জন্মভূমি।

মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিতীয় বর্ষ।

১২৯৮ সালের—পৌষ হইতে ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা।

৩৪।১ নং কলুটোলাষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৯ সাল।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ডাঃ মাঃ ।৶০ ছয় আনা।

সূচীপত্র।

চিত্র বা ছবির সূচীপত্র।

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } পৌষ। ১২৯৮। { ১ম সংখ্যা।

হিন্দুর প্রাত্যহিক কার্য্য।

আহার, বিহার, নিদ্রা—সকলেরই আছে। সামান্য পশু-পক্ষী হইতে সুসভ্য মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই এই প্রাকৃতিক কার্য্যের বশীভূত। তবে প্রভেদের মধ্যে সভ্য মনুষ্যের এ সমস্ত নিয়মিত ও পশুপক্ষীদিগের অনিয়মিত। হিন্দুদিগের নিয়ম-সমূহ আবার কিছু বিশেষ রকমের। অপর জাতির নিয়ম অনেকটা স্বেচ্ছাকৃত। হিন্দুদিগের ধর্ম্মময় কর্ত্তব্যের মধ্যে দৈনন্দিন কর্ত্তব্যেও শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত নিয়ম, সুপ্রতিষ্ঠিত; সেইগুলি বলিবার জন্যই অদ্য আমাদের প্রয়াস।

প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিতে হয়। যে সময়ে উঠিতে হয়, তাহার শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। সূর্য্যোদয়ের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্র মুহূর্ত্ত। প্রায় দুই দুই দণ্ডে এক এক মুহূর্ত্ত। ২৪ মিনিটে ১ দণ্ড। সূর্য্যোদয়ের ৪৮ মিনিট পূর্ব্বেই যে মুহূর্ত্তের শেষ, তাহারই নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। এ মুহূর্ত্তের পরিমাণও পূর্ব্ববৎ। ইহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ৪৮ মিনিট, গাত্রোত্থান করিবার কাল। ইহা শাস্ত্রের আজ্ঞা। পূর্ব্ব পুরুষগণ এবং বর্ত্তমান সময়ের অনেক ব্যক্তিও এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু সে "ওল্ড" মতের আদর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বেলা ৭টা ৭॥০টা না হইলে, নিদ্রাভঙ্গ এখন অনেকেরই হয় না। এই ব্রাহ্ম-রৌদ্র-মৌহূর্ত্তিক নিদ্রাই বর্ত্তমান সময়ের "ক্ষীর ঘুম"-পদ-বাচ্য। এই শুভ নিদ্রার ব্যাঘাত করাকেই নব্যসম্প্রদায়, "ক্ষীরঘুমে কাটি দেওয়া" রূপ নিন্দিত আখ্যা প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। ক্ষীর-ঘুমে কাটি পড়িলে, রজনীর দশঘটিকা-ব্যাপিনী ঘোর নিদ্রাও মাটী হ'ন—এ কথা অনেকেই বলেন এবং মানেন। আকাশের প্রাভাতিক সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য কাহারও কাহারও কখন ইচ্ছা হইলেও, এই ক্ষীর-ঘুমের অনুরোধে তাহা ঘটিয়া উঠে না, এমন সংবাদ বিশ্বস্তসূত্রে আমরা অবগত আছি। যাহা হউক, সভ্যের অনুরোধে আমি কিন্তু ক্ষীর-ঘুমের পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। ভর্ৎসিতই হই, আর নিন্দিতই হই, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উত্থানের গুণ-গৌরব প্রকাশ আমি করিবই; এবং আমি মুক্তকণ্ঠে ইহাও বলিতে পারি যে, যে কেহ দিন কয়েক এই স্নিগ্ধ-বাত-সঞ্চার-রমণীয়, কুলায়-লীন বিহঙ্গমকুলের কল-কল রবে মুখরিত, "বিচেরতারক" গগনমণ্ডলের আরক্তিম পূর্ব্ব-প্রান্তে পরিশোভিত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিবেন, তিনিই আমার সহিত একমতাবলম্বী হইবেন। ধর্ম্মচর্চ্চার কথা, আধ্যাত্মিক ভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুদ্ধ, বিষয়ীর বিষয়োপভোগক্ষম, শারীরিক মানসিক স্ফূর্ত্তিসম্পাদনের জন্যই প্রত্যূষোত্থানকে শতমুখে প্রশংসা করা যায়।

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়াই সকল চিন্তা আসিবার পূর্ব্বে, স্বস্থচিত্তে প্রধান প্রধান দেবগণ, ঋষিগণ এবং অন্য যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় আছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের স্মরণে চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়। সুপ্রসন্নচিত্তে সংসারের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য এবং তথাবিধ লোকের প্রতি সম্মান-ভক্তি প্রদর্শনের জন্য এরূপ উৎকৃষ্ট উপায় দ্বিতীয় নাই।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরন্ দেববরানৃষীন্।"

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি-রাহু-কেতু
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রবি, শশী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু ইহাঁরা সকলে আমার 'সুপ্রভাত' করুন। এই শ্লোকটী পাঠ করিবে। অনন্তর,—

"প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥"

মস্তকস্থিত শ্বেত-পদ্মে আসীন প্রসন্নবদন, দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ প্রশান্ত গুরুদেবকে তদীয় নামোচ্চারণ সহকারে প্রাতঃকালে স্মরণ করিবে। এই বিধি মত কর্ম্ম করিয়া,—

"নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্ ॥"

যাঁহার বাক্যামৃতে সংসার-গরলে বিনষ্ট হয়, ইষ্টদেব-স্বরূপী সেই গুরুদেবকে প্রণাম। এই নমস্কার-মন্ত্র পাঠ করিবে।

এখনকার কালে প্রত্যহ প্রাতে ঐরূপ ভাবে গুরু-প্রণাম বড় সহজ কথা নহে। যাহাকে দেখিলে, ক্রোধ ও ভয় যুগপৎ উপস্থিত হয়, যাহার প্রসঙ্গে ঘৃণার উদ্রেক হয়, এহেন জুতা-জামা-কোট-পেন্টলুন-বর্জ্জিত চীরবাসা গুরু জাতীয় ব্যক্তির প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন! বরং একদিন নিঝ্ঞ্ঝাটে ভোরে উঠা যায়, তবু ঐ রৌদ্র-বীভৎস-ভয়াল-করুণ-রসাত্মক প্রণাম-কার্য্যটী করা যায় না। গুরু, শিষ্য—উভয়ের মধ্যে, কাহার দোষে নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু এ ভাব যে নব্যগণের অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে, ইহা নিশ্চয়। তথাপি আমাকে গুরুপ্রণাম করিতে বলিতে হইল। কেননা, আমি সেই পুরাতন ঋষিদিগের আদেশবাহী। যিনিই শাস্ত্রাজ্ঞা প্রচার করিবেন, তাঁহাকেই এই কার্য্য করিতে বলিতে হইবে, আর যিনি তাহা পালন করিবেন, তাঁহাকে গুরুপ্রণামও করিতে হইবে। তার পর,—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥

"হিন্দু শাস্ত্রমতে, সকল আচার, সকল অনুষ্ঠান, এবং সকল আশ্রমের চরম ফল মুক্তি। যাঁহারা, সসাগর ধরামণ্ডলের একচ্ছত্রাধিপত্যকে তৃণ-জ্ঞান করেন, স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্বকেও বন্ধন-জ্ঞানে ঘৃণা করেন, ব্রহ্মপদকেও অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন, সেই আজন্ম-তপো-নিমগ্ন বল্মীকাবৃত-দেহ মহাযোগিগণও মুক্তির জন্য লালায়িত। যে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, মুক্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, তাহারই শাস্ত্রীয় নাম "তত্ত্ব-জ্ঞান।" উপরি বিন্যস্ত শ্লোক সেই তত্ত্বজ্ঞানেরই উপদেশক।

"উত্থায়োত্থায় বোদ্ধব্যং মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
মরণ-ব্যাধি-শোকানাং কিমদ্য নিপতিষ্যতি ॥"

"প্রত্যহ গাত্রোত্থান করিবার পরই—মহাভয় উপস্থিত বিবেচনা করা উচিত। মরণ, রোগ এবং শোকের মধ্যে আজ যে কোন্‌টী সমাগত হইবে, তাহা ত স্থির নাই।" এই উপদেশটী যেমন মানুষের মহাবৈরাগ্যের অঙ্কুরচ্ছায়া প্রতিফলিত করিতে সক্ষম; তদ্রূপ,—"অহং দেবঃ" ইহাও তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গমকরণে উদ্যত।

'আমি' ও 'আমার' এই জ্ঞানই ত যত সর্ব্বনেশে। 'আমি' বা 'আমার' জিনিসটা কি বুঝিতে পারিলে কিন্তু আর ঝঞ্ঝাট থাকে না। পুত্র মিত্র গৃহ গৃহিণী অর্থ বস্ত্র—আমার, আর এই দেহই আমি, এই ভাবিয়াই সংসারী, ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত;—শোকে কাতর, রোগে কাতর, দারিদ্র্যে কাতর, মরণ-ভয়ে কাতর। সেই কুসংস্কারকে উন্মূলন করিবার জন্য বা যাহাতে সে কুসংস্কার হৃদয়ে প্রবেশ না করে, এই জন্য প্রত্যহ "অহং দেবঃ" ইত্যাদি চিন্তা করিতে শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন।

"আমি কে?—আমি সেই পরম দেবতা। তদরিক্ত দেহ বা অন্য কিছু 'আমি' নহি। আমি কে?—আমি সেই নিত্যনিরঞ্জন ব্রহ্ম;—শোক-দুঃখ আমার নাই। আমি কে?—আমি সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ;—আমি নিত্য-মুক্ত।" * এই সোঽহং জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যও সেই জ্ঞানের প্রযোজক। ঋষিতপস্বীর তপস্যোপযোগী নির্জ্জন বন আছে, অনাসক্তের নির্ম্মল মন আছে; কিন্তু সংসারমগ্ন বিষয়ান্ধের তেমন কি আছে?—আছে প্রাতঃকাল! নিদ্রার নির্দ্দোষ গোময়-লেপনে হৃদয়-মন্দির তখন সহজতঃ পরিষ্কৃত; চিন্তার আবর্জ্জনা তখনও জমে নাই; সংসারের কোলাহল তখনও কর্ণ-পটহে প্রতিধ্বনিত হয় নাই;—সেই জন্যই প্রাতঃকাল সূক্ষ্ম চিন্তার পরম উপযোগী।

* "অহং দেবঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ।

হিন্দুর প্রাত্যহিক কার্য্য।

কোন গাঢ় চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিচ্ছায়া হৃদয়-ফলকে দৃঢ়তররূপে অঙ্কিত করিতে, যাহার ইচ্ছা; প্রত্যূষ সময়, তাহার ইষ্ট-সিদ্ধিকর পরম সহায়। ঐ দৈবে সময়ে ত্রিবিধ-তাপ-তপ্ত সংসারীর এই ধ্যান যে কত দূর ফলপ্রদ, তাহা ব্যক্ত করা মাদৃশ বিষয়ান্ধ ব্যক্তিদিগের সাধ্যাতীত। ইহার পর,—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে। ১

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ২

এই শ্লোকদ্বয় পাঠ ও ইহার অর্থ ভাবনা করিবে।

অর্থ;—হে ত্রিলোকনাথ! চৈতন্যময়! দেবাধিদেব! শ্রীনাথ! বিষ্ণো! আপনার প্রীতি-সাধনের জন্য, আপনার আজ্ঞাক্রমেই প্রাতঃকালে উঠিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১

ঠাকুর! ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান আমাদের আছে, কিন্তু ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অধর্ম্মে অপ্রবৃত্তি ত হয় না। হে হৃষী-কেশ! বুঝিয়াছি:—তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যেরূপ করাইতেছ, আমি সেইরূপই করিতেছি। ২

ইহাই হইল হিন্দুর পরমশিক্ষা;—কর্তৃত্বাভি-মান যাহাতে দূর হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করাই হিন্দুধর্ম্ম-সম্মত প্রধান কার্য্য। কর্তৃত্বাভিমানই যত অনর্থের মূল। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে নিজের যন্ত্রতুল্য পরাধীনতা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর-নির্ভরতা ব্যতীত কর্তৃত্বাহঙ্কার সম্পূর্ণ দূর হয় না, সুতরাং সে ভাবের সমাবেশও ইহাতে যথেষ্ট।

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং, দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

প্রাতঃকালে দুর্গানাম স্মরণ করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে, দুর্গানাম স্মরণ করে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, তাহার সকল বিপদ্ দূর হয়।

"কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥

"কর্কোটক, নাগ, দময়ন্তী, নল এবং রাজর্ষি ঋতুপর্ণের নামকীর্ত্তনে কলিদোষ নষ্ট হয়।

"কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চলভতে পুনঃ॥"

যে মনুষ্য, প্রাতঃকালে উঠিয়া সহস্রবাহু রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহার দ্রব্য হারাইয়া যায় না এবং হারান দ্রব্যের পুনঃ-প্রাপ্তি হয়।

"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

নলরাজা পুণ্যকীর্ত্তি; যুধিষ্ঠির পুণ্যকীর্ত্তি; বৈদেহী পুণ্যকীর্ত্তি; এবং জনার্দ্দন পুণ্যকীর্ত্তি।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী,—এই পঞ্চকন্যা স্মরণ প্রত্যহ কর্ত্তব্য। কেননা, ইহাদিগের স্মরণে মহাপাতক পর্য্যন্ত দূর হয়।

এই সমুদয় পাঠ করিয়া নারায়ণ, অন্নপূর্ণা, কাশী, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি পবিত্র নামকীর্ত্তন, তন্নাম-সংবলিত শ্লোকপাঠ করিবার রীতি বহুদেশে আছে। *

অনন্তর, "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ "এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথমেই শয্যা হইতে দক্ষিণ চরণ ভূমিতে স্থাপন করিবে।

যে কার্য্যটী বিবৃত করা গেল, তাহা লিখিতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও কার্য্যে অতি সামান্য।

এ সকল কার্য্য করিতে কোনরূপ অর্থ ব্যয় নাই, শারীরিক পরিশ্রম নাই, কেবল একটু ভোরে উঠা; ইহাতেই কি কম লাভ। শরীর এবং মনের স্ফূর্ত্তি-লাভ হয়; বিষয়ীর ইহাই ত একমাত্র প্রার্থনীয়।

হায়! হায়! এমন কার্য্যেও প্রবৃত্তি হয় না!

আবার বিষম! না বলিয়াও থাকিতে পারি না; বলিতে কিন্তু ভয়ও হয়, লজ্জাও হয়। এখন আবার তন্ত্রের মতে প্রাতঃকৃত্য বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। জানিতে পারিতেছি বটে, এই উপদেশ মানিয়া চলিতে পারে, এমন ব্যক্তি—শিক্ষিতের মধ্যে নাই, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মধ্যেও অল্প-স্বল্প। তবুও বলিতে ওষ্ঠাধর বিকম্পিত; লিখিতে লেখনী বেগবতী। জানি বটে, ১০টার

---

* বিশেষতঃ কাশীধামে,
বিশ্বেশং কেশবং ঢুণ্ডিং দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্।
বন্দে কাশীং গুহং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্॥
এই শ্লোক এবং "হর হর বিশ্বেশ্বর" প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিবার প্রথা আছে।

সময় আফিস,—কেহ রেলওয়ে ডেলি-পেশেঞ্জার, কেহ বা পদব্রজে দ্বিক্রোশাতিবাহী; সুতরাং ৮টার পূর্ব্বে-আহারী; ভোরে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহাদিগকে এত বিরক্ত করা ভাল নয়। এই গেল পৌরাণিক প্রাতঃকৃত্য, আবার তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য;—এইরূপে বিভীষিকা দেখান উচিত নয়। বিশেষতঃ যদি প্রাতঃকৃত্যেই বাজীভোর করিয়া দেওয়া যায়, তবে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে [illegible] যাবে কখন্? আলাপ-চারিতে রাত কাটাইয়া গাওনার সময় নষ্ট করা অনুচিত, তাহাও জানি। তবু কিন্তু মন মানিতেছে না। মনে হইতেছে, একজনও কি এইরূপ শাস্ত্রোক্ত পালন করিতে পারিবে না? যদি পারে;—তবে ত প্রকাশ করাই উচিত। কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলেও, দেখিয়া শুনিয়া কাহারও শাস্ত্রোপদেশ মানিতে ইচ্ছাও ত হইতে পারে। তাহাও কোন্ কম লাভ!

"সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্।"

মনে মনে ধর্ম্মকরণেচ্ছা প্রবল হইলেও ধর্ম্ম হয়। যদি কাহারও সেই ইচ্ছা হয়, এই আশাতেই ভয়-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলাম।

এমনই ভ্রম জন্মিয়াছে, বোধ হয় যেন দেশ-শুদ্ধ সবাই আফিসার। কিন্তু তাহা ত নহে। করিতে পারে, অথচ করে না; যুগধর্ম্মবশতঃ বা অনভিজ্ঞতানিবন্ধন্ সময়াভাব না হইলেও শাস্ত্র-মত পালনে পরাঙ্মুখ,—এমনতর ব্যক্তিও এখন অনেক। তাহাদিগকে ত জোর করিয়া শুনাইতে পারি। তবে না বলিব কেন? যাহা হউক, আর বকিব না;—এখন—"প্রকৃতমনুসরামঃ।"

অনন্তর, 'রাত্রিবাস' ত্যাগ করিয়া—চিন্তা করিবে;—মস্তকোপরি সহস্রদলপদ্মে শুক্লবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়ধারী, শুক্ল মাল্য ও শুক্লানুলেপনে শোভিত, স্বপ্রকাশস্বরূপ গুরুদেব, এবং তাঁহার বামভাগে স্বপ্রকাশস্বরূপা রক্তবর্ণা তদীয় শক্তি অবস্থিত। এই চিন্তা করিয়া শক্তি-সম্মিলিত গুরুদেবের মানসোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর,—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" ২

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিবে।

ভাবার্থ;—এই সমুদয়বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী পরম দেবতার পরম পদ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গুরুদেবকে নমস্কার। ১

যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা এই অজ্ঞান তিমিরান্ধ ব্যক্তির নেত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। ২

তৎপরে, সুদৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইয়া শ্বাসাবরোধ সহকারে "হংসঃ" এই মন্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবতাস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করিবে এবং স্বীয় শরীর তদীয় প্রভায় উদ্ভাসিত মনে করিবে। এই কুলকুণ্ডলিনীটী যে কি তাহা বলিতেছি;—

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামে ছয়টী চক্র, শরীরে অবস্থিত। তন্মধ্যে মূলাধার চক্র গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধে ও লিঙ্গমূল-নিম্নে অবস্থিত। অপর পাঁচটী চক্র যথাক্রমে লিঙ্গমূল, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ এবং ভ্রূমধ্যে অবস্থিত।

অধোমুখ চতুর্দ্দল পদ্ম। ব, শ, ষ, স, এই বর্ণচতুষ্টয়ই সেই পদ্মের সুবর্ণ-বর্ণ দলচতুষ্টয়। চতুষ্কোণ পৃথিবীচক্র ইহাতে অবস্থিত বলিয়া ইহাই মূলাধার-চক্র নামে অভিহিত। এই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে কামরূপ-পুর বিদ্যমান।

"তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকনককলা-কোমলঃ পশ্চিমাস্যো জ্ঞান-ধ্যান-প্রকাশঃ প্রথমকিসলয়াকাররূপঃ স্বয়ম্ভূঃ।"

তন্মধ্যে দ্রবীভূত-সুবর্ণ-দীপ্তি, জ্ঞান-ধ্যানে প্রকাশমান, প্রথম-কিসলয়াকৃতি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ পশ্চিমাস্যে অবস্থিত। কুলকুণ্ডলিনী এই মূলাধার চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান। ইনি কোটি-সৌদামিনীবৎ প্রভাবতী সূক্ষ্মা সার্দ্ধত্রিকুণ্ডলা (৩॥০ সাড়ে তিন পেঁচ) সর্পাকৃতি এবং সুপ্তা। এই জগন্মোহিনী মহাদেবী, মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; প্রাতঃকালে "হংসঃ" মন্ত্রে ইহাঁকেই জাগরিত করিতে হয়।

"ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্।
তামুত্থাপ্য মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেণ সাধকঃ॥
উদ্যদ্দিনকরদ্যোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ॥
মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং মূলবিদ্যাং বিভাবয়েৎ॥"
মূলবিদ্যাং কুলকুণ্ডলিনীম্। (টীকা)

এই তান্ত্রিব প্রাতঃকৃত্য দীক্ষিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে, ইষ্টদেবতার পূজায় অধিকার হয় না। ইহার প্রমাণ রুদ্রযামল তন্ত্রে আছে, যথা;—

"প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ।
নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥"

প্রাতঃকৃত্য না করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা করিলেও, অশুচি অবস্থায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ন্যায়; সে অর্চ্চনা নিষ্ফল হয়।

অদ্য এইপর্য্যন্ত।

কলিকাতা-দর্শন।

আমি কলিকাতায় এই উপস্থিত হইতেছি। দু'শ বৎসরের পর আজ একেবারে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; কোন দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। দু'শ বৎসর পূর্ব্বে আমি এদেশে ছিলাম, তারপর কোথায় ছিলাম, বলিব না। আমার অস্তিত্বে লোকের বিশ্বাস না হয়, না হউক; আমার লেখায় বিশ্বাস হইলেই হইল।

আমার সহচর একজন ৩০ বৎসর-বয়স্ক মূক। কলিকাতার সর্ব্বস্থান তাহার বিদিত, অন্ততঃ এইরূপ আমার বিশ্বাস। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই আমি অবাক্! মাঠের মতন বিস্তৃত এক একটা রাস্তা। আবার, এই রাস্তা,—এই রাস্তা; রাস্তার উপর রাস্তা। সহরের চারিদিকে প্রাচীর নাই; মাঝে মাঝে ফটক নাই। সহরের বিশাল তোরণ নাই। এ যেন কি একটা নূতন কাণ্ড!

আবার কত রকম অশ্বযান; ওঃ! এই লম্বা একপ্রকার যান পোঁ পোঁ শব্দ করিতেছে আর কত লোক লইয়া অনতি দ্রুতবেগে চলিয়াছে; তদ্ভিন্ন এই চতুষ্কোণ, এই সাবরণ, এই নিরাবরণ,—ওঃ! অশ্বযানের ত সংখ্যা নাই। এত ধনী কি কলিকাতায়? তা হবে। আবার একি! এ যে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা! প্রাচীর নাই; লৌহদণ্ডের বেষ্টনী!! গৃহের গবাক্ষ কৈ? ঐ স্তরে স্তরে সুরক্ষিত কাষ্ঠ-ফলক-সমূহে মণ্ডিত বদ্ধ-কবাটবৎ ও গুলি কি! ঐ কি এখনকার বাতায়ন! আলোক-বায়ু সঞ্চার হয় কিরূপে? গবাক্ষ-ছিদ্র কৈ?

না, না,—এ যে খোলা যায়, ঐ যে খোলা রহিয়াছে। বাঃ! বেশ ত!!

কিন্তু ঐ গৃহে বোধ হয় স্ত্রীলোক আসে না। নতুবা রাস্তার ধারে খোলা বাতায়ন কিরূপে করিবে? ওমা! ঐ যে স্ত্রীলোক; অবগুণ্ঠনও ত নাই, এই যে অবগুণ্ঠনহীন রমণীর যৌবন-কোমল বদনমণ্ডল বাতায়নের বাহিরেও আসিতেছে। ইহা কি ভদ্রগৃহ নহে? যা'ই হউক, আর বাতায়নের দিকে চাহিব না।

মোটা-মোটা ছোট-ছোট থামের মতন মাটীতে পোঁতা,—এগুলি কি গো? মাথার নীচে একটী আবার বাঘের মুখ। কলসী লইয়া লোকে উহার নিকট আসিতেছে কেন?—বা! বা!! হাত দিতেছে, আর হুহু শব্দে জল পড়িতেছে!! বড় ত মজা। সহচরকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কাজেই একজন ভদ্রলোককে ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইল। এই ত সম্মুখেই অনেক ভদ্রলোক ক্রমান্বয়ে আসিতেছে; একবার জিজ্ঞাসা করি;—ওহে বাপু! এগুলি (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) কি গা?—উত্তর দিলে না যে, এগুলি কি?—(শুনিয়া) "নিগার"। নিগার কি? এখনকার কথা কি দুর্ব্বোধ্য? আচ্ছা, এই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি;—নিগার কি বাপু! এই মাটীতে পোঁতা খাট-খাট থামের ন্যায়—এ গুলির নাম কি নিগার?—হাসিলে যে?

দূর হউক আর ফর্সা-কাপড়ওয়ালাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।

এই যে আবার লম্বা লম্বা খুঁটী, মাথার উপর তিন চারিটা করিয়া লোহার দড়ির মতন বরাবর চলিয়া গিয়াছে! ইহার নাম কি?—এই দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করি,—এগুলি কি বাপু!—কি বলিলে?—"টেলিগ্রাফের তার?"

ঘাট হইয়াছে, আর কোন কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিব না। এই কয় বৎসরে, ভাষাও বদলাইয়া গিয়াছে। তাই ত! আমাদের ত কলিকাতায় থাকা ভার দেখিতেছি। অন্যদেশ কিরকম জানি না; যদি এইরূপ হয়ত ফিরিয়া আসিয়া ঝকমারি করিয়াছি; আবার সেই দেশে যাইতে হইবে, আর কি!

বাঃ! একখানি কৃষ্ণবর্ণ ফলকে কি সুন্দর বঙ্গাক্ষর লিখিত রহিয়াছে! দেখিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল। কি লেখা দেখি;—

সি, সি, বানর্জ্জি।

হায়! হায়!! কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে; অমৃতে গরল মিশিয়াছে: জ্যোৎস্নায় দাবানল

ঘুমিয়াছে'! এই অক্ষর 'ব্যানর্জ্জি' অধিকার করিয়াছে? (আর একখানি দেখিয়া) এখানিও ত তদ্রূপ দেখিতেছি। দেখি, ইহাতেই বা কি লেখা;—

বি, কুণ্ডের ঔষধালয়।

তবু ভাল। অনেকটা বুঝিলাম।" 'বি টী' বুঝিলাম না। ও টী কি নামের স্থানীয়?"

দেখি, দেখি!—

এ. বসুর পুস্তকালয়।

হাঁ; "বি," "এ," এইগুলি নামই বটে। এদেশে কি আর সেই অমৃতময় নাম সমূহ প্রচলিত নাই? আমরা যে, ছল-ক্রমেও, প্রসঙ্গক্রমেও ভগবন্নাম কীর্ত্তন ভাল বাসিতাম। পুত্রকে "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়া আজন্ম-দুরাচার অজামিলের পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়াছিল; একথা কি এখনকার বাঙ্গালীরা ভুলিয়া গিয়াছে; আহা! সেই সদাসর্ব্বক্ষণ পুত্রকে ডাকিয়া ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের ফল পাইতে বাঞ্ছা, লোকের ফুরাইল কেন? এ কিংভূত-কিমাকার নাম রাখিবার প্রবৃত্তি কেন হইল? বুঝি, ইহাও ভগবানের লীলা। কলিযুগের মাহাত্ম্য! কোনরূপেই যাহাতে পাপ ক্ষয় না হয়, তাহার আয়োজনের নিদর্শন বুঝি এই সব। "নারায়ণঃ!"

এই সব রাস্তার মোড়ে দেয়ালেমারা কাগজে বড় বড় অক্ষরে কি লেখা?—

ষ্টার থিয়েটার।

আবার তাই? সেই বিষম কথা? সেই দুর্ব্বোধ ভাষা? থাক্, আর ভাল লাগে না!

আর বেড়াইব না; স্নানাহ্নিকের বেলা হইল। শ্রীশ্রী৺ গঙ্গাস্নানে যাই।—যে ইচ্ছা, সেই কার্য্যারম্ভ। ক্রমে পথের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া কত যবন, কত নীচজাতি স্পর্শ-করত পবিত্র হইয়া পতিত-পাবনীর তীরে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য,—এই ভ্রমণ ও গঙ্গাতীর গমনে পথ-প্রদর্শক ছিলেন, আমার সেই মুক সঙ্গী।

উৎকল-দেশীয় পাণ্ডাগণের 'বাবু এদিকে' 'বাবু এদিকে' ইত্যাদি অভ্যর্থনা-বাক্যে আপ্যায়িত, ব্যতিব্যস্ত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সহচরের সঙ্কেতানুসারে এক পাণ্ডার নিকট বস্ত্রাদিস্থাপন ও কিঞ্চিৎ তৈলমর্দ্দন পুরঃসর জলেনামিলাম। নামিয়াই ভাবিলাম, ৺ গঙ্গাভক্তির পরীক্ষা এইখানেই বটে! নতুবা "শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলং গঙ্গাজলং নির্ম্মলং" পাইলে ত ভক্তি হইতে পারেই। এমন জল দুষ্প্রাপ্য বোধে তথায় স্নান সম্পন্ন করিয়া "সদ্যো দুঃখবিনাশিনী সুখদা" বলিতে অনেকেই তৎপর হইতে পারেন। কিন্তু এখানে,—এই সদা আবর্জ্জনাময়, মহাবিষ্ঠা-চূর্ণবিষ্ঠা-কাস-নিষ্ঠীবনবাহী দোদুল্যমান গঙ্গাসলিলে স্নান করিতে কয় জনের বিকার উপস্থিত হয় না? আচমন করিবার জন্য দক্ষিণ করতলে জল লইয়া দেখিলে, তাহার সঙ্গে অপানঃনিঃসৃত মটরচূর্ণ ও পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রাভ পদার্থ বিশেষ ভাসমান; তখন তোমার মনে যদি কিছুমাত্র ঘৃণার উদ্রেক না হয়, তবেই তুমি প্রকৃত ভক্ত। তাই বলিতেছিলাম, এইখানেই শ্রীশ্রী৺ গঙ্গাভক্তির পরীক্ষা।

মা অধমতারিণি! পতিতপাবনি! দীনে দয়া কর। মনের বিকার বিলুপ্ত করিয়া দেও। মা গঙ্গে! রক্ষা কর। তোমার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা কলিযুগে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছি। আজ যে এই অপরাধ তোমার নিকট হইল, মা! নিজগুণে দয়া করিয়া তাহা ক্ষমা কর।

জলেই দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া, অনবরত হস্ততাড়ন দ্বারা জলরাশি-বিলোড়নে আবর্জ্জনাদি দূরকরত স্নানাহ্নিক সমাপন করিলাম। একটা কথা ভুলিয়াছি, পোতের ন্যায় বহুতর পদার্থ জলোপরি অবস্থিত দেখিলাম। তাহা হইতে মধ্যে মধ্যে ধূমোদ্গার ও বংশীশব্দ হইতেছে; এগুলি কি—জানিবার জন্য কৌতূহল হইল বটে; কিন্তু পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।

সহচরও স্নান সমাপ্ত করিলেন।

শুধু গঙ্গাতীরে বসিয়া ফলমূলে জলযোগ সমাপ্ত করিলাম। দোকানে মিঠাই; কাজেই সন্দেশাদি লওয়া হয় নাই। তৎপরে সহচর সঙ্কেতে বুঝাইলেন, তাঁহার ২।১টী পরিচিত স্থল আছে, সেখানে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া হইতে পারিবে এবং আমার স্বপাকেও ব্যাঘাত ঘটিবে না।

যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম, "গন্তব্য-বাটীতে উপস্থিত হইয়া আর্দ্র বস্ত্রখানি শুষ্ক করিতে হইবে; পরে পুনরায় তথায় যেরূপে হউক, স্নান করিতে হইবে; নচেৎ এই রাস্তা,—কোথাও অন্ন বিকীর্ণ রহিয়াছে, কোথাও হস্তমৃত্তিকার দাগ, কোথাও যবন-নিক্ষিপ্ত মাংস-ব্যঞ্জনাবশিষ্ট জল;—

যত সাবধানেই গমন করি, ইহা স্পর্শ একবার না একবার করিতেই হইতেছে; কাজেই স্নান না করিলে চলিবে না। স্নান করিয়া এই বস্ত্র পুরিব। পাকে একটু বিলম্ব হইবে, তা কি করিব!"

কিঞ্চিৎক্ষণ পরে, সহচর জানাইলেন, এই সম্মুখের বাটী আমাদের ভাবী আশ্রয়। সহচর অগ্রসর হইলেন, আমি পশ্চাদ্বর্ত্তী; বাটীর ভিতরের দিকে দুই-চার পা অগ্রসর হইয়াই ভাবিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! হাবা বেটা আমাকে যবনের বাটীতে লইয়া যাইতেছে; ওঃ! কি পলাণ্ডু-রন্ধনের দুর্গন্ধ!! রামঃ!" নাসিকা দৃঢ়তররূপে টিপিয়া ও বস্ত্রাবৃত করিয়া নিঃশব্দে পশ্চাৎপদ হইলাম। ভাবিলাম, "ওরূপ সহচরে আমার কাজ নাই; অদৃষ্টে যা থাকে, হবে; আমি একাকীই কলিকাতা দর্শন করিব।"

বাটীর বাহিরে আসিয়া একটী বক্র পথ আশ্রয় করিলাম। কিন্তু ক্ষুধা অধিক, চলিতে প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিলাম, "দেখিয়া শুনিয়া এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অতিথি হইব।" এমন সময়ে সেই পরিচিত মূকের কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে গেল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, সহচর আমার নিকট দৌড়িয়া আসিতেছে। আমি মনে করিলাম, "আমিও দৌড়িয়া পলাই।" কিন্তু কার্য্যত তাহা ঘটিল না। সে আমার নিকটে আসিয়া একেবারে পদদ্বয় ধারণ করিল ও কত ঠারে-ঠোরে বলিতে লাগিল;— "চলুন—ফিরিয়া আসিলেন কেন?"

এই ব্যাপারে আমাদের উভয়ের পার্শ্বে বহুতর লোক জমিয়া গেল। আমি ভাবিলাম, "কি বিপদ! কাজেই হাবাকে উঠাইতে হইল" এবং বুঝাইয়া দিলাম, "সে স্থলে কিছুতেই যাইব না। তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

অগত্যা আমার প্রস্তাবে সহচর সম্মত হইল। লোক-জনও যথাস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যাইতে যাইতে হাবাকে সঙ্কেতে বলিলাম, "যাহার বাটী লইয়া গিয়াছিলে, সে ত ব্রাহ্মণ নহে।" অধিক বলিতে পারিলাম না। হাবা অনেক প্রকার শপথ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে "সে খুব ভাল ব্রাহ্মণ।"

আমি ত অবাক্। ভাবিলাম, "তবে হাবা, ভ্রমক্রমে আর কারও বাটী লইয়া গিয়া থাকিবে।"

নীরবে কিছুদূর চলিলাম। লক্ষ্য,—ব্রাহ্মণবাটীর দিকে আছে। কিন্তু কি করিয়া যে, ব্রাহ্মণ-বাটী চিনিব তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, "এত বসতি, ইহার মধ্যে অবশ্যই ব্রাহ্মণ আছে। মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত, অতিথি-অপেক্ষায় দ্বারদেশে কেহ না কেহ দণ্ডায়মান আছেনই। আমি মূঢ়, হতভাগ্য; অদ্য আমার অতিথি-সেবা হইল না।" একটু পরে, সম্মুখে দেখি, একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পলিত কেশ, গলিত দন্ত, উত্তরীয় নামাবলী, ললাটে তিলক,—রোদন করিতে করিতে আসিতেছেন। আমি কাতর হইয়া (আকার ও অবস্থা দর্শনে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভুলিয়া) জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনি রোদন করিতেছেন কেন?" ব্রাহ্মণ—"আমি বড় দরিদ্র, অদ্য তিন দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি, এখানে আমার পরিচিত কেহ নাই; তবে শুনিয়াছি, কলিকাতা রাজধানী, অনেক ধনীর বাস এইস্থানে; 'যদি কিছু সাহায্য হয়' এই আশায় এখানে আসিয়াছি। কিন্তু সাহায্য হওয়া দূরে থাক্, তিন দিন উপবাসী রহিয়াছি। অতিথি হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছি, অতিথি-সৎকার কিন্তু এখানে বিচিত্র। ধমক, ভর্ৎসনা, ভীতি-প্রদর্শন, চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবার চেষ্টা ও প্রহার,—এই পঞ্চবিধ সৎকার এখানে প্রচলিত। আমি সবগুলিই লাভ করিয়াছি"—বলিয়া পৃষ্ঠদেশ দেখাইলেন। আমি কম্পিত-কলেবরে বিপ্রপৃষ্ঠে সেই রক্তমুখ জুতা-প্রহার-চিহ্ন অবলোকন করিলাম। শরীর কণ্টকিত হইল। ভাবিলাম, "আর না, ঢের হইয়াছে; এখন "পলায়নমেব শ্রেয়ঃ।" ব্রাহ্মণকে বলিলাম আমার বহুভাগ্য; আপনি আজ আমার অতিথি হউন। কিন্তু ঠাকুর! আমি স্বয়ং পথিক, অন্নসংস্থান আমার নাই। দোকান হইতে আপনার ইচ্ছামত সামগ্রী কিনিয়া দিতেছি।" ব্রাহ্মণ আমাকে কৃতার্থ করিলেন; তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে মাত্র ফল মূল কিনিয়া দিলাম, তিনি গ্রহণ করিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ লইলাম। হাবা মিষ্ট-সামগ্রী লইল। তিন জনে পুনরায় গঙ্গাতীরে গিয়া উক্তরূপে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাধা করিলাম।

এখন আমরা তিন জনেই এক সঙ্গে চলিলাম যাইতে যাইতে দেখি, পথের ধারে একটী মেটে ঘরের দ্বারদেশে লিখিত রহিয়াছে,

হিন্দুদিগের আহার করিবা স্থান।

আমি আগ্রহের সহিত সেই ব্রাহ্মণকে বলিলাম, "বেশ হইয়াছে, এইখানে পাক করিয়া আহার করা

যাইতে পারে ত?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "রামঃ! ও গুলিকে এখন লোকে হোটেল না কি বলে। হোটেলে অন্ন বিক্রয় হয়। পাচকের জাতিস্থিরতা নাই। ভোক্তা যে-সে উপস্থিত হয়; সর্ব্বজাতির উচ্ছিষ্ট সর্ব্বত্র। এক একটী হোটেল এক একটী ক্ষুদ্র নরক। ওখানে পদার্পণ করিলেও পাপ হয়।"

আমি যতই কলিকাতার ভাব বুঝিতে লাগিলাম, ততই স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম। হাবাকে সঙ্কেতে বলিলাম,—কলিকাতায় আর থাকিব না; বহির্গমনের পথে লইয়া চল। হাবা তাহাই করিল।

যতই কেন কষ্টে পড়ি না, নূতন স্থান দর্শনের কৌতূহল সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে। চক্ষু এদিক-ওদিক যাইতে লাগিল। এক স্থানে দেখি—লেখা রহিয়াছে,

পরীক্ষোত্তীর্ণা

ধাত্রী

এন্, ভট্টাচার্য্য।

আমি দেখিয়া ভাবিলাম, "এ কি! এসব বুঝি ভাষা-ব্যত্যয়ের ফল। লিঙ্গভেদ অর্থভেদ, সবই হইয়াছে বোধ হয়। 'পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী' শব্দে হয় ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আচ্ছা এই বৃদ্ধ ত আমা অপেক্ষা আধুনিক, ইহাঁকে একবার অর্থটী জিজ্ঞাসা করি।"—মহাশয় "পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী" শব্দের অর্থ কি?

তিনি বলিলেন, "এখন ধাত্রী-বিদ্যার পরীক্ষা দেওয়া উঠিয়াছে, যে ধাত্রী সেই পরীক্ষায় ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই 'পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী।' আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু—সিংহের বাটীতে একবার পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী গিয়াছিল। এত খবর তাহাতেই পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ধাত্রী ত স্ত্রীলোকেই হয়?"

বৃদ্ধ। (হাস্য করিয়া) স্ত্রীলোক ভিন্ন কি অপরে ধাত্রী হইতে পারে?

আমি। তবে আপনি প্রকৃত অর্থ জানেন না। নতুবা সকল দিকে অসঙ্গত হয়।

বৃদ্ধ। কিরূপ অসঙ্গত হয়, একবার বলুন দেখি, শুনি।

আমি। কিছু পূর্ব্বে,—একটী বাটীর গায়ে কাষ্ঠফলকে "পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী এন্, ভট্টাচার্য্য" লিখিত রহিয়াছে, দেখিলাম। তাই বলিতেছি, আপনার কথা অসঙ্গত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি শাস্ত্র-বিদ্যা ছাড়িয়া ধাত্রীগিরি করিতেছেন? আর আপনিও ত বলিলেন, ধাত্রী স্ত্রীলোক ভিন্ন হয় না।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাইত"—

পশ্চাদ্ভাগ হইতে একজন, আমাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল। সে ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিল, "জান না ভট্‌চাজ! তোমাদের সেই সেকেলে বুজরুকি আর এখন নাই। স্ত্রী-পুরুষ-সাধারণের এখন একরূপ উপাধি। স্ত্রী,—রমণী মিত্র, তাঁহার স্বামী,—ললিত মিত্র ইত্যাদি। এন্, ভট্টাচার্য্য ও স্ত্রীলোক।

আমি তাহার কথায় উত্তর দিলাম না। ভাবিলাম, "শূদ্র রমণীগণ 'দাসী' উপাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। বোধ হয়, এ কৌশল সেইজন্য হইয়াছে। কিন্তু 'দাস' উপাধিটী কি উঠিয়া গিয়াছে —তা না উঠিলে পূর্ণ সুবিধা নাই। দাস ও দাস-রমণীর দাস্য ত ঘুচে নাই।

* * * * *

আমার পাপভোগ ফুরাইল, ব্রাহ্মণ-সহবাসে অচিরেই ভৌম-নরক-ভোগ-দুঃখ পরিসমাপ্ত হইল। আমি কলিকাতার সীমা-বহির্ভূত হইলাম।

কর্ত্তার গৃহস্থালি।

সংসারে কর্ত্তাই প্রধান। প্রধান বলিয়া তিনি সর্ব্বদা উক্ত হইয়া থাকেন এবং প্রথমা বিভক্তি বা সর্ব্বপ্রধান ভাগও পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রধান বলিয়া উক্ত না কর, তিনি তৃতীয় পক্ষীয় ব্যক্তির ন্যায় উদাসীন হইয়া থাকিবেন, কোন ক্রিয়া কর্ম্মেই তাঁহার বাধ্য-বাধকতা-সম্পর্ক থাকিবে না।

যাহা হউক, কর্ত্তার আধিপত্য বিস্তর। যদিও ক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে করণকেই অনেকে প্রধান বলিয়া থাকেন, কিন্তু কর্ত্তার অনুমতি ভিন্ন তাঁহার একপাও চলিবার শক্তি নাই। রথদ্বারা ব্রজপুরীতে গমন সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু রাম না চালাইলে রথ চলে নাই। তবে করণ লোকটা কর্ত্তামহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ বটে। আর কর্ত্তা নিজে বড় অধিক পরিশ্রম করিতেও পারেন না। কাযেই সকল কার্য্যে তাঁহার করণকে ডাকিতে হয়। কিন্তু করণ তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কোন কার্য্য করে না। সমস্ত ক্রিয়া কর্ত্তার অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকে।

কর্ত্তার ঔরস পুত্র নাই, অথচ পুত্র কন্যা অগণ্য। উহাদের কোনটী দত্তক, কোনটী ক্রীত ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহাদের প্রতি—দুইটী ভাই ভগিনীই সহোদর ও সহোদরা। পুত্রদিগের সাধারণ নাম ধাতু, কন্যাগুলির সাধারণ নাম ক্রিয়া। সকলেই কর্ত্তা মহাশয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত। তন্মধ্যে কয়েকটী কর্ত্তার বড়ই প্রিয়, প্রায় তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে না। যেমন ভূ, অস্, কৃ নামক পুত্র এবং ভবতি, অস্তি ও করোতি নাম্নী কন্যা। ইহাদের মধ্যে অস্‌নামক পুত্র ও তাহার সহোদরার বয়স অনেক হইয়াছে। সহোদরাদ্বয়ের সহ ভূ ও কৃ নব্য বটে, তবে ছেলেমি করিয়া কখনও শিশু, কখনও বৃদ্ধও সাজিয়া থাকে।

অনেকগুলি পুত্র কন্যা বিশেষতঃ কন্যারা কর্ম্ম বড় ভাল বাসেন। কর্ম্ম করাতেই স্ত্রীজাতির বড় সুখ্যাতি, সেকালের এইরূপ ব্যবস্থা। যাহারা কর্ম্মে আসক্ত নহে, অকর্ম্মা (অকর্ম্মক) বলিয়া তাহাদিগকে সকলে প্রচার করে। ঐরূপ-প্রকৃতির কন্যারা কেহ বসিয়া থাকেন, কেহ শুইয়া থাকেন, কেহ আছেন মাত্র, কেহ কেবল জাগিয়া আছেন বা নিদ্রা যাইতেছেন, কেহ কেবল হাসেন, খেলা করেন বা নৃত্য করেন, সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করেন, কখনও কেবল খেদ করেন, কাঁদিয়া আকাশ ফাটান, শেষে পরহিংসায় শুকাইয়া মরেন। কর্ম্মশীলা কন্যারা ঐ-প্রকৃতির নহেন। তাঁহারা কেহ রাঁধিতেছেন, কেহ পরিবেশন করিতেছেন, কেহ পাঁচজনকে ডাকিতেছেন, অনুনয় বিনয় করিতেছেন, কেহ খাওয়াইতেছেন, শোওয়াইতেছেন, সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন, ইত্যাদি।

কর্ত্তা যে কেবল পুত্র কন্যা লইয়াই সর্ব্বদা সাধ আহ্লাদে থাকেন এমন নহে, কার্য্য কর্ম্ম নির্ব্বাহেও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। কর্ম্ম না থাকিলে তিনি আপনাকে শূন্য বলিয়া বোধ করেন। বাস্তবিক, গৃহস্থ বাটীতে কর্ম্মকায না থাকিলে আড়ম্বর, ধূমধাম কিছুই থাকে না।

কর্ত্তার দাতৃত্বও আছে, কখনও দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দান করিতেছেন, ব্রাহ্মণকে ভূমি, গো, হিরণ্যদান করিতেছেন। যাহা দান করেন, তাহা একবারে স্বত্বত্যাগ করিয়াই দান করেন। যদি দানপাত্র তাহা গ্রহণ না করেন, তথাপি তাঁহার দান ফিরে না।

কিন্তু যতই দান করুন, সকলই সেই ভাণ্ডার বা অপাদান হইতে। সকল কার্য্যেরই অবধি সেইখানে। যতই ধন দাও, কর্ত্তার সেই বাক্স হইতে। তোমার বাটীতে ক্রিয়া, বড় মৎস্য বড় আবশ্যক, লও কর্ত্তার সেই পুষ্করিণী হইতে। বাটীতে ঠাকুর সেবা, অতিথি-অভ্যাগত সেবা, দধি দুগ্ধ ঘৃতের প্রয়োজন, সকলই উৎপন্ন হইবে কর্ত্তার সেই গোহালপূর্ণ গোধন হইতে। ভাণ্ডারই বা কত! সকল বিষয়েরই পৃথক পৃথক ভাণ্ডার। গাছ হইতে পাতাটী পড়িবে, তাহারও ভাণ্ডার বা অপাদান আছে।

এখন কর্ত্তার সেই প্রকাণ্ড বসতবাটীর পরিচয় দিলেই হয়। সেটীর নাম অধিকরণ। কর্ত্তা সেই প্রশস্ত ভবনের একদেশেই অবস্থান করেন, যেমন সিংহ কাননের একদেশে বাস করে। কিন্তু একদেশে বাস করিলেও যেমন সেই সিংহের অধিষ্ঠানভূমি কাননে পদার্পণ করিতে কাহারই সাহস হয় না; তেমনি কার সাধ্য কর্ত্তার ভবনে সাহসপূর্ব্বক প্রবেশ করে। কাননে সেই সিংহের ন্যায় সকল ভবনই যেন তিনি ব্যাপিয়া আছেন। যেমন তিলে তৈল থাকে বা দুগ্ধে মাধুর্য্য থাকে, সেই ভাবে সমগ্র ভবন ব্যাপিয়া তাঁহার অবস্থিতি বোধ হয়। তেজের এমনি প্রভাব বটে! প্রভাব বা ভাব যাহাই বল, তিনি উঠিলে সকলকে উঠিতে হয়, তিনি বসিলে সকলকে বসিতে হয়, ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ত্তার একটী প্রিয় বয়স্য আছে। ঐ ব্যক্তি কর্ত্তার স্বগণ না হইলেও এখানেই তাহার আহার বিহার ও এবাটীর সকলের সহিত তাহার সদ্ভাব ও আত্মীয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। লোকটী অতি মিষ্টভাষী ও অমায়িক, তাহার নাম সম্বন্ধ। সে কাহার সহিত পিতৃত্ব, কাহার সহিত পুত্রত্ব, কাহার সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ পাইতেছে; কোথাও মূল; কোথাও অঙ্গ, কোথায় প্রভু, কোথাও বা ভৃত্য হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। কোথাও স্বত্ব-স্বামিত্ব; কোথায় আধার-আধেয়ত্ব, একটা না একটা সম্পর্ক সে ব্যক্তি উদ্ভাবন করিবেই করিবে। ফলতঃ কেহই তাহার পর নহে, এবং লোকটীর ঐরূপ স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের জন্য সকলেই তাহাকে আন্তরিক ভালবাসে।

কর্ত্তার সংসারে ঠিক ইহারই বিপরীত প্রকৃতির একটী লোক আছেন। ইতর বিশেষ করা, তারতম্য করাই তাঁহার স্বভাব। দেবতার মধ্যে মহেশ্বরই শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, ছেলেদের মধ্যে

অমুক ছেলেটীই দেখিতে ভাল, মেয়েদের মধ্যে অমুকই কর্ম্মিষ্ঠা, আর সকলে বসিয়া থাকেন, চাকরের মধ্যে অমুক বড় দুষ্ট, তাহাকে জবাব দিলেই হয়, গরুর পালের মধ্যে কালো গরুটীই দুগ্ধবতী, আরগুলির বৃথা ঘাসকাটা ইত্যাদি নির্দ্ধারণ ও তদুপলক্ষে বাগবিতণ্ডা করিতেই ইনি আছেন। এজন্য লোকে ইহাঁকে নির্দ্ধার বলিয়া থাকে। কর্ত্তা দেখিয়া শুনিয়াও ইহাঁকে অনাদর বা তিরস্কার করেন না। সকলেই তাঁহার সংসারে সমান আদরে স্থান পাইয়াছে ও একবাক্যে অবস্থিতি করিতেছে। ফলতঃ পরিবারটী যেমন বৃহৎ, তেমনি সুখী। এ পরিবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তির উল্লেখ করা গেল মাত্র। পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও কার্য্য বর্ণনাপূর্ব্বক সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে।

কর্ত্তা অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি জানেন,—মহেশাদি দেবগণ ও পাণিনি-কাত্যায়নাদি মুনিগণ, শাস্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারেই আমাদিগের সংসার চালান কর্ত্তব্য। নব্য সভ্যতার অনুরোধে ঐ সকল বিধিব্যবস্থার অণুমাত্র উল্লঙ্ঘন করিলেও প্রত্যবায় আছে।*

নব্যগণ, কর্ত্তার প্রশংসা শুনিলে? দেখিলে কিরূপে গৃহস্থালি করিতে হয়? ঐরূপ করাই আমাদের শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ভরসা করি, তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষণ করিতে শিখিবে ও আমার উক্ত দৃষ্টান্ত মনোযোগপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, সাহেবদিগের ন্যায় একাকী, আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া কখনই সংসারে বাস করিবে না। ইতি।

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

* কোন কোন নব্যসভ্যতাভিমানী ঐ নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যেমন, তাঁহারা সম্বন্ধকে কর্ত্তার স্বগণ বলিয়া কারক-সংসারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এরূপ করা অন্যায়। তবে কালবশে যে পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, সে স্থলে উপায় কি আছে? যেমন, বাঙ্গালায় দানের আর সেরূপ প্রচলন নাই। কাযেই সম্প্রদান উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যে কিঞ্চিৎ দান আছে, তাহা সামান্য কর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে, তাহাতে তাদৃশ ক্ষতি বোধ হয় নাই।

পুরাবৃত্তম্।

'ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্।'

বেদ ভারতের উপজীব্য, ভারতের গৌরবের সামগ্রী; তবু কেন বেদের শতশত শাখা লোপ হইল? বলিতে পার, তবু কেন ভারতে দিন দিন বেদচর্চ্চা কমিয়া আসিতেছে? যে যোগাভ্যাসে, পূর্ব্ব আর্য্যগণ অদ্বিতীয় ছিলেন, যে যোগের প্রভাবে এক এক জন ঋষি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, ভারতের সেই হৃদয়-নিহিত মহারত্ন আজ কোথায়? কোন্ অন্ধকারময় গিরিগহ্বরে বিলীন? কে বলিতে পারে? শুধু ইহাই নহে। মহর্ষি পঞ্চশিখ প্রভৃতির সাংখ্যাদি দর্শনগ্রন্থ; মনিথ, সত্য প্রভৃতির জ্যোতিষ গ্রন্থ; কত শত কাব্য নাটক;—ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটায়ন প্রভৃতির ব্যাকরণগ্রন্থও কথা-শেষ হইয়াছে।

তবে আমরা কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, "আমাদের ইতিহাস ছিল না বা পূর্ব্ব-পুরুষগণ, ইতিহাস লিখিবার প্রণালী অবগত ছিলেন না।" বরং ইহাই বলিতে প্রবৃত্তি হয়, আমাদের সবই ছিল; এখন আমাদের কিছুই নাই। আমরা ছিলাম—রাজরাজেশ্বর; হইয়াছি—ভিখারী। এখন, সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষ- গণের দোষ দিলে আর কি হ'বে!

বৌদ্ধগণের দৌরাত্ম্যে, যবনদিগের দুরাচারে,* দেশের দুর্দ্দশায়, আমাদের অভাগ্যে এবং পৃথিবীর অভাগ্যে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আর নাই বলিলেই হয়। ইতিহাসও উঠিয়া গিয়াছে। কালসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে। আদৌ না থাকিলে,—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ"।

(স্মৃতি।)

এ সব লেখা আসিল কোথা হইতে? যাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইতিহাস-পর্য্যালোচনা;—সন্ধ্যাবন্দনা ও আহারাদির ন্যায় নিত্যকর্ম্ম বলিয়া উপদিষ্ট, সেই

* কে কোন নব্যশিক্ষিতের মতে, যবন হইতেই আমাদের গৌরব। এবং বেদ, মন্বাদি স্মৃতি ও পুরাণাদি মিল, কোমতের পরে রচিত। হাঁ ইহা একটা কথার মত কথা বটে!

আর্য্য পূর্ব্বপুরুষ-গণের ন্যায় ইতিহাসের গৌরব করিতে আর কেহ জানে কি না, জানি না। তাঁহাদিগের যে ইতিহাস ছিল, তদ্বিষয়ে ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না।

কিন্তু সে তর্কে আর ফল কি? সে অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের বিবাদ কেবল শুষ্ককলহ বৈ ত নয়? প্রাচীন কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গেলেই বিষম অন্ধকারে পড়িতে হইবে; তাহার নিবারণ ত তর্কে হইবে না। কাজেই তর্ক ছাড়িয়া অন্ধবিক্রমে অতীতের সুদূর রাজ্যে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"অথবা কৃতবাগদ্বারে * * অস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

কিন্তু এই সুবিস্তৃত রাজ্যে অধিকদূর অগ্রসর হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কিয়দ্দূর গমন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতেই হইবে। আমাদের সেই গন্তব্য দূরের সীমা হইল, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল। এখন সীমা-বিবাদের সময় পড়িয়াছে, কাজেই, প্রথমেই সেই সীমা-বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ফল, কেন্দ্র স্থির না করিলে সর্ব্বত্রই গোলযোগ ঘটিতে পারে, এইজন্য যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল নিরূপণ প্রথমেই করা যাইতেছে।

"গতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরু-পাণ্ডবাঃ॥"

এই রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণানুসারে অনেকেই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলিপ্রারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে বলিয়া থাকেন। এখন কল্যব্দ হইতেছে ৪৯৯২। সুতরাং প্রায় ৪৩৩৯ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ছিল। ঐতিহাসিক রামদাস সেন এই মতাবলম্বী।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, কলিপ্রারম্ভের নবতিবর্ষের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে;—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুন-মেদিনীবিভু-
র্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকা নৃপাঃ॥ *

যুধিষ্ঠিরাদ্বেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪
কলম্ববিশ্বে ১৩৫ হভ্রখখাষ্টভূময়ঃ ১৮০৮০।
ততোঽযুতং১০,০০০ লক্ষচতুষ্টয়ং ৪০০০০০ক্রমাৎ
ধরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি এই ছয় রাজা যথাক্রমে শকাব্দ স্থাপক। তন্মধ্যে ৩০৪৪ তিনহাজার চুয়াল্লিশ বৎসর যুধিষ্ঠিরের, শকাব্দ প্রচলিত ছিল। তৎপরে, ক্রমে ১৩৫ একশত পঁয়ত্রিশ বৎসর বিক্রমাদিত্যের,১৮০০০ আঠার হাজার বৎসর শালিবাহনের, ১০০০০ দশ হাজার বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০০ চারি লক্ষ বৎসর নাগার্জ্জুনের এবং ৮২১ আট শত একুশ বৎসর বলির শকাব্দ প্রচলিত থাকিবে। বোম্বে প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণও এই মত সমর্থন করেন। উক্ত শালিবাহন-শকাব্দই বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত। এক্ষণে ইহার মান ১৮১৩। ৩১৭৯ যৌধিষ্ঠিরাব্দের পর হইতে শালিবাহন-শকাব্দ প্রচলিত, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে যুধিষ্ঠিরের প্রথম শকাব্দ হইতে ৪৯৯২ চারি হাজার নয় শত বিরানব্বুই বৎসরকে আমরা বর্ত্তমান বর্ষ বলিয়া ব্যবহার করিতেছি। এবং;—

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"
ভাস্করাচার্য্য।

শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ
কলের্ভবত্যব্দগণো নৃপস্য।
মকরন্দ।

ইহার দ্বারা বুঝিতেছি, ৩১৭৯ তিন হাজার একশত উনআশী কলিগতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ। যোগ করিলে কলিপ্রবৃত্তির প্রথম বর্ষ হইতে উক্ত ৪৯৯২ চারি হাজার নয় শত বিরানব্বই বর্ষই বর্ত্তমান বর্ষ ইহা স্থির হয়। তদনুসারে যুধিষ্ঠির-শাক ও কল্যব্দের আরম্ভ এক বর্ষেই বলিতে হয়। দুই একখানি প্রাচীন তাম্রশাসনেও এই মতানুবর্ত্তী শ্লোক দেখা যায়। ইহা দ্বারা তর্ক বাচস্পতি মহাশয়েরই পক্ষসমর্থন হইতেছে।

প্রদর্শিত মতদ্বয় প্রবল হইলেও দুঃখের সহিত তাহা আমার পরিত্যাগ করিতে হইল। কাজেই এখন "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ" তৃতীয় পন্থার

---

* কোন সংগ্রহ পুস্তকে এই শ্লোকটীর পাঠ অন্যবিধ দেখা যায় যথা;—
"যুধিষ্ঠিরাদ্বিক্রম-শালিবাহনৌ
ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ
কল্কী ষড়েতে শককারকা নৃপাঃ॥"
এই পাঠানুসারে শেষ শক কর্ত্তার নাম কল্কী।

অনুসরণ-ভিন্ন গত্যন্তর নাই। নিবৃত্তি-প্রবৃত্তির কারণ সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যক্ত হইবে। আমার বিবেচনায় কলির একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকাল। তন্মধ্যে একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে অর্থাৎ ১০৭৫ কলিগতাব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হয়, ধিষ্ঠিরের শকাব্দারম্ভও সেই সময় হইতে। আর নিষ্কণ্টক রাজ্য-ভোগ-কাল কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে।

এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে;—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"

(বরাহমিহিরাচার্য্যকৃত) বৃহৎসংহিতা, ১৩ শ অঃ।

"যখন রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করেন; তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল (নক্ষত্র) মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময় (বৃহৎসংহিতার সেই অংশ-রচনার সময়) যুধিষ্ঠির-শকাব্দ ২৫২৬।"

"সাম্প্রতময়নং সবিতুঃ কর্কটকাদ্যং মৃগাদিতশ্চান্যৎ
ঐ ৩য় অঃ।

"এখন (বৃহৎসংহিতার সেই অংশ-রচনার সময়) সূর্য্যের অয়ন পরিবৃত্তি (দক্ষিণায়নারম্ভ) কর্কট রাশির প্রথমাংশে ও উত্তরায়ণারম্ভ মকরের প্রথমাংশে হইয়া থাকে।"

প্রচলিত গণনায় ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অয়নাংশ। এখন বৃহৎসংহিতার সময় হইতে প্রায় ২১ অয়নাংশ অন্তর হইয়াছে। তাহাতে ১৩৯২ বৎসর পূর্ব্বে বৃহৎ সংহিতা রচিত হইয়াছে এইরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আধুনিক ইংরেজী সূক্ষ্ম গণিতবেত্তা মাধব-চট্টোপাধ্যায়ও ৪২৭ শকে বরাহের স্থিতি স্থির করিয়াছেন। এই ২৫২৬ ও ১৩৯১ যোগ করিলে, ৩৯১৭ তিন হাজার নয়শত সতের বৎসর হয়। অদ্য তিন হাজার নয়শত সতের বৎসর হইল যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ১০৭৫ কলিগতাব্দে যুধিষ্ঠির শকাব্দ আরম্ভ বলিলে, অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা ভাস্করাচার্য্য মকরন্দকর প্রভৃতি সমুদয় পণ্ডিতগণের উপদিষ্ট ও সর্ব্বদেশ-ব্যবহৃত কল্যব্দ কিছুতেই মিলে না। যেন-তেন-প্রকারেণ এখন ত কল্যব্দ ৪৯৯২ বলিতে হইবেই। অতএব;—

"তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তমাঃ।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অঃ।

পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘায় অবস্থিত ছিলেন এবং কলির তখন দ্বাদশ শতাব্দী চলিয়াছিল এরূপ অর্থ সুসঙ্গত হইল।

"একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং চরন্তি তে বর্ষাণাম্॥"
বৃহৎসংহিতা, ১৩শ অঃ।

"সপ্তর্ষয় * * * তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥"
বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪ অঃ।

"সপ্তর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে এক একশত বৎসর থাকেন।"

যুধিষ্ঠিরের যখন নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ হইয়াছিল তখনও সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন ও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশশততম কল্যব্দে পরীক্ষিতের রাজ্যকালেও মঘানক্ষত্রে ছিলেন; ইহা ত বিচিত্র কথা নহে। এক এক নক্ষত্রে ত তাঁহাদের একশত বর্ষ করিয়া স্থিতি।

এখানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না: রাজতরঙ্গিণীর বা জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে ভ্রান্ত হইয়া কোন ব্যক্তি, "তে তু পরীক্ষিতে কালে" ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকাকারে "দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ সন্ধ্যাংসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ" ইত্যাদি দুই এক পংক্তি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। এই টীকার তাৎপর্য্য এই—"সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ যুগের প্রাথমিক এবং আবসানিক কিয়ৎকালের পারিভাষিক সংজ্ঞা। এই সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সমেত কলিযুগের পরিমাণ—দেব-পরিমাণে—দ্বাদশশত বৎসর।" তাহাতে "দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" এই বিশেষণের ব্যর্থতা, পুনরুক্তি এবং "প্রবৃত্তঃ" পদটীর সহজ বোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া "বৃদ্ধঃ" এইরূপ কষ্টকল্পিত অর্থ আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু এ প্রয়াস পাইবার ত আবশ্যকতা নাই। শ্রীধরস্বামী স্বয়ং যে এরূপ দুষ্ট অর্থ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। টীকার মধ্যে অপরের এতাদৃশ দৌরাত্ম্য অনেক গ্রন্থেই দেখা যায়।

বলা বাহুল্য, রাজতরঙ্গিণীর মত বা জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মত গ্রাহ্য করিতে গেলে, জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য্য বরাহমিহিরের প্রদত্ত হিসাবের সঙ্গে বিশেষ গোলযোগ ঘটে। বিষ্ণুপুরাণ বচনেরও সদর্থ হয় না। আবার নন্দ-রাজ্যকাল লইয়াও বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়।

ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে;—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চ দশোত্তরম্॥"

ভাবার্থ;—পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলিতেছেন, রাজন্! আপনার জন্ম হইতে ১৫১০ একহাজার পাঁচশত দশ বৎসরে নন্দরাজের অভিষেক। তারানাথ তর্কবাচস্পতিও ঐই বচনের এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষিতের জন্ম যদি কলির প্রথম শতাব্দীর মধ্যে স্বীকার করা যায়, কিংবা কলির সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যম ভাগে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ইতিহাসের সঙ্গে, এবং বৌদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে মহাবিরোধ উপস্থিত হয়।

গ্রীক্বীর আলেক্জেণ্ডার ৩২৭খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। চন্দ্রগুপ্ত শেষ নন্দের পুত্র। নবনন্দের রাজ্যকাল সমুদয়ে প্রায় ১০০ বৎসর। সুতরাং ৪২৫ হইতে ৪৬০ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৬৩৭ কল্যব্দ হইতে ২৬৭২ কল্যব্দের মধ্যে প্রথম নন্দের রাজ্যাভিষেককাল মোটামুটী ধরা যাইতে পারে। এখন কলির দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে পরীক্ষিতের জন্ম মানিলেই তদপেক্ষা ১৫১০ পনের শত দশবর্ষ পরে নন্দরাজ্যাভিষেক স্থির করা অসঙ্গত হয় না।

"ততোঽপি ত্রিসহস্রে তু* শতাধিকশতত্রয়ে।
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি॥"
স্কন্দপুরাণ, কুমারিকাখণ্ড।

কলির তিন সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবার তিনশত দশবর্ষ অবশিষ্ট থাকিতে † অর্থাৎ ২৬৯০ কল্যব্দে নন্দবংশের রাজত্ব থাকিবে। এই নন্দবংশ ধ্বংস করিবেন চাণক্য। এই বচনটীও মন্দ সাধক নহে। এইজন্য,

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্।

এই বিষ্ণুপুরাণ-বচনের "পঞ্চদশোত্তরং" এই স্থলের পঞ্চদশ শব্দটীকে একশেষ-সিদ্ধ বলিতে হয়। যেমন 'ঘটৌ' বলিলে দুইটী ঘট বুঝায়, 'ঘটাঃ' বলিলে বহু ঘট বুঝায়, তদ্রূপ উক্ত 'পঞ্চদশ' কথাটী বহু পঞ্চদশের অর্থাৎ চতুস্ত্রিংশদ্‌গুণিত পঞ্চদশের বোধক বলিতে হইবে। ১৫কে ৩৪ দ্বারা গুণ করিলে পাঁচশত দশই হইয়া থাকে। অথবা উক্ত বচনে লিপিকর ভ্রম ক্রমে 'শতং' স্থলে 'জ্ঞেয়ং' হইয়াছে। এইরূপ একটু কষ্ট কল্পনা করিতেই হয়।

ভাগবতের শ্লোকের "শতং পঞ্চদশোত্তরং" ইহার সরল অর্থ ১১৫; কিন্তু আমরা অর্থ করিয়াছি ৫১০। এইরূপ সমুদয় বচনেই যে সামঞ্জস্য করিয়া অর্থের মার-পেঁচ করিতে হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কেবল যে, গ্রীক্ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গত করা,—তাহা নহে; কিন্তু পৌরাণিক বিরোধ পরিহার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

অর্থের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য না করিলে কিরূপ বিরোধ হইত, দেখাইতেছি;—

পরীক্ষিত অর্জ্জুনের পৌত্র, সোমাপি অর্জ্জুন-সাময়িক জরাসন্ধের পৌত্র; সুতরাং ইঁহারা সম-সাময়িক। এই সোমাপি-বংশ সহস্র বৎসর মগধে রাজ্য করিলে পর সুনিক-পুত্র প্রদ্যোত রাজা হন। প্রদ্যোতবংশের রাজত্ব ১৩৮ বৎসর। তৎপরে শিশুনাগ ও তৎপুত্রাদির রাজ্য; সমুদয়ে ইহাঁদের রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর। নন্দরাজ্য তাহার পর। তবেই হইল, পরীক্ষিত হইতে নন্দরাজ্যের অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর অন্তর। বিষ্ণুপুরাণেই এই কথা ভবিষ্য রাজগণ-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে। যথা;—

"জরাসন্ধসুতাৎ সহদেবাৎ সোমাপিঃ, তস্মাৎ শ্রুতবান্, তস্যাপ্যযুতায়ুঃ, ততশ্চ নিরমিত্রঃ, তত্তনয়ঃ সুক্ষত্রঃ, তস্মাদপি বৃহৎকর্ম্মা, ততশ্চ সেনজিৎ, তস্মাচ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ, ততো বিপ্রঃ, তস্য চ পুত্রঃ শুচিনামা ভবিষ্যতি। তস্যাপি ক্ষেম্যঃ, ততশ্চ সুব্রতাৎ ধর্ম্মঃ, ততঃ সুশ্রমঃ, ততো দৃঢ়সেনঃ, ততঃ সুমতিঃ, তস্মাৎ সুবলঃ, তস্য সুনীতো ভবিতা। ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ, ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি। যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ, তস্য সুনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি। স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতনামানমভিষেক্ষ্যতি * * * ইত্যেতে অষ্টত্রিংশদুত্তরমব্দশতং পঞ্চ প্রদ্যোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। ততশ্চ শিশুনাগঃ * * * মহানন্দী ইত্যেতে শৈশুনাগা দশ ভূমিপালাস্ত্রীণি বর্ষশতানি দ্বিষষ্ট্যধিকানি ভবিষ্যন্তি। মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো

* 'দ্বিসহস্রে তু' তর্কবাচস্পতি সম্মত এই পাঠ। কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

† এটী শতাধিক শতত্রয়ের যথোচিতকূটার্থ। তর্কবাচস্পতিও এইরূপ কূটার্থ আশ্রয় করিয়াছেন।

হতিলুব্ধো মহোপদ্মো নন্দঃ, পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা।" ইত্যাদি

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪ অঃ।

ভাগবতের নবমস্কন্ধেও প্রায় এই মর্ম্মেই লিখিত আছে। তবে ২।৪ জন রাজার নামভেদ আছে। ভাগবতের মতে জরাসন্ধের-পৌত্রের নাম মার্জ্জারি! বিষ্ণুপুরাণের মতে সোমাপি ইত্যাদি। আর শিশুনাগ-বংশের রাজত্ব ৩৬০ বৎসর। বিষ্ণুপুরাণের মতে ৩৬২ বৎসর। কাজেই ভঙ্গীবিশেষভাষী মহর্ষির লিপির অর্থ-বিচিত্র্য করিতে হইয়াছে। এইজন্য "আরভ্য ভবতো জন্ম" ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন।

"বর্ষসহস্রং পঞ্চদশোত্তরং শতঞ্চেতি কয়াপি বিবক্ষয়া অবান্তরসংখ্যেয়ং, বস্তুতস্ত পরীক্ষিন্নন্দয়োঃরন্তরং দ্বাভ্যাং ন্যূনং বর্ষাণাং সার্দ্ধসহস্রং ভবিষ্যতি। যতঃ পরীক্ষিৎ-সমকালং মাগধং মর্জ্জারিমারভ্য রিপুঞ্জয়ান্তা বিংশতী রাজানঃ সহস্রসংবৎসরং ভুবং ভোক্ষ্যন্তীত্যুক্তং নবমস্কন্ধে; যে বার্হদ্রথভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরমিতি। ততঃ পরং পঞ্চ প্রদ্যোতনা অষ্টত্রিংশোত্তরং শতম্। শিশুনাগাশ্চ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীমিত্যত্রৈবোক্তত্বাৎ।"

অর্থাৎ এই যে এক হাজার একশত ১৫ বৎসর নন্দরাজ্য ও পরীক্ষিত জন্মের অন্তর বলা হইয়াছে; ইহা একটা মাঝামাঝি কালসংখ্যা-কথন মাত্র; বস্তুতঃ পরীক্ষিত হইতে দুই কম পনের শত বৎসর পরে নন্দরাজ্য। এ কথা এই ভাগবতেই নবমস্কন্ধে বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। ইত্যাদি।

স্বামীর প্রদর্শিত যুক্তিই আমাদের অবলম্বন। কেবল "শতং পঞ্চদশোত্তরম্" এবং "জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্" এই দুই স্থানের অর্থ স্বামিকৃত নহে। যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিলাম। তবে স্বামীর সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষের মতান্তর হইতেছে মাত্র। কিন্তু মূলের সঙ্গে বিরোধ নাই। মূলে আছে,জরাসন্ধপৌত্রহইতে ১৫০০ (বিষ্ণুপুরাণের মতে), ১৪৯৮ (ভাগবতের মতে), বৎসর পরে নন্দরাজ্য। এই দেখিয়াই স্বামীর সিদ্ধান্ত। আমরা বলি, পরীক্ষিত, জরাসন্ধপৌত্র অপেক্ষা দ্বাদশ কি দশ বৎসরের বড়; তাহা অসম্ভবও নহে। তাহা হইলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। "শতং পঞ্চ দশোত্তরম্" বা "জ্ঞেয়ং পঞ্চ দশোত্তরম্" ইহার অস্মৎ-প্রদর্শিত অর্থও সুসঙ্গত হয়।

"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।

ভাগবত ১২শ স্কন্ধ।

"সপ্তর্ষিমণ্ডল, যৎকালে মঘা নক্ষত্র হইতে ক্রমে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, তৎকালেই নন্দরাজ্য; সেই সময় হইতেই কলির বৃদ্ধি।" উক্ত শ্লোকের এইরূপ অর্থ মনে করিয়া এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক এক নক্ষত্রে একশত বৎসর করিয়া স্থিতি স্মরণ করিয়া, পরীক্ষিত ও নন্দরাজ্যে কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর অন্তর ইহা বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু শ্রীধরস্বামীর অর্থ দেখিলে সে ভ্রম দূর হয়। তিনি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—

"যখন 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়াতে গমন করিবেন, সেই সময় অর্থাৎ সুনিকপুত্র প্রদ্যোতের রাজ্যারম্ভকাল হইতে কলির বৃদ্ধি, নন্দের সময় হইতে অতিবৃদ্ধি।"

ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, নন্দের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে ছিলেন না। কিন্তু সম্ভবতঃ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ছিলেন।*

"পূর্ব্বাষাঢ়াং যদা চৈতে প্রযাস্যন্তি মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥"

এই বিষ্ণুপুরাণ-বচনের অর্থও, ভাগবত-বচনের ন্যায় হইবে।

বস্তুত, জ্যোতির্ব্বিদাভরণের শ্লোকার্থ আমাদের অনুকূলেও হইতে পারে। যথা ;—

"যুধিষ্ঠিরাদ্দেযুগাম্বরাগ্নয়ঃ" যুধিষ্ঠিরাৎ প্রবৃত্তাঃ শকাব্দাঃ কলের্ব্বেদ যুগাম্বরাগ্নয় ইত্যর্থঃ।

"যুধিষ্ঠির হইতে প্রবৃত্ত শকাব্দ,—৩০৪৪ কল্যব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত।"

অর্থটী কিন্তু নিতান্ত সহজে আসে না। না আসিলেও ক্ষতি নাই। কেননা, অপর অর্থটীও ত সহজে আসে না।

অতএব জ্যোতির্ব্বিদাভরণও আমাদের প্রতিকূল নহে।*

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

---

* সপ্তর্ষিমণ্ডল লইয়া এক্ষণে বড় গোলযোগ। ইংরেজী সিদ্ধান্তে নাকি ইহার গতি স্বীকার নাই। যাহা হউক, সে কথা স্বতন্ত্র। সপ্তর্ষির সহিত এ প্রবন্ধের কোন সংশ্রব নাই। প্রসঙ্গক্রমে লিখিলাম মাত্র।

* রাজতরঙ্গিণীর শ্লোকটী খুব সরল। এইজন্য

(কৃষ্টমাস নম্বর)

১ম পর্ব্ব—চুরি।

"লে লুল্লু", আমীর সেখের মুখ দিয়া যখন এই কথা দুইটী নির্গত হইল, তখন তিনি *জানিতেন না, ইহাতে কি বিপত্তি ঘটিবে। কথা দুইটী আমীরের অদৃষ্টে বজ্রাঘাত রূপে পতিত হইল। আমীরের বাটী দিল্লী সহরে, আমীর জাতিতে মুসলমান। এক দিন অন্ধকার রাত্রিতে আমীরের বিবি একেলা বাহিরে গিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া, স্ত্রীকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমীর ভিতর হইতে বলিলেন,—"লে লুল্লু"। অর্থাৎ কি-না, "লুল্লু! তুই আমার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যা।" লুল্লু, কোনও দুরন্ত বাঘেরও নাম নয়, কিংবা ছুরিধারী কান্‌কাটারও নাম নয়। "লুল্লু" একটী বাজে কথা, ইহার কোন মানে নাই, অভিধানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিহাস করিয়া আমীর কেবল কথাটী যোড়-তাড় করিয়া বলিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, তখন কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্য্যের কথা এই, লুল্লু একটী ভূতের নাম ছিল। আবার, দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্ত্তে, আমীরের বাটীর ছাদের কার্ণিশার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, সে চমকিয়া উঠিল, শুনিল,—কে তাহাকে কি লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও আনন্দে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন। চকিতের ন্যায়, দুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশ-পথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর ঠিক নাই।

আমীর, ঘরের ভিতর থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, স্ত্রী এই আসে। এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া-শব্দ কিছুই পাইলেন না। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, নিঃশব্দ। বাহিরে আসিয়া, এখানে ওখানে চারিদিকে স্ত্রীকে খুঁজিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তবুও মনে এই আশা হইল, স্ত্রী বুঝি তামাসা করিয়া কোথায় লুকাইয়া আছে। তাই, পুনরায় প্রদীপ হাতে করিয়া আতি-পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিলেন, বাড়ীর ভিতর স্ত্রীর নাম-গন্ধও নাই। আবার, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বাড়ীর দ্বার বন্ধ। সন্ধ্যাকালে নিজে তিনি যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে। তবে তাঁহার স্ত্রী কোথায় যাইলেন? পতিব্রতা সতী-সাধ্বী আমীর-রমণী বাড়ীর বাহিরে কখনই পদার্পণ করিবেন না। আর যদিও তাঁহার ওরূপ কুমতি হয়, তাহা হইলেও দ্বার খুলিয়া ত যাইতে হইবে! দ্বার ত আর ফুড়িয়া যাইতে পারেন না! দারুণ কাতর হইয়া আমীর এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমীরের চক্ষু হইতে বুক বহিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল। প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে না দেখিয়া গৃহ শূন্য, জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য,—আমীর সবই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেবল শূন্য নয়, গ্রীষ্মকালের আতপ-তাপিত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া হৃদয় তাঁহার জ্বলিতে লাগিল। "আমি আমার অমূল্য নারী-রত্নকে আপন হাতেই বিলাইয়া দিলাম; আমার কথা মত তাহাকে জিনেই লইয়া গেল, কি ভূতেই লইয়া গেল, কি স্বয়ং শয়তান আসিয়াই লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! হায়! কি হইল!" এইরূপে আমীর নানাপ্রকার খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া, দ্বার খুলিয়া পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া আমীরের বাটী অন্বেষণ করিল, আমীরের বাটী দেখিবার পর, পাড়ার এ ঘরে ও ঘরে যথাবিধি অন্বেষণ হইল, গলি-ঘুঁজি সকল স্থানই দেখা হইল, খুঁজিতে আর কোথাও বাকী রহিল না, কিন্তু আমীরের স্ত্রীকে

হার কূটার্থ আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল হইলেও াহা অবলম্বন করিতে পারিলাম না। কূটার্থ করিবার স্কেতটী এই—

*সার্দ্ধ ষট (ছয় এবং তাহার অর্দ্ধ, অর্থাৎ ৯ নয়) াধিক অর্থাৎ তাহার উপর তিন (৯+৩=১২) এই র শত। গতেষু প্রাপ্তেষু। সর্ব্বে গতার্থাঃ প্রাপ্তার্থাঃ। র্থাৎ কলির দ্বাদশ শতাব্দী আরম্ভে কুরু-পাণ্ডবেরা লেন।

কেহই খুঁজিয়া পাইল না। প্রতিবাসীরা ক্রমে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল, নিশ্চয় আমীরের বিবি কোনও পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। এরূপ সুন্দরী নব-যৌবনা রমণী আফিমচীর ঘরে কতদিন থাকিতে পারে? আমীর একটু একটু গাঁজা-আফিম খাইতেন, তাঁহার এই দোষ। এক ত স্ত্রী গেল, তারপর যখন এই কলঙ্কের কথা আমীরের কাণে উঠিল, আফিমচী হউন, তখন তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "দূর হউক, এ সংসারে আর থাকিব না, লোকের কাছে আর মুখ দেখাইব না, ফকিরী লইয়া দেশে দেশে বেড়াইব, যদি সে প্রিয়তমা লায়লারূপী সাধ্বীকে পুনরায় পাই, তবেই দেশে ফিরিয়া আসিব, না হইলে মজনুর মত এ ছার জীবন একান্তই বিসর্জ্জন দিব।"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ফকিরের বেশে আমীর ঘর হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কিছুই লইলেন না;—লইলেন কেবল, একটী টিনের কৌটা, একটী বাঁশের নল, আর একটী লোহার টেকো! আমীর কিছু সৌখীন পুরুষ ছিলেন। টিনের কৌটার ঢাকনের উপর কাচ দেওয়া ছিল, আর্‌সির মত তাহাতে মুখ দেখা যাইত। পাণ খাইয়া আমীর তাহাতে কখন কখন মুখ দেখিতেন, ঠোঁট লাল হইল কি না। বাঁশের নলটী তাঁহার বড়ই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খান্‌সামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিসটী ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সে গুলি অলঙ্কার, তাই সেই হিজি-বিজি গুলির বড়ই গৌরব করিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু সে গুলি অলঙ্কার নহে, সে গুলি অক্ষর,—চীনভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল, "চীনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং সহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটী প্রস্তুত হইয়াছে। নল নির্ম্মাণকাজে মোপিঙ একজন অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার সুখ্যাতি। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকর-দিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থনষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।" যাহা হউক, আমীর যে নলটী কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্ব্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্রক্রোশ মরুভূমি চলিয়া, চীনের উত্তর-সীমায় লিংটিং সহরে আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ তখন মূল্য ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি, ধর্ম্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটী আমীরের মনোনীত হইয়াছিল। এত মনোনীত হইয়াছিল যে, প্রতিদিন ইহাতে অতি যত্নে আমীর তৈল মাখাইতেন। তেল খাইয়া খাইয়া, পাকিয়া, ইহা ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ হইয়াছিল। কৌটার ভিতর বড়ই সাধের ধন, আমীরের প্রস্তুত করা আফিম থাকিত, ইতর ভাষায় যাহাকে লোকে চণ্ডু বলে। বাঁশের নলটী দিয়া চণ্ডুর ধূম পান করিতেন। টেকো দ্বারা কৌটা হইতে আফিম তুলিয়া নলের আগায় রাখিতেন।

২য় পর্ব্ব——রোজা।

এই সকল সরঞ্জাম লইয়া আমীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দিল্লী পার হইলেন, কত নদ নদী গ্রাম প্রান্তর অতিক্রম করিলেন। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া খান, সন্ধ্যা হইলে, গাছতলায় হউক, কি মাঠে হউক, পড়িয়া থাকেন, খোদা খোদা করিয়া কোন মতে রাত্রি কাটান। এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। স্ত্রীকে পুনরায় পাইবার আশা আমীরের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। হয় ফকিরী করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে, না হয় একটা বুড়ো-হাবড়া নিকা করিয়া পুনরায় ঘরকন্না করিতে হইবে, এই ভাবিয়া শোকে তিনি নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি একটী গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজনদের বাটীর সম্মুখে অনেক গুলিন লোক বসিয়া আছেন দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সে গ্রামটী পশ্চিমের চক্রবেড় বিশেষ। যেখানে লোক বসিয়াছিল, সেটী জানের বাড়ী। গৃহস্বামী একজন প্রসিদ্ধ গণৎকার। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। সংসারে তাঁহার কাছে কিছুই গুপ্ত নাই।

অদৃষ্টের লিখন তিনি জলের মত পড়িতে পারেন। সামুদ্রিকে হনুমানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি। ললাটে কি হাতে, যে ভাষায় বিধাতা কেন আঁচড়-পিচড় পাড়িয়া থাকুন-না,—ইংরেজিতে হউক কি ফারসীতে হউক, দেবভাষায় হউক কি দানব ভাষায় হউক,—সকলই তিনি অবাধে পড়িতে পারেন। চুরি-জুয়াচুরি সকলই বলিয়া দিতে পারেন। অবোধ গবর্ণমেণ্ট যদিও তাঁহাকে একটীও পয়সা, কি একটীও টাইটেল দেন নাই সত্য, কিন্তু দূর দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিয়া থাকে। পাঁচটী পয়সা আর পাঁচ ছটাক আটা দিয়া ভূত ভবিষ্যৎ গুনাইয়া লয়। আমীর বলিলেন,—"আমিও জানের বাড়ী যাই, ইন্‌শাল্লাতালা! কে আমার বিবিকে লইয়া গিয়াছে সে গুণিয়া দিবে।" আমীর গিয়া জানের বাটীর সম্মুখে বসিলেন। অন্যান্য লোকের গুণা-গাঁথা হইয়া যাইলে, অতি বিনীত ভাবে গণৎকারের নিকট তিনি আপনার দুঃখের কথা আগাগোড়া বলিলেন। গণৎকার ক্ষণকালের নিমিত্ত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে চারিখানি খাপুরা হাতে লইলেন। মন্ত্র পড়িয়া সেই চারিখানি খাপুরায় ফুঁ দিতে লাগিলেন। যখন মন্ত্র পড়া আর ফুঁ দেওয়া হইয়া গেল, তখন একখানি উত্তরদিকে, একখানি দক্ষিণে, একখানি পূর্ব্বদিকে, আর একখানি পশ্চিমে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তার পর কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"ফকিরজী! আপনার স্ত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। আপনার স্ত্রীকে ভূতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু করিব কি! আমি ভূতের রোজা নই। ভূতের উপর আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্ কালে আপনার স্ত্রীকে আনিয়া দিতাম। তবে আপনাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। আপনি এক্ষণে একটী ভাল রোজার অনুসন্ধান করুন। ভাল রোজা পাইলে নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন।" এ আশ্বাস পাইয়া আমীরের মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তাঁহার স্ত্রী যে, কোনও দুষ্ট লম্পটের কুহকে পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হয় নাই, এ দুঃখের সময় তাহাও শান্তির কারণ হইল।

এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটী পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলা এমনই ইংরেজিভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কি-না হিষ্টিরিয়া হইয়াছে! এ কথায় রক্তমাংসের শরীরেই রাগ হয়, ভূতদেহে ত রাগ হইবেই। তাই ঘৃণায় ভূতকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—"দূর হউক, আর কাহাকেও পাইব না।" ডাইনীকুল একবাক্য হইয়া বলিল, "দূর হউক, আর কাহাকেও খাইব না।" ভারতের ভূতকুল ও ডাইনীকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মাণ। শশ্মান-মশান আজ তাই নীরব। রাত্রি দুই প্রহরের সময়, জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, আকাশ পানে পা তুলিয়া, জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া, চারি দিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, সেকালে ডাইনীরা যে চাতর করিত, আজ আর সে চাতর নাই। মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল! এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কি করিয়া চলিবে? তাহাও এক প্রকার লোপ হইয়াছে। নানা স্থানে, কত-শত গঙ্গা ময়রার ঘরে আজ অন্ন নাই। পায়ের উপর পা দিয়া, সোণা দানা পরিয়া, যাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত, আজ তাহারা পথের ভিখারী। আমীর দেখিলেন, ভাল রোজা পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। আমীর কিন্তু হতাশ হইবার ছেলে ছিলেন না। মনে করিলেন যে,—"যদি আমাকে পৃথিবী উলট-পালট করিয়া ফেলিতে হয়, তাহাও আমি করিব, যেখানে পাই সেইখান থেকে ভাল রোজা নিশ্চয় বাহির করিব।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় দেশ-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন যেখানে যান, সেই খানেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন,—"হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল ভূতের রোজা আছে?" ছোট-খাট অনেক রোজার সঙ্গে দেখাও হইল। অনেক মুসলমান আসিল, যাঁহারা তাবিজ লিখিয়া ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যকে দূর করেন, তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু মনের মত কাহাকেও পাইলেন না; বুক ফুরিয়া কেহই বলিতে পারিল না যে, "ভূত মারিয়া আমি তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দিব।" অবশেষে অনেক পথ, অনেক দূর যাইয়া, আমীর একটী গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে প্রথমেই একটী বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আমীর যথারীতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল রোজা আছে?" বৃদ্ধা উত্তর

করিল,—"হাঁ বাছা! আছে। আমাদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে সম্প্রতি একটী দুর্দ্দান্ত ভূতে পাইয়াছিল। মহাজনের টাকার আর অবধি নাই। সে যে কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত হেকিম, কত রোজা আনিয়াছিল, তাহার আর কি বলিব, দু পা দিয়া জড় করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারে নাই। অবশেষে গ্রামেরই একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটী মন্ত্র পড়িয়াই তাহাকে আরোগ্য করেন। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে খাইতে পাইত না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর উদরে অন্ন ছিল না, অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, এখন অন্ন-বস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, 'দ্বারে হাতী, ঘোড়া, উট বাঁধা'।"

৩য় পর্ব্ব——তাঁতি।

বলা বাহুল্য, আমীর এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঝুঁকে সেলাম করিয়া, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত আপনার দুঃখের কাহিনী বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দেখ! ভূতে পাইলে আমি ছাড়াইতে পারি। ভূতে যদি কাহাকেও একেবারে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার আমি কি করিতে পারি? পাহাড়ে লইয়া গিয়াছে, কি সমুদ্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? ফকির সাহেব! তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।" এই কথা শুনিয়া আমীর মাথা হেঁট করিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুর্ব্বাসা মুনির জাতি! যেমন কঠিন, তেমনি কোমল! সেই জলেই ব্রাহ্মণের মন ভিজিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"শুন ফকিরজী! তোমাকে মনের কথা বলি,—প্রকাশ করিও না। তাহা হইলে রোজা বলিয়া আমার যা কিছু মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইয়াছে, সকলই যাইবে। তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নই, ভূত ছাড়াইবার একটী মন্ত্রও জানি না। এমন কি, গায়ত্রী পর্য্যন্ত জানি না, আর লেখাপড়া বিষয়ে, ক খ পর্য্যন্তও শিখি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। চৌকায় বসিয়া খাই। আজ কালের ইংরেজি-পড়া বাবু ভায়াদিগের মত নই।" আমীর বলিলেন,—"সে কি মহাশয়! তবে আপনি মহাজন-কন্যার ভূত ছাড়াইলেন কি করিয়া?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"সে কথা তোমাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি। প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে আমার বড়ই মন্দ হইবে।" আমীর বলিলেন,—"আল্লার কসম্, এ কথা আমার মুখ দিয়া কখনই বাহির হইবে না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এই গ্রামে একটী তাঁতি বাস করে। তাঁতি তাঁত বুনিয়া খায়, কোনও ল্যাঠাই ছিল না। একদিন কি মতি হইল, সে তাঁত বুনিতে বুনিতে একটু গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিল। নিজের কানে সুরটী স্বরটী বড়ই সুমধুর বলিয়া লাগিল। পুনর্ব্বার আস্তে আস্তে গাহিয়া দেখিল, বড়ই মিষ্ট বটে! তাঁতি মনে মনে ভাবিল, 'আমি একজন প্রকৃত গাইয়ে। এ গুণটী এতদিন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বৃথা নষ্ট হইতেছিল। জগতের দশাই এই, তা না হইলে হীরা-মণি-মুক্তা উপরে চক্‌মক্ না করিয়া, মাটী কি জলের ভিতর কেন বৃথা পড়িয়া থাকিবে? যাহা হউক, এখন হইতে গান গাইয়া আমি জগৎ মুগ্ধ করিব, মধুর তানে অবিরত জগতের কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দিব। আপাতত প্রতিবাসীদিগকে আমার গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।' এই বলিয়া তাঁতি ক্রমে গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। একদিন যায়, দুইদিন যায়, গ্রামবাসীরা শশব্যস্ত। দুই চারি দিন পরে গ্রামের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রাণ লইয়া সকলের টানাটানি। সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গিয়া তাঁতির দ্বারে উপস্থিত। তাঁতিকে ডাকিয়া বলিল,—'বাপু হে! পুরুষ-পুরুষানুক্রমে বহুদিন ধরিয়া আমরা এই গ্রামে বাস করিতেছি। তোমার গানের প্রভাবে আর আমরা এখানে তিষ্ঠিতে পারি না। বল ত ঘর দ্বার ছাড়িয়া উঠিয়া যাই, আর না হয় চুপ কর, গানে ক্ষান্ত দাও।' তাঁতি বলিল,—'না মহাশয়! সে কি কথা! গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবেন কেন? সুরবোধ নাই বলিয়া যদি আমার গান আপনাদিগের কাণে ভাল না লাগে, তাহা হইলে আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। আজ হইতে মাঠে বসিয়া আমি গান করিব। যাঁহার বোধাবোধ আছে তিনি গিয়া আমার গান শুনিবেন, আর পারিতোষিক-স্বরূপ একপণ করিয়া আমি তাঁহাকে কড়ি দিব।' এইরূপ আশ্বস্ত হইয়া

গ্রামের লোক যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। তাঁতি গিয়া মাঠের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে তঁচত খাটাইল। সেখানে বসিয়া মনের সুখে গান করিতে লাগিল। তবে খেদের বিষয় এই শুনিতে কেহ যায় না, জনপ্রাণী সে দিক মাড়ায় না, কাক পক্ষী সেদিকে ভুলিয়াও উড়িয়া যায় না।"

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"ফকিরজী! আমি বড়ই দরিদ্র ছিলাম। এ গ্রামের ভিতর আমার মত দীনদুঃখী আর কেহ ছিল না। গৃহিণী ও আমি যে কত উপবাস করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। নিজের যাহা হউক, ব্রাহ্মণীর শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ, দেখিয়া সততই আমার প্রাণ কাঁদিত। কি করিব, কোনও উপায় ছিল না, মনের আগুণ মনেই নিবাইতাম, চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইতাম। ব্রাহ্মণী একদিন আমাকে বলিলেন—'আজ ঘরে আটা নাই। তাঁতি বলিয়াছে তাহার গান শুনিলে একপণ করিয়া কড়ি দিবে। যাওনা, একটুখানি কেন শুনিয়া এস না। একপণ কড়ি পাইলে ঘরে অন্ন হইবে, দুইজনে খাইয়া বাঁচিব।' আমি বলিলাম—'দেখ ব্রাহ্মণি! ও কথাটী আমাকে বলিও না। শূলে যাইতে বল তা যাইতে পারি, আগুণে পুড়িয়া মরিতে বলিলেও মরিতে পারি, কিন্তু তাঁতির গান আমাকে শুনিতে বলিও না, তিলেকের নিমিত্তও সে দণ্ডানি আমি সহ্য করিতে পারিব না।' এই কথা লইয়া ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার ক্রমে কিঞ্চিৎ বচসা হইল। ব্রাহ্মণী আমাকে ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'যাও একটুখানি, তাঁতির গান শুনিয়া একপণ কড়ি লইয়া আইস।' পথে বাহির হইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, কি করি! তাঁতির গান কি করিয়া শুনি! অথচ কড়ি না লইয়া আসিলে ব্রাহ্মণী আর রক্ষা রাখিবেন না। তাঁতির গান শুনার চেয়ে মরা ভাল। এ ছার জীবনে আর কাজ নাই। গলায় দড়ি দিয়াই মরি। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া একজনদের বাটী হইতে এক গাছি দড়ি চাহিয়া লইলাম। এ মাঠে তাঁতি গান করিতেছে, অন্য দিকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, আর একটী মাঠে গিয়া আর একটী অশ্বত্থ গাছে দড়টী খাটাইলাম, ফাসটী ঠিক করিয়া লইলাম, গলায় দিই আর কি, এমন সময় সেই গাছের ভিতর হইতে একটী ভূত বাহির হইল। ভূত আমাকে বলিল—'ওরে বামুন, তুই করিতেছিস্ কি?' আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট বর্ণন করিলাম। ভূত বলিল, 'আর ভাই! ও কথা বলিস্ নে। যে গাছের তলায় এখন তাঁতি গান করিতেছে, যুগ-যুগান্তর হইতে ঐ গাছে আমি বাস করিতেছিলাম। গাছটী আমার বড়ই প্রিয় ছিল। কিন্তু হইলে হইবে কি, যেদিন হইতে তাঁতি উহার তলায় গান আরম্ভ করিল, সেইদিন হইতেই আমাকে ও-গাছ ও-মাঠ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। দেখিতেছি, দুইজনেই আমরা একবিপদে বিপন্ন। তা, তোর আর ভাবনা নাই, তুই বাড়ী ফিরিয়া যা। তোদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে আমি গিয়া পাইব। কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল তুই গিয়া যখন আমার কাণে কাণে বলিবি যে, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছি, তখনই আমি ছাড়িয়া দিব। মহাজনের অনেক টাকা আছে, আর সেই একমাত্র কন্যা। অনেক ধন দৌলত দিয়া তোকে বিদায় করিবে, তোর দুঃখ ঘুচিবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সেখজী! শুনিলে তো! আমি রোজা নই, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। দৈবক্রমে আমার একটী ভূতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমার এই যা কিছু বল। মহাজনের কন্যার ভূত ছাড়িলে, চারিদিকে আমার নাম বাহির হইল যে, আমার মত রোজা আর পৃথিবীতে নাই। ভূতে পাইলেই সকলে আমাকে লইয়া যায়। আমাকে আর কিছু করিতে হয় না, কেবল আমি রোগীর কাণে কাণে গিয়া বলি, 'শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে তো যাও, না হইলে এখানে তাঁতির গান দিব।' তাঁতির নামে সকল ভূতই জড়-সড়, পলাইতে পথ পায় না।"

৪র্থ পর্ব্ব——উদ্যোগ।

আমীর বলিলেন, "মহাশয়! তাহাই যদি সত্য, তবে চলুন না কেন? আপনার সেই ভূতটীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া দেন? কারণ, ভূতে ভূতে অবশ্যই আলাপ পরিচয় আছে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে, শাদি-বিয়াতে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। আমার স্ত্রীকে যে ভূতে লইয়া গিয়াছে, তাহাকে যদি তিনি দুটো কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার অনেক উপকার হইতে পারে। না হয়,

ভূত সাহেব! হুজুর!

স্ত্রীকে কি করিয়া পাই, তাহার একটা না-একটা উপায়ও তিনি বলিয়া দিতে পারেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নয়, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি, আচ্ছা চল যাই, দেখি কি হয়।" ব্রাহ্মণ দুর্গা বলিয়া, আমীর বিস্মিল্লা বলিয়া যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা যে মাঠে ভূত থাকে, সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে গাছে ভূত থাকে, সেই গাছতলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া, গাছের দিকে চাহিয়া উর্দ্ধমুখে দুইজনে স্তুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"হে ভূত! আশ্রিত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, তোমার কৃপায় তাহার দরিদ্রতা মোচন হইয়াছে। পৃথিবীতে যত ভূত আছে, সকল ভূতের তুমি শ্রেষ্ঠ।' ভূতের তুমি রাজা। কৃপা করিয়া দেখা দাও, আর একবার আবির্ভাব হও।" মুসলমান বলিল, "ভূত সাহেব! হুজুরের নাম শুনিয়া কদম-বোসী করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। হুজুরের এই গাছ তলায় কাঁচা পাকা সিন্নি চড়াইব।" এই প্রকারে নানারূপ স্তব করিতে করিতে গাছটী দুলিতে লাগিল, গাছটীর উপর যেন এক প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল, ডালপালা সমুদয় মড় মড় করিতে লাগিল তার পর গাছের ডগায়, এক স্থানে সহসা অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। দিন দুইপ্রহরে, চারিদিকে সূর্য্যের কিরণ, আর সকল স্থানেই আলো, কেবল সেই স্থানটুকুতেই অন্ধকার। ক্রমে সেই অন্ধকার-রাশি জমিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এক ভীষণ প্রকাণ্ড নরমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। নরমূর্ত্তি ধরিয়া ভূত গাছ হইতে নামিয়া আসিল, বৃক্ষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এখানে এখন একটী নূতন কথা উঠিল। বিজ্ঞান-বেত্তারা বিশেষত ভূত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয়টী অনুধাবনা করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবেরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তার পর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া, ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব শস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। শস্তা হইলে গরিব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।

গাছের পাশে দাঁড়াইয়া, কিছু রাগত ভাবে ভূত বলিল,—"বামুন! আজ আবার কেন আসিয়াছিস্? তোর মত বিট্‌লে বামুন আমার অবধ্য নয়। ইচ্ছা হইলে এখনি তোর ঘাড় মুচ্‌ড়াইয়া দিতে পারি। আমার অবধ্য, সেই ইংরেজি-পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি। ভয় করি, পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে টলিয়া পড়েন, কি বমন করিয়া দেন। ভক্তি করি কেন না, এটা সেটা খাইয়া তাঁহাদের মনের কোঁচ্‌কা ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়, এই মর্ত্ত্যলোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, আর অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলেপির পাক-বিশিষ্ট নয়।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু! আমি নিজের জন্য আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসি নাই। আপনার প্রসাদে আমার আর কিছুরই অভাব নাই। এই লোকটী নিদারুণ সন্তাপিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্তই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।"

এই কথায় ভূতের রাগ কিছু পড়িয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"সঙ্গে তোমার ও লোকটী কে?" ব্রাহ্মণ তখন আমীরের সকল কথাই ভূতকে শুনাইলেন। শুনাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে ইহার একটা উপায় করিতে হইবে, না করিলে এ লোকটী প্রাণে মরিবে। আপনি দয়ার্দ্রচিত্ত, আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহারও প্রাণ রক্ষা করুন।" ভূত বলিল, "ইহার স্ত্রীকে নিশ্চয় লুল্লু লইয়া গিয়াছে। লুল্লু সবে নূতন ভূতাগার পাইয়াছে, ভূতগিরিতে তাহার নব অনুরাগ, সে বড়ই দুরন্ত।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে? মহাশয়! সে কি প্রকার কথা?" ভূত হাসিয়া বলিল—"এ কথার তোমরা কিছুই জান না। লোকে বলে অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ঠিক সেটী সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া নিজের ভূত হয় না। মানুষ মরিলে আমরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূত-গিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বা বেকার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্ত্তা, তিনিই ভূতদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ভূতকে তিনি বলেন,—'যাও অমুক মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, সে মরিলে তাহার ভূত হইও, তাহার ভূতগিরি তোমাকে দিলাম।' সেই দিন হইতে ভূতটী মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মানুষের মাথাটী ধরিলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না; কেননা, মরিলেই তাহার ভূতগিরি করিতে পাইবে। এরূপ যে ঘটনা হয়, সে কেবল তোমাদের নিজ দোষে। দেশীয় সংবাদপত্র সকল তোমা-দিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মন-চিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না। এই দেখ, দেশ একেবারে নির্দ্ধন হইয়া যাইতেছে। বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়েরা ধন লুটিতেছে। ভাল, বিলাতী কাপড় না পরিলেই ত হয়। যদি দেশী কাপড় পর, তাহা হইলে ত আর তোমাদিগের ধন কেহ লুটিতে পারে না। রেল করিয়া বিদেশীয়েরা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলে না চড়িলেই ত হয়, পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী-বৃন্দাবন যাও না? তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনই আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে। সেইরূপ, আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি? আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি-বার উমেদারিতে থাকি? ভাল, তোমরা যদি মরা ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তো কেহ তোমাদের ভূতগিরি করিতে আসে না। তাই বলি, না মরিলেই ত সকল কথা ফুরাইয়া যায়। নিজে তোমরা মরিবে, আর যত দোষ আমাদের? অপরাধের মধ্যে এই যে, মরিলে আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি।

"যাহা হউক, লুল্লু বহুদিন হইল, ভূতগিরি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার কপালে ভাল ভূতগিরি কোথাও জুটে নাই। অবশেষে কর্ত্তা তাহাকে দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরির উমেদারিতে নিযুক্ত করেন। দুখিরাম যদিও বৃদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহার শক্তি-সামর্থ্য বিলক্ষণ ছিল। কিছুতেই মরিতে চায় না। বৃদ্ধের কুব্যবহারে লুল্লু বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। আজ অল্পদিন হইল, দুখিরামের মৃত্যু হইয়াছে, লুল্লু তাহার ভূতগিরি পাইয়াছে। লুল্লু একটী সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে যে এতদিন পরে এখন মনের সাধে ভূতগিরি করিতেছে, তোমাদের মুখে এ কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"সে কি কথা মহাশয়? দুরাচার লুল্লুর কার্য্যে আপনি সন্তুষ্ট! আমরা যে, আপনার নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিতে আসিয়াছি! ইহার স্ত্রীকে আপনি উদ্ধার করিয়া দিবেন, সেই প্রার্থনায় যে, আপনার কাছে আসিয়াছি!" এইরূপ অনেক বাদানুবাদের পর ভূত বলিল,—"দেখ, আমি এক্ষণে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, সংসারের বাদ-বিসংবাদ, ভাল-মন্দ কিছুতেই থাকি না। আমি জানি না লুল্লু এখন ইঁহার স্ত্রীকে কোথায় রাখিয়াছে। অন্বেষণ করি, এরূপ অবকাশ আমার নাই। তোমরা এক কাজ কর; এখান হইতে দশক্রোশ দূরে মাঠের মাঝখানে একটী পুরাতন কূপ আছে, সে কূপে এখন জল নাই। তাহার ভিতর ঘ্যাঘোঁ বলিয়া একটী ভূত বাস করে। ঘ্যাঘোঁ সকল সংবাদ রাখিয়া থাকে। ভূতদিগের মধ্যে সে একরূপ গেজেট। তোমরা তাহার নিকট যাও, সে সকল সন্ধান বলিয়া দিবে।" তবে কথা এই, আজ কিছুদিন হইল ঘ্যাঘোঁ প্রেম-জ্বরে জর-জর জর হইয়াছে। মনের খেদে বিরলে সে কূপের ভিতর বসিয়া আছে। কথা কহে না, ডাকিলে উত্তর দেয় না, তাহার দেখা পাওয়া ভার। চেষ্টা করিয়া দেখ।"

৫ম পর্ব্ব——প্রেম-জ্বর।

ব্রাহ্মণ এবং আমীর, আর করেন কি? দুইজনে ঘ্যাঘোঁর অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কূপের ধারে গিয়া ঘ্যাঘোঁকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ডাকিলেন,—"ঘ্যাঘোঁ মহারাজ! ঘ্যাঘোঁ বাবু! ঘরে আছেন?" মুসলমান ডাকিলেন,—"ঘ্যাঘোঁ সাহেব! বাড়ী আছেন?" ডাকিয়া ডাকিয়া দুইজনেরই গলা ভাঙ্গিয়া গেল, তবুও ঘ্যাঘোঁ কূপ হইতে বাহির হইল না, উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। দুইজনে তখন ভাবিলেন, এত বড়ই বিপদ! এর আবার উপায় কি করা যায়। ব্রাহ্মণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"চল, আমরা তাঁতির কাছে যাই।" বিরস-বদনে দুই জনে ফিরিলেন। পুনরায় গ্রামে আসিয়া দুইজনে তাঁতির নিকট যাইলেন। ব্রাহ্মণ, তাঁতিকে বলিলেন,—"ভায়া! তোমাকে একটী উপকার করিতে হইবে। ঘ্যাঘোঁ নামে একটী ভূত আছে। সে আমার পরম বন্ধু। তাহার কাণের ভিতর অতিশয় পোকা হইয়াছে, সে পোকা কিছুতেই বাহির হইতেছে না। দারুণ ক্লেশে ঘ্যাঘোঁ এখন একটী কূপের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। ডাকিলে উত্তর দেয় না, বাহিরেও আসে না। মনুষ্যের কাণে পোকা হইলে অনেক কালোয়াতের গানে বাহির হইতে পারে, কিন্তু ভূতের কাণের পোকা তোমার গান ভিন্ন কিছুতেই বাহির হইবে না। অতএব যদি তুমি একবার সেই কূপের ধারে বসিয়া, একটু গান কর, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।" এ পর্য্যন্ত ইচ্ছাসত্ত্বে কেহ তাঁতির গান শুনে নাই। আজ তাহাকে গান গাওয়াইবার জন্য লোকে উৎসুক! এ অহঙ্কার রাখিবার কি আর স্থান আছে? আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁতি বলিল,—"আমি এইক্ষণেই যাইতেছি। কাপড় পরিয়া আসি।" তাঁতি কাপড় পরিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইল। তিনজনে পুনরায় সেই কূপাভিমুখে চলিলেন। কূপের ধারে পৌঁছিয়া, তাঁতি আসন করিয়া গান আরম্ভ করিলেন; ব্রাহ্মণ ও আমীর কাণে অঙ্গুলি দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তাঁতির গান কূপের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, তখন ঘ্যাঘোঁ ভাবিল, "প্রেম-জ্বরে জর-জর হইয়া মনের খেদে বিরলে কূপের ভিতর বসিয়া আছি, ওখানে আজ আবার একি ভীষণ ব্যাপার! সে কালে কবির চিৎকারে শুনিয়াও প্রাণ ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতেও প্রাণ বাহির হয় নাই; আজ যে দেখিতেছি, মহাপ্রাণী ধড়ফড় করিয়া বাহির হয়!" ঘ্যাঘোঁ তবুও কিন্তু সহজে

কূপ হইতে বাহির হয় নাই। যখন দেখিল, তাঁতির গানে নিতান্তই প্রাণ বাহির হইয়া যায়, তখন করে কি? কাজেই বাহির হইতে হইল। হামাগুড়ি দিয়া কূপ হইতে বাহির হইল। ঘ্যাঘোঁ বেঁটে-খেঁটে, হাড়-ওটা বুড়ো-সুড়ো ভূত। প্রেম-জরে দেহ তার এতই জর-জর হইয়াছিল যে, তাহার চক্ষু, মুখ, নাসিকা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে ছিল।

প্রেম-জ্বরে জর-জর।

কূপ হইতে বাহির হইয়া ভূত একদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ ও আমীর আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, "ঘ্যাঘোঁ, তুমি পলাইও না, তোমার ভয় নাই, ঐ দেখ তাঁতি ভায়া চুপ করিয়াছেন। আর পলাইবে বা কোথা? যেখানে যাইবে, সেইখানে গিয়া তাঁতি ভায়া গান জুড়িয়া দিবেন। তার চেয়ে, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্য উত্তর দাও, আমরা তাঁতি ভায়াকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই।" ঘ্যাঘোঁ ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিল, আমীরের মুখপানে চাহিল, তাঁতির মুখপানে চাহিল। দেখিল, গলা পরিষ্কার করিয়া তাঁতি আর একটী গান আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাহা দেখিয়াই ঘ্যাঘোর আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া যাইল। সে বলিল,—"আচ্ছা কি বলিবে বল, কি জিজ্ঞাসা করিবে?" ব্রাহ্মণ বলিল,—"লুল্লু নামক তোমাদের যে ভূত আছে, সে এই আমীরের স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে, তুমি বলিতে পার? আর কি করিয়াই বা তাহার উদ্ধার হয়?" ঘ্যাঘোঁ বলিল,—"অনেক দিন ধরিয়া, প্রেম-জরে জর-জর হইয়া আমি এই কূপের ভিতর বসিয়া আছি। সংসারের সংবাদ বড় কিছু রাখি নাই। তবে তাঁতির গান যদি আর না শুনাও, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"অনুসন্ধান করিতে যাই বলিয়া তুমি পলাইয়া যাইবে, শেষে আর তোমার দেখা পাইব না। আমরা তেমন বোকা নই যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" ঘ্যাঘোঁ উত্তর করিল, "পলাইয়া আর কোথায় যাইব? যেখানে যাইব, সেই খানে গিয়া তোমরা তাঁতির গান জুড়িয়া দিবে। তা ছাড়া আমীরের স্ত্রী কোথায়, অনুসন্ধান না করিয়াই বা আমি কি করিয়া বলিব?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সত্য কর যে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।" ঘ্যাঘোঁ বলিল—"আমি সত্য বলিতেছি, শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আচ্ছা তবে যাও, শীঘ্র আসিও, আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম।" ঘ্যাঘোঁ বলিলেন—"রও, আমি আমার বড় নাগরা জুতা যোড়াটী পায়ে দিয়া আসি। সে জুতাটী পায়ে দিলে আমি বাতাসের উপর উত্তম চলিতে পারি। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদয় ভারত-ভূমি ভ্রমণ করিতে পারি।" এই বলিয়া ঘ্যাঘোঁ পুনরায় কূপের ভিতর যাইল, নাগরা জুতা পায়ে দিয়া বাহিরে আসিল, বাতাসের উপর উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া অতি দ্রুত বেগে চলিতে লাগিল; শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, আমীর ও তাঁতি সেই খানে বসিয়া রহিলেন। ঘ্যাঘোঁ ফিরিয়া আসে কি না এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই একদৃষ্টে আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। "কখন্ আসে, কখন্ আসে" এই কথা সকলেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমীর বলিয়া উঠিলেন "ঐ আসিতেছে, ঐ দেখ উত্তর দিকে কালো দাগটীর মত কি দেখা যাইতেছে।" নিকটবর্ত্তী হইলে সকলেই বলিয়া উঠিলেন—"ঘ্যাঘোঁ বটে, নাগরা জুতা পরিয়া ঘ্যাঘোঁ আসিতেছে।" ঘ্যাঘোঁ নিকটে আসিলে সকলেই তাহার মহা সমাদর করিলেন, সকলেই বলিলেন—"ঘ্যাঘোঁ! তুমি সত্যবাদী বট। প্রেম-জরে জর-জর হইয়া ত তুমি আপনার সত্য রক্ষা করিয়াছ। এখন বল, সংবাদ মঙ্গল তো?" ঘ্যাঘোঁ বলিল, "সু-সমাচার বটে, আমীরের স্ত্রীর

আমি সন্ধান পাইয়াছি।” সকলে বলিলেন, তবে শীঘ্র বল—“আমীরের স্ত্রী এক্ষণে কোথায়? সে ভাল আছে তো?”

ঘ্যাঘোঁ বলিল,—“হিমালয়-প্রদেশে ভীমতাল নামক একটী হ্রদ আছে। হ্রদের ভিতর পাহাড়ের গায় লুল্লু একটী ঘর খুদিয়াছে। জলে ডুব দিয়া তবে সে ঘরের ভিতর যাইতে পারা যায়, অন্য পথ নাই। তাহার ভিতর লুল্লু আমীরের স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। রাম বিহনে অশোক-বনে সীতা যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন, সেই ঘরের ভিতর একাকিনী বসিয়া আমীরের রমণীও সেইরূপ কাঁদিতেছেন। কেন যে কাঁদিতেছেন, তা বলিতে পারি না। লুল্লু আমাদের একটী সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে লইয়া গিয়াছে তার আবার কান্না কি? লুল্লু তাহাকে একবৎসর কাল সময় দিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে যদি শান্ত হইয়া তাহাকে নিকা না করে, তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কথা এই, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, হ্রদের ভিতর প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া লুল্লুর ঘরের ভিতরে যায়। আমরা ভূত হইয়া ভূতের বিপক্ষতা করিতে পারি না; তাহা হইলে ভূত-সমাজে আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। তবে এই মাত্র বলিয়া দিতে পারি যে, যদি তোমরা একটী হৃষ্টপুষ্ট ভূত ধরিয়া তাহার তেল বাহির করিতে পার, আর যদি সেই তেল মাখিয়া জলে প্রবেশ কর, তাহা হইলে অনায়াসেই লুল্লুর ঘরে পৌঁছিতে পারিবে। তার পর কৌশল করিয়া আমীরের স্ত্রীকে উদ্ধার করিও। তা বলিয়া যেন আমাকে ধরিয়া তেল বাহির করিও না। প্রেম-জ্বরে তো জর-জর আছেই, তার উপর আবার তাঁতির গান শুনিয়া আমার শরীরে আর শরীর নাই, এক বিন্দুও তেল বাহির হইবে না। তবে এক কাজ কর, এই মাঠের প্রান্তভাগে একটী গাছ আছে। সেই গাছে গোগাঁ নামে একটী গলায়-দড়ি ভূত বাস করে। নিকটে গ্রামের লোককে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে সে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। যে কেহ তাহার প্রলোভনে পতিত হয়, সে এই গাছে ফাসিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরে। শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হইবে বলিয়া, এই ভূত তখন তাহাদের পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে। তোমরা যদি এই ভূতটীকে ধরিয়া তেল বাহির কর, তাহা হইলে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করি। কারণ সে দুরাচার, আমার পরম শত্রু। আমার যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সে গিয়া ভাংচী দিয়া আসে। প্রেতিনী, সঙ্খচূনী, চূড়েল প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতিনীদিগের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। দুই এক স্থানে কন্যাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কন্যা দেখিয়া মনও মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু এই দুরাচার গিয়া কন্যার পিতা-মাতার কাছে আমার নানারূপ কুৎসা করে। সে জন্য—দুঃখের কথা বলিব কি! ভূতগিরি করিতে করিতে বুড়া হইয়া যাইলাম, আজ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই। সংসারে আমি আধখানা হইয়া আছি, পুরা ঘ্যাঘো হইতে পারিলাম না। আর কত লোক দশটা কুড়িটা বিবাহ করিয়া ষোল আনার চেয়ে বেশী হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, মনুষ্যের দ্বারা ভূত ধরা কিছু সহজ কথা নয়। সে কালের মত এখন আর রোজা নাই যে, ভূত ধরিয়া পাল্কি-বেহারা করিবে, কি গাড়ীতে যুতিয়া দিবে। কৌশল করিয়া ধরিও।

“বিবাহের কথা মনে করিয়া আমার প্রাণ এখন বড়ই হু হু করিতেছে। একবার একটী পরম-রূপবতী চূড়েলিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল। তাহার রূপের কথা আর বলিব কি? তাহার নাকটী দেখিয়াই আমার মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ও হো প্রাণপ্রেয়সি! তোমার বিরহে প্রাণ যে আর ধরিতে পারি না! একবার তোমার ছবিখানি দেখিয়া প্রাণ শান্ত করি।” আমিও দেখি, তোমরাও দেখ, দেখিয়া চক্ষু জুড়াও।

৬ষ্ঠ পর্ব্ব—প্রবন্ধ-নিষ্পীড়ন।

প্রাণপ্রেয়সীর ছবি দেখিয়া ঘ্যাঘোঁর প্রাণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; সে একে একে সকলের কর-মর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিল। তখন আমীর,—ব্রাহ্মণ ও তাঁতিকে বলিলেন,—“আপনাদিগকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। ঘর-সংসার ছাড়িয়া আপনারা আমার সঙ্গে ঘুরিতেছেন। আর আপনা-দিগকে আমি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা বাটী ফিরিয়া যান, আমার কপালে যাহা আছে, তাহা হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও তাঁতি কিছুতেই আমীরকে একেলা ফেলিয়া যাইতে চাহিলেন না। আমীরের অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষে স্বীকৃত হইয়া, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া,

ও হো প্রাণ-প্রেয়সি!

বিরস-বদনে দুইজনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাঁরা চলিয়া গেলে, ঘ্যাঘোঁর কূপের ধারে বসিয়া আমীর অনেকক্ষণ কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর মনকে প্রবোধ দিয়া ভাবিলেন, "কাঁদিলে কি হইবে? এখন ভূত ধরিবার উপায় চিন্তা করি, তবে ত স্ত্রীর উদ্ধার হইবে।" অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমীর মাথা হইতে পাগড়িটী খুলিলেন। পাগড়িটী উত্তম রূপে পাকাইলেন, আর তাহার একপাশে একটী ফাস করিলেন। এইরূপে সুসজ্জ হইয়া, যে আমগাছে গোঁগাঁ নামক গলায়-দড়ি ভূত থাকে, সেইদিকে চলিলেন। গাছের নিকট উপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উঠিয়া গাছের ডালে পাগড়ির অপর পার্শ্ব বাঁধিয়া ফাঁসটী গলায় দিতে উদ্যত হইলেন। ফাসটী গলায় দেন আর কি. এমন সময় চাহিয়া দেখেন যে, সেই গলায়-দড়ি ভূত সহাস্য-বদনে তাঁহার সম্মুখে আর একটী ডালে বসিয়া রহিয়াছে।

ভূত বলিল,—"নে নে, শীঘ্র শীঘ্র গলায় ফাঁস্ পরিয়া ঝুলিয়া পড়, নীচে হইতে আমিও সেই সময় তোর পা ধরিয়া টানিব এখন, তাহা হইলে সত্বর তোর মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে আমার বেকার নাতি-জামাই তোর ভূতগিরি করিতে পাইবে।" আমীর কোনও কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে জেব হইতে আফিমের কৌটাটী বাহির করিলেন। কৌটাটীর ঢাকন ভূতের সম্মুখে ধরিলেন। ভূত তাহাতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওর ভিতর ও কে?" আমীর বলিলেন,—"একটী ভূত।" গোঁগাঁ বলিল,—"ভূত! কৈ, ভাল করিয়া দেখি।" খুব ভাল করিয়া দেখিয়া গোঁগাঁর নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, ভূত বটে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"উহার ভিতর তুই ভূত ধরিয়া রাখিয়াছিস্ কেন?" আমীর বলিলেন,—"আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারি-সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটী ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারি-সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।" গোঁগাঁ বলিল,—"আমি যে লেখাপড়া জানি না।" আমীর বলিলেন,—"পাগল আর কি! লেখাপড়া জানার আবশ্যক? গালি দিতে জানিস্ ত?" গোঁগাঁ বলিল,—"ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।" আমীর বলিলেন,—"তবে আর কি! আবার চাই কি? এতদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্য্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।" ভূত বলিল,—"তবে কি তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে না? ঐ যে পাগড়ি? ঐ যে ফাঁস?" আমীর বলিলেন,—"আমি ত আর ক্ষেপিনি যে,

গলায় দড়ি দিয়া মরিব! পাগ্‌ড়ি আর ফাস হইতেছে টোপ, ওরে বেটা! তোরে ধরিবার জন্ম টোপ। যদি এ ফন্দি না করিতাম, তাহা হইলে তুই কি গাছের ভিতর হইতে বাহির হইতিস্? এখন চল্‌, ইহার ভিতর প্রবেশ কর্।" এই বলিয়া আমীর তাহাকে চণ্ডুর নলটী দেখাইলেন। ভূত জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি?" আমীর বলিলেন, "ইহার নাম বাম্বু, নে শীঘ্র ইহার ভিতর প্রবেশ কর্।" ভূত ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া আমীর টেকোটী বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখিতেছিস?" ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—"ও আবার কি?" আমীর বলিলেন,—"এর নাম আর্টখিয়ে। সাধু ভাষায় ইহাকে থক্ বলে। নলের ভিতরে যদি না প্রবেশ করিস্, তাহা হইলে ইহা দিয়া তোর চক্ষু উপাড়িয়া লইব।" বাস্তবিক থক্‌টী তখন যেরূপ চক্ চক্ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে আজন্মকাল ভূতের চক্ষু তুলিয়া আসিতেছে, যেন ভূতের চক্ষু না তুলিয়া থক্ কখন জলও গ্রহণ করে না, আর যেন আমীর যদি নাও উপড়ান্ ত থক্ নিজে গিয়া সেই মুহূর্ত্তে ভূতের চক্ষু তুলিয়া ফেলিবে। টেকোর এই প্রকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভূত বড়ই ভয় পাইল, ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে করিল, "কাজ নাই বাপু! পরের চাকর হইয়া, এডিটারি করিয়া না হয় খাইব, তা বলিয়া অন্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না।" এই ভাবিয়া সে আপনার কলেবর হ্রাস করিল, আর সুড়সুড় করিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করিল। নলের ছিদ্রে ভাল করিয়া সোলা আঁটিয়া দিয়া, আমীর গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আমীরের মনে এখন কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তির উদয় হইল। শিস্ দিতে দিতে তিনি গ্রামাভিমুখে চলিলেন। গ্রামে উপস্থিত হইয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের এ গ্রামে কলুর বাড়ী আছে?" লোকে বলিল, "হঁা আছে।" কলু-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমীর কলুকে বলিলেন, "কলু ভায়া! আমার একটী বিশেষ উপকার করিতে হইবে। এই বাঁশের নলটীর ভিতর আমি একটী ভূত ধরিয়া আনিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই ভূতটীকে ঘানিতে মাড়িয়া তেল বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়।" কলু বলিল—"তার আটক কি! এখনই দিব। তিল, সরিষা, তিসি, পোস্ত, কত কি পিশিয়া তেল বাহির করিলাম, আজ একটু ভূতের তেল বাহির করিয়া দিব, সে আর কি বড় কথা! কৈ, লইয়া আইস।" দুইজনে ঘানিগাছের কাছে গেলেন। আমীর নল হইতে ভূতটীকে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কলু তৎক্ষণাৎ ঘানি চালাইয়া দিলেন। কলুর বলদ মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরিতে লাগিল। ভূতের হাড় মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। ভূত, "ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল,—"এই বুঝি তোমার এডিটারির পদ? এই বুঝি খবরের কাগজের সম্পাদকতা করা?" আমীর হাসিয়া বলিলেন,—"জান না ভায়া! সম্পাদক হইতে আমি এইরূপেই প্রবন্ধ বাহির করিয়া থাকি। কেমন! উত্তম উত্তম গালি, ভাল ভাল প্রবন্ধ, এখন মনে উদয় হইতেছে ত? গোঁগাঁ ভায়া! সেকালের হরিণের গল্পটাও কি ছাই শুন নাই? যাহাতে কথা আছে,—'ওহে ভাই শশধর! আগে এ দায়ে ত তর, তারপর রাজ কাম কর আর না কর।" ঘানি হইতে ক্রমে টপ্ টপ্ করিয়া তেল পড়িতে লাগিল। প্রায় এক শিশি তেল প্রস্তুত হইল। যখন ভূতের দেহ একেবারে তেল-শূন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না, আমীর সেই ছোবড়ারূপ ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোন্ কালে মরিয়া যাইত।

৭ম পর্ব্ব——উদ্দেশ্য।

তেলের শিশিটী পকেটে লইয়া আমীর পুনর্ব্বার চলিলেন। যাইতে যাইতে কত পথ চলিয়া অবশেষে হিমালয়ের তলভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের উপর উঠিয়া, কত চড়াই উতরাইয়ের পর ভীমতাল দেখিতে পাইলেন। ভীমতালের চারিদিকে ঘুরিয়া, ঘ্যাঁঘোঁ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্থানটীতে গিয়া বসিলেন। জানিলেন, এই স্থানটীতে ডুব মারিতে হইবে, ইহার নীচেতেই লুল্লুর ঘর। সেই স্থানে বসিয়া, শিশিটী বাহির করিয়া উত্তমরূপে সর্ব্বশরীরে ভূতের তেল মর্দ্দন করিলেন। তেল মাখিয়া তাঁহার শরীরে যে কেবল আসুরিক বল হইল তাহা নহে, দেহ এত লঘু হইল যেন তিনি পাখীর মত উড়িতে পারেন।

তেল মাখা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর "বিস্‌মিল্লা" বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলে ডুব মারিয়া ক্রমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। পাতাল পর্য্যন্ত তত দূর যাইতে হয় নাই, কিন্তু অনেক, অনেক, দূর গিয়া পাহাড়ের গায়ে একটী ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করিতেই একেবারে শুষ্ক ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। সেখানে আলোর অভাব ছিল না, উত্তম দিনের আলো ছিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাসস্থানের মত পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কি মনুষ্য, কি ভূত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, "এখনও দিন রহিয়াছে, এত প্রকাশ্যভাবে এখানে বিচরণ করা ভাল নয়। রাত্রি হইলে সকল সন্ধান লইব।" এই মনে করিয়া একটী ছোট গর্ত্তে লুকাইয়া রহিলেন।

জলে ডুব দিয়া যে শুষ্ক ঘরের ভিতর প্রবেশ করা যায়, এ কথা শুনিয়া কেহ যেন অবাক্ হইবেন না। লোকে পাছে ভাবেন যে, আমি যে সমস্ত লিখিতেছি তাহা অলীক গল্প কথা, সেজন্য আমাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে হইল। আকবরের সময় এক জন মিস্ত্রি লাহোরে এরূপ একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, নিকটস্থ একটী জলাশয়ের জলে ডুব না দিয়া সে ঘরে যাইবার আর অন্য পথ ছিল না। আগ্রাতে জহাঙ্গীর বাদশাহও এইরূপ একটী ঘর দেখিয়াছিলেন। 'ওয়াকিয়াত-ই-জহাঙ্গীরি' নামক পুস্তকে জহাঙ্গীর লিখিয়াছেন, "আমার পিতার সময় লাহোর নগরে যেরূপ একটী জল-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ একটী জল-গৃহ দেখিতে রবিবার দিন হাকিম আলির বাটীতে গিয়াছিলাম। আমার সহিত কতকগুলি পারিষদও ছিল, যাহারা এরূপ গৃহ কখনও দেখে নাই। জলাশয়টী দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় ছয় গজ, ইহার পাশে একটী কামরা, যাহাতে উত্তমরূপ আলো ছিল, এবং যাহার ভিতর যাইতে হইলে এই জলের ভিতর দিয়া ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কামরায় এক বিন্দুও জল প্রবেশ করিতে পারে না। কামরায় দশ বার জন লোক বসিতে পারে। ইহার ভিতর হাকিম আমাকে টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলেন। কামরা দেখিয়া আমি বাটী ফিরিয়া আসিলাম। হাকিমকে পুরস্কার স্বরূপ দুহাজারীর পদে নিযুক্ত করিলাম।" এক্ষণে ইতিহাস দ্বারাও গল্পটী সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত বিষয় আছে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়।

আমীর পাহাড়ের গর্ত্তে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। যখন কতক রাত্রি গত হইয়া গেল, তখন সেই গিরিগহ্বরে সহসা তুমুল ঝড় উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জলের ভিতরও ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। আমীর কাণ পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন জল ফুড়িয়া উপরে যাইতেছে। ভাবিলেন, "রাত্রি হইয়াছে, এইবার ভূত বুঝি চরিতে যাইতেছে।" যখন পুনরায় সে স্থান নিঃশব্দ হইল, তখন আমীর আস্তে আস্তে গর্ত্ত হইতে বাহির হইলেন। অতি সাবধানে, এ-ঘর সে-ঘর, অর্থাৎ কি না এ-গর্ত্ত সে-গর্ত্ত খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে অতি দূরে একটী সামান্য আলো তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। সেই দিক্ পানে গিয়া দেখিলেন অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ঘরের ভিতর একটী প্রদীপ মিটু মিটু করিয়া জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের কাছে গালে হাত দিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, এক মলিন-বসনা বিরস-বদনা ললনা বসিয়া রহিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমীর চিনিতে পারিলেন যে, এই রমণী তাঁহারই স্ত্রী। স্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। এমনি হৃদয়ের আবেগ উপস্থিত হইল যে, মনে করিলেন, এখনি দৌড়িয়া গিয়া ধরি, আর বলি,—"প্রিয়তমে! জানি! আর ভয় নাই, আমি আসিয়াছি, আমি তোমার আমীর আসিয়াছি।" কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিলেন, মনে করিলেন, "ভয় নাই কিসে? এখনও ত আমরা ভূতের হাতে! এখনও ত স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারি নাই! স্ত্রীর দেখিতেছি—শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ। বোধ হয়, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। একেবারে দেখা দেওয়া হইবে না। আমি যে এখানে আসিয়াছি, ক্রমে জানিতে দিব।" এই ভাবিয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমীর একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমীর-রমণী কাঁদিতেছিলেন। অবিরল ধারায় অশ্রুস্রোত তাঁহার নয়নযুগল হইতে বহিতেছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন, এক এক বার চক্ষু মুছিতেছিলেন, কখনও কখনও অপরিস্ফুট ভাষায় খেদোক্তিও করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন,—"হায়! আমার দশা কি হইল! শয়তানের হাতে

পড়িয়া আমার জাতিকুল সকলি মজিতে বসিল। ধর্ম্ম বিনা স্ত্রীলোকের আর পৃথিবীতে আছে কি? ভূতই হউক আর শয়তানই হউক, এ ধর্ম্ম আমি তাহাকে কখনই বিনাশ করিতে দিব না। সে দুর্বৃত্ত অঙ্গীকার করিয়াছে, একবৎসর কাল আমাকে কিছু বলিবে না। এই একবৎসরের মধ্যে দুর্ব্বলের বল, নিঃসহায়ের সহায়, ঈশ্বর কি আমায় পাপিষ্ঠের হাত হইতে মুক্ত করিবেন না। আমীর! আমীর!! একবার আসিয়া দেখ, আমার কি দশা হইয়াছে।” আমীর আস্তে আস্তে বলিলেন, “ভয় নাই, ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, আমি আসিয়াছি।” আমীর-রমণী চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। চক্ষুর্দ্বয় তখন তাঁহার জলে প্লাবিত ছিল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, মনের ভ্রান্তি বশতই তিনি এরূপ শব্দ শুনিলেন। তবুও মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সহসা চক্ষু মুছিতে সাহস করিতেছিলেন না; পাছে সত্য সত্যই ভ্রান্তি হইয়া পড়ে, পাছে সে আশাকণা-টুকুও উড়িয়া যায়। আমীর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, বলিলেন,—“চাহিয়া দেখ! সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি। ভয় নাই! ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয় এ ঘোর বিপদ হইতে আমরা মুক্ত হইব।” এই বলিয়া একেবারে স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, স্ত্রীও তাঁহার গলা ধরিলেন। এইভাবে বসিয়া দুইজনে অনেক ক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর আমীর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—“আর কাঁদিও না। এখন এখানকার সকল কথা আমাকে বল। প্রথম আমাকে বল,—ভূত তোমাকে কি করিয়া ধরিয়া আনিল।” আমীর-রমণী বলিলেন,—“তাহার আমি কিছুই জানি না। ঘরের ভিতর হইতে যেই বাহিরে আসিয়া পা দিলাম, তুমি কি ভিতর হইতে বলিলে, শুনিতে পাইলাম। তার পর যেন একটা ঝড় আসিয়া আমাকে একেবারে ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল, একেবারে উড়াইয়া লইয়া চলিল। আমি অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, বলিতে পারি না। যখন প্রভাত হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখি, দিন হইয়াছে, সম্মুখে এক বিকটমূর্ত্তি বিষমদেহ নরাকার রাক্ষস। তাহাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার অজ্ঞান হইয়া যাইলাম। তার পর পুনরায় যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, রাত্রি হইয়াছে, ঘরে আর কেহ নাই, একেলা পড়িয়া আছি। এই প্রদীপটী মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, নানারূপ আহারীয় দ্রব্য ঘরে রহিয়াছে। আমি কিন্তু কিছুই খাইলাম না। মনে করিলাম, ‘অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।’ তাহার পর-দিবস প্রাতঃকালে সেই বিকটমূর্ত্তি আবার আমার কাছে আসিল। এবার আমি তাহাকে দেখিয়া অজ্ঞান হই নাই। বড়ই ভয় হইয়াছিল সত্য, অজ্ঞান হইবার উপক্রমও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সাহস করিয়া বুক বাঁধিলাম, মনে করিলাম, শুনিতে হইবে সে কে, আর কেনই বা আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। সেই বিকটমূর্ত্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল,—‘সুন্দরি! এক্ষণে আর তুমি আমীরের রমণী নও, এক্ষণে তুমি আমার গৃহিণী। তোমার স্বামী নিজে তোমায় আমাকে দান করিয়াছে। এখন আমার এই সমুদয় ঘরকন্না তোমার। অনুমতি হইলেই এইক্ষণেই আমাদের কাজিকে ডাকিয়া আনি, তিনি আমার সহিত তোমার নিকা দিয়া দিবেন।’ সাহসের উপর ভর করিয়া আমি বলিলাম,—‘তুমি কে?’ স্বামী আমায় তোমাকে কি করিয়া দিলেন?’ সে বলিল,—‘আমি ভূত। আমার নাম লুল্লু। আমি সামান্য ভূত নই, আমি একজন সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আর এই ধন সম্পত্তি, এই গিরিগহ্বরও আমার; আমি দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরি করিতেছি। ভূত-সমাজে আমি অতি প্রবল-পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত, আমার মান-মর্য্যাদা রাখিতে আর স্থান নাই।’ আমি বলিলাম,—‘স্বামী আমায় তোমাকে দিয়াছেন এ কথা একেবারেই মিথ্যা। তারপর মানবী হইয়াই বা ভূতের রমণী কবে কে হইয়াছে? দেখ, আমরা খোদা-পরস্ত মুসলমান, বুতপরস্ত-দিগের মত শয়তানের শাগরেদ নই। আমার প্রতি অত্যাচার করিলে খোদা তোমাকে দণ্ড করিবেন।’

“এইরূপ প্রতিদিন ভূতের সহিত বাদানুবাদ হয়। ভূত কিন্তু আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করেনি। প্রথম কয়েক দিন আমি আহার নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। তার পর যখন দেখিলাম, যে, আপাতত ভূত আমার প্রতি বিশেষ কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিতেছে না, তখন আহার করিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, ‘ভূত শাসন করিবার নিমিত্ত নানারূপ তাবীজ আছে। আমিলদিগের নিকট হইতে তাহা আনিয়া নিশ্চয় তুমি আমায় উদ্ধার করিবে।’ ভূত প্রতিদিন আসে

আর বলে—"কেমন, আজ কাজি আনি?" প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া, এখন তাহাকে দেখিলে আর আমার বড় ভয় হয় না, পূর্ব্বেকার চেয়ে মনে সাহসও অনেক হইয়াছে। নিকা করিবার কথা বলিলে এখন তাহাকে একপ্রকার দূর দূর করিয়া দিই। এক দিন কিন্তু সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইল, ভূত না হইলে হয় ত ফাটিয়া মরিয়া যাইত। সমুদয় শরীর হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। রাগে নিজের হাতটী খুলিয়া লইল, অপর হাত দিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। পা দুইটা খুলিয়া লইল আর সেইরূপ ঘুরাইল। দুইটী হাত, দুইটী পা ঘুরান হইলে, চক্ষু-কোটর হইতে চক্ষু দুইটী বাহির করিয়া লইল, আর যেরূপ লোকে ভাঁটা লুফিয়া থাকে, সেইরূপ দুই হাতে লুফিতে লাগিল। তার পর সমস্ত মুণ্ডটী খুলিয়া লইল, হাতে লইয়া বলিল কি? 'সুন্দরি! যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি এই আপনার মুণ্ডটী আপনি চিবাইয়া খাইব।' কি করিয়া নিজের মুণ্ড নিজে খাইবে, তাহা কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক আমি বলিলাম— 'তুমি নিজের মুণ্ড নিজেই খাও, আর পরেই খা'ক, আমি কেন ভূতকে বিবাহ করিতে যাইলাম? ভাল চাও ত আমাকে ঘরে রাখিয়া আইস।' তখন সে বলিল—'আচ্ছা! আজ আমি তোমাকে কিছু বলিলাম না, আজ হইতে এক বৎসর কাল তোমাকে কিছু বলিব না। এক বৎসর পরে আমাকে নিকা কর ভালই, না কর তোমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিব। তোমার স্বামী তোমায় আমাকে দিয়াছে, আমি তোমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিব, মনে করিওনা আর কখনও তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়া দিব।' সেই দিন হইতে আর আমাকে বড় বিরক্ত করে না। রাত্রি হইলে চরিতে যায়, সকাল হইলে বাড়ী আসে, দূরে ঐ বড় গর্ত্তটীতে শুইয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যায়। মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় নাক-ডাকার শব্দ শুনিতে পাই, আমার কাছে বড় আসে না। কেবল দুইচারি দিন অন্তর একবার আসিয়া আহারীয় সামগ্রী দিয়া যায়, আর জিজ্ঞাসা করে—'কেমন, এখন তোমার মন শান্ত হইয়াছে তো? কাজি ডাকি?' গতবার আসিয়া বলিল—'দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। রং অনেক ফরসা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব সকলে বলিবে, 'এ লুল্লু নয়, সাহেব ভূত, কোন লার্ডের ছেলে হইবে। তখন তুমি আর আমাকে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন তুমি বলিবে 'আমার লুল্লু কই? আমার লুল্লু কোথা গেল?' তখন তুমি বলিবে, 'আর বিলম্ব সহে না, শীঘ্র কাজি ডাকো, শীঘ্র আমাকে নিকা কর।' কিন্তু তা আমি করিব না। তখন আমি নলপতঃ করিব। নিকা করিবার জন্য তুমি আমার সাধ্য সাধনা করিবে, তা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিব। মনে করিব, 'এ আমাকে বড়ই ভালবাসে, আমি ইহার জীবনসর্ব্বস্ব।' সকল ভূতেই বলে যে, লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আমি আর আমার গেঁটে দাদা, দুইজনেই সভ্য ভব্য নব্য। দেখিতে পাও তো, ভোর না হইলে কখনও বাড়ী আসি না। যাই, এখন সাবাং মাখিগে।' এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। দু-এক দিনের মধ্যে আবার বোধ হয় আসিবে।"

আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি ভূতের মেস্, না মুফলিসের বাড়ী? অর্থাৎ কি না, এখানে অপরাপর ভূত থাকে, না লুল্লু একেলা থাকে?" আমীর-রমণী বলিলেন যে, "এখানে লুল্লু ভিন্ন আর কোন ভূতকে দেখি নাই! লুল্লু একেলা থাকে, এই আমার বিশ্বাস।" আমীর বলিলেন "এখন সকল কথা বুঝিলাম, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন। কিন্তু কিরূপে যে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব, তাহা জানি না। আপাততঃ আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। যদি কিছু খাবার থাকে তাহা হইলে আমাকে দাও।" আমীর-রমণী বলিলেন—"খাবারের এখানে কিছুমাত্র অভাব নাই। ভূত প্রচুর পরিমাণে সে সকল আনিয়া দেয়।" এই বলিয়া তিনি পোলাও, কালিয়া, কুর্ম্মা, কোপ্তা, কাবাব, কারি আনিয়া স্বামীকে উত্তমরূপ আহার করাইলেন।

৮ম পর্ব্ব——চণ্ডু-মাহাত্ম্য।

আহারান্তে বিছানায় শুইয়া আমীর নল দ্বারা চণ্ডুধূম পান করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন,—'কি করিয়া স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে

উদ্ধার করি।’ ধূম পান করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিলেন—“এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তুমি কি বল? লুলু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। ভূতের তেল মাখিয়া যদিচ আমার শরীরে ভূতের বল হইয়াছে, তথাপি তাহার সহিত বোধ হয় সম্মুখ-সংগ্রামে আমি জয়লাভ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ, ঘ্যাঘোঁ আমাকে বলিয়া দিয়াছে—‘কৌশল করিয়া স্ত্রীর উদ্ধার করিও।’ সে জন্য তুমি একটী কাজ কর। অল্প অল্প লুলুকে প্রশ্রয় দাও। দিন-কত-কাল তাঁহাকে চণ্ডুর ধূম পান করাও। তার পর কি হয় বুঝা যাইবে। গোকুলের বাঁকা কালাচাঁদের সহিত পরিণয় করিলে রক্ষা আছে, কিন্তু আফিম-কালা-চাঁদের সহিত প্রেম করিলে আর রক্ষা নাই। চণ্ডুর পরিণয়ে তুমি তাহাকে আবদ্ধ কর। আমার সমুদয় সরঞ্জাম তোমার নিকট রাখিয়া যাইব। দিনকত কাল কাঁচা আফিম খাইয়া না-হয় আমি কষ্টেশ্রেষ্ঠে কাল কাটাইব।” আমীর-রমণী বলিলেন, “এ পরামর্শ মন্দ নয়”।

এইরূপ কথোপকথনে নিশা অবসান-প্রায় হইল। তখন আমীর রমণী বলিলেন—“আর তুমি এখানে থাকিও না। ভূতের আসিবার সময় হইয়াছে। ভূত চরিতে গেলে, কাল আবার রাত্রিতে আসিও। চণ্ডুর আসবাব রাখিয়া যাও। দেখি কি করিতে পারি। কিছু খাবার দাবার সঙ্গে লইয়া যাও, দিনের বেলায় খাইবে।” আমীর, স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় সেই গর্ত্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

প্রাতঃকাল না হইতে হইতে ভূত বাটী ফিরিয়া আসিয়াই, প্রথমে আপনার গর্ত্তে গিয়া শুইল। ঘোরতর নাক ডাকাইয়া অনেক ক্ষণ নিদ্রা যাইল। তার পর উঠিয়া হ্রদের জলে স্নান করিতে যাইল। পাথর দিয়া, ঝামা দিয়া, বালি দিয়া, সাবাং দিয়া উত্তমরূপে গা মাজিল। শরীরে নানাস্থানে রক্ত ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা-আপনি বলিল—“ক্রমে এইবার দুধে-আল্‌তার রং হইয়া আসিতেছে, নাঁ?” তার পর সাজ-গোজ করিয়া আমীর-রমণীর নিকট গমন করিল। বলিল—“কি সুন্দরি! দেখিতেছ? দিন দিন কি হইতেছি? দুধে-আলতার রং!” আমীর-রমণী বলিলেন—“তাই তো! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।” ভূত বলিল—“পাথর, ঝামা, বালি, সাবাং!” আমীর-রমণী বলিলেন—“সত্য সত্যই তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত।” ভূত বলিল—“তবে কাজি ডাকি?” আমীর-রমণী বলিলেন—“কাজি ডাকায় আমার কিছু আপত্তি নাই, তবে কি না জান, তুমি হইলে ভূত, আমি হইলাম মানুষ, দুইজনে মিলিবে কি করিয়া তাই ভাবিতেছি। মানুষের মত একটু আধটু যদি তোমার ব্যবহার দেখি, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ, দুইজনে পরিণয় হইতে পারিবে। এই দেখ, এত খাদ্যদ্রব্য তুমি আমাকে আনিয়া দাও, নিজে কিন্তু একদিনের জন্যেও একটু খুঁটিয়া মুখে দাও না। কি খাও, কি না খাও, তাহাও জানি না। সাপ খাও, কি ব্যাং খাও,—কিছুই বলিতে পারি না। হয় তো কোন্ দিন পচা মড়া খাইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। মুখের গন্ধে আমার প্রাণ বাহির হইবে। তার পর দেখ, মানুষে পান খায়, তামাক খায়, গ্যাঁজা খায়, আরও কত কি খায়। আহা! আমার স্বামী আমীর কেমন চণ্ডু খাইতেন! কাছে বসিয়া মনের সাধে কেমন তাঁহাকে আমি চণ্ডু খাওয়াইতাম। যখন চণ্ডুর ধূম আমার নাকে প্রবেশ করিত, তখন কেমন আমি স্বর্গসুখ লাভ করিতাম তাঁহার চণ্ডুর আসবাবগুলি আমি আমার কাঁধের ঝুলি করিয়া রাখিয়াছিলাম। শয়নে উপবেশনে সর্ব্বদাই আমার নিকট রাখিতাম, আহা! আজ পর্য্যন্ত সেই ঝুলিটী আমার কাঁধেই রহিয়াছে। ভূত বলিল—“বটে! তা, আমিও চণ্ডু খাইব, নিয়ে এস, এখনি খাইব।” আমীর-রমণী বলিলেন—“তাহা যদি করিতে পার, তো বড় ভালই হয়। ভূত-ভূতিনীদিগের কাছে তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত বট, কিন্তু আমাদের নাকে তোমাদের গায়ের একটু গন্ধ লাগে, একটু বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ রীতিমত চণ্ডুটী খাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে আর তোমার গায়ে সে গন্ধ থাকিবে না, মানুষ-মানুষ গন্ধ হইবে।” ভূত বলিল—“তা দাও, খাই।” আমীর রমণী বলিলেন—“কাঁচা আফিম হউক, কি গুলি হউক, কি চণ্ডু হউক, অল্প অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করিতে হয়। একেবারে অধিক খাইলে অসুখ করে। তোমার অসুখ করিলে প্রাণে আমি বড়ই ব্যথা পাইব। কারণ তোমার প্রতি সবে আমার এই নব অনুরাগ হইতেছে কি না? যাহা হউক, চণ্ডু শুইয়া খাইতে হয়। মূর্খ লোকেদের বিশ্বাস এই যে, চণ্ডু একবার টানিলেই অজ্ঞান

হইয়া পড়ে বলিয়া, সকলে ইহা শুইয়া খায়। তাহা নহে, শুইয়া খাইতে বাঞ্ছা হয় বলিয়া খায়।” এই বলিয়া আমীর-রমণী চণ্ডুর আসবাব বাহির করিয়া দিলেন। প্রদীপের নিকট ঘরের এক পার্শ্বে মাটীতে শুইয়া তাহাকে ধূমপান করিতে বলিলেন। কি করিয়া খাইতে হয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। অল্প স্বল্প ধূমপান করিলে, আমীর-রমণী বলিলেন,—“এখন আর নয়, চরিতে যাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ও-বেলা আসিয়া খাইও। কিছু কি টের পাইতেছ?” ভূত বলিল,—“আর কিছু টের পাইতেছি না, কেবল গা চুলকাইতেছে, আর একটু বমী-বমী করিতেছে।” আমীর-রমণী বলিল—“ঐ টুকুই এর আয়েস, একেই নেশা বলে।” ভূত তখন চলিয়া গেল। পুনরায় সন্ধ্যা বেলা আসিয়া আর একবার চণ্ডু খাইল। রাত্রি হইলে যথানিয়মে চরিতে যাইল। তখন আমীর আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন।

৯ম পর্ব্ব——উদ্ধার।

ভূতের চণ্ডু খাওয়ার বিবরণ স্ত্রীর নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমীর বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। পূর্ব্বেকার মত কথোপকথনে দুইজনে একত্রে রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাত না হইতে হইতে আপনার গর্ত্তে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। ভূত দিনে দুইবেলা আসিয়া চণ্ডু খায়। আমীর রাত্রিতে স্ত্রীর নিকট থাকেন। আমীর যখন দেখিলেন, চণ্ডুপানে ভূতের বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, আর ছাড়িবার যো নাই, তখন তিনি একদিন স্ত্রীকে বলিলেন,—“কাল তুমি ভূতকে আর চণ্ডু দিও না, বলিও চণ্ডু ফুরাইয়া গিয়াছে, মনুষ্যালয় হইতে চণ্ডু আনিতে বলিবে।” তার পরদিন প্রাতঃকালে যখন ভূত চণ্ডু খাইতে আসিল, আমীর-রমণী তাহাকে বলিলেন,—“দেখ, সঙ্গে করিয়া যাহা কিছু চণ্ডু আনিয়াছিলাম, সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ তোমাকে খাইতে দিই এমন আর নাই, তুমি লোকালয় হইতে চণ্ডু লইয়া আইস।” এই কথা শুনিয়া ভূতের মনটা বড়ই ফাঁক-ফাঁক হইয়া গেল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, কি সর্ব্বনাশের কথা সে শুনিল! বিরসবদনে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। যত বেলা হইতে লাগিল, শরীরে ও মনে ততই ক্লেশ হইতে লাগিল। প্রথম আকর্ণ পূরিয়া হাই উঠিতে লাগিল, তার পর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, গা-ভাঙ্গিতে লাগিল। সর্ব্বশরীরে ঘোর বেদনা হইল, প্রাণ আই-ঢাই করিতে লাগিল। সেদিন আর নিদ্রা হইল না। বৈকাল বেলা খালি নলটী লইয়া প্রদীপের শীসের কাছে ধরিয়া একবার টানিল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ দূর হইল না। একান্তমনে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কখন সন্ধ্যা হইবে যে, লোকালয়ে যাইয়া চণ্ডু আনিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। সেদিন যেই সন্ধ্যা হইল, অমনি ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। ভীমতালের জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। উপরে গিয়া আর সব চিন্তা ছাড়িয়া, কেবল চণ্ডুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-নগর সে-নগর, এ-দেশ সে-দেশ, সমস্ত ভারতভূমি ঘুরিল, চণ্ডু কোথাও পাইল না। আবকারির এমনই কড়া নিয়ম যে, সন্ধ্যা না হইতেই সকল দোকান বন্ধ হইয়া যায়। এদিকে চণ্ডু বিনা প্রাণ বাহির হয়। উদরেরও বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। শরীর আর বয় না, আর উড়িতে বা চলিতে পারে না। তখন ভাবিল,—“বৃথা আর ঘুরিয়া কি হইবে? মরি তো ঘরে গিয়া মরি, প্রেয়সীর মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব! তাহাকে বলিব, ‘দেখ তোমার প্রেমের ভিখারী হইয়া আমি এই প্রাণ বিসর্জ্জন করিলাম। হয় ত আমাকে বাঁচাইবার জন্য ইহার একটা উপায়ও করিতে পারে।” অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া, ঘোরতর যাতনায় ব্যথিত হইয়া, ভূত সেদিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। আমীর জানিতেন, কি ঘটনা ঘটিবে, তাই তিনিও সে দিন স্ত্রীর নিকট হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া আপনার ঘরে গিয়াছিলেন। ভূত কিন্তু আপনার ঘরে আসিয়াই সেইখানে শুইয়া পড়িল। শরীর এতই বিকল হইয়াছিল যে, সেখান হইতে নড়িতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সেইখানে পড়িয়া ক্রমাগত উঃ আঃ করিতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ হইয়া গেল। সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হইতে লাগিল, লিগেমেণ্ট সমস্ত আলগা হইল, শরীরের জায়েন সব একেবারে খুলিয়া গেল, হাড়ের সন্ধি সমুদয় একে একে খসিয়া গেল, যাবতীয় অস্থি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িল। উত্থানশক্তি-রহিত। ঘোর বেদনায়, ঘোর যাতনায় লুল্লু পড়িয়া রহিল। প্রভাত হইলে, হাসিতে হাসিতে হাত ধরাধরি

করিয়া, আমীর ও আমীর-রমণী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আমীর বলিলেন,—"কি হে বাপু! সভ্য ভব্য নব্য ভূত! পুরাতন কথাটা কি কখনও শুন নাই?

'থোড়া থোড়া কর্‌কে খাও মুঝে, ময় লগুঁ কড়ুয়া।
আব জরু বেচো, গরু বেচো মুঝকো লাও ভেড়ুয়া।'

ইহার অর্থ এই, আফিম বলিতেছেন, 'অল্প অল্প করিয়া আমাকে প্রথম খাও; কেননা, আমি তিত লাগি। এখন ভেড়ুয়া! স্ত্রী বিক্রয় কর, কি গরু বিক্রয় কর, বিক্রয় করিয়া যেখান হইতে পাও আমাকে লইয়া আইস।" ভূত চিঁচিঁ করিয়া বলিল,—"এ বিপদের সময় মুখনাড়া দিচ্ছিস্ তুই আবার কে?" আমীর বলিলেন,—"আমি আমীর, এই রমণীর স্বামী, যাহাকে তুই নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছিস্; তাই আজ তোর যাতনা দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিতেছি।" ভূত বলিল,—"তোমার জরু তুমি ফিরিয়া লও, অমন জরুতে আমার কাজ নাই। বাবা! ওতো জরু নয়! সুখে স্বচ্ছন্দে ভূতগিরি করিতেছিলাম, একি বাপু! ভূতের আবার চণ্ডু খাওয়া কি? ঐটা আমাকে মজাইল। এখন তোমার কাছে যদি আফিম কি চণ্ডু থাকে ত দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ধড়ে প্রাণ আসিলে তোমার স্ত্রীকে এবং তোমাকে ঘরে লইয়া যাইব। কেবল ঘরে রাখিয়া আসিব না, এখন দেখিতেছি আমাকে চিরকাল তোমার গোলামি করিতে হইবে, চণ্ডু না পাইলে ত আর বাঁচিব না; সুতরাং চণ্ডুর জন্য তোমার গোলামি করিতে হইবে। দুইবেলা চণ্ডু দিও, যা বলিবে তাহা করিব, তোমার সংসারে ভূতের মত খাটিব।" আফিমের মহিমা আমীর ভালরূপেই জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, লুল্লু যাহা বলিতেছে, তাহা প্রকৃত কথা, প্রতারণা ইহাতে কিছুই নাই। পকেট হইতে বাহির করিয়া প্রথমে তাহাকে একটু কাঁচা আফিম খাইতে দিলেন। ইহাতে ভূতের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল; শরীরের অস্থি-সমুদয় পুনরায় যে যাহার স্থানে গিয়া যোড়া লাগিল। তখন সে উঠিয়া বসিল। তার পর আমীর তাহাকে চণ্ডু পান করিতে দিলেন। তাহাতে তাহার দেহে পুনরায় প্রাণ-সঞ্চার হইল, শরীর স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল। লুল্লু তখন আমীরের পদতলে পড়িয়া বলিল,—"মহাশয়! আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী, বড়ই দোষ করিয়াছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। বড়ই নিদারুণ ক্লেশ হইতে আপনি আমাকে মুক্ত করিলেন। আপনার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। চিরকাল দাসানুদাস হইয়া আপনার এবং এই বিবিজীর সেবা করিব। এখন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লউন। আজই রাত্রিতে আপনাদিগকে ঘরে লইয়া যাইব।" আমীর ও আমীরের রমণী তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর ভূত আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। দুই জনে লুল্লুর পিঠে বসিলেন, জল হইতে বাহির হইয়া লুল্লু আকাশ-পথে উঠিল। তাড়িত-বেগে আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় সকলে দিল্লি নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমীরের ছাদে গিয়া ভূত ইঁহাদিগকে নামাইয়া দিল। আমীর ফকির-বেশে গৃহ ত্যাগ করিবার সময় ঘরে চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। চাবি খুলিয়া স্ত্রী পুরুষে ঘরে প্রবেশ করিলেন। লুল্লুর জন্য একটী ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিলেন, "লুল্লু! এই ঘরটী তোমার, তুমি এই ঘরে থাকিবে। আফিম কি চণ্ডু যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব।" লুল্লু বলিল—, "হাঁ, এ জনমে আর আপনাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। ছাড়িবার যোও নাই।" পরদিন প্রাতঃকালে আমীর প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। আমীর বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইলেন।

১০ম পর্ব্ব——লুচি।

যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইলে, লুল্লু ও আমীর দুইজনে এক সঙ্গে শুইয়া মনের সুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া চণ্ডু পান করিলেন। এইরূপে ভূতে মানুষে ক্রমে বড়ই ভাব হইল। এক দিন চণ্ডু খাইতে খাইতে আমীর বলিলেন,—"হে লুল্লু! হে চণ্ডু-সেবক-কুলতিলক! আমার বড় সাধ হইতেছে যে, পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করি,—যাঁহারা স্ত্রী-উদ্ধার-বিষয়ে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন তুমি আমার শত্রু ছিলে, এখন কিরূপ প্রাণের মিত্র হইয়াছ, তাহাও তাঁহারা একবার আসিয়া দেখুন। প্রথম হইতেছেন সেই জান, যিনি বলিয়া দিয়াছিলেন

তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ। তারপর সেই ব্রাহ্মণ, যাঁহার মত রোজা ধরাধামে কখনও হয় নাই, হবে না। তারপর আমাদের তাঁতি-ভায়া, যাঁর মত সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ পৃথিবীতে হয় নাই, হবে না। তারপর সেই কলুর-পো, যাঁর মত তৈল-নিষ্পীড়ক জগতে হয় নাই, হবে না। আর যদি ভূতদিগকে আনিতে পার, তাহা হইলে ত বড়ই সন্তুষ্ট হই। সেই ভূত-তত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণের ভূত, সেই অমানুষিক অভৌতিক প্রেমিক ঘ্যাঁঘোঁ, আর সেই ভাবি-সম্পাদক তৈল-প্রদায়ক গোঁগোঁ। তোমার গেঁটে দাদার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও আমার বড়ই ইচ্ছা। আর একটী কথা—আহা! ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ হয় নাই, তাহার সেই প্রাণ-প্রেয়সীকে আনিয়া যদি দুইজনে মিলন করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ই সন্তুষ্ট হই।" লুল্লু বলিল,—"আপনার সমুদয় আদেশ পালন করিতে আমি সমর্থ। আমি এই রাত্রিতেই সকলকে এখানে আনিতেছি।" সন্ধ্যার সময় ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে জান, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমীর সকলকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপনার বিবিকে পাইয়াছেন শুনিয়া সকলে পরম সুখী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুল্লু পুনর্ব্বার আকাশ-পথে যাত্রা করিয়া ব্রাহ্মণের ভূত, ঘ্যাঁঘোঁ, গোঁগোঁ ও সভ্য ভব্য নব্য গেঁটে দাদাকে লইয়া আসিল। ঘ্যাঁঘোঁর প্রাণপ্রেয়সী নাক-ধারিণী বিশ্ববিমোহিনী সেই চুড়েলনীকেও আনিয়া দিল। চুড়েলনী অন্তঃপুরে আমীর-পত্নীর নিকট গমন করিলেন। পুরুষ-মানুষ ও পুরুষ-ভূত সকলে বহির্ব্বাটীতে উপবেশন করিলেন। পরস্পরে আলাপ-পরিচয় হইলে, আমীর অনুনয়-বিনয় করিয়া সকলকে বলিলেন,—"মহোদয়-গণ! আজ রাত্রিতে আমার এ গরিব-খানাতে পদার্পণ করিয়া আপনারা বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার মনে একটী বাসনা বড়ই প্রবল হইয়াছে, আপনারা তাহা পুরণ করুন। বড় ইচ্ছা চুড়েলনীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ কার্য্য আজ রাত্রিতেই সমাধা করি। গোঁগোঁ যে, ঘ্যাঁঘোঁর নামে মিথ্যা কুৎসা করিয়াছিল, তাহা আমার পত্নী, চুড়েলনীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গোঁগোঁও সে কথা এখন স্বীকার করিতেছে। চুড়েলনীও কৃপা করিয়া বিবাহে সম্মতিদান করিয়াছে। এখন আপনাদিগের কি মত?" সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন, "তথাস্তু, শুভকার্য্যে বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" তখন আমীর,—লুল্লু প্রভৃতি ভূতদিগকে পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু উপস্থিত ভূতগণ সকলেই মৌন হইয়া রহিল। আমীরের আদেশ পালনে কেহই তৎপর হইল না। আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি তোমাদিগকে কোন দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছি? পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করা কি তোমাদের অভিপ্রেত নয়?" লুল্লু উত্তর করিল,—"মহাশয়! আপনি যেরূপ সদাশয় লোক, তাহাতে আপনার সমস্ত আদেশই আমাদের শিরোধার্য্য। তবে কি না, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলেই আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ক মৃত্তিকা-ভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র-পারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম্ম ফুস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্ম্মের গন্ধটী পর্য্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন। যার পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা,—দিবারাত্রি তাঁহাদিগকে পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিংবা কথা পড়িতে হইবে, তবেই তাঁহাদের ধর্ম্মটী টায়টোয়ে বজায় থাকিবে। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন যেরূপ অনুমতি হয়।" আমীর বলিলেন,—"তবে আর তত আড়ম্বরের আবশ্যক নাই। ভারতীয় ভূত-সমাজকেই কেবল নিমন্ত্রণ কর।"

নানাবিধ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পান ভোজনের সামগ্রীরও আয়োজন হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূতেরা অনেক লুচি, অনেক সন্দেশ, অনেক দধি জমা করিয়া ফেলিল। নগরবাসী অনেক লোককে আমীর সেই রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইলে, আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সমুদয় আয়োজন হইলে, মহাসমারোহে চুড়েলনীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল। আমীর নিজে কন্যাদান করিলেন, ব্রাহ্মণটী পুরোহিত হইলেন। বিবাহের মন্ত্র তিনি জানিতেন না সত্য, কিন্তু একটী দীর্ঘ কৌটা কাটিয়া [ওং আং করিয়া কোন রকমে সে রাত্রির

কার্য্য সারিলেন। পূর্ণযৌবনী ভূতকামিনী ঘ্যাঘো-পত্নীর রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেরই মন বিমোহিত হইল। একমনে অনিমিষ-নয়নে সকলে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন। যিনি যত দেখেন, দেখিয়া পিপাসা হৃদয়ে তাঁহার ততই প্রজ্বলিত হইল। বরকে সকলে বলিলেন, "ঘ্যাঘো! তুমি অতি ভাগ্যবান পুরুষ! যে, এরূপ অমূল্য কন্যারত্নকে লাভ করিলে!" ঘ্যাঘোঁ চক্ষু ঠারিয়া ঈষৎ হাসিলেন, বর কি না? অধিক কথাত আর কহিতে পারেন না? তবে সেই ঠার, সেই হাসির অর্থ এই—"আমি পূর্ব্বেই না বলিয়াছিলাম, ও-রূপ দেখিয়া কার প্রাণ সুস্থির থাকিতে পারে?" নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদি-ক্রিয়াও উত্তমরূপ সমাধা হইল। যিনি যত পারিলেন, লুচি ও সন্দেশ তুলিলেন, ও পুঁটলি বাঁধিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সভাস্থলেই বাসর ঘর হইল। বাসর ঘরে গান গাইবার নিমিত্ত সকলে একবাক্য হইয়া তাঁতিকে অনুরোধ করিলেন। পুলকে পুলকিত হইয়া, সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে তাঁতি সেই রাত্রিতে মনের সুখে গান করিলেন। শ্রোতারা একদৃষ্টে তাঁহার মুখভঙ্গিমা দেখিয়াই আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। গানের কণামাত্র কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। আমীরের অনুরোধে দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সে রাত্রিতে সাবধান হইয়াছিলেন। তুলা দিয়া সকলেই কাণ একবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। সে রাত্রিতে নৃত্যেরও অভাব হয় নাই, ভূত ভূতিনীরা দলে দলে কতই যে নাচিল, তাহা আর কি বলিব! প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মজলিস ভাঙ্গিল। তখন লুল্লু,—জান, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে ঘরে রাখিয়া আসিলেন। নগরবাসীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

১১শ পর্ব্ব—লেখক-দল! সাবধান।

ভূত ও ভূতিনী সকল, বিদায় হইবার পূর্ব্বে, আমীরকে বলিল,—"মহাশয়! আপনার সদাচারে আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যদি কোনও বিষয়ে আপনার উপকার করিতে পারি ত বলুন, আমরা বড়ই সুখী হইব।" আমীর বলিলেন,—"আমার উপকার করিতে যদি নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের বাসনা আমি পূর্ণ করিব। এখান হইতে চারি ক্রোশ দূরে যমুনার কূলে আমার অনেক ভূমি ছিল; তাহার আয় হইতে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমাদিগের সংসার হালে চলিত। সেই ভূমি এক্ষণে যমুনার জলপ্লাবনে একবারে বালুকাময় হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে তোমরা যদি বালুকা সব তুলিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।" ভূতেরা বলিল, "যে আজ্ঞে আমরা এই ক্ষণেই করিতেছি।" এই বলিয়া যত ভূত সেই মুহূর্ত্তে ভূমির নিকট যাইল এবং অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই সমুদয় বালি উঠাইয়া ফেলিল। ভূমি পূর্ব্বের মত উর্ব্বর ফলশালী হইল। তখন তাহারা আমীরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমীর কিন্তু গোঁগাঁকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তাহাকে বলিলেন,—"গোঁগাঁ! তুমি যাইও না। তোমার অস্থি মজ্জা সমুদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আফিম আর দুধ, এই দুই বস্তু নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে তোমার শরীর পুনর্গঠিত হইতে পারে। যে হেতু আফিম অতি অপূর্ব্ব পদার্থ, ইহা সেবন করিলে মানুষ যে বয়সে খায় সেই বয়সেই চিরকাল থাকে, শরীরের কোষ সমুদয় সত্বর ধ্বংস হয় না, ম্যালেরিয়া বিষ-জনিত জ্বর ইহার নিকটে আসে না। কি মনুষ্যের, কি ভূতের, ইহা সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অতএব তুমি লুল্লুর নিকট অবস্থিতি কর। চণ্ডু পান করিতে অভ্যাস কর।" গোঁগাঁ তাহাই স্বীকার করিল। এইরূপে আমীর স্ত্রীকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই লুল্লু গণ্য মান্য সকলের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একটু আধটু যাঁহারা নেশা করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি 'মা' বলিয়া ভিন্ন কথা কহিতেন না। চণ্ডুর মোহিনী শক্তি প্রভাবে তাঁহার বিকৃতি আকার ক্রমে সুকৃতি হইয়া উঠিল। নব্য না হউন, সত্য সত্যই তিনি একজন সভ্য ভব্য ভূত হইলেন। চণ্ডুর সহিত দুধ ঘি খাইয়া তাঁহার রং যথার্থই ফরসা হইয়া উঠিল। তবে তাঁহার দোষ এই, নেশাখোর ভিন্ন অপরের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। যাহা হউক, এত পোষ মানিয়াছিলেন যে, আমীর-রমণী তাঁহাকে দেখিয়া আর কিছুমাত্র লজ্জা বা ভয় করিতেন না। আমীরের অবস্থা ভাল হইলেও, লুল্লু তাঁহাকে গাড়ি-

ঘোড়া করিতে দেন নাই। তাঁহার যেখানে যাইবার আবশ্যক হইত, তিনি পিঠে করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার পিঠে চড়িয়া আমীর-রমণী কতবার বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। লুল্লুকে সর্ব্বদা এখানে সেখানে যাইতে হইত বলিয়া তিনি স্বর্ণকারের দ্বারা দুই খানি পাখা গড়াইয়া লইয়াছিলেন। কোথাও যাইতে হইলে ঐ দুই খানি পাখা পরিয়া উড়িয়া যাইতেন, তাহাতে তাঁহাকে দেখাইত ভাল, আর তাহা পরিয়া অনেক দূর যাইলেও শ্রম হইত না। একবার সমুদ্র দেখিতে আমীর-রমণীর বড়ই সাধ হইয়াছিল। লুল্লু এ কথা শুনিয়া বলিলেন, "তার ভাবনা কি? আমার পিঠে চড়। আমার মাথাটা ভাল করিয়া ধর, আমি সমুদ্র দেখাইয়া আনিতেছি।" এই প্রকারে তিনি আমীর-রমণীকে সমুদ্র দেখাইয়া আনিলেন।

ধন্য লুল্লু!

কিছুদিন পরে, গোঁগাঁর শরীর পুনরায় সবল হইলে, আমীর তাহাকে বলিলেন,—"গোঁগাঁ! আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা করিব। একখানি খবরের কাগজ খুলিব, তাহার সম্পাদক হইবে তুমি।" যথাসময়ে আমীর একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত,—গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না। সংবাদপত্র-খানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ হইল।

গোঁগাঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটী লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র আফিসেই তাঁর অদৃশ্য ভাবে গতায়াত আছে। অন্যান্য-কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোঁগাঁ তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকেরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন তাহার কথা আর কি বলিব! মিথ্যা বলিতেছি? পরের কথায় কাজ কি? আমার নিজের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াই পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। তাই বলি, লেখক-দল! সাবধান।*

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

* ভতের কথায়, ভতের অধিকার; মনুষ্য-সমাজের ইহার সহিত সম্পর্ক নাই। ইতি

ছাপাখানার ভূত।

মুখবন্ধ।

প্রিয় পাঠক! আগুসারা করিয়া লউন। অদ্য আমি হস্তীর প্রবন্ধ রচনা করিলাম। বুঝি বটে, এ রচনা সকলের রুচিকর হইবে না; কেন না, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" তাহা হউক, এ সংসারে হস্তিমূর্খও অনেক আছেন। হস্তী দেখিয়া থাকিতে পারেন অনেকেই; হস্তীর আকৃতি-জ্ঞানও অনেকেরই থাকিতে পারে; কিন্তু হস্তীর প্রকৃতি, লক্ষণ, গুণ, প্রভৃতির ভেদাভেদ-তত্ত্ব, অনেকেরই, অন্ততঃ মোটামুটি ভাবেও বিদিত নহে। হস্তী আদৌ দেখেন নাই, এমন লোকও আছেন। ইঁহাদেরই সর্ব্বাভিজ্ঞতাভিমান কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিদ্যা ধরা পড়িবার ভয়ে, ইঁহারাই এই সব রচনার নামে সর্ব্বাগ্রে শিহরিয়া উঠেন, এবং নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। এ সব সর্ব্বজ্ঞ পাঠকের জন্য অবশ্য এ প্রবন্ধ রচিত হয় নাই। যাহারা জীব-জগতের মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত এবং জড়-জগতের অত্যুচ্চ হিমাদ্রি-শেখর হইতে তুচ্ছ তৃণটী পর্য্যন্ত, সকল বিষয়েরই গূঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে বা বিদিত হইতে উৎসুক; এবং সকল ব্যাপারেই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা সৃষ্টিকর্ত্তার রচনাতত্ত্বের কতক কতক আভাসমাত্র পাইয়াও পুলক-কণ্টকিত-প্রাণে প্রেমানন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠেন, তাঁহাদের জন্যই এই প্রবন্ধ। মনুষ্য যেমন বুদ্ধি-বৃত্তিতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তেমনই হস্তীও দেহাদি-গঠনে আকার-প্রকারে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এ প্রকাণ্ড জীব সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে একখানি কাশীদাসী মহাভারত প্রস্তুত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলে সত্য সত্যই এতৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ আছে। হস্তীর কথা ছাড়িয়া দাও, এক ক্ষুদ্র "পঙ্গপাল" সম্বন্ধে যে সব বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক আছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। "পঙ্গপালের" প্রবন্ধে জন্মভূমির ১০।১২ পৃষ্ঠামাত্র অধিকার করিয়াই, বিষম ভাবিত হইয়াছিলাম। তবে সেবার পাঠকবর্গের অনুগ্রহে সে ভাবনা কতকটা দূর হইয়াছিল। সেই সাহসেই এবার হস্তীতে হস্তক্ষেপ করিলাম। কোথায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র "পঙ্গপাল" আর কোথায় শৈল-শিখরবৎ প্রকাণ্ড-দেহ হস্তী! ভরসা-স্থল কেবল পাঠকবর্গের অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। উপকরণ-সংগ্রহে সাধ্যমতে ত্রুটি করি নাই। এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিলেই শ্রম সার্থক হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—"হস্তীর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লাভ বা উপকার কি?" এতদুত্তরে কাতর-কণ্ঠে ও কর-যোড়ে বলি,—"অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করুন।" প্রবন্ধ অবশ্য সংক্ষিপ্ত-সারই হইবে,—প্রথমতঃ পাঠকের রুচি-ভেদ-ভয়ে; দ্বিতীয়তঃ জন্মভূমির স্থানাভাব-নিবন্ধন; তবুও অনুপাদেয় হইবে না, এমন ভরসা আছে।

সাহিত্য-সম্বন্ধ।

হস্তীর প্রবন্ধে আমাদিগের সাহিত্যিক পাঠক-বর্গ যে সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইবেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। যেহেতু 'হস্তী,' সাহিত্য-সংসারে, কাব্য-কাননের অলঙ্কার-কুঞ্জপুঞ্জে যতটা অধিকার লাভ করিয়াছে, ততটা অধিকার লাভ করিতে, আর কোন জীবই সক্ষম হয় নাই। উপমান, উপমেয়, উৎপ্রেক্ষা, উৎকর্ষ প্রভৃতিতে "হস্তী"রই সুপ্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন। শুনিয়াছি, ব্রহ্ম-বাক্য অপৌরুষেয় বেদেও হস্তীর উল্লেখ আছে। এ অধম শূদ্র লেখকের বেদে অধিকার নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগ লেখকের সাধ্যাতীত। বেদ ব্যতীত পুরাণ, তন্ত্র, নাটক, উপাখ্যান প্রভৃতিতে যথা-তথায়, নানা সম্বন্ধে, নানা নামে, নানা সংজ্ঞায়, নানা আখ্যায়িকায়, এই মহা-জীব "হস্তী" প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।

পুরাণের সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রকরণে, "হস্তী"র জন্মোৎপত্তি বিবরণ বিবৃত আছে। হস্তি-রাজ ঐরাবতের উৎপত্তি-তত্ত্ব কোন্ পৌরাণিক পাঠকই বা অবগত নহেন? সত্যযুগে দেবাসুরের সংগ্রাম-কালে সমুদ্র-মন্থনে যে সেই,—"শ্বেতবর্ণ চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত হস্তী" উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা কে না জানে? "গজ-কচ্ছপের" যুদ্ধ-সংবাদ নিশ্চিতই মহাভারত-পাঠকের স্মরণাতীত নহে। রামায়ণ অবশ্যই মহা-ভারতের পূর্ব্ব-বর্ত্তী গ্রন্থ। এই রামায়ণেই ঐরাবতের উল্লেখ পাইবে। সেই মদ-মত্ত কামাতুর "ঐরাবত"ই ত, পতিত-পাবনা ভগবতী ভাগীরথীর গতিরোধ করিতে গিয়া, উত্তাল-তরঙ্গ-রঙ্গ-বিক্রমে

বহু যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রহ্লাদ, হস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বাপরে রামকৃষ্ণের হস্তে "কুবলয়াপীড়" মরিয়াছিল। "ভগদত্তে"র হস্তী অদ্যাপি জীবিতাবস্থায় (প্রবহ) স্থিরবায়ুর উপর বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সব পুরাণ-বাক্য ব্যতীত পরবর্ত্তী সকল সাহিত্য-কাব্যেই "হস্তি"-মাহাত্ম্য বিবেচিত হইয়াছে। মনে হয়, "হস্তী"ই নাটক-উপাখ্যানের অঙ্গীভূত,—"হস্তী" না থাকিলে বুঝি, নাটক-উপাখ্যান সিদ্ধ হইত না। স্যার ওয়ালটর স্কটের নবেল পড়িলে, যেমন স্কটের সারমেয়-প্রিয়তাটুকু বুঝা যায়, কালিদাসের কাব্য-পাঠেও সেইরূপ কালিদাসের "হস্তি"প্রিয়তা উপলব্ধি হয়। "রঘু"র এমন একটী বোধ হয়, সর্গ নাই, যে সর্গে কোন না কোন প্রসঙ্গে বা উপলক্ষে, "হস্তী"র আবির্ভাব হয় নাই। হস্তীর লক্ষণ নির্ণয়, আকৃতি প্রকৃতির পরিচয়, ভ্রমণ-বিচরণের অবস্থা, আধি-ব্যাধির ব্যবস্থা সম্বন্ধে, অনেক পুরাণ-উপপুরাণে, অল্প-বিস্তারিত নানা কথারই উল্লেখ আছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদের পুরাণাদিতে, যাহা লিখিত হইয়াছে, হিন্দু পাঠকদিগের তাহা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। পশুতত্ত্ব-নির্ণয়ে ব্রহ্মবিদ্ ঋষিকুল যে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইহাতে তাহাই উপলব্ধি হইবে। আমরাও সর্ব্বাগ্রে তাহাই বিবৃত করিলাম।

নাম-সংজ্ঞা।

স্থূল কথা,—যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর, তাবৎই ভারতে "হস্তী" বিদ্যমান। এই ভারতের সংস্কৃত গ্রন্থনিচয়েই "হস্তি"-বিবরণ যেরূপ বিবৃত, তেমন আর কোথাও নাই। "হস্তী",—হস্তী নাম পাইল ভারতেই। হস্ত যাহার আছে; সেই হস্তী; সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্র মতে ইহাই ব্যুৎপত্তি। নামেও অলঙ্কার। "হস্তী"র "শুণ্ড"টী মানুষের হস্তবৎ,—তাই নাম হইল হস্তী। কেহ কেহ বলিতে পারেন,—"হস্ত যাহার আছে, সেই যদি "হস্তী" হইল, তবে মানুষ "হস্তী" হইল না কেন?" এ কথার উত্তরে অগ্রে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—"যে গমন করে, সেইত "বায়ু"; মানুষ গমন করে, মানুষ তবে "বায়ু" হইল না কেন?" ইহার উত্তর এই,—এইগুলি যোগরূঢ় শব্দ। সকল ভাষায়ই বোধ হয় এইরূপ যোগরূঢ় শব্দ আছে। ইংরেজিতে *Comforter* অর্থে, যে *Comfort* অর্থাৎ সুখ,—দেয়, কিন্তু *Comforter* বলিলে বুঝিতে হয়, পশমে-বুনা বা গরম কাপড়ে তৈয়ারি-করা সেই জিনিষটা, যেটা গলায় জড়াই। এখন আশা পাঠক বুঝিলেন, মনুষ্য "হস্তী" হইতে পারে না কেন; তবে কখন কখন কোন কোন মানুষ যে "হস্তী"-পদবাচ্য হইয়া থাকে, সেটা কেবল বুদ্ধির দোষে।* হস্ত আছে বলিয়া যেমন হস্তীর নাম হস্তী,—তেমনই দন্ত আছে বলিয়া "হস্তী"র আর একটী নাম "দন্তী"। এইরূপ এক একটী বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা বাহ্যাভ্যন্তরীণ গুণাগুণ লইয়া, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে হস্তীর বহু নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সকল নামের ব্যুৎপত্তি-তত্ত্ব প্রকাশের স্থান হইবে না; কেবল কোন্ কোন্ সংস্কৃত অভিধানে কি কি নামের উল্লেখ আছে, তাহাই প্রকটিত হইল। যাঁহারা সবেমাত্র সাহিত্যে সংসার পাতিয়াছেন, তাঁহাদের এ নামমালায় অনেকটা উপকার হইবে,—প্রয়োগ-নিয়োগের জন্য কথায় কথায় আর অভিধানের পাতা উল্টাইতে হইবে না; "সর্ব্বজ্ঞদে"র কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এখন নাম শুনুন,—

"দন্তী, দন্তাবলঃ, হস্তী, দ্বিরদঃ, অনেকপঃ, দ্বিপঃ, মতঙ্গজঃ, গজঃ, নাগঃ, কুঞ্জরঃ, বারণঃ, করী, ইভঃ, স্তম্বেরমঃ, পদ্মী। ইত্যমরঃ।

মতঙ্গঃ, মাতঙ্গঃ, পীলুঃ, বরাঙ্গঃ, পুষ্করী, জলকঙ্কঃ, মহামৃগঃ, স্তরমঃ, শূর্পকর্ণঃ, সিন্ধুরঃ, সামজঃ, কটী, অন্তঃস্বেদঃ, দীর্ঘমারুতঃ, বিলোমজিহ্বঃ, করটী, পিণ্ডপাদঃ, মহামদঃ, পেটকী, কটকী, কুম্ভী, নির্ঝরঃ। ইতি শব্দ রত্নাবলী।

সিন্দুরতিলকঃ, পঞ্চনখঃ, শৃঙ্গারী, করেণুঃ, কর্ণিকী, লিঙ্গী, সামযোনিঃ। ইতি জটাধরঃ।

---

* হাতী বড় বোকা, মহাকবি কালিদাস তাহা বেশ বুঝাইয়াছেন,—

"দৃষ্টি! যাসাং নয়নসুষমাং বঙ্গবারাঙ্গনানাং
দেশত্যাগঃ পরমকৃতিভিঃ কৃষ্ণসারৈরকারি।
তাসামেব স্তনযুগজিতাঃ কুম্ভিনঃ সন্তি মত্তাঃ
প্রায়ো মূর্খঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং তনোতি॥"

বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণসার, যুবতীর নয়ন-শোভা দেখিয়াই দেশত্যাগী; কিন্তু হস্তী এমনই বোকা,—সেই রমণীর পীনোন্নত পয়োধরের নিকট নিজ কুম্ভ পরাস্ত হইলেও তাহারা যখন তখন মাতিয়া উঠে। ইহাতেই বুঝা যায়, মূর্খের মানাপমান বোধ নাই।

রাজীবঃ, জলকাঙ্ক্ষঃ, লতালকা, পেকিসঃ।
ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।
দ্বিরদনঃ, করভী, বিষাণী, রদনী, মহাবলঃ, ভদ্রঃ, ক্রমারিঃ, ষষ্টিহায়নঃ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

হস্তীর জাতিভেদ।

হস্তীর জাতিভেদও আছে। সেই জাতি ভেদ চারি প্রকার। যথা,—

"ভদ্রো মন্দ্রো মৃগো মিশ্রশ্চতস্রো গজজাতয়ঃ।"
ইতি হেমচন্দ্রঃ।

বরাহ মিহির কৃত বৃহৎসংহিতা শাস্ত্রে এই চারি জাতির এইরূপ লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে ;—

১। ভদ্র।

"মধ্বাভদন্তাঃ সুবিভক্তদেহা
ন চোপদিগ্ধাশ্চ কৃশাঃ ক্ষমাশ্চ।
গাত্রৈঃ সমৈশ্চাপসমানবংশা
বরাহতুল্যৈর্জঘনৈশ্চ ভদ্রাঃ॥"

ভদ্র হস্তীর দন্তদ্বয়ের বর্ণ মধুর মত ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত ; দেহটী নাতি-বৃহৎ নাতি-ক্ষুদ্র ; স্থূলও নহে,—কৃশও নহে ; বহুভার-বহনে সক্ষম ; দেহাবয়বের গঠন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ; মেরুদণ্ড ধনুকবৎ ; এবং জঘনভাগটা (রাং) বরাহের মত।

২। মন্দ্র।

"বক্ষোঽথ কক্ষাবলয়ঃ শ্লথাশ্চ
লম্বোদরস্ত্বগ্ বৃহতী গলশ্চ।
স্থূলা চ কুক্ষিঃ সহ পেচকেন
সৈংহী চ দৃগ্মন্দ্রমতঙ্গজস্য॥"

মন্দ্র হস্তীর বক্ষঃস্থল এবং কক্ষ (বগল) শ্লথ (থল-থলে) ; উদর দোদুল্যমান (ঝোলা) ; স্কন্ধদেশ এবং চর্ম্ম ঘন (পুরু) ; পেট মোটা ; এবং চক্ষু দুইটী পেচকের মত, কিন্তু সিংহের মত জ্যোতির্ম্ময়।

৩। মৃগ।

"মৃগাস্তু হ্রস্বাধরবালমেঢ্রা-
স্তন্বঙ্ঘ্রি-কণ্ঠ-দ্বিজ-হস্ত-কর্ণাঃ।
স্থূলেক্ষণাশ্চেতি তথোক্তচিহ্নৈঃ
সঙ্কীর্ণনাগা ব্যতিমিশ্রচিহ্নাঃ॥"

মৃগ হস্তীর অধর, লাঙ্গুল এবং লিঙ্গ খর্ব্বাকৃতি ; পদ, গলদেশ, দন্ত, শুণ্ড এবং কর্ণ ক্ষুদ্র ; চক্ষুদ্বয় স্থূল।

৪। মিশ্র

"পঞ্চোন্নতিঃ সপ্ত মৃগস্য দৈর্ঘ্য-
মষ্টৌ চ হস্তাঃ পরিণাহমানম্।
একদ্বিবৃদ্ধাবথ মন্দ্র-ভদ্রৌ
সঙ্কীর্ণনাগোঽনিয়তপ্রমাণঃ॥"

মিশ্র হস্তীতে উপরোক্ত তিনপ্রকার হস্তীর কোন না কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

মৃগ হস্তীর উচ্চতা ৫ হাত ; দৈর্ঘ্য ৭ হাত ; এবং দেহের পরিমাণ ৮ হাত। মন্দ্র এবং ভদ্র হস্তীর উচ্চতা মৃগের অপেক্ষা ১ হাত, এবং প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য প্রত্যেকই দুই হাত অধিক। মিশ্র হস্তীর পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই।

ভদ্রের মদ*বর্ণ হরিৎ, মন্দ্রের পীত, মৃগের কাল এবং মিশ্রের মদ-বর্ণ মিশ্র।

গজারোহণের ফল।

বলা বহুল্য,—হস্তী আরোহণের জন্যই ব্যবহৃত। আরোহণের ফলাফলও বহুবিধ। বায়ু-প্রকোপ বৃদ্ধি হয় ; অঙ্গ-স্থৈর্য্য হয় ; এবং বল ও ক্ষুধা বাড়ে। যথা,—

"বাতকোপনম্। অঙ্গস্থৈর্য্যবলাগ্নিকারিত্বঞ্চ।"
ইতি রাজবল্লভঃ।

কামুকের সম্পর্ক পরিত্যাজ্য সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববিষয়ে। কামোন্মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠেও কদাপি আরোহণ করিও না। ইহ-পর কাল নষ্ট হইবে। ইহা শাস্ত্রের আদেশ।

"নারোহেৎ কামুকোন্মত্তং গজং রাজা কদাচন।
আরুহ্য কামুকং তস্য পরত্রেহ বিষীদতি॥"
ইতি কালিকাপুরাণে, ৮৯ অধ্যায়ঃ।

আরোহণ দর্শনাদির ফলাফল।

ঐন্দ্র-মিত্র-বরুণানিল-পুষ্যা-
চন্দ্র-তোয়-রবি-বারিজ-তারে।
সূর্য্য-শুক্র-গুরু-সোমজবারে
শ্রেয়সে ভবতি কুঞ্জরযানম্॥

* হস্তীর গণ্ডস্থান হইতে যৌবনকালে কোন কোন সময় যে এক প্রকার ঘর্ম্ম নির্গত হয় তাহাই মদ। বিশেষ বিবরণ পরে পাইবেন।

লগ্নে চরে শুভসমাশ্রিতবীক্ষিতে বা
চন্দ্রস্য দৃষ্টিরভিযানবিধৌ বিরুদ্ধা॥
সৌম্যে দিনে কর-নিশাট-বসু-শ্রবণ্য-
তোয়েশ-মৈত্রমদিতিশ্চ শুভগ্রহাহঃ।
স্যাৎ কুঞ্জরক্রয়ণ-দর্শন-দানকালঃ
শেষেষু দুঃখফলমার্কসুতেঽহ্নি চৈব॥

জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শতভিষা, স্বাতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, পূর্বাষাঢ়া,—এই সকল নক্ষত্রে; রবি, শুক্র, গুরু ও বুধবারে হস্তীতে গমন করা মঙ্গলের নিমিত্ত হয়।

মেষ, কর্কট, তুলা, মকর লগ্নে, শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে, যদি সেই শুভগ্রহযুক্ত বা শুভগ্রহ বীক্ষিত লগ্নে চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে গজাভিযান বিষয়ে অমঙ্গল হয়।

শুভদিনে হস্তা, মূলা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, শতভিষা, অনুরাধা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে এবং শুভগ্রহের বারে হস্তিক্রয়, হস্তিদর্শন ও হস্তিদান শুভপ্রদ। আর এতদ্ভিন্ন অপর সময়ে এবং শনিবারে ক্রয়াদি করিলে অমঙ্গল হয়।

হস্তীর প্রকার-ভেদ।*

হস্তীর ভেদ আটপ্রকার; তাহা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। (১) ঐরাবত, (২) পুণ্ডরীক, (৩) বামন, (৪) কুমুদ, (৫) অঞ্জন, (৬) পুষ্পদন্ত, (৭) সর্ব্বভৌম ও (৮) সুপ্রতীক। এই আটটী দিগ্‌গজ। ইহাদিগের বংশজাত বলিয়া হস্তী-জাতিরও আটপ্রকার ভেদ।

১। ঐরাবত-বংশ।

যে হস্তীগুলি সর্ব্বাঙ্গশুভ্র, সুদীর্ঘদন্ত বা শ্বেত পুষ্পের ন্যায় দন্তযুক্ত, লোমশূন্য, অল্পভোজী, বলবান্, অত্যন্ত বৃহৎ, স্বল্প ও পুষ্টলিঙ্গযুক্ত, সমীক অর্থাৎ সংগ্রাম সময়ে ক্রুদ্ধ, অন্য সময়ে নম্র, শীঘ্রজলপায়ী, প্রভূত অথচ উগ্র দান-বারি সম্পন্ন, বিস্তীর্ণ (অধিক কাল স্থায়ী) মদজলযুক্ত, লোম ও পুচ্ছে সূক্ষ্মতা-বিশিষ্ট, সেই হস্তীরাই ঐরাবতের বংশসম্ভূত। সেই হস্তীর মস্তকে বিশুদ্ধবর্ণযুক্ত ও সুগোল মুক্তা হয়। ইহারা রাজাদিগের অল্প পুণ্যে পৃথিবীস্পর্শ করে না। আর যুদ্ধকালে ইহাদিগের দন্ত ভগ্ন হইলেও পুনর্ব্বার তাহার প্ররোহ হয়।

২। পুণ্ডরীক-বংশ।

যে কুঞ্জরগণের সর্ব্বাঙ্গ কোমল, পুচ্ছদেশ দণ্ডাকৃতি নহে, গণ্ডদেশ খর; যাহারা সর্ব্বদাই মদস্রাবী সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ, দেবপ্রিয়, সর্ব্বভক্ষ, বলবান্, এবং যাহাদিগের দন্ত ও রসনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; সেই হস্তীরাই পুণ্ডরীক নামক দিগ্‌গজের বংশজাত। ইহাদিগের রেতঃ পদ্মের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট; ইহাদিগের মদজল ও বমন, অধিক হয় না। ইহারা জলপানে অত্যন্ত স্পৃহাবান্ হয় না এবং অত্যন্ত শ্রমেও ক্লান্ত হয় না। এই হস্তিগণ যাঁহাদিগের গৃহে থাকে, তাঁহারা সমস্ত পৃথিবীর শাসনে উপযুক্ত হন।

৩। বামন-বংশ।

যে হস্তীর সমস্ত দেহ অত্যন্ত কর্কশ ও খর্ব্ব; যাহারা কখন কখনও উন্মত্ত হয়, সর্ব্বদাই মদস্রাব করে, আহারের যোগে বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হয়; যাহারা জলপান করিতে অত্যন্ত স্পৃহয়ালু হয় না; যাহাদিগের গণ্ডস্থল অত্যন্ত লোমশ, দন্তদ্বয় বিরূপ, পুচ্ছ ও কর্ণ সূক্ষ্ম; পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহারাই বামন নামক দিগ্‌গজের বংশসম্ভূত।

৪। কুমুদ-বংশ।

যাহাদিগের দেহ দীর্ঘ, শুণ্ডদেশ অস্থূল ও দীর্ঘ; দন্তদ্বয় বিশ্রীক, দেহ সর্ব্বদাই মলযুক্ত, গণ্ডদেশ স্থূল ও বিবাদ করিতে যাহারা অত্যন্ত ইচ্ছুক; তাহারাই কুমুদ নামক দিগ্‌গজের বংশজাত। ইহারা অন্য হস্তীকে দর্শন করিবামাত্রই নিহত করে এবং মনুষ্যগণ ইহাদিগের নিকট প্রায়ই ঘেঁষিতে পারে না।

৫। অঞ্জন-বংশ।

যে হস্তী সকল স্নিগ্ধদেহ, অত্যন্ত জলকামী, সুবৃহৎ; যাহাদিগের দন্ত ও শুণ্ড ক্ষুদ্র, দন্তদ্বয় স্থূল, এবং শ্রম দুঃসহ; তাহারাই অঞ্জন নামক দিক্‌হস্তীর বংশজাত।

৬। পুষ্পদন্ত-বংশ।

যে হস্তী সকল সর্ব্বদাই রেতঃ ও মদজল পরিত্যাগ করে, যাহারা অনূপ (জলপ্রায়) দেশে উৎপন্ন হয়, যাহাদিগের পুচ্ছদেশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম; সেই অতিশয় বেগবিশিষ্ট হস্তীসকল পুষ্পদন্ত নামক দিক্‌কুঞ্জর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

* কেবলমাত্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। সংস্কৃত মূল প্রকাশের স্থানাভাব।

৭। সার্ব্বভৌম-বংশ।

যে কুঞ্জরগণ অত্যন্ত দীর্ঘদন্ত, বহুলোমযুক্ত, মহাপ্রমাণ, কর্কশদেহ, অধিক পথ ভ্রমণ করিলেও শ্রান্ত হয় না; যাহারা আহার ও পানে অত্যন্ত শক্তিমান্; মরুভূমিতে বিচরণশীল, যাহাদিগের দেহ বৃহৎ ও কর্কশ দন্তদ্বয় অনিপুণ (অকর্ম্মণ্য) কোমল অথচ শুক্লবর্ণ; ভক্ষণ অধিক, মূত্র ও পুরীষ অল্প, কর্ণদেশ বিস্তীর্ণ, রোম সকল ও গণ্ডদ্বয় ক্ষীণ; তাহারাই সার্ব্বভৌম নামক দিগ্‌গজের বংশ। এই হস্তী সকলেও বিশুদ্ধ মুক্তা জন্মিয়া থাকে।

৮। সুপ্রতীক-বংশ।

যাহাদিগের শুণ্ড দীর্ঘ, দেহ অসংহত (জড়-সড় নহে), বেগ অতিশয়; যাহারা সক্রোধ, বিষ্টব্ধকর্ণ (কাণ খাড়া); যাহাদের পুচ্ছ ও দন্ত ক্ষীণ; যাহারা সর্ব্বদা ভক্ষণকারী ও হস্তিনীপ্রিয়; যাহাদের গণ্ডদেশ বৃহৎ; গাত্রে সূক্ষ্ম লোম অধিক; তাহারাই সুপ্রতীকের বংশসম্ভূত। কাপ্য মুনি বলেন, এই হস্তীর মস্তকেই মহা-প্রমাণ মুক্তা অধিক জন্মিয়া থাকে।

একজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে) হইতে উৎপন্ন হস্তীকে শুদ্ধ বলে। শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট হস্তীর যে প্রকার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, ইহাতে সে সমস্তই থাকিবে। শুদ্ধ ব্রাহ্মণজাতীয় হস্তী হইতে যে হস্তী উৎপন্ন, অথচ ব্রাহ্মণ-জাতীয় হস্তীর লক্ষণযুক্ত, এবং যথাযথ বলবীর্য্যবান্, তাহাকে জারজ বলে। দুইটী দ্বিজাতীয় হস্তী হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাকে শূর বলে। ব্রাহ্মণজাতীয় ও জারজ হইতে যে হস্তী জন্মিয়াছে, তাহাকে উদ্দান্ত বলে। এই প্রকার পরস্পরের সংযোগে অনেক প্রকার হস্তীজাতির উৎপত্তি হয়, যিনি এই হস্তী-জাতির ভেদ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনিই রাজার পাত্র (অমাত্য) হইতে পারেন।

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিভেদে হস্তী চারি প্রকার।

যে হস্তী বিশাল-দেহ, পবিত্র ও অল্পভোজী, সেই হস্তী ব্রাহ্মণজাতীয়।

যাহারা বলিষ্ঠ, বিশালদেহ, বহুভোজক ও ক্রুদ্ধ, তাহারাই ক্ষত্রিয়জাতীয়।

গুণবান্ হস্তী।

যেমন রত্ন, খড়্গ, স্ত্রী ও অশ্ব সকল গুণ দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ হস্তীও গুণ দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে

উৎকৃষ্ট হস্তীর দ্বাদশবিধ ভেদ, যথা;—১ রম্য, ২ ভীম, ৩ ধ্বজ, ৪ অধীর, ৫ বীর, ৬ শূর, ৭ অষ্টমঙ্গল, ৮ সুনন্দ, ৯ সর্ব্বতোভদ্র, ১০ স্থির, ১১ গম্ভীরবেদী, ১২ বরারোহ।

ভোজ বলিয়াছেন;—যে হস্তী বিভক্তদেহ (স্কন্ধে মুণ্ডে শুণ্ডে পাদে জড়-সড় নহে), পুষ্ট, সুদন্ত, বৃহৎ ও তেজস্বী, তাহাকে রম্য বলে; ইহারা অত্যন্ত সম্পত্তিবর্দ্ধক। ১

অঙ্কুশাদি-প্রহারেও যাহার কষ্ট হয় না; সেই শুদ্ধ হস্তীকে ভীম বলে, ইহা রাজার সর্ব্বার্থ-সাধক। ২

যে হস্তীর শুণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটী রেখা দৃষ্ট হয়, সেই শুদ্ধ হস্তীকে ধ্বজ বলে; ইহা সাম্রাজ্য ও দীর্ঘজীবনদায়ক। ৩

যে কুঞ্জরের কুম্ভদ্বয় পরস্পর সমান, খরাকার, আবর্ত্তবিশিষ্ট ও আবর্ত্তস্থানে উন্নত; সেই হস্তীকে অধীর বলে; ইহা রাজাদিগের বিনাশক। ৪

যাহার পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া নাভি পর্য্যন্ত আবর্ত্ত থাকে, সেই পুষ্টদেহ ও বলশালী হস্তীকে বীর কহে; ইহাতে রাজাদিগের অভিলষিত সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৫

যে হস্তীর পরিমাণ বৃহৎ, দেহ পরিপুষ্ট, দন্ত ও গণ্ডদেশ মনোহর, আহার করিলেই পরিশ্রম হয় ও যাহার অতিশয় বল, সেই হস্তীকে শূর বলে; ইহাতে রাজার লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়। ৬

যাহার দন্তযুগল, নখ ও পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ; যাহার গাত্রে শ্বেতবর্ণ রেখা থাকে; যাহার কুম্ভ, চক্ষু ও পুংচিহ্ন রক্তবর্ণ; সেই হস্তীকে অষ্টমঙ্গল বলে। এই অষ্টমঙ্গল নামক হস্তী যাঁহার গৃহে বর্ত্তমান থাকে, তিনি সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল ভোগ করেন। এই হস্তী যথায় বাস করে, তথায় অরিষ্ট বা অনীতি থাকে না এবং তথা হইতে শতযোজন পর্য্যন্ত অমঙ্গল সকল বিনষ্ট হয়। কলিযুগে অল্পপুণ্য নরপতিগণ ইহা লাভ করিতে সমর্থ হন না। ৭

যে হস্তীর মাংসভেদ করিলে কি রক্তস্রাব হইলে অথবা মাংস কাটিয়া লইলেও জানিতে পারে না অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না, তাহাকেই গম্ভীরবেদী হস্তী কহে।

দন্তদ্বয়, শুণ্ড, কুম্ভদ্বয়, দেহ ও গণ্ডদ্বয়ে বা গণ্ড-মধ্যে আবর্ত্ত থাকিলে শুভলক্ষণাক্রান্ত হস্তী হয়।

যে সকল হস্তীর গণ্ডদেশ নিরন্তর মদস্রাবে পরিপ্লুত থাকে, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশেও (ডাঙ্গশে) যাহাদিগকে

নিবারিত করিতে কষ্ট হয়, যাহারা হস্তী দেখিলেই রোষান্বিত হয়, যাহারা নূতন মেঘের ন্যায় শব্দকারী ও গম্ভীর; সেই হস্তীরা রাজাদিগের সমস্ত সুখদায়ক হইয়া থাকে।

দুষ্ট হস্তী।

দুষ্ট হস্তী বিংশতি প্রকার;—যথা;—১ দীন, ২ ক্ষীণ, ৩ বিষম, ৪ বিরূপ, ৫ বিকল, ৬ খর, ৭ বিমদ, ৮ ধ্বাপক, ৯ কাক, ১০ ধূম্র, ১১ জটিল, ১২ অজিনী, ১৩ মণ্ডলী, ১৪ শ্বিত্রী, ১৫ হতাবর্ত্ত, ১৬ মহাভয়, ১৭ রাষ্ট্রহা, ১৮ মুষলী, ১৯ ভালী, ২০ নিঃসত্ত্ব। ভোজরাজ ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যথা;—যাহার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ও প্রভাশূন্য এবং দন্ত অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র, সেই হস্তীকে দীন বলে, এই হস্তী গৃহে থাকিলে রাজগণ দরিদ্র হন। ১

যাহার শুণ্ড খর্ব্ব, পুচ্ছ বৃহৎ ও নিশ্বাস বেগহীন, সেই নাগকে ক্ষীণ বলে; ইহা যাহার গৃহে থাকে, সেই ব্যক্তি ধনসম্পত্তি দ্বারা ক্ষীণ হয়। ২

যাহার কুম্ভ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ বা পার্শ্বদ্বয় পরস্পর অসমান; সেই হস্তীকে বিষম কহে; ইহা সর্পের ন্যায় ক্ষয়কারক। ৩

যাহার স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ক্ষীণ ও পশ্চাৎভাগ স্থূল, তাহাকে বিরূপ হস্তী বলে; ইহাতে রাজার রাজ্যচ্যুতি ও ধনক্ষয় হয়। ৪

অনেক ভোগেও যাহার মদক্ষরণ হয় না এবং যুদ্ধের উপক্রম করে না; তাহাকে বিকল বলে; এইরূপ হস্তীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়। ৫

যাহার শরীরস্থ খরতা স্বাভাবিক বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, এবং দন্ত ও শুণ্ড হ্রস্ব; তাহাকে খর বলে, ইহা বর্ত্তমান থাকিলে কুলক্ষয় হয়। ৬

একেবারেই যাহার মদস্রাব হয় না বা মদস্রাব অত্যন্ত অকালে উৎপন্ন হয়, যে হস্তী অত্যন্ত বিরূপ ও বিবশ, সেই হস্তীকে বিমদ বলে; ইহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৭

যে হস্তীর পরিমাণ লঘু; অঙ্গ সকল ক্ষীণ; শুণ্ড, শিরা ও উদর হ্রস্ব; যে হস্তী ব্যগ্রভাবে অবিশ্রান্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করে; যাহার নেত্রদ্বয়ে অনবরত মল নির্গত হয়; ত্রিক (কোমর) ও পুচ্ছের অগ্রভাগে আবর্ত্ত বা মণ্ডল থাকে; যে হস্তীর লিঙ্গ নিশ্চেষ্টবৎ সর্ব্বদা বহির্গত থাকে; তাহাকে ধ্বাপক হস্তী বলে, ইহা হস্তীরামধ্যে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। যিনি শাশ্বতী ভূতি ও শরীরের আরোগ্য অভিলাষ করিবেন, সেই রাজগণ এই ধ্বাপক হস্তীকে দর্শনও করিবেন না। ৮

যে হস্তীর শঙ্খদেশ অর্থাৎ ললাটস্থ অস্থিফলকদ্বয় ভগ্ন, যাহার স্কন্ধদেশ অতিগুচ্ছক (খাঁজকাটা) সেই হস্তীকে কাক বলে; ইহা প্রভুর মৃত্যুকারক। ৯

যে হস্তীর দন্তযুগল বিষম, ললাটাস্থিগত, শুণ্ডবিরোধী, স্বয়ং-ভিন্ন বা বিদীর্ণ এবং শূন্যান্তর (অগ্রভাগে পরস্পর যুক্ত); সেই গজাধমকে ধূম্র বলে; ইহাতে স্বামীর ব্যাধি হয়। ১০

যে হস্তীর মস্তকজাত কেশ সকল কর্কশ, রুক্ষ ও জটার ন্যায় আকারধারী, তাহাকে জটিল হস্তী বলে; ইহাতে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। ১১

যাহার স্কন্ধ বা গাত্র চর্ম্মলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অজিনী নামক হস্তী বলে; ইহাতে রাজার পৃথিবীক্ষয় ও ধনক্ষয় হয়। যদি নিজে লক্ষ্মী-আদি অভিলাষ কর; তবে ইহাকে স্পর্শ বা দর্শনও করিও না। ১২

যে হস্তীর দেহে একটী, দুইটী বা অনেকগুলি মণ্ডল* থাকে, সেই মণ্ডলগুলি যদি বিরূপ বা উদ্গাত অর্থাৎ উন্নত হয়, তবে সেই হস্তীকে মণ্ডলী কহে; ইহা কুলনাশক। ১৩

সেই মণ্ডলগুলি যে হস্তীর শ্বেতবর্ণ হয়, তাহাকে শ্বিত্রী বলে; ইহা ধননাশক। ১৪

যে হস্তীর হৃদয়ে, উদরে, ত্রিকদেশে, পুচ্ছমূলে গুহ্যদেশে, লিঙ্গে, বা পদে আবর্ত্ত সকল নষ্ট হয়, তাহাকে হতাবর্ত্ত বলে; ইহা রাজাদিগের লক্ষ্মীবিনাশক এবং নরপতিকে যোগী, প্রবাসী ও উপদ্রববিশিষ্ট করে। ১৫

যে হস্তীর গমনকালে গুলফদ্বয় মুহুর্মুহু পরস্পর সংঘর্ষণ হয়, তাহাকে মহাভয় বলে। এই হস্তী যদি অন্যান্য গুণসমূহ দ্বারাও যুক্ত হয়, তথাপি ইহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু মহাভয় হস্তী যাঁহার গৃহে থাকে, তাঁহার রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্য, মৈত্র, পত্নী ও প্রজা দৃষ্টিমাত্রেই বিনাশিত হয়; ইহা যে দেশে অবস্থান করে, তত্রত্য লোকগণ বিনষ্ট হয় এবং সেই স্থানে বজ্রভয়, ব্যাধিভয়, ও অগ্নিভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৬

যে হস্তী অত্যন্ত তাড়িত হইয়াও এবং পদও

* মড়াই। লোমের আবর্ত্ত। মনুষ্যের মস্তকস্থ কেশরাশির মধ্যভাগে মণ্ডলাকারে যে চিহ্ন দেখা যায় তাহাই মড়াই।

গমন করে না, যাহার পৃষ্ঠ হইতে উদর দিয়া গোল-ভাবে রক্তবর্ণ রেখা থাকে এবং বিন্যস্ত অগ্রিম পদ-স্থানে পশ্চাৎ পদ পতিত হয়, তাহাকে রাষ্ট্রহা বলে; এই হস্তী সর্ব্বগুণযুক্ত হইলেও ইহাকে পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু এই হস্তী বিদ্যমান থাকিতে ঐশ্বর্য্যাভিলাষী রাজগণ ইহাকে স্বীয় রাষ্ট্র হইতে তাড়াইয়া দিবেন। যদি অজ্ঞানবশতঃ স্বীয় রাজ্যের শেষভাগেও রক্ষা করেন, তবুও রাজ্যের বিনাশ হয়। ১৭

যাহার পদ সকল বিষম, দন্তদ্বয় পরস্পর অসমান, পঞ্জরসকলের মধ্যে একটী, দুটী বা সমস্তগুলিই ভগ্ন; যাহার দন্তদ্বয় নড়িতে থাকে অথবা প্ররো-হিত হয় না, এবং যাহার কক্ষদ্বয় শ্বেতবর্ণ; সেই গজাধমকে মুষলী বলে। ইহাতে রাজ্য, দুর্গ, সৈন্য ও মন্ত্রিগণের ক্ষয় হয়, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিবে। ১৮

যে হস্তীর ললাটদেশের চর্ম্মখণ্ড অতিশয় কর্কশ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকে ভালী হস্তী বলে; ইহা স্বামীর কুলক্ষয় ও ধনক্ষয়-কারক। ১৯

যে হস্তী পুষ্টদেহ, বিশাল, মনোহর-দন্তযুক্ত, সংকৃত ও শুভ হইলেও যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, সেই গজাধমকে নিঃসত্ব বলে। যত প্রকার গজদোষ উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে এই দোষই সর্ব্বা-পেক্ষা প্রধান; যেহেতু এই দোষ দ্বারাই সমগ্র গুণগ্রাম নিশ্চয়ই তৃণতুল্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। ২০

পালকাপ্য বলিয়াছেন;—দন্ত, দেহ ও শুণ্ডের ক্ষীণতা, দন্তাদির বৈষম্য, মস্তকের ক্ষীণতা ও অধোভাগের পুষ্টি; এই গুলিই হস্তীর দোষ।

গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন;—যে সকল হস্তীর দন্ত, দেহ, গণ্ড ও শুণ্ড ক্ষীণ; যাহাদিগের দেহ দুর্ব্বল, পুচ্ছ গুরু ও দীর্ঘ; এবং যাহারা বল্যাদি-গুণশূন্য, সেই হস্তী সকল হিতের নিমিত্ত অভিমত হইলেও রাজাদিগের দর্শনযোগ্য নহে। যে হস্তী, কখনই মদ-জল ত্যাগ করে না, যাহার মস্তকদেশ কৃশ, যে হস্তী অনেক ভোজন করিলেও দুর্ব্বল এবং অন্যান্য নিক-টস্থ শত্রুকে নিহত করিতে অভিলাষ করে না, রাজগণ সেই হাতীকে দর্শনও করিবেন না।

রাজগণ দোষদুষ্ট হস্তীকে কখনই দর্শন করি-বেন না, ইহাদিগকে পরকীয় রাজ্যে গচ্ছিত রাখি-বেন বা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিবেন অথবা শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে কি বিশুদ্ধ গণককে প্রদান করিবেন। যদি রাজা কোন সময়ে দুষ্ট হস্তীকে অবলোকন করেন, তবে ব্রাহ্মণকে, একশত শৃঙ্গী (গরু) দান করিবেন অথবা নগরীকে, আপনাকে বা পুত্রকে নীরাজিত করিবেন। দেবসূক্ত মন্ত্র দ্বারা অযুত হোম করিবেন কিংবা তৎপ্রতীকারের নিমিত্ত অগ্নিতে তিলহোম করিবেন।

ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে যে চারি প্রকার হস্তী আছে, তাহারা ব্রাহ্মণাদি চারিজাতীয় রাজার পক্ষে বাহন-বিষয়ে যথাক্রমে শুভপ্রদ।

মনুষ্যের যে সকল ব্যাধি আছে, হস্তীদিগেরও সেই সকল ব্যাধিই হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা মনুষ্যের ন্যায় কর্ত্তব্য; কেবল মাত্রার (ঔষধের পরিমাণের) আধিক্য হইবে।*

বৈদেশিক সংজ্ঞা।

হস্তীর সংস্কৃত সংজ্ঞা উপরে বিবৃত হইয়াছে; বাঙ্গালায় অবশ্য এই সবই প্রযোজ্য, বিদেশীয় সংজ্ঞাগুলি শুনিয়া রাখা ভাল;—

সেন,—ব্রহ্ম-ভাষা; ওলিফান্ট,—ডচ্; এলিফাস্—গ্রীক্; এলিফান্টিস,—ইতালীয়; এলিফাস্ বা এলিফান্টুস্,—লাটিন; গজ বা বেরাম,—মালয়; ফেল,—পারস্য; পিল,—পস্তু; ফ্রাইয়েল্,—নরওয়ে-সুইডেন; এলিফান্টি,—স্পেন গলা,—সিংহলী; আনি,—তামিল; জেনি বা জেনুগ,—তৈলঙ্গ। ইংরেজি, ফরাশি এবং জার্ম্মাণ ভাষায় হস্তীকে “এলফেন্ট” বলে।

সংস্কৃতে “হস্তী” শব্দের ব্যুৎপত্তিতত্ত্ব লইয়া কোন গোল নাই; ইংরেজির “এলিফেন্টে”র ব্যুৎ-পত্তি লইয়া নানা গোল আছে। স্যর, জে, ই, টেনান্ট অনুমান করেন,—হিব্রু “এলেফ্” (বলদ) হইতে এলিফেন্ট উৎপন্ন।† পিকটেক বলেন,—“ঐরাবত বা ঐরাবণ শব্দ হইতে ‘এলিফেন্টে’র ব্যুৎপত্তি।” বর্টন বলেন,—“সংস্কৃত পিলু হইতে ইহার উৎপত্তি; কিংবা এখন যাহা দেখিতেছি, পস্তুর পিল—পারস্যে ফেল, তাহাই প্রাচীন পারস্যে ‘ফিল’ ছিল; ‘ফিলে’র পূর্ব্ব আরেবিক ‘এল’

---

* হস্তীর চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

† *Tennent's Sketches of Elephas Sumatranus.*

এসিয়ার হস্তী।

উপসর্গযুক্ত হইয়া গ্রীকে দাঁড়াইয়াছে,—'এলিফাস্'।

এসব ভাষতত্ত্ব লইয়া আমাদিগের আর গোলযোগ করিবার প্রয়োজন নাই; মীমাংসা না করিলেও কিছু এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে ক্রটি হইবে না। বাঙ্গালী পাঠক বাঙ্গালা বুঝেন, আমরাও বাঙ্গালায় লিখিতে বসিয়াছি; সুতরাং বাঙ্গালা হস্তী শব্দটা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে। এখন হস্তিচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

হস্তীর আকর।

হস্তীর আকর কেবল এসিয়া এবং আফ্রিকা। দুই স্থানেই হস্তীর আকার ও গঠন-গত ভেদ আছে। এই দুই প্রকার হস্তীর ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রদর্শিত হইল। আভ্যন্তরিক গঠন-প্রণালীর তারতম্যও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা স্থানান্তরে তাহার পর্য্যালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। বড় বড় প্রাণি-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ হস্তীর অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া যে তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তৎপর্য্যালোচনাতেও প্রয়াস পাইব।

এসিয়ার মধ্যে সিংহল, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রদেশ, মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্ব্বদ্বীপ পুঞ্জের বড় বড় দ্বীপের পার্ব্বত্য এবং জঙ্গলময় ভূভাগেই বনচর হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়: সিংহলে ৭।৮ হাজার ফিট ঊর্দ্ধ এবং দাক্ষিণাত্যে ৪.৫ হাজার ফিট ঊর্দ্ধ পর্ব্বতশৃঙ্গে হস্তীর দল বিচরণ করিয়া থাকে। ভারতের নিম্নলিখিত স্থানই হস্তীর জন্য প্রসিদ্ধ;—

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ এবং পশ্চিমভাগ; পূর্ব্ব হিমালয়ের পদ-প্রান্তস্থ বন-জঙ্গল, নেপাল, ত্রিপুরা, এবং চট্টগ্রাম।*

এই সমুদয় স্থানের হস্তীদিগের মধ্যে আবার আকার-গঠনের তারতম্য আছে। এমন কি, এক স্থানের হস্তিযূথে, প্রকার এবং প্রকৃতিতে অনেক প্রকারই প্রভেদ দেখা যায়।

সচরাচর হস্তীদের ১৮ কিংবা ২৪ বৎসরে যে উচ্চতা হয়, তাহার পর তাহা অপেক্ষা আর প্রায় বেশী হয় না। স্কন্ধদেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উচ্চতা ৭ হইতে ১০ ফিটে দাঁড়ায়। সম্মুখের পা'টা দড়ি দিয়া

---

* "অথৈষাং প্রাচ্য-কারূষ-দশার্ণ-মার্গণেয়ক-কালিঙ্গকা-পরান্তিক-সৌরাষ্ট্র-পঞ্চনদাখ্যানি অষ্টৌ বনানি বাসস্থানানি।"

পরাশরসংহিতা।

এই সকল স্থানের ব্যাখ্যা (আধুনিক নামের সহিত মিল) করিতে গেলে, পরাশরসংহিতার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিতে হয়; কিন্তু জন্মভূমিতে তত স্থান নাই। কাজেই তাহার উল্লেখ করিলাম না। বৃহস্পতি সংহিতাতেও ঐরূপই আছে।

ইহার মাপিলে, যতটা হয়, ততটাই হস্তীর খাড়াই। সিংহলের হাতী সচরাচর ৯ ফিট উচ্চ হয়, তবে কোন কোনটা ৯ ফিট ছাড়াইয়াও যায়। জাপানে একবার একটা হাতী ধরা পড়ে, সেটা উচ্চদিকে ১২ ফিট ১ইঞ্চ। অনেক মানুষ যেমন বয়সের চাড়ি করিয়া থাকে, অনেক মাহুতও হাতীর উচ্চতা সম্বন্ধে ভাঁড়াভাঁড়ি করে। যত উচ্চ বলিবে, বীরত্বের গরিমা তদনুসারে বাড়ে কি না? মুর্শিদাবাদ-নবাবের একটা মাহুত প্রায়ই বলিত,—"আমি যে হাতিটা চালাই, সেটা ১৮ ফিট উঁচু।" একজন সাহেব কিন্তু মাপিয়া দেখেন, সেটা ১০ ফিটের বেশী নহে। হস্তী জন্মকালে প্রায় ১॥ হস্ত উচ্চ হয়।

ভারত এবং সিংহল অপেক্ষা অন্যান্য উপদ্বীপে হস্তিসংখ্যা অনেক অধিক। এ সব স্থানে ইহাদের বিচরণপক্ষে কোন বিশেষ বিঘ্ন-ব্যাঘাত হয় না। হস্তীর দল এই সব স্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পায় বলিয়া, ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রুস-জার "পিটর দি গ্রেটে"র সময় পারস্যের সাহা সেন্ট-পিটার্সবর্গে যে হস্তিকঙ্কাল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; তাহা প্রায় ১২ হাত উচ্চ। ইহা অপেক্ষা উচ্চ হস্তী হইতে পারে কি না এ পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—হাতী জন্মকালে প্রায় ১॥০ হাত উচ্চ হয়। একজন সাহেব একটী ভারতীয় হস্তি-শাবককে সাত বৎসর কাল পুষিয়াছিলেন তিনি সাত বৎসরে তাহার নিম্নলিখিত রূপ উচ্চতা নিরূপণ করিয়াছিলেন,—

১ম বৎসর—৩ ফিট ১০ ইঞ্চি; ২য় বৎসর,—৪ ফিট ৬ ইঞ্চি; ৩য় বৎসর,—৫ ফিট; ৪র্থ বৎসর,—৫ ফিট ৫ ইঞ্চি; ৫ম বৎসর,—৫ ফিট ১০ ইঞ্চি; ৬ষ্ঠ বৎসর,—৬ ফিট ১॥ ইঞ্চি, ৭ম বৎসর,—৬ ফিট ইঞ্চি। প্রথম বৎসর বাড়িয়াছিল,—১১ ইঞ্চি, তারপর প্রতি বৎসর এইরূপ বাড়িয়াছিল, ৮, ৬, ৫, ৫, ৩॥ এবং ২॥ ইঞ্চি।

অনেকেরই বিশ্বাস, ৭ ফিট উচ্চ হস্তী কার্য্যের যোগ্য। ৯।১০ ফিট উচ্চ হস্তী যুদ্ধার্থ শিক্ষিত হইয়া থাকে। টিপু-সুলতানের সময়, ক্যাপ্তেন সিডনি যে সব হস্তী পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ প্রায়ই ৯॥০ ফিট উচ্চ ছিল। লাঙ্গুল হইতে মুখ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য, ১৫ ফিট ১১ ইঞ্চি লম্বা; এমন হাতীও দেখা গিয়াছে।

হাতীর ষ্কন্ধদেশে কুঁজ দেখিয়া অনেকেই হাতীর প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব নির্ণয় করিয়া লইতে পারে। কুঁজ কমিয়া গেলে বুঝা যায়, হাতী বৃদ্ধ হইয়াছে।

সিংহলের হস্তী অপেক্ষা বাঙ্গালার হস্তী অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের হস্তী আজ কাল ইংরেজ-রাজের যুদ্ধকার্য্যে সবিশেষ উপযোগী। চট্টগ্রামের দক্ষিণ অংশ, ব্রহ্ম এবং পেগুরাজ্যের হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই জন্য ১৭০০ খৃষ্টাব্দে যখন ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের অন্তর্ভূত ছিল, তখন ইংরেজের সামরিক বিভাগে হাতী যোগাইবার ভার দেওয়া হয়, ঠিকাদারদের হাতে। ঠিকাদারদের উপর এমনই কঠোর আদেশ ছিল যে, ত্রিপুরার উত্তর অঞ্চলের কোন হস্তী যেন সামরিক বিভাগে প্রেরিত না হয়। ইহাতেই আমরা অনুমান করি, উষ্ণ প্রদেশের জলবায়ু হস্তীর বলবিধানে পক্ষে বড়ই উপযোগী; এবং এইখানকার হস্তী বৃহৎ, উৎকৃষ্ট ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। এইখানকার হস্তী আবার নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে যাইলে, হতবল এবং হতশ্রী হইয়া পড়ে। সিংহলের হস্তী অপেক্ষা বাঙ্গালার হস্তী উৎকৃষ্ট হইলেও এখনও কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, সিংহলের হস্তী বাঙ্গালার হস্তী অপেক্ষা অনেকটা উৎকৃষ্ট। ইহার কারণ এই, পূর্ব্বে মালাবর এবং কুর্গরাজ্যের মধ্যে যাঁহারা হস্তী দেখিতেন, ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামের হস্তী দেখিবার তাঁহাদের সুবিধা হইত না। মালাবর অঞ্চলের হস্তী সিংহলের হস্তী অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। এইজন্যই অনেকের এখন ধারণা আছে, সিংহলের হস্তী, বাঙ্গালার হস্তী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সিংহলের জঙ্গলে অপরাহ্ণ চারিটার সময় হস্তী দলে দলে বাহির হয়। তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে বিচরণ করিয়া, রাত্রি ৭॥ সাড়ে সাতটার সময় গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে, ততক্ষণ তাহাদের আক্রমণের ভয় থাকে, একবার বনমধ্যে প্রবেশ করিলে কিন্তু তাহাদের কোন ভয়ই থাকে না। "হস্তিনী"রা ১৬ বৎসর বয়সে সন্তান ধারণে সক্ষম হয় এবং দুই বৎসর কাল গর্ভ ধারণ করে। হস্তীর পরমায়ু ১২০ বৎসর।* বেকার সাহেব বলেন, হস্তী ১৫০ শত

* "নরা গজা বিশে শ, তার অর্দ্ধেক ঘোড়ায় যা।
বাইশ বলদা তের ছাগল, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হেড়ল॥"
খণার বচন।

বৎসর বাঁচে। সিংহলের ৩০০ শত হাতীর মধ্যে একটী হাতীর দাঁত দেখিতে পাইবে। ছোট ছোট হস্তীরই দন্ত দেখা যায়। হস্তী প্রায় ৮টী করিয়া দল বাঁধিয়া যায়; অনেক সময় এক এক দলে ৫০ হইতে ৮০টী পর্য্যন্ত থাকে। প্রত্যেক দলে হস্তিনীর সংখ্যা অধিক; অনেক সময় কিন্তু দলে একটীও হস্তী থাকে না। আবার কখন কখন কেবল হস্তীর দলই দেখা যায়। হস্তিনী অপেক্ষা হস্তী বৃহৎ; এবং ভয়ানক দুর্দ্ধর্ষ।

হস্তীর শুণ্ডস্থ ছিদ্রদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, মেঢ্র ও নেত্রদ্বয়, এই সপ্ত স্থান দিয়া মদস্রাব হয়।* মদস্রাবী হস্তীই মত্ত হইয়া উঠে। সে মদস্রাবে কুসুম-সুরভি নির্গত হয়। সে সুরভিভারে দিঙ্মণ্ডল প্রফুল্লিত হইয়া পড়ে। মধুকরকুল গন্ধান্ধ হইয়া পড়িয়া,—ঝাঁকে ঝাঁকে মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গের দিকে ধাবিত হয়। সংস্কৃতকাব্যসমূহে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইবেন।

রঘুবংশে দেখিবেন;—

"অথোপরিষ্টাদ্‌ভ্রমরৈর্ভ্রমদ্ভিঃ
প্রাক্‌সূচিতান্তঃসলিলপ্রবেশঃ।
নির্দ্ধৌতদানামলগণ্ডভিত্তি-
র্ব্বন্যঃ সরিত্তো গজ উন্মমজ্জ॥"

অর্থাৎ,—সেই নদীপ্রবাহ (নর্ম্মদা) হইতে এক বন্যগজ সমুত্থিত হইল। উত্থানবেগে উহার মদধারা প্রক্ষালিত ও গণ্ডস্থল একান্ত নির্ম্মল হইয়াছিল এবং উত্থানের পূর্ব্বে মদগন্ধাকৃষ্ট সলিলের উপরিভাগে বিচরণশীল ভ্রমরসমূহ কর্ত্তৃক জলমধ্যে তাহার প্রবেশ সূচিত হইয়াছিল। মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গের মদগন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তিগণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ইহারও পরিচয় রঘুবংশের এইখানে পাইবে।

গ্রীষ্মকালে হস্তীরা দলে দলে পুষ্করিণীর জলে নিমজ্জিত হয়।

"করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং
শুচিব্যপায়ে বনরাজিপল্বলম্।"

রঘুবংশ, ৩।৩।

* "করাৎ কটাভ্যাং মেঢ্রাচ্চ নেত্রাভ্যাঞ্চ মদস্রুতি" ইতি পালকাপ্যে।

সকল হস্তীরই দুইটী করিয়া দাঁত থাকে না। যাহাদের একটী দন্ত, তাহাদিগকে একদন্তী কহে।

শ্বেত হস্তী।

ব্রহ্ম এবং শ্যাম রাজ্যে শ্বেত হস্তী পূজিত হইয়া থাকে। শ্বেত হস্তীর বর্ণ ঠিক সাদা। "আলোয়ানে"র মত। এই জন্য ব্রহ্ম ও শ্যাম রাজ্যের অন্যতম উপাধি "শ্বেত-হস্তি-রাজ"। শ্যামবাসীরা মনে করে, শ্বেত হস্তীর পালনে রাজার অর্থবৃদ্ধি এবং রাজ্যের উন্নতি হয়। এই জন্য তথায় শ্বেত হস্তীর প্রকৃত পক্ষে পূজা হইয়া থাকে। শ্বেত হস্তীর প্রকৃতই রাজ-ভোগ। সদাই মাল্য-চন্দনে চর্চ্চিত এবং স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। রাজা কখন শ্বেত হাতীর উপর আরোহণ করেন না। শ্বেত হস্তী অতি দুষ্প্রাপ্য ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ একটী শ্বেত হস্তী প্রাপ্ত হন। এই হস্তীটী উচ্চ ১০ ফিট ছিল; তাহার সুদর্শন মস্তকটী দেখিয়াই শ্যামবাসীদের ভক্তি-প্রীতি উথলিয়া পড়িত। পূর্ব্ব-মধ্য আফ্রিকার ইনারিয়া নামক স্থানেও শ্বেত হস্তী, তত্রত্য অধিবাসিমণ্ডলীর যথেষ্ট সম্মানভাজন। ভারতের কান্যকুব্জে পূর্ব্বে শ্বেতহস্তীর সবিশেষ সমাদর ছিল। যখন ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র মহম্মদঘোরীকর্ত্তৃক পরাজিত এবং হত হন, তখন মহম্মদঘোরী তত্রত্য একটী শ্বেতহস্তী হস্তগত করেন; কিন্তু সে হস্তী কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করে নাই। যে মাহুত প্রাণপণে বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সে আর একটু হইলে মারা পড়িত। মহম্মদের মাতামহের সময় এব্রাহিমে শ্বেতহস্তী আরোহণ করিয়া হিরাট অঞ্চলে কেনানার বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল।

পেগু-অঞ্চলে যে হাতী পাওয়া যায়, আফ্রিকার হস্তী তাহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আফ্রিকার হস্তী বিলক্ষণ বলশালী এবং সুদর্শন; আফ্রিকার একটী হস্তী মাপিয়া দেখা গিয়াছিল, উহা ১৪ ফিট উচ্চ। সেনানী মেজর ডেনহাম, মধ্য-আফ্রিকার একটী হাতী মাপিয়া দেখিয়াছিলেন, ১২ ফিট, ১৭ ইঞ্চি উচ্চ। আফ্রিকাদেশীয় হস্তীর চিত্র নিম্নে প্রকটিত হইল। এতৎসম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে; বারান্তরে যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

আফ্রিকার হস্তী।
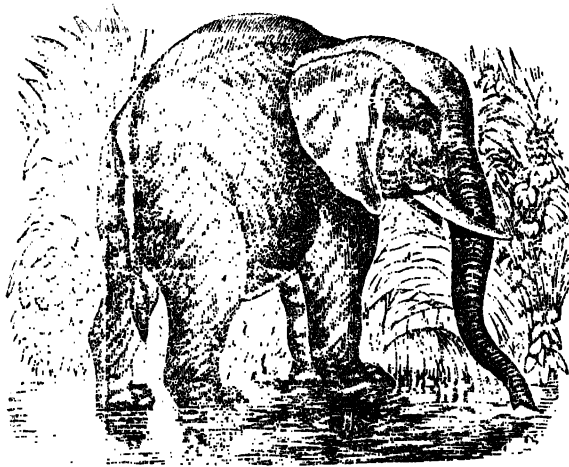
এবার এই পর্য্যন্ত। আগামীবারে হস্তীর যুদ্ধ, হস্তীর শরীরতত্ত্ব, হস্তীর প্রভুভক্তি, হস্তি-কঙ্কাল, হস্তী ধরিবার কৌশল প্রভৃতি সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

আমার জীবনচরিত।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি জহরীমল শেঠের গৃহে বন্দী হইয়া আছি। ঘরের বহির্ভাগে চারিদিকে পাহারা, ভিতরে আমরা। ৫৭ সালের ১লা জুন প্রভাতকাল অতীত হইল, বেলা এক প্রহর অতীত হইল, তথাচ মহম্মদ সফি বা তাঁহার কোন লোক, আমাদের কোন সংবাদ লইতে আসিল না। ঘরে আহারীয় সামগ্রী কিছুই নাই। যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা যবনস্পৃষ্ট বলিয়া শেঠজী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। খাইতে খাইতে তামাকও ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিল। বেলা তখন ১০টা। আমি শেঠজীকে ডাকিয়া বলিলাম, "শেঠজী! গতিক বড় সুবিধা নহে। এখনও আটা, ঘি, আজ পাঠাইল না কেন? আমার মনে কেমন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।" কাশীপ্রসাদ কিন্তু আজ একটু নির্ভীকচিত্তে বলিল, "সিধা পাঠায় নাই বলিয়া যে ভয়ের কিছু কারণ আছে তাহা নহে: কাল তাহারা পাঁচসের আটা, দুইসের ঘি, প্রভৃতি পাঠাইয়াছিল, তাই তাহারা মনে করিয়াছে, ইহাতেই ইহাদের অন্ততঃ দুইদিন কাল পর্য্যাপ্ত হইবে। কিন্তু এখানে যে একরাত্রেই সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তাহা মহম্মদ সফি কি করিয়া জানিবে?"

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল দেখিয়া, আমি আমাদের প্রহরী দফাদারের নিকট গেলাম। বলিলাম, "দফাদার সাহেব! এ পর্য্যন্ত আমাদের আহারাদি কিছুই হয় নাই। ঘরে আটা, ঘি কিছুই নাই; মহম্মদ সফি এ পর্য্যন্ত কিছুই পাঠান নাই। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, আমাদের উপায় কি হয়?"

দফাদার। উপায় তো আমি কিছু দেখি না।

আমি। এখানে তো অনেক প্রহরী আছে, আমরাও কিছু পলাইতেছি না। তুমি একবার নিজে মহম্মদ সফির নিকট গিয়া আমাদের এই আবেদন জানাও না কেন?

দফাদার। পাহারা ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না। বখ্‌ত খাঁর অদ্যকার হুকুম বড় শক্ত। যদি আমি পাহারা ছাড়িয়া যাই, এবং এ কথা যদি বখ্‌ত খাঁর কাণে উঠে, তাহা হইলে আমার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আমি। আজ কেন এমন শক্ত হুকুম হইল?

দফাদার। আপনারা পাছে পলাইয়া যান, ইহাই তাঁহার ভয়। আপনাদিকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

আমি। কবে তোমরা দিল্লী যাইবে?

দফাদার। তাহা ঠিক্ জানি না, বোধ হয় ২।৩ দিন পরেই দিল্লী রওনা হইতে হইবে।

আমি। সে যাহাই হউক, তোমার পাহারা যখন বদলী হইয়া, তুমি যখন প্যারেডে যাইবে, তখন তুমি আমাদের অনাহারের কথা মহম্মদ সফিকে বলিতে পারিবে তো?

দফাদার। তাহা বলিতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যা ছটার কম, আমি এ স্থান হইতে যাইতে পারিব না।

এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া আমি ক্ষুণ্নমনে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। বুঝিলাম, বিপদ ক্রমশই গাঢ়তর হইতেছে। আমি আসিবামাত্র ভায়া কাশীপ্রসাদ জিজ্ঞাসিল, "দাদা! ডাল-রুটীর কি বন্দোবস্ত করিলে?" আমি প্রকৃত কথা না কহিয়া বলিলাম, "ডাল আটা একটু পরে আসিবে।"

বেলা তৃতীয় প্রহর হইল, তথাচ আহারীয় সামগ্রী পাইলাম না। মনে বড় চিন্তা হইল, এইরূপে ক্রমশ অনাহারে প্রাণত্যাগ ঘটিবে নাকি?

ও-দিকে ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ বিছানায় শুইয়া আই-ঢাই, ছট্-ফট্ করিতেছে। এদিকে শেঠজী মুদ্রিতনয়নে দেবতার ধ্যানে নিযুক্ত আছেন। রসুয়ে ব্রাহ্মণটী এক একবার আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিতেছে "বাবু সাহেব! ঘি, আটা আর কত-দূর?' চাকরটী শীঘ্রই ঘি আটা আসিবার আশায় পূর্ব্বে একবার উনান ধরাইয়াছিল। এখন উনান নিবাইয়া ভগ্নমনে ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছে।

আমি বেগতিক বুঝিয়া, ভাই কাশীপ্রসাদকে হাসিয়া বলিলাম, "ভাই! আজ একাদশী কর, গতিক বড় সুবিধা নয়।"

বেলা যখন সাড়ে চারিটা, তখন মহম্মদ সফি অশ্বারোহণে আমার নিকট আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও দশ বার জন অশ্বারোহী আছে। তিনি আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, "বাবু সাহেব! আপনার আহারাদি উত্তমরূপ হইয়াছে তো?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "উত্তমরূপ দূরে যাউক, এ অধমের আহারাদি অধমরূপও হয় নাই।"

মহম্মদ সফি। কেন কেন? রুটী তৈয়ারিতে কোন ব্যাঘাত পড়িয়াছে না কি? পাচক ব্রাহ্মণ পলাইয়াছে না কি?

আমি। পাচক ব্রাহ্মণ পলাইবে কেন? আর কোন্ পথ দিয়াই বা পলাইবে? কোথাও এক মুঠা আটা নাই, রুটী তৈয়ারি হইবে কিরূপে?

মহম্মদ সফি। (সবিস্ময়ে) ইহা ত বড় আশ্চর্য্যের কথা! আমি আজ বেলা প্রায় দেড়প্রহরের পর দশসের ভাল আটা, চারিসের ঘৃত, ডাল ইত্যাদি সমস্তই লোক দ্বারা পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা কি আপনার নিকট ঐ সকল জিনিষ দিয়া যায় নাই?

আমি। না।

মহম্মদ সফি। বলেন কি?

আমি। দিয়া গেলে কি আর আমি মিছা করিয়া বলিতেছি,—তাহারা দিয়া যায় নাই। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনাদের ঐ প্রহরী দফাদারকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহম্মদ সফি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হইতেছে না,—বড় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল দেখিতেছি। বাবু সাহেব! কাল যখন রাত্রি ৯টার সময়, ট্যাটু ধ্বনি হইলে, অশ্বারোহী সৈন্যগণ মিলিত হয়, তখন গণনা করিয়া দেখিলাম, ২৫জন সওয়ার অনুপস্থিত আছে। অদ্য প্রাতে অনুসন্ধানে জানিলাম, সেই সওয়ারগণ সহরের ৩।৪ জন ধনাঢ্য লোকের বাড়ী লুট করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া আপন-আপন দেশাভিমুখে ছুটিয়াছে। আজও সংবাদ পাইলাম, বেলা ১২টার পর সওয়ারগণ ও পদাতিক সৈন্য মিলিত হইয়া, সহরের অনেক মহাজনের বাড়ী লুট-পাট আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য ১০০ শত সওয়ার পাঠাইলাম। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "লুণ্ঠন সত্য বটে, কিন্তু সওয়ার ও পদাতিক সৈন্যগণকে দেখিলাম না। সম্ভবতঃ তাহারা আমাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলাইয়া থাকিবে।"

যে সওয়ারগণের দ্বারা আপনার আহারীয় দ্রব্য পাঠাইয়াছিলাম, বোধ হয় তাহারা আটা, ঘি, নিজে নিজে খাইয়া কাহারও বাড়ী ঘর লুট করিয়া দেশে পলাইয়াছে। বিশেষ অদ্য আটা-ঘিরও কিছু টানাটানি গিয়াছে। সেনা-বাজারের মুদিগণ সম্যক্রূপে আজ আটা জুটাইতে পারে নাই। তাহারা বলিতেছে, "সহরের দোকান পাট সমস্তই বন্ধ। লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে গ্রামান্তর হইতেও কেহ আর সহরে আটা ঘি চালান দিতেছে না।" বাবু সাহেব!

আমি বহুকষ্টে আজ আপনার জন্যে দশসের আটা ও চারি সের ঘি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

আমি। বেণিয়াগণের নিকট কি আটা ঘি আর আদৌ নাই?

মহম্মদ সফি। যাহা আছে, তাহাতে একসপ্তাহ কাল আমাদের বেশ চলিতে পারে। কিন্তু বখ্‌ত খাঁ হুকুম দিয়াছেন, ঐ ৭ দিনের রসদে ১৫ দিন কাল চালাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যহ অর্দ্ধেক পরিমাণ আহারীয় সামগ্রী বেণিয়াগণ তাহাদের ভাণ্ডার হইতে দিবে, বাকী অর্দ্ধেক সহরের বাজার হইতে ক্রয় করিয়া পূর্ণ করিবে। এ দিকে কিন্তু সহরের বাজার বন্ধ। কাজেই সেনাগণের আহারের আজ হইতেই কম পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"বখ্‌ত খার এ বন্দোবস্তটী অতি পাকা হইয়াছে। কাহাকেও খাইতে দিব না অথচ ঘরে পুরিয়া মাল পচাইব। সাবাশ কমানডার-ইন-চিফ্! সাবাশ!!"

মহম্মদ সফি বলিলেন,— যাক ও সকল কথা। এক্ষণে আপনাদের জন্য আটা ঘি আনাইয়া দিতেছি, আপনারা রন্ধন করুন।

একজন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ প্যারেড-ভূমিতে গিয়া, প্রধান বেণিয়া-মুদিকে আমার নিকট লইয়া আসিল। মহম্মদ সফি তাহাকে বলিলেন, "দেখ, এই বাবু সাহেবের জন্য প্রত্যহ রসদ যোগাইবে। দেখিও যেন কোন রকমে ত্রুটী না হয়।"

মহম্মদ সফি প্রস্থান-উদ্যত হইলে আমি তাঁহার হাত ধরিলাম। বলিলাম, "আপনি যান কোথা? আমাদিগকে এরূপভাবে আর কতদিন থাকিতে হইবে? আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। সহরে যে সকল আমার আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি।

মহম্মদ সফি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কাল এমনি সময় সম্ভবতঃ আমি আপনার নিকট আসিব। সেই সময় যাহা কিছু বলিবার আছে বলিবেন। আজ আমাকে ছাড়িয়া দিন।" অগত্যা আমি মহম্মদ সফির হাত ছাড়িলাম। মহম্মদ সফি আমায় সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেইরূপ শব্দ হইল,— 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে!!' এবার পূর্ব্বের ন্যায় তত হুলস্থুল না হউক, কিন্তু 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' শব্দে দিক সমূহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার আমি দৌড়িয়া বাহিরের দিকে গেলাম। আবার দেখিলাম, সিপাহীগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। কিন্তু অর্দ্ধদণ্ড পরে ভ্রম ভাঙ্গিল, কোথাই বা গোরা এবং কোথাই বা তাহাদের শুভাগমন। আমি যে কয়েক দিন শেঠজীর গৃহে বন্দী ছিলাম, সেই কয়েক দিনই প্রত্যহ দিনে-রেতে দুই তিন বার করিয়া ঐরূপ 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' শব্দ সিপাহী-দলমধ্যে ধ্বনিত হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, জাগিয়া-জাগিয়াও সিপাহীগণ গৌরাঙ্গমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিত। এতই তাহাদের অন্তরের আতঙ্ক! 'ঐ গোরা' বলিলে, সিপাহী যেন কদলী-পত্রের ন্যায় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া দুলিতে থাকিত। গৌরাঙ্গ নামের এই মহামহিমান্বিতা মোহিনীশক্তি দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হয় হয়। আমি শেঠজীর কাছে বসিয়া আছি। সকলেরই মুখ শুষ্ক, কেননা, এ পর্য্যন্ত কাহারও আহার হয় নাই। বেণিয়া-মুদি, মহম্মদ সফির আদেশ পাইয়াও এখনও আমাদের জন্য রসদ আনে নাই। শেঠজী বলিলেন, "বেণিয়ার হাত হইতে কোন সিপাহী তো আমাদের রসদ কাড়িয়া লয় নাই?" আমি বলিলাম, যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নয়।" এমন সময় বেণিয়া এবং তাহার একজন ভৃত্য আমাদের সম্মুখে আসিল। ডাল রুটীর পরিবর্ত্তে ছাতু গুড় ও লূণ দিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,"একি!" মুদি কহিল, বখ্‌ত খাঁর হুকুকে আটা ঘি সমস্তই আটক হইয়া আছে। তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কাহাকেও আটা ঘি দিবার যো নাই। আমি আপনাদের জন্য স্বয়ং বখ্‌ত খাঁর নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইলাম না। কাজেই ছাতু লঙ্কা প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছি। সম্ভবতঃ কল্য আটা ঘি আনিতে পারিব।"

মুদি বিদায় হইল। আমরা তিনজনে খাইতে বসিলাম; পাচক-ব্রাহ্মণ পরিবেশন আরম্ভ করিল। সমস্ত দিনের পর আহার; ছাতুই তখন অমৃতময় বোধ হইতে লাগিল। প্রথমত লূণ লঙ্কা দিয়া ছাতু ভক্ষণ, তার পর গুড়সংযোগে ছাতু ভক্ষণ,—উদর একরকম পূর্ণ হইল; কালিয়ে পোলওয়া খাইলে যে রকম উদর পূর্ণ হইত ছাতুতেও সেই রকম পূর্ণ হইল, তবে মন বুঝে না বলিয়াই মন কেমন একটু

একটু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। কেননা, অদ্য আমাদের ছাতু খাইয়া দিনপাত করিতে হইল। আড়াই টাকা দামের বালাপোষে যেমন শীত ভাঙ্গে, পাঁচ টাকা দামের লুই গায়ে দিলে যেরূপ শীত ভাঙ্গে, পাঁচ হাজার টাকার শাল গায়ে দিলেও সেই রকমই শীত ভাঙ্গে। কিন্তু মন বুঝে না বলিয়াই মনে হয়, এঃ এ-টা লুই, ইহা কি গায়ে দেওয়া যায়?

আহারাদি করিয়া, আমরা তিন জনে শয়ন-গৃহে গিয়া নিজ নিজ শয্যার উপর উপবেশন করিলাম। কোন কাজ নাই, কি করি? ইহাই তখন ভাবনা হইল, এত সন্ধ্যা বেলায় শুইয়াই বা কি হইবে? শেঠজীর ঘরে সেতারও নাই যে, খানিক বাজাইয়া মনস্তৃপ্তি করি। শেঠজীকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনি কি গান গাহিতে জানেন?

শেঠজী। (হাসিয়া) না।

আমি। কিছু কিছু জানেন বৈ কি!

শেঠজী আমি ঈশ্বরের দোহাই বলিতেছি, গান গাহিতে আমি জানিনা।

আমি। বলেন কি? আমি যে বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি, আপনি গান গাহিতে জানেন।

শেঠজী। (হাসিয়া) সে যা একটু আধটু গাহিতে জানি, তাহা আর আপনাদের সাক্ষাতে গাহিবার নয়।

আমি। আমার সাক্ষাতে গাহিতে কোন দোষ নাই। আপনার গানশিক্ষা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, আপনার গান ভাল হইলে এখানে কেহ আপনাকে পুরস্কার দিতেছে না। মন্দ হইলেও কেহ তাড়াইয়া দিতেছে না। সুতরাং আমার সাক্ষাতে গান গাহিতে দোষ কি?

শেঠজী। দোষগুণের কথা বলিতেছি না। আমি যখন আদৌ ভাল গান গাহিতে জানিনা, তখন কি করিয়া গান গাহিব?

আমি। (হাসিয়া) আমরা তো আর ভাল গানের কান্না কাঁদিতেছি না। আপনি যাহা জানেন, তাহাই একটু গান। দিন কাটিলেই হইল।

শেঠজী। আমি একলা-একলা বসিয়া নির্জ্জনে যখন গান করি, তখন আমি আপনা-আপনিই লজ্জিত হই।

আমি। তবে ভগবানের নাম করুন; একটী হয়, ভজন গান; ভগবানের নামে তো কোন দোষ নাই, সুর খারাপ হইলে ভগবান্ তো আর রাগ করিবেন না, ভক্তি থাকিলেই হইল।

তখন শেঠজী আমায় না-ছোড়-বন্দা দেখিয়া, আমার নিকট পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া, তাঁহার যথাসাধ্য স্বর-লয়-সংযোগে একটী ভজন আরম্ভ করিলেন।

শঙ্কর শিব বম্ বম্ ভোলা!
কৈলাসপতি মহারাজ-ধীরাজ,
গলে রুণ্ড মাল, ওঢ়ে সিংহ খাল,
লোচন বিশাল হ্যায় লাল লাল!
অৎচন্দ্র ভাল সুন্দর বিরাজে॥

শেঠজী ভজন গাহিয়া, আমাকে অন্য একটী ভজন গাহিবার জন্য ধরিলেন, সে যেমন-তেমন ধরা নয়, অজগর সর্প যেমন ভীমকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেইরূপ যেন জড়াইয়া ধরিলেন। আমি অগত্যা আমার সেই চির-অভ্যস্ত ভজনটী ধরিলাম:

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ী।
রসনা রস-নাম লেত,
সন্তনকো দরশ দেত,
ঈষৎ মুখচন্দ্র-বিন্দু,
সুন্দর সুখ-দায়ী॥

কেশরকে-তিলক-ভাল,
মানো রবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ-কুণ্ডল ঝিল্‌মিলাতি,
রবি-পথ-ছব্ ছায়ী॥

মোতিয়ন্‌কে কণ্ঠমাল,
তারাগণ অতি বিশাল,
মানো গিরি-শিখর ফোড়্
সুর-সর চলি আয়ী॥

সখা সহিত সরযূ-তীর,
বিহরত রঘুবংশ-বীর,
হরখ নিরখ তুলসী দাস,
চরণন রজ পায়ী॥

সঙ্গীত শেষ হইলে, আমি এবং ভ্রাতা কালীপ্রসাদ, শেঠজীর সেই সুপ্রশস্ত খাটে পূর্ব্বদিনের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলাম। স্বয়ং শেঠজী সেই খাটিয়া খানিতে গিয়া শুইলেন।

অদ্য রাত্রে আমার ভাল ঘুম হইল না। নানা চিন্তায় হৃদয় মগ্ন হইল। কারাগারে এরূপ ভাবে নীরব নিস্পন্দ হইয়া কতদিন থাকিব? শেষে

বখ্‌ত খাঁ বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া যদি আমাদিগকে দিল্লী লইয়া যায়, তখনই বা উপায় কি করিব? আমি দিল্লী যাইতে অস্বীকৃত হইলে, বখ্‌ত খাঁ আমাকে ফাঁসা-কাঠেও ঝুলাইতে পারে। তাই ভাবিতেছি, কোথায় যাই, কি করি, কাহারই বা পরামর্শ লই? ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে সমস্ত বিপদের কথা খুলিয়া বলিলে তো, সে একেবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিবে। শেঠজীও সাদাসিধে লোক; ইহজন্মে কেবল তিনি সুদ লইবারই সুকৌশল শিখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গেই বা পরামর্শ কি করিব?

সহরে শুনিতে পাই অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটীতে লুটপাট হইতেছে, দাঙ্গা হাঙ্গামাও চলিতেছে। আমার পরিচিত আত্মীয় হরদেব এবং হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইহাঁরাই বা এ সময় কি করিতেছেন? বৃদ্ধ অহিফেনসেবী ঠাকুরদাদা রামকমল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই বা এই ঘোর দুর্দ্দিনে কিরূপে কাল কাটাইতেছেন? ডাকঘরের বাবুই বা কোথায়? ডাকে চিঠী পত্র চলাচল তো বন্ধ হইয়াছে।

শুনিতেছি, খাঁ-বাহাদুর খা, নবাব সাজিয়াছেন। পাঠক! বুঝিয়াছেন,—খাঁ বাহাদুর খাঁ কি? এই রোহিলখণ্ড প্রদেশের পূর্ব্বতন নবাব হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্র, সেই খাঁ বাহাদুর খাঁ। ইনি নবাব-বংশীয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। আমায় যিনি সেতার শিখাইতেন,—সেই নবাববংশীয় চুন্নামিঞার কথা মনে পড়িল।

মন বড়ই উচ্চাটন হইল। কি করি? এ স্থান হইতে পলাই কিরূপে? স্থির করিলাম, কাল আর এখানে কিছুতেই থাকিব না;—যেমন করিয়া হউক, পলাইব।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে মহম্মদ সফি আসিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "সহরের সংবাদ আপনি কিছু জানেন কি? খাঁ বাহাদুর খাঁ "নবাব" হইয়াছেন নাকি?"

মহম্মদ সফি। হাঁ।

আমি। আপনারা তাঁহাকে নবাবপদে—দেশের শাসন কর্ত্তার পদে বরণ করিলেন, না, তিনি আপনিই নবাব হইয়াছেন?

মহম্মদ সফি। আমরা, অন্ততঃ আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না। সম্ভবত তিনি আপনা-আপনিই নবাব হইয়াছেন। শুধু তিনি নবাব হন নাই, সহরে অন্যান্য যত ইংরেজ ছিল, তিনি সকলকে গত কল্য হত্যা করিয়াছেন; অথবা তাঁহার নাম করিয়া সহরবাসিগণ ইংরেজগণকে নিহত করিয়াছে।

আমি। ওঃ! ব্যাপার কি বলিতে পারেন?

মহম্মদ সফি। ব্যাপার আর কিছুই নহে,—ঘোর অরাজকতা উপস্থিত। কেহ কাহাকেও মানে না, কেহ কাহারও কথা শুনে না, যাহার গায়ে বল বেশী, সে-ই এখন কর্ত্তা।

আমি। খাঁ বাহাদুর খা, তবে নবাব হইয়া কি করিতেছেন? তিনি কি অত্যাচার নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না?

মহম্মদ সফি। খাঁ বাহাদুর খাঁর দ্বারা অত্যাচার নিবারণ হওয়া দূরে থাকুক; বরং অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। খাঁ বাহাদুর খাঁ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক। যে যা বলে, তাই তিনি করেন। তাঁহার মনে মনে প্রজার মঙ্গল করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনাস্রোতে পড়িয়া কার্য্যগতিকে তিনি প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। এই দেখুন, গত কল্য তিনি খাস্ বেরিলীর সেশন জজ রেক্‌স্ সাহেবকে, জজ রবার্টসন সাহেবকে, ডেপুটী কালেক্টর ওয়াট-সাহেবকে এবং ডাক্তার হে সাহেবকে থামকা হত্যা করিয়াছেন।

আমি। সেকি কথা? ইহাঁরা কি নাইনিতাল পলাইতে পারেন নাই?

মহম্মদ সফি। না। পলাইবার অবসর পান নাই। রবিবার দিন বেলা ১১টার সময় যে বিদ্রোহ-অনল জ্বলিয়া উঠিবে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। ইহাঁরা পলাইবার জন্য আস্তাবলে ঘোড়া সজ্জিত রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় পলাইতে না পারিয়া বেরিলীস্থ দুই জন সম্ভ্রান্ত সওদাগরের বাটীতে লুক্কায়িত হন কিন্তু খাঁ বাহাদুর খাঁ গোয়েন্দার দ্বারা সংবাদ পান। অমনি কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ গিয়া সেই কয়েকজন ইংরেজকে গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে আশ্রয়-দাতার বাটীও লুণ্ঠন করে। গ্রেপ্তারীর পর কয়েকজন ইংরেজকে তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। এই ত ব্যাপার!

আমি। এরূপভাবে ইংরেজ কাটিয়া কি যে লাভ হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। বরং হত্যার পরিবর্ত্তে যদি বন্দী করিয়া রাখিত, তাহা হইলে সর্ব্বাংশে উত্তম কাজই হইত। খাঁ বাহাদুর খাঁ এরূপভাবে ইংরেজগণকে হত্যা করিতেছেন, সহরেরঘরবাড়ী লুণ্ঠন করিতেছেন, ইহার কোন প্রতিবাদ আপনারা করিতেছেন না কেন?

মহম্মদ সফি। আমাদের প্রতিবাদ করিয়া লাভ কি? আমরা এ সহরে আর কয় দিন আছি? শীঘ্রই আমরা দিল্লী যাত্রা করিতেছি। সুতরাং এরূপ স্থলে খাঁ বাহাদুর খাঁর সহিত বিবাদ করিয়া ফল কি?

আমি। আচ্ছা, হঠাৎ খাঁ বাহাদুর খাঁ নবাব উপাধি ধারণ করিলেন কিরূপে? এক্ষণে তাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ধনাঢ্য লোক তো অনেক বর্ত্তমান আছেন।

মহম্মদ সফি। অনেক না থাকুন, এক আধ জন আছেন বটে? মোবারেক শা খাঁ একজন উদ্যমশীল অধিনায়ক বটেন, তাঁহার প্রচুর অর্থও আছে, লোকবলও আছে, আর পাঠানদের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে। খাঁ বাহাদুর খাঁর পাঠানদের উপর আধিপত্য আছে বটে, নবাব-বংশীয় বলিয়া বিশেষ সম্মানও আছে বটে, কিন্তু তিনি অধ্যবসায়শীল নহেন; আর, কি শরীরের, কি মনের সেরূপ তেজও তাঁহার নাই। আফিং সিদ্ধি প্রভৃতি নেশাদি লইয়াই তিনি সদাই বিব্রত। এজন্য মোবারেক শা খাঁর মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, তিনিই বেরিলীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। গত ৩১শে মে সৈনিকাশ্রমে অগ্নিপ্রদানের সংবাদ পাইয়া, মোবারেক শা খাঁ প্রায় একশত বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হইলেন, প্রায় পাঁচশত অস্ত্রধারী অনুচরকে সঙ্গে লইলেন। মহা সমারোহে তিনি এইরূপে কোতোয়ালীর দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার মনে মনে এরূপ কল্পনা ছিল যে, দিল্লীর সম্রাটের অধীনে তিনি বেরিলীর নবাব নাজিমের পদ গ্রহণ করিবেন।

আমি। আপনি এত ব্যাপার জানিলেন কিরূপে?

মহম্মদ সফি। (হাসিয়া) সর্ব্বসংবাদ সংগ্রহ করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সহরের চারিদিকে দিন রাত্রি আমার চর ঘুরিতেছে, সহরের সামান্য ব্যাপারটী পর্য্যন্ত আমার নখদর্পণে। খাঁ বাহাদুর খাঁ কি দিয়া ভাত খান, তাহা পর্য্যন্তও আমি জানি। মোবারেক শা খাঁ কখন্ কোন্ খানে কাহার সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন, তাহারও সকল সংবাদ আমি রাখিতেছি। বিশেষ, বিদ্রোহ ঘটিবার একমাস পূর্ব্ব হইতেই, মোবারেক শা খাঁ আমাদের সেনাপতি বখ্‌ত খাঁর সহিত এ বিষয়ের ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন;—এ কথা আমি সম্প্রতি বখ্‌ত খাঁর মুখেই শুনিয়াছি।

আমি। সে কথা যাক। এখন কিরূপে খাঁ বাহাদুর খাঁ নবাব হইলেন বলুন।

মহম্মদ সফি। এদিকে মোবারেক শা খাঁ পূর্ব্বোক্তরূপ দল বাঁধিয়া কোতোয়ালি-অভিমুখে আসিতেছিলেন, ওদিকে খাঁ বাহাদুর খাঁ ঠিক ঐরূপ দল বাঁধিয়া কোতোয়ালী-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কি ছোট, কি বড়, পুরাতন সহরের সমস্ত মুসলমান খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে ছিল। নও মহল্লার সৈয়েদেরাও খাঁ বাহাদুর খাঁর পক্ষে ছিল। সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, উঠ এবং অনেক অস্ত্রধারী পুরুষও ছিল। মধ্য পথে দুই দলের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মোবারেক শা খাঁ নিজের চিরপোষিত আশাকে বিসর্জ্জন করত, তৎক্ষণাৎ খাঁ বাহাদুর খাঁর দলে মিশিয়া গেলেন। তিনি খাঁ বাহাদুর খাঁকে বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই, আমি সদলে আপনার নিকট যাইতেছিলাম, তবে সৌভাগ্য এই, পথিমধ্যেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আপনি দিল্লীশ্বরের অধীনে, নবাব নাজিমের পদ গ্রহণ করুন; দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হউক।" বলা বাহুল্য, মোবারেক শা খাঁ অতি চতুর লোক। তিনি মনে মনে স্থির করেন, "এ সময় আমি যদি নবাব হইব বলিয়া খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হই, তাহা হইলে ঘরে ঘরে বিষম বিবাদ বাধিবে এবং রক্তপাত তাহার পরিণাম হইবে। কিন্তু আমি যদি খাঁ বাহাদুর খাঁর অধীনত্ব এক্ষণে স্বীকার করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমিই এ প্রদেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতে পারিব। কেননা, খাঁ বাহাদুর খাঁ সদাই নেশায় মগ্ন, এবং স্বয়ং কার্য্য করিতে অক্ষম।"

আমি। তৎপরে, খাঁ বাহাদুর খাঁ কোতোয়ালীতে গিয়া কি করিলেন? আমাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলুন;—আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে।

মহম্মদ সফি। কোতোয়ালীতে পৌঁছিবার পর তৎক্ষণাৎ এক মশনদ প্রস্তুত হইল। বহুমূল্য শাল ও বিচিত্র বসন দ্বারা ঐ মশনদকে আবৃত করা হইল। তখন, মাদারালী খাঁ রোহিলখণ্ড প্রদেশের সমগ্র পাঠানের সম্মতি জ্ঞাপন করত খাঁ বাহাদুর খাঁকে সেই মশনদে উপবেশন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ সুবর্ণ, হীরক, এবং মুক্তা-খচিত বস্ত্রে সুশোভিত হইয়া সেই মশনদে উপবিষ্ট হইলেন। তখন চারিদিক্ হইতে "জয় দিল্লীশ্বরের জয়!" "জয় নবাব খাঁ বাহাদুরের জয়!"—ধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ কোতোয়ালীর সম্মুখে মহম্মদী ঝণ্ডা বা পাতাকা প্রোথিত করা হইল। একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত চাতালে কয়েক ব্যক্তি ধূপ ধুনা ইত্যাদি প্রজ্বলিত করিতে লাগিল। এইরূপে খাঁ বাহাদুর খাঁ বেরিলীর শাসনকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইলেন।

আমি। সম্ভবতঃ তখন তথায় অবশ্যই বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল?

মহম্মদ সফি। হাঁ। দশ সহস্র লোকের কম নহে।

আমি। খাঁ বাহাদুর খাঁ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে কি কাজ করিলেন?

মহম্মদ সফি। কোতোয়ালীতে ইংরেজের আমলের যে কাগজ-পত্র দলিল-দস্তাবেজ ছিল, সমস্তই তিনি পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিবার হুকুম দিলেন। এক অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে কাগজ-পত্র সমস্তই নিক্ষিপ্ত হইল। কোতোয়ালীতে ইংরেজের আমলে যে সকল বরকন্দাজ ছিল, তাহাদের পরিধেয় বসন সমস্ত কাড়িয়া লওয়া হইল। এমন সময় কয়েকজন গয়েন্দা আসিয়া খাঁ বাহাদুর খাঁকে সংবাদ দিল, কয়েকজন ইংরেজ, মুন্সেফ হামিদ হোসেনের বাড়ীতে লুক্কায়িত আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরেজ-গণকে খুন করিবার আদেশ দিলেন। অমনি কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ, 'মার্ মার্' শব্দে হামিদ হোসেনের বাটীর দিকে ধাবিত হইল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ফজ্লু সেখ আমাদের যাইবার পূর্ব্বে হামিদ হোসেনের গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া ইংরেজগণকে খুন করিয়াছে এবং হামিদহোসেনের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়াছে।

আমি। ফজ্লু কে?

মহম্মদ সফি। ফজ্লুকে আপনি জানেন না কি? সে একজন সহরের প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। তাহার দলে প্রায় আড়াইশত গুণ্ডা আছে।

আমি। তাহার নাম ফজ্লু কেন হইবে? তাহার নাম যে, বকাউল্লা।

মহম্মদ সফি। তাহার অনেক গুলি নাম আছে; নানা স্থানে সে নানা নামে প্রসিদ্ধ। তাহার শরীরে অসুরের ন্যায় বল। তাহার হৃদয় নির্ভয়। সে কাহাকেও দৃক্‌পাত করে না।

আমি। সে যাহা হউক,—খাঁ বাহাদুর খাঁ ফজ্লুর কার্য্য শুনিয়া কি বলিলেন?

মহম্মদ সফি। তিনি অতি সন্তুষ্ট হইলেন। এবং এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন,—"ইংরেজ মাত্রকেই হত্যা করিয়া ফেলিতে হইবে।" এক একটী ইংরেজের মাথার মূল্য দশ টাকা করিয়া ধার্য্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ঘোষণা প্রচারিত হইল, "যে কোন ব্যক্তি কোনও ইংরেজকে আশ্রয় দিবে, অথবা আশ্রয় দিবার চেষ্টা করিবে, তাহাকেও বিশেষরূপ দণ্ড দেওয়া হইবে। অপরাধের গুরুত্ব-লঘুত্ব-অনুসারে সেই আশ্রয়দাতার প্রাণদণ্ড হইতে পারে,—অথবা তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহার নাককাণ কাটিয়া তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

আমি। গত কল্য বেলা কয়টা পর্য্যন্ত তিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন?

মহম্মদ সফি। বেলা প্রায় ১১টার পর তিনি দরবার ভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনরায় বেলা ৩টার পর আসিয়া কোতোয়ালীর মশনদে বসিলেন। সেই সময় স্পিনেল নামক একজন ইংরেজ, তাহার স্ত্রী এবং তাহার দুইটী শিশুসন্তানকে কোতোয়ালীতে ধৃত করিয়া আনা হইল। খাঁ বাহাদুর খাঁ তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রাণ দণ্ডের হুকুম দিলেন। প্রথমতঃ শিশুসন্তান দুইটীকে পিতা মাতার সম্মুখে বধ করা হইল। তাহার পর, স্ত্রীকে জঘন্যভাবে তীক্ষ্ণধার বর্ষা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বধ করা হইল। অবশেষে স্পিনেল সাহেবের মাথা লগুড়াঘাতে গুঁড়া করা হইল। পূর্ব্বে রেকস্, রবার্টসন্, হে, বাক্ এবং ওর প্রভৃতি সাহেবগণ সহরবাসীদের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল। কয়েকজন বদমাইস গুণ্ডা ঐ সাহেবদের মৃতদেহ উলঙ্গ করত সহরের প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া টানিয়া আনিয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে, খাঁ বাহাদুর খাঁর সিংহাসনের নিকটে রাখিয়া দিল। তিনি হুকুম

দিলেন, "কল্য প্রাতে আবার ইহাদের মৃতদেহ সহরময় ঘুরাইতে হইবে।" কিন্তু কার্য্যত তাহা ঘটে নাই। অদ্য প্রাতঃকালে মৃতদেহ হইতে বিষম দুর্গন্ধ উত্থিত হওয়ায় সহরের বাহিরে একটী পুষ্করিণীতে তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আমি। গত কল্য বৈকালে মশনদে বসিয়া তিনি আর কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, আমাকে বলুন।

মহম্মদ সফি। বেরিলীর কারাধ্যক্ষ হ্যান্‌সবেরো সাহেব কোতোয়ালীতে বেলা প্রায় ৫টার সময় আনীত হইলেন। তাঁহার হাতে হাতকড়ি পায়ে শিকল। মুখ দিয়া রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। গত কল্য সমস্ত দিন তিনি অকুতোভয়ে অসীম সাহসে বিদ্রোহী সহরবাসীর বিরুদ্ধে কারাগারের দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন। বন্দুকের দ্বারা তিনি প্রায় ৩০ জন লোককে হত্যা করেন। কিন্তু অবশেষে অপরাহ্ণ কালে তিনি বন্দী হইয়া খাঁ বাহাদুর খাঁর সম্মুখে আনীত হইলেন। সে সময়েও তাঁহার সাহস ও বিক্রম দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। তিনি সর্ব্বজন-সমক্ষে সগর্ব্বে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমি এক্ষণে তোমাদের বন্দী। তোমরা আমাকে খুন করিতে পার। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা ভাবিও না যে, আমাকে এবং আরও কয়েকজন এই সহরের ইংরেজকে খুন করিয়াই তোমরা এ দেশে ইংরেজ-শাসনের অবসান করিতে সক্ষম হইবে। অচিরেই প্রতিফল পাইবে, আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিও।" এই কথা বলিবামাত্র খাঁ বাহাদুর খাঁ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। কারাধ্যক্ষের দেহ প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

আমি। বড়ই বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়াছে দেখিতেছি! তার পর কি হইল?

মহম্মদ সফি। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে খাঁ বাহাদুর খাঁ আপন পারিষদবর্গ সঙ্গে লইয়া তানজামের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া নগরভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নকীব ফুকরাইতে লাগিল;—"হে দোকানদারগণ! তোমাদের আর কোন ভয় নাই। তোমরা আসিয়া দোকান-পাঠ খোল। হে সহরবাসিগণ! তোমাদের আর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে পলাইবার আবশ্যক নাই। যাহারা পলাইয়াছে, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করুক। হে শিল্পিগণ! তোমরা শিল্পকার্য্যে মন দাও। ইংরেজ-রাজত্ব লোপ হইয়াছে। আর কস্মিন্ কালেও ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপিত হইবে, সেরূপ আশা এককালেই আর নাই। দিল্লীর সম্রাটই এখন ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন। আমি তাঁহার অধীনে নবাব নাজিমের পদে নিযুক্ত হইয়াছি। ভয় নাই! ভয় নাই! ভাই সকল! আর ভয় নাই।" নকীব এই কথা ফুকরাইবামাত্র, অমনি শত শত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জয় নবাব বাহাদুর কী জয়!" "জয় দিল্লীশ্বর কী জয়!"

আমি। এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইলে, দোকানদারগণ দোকান খুলিল কি?

মহম্মদ সফি। দুই একজন ছাড়া আর কেহই দোকান খুলিতে সাহস করিল না।

আমি। খাঁ বাহাদুর খাঁ রাত্রি কতক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন?

মহম্মদ সফি। রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত তিনি নানা স্থানে নানা পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐরূপ ঘোষণা দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

আমি। কল্য রাত্রে সহরে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল কি?

মহম্মদ সফি। না। কেবল ৪।৫ জন মহাজনের গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

আমি। অদ্যকার খবর কি?

মহম্মদ সফি। অদ্য তো প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি আপনার নিকট আসিয়াছি। অন্য কোন সংবাদ কেমন করিয়া বলিব?

আমি। এত তাড়াতাড়ি কেন?

মহম্মদ সফি। আমাদের সেনাপতি বখ্‌ত খাঁ আমাকে আপনার নিকট এত তাড়াতাড়ি করিয়া প্রাতঃকালে পাঠাইলেন।

আমি। কেন কেন! ব্যাপার কি?

মহম্মদ সফি। ব্যাপার আর কিছুই নয়, কেবল আপনি আমাদের অধীনে চাকুরী স্বীকার করেন, উহাই তাঁহার মন্তব্য। পাছে অন্য কাহাকেও পাঠাইলে, আপনি কথা গ্রাহ্য না করেন, তাই আমাকে পাঠাইয়াছেন। বিশেষ বখ্‌ত খাঁ আরও জানেন, আমার সহিত আপনার সদ্ভাব আছে। আমার অনুরোধ আপনি কখন এড়াইতে পারিবেন না, ইহাই বখ্‌ত খাঁর বিশ্বাস।

আমি। আমাকে লইয়া তিনি এত টানাটানি করিতেছেন কেন? সহরে কি আর উপযুক্ত লোক নাই? একজন ভাল মুহুরিকে বাছিয়া গুছিয়া রাখিলেই তো হইল।

মহম্মদ সফি। আচ্ছা, আপনাকে আমি একটা গোপনে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের অধীনে চাকুরী স্বীকার করিতে আপনি এত কাতর হইতেছেন কেন? ক্ষতি কি? চাকুরী করিলে, লাভ ভিন্ন তো লোকসান নাই। বিশেষ, আমরা এখন বড়ই বিব্রত হইয়াছি। নানা স্থান হইতে দিন রাত গাড়ি করিয়া বাক্স বাক্স টাকা আসিতেছে। সে সকল টাকার হিসাব পত্রই বা রাখে কে? লইয়া খরচপত্রই বা করে কে? টাকা মজুদ, রসদও মজুদ,—অথচ আবশ্যক হইলে, সময়ে টাকাও পাওয়া যায় না, রসদও পাওয়া যায় না। তাই বলি, আপনি টাকা ও রসদ বিভাগের অধ্যক্ষ হউন। ইহাতে আপনার লাভ বই লোকসান হইবে না।

আমি। আপনিও যদি বখ্‌ত খাঁর ন্যায় চাকুরীর জন্য পীড়াপীড়ী করেন, তবে আর আমার আশ্রয় কোথায়?

মহম্মদ সফি। কেন, আপনার চাকুরী লইতে এত ভয় কিসে? আপনি কি মনে করেন যে, ইংরেজ এখনি আবার সসৈন্যে ফিরিয়া আসিবে?

আমি। ইংরেজ ফিরিয়া আসুক, আর নাই আসুক, আপনাদের অধীনে চাকুরী লইলে আমার দুরবস্থার একশেষ হইবে। আপনাদের নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, প্রকরণ নাই, পদ্ধতি নাই, আছে কেবল মাঝে মাঝে "গোরে আয়ে গোরে আয়ে" শব্দ। আপনাদের কাণ্ড যাচ্ছেতাই-রকমের; যেন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ উপস্থিত। আমি একা কেন, আমার ন্যায় ১০ জন লোক আসিলেও সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে না।

মহম্মদ সফি। আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। তবে আমি চলিলাম; বখ্‌ত খাঁকে গিয়া বলিব যে, তিনি কিছুতেই চাকুরী স্বীকার করিতে রাজি নহেন।

আমি। আপনি মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিবেন, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, আমি কিছুতেই চাকুরী স্বীকার করিব না।

তখন আমি মনে মনে কহিলাম, 'ইংরেজের নুণ খাইয়া, কিছুতেই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা উচিত নয়।' মহম্মদ সফি উঠিবার উপক্রম করিলেন, আমি তাঁহাকে হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলাম, আমার এক বক্তব্য আছে শুনুন।

মহম্মদ সফি। কি বলুন।

আমি। আপনি বলিয়াছেন, "আমার প্রাণ থাকিতে আপনার প্রাণ কখনও নষ্ট হইবে না।" কিন্তু এক্ষণে অস্ত্রাঘাতে প্রাণে না মরি, অনাহারে বুঝি প্রাণে মরিতে হইল।

মহম্মদ সফি। কেন কেন? বেণিয়া মুদি কি গত কল্য আপনাদের সিধা দিয়া যায় নাই?

আমি। দিয়াছিল বটে; কিন্তু যাহা দিয়াছিল, তাহা আমাদের অভক্ষ্য; ছাতু লঙ্কা খাইয়া কয় দিন প্রাণে বাঁচিব।

মহম্মদ সফি। কল্য কি সে আটা ঘির পরিবর্ত্তে ছাতু লঙ্কা দিয়া গিয়াছিল?

আমি। হাঁ। আপনি জানেন, ছাতু লঙ্কা খাওয়া আমার কখন অভ্যাস নাই। কল্য প্রাণের দায়ে ছাতু লঙ্কা কিছু খাইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য আমার পেটের অসুখ হইয়াছে।

(পেটের অসুখের কথাটী মিথ্যা)

মহম্মদ সফি আমার উদরাময়ের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, আটা ঘি পাঠাইয়া দিলেও এখানে রুটী তৈয়ারি করিবার উপযুক্ত লোক নাই। আর আপনি জানেন, আমি স্বয়ং কখনও রন্ধন করিয়া খাই নাই। সুতরাং রন্ধনকার্য্যে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব আপনি আটা ঘি পাঠাইবারও যদি রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আমার অনাহার বা অর্দ্ধাহার হইবে।

(বলা বাহুল্য, আমার এইরূপ উক্তিও মিথ্যা)

মহম্মদ সফি উত্তর দিলেন, তবে আপনার আহারের উপায় কি হইবে বলুন দেখি?

আমি। সহরে, হরদেব এবং হরগোবিন্দ নামক আমার দুই দাদা আছেন। সেখানে যদি প্রত্যহ আমাকে পাঠাইয়া খাওয়াইয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলেও আমাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

মহম্মদ সফি। তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

আমি। আমাদের সঙ্গে আট জন অশ্বারোহী প্রহরী দিবেন, তাহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, এবং আহারাদি হইলে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। বলা বাহুল্য, আমরা অবশ্যই পলাইব না। আর পলাইবই বা কোথায়?

মহম্মদ সফি, এ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "আমি একা-এক

আপনার কথার উত্তর দিতে পারিতেছি না। বখ্‌ত খাঁর আদেশ ব্যতীত আপনাকে এরূপ ভাবে ছাড়িয়া দিতে সক্ষম নহি। কিন্তু বখ্‌ত খাঁ যখন শুনিবেন যে, আপনি চাক্‌রী লইতে কিছুতেই রাজি নুন, তখন যে তিনি এরূপভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার হইবেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তবে এক কৌশল করা যাক্‌। বখ্‌ত খাঁকে গিয়া বলিব যে, দুর্গাদাস বাবুর মন অনেক নরম হইয়াছে। তিনি আপনার অধীনে চাক্‌রী স্বীকার করিতে বারআনা রূপ সম্মত হইয়াছেন, তবে এই কয়েক দিন কারাগারে আহারের গোলযোগে তাঁহার উদরাময় হইয়াছে। পীড়া একটু আরাম হইলে তিনি সম্ভবত চাক্‌রী লইবেন। এইরূপ কথা বলিলে অবশ্যই বখ্‌ত খাঁ আপনাকে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া একবেলা আহারের জন্য সহরে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

আমি। আচ্ছা, যে উপায়েই হউক, আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই মঙ্গল।

মহম্মদ সফি, আমাকে সেলাম করিয়া অশ্বারোহী-দলে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

বেলা তখন প্রায় ১০টা। অদ্য ২রা জুন মঙ্গলবার বেরিলী-বিদ্রোহের তৃতীয় দিবস।

একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদ সফি, প্রস্থান করিবার পরেই বেণিয়া মুদি সিধা আনিল। অদ্যকার সিধা ডাল, আটা, ঘৃত, লবণ, এবং তামাক। আহারাদি-কার্য্য যথানিয়মে যথাসময়ে সম্পন্ন হইল।

বেলা ৩টার সময় আবার "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে" শব্দ উপস্থিত হইল। এবার ভয়ঙ্কর শব্দে যেন ধরাধাম টল টল কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে আমাদের প্রহরীগণও অস্ত্র শস্ত্র হস্তে করিয়া সেই শব্দাভিমুখে দৌড়িল। আমি, ভ্রাতা কালীপ্রসাদ, শেঠ জহরীমল, গোমস্তা এবং ভৃত্য এই পাঁচজনে বাটীর বাহির হইয়া ব্যাপার দেখিতে অগ্রসর হইলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের বহির্গমনে বাধা দিবার বা নিবারণ করিবার অদ্য কোন প্রহরীই নিকটে নাই। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম, মহা দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি ব্যাপার পড়িয়াছে এবং সহরের দিক্‌ হইতে প্রায় তিন সহস্র লোক, সেনানিবাসের দিকে আসিতেছে। সেই তিন সহস্র লোকের—ধ্বজ পতাকা লইয়া, তরবারী বন্দুক লইয়া আগমন দেখিয়া, সেনানিবাসের যত সেনা "গোরে আয়ে গোরে আয়ে" শব্দ করিয়া এক বিভীষণ বিকট ধ্বনি করিতেছে। কে কাহার ঘাড়ে পড়িতেছে, কে কখন ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িতেছে,—তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। দূর হইতে সেই তিন সহস্র লোককে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া, আমার প্রথম একটু সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি সত্য সত্যই ইংরেজের গোরখা-পল্টন আসিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, আমার এ আশা দুরাশা মাত্র।

রহস্য এই। একটু গোড়া হইতে না বলিলে পাঠকগণ এ রহস্য বুঝিবেন না। অদ্য অর্থাৎ ২রা জুন মঙ্গলবার বেলা ১টার সময় নূতন নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ সহরের কোতোয়ালীতে উপস্থিত হইয়া এক বিরাট দরবার করেন। সহরের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী সে দরবারে উপস্থিত হন। পাঁচশত জোয়ান বাছিয়া, তাহাদের হস্তে বন্দুক দেওয়া হয়; কতকগুলি লোক কেবল ঢাল তরবারী প্রাপ্ত হয়। আর একদল লোক বর্ষা ও জাল-কিরিচ প্রাপ্ত হয়। অন্য এক সম্প্রদায় অশ্বে আরোহণ করিয়া অশ্বারোহী-সৈন্যরূপে সজ্জিত হয়। দরবারে নূতন রাজ্য কিরূপে শাসন করিতে হইবে, কিরূপে প্রজাপুঞ্জ সুখে থাকিবে, প্রথমে ইহারই বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য,সেবিষয়ের মীমাংসা কিছুই হইল না। শেষে স্থির হইল, বিদ্রোহী সৈন্যের অধিনায়ক বখ্‌ত খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করা হউক। তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র এবং আড়াই শত সুশিক্ষিত সিপাহী—রাজ্যরক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হইবে। ইহাই প্রধান মন্তব্য রহিল। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর মনে ঐরূপই গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যতঃ এই বলিয়া যাত্রা করিলেন যে, তিনি বখ্‌ত খাঁ এবং মহম্মদ সফিকে সম্মান প্রদর্শন করণার্থেই, তাঁহাদের নিকট যাইতেছেন। হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার উপর খাঁ বাহাদুর খাঁ উপবিষ্ট। সঙ্গে ইহা ব্যতীত আরও ১৬টী হস্তী ছিল। তদুপরি সহরের সম্ভ্রান্ত রেইসগণ বসিয়াছিলেন। যখন এই দল, সেনানিবাসের ধারে কালেক্টর সাহেবের কাছারীর সন্নিকটে উপস্থিত হইল, তখন বিদ্রোহী সেনাগণ ইহাদিগকে দেখিতে পাইল,—কিন্তু ইহারা কে?—কেন আসিতেছে?—

অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিবার উদ্দেশ্যই বা কি ?—ইহা বিদ্রোহী সেনাগণ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। তাহারা আতঙ্কে অধীর হইয়া, শত্রু-আগমন-সূচক ভয়ব্যঞ্জক বিউগল বাজাইয়া দিল। তার পর ঐরূপ, "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে" শব্দ পড়িয়া গেল। সেই শব্দ শুনিয়া আমাদের প্রহরীগণ প্রহরার কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দৌড়িয়া ব্যাপার দেখিতে ছুটিল। আমরাও শূন্য ঘর পাইয়া প্রহরীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদে বাহিরে আসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, বিদ্রোহী সিপাহীগণ, খাঁ বাহাদুর খাঁর দলের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। খাঁ বাহাদুর খাঁর দলস্থ কয়েক ব্যক্তির শরীরে গুলির আঘাত লাগায়, তাহারা ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল একটা হস্তী গুলি খাইয়া বিপরীত বিকট চীৎকারপূর্ব্বক দল হইতে দৌড়িয়া বাহির হইয়া সহরের দিকে ছুটিল। দেখিলাম, তাহার পায়ের এবং গায়ের চাপনে পড়িয়া ৫।৭ জন ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিল অনেকে বিষম আঘাত পাইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল খাঁ বাহাদুর খাঁ এইরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বখ্‌ত খাঁ তাঁহার এই বন্ধুভাবের আগমন হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি যে, বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, এই অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইবার জন্য, হাওদার উপর দণ্ডায়মান হইয়া রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন। আরও কয়েকজন রেইস, হাওদার উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে রুমাল ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে মহম্মদ সফি কোথা হইতে তীরবেগে অশ্বারোহণে ছুটিয়া আসিয়া, যে সকল সিপাহী গুলি চালাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন, এবং গুলি চালান বন্ধ করিয়া দিলেন। বখ্‌ত খাঁ তখন প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বোধ হয় কিঞ্চিৎ লজ্জিতও হইলেন। বখ্‌ত খাঁ মহম্মদ সফির সহিত কি পরামর্শ করিয়া নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর নিকট তৎক্ষণাৎ একজন দূত পাঠাইলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ সেই দূতের কথা শুনিয়া সহরের যাবতীয় লোককে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সকলেই অমনি পশ্চাৎপদ হইয়া সহরাভিমুখে যাত্রা করিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ ৫ জন বিশ্বাসী অনুচর সঙ্গে লইয়া, বখ্‌ত খাঁ ও মহম্মদ সফির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সম্মানের জন্য ১১টী তোপধ্বনি হয়। কিন্তু বখ্‌ত খাঁ, প্রথমত নবাব সাহেবকে বিশেষরূপ সম্ভাষণ বা আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। এবং নবাব সাহেব, উপঢৌকন স্বরূপ এক সহস্র মুদ্রা বখ্‌ত খাঁকে প্রদান করিলে, তাহাও তিনি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে মোবারেক শা খাঁর প্ররোচনা-বাক্যে বখ্‌ত খাঁ ঐ টাকা গ্রহণ করেন। তৎপরে বখ্‌ত খাঁর সহিত খাঁ বাহাদুর খাঁর কাণাকাণি কি পরামর্শ হইল। তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রত্যাগমন কালে প্রত্যেক সেনানায়ককে নবাবসাহেব, কিছু কিছু টাকা দিয়া আসিলেন। এবং সমগ্র সৈন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা লোগ্! তোম লোগনে বড়া আচ্ছা কাম কিয়া। খোদানে চাহাতো হাম তোমারে হাতমে সোনে কী কড়ে দেলওয়ায় দেঙ্গে।"

নবাব সাহেব ঘরে গেলেন। আমরাও আপন আপন ঘরে আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, প্রহরীগণ আমাদের গৃহে সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতে নিযুক্ত। আমি মনে মনে বলিলাম,—"বলিহারী পাহারায়!" হে দফাদার সাহেব! তুমি-না বলিয়াছিলে, 'এবার বখ্‌ত খাঁর শক্ত হুকুম,—এস্থান হইতে নড়িলেই প্রাণদণ্ড হইবে!"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্য চতুর্থ দিন, ৩রা জুন, বুধবার। আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া, তামাক খাইতেছি এবং ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে বকিতেছি। কি করি, কোন কাজ কর্ম্ম নাই, কাজেই ভাইকে এক হাত বকিয়া লইতেছি। ভ্রাতার অপরাধ বিশেষ কিছু ছিল না। ভ্রাতাকে আমি প্রাতঃস্নান করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু কাশী একটু ইতস্ততঃ করায় আমি বিরাশী সিক্কার ওজনে ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলাম। কাশী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তৈল মাখিয়া, স্নান করিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া, শুষ্ক বস্ত্র পরিয়াছেন, তখনও আমার বকুনি ফুরায় নাই। শেঠজী বলিলেন, "বাবু সাহেব! আপনি ক্ষেপিলেন নাকি?" আমি বলিলাম, "কিঞ্চিৎ বটে।"

শেঠজী। ভাইটী একে ছেলে-মানুষ, তাহার উপর বন্দী; তাহার উপর এখানে সময়ে আহার

মিলে না;—এ সময় কি বকা ভাল দেখায়, না উচিত হয়?

এইরূপ আমাদের কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় এক সুখের সংবাদ আসিল। অন্ধ চক্ষু পাইলে যেরূপ সুখী হয়, আমি সেইরূপ সুখী হইলাম। পাঁচজন সওয়ার এবং এক জন দফাদার আমার নিকট উপস্থিত হইল। দফাদার এক পার্সী চিঠি এবং এক ছাড়পত্র আমার হাতে দিল। পত্র পড়িয়া ভায়াকে বলিলাম, "উঠ, আর বিলম্ব করিও না; চল, দাদার বাসায় যাই।

পাঠক! বোধ হয়, এতক্ষণ বুঝিয়াছেন;—এই ছাড়পত্র এবং এই অশ্বারোহিগণ মহম্মদ সফি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ভ্রাতৃগৃহে গিয়া আহার করিবার অনুমতি পাইয়াছি। আমাদের দুই ভ্রাতার জন্য দুইটী অশ্বও আসিয়াছে। বেলা তখন আটটা বাজিলেও আমরা দুই ভাই 'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা' করিয়া ছয়জন অশ্বারোহী-পরিবৃত হইয়া, অশ্বারোহণে, আনন্দিত-মনে সহরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। শেঠজীর মুখটী কিন্তু চুণ হইয়া রহিল, দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। আমি বলিলাম, "শেঠজী! আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

আমাদের দুই ভ্রাতার জন্য মহম্মদ সফি, ২টী সুশিক্ষিত, বড় বড় এবং তেজীয়ান্ ঘোড়া, নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সে ঘোড়ার জিনের উপর ক্যাবূলে অর্থাৎ জিনের দুই পার্শ্বস্থ চামড়ার থলির ভিতরে ২টী রিভলবার ছিল।

আমরা ঘোটকদ্বয়ে আরোহণ করিলাম। আমরা আগে আগে,—আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহরী অশ্বারোহীগণ যাইতে লাগিল। তাহাদের কটীবন্ধে তরবারি নিবদ্ধ, বামহস্তে ঘোড়ার লাগাম, দক্ষিণহস্তে বর্শা।

শীঘ্রগতিতে আমরা ময়দান পার হইলাম। সহরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, পথে জনমানব নাই। সমস্ত দোকান বন্ধ, হাটে-বাজারে লোকসমাগম কিছুই নাই। বোধ হইল, সকল লোক এ কালে কোথাও পলাইয়াছে। স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের চিহ্ন দৃষ্ট হইল। কাহারও ঘর সম্পূর্ণ ভাবে দগ্ধ হইয়াছে, কাহারও গৃহ অর্দ্ধদগ্ধ; কাহারও ঘরের কপাট জানালা ভগ্ন; কোথাও বা রাজপথে মৃতদেহ নিপতিত, সৎকার করিবার কেহই নাই; শকুনিকুল সমাগত হইয়া, সেই শবোপরি বসিয়া সানন্দে পচা নরমাংস ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও দেখিলাম, পথিমধ্যে রাশীকৃত গবর্ণমেণ্টের আফিংএর 'বাট' ছড়ান রহিয়াছে। একস্থানে দেখিলাম, বরফি, মিঠাই ও জেলাপির হাঁড়ী ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলা মিঠাই ও বরফি ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে। কোন স্থানে সুজি ও আটার উপর দিয়া ঘোড়া চালাইতে লাগিলাম। প্রকৃতই সহরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

সম্মুখে একদল অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিলাম। তাহাদের হাতে এক একখানি তরবারি। তাহারা আমাদের সম্মুখীন হইয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসিল, "তোমরা কোথা যাইবে?" আমি উত্তর দিলাম, "আমরা বখ্‌ত খাঁর লোক। শুনিলাম, সহরে দারুণ অত্যাচার হইতেছে; তাই অত্যাচারকারীগণকে ধৃত করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তোমরা কে তাহার পরিচয় দাও।" তাহারা বলিল, "আমরা নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর লোক। আমরা নগরের শান্তিরক্ষক।"

আমি। তোমরাই যদি শান্তিরক্ষক; তবে সহরের ভিতর দিন দুপুরে এরূপ ডাকাইতি লুণ্ঠন হত্যা হইতেছে কেন? তোমরা কি কেবল নিদ্রা যাইতেছ? লুণ্ঠনের ভয়ে একজনও দোকানদার দোকান খুলে নাই। তোমরা কোন্ মুখে তবে শান্তিরক্ষক বলিয়া পরিচয় দাও? অথবা তোমরাই বুঝি, ডাকাইত দলের আশ্রয়দাতা এবং অভিভাবক? চল, তোমাদিগকেই বখ্‌ত খাঁর নিকট লইয়া যাই, আগে তোমাদেরই বিচার করা হইবে।

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ভ্রূকুটীভঙ্গী পূর্ব্বক এই কথা বলিবামাত্র সেই অস্ত্রধারী পুরুষগণ পার্শ্বস্থ গলির মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপাতের ন্যায় দ্রুতপদ-সঞ্চারে কে কোথায় যে দৌড়িয়া পলাইল, তাহা আমি ঠিক করিতে পারিলাম না। বলা বাহুল্য, আমি তাহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিলাম না।

এইরূপে নানা ব্যাপার অবলোকন করিয়া, শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (মাতামহকুল-সম্পর্কীয়) দাদা মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দাদার গৃহের দ্বার রুদ্ধ। বাহির দিকে চাবি দেওয়া। "দাদা দাদা" করিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। ভাবিলাম, ইঁহারাও সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছেন নাকি? বিপদ গাঢ়তর দেখিতেছি।

দরজায় ধাক্কা দিলাম, কেহই উত্তর দিল না। আর একবার খুব জোরে ধাক্কা মারিলাম, কপাটের মুখ একটু ফাঁক হইল। দেখিলাম, ভিতর দিক্ হইতে খিল বন্ধ। মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, ভিতরে অবশ্যই লোক আছে। দাদা বুঝি পালান নাই; বিদ্রোহীদের ভয়ে বুঝি ভিতরে খিল, বাহিরে চাবি দিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। তখন বাঙ্গালা ভাষায় আমি ডাকিতে লাগিলাম, "দাদা আমি দুর্গাদাস আসিয়াছি।" হরগোবিন্দ দাদা, তখন ছাত হইতে উত্তর দিলেন, "কে ও, দুর্গাদাস! আমরা এই তোমার কথা বলাবলি করিতেছিলাম। যা হোক প্রাণে-প্রাণে যে বাঁচিয়া আছ, সেই ভাল।" তিনি তখন ছাতের কিনারায় আসিয়া লম্বা দড়িতে বাঁধা একটী চাবি আমার সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলেন। বলিলেন, "সঙ্গে তোমার এসব কি!—এত তুরুক সওয়ার কেন?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আগে ভিতরে যাই, পরে সব কথা বলিতেছি।"

দড়ি হইতে চাবিকাটী খুলিয়া, দরজার চাবি খুলিলাম। ওদিকে হরগোবিন্দ এব হরদেব—ভ্রাতৃদ্বয় খিল খুলিয়া, আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি এবং ভ্রাতা কালীপ্রসাদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। বেঞ্চ এবং মোড়া আনাইয়া দফাদার এবং অশ্বারোহীগণকে বৈঠক-খানার চাতালে বসিতে আসন দিলাম। একজন সওয়ার ঘোটকসমূহের তত্ত্বাবধারণ জন্য বাটীর বহির্ভাগে নিযুক্ত রহিল।

এই দফাদারটী আমার বিশেষ পরিচিত, এবং বন্ধু; আমি ইহাকে বিনা সুদে ১০০৲ শত টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলাম। সেই জন্য, এ ব্যক্তি আমার বিশেষ বাধ্য ছিল। দফাদার জাতিতে মুসলমান, এবং একজন উৎকৃষ্ট পালওয়ান বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত অনেকবার কুস্তি খেলায় জয়লাভ করিয়া অনেকবার সে অনেক টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার নামটী এখন আর আমার মনে নাই।

প্রহরীদগকে প্রথমতঃ বিশেষ অপ্যায়িত করিয়া অভ্যর্থনার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বসাইলাম। তার পর হরগোবিন্দ দাদাকে সকল ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি আমার অবস্থার কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত এবং কাতর হইলেন।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। দাদা বলিলেন, "দুর্গাদাস! যা হইবার তা হইয়াছে, এখন বাটীর ভিতরে গিয়া স্নান আহার কর, বিশ্রাম কর।" আমি বলিলাম, "একা-এক বাটীর ভিতর না গিয়া দফাদারকে আগে জিজ্ঞাসা করা ভাল; কেননা, ওব্যক্তি যদি আমার অন্দর-গমনে আপত্তি করে, তাহা হইলে কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়" আমি হাসিয়া দফাদারকে বলিলাম, "দফাদার সাহেব! আমরা তো এখন বন্দী, তোমরা এক্ষণে আমাদের প্রহরীর স্বরূপ, স্নান আহার তোমার সম্মুখেই কি করিতে হইবে? যদি বল, তবে তাহাই করি।" দফাদার বলিল, "বাবু সাহেব! তাহা করিতে হইবে না, আপনি অন্দরেই যান। আপনার প্রতি আমাদের অবিশ্বাস নাই।"

অনুমতি পাইয়া দুই ভাই বাটীর ভিতর গমন করিলাম। সেখানে গিয়া এক বিপরীত কাণ্ড দেখিলাম! বৃদ্ধ ঠাকুর দাদা রামকমল চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। তিনি আর বাঁচিবেন না ইহা স্থির হইয়াছে। আমি হরগোবিন্দ দাদাকে জিজ্ঞাসিলাম, "ব্যাপার কি?—ইহাঁর ব্যারাম কি?" দাদা বলিলেন, "আজ তিন দিন হইতে ইনি অচেতন। তুমি জান, ইহাঁর অনেকটা করিয়া আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল, তিন বারে আধভরির অধিক আফিং সেবন করিতেন। বিদ্রোহের পর দিন হইতে ইহাঁর আফিং খাওয়া বন্ধ আছে। বাজারের সমস্ত দোকান বন্ধ। আর খোলা থাকিলেই বা পথে বাহির হইয়া কে আফিং আনিতে যাইবে? চারিদিকে ডাকাইত দল ফিরিতেছে। তথাচ সাহসে ভর করিয়া গত কল্য আমি আফিং খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু কোথাও পাই নাই। যখন বাহির হই, তখন ইহাঁর একটু সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু ফিরিয়া আসার পর যখন তিনি শুনিলেন যে, আফিং পাওয়া যায় নাই, তখন হইতেই ইনি সংজ্ঞাহীন হইয়া আছেন।"

আমি বলিলাম, "আফিংএর ভাবনা কি? কত আফিং চাই? আমি এখনইআনাইয়া দিতেছি।" আমি বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় দাদা আফিংএর মূল্যস্বরূপ একটী টাকা আমার হাতে দিতে আসিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "টাকা চাই না। টাকায় এখন আফিং মেলে না। আমি বিনা টাকায় এখনি এত আফিং

আনাইয়া দিব যে, ঠাকুর দাদার ছয় মাস তাহাতে বেশ চলিবে।"

আমি অন্দর হইতে সদরে আসিয়া, দফাদারকে বলিলাম, "দফাদার সাহেব! আমার ঠাকুর দাদার প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে, এ সময় তুমি যদি একটু উপকার কর, তাহা হইলে, তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।"

দফাদার। যদি সাধ্য হয়, তবে এখনি আমি সে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।

আমি। আমার ঠাকুরদাদা আজ তিন দিন আফিং না খাইয়া অচেতন হইয়া আছেন। সহরের দোকান সব বন্ধ,—কোথাও আফিং পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আমরা আসিবার সময় দেখিলাম, গবর্ণমেণ্টের অনেক আফিং রাস্তায় ছড়ান রহিয়াছে। তুমি যদি একবার ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া কিছু আফিং লইয়া আইস, তাহা হইলে, ঠাকুর দাদা প্রাণ প্রাপ্ত হন।

দফাদার। ইহা আর অধিক কাজ কি?

ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ দফাদার উঠিয়া পড়িল। বাহিরে গিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। পনের মিনিট মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া প্রায় তিন সের আফিং আমার হস্তে অর্পণ করিল।

আমি তখন আধভরি আন্দাজ আফিং জলে গুলিয়া, একটু একটু করিয়া ঠাকুরদাদাকে খাওয়াইতে লাগিলাম। দেড় ঘণ্টা পরে ঠাকুরদাদা একটু চৈতন্য লাভ করিলেন। তখন আমি স্নানাহার করিলাম। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে।

বাসায় আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত বিবেচনা করিলাম না;—কেননা, দফাদার প্রভৃতি এখন পর্য্যন্ত কিছুই খায় নাই। দাদাকে বলিলাম,—"আজ আমি আসি;—কল্য আসিয়া, আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিব।" হরগোবিন্দ দাদা কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন ভাই,—"তুমি যে এরূপভাবে বন্দী হইবে, তোমার যে এরূপ দশা ঘটিবে, ইহা কখন ভাবি নাই। তোমার যে এক কালে সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইবে, তাহা কখন মনে ছিল না। এখন তো এই অবস্থা, ভবিষ্যতে যে অদৃষ্টে কি আছে, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? বিশেষ, কাশী ছেলে-মানুষ, সে তোমার সহিত এরূপ কষ্ট কেমন করিয়া সহিবে?"

আমি বলিলাম,—"দাদা আপনি ভাবিবেন না, দুর্গা দুর্গা নাম করিয়া আমরা অচিরে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইব। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। আমাদিগকে বিদায় দিন।"

দাদা। টাকা কড়ি কিছু সঙ্গে রাখিবে কি? বল তো কিছু তোমার হাতে দি।

আমি। টাকার আবশ্যক কিছুই নাই।

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, তবে সাতটী টাকা আমাকে এক্ষণে দিন। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।" দাদা তৎক্ষণাৎ আমার হাতে সাতটী স্থানে আটটী টাকা দিলেন। বলিলেন, "টাকা কিছু হাতে রাখা ভাল" আমি আট টাকা লইয়া বাহিরে আসিলাম। পুরস্কার স্বরূপ দফাদারকে ২৲ টাকা ও পাঁচজন অশ্বারোহীকে পাঁচ টাকা, মোট সাত টাকা প্রদান করিলাম। সওয়ারগণ টাকা পাইয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হইল। দফাদার প্রথমতঃ টাকা লইতে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু আমার জেদে টাকা গ্রহণ করিল। তার পর আমি ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রণাম করিয়া, দুর্গা দুর্গা নাম স্মরণপূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। বেলা তখন প্রায় দেড়টা।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ছয় জন সওয়ার এবং আমরা দুই ভাই এই আট জন, অশ্বারোহণে সহরের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলাম। যে পথ দিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সে পথ দিয়া না গিয়া অন্য পথ ধরিলাম। কিঞ্চিৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার অভিলাষ, সহরের সর্ব্বস্থান সন্দর্শন করা। লুণ্ঠনপ্রিয় বিদ্রোহী সেনাগণ, এবং অত্যাচারী সহরবাসী গুণ্ডাগণ, বেরিলীতে কি যে ভয়ানক রসের অভিনয় করিতেছে, তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। কাহারও মাটীর পাঁচীর ভাঙ্গা, কাহারও খোলার চাল ভাঙ্গা, কাহারও অশ্বালয়ে অশ্ব অপহৃত, গোশালায় গোগণ অপহৃত। সর্ব্বত্রই নীরব নিস্তব্ধভাব। পক্ষিকুলও যেন পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে আর ডাকে না। সহরের ভগ্নশ্রী দেখিয়া হৃদয়ে বড় ব্যথা জন্মিল। চকের বাজারে গিয়া উপনীত হইলাম। অদূরে গভীর আর্ত্তনাদ হইতেছিল। আমরা বেগে অশ্ব ছুটাইয়া সেই দিকে গেলাম। দেখিলাম, প্রায় ২৫ জন দস্যু, নর্ত্তকী পান্নার গৃহ আক্রমণ করিয়াছে

পান্নাসুন্দরী।*

পান্না ষোড়শী; অকলঙ্ক শশী। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলিয়া, পান্না রোহিলখণ্ডে সুবিখ্যাতা। ঐ প্রদেশস্থ সর্ব্বসাধারণের ধারণা,—পান্নার ন্যায় রূপবতী এবং গুণবতী রমণী বুঝি ধরাধামে আর জন্ম গ্রহণ করে নাই।

পান্না সুশীলা "চরিত্রযুক্তা" বুদ্ধিমতী। নর্ত্তকী বলিয়া সে বারবিলাসিনী নহে। বিধাতার বিধানে সে পরপুরুষগামিনী বটে, কিন্তু একের প্রতিই তার মতি-গতি। যখন যার তখন তার। কর্ণেল ক্রুশম্যান বলিতেন, "পান্নার মুখের মধুর হাসিটুকুর দামই দশহাজার টাকা।"

পান্না রামজানী-জাতীয়া। আচারনিষ্ঠা, প্রকৃত হিন্দুর ন্যায়। প্রত্যূষে স্নান করিয়া পান্না, এক ঘণ্টা-কাল শিবদুর্গার পূজা করিত এবং সেই সময় কাগজে হিন্দী অক্ষরে একশত আটটী করিয়া রাম নাম লিখিত। সপ্তাহান্তে প্রত্যেক রাম নাম স্বতন্ত্র করিয়া কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিত। সেই কাগজের টুক্‌রা আটার সহিত মিশাইয়া মটরের ন্যায় এক একটী বড়ি তৈয়ারি করিত। এইরূপে সপ্তাহে ৭৫৬টী রাম নামের গুলি হইত। একজন শুদ্ধ-চারী ব্রাহ্মণ, সেই রামনামের গুলি সমূহ মৎস্য-কুলের আহারের জন্য রাম-গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিতেন।

পান্না, মাছ-মাংস খাইত না। পান্না যেখানে বসিত, সেখানে, কোন মুসলমান বসিতে পাইত না। মুসলমানস্পৃষ্ট হইলে, পান্না স্নান করিত। যে বিছানায় হুঁকা থাকিত, সে বিছানা হঠাৎ কোন মুসলমান বা নীচজাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পান্না, তৎক্ষণাৎ হুঁকার জল পরিবর্ত্তন করাইত।

উচ্চশ্রেণীর রামজানী-জাতীয়া প্রায় সকল নর্ত্তকীই এরূপ আচারবতী। পান্না ভ্রাতৃগৃহেই থাকিত। ভ্রাতা গৃহস্থ, তাঁহার স্ত্রী কুলবধূ, মাতাও পরদা-নসীন। ভ্রাতৃবধূর ঘোমটা দীর্ঘ। অসূর্য্য-স্পশ্যরূপা বলিয়া যে কথা আছে, তাহা পান্নার ভ্রাতৃজায়াতেই সার্থক হইয়াছে।

বাহিরের বৈঠক খানাই পান্নার অধিকার। পান্না সেই খানেই থাকিত। সেই খানেই ওস্তাদ আসিয়া পান্নাকে নৃত্য গীতাদি শিক্ষা দিত। সেই খানেই পান্নার বন্ধু বান্ধব আসিয়া পান্নার সহিত আলাপ পরিচয় করিত। অন্দরে থাকিত, পান্নার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া এবং মাতা। তাহারা গৃহস্থ।

পান্নার রঙ সাদা ধপ্‌ধপে, সেই শ্বেতপদ্ম হইতে গোলাপী রঙের আভা ঈষৎ দৃষ্ট হইত। মনে হইত বুঝি স্বর্গের কোন বিদ্যাধরী ধরাধামকে আলোকিত করিতে আসিয়াছেন।

বড় বড় ইংরেজগণ বলিতেন, ইংলণ্ডীয় রমণী বলিয়া পান্নাকে ভ্রম হয়; কেননা, পান্নার যেরূপ রঙ, সেরূপ রঙ এ দেশে সম্ভবে না।

ত্রিতলের ছাদে উঠিয়া নয়নজলে ভাসিয়া পান্না কাতরকণ্ঠে সকলকে বলিতেছে,—"কে আছ; আমাকে রক্ষা কর। দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ, আমার ধনপ্রাণ লইতে আসিয়াছে। এ দিকে পান্নার গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া কয়েকজন দস্যু দ্বিতলের দ্বার ভগ্ন করিতেছে। দুপ্ দাপ্ শব্দ হইতেছে। পাছে কেহ পান্নার বাটীতে প্রবেশ করে, এই জন্য দশ বার জন বিকটাকার মনুষ্য, সম্মুখদ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহা-দের প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে এক এক খানি তরবারী। কাহারও বা হাতে লৌহমণ্ডিত লাঠী। সেই ভীমদর্শন পুরুষগণ "আলি আলি" শব্দ করিয়া তরবারী এবং লাঠী ঘুরাইতেছে। কাহার এমন সাধ্য যে, সহজে তাহাদের নিকট অগ্রসর হয়। আমি নিকটস্থ সওয়ারের নিকট হইতে একটী বর্শা-লইয়া উন্মত্তের ন্যায় ভীষণভাবে দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দফাদার ও পাঁচজন সওয়ার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল, ভায়া কালীপ্রসাদ কেবল পশ্চাতে

---

* বড়ই বিড়ম্বনা হইল। কাঠে যে ছবি খোদাই হইয়া জন্মভূমির সহিত ছাপা হইতেছে,—তাহার সহিত পান্নার চেহারার বিশেষ মিল নাই। স্বর্গ-নরক প্রভেদ হইয়াছে। কারিকরের দোষে এরূপ ঘটিয়াছে। গজ-দন্তের উপর অঙ্কিত পান্নাসুন্দরীর মূর্ত্তি একখানি আমার নিকট আছে।

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রহিল। আমি ভ্রূকুটী করিয়া, দন্তে-দন্তে ঘর্ষণ করিয়া আরক্ত-লোচনে বাম হস্তে অশ্বরজ্জু ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে সেই তীক্ষ্ণধার বর্ষা উদ্যত করিয়া কহিলাম; "কেঁও বদমাইস্ লোগ! এ ক্যা জুলুম হ্যায়? দিন দোপরমে বেগুনা আওরৎকে মোকান পর ডাঁকা ডাল্‌তা হ্যায়? অভি চলা যাও, নেহিতো অভি সবকা জান্ লে লুঙ্গা।"

আমার বর্ষা উত্তোলন দেখিয়া সওয়ারগণ ঠিক সেই ভাবেই বর্ষা উত্তোলন করিয়া রহিল।

সাধু এবং দস্যুর প্রভেদ এই স্থানেই বুঝা যায়। তাহারা দলে পুষ্ট হইলেও, পাশববলে আমাদের অপেক্ষা বলীয়ান হইলেও, দস্যুগণ কেমন যেন থতমত খাইয়া উঠিল। সহসা কোন কথার উত্তর দিবার তাহাদের শক্তি রহিল না। আমি তাহাদিগকে মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বজ্রনিনাদে বলিলাম, "জল্‌দী জবাব দেও শালে লোগ্।"

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বর্ষার তীক্ষ্ণধার অগ্রভাগটী সম্মুখস্থ বিকটাকার পুরুষের বক্ষঃস্থলের আরও নিকটে লইয়া গেলাম। সেই বিকটাকার ব্যক্তি তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "আমরা খাঁ বাহাদুর খাঁর লোক। এই বাটীতে একজন ইংরেজের বিবি, হিন্দুস্থানীর বেশ পরিয়া হিন্দুস্থানী সাজিয়া লুকাইয়া আছে। নবাব সাহেবের হুকুমে আমরা তাহাকে ধরিতে আসিয়াছি।"

আমি পূর্ব্ববৎ তীব্রস্বরে বলিলাম, "কে বলিল, এখানে বিবি লুকাইয়া আছে? তোদের সকল কথাই মিথ্যা। বদমাইস! ডাকাইত!

সেই দস্যুদল হইতে একজন উত্তর করিল, "কে বলিল, আমাদের কথা মিথ্যা?" এই কথা তাহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র, দফাদার সাহেব তীরবেগে তাহার নিকট গিয়া তাহার টুঁটী ধরিয়া টানিয়া আনিল এবং খানিক কানমলার ঘোড়দৌড় করাইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দফাদার একজন পালওয়ান, কুস্তিগীর জোয়ান, শরীর যেন লৌহময়। বিষম কর্ণমর্দ্দনে দস্যুর কাণ দিয়া টস্ টস্ রক্ত পড়িতে লাগিল।

দ্বিতলে উঠিয়া যে সকল দস্যু দরজা ভাঙ্গিতে-ছিল, তাহারা নিম্নে কিছু গোলযোগ বুঝিয়া নামিয়া আসিল। অবতরণ মাত্র তাহাদের হস্তস্থিত লাঠী তরবারী মুগুর প্রভৃতি দফাদার সাহেব কাড়িয়া লইতে লাগিল। তাহারা কেমন বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া, 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন উচ্চবাচ্য করিতে পারিল না। দুই একজন দস্যু পলাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সওয়ারগণ দ্রুতপদে গিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল। আমি বলিলাম, "যে পলাইবার চেষ্টা করিবে, তাহাকে এখনি কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিব। খবরদার—তোমরা আমার সঙ্গে সেনাপতি বখ্‌ত খাঁর নিকট চল। সেখানে তোমাদের বিচার হইবে।"

বখ্‌ত খাঁর নাম শুনিয়া সকলের মুখ আরও শুষ্ক হইল। তখন সেই বিকটাকার পুরুষ, আমার পায়ে ধরিয়া বসিয়া পড়িল। অতি কাতর স্বরে বলিল, "এ দফা আমাদিগকে ক্ষমা করুন," আপনি যাহা দণ্ড দিতে হয় দিউন, বখ্‌ত খাঁর নিকট লইয়া যাইবেন না; দোহাই আপনার। আমি বলিলাম, "তুমি যদি সত্য কথা বল, তাহা হইলে তোমায় এ যাত্রা ছাড়িয়া দিব। বল কাহার হুকুমে পান্না বিবিকে এরূপ ভাবে ধরিতে আসিয়াছ?"

বিকটাকার পুরুষ যোড়হাতে কহিল, হুজুর! মা-বাপ; আমাকে এর পর রক্ষা করেন তো বলি।"

আমি। তোমার কিছু ভয় নাই; তুমি বল।

বিকটাকার পুরুষ। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ পান্নাকে ধরিয়া আনিতে বলেন নাই; তিনি এবিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। এই সহরের একজন রেইস যাঁহার নাম শ্রী——ইনি খুব বড় লোক। আপনিই কোন্‌না ইহাঁকে চেনেন? আজ ছয় মাস হইতে ঐ রেইসের পান্নার উপর নজর পড়ে, পান্নাকে তিনি অনেক টাকা ও মণি মুক্তা দিবার প্রলোভন দেখান। কিন্তু পান্না কিছুতেই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। অবশেষে বিদ্রোহের পর, সহরে যখন অরাজকতা উপস্থিত হইল, তখন তিনি আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "পান্নাকে ধরিয়া আনিতে পারিলে তোমাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিব।" পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়াছেন, আর বাকী টাকা পরে দিবেন বলিয়াছেন। দোহাই হুজুর! আমি সত্য কথা কহিলাম, আমাকে ছাড়িয়া দিন।

আমি। তুমি আল্লার নাম করিয়া শপথ করিয়া বল, আর কখন পান্নার গৃহ আক্রমণ করিবে না।

বিকটাকার পুরুষ। আমি আল্লার নাম করি-য়াই বলিতেছি, আর কখন পান্নার গৃহ আক্রমণ

করিব না। পান্না আমার মা। মাকে যেমন সন্তানে রক্ষা করে, আমি তেমনি পান্নাকে রক্ষা করিব।

আমি ভাবিলাম, আমি নিজে তো বন্দী, সদাই প্রহরি-বেষ্টিত। আমিই বা ২০।২৫ জন ডাকাইতকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কি করিব?

আমি তখন সেই বিকটাকার পুরুষকে বলিলাম, "তোমরা আপন আপন ঘরে যাও। দেখিও সত্য-পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হইও না।"

তখন সেই ২৫ জন দস্যু এককালে মুক্তকণ্ঠে এই ভাবে বলিয়া উঠিল, "পান্না আমাদের মা, পান্নাকে আমরা সতত রক্ষা করিব।"

যে সকল লাঠী ও তরবারী কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা দস্যুগণকে প্রত্যর্পণ করা হইল।

দস্যুগণ পলায়নে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় উপরিতল হইতে পান্না সুন্দরী, তাঁহার ভ্রাতার সহিত নিম্নতলে আমার নিকট উপনীত হইলেন। পান্না তখন আলুলায়িতকেশা, আলুথালু-বেশা, নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। তখনও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। তখন বক্ষঃস্থল একবার স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, আবার তালে তালে নিম্নে নামিতেছে।

পান্নার সহিত পূর্ব্ব হইতেই আমার পরিচয় ছিল। সেনানিবাসে তাঁহার অনেকবার নাচ হইয়াছিল। ইংরেজগণ পান্না ব্যতীত অন্য কোন নর্ত্তকী পছন্দ করিত না। কাজেই আমাকে পান্নার বায়না করিতে হইত।

বসন-ভূষণে ভূষিত—নর্ত্তকীর সাজে সজ্জিত—অবস্থায়, পান্নাকে যেরূপ সুন্দরী দেখাইত, আজ তাহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী দেখাইতে লাগিল। মরি মরি বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

পান্না অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদস্বরে যোড়হাতে আমাকে বলিল, "বাবু সাহেব! আপনি না থাকিলে আজ আমার প্রাণ যাইত। আপনার এ ঋণ পরিশোধ হইবার নহে। এই অধমা নারী নর্ত্তকী-জাতীয়া। আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, যদি কোন দোষ না থাকে, তবে আপনার পদধূলি আমার শিরোপরি প্রদান করুন।"

এই বলিয়া পান্না আমার পদপ্রান্তে পতিত হইল। আমি পান্নার দক্ষিণ করকমল ধরিয়া ভূমিতল হইতে উঠাইলাম। পান্নার তখন দুই চক্ষু দিয়া শতধারা বহিতেছে। কথা কহিবার শক্তি তার তখন আর নাই।

পান্নার ভ্রাতা জল আনিয়া দিলে, পান্না মুখ ধুইল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, পান্না ভাবে জানাইল, (স্পষ্টত বলিতে সাহস করিল না) আমি এই খানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করি।

আমি বলিলাম, "আমি বন্দী। বসিবার যো নাই।"

পান্না ভয়চকিতা হরিণীর ন্যায় শিহরিয়া উঠিল। চক্ষুকোণে আবার অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তখন দুই চারি কথায় সংক্ষেপে পান্নাকে আমার অবস্থা বুঝাইলাম; বলিলাম, "যদি জীবিত থাকি, যদি কখন মুক্তিলাভ করিতে পারি, তবে আবার তোমার সহিত দেখা করিব। অদ্য বিদায়।"

পান্না তখন আর কোন কথা না কহিয়া, আবার আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। আমিও তখন আর কোন কথা না কহিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, অশ্বারোহিগণ-সহ দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলাম।

আমাদের হাজত।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রজবাবুর বিরক্তি।

যাহার জন্য আমরা এতক্ষণ ব্যাকুল হইয়াছিলাম, যে মহাস্থান-সন্দর্শনার্থ মন এতক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল,—এতক্ষণে তাহার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইলাম, এতক্ষণে তাহার পূর্ণ দর্শনসুখ সম্ভোগ করিলাম। দেহ কণ্টকিত হইল, মন পুলকে পূর্ণ হইল; মুখমণ্ডলে কে যেন আনন্দ-মাখা হাসি-হাসি ভাব মাখাইয়া দিল।

কৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"মুখে যে, আর হাসি ধরে না;—রকম কি? এত উল্লাস কিসের?"

আমি। যাহা সুদুর্লভ, তাহা যদি সহজে করতলগত হয়, তবে আনন্দ-উল্লাস হইবে না কেন? ইহজীবনে যাহা কখন আশা করি নাই, তাহাই আজ হঠাৎ করতলগত হইল,—করতলগত কেন,—পদতলগত হইল,—সুতরাং আনন্দ-উল্লাস না হইবে কেন? রাজ-দরবারে বোধ হয় লক্ষটাকা গণিয়া দিলেও, এই হাজত-বাসের অধিকার প্রাপ্ত হইতাম না;—কিন্তু অদ্য বিনামূল্যে এ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইলাম। আমার চন্দ্র-লোক গমন, ধ্রুব-লোক

গমন, বা বৈকুণ্ঠ-লোক গমন একদিন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এই হাজত-লোক আগমনের সম্ভাবনা কিছুই ছিল না। বরং নিজগুণে ক্রমশ আমি অৰ্দ্ধেক রাজ্য এবং একটী রাজকন্যা পাইবার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারি,—কিন্তু এককালে যে, সমগ্র হাজত-রাজ্যের অধীশ্বর হইব,—এ আশা কবে মনে উদিত হইয়াছিল? যাহা কখন ভাবি নাই, ভাবিয়াও কল্পনায় অঙ্কিত করিতে পারি নাই,—আজ তাহাই ঘটিল, তাহাই আজ চক্ষে দেখিতে হইল। যাহা দেবতা-দুর্লভ, মুনি-ঋষি-গতির যাহা অগোচর,—রাজা যুধিষ্ঠির যাহা প্রাপ্ত হন নাই,—আজ তাহাই প্রাপ্ত হইলাম,—চক্ষু-কর্ণ-নাসা দ্বারা উপভোগ করিতে পাইলাম। এমন শুভদিন, সুখের দিন বুঝি আর হইবেনা! কৃষ্ণবাবু! আপনিও আনন্দ করুন—"

কৃষ্ণবাবু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন,—"প্রকৃতই আজ মহা আনন্দের দিন বটে,——"

আমি। একবার "হরি, হরি" বলিয়া আনন্দ-ধ্বনি করুন।

ব্রজবাবু আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন,—"আপনাদের যদি এতই আনন্দ হইয়া থাকে, তবে একবার দুই হাত তুলিয়া নাচিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "নাচে আমার আপত্তি নাই,—কিন্তু আমি হইলাম ওজনে তিনমণ দশ সের, আর কৃষ্ণবাবু হইলেন দৈর্ঘ্যে ছয় ফিট দুই ইঞ্চি,—আমাদের মহানৃত্য আরম্ভ হইলে, লোক সকল মূৰ্চ্ছিত হইতে পারে। যাহা হউক, বিধাতা যদি দিন দেন,—আপনি নাচিতে অনুরোধ না করিলেও, আমরা তখন নিশ্চয় নাচিব।

ব্রজবাবু। সে দিনটা কি? সে কেমন দিন?

আমি। পূৰ্ব্বজন্মের এমন কি পুণ্যবল আছে যে, সেদিন সহজে আসিবে?

ব্রজবাবু। বলুনই না, সে দিনটা কি দিন?

আমি। যে দিন আমাদের কারাবাসের হুকুম হইবে—সেই দিন। হাজত স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি মাত্র,—কিন্তু কারাগার,—অমরাবতী। কারাগারে নন্দন-কানন আছে, পারিজাত পুষ্প আছে; এখানে বসন্ত বারমাস বিরাজিত;—এখানে অষ্ট-প্রহরই কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটীর।

ব্রজবাবু কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিলেন "আপনার ওসব কি হইতেছে? আবার বুঝি সেইরূপ আরম্ভ করিলেন?"

আমি। সেইরূপ,—কিরূপ?

ব্রজ। সেই,—সেই, রসিকতা!!

আমি। হাঁ,—বটে! হাজতের রসিকতা এই রূপই!—আমি আপনাকে এ কথা কতবার বুঝা-ইব? হাজতের কথা—কাব্য; বাক্য—বেদ; রসনা—রসময়,—রঙ্গভঙ্গ—রসিকতাময়!! লঙ্কায় লোহা পাওয়া যায় না, সমস্তই সোণা; হাজতে গদ্য নাই, কেবলই পদ্য। হাজতে মুক্তা নাই, কেবলই মুক্তা;—পাট-শণ নাই, কেবলই ধবল চামর।

ব্রজবাবু। আচ্ছা, তাই বটে,—আপনি এখন থামুন!

আমি। হাজতে থামাথামি নাই,—একসাই চলন চাই! হাজতে সুপথ, বিপথ, কুপথ নাই,—আপদ, বিপদ, সম্পদ নাই,—সব সমভাব, সমান চাল। এখানে রাজা দেখিয়া প্রজা থামে না, প্রজা দেখিয়া রাজা থামে না; সবাই সকল সময় সমান সচল! এ হাজত-জগন্নাথক্ষেত্রে অচল কেহই নাই, মেথর-মুদ্দফরাস হইতে মুকুটধারী রাজা পৰ্য্যন্ত,—সকলেই সমান সচল!

ব্রজবাবু। কি আপদেই পড়িয়াছি! আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না; আমিও আর আপনার সঙ্গে কথা কহিব না।

এই বলিয়া, শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়,—কার্য্যাধ্যক্ষ বলিয়া অভিযুক্ত মহাশয়,—যেন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া আমার নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি অৰ্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিলাম, "হাজতে ত কথা নাই,—কহিব কিরূপে? এখানে যে, সবই কাব্য।"

নবম পরিচ্ছেদ।

নীলমণি অধিকারী।

আলিপুর-কারাগারের ভিতর, উত্তরাংশে, এক কোণে, হাজত-ভবন অবস্থিত। কারাগারের প্রাচীর খুব উচ্চ;—হাজত-ভবনের প্রাচীর ইহার অৰ্দ্ধেক উচ্চ। যেরূপ সমুদায় কারাগারের চারি-দিকে প্রাচীর আছে, সেইরূপ হাজতভবনের চারিদিকেও প্রাচীর বর্ত্তমান। যেমন লোহার সিন্দুকের ভিতর একটী কাঠের বাক্স, সেইরূপ কারাগারের ভিতর হাজত। যেমন ফলের ভিতর আঁটী, সেইরূপ জেলের ভিতর হাজত।

হাজত-ভবনের দুই দ্বার—এক উত্তরে, এক দক্ষিণে। উত্তরের দ্বার দিয়া আসামীগণ হাজত-ভবনে প্রবেশ করে; এবং হাজত-ভবন হইতে বাহিরে যায়;—আর দক্ষিণ দ্বার দিয়া জমাদার প্রভৃতি বেতনভুক্ কর্ম্মচারিগণ হাজত-গৃহে যাওয়া-আশা করিয়া থাকে।

আমরা উত্তর দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক হাজত-ভবনে প্রবেশ করিলাম। তখনও অল্প রৌদ্র আছে। রৌদ্র থাকুক,—কিন্তু বেলা অবসানপ্রায়। আমরা চারিমূর্ত্তি প্রবেশ করিবামাত্র,—হাজতস্থ যাবতীয় লোক চিত্রার্পিতের ন্যায় আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা অনিমেষ লোচনে বর-বপুর বাহার হেরিতে লাগিল। হেরিবারই কথা! আমার ন্যায় এরূপ স্থূল কলেবর, কৃষ্ণবাবুর ন্যায় এরূপ দীর্ঘ দেহ,—তাহারা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে হাজতে আসিতে কখন দেখে নাই।

হাজতের ভিতর আমাদেরও দেখিবার সামগ্রী অনেক। আমরা চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড উঠান;—লহলহ ঘাসে ঢাকা; সে ঘাসের উপর দিয়া যাইবার কাহারও আজ্ঞা নাই। তার পশ্চিম পাশ দিয়া এক রাস্তা আছে। রাস্তাটী বোধ হয় আড়াই ফিট প্রশস্ত; ইটের উপর সুরকি দিয়া পিটিয়া তৈয়ারি হইয়াছে। বর্ষাকাল;—পথের মাঝে মাঝে শেওলা পড়িয়া পিছল হইয়াছে। পথিমধ্যে কোথাও বা দুই চারি গাছি ঘাস গজাইয়াছে। পড়িয়া যাইবার ভয়ে আমি সেই পথ দিয়া পা'টিপিয়া-টিপিয়া চলিতে লাগিলাম। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, কৃষ্ণবাবু আমাদের সহচর প্রহরী-জমাদারকে জিজ্ঞাসিলেন,—"পায়খানা কোথা?" প্রহরী পূর্ব্বদিকে অঙ্গুল-নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইল,—"ঐ দেখুন, পায়খানা।"

কৃষ্ণবাবু। আমি বাহে যাইব!

আমি। এ-যে, বিবাহ সময়ে কন্যার সেই কথাটীর ন্যায় ঠিক হইল।

জমাদার। তবে আর এ-দিকে কেন? ঐদিকে যাউন। দেখিবেন,—ঘাসের উপর দিয়া যাইবার হুকুম নাই।

যে পথ দিয়া অগ্রগামী হইয়াছিলাম, সেই পথ দিয়াই কৃষ্ণবাবু ফিরিলেন,—একটু গিয়া, পূর্ব্বমুখ এক পথ ধরিলেন। আমিও কৃষ্ণবাবুর সঙ্গ ছাড়িলাম না। কৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি এ দিকে কেন?"

আমি। আপাততঃ আমি প্রস্রাব—। তার পর আপনার মুখে পায়খানার বর্ণন শুনিলে, আমি তথায় যাওয়া না যাওয়া স্থির করিব।

সম্মুখে দেখিলাম,—একতলা ইটের এক লম্বা ঘর। সেই ঘরকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিন কুঠারী স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। তাহার দুইটী কুঠারীতে চাবা বন্ধ;—উত্তরের শেষ কুঠারীটী খোলা—অবারিত দ্বার,—সেইটীই পায়খানা।

পায়খানার সম্মুখে এক নর্দ্দমা,—এক হাত প্রশস্ত, দশ হাত লম্বা হইবে। নর্দ্দমা ইটে গাঁথা—সিমেণ্ট করা। এক জন ভীমকায় পুরুষ এক লম্বা বাঁশের লাঠী লইয়া, সেই নর্দ্দমা সাফ করিতেছে। সেই লাঠির অগ্রভাগে স্তূপাকার পাট-শণ-খড় জড়ানো আছে। সেই ভীমকায় পুরুষটী লাঠীর সেই অগ্রভাগ দ্বারা নর্দ্দমার গাত্র ঘষিতেছে। আর, মাঝে-মাঝে টবস্থিত জল লইয়া নর্দ্দমায় ঢালিতেছে। সেই ব্যক্তির চেহারা, রঙ্গ-ভঙ্গ এবং কার্য্য দেখিয়া, হাজতের মেথর বলিয়া ঠিক করিলাম। তাহার পরিধান হাঁটু পর্য্যন্ত বিলম্বিত জাঙ্গিয়া, গায়ে কান্‌বিসের এক কোর্ত্তা, কোমরে পিতলের এক চাপরাস্ বাঁধা,—মাথায় নীল কাপড়ের এক নূতন ধরণের পাগড়ী। তাহার চক্ষু দুটা গোল-গোল, সদাই যেন ঘুরিতেছে; হাতের আঙ্গুল মোটা-মোটা,—পাথরের ন্যায় কঠিন বলিয়া বোধ হইল। বক্ষস্থল প্রশস্ত; বয়স কিন্তু পঞ্চাশের কম নহে। মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়,—এ ব্যক্তি যৌবনে ভারি জোয়ান ছিল। এখনও তাহার দেহে বিলক্ষণ শক্তি আছে বলিয়া বোধ হইল। মুখ গম্ভীর; তাহাতে কে যেন বিরক্তি-ভাবের এক-পোঁচ বার্ণিস মাখাইয়া রাখিয়াছে। মনে হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে কথা কহিলেই, সে যেন আমাদিগকে খ্যাঁক্ করিয়া কামড়াইতে আসিবে।

আমি কৃষ্ণবাবুকে আস্তে আস্তে বলিলাম,—"হাজতের মেথর দেখুন,—ঠিক যেন যমদূত।"

কৃষ্ণবাবু কহিলেন, "যস্মিন্ দেশে যদাচার।"

ক্রমেই সেই যমদূতের অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। তখন সেই যমদূত তীব্রকটাক্ষে আমাদের আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিল। নর্দ্দমা পরিষ্কার কাজ বন্ধ করিয়া, সেই দীর্ঘ রাইবাঁশটী দক্ষিণ হস্তে ধৃত করিয়া অতি কঠোর ঘোর বাজখাঁই কর্কশ স্বরে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"তোমরা কে গো?—কিকরবে এখানে?"

বাপ্‌! যমদূতের সেই কিটি-কিটি-কিঙ্কিনী নিরেট' কাঁসরের ধ্বনি,—আজও আমার কাণে লাগিয়া আছে। সম্মুখে শতকামান দাগিলে যেরূপ বিচলিত না হইতে হয়, কিন্তু যমদূতের সেই এক ভৈরব লোমহর্ষণ গলার আওয়াজেই বস্‌ আছে।

কৃষ্ণবাবু পথের খুব কিনারা দিয়া চলিতেছেন,—সম্ভবত দুই-একগাছি ঘাস তাঁহার পায়ে ঠেকিয়া থাকিবে। যমদূত অমনি পূর্ব্বের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল,—"এটা শ্বশুর-বাড়ী নয়,—এটা জোমালয় *; এখানে পথ দেখে পথ চল্‌তে হয়;—এখানে এক-একগাছি ঘাস মাড়াবে, আর এক-একগাছি বেত তোমাদের পিঠে পড়বে।"

কৃষ্ণবাবু, অমনি একটু থতমত খাইয়া, পথের ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও অল্প একপেশে ছিলাম,—গতিক বুঝিয়া, মাঝখানে আসিলাম। পথের মধ্যেও দুই-চারি-গাছি ঘাস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—'এ ঘাস পায়ে ঠেকিলেও দোষ আছে কি না? উঠানের ঘাস-স্পর্শে যখন দোষ, তখন এ ঘাস-স্পর্শে যে, দোষ হইবে না,—তাহা কে বলিল? উভয়েই ঘাসজাতীয় বটে ত! তবে স্থানমাহাত্ম্যে পথের ঘাস যদি নির্দ্দোষ হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না।' সাবধানের বিনাশ নাই।—আমি, সেই পথের ঘাসগুলিকেও মাড়াইলাম না। কি যদি বড় সাহেবের সখই হইয়া থাকে যে, হাজত-ভবনের পথের মধ্যে স্থানে স্থানে নবদূর্ব্বাদলের সমাবেশ থাকিবে!! যমদূতের আদেশ মত, পথ দেখিয়া দেখিয়া, ঘাসশূন্য স্থান দিয়া, নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিলাম।

আমাদের কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতে না-হইতে, কৃষ্ণবাবুর দিকে চাহিয়া, যমদূত কহিল, "বাহ্যে যাবে কি?"

কৃষ্ণবাবু। হাঁ।

যমদূত। তবে এইদিকে আসিয়া এইখানে দাঁড়াও। আমি বাটী নিয়া আসিতেছি।

পায়খানার ঘরের সংলগ্ন, চাবি-বন্ধ যে দুইটী ঘর ছিল, তাহার মধ্যে দক্ষিণদিকের ঘরটী খুলিয়া যমদূত বাটী বাহির করিতে গেল।

* এই যমদূত,—যমালয়ের উচ্চারণটী 'জোমালয়' করিয়া থাকে। মুখটী ছুঁচাল করিয়া, 'জ' অক্ষরে 'ও'কার সংযোগ করিয়া, অতি চমৎকার রূপ সে, 'জোমালয়' কথাটী কহিয়া থাকে।

আমি ভাবিলাম, 'বাটী কেন? বাটীতে তো ডাল, দুধ, পায়স, প্রভৃতি রাখিয়া খাইতে হয়। কৃষ্ণবাবু তো পায়খানা যাইবেন, সুতরাং তাহার জন্য বাটী আবশ্যক হয় কেন?'

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়, লোহার চারি খানি সরা লইয়া, যমদূত গৃহ হইতে, নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দক্ষিণ হস্তে দুই খানি ছোট সরা, বাম হস্তে দুই খানি বড় সরা।

সরা দেখিয়া ভাবিলাম, এ আবার কি রকম হইল? যমদূত "বাটী আনিব" বলিয়া গিয়া, সরা আনিল কেন? সরাগুলা আবার লোহার তৈয়ারি দেখিতেছি! এই লৌহ-সরা-চতুষ্টয় দ্বারা, কৃষ্ণবাবুর পায়খানা-গমনের যে কি সুবিধা হইবে, বা কি সাহায্য ঘটিবে, প্রকৃতই আমি তখন প্রগাঢ় চিন্তা করিয়াও, বুঝিতে পারিলাম না।

যমদূত নিকটবর্ত্তী হইয়া, দক্ষিণ-হস্ত-স্থিত এক খানি ছোট সরা কৃষ্ণবাবুর হাতে দিয়া বলিল,—"এই—বাটী লাও।" বাম হস্তের একখানি বড় সরা কৃষ্ণবাবুর হাতে দিয়া, যমদূত বলিল,—"এই—থালা লাও।"

আমি তো অবাক্‌! ভোজ-বাজীতে সাদা,—কাল হইবার কথা শুনিয়াছি; কিন্তু বাটী, সরা হইবার কথা কস্মিন্‌কালেও শুনি নাই। বাঙ্গালা অভিধানের নূতন সংস্করণে, বাটীর অর্থ, 'হাজতে সরা' এ কথা লিখিয়া দেওয়া উচিত।

কৃষ্ণবাবু আর নীরব থাকিতে না পারিয়া, সাহসে ভর করিয়া, যমদূতকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—"লোহার সরা দুইখানি লইয়া কি করিব?"

যমদূত এক বিকট বিভীষণ হুঙ্কার ছাড়িয়া উত্তর দিল;—"একে সরা বলেনা;—এ সরা নয়,—সরা নয়। জেলখানায়, এর নাম থালা আর বাটী। যখন ঘরে যাবে, তখন স্ত্রীর পাশে দুয়ারে ব'সে, এ-কে 'সরা, সরা, সরা' একশবার ব'লো।"

কৃষ্ণবাবু। (ঈষৎ হাসিয়া) তাই না হয়, বাটী বলিলাম,—

যমদূত। এখানে হাসিলে চলিবে না! এ হাসি-খুসীর জায়গা নয়! এ জোমালয়! জোমালয়! জোমালয়!

আমি তখন, যমদূতের কথা-মধু কাণ দ্বারা পান করিয়া, প্রাণকে কেবল তৃপ্ত করিতে লাগিলাম।

এমন সময়, যমদূত, আমার দিকে চাহিয়া, পূর্ব্ববৎ মধুরস্বরে, সম্বোধন করিয়া কহিল,—"তুমি

অমন জয়-জগন্নাথটীর মতন চুপটী ক'রে খাড়া দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাহ্যে যাবে তো, এই বাটী নিয়ে, ওর সঙ্গে একত্রে যাও।"

আমি তথাচ নীরব। কোন্ কথার কি ভাবে উত্তর দিব, সত্য সত্যই তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কূল-কিনারা, কিছুরই দেখিতে পাইলাম না। বাটী অর্থাৎ একখানি ছোট চিটকে লোহার সরা, হাতে করিয়া লইয়া, পায়খানায় গিয়া কি করিব? সরাখানি কোন্ বিভাগের কোন্ কাজে আসিবে? আর এক কথা এই; যমদূত, একই পায়খানায় একই সময়ে আমাদের দুইজনকেই যাইতে বলিল। তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? এ দিকে, আমি যদি এখন বলি যে, আমি পায়খানায় যাইব না, কেবল প্রস্রাব বসিতে আসিয়াছি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-বদন-বিনিঃসৃত পায়খানা-ধামের বর্ণন শ্রবণানন্তর) পায়খানা-গমনরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিলে, যমদূত মহোদয় তদীয় তীক্ষ্ণধার বিষাক্ত, দংষ্ট্রানিচয় দ্বারা, আমার মর্ম্মস্থানে দংশন করিয়া ফেলিবে। কাজেই তখন আমি নীরবই রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া যমদূত আমার পূর্ব্ববৎ কোমল-কণ্ঠে কহিল;—"এখানে নূতন-জামাইটীর ন্যায়, চুপ করিয়া থাকিলে, চলিবে না। এখানে প্রতি কথার জবাব দিতে হইবে।

এ বড় শকত ঠাঁই।
গুরু-শিষ্যে দেখা নাই॥

এ স্থানে গোলযোগ করিলেও দণ্ড, চুপ করিয়া থাকিলেও দণ্ড। এখানে হাসিলে দণ্ড, রাগ করিলে দণ্ড। যদি বাহ্যে যাবে তো, এই বেলা যাও; না হয় এখান থেকে চলে যাও। এখানে কি 'সং' আছে যে, তাই দেখতে এসেছ?"

আমি তথাচ নীরব হইয়া, দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিলাম 'দেখি না, শেষটা কি হয়?'

কিন্তু অধিকক্ষণ আমাকে আর এভাবে থাকিতে হইল না। যে প্রহরী-জমাদার, আমাদিগকে হাজত-গৃহে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সে আমাদের নিকটে আসিল। তাহাকে দেখিবামাত্র যমদূত ভক্তিভরে তাহাকে একটী সেলাম করিল

জমাদার কহিল,—"বাবুদিগকে হাজতের সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। বাবুদের কোন বিষয়ে অভাব না ঘটে; কষ্ট না হয়, ইহা তুমি দেখিও বাবুরা কোন বিষয় যদি বড়-সাহেবকে জানাইতে চান, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা জানাইও। হাজতের নিয়ম ঠিক্ ঠিক্ পালন করিও।" এই কথা বলিবার পর, জমাদার, আরও দুই চারিটী কথা, খুব আস্তে আস্তে যমদূতকে কহিল। কিন্তু সে কথাগুলি আমরা আর শুনিতে পাইলাম না। জমাদারের যাত্রাকালে, যমদূত তাহাকে আর একটী সেলাম করিল।

যমদূত তখন তাহার গলার সুর একটু মিষ্ট করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল। সেই সপ্তমে-বাঁধা কড়া সুর কিছুতেই কোমল হইল না। যমদূত প্রাণপণ যত্ন করিয়াও তাহার সেই বজ্র-বাঁধনে বাঁধা সুরকে এক ঘাটও নামাইতে পারিল না। মোদ্দা, এবার সে, পাহাড়ী রাগিণীতে কথা আরম্ভ করিল;—"আপনারা যে ভদ্র লোক, তাহা পূর্ব্বেই আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু আজ এগার বৎসর কাল জেলে থাকিয়া আমি ভদ্রের ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি। সদাই চোর, ডাকাত, খুনী, জালেম্ জালিয়ৎ প্রভৃতির সহিত আমাকে কথা-বার্ত্তা কহিতে হয়। অধিক কি, তাহাদিগকে লইয়াই আমাকে দিন-রাত্রি ঘরকন্না করিতে হয়। আমার হৃদয় পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন হইয়া গিয়াছে। লোকের কষ্ট দেখিলে, আমার আর কষ্ট বোধ হয় না। লোকের দুঃখ দেখিলে, এখন আমার আনন্দ হয়। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই আমার পৈতা দেখুন। আমার নাম—শ্রীনীলমণি অধিকারী।"

এই কথা বলিতে বলিতে, নীলমণির চক্ষু-কোণে জল-বিন্দু দেখা দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বীভৎস-রস।

সূর্য্য ডুবু-ডুবু, হাজত-গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইতে আর বিলম্ব নাই। সুতরাং অতি সংক্ষেপে স্বল্প কথায়, অধিকারী মহাশয়ের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল।

সরা-রহস্য উদ্ঘাটনার্থ কৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসিলেন, "এই লৌহ-পাত্রে কি হইবে?"

অধিকারী। এই লোহার বাটীটী (ছোট সরাখানি) লইয়া আপনি পায়খানার ভিতর প্রবেশ করুন। দেখিবেন, পায়খানার দক্ষিণ কোণে রাশী-কৃত গুঁড়া মাটী পড়িয়া আছে। ঐ বাটী পরিপূর্ণ

করিয়া, সেই মাটী লইবেন। সেই মাটী-পূর্ণ বাটীটী আপনার কাছে রাখিবেন; অথবা পায়খানার ভিতর আড়াই হাত উচ্চ আধ হাত প্রশস্ত ইঁটের প্রাচীরবৎ খানিকটা গাঁথান আছে; সেই প্রাচীরের উপরেও আপনি ঐ মাটী-পূর্ণ বাটী রাখিতে পারেন। দেখিবেন, ঘরের ভিতর যেন মাটী ছড়াইয়া না পড়ে। ঐ পায়খানায় একেবারে চারিজন ব্যক্তি যাইতে পারে। উত্তর দিকের দেওয়ালের পাশে, এক সারিতে চারিটী কুণ্ড আছে। সেই চারি কুণ্ডে, এককালে চারিজন লোক বসিয়া থাকে। সামান্য পরদা, পরস্পরের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। আব্রু রক্ষা, যৎসামান্যরূপই হইয়া থাকে। পায়খানায় অধিক-ক্ষণ বসিয়া থাকিবার যো নাই। একটু বিলম্ব হইলেই আমি ডাকা-ডাকি আরম্ভ করি, অথবা পায়খানার ভিতর গিয়াই উপস্থিত হই।

আমি। একসরা মাটী লইয়া কি হইবে? হাজতে হাতমাটী করিতে এত অধিক মাটী লাগে নাকি?

অধিকারী। (হাসিয়া) বাবু! ও হাতমাটীর মাটী নয়। দুঃখের কথা কত কহিব, মলত্যাগ কার্য্য শেষ হইলে, আপনাকে স্বয়ং স্বহস্তের দ্বারা সেই মল, ঐ মাটী দিয়া ঢাকিতে হইবে।

কৃষ্ণবাবু। ঈঃ! বলেন কি অধিকারী মহাশয়!—স্বয়ং স্বহস্তে এই কাজ করিতে হইবে? ইহা ত মেথরের কাজ।

অধিকারী। মেথরেরই কাজ হউক, আর মহামহোপাধ্যায়েরই কাজ হউক, যিনি মলত্যাগ করিবেন, তাঁহাকেই ঐ কাজ করিতে হইবে; ইহাই হুকুম।

আমি। হুকুমটী বেশ মোলায়েম মুখমিষ্ট বটে। হাজত যথার্থ ই মহাকাব্য।

কৃষ্ণবাবু। ঢাকার পর কি করিতে হইবে?

অধিকারী। যদি দেখেন, পূর্ণ এক বাটী মাটীতে ভাল ঢাকা হইল না, তবে আর এক বাটী মাটী লইয়া তাহার উপর চাপা দিয়া তাহাকে মানব-চক্ষুর অগোচরীভূত করিতে হইবে। কিন্তু সাবধান, বেশী মাটী খরচ করিতে পারিবেন না। যদি বুঝা যায়, আপনার দ্বারা অনর্থক বেশী মাটী খরচ হইয়াছে, তাহা হইলে আপনি দণ্ডনীয় হইতে পারেন।

আমি। এরূপস্থলে এক একটী দাঁড়ি-বাটখারা লইয়া, প্রত্যেকের পায়খানায় শুভাগমন করা উচিত এবং গবর্ণমেণ্টেরও একটী নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, এত ওজন ময়লা হইলে, প্রত্যেক আসামী এত ওজন মাটী পাইতে পারিবে।

অধিকারী মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণবাবু। আচ্ছা, জলশৌচ কোথায় কিরূপে হইবে?

অধিকারী। মাটী দিয়া ঢাকিবার পর, সেই খালি বাটীটী আপনি হাতে করিয়া লইয়া, বাহিরে আসিবেন। অবশ্য কাছা তখন আপনার খোলা থাকিবে। তাহার পর, এই যে সম্মুখে একটী জল পূর্ণ নহর বা নরদামা দেখিতেছেন, ঐ নরদামার জল, বাটীর দ্বারা সেচন করিয়া, জল-শৌচ-কার্য্য আরম্ভ করিবেন। শৌচ-জল, আপনার পশ্চাৎ-ভাগস্থ দ্বিতীয় নরদামায় আসিয়া পড়িবে, অর্থাৎ যে নরদামাটী আমি এখন সাফ করিতেছি, এইটীতে পড়িবে। এই জল-শৌচ-কার্য্যে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। দেখিবেন, শৌচ কালে, শৌচ-জল যেন আপনার সম্মুখস্থ জলপূর্ণ নরদামায় কিছুতেই না পড়ে। অর্থাৎ যে নরদামা হইতে আপনি জল লইয়া শৌচ-কার্য্য করিবেন; সেই নরদামাতে শৌচ জল পড়িলে আপনি দণ্ডনীয় হইবেন।

আমি। অধিকারী মহাশয়! বলিতে পারেন, হাজতে এমন কোন কাজ আছে কি না, যাহাতে দণ্ডনীয় না হইতে হয়?

অধিকারী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাবুর কথাগুলি বড় মিষ্টি।"

কৃষ্ণবাবু। সম্মুখস্থ জলপূর্ণ নরদামায় একটু-আধটু শৌচ-জল পড়িলে, দোষ কি? যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে উহার ভিতর একটু-আধটু দূষিত জল পড়াই সম্ভব।

অধিকারী। তাহা হইলে চলিবে না ত—তাহা হইলে চলিবে না। কেননা, ঐ সম্মুখস্থ নরদামার জলে মুখ হাত ধুইতে হয়, কুলকুচা করিতে হয়, স্নানাদি করিতে হয়।

কৃষ্ণবাবু। (নাসিকা বিকৃত করিয়া) রাম! রাম! রাম!

অধিকারী। এ কালে 'রাম রাম' বলিলে, আর ভূত ছাড়ে না। যখন তুলসী-পাতার স্বত্বে, শিউলী-পাতার স্বত্বে লোকের জর আরাম হইত, তখন রাম-রামে ভূত ছাড়িত। এখন কুইনাইনের কাল উপস্থিত, সুতরাং ভূত-ছাড়ার ঔষধও স্বতন্ত্র হইয়াছে।

আমি। ঠিক্ কথা। অধিকারী মহাশয়! আপনার জয় হউক।

কৃষ্ণবাবু। জল-শৌচের পর হাতমাটী কোথায় করিব?

অধিকারী হো হো হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাজতে মানুষই মাটী, তার আবার হাতমাটী কি?"

আমি। সে কথা যাক্, সরা খানি লইয়া অবশেষে কি করিতে হইবে?

অধিকারী। সরা খানি আপনাকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া মাজিতে হইবে।

আমি। তার পর?

অধিকারী। মাজা ঘসা, ধোয়া শেষ হইলে, বাটীটী লইয়া, হাজত-ঘরে আপনার নির্দ্দিষ্ট শয্যার নিকট ঢৌশাইয়া রাখিতে হইবে।

আমি। তার পর?

অধিকারী। জল-তৃষ্ণা পাইলে, ঐ সরায় পানায় জল লইয়া পান করিবেন। অথবা আহারের সময় ঐ বাটীতে খিচুড়ি বা ডাউল লইতে পারেন।

আমি। অধিকারী মহাশয়! এখানে বেদান্ত-দর্শন-পাঠের কোন ভাল টোল আছে কি-না বলিতে পারেন?

অধিকারী। বাবু মহাশয়! এ জোমালয়! জোমালয়! সকল বিদ্যারই এখানে আখ্ড়াই হয়; খুঁজিয়া লইতে পারিলেই হইল।

আমি। এ বড় সরাখানিতে কি করিতে হইবে?

অধিকারী। এখানি ভাত খাইবার থালা। আহারের পর আপনাকে এ থালা মাজিয়া শয্যার পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিতে হইবে।

কালাতীত হয়-হয় দেখিয়া, কৃষ্ণবাবু, অধিকারীর অনুরোধে পায়খানায় গমন করিলেন। আমি বলিলাম, আমি পায়খানায় যাইব না, প্রস্রাব-বসিব।

অধিকারী। এখানে প্রস্রাব-বসা নাই, প্রস্রাব-দাঁড়ানো।

আমি। সে কি রকম?

অধিকারী। এখানে কোন স্থানে বসিয়া প্রস্রাব করিবার হুকুম নাই। দাণ্ডাইয়া মূত্রত্যাগ করিতে হয়।

আমি। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাই হউক।

অধিকারী। তবে আমার সঙ্গে চলুন।

আমি। জল লইব কোথা হইতে?

অধিকারী হাসিলেন। বলিলেন,—"নিয়ম সবই তো রক্ষা হইতেছে, বাকি কেবল জলটুকু লওয়া। ইচ্ছা হয়, ঐ নরদামা হইতে এক বাটী জল তুলিয়া লউন।"

আমি তখন জল তুলিয়া লইয়া সরা হাতে করিয়া চলিলাম। চিট্‌কে সরায় জল থাকিবে কেন? আমার চলনদোষে টলিয়া টলিয়া জল উছলিয়া পড়িতে লাগিল। কাপড় ভিজিল, জামা ভিজিল। যাইতে যাইতে, মধ্যপথে, একটু গুরুগম্ভীর গোছ হোঁচটও খাইলাম; কারণ তখন আমার দৃষ্টি ছিল সরার উপর, পথ দেখিয়া চলি নাই। জলটুকু সমস্তই কাপড়ে পড়িয়া গেল। তখন শূন্য-সরা হাতে করিয়া, উরুদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ এক প্রস্রাব-কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড টব মানবমূত্রে প্রায় পরিপূর্ণ; একটা বিষম ঝাঁজ উঠিতেছে! সেই কুণ্ডের দিকে মুখ রাখিয়া প্রস্রাব করে সাধ্য কার? নাক জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। মনকে বলিলাম, "মন! একবার মনে কর, ইহা বিলাতী লঙ্কার ঝাঁজ;—অথবা মনে কর, গোলমরীচের গুঁড়া তোমার নাকে লাগিয়া আছে।" জ্ঞানোদয় হওয়ার পর হইতে, আমি কখন দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিয়াছিলাম কি-না, তাহা আমার স্মরণ নাই; সুতরাং একার্য্যে নিতান্ত অনভ্যস্ত।

দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ করিতে গিয়া, অধিকাংশ মূত্রই, গায়ে পায়ে এবং কাপড়ে লাগিল।

অবিলম্বে কৃষ্ণবাবু এবং আমি উভয়েই আপন আপন কার্য্য সমাপন করিয়া, সেই লৌহসরা মাজিবার অভিপ্রায়ে সেই জলপূর্ণ নরদামার নিকট উপস্থিত হইলাম। উভয়ের মধ্যে আর কথাবার্ত্তা নাই। কৃষ্ণবাবুও হাসেন, আমিও হাসি। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসিলাম;—"কৃষ্ণবাবু! কেমন?"

কৃষ্ণবাবু। আপনার কেমন আগে বলুন, তবে আমি বলিব।

আমি। তাহা হইতে পারে না। আমি আগে প্রশ্ন করিয়াছি, আপনাকে আগে বলিতে হইবে, আপনার কেমন?

কৃষ্ণবাবু। আমার অতি সুন্দর।

আমি। আমার আপনা অপেক্ষা দশগুণ অতি সুন্দর।

কৃষ্ণবাবু। আমার বিশগুণ অতি সুন্দর।

হাজতের আসামীগণ

আমি। আমার কোটিগুণ অতি সুন্দর।

বিবাদানল ক্রমশঃ দাউ-দাউ জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। এমন সময় অধিকারী মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "থালা বাটী আপনাদিগকে আর মাজিতে হইবে না, আমি অন্য ব্যক্তি দ্বারা মাজাইয়া দিতেছি। আপনারা বড়লোক, সুখী লোক, এ কাজ কি আপনাদের? আমি শিবুকে ডাকিয়া দিতেছি, শিবু আপনাদের থালা বাটী মাজিয়া দিবে। আপনারা এখন হাজত-গৃহে যান।" এই কথা বলিয়া অধিকারী মহাশয় "শিবে, শিবে" করিয়া এক উচ্চ চীৎকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাহন গরুড়-পক্ষিবৎ, শিবু আসিয়া নিমেষমধ্যে হাজির হইল।

শিবু জাতিতে ডোম। গ্যাটা—গোঁটা জোয়ান। মাল-মুগুা গড়ন। মালকোঁচা-মারা কাপড় পরা। শিবুচন্দ্র আগমন করিয়াই শীঘ্র-হস্তে সানন্দে সরাগুলি মাজিতে আরম্ভ করিল। আমরা হাজত-গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রূপ-বর্ণন।

যে ঘরের ভিতর আমাদের রাত্রিবাস করিতে হইবে, সেই ঘরের নিকট আমরা আসিলাম। দেখিলাম, অরুণ এবং আরও পনের-ষোল জন হাজতের আসামী বসিয়া আছে। অরুণকে জিজ্ঞাসিলাম,—"ব্রজবাবু কোথায়?"

অরুণ। তিনি একা ওধারে বসিয়া, মনে মনে বোধ হয় দুর্গানাম জপ করিতেছেন।

হাজত-ঘরের পূর্ব্ব দিকে তিনি একাকী নীরবে ধ্যানমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট। আমি তথায় গিয়া বলিলাম,—"উঠুন, উঠুন,—এখানে আর তপ-জপ তন্ত্র-মন্ত্র খাটিবে না।"

ব্রজ বাবু আমার কথা শুনিলেন না;—পূর্ব্ব-ভাবেই বসিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম,—"যদি সোজা কথায় আপনার ধ্যান ভঙ্গ না হয়, তবে আমি রাজা পরীক্ষিত হইয়া, আপনার গলদেশে মৃত সর্প জড়াইয়া দিব। অবশেষে তক্ষক-দংশনের শাপ আমার অদৃষ্টে ঘটিতে পারে বটে; কিন্তু এ দুর্গম হাজতে যে, তক্ষক প্রবেশ-লাভ করিতে পারিবে,—ইহা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

এমন সময় কৃষ্ণবাবু আসিয়া বলিলেন, "ম্যানেজার বাবুর সবই বাড়াবাড়ি। এখানে আবার সন্ধ্যাহ্নিক কি?—কাপড় ছাড়া নাই, গঙ্গাজল নাই, বাহ্যাভ্যন্তরের শৌচ নাই;—শুধু শুধু বসিয়া জপ করিলেই কি হইল?"

ব্রজবাবু চক্ষু চাহিলেন;—বলিলেন, "সকল বিষয়েই আপনাদের তামাসা-কৌতুক!"

আমি। আপনি তবে এতক্ষণ ভগবানের ধ্যান না করিয়া, আমাদের তামাসা কৌতুক কেবল শুনিতেছিলেন?—অতি উত্তম ধ্যান বটে!!

ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিবেন, "কি করিতে হইবে বলুন?"

আমি। ওদিকে হাজত-ঘরে ঢুকিবার এখনি হুকুম হইবে। ইত্যবসরে আমরা চারিজন একত্র হই আসুন;—হাজতের কেমন বাহার হয় দেখুন।

এমন সময় প্রকৃতই আমাদের ঘরে ঢুকিবার হুকুম হইল। আর বিলম্ব সহিল না। অমনি তদ্দণ্ডে গিয়া সকলে হাজত-ঘরে প্রবেশ করিলাম। তখন চারি মূর্ত্তি একত্র হইলাম।

ঐ যে চারি মূর্ত্তির চিত্র দেখিতেছেন,—উহা আমাদেরই। এইবার একবার রূপ-বর্ণন করিব। ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ-বর্ণন করিয়াছিলেন;—এইবার আমি আমার রূপ বর্ণন করিব। নিজের রূপ নিজে বর্ণন করিবার প্রথা সাহিত্য-জগতে প্রচলিত নাই। কিন্তু এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ,—১৮৯২;—আর আটটী মাত্র গ্রন্থিতে, এই উনবিংশ শতাব্দীটী ঠেকিয়া আছে। সুতরাং এ কালে পুরাণ প্রথা পরিত্যাগ করাই পদ্ধতি। অতএব এখন আমার আত্মরূপ-বর্ণন দোষাবহ হইবে না;—এরূপ ভরসা আছে। আর কথা এই,—ভবিষ্যতে যদি কোনও সুকবি দ্বারা আমার রূপ বর্ণিত হইবে, এমন কোনও আশা থাকিত, তাহা হইলে, আমি অদ্য লেখনী ধারণ করিতাম কি না সন্দেহ।

ফটোগ্রাফ হইতে কাষ্ঠে ছবি খোদাই হইয়াছে। সেই কাঠখানি মেশিনে ফেলিয়া ছাপা হইতেছে। ছাপা দেখিয়া আমার একজন বন্ধু বলিলেন, "এ, কি হইতেছে?—এ যে, ছাই-পাঁশ মাথা-মুণ্ড কিছুই হইতেছে না।"

আমি উত্তর দিলাম,—"ছাপা যত খারাপ হয়, ততই আমার পক্ষে ভাল। কাঠের উপর খোদাইও ভাল হয় নাই,—চেহারা ঠিক-ঠিক মিলেও নাই—তাই আমি গোপনে এনগ্রেভারকে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বকসিস দিয়াছি।"

বন্ধু জিজ্ঞাসিলেন, "কেন,—কেন ?—এরূপ বিপরীত ব্যাপার কেন ?"

আমি। চেহারার সঙ্গে ঠিক মিলে নাই, তাই রক্ষা!! ঠিক মিলিলে কি আর রক্ষা ছিল? প্রেসম্যান এখন ছাপিতে ছাপিতে কত কালি ঢালিবে, ঢালুক না কেন ?—বলিলেই হইবে, এন্‌গ্রেভারের এবং প্রেস-জমাদারের যত দোষ!! চেহারার কোন দোষ ছিল না,—কেবল এন্‌গ্রেভার এবং প্রেস-জমাদার যুক্তি করিয়া আমাকে মাটী করিয়াছে।

ঐ যে ৩ নম্বর শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেছেন,—উনিই আমি। কিবা নব-জলধর-পটল-শ্যামল-কলেবর! কিবা লম্বোদর-অচল-অটল-স্থূল-মাংসল-কোমল-অঙ্গ-পর্ব্বত-বিরাজিত!! ঠিক যেন মূর্ত্তিমান রাজ-বিদ্রোহ! যেমন দ্রুতপদে গমনশীল, তেমনি শীঘ্র-হস্ত! যেমন চট্‌পটে, তেমনি চালাক! রুষরাজ কবে তাঁহাকে স্বরাজ্যের প্রধান সেনাপতি-পদে বরণ করিবেন বলিয়া ডাকিয়া পাঠান,—ইহাই কেবল কিঞ্চিৎ ভাবনা!

১নং মূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ইহাঁর দীর্ঘদেহে দীর্ঘদাড়ী বিলম্বিত। ঐখানেই কিঞ্চিৎ গোল।

২নং মূর্ত্তি—শ্রীব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চেহারা যাহাই উঠুক, আমি কিন্তু তামা-তুলসী হস্তে লইয়া, একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতেছি,—তামাসা না করিয়া, গম্ভীর ভাবেই বলিতেছি,—'ব্রজবাবুর সুন্দর মূর্ত্তি; ফিট্ গৌরবর্ণ; আয়ত-লোচন; কম্বুকণ্ঠ, এবং পরিপক্বকেশ।"

৪র্থ মূর্ত্তি—শ্রীঅরুণোদয় রায়ের। পক্ষিরাজ অশ্বারোহণে দিগ্বিজয় করিবার জন্য যেন সদা সমুৎসুক।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } মাঘ। ১২৯৮ { ২য় সংখ্যা।

শঙ্করাচার্য্যের সময়-নিরূপণ।

যাঁহার নাম স্মরণ করিলে হৃদয় পবিত্র হয়; যাঁহার মহাবাক্য শ্রবণ করিলে পাপ, তাপ, মায়া, মোহ, সংসার-জ্বালা বিদূরিত হয়;—যিনি শ্রুতি-সাগর মন্থন করিয়া বিশুদ্ধাদ্বৈতরূপ জ্ঞানামৃত প্রকাশ করিয়াছেন;—যিনি বিধর্ম্মীর করাল কবল হইতে সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যসন্তানের চিরমঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন;—সেই সাক্ষাৎ শঙ্কররূপী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের পবিত্র অলৌকিক জীবনী অনেকেই অবগত আছেন, অথবা তাঁহার পুণ্য নামও অনেকে শুনিয়াছেন।

কিন্তু বল দেখি, তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাবকাল কয় জন অবগত আছেন? কোন্ সময়ে তিনি বিশুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচার করিয়া ভারতবাসীদিগকে জ্ঞানোন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কোন্ সময়ে তিনি উপনিষদ্ভাষ্য, শারীরক-ভাষ্য ও গীতাভাষ্য রচনা করিয়া অসাধারণ বুদ্ধি ও অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন; ধর্ম্মভীরু কোন্ হিন্দুসন্তান না তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন?

আর এক কথা। শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত কাল স্থির করিতে পারিলে, তৎকালীন ভারতবাসীর সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা অনেকটা জানা যাইতে পারে। সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ও সম্প্রদায় মধ্যে কিরূপ ধর্ম্মসংঘর্ষ সমুত্থিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে ও পরে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, সেই সময়ে কোন্ নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক অনেক কথা আমরা জানিতে পারিব।

শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত আবির্ভাবকাল এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। এরূপ স্থলে, তিনি কোন্ দেশীয় লোক ছিলেন, তাঁহার জন্মবিবরণ-সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কিরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাঁহার জীবন কালসম্বন্ধে কিরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় পুরাবিদ্গণ তাঁহার কালসম্বন্ধে কিরূপ স্থির করিয়াছেন; তাহার সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, শঙ্করাচার্য্যের জীবন অবলম্বন করিয়া যে কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি কি না? সেই সেই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধে এবং তাঁহার সমকালীন বলিয়া যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রকৃত কি না?

শঙ্করাচার্য্যের জীবনোপাখ্যান লইয়া, যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয়, চিদ্বিলাসযতিরচিত শঙ্করবিজয় এবং মাধবাচার্য্য-প্রণীত সংক্ষেপ-শঙ্করজয়, এই গ্রন্থত্রয়ই প্রধান।

১। আনন্দগিরি নিজ গ্রন্থে—শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ পূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন,—

চিদম্বর* নামক পুণ্যস্থানে সর্ব্বজ্ঞ নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী কামাক্ষীর

---

* এই স্থান দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ আর্কট (অরুকড়্) জেলার অন্তর্গত।

গর্ভে এক অনুপমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; সেই কন্যার নাম বিশিষ্টা। বিশ্বজিৎ নামে এক ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণিপীড়ন করেন। এই মিলন বহুদিনস্থায়ী হইল না। বিশ্বজিৎ সংসার-বৈরাগী; তিনি সংসারের অনিত্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বনে গিয়া তপস্যায় মন দিলেন। অভাগিনী বিশিষ্টা অসময়ে পতিহারা হইয়া চিদম্বরেশ্বর মহাদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেব বিশিষ্টার সেবা-শুশ্রূষা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী পুত্ররত্ন প্রদান করিলেন, সেই পুত্রই শঙ্করাচার্য্য।

এইরূপে আনন্দগিরি, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে, কোন্ বর্ষে, কোন্ নক্ষত্রে অথবা কোন্ লগ্নে জন্ম-গ্রহণ করিলেন, তাহার কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

অনেকে এই আনন্দগিরিকে শাঙ্করভাষ্য-সমূহের টীকাকার বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু ভাষ্যটীকা এবং শঙ্করদিগ্বিজয়ের রচনা-প্রণালী মনোযোগ-পূর্ব্বক সমালোচন করিলে উভয়ই এক ব্যক্তির লেখনী-প্রসূত বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। প্রসিদ্ধ আনন্দগিরিকৃত ভাষ্যটীকার ভাষা প্রাঞ্জল, শব্দলালিত্যপূর্ণ এবং বিচক্ষণ বিজ্ঞ ব্যক্তির হস্ত-প্রসূত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শঙ্করদিগ্বিজয়ের ভাষা তেমন প্রাঞ্জল ও সরস বলিয়া বোধ হয় না, এই গ্রন্থের অনেক স্থলে ভাষা এবং অলঙ্কার-দোষ পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং ভাষ্যটীকাকার আনন্দগিরি এবং শঙ্করদিগ্বিজয়-রচয়িতা—উভয়েই যে বিভিন্ন ব্যক্তি তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শঙ্করদিগ্বিজয়-গ্রন্থপ্রণেতা স্বীয় গ্রন্থে 'কুবের, যম, চন্দ্র' প্রভৃতি কয়েকটী মতের উল্লেখ করিয়া আপনার স্বকপোল-কল্পনার বেশ পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি এক স্থানে * লিখিয়াছেন, "শঙ্করাচার্য্যের আদেশ মত লক্ষ্মণ ও হস্তামলক,—বৈষ্ণব মত স্থাপন করিবার জন্য কাঞ্চীপুর হইতে একজন পূর্ব্বাভি-মুখে এবং অপর ব্যক্তি পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করেন।"

শঙ্কর-দিগ্বিজয়োক্ত লক্ষ্মণ ও হস্তামলক কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-মত-স্থাপন, এই ঘটনাটী নিতান্ত আশ্চর্য্য-জনক বলিয়া বোধ হয়। লক্ষ্মণ ও হস্তামলক নামে কোন ব্যক্তি যে, কখন বৈষ্ণব মত প্রচার করিয়াছিলেন, কোন বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ নাই এবং উক্ত মহাত্মা দুই জনের রচিত কোন প্রকার বেদান্তভাষ্য এ পর্য্যন্ত কেহ দেখে নাই ও অপর কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ নাই। হস্তামলক যে একজন মহা-অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহা তৎকৃত 'হস্তামলক' নামক ক্ষুদ্রপুস্তিকা-পাঠে জানা যায়। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এই স্থলে গ্রন্থকার আভাসে রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। এই দুই জনেই বৈষ্ণব মত প্রচার এবং বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। রামানুজ ১০১৭ খৃঃ অঃ এবং মধ্বাচার্য্য ১১১৯ খৃঃ অঃ জন্ম-গ্রহণ করেন। অতএব ঐ সময়ের পরে শঙ্করদিগ্বিজয় * রচিত হয়; সুতরাং ঐ গ্রন্থকার যে, শঙ্করাচার্য্যের বহু শত বর্ষ পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব শঙ্করদিগ্বিজয়ের লিখিত বিবরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না।

২। চিদ্বিলাস যতি তাঁহার শঙ্করবিজয়-গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ পূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন, "কেরলদেশে কালাদি নামক স্থানে শিবগুরু নামে একজন শ্রুতিবিশারদ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে তদীয় পত্নীর গর্ভে শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। তখন বসন্তকাল, মধ্যাহ্ন, অভিজিৎ মুহূর্ত্ত ও আর্দ্রা-নক্ষত্র। তাঁহার জন্মকালে ৫টী গ্রহ উচ্চে ছিল। † পঞ্চম বর্ষে তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। তৎপরে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তপোরত গোবিন্দপাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল এবং তাঁহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া নিগূঢ় জ্ঞানতত্ত্ব শিক্ষা করিলেন (৯অঃ)। কিছু দিন পরে তিনি ভট্টপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মণ্ডনমিশ্রের সহিত শাস্ত্রালাপ করিবার জন্য কাশ্মীররাজ্যে গমন করেন (১৬অঃ)।

* শঙ্করদিগ্বিজয় ৬৮ অঃ দেখন।

* শঙ্করদিগ্বিজয়-রচয়িতা আনন্দগিরিও আপনাকে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু বোধ হইতেছে, তিনি আপনার প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য এরূপ পরিচয় দিয়া থাকিবেন। অথবা তিনি শঙ্করমঠধারী অপর কোন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইবেন।

† এই ৫ গ্রহের নাম কি? তাহার কোন উল্লেখ নাই।

তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নানা স্থানে বিভিন্ন-মতাবলম্বিগণের ভ্রান্ত মত নিরাকরণ করিয়া অদ্বৈত-বাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। তৎপরে শৃঙ্গগিরি ও জগন্নাথে মঠ স্থাপন করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য ও পদ্মপাদকে যথাক্রমে মঠ-রক্ষার ভার দিলেন এবং পরে দ্বারকায় একটী মঠ স্থাপন করিয়া হস্তামলককে সেই মঠের অধ্যক্ষ করিয়া আসিলেন। পুনরায় হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে আসিয়া আর একটী মঠ স্থাপন করিলেন, এখানে তাঁহার অনুমতিক্রমে তোটকাচার্য্য, মঠের আচার্য্য হইলেন। এইখানে শঙ্করাচার্যের লীলা শেষ হইল। একদিন বদরিকাশ্রমে বিষ্ণুর অবতার ভগবান্ দত্তাত্রেয়, শঙ্করাচার্য্যের হস্ত ধারণ করিয়া তুষারাবৃত হিমানীগহ্বরে প্রবেশ করেন। তথা হইতে শঙ্কর কৈলাসধামে গমন করিয়া শিবের সহিত সম্মিলিত হইলেন।"

চিদ্‌বিলাস যতি আপন গ্রন্থে অনেক অপ্রাচীন কালের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা যে তিনি শঙ্করাচার্য্যের বহুশত বর্ষ পরে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে। চিৎবিলাস শঙ্করাচার্য্যকে কৈলাসে লইয়া গিয়া শিবের সঙ্গে মিলন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আনন্দগিরির মতে * কাঞ্চীতে শঙ্করাচার্য্য মোক্ষলাভ করেন। এখনও শিবকাঞ্চীতে শঙ্করাচার্য্যের সমাধিস্থান দৃষ্ট হয়, সেই সমাধির উপর শঙ্করের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এখনও অনেক তীর্থযাত্রী সেই সমাধিস্থান দর্শন করিয়া শঙ্করের পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে চিদ্‌বিলাস যতির বিবৃত ঘটনা প্রকৃত কি না তৎপক্ষে, ঘোর সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। এরূপ স্থলে চিদ্‌বিলাস যতির কথাতেও নির্ভর করিতে পারিলাম না।

৩। মাধবাচার্য্য সংক্ষেপ-শঙ্করজয়ে লিখিয়াছেন,—

(মলয়বরের) "কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে তৎপত্নী সতী দেবীর গর্ভে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে গ্রহগণের এই রূপ স্থিতি ছিল;—মেষে রবি, তুলায় শনি এবং মকরে মঙ্গল। এই সময়ে বৃহস্পতি কেন্দ্রে ছিল।† তৎপরে তিনি অষ্টমবর্ষে গৃহত্যাগ করিয়া নর্ম্মদা-তীরে গোবিন্দযোগীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন।"

সংক্ষেপ-শঙ্করজয় গ্রন্থ পাঠে আরও জানা যায়;—শঙ্করাচার্য্য—নীলকণ্ঠ, হরদত্ত ও ভট্টভাস্করকে তর্কে পরাজয় করেন এবং তাঁহাদের ভাষ্যেরও নিন্দা করেন। তৎপরে তিনি বাণ, দণ্ডী, ময়ূর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেন। অনন্তর তিনি খণ্ডনখণ্ডখাদ্যপ্রণেতা হর্ষ, অভিনব গুপ্ত, মুরারিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, কুমারিল্ল, মণ্ডনমিশ্র এবং প্রভাকর প্রভৃতিকে তর্কশাস্ত্রে পরাজয় করেন; অবশেষে মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসে দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত সম্মিলিত হন।

এখন দেখা যাউক, মাধবাচার্য্যের বর্ণনা ঠিক কি না, তিনি যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃতই তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক কি না?

নীলকণ্ঠ।—তাঁহার অপর নাম শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য; তিনি বেদান্তসূত্রের শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈত মতে একখানি ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য-গ্রন্থে তিনি অনেক স্থানে রামানুজাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং তিনি রামানুজের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রপন্নামৃত নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায়, রামানুজ ৪১১৮ কল্যব্দে (অর্থাৎ ৯৩৯ শকে) প্রাদুর্ভূত হন।

হরদত্ত,—আপস্তম্ব ও গৌতম-ধর্ম্মসূত্রের ভাষ্যকার। তিনি কাশিকাবৃত্তির 'পদমঞ্জরী' নাম্নী টীকা রচনা করেন। ঐ কাশিকাবৃত্তি জয়াদিত্য ও বামন নামক দুই ব্যক্তি দ্বারা রচিত। কাহারও মতে, কাশিকার প্রথম চারি অধ্যায় জয়াদিত্য এবং শেষ চারি অধ্যায় বামন-বিরচিত *। আবার কাহারও মতে, জয়াদিত্য প্রথম পাঁচ অধ্যায় এবং বামন শেষ তিন অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। † যাহা হউক, জয়াদিত্য ৫৯৫ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। চীন-পরিব্রাজক ইৎ-সিংবিরচিত "নন্-হে-কি কেই-চোউএন্" অর্থাৎ দক্ষিণসাগর দর্শন ও প্রত্যাবর্ত্তন বিবৃতি নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়।

---

* আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয় ৭৪ অঃ।

† "জায়া সতী শিবগুরোর্নিজতুঙ্গসংস্থে
সূর্য্যে কুজে রবিসুতে চ গুরৌ চ কেন্দ্রে।"
সংক্ষেপশঙ্করজয় ২।৭১।

* Dr. Buhler in Journal of the Bombay Branch of the Roy. As, Soc, 1877, p, 72,

† Dr, R, G. Bhandarkar's Report on the search of Sankrit Mss, for the year 1883 4.

কাশিকাবৃত্তির শেষাংশ-রচয়িতা বামন ধ্বন্যালোক-লোচন, কাব্যালঙ্কারবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তিনি ধ্বন্যালোকলোচনে কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্ম্মার সভাপণ্ডিত ভবভূতির উত্তররামচরিত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যশোবর্ম্মা সংবৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জে রাজত্ব করেন, ভবভূতিও সেই সময়ের লোক, সুতরাং বামন তাঁহার পরে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন। হরদত্ত—জয়াদিত্য ও বামনের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি সংবৎ নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

ভট্ট ভাস্কর,—তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্যকার। ইনি স্পন্দসূত্রবার্ত্তিক ও বেদান্তসূত্রের এক খানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইনি আপন বেদান্তভাষ্যে অনেক স্থলে শঙ্করাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিচার করিয়াছেন। ইহাঁর বিরচিত 'জ্ঞানযজ্ঞ' নামক যজুর্ভাষ্য পাঠে জানা যায়, ইনি সংবৎ নবম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

বাণ ও ময়ূর।—শার্ঙ্গধরপদ্ধতি পাঠে জানা যায়, বাণ ও ময়ূর উভয়েই শ্রীহর্ষের রাজসভায় থাকিতেন *। বাণ শ্রীহর্ষচরিত ও কাদম্বরী রচনা করেন। শ্রীহর্ষ ইহাঁকে মহাকবিচক্র-চূড়ামণি-উপাধি প্রদান করেন। ময়ূর সূর্য্যশতক রচনা করেন। ইনি বাণের সমকালীন হইলেও অধিক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। উভয়েই সংবৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

দণ্ডী,—দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ প্রণয়ন করেন। ইনিও বাণ ও ময়ূরের অব্যবহিত পরে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীহর্ষ,—আপন নৈষধচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন; তিনি 'অর্ণব-বর্ণনকাব্য,' 'নবসাহসাঙ্কচরিত,' 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য,' 'গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম, এবং মাতার নাম মামল্লদেবী। তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট সম্মানসূচক তাম্বুলদ্বয় ও আসন লাভ করিয়াছিলেন। জৈনকবি রাজশেখর প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন, "শ্রীহারসুত (শ্রীহর্ষ) বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আদেশে নৈষধচরিত প্রণয়ন করেন।" জয়ন্তচন্দ্রের অপর নাম জয়চ্চন্দ্র বা জয়চন্দ্র, ইনি ১১০৩ ও ১১২৯ সংবতের মধ্যে বারাণসী ও কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষও ঐ সময়ের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই।

অভিনবগুপ্ত—একজন প্রসিদ্ধ কাশ্মীরীয় গ্রন্থকার। ইনি ভগবদ্গীতাটীকা, তন্ত্রালোক, পরাত্রিংশিকাবিবরণ, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী বৃহতী বৃত্তি ও লঘুবৃত্তি প্রণয়ন করেন। ইনি সংবৎ ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার লোক। (*)

মুরারিমিশ্র,—কৃষ্ণমিশ্রের পুত্র, ইনি অঙ্গত্বনিরুক্তি, প্রায়শ্চিত্তমনোহর, অনর্ঘরাঘব নামক কাব্য এবং কয়েক খানি মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১১৮৫ সংবতের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

উদয়নাচার্য্য,—প্রসিদ্ধ ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থকার। ইনি বাচস্পতিমিশ্র-বিরচিত ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য নামক ন্যায়গ্রন্থের 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' নাম্নী একখানি টীকা রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্র ১০৩২ সংবতে (১০৮৮ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন। আবার ভট্টরাঘব ১১৯৬ সংবতে 'ন্যায়-সারবিজয়' নামক গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন; সুতরাং উদয়নাচার্য্য ১০৩২ ও ১১৯৬ সংবতের মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, তৎপক্ষে সংশয় নাই। †

উপরে যে সকল গ্রন্থকারের নাম লিখিত হইল, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বিদ্যমান কাল আলোচনা করিলে কিছুতেই শঙ্করের সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপ-শঙ্করজয়-প্রণেতা প্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য ১২৮৫ সংবতে বিজয়নগরের

---

* Viena Oriental Journal, 1887. nos 2; কাব্যমালা (বোম্বাই প্রকাশিত) ১৯ সংখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ আছে।

রাজশেখর-রচিত প্রবন্ধকোষের নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলে বাণও ময়ূর উভয়ে যে সমসাময়িক লোক ছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়—

"অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণ-ময়ূরয়োঃ॥"

(*) Buhler's Reports of a Journey in Kashmir, p. 131-160 দেখ

† বিশ্বকোষ ২ ভাগে "উদয়নাচার্য্য" শব্দে ইহাঁর জীবনী সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রাজসভায় অবস্থান করিতেন। তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান প্রধান কবি ও দার্শনিকদিগকে শঙ্করের সমসাময়িক করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হইক, যখন দেখা যাইতেছে, সংক্ষেপশঙ্করজয়োক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ শঙ্করের সমকালীন বলিয়া কথিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক নহেন, তখন এরূপ গ্রন্থের সাহায্যে, শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত সময় কিছুতেই নির্ণীত হইতে পারে না। কাজেই সংক্ষেপশঙ্করজয়ের বর্ণিত ঘটনার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না।

এখন কি করি, শঙ্করাচার্য্যের জীবনী-সম্বন্ধীয় প্রধান তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থকেই অবসর দিতে হইল। তবে কাহার উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সময় নিরূপণ করি? এখন প্রবাদ আমাদের একমাত্র সম্বল। দেখি, প্রবাদ দ্বারা কতদূর কৃতকার্য্য হই।

দক্ষিণাপথে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। (*) প্রত্যেক বিভাগে, প্রত্যেক নগরে, প্রতি গ্রামে, শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই একটী নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায়, নূতন হইলেও তাহা অলৌকিক, অনেক স্থলে আবশ্যক বোধ করিলেও তদ্দ্বারা সময় নিরূপণ করিবার উপায় নাই। এইরূপ বহুল প্রবাদ প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ, বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের মোক্ষ হইবার পর প্রশিষ্য-পরম্পরা কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের লীলা-খেলাও সেই পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের নামেই চলিয়া গিয়া থাকিবে। শঙ্করাচার্য্য নামটী কেবল এক জনের ভাগ্যে হইয়াছিল, তাহা নয়। দক্ষিণাপথের শাঙ্কর-মঠের আচার্য্য বা অধিকারিগণ আপনাদিগকে শঙ্করাচার্য্য নামে পরিচিত করিতেন, অদ্যাপি শৃঙ্গেরি প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ মঠাধ্যক্ষগণ 'শঙ্করাচার্য্য' নামে পরিচয় দিয়া থাকেন।

এখানে পাঠক মহাশয়! যেন মনে করিবেন না, আমরা সেই সমস্ত শঙ্করাচার্য্যেরই সময় নিরূপণ করিতে বসিয়াছি। কেবল সেই বিশুদ্ধ-অদ্বৈতমত-প্রচারক ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত কাল নির্ণয় করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১ম, দাক্ষিণাত্যে একটী প্রবাদ আছে যে, শঙ্করগুরু গোবিন্দভট্ট—বিক্রমাদিত্যের পিতা। তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে গোবিন্দযোগী নামে বিখ্যাত হন। শঙ্করাচার্য্য বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে ভট্টপাদ নামক এক ব্যক্তিকে তর্কে পরাজয় করেন, সুতরাং শঙ্করাচার্য্যও বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক (খৃঃ পূঃ ৬৫)। এই প্রবাদ মতে ভট্টি ও ভর্ত্তৃহরি উভয়েই সেই সময়ের লোক।

২য়, নেপালে একটী প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ তথায় রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় অষ্টাদশ রাজার নাম বৃষভদেব, বর্ম্মা, তিনি রুদ্রদেব বর্ম্মার পুত্র, ৬১৪—৫৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নেপালের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্য নেপালে গমন করেন। তিনি শঙ্করের নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৩য়, দক্ষিণদেশে মলয়ালম্ ভাষায় লিখিত কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায়, "কেরলদেশে কালাদি নামক স্থানে কৈপল্লি নামক নগরে ৩৫০১ কল্যব্দে ভাদ্রমাস আর্দ্রানক্ষত্রে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩৮ বর্ষের মধ্যে স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন এবং ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণকে ৭২ শাখায় বিভক্ত করেন। তাঁহার সময়ে রাজা চেরুমান্ পেরুমালের যুদ্ধ ঘটনা হয়, ঐ রাজা ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মক্কা যাত্রা করেন।"

৪র্থ, দাবিস্তান্ নামক পারস্য গ্রন্থের মতে শঙ্করাচার্য্য ৭২৭ হিজিরীতে (১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে) জন্ম পরিগ্রহ করেন।

৫ম, ভোটদেশবাসী তারানাথের বৌদ্ধ ইতিহাসে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য কুমারিল্লের সমসাময়িক।

উপরে যে কয়েকটী প্রবাদ উদ্ধৃত হইল, উহা প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ শঙ্করগুরু গোবিন্দ-পাদ যে, বিক্রমাদিত্যের পিতা ছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন প্রাচীন পুস্তকে কোন কথাই লিখিত হয় নাই এবং নবরত্নের মধ্যে ভট্টপাদ নামক ব্যক্তি বিক্রমাদিত্যের সভায় থাকিতেন, তাহাও নিতান্ত অপ্রামাণিক। এমন কি ধন্বন্তরি, ক্ষপণক প্রভৃতি নয় জন পণ্ডিতও

* Theosophist, Vol XI, p,98-103

এই পুস্তকে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান প্রবাদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক এন্, ভাষ্যাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের জীবনী ও সময়-সম্বন্ধীয় অনেক আবশ্যক কথা, প্রকাশ করিয়াছেন।

বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিলেন না; জ্যোতির্বিদাভরণ নামক নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থে নবরত্নের নাম থাকিলেও সেই খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোক, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে *।

ভট্টি ও ভর্ত্তৃহরি এক সময়ের লোক বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা উভয়েই বিভিন্ন সময়ের লোক ছিলেন। ভট্টি তৎকৃত 'ভট্টিকাব্যে' আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায়, তিনি বলভীরাজ শ্রীধরসেনের সমসাময়িক;—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।" ভট্টি ২২ ৩৫॥

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মোক্ষমুলরের মতে ভট্টি খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। † কিন্তু ইহা ঠিক নয়। গুর্জ্জরাধিপতি বীতরাগের পুত্র প্রসন্তরাগ (দদ্দ ২য়) নামক নৃপতি কর্তৃক নন্দীপুরীর একখানি ক্ষোদিত সনন্দপত্র পাঠে জানা যায়, মহাকবি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টি ৩৮০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

ভর্ত্তৃহরি উঁহার অনেক পূর্ব্বের লোক। তাঁহার রচিত 'বাক্যপদীয়' নামক মহাভাষ্য টীকায় তিনি আপনাকে বসুরাতের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বসুরাত চন্দ্রাচার্য্যের সমসাময়িক। শেষোক্ত ব্যক্তি কাশ্মীর-রাজ অভিমন্যুর সভায় থাকিতেন। (রাজতরঙ্গিণী ১ম)। তিনি কাশ্মীরে পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রচার করেন। ক্ষোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, রাজা অভিমন্যু ৪০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন; বসুরাতও এই সময়ের লোক। অতএব বসুরাতশিষ্য ভর্ত্তৃহরি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক হইতেছেন ‡। এখন দেখা যাইতেছে, ভট্টি ও ভর্ত্তৃহরি কোন ক্রমে এক সময়ের লোক হইতে পারেন না। সুতরাং ঐ প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সময় নির্ণয় করা নিতান্ত হস্তিমূর্খের কথা।

দ্বিতীয়তঃ ৬১৪—৫৫৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে নেপাল-রাজ্যে কখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই, তাহা যিনি বুদ্ধের জীবনকাল অবগত আছেন, তিনিই বলিতে পারেন। ঐ সময়ে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। অতএব নেপালের প্রবাদের উপর কিছুমাত্র আস্থা হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ কেরলোৎপত্তির মত বিশ্বাস করিলে শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল ৪৫০ খৃষ্টাব্দ স্বীকার করিতে হয়। আবার ঐ গ্রন্থে রাজা চেরুমান্ পেরুমাল শঙ্করাচার্য্যের সমকালীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মক্কানগরে চেরুমান্ পেরুমালের সমাধির উপর তাঁহার মৃত্যুকাল হিজিরী ২১৬ (অর্থাৎ ৮৩৮ খৃষ্টাব্দ) ক্ষোদিত আছে।* কাজেই কেরলোৎপত্তির কথার উপর কি করিয়া নির্ভর করি? তৎপরে দাবিস্তানের কথা এককালে অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত। কারণ শঙ্করাচার্য্য ৭২৭ হিজিরীর বহুপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

যাহা হউক, পূর্ব্বে যে কয় পংক্তি লিখিলাম, তাহাতে শঙ্করাচার্য্যের কালনির্ণয় হইল না, বৃথা আড়ম্বর ও বাক্যব্যয়ে অতিবাহিত হইল; নির্দ্দিষ্ট পথে পৌঁছিতে পারিলাম না। এখন দেখা যাউক, নির্দ্দিষ্ট পথ কত দূর?

অধ্যাপক উইলসন্, মোক্ষমূলর, রাজেন্দ্রলাল, ভাণ্ডারকর, রমেশচন্দ্র দত্ত, কাউএল্, গফ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও দেশীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শঙ্করাচার্য্যকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।† মনিয়র উইলিয়ম্, ফুলকেস্ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদের মতে, শঙ্কর ৬৫০—৭৪০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কোন এক সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।**

* বিক্রমাদিত্যের কাল-নির্ণয়' নামক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিক্রমের সহিত নবরত্নের সময় নিরূপণ করিবার ইচ্ছা রহিল।

† Max Muller's India, what can it teach us, p, 348-353,

‖ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভর্ত্তৃহরিকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (Max Muller's India, &c, p 348,) কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

* Indian Antiquary, Vol, XVI, p, 160.

† Wilson's Sanskrit Dictionary, preface, p. XVII; Max Muller's Indian literature, p. 51; Rajendra Lala Mitra's Notices of the Sanskrit Mss, Vol, VII, p. 17; R. G. Bhandarkar's Reports on Search of Sanskrit Mss [1883-84] p. 32; R, C. Dutt's Ancient. India; Cowell's Sarvadarsan-Sangraha, preface, p, viii,

** Monier William's Indian Wisdom, p,48; Foulkes in the Journal of the Roy, As, Soc, Vol, XVII, N, S, p, 196; K, T, Telang in Indian Antiquary, Vol VIII,

মোক্ষমূলর প্রভৃতি বিজ্ঞব্যক্তিগণ যে-কারণে শঙ্করাচার্য্যকে অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা এই—

কে, বি, পাঠক নামক একজন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত বেলগাঁও নিবাসী গোবিন্দভট্টের নিকট বালবোধ অক্ষরে লিখিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের পরিচয় পাইয়া সেখানি প্রচার করেন। তাহাতে লিখিত আছে,—

"দুষ্টাচারবিনাশায় প্রাদুর্ভূতো মহীতলে।
স এব শঙ্করাচার্য্যঃ সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কঃ॥
নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।
অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদান্ দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ॥
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ।
কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্কবহ্ন্যব্দে গুহাপ্রবেশঃ।
বৈশাখে পূর্ণিমায়াস্তু শঙ্করঃ শিবতামগাৎ॥"

সেই কৈবল্যদাতা শঙ্করাচার্য্য লোকের দুষ্কৃত নিবারণ করিবার জন্য প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ৩৮৮৯ কলি গতাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টবর্ষে চারিবেদ ও বারবর্ষে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ এবং ষোলবর্ষের সময়ে উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মসূত্রাদির ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ৩৯২১ কলি-গতাব্দে (অর্থাৎ ৮২০ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শঙ্কর শিবত্ব লাভ করেন।

মোক্ষমূলর প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ উপরোক্ত সংস্কৃত বচনের উপর নির্ভর করিলেও যুক্তিপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে কিছুতেই ঐ বচনে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কারণ এই সংস্কৃত বচনগুলি আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। সেই সংস্কৃত পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে, মধ্বাচার্য্য মধুনামক দৈত্যের পুত্র; ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ঐ গ্রন্থখানি অন্ততঃ (মধ্বাচার্য্যের পর) খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর লিখিত হইয়াছে। যখন এই গ্রন্থখানি শঙ্করাচার্য্যের বহু শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে, তখন ইহার বর্ণিত বিষয়গুলি প্রকৃত বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না।

যাহা হউক, নানা কারণে মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত অভ্রান্ত ও প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

যখন দেখা যাইতেছে, শঙ্করাচার্য্যের জীবনী অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে অথবা যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত আবির্ভাব-কাল নির্ণীত হইতেছে না, তখন শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত গ্রন্থই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়।

শঙ্করাচার্য্য আপন গ্রন্থে তদীয় জীবনীঘটনামূলক কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই, তবে স্বরচিত বৃহৎ ভাষ্যমধ্যে স্থানে স্থানে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের নাম এবং প্রমাণস্থলে দুই একজন রাজা অথবা জনপদের নাম লিখিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যতদূর তাঁহার আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে, এখন তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

তাঁহার বিরচিত শারীরক-ভাষ্য, বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ছান্দোগ্যভাষ্য ও গীতাভাষ্যে এই কয়জন দার্শনিকের মত উদ্ধৃত এবং সমালোচিত হইয়াছে। যথা—

(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ, (২) উদ্যোতকর, (৩) উপবর্ষ, (৪) কুমারিলভট্ট, (৫) দ্রবিড়াচার্য্য, (৬) প্রভাকর, (৭) প্রশস্তপাদ, (৮) ভর্তৃপ্রপঞ্চ, (৯) বৃত্তিকার, (১০) শবরস্বামী।

রাজার নাম—রাজবর্ম্মা ও পূর্ণবর্ম্মা।

জনপদের নাম—স্রুঘ্ন, পাটলিপুত্র, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য।

দেখা যাউক, ঐ সকল ব্যক্তি কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং ঐ সকল জনপদ কোন্ সময় পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল।

ঈশ্বর কৃষ্ণ,—সাঙ্খ্যকারিকা বা তত্ত্বসংগ্রহ-রচয়িতা। সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট অপর নাম ভট্টপাদ সাঙ্খ্যকারিকার ভাষ্য রচনা করেন। ঐ ভাষ্য চীন দেশে চঙ্ বংশীয়দিগের রাজত্ব কালে (৫৫৭ হইতে ৫৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) চনতি (পরমার্থ) কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। সুতরাং চীনভাষায় অনুবাদ হইবার অন্ততঃ দুই তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপবর্ষ,—জৈমিনিসূত্র ও বাদরায়ণসূত্রের ভাষ্যকার। ইনি যোগানন্দ নামক একজন রাজার সমকালীন। গুণাঢ্য প্রাকৃত ভাষায় যে বৃহৎকথা প্রণয়ন করেন, উপবর্ষ তাহাই আবার সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া যান। গুণাঢ্য সাতবাহন রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ঐ সাতবাহন রাজাই

শকাব্দ প্রচার করেন। বোধ হয়, তাহারই কিছু পরে উপবর্ষ বিদ্যমান ছিলেন।

কুমারিল্লভট্ট,—অপর নাম গৌড়পাদ। ইনি মীমাংসাবার্ত্তিক, আশ্বলায়ন-গৃহ্যপদ্ধতি,তন্ত্ররত্ন, সাঙ্খ্যকারিকার টীকা, তুপ্তিকা, মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তৎকৃত সাঙ্খ্যকারিকাভাষ্য ৫৫৭—৫৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। সুতরাং ঐমূল (টীকা) অনুবাদ অপেক্ষা অন্ততঃ দেড় শত বা দুই শত বর্ষের প্রাচীন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কুমারিল্ল তৎকৃত মীমাংসাসূত্রের তন্ত্রবার্ত্তিকে কালিদাসের শকুন্তলা-বর্ণিত "সতাং হি সন্দেহ" এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে,কুমারিল্ল কালিদাসের পরবর্ত্তী লোক ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং সেই সঙ্গে এ দেশীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, ডাক্তার রামদাস সেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কালিদাসকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি* বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই মতটীর উপরও আমরা নির্ভর করিতে পারিলাম না। অপর গ্রন্থগত প্রমাণ ও প্রবাদ ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমোদিত ক্ষোদিত শিলালিপির উপর বিশ্বাস করিলেও তিনি ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অনেক প্রাচীন লোক হইয়া পড়েন। চালুক্যরাজ পুলিকেশীর ক্ষোদিত তাম্রানুশাসনে কালিদাস ও ভারবির নাম দৃষ্ট হয় †। যথা;—

"যেনাযোজিত বেশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিত-কালিদাস—
ভারবিকীর্ত্তিঃ ॥"

ঐ অনুশাসন খানিতে লিখিত আছে—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষব্দে পঞ্চসু ॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভূজাম্ ॥"

ভারতযুদ্ধ হইতে অধুনা ৩৭৩৫ কলি-গতাব্দ এবং ৫৫৬ শকাব্দ গত হইয়াছে।

৫৫৬ শক=৬৭৮ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে কালিদাসের কবিত্বশক্তির পরিচয় অনেকেই পাইয়াছিলেন, তাহা চালুক্যরাজ্যের অনুশাসন লিপি পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সুতরাং কালিদাস ঐ সময়েরও অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উদ্যোতকর,—কালিদাসের মেঘদূত পাঠে জানা যায়, দিঙ্‌নাগ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্রকে দূষিয়াছেন। উদ্যোতকরাচার্য্য তাঁহার দোষনিরাকরণের জন্য ন্যায়বার্ত্তিক রচনা করেন। প্রশস্তপাদ উদ্যোতকরের সমকালীন, আমাদের বিবেচনায় উভয় ব্যক্তি সংবৎ ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে জীবিত ছিলেন।

প্রভাকর,—শবরস্বামী প্রচারিত মীমাংসক মতাবলম্বী কুমারিল্ল আপন তন্ত্রবার্ত্তিক, শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্ররত্ন প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রভাকরের মত দূষিয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে প্রভাকর কুমারিল্লের কিছু পূর্ব্বে প্রায় সংবৎ তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বৃত্তিকার,—ইঁহার অপর নাম বোধায়ন। ইনি বেদান্ত-সূত্রের সংক্ষিপ্ত বৃত্তি করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তি এখন আর পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এক সময়ে সেই বৃত্তিখানি প্রচলিত ছিল, তাহা শঙ্করভাষ্য ও রামানুজভাষ্য পাঠে জানা যায়। যদি সেই বৃত্তিকার ও বোধায়ন-সূত্রকার অভিন্ন ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্ট জন্মের বহুশতবর্ষ পূর্ব্বেকার লোক হইয়া পড়েন।

এখন দেখা যাইতেছে, ভগবান শঙ্করাচার্য্য, যে সকল ব্যক্তির নাম আপন ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, সকলেই খৃষ্টীয় ৪র্থ ৫ম শতাব্দীর সাময়িক অথবা পূর্ব্বতন লোক হইতেছেন; অতএব শঙ্করাচার্য্য ঐ সময়ে অথবা ঐ সময়ের পরে প্রাদুর্ভূত হন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সংক্ষেপশারীরক-রচয়িতা সর্ব্বজ্ঞ মুনি আপনাকে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থপাঠে আদিত্য নামক একজন ক্ষত্রিয়রাজের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাকে একজন চালুক্যরাজ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ঐ রাজা খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ মুনির প্রায়, ১০০ বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্য পূর্ণবর্ম্মা ও রাজবর্ম্মা নামক দুইজন সমসাময়িক রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

---

* অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত উপাসক-সম্প্রদায় ২য় ভাগ ২৭২ পৃঃ; ডাক্তার রামদাস সেনের ঐতিহাসিক রহস্য ১ম ভাগ ৪৮পৃঃ।

† Indian Antiquary, 1879, p, 243,

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য ২ প্রপাং ২৩ খণ্ড এবং শারীরক-ভাষ্য ২।১।১৮ দেখ।) এখন দেখিতে হইবে, পুর্ণবর্ম্মা ও রাজবর্ম্মা নামে কোন রাজা প্রকৃত পক্ষে ছিলেন কি না এবং তাঁহারা কোথায় কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন ?

অনুসন্ধান দ্বারা এ পর্য্যন্ত যত অনুশাসন-পত্র ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইজন পূর্ণবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়, একজন মগধরাজ্যে ৫৯০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন * এবং অপর ৪৫০ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপ আক্রমণ করেন। † রাজবর্ম্মার নামে এ পর্য্যন্ত কোন শিলালিপি বাহির হয় নাই, সুতরাং রাজবর্ম্মা কোথাকার রাজা ছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন, মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মার সময়ে শঙ্করাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন ; কিন্তু আমাদের তাহা অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। শঙ্করাচার্য্য প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণদেশীয় লোক, দাক্ষিণাত্যে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়, এরূপ স্থলে যে তিনি দক্ষিণদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজার নামোল্লেখ করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্যে এক স্থলে এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার সময়ে পূর্ণবর্ম্মা নামক এক রাজার রাজ্যাভিষেক হয় ; আমাদের বিবেচনায় তিনি যবদ্বীপ-বিজয়ী পূর্ণবর্ম্মা হইবেন। দক্ষিণদেশীয় বর্ম্ম-উপাধিধারী পল্লবরাজগণ অনেকবার যবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং যবদ্বীপের রাজকুমার ও রাজকুমারীগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য দাক্ষিণাত্যে আগমন করিতেন। এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, যবদ্বীপ-আক্রমণকারী পূর্ণবর্ম্মা অবশ্যই পল্লববংশীয় দক্ষিণ-দেশীয় একজন রাজা ; তাঁহার সময়ে অর্থাৎ ৪৫০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্য্য জীবিত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্যে ভট্টপাদ বা কুমারিল্লকে পরমগুরু (গুরুর গুরু) বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, কুমারিল্লভট্ট খৃষ্টের তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য তাহার পরে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে (৪৫০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই অধিক সম্ভবপর

তিনি শারীরকসূত্রের (২।১।১৮) ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "ন হি দেবদত্তঃ স্রুঘ্নে সন্নিধীয়মানস্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে, যুগপদনেকত্র বৃত্তাবনেকত্বপ্রসঙ্গাদ্দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তয়োরিব স্রুঘ্ন-পাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ।"

অর্থ—যেমন একই দেবদত্ত স্রুঘ্নদেশে উপস্থিত ও সেই দিনসেই পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইতে ও থাকিতে পারে না, উহাও সেইরূপ। এক সময়ে উভয়দেশে উপস্থিত থাকা দুই ব্যক্তি ব্যতীত হয় না। অর্থাৎ বিভিন্ন অবয়বী স্বীকার করিতে হইবে। এ-অবয়বী ও সে অবয়বী এক নহে, ভিন্ন বলিতে হইবে, যেমন স্রুঘ্ননিবাসী দেবদত্ত ও পাটলিপুত্রনিবাসী যজ্ঞদত্ত, সেইরূপ।

শঙ্করাচার্য্যের উক্ত ভাষ্যপাঠে বোধ হইতেছে, তাঁহার সময়ে স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্র নামে দুইটী জনপদ ছিল এবং ঐ দুই জনপদ এক স্থানে নহে, উভয়ে বহুদূর ব্যবধান ছিল তাহাও শঙ্করাচার্য্য জানিতেন। বোধ হয়, ঐ দুইটী জনপদ তাঁহার সময়ে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ; উভয় স্থান প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়াই ভিন্ন অবয়বী বুঝাইবার জন্য অপর কোন স্থানের নামোল্লেখ না করিয়া ঐ দুইটীরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন গ্রন্থপাঠেও জানা যায় যে, ঐ উভয় স্থান এক সময়ে ভারতবর্ষের বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্র দর্শন করিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন ;—"স্রুঘ্নরাজধানী ২০ লি (প্রায় দেড় ক্রোশ) বিস্তৃত, ইহার পশ্চিমে যমুনা নদী প্রবাহিত। এই স্থান এককালে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও সুদৃঢ় রহিয়াছে।"

চীন-পরিব্রাজকগণের (ফাহিয়ান্ ও হিউএন্ সিয়াংএর) বর্ণনায় জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পাটলিপুত্রের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না ; তৎপরে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে শোণ ও গঙ্গানদীর প্রবল জলপ্লাবনে এই প্রাচীন মহানগরী এককালে জলশায়ী হয়*। সেই জলশায়ী পাটলিপুত্রের

* Indian Antiquary 1884 ; Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol III, p, 137,

† Journal Roy, As, Soc, N, S, Vol XVII, p, 204.

* Journal Roy, As, Soc, for 1836 ; Journal As, Soc, Bengal, Vol VI,

পার্শ্বে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে শেরশাহকর্তৃক বর্ত্তমান 'পাটনা' নগরী সংস্থাপিত হয়।

উপরে যে কয়েক ছত্র লিখিত হইল, তাহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধিকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন তাহা স্থির এবং সেই সময়ে বিশুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ও ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে পরম জ্ঞানতত্ত্ব উদ্দীপন করিয়াছিলেন। তিনি সেই প্রাচীন কালে যে নিগূঢ় জ্ঞানতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বহুশতাব্দী পরে কান্ত, বার্কেলে, স্পেন্সার, হার্টমান প্রভৃতি ইউরোপীয় তত্ত্বদর্শিগণ, অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণে এখনও সেই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিতে অথবা তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা ইউরোপীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
বিশ্বকোষ-প্রকাশক।

বর্ণমালা-রহস্য।

সংস্কৃত-বর্ণমালার পরিপাটী যেমন আশ্চর্য তেমনি মনোহর। আমি অন্য-অন্য বর্ণমালা যতদূর জানি, তাহার কোন বর্ণমালাতেই সুপরিপাটী ত দূরে থাকুক, আদৌ কোন ক্রম-নির্ণয় আছে বলিয়া বিবেচনা হয় না। ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষাতে যে বর্ণমালার প্রয়োগ হয়, তাহা রোমক্ বর্ণমালা। সে বর্ণমালার আদ্য অক্ষর—"এ" বা "অ"; দ্বিতীয় অক্ষর "ব"; তৃতীয় "স" বা "ক";—ইত্যাদি। গ্রীক-বর্ণমালাতে প্রথমে "অ" বা "আ"; তাহার পর "ব"; তাহার পর "গ;—ইত্যাদি। আরবী, ফার্সী, হিব্রু প্রভৃতি বর্ণমালাতেও ঐরূপ অ, ব, প, ত,—ইত্যাদি। কোন বর্ণমালাতেই কোন নৈসর্গিক ক্রম পরিলক্ষিত হয় না;—এমন কি, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের পৃথক্-পৃথক্ সমাবেশ পর্য্যন্ত নাই। আধুনিক ভাষায় যাহাকে বিজ্ঞান বলে, বর্ণমালার এইরূপ ক্রম-হীনতা-দোষকে সে ভাষাতে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিতে হয়। কেবল সংস্কৃত-বর্ণমালাতেই সে দোষ নাই। ইহা গৌরবের কথা, সুতরাং আনন্দের কথা।

সংস্কৃত-বর্ণমালার ক্রম-সজ্জাতে আশ্চর্য্য নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কি হেতু যে, এরূপ ক্রম-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় জানি না। আমি যে হেতু নির্দ্দেশ করিব,—তাহা আমারই কল্পিত। শব্দ-শাস্ত্রের পারদর্শী পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিতে পারিবেন যে, আমার কৃত হেতু-নির্দ্দেশ বাস্তবিক শাস্ত্র-সঙ্গত বটে কি না। যদি শাস্ত্র-সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আমি আমাকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিব।

কিন্তু বিষয় বড় নীরস। এমন প্রসঙ্গ কয়জন পাঠকের ভাল লাগিবে, জানি না। ফলত দুইচারি জনেও ইহার যদি আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার পরম সুখের বিষয় হইবে

বলিয়াছি যে, সংস্কৃত-বর্ণমালায় নৈসর্গিক পরিপাটী আছে। ইহার অর্থ এই যে, বাগ্‌যন্ত্রের গঠন-অনুসারে যে ধ্বনির পর যে ধ্বনি উচ্চারিত হইতে পারে, সংস্কৃত-বর্ণমালায় ঠিক সেই ধ্বনির পর সেই ধ্বনি সাজান আছে। আবার ভাষাতে ঠিক যতগুলি ধ্বনির প্রয়োজন হয়, বর্ণসংখ্যাও ঠিক ততগুলি! অভাব নাই, আধিক্য নাই, অক্রম নাই। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক

কণ্ঠনালীর যে স্থানে জিহ্বামূল সংযোজিত আছে, সেই স্থান হইতে ওষ্ঠপ্রান্ত পর্য্যন্ত বাগ্‌যন্ত্রের স্থান। এই স্থানটী বক্রগতি, ইহা বলাই বাহুল্য; অর্থাৎ কণ্ঠনালী হইতে তির্য্যগ্‌ভাগে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধগামী হইয়া, ক্রমশ উর্দ্ধে যাইতে যাইতে, তাহার পর ক্রমে আবার অধোমুখ হইয়া, খিলানের মত হইয়া আছে। উদানবায়ু কণ্ঠনালী হইতে পরিচালিত হইয়া, এই স্থান দিয়া, নির্গত হইলে, যে স্ফুট ধ্বনি সকল উচ্চারিত হইতে পারে, এক একটী বর্ণ সেই সেই ধ্বনির দ্যোতক। কিন্তু উদানবায়ু, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অথবা একেবারে যেমন ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া নির্গত হইতে পারে, সেইরূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ওষ্ঠপ্রান্তে না আসিয়া নাসা-গহ্বরের মূলদেশে প্রবেশ করিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারে। যথাস্থানে এ কথা আরও স্পষ্টতর করা যাইবে।

এই যে, কণ্ঠনালী হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানের পরিচয় দিয়াছি,—ঐ স্থানের মধ্যে নানাপ্রকার অভিঘাত-জন্য ধ্বনির প্রভেদ হইয়া থাকে।

জিহ্বার সাহায্যেই সেই অভিঘাত হয়। অর্থাৎ উদানবায়ুকে হয় অবাধে নির্গত হইতে দেওয়া হয়, নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জিহ্বার সাহায্যে বাধা দিয়া অভিহত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপ করা হয়। ধ্বনি-ভেদের ইহাই কারণ।

এই অভিঘাত-স্থান পাঁচটী। প্রথম অভিঘাত কণ্ঠে; দ্বিতীয় অভিঘাত তালুতে; তৃতীয় অভিঘাত—ঐ যে খিলানের কথা বলিয়াছি, ঐ খিলানের মাথায় অর্থাৎ মূর্দ্ধায়। চতুর্থ অভিঘাত-স্থান,—দন্তে বা দন্তমূলে। পঞ্চম ওষ্ঠে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখুন, এই পঞ্চাতিরিক্ত অভিঘাত-স্থান হইতেই পারে না। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, সমুদায় স্ফুটধ্বনি পাঁচ শ্রেণীতেই বিভক্ত। এই শ্রেণীকে সংস্কৃত-ভাষায় বর্গও বলে। অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান বা অভিঘাত-স্থান বিবেচনা করিলে, স্ফুটধ্বনি পাঁচ-জাতীয় হইতে পারে;—কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্দ্ধন্য, দন্ত্য, এবং ওষ্ঠ্য। যাহা ধ্বনি, তাহারই দ্যোতক-চিহ্নের নাম বর্ণ। সুতরাং বর্ণও ঐ পাঁচ প্রকার হইল,—কণ্ঠ্য, তালব্য ইত্যাদি।

এখন আর এক ভাবে দেখুন, ধ্বনি দুই প্রকার। প্রথম প্রকার—স্বয়ংসিদ্ধ স্ফুটধ্বনি। অর্থাৎ অভিঘাতস্থানে উদানবায়ুকে ঐ-অভিঘাতস্থান-সম্ভব-মূর্ত্তি দিয়া নির্গত করিলে এক প্রকার স্ফুটধ্বনি শ্রোতার শ্রুতিগোচর হয়। এই স্বয়ংসিদ্ধ ধ্বনিগুলিকে এবং তদ্দ্যোতক বর্ণগুলিকে স্বর বলে। আর এক প্রকার অভিঘাতে যে ধ্বনি সম্ভবে, তাহা স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্ফুট হইতে পারে না। যতক্ষণ তাহাতে স্বরসংযোগ না করা যায়, ততক্ষণ সে ধ্বনি অভিঘাতস্থলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। স্বরের সাহায্য পাইবামাত্র স্ফুটমূর্ত্তিতে শ্রুতিগোচর হয়। এই সকল বর্ণকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, ধ্বনি ও বর্ণ অভিঘাত-স্থানভেদে পাঁচ জাতীয়। এখন দেখিবেন, স্বরও পাঁচ জাতীয়, ব্যঞ্জনও পাঁচ জাতীয়। অর্থাৎ কতক গুলি স্বর কণ্ঠ্য, কতকগুলি তালব্য, কতক মূর্দ্ধন্য ইত্যাদি। ব্যঞ্জন বর্ণও ঐরূপ।

প্রথমে ধরুন স্বর। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, ং, ঃ,—সংস্কৃত বর্ণমালায় এই যোলটী স্বর বর্ণ আছে।

অ, কণ্ঠ্য স্বর। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীরা ইহার প্রকৃত উচ্চারণ করেন না। স্বভাবতঃ কণ্ঠ হইতে অবাধে যে ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া উচ্চারিত হয়, তাহাই অ। হিন্দুস্থানীরা, 'যব্' 'তব্' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিলে যে স্বর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, তাহাই অকারের প্রকৃত উচ্চারণ। ইংরেজীতে *But* শব্দে *u* বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ, তাহাই অকারের প্রকৃত উচ্চারণ। অবিকারে কিঞ্চিৎ মুখ ব্যাদান করিয়া, অল্পমাত্র কণ্ঠধ্বনি করিয়া দেখন, যে স্ফুট-ধ্বনি হইবে, তাহাই অ। আমরা যে ভাবেতে অকারের উচ্চারণ করি, তাহাতে ঈষৎ ওষ্ঠ প্রদেশের সাহায্য লইতে হয়; নহিলে অমন অকারের উচ্চারণ করা যায় না। বোধ হয়, এই জন্যই বাঙ্গালা অকারের তুল্য উচ্চারণ ইংরেজীতে লিখিতে হইলে *a w* কিংবা *a u* কিংবা *o u* ইত্যাদি বর্ণ সংযোগ করা হইয়া থাকে। *u* এবং *w* ওষ্ঠ্য বর্ণ। আরও এক পরিচয় দিলে সংস্কৃত অকারের প্রকৃত উচ্চারণ বুঝিতে পারা যাইবে। স্বরগুলি মাত্রাভেদে হ্রস্ব দীর্ঘ হয়; অর্থাৎ স্বল্প সময়ে উচ্চারণ শেষ করিলে যে ধ্বনি হয়, তাহা হ্রস্ব ধ্বনি। এই উচ্চারণ-কালকে মাত্রা বলে। সুতরাং হ্রস্ব স্বর হইল একমাত্র। দ্বিগুণ সময় দিয়া সেই স্বরকে উচ্চারণ করিলেই স্বর দীর্ঘ হয়। তবেই দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্র হইল। হ্রস্ব স্বর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, আর-ততটুকু সময় পর্য্যন্ত সেই স্বরের উচ্চারণ বজায় রাখিলে তাহাই দীর্ঘ স্বর হইয়া পড়ে। এখন দেখুন,—অকারের দীর্ঘ আ। আ দ্বিমাত্র। আকারকে একমাত্র করুন, প্রকৃত সংস্কৃত অকার উচ্চারিত হইবে। বাঙ্গালীর ছেলেরা স্বরসন্ধিতেও যে বিব্রত হয়, তাহার এক-মাত্র কারণ এই যে, তাহাদিগকে অকারাদির প্রকৃত উচ্চারণ শিখান হয় না। বালকদিগকে জোর করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, 'অকারের পর অকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়' ইত্যাদি। অকারে-অকারে আকার ভিন্ন যে আর কিছু হইতেই পারে না, এটুকু তাহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হয় না—বুঝাইয়াও দেওয়া হয় না।

এখন আমরা দুইটী কণ্ঠ্য স্বর প্রথমে পাইলাম—অ, আ।

কণ্ঠের পরেই দ্বিতীয় অভিঘাত-স্থান তালু। তালব্য স্বর,—ই। তাহাই দ্বিমাত্র করিলে,—ঈ হইল। পাইলাম অ, আ, ই, ঈ।

ইকার উচ্চারণের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝানও একটু কঠিন। নিজে মনোযোগ দিয়া ইকার-উচ্চারণ-কালে অভিঘাতের প্রতি লক্ষ্য করিলেই

ইহা বুঝা যায়। অবিকারে ওষ্ঠাধর বিশ্লেষ করিয়া জিহ্বার মধ্যস্থল তালুতে আলগ্নভাবে রাখিয়া জিহ্বাগ্র নিম্ন করিয়া ধ্বনি নির্গত করিলেই ইকার উচ্চারিত হয়। জিহ্বাকে তালুতে আলগ্ন করিবার সময় জিহ্বা বিস্তার অবশ্যই অধিকতর হয় এবং জিহ্বাগ্রও কিয়ৎ পরিমাণে কুঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহার অধিক লিখিয়া প্রকাশ করিতে আমার ক্ষমতা নাই।

তাহার পর তৃতীয় অভিঘাত-স্থান মূর্দ্ধা। মূর্দ্ধায় জিহ্বাগ্র আলগ্ন করিয়া উদান-বায়ুকে নিঃসারিত করিলে হসন্ত র-কারের ন্যায় ধ্বনি উৎপন্ন হয়। শিশুদের কাণে আমরা যে কখন কখন "ঋণ্-কুরু" দিই তাহা প্রকৃত পক্ষে ঋ-কারেরই প্লুত উচ্চারণ। অর্থাৎ দুই মাত্রার অধিক কাল ব্যাপিয়া ক্রমিক ঋকারের উচ্চারণ হয় মাত্র। ছাগলকে ডাকিবার সময়ও "আর্‌র্‌র্‌ আয়" করিয়া যে ধ্বনি করা হয়, তাহাও কতকটা ঋকারের প্লুত উচ্চারণ। এই ধ্বনিকে হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্র করিয়া উচ্চারণ করিলেই ঋকারের স্বরূপ জানিতে পারা যায়।

চতুর্থ অভিঘাতস্থান দন্তমূল। জিহ্বাগ্র দন্তমূলে আলগ্ন করিয়া ধ্বনি করিলেই ঌকার উৎপন্ন হয়। ইংরেজীতে *able*, *particle* প্রভৃতি শব্দে লকারে যে উচ্চারণ, তাহাই ঌকারের প্রকৃত উচ্চারণ, উহারই হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে,—ঌ, ৡ।

পঞ্চম বা শেষ অভিঘাতস্থান ওষ্ঠ। ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ধ্বনি করিলেই,—উ হইল। তাহাই একমাত্র—দ্বিমাত্রভেদে,—উ, ঊ হইল।

এখনও অনেকগুলি স্বর বাকি। কিন্তু সেগুলির কথা বলিবার পূর্ব্বে উকার-সম্বন্ধে যে একটু ক্রম-ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা উচিত। সংস্কৃত বর্ণমালায় অকারের পর ইকার, তাহার পর, ঋকার, ঌকার, না হইয়া,—উকার। উকারের পরে, তবে ঋকার ঌকারের স্থানে হইয়াছে। এমন হইল কেন?

স্বর-ধ্বনির লক্ষণ করিবার সময় বলিয়াছি; যে-অভিঘাত-স্থানে উদান-বায়ুকে ঐ অভিঘাত-স্থান-সম্ভব-মূর্ত্তি দিয়া যে স্বয়ংসিদ্ধ ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়, তাহাই স্বর। স্বরের আরও এক বিশেষ এই যে, স্বর সুখ-সাধ্য হইলেই শ্রেষ্ঠ হয়। কষ্ট-সাধ্য হইলে তাহা স্বর হইয়াও নিকৃষ্ট। এখন অনুধাবন করিয়া দেখুন; ঋকার ঌকারের উচ্চারণ-কালে জিহ্বার নর্ত্তন হইয়া থাকে। নর্ত্তনে অভিঘাত-বাহুল্য আছে। সুতরাং উচ্চারণে কষ্ট-সাধ্যতা। উকারে এ ক্লেশ নাই। উকার সরল এবং সুখ-সাধ্য। সুতরাং স্বরের মধ্যে ঋকার ঌকার অপেক্ষা উকার শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্ত উকার ওষ্ঠ্যবর্ণ হইয়াও মূর্দ্ধন্য বর্ণের এবং দন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে স্থান লাভ করিয়াছে।

এইবার অ, ই, উ, ঋ, ঌ হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে দশটী স্বর যথাক্রমে পাওয়া গেল। এই দশটী স্বর অমিশ্র বা শুদ্ধ। অতঃপর মিশ্র স্বরের কথা বলা যাইতেছে। এ, ঐ, ও, ঔ—সন্ধ্যক্ষর, অর্থাৎ দুইটী স্বরের সন্ধিতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে সঙ্কর স্বরবর্ণও বলা যাইতে পারে। অকার, ইকারে উপগত হইয়া একার উৎপন্ন করে। একারের প্রকৃত উচ্চারণ করিতে হইলে কণ্ঠ্য-অভিঘাতের সহিত তালব্য-অভিঘাতের মিশ্রণ হয়। অকারের পর ইকার সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে, যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়, তাহাই প্রকৃত একার। ব্যাকরণের সন্ধিসূত্রেও এ কথা ধরা আছে—অকারের পর ইকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। মনে রাখা উচিত যে, বৈয়াকরণ মহাশয়ের শাসনেই যে এরূপ হয় তাহা নহে; নৈসর্গিক নিয়ম বশেই এরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ অকারে-একারে মিলিয়া ঐকার, অকারে-উকারে মিলিয়া ওকার, অকারে-ওকারে মিলিয়া ঔকার উৎপন্ন হয়,—ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। মূল বর্ণের নৈসর্গিক নিয়মই মাত্র আমরা দেখাইলাম।

এ, ঐ, ও, ঔ, সন্ধ্যক্ষর। ইংরেজীতে এরূপ অক্ষরকে *dipthong* বলে। সন্ধ্যক্ষরের উচ্চারণে,—স্বরদ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ না করিয়া, অবশ্য সংশ্লিষ্ট উচ্চারণই করিতে হয়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালায় তাহা করি না। ঐকার ঔকার বলিবার সময় ও+ইএবং ও+উ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি। এরূপ উচ্চারণ করা যে ভুল, ইহা বলাই বাহুল্য। উচ্চারণ ঠিক না থাকাতেই ব্যাকরণের সন্ধি-প্রকরণে বালকদের কষ্ট বোধ হইয়া থাকে।

আর সন্ধ্যক্ষর নাই কেন? তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সন্ধ্যক্ষরে প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধস্বরের লক্ষণ স্থির থাকে না। কেননা, সন্ধ্যক্ষরে দুই স্বরের মিশ্রণ হইয়া থাকে। তবে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণের বিশেষ সম্মান আছে, সেইরূপ আদ্যস্বর "অ" বর্ণও বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ। "অ" বর্ণকে অন্তস্বরে উপগত

হইতে দিয়া উপরি লিখিত চারিটী সন্ধ্যক্ষরকে স্বরবর্ণে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এ, ঐ, ও, ঔ,—এই চারি বর্ণের মূলেই "অ"বর্ণ আছে। "অ"বর্ণেরই এই বিশেষ অধিকার; অন্য বর্ণের ইহা নাই।

আর দুইটী বর্ণের কথা বলিলেই স্বর-প্রকরণ শেষ হয়। একটী অং অপরটী অঃ। অনুস্বার এবং বিসর্গ-সম্বন্ধে বৈয়াকরণদিগের মধ্যে কিছু মতদ্বৈধ আছে। প্রাচীনেরা এই দুইটীকে স্বরবর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন, নব্যেরা করেন না। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ইহারা স্বরবর্ণ। দৈবাদি কর্ম্মে ইহারা স্বরেরই কার্য্য করে। সুতরাং অনুস্বার এবং বিসর্গকে স্বরের মধ্যে স্থান দেওয়াই প্রশস্ত কল্প। স্বরান্তরের সহযোগ ভিন্ন অনুস্বার বিসর্গের যে, উচ্চারণ একেবারেই হয় না, তাহা নহে। সুপরিস্ফুট উচ্চারণ হয় না বটে, কিন্তু অর্দ্ধস্ফুট উচ্চারণ হয়। উদানবায়ুকে নাসারন্ধ্রমূলে আবদ্ধ করিয়া নিঃসারণ করিলেই অনুস্বারের উচ্চারণ পাওয়া যায়। অকারের আশ্রয় দিলে, উচ্চারণ সুপরিস্ফুট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অকারের বিশেষ সম্মান আছে।

অনুস্বার-সম্বন্ধে নাসারন্ধ্রমূলের যে উল্লেখ করিয়াছি, বিসর্গ-সম্বন্ধেও সেইরূপ একটী বিশেষ কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। সে বিশেষ কথা এই,—উদানবায়ুকে বিশেষ বলসহকারে নিঃসারণ না করিলে যেরূপ সহজ স্বর পাওয়া যায়, বিশেষ বলপ্রয়োগ করিলে আর সেরূপ স্বর পাওয়া যায় না, অন্যবিধ ধ্বনি পাওয়া যায়। আমরা যখন ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করি, তখন এই ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। যেমন, "অঃ কর কি,—"বলিবার সময় অঃ উচ্চারণে যে ধ্বনিটী উদিত হয়, সহজ অ বলিলে সে টুকু হয় না। ঐ যে অর্দ্ধস্ফুট মহাপ্রাণ ধ্বনি, তাহাই বিসর্গ। পরিস্ফুট করিবার জন্য অকারের আশ্রয় দিয়া বিসর্গের সামান্য পরিচয় হইয়া থাকে। ফলত অং, অঃ স্বরবর্ণমধ্যে পরিগণিত হইলেও অবিশুদ্ধ এবং নিকৃষ্ট স্বর। সেইজন্য স্বরপর্য্যায়ের প্রান্ত-ভূমিতেই ইহাদিগকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এইবার ব্যঞ্জনবর্ণ-গুলির স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। ব্যঞ্জনবর্ণ-সম্বন্ধে এই এক সাধারণ তত্ত্ব বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বরের সংযোগ ব্যতীত ব্যঞ্জন একেবারেই শ্রুতিগোচর হইতে পারে না। ব্যঞ্জন-ধ্বনির উপক্রম করিয়াও যদি তাহাতে কোন স্বরবর্ণের সহযোগ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে, সেই উপক্রমেই তাহার অবসান হইয়া পড়ে, অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হইতে পারে না। ককারের ধ্বনিতে অকারের সহযোগ আছে, সেই 'অ' টুকু একেবারে বাদ দিলে, 'ক' সেই জিহ্বামূলেই পর্য্যবসিত হয়। মুখ-গহ্বরের বাহিরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং সকল ব্যঞ্জনেই স্বরসহযোগের নিতান্ত প্রয়োজন এবং স্বর-সহযোগ ব্যতীত ব্যঞ্জনের পরিচয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব স্বরবর্ণ অপেক্ষা ব্যঞ্জনবর্ণ জাতিতে নিকৃষ্ট হইল। সেইজন্য প্রথমে স্বরবর্ণের স্থান, তাহার পরে ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান। ইংরেজীতে যেমন ছাব্বিশ বর্ণ,—যে যেখানে পায়, সেই সেখানে বসিয়া যায়;—*a*র পর *b*, *b*র পর *c*, *c*র পর *d*, *d*র পর *e* ইত্যাদি;—সংস্কৃতে সেটী হইবার যো নাই; আমাদের বর্ণমালাতেও বর্ণ-বিচার আছে।

এইবার ব্যঞ্জনবর্ণগুলির স্থান-সমাবেশের ক্রম দেখুন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধ্বনি নিঃসারণের প্রথম অভিঘাত-স্থান কণ্ঠ, তাহার পর তালু, তাহার পর মূর্দ্ধা, তাহার পর দন্ত, তাহার পর ওষ্ঠ। এখন বলাই বাহুল্য, কণ্ঠ তালু প্রভৃতি অভিঘাত-স্থানের ক্রম-অনুসারেই ব্যঞ্জনবর্ণগুলির স্থান-সমাবেশ হইবে।

প্রথমে দেখুন, কণ্ঠে জিহ্বামূলে স্পর্শ করাইয়া অভিঘাত করিলে, স্বর-সাহায্যে যে সহজ ধ্বনি হয়, তাহা,—ক। অধিক বল প্রয়োগ করিয়া অর্থাৎ মহাপ্রাণ করিয়া উচ্চারণ করিলে সেই "ক"ই খ হয়। কণ্ঠধ্বান গদ্গদ করিয়া বলিলে, সেই "ক"ই গ—হয়। আবার ঐ "গ"কে মহাপ্রাণ করিলেই ঘ—হয়।

ঐ যে "গদ্গদ" করা আমরা বলিলাম, তাহা একটু বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি নাই। যখন মন ব্যাকুল, নয়ন বাষ্পাকুল, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তখনি গদ্গদ ভাব হয়। বালক যদি কাঁদিতে-কাঁদিতে বলে, "আমি কাঁদি নাই", তখন আমরা শুনিতে পাই, বালক যেন বলিতেছে, আমরা "গাঁদি" নাই। বায়ু রুদ্ধ করিয়া, কণ্ঠ স্ফীত করিয়া ঐ যে ধ্বনির উচ্চারণ, তাহাকেই গদ্গদ উচ্চারণ বলিতেছি।

এই উচ্চারণ করিবার প্রকারভেদে প্রথম বর্ণের প্রথম চারিটী বর্ণ আমরা পাইলাম। সহজে—ক, তাহাই আবার মহাপ্রাণে—খ, গদ্গদে—গ, তাহাই

আবার মহাপ্রাণে—ঘ। আর সেই জিহ্বামূলের অভিঘাত জন্য কণ্ঠ্য-ধ্বনিকে নাসারন্ধ্রমূলে অবরুদ্ধ করিয়া নিঃসারণ করিলে ঙ হইবে। এই গেল—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। এই হইল, প্রথম অথবা কণ্ঠ্যবর্গ।

ইহার পরেই দ্বিতীয় অর্থাৎ তালব্য বর্গের উপরি উক্ত নিয়মানুসারে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ পাওয়া যাইবে। জিহ্বার প্রায় মধ্য ভাগ তালুদেশে স্পর্শ করাইয়া, সেই অভিঘাতের ফলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাই তালব্য ধ্বনি,—এ কথা বোধ হয় আর না বলিলেও চলে।

তৃতীয় বর্গ—মূর্দ্ধন্য বর্ণ। জিহ্বাগ্র মূর্দ্ধাতে স্পর্শ করাইতে হয়, এবং সেই অভিঘাতে মূর্দ্ধন্য ধ্বনি হয়। কণ্ঠ্য বর্ণে যেমন "ক"কার, তালব্যবর্ণে যেমন "চ"-কার, মূর্দ্ধন্য বর্ণে সেইরূপ "ট"-কার ভিন্ন সম্ভবে না। আর উচ্চারণ-ভেদের যে নিয়ম পূর্ব্বে বলিয়াছি, তদনুসারে মূর্দ্ধন্য বর্ণে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—এই পাঁচ অক্ষর পাওয়া যায়।

তাহার পর দন্তে ঐরূপ জিহ্বা স্পর্শ করাইয়া তদভিহত ধ্বনিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ত, থ, দ, ধ, ন পাওয়া যায়।

আর ওষ্ঠদ্বয়ের স্পর্শাভিঘাতে যে ধ্বনি পাওয়া যায়, তাহাই পঞ্চম বা ওষ্ঠ্য বর্ণ। ইহাতে পাওয়া যায়, প, ফ, ব, ভ, ম। এই পাঁচ বর্গের ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যতীত আরও ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। সেগুলি কিন্তু স্পর্শাভিঘাত জন্য নহে।

স্পর্শাভিঘাতে জন্মে না, অথচ স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধ্যক্ষর হইলেও চারিটী সন্ধ্যক্ষর ব্যঞ্জনমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সেই চারিটী য, র ল, ব। তালব্য-স্বর—ইকার, অকারে উপগত হওয়াতে, 'য' উৎপন্ন হইয়াছে। মূর্দ্ধন্য স্বর 'ঋকার' ঐরূপ অকারে উপগত হওয়াতে 'র' উৎপন্ন হইয়াছে। দন্ত্যস্বর—ঌকার, অকারে উপগত হইয়া 'ল' উৎপন্ন হইয়াছে। এবং ওষ্ঠ্যস্বর—উ, ঐরূপ অকারে উপগত হওয়াতে বকার উৎপন্ন হইয়াছে। বুঝিলাম যে, প্রথমে য, তাহার পর র, তাহার পর ল, তাহার পর ব উৎপন্ন হইল। কিন্তু স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধি হইয়া যে বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্বরবর্ণের পর্য্যায়ে স্থান না পাইয়া ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে কেন আসিল, তাহা এখন বুঝিতে হইবে।

একবার ইঙ্গিতে বলিয়াছি যে, 'আমাদের বর্ণমালাতেও জাতিবিচার আছে। সন্ধ্যক্ষরগুলি য, র ল, ব-ও সঙ্কর বর্ণ। অকারে ইকারে মিশিয়া যেমন একার; ইকারে অকারে মিশিয়া তেমনি যকার অথচ এ,—স্বরবর্ণ; আর য,—ব্যঞ্জনবর্ণ। এরূপ হইবার কারণ আছে। শাস্ত্রানুসারে উচ্চবর্ণ নিম্নক্ষেত্রে উপগত হইলে, অনুলোম সম্বন্ধ বলে; কিন্তু নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণে উপগত হইলে প্রতিলোম বা বিলোম সঙ্কর উৎপন্ন হয়। একারাদি স্বর সঙ্কর-বর্ণ হইলেও অনুলোম সঙ্কর, সুতরাং শ্রেষ্ঠ জাতি তাহারা স্বরধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু যকারাদি প্রতিলোম সঙ্কর সুতরাং চণ্ডাল-সদৃশ অধম সেই জন্য স্পর্শাভিঘাতজন্য বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনের পরে য, র, ল, ব স্থান পাইয়াছে। একটা বাজে কথা এইখানে বলিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই;—সুশিক্ষার অভিমান করিয়া যে হিন্দুসন্তান বর্ণবিচার করেন না, আমার বোধ হয় যে, ভাল করিয়া তাঁহার বর্ণ-পরিচয়ও হয় নাই।

আরও বঞ্জনবর্ণ আছে। তাহারা বিশুদ্ধ স্পর্শাভিঘাতজন্য নহে, সন্ধ্যক্ষর ব্যঞ্জনও নহে, অথচ তাহারাও এক এক প্রকার ধ্বনি সিদ্ধ করে। সন্ধ্যক্ষরগুলি অবশ্য তাহাদের অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়, এই জন্য তাহারা অন্তঃস্থ বর্ণ বলিয়াও পরিচিত। বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনের পর এবং সেই প্রান্তবাসী ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে অন্তঃস্থ বর্ণ—য, র, ল, ব—স্থান পাইয়াছে।

সেই প্রান্তেবাসী ব্যঞ্জনগুলি উষ্ম বর্ণ। ছোট লোক কি না, একটু গরম মেজাজ, একটু কড়া-কড়া ভাব,—কিছু বায়ু-বিকারে বিকৃত, প্রান্ত ভূমিতেই ত ইহাদিগকে স্থান দেওয়া উচিত। কিন্তু এই জাতীয় পাঁচটী বর্ণের দুইটীকে আমরা খুঁজিয়া পাই না। বোপদেব বলিয়াছেন, কপৌ মুন্তৌ, বোধ হয়, কালসহকারে সেই দুই বর্ণ লোপ পাইয়াছে। সেইজন্য আদ্য অর্থাৎ কণ্ঠ্য বর্গের উষ্ম বর্ণ এবং অন্ত্য অর্থাৎ ওষ্ঠ্য বর্গের উষ্ম বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন পাওয়া যায় কেবল, তালব্য বর্গের উষ্মবর্ণ অর্থাৎ শ, তার পর মূর্দ্ধন্য বর্গের উষ্ম বর্ণ অর্থাৎ ষ, তার পর দন্ত্যবর্গের উষ্মবর্ণ অর্থাৎ স।

বাকী আছেন,—হ। ঐ যে মহাপ্রাণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি পরিস্ফুট হইতে গেলেই হ হইয়া থাকেন। যেখানে বিসর্গের আলোচনা করা গিয়াছে, সেই স্থানটা দেখিলেই হকারের স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। মহাপ্রাণ ধ্বনি অকারে

উপগত হইয়া ব্যঞ্জনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা এখন বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে অপর একটী ল আছেন। তিনি ইদানীন্তন সুশিক্ষিত সভ্যসমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত সেইজন্য এ আসরে তাঁহাকে টানিয়া আনিলাম না।

আর একটী যুক্তাক্ষর—ক্ষ—ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে বরাবরই চলিয়া আসিতেছেন। ইনি কেন আইসেন, তাহা জানি না। কিন্তু বিবেচনা হয় যে, এইটী না থাকিলে, বর্ণমালাই হইত না। ক্ষ যেন বর্ণমালার মেরু। আবার মালা গাঁথিতে হইলে সূত্রের দুই মুখ একত্র করিতে হয়। অকার হইতে হকার পর্য্যন্ত সূত্রে গাঁথা গিয়াছে বটে, কিন্তু মালা গাঁথা হয় নাই; মালা গাঁথিতে হইলে সূত্রের দুই প্রান্ত একত্র করিয়া বাঁধিতে হয়। কিন্তু স্বরে ব্যঞ্জনে বাঁধা যায় না, আবার একটু সূত্রাগ্রভাগ অর্থাৎ ‘ফুঁপি’ না রাখিলেও বাঁধা যায় না, সেই জন্যই স্বরবর্ণ গুলিকে বাহিরে রাখিয়া আদ্য ব্যঞ্জন ক ও সর্ব্বোচ্চ উষ্মবর্ণ মূর্দ্ধন্য “ষ” একত্র করিয়া গ্রন্থি বাঁধিয়া বর্ণমালা সাঙ্গ করা হইয়াছে।

সংস্কৃত-বর্ণমালা সম্বন্ধে আমি যেরূপ কল্পনা করিয়াছি, তাহা বলিলাম। সংস্কৃত-বর্ণমালার কেমন সুন্দর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, কেমন চমৎকার ক্রমপরিপাটী, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। মূলে যাহার এই সৌন্দর্য্য, এই বৈজ্ঞানিক পারিপাট্য, তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে জানিলে যে, পরমানন্দ লাভের সম্ভাবনা আছে; তাহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই কেবল বুঝিতে পারেন। কিন্তু কালধর্ম্মবশে দুর্ভাগ্য এবং মোহ আমাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অমৃতভাণ্ড চূর্ণ করিয়া বিষপাত্রের জন্য আমরা ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছি। অতুল সম্পদের অধিকারী আমরা ভাণ্ডারপূর্ণ মণিমাণিক্যে অবহেলা করিয়া কাচখণ্ড কুড়াইবার জন্য কতই না কাতরতা প্রকাশ করিতেছি!

দেখিবে না ভাই!—একবার কি ফিরিয়া চাহিয়া দেখিবে না!

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

হিন্দুর শৌচ-প্রকরণ।

ভ্রম যেন, মানুষের লাগিয়াই আছে। যতই কেন সাবধান হও না, যতই কেন সতর্ক হও না; ভ্রমের হস্ত হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইবার যোটী নাই। এই আমারই দেখ না কেন,—বহু গ্রন্থের ব্যাখ্যাত প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় বচন হইতে হিন্দুর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে বসিয়াছি, সুতরাং মূল-উপদেশে ভ্রমমহাশয়, আসন পরিগ্রহ করিতে পান নাই। না পান, তিনি চলিয়া যাইবার লোক নহেন; দোখয়া শুনিয়া লিপিক্রমের একটী স্থান অধিকার করিয়াছেন। শয্যা হইতে ভূতলে পদক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে উপস্থিত দিবসের ধর্ম্মার্থকাম বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া লইতে হয়।

“বিবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ ধর্ম্মমর্থকাম্যাবিরোধিনম্।
অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥”

বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ।

কিন্তু “এই বলি, এই বলি” করিয়া যথাসময়ে এটী বলা হয় নাই,—ভ্রমমহাশয়ের অনুগ্রহে। যাহা হউক, বেশী অগ্রসর না হইতে হইতে যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, ইহাই পরম লাভ বলিতে হইবে।

এই উপদেশটী ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, নাস্তিক, আস্তিক সকলেরই উপকারী। কার্য্যগুলি উদ্বোধ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে স্থির করায় যে অনেক উপকার, তাহা কে না স্বীকার করিবে?

শয্যা হইতে উঠিয়া মুখে জল দিবার পর বহির্দ্দেশ-গমন-ব্যাপার। এই প্রসঙ্গটী বলিবার পূর্ব্বেই নব্য-নাসিকার সঙ্কোচ-বিভীষিকা যেন সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি। বিশেষতঃ একজন শাস্ত্রজ্ঞ নব্য রসিক বন্ধুর রসিকতা স্মরণ করিয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতেছি।

বন্ধু বলিয়াছিলেন, “আমি যদি হিন্দু না হইতাম, তাহা হইলে, প্রাচীনহিন্দুদিগের এই বহির্দ্দেশগমনের, দুইটী চিত্র প্রকাশ করিতাম;—

(১)

“হস্তে ধনুর্ব্বাণ, কক্ষে এক আঁটি খড়। নৈর্ঋত-কোণাভিমুখে আলীঢ় ভাবে অবস্থিত।” দেখিলে ইহাঁকে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত বীরই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কে বলিতে পারে,’ ইনি বহির্দ্দেশ-গমনের জন্য সজ্জিত?

(২)

পরিধেয় বস্ত্র কটিদেশ পর্য্যন্ত উত্তোলিত, মস্তকে পাগ মুখে কথাটী নাই, আর বলিতে পারি না;—সেই রকম একটী বিচিকিৎস্য ভাবে দণ্ডায়মান। ইনি কৃত-পুরীষোৎসর্গ আসন্নজলশৌচ প্রাচীন হিন্দু।"

"উত্থায় পশ্চিমে রাত্রেস্তত আচম্য চোদকম্।
অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা॥
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে তু শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥
নৈঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ।
মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেৎ তু শরত্রয়ম্॥
হস্তানান্তু শতে সার্দ্ধে লক্ষ্যং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
অথাবকৃষ্য বিণ্মূত্রং লোষ্ট্রকাষ্ঠতৃণাদিনা।
উদস্তবাসা উত্তিষ্ঠেদ্দৃঢ়ং বিধৃতমেহনঃ॥"

এই বচনগুলি পাঠ করিয়াই বন্ধু, রসিকতা করিয়াছিলেন। ইহার ভাবার্থ এই—

"রাত্রিশেষে উঠিয়া, কুলকুচা করিবে। পরে পবিত্র স্থানে গিয়া তৃণ দ্বারা ভূমি আবৃত করিয়া তদুপরি প্রস্রাব ত্যাগ ও মলত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই কার্য্যদ্বয় করিবার সময়ে কথা কহিবে না। থুথু ফেলিবে না। নিশ্বাস টানিবে না মনঃসংযোগ রাখিবে। মাঝারি ধনুকে লক্ষ্য স্থির করিয়া ক্রমে তিনটী বাণক্ষেপ করিলে, শেষ শরটী দেড়-শ হাত দূরে পড়ে। বাটীর নৈঋত কোণে এই দেড়-শ হাত দূরে শৌচ প্রস্রাব করিতে হয়।

তার পর কার্য্যসমাধা করিয়া তৃণলোষ্ট্রাদি দ্বারা মলদ্বার মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর বস্ত্র কটিদেশে উত্তোলন পুরঃসর দৃঢ়হস্তে লিঙ্গধারণ করিয়া জল-শৌচ করিবার জন্য সেস্থান হইতে উঠিবে।"

যাঁহাদের সংসর্গে আমার হিন্দু বন্ধুও উপযুক্ত চিত্র অঙ্কন মনে মনেও করিতে সাহসী হইয়াছেন, আমিও তাহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি; তাঁহারা—খোদ তাঁহারা উল্লিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে, পূর্ব্ব হিন্দুগণের অসভ্যতা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিবার জন্য বন্ধুর চিন্তিত চিত্র বিলাত হইতে এন্‌গ্রেভিং করাইয়া গৃহে গৃহে বিতরণ করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু পুস্তক হইতে ঐ বীভৎস কুরুচিপূর্ণ অংশটুকু বিকর্ত্তিত করিয়া মনঃক্ষোভ মিটাইবেন। এই আশঙ্কাই আমার বিভীষিকার কারণ।

কিন্তু ঋষিগণের দারুণ দুঃসাহস, বা বিষম অদূর-দর্শিতা! তাঁহারা স্পষ্টভাবে ঐ সব কথা বলিয়া গিয়াছেন।

"উৎপৎস্যতেঽস্তি * * * * *
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

ভাবিয়াও সাবধান হন নাই বা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই আমাকেও তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইল। এখন সাদা কথায় ঋষি-বচনের তাৎপর্য্যটুকু প্রকাশ করা যাক।

সেই ভোরে উঠিয়া চ'খে মুখে জল দিয়া বাটীর অন্যূন দেড়-শ হাত দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে * পরিষ্কৃত স্থানে নির্জ্জনে "বাহ্যে" যাইবে। মাটীর উপর তৃণ পাতিয়া তাহাতে "বাহ্যে" যাইতে হয়। যাবৎ জলশৌচ না হয়, তাবৎ কথা কহিবে না। বাহ্যে করিতে করিতে থুথু ফেলিবে না। নিশ্বাস টানিবে না। মাথায় কাপড় দিয়া থাকিবে।

প্রস্রাব-বাহ্যে দিবসে করিতে হয়—উত্তরমুখ হইয়া; রাত্রিতে করিতে হয়—দক্ষিণমুখ হইয়া। অনুদয়ে এবং সায়ংকালেও দিবসের নিয়ম। প্রাণের আশঙ্কা-স্থলে ছায়াতে ও দিগ্‌ভ্রমে যখন-তখন যে-মুখো ইচ্ছা বাহ্যে-প্রস্রাব করিতে পারে। তবে, সন্ধ্যোপাসনাকালে, প্রস্রাববাহ্যে করা পীড়িতের পক্ষে অনুমত; অপরের পক্ষে নহে। দ্বিজ, "এক-বস্ত্রে" প্রস্রাব বাহ্যে করিতে হইলে, যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে লাগাইয়া দিবেন। উত্তরীয় থাকিলে, যজ্ঞোপবীতটীকে মালাবৎ পৃষ্ঠে লম্বিত করিয়া রাখিবেন। জুতা পায় দিয়া তাহা করিতে নাই। পথে, গোষ্ঠে, ফালকৃষ্টক্ষেত্রে, জলে, চিতায়, পর্ব্বতে, ভগ্ন-দেবালয়ে, প্রাণিযুক্ত গর্ত্তে, নদীতীরে, পর্ব্বতশিখরে, ভস্মোপরি এবং বল্মীকোপরি প্রস্রাব বাহ্যে করিতে নাই। যাইতে যাইতে বা দণ্ডায়মান হইয়াও করিতে নাই। গো, ব্রাহ্মণ, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, পূজ্যব্যক্তি এবং জলের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব বাহ্যে করিবে না। বিষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। বাহ্যে করা হইলে, তৃণ দ্বারা মলদ্বার মার্জ্জন করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে জলশৌচ করিবে।

প্রথমতঃ মলদ্বারের মৃত্তিকাশৌচ, তৎপরে জল-শৌচ। এসব কার্য্য বামহস্ত দ্বারাই হইবে। মলদ্বারে মৃত্তিকা তিনবার দিবে। মৃত্তিকার পরিমাণ ১ম—অর্দ্ধপ্রসৃতি, ২য়—তদর্দ্ধ, ৩য় বার—তাহারও অর্দ্ধ। প্রস্রাবদ্বারে একবার মৃত্তিকা দিতে হয়।

* দক্ষিণ দিকেও কোন সময়ে হইতে পারে।

তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামা অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্ব যে মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হয়, তত টুকুই এই শৌচে এবং হস্তাদিশৌচে প্রয়োজনীয়। মৃত্তিকা বেশ ধুইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত জল লইতে হইবে। তাহার পর হস্তে মৃত্তিকা;—বামহস্তে দশবার, এবং দুই হস্তে সাতবার মৃত্তিকা দিবে। নখ থাকিলে, তৃণ দ্বারা তন্মধ্য পরিষ্কৃত করিয়া দুইহাতে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। পরে দুই পদতলে তিনবার করিয়া মৃত্তিকা দিয়া শেষে জলদ্বারা বেশ করিয়া প্রক্ষালন করিবে। ইহাতে গন্ধদূর না হইলে, আরও অধিক অর্থাৎ যত বারে গন্ধদূর হয়, ততবার মৃত্তিকাশৌচ কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা অপেক্ষা অল্পবারে গন্ধলেপাদি দূর হইলে স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীতের আর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে না। দ্বিজাতির পক্ষে কিন্তু পূর্ণ করা চাহি।

এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমি এত মৃত্তিকা ও জলশৌচের কথা একদমে অসঙ্কোচে বলিয়া গেলাম; আমারই কি কম সাহস,—না কম বাহাদুরী? মাটীকে বরতরফ করিয়া সাবান চালাইবার কালও গতপ্রায়; এখন জলকে বিদায় দিয়া কাগজে কাজ সারিবার ব্যবস্থা দেওয়ার সময় উপস্থিত। আমি কি না সেই পুরাণ মাটীর কথা লিখিয়া সব মাটী করিতে বসিয়াছি,—জলের কথা প্রবল করিয়া লোক জ্বালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! তবে ইহাত আমার বাহাদুরী নয়;—বোকামী। তা ইহা বাহাদুরীই হউক, আর বোকামীই হউক, সার কিন্তু বকামী। নতুবা বুড়া-বুনো-ঋষিদিগের কথায় মজিয়া কলিকাতাবাসিগণ কি—মাটী মাটী—করিয়া "ভিটামাটী চাটী" করিবে? কাজেই ফর্দ্দমত হাতে মাটী কলিকাতায় অচল। তা হলেই হইল, সর্ব্বত্র তথৈবচ। কেন না,—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

শ্রেষ্ঠের অনুকরণ অপরে করিয়াই থাকে। তবু কিন্তু আমি নাছোড়-বান্দা।

বলিয়া রাখা ভাল; পায়খানার নিকট বড়ই ঠকিয়াছি। সেই মহাসহর—ক্ষুদ্র-সহর—অর্দ্ধ-সহরাধিকারিণী পল্লীগ্রামের-বড়মানুষী-বৈজয়ন্তী পায়খানার প্রভাবে আমরা এবং অনেকেই মনুর মান রাখিতেও অপারগ, দক্ষের সপক্ষে কথা কহিতেও অনিচ্ছুক। কোথায়ই বা নৈঋতকোণ, আর কোথায়ই বা দেড়-শ হাত! কোথায়ই বা পরিষ্কৃত স্থান, আর কোথায়ই বা ভূমিতে তৃণাস্তরণ! "কা কস্য পরিদেবনা!!" পায়খানার কাছে সব গিয়াছে।" তবে কি না পায়খানা নাই—এমন লোক যথেষ্ট আছে, এইজন্যই সকল কথা আমাকে বলিতে হইয়াছে।

ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণ, এইটুকু দেখিয়াই আনন্দে অধীর হইবে, আর উচ্চকণ্ঠে বলিবে, "যখন পায়খানায় বাহে যায় তখন হিন্দুর আর জাতি কোথায়?"

হিন্দুগণ! তোমরা তাহাতে বিচলিত হইও না। জাতির সঙ্গে উক্ত কার্য্যের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই। তবে সাধ্যসত্ত্বে পায়খানায় যাইও না। আমরা যুক্তিতর্কের বড় ধার ধারি না। ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার আভাসমাত্র দিলাম। যুক্তি দিয়াছেন, একজন বিলাতী প্রধান ডাক্তার। তিনি উক্ত সকল নিয়মই স্বাস্থ্যের উপযোগী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা বলি উহাতে অন্য ফলও আছে, স্বাস্থ্যও আছে। যাহাতে দুর্গন্ধ দ্রাণ লইতে না হয়, মনে বিকার উপস্থিত না হয়, এই জন্য পরিষ্কার স্থানে বাহে যাওয়া উচিত; নৈঋত কোণ হইতে কখনই বায়ু বহে না, ঐ দিকে মলত্যাগ করিলে মলগন্ধবাহী বায়ু বাটীর দিকে আসিতে পারে না; অন্ততঃ দেড়-শ হাত দূর বলিয়া বাটীতে দূষিত গ্যাসও আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। তৃণ বিছাইয়া তদুপরি মলত্যাগ করিলে, মলবাহিগণ অনায়াসে মুক্ত করিতে পারে। বিষ্ঠার দাগটী পর্য্যন্ত মাটীতে থাকে না, সুতরাং পরদিন তাহার নিকটেও আবার যাওয়া যায়। দুই-চারি-দশ দিনের দাগ থাকিতে থাকিতে সেখানকার বাষ্প বায়ু ক্রমে দূষিত হইতে পারিত, উক্ত নিয়মে তাহা নিবারণ করা হইয়াছে। আর শৌচ পারিপাট্যও—দুর্গন্ধ বা যে কোনরূপ সংস্রব দূর করিবার জন্য। এই রকম যুক্তি স্বাস্থ্যের পক্ষ হইতে দেওয়া যাইতে পারে।

এখন আর একটী কথা বলিব। প্রস্রাবত্যাগ করিলেও মৃত্তিকা-শৌচ করিতে হয়। একালে প্রস্রাব করিয়া যিনি জল লন, তাঁহার প্রশংসা ধরে না,—তিনি হিন্দুকুল-চূড়ামণি। এমন সময়ে মৃত্তিকা-শৌচের কথাটা বাদ দেওয়াই উচিত ছিল বটে, কিন্তু তাহা করিলাম না,—ঋষিদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া।

প্রস্রাব করিয়া প্রস্রাব-দ্বারে একবার, বাম হাতে তিনবার, দুই হস্তে একবার এবং দুই পায়ে এক একবার করিয়া মাটী দিবে। মাটীর পরিমাণ পূর্ব্ববৎ। তৎপরে মৃত্তিকা-প্রক্ষালনোপযোগী জল লইবে।

জলশৌচ, জলাশয়ের মধ্যে অকর্ত্তব্য। জল-পাত্রাভাবে জলের ধারে বসিয়া হাতে জল লইয়া জলশৌচ করিতে পারে। কিন্তু তীর হইতে প্রায় এক হাতের মধ্যের জল লইবে না। হাত বাড়াইয়া দূরের জল লইবে। এবং সেই জলাশয় তীর-ভূমি শৌচান্তে পরিষ্কার করিতে হইবে। জলপাত্র স্পর্শ করিয়া 'শৌচ' প্রস্রাব করিলে, সে জল দ্বারা জল-শৌচাদি করিবে না। কারণ, তাহা অত্যন্ত অপবিত্র হয়।

নির্দ্দিষ্ট শৌচের ন্যূন ত করিবেই না, অধিকও করিতে নাই।

"ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যং শৌচং শুদ্ধিমভীপ্সতা।"

বল্মীক-মৃত্তিকা, মূষিক-মৃত্তিকা এবং শৌচাব-শিষ্ট মৃত্তিকা শৌচের অনুপযোগী। গৃহ-লেপনের (ঘর-গোবরের) 'গোলা' মাটী বা জলের ভিতরের মাটী দিয়াও শৌচ করিতে নাই। যে মাটীর ভিতরে, কোন জীব মরিয়া গিয়াছে, সে মাটী দ্বারাও শৌচ হয় না। হল-মুখোৎকীর্ণ এবং কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকাও শৌচে অগ্রাহ্য। *

হস্তমৃত্তিকা প্রভৃতি যত বার দিতে বলা হই-য়াছে,—অসমর্থ ব্যক্তি রাত্রিকালে তাহার অর্দ্ধেকবার দিলেই শুদ্ধ হইবে। আতুরের পক্ষে সিকি। অশক্ত পথিকের খুব কম, সিকির অর্দ্ধেক।

যথোদিতং দিবাশৌচমর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে।
আতুরে তু তদর্দ্ধং স্যাৎ তদর্দ্ধন্তু পথি স্মৃতম্॥

যথোক্তকরণাশক্তাবেবেদম্। আহ্নিকতত্ত্ব।

আজ-কালকার কোন কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের টাকা রোজগারের সুযোগ এই রকম জায়গায়।

কেহ যদি কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া জিজ্ঞাসা করে,—"মহাশয়! হাতে-মাটীটা কিছু কম জম দিলে চলে না।" মহাশয়, টাকা গণিয়া মনোমত হইল ত বলি-লেন, "হাঁ, চলে বৈ কি;—"অর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে" রাত্রিকালে অর্দ্ধেক। রাত্রি কাহার নাম?—যখন সূর্য্য না দেখা যায়, তখনই রাত্রি। অতএব চক্ষু বুজিলেই রাত্রি। কেহ বলেন বটে; "সূর্য্য-শূন্য সময়ের নাম রাত্রি;" কিন্তু তাহা ভ্রম; কেননা—সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সূর্য্য কোথায়ও না কোথায় আছেনই। একেবারে সূর্য্য-শূন্য সময় মোটেই নাই। কাজেই আমি যে রাত্রির লক্ষণ করিয়াছি, তাহাই ঠিক। অতএব হাতে-মাটী দিবার সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিবে, তাহা হইলে অর্দ্ধেক বার দিলেই চলিবে।"

"মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ যথা দিবা॥"
"ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথাসুখমুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণবাধভয়েষু চ॥"
"কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতম্।
বিণ্মূত্রে চ গৃহী কুর্য্যাদ্ যদ্বা কর্ণে সমাহিতঃ॥"
"বদ্ধৈকবস্ত্রো যজ্ঞোপবীতং কর্ণে কৃত্বাবগুণ্ঠিতঃ।"
"ন মূত্রং পথি কুর্ব্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে।
ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্ব্বতে।
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন গচ্ছন্ নাপি চ স্থিতঃ।
ন নদীতীরমাসাদ্য নচ পর্ব্বতমস্তকে।
* * কদাচন কুর্ব্বীত বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্॥"
"প্রত্যগ্নিং প্রতি সূর্য্যঞ্চ প্রতি সোমোদকদ্বিজান্।
প্রতি গাং প্রতি বাতঞ্চ প্রজ্ঞা নশ্যতি মেহতঃ।"
"অগ্নি-সূর্য্য-চন্দ্র-জল-ব্রাহ্মণ-গোবাতাভিমুখং মূত্র-পুরীষে কুর্ব্বতঃ প্রজ্ঞা নশ্যতি।" (কুল্লুক-টীকা)।
"পর্ব্বত-মস্তকনিষেধোঽধিকদোষায়। (আহ্নিকতত্ত্ব)
"————————পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখে।
কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবন-বিণ্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ————"
"ন চ সোপানৎকো মূত্র-পুরীষে কুর্য্যাৎ।"
"আহার-নির্হার-বিহারযোগাঃ
সুসম্বৃতা ধর্ম্মবিদা তু কার্য্যাঃ।"
"ন বিণ্মূত্রমুদীক্ষেত"
"একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে তথা।
উভয়োঃ সপ্তদাতব্যামৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা"।
উভয়োঃ করয়োঃ————————।" (আহ্নিকতত্ত্ব)
তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা নখবিশোধনম্।
"তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ॥"
"অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রা তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা।
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধার্দ্ধা প্রকীর্ত্তিতা॥"
মলদ্বারাদন্যত্র পরিমাণমাহ যমঃ। (আহ্নিকতত্ত্ব)
"মৃত্তিকাতু সমুদ্দিষ্টা ত্রিপর্ব্বী পূর্য্যতে যয়া।"
"ত্রিপর্ব্বী তর্জ্জনীমধ্যমানামানামগ্রপর্ব্বত্রয়ম্।"
যদা তূক্তপ্রমাণয়া মৃদা গন্ধলেপক্ষয়ো ন ভবতি তদাধিকয়াপি কর্ত্তব্যম্,—"গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ।
"ন যাবদুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা।
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং তেষাং বিধীয়তে॥"
"মূত্রোচ্চারে কৃতে শৌচং ন স্যাদন্তর্জ্জলাশয়ে।"
"অরত্নিমাত্রং জলং ত্যক্ত্বা কুর্য্যাৎ শৌচমনুদ্ধৃতে।
পশ্চাচ্চ শোধয়েৎ তীর্থমন্যথা ন শুচির্ভবেৎ॥"
"বল্মীক-মূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাম্।
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাং সকর্দ্দমাম্॥"

আবার একজন ধনী প্রভুত অর্থ শ্রীচরণোপান্তে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! আমার পুত্র জলশৌচ করে না, 'হাঁতে-মাটী' করে না, এই অপরাধে সমাজচ্যুত হইয়াছি। শুনিয়াছি,—বেদে সব আছে; আপনি ত একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ,—বেদে জলশৌচাদি না করিবার কি কোন প্রমাণ নাই? যদি থাকে ত তাহা দর্শাইয়া ও আপনার অভিমত ব্যক্ত করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন।"

ঠাকুর, পায়ের নিকট চাহিয়া গলিয়া গেলেন, বলিলেন, "হাঁ আছে।"

"যথোদিতং দিবা শৌচমর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে।
আতুরে তু তদর্দ্ধং স্যাৎ তদর্দ্ধন্তু পথি স্মৃতম্।"

অর্থাৎ পথে একেবারেই শৌচ নাই। কথাটা বুঝ; দিবসে পূর্ণ শৌচ, * *, সিকি পীড়িতের পক্ষে, পথে সিকির অর্দ্ধ। মলদ্বারে,—৩ বার মাটী—পূর্ণ শৌচ। তার সিকি হয় কয়বারে? সিকির অর্দ্ধেকই বা হইবে কিরূপে? দেড়-সিকিবার ত মাটী দেওয়া চলে না। দুইহাতে সাত বার মাটী পূর্ণশৌচ। তাহার সিকির অর্দ্ধেক এক বারেরও কম; হাতে মাটী ঠেকাইলেই একবার হাতে-মাটী দেওয়া হইল; তাহার কম করিতে হইলে একেবারে নাদেওয়াই উচিত। দিলে বরং শাস্ত্র লঙ্ঘনজন্য মহাপাপ। বাম হস্তে দশবার হাতে-মাটী পূর্ণশৌচ, তাহার সিকির অর্দ্ধ ১।০ সওয়া বার। সওয়া বার হাতে-মাটী দিবার বিধান কেবল পরিহাস মাত্র। অর্থাৎ সওয়া বার হাতে-মাটীও নাই; পথে শৌচও নাই। এইরূপ মীমাংসা সর্ব্বত্র। এখন দেখিতে হইবে, তোমার পুত্রের মলত্যাগাদির স্থান পথ কি না? একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, অবশ্যই পথ। কেননা, শাস্ত্রে কিছু "অমুকের পথ" এরূপ উল্লেখ নাই। তবে পায়খানা পথ না হইবে কেন? তোমার বাটীই বা পথের বহির্ভূত হইবে কেন? ঐ সকল স্থান—অন্ততঃ কীট-পতঙ্গ মক্ষিকা-মশকেরও পথ। সুতরাং শৌচাভাবে তোমার পুত্রের কোনই দোষ নাই।"

এইরূপ বিচারপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র, অনেক টাকার ফল।

সুরুচি-প্রিয় পাঠকবৃন্দ যেন এই প্রস্তাবটী না পড়েন; ইহা বলিয়া রাখা ভাল।

শাস্ত্রীয় তর্ক।

"পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খদোষা হি কেবলং" কথাটা বড়ই ঠিক;—পণ্ডিতের না আছে এমন গুণ নাই, দোষের মধ্যে যা' কেবল মূর্খতা। অবস্থাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই একথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না—যে, জাল জুয়াচুরী, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, সময় বিশেষে চুরী বাটপাড়ী সকল গুণই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আছে,—নাই কেবল বিদ্যা বা শিক্ষা। তাহা থাকিলে, আমরা অনায়াসে,—হে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত!—তোমাদিগকে সম্মান করিতাম, বন্ধু বলিতাম, প্রেমভরে আলিঙ্গন দিতাম। কিন্তু হা হতভাগ্যগণ! সে পবিত্র সুখে তোমরা চিরবঞ্চিত। যেহেতু শিক্ষা তোমাদের একেবারেই নাই। জানত দুগ্ধ-পূর্ণ পাত্রে এক বিন্দু গোমূত্র পড়িলে, দুগ্ধের কি দশা হয়! সেইরূপ এক শিক্ষার অভাব, তোমাদের গুণরাশি বিনষ্ট করিয়াছে।

তবে সাধারণের অবগত্যর্থ একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক;—

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মস্তক-মধ্য-বিলম্বিত কেশ-গুচ্ছকেও অনেকে 'শিক্ষা' বলে বটে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। এই শিক্ষার অপভ্রংশ—শিখা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বৃন্দ, শিখা নামই ব্যবহার করে। বলা বহুল্য যে, এটীও পূর্ব্ববৎ ভ্রম-প্রমাদ-মোহ-বিজৃম্ভিত। ঐ কেশগুচ্ছ গুলির নাম, শিক্ষা বা শিখা আদৌ নহে; উহার নাম,—টীকি, চৈতন, 'ক' ফলা এবং তরমুজের বোঁটা। শিক্যা বা শিকাও হইতে পারে। উহাতে একটী পুষ্প প্রায়ই দোদুল্যমান থাকে বলিয়া উহাকে শিক্যা বা শিকা বলা যায়। সময় বিশেষে ঐ শিকা বহুতর গুপ্ত ভার—নোট প্রভৃতি বহন করে।

আর শিক্ষা শব্দে এজুকেশন। এজুকেশন নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মাটী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মূর্খতার পরিচয় ক্রমে পাইবে।—

"অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ॥

মনু পরাশর।

যাহারা অপ্-রত, অর্থাৎ জল ব্যতীত যাহাদের এক দণ্ড চলে না;—যাহাদের সন্ধ্যা-পূজায় জল চাই, শৌচে জল চাই, প্রস্রাবে জল চাই, আবার যখন-তখন আচমনে জল চাই; যাহারা স্নান-ধী-

যান, পরের বুদ্ধিতে—পুরাণ-চোতার আদেশ মত—চলে ; * সেই সকল দ্বিজ, যে গ্রামে ভিক্ষা পায়, রাজা সে গ্রামবাসীদিগকে, চৌর-পোষক বলিয়া দণ্ড দিবেন।

এ সদর্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে বুঝে না। টেবিল-চেয়ারে উপাসনা, নিরম্বু প্রস্রাব, কাগজে শৌচ, আচমন-বিসর্জ্জন এবং আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকল বিষয় স্থির করা ও তদনুসারে ব্যবহার করা যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের নিতান্ত প্রিয় ছিল, তাহা উপর্য্যুক্ত বচন পাঠে বেশ বুঝা যায়।

বিশেষতঃ, মনু, ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন,—

"স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ"

আপনার প্রিয় যাহা হইবে, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং প্রাচীন পুস্তকে যদি কিছু বিভিন্ন-প্রকার ধর্ম্মের কথা থাকে, ত তাহা বোধ করি, পরবর্ত্তী গর্দ্দভাবতার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা রচনা করিয়া মূলের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন। নতুবা মনু-বচন সম্পূর্ণ অসঙ্গত হয়।

যে দুইটী ঋষিবাক্য উপরে উদ্ধৃত হইল ,বল দেখি, তাহা কতদূর উদার মত! সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যে-পূর্ব্বপুরুষগণ এতদূর উদার-হৃদয় ছিলেন, তাঁহারা কখনই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ঘোরতর দারুণ যন্ত্রণাময় কারানিয়ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই।

পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিদ্যাবর্জ্জিত হইল, শাস্ত্রের অর্থ বুঝিল না ; একটা যা'হউক কল্পনা করিয়া স্ব স্ব মত সমর্থনে প্রয়াস পাইল। ইহাতেই দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শিক্ষার অভাবে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ; সঙ্কীর্ণতার ফল বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম বা কারানিয়ম।

তবে এ দোষের জন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকেই দোষী করা যায় না। শিক্ষার পুরুষানুক্রমিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্য-হৃদয়ে কতকগুলি কুসংস্কার আসিতে লাগিল, ক্রমে সে গুলি গাঢ়তর হইতে থাকিল ; তাহার ফলেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম। এখনকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আরও অশিক্ষিত, কাজেই প্রাচীন শাস্ত্রেরও সদর্থ বুঝে না ; অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র হইতেও বিচার সঙ্গত অর্থ বাহির করিতে পারে না।

সেইজন্যই ধর্ম্ম এখন বিভীষিকাময়। এইরূপ অবনতি যে ক্রমে হইয়াছে, তাহা অবরোহ-প্রণালী-ক্রমে প্রতিপন্ন করিতেছি,—

সুতরাং প্রথমে প্রাচীন কাল হইতে যথাক্রমে পর পর গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া যাই ; তাহা হইলে, প্রতিজ্ঞাত বিষয়টী বিশদ রূপে বুঝান যাইবে।

১ম ঋগ্বেদ, ২য় যজুর্ব্বেদ, ৩য় সামবেদ, ৪র্থ মনু-সংহিতা আরও কতিপয় সংহিতা, ৫ম অথর্ব্ববেদ, ৬ষ্ঠ উপনিষৎ, ৭ম মহাভারত, ৮ম ভাগবত, ৯ম রামায়ণ, * ১০ম কাব্য-নাটক-পুরাণাদি। দর্শন, জ্যোতিষাদির কথা ছাড়িয়া দিলাম। আমাদের কথা সপ্রমাণ, উক্ত দশবিধ গ্রন্থ দ্বারাই হইবে।

বেদত্রয়, আমাদের উৎকৃষ্টাবস্থার পরিচায়ক ; তখন, গবাদি মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান, এক-জাতিতা, স্ত্রীস্বাধীনতা, যথেচ্ছ বিহার, এ সমুদয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, জাবাল শ্রুতিতে লিখিত আছে,—

"সত্যকামো জাবালো মাতরমপৃচ্ছৎ,—কিংগোত্রোহস্মীতি, সৈবং প্রত্যবাদীৎ,—বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামালভে নাহং তদ্বেদ।"

ব্যাপার খানা বুঝুন!—

* আন—অন্য ; প্রমাণ—কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতিতে যথেষ্ট আছে। ধী—বুদ্ধি। যান—চলা।

* আধুনিক অনেক ব্যক্তির ধারণা,—রামায়ণ, মহাভারতেরও পূর্ব্বে বিরচিত। এইজন্য রামায়ণ-কর্ত্তা বাল্মীকিকে আদিকবি বলিয়া উল্লেখ নানা গ্রন্থে আছে, এইরূপ প্রমাণও তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। গ্রন্থোক্ত সামাজিক রীতি-নীতি দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। বিশেষতঃ বাল্মীকি, প্রচেতা হইতে অধস্তন দশম পুরুষ ; আর মহাভারত-কর্ত্তা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, বসিষ্ঠের প্রপৌত্র। বসিষ্ঠ ও প্রচেতা দুই ভাই,—সুতরাং বাল্মীকি হইতে বেদব্যাস ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ, অর্থাৎ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের লোক। গ্রন্থ-কর্ত্তার পৌর্ব্বাপর্য্যেই গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির হইতেছে।

এই জন্যই বিখ্যাত বিদুষী কর্ণাট-রাজমহিষী, ব্রহ্মার পরেই বেদব্যাসের নাম করিয়াছেন ; যথা,—

"একোহভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপরঃ।"

অর্থাৎ "একজন কবি পদ্ম হইতে উৎপন্ন (ব্রহ্মা), তৎপরে আর একজন দ্বীপে উৎপন্ন (দ্বৈপায়ন বেদব্যাস), অপর একজন বাল্মীকসম্ভূত (বাল্মীকি)।"

বাল্মীকিকে যে আদি-কবি বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা বাল্মীকির প্রতি বিশেষ-সম্মান-প্রদর্শনার্থ মাত্র, নতুবা প্রকৃত নহে। অতএব, বেদব্যাস-পুত্র শুকের প্রণীত ভাগবতও রামায়ণ হইতে ১১০ একশত দশ বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থ।" ভাষ্য।

"সত্যকামী. জাবাল, মাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা! আমি কোন্-গোত্র?' মা—বলিলেন, 'বাবা! যৌবনে অনেকের সহিত সংসর্গ করিয়া তোমাকে পাইয়াছি, জানি না, তুমি কোন্-গোত্র।'

তার পর, সেই জাবাল, গৌতমের প্রধান শিষ্য ঋষিপুঙ্গব হন।

সোম-যাগ, গোমেধ যজ্ঞ,—মদ্য-মাংস-প্রচলনের বিশিষ্ট পরিচায়ক।

মনুসংহিতায় আছে,—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।"

মদ্য-মাংস-ভক্ষণাদিতে দোষ নাই। এবং অব্রতা ইত্যাদি পূর্ব্ব-বচনদ্বয়ও এ সময়ে দ্রষ্টব্য।

অত্রি সংহিতায় আছে,—

"ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ"।

পরপুরুষ-সংসর্গে, রমণীর কোন দোষ নাই। অথর্ব্ববেদে প্রাচীন বেদত্রয় অপেক্ষা নূতন কথা কিছু নাই।

তার পর মহাভারত দেখ; দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী আছে, কুন্তীর কারখানা আছে, অর্জ্জুনের বিধবা-বিবাহ আছে, যৌবনে বিবাহের ব্যাপারও প্রদর্শিত হইয়াছে, পছন্দ-সহিবিবাহ আছে, যদুবংশের বারুণী-পানের কথা স্পষ্ট আছে; বেদব্যাসের ধীবর-কন্যার গর্ভে উৎপত্তি—এ বিবরণও অসঙ্কোচে লিখিত আছে। সুতরাং এই পর্য্যন্ত আমরা পূর্ব্ব পুরুষ দিগের ধর্ম্মনীতি একরূপ স্থির করিতে পারি;—

বেদ হইতে মহাভারত পর্য্যন্ত—এই সাত শত বৎসর—সকল স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছ আহার, যথেচ্ছ বিহার ছিল। পছন্দসহি-বিবাহ, যৌবন-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। ধর্ম্ম—যে যেমন ভাল বাসিত, সে সেইরূপ কল্পনা করিয়া লইত। জাতি ভেদ ছিল না।

এখনকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করে যে, সেই সময়টী ভারতোপনিবেশী আর্য্যদিগের চরম উন্নতির কাল। একথা বলাই বাহুল্য যে, উক্ত গ্রন্থ সমূহে এতদ্বিরুদ্ধ প্রমাণ যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত।

মহাভারতের সময় অতীত হইবার পর হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, ভাগবতে তাহার পরিচয় দেখ;—

"তেজীয়সাং ন দোষায়"

এইটুকু বন্ধন আসিয়া দাঁড়াইল; শিক্ষার অবনতি এইখানেই প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়।

যাহা সর্ব্বসাধারণের অধিকার-ভুক্ত ছিল, তাহা কেবল তেজস্বীর আয়ত্ত থাকিল, যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা শাসন মানিতে বাধ্য; আর যাহারা প্রবল—সমাজ মানে না, শাসন মানে না—তাহাদিগকে হাতে রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইল,—তেজস্বীদিগের দোষ নাই। ইহা হৃদয়ের ঘোর সঙ্কীর্ণতার পরিচয়, তাহা সহৃদয় মাত্রেই বুঝিবেন। ভাগবত, মহাভারতের ৪০ চত্বারিংশৎ বৎসর পরে রচিত।

তার পর রামায়ণে দেখ এ অধিকারও গিয়াছে। অহল্যার নির্যাতন, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, সীতার বনবাস, রামের বনগমন—পর্য্যালোচনে ঠিক বোধ হয়, তখন পুরুষের কতকটা অধীন হইতে হইয়াছে; স্ত্রীলোক ত বড়ই অধীন,—যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার যো'টী নাই। কিন্তু সীতা-বিবাহে, যৌবন-বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়, সূর্পণখার বিবাহোদ্যোগে বিধবা-বিবাহের আভাসও পাওয়া যায়। গঙ্গা-যমুনার নিকট, সীতার প্রার্থনা-বাক্যে—

"সুরাঘটসহস্রেণ"

"সহস্র কুম্ভ সুরা দ্বারা পূজা করিব" দেখিয়া, সুরার প্রচলন দেখিতে পাই। রামের লঙ্কা গমন দ্বারা, সমুদ্রযাত্রাও বিহিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারি। গুহক চণ্ডাল ও শবরীর সহিত রামের ব্যবহার দর্শনে স্থির করা যায়, জাতিভেদ তখনও হয় নাই। তারা মন্দোদরীর প্রকরণে বিধবা-বিবাহ প্রমাণিত হয়। দেবরের সহিত সংসর্গে যে বিশেষ দোষ নাই, তাহা মারীচ-বধ সময়ে লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি দ্বারা এবং সুগ্রীব-পত্নী রুমার সহিত বালীর সংসর্গে বেশ বুঝা যায়।

আরও অবনতি কালিদাসের সময়ে। তখন জাতিভেদ হইয়াছে, পশুপূজা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যৌবন বিবাহ ছিল, প্রমাণ—শকুন্তলা ইন্দুমতীর বিবাহ প্রসঙ্গে। যবনদেশে গমন ও মদ্যপানের সত্তা স্থির হয়, রঘুর দিগ্বিজয় প্রকরণে। উত্তরচরিতের সময়-পর্য্যন্ত গোমাংস-ভক্ষণ চলিত ছিল। চতুর্থ অঙ্কে সৌধাতকির কথা তদ্বিষয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ। পুরাণে মিশ্রভাব; নিষেধ আছে, বিধি আছে, বড়ই গোলযোগ—ঠিক করিবার যো নাই; তবে বিধবা-বিবাহ, যৌবন-বিবাহ, মদ্য-মাংস-ভক্ষণ এই সময় হইতেই বন্ধ হয়—ইহা বুঝা যায়। এই সময় হইতেই ঘোরতর অবনতি। ভাগবত হইতে উত্তরচরিত পর্য্যন্ত এই ৮০০ শত বৎসর,

অবনত অবস্থা হইলেও মন্দের ভাল। তৎপর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই প্রায় সহস্র বৎসর ক্রমেই অবনতি। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শিক্ষা হইলে এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কেননা, কতক গুলি লোকের শিক্ষা হওয়াতেই, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যতদূর অবনতি ছিল, বোধ হয়, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মূর্খতা দূর হইলে, সর্ব্বাংশে উন্নতির আশা করা যায়। কিন্তু হায়! সে আশা আকাশ-কুসুম মাত্র !!

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ, মূর্খতার প্রভাবে, শুধু যদি বচনার্থ-বোধে অক্ষম হইত; তবুও বাঁচিতাম; কিন্তু তাহা ত নহে; বর্ণের শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনাও এখন তাহাদের নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন;—

সংস্কৃত ও বঙ্গীয় বর্ণমালাতে 'জ' এবং 'য' দুইটী জিনিস; কিন্তু এদেশে উভয়েরই উচ্চারণ অনেক স্থলে এক; যথা,—যমুনা, জননী, জনক। একে বিদ্যার অভাব, তাহাতে উচ্চারণের আবার এই দৌরাত্ম্য। সুতরাং "সোণার উপর সোহাগা"— আর পায় কে? সমাজের নেতা * ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বৃন্দ ও তৎপথানুসারা গণ্ডগণ, সংস্কৃত জাতি শব্দটী 'যাতি' করিয়া লইয়াছে। কিন্তু জাতি ও যাতির যে, আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।—কথাটা পরিস্কার করিয় বলিতেছি—

সংস্কৃত-শাস্ত্রমতে, জাতির লক্ষণ,—

'নিত্যানেক সমবেতা জাতিঃ'

অস্যার্থঃ।

যে জিনিশটী—নিত্য, অনেক এবং সমবেত, তাহাই জাতি।

ব্যাখ্যা।

নিত্য—যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই;—যাহা হয়ও না, যায়ও না, তাহাই নিত্য। অনেক—বহুতর। সমবেত—মিলিত। তবেই হইল,—'যাহা ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন, চাণ্ডাল ইত্যাদি রূপে নানাবিধ হইলেও পরস্পর মিশ্রিত হইবে, অথচ উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইবে না,—তাহাই জাতি.

জাতি-ভেদ অবশ্য আছে বটে, কিন্তু সকল জাতকেই একত্র হইতে হয়—পরস্পর মিশিতে হয়। ব্রাহ্মণ,চাণ্ডালের অন্ন ভোজন করিবে; যবন—ব্রাহ্মণ শূদ্রকে পত্রাবশিষ্ট দিবে;—তথাপি পুরাতন পৈতৃক জাতি যাইবে না, নূতন কোন জাতি উৎপন্নও হইবে না,—যা 'তাই' থাকিবে। ইহাই জাতির প্রকৃত লক্ষণ।

আর, যাতি—অর্থে যায়, যাইতেছে ক্রিয়া-সাহায্যে কর্ত্তৃপদ উহ্য। অর্থাৎ যাহা যায়। কিংবা যাতি—যা + ক্তি (কর্ত্তরি) গমনপরায়ণ। এখন পদে পদেই জাতি যায়,—এ পাশ ফিরিলে জাতি যায়, ও কথাটী বলিলে, জাতি যায়; কত রকমেই জাতি যায়! সুতরাং এখনকার 'যাতি' বা গত্বর প্রায় সমানার্থক। সেই 'যাতি'তে বর্গীয় 'জ' স্থান পাইয়াছে,—মূর্খতা ও উচ্চারণের দোষে। অর্থের কিন্তু পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্তস্থ 'য' থাকিতেও যাহা ছিল, বর্গীয় 'জ' আসিলেও তাহাই রহিল। লাভের মধ্যে সংস্কৃত আসল 'জাতি' কথাটা মারা গেল; দেশও উৎসন্ন যাইতে বসিল!

তাহার উপর 'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটক' আছে। "জাতি—নাশশীল,"—মূর্খতা বশতঃ না হয় এই কথা মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত হ; তা নয়, আবার তাহার সাধক বচন-প্রমাণ—মাথামুণ্ড কত কি দেখায়। মূর্খতার বাহাদুরী আছে!

দেশের পনর আনা তিন পাই লোক, গণ্ডমূর্খ; মূর্খাদপি মূর্খ; তা'না হ'লে, তাহারাও কিনা ভণ্ড পাষণ্ড ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া জাতি যাইবার ভয়ে অস্থির হয়। সুতরাং কোন দিকে আর মঙ্গল নাই।

অনেক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি ও দেখিতেছি,—নিভাজ খাঁটি মনুসংহিতার মতে সমাজ গঠিত হইলে সকল দিকে শুভ হয়। কিন্তু এই রকম "অব্রত আনি-ধা-যান" ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের শাসন না করিলে অর্থাৎ তাহাদের ভিক্ষা বন্ধ না করিলে সেরূপ সমাজ গঠন হইবে না। এইজন্য সমুদয় শিক্ষিতবৃন্দ সমবেত হইয়া একটী সভা স্থাপন করুন, যাহাতে উক্তরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কোন স্থলে ভিক্ষা না পায়, তদ্বিষয়ে সভার সম্পূর্ণ লক্ষ্য হউক।

শিক্ষিত সংসর্গী যে ২।১ জন সব্রত * স্ব-স্ব-বুদ্ধি পরিচালিত পণ্ডিত' ব্রাহ্মণ আছেন,

---

* কেন, এক,—লিখিয়া থাকি, আর উচ্চারণ করি—ক্যান, য়্যাক,—ইহা স্মরণ করিয়া যেন 'নেতা'টী পড়েন।

ভাষ্য।

*সব্—রত। কোন কার্য্যই যাঁহার বাকী নাই—এরূপ অর্থ অনেকে করিলেও মূলের সঙ্গে এ অর্থের কোন সংশ্রব নাই।

ভাষ্য।

তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ হইবার জন্য সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে পোষণ করা এ সভার দ্বিতীয় লক্ষ্য হউক। অপরাপর লক্ষ্য সভাস্থলে স্থির করিলেই চলিবে।

কিন্তু সাবধান! আমার এই উপদেশটী যেন অনর্থক না হয়। কার্য্যারম্ভ করিলে অবিলম্বেই সুফল পাওয়া যাইবে।

আমার বক্তব্য শেষ হইল।

এখন নাম স্বাক্ষরেই গোলযোগ! সকলেই জানেন, 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' অঙ্ক ও বামার অর্থাৎ স্ত্রী-লোকের সমান গতি। মনে কর, 'রস-চন্দ্র' আগে রস, তার পর চন্দ্র। রস অর্থে ছয়, আর চন্দ্র শব্দে এক;—সোজা ধরিলে 'রস চন্দ্র' অর্থে ৬১ একষষ্টি; কিন্তু তাহা না হইয়া উহার অর্থ হইবে,—১৬ ষোল। রমণীরও এইরূপ উল্টা গতি; আমি লিখিতেছি;—আমি—এমে; বুঝিতে হইবে, কিন্তু মেএ বা মেয়ে। সুতরাং নামটা আর দিব না। পুরুষ হইলে, আমার উপাধি হইত 'শাস্ত্রী', তাহা যখন হই নাই; তখন উপাধিটাও গোপন করা ভাল।

তবু এবার শ্রীতে শেষ। পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ তর্কে—শ্রীও ফাঁদি নাই।

শ্রী——

মনুসংহিতা সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব।

এক্ষণে মন্বন্তর উপস্থিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে মনুর পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্বন্তরে মনুর একবারেই অন্তর অর্থাৎ অন্তর্দ্ধান হইবে, এইরূপ সংশয় হয়। কেবল অন্তর্দ্ধান হইলেও রক্ষা আছে। এক্ষণে মনুর প্রতি যেরূপ নির্যাতন হইতেছে, তাহা আর সহ্য করা যায় না।

কোথা হইতে কি বাতাস আইসে, তাহা জানা যায় না; অথচ দেখা যায়, এক এক প্রকার জ্বর বা অন্য রোগ সকলকেই আক্রমণ করে। সেইরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার বাতাসে এদেশের প্রায় সকলকেই এই এক বিকৃত ভাব আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কিছুই ভাল বাসেন না। পুরা-তন—অথবা চিরন্তন—হিন্দুসমাজের জাতি, ধর্ম্ম, গৃহ, ধনসম্পত্তি, এ সকলেরই নিয়ামক—মনুর ব্যবস্থাশাস্ত্র। অতএব সেই মনুর প্রতি সকলের বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে।

কেহ বলেন, মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র 'কর্ম্মনাশা'র জলে নিক্ষেপ কর। কেহ বলেন, মান্ধাতার আমলের পূর্ব্বের আর এক মান্ধাতার আমলে যে বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এখনও তাহা চলিবে,—ইহা ক্ষিপ্তের খেয়াল মাত্র। "চোরকে ধর"—এই রব উঠিলে যেমন সকলেই বলে,—"ধর, ধর"; অথচ পনর আনা লোক চোরকে দেখেন নাই; সেইরূপ মনু-স্মৃতির প্রতিবাদী সহস্র লোকের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি-মাত্র ঐ গ্রন্থ দেখিয়াছেন। কিন্তু "মনু সংহার"—"মনু সংহার," এই রব—নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকমাত্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ইংরেজী পড়িয়াছেন, কেবল তাঁহারাই নয় যাঁহারা ইংরেজীর বাতাস পাইয়াছেন, তাঁহারাও মনু-বিদ্বেষী।

এই বিদ্বেষী দলের মধ্যে যুবকের সংখ্যাই অধিক। এই বিড়ম্বনার কারণ এই যে, মনুর অতি প্রাচীনত্ব হেতু তাঁহার নিন্দাবাদ গুলি ইহাঁদের মধ্যে শীঘ্র বিশ্বাস-যোগ্য ও প্রচরদ্রূপ হয়। এই যুবকেরা যেরূপ তর্ক-বিতর্ক করেন এবং যেরূপ কার্য্য করিতে চাহেন, তাহাতে এক অনভিজ্ঞ কৃষক-পুত্রের গল্প মনে পড়ে। এক কৃষিজীবী ব্যক্তির একটী পুত্র ছিল। সে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করেন, তাহাতে ধান্যই উৎপন্ন হয়; সেই ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া লইতে তাহার জননীকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয়। যুবক, এই ব্যাপার দেখিয়া, তাহার পিতার বুদ্ধির দোষ কল্পনা করিয়া, ক্ষেত্রে বীজ-রোপণ সময়ে ধান্যের পরিবর্ত্তে তণ্ডুল ছড়াইয়া দিল। তাহার প্রত্যয় হইয়াছিল যে, যাহা রোপণ করা যায়, তাহাই ফলে, অতএব তণ্ডুল রোপণ করিয়া একবারে প্রস্তুত তণ্ডুল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সংসারে প্রবিষ্ট হই-বার সময় কার্য্য-কারণ-ঘটিত সহজ জ্ঞান প্রভাবে আমাদের যুবকবৃন্দ যাহা করিতে চাহেন, তাহাতে তাঁহারা ঐ অনভিজ্ঞ কৃষক-যুবার ফল প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আক্ষেপ এই যে, যুগের পর যুগ, এই প্রকারে কত যুগ চলিয়া গেল, তথাপি যে অমৃত পুরুষের অব্যর্থ শাসন—এত বড় হিন্দু জাতিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাঁহার হিরণ্ময় উজ্জ্বল মুকুটের উপর ধূলিরাশি পতিত হইতেছে। অথবা এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করা যায় যে, বালকেরা যখন ধূলা-খেলা করে, তখন

তাহারা মহাপুরুষদিগের ক্রোড়ে উঠিয়া তাঁহাদের গাত্রকে কলুষিত করিলে, তাহাতে দোষ হয় না। সেই মহাত্মারা "ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি।" যে নব যুবক, সহজ-লভ্য বিবেচনা করিয়া ধান্যের পরিবর্ত্তে তণ্ডুলের চাষ করিতে চাহেন, তিনি কিছু কাল পরীক্ষা না করিলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি-তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না; এবং কিরূপে মন্বন্তরবৎ দুর্ভিক্ষ হইলেও মানব-সমাজের রক্ষা হয়, তাহা বুঝিতে তাঁহার অর্দ্ধ মন্বন্তর কাল গত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

এই লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয় যে, আমাদের এই অপরিপক্ক সমাজে মনুস্মৃতি যদি মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত না হইত, তাহা হইলে এক প্রকার ভাল হইত। অন্ধকারে বরং পথ দেখা যায়; আলো-আঁধারে চলা দুষ্কর। এদেশে এক বা ততোধিক সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যার সহিত মনুসংহিতার যে সকল সংস্করণ প্রকাশ হইয়াছে, দুর্ম্মূল্যতা ও দুরূহতা নিবন্ধন সকলে তাহা ক্রয় করিতে ও পড়িতে পারে না। এজন্য মনুসংহিতা অল্প লোকের গোচর হইয়াছে। ঐ অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে যিনি মনুকে যাহা বলেন, অধিকাংশ লোক তাহাই শ্রুতিগোচর করিয়া জিহ্বার আলোড়ন করেন। মনুর অপবাদকারী লোকদিগের স্বর অতি উচ্চ; মনুর প্রশংসাকারীরা, অপেক্ষাকৃত নীরব। তাহাতেই এই দশা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যাঁহারা মনু-সংহিতা স্পর্শও করেন নাই, তাঁহারাও মনুর বিষম নিন্দাবাদের গোলযোগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অতুল্য অমূল্য সুমহৎ মস্তকে যষ্টির আঘাত করিয়া চলিয়া যান।

ইহা সত্য বটে যে, মনুস্মৃতির এক একটী শ্লোক এমন আছে যে, তাহা পৃথক্ রূপে প্রদর্শন করিলে তাহা নিন্দাস্পদ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বাপর শ্লোক ধরিয়া বিচার করিলে এবং শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যেরূপে উন্নয়ন করিতে হয়, তাহা করিলে, চিরপূজ্য মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের কখনই বিগর্হিত মত প্রতিপন্ন হইবে না। যাঁহারা মনুর গ্লানি করিতে উন্মুখ, তাঁহারা তৎকৃত সংহিতা-বচন বিকল করিয়া প্রদর্শন করেন। কেহ কেহ এমন সকল শ্লোককে মনুবচন বলিয়া উদ্ধৃত করেন, যাহা মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শাস্ত্রদর্শী বলিয়া যাঁহারা ভান করেন, তাঁহাদের কথার খণ্ডন কে করে? এবং খণ্ডন করিবার জন্য হাতে হাতে উক্ত সংহিতা-গ্রন্থ কোথায়ইবা পাওয়া যায়? আর যদিও সে পুস্তক প্রাপ্তি ঘটে, তদন্তর্গত প্রায় তিন সহস্র শ্লোকের মধ্য হইতে বিতর্কিত শ্লোকটী বাছিয়া বাহির করা সুসাধ্য হয় না।

মনুসংহিতার আর একটী লক্ষণ এই যে, তন্মধ্যে এক একটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তৎসমুদায় আলোচনা না করিলে একদেশ-দর্শিতা ও তন্নিবন্ধন অপসিদ্ধান্ত হয়। কোন্ বিষয়ের কোন্ ব্যবস্থা কোন্ অধ্যায়ের কোন্ শ্লোকে আছে, তাহা জানা আয়াস-সাধ্য হওয়াতে মনুর তত্তদ্বিষয়ক মত নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

এই সকল কারণে মনুর মত সম্বন্ধে বহুল বিচিত্র কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা মনু-স্মৃতির সমাদর করেন, তাঁহারাও সম্যক্-অদর্শন বা ভ্রম বশত হঠাৎ এক একটী অপসিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা—মনুর যে সকল গর্হিত মত ব্যক্ত করেন, তাহার প্রতিবাদ করিতে হইলে এত সময় লাগে যে, সেই সময়ের অভাবে ঐ সকল দূষিত, অপসিদ্ধান্ত, অবাধিত বা অখণ্ডিত রহিয়া যায়।

এপর্য্যন্ত লেখা-পড়ায় মনুর যে সকল নিন্দাবাদ উঠিয়াছে এবং তাহার যে প্রতিবাদ হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটীর পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১। অষ্ট প্রকার বিবাহ ও দ্বাদশ প্রকার পুত্রত্ব সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা বর্ব্বরতা-সূচক—এই নিন্দাবাদের পরিহারার্থ "বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত" এই নামে এক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।

২। শূদ্র-শাসন সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়া সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মনুর প্রতি যে বিষম কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া "আর্য্য কায়স্থ" পত্রিকার ১২৯৭ সালে ভাদ্রের সংখ্যায় এক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে এবং "শাস্ত্রাপবাদ-নিরাকরণ" নামে এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮১৩ শকের শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে মনুর মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে একদেশ-দর্শিতা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ দৃষ্ট হয়।

৪। পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ জন্য, আবশ্যক হইলে, শত অকার্য্য করিতে মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন,—এই গর্হিত কথা "উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠোপযোগী" এক পুস্তকে

সন্নিবেশিত আছে। এই পুস্তক মাইনর-ছাত্রবৃত্তির-পাঠ্য হইয়া কিছু দিন চলিয়াছিল।

উদ্ধৃত শ্লোকটী এই—

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

মনুসংহিতা খুলিয়া দেখিলে এ বচন কোথাও পাওয়া যাইবে না।

এমন অবস্থায় বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা এক বা ততোধিক টীকা সহ মনুসংহিতা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণ লোককে আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে ফেলিয়াছেন। তাহাতে মনুসংহিতা পাঠকারী বা কেবল মনু-নিন্দাকারী—সকলকেই সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে। ভগবান্ মনুর রাজপূজা এখন ত সম্ভব নয়। কেবল তাঁহার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক লোকে যে তাঁহার গুণবত্তা স্বীকার করে, তাহাতেও তাঁহাদের ধাঁধা লাগিতেছে। পক্ষান্তরে সহস্র ব্যক্তি ভ্রম বা বিদ্বেষ-বশত নিন্দা, গ্লানি, কুৎসা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার, এবং অভিধানে এই পর্য্যায়ে আর যে সকল শব্দ আছে, তাহার উদ্বোধক কথার মালা গাঁথিয়া মনুর মহনীয় গলদেশে লম্বিত করিতেছেন। এই সকল উপদ্রবকে বালকের ধূলি-নিক্ষেপের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহার বৃদ্ধ পিতা বা পিতামহ পথের বালকদিগের দ্বারা এইরূপে উৎপীড়িত হয়েন, তিনি তাহাতে কখন উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। যাঁহারা মনুকে দেবতাবৎ পূজাস্পদ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে তাঁহার মহীয়ান নামের উপর বিবিধ কলঙ্কারোপ ও তজ্জন্য কটূক্তি নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে।

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।

আমরা সেই অলোক-সামান্য মহাপুরুষের প্রতি ঈদৃশ অপভাষা-প্রয়োগ শ্রবণ করিয়া বড়ই পাপগ্রস্ত হইতেছি। আমরা যে কত অসার ও অপদার্থ—আমরা যে অবনতির কতগভীর তলে গিয়া পড়িয়াছি, এই পিতৃপুরুষ-নিন্দাতে তাহার চরম লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আমরা মনুর অন্তর্দ্ধানের কথা বলি। কিন্তু তাহা যে, আমাদেরই অন্তর্দ্ধান, তাহা আমরা বুঝি না। মনুর ব্যবস্থা আমাদের সমাজের ভিত্তিভূমি। সেই ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া কার্য্য না করিলে হিন্দু-সমাজ বল, ব্রাহ্ম-সমাজ বল, ইণ্ডিয়ান বা ভারত-সমাজ বল,—এই দ্বিসহস্রতম খৃষ্টীয় শকে আদৌ আরম্ভ করিয়া কেহ কোন সমাজ গঠন বা তাহার উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না। খৃষ্টান, মুসলমান, ও বৌদ্ধ সমাজ ভিন্ন ভারতে যদি অপর সমাজ থাকে, তাহা সেই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে। সেই ভিত্তি-ভূমির প্রতি সাধারণের এইরূপ বিষম অশ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইলে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে আমাদের অন্তর্দ্ধানের অতি অল্পই বিলম্ব বুঝিতে হইবে।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহারা মনুর পুনরাবৃত্তি কামনা করেন, তাঁহাদের উচিত যে, যাহাতে এদেশে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকতর অনুশীলন হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করে। মনুসংহারোদ্যত যুবকবৃন্দ ঐ মহার্থপূর্ণ স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিলে, তাঁহাদের দোষবুদ্ধি তিরোহিত হইবে, ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারা যায়।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে মনুসংহিতা গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। ১৭৮৮ শকে পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কুল্লুক-ভট্টের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ মনুসংহিতা গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। তৎপরে মনু গ্রন্থের ৩।৪ সংস্করণ প্রকাশ হইয়াছে। এক্ষণে মেধাতিথি-কৃত ভাষ্য এবং কুল্লুকভট্ট-কৃত টীকা এবং স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত মহোপাধ্যায়গণের কৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সমেত মনুসংহিতা বঙ্গদেশের নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও যে অভাব রহিতেছে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে মনুসংহিতা আমাদের সকল গৃহের ভিত্তিমূল, সে গ্রন্থকে ঘরে ঘরে না দেখিলে অভাব অপূর্ণ রহিল বলিতে হইবে।

পূর্ব্ব প্রচারিত কুল্লুকভট্টের টীকার সহিত মেধাতিথির ভাষ্য সংযোগ করিয়া বর্ত্তমান প্রকাশকেরা মনুস্মৃতির ব্যাখ্যা-পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইল, বিবেচনা করিয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহারা মুম্বই নগরে মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থের আর ৪টী টীকা * অতিরিক্ত ভাবিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল টীকার মুখ্যার্থ নিপুণরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে জটিলতা কিছু না থাকিবারই সম্ভাবনা। ভাল হউক বা না হউক, মনু কোন্ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সকল ব্যাখ্যা দ্বারা সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। যাঁহাদের

তর্কশক্তি প্রবল, তাঁহারা মনুবচনের নানাবিধ সূক্ষ্ম অর্থ করিতে পারেন ও পারিবেন। প্রাচীন প্রামাণিক ভাষ্য ও টীকাকারগণের মত অনুসারে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা হইবে। কিন্তু স্থূলতঃ মহাত্মা মনু কোন্ বিষয়ে কি উপদেশ দিয়াছেন এবং কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট লাভ হয়। আর তাহাই অত্যাবশ্যক।

এজন্য আমরা প্রস্তাব করি যে, স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের অনুমোদিত বাঙ্গালা অর্থ সমেত মনুসংহিতার মূল শ্লোকগুলি মুদ্রিত করিয়া অতি সুলভ করিয়া দেওয়া হয়। আর সেই পুস্তকের পরিশেষে এমন একটী নির্ঘণ্ট দেওয়া হয়, যাহাতে মনুর কোন্ বিষয়ের কোন্ ব্যবস্থা, কোন অধ্যায়ের কোন্ শ্লোকে আছে, তাহা ইঙ্গিত মাত্রে বাহির করা যায়। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, অনুশীলন, বিচিন্তন, বিতর্কিত-স্থল-উদ্ঘাটন, অনুরূপ বাক্যের নির্ব্বাচন এবং প্রমাণ বচন উদ্ধারণ প্রভৃতি মনুস্মৃতির সহস্রবিধ ব্যবহারে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী হইবে। এতদ্দ্বারা সুবিস্তৃত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র হস্তামলকবৎ সকল ব্যক্তির পরিগ্রহণীয় হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

পশম।

মেষের লোমে পশম হয়। মেষের লোমেই যে কেবল হয় তাহা নহে, অন্যান্য কতিপয় জন্তুর লোমেও পশম হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে উটের লোমে নানা প্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, গরীব-দুঃখীরা তাহা পরিয়া সেখানকার দুরন্ত শীত হইতে রক্ষা পায়। ছাগলের লম্বা লম্বা কেশেও লোকে রজ্জু প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করে কিন্তু তাহাকে পশম বলে না। কোঁকড়া কোঁকড়া সরু সরু নরম নরম লোমকেই পশম বলে। ছাগলের কেশ তাহা নহে, তাই তাহাকে পশম বলে না। তবে তিব্বত প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে, ছাগলের কেশের নীচে ঠিক গায়ের উপর, কোঁকড়া-কোঁকড়া অতি কোমল পশম জন্মে। এখানে বড় শীত, সামান্য পাতলা-পাতলা কেশের আবরণে শীত ভাঙ্গে না, তাই, জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়ম;—এখানকার ছাগলের গায়ে তিনি পশমের আয়োজন করিয়া দিয়াছেন। এই পশম—বহুমূল্য; ইহাতে কাশ্মীরী শাল্ প্রস্তুত হয়,—ইহাকে লোকে পশ্মীনা বলে। মেষের লোমকে মাজিয়া-ঘষিয়া নরম করিয়া লইলে, তাহাকেও লোকে পশ্মীনা বলে। দুঃখের বিষয় এই, ভারতে পশ্মীনা ছাগল জীবিত থাকে না। কাশ্মীর প্রভৃতি শীত-প্রধান প্রদেশে কতবার এই ছাগল প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পশ্মীনা ভারতের দ্রব্য নয়, তাই ইহার বিষয় এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ছাগলের ন্যায় তিব্বতে কুকুরের গায়েও পশ্মীনা হইয়া থাকে, তাহা হইতেও লোকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। আবার এখানে আর একটী জন্তু আছে, তাহার গা হইতেও লোকে পশম কাটিয়া লয়। ইহাকে 'য়াক' বলে, আমরা বলি, চামর-গরু; (চমরীমৃগ ?) কারণ ইহার পুচ্ছ হইতেই চামর হয়। তিব্বত ও হিমালয়ের উত্তর-প্রদেশে এই গাভী মানুষের পরম বন্ধু। বালুকাময় আরবে যেরূপ উট, তুষার-ময় ল্যাপ্‌ স্থানে যেরূপ রেণ-হরিণ, হিমালয়ের ভোট-প্রদেশে সেইরূপ চামর-গরু। এই প্রস্তরময়, বরফময়, মরুভূমির ভিতর জীবজন্তুর আহারের বড়ই অনটন। আহার-সংগ্রহ বিষয়ে চামরগরু কিন্তু বড়ই দক্ষ। বরফের ভিতর কোথায় ঘাস কোথায় পাতা লুক্কায়িত থাকে, শুঁকিয়া ইহারা জানিতে পারে। সেই স্থান খুর দিয়া আঁচড়ায়, বরফ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘাসগুলি খুঁটিয়া খায়।

এখানে শীত কিরূপ? একবার এই কথা আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইনি গাঁজা-ধূমপানে বড়ই প্রীতি লাভ করিতেন, ইহাঁর ঘরে গাঁজার সদাব্রত ছিল; যে যাইত, অবাধে সেই গাঁজা খাইতে পাইত। অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে ইনি বড়ই ভাল বাসিতেন। ইহাঁর কাছে কোনও কথা পড়িলে, অতি অদ্ভুত যদি হইত, তবেই কাণ দিয়া শুনিতেন, না হইলে উড়াইয়া দিতেন। একবার হিমালয় প্রদেশ হইতে বাটী আসিয়াছি, ইনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেখানে গিয়াছিলে, ভাল, সেখান হইতে কৈলাস পর্ব্বত কতদূর?" পাঠকগণ! ক্ষমা করিবেন। আমি কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া বলিয়াছিলাম। দেশ-পর্য্যটক-দিগের রীতিই এই। তাহাতে আমার দোষ নাই।

চামর-গরু।
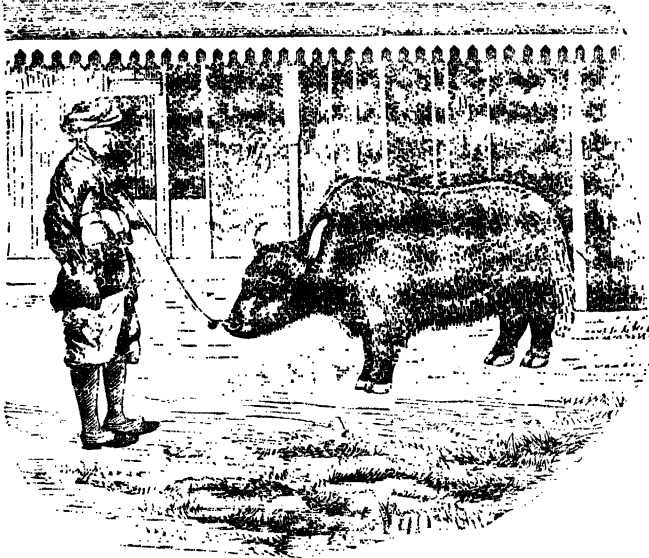
আমি বলিলাম, "মহাশয়! সেখান হইতে কৈলাস পর্ব্বত অতি নিকট। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যখন শিবের আরতি হইত, তখন শাখ-ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইতাম। ভক্তিরসে প্লাবিত-হৃদয়ে শিব-সহচর ভূতদল তখন নৃত্য করিত। যেখানে আমি গিয়াছিলাম, সেখান পর্য্যন্ত কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিত, ঘরের বালি খসিয়া পড়িত।" অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি বলিলেন "বটে হাঁ! আচ্ছা, বল দেখি, সেখানে শীত কি প্রকার?" আমি বলিলাম, "মহাশয়! সামান্য শীতে জল জমিয়া বরফ হয়। সেখানে এরূপ ঘোরতর শীত যে, বায়ু পর্য্যন্ত জমিয়া যায়।" আর সকলে—যাঁহারা বসিয়াছিলেন, এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি হাসিলেন না। সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা এ সকল তত্ত্ব কিছুই জান না, তাই হাসিতেছ; আমার অনেকটা জানা আছে, আমি পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছি, ইনি যাহা বলিতেছেন সে সকলই সত্য।" তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, শীতে যদি বায়ু জমিয়া যায়, তো লোকে রাস্তা চলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "সেখানকার স্ত্রী-পুরুষের হাতে কুঠার ও মাথায় আগুনের হাঁড়ি থাকে। কুঠার দিয়া বায়ু কাটিয়া-কাটিয়া পথ চলিতে হয়; যে স্থানে বায়ু বড়ই কঠিন, সেখানে এই আগুনের তাত দিলেই কিঞ্চিৎ কোমল হয়, তখন কুঠার দিয়া অনায়াসেই কাটিতে পারা যায়।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বায়ু যদি এতই কঠিন হয়, তাহা হইলে লোকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লয় কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "হামাম-দিস্তাতে বায়ু চূর্ণ করিয়া কৌটার ভিতর রাখিতে হয়, লোকে যেরূপ নস্য লইয়া থাকে, সেইরূপ মাঝে মাঝে কৌটা হইতে বায়ু চূর্ণ লইয়া নাসিকা দ্বারা টানিয়া লইতে হয়।" গাঁজা-প্রিয় বন্ধু এরূপ অদ্ভুত কথা জনমে কখনও শুনেন নাই, এখন শুনিয়া আমার প্রতি তাঁহার বড়ই ভক্তি হইল। ভরসা করি, পাঠকদিগের মনেও আমার প্রতি সেইরূপ ভক্তির উদয় হইবে। বায়ু না জমিয়া যাউক, এখানে কিন্তু দারুণ শীত। শীতকালে চামর-গোরুর চক্ষুর উপর বড় বড় লোম হয়, চক্ষুর উপর তাহা ঝুলিয়া থাকে, তাহাতে চক্ষু রক্ষা পায়। শীতে এই সময়ে নাক দিয়া ইহাদের জল পড়িতে থাকে, এই জল মাটিতে না পড়িতে পড়িতে জমিয়া যায়। অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ বেলোয়ারি কাচের নোলোকের মত নাকের আগায় ঝুলিয়া থাকে। চামর-গোরু বিষয়ে যখন এত কথা বলিলাম, তখন ইহার একখানি চিত্র দিতে হইল।

পালিত মেষের মত বন্য মেষ নিরীহ নহে। বন্যঅবস্থায় ইহাদের বড় বড় শৃঙ্গ থাকে, সেই শৃঙ্গের গর্ব্বে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুরন্ত বলশালী পশুদিগকেও ইহারা গ্রাহ্য করে না। পরস্পর যুদ্ধের সময়ও মেষে ঘোরতর বীরত্ব প্রকাশ করে, ঢু মারিয়া একবারে মাথা ফাটাইয়া দেয়। কিন্তু খেলিবার সময় ছাগলের মত ইহাদের বড় ভাব-ভঙ্গী নাই। ছাগলে কেমন সম্মুখের পা দুটি তুলিয়া ঘাড়ও মাথাটী একটু বক্র করিয়া, চক্ষুতে কিঞ্চিৎ আধ-আধ ভঙ্গী করিয়া, এরূপ ভাব দেখায়, যেন একটী ঢুঁ সেই ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া দুইখানা হইবে। কিন্তু সে কেবল আড়ম্বর সার, আঘাতের সময় শৃঙ্গে শৃঙ্গে কেবল একটু ঠেকাঠেকি হয়, তাই উদ্ভট কবি বলিয়াছেন,—

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

বন্য অবস্থায় মেষের গায়ে কেশ অধিক পরিমাণে থাকে, পশম অল্প থাকে। সে পশমও ভাল নয়। পালিত মেষের পশমের ন্যায় কোমল ও চিক্কণ নয়। ভাল ঘাস, ভাল জল খাইতে পাইলে এ সকল দোষ ক্রমে দূরীভূত হয়। পশুদিগের মধ্যে যাহাদের শাবক স্তন পান করে, মেষ সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত। ইংরেজিতে এই সম্প্রদায়কে 'ম্যামেলিয়া' বলে। ম্যামেলিয়ার ভিতর আবার যে পশুরা রোমন্থ চর্ব্বণ করে অর্থাৎ জাবর কাটে, মেষ সেই জাতির অন্তর্ভূত। এইরূপ পশুর চারিটী পাকস্থলী থাকে। ইংরেজিতে ইহাদিগকে 'রিউমিনেটা' বলে। আবার রোমন্থিক পশুদিগের মধ্যে মেষ ক্যাপ্রিডি-দলভুক্ত। এই পশুদলের শৃঙ্গ খসিয়া যায় না, আর তাহাদিগের শৃঙ্গ একটী সামান্য অস্থি-প্রবর্দ্ধন হইতে নির্গত হয়। ক্যাপ্রিডির মধ্যে মেষ আবার অভিস-শ্রেণীভুক্ত। অভিস-শ্রেণী পশুদিগের শৃঙ্গ থাকিতেও পারে, আবার না থাকিতেও পারে। ইহাদিগের শৃঙ্গ—সম্মুখের দিকে যায় না, পার্শ্বে পশ্চাৎ দিকে বৃদ্ধি পায়। পালিত মেষদিগের আদি-পুরুষ কিরূপ পশু ছিল, তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। হিমালয়ের অপর পারে ও তাতার প্রভৃতি দেশে 'আরগালি' নামক এক প্রকার বন্য মেষ আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজেরা এই মেষকে শীকার করিতে বড়ই ভাল বাসেন, ইহাকে শীকার করিবার জন্য সেই নিদারুণ দেশে ঘোরতর ক্লেশও ভোগ করিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন যে, এই 'আরগালি' মেষই পালিত মেষদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ। কিন্তু পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সকলে একথা স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বলেন যে, 'আরগালি' মেষ পূর্ব্বে গৃহ-পালিত ছিল, গৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া বন্য হইয়াছে, বনে বাস করিয়া ইহাদের স্বভাব-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, দীর্ঘ শৃঙ্গ ও বলশালী হইয়াছে, শরীরে পশমের স্থানে কেশের উৎপত্তি হইয়াছে। গৃহপালিত পশু বন্য হইয়া যাইলে ইহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি যে বিলক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা আমরা চক্ষের উপরই দেখিতেছি। কলিকাতার সন্নিকট গ্রামসমূহে আজ-কাল যে বন্য-শূকরের উপদ্রব দেখিতে পাই, সেই বন্য-শূকর পূর্ব্বে গ্রাম্য-শূকর ছিল। আশ্বিনে-ঝড়ের বৎসর তাহারা রক্ষকদিগের হাত হইতে বনে পলায়ন করিয়া ক্রমে বন্য হইয়া পড়িয়াছে। যখন মানুষের ঘরে থাকিত, তখন তাহাদিগের এরূপ দীর্ঘ দন্ত, অপরিমিত বল, ও অসীম সাহস, ইহার কিছুই ছিল না। সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় এক্ষণে ইহাদিগের বল বিক্রম হইয়াছে। এখানে 'আরগালি' মেষের একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইল।

আরগালি মেষ।

সমুদয় ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রায় তিনকোটী মেষ আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা মেষের সংখ্যা এক্ষণে অনেক কমিয়া গিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি

ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনেক পতিত জমি এক্ষণে কর্ষিত হইয়াছে। সেকালে যেখানে গরু, ছাগল ও মেষ চরিত, এক্ষণে সে সমুদয় ভূমিতে শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমুদয় বনে পালিত পশু চরিতে পাইত, বন-বিভাগের কঠিন নিয়মে এক্ষণে আর সেখানে চরিতে পায় না। এইরূপে গোচর-ভূমি যতই সঙ্কীর্ণ হইতেছে, গৃহ-পালিত পশুর সংখ্যাও ততই কমিতেছে। যে সকল জাতিরা মেষ ছাগল প্রভৃতি পশু পালন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের অনেকে হয় অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, আর না হয় ঘরদ্বার ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে। দক্ষি-ণের অনেক পশুপালকেরা এক্ষণে কৃষিকার্য্য অব-লম্বন করিয়াছে, অযোধ্যার পশুপালকেরা নেপালে পলায়ন করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে ঐ জাতিদিগের বড়ই কষ্ট হইয়াছিল; এমন কি, অনাহারে অনে-ককেই দিনপাত করিতে হইত। এক্ষণে ইহাদিগের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হইয়া আসিতেছে। ভারত-বর্ষের পশম পূর্ব্বে বড় বিদেশে যাইত না। সুতরাং পশমমূল্য সুলভ ছিল। পশুপালকেরা দেশের লোকদিগকে পশম ও কম্বল প্রভৃতি বেচিয়া যাহা কিছু টাকা পাইত, তাহাতে তাহাদের উদরান্ন পর্য্যন্ত হইত না। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের পশম বিদেশে যাইতেছে, পশম মহার্ঘ্য হইয়াছে। তাই পশুপালকদিগের ঘরে এক্ষণে অন্ন হইয়াছে।

বঙ্গদেশে বড় মেষের চাষ নাই। আর্দ্রভূমি মেষের পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। শুষ্ক-বায়ু-ভূমি সম্ব-লিত দেশই মেষদিগের পক্ষে হিতকর। বেহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবেই তাই অনেক মেষ প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলে যে জাতি, মেষ পালন করে তাহাদিগকে 'গাড়রীয়া' বলে। হিন্দি-ভাষায় 'গাড়র' মেষের একটী নাম। ভেড়ীও ইহার অপর নাম। তাই গাড়রীয়া জাতিকে ভেঁড়িহারও বলে। ইহারা যে, কেবল মেষ পালন করে, তাহা নহে; মেষের দেহ হইতে পশম কাটিয়া তাহা দিয়া কম্বলও প্রস্তুত করে। গাড়রীয়ারা বোধ হয়, গোপজাতির শাখা-বিশেষ, তবে মেষ পালন ও কম্বল-বুনন নীচ কার্য্য বলিয়া জাত্যংশে ইহারা কিঞ্চিৎ লাঘব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক একজন গাড়রীয়ার নিকট কুড়ি হইতে পাঁচশত পর্য্যন্ত ভেড়া থাকে। যে পালটীতে কুড়িটী ভেড়া থাকে সে পালের নাম "লেন হর" যে পালটীতে একশত ভেড়া থাকে তাহার নাম" বসা"। যাহাতে চারিশত কি পাঁচশত ভেড়া থাকে তাহার নাম "গেহর"। গাড়-রীয়ারা নিঃশব্দে মেষদিগকে চরায়। এ ভূমি হইতে সে ভূমি গাড়রীয়া লাঠি হাতে আস্তে আস্তে যায় ভেড়াগুলি, আপনা আপনি তাহার পাছে পাছে যায়, তাড়াইতে হয় না। তবে ছোট খাটো নদী পার হইবার সময় কিছু গোল। নদীপার হওয়া ভেড়াদের মনোমত কার্য্য নয়। জলের ধারে গিয়া তাহারা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে, এ বলে ও আগে যাউক, ও বলে সে আগে যাউক। তখন একটীকে ধরিয়া গাড়রীয়া জলে ফেলিয়া দেয়, একটী যাইলেই আর সকলে কোনও কথা না কহিয়া আপনা আপনি ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া গিয়া জলে পড়ে। মাঝে মাঝে নেকড়ে বাঘ, পালের উপর বড়ই উপদ্রব করে। গত কার্ত্তিক মাসে আমি জরাসন্ধ-মহাশয়ের রঙ্গভূমিতে রাজ-গৃহে গিয়াছিলাম। ব্রহ্মকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড মকদূম-কুণ্ড প্রভৃতি নানাতীর্থে স্নানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে একটী বাঙলায় গিয়া বাসা লই। আমাদের সহিত অনেক লোক ছিল। লোকের কোলাহল দেখিয়া রাত্রিতে বাঘে উপদ্রব করিতে পারিবে না বলিয়া একজন মেষ-পালক পালের সহিত সেইখানে আশ্রয় লইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, মেষপালক কাঁদিতে কাঁদিতে যাই-তেছে। রাত্রিকালে একটী মেষকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। সমুদয় ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ গাড়রীয়ার বাস। ইহার মধ্যে বেহারে ও উত্তর-পশ্চিমেই অধিক। বেহারে ইহাদিগের সংখ্যা ৮৭ হাজার; উত্তর-পশ্চিমে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার। পঞ্জাব, রাজ-পুতানা ও মধ্য-প্রদেশে ইহাদিগের সংখ্যা অধিক নয়। মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণে গাড়রীয়া জাতি এক-কালে নাই বলিলেও হয়।

দক্ষিণপ্রদেশে অন্য জাতিতে মেষ-পালন করে। বোম্বাই অঞ্চলে এ জাতির নাম 'ধাঙ্গড়,' মান্দ্রাজে ইহাদিগকে 'কুরুবার' বলে। পূর্ব্বকালে মধ্যপ্রদেশে আহীরেরা মেষ পালন করিত। এক সময়ে আহীরেরা ধনধান্যসম্পন্ন বিপুল প্রতাপ-শালী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহারা অনেক গো-মহিষ-মেষ প্রতিপালন করিত। অনেকগুলি দুর্গম দুর্গও ইহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। খান্দেশে আসা আহীরের নাম আজ পর্য্যন্ত

প্রসিদ্ধ। ইহাঁর বিশ সহস্র মেষ ছিল। বদান্যতার জন্য লোকে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া গণনা করেন। আহীরেরা এক্ষণে কেবল গো-পালন করে, মেষ পালন করে না। মেষ পালন নীচ কর্ম্ম বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই অবধি কুলে শীলে ইহাঁদিগের মর্য্যাদা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোম্বাই অঞ্চলে ধাঙ্গড় নামক জাতি মেষ পালন করে। সাহেবেরা এই ধাঙ্গড়দিগকে আমাদিগের ছোট নাগপুরের ধাঙ্গড়দিগের সহিত এক জাতি বলিয়া পরিগণিত করেন। তাহা ভুল। ছোট নাগপুরের ধাঙ্গড়েরা অহিন্দু অসভ্য জাতি। বোম্বাইয়ের ধাঙ্গড়েরা জল-আচরণীয় সজ্জাতি হিন্দু। গোপজাতির নিম্নস্থ এক প্রকার শাখা মাত্র। "ধেণ্ডাট" হইতে বোধ হয় ধাঙ্গড় নাম হইয়াছে। কায়স্থেরা যেরূপ ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, হাড়িরা যেমন ব্রহ্মার হাড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ধাঙ্গড়েরা সেরূপ ব্রহ্মার কোন অংশ হইতে বাহির হয় নাই। ধাঙ্গড়েরা বলে, শিবের পদরেণু হইতে তাহাদিগের আবির্ভাব হইয়াছে। ধাঙ্গড়েরা সুদীর্ঘ, বলশালী ও সাহসী। মহারাষ্ট্রবীর শিবজী, যে সেনাদিগের বাহুবলে মুসলমান সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেন, এই ধাঙ্গড়েরাই সেই ভারত-বিজয়ী সেনা। মেষ পালন করিয়াই ইহারা এক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহ করে, মেষেরপাল সঙ্গে লইয়া ইহারা দূর দূরান্তর গমন করে। যেখানে যতদিন ঘাস জল আদি মেষের খাদ্য থাকে, সেখানে ততদিন অবস্থিতি করে। ফুরাইয়া যাইলে পুনরায় আগে চলিতে থাকে। রাত্রিতে চাষাদিগের ক্ষেত্রে মেষদিগকে শয়ন করায়। মেষদিগের মলমূত্র ত্যাগে ভূমি সারবান হইবে বলিয়া কৃষকেরা উহাদিগকে শস্যাদি প্রদান করে। প্রতি মেষের পালে ধাঙ্গড়েরা একটী কি দুইটী ছাগল রাখে। ছাগল সুবুদ্ধি। যেখানে খাবার মিলিবে, পথ দেখাইয়া আগে আগে সেইখানে যায়। মেষেরা গুটি গুটি তাহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। মেষের পালের সহিত কুকুরও থাকে। বিলাতে এক প্রকার "কলি" জাতীয় কুকুর আছে। সে কুকুর অতি চতুর। তাহারা পালের ভিতর মেষদিগকে একত্রে রাখিয়া দেয়, এ-খানে সে-খানে যাইতে দেয় না। প্রভুর আদেশে মেষদিগের তত্ত্বাবধারণ করে। ধাঙ্গড়দিগের কুকুর কিন্তু সেরূপ নয়। ইহারা মেষদিগকে কোথায় যাওয়া উচিত, কোথায় না যাওয়া উচিত একথা বলিয়া দিতে পারে না। বন্য পশু হইতে মেষদিগকে রক্ষা করাই ইহাদের কার্য্য। সে কার্য্যে সময়ে সময়ে ইহারা প্রভূত পরাক্রম প্রদর্শন করে। ব্যাঘ্র পালে আসিয়া পড়িলেও নির্ভয়ে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। কুকুরীর ছানা হইলে ধাঙ্গড়েরা তাহাদিগকে মা'র কাছ হইতে কাড়িয়া লয়। স্তনপান করাইবার জন্য মেষস্ত্রীদিগের হস্তে কুকুরছানাগুলিকে প্রদান করে। প্রথম প্রথম দুগ্ধবতী মেষিণী কুকুরছানাকে স্তনপান করাইতে বড়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু দুই চারি দিন পরে তাহাদিগের প্রতি তাহার মমতা জন্মে। তখন স্নেহের সহিত স্তনপান করায়। কুকুরছানাগুলি যখন বড় হয়, তখন মেষ-মেষস্ত্রীদিগকে পিতৃকুল ও মাতৃকুল বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের রক্ষার জন্য অকুতোভয়ে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করে। মেষস্ত্রীকর্ত্তৃক কুকুরছানা প্রতিপালন একবার আমি অমরাবতীতে দেখিয়াছিলাম। চক্ষে দেখি নাই, কানপুরে একটী বানরীকর্ত্তৃক কুকুরছানা প্রতিপালনের কথা শুনিয়াছিলাম। বানরীর নবপ্রসূত শিশুটী মরিয়া গিয়াছিল। তবুও কয় দিন ধরিয়া মরা ছেলেটীকে কোলে করিয়া বেড়াইতে ছিল। একদিন এক স্থানে অনেকগুলি কুকুরের বাচ্ছা হইয়াছে সে দেখিতে পাইল। তখন নিজের মৃত শিশুকে ফেলিয়া, একটী কুকুরের ছানা বুকে লইয়া গাছে গিয়া উঠিল। কুকুর ছানা অত শত কি জানে? বানরীর স্তন পান করে, আর বড় হয়। বানরী কিন্তু ক্রমে বড়ই আশ্চর্য্য হইল। ছানা কোল ছাড়ে না কেন? ছানা গাছের উপর লাফালাফি করিতে শিখে না কেন? যাহা হউক, যতদিন বহিতে পারিল, তত দিন তাহাকে কোলে লইয়া গাছে গাছে বেড়াইল। কিন্তু যখন খুব বড় হইল, যখন খুব ভারি হইয়া উঠিল, তখন আর তাহাকে কোলে রাখিতে পারিল না, তখন ভূমিতে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কুকুর বানরীকে ছাড়িল না। বানরী গাছে, কুকুর মাটিতে। যেখানে বানরী যায়, সেই খানেই কুকুর যায়, আর গাছ পানে চাহিয়া, উর্দ্ধমুখে ডাকাডাকি করে। এই অদ্ভুত রহস্য দেখিয়া লোকের দয়া হইল। সকল লোকেই কুকুরকে খাবার দিতে আরম্ভ করিল। গাছতলায় খাবার দিয়া লোকে সরিয়া যাইত। তখন বানরী গাছ হইতে নামিয়া আসিত। কুকুরে ও বানরে

সেই খাদ্য এক সঙ্গে আহার করিত। যতক্ষণ মেনেরা না আসিত, ততক্ষণ কুক্কুর খাদ্যদ্রব্য স্পর্শও করিত না।

মেষ-মেষস্ত্রীদিগের সহিত ধাঙ্গড়েরা তাই কুকুরের এইরূপ প্রণয়-সঞ্চার করিয়া দেয়। খণার মত ধাঙ্গড়েরা মেষ-ঝড়ের বিষয় আগে থাকিতে বলিয়া দিতে পারে। চিরকাল ঘরের বাহিরে মাঠের মাঝ খানে বাস করিয়া এবিষয়ে তাহাদিগের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মায়। অপরাপর সাংসারিক বিষয়ে লোকে কিন্তু তাহাদিগকে বড়ই মূর্খ বলিয়া জ্ঞান করে। মেষের সহিত চিরকাল বাস করিয়া অনেকটা ইহারা মেষপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে এই কথা বলে। কোন বিষয়ে কেহ মূর্খতা প্রকাশ করিলে লোকে তাহাকে ধাঙ্গড়ের সহিত তুলনা করে। মারহাটী ভাষায় বলে—"ধাঙ্গড় বেদ ত্যাচে দোক্যান্ত শিলে আহে।" "অর্থাৎ কিনা—"ধাঙ্গড়ের পাগলামী ইহার মাথায় প্রবেশ করিয়াছে।" কিম্বা বলে "ত্যালা ধাঙ্গড় বেদ লাগলে আহে।" ইহার অর্থ এই "ধাঙ্গড়ের পাগলামী তাহাকে পাইয়াছে।" পশুর সহিত দিবারাত্রি বাস করিলে যে, কতকটা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, সে কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে। কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জেলার গোঁড় গোয়ালারা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যে গয়লা যুবকগণ গরু লইয়া চিরকাল বাতানে থাকে, বিদ্যাবুদ্ধিতে তাহারা যে বেদ ব্যাসের মত পণ্ডিত নয় তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। পৃথিবীর বিষয় তাহারা কিছুই জানে না, একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। বিয়ে পাশ টেড়া মেজাজ বাবুদিগের মত কুলগুরু নবদ্বীপের গোস্বামীকে তাহারা যথাবিধি মান্য করে না। একবার শীতকালে একটী গুরু গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধেরা অবশ্যই তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সম্মান করিয়াছিল। সন্ধ্যা হইল, গুরু ভিতরে চাদর দিয়া উপরে লাল বনাত গায়ে দিলেন, মাথায় চূড়া সংযুক্ত নাইট ক্যাপটীও পরিলেন। সাজ গোজ করিয়া গোয়ালের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গোয়ালের কোণে ঘুটের আগুণের কাছে বসিয়া মনের সুখে আগুণ পোহাইতে লাগিলেন। এমন সময় গোপ-যুবক মাঠ হইতে গরুর পাল লইয়া ঘরে আসিল। গরু সকল গোয়ালের ভিতর প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে দেখে সেই অপরূপ রূপ। দেখিয়া যে দিকে দু'চক্ষু যাইল সেই দিকে সব গরু লেজ তুলিয়া ছুটিয়া পলাইল। গোপযুবক মনে করিল গোয়ালে বুঝি বাঘ প্রবেশ করিয়াছে! গোয়ালের ভিতর গিয়া দেখে, সেই মূর্ত্তি স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, মনের সুখে আগুণ পোহাইতেছেন। তখন গোয়ালার আর রাগের সীমা নাই। গর্ভিণী গাভীদিগের অনিষ্ট হইবে, এই চিন্তায় রাগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। লাঠি লইয়া সে গুরুকে এই মারে তো এই মারে। বৃদ্ধগণ আসিয়া তাহাকে থামাইল। তাহাকে বলিল—"ইনি গুরু, ইহাঁর অপমান করিতে নাই।" গোয়ালা-যুবক চুপ করিল। গুরু এতক্ষণ ভয়ে জড় সড় হইয়াছিলেন। এইবার তাঁহার রাগ চাগিল। ক্রোধে সর্ব্বশরীর তাঁহার কম্পিত হইল, হাতে ধরিয়া পায়ে ধরিয়া কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিল না। তিনি বলিলেন—"দুষ্ট ছোঁড়াকে আমি এই মুহূর্ত্তে দণ্ড দিতেছি। ইহাকে এইক্ষণে আমি রামগণ্ডির ভিতর দাঁড় করাইব।" গোয়ালা যুবককে তিনি একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। যুবক অবাক; প্রাণে তাহার বড়ই ভয় হইল, মনে করিল,—কি ঘোরতর দণ্ডই না তাহাকে ভোগ করিতে হইবে! গুরু ঢিল লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মাটিতে তাহাকে বেড়িয়া গোলাকার দাগ দিলেন, আর বলিলেন—"ইহার ভিতর তুই দাঁড়াইয়া থাক্।" গুরুর বাসনা এই যে, কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইবার পর গৃহস্থের নিকট কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবেন। যতক্ষণ মন্ত্র পড়া হইতেছিল, রামগণ্ডি দেওয়া হইতেছিল, গোয়ালা ততক্ষণ সভয়ে দাঁড়াইয়াছিল। মনে করিতেছিল, তাহার বুঝি প্রাণ বধের সমস্ত আয়োজন হইতেছে! কিন্তু আঁক-কাটা বই যখন আর কোনও গুরুতর ব্যাপার দেখিতে পাইল না, তখন তাহার মনে সাহস হইল। সে ভাবিল;— 'গুরু মনে করিয়াছেন, আমি এই দাগ ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারি না।" এই ভাবিয়া সে বলিল —"ঈশ! আমি কত খানা কত পগার ডিঙ্গিয়াছি, আর তোমার এই দাগ ডিঙ্গাইতে পারি না বুঝি?" এই বলিয়া এক লাফে রামগণ্ডি পার হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যাইল। তবেই দেখ!! যাহারা রামগণ্ডিকে অমান্য করে, তাহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা কি করিয়া করি? গোবুদ্ধি ভিন্ন ইহাকে প্রখর নরবুদ্ধি বলিতে পারি না। মেষের পালের সহিত থাকিয়া যেরূপ ধাঙ্গড়দিগের মেষ-বুদ্ধি হয়, বাতানে গরুর পালের সহিত থাকিয়া অনেক গোয়ালাও সেইরূপ গোবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বোম্বাই প্রদেশে কয়ড়া, পাঁচমহল প্রভৃতি স্থানে রবাড়ী, ভরওয়াড ও কমলীয়া জাতিরাও অনেক মেষ পালন করে। কাঠিওয়ারে রবাড়ী জাতি মেষ পালন করে না। গো পালন করিয়া ইহারা এক্ষণে উচ্চপদস্থ হইয়াছে। কাঠিওয়ারে ভরওয়াডেরা মেষ পালন করে। কর্ষিত ভূমিকে পুনরায় গোচর ভূমি করিবার নিমিত্ত ইহাদিগের মধ্যে এক আশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহের সময় ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধপান করে। তাহাতে তাহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে; কেন বলিতে পারি না। উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগের কিছু কাটিবার বাসনা হয়, কিছু না কাটিয়া থাকিতে পারে না। তাই তাহাদের পুরুষেরা পূর্ব্ব হইতেই একটী শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র কিনিয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা দুগ্ধপানে উন্মত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়া তবে সুস্থির হয়। সেই ক্ষেত্রে পুনরায় হাল কর্ষণ করিবার রীতি নাই। তাহা গোচর বা মেষচর হয়। ভরওয়াডেরা গোকুলের নন্দঘোষের বংশ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। ইহাঁকে তাহারা নন্দ "ঘোষ" বলে না। নন্দ "মেড়" বলে। বলে নন্দমেড়ের ম্যাড়ার পালই অনেক ছিল, গরু তত ছিল না। এই অঞ্চলে মেড় বলিয়া আর একটী জাতি আছে। ভরওয়াডেরা বলে যে, এই মেড়েরা তাহাদিগের জ্ঞাতি। মেড়েরা তাহা কিন্তু স্বীকার করে না। মেড়েরা আপনাদিগকে হনুমানের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা যে প্রকৃত হনুমানের বংশ তাহার সাক্ষ্য প্রমাণও অনেক দিয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটী প্রমাণ এই যে, বরাবর হইতে তাহাদের রাজবংশীয় সকলেরই লাঙ্গুল ছিল, লাঙ্গুল সহিত তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিতেন। আজ অল্প দিন হইল রাজবংশীয় সন্তানগণ আর সলাঙ্গুল জন্মগ্রহণ করেন না। তাহারা বলে যে, কলিকালের পাপের নিমিত্ত রাজবংশে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

দক্ষিণের পুনা, আমদনগর প্রভৃতি জিলায় 'কুনবী' বলিয়া এক প্রকার জাতি আছে। এই কুনবীরা অনেক মেষ পালন করিয়া থাকে। শাক-সবজী উৎপাদন করাই কুনবীদিগের প্রকৃত জাতীয় ব্যবসা। শাক-সবজী উৎপাদনে সারের প্রয়োজন; মেষের মল-মূত্র অতি তেজঃশালা সার; সেইজন্যই তাহারা মেষ পালন করে। মেষ হইতে যে পশম প্রাপ্ত হয়, তাহা অধিকন্তু লাভ।

দক্ষিণের পূর্ব্বদিকে যাইলেই আমরা ক্রমে মান্দ্রাজ প্রদেশে উপস্থিত হই। এখানে যে জাতি, মেষ পালন করে, তাহাদিগের নাম 'কুরুবার'। অনেক অনেক স্থানে কুরুবারেরা সভ্য-ভব্য হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। আবার, কোনও কোনও স্থানে তাহারা বনে বাস করে, অসভ্য বন্য জাতিদিগের মত তাহাদিগের ব্যবহার। মহীসুর ও নীলগিরি পর্ব্বতে অনেক বন্য কুরুবার দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটস্থ অপরাপর বন্য জাতিদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, কুরুবারেরা মন্ত্র-তন্ত্র মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি জাদুবিদ্যায় অতি পারদর্শী। তাই সকলেই তাহাদিগকে ভয় করে ও শস্যাদি নানারূপ উপঢৌকন দ্বারা তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করে। বন্য কুরুবারদিগের নিকট 'বড়াগা' নামক আর একটী জাতি বাস করে। বর্ষারম্ভে প্রথম ক্ষেত্রকর্ষণের সময় কুরুবারদিগের দ্বারা এক বার চাষ দিয়া লয়। সংস্কার এই যে, এরূপ করিলে ক্ষেত্রে উত্তম শস্যের উৎপত্তি হয়। মেষ-পালন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া যেখানে কুরুবারেরা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, সেখানে আজ পর্য্যন্ত ইহারা গণ্য-মান্য হইতে পারে নাই। নীচজাতি বলিয়াই তাহারা পরিগণিত হয়। অনেক স্থানে কিন্তু তাহারা সজ্জাতি হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার যথাবিধি প্রতিপালন করে। বিজাপুর জিলায় তাহারা ক্রমে সম্ভ্রান্ত জাতি হইয়া উঠিতেছে। এখানে কুরুবারেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বিবাহের সময় এক সম্প্রদায় তূলার সূতা হাতে পরিয়া বিবাহ করিতে যায়, তাই তাহাদিগকে 'হাতিকঙ্কণ' বলে। অপর সম্প্রদায় পশমের সূতা হাতে পরিয়া থাকে, তাই তাহাদিগকে 'উণি-কঙ্কণ বলে। যদিও একজাতি, তথাপি এই সূতা পরা লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেক স্থলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আহারাদি ক্রিয়া একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। বিজাপুর জিলায় কুরুবারেরা অনেক মেষ পালন করে। একটী একটী পালে পাঁচ ছয় শত করিয়া মেষ থাকে। ধাঙ্গড়দিগের মত, কুরুবারদিগের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য বিষয়ে দক্ষিণ দেশে নানারূপ পরিহাস উক্তি প্রচলিত আছে। সেখানেও লোকের বিশ্বাস এই যে, মেষদিগের সহিত দিবা রাত্রি সহবাস করিয়া কুরুবারেরা কতকটা মেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

হিমালয়ের উপর 'গড়িড' নামক এক

গড্ডিজাতি।

প্রকার জাতি আছে। তাহারাই সে অঞ্চলের মেষ-পালক। হিমালয়ের অতি উচ্চ প্রদেশে, তিব্বতের কোলে, বরফান পাহাড়ে, 'চম্বা' নামক যে একটী সামান্য দেশীয় রাজ্য আছে, গড্ডি-দিগের বাস সেইখানে। গড্ডিদিগের মেষ ও ছাগলের বড় বড় পাল আছে। এক একটী পালে তিন শত হইতে বার শত করিয়া পশু থাকে। গ্রীষ্মকালে বাটীর সন্নিকট পর্ব্বত সমূহে প্রচুর পরিমাণে তৃণাদি প্রাপ্ত হয়, সেইখানেই তখন তাহারা স্ব স্ব পাল চরায়। কিন্তু শীতকালের প্রারম্ভে এই অঞ্চলে, আকাশ হইতে বরফ পড়িতে থাকে। অল্পকাল মধ্যেই সমুদয় পর্ব্বতশ্রেণী একেবারে অনেক হাত গভীর তুষারে আবৃত হইয়া যায়। তখন মেষ ছাগলের খাদ্য আর সেখানে পাওয়া যায় না। তাই গড্ডিরা তখন পাল লইয়া নিম্নস্থ পর্ব্বতসমূহে নামিতে থাকে। যেমন শীত গভীর হইতে থাকে, ইহারাও সেই অনুসারে নিম্ন হইতে নিম্নতর পাহাড়ে নামিতে থাকে। নামিতে নামিতে ক্রমে পঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের একবারে দক্ষিণ-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাল চরাইতে চরাইতে এতদূর আসিতে প্রায় চারি পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়া যায়। ইত্যবসরে শীতকালও কাটিয়া যায়। বসন্তকাল আসিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত হিমালয়ের পর্ব্বত সমূহ ক্রমে নবপল্লবে নব-তৃণে সজ্জিত হইতে থাকে। সেই নবপল্লবের, সেই নব-তৃণের সঙ্গে সঙ্গে গড্ডিরাও পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। যাইতে যাইতে গ্রীষ্মকালে গিয়া ঘরে উপস্থিত হয়। সেখানে আবার কয়েক মাসের জন্য প্রচুর পরিমাণে তৃণাদি প্রাপ্ত হয় ও পরিবারাদির মধ্যে আসিয়া সুখে স্বচ্ছন্দেআপনাদিগের পাল চরায়। উপরে যে ছবি খানি প্রদত্ত হইল, ইহা গড্ডি জাতির।

গড্ডিরা মেষদিগকে অতি যত্নে প্রতিপালন করে। পালে যতই কেন মেষ থাকুক না, প্রতি মেষই তাহাদিগের পরিচিত। একটী হারাইয়া যাইলে তখনই তাহারা জানিতে পারে; আর তৎক্ষণাৎ তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। পালের সহিত গড্ডিরা কুকুর পুষিয়া থাকে। কিন্তু বিলাতী কুকুরের মত এ-কুকুর মেষদিগকে পথ প্রদর্শন করে না। হিংস্রক পশুদিগের উপদ্রব হইতে কেবল তাহাদিগকে রক্ষা করে। চিতাবাঘ এখানে মেষপালের পরম শত্রু। অনেক দিন ধরিয়া চুপি চুপি তাহারা মেষপালের অনুসরণ করে। এক আধটী মেষ

কোনও প্রকারে পাল ছাড়া হইলেই চকিতের ন্যায় তাহার উপর গিয়া পড়ে, আর তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। ভল্লুকেরা উদ্ভিজ্জজীবী। কিন্তু কখনও কখনও এরূপ ঘটনা হয় যে, পর্ব্বত-প্রদেশ বরফে আবৃত হইয়া উদ্ভিজ্জ-আহারের একবারেই অনটন হয়। তখন জঠরানলে ভল্লুকেরা নিতান্তই কাতর হইয়া পড়ে। তাহাদিগের আর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। জীবজন্তু ধরিয়া খায়। ক্ষুধার জ্বালায় একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া দিনের বেলাই পালের মাঝে গিয়া পড়ে। কুকুর মানে না, মনুষ্য মানে না, কিছুই মানে না। মেষদিগকে বন্যপশু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গড্ডিরা কাছে বন্দুক রাখে না। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, বন্দুকের শব্দ শুনিলে বনদেবতারা রাগ করিবেন। বনদেবতারা রাগ করিলে প্রাচীন প্রথানুসারে পালে মহামারী উপস্থিত করিয়া দেন। কিন্তু ভারতের সকলেই আজকাল ক্রমশঃ প্রাচীন প্রথা সমূহ ছাড়িয়া দিতেছেন। বনদেবতারাও কতকটা ছাড়িয়াছেন। গড্ডিদিগের উপর অপরিতুষ্ট হইলে মেষপালে কেবল মহামারী উপস্থিত করিয়াই এখন আর তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন না। যখন মেষপাল পাহাড়ের গায়ে অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে থাকে, সেই সময় ছাগলের পালে উপরলক্ষ্য করিয়া উপর হইতে এক আধটী বড় বড় প্রস্তর গড়াইয়া দেন, তাহাতে শত শত মেষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবার হিমালয় প্রদেশে এক প্রকার বরফের নদী আছে। ইহাকে 'গ্লেসীয়ার' বলে। অতি দীর্ঘ অতি গভীর অতি প্রকাণ্ড স্রোতাকার নদীর মত বরফরাশিকে গ্লেসীয়ার বলে। সিন্ধু, গঙ্গা প্রভৃতি নদনদী এইরূপ গ্লেসীয়ার হইতেই উৎপন্ন। গড্ডিরা যখন পাল লইয়া হিমালয়ে ভ্রমণ করে, তখন স্থানে স্থানে এইরূপ অনেক গ্লেসীয়ার পার হইতে হয়। গ্লেসীয়ারের মাঝে মাঝে ফাটা থাকে। এই ফাটাকে ক্রেভিস্ বলে। এই ফাটা অতলস্পর্শ। গঙ্গোত্তরীর নিকট একবার এইরূপ একটী ভয়াবহ ক্রেভিস্ অতি কষ্টে পার হইয়াছিলাম। মনে করিলে আজও শরীর শিহরিয়া উঠে। ক্রেভিসের ভিতর পড়িলে আর রক্ষা নাই। বনদেবতারা রাগ করিয়া কখনও কখনও আগের মেষটীকে এইরূপ একটী ফাটার ভিতর পড়িতে প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। আগের মেষটী পড়িলেই পালের সমস্ত মেষ সকলেই গিয়া তাহার ভিতর পড়ে। পালটী একবারে সমূলে ধ্বংস হয়। শুনিয়াছি যে, একবার সাত শত মেষ এইরূপ একটী ফাটায় পড়িয়া মরিয়া যায়। সেই ভয়ে গড্ডিরা বন্দুক ছুড়িয়া বন দেবতাদিগের ক্রোধভাজন হইতে বড়ই ভয় করে।

আজ এই পর্য্যন্ত।—

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরসিকচন্দ্র রায়।

কবি-কুল-কোকিল শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় বাঙ্গালার শেষ কবি। শেষ কবি বলি এইজন্য যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে, বঙ্গ-ভাষার বিশুদ্ধ খাঁটী কবিকে, আর দেখিতে পাইব না। কবি অনেক আছেন, অনেক হইবেন, কিন্তু এমনটীত,—এমন নির্জ্জলা বাঙ্গালা ভাষার কবি আর কোথাও মিলিবে না। তাই বলি, সকলে একবার, বাঙ্গালার শেষ কবিকে দেখিয়া লউন। সকলে একবার বাহাত্তর-বৎসর-বয়স্ক ভাবুক কবি রসিকচন্দ্রকে দেখিয়া লউন।

রসিকচন্দ্রের কবিতা বাঙ্গালার নিজস্ব জিনিষ। রসিকচন্দ্রের কবিতা সতী, স্বভাব-সুন্দরী; যেন বন-দেবী,—ফুলের মালা গলায় ধারণ করিয়া, যেন ভুবনমোহিনী-সাজে সজ্জিত হইয়া আছেন। তাঁহার কবিতা-কামিনীতে, ফিরিঙ্গি-ভাব নাই, কোন রকম ভেজাল বা বিজাতীয় সংমিশ্রণ নাই। সেই কবিতা-কামিনীর গায়ে বডী নাই, পরিধানে গাউন নাই, মুখে পাউডার-মাখা নাই, তথাচ সতী অনির্ব্বচনীয়-সুন্দরী। রসিকচন্দ্রের কবিতা খাঁটী-সোণা, খাদ নাই; তাই সকলকে আবার বলি, বাঙ্গালার শেষ কবিকে সকলে একবার দেখিয়া লউন।

রসিকচন্দ্রের খম্বাজ রাগিণীর এই গান বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব জিনিষ;—

তোমায় ভুলব না গিরি-কন্যে।
ভোলা,—ভোলা যায়, তায় কি ভোলা যায়,
ভোলা যায়, পেয়েছে পরম পুণ্যে।

মূলতান রাগিণীতে রসিকচন্দ্র গাহিতেছেন ;—

আয় মা ! সাধন-সমরে,
দেখবো, মা হারে কি পুত্র হারে ॥
আরো এঁকেছি কালি ! সাধন-রথে ,
তপ জপ দুটো অশ্ব যুতে তাতে.
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্মবাণ,
বসেছি ধরে ।
দেখ্‌বো মা ! তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি-ধন ।
তা'তে রসনা ঝঙ্কারে, কালীনাম হুঙ্কারে,
কার সাধ্য আমার রণে রন ।
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এইবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ি !
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা ! তোমারি বলে,
জিনবো তোমারে ॥

পারা-ভৈরবীতে রসিকচন্দ্র গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন ;—

কেরে নবীন-নীরদ-বরণী ! কার ঘরণী ।
জ্যোতির ঝলকে চপলা চমকে,
পলকে পলকে তিমিরনাশিনী ।
দিনকর-কর-নিকর চরণে,
সুধাকর-কর নখর বরণে,
নিবিড় নিতম্বে, নিন্দে নীকস্তম্ভে,
শিখর-কদম্বে, উল্লাস-দামিনী ॥

পীনোন্নত কিবা যুগ্ম পয়োধর,
করিকর-গুরু-উরু মনোহর,
কটিতট করি-অরি-নিন্দাকর,
তাহে নরকর-কিঙ্কিণী,
নরশিরো-মালে শোভে ভয়ঙ্কর,
চিবুকে রুধির দর দর দর,
গভীর হুঙ্কারে গর গর গর,
থর থর থর কাঁপায় মেদিনী॥
অর্ককোটি তেজে যেন তেজঃপুঞ্জ,
ধক ধক জ্বলে রক্তবর্ণ লঞ্জ,
লক লক জিহ্বা এলাইত কঞ্জ,
বুঝি শঞ্জ-মোহিনী,
সিংহ নিনাদিনী বিবাদিনী কেরে,
ধর ধর ধর ধর-এ বামারে,
রসিক বলে ধর, ধরিয়া সত্বর,
কর এ হৃদয়-বাসিনী॥

এরূপ অকৃত্রিম কবিতা আর কোথাও আছে কি? রসিকচন্দ্র আর কিছু না লিখিয়া, কেবল মাত্র যদি এই তিনটী কবিতাই লিখিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার যশ এদেশে অক্ষুণ্ণ-ভাবে বিরাজ করিত।

কবিবর রসিকচন্দ্র "উপস্থিত" কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন; তিনি একবার শতরঞ্চ খেলায় হারিয়া, তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত গানটী সিন্ধুরাগিণীতে গাহিয়াছিলেন,—

তারা কোথা হই উঠে বস্তি
ছয় বেটাতে মিলে, মাতের ঘরে ফেলে,
মায়া-বোড়ে ঠেলে, দিয়েছে কিস্তি॥
কুসঙ্গ কুরঙ্গ এই দুটা ঘোড়া, কল্লে পথ জোড়া,
বল থাক্তে হই খোড়া, ওমা তারিণি,—
মিথ্যা প্রবঞ্চনা নৌকা দুইখানা,
করেছে যোজনা, কি জবরদস্তি॥
পাপ-রোক্কায় মারা গেল পুণ্য-দাবা,
আশা-চিন্তা-গজের রোকে বাঁচে কেবা,
ওমা তারিণি!
তাতে তুমি নও রাজি, হারি হ'ল এ বাজি,
দেখ মা তারা! আজি, রসিকের শাস্তি॥

রামপ্রসাদ সেন পরলোক গমন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র পরলোক গমন করিয়াছেন; ঈশ্বর গুপ্ত নাই, দাশরথি রায় নাই; কেহই আর দেহধারী হইয়া জীবিত নাই, আছেন কেবল, একমাত্র রসিকচন্দ্র। যদি কেহ কাব্য-রসজ্ঞ থাকেন, তবে একবার রসিকচন্দ্রের মূর্ত্তি অবলোকন করুন। রসিকচন্দ্র বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত,—শেষ কবির শেষকাল উপস্থিত; সত্বরে একবার মূর্ত্তি দেখিয়া লউন।

সন ১২২৭ সালে বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে বেলা দুই প্রহরের পরেই শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলালয় 'পালাড়া' গ্রামে ইঁহার জন্ম। পালাড়া,—ভদ্রেশ্বরের পশ্চিম,—হুগলী-জেলার অন্তর্গত।

রায় মহাশয় জাতিতে কায়স্থ। ইনি 'হুগলী জেলার অন্তর্গত 'হরিপালের' রায়বংশ-সম্ভূত। ইঁহার পিতার নাম ৺ হরিকমল রায়। পিতা, মাতামহ-সম্পর্কীয় এক জমীদারী লাভ করিয়া, বড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তদবধি 'বড়া' গ্রামেই ইঁহাদের বাস হইল। বড়া গ্রাম,—হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

বাল্যকাল হইতেই রসিকচন্দ্র কেমন যেন একটু ভাবুক ছিলেন। অন্যান্য ছেলে-পিলের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বা, ঝগড়া-বিবাদ করিতেন না। আপন মনে নীরব হইয়াই অনেক সময় বসিয়া থাকিতেন।

বাল্যকালে বাঙ্গালা লেখা-পড়ার প্রতি ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সদাই পড়িতেন, এবং লিখিতেন।

দশ বৎসর বয়স হইতেই ইনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। স্বভাবত কথায় কথায় মিলিয়া কেমন কবিতা হইয়া পড়িত। রসিকচন্দ্রের বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন তিনি "জীবন-তারা" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল। গ্রন্থের গল্পটী মনোহর; রস, ভাব, কল্পনা, অনুপ্রাস ও যমকে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থে বিহার-বর্ণন সন্নিবেশিত থাকায় গবর্ণমেণ্ট ইহা অশ্লীল দোষে দুষ্ট বলিয়া কয়েক বৎসর পরেই ছাপা বন্ধ করিয়া দেন।

রসিকচন্দ্রের বাটীর নিকটেই একটী পুষ্পোদ্যান আছে। সেই নিভৃত নিকুঞ্জবনে, এক পত্র-কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া প্রায় সমস্ত দিবাভাগ একাকী বসিয়া থাকিতেন। সে উদ্যানে অন্য কাহারও প্রবেশ-অধিকার ছিল না। পক্ষিকুলের কলধ্বনি বিনা তথায় অন্য কোন গোলযোগ ছিল না। সে উদ্যানটী হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত, বুঝি কোন মুনির তপোবন। তথায় বসিয়া রসিকচন্দ্র এগার খণ্ড পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।

"জীবন-তারা" ও একাদশ খণ্ড "পাঁচালী" ব্যতীত, তাঁহার আরও অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। যথা,—হরিভক্তি-চন্দ্রিকা, কৃষ্ণ-প্রেমাঙ্কুর, বর্দ্ধমান-

চন্দ্রোদয়, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলার বনবিহার, দশমহাবিদ্যা-সাধন, বৈষ্ণব-মনোরঞ্জন, নবরসাঙ্কুর, কুলীন-কুলাচার, শ্যামা-সঙ্গীত, পদ্যসূত্র—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন তাৎকালিক ওস্তাদী কবিওয়ালাদের, যখন যেরূপ গান আবশ্যক হইয়াছে, তিনি তৎসমস্তই বাঁধিয়া দিয়াছেন। ৺গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগকেও ইনি অনেক গান যোগাইয়াছেন। ইহাঁ ছাড়া কীর্ত্তন, নগর-কীর্ত্তন, তর্জ্জা, বাউলের গান প্রভৃতিতে প্রায় পঞ্চাশ সহস্রেরও অধিক গান সাধারণে বিতরণ করেন।

কবি, পাঁচালী, তর্জ্জা,—এই সকল কথা শুনিলে, কোন কোন নব্য যুবক, কাণে আঙ্গুল দেন, কেহ বা কাপড় দিয়া নাকটীও ঢাকেন। বোধ হয়, তাঁহাদের ধারণা,—কবির গান হইলেই, বা পাঁচালীর ছড়া হইলেই, তাহাতে ভয়ানক অশ্লীলতা বা কুরুচি-কাণ্ড অন্তর্নিহিত থাকিবেই থাকিবে। বলা বাহুল্য,—এরূপ উক্তি ভ্রমমূলক। কবিকঙ্কণে বিহার-বর্ণন আছে, কবিরঞ্জনে বিহার-বর্ণন আছে, রায় গুণাকরে বিহার-বর্ণন আছে, কিন্তু প্রাচীন কাব্য বলিয়া, এরূপ বর্ণন থাকা সত্ত্বেও আইনের হস্ত হইতে এই সকল মহাকবির মহাকাব্য রক্ষা পাইয়াছে। আধুনিক "শিক্ষিত" ব্যক্তিদিগের চক্ষে, কোনও পুস্তকে বিহার-বর্ণন থাকিলেই, তাহা অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়; এবং আইনেও তাহা বাধে। বাধুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ সমাজে সজোরে চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃত কবিত্ব অক্ষয়, অজর, অমর। সে কবিতার মালা রৌদ্রে শুষ্ক হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, কাল-নিশ্বাসে পরিম্লান হয় না, তাহা অনন্তকাল একই ভাবে প্রস্ফুটিত, সজীব, নব-যৌবন-সম্পন্ন। সে মালার কোনও অংশে, একটু "কথিত অশ্লীলতা-ক্ষত" আছে বলিয়া, তাহা পচিয়া যায় না। কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবির মহাকাব্যের তাই আজও এত আদর। কেননা, উহাঁদের কাব্য প্রকৃত কবিত্ব-সম্পন্ন।

দাশরথি রায়, এবং রসিকচন্দ্র রায়ের, পাঁচালীতে খেঁউড় ছিল। এক্ষণে সে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং পাঠকের আর সে আশঙ্কা নাই। পাঁচালী বলিয়াই ভয়ে জলাতঙ্ক-রোগীর ন্যায় বিভীষিকা-গ্রস্ত হইবার আর কোনও কারণ নাই। দাশরথি রায়ের এবং রসিকচন্দ্র রায়ের পাঁচালী যেরূপ কবিত্ব-পূর্ণ, ভাষা যেরূপ তেজস্বিনী, কথার গাঁথুনি এবং শব্দ-বিন্যাসে যেরূপ পরিপাটী;—তাহাতে উপযুক্ত সম্পাদক দ্বারা সম্পাদিত হইলে, ঐ পাঁচালী-নিচয়, ভাষা-ভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব রত্নরাজি হইয়া উঠে। ইহাঁদের কাব্য ভূগর্ভস্থ বিশুদ্ধ হীরার ন্যায়। মাজিয়া-ঘষিয়া সেই হীরাকে লোক-সমাজে আনিতে হইবে। তাই বলি, এ কার্য্য সম্পাদনজন্য উপযুক্ত সম্পাদক চাই। পাঁচালীর মধ্যে স্থানে স্থানে এখনও যে মাটী ময়লা লাগিয়া আছে, তাহা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা আবশ্যক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়, অতি মলিন-ভাবে, অনাথার বেশে, দাশরথি রায়ের এবং রসিকচন্দ্র রায়ের পাঁচালী কলিকাতা বটতলার বাজারে, আজও বিরাজিত আছে। আমরা একবার রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, "মহাশয়! আপনি আপনার পাঁচালী গুলি উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়া একবার ভদ্র লোকের জন্য ভদ্রতাতে প্রকাশ করুন না কেন?" রায় মহাশয়, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, অথচ হাসিয়া বলিলেন, "আমার একাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমার সে উৎসাহও নাই, অধ্যবসায়ও নাই। বিশেষ আমি এ সকল কাজে বড়ই অপটু, গ্রন্থ কিসে ভদ্র হয়, কি সে অভদ্র হয়, তাহা আমি বুঝি না। আমি অধুনা চিত্তের সন্তোষের জন্য কবিতা লিখি, ভগবানকে ডাকিবার জন্য আমি কবিতা লিখি, সংসার-মোহ এড়াইবার জন্য আমি কবিতা লিখি। সুতরাং আমার দ্বারা সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ আমি এক্ষণকার শ্লীল অশ্লীল তাদৃশ বুঝি না। সুনীতি কুনীতি তাদৃশ জানি না। সুতরাং সম্পাদন বিষয়ে আমি একান্ত অক্ষম। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রসিকচন্দ্র রায়, দাশরথি রায়ের এবং ঈশ্বর গুপ্তের সমকালীন লোক। দাশরথির সহিত তাঁহার পরম সৌহার্দ্দ ছিল। দাশরথি প্রায় বিংশতি বার 'বড়া' গ্রামে রসিক রায়ের নিকটে আসিয়া, সেই মনোহর পুষ্পোদ্যানে বসবাস করিয়াছিলেন। রসিকচন্দ্র, বন্ধু দাশরথির আগমনে বড়ই প্রীত হইতেন, এবং মহামহোৎসবে দিন কাটাইতেন। রসিকচন্দ্রের একমাত্র পুত্রের নামও দাশরথি রায়।

ক্রমশঃ—

সমালোচন।

বড় মনোদুঃখেই, প্রথম বৎসর কোনও গ্রন্থাদির সমালোচন জন্মভূমিতে প্রকাশ করি নাই। একবার রাগ করিয়া, একজন প্রিয়-সুহৃদকে বলিয়াছিলাম,—"বরং নিদারুণ অম্লশূল-ব্যাধির যন্ত্রণা ভুগিতে রাজী আছি, কিন্তু সমালোচন করিতে রাজী নহি।"

বঙ্গভূমে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, সমালোচন করার ন্যায় পাপ-কাজ বুঝি আর পৃথিবীতে নাই। দোষ-গুণ-বিচারকেই স্থূলত সমালোচন বলা গিয়া থাকে। সমালোচক,—মুক্তকণ্ঠে—দোষও বলিবেন, গুণও বলিবেন। সমালোচকের আসন অতি উচ্চে অবস্থিত; তিনি কাহারও ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইবেন না; তিনি কাহারও মুখ-মিষ্ট কথায় মজিবেন না; অধিক কি, কামিনী-কাঞ্চনেও, তাঁহাকে বশ করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া, অচল-অটল-ভাবে আপন স্বর্গীয় রত্ন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তুলাদণ্ডে দোষগুণের বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এরূপ উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবার উপযুক্ত পাত্র নহি,—বলিয়াই এতদিন জন্মভূমিতে কোনও গ্রন্থের সমালোচন প্রকাশ করি নাই। আর কোন দোষ থাকুক, আর নাই থাকুক,—আমাদের অন্তত চক্ষু-লজ্জা-দোষ আছে।

আজ কাল অধিকাংশই তৃতীয়শ্রেণীর গ্রন্থকার। ধরুন,—ঐ শ্রেণীর কোন একজন গ্রন্থকার একখানি গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রদান করিলেন। পুস্তকখানি সমালোচকের হাতে দিয়াই গ্রন্থকার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মহাশয়! "অমুক এম এ, বি এল,—এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; অমুক জজের উকীল বলিয়াছেন, 'বঙ্গসাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ এই নূতন'; ডাক্তার রুক্মিণীকান্তের অভিপ্রায় এই,—কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই ইহা পাঠ করা উচিত। তা, আপনারা বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী,—আপনারা যে, এ গ্রন্থকে ভাল বলিবেন, তৎপক্ষে আর সংশয় কি?" এইরূপে গ্রন্থকার, সমালোচককে শাসাইয়া, গৃহে গমন করিলেন। এ দিকে সমালোচক সেই গ্রন্থখানি খুলিয়া দেখেন,—ছাই আর ভস্ম,—মাথা আর মুণ্ড।

আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন,—তাঁহারা ভাল-মানুষ। সমালোচকের নিকট গিয়া, অতি বিনীতভাবে পুস্তকখানি দিয়া, বিনয়-নম্র-বচনে বলেন, "আপনি যদি একটু অনুগ্রহ না করেন, তাহা হইলে আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই বই খানি ছাপাইয়াছি,আপনি যদি একটু ভাল সমালোচন না করেন, তাহা হইলে সব মাটী হইবে।" গ্রন্থকারের গমনের পর, সমালোচক বই খুলিয়া, দুই চারি পাত পড়িয়া দেখেন,—ইহাও তথৈবচ। কাজেই সমালোচক সমালোচন করিতে সক্ষম হইলেন না। ও-দিকে গ্রন্থকার দেখিলেন,—কাগজে তাঁহার গ্রন্থের সমালোচন বাহির হইল না;—অমনি তিনি ম্লান-মুখে সমালোচকের নিকট আসিয়া হাজির! আবার তোষামোদ এবং কাকুতি-মিনতি। এরূপ স্থলে চক্ষু-লজ্জার দায়ে সমালোচক বিব্রত হইয়া পড়েন। একবার আমাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি সমালোচনার্থ একখানি উপন্যাস গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। পুস্তকখানিতে না আছে মিল, না আছে সঙ্গতি, না আছে সামঞ্জস্য। সেই পরিচিত ব্যক্তি, চক্ষু-লজ্জার খাতির এড়াইতে না পারিয়া, গ্রন্থের এইরূপ দ্ব্যর্থ-ভাবব্যঞ্জক সমালোচন করেন,—"এরূপ গ্রন্থলেখা বড় সহজ নহে। বঙ্গদেশে বোধ হয় এরূপ গ্রন্থকার বিরল। আমরা এ গ্রন্থ যত পড়িয়াছি, তত হাসিয়াছি; স্থানে-স্থানে ছত্রে-ছত্রে হাসিয়াছি। বিজ্ঞ পাঠক! যদি আপনার হাস্যরসে ডুবিয়া থাকিবার অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তবে এই গ্রন্থ খানি ক্রয় করুন। আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন, এই গ্রন্থ-পঠন কালে নিশ্চয়ই আমাদের ন্যায় হাসিবেন এবং মজা টের পাইবেন।"

সমালোচন-ব্যাপারে উপরোধ-অনুরোধও বিলক্ষণ চলে। কোন কোন গ্রন্থকার আগে লক্ষ্য করেন,—সমালোচকের আলাপ কাহার সঙ্গে?—সমালোচক বাধ্য কাহার? কেহ সমালোচকের পিতা বা ভ্রাতার নিকট গমন করেন, কেহ সুহৃদ বা সম্বন্ধীর নিকট উপস্থিত হন। উদ্দেশ্য,—একখানি উপরোধ-পত্রভিক্ষা।

ঘুষ-প্রথাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। কোন গ্রন্থকার একখানি স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিয়া, সমালোকের হাতে সমর্পণ করিলেন। পরদিন সমালোচকের গৃহে দৃষ্ট হইল,—পাঁচ সেরা একটা রুই মাছ, একহাঁড়ি দই, চারিসের খেজুরে-

গুড়ের শন্দেস্‌ এবং দশটা ফুলকপি। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই সেই গ্রন্থকারের প্রেরিত।

সমালোচনে ভ্রাতৃবিরোধ হয়, বন্ধুত্ব বিলোপ হয়; অধিক কি, রাস্তা-ঘাটে সমালোচকের প্রহারিত হইবারও আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

একশ্রেণীর মুখ-দাম্ভিক গ্রন্থকার আছেন; তাঁহারা বুঝি মনে করেন, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই। তাঁহারা যেরূপ ভাষাবিদ্‌, সেইরূপ চিন্তাশীল; যেরূপ বিদ্বান্‌, সেইরূপ বুদ্ধিমান্‌;—কোনও দিকে তাঁহারা ন্যূন নহেন। ইহাঁরা ঠিক যেন চৌকোণা! অথবা ইহাঁরা যেন এক একটী, শারদীয় পূর্ণিমার অখণ্ড অকলঙ্ক চন্দ্র! সুতরাং ইহাঁদের সম্মুখে সহজে সহসা অগ্রগামী হয় কে? ইহাঁরা সদাই যেন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থকারমধ্যে এক একজন গ্রন্থকার এমন কথাও বলিয়া থাকেন,—"আমার গ্রন্থ সমালোচন করিবার'ত উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া পাই না। সাধারণ সমালোচক-বানরগণ মদ্‌গ্রথিত মুক্তামালার মর্ম্ম কি বুঝিবে?" লোকের কাছে মুখে তিনি এরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কোন সংবাদপত্রে প্রশংসা-সূচক সমালোচন প্রকাশ হইলে, অমনি পুলকে পূর্ণ হইয়া গলিয়া দ্রব হইয়া যান; আর, নিন্দা-সূচক সমালোচন প্রকাশ হইলে, রাগে দন্তে-দন্তে সংঘর্ষনপূর্ব্বক আত্মদেহের রক্তপাত পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

একবার একখানি দুই শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ গ্রন্থ দেখিলাম। তাহার প্রথম পঞ্চাশ পৃষ্ঠা নানা লোকের প্রশংসাপত্রে পরিপূর্ণ। ইস্তক হৈদরাবাদের নিজাম হইতে নাগাইদ বাঞ্ছারাম কোচ পর্য্যন্ত—সকলেরই প্রশংসাপত্র তাহাতে আছে। উকীল, ডেপুটী, জমাদার, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—ইহাঁদের ত প্রশংসাপত্র তহাতে অবশ্যই আছে। অনুসন্ধানে জানিলাম,—ইহার কতকগুলি প্রশংসাপত্র জাল,—আর কতকগুলি প্রকৃত। একজন পরিচিত উকীলকে জিজ্ঞাসিলাম, "আপনি এ জঘন্য গ্রন্থের এরূপ প্রশংসাপত্র দিলেন কিরূপে?" তিনি উত্তর দিলেন, "কি করি বলুন;—গ্রন্থকার ফর্ম্মাকতক বই ছাপাইয়া, আমার মতামত লইবার জন্য দু'বেলা আমার বাসায় আনা-গোনা আরম্ভ করিলেন। শেষে তিনি এরূপ বিব্রত করিয়া তুলিলেন যে, আমাকে খাইতে, মাখিতে বা মক্কেলের কাজ করিতে দেন না!—তিনি কেবল আমার মুখটী পানে চাহিয়া অষ্টপ্রহর আমার বাসায় বসিয়াই আছেন! শেষে তাঁহাকে ঐ প্রশংসাপত্র দিয়া আমি, সে দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।"

এমনও কোন কোন গ্রন্থকার আছেন, যিনি আপনার গ্রন্থের আপনিই সমালোচন লিখিয়া সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, এরূপ স্থলে সম্পাদকের সহিত গ্রন্থকারের পূর্ব্ব হইতে ভাব থাকা চাই।

এমনও শুনিয়াছি, গ্রন্থকার যদি দশ টাকা দিয়া কোন সংবাদপত্রে একটী বিজ্ঞাপন দেন, তাহা হইলে সেই সংবাদপত্রে সেই গ্রন্থের প্রশংসাসূচক সমালোচন প্রকাশ হইয়া থাকে।

ইংরেজ-পরিচালিত ইংরেজী-সংবাদপত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচন প্রকাশ—এক অপূর্ব্ব জিনিস!

বাঙ্গালাভাষায় ভাল গ্রন্থ বাহির হউক আর নাই হউক,—ভাল সমালোচন কিন্তু অনেক গ্রন্থেরই আছে। কেবল ঐ সমালোচনগুলি একত্র করিয়া, যদি কেহ পড়েন, তবে তিনি মনে করিতে পারেন, বাঙ্গালাভাষায় না জানি দিন দিন কতই-না উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতেছে! বুঝি কেবল চিন্তাশীল লেখক দ্বারাই বঙ্গদেশ পূর্ণ হইয়াছে!

বিড়ম্বনার একশেষ! মনোদুঃখে এবং অভিমান-ভরা ক্রোধের বশীভূত হইয়া একবৎসর কাল জন্মভূমিতে সমালোচন প্রকাশ করি নাই। কিন্তু সমালোচন না করিলেও আর চলে না! সমালোচন, সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। মাসিক পত্র,—সমালোচন ব্যতীত অসম্পূর্ণ। সেই জন্য সর্ব্ব অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক, দ্বিতীয় বৎসর হইতে সমালোচন প্রকাশ করাই উচিত বিবেচনা করিয়াছি। "চোরের উপরে আড়ি করিয়া ভূমে ভাঁত খাওয়া ভাল নহে।"

গ্রন্থ দিলেই যে, সমালোচন করিতে হইবে, তাহা নহে। সমালোচন করা, না-করা, সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যে গ্রন্থ সমালোচিত হইবে না, তাহা গ্রন্থকারকে প্রত্যর্পণ করিবার নিয়ম নাই।

কোন কোন গ্রন্থের কেবল মাত্র প্রাপ্তি-স্বীকার হইবে।

সমালোচকের ইচ্ছানুসারে সমালোচন অতি সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে হইবে।

সমালোচন-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কোন মতামত গৃহীত হইবে না।

জন্মভূমির সমালোচন-ব্যাপারে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রতী হইয়াছেন। আশা আছে, তাঁহার দ্বারা সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য পালন হইবে।

পণ্ডিত-অযোধ্যানাথ।

ঐ প্রতিমূর্ত্তি পণ্ডিত অযোধ্যানাথের; এবং এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ। আজ কয়েক সপ্তাহ হইল, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বাহিরের মূর্ত্তি দেখিয়া মনুষ্যের ভিতরের মনুষ্যত্বের অনুমান ও অনুধাবন সকলেই কিছু কিছু করিয়া থাকেন এবং কোন কোনও স্থলে কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃত অনুমান ও অনুধাবন করিতেও সমর্থ হন। অতএব অসম্ভব নহে যে, পণ্ডিত অযোধ্যানাথের এই আলেখ্যটী দেখিয়া পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সাধারণ জনস্রোতোভ্যন্তরে অজ্ঞাত ডুবিয়া যাওয়ার মত লোক নহেন; প্রত্যুত সে স্রোতের উপর মনুষ্যত্বের বা পুরুষকারের একটা মুদ্রাঙ্কন রাখিয়া যাওয়ার মত লোক; অন্তত তাঁহার মূর্ত্তিটী তদনুরূপ। আমরা পাঠকদিগকে প্রথমেই বলিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা অযোধ্যানাথের প্রতিমূর্ত্তি হইতে তাঁহার মানসিক শক্তি ও হৃদ্‌বৃত্তি-বিষয়ক উপপত্তি সংগ্রহ করিলে প্রবঞ্চিত হইবেন না। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ জীবন-যুদ্ধে যথার্থই যোগ্যতা দেখাইয়া গিয়াছেন; সে যোগ্যতা সচরাচর দৃষ্ট এবং সাধারণ শ্রেণীর যোগ্যতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র এবং বস্তুতই বিশিষ্ট। তিনি জনপ্রবাহে পড়িয়া ভাসিয়া যান নাই, তাহার অতলস্পর্শী তলে অদৃশ্য হইয়াও পড়েন নাই;—সে প্রবাহ, বরং কিয়ৎপরিমাণে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার স্থলবিশেষে নিজ-অস্তিত্বের এমনতর একটী অঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা খুব শীঘ্র "মুছিয়া" যাইবে না। এক কথায় এবং একটা প্রচলিত সাধারণ কথায়, অযোধ্যানাথ-সম্বন্ধীয় আসল কথাটা ব্যক্ত করিতে হইলে বলা যায় যে, অযোধ্যানাথ বড় "হাড়-শক্ত" লোক ছিলেন। তা "হাড়-শক্ত" লোকের সংখ্যা অধুনা এদেশে নাকি খুবই কম; তাই "জন্মভূমিতে" আজ পণ্ডিত অযোধ্যানাথের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত করা অনুপযুক্ত মনে করিলাম না।

কিন্তু পণ্ডিত অযোধ্যানাথ আমাদের এই বঙ্গদেশীয় লোক নহেন; বঙ্গে বিশেষ রূপে বিখ্যাতও নহেন; এমন কি বঙ্গদেশে তাঁহার নাম অনেকে না শুনিয়াও থাকিবেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ—কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ; তাঁহার প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি এবং প্রতিভা,—তাঁহার শক্তি, সম্পত্তি এবং সৎকার্য্য,—তাঁহার বদান্যতা এবং লোকপ্রিয়তা;—সমস্তই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে। তবে বঙ্গে যে, তিনি একেবারেই অজানিত, অপরিচিত; তাহা নহে। অন্তত যত লোক এ অঞ্চলে, "ইণ্ডিয়ান নাসানাল কংগ্রেসের" নাম শুনিয়াছেন, পণ্ডিত অযোধ্যানাথকে তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন। বিগত কয়েক বৎসর নাসানাল কংগ্রেস, পণ্ডিত অযোধ্যানাথের নামান্তর হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কংগ্রেসের যে কিছু প্রচার, তাহা প্রধানত পণ্ডিত অযোধ্যানাথের শক্তি ও শ্রম-সম্ভূত। তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কংগ্রেসেরই কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল;—বলা যাইতে পারে। এ কথা আপাতত থাকুক।

অগ্রেই জানাইয়াছি, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। "ব্রাহ্মণ" বলিলে পূর্ব্বে বিস্তর কথা বুঝাইত বটে; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। কেবল মাত্র "ব্রাহ্মণ" বলিলে আজ কালকার বাজারে সাধারণত যাহা বুঝায়, তাহা প্রায় কিছুই নয়; তাহা বড় জোর একটা আভিজাতিক উপাধি বা "টাইটেল"; তাহাও আবার অত্যন্ত—অনেক দিনের—পুরাতন। আমরা বলিতে চাই যে, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এ প্রকৃতির সাধারণত ব্রাহ্মণ-বাচ্য ব্রাহ্মণ নহেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাসী, সন্ধ্যাহ্নিক-পূত এবং নিত্য নিয়মিত পূজা-পাঠ-নিরত ব্রাহ্মণ। আমরা অতি বিশ্বস্ত সূত্রে এবং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকারীর প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ তাঁহার অসংখ্য বিষয় কার্য্যের মধ্যে, ইংরেজীর অশেষ আলোড়নের মধ্যে প্রত্যহ প্রত্যুষ কাল হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টী পূজা-আহ্নিকে "ক্ষেপণ" করিতেন। ইহা করিতে তাঁহার কোনও দিনই "সময় ও অবকাশাভাব" হইত না।

কাশ্মীরী-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব স্বয়ং সুব্রাহ্মণ অযোধ্যা

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ।

নাথ পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন,—আগরা নগরে। ১৮৪০ সালে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম পণ্ডিত কেদারনাথ। পিতাও নিজে কম লোক ছিলেন না। অযোধ্যানাথের ন্যায় পুত্রের উপযুক্ত পিতাই ছিলেন,—পণ্ডিত কেদারনাথ। ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত, প্রতিপত্তিশালী পণ্ডিত কেদারনাথ এক সময়ে "ঝাঝর" নবাবের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসা-কার্য্য, কুঠী ও ব্যাঙ্ক ছিল। বিষয়-কার্য্য উপলক্ষেই পণ্ডিত কেদারনাথ আগ্রায় বাস করেন। ইনি দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অযোধ্যানাথ ও কনিষ্ঠ জগন্নাথ-প্রসাদ।

পণ্ডিত অযোধ্যানাথের বাল্য-শিক্ষা হইয়াছিল,—আরবী এবং পারশী ভাষায়। আরবী এবং পারশী তিনি এত শিখিয়াছিলেন এবং এতদুভয় সাহিত্যে এবং শাস্ত্রে এতাদৃশ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন যে, আরবী পারশীর আকর স্বরূপ মুসলমান মৌলবীরাও কদাচিৎ তাঁহার সমকক্ষতা করিয়া উঠিতে পারিতেন। কোরাণ-বিষয়ক কঠিন প্রশ্ন ও মুসলমান আইনের অতি কূট তর্ক—তিনি তত্তৎ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতার সহিত মীমাংসা করিতে পারিতেন। কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশন-সভায় আমি পণ্ডিত-অযোধ্যানাথকে বরং একটু আক্ষেপের সহিত বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, হিন্দু হইয়া হিন্দু-সাহিত্যে ও শাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই, যাদৃশ ব্যুৎপত্তি মুসলমান-সাহিত্যে ও শাস্ত্রে আছে। এ কথার উল্লেখ—মুসলমানদিগের কংগ্রেস-বিদ্বেষের কারণ অপনয়নার্থ—প্রাসঙ্গিক রূপেই তিনি করিয়াছিলেন।

অযোধ্যানাথের ইংরেজী প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা হইয়াছিল,—আগরা কলেজে। তাঁহার কলেজ-জীবনও প্রভূত কৃতিত্বময়। বাল্যাবধি বিশিষ্টরূপে মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি,—অযোধ্যানাথ, কলেজে সমপাঠি-শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থান স্বভাবতই অধিকার করিতেন এবং পরীক্ষায় প্রতি বৎসরই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অযোধ্যানাথের শিক্ষাকালে ইউনিবার্সিটী প্রথা প্রচলিত হয় নাই। অতএব শিক্ষা-সম্বন্ধীয়—এখনকার মত—কোনও উপাধি তিনি প্রথম উদ্যমে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু কলিকাতা ইউনিবার্সিটী সংস্থাপিত হওয়ার পর "এফ এ" পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উহার প্রজা-বৃন্দমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

প্রথমত পিতা পণ্ডিত কেদারনাথের বাসনা হইল,—স্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ও ব্যাঙ্কের কার্য্যে পুত্র অযোধ্যানাথকে প্রবেশ করান। কিন্তু তাহা ঘটিল না। কেবল মাত্র নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসা কার্য্য অযোধ্যানাথের তেজোময়ী প্রতিভার পক্ষে প্রচুর নহে। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে অযোধ্যানাথের অপ্রবৃত্তি প্রকাশিত হইল। পিতা পীড়াপীড়ি করিলেন না। অযোধ্যানাথ ১৮৬২ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আগরার সদর-দেওয়ানি আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। ওকালতীও ব্যবসা-বিশেষ বটে। কিন্তু এ ব্যবসায়ে এবং ব্যাঙ্কাদির ব্যবসায়ে প্রভেদ অনেক। ওকালতী অযোধ্যানাথের উপযুক্ত ক্ষেত্র হইল। তিনি তাঁহার মানসিক প্রভাব-প্রকাশের স্থান পাইলেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই আগরা সদর-দেওয়ানি আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল হইলেন—অযোধ্যানাথ। তাঁহার খ্যাতি, জেলায় জেলায় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি দেশীয় উকীল-দলের এবং স্থানীয় লোক-সমাজের স্বাভাবিক নেতা হইয়া উঠিলেন। এই "নেতৃত্ব" মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্রই সমান রূপে তাঁহার অধিকারাধীন ছিল।

১৮৬৯ সালে গবর্ণমেণ্ট-নিবাস আগরা হইতে এলাহাবাদে উঠিয়া আসে। সদর দেওয়ানি আদালত "হাইকোর্টে" পরিণত হইয়া এলাহাবাদে স্থাপিত হয়। সুতরাং অযোধ্যানাথ আগরা হইতে এলাহাবাদে আসিলেন। এই নূতন স্থানে আসিয়াও তাঁহার অপেক্ষা করিতে হইল না; অল্প দিনেই সকলের অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। উকীল-মহলে শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রণী উকীল হইলেন;—সমাজে সম্ভ্রান্ত হইলেন; রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সর্ব্বদিক্-প্রসারী সহানুভূতি, সদভিপ্রায়, সাধারণ কার্য্যে অনুরাগ ও উদ্যোগ, সাহস, উদারতা, অবিচলিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি—নানা গুণে তিনি খ্যাতি লাভ করিলেন;—এলাহাবাদ অঞ্চলে সাধারণ সকল কার্য্যেরই তিনি পরিচালক হইয়া উঠিলেন।

এলাহাবাদে আসার কিয়ৎকাল পরে অযোধ্যানাথের পিতৃ-বিয়োগ হইল। অযোধ্যানাথ প্রকাণ্ড সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন;—পিতৃকৃত বিস্তৃত এবং লাভকর ব্যাঙ্ক-কার্য্য তাঁহার হস্তে পতিত হইল। ইহা তিনি অটুট রাখিতে

কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিয়ৎকালের জন্য ওকালতীর শত অনুরোধ অবহেলা করিয়া পিতৃ-অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্কের কার্য্যে নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কার্য্য চলিতে লাগিল। অযোধ্যানাথের "কুঠী" এখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একটী শ্রেষ্ঠতর ব্যাঙ্ক।

এলাহাবাদ হাই-কোর্টে অযোধ্যানাথ ওকালতী করিতে লাগিলেন। কেবল ওকালতী নহে, তিনি এলাহাবাদ গবর্ণমেণ্ট কলেজে আইন-অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই আইন-অধ্যাপকতা তিনি প্রায় ২৫ বৎসর কাল অসাধারণ দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা আইন সম্বন্ধে অযোধ্যানাথের অধিকতর ব্যুৎপত্তি ছিল—একথা বলাই বাহুল্য; কারণ, তিনি আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং আইনই তাঁহার বিশেষ অধ্যয়নের ও চিন্তাভিনিবেশের বিষয় হইয়াছিল। তা আইন-ব্যবসায়ী ত অনেকে হইয়া থাকেন এবং বিশেষরূপে আইন অধ্যয়ন ও চিন্তনও অনেকে করিয়া থাকেন; কিন্তু তবুও ত সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই জন্মে। তজ্জন্যই না, এলাহাবাদ-হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি, (চিফ্ জষ্টিস) পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মৃত্যুর পর, "ফুল বেঞ্চে"—জজদিগের পূর্ণ অধিবেশনে, শোক-সূচক এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া, প্রকাশ্যভাবে আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করত পণ্ডিতের আইন-পারদর্শিতার বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চিফ্ জষ্টিসের মন্তব্যটী ক্রমে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। আপাতত অযোধ্যানাথের আইন-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চিফ্ জষ্টিস্ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই এক আধ কথা উদ্ধৃত করিয়া কথাটা শেষ করি। চিফ্ জষ্টিস্ বলেন, "পণ্ডিত অযোধ্যানাথ অত্যুন্নত শ্রেণীর উকীল। উপযুক্ত ব্যবহারবিৎদের যতদূর সৎ, মহৎ এবং আইন-অভিজ্ঞ হইতে হয়, অযোধ্যানাথে সমস্তই ততদূর ছিল। তাঁহার আইন-জ্ঞান এবং তর্ক-শক্তি উচ্চতম অধিকারের।

(*highest legal and forensic attainments*)

আরও অনেক কথার পর চিফ্ জষ্টিস বলিতেছেন,—

No matter how complected might be the faets of the case in which he was engaged or how intricate or difficult the questions of law upon which he had to address us or how necessarily prolonged might be his arguments he was never wearisome. It was always a pleasure to us to listen to him and we frequently derived instruction from the legal arguments of pundit Ajodhya Nath.

"মোকদ্দমার-বিষয়গত বৃত্তান্ত যতই জটিল হউক না কেন, তৎসংশ্লিষ্ট আইন-ঘটিত প্রশ্ন যতই কঠিন এবং জটিল হউক না কেন, পরন্তু সে সম্বন্ধে পণ্ডিত অযোধ্যানাথের বক্তৃতা—বিতর্ক যতই সময়ব্যাপী ও সুদীর্ঘ হউক না কেন, আমাদের অসহিষ্ণুতা উৎপাদন তিনি কখনও করেন নাই। প্রত্যুত তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমরা নিয়তই আনন্দ অনুভব করিতাম। তাঁহার ব্যবহারিক বিতর্ক-নিচয় হইতে আমরা সর্ব্বদাই উপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

আদালতের উচ্চতম আসন হইতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা ব্যবহারাজীবের পক্ষে;—তা সে ব্যবহারাজীবীরা যত বড়ই হউন না,—আর কি হইতে পারে? তাই বলিয়া কি অযোধ্যানাথ কখনও অযথা-রূপে আদালতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? না;—পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সে প্রকৃতির লোকই ছিলেন না;—তাঁহার তেজস্বিতা এবং সাহসিকতা অতিশয় প্রখরা ছিল; সে এত যে, তজ্জন্য তিনি রুক্ষ-প্রকৃতি বলিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট হইতেও অনুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। চিফ্ জষ্টিস নিজেই তাঁহার মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন;—"পণ্ডিত অযোধ্যানাথ "ষোল আনা" স্বাধীন-চেতা লোক ছিলেন, একথা বলাই অতিরিক্ত।"

পণ্ডিত অযোধ্যানাথের ব্যবহার-বিদ্যার তীক্ষ্নতা সম্বন্ধে আদালতের উপরোক্ত মন্তব্য হইতে আরও কয়েক ছত্র উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করা প্রয়োজন বিবেচনা করি। চিফ্ জষ্টিস উকীল অযোধ্যানাথের আইন-বিষয়ক গভীর জ্ঞান, তাঁহার মস্তিষ্কের এবং মনের সূচীভেদ্য সূক্ষ্ম দর্শন এবং তাঁহার চিত্তাকর্ষণী ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন;—

'I confess that I have not vnfrequently been captivated by the display, on sudden and difficult emergencies in his casesof

his legal knowledge, the subtlity of his mind and his pursuasive powers'.

অর্থাৎ আমি (চিফ্ জষ্টিস) সম্যক্ প্রকারে স্বীকার করিতেছি যে, এমন অনেক সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, তৎপরিচালিত মোকদ্দমায় অকস্মাৎ-উত্থিত অতি কঠিন কঠিন স্থলে অযোধ্যানাথ এতাদৃশ আইন-অভিজ্ঞতা, মানসিক সূক্ষ্মতা এবং চিত্তাকর্ষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।

অযোধ্যানাথ উকীল ছিলেন, কিন্তু উচ্চ ওকালতীর অননুমোদিত অথচ অসংখ্য উকীল কর্তৃক অবলম্বিত অনুপযুক্ত বক্র পথ কখনও কোন ক্রমে গ্রহণ করিতেন না; তিনি সুস্পষ্ট ও অনাবৃত ভাবে মোকদ্দমার যাবতীয় বিবরণ বিচারকদিগের গোচর করিয়া বিতর্ক ও বক্তৃতা করিতেন,—আইন-ঘটিত প্রশ্ন উত্থাপিত ও মীমাংসিত করিতেন। মোকদ্দমার বিবরণ-বিবৃতি সম্বন্ধে তিনি এমনতর সন্দিগ্ধ ছিলেন যে, "লুকো-চুরীর" ঈষৎ ছায়াও যদ্দ্বারা তাঁহাতে পতিত না হয় অতি সাবধানতার সহিত তাহা করিতেন। এই কারণেই তিনি বিচারকদিগের অধিকতর সৌহৃদ্য ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। অযোধ্যানাথের উপরোক্ত বিশুদ্ধ-চিত্ততার বিশেষ উল্লেখ করিয়া নব্য ব্যবহারাজীব-সাধারণকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া চিফ্ জষ্টিস্ তাঁহার মন্তব্যে লিখিয়াছেন,—

"In his arguments before us he was most scrupulous in avoiding even the semblance of a misstatement of facts and thereby secured in our judges a thoraugh reliance upon his honor as an advocate."

I need scarcely say that he was thorughly independent. His character and career as a lawyer afford a good example to the younger members of the profession of how an honorable advocate may attain in that profession to the front rank and gain, what is no small assistance to the success of an advocate the confidence, respect and friendship of the tribunal before which he practices.

(এ উক্তির তাৎপর্য্য উপরেই দেওয়া হইয়াছে।)

উকীল অযোধ্যানাথের সাধারণত আইন-জ্ঞতা সম্বন্ধে উপরে যে পরিচয় দেওয়া হইল, তাহাই প্রচুর। বিশেষরূপে তাঁহার নিপুণতা এবং অভিজ্ঞতা ছিল, হিন্দু ও মুসলমান আইনে। কিন্তু আইনে নিপুণতা ও অভিজ্ঞতা এবং ওকালতীতে "পসার" এমন অনেকেরই থাকে এবং আছে। অযোধ্যানাথের জীবন যদি কেবল এই ওকালতী-ব্যবসায়ে এবং আইন-অধ্যয়নে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে তাঁহার এই জীবনী লিখিতে বসিতাম কি না, জানি না।

আইন ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য,—কাব্যালঙ্কারাদিতে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাঁহার অধিকার ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ তাঁহার ন্যায় লোকের এরূপ থাকিয়াই থাকে।

আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক কথায় অনেক কথা লেখা হইয়া গেল। আমরা অযোধ্যানাথের জীবনের ঘটনাবলীর লেখনীয় ঘটনাগুলির অনুসরণ করিতেছিলাম; এখন তাহাই করি।

অযোধ্যানাথ অত্যুচ্চ শ্রেণীর উপযুক্ত উকীল; অতএব অত্যুচ্চ আদালতের বিচারক হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভাবিত নহে। ১৮৮১ সালে, এলাহাবাদ-হাইকোর্টে জনৈক এদেশীয় জজ স্থায়ী রূপে নিযুক্ত করা স্থির হয়। উক্ত হাইকোর্টের তাৎকালিক চিফ্ জষ্টিস্ স্যর রবার্ট ষ্টুয়ার্ট, পণ্ডিত অযোধ্যানাথকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই উপযুক্ত অনুরোধ রক্ষা হয় নাই। অন্যদিগের স্বার্থ সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ জজের কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই; নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আলিগড়ের স্যর সায়দ আমেদের পুত্র মিষ্টার মামুদ। কিন্তু ইহাতে অযোধ্যানাথের কিছুই আসিয়া-যায় নাই। তিনি নিজে ঐ কাজের জন্য প্রার্থী হন নাই; বরং ঐ পদ গ্রহণ করার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্ব-বৎসর অর্থাৎ ১৮৮০ সালে প্রবল-প্রতাপান্বিত "পায়োনিয়র" সংবাদপত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এলাহাবাদে "ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড" নামে এক দৈনিক সংবাদ

পত্র প্রকাশিত করেন। বলা বাহুল্য যে, "পায়নিয়রের" প্রতিযোগী এই "ইণ্ডিয়ান হেরাল্ডকে" প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র করা হইয়াছিল। ইহার সম্পাদনার্থে বিলাত হইতে সুদক্ষ সম্পাদক আনীত হইয়াছিলেন। অর্থে সামর্থ্যে যতদূর করা সম্ভব, এই পত্রের উন্নতি-কল্পে অযোধ্যানাথ কিছুই করিতে ক্রটী করেন নাই। কোনও বন্ধু এলাহাবাদ হইতে লিখিয়াছেন যে, এই "ইণ্ডিয়ান হেরাল্ডের" স্থাপনায় এবং চালনায় "পণ্ডিতজীর" "ন্যূনাধিক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কি কারণে জানি না "ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড" টিকে নাই। তিন বৎসর প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১৮৮৭ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক-সভা সংস্থাপিত হয়;—হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত অযোধ্যানাথ উহার সদস্য মনোনীত হন। এত বিশিষ্ট দক্ষতার সহিত তিনি এই উচ্চ-পদোচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী বৎসরেও অযোধ্যানাথ সদস্য-পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু নানা কারণে কয়েক মাস পরে ঐ পদ তিতি স্বয়ং পরিত্যাগ করেন।

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ আরও কতক গুলি সরকারী কার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ ইউনিবার্সিটীর সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিচয়ে বহু বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন এবং মিউনিসিপাল-কমিসনর ছিলেন। এলাহাবাদ সহরের স্বাস্থ্যোন্নতি প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে সংঘটিত হইয়াছে। মিউনিসিপাল-কমিসনর রূপে তিনি এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত অযোধ্যানাথের যে সকল কার্য্যের কথা আমরা এতক্ষণ বিবৃত করিলাম, তাহা শ্রেষ্ঠ, সম্মানার্হ ও "বড়লোক"-যোগ্য হইলেও, এ প্রকৃতির কার্য্য আজ কাল কিছু সাধারণ। বড় উকীল, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য, মিউনিসিপাল-কমিসনর, ইউনিবার্সিটীর ফেলো ইত্যাদি উচ্চ পদ আজ কাল ত অনেকেরই হইয়া থাকে,—প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিও অনেকের হয়; পণ্ডিত অযোধ্যানাথেরও হইয়াছিল, অতএব তাহাতে আর তাঁহার বিশেষত্ব কি? বিশেষত্ব তাঁহার তাহাতে নহে;—সেটা ছিল, তাঁহার "শক্ত হাড়ে"। আর সেইজন্যই তিনি যাহাতে হাত দিতেন, যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাতেই কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব প্রতিবিম্বিত হইত। অবিচলিত মানসিক দৃঢ়তা, সুবিস্তৃত সহানুভূতি, এবং অকৃত্রিম ও একান্ত ব্যক্তিগত স্বদেশ-ভক্তি,—তাঁহার এই বিশেষত্বের, তাঁহার মনুষ্যত্বের ও সর্ব্ব প্রকার উন্নতির,—তাঁহার সুদূর-ব্যাপী সম্ভ্রমের ও নিরতিশয় লোক-প্রিয়তার কারণ হইয়াছিল। স্বাভাবিক সহানুভূতি ও স্বদেশানুরাগ তাঁহাকে সাধারণ-কার্য্যে সংলিপ্ত করিত; তাহাতে সংলিপ্ত না হইয়া তিনি থাকিতেই পারিতেন না। তিনি যাহাতে সংলিপ্ত হইলেন, কাহার সাধ্য তাহা হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। সর্ব্বান্তঃকরণের ঐকান্তিক একাগ্রতা ও অনুরাগ তিনি সে কার্য্যে ঢালিয়া দিয়াছেন; তাহার জন্য অকাতরে নিজ অর্থ ব্যয় করিতেছেন;—শারীরিক শ্রমের চরম সীমায় তাহার জন্য যাইয়া পৌঁছিতেছেন! ইহাই অযোধ্যানাথের বিশেষত্ব। ইহারই জন্য সে দিন ভাইস চানস্যালর স্যর জন এজ, এলাহাবাদ-ইউনিবার্সিটীর কনভোকেশন-সভার অধিবেশনে অযোধ্যানাথের উদ্দেশে আক্ষেপ করিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাটী বলিয়াছিলেন যে, "অযোধ্যানাথ এমন লোক ছিলেন, যাঁহার জন্য পৃথিবীর যে কোনও দেশ এবং জাতি হউক না, গর্ব্ব করিতে পারে।

(*"He was a man of whom any country and any race might be proud.*)

পরন্তু অযোধ্যানাথের উপরোক্ত ঐ বিশেষত্বের জন্যই আজ আগ্রায় "ভিক্টোরিয়া কলেজের" অস্তিত্ব এবং আজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে "নাসানাল কংগ্রেস" পরিচিত। পশ্চিমে ভ্রমণ-কালে আমার সহিত কংগ্রেস সম্বন্ধে সাধারণ-শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান অনেকের সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কংগ্রেস কিসে তাহারা ভাল বলিয়া জানিল—জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধ বণিকই হউক বা বিদ্যালয়ের বালকই হউক, সকলেই বলিল,—"কেঁও? পণ্ডিতজী নে কহা।" অর্থাৎ পণ্ডিতজী কহিয়াছেন, কংগ্রেস ভাল, অতএব তাহা অবশ্যই ভাল; কারণ তিনি কখনও মিথ্যা কহেন না। ইহাতেই,—এই একটা দৃষ্টান্তেই বুঝুন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পণ্ডিত অযোধ্যানাথের কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি এতাদৃশ লোক-প্রিয় ছিলেন যে, সে বলিবার নয়। তাঁহার মৃত দেহ সংকারের জন্য ত্রিবেণী-

তীরে যখন নীত হয় তখন উচ্চপদস্থ ধনী ব্যক্তি হইতে দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত শত সহস্র লোকে উদ্বেলিত হৃদয়ে তাহাতে যোগদান করে। সে দৃশ্য হৃদয়-বিদারক। শেষের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ জজ নক্স প্রদত্ত পুষ্পমালা চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

আগ্রায় ভিক্টোরিয়া কলেজ সংস্থাপন প্রধানতঃ অযোধ্যানাথের যত্নে হইয়াছিল—উপরে বলিয়াছি। যেরূপে এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার এক বিন্দু ইতিবৃত্ত আছে। আগ্রায় খৃষ্টান মিশনরী দিগের এক স্কুলে অনেক হিন্দু বালক অধ্যয়ন করিত। একদা ঐস্কুলে জনৈক খৃষ্টানীকৃত মেহতর বালককে ভর্ত্তি করার প্রস্তাব হওয়াতে স্কুলের যাবতীয় হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্র সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। মিশনরী মহাশয়েরা প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিলেন না; "মেহতর" বালক স্কুলে গৃহীত হইল। হিন্দু ছাত্রেরা স্কুল ত্যাগ করিল। স্কুল ত্যাগ করিল বটে কিন্তু তাহারা অধ্যয়ন করে কোথায়? মিশনরী দিগের অনুরোধে আগ্রা কলেজ এই ছাত্রদিগের প্রবেশার্থে অ.দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন না। বড়ই বিপদ উপস্থিত হইল। কিন্তু অযোধ্যানাথ তৎকালে আগ্রায় ছিলেন। উদ্যোগী ও আগ্রহী হইয়া ও অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিয়া এক স্কুল স্থাপন করিলেন,—নাম দিলেন ভিক্টোরিয়া কলেজ। অযোধ্যানাথ যত দিন আগ্রায় ছিলেন; এই স্কুল তাঁহারই হস্তে ছিল; আগ্রা ছাড়িয়া এলাহাবাদে আসিবার সময় স্কুলের সম্পাদকীয় ভার অন্য হস্তে ন্যস্ত করিয়া আসেন।

অযোধ্যানাথ যেমন তেজী, উদ্যোগী ও সৎসাহসী; তেমনি সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বান ছিলেন; তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠার জন্য তাঁহার শত্রুবর্গও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। অযোধ্যানাথ যাহা ধরিতেন, তাহার একটা "কুল-কিনারা" না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না; তিনি সে পাত্রই ছিলেন না। শুনা যায়, কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার নাকি প্রথমতঃ আস্থা ছিল না; কিন্তু যে দিন হইতে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন, সে দিন হইতে কংগ্রেসই হইয়াছিল, তাঁহার "জপ-মালা"। কত কত লোক ত কংগ্রেসে যান, খান, বক্তৃতা করেন, কিন্তু এত লোকের মধ্যে অযোধ্যানাথের মত কটী লোক কংগ্রেসে আছেন? কংগ্রেসের জয়েণ্ট সেক্রেটারী স্বরূপ অযোধ্যানাথ কয়েক বৎসর ধরিয়া বস্তুতই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন; তত পরিশ্রম অন্য লোকে নিজের কার্য্য-উদ্ধারের জন্যও করে না। কেবল কি শ্রম, আর সামর্থ্য আর শক্তি, কংগ্রেসের জন্য অযোধ্যানাথ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। কংগ্রেস কার্য্যের গুরুভারে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। তাহার পর কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব অধিবেশনে যাইয়া নাসাজর হইতে যে সাংঘাতিক সর্দ্দি লইয়া আসিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। অযোধ্যানাথের মৃত্যুতে দেশের গণ্য, মান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হাহাকার করিতেছে, নানা স্থানে শোকসূচক সভাসমিতি হইতেছে; সম্ভবত এলাহাবাদে তাঁহার কোন "স্মৃতিচিহ্ন" স্থাপিত হইবে। উদ্যোগ হইয়াছে। অযোধ্যানাথের স্থান অধিকার করিতে পারেন, এমন ব্যক্তি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আপাততঃ একটীও নাই। যেমনটী যায়, তেমনটী যথার্থই আর হয় না। বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত লোক আমরা কি আর পাইব? কখনই না! পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মত লোকও এলাহাবাদ অঞ্চলের লোক আর পাইবে না। অযোধ্যানাথের কয়েকটী পুত্র-কন্যা ও ভ্রাত্রাদি বিদ্যমান আছেন।

মৃত্যুকালে অযোধ্যানাথের বয়ক্রম ৫১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার অনতিদীর্ঘ দেহ সুগঠিত ও সুন্দর বর্ণ গৌরোজ্জ্বল ছিল। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, সুদীপ্ত নয়ন,—শোভনীয় শ্মশ্রু, দৃঢ় বদ্ধ ও স্থির প্রতিজ্ঞা বুদ্ধিমত্তা ব্যঞ্জক অধরোষ্ঠ। অযোধ্যানাথের মূর্ত্তি খানি শক্তির পরিচায়ক ছিল।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

হস্তী।

(২)

এফিকার হস্তী।

গত বার পাঠক এসিয়া এবং এফ্রিকা, উভয় দেশীয় হস্তীর চিত্র দেখিয়াছেন। চিত্রে অবশ্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না,—উভয়ের তারতম্য কি? তারতম্য কিন্তু আছে। বুঝিলে,—তারতম্য বহুপ্রকারে। এসিয়া দেশীয় হস্তীর মস্তকটী একটু দীর্ঘাকার,—এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর মস্তক কতকটা

মণ্ডলাকার। এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর মস্তকের সম্মুখ ভাগটা, এসিয়া দেশীয় হস্তীর ন্যায় খিলানের মত না হইয়া, কতকটা গম্বুজাকৃতি। এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর কর্ণদ্বয়, এসিয়া দেশীয় হস্তীর অপেক্ষা অনেক বড়। এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর পশ্চাতের পদদ্বয়ে প্রত্যেকে চারিটী করিয়া নখ না হইয়া, তিনটী করিয়া নখ।* এসিয়া দেশীয় হস্তী এফ্রিকাদেশীয় হস্তী অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট দন্ত ও শুণ্ডের আকৃতি-প্রকৃতিতে উভয় দেশীয় হস্তীর মধ্যে অনেকটা বৈলক্ষণ্য আছে। এসিয়া দেশীয় হস্তীর বর্ণ অপেক্ষা এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর বর্ণ গাঢ়তর। এসিয়া দেশীয় হস্তীর ধারণা-শক্তি যত প্রখরা, এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর ততটা নহে। এফ্রিকার সিনিগাল হইতে উত্তম-আশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থানে হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। এসিয়ায় যত হস্তী পাওয়া যায়, এফ্রিকায় তত পাওয়া যায় না।

যাঁহারা বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সিংহ নামক এক প্রকার পক্ষী হস্তীর মাংস খাইয়া থাকে।† কিন্তু হস্তীর মাংস মানুষে খায়, এ কথা বোধ হয় আমাদের অনেক পাঠকই অবগত নহেন। সত্য সত্যই কিন্তু এফ্রিকা দেশের অনেক স্থানের লোক হস্তীর মাংস পরিতৃপ্তি সহকারে উদরসাৎ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ লোকেরই ইহা উপাদেয় আহারীয়।‡ শুনা যায়, ব্রহ্মদেশের অনেকেই হস্তীর মাংস খাইয়া থাকে।

মেজর ডেনহাম বলেন,—"হস্তীর মাংস কতকটা কর্কশ বটে; কিন্তু এফ্রিকা অঞ্চলে যে গো-মাংস পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা হস্তীর মাংস সু-স্বাদ এবং সদ্‌গন্ধযুক্ত। প্রাচীন রোমকেরা হস্তীর মুণ্ডটীকে বড় রসনা-রস-সঞ্চারী সুখাদ্য মনে করিতেন। কেহ কেহ বলেন,—রোমক রাজ্যে হস্তীর পা-কয়খানিও বড় বাদ যাইত না। রাজ-রাজড়াও খুব আমোদ করিয়া, রন্ধিত হস্তীর পদ লেহন করিতেন। অনেকের "পা" আর "শুঁড়", উভয়ই স্বর্গের ভোগ বলিয়া মনে হইত। এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর ভাগটা, এসিয়া দেশীয় হস্তীর অপেক্ষা কতকটা বেশী। কেহ কেহ বলেন—

"এফ্রিকা দেশীয় হস্তী মানুষের বশে আসিত না, আজকাল অনেকটা পোষ মানে।" এ কথা কিন্তু বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কেন না, ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ভারতবাসীরা যেমন এসিয়া দেশীয় হস্তী ব্যবহার করিয়া থাকে, কার্থেজবাসীরা সেইরূপ এফ্রিকা দেশীয় হস্তী ব্যবহার করিত। পূর্ব্বে রোমক রাজ্যে পম্পে এবং সিজরের সময় হস্তি-প্রদর্শনীতে এফ্রিকার হস্তী প্রদর্শিত হইত।

এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর দন্তে* অনেক শিল্প-সৌন্দর্য্যময় মনোহর কারুদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বিলাতে বহুল পরিমাণে হস্তিদন্তের রপ্তানি হয়। এক সেফিল্ড সহরে প্রতিবৎসর প্রায় ৪০।৫০ সহস্র টাকার কম গজ-দন্ত রপ্তানি হয় না। তথায় প্রায় ৫০০ শত লোক গজ-দন্তের কাজ করিয়া থাকে। মূল্যও ৩ লক্ষ টাকার কম হইবে না।†

---

* এসিয়ায় হস্তীর সম্মুখস্থ দুটী পায়ের প্রত্যেকটীতে সচরাচর ৫টী করিয়া এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী পায়ে ৪টী করিয়া নখ থাকে। বৃহস্পতির মতে যে হস্তীর নখ সংখ্যা সাত, আট, নয়, দশ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, একোনবিংশতি হয়, সেই হস্তী অন্যান্য শুভ-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও অশুভ-কারক। যদি হস্তীর নখ অষ্টাদশ বা বিংশতি হয়, তবে সে শুভ-কারক।

† তত্র প্রস্রবণ রম্যেষু সিংহা পক্ষগমাঃ স্থিতাঃ।
তিমিমৎস্য গজাংশ্চৈব নীড়ান্যারোপয়ন্তিতে।
রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২।১৬

‡ *Strabo (lib xvi, p 772 & Diod Sic lib 1, 61)*

* পূর্ব্বে বলিয়াছি, এশিয়া দেশীয় হস্তীর মুখের বাহিরে দুইটি দন্ত দেখা যায়। ইহা 'গজদন্ত' নামে সুপরিচিত। ইহাতে নানাবিধ সূক্ষ্ম শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। হস্তীর সর্ব্বসুদ্ধ ১৮টি দাঁত। ১৬টি মুখের ভিতর,—উপরে ৮টি এবং নীচে ৮টি। বাহিরে দুইটি থাকে। বাহিরের দাঁত দুইটি এক গজ বা ততোধিক লম্বা, নিটোল চকচকে, কঠিন এবং শ্বেতবর্ণ। কখন কখন রঙ্গ ঈষৎ লালাভ হইয়া থাকে। দাঁত দুইটি সোজা; তবে শেষভাগ উপর দিকে বাঁকা। কোন কোন হাতীর বাহিরে চারিটি দাঁতও দেখা যায়। কোন কোন হাতির দাঁত, প্রতি বৎসর কাটিয়া দিতে হয়; কাহারও কাহারও বা ২।৩ বৎসর অন্তর কাটিয়া দিতে হয়। একবার কাটিয়া দিলে, আবার গজায়। হস্তীর দশম বৎসরে এবং আশীত বৎসরে দাঁত কাটা, অনেকেই অন্যায় মনে করেন।

† ভারতীয় হস্তীর দন্তে অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ সূক্ষ্ম চাতুর্য্যময় সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ইহা বহুমূল্য বাণিজ্য দ্রব্য। পূর্ব্বে গ্রীক এবং রোমকেরা গজদন্ত-নির্ম্মিত বহুবিধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। তখন গজদন্তে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিও গঠিত হইত। গজদন্ত-নির্ম্মিত "মিনর্ভা" এবং "জুপিটার" বিগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি সুগঠিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। কিপলিং সাহেব বলেন,—"গ্রীক এবং রোমক রাজ্যে গজদন্তের

হস্তিনী।

এসিয়া দেশীয় এবং এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর তারতম্য বোধ হয়, পাঠকগণ অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এক্ষণে আর তারতম্য নহে, সাম্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গই চলিবে। অন্যান্য সকল বিষয়েই সাধারণতঃ সাম্যই দেখিতে পাওয়া যায়। এখন "হস্তিনী" সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলিয়া রাখি। হস্তিনীর স্তন এবং গর্ভ মানবীর মতনই; তোতা-পাখার ন্যায় জিহ্বা খানি গোল; হস্তিনীর কমনীয় কান্তি, হস্তীর মনপ্রাণ-হারিণী। মদ-ক্ষরণ সময় যখন হস্তী প্রচণ্ড বিক্রমে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, তখন একটী হস্তীনীকে তাহার সম্মুখে ছাড়িয়া দিলে, তাহার সে দুরন্ত-দুৰ্দ্ধর্ষতা ছুটিয়া পলায়ন করে। সচরাচর ত হস্তিনীর মোহন-ফাঁদে পড়িয়াই হস্তী মনুষ্যের লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার আর বিচিত্র কি? নারী-চক্রে যে জগৎ পিষ্ট। অন্যান্য পশু-স্ত্রী অপেক্ষা হস্তিনীর স্নেহ-কারুন্য অনেক অধিক। সন্তান-বাৎসল্যে হস্তিনী পশু-সমাজে অদ্বিতীয়। একটী সন্তান হত, হৃত বা নষ্ট হইলে, হস্তিনীর শোকের সীমা থাকে না। আবুল-ফজলে প্রণীত, আইন. আকবরী পাঠে, এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হস্তিনী তখন শোকে তাপে তৃণ-জল পরিত্যাগ করে; এমন কি অনেক সময় দারুণ শোকে দগ্ধ হইয়া, প্রাণত্যাগও করিয়া থাকে। কিন্তু আবার ইহাও শুনিতে পাই, দু দশদিনের জন্য হস্তিনী কোন রকমে স্থানান্তরিত হইলে, পুনরায় সে আপন শাবককে চিনিতে পারে না। শাবক, মাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিলেও, মা চিনিতে পারে না; ফিরিয়াও চাহে না। হস্তি তত্ত্ববিদ্ কোর্স সাহেব এই কথা বলেন।* সান্নিধ্যে অসীম স্নেহ,—আর ক্ষণিক অপসরণে নিদারুণ নির্ম্মমতা,—পাশুলালা কি বুঝিব বল? সবই ভগবানেরই খেলা বৈত নয়। হস্তিনীরা পূর্ণাবয়বে ৭ হাত উচ্চ হয়।

হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীরা চতুর। সম্রাট আকবরের বিখ্যাত ইতিহাসলেখক আবুল ফজেলই বলেন,—"এক দিন আমরা শীকারে বাহির হই; দেখিলাম একটী হস্তিনী মরিয়া পড়িয়া আছে; কিন্তু পর দিন দেখিলাম, সেটা সেখানে নাই। শুনা গেল, আমাদিগকে দেখিয়া হস্তিনী মৃতবৎ পড়িয়াছিল।"

গর্ভ ধারণ।

হস্তিনী প্রায়ই অষ্টাদশ মাস গর্ভ ধারণ করে। কেহ কেহ বলেন, "হস্তিনী বিংশতি মাস কয়েক দিন গর্ভ ধারণ করে।" হস্তিনীর ঋতুকালে সচরাচর ১২ দিন শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। এই বার দিনের পর হস্তিসঙ্গমে হস্তিনী গর্ভধারণ করে। সঙ্গম-লিপ্সা-কালে হস্তিনী, ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে; সর্ব্বদাই বারিকণা বা ধূলিকণা আপন অঙ্গে সিঞ্চিত করিতে থাকে; এবং এক মুহূর্ত্ত কালও হস্তি-সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। এই সময় তাহার কাণ ও লেজ খাড়া হইয়া উঠে। হস্তিনী তখন হস্তীর অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করে; মাথাটা দন্তের নিম্নে নামাইয়া রাখে; প্রস্রাব এবং মলের আঘ্রাণ গ্রহণ করে; অন্য হস্তিনী হস্তীর নিকট

সূক্ষ্মকার্য্য যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ভারতে তেমন করে নাই।" Journal of Indian Art Pi 44. কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকের মতভেদ আছে। প্রাচীনকালে ভারতেও যে গজদন্তে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য নির্ম্মিত হইত, তাহার প্রমাণ বৃহৎসংহিতায়ও পাওয়া যায়। শয়ন-শয্যা খট্টাঙ্গের পায়াগুলি নীরেট গজদন্তে নির্ম্মিত হওয়া উচিত বলিয়া, বৃহৎসংহিতায় উল্লিখিত আছে। কোন্ হস্তীর কিরূপ দন্ত ব্যবহার্য্য এবং পরিত্যজ্য,তাহারও বিবৃত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ প্রবন্ধে সে সব কথা বলিবার স্থান হইবে না। গজদন্ত সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল তবে এক কথা বলিয়া রাখি, ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে [illegible]র কার্য্য যত হইত, এখন তাহার চতুর্থাংশও হয় না। তবু [illegible]শিদাবাদ, গয়া, ডুমরাওন, দ্বারভাঙ্গা, উড়িষ্যার করদমহল, বৰ্দ্ধমান, ত্রিপুরা চট্টগ্রাম, ঢাকা ও পাটনা প্রভৃতি স্থানে এখনও গজদন্তের কার্য্য হইয়া থাকে। মুরশিদাবাদের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Art manufactures of India নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে, আমাদের ইংরেজিবিদ্ পাঠক এতৎসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান শিল্প-ক্ষয় সময়ে এসব তত্ত্ব সংগ্রহ করাও কিন্তু উচিত। কেবল তাহাই নহে, এ অধঃপতিত সুকুমার শিল্পের উন্নতি ও উদ্ধার সাধন করা দেশহিতৈষি মাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। নহিলে কালে ইহার চিহ্নও থাকিবে না

* *English Cyclopædia p 507*

আসিলে, তাহা তাহার অসহ্য হইয়া উঠে। যখন হস্তিনীর সঙ্গমে প্রবৃত্তি হয় না, তখন হস্তী বলপূর্ব্বক সঙ্গম-কামনা করিলে, হস্তিনী চীৎকার করিয়া উঠে। অন্যান্য হস্তিনীরা তাহার গর্জ্জন শুনিয়া, তাহার উদ্ধারার্থ তথায় আগমন করে। হস্তিরেতঃ তিন মাস কাল হস্তিনীগর্ভে পড়িয়া থাকে; তখন কোনরূপে তাহা হস্তিনীগর্ভে সঞ্চালিত হইলে, সেই রেতোভাগ পারদের মতন প্রতীয়মান হয়। পঞ্চম মাসে রেতোভাগ জমাট হইয়া বসে; সপ্তম মাসে শক্ত হইয়া উঠে; নবম মাসে পুরুষ্ট হয়; একাদশ মাসে জীবদেহের আভাস দেখা যায়; দ্বাদশ মাসে শিরা, অস্থি, নখ এবং মুখ দেখা দেয়। ত্রয়োদশ মাসে স্ত্রী বা পুং-চিহ্নের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পঞ্চদশ মাসে, গর্ভস্থ জীব, সময়ে সময়ে গর্ভে ইতস্তত করিয়া বেড়ায়। ষোড়শ মাসে সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণ পরিণতি লক্ষিত হয়। সপ্তদশ মাসে গর্ভস্থ জীব-সঞ্চারে অকাল প্রসবের সম্ভাবনা। অষ্টাদশ মাসে হস্তিশিশু জন্ম গ্রহণ করে। হস্তিনী যদি সঙ্গমান্তে বলহীন না হয়, তাহা হইলে হস্তি প্রসবের লক্ষণ বুঝিতে হইবে; নতুবা হস্তিনী।*

কেহ কেহ বলেন, প্রথম মাসেই রেতোভাগ কঠিন হইয়া আসে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ এবং জিহ্বা দ্বিতীয় মাসে গঠিত হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব হয়; চতুর্থ মাসে দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, কঠিন হইয়া উঠে; পঞ্চম মাসে জীব-সঞ্চার হয়; ষষ্ঠ মাসে বোধোদয়; সপ্তম মাসে বোধোদয়ের পূর্ণ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; অষ্টম মাসে গর্ভ-স্রাবের সম্ভাবনা; নবম, দশম এবং একাদশ মাসে গর্ভস্থ জীব পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া, দ্বাদশ মাসে প্রসূত হইয়া থাকে। যদি হস্তীর রেতোভাগের পরিমাণ অধিক হয়, তাহা হইলে পুং-শাবক প্রসূত হয়। হস্তিনীর রেতোভাগ অধিক হইলেই, স্ত্রী-শাবক হইয়া থাকে। উভয়েরই সমভাগ হইলেই, ক্লীব হয়। পুং-শিশু গর্ভের দক্ষিণদিকে, স্ত্রী-শিশু বামদিকে এবং ক্লীব মধ্যভাগে অবস্থিতি করে। হস্তিনী একটী শিশুই প্রসব করে, কখনও কখনও দুইটীও প্রসব করে।*

হস্তিনীর দুগ্ধের গুণ।

মধুর, বৃষ্য, গুরু, কষায়, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকারী শীতল দৃষ্টিবর্দ্ধক এবং বলবৃদ্ধিকর।

দধি-গুণ।

কষায়, লঘু, উষ্ণ, পাকশূলনাশক, রুচিকর, দীপ্তিপ্রদ, কফরোগনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং উত্তম বলপ্রদ।

নবনীত-গুণ।

কষায়, শীতল, লঘু, তিক্ত, বিষ্টম্ভীরক্ত-পিত্ত, কফ ও ক্রিমিনাশক।

ঘৃত-গুণ।

কফ-পিত্ত-বিষ-কৃমিনাশক, কষায়, বিষ্টম্ভী, তিক্ত এবং অগ্নিকর।

হস্তিশাবক।

হস্তি-শিশু স্তনপান করে; কিন্তু শুঁড় দিয়া নহে। হস্তী শুঁড় দিয়াই আহারাদি করিয়া থাকে। হস্তীর শুঁড়ই হস্তীর নাসিকা। শুঁড় আ-পৃথিবী লম্বমান। হস্তীর দেহটী যেমন প্রকাণ্ড, স্কন্ধটীকে তদনুপাতে অতি ক্ষুদ্র বলিতে হইবে। মাথাটী নাড়িবার চাড়িবার যো নাই, যা কিছু কার্য্য শুঁড়ের দ্বারাই করিতে হয়। শুঁড়ের কিন্তু অসীম শক্তি। শুঁড়টী কেবল ভোজনের জন্য নহে; শত্রুশাসনে, মনুষ্য-মন্থনে, রণে, বনে, ভ্রমণে, বিচরণে, সর্ব্বত্রই এই শক্তিশালী শুঁড়ই প্রধান সহায়। "বলিহারি প্রভো রচনা তোমারি।" কি অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল! হস্তী উর্দ্ধে, নিম্নে, পার্শ্বে, পশ্চাতে সর্ব্বদিকেই শুঁড় সঞ্চালন করিতে সক্ষম; কি অপূর্ব্ব কৌশলেই হস্তী,—তৃণ, পল্লব প্রভৃতি আহারীয় সংগ্রহ করিয়া মুখের ভিতর শুঁড়ের দ্বারা প্রবেশ করিয়া দেয়। শুঁড়ের আকুঞ্চন-প্রসারণে বিধাতার অপূর্ব্ব রচনা-সৃষ্টির প্রভূত পরিচয়। স্থানান্তরে সে সকল প্রণালীর কতক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। হস্তী শুণ্ড দ্বারা জলসেবন করিয়া পাকস্থলীতে

---

* সম্রাট জাহাঙ্গীর হস্তিশাবকের প্রসব স্বচক্ষে দেখিয়া ঠিক করেন, হস্তিনী ১৬ মাসে এবং হস্তী [illegible]মাসে জন্ম গ্রহণ করে। হস্তিশাবকের পা সর্ব্বাগ্রে নির্গত হয়। হস্তী জন্মগ্রহণ করিলে পর, হস্তিনী তাহারে কর্দ্দমে এবং ধূলায় আবৃত করিয়া, গাত্র লেহন করিতে থাকে। ঐরূপ করিতে করিতে হস্তিশিশু ক্রমে স্তনপান করিতে চেষ্টা করে।

L. Johnstone's remarks in the Proceedings of the Asiatic society of Bengal for May 1868.

**Blockman's Translatieon of Ain-Akbari.*

হস্তিশিশুর স্তনপান।

নক্ষেপ করে; আবার ইচ্ছা করিলেই সেই জল পাকস্থলী হইতে বাহির করিয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিয়া থাকে। সে জলে কোনরূপ দুর্গন্ধ নাই। হস্তী শুণ্ডের দ্বারাই দুদিন পরে উদর হইতে ভুক্ত তৃণাদি বাহির করিয়া ফেলে। সে তৃণাদির কোন রূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এই শক্তিশালী এবং কার্য্যকারী শুণ্ড লইয়া হস্তিশাবক জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু শুণ্ড দ্বারা স্তনপান করে না। এও এক বিচিত্র ব্যাপার! হস্তিশাবক অধরোষ্ঠ-প্রান্ত দিয়া স্তন্যপান করে। পাঠক! নিম্নে তাহার চিত্র দেখুন। হস্তিশাবক দুগ্ধপানের সময়, শুণ্ডের দ্বারা স্তন চাপিয়া রাখে; ইহাতে সহজেই স্তন্যদুগ্ধ নিঃসৃত হয়। হস্তিনী শাবককে দুগ্ধ দিবার জন্য কখন শয়ন করে না; কিন্তু হস্তিনী একটু অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইলেই, শাবকের দুগ্ধপান করিতে একটু কষ্ট হয়। সেই অবস্থায়, হস্তিনীকে কখন কখন অবনমিত হইতে হয়। এই সময় কখন কখন দুগ্ধপান করিবার জন্য হস্তি শিশুকে শুণ্ডের ব্যবহার করিতেও হইয়া থাকে। গৃহস্থের আশ্রয়ে দেখা যায় যে,যেখানে হস্তিনী আবদ্ধ থাকে সেইখানে হস্তিরক্ষক ৬।৭ 'ইঞ্চি' উচ্চ একটী মৃত্তিকার মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দেয়। হস্তিশিশু তাহার উপর দাঁড়াইয়া, স্তনপান করে। বদ্ধাবস্থায় হস্তিনী ত অবনমিত হইয়া স্তন দিতে পারে না। হস্তিশিশু পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধপান করে; ইহার পর তৃণ-পল্লব আহার করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় হস্তিশিশু "বাল" নামে অভিহিত হয়। দশমে বৎসরে "পুট," বিংশতি বৎসরে "বিক্কা," এবং ত্রিশ বৎরে "কালবা" নাম প্রাপ্ত হয়। এমনও দেখা যায়, হস্তিশিশু জন্মগ্রহণ করিলে পর,হস্তিনীরা শুণ্ডদ্বারা তাহাকে তুলিয়া, তিন চারি দিন হয়, পৃষ্ঠের উপর, না হয়, দন্তের উপর রাখিয়া দেয়। হস্তিশাবকের তিন বৎসর বয়সে, দন্ত বহির্গত হয়। হস্তিনী গর্ভাবস্থায় পীড়িত হইলে, অথবা হস্তিনার গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, হস্তীরা তাহাদিগকে ঔষধ সেবন করায়। এই সময় হস্তিযূথ হস্তিনীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যদি কখন হস্তি-শাবক ধৃত হয়, তাহা হইলে, হস্তিদল তখন কোন ঝোঁপের ভিতর লুক্কায়িত রহে; তাহার পর যে স্থানে হস্তিশাবক থাকে, তাহার সন্ধান করিয়া, তাহারা তথায় চুপিচুপি উপস্থিত হইয়া, হস্তিশিশুকে উদ্ধার করে এবং শিকারীকে মারিয়া ফেলে। কখনও কখনও বা হস্তিনী একাকিনী গমন করিয়া নানা কৌশলে হস্তিশিশুকে তুলিয়া লইয়া আসে। আবুল ফজেল লিখিয়াছেন—"এক দিন একটা গর্ত্তের ভিতর একটী হস্তিশাবক পড়িয়া যায়। রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় আমরা সেই হস্তিশিশুটীকে গর্ত্ত হইতে তুলিতে পারিলাম না। তাহার পরদিন প্রাতঃ

কালে গিয়া দেখি, গর্ত্তটী বড় বড় কাঠ এবং ঘাসে পূর্ণ। বন্য হস্তীরা এইরূপে গর্ত্তে কাঠ ও ঘাস ফেলিয়া, হস্তি-শাবককে টানিয়া তুলিয়াছিল।

বয়ঃস্থ হস্তী।

সাধারণতঃ ৬০ বৎসর বয়সে হস্তী পূর্ণাবয়বসম্পন্ন হয়। সচরাচর হস্তিনী ৩০ বৎসর বয়সে পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠে। একটী গোলা দ্বিখণ্ডিত হইলে, যেমন দেখা যায়, পূর্ণাবয়বে হস্তীর মস্তিষ্কটী সেইরূপ দেখায়। কাণ দুইটী কুলার মতন হয়। শুণ্ড, দন্ত, লিঙ্গ এবং লাঙ্গুল ভূমিস্পর্শী হইয়া থাকে। সমুদয় পদতল মাটীর সহিত লিপ্ত ভাবে পতিত হয়। কোর্স সাহেব বলেন,—"পূর্ণাবয়বে হস্তীর কর্ণ বৃহৎ এবং মণ্ডলাকার হয়। চক্ষু দুইটী ঈষৎ পাংশুল বর্ণের হইয়া থাকে; কোন প্রকার দাগ থাকে না। শুঁড়ের উপরিভাগে এবং জিহ্বায় বড় দাগ থাকে না। শুঁড় বৃহৎ এবং লাঙ্গুলের কেশগুলি প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে। সম্মুখের পায়ের প্রত্যেকে ৫টী করিয়া এবং পশ্চাতের পায়ের প্রতেকে ৪টী করিয়া মোট ১৮টী নখ থাকে। মস্তকটী সুপ্রতিষ্টিত এবং উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। স্কন্ধদেশ হইতে পৃষ্ঠের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, পরে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকল সুদৃঢ় এবং কঠিন হইয়া থাকে।"

হস্তী ধরিবার কৌশল।

বনের হাতী বনেই বিচরণ করে, বনেই তাহার বিপুল বিক্রম। সেই বিপুল-বিক্রম, শৈল-শৃঙ্গবৎ বিশালদেহ হস্তীর শুঁড় ও দন্তাঘাতে প্রতিনিয়তই কত বৃহৎ বৃহৎবৃক্ষ উন্মূলিত, এবং কত সিংহ গণ্ডার ভীষণ জন্তু ব্যাপাদিত হয়। সে শক্তিশালী শুণ্ডের ক্ষয় হয় না; দুরন্ত দন্ত শত বৎসরেও ভগ্ন হয় না। শুণ্ডেরত ক্ষয় নাই; দন্ত একবার উন্মূলিত হইলে, পুনরায় উত্থিত হয়। এ হেন শক্তিশালী দুৰ্দ্ধর্ষ জীব ক্ষুদ্রকায় মনুষ্যের বশীভূত হইয়া কুক্কুর-বিড়ালবৎ, ধীর-স্থির, প্রশান্ত মূর্ত্তিতে মনুষ্যের সেবায় নিযুক্ত হয়। মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তির নিকট পাশব-শক্তির ঘোরতর পরাজয়। বন্যহস্তী ধরা ও বশে আনা, বড় সহজ ব্যাপার নহে। এ ব্যাপার বহু-ব্যয়সাপেক্ষ, আয়াসসাধ্য এবং বিপজ্জনক।

* কখন কখন হস্তী ধরিবার জন্য গর্ত্ত খুড়িয়া রাখা হয়। কোন ক্রমে সেই গর্ত্তে হস্তী পতিত হইলে ধৃত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই হস্তী ধরিবার নানা কৌশল প্রচারিত আছে। আইন-আকবরীর মতে, হস্তী ধরিবার চারিটী রীতি প্রচলিত আছে।

ভারতের হস্তী ধরা।

(১) খেদা। শিকারীদের কতক অশ্ব-পৃষ্ঠে এবং কতক পদব্রজে বনের মধ্যে প্রবেশ করে। গ্রীষ্মকালই হস্তি ধরিবার উপযুক্ত সময়। যে স্থানে হস্তী বিচরণ করে, সেই স্থানে শিকারীরা উপস্থিত হইয়া, ঢোল এবং ভেঁপু বাজাইতে থাকে। ঢোল ও ভেঁপুর শব্দে, হস্তিযূথ ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়। এই রূপ দৌড়াদৌড়ি করিয়া, শরীরের ভারে ক্রমে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে; তৎপরে নিকটস্থ বৃক্ষের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন পাকা শিকারীরা বৃক্ষছাল বা পাটের তৈয়ারি দড়ি হস্তির গলায় বা পায়ে বাঁধিয়া দেয়। পরে পালিত ও শিক্ষিত হস্তী দ্বারা সেই সমস্ত বন্যহস্তী প্রলোভিত হইয়া ক্রমে মনুষ্যের বশীভূত হয়। একটা হাতীর যত দাম, শীকারীরা তাহার সিকি পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়।

চোরখেদা। যেখানে বন্য হস্তিযূথ বিচরণ করে, শীকারীরা সেখানে একটী পোষা হস্তিনী লইয়া যায়। মাহুত সেই হস্তিনীর পৃষ্ঠে নীরবে মৃতবৎ শয়ন করিয়া থাকে। হস্তিনীর পৃষ্ঠে যে কোন মানুষ আছে, তাহা জানিবার যো নাই। হস্তীরা হস্তিনীকে দেখিয়া, আপনা আপনি লড়াই করিতে থাকে। ইত্যবসরে, মাহুত, হস্তীর পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দেয়। শ্যামদেশে এই প্রথায় হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

গাদ। যেখানে হস্তিযূথ সচরাচর বিচরণ করে, সেই স্থানে একটী গর্ত্ত খুড়িয়া রাখা হয়। এই গর্ত্ত ঘাসে পরিপূর্ণ থাকে। শীকারীরা অদূরে ঝোঁপের মধ্যে লুকাইয়া রহে। হস্তীর দল সেই গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইলে, শিকারীরা ঝোঁপের মধ্য হইতে শব্দ করিতে আরম্ভ করে। হস্তিগণ তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, অসাবধানে দৌড়া-দৌড়ি করিয়া বেড়ায়, ক্রমে একটা না একটা সেই গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া যায় এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। গর্ত্তের ভিতর যিনি পড়িলেন, তিনিই গেলেন। তাহাকে জল বা

হস্তি ধরবার প্রথা।
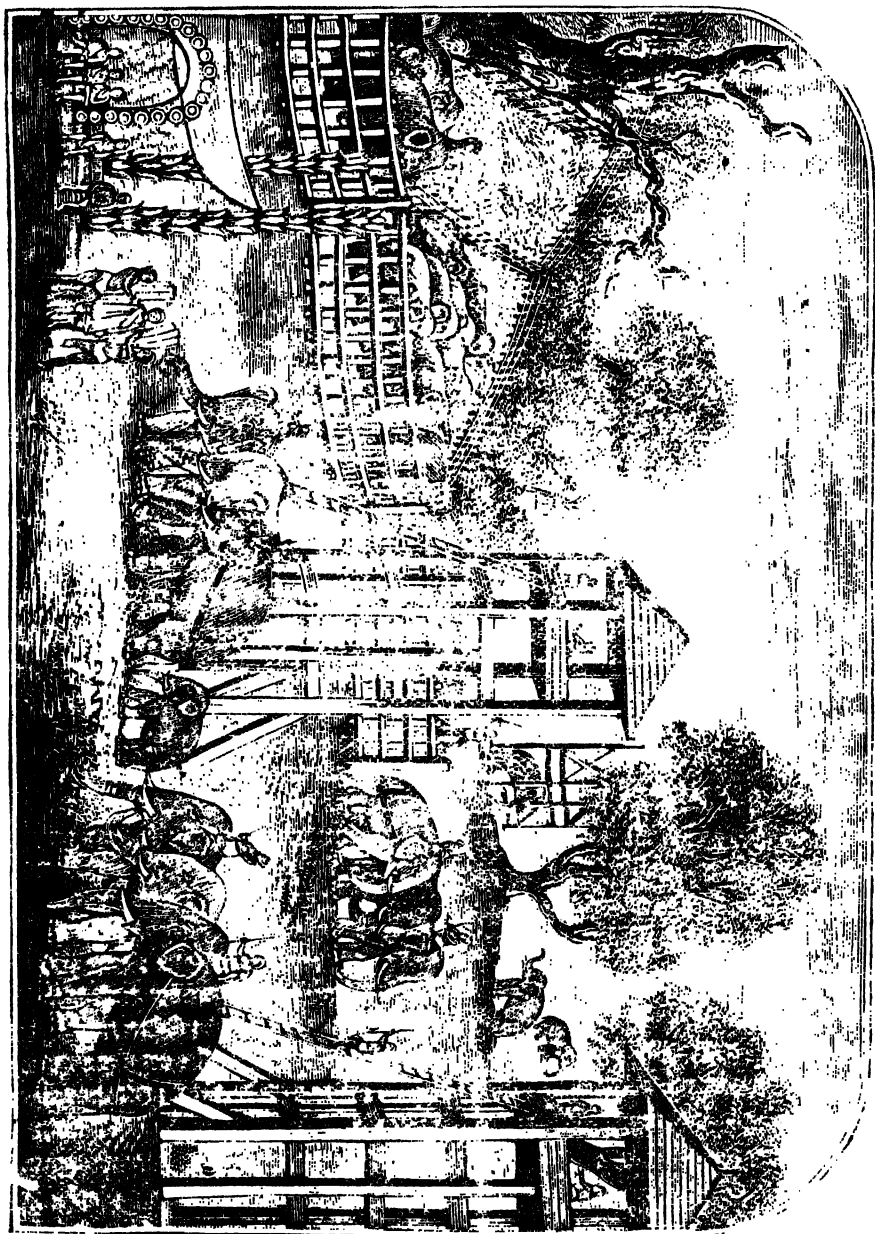
কোন রকম খাদ্য দেওয়া হয় না; কাজেই ক্রমে সে বশে আসে।

ঘার। যে স্থানে হস্তীর দল বিশ্রাম করে, সেই খানে শীকারীরা একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন করে। সেই গর্ত্তের এক দিকে একটা পথ থাকে, পথের মুখেই একটী দরজা বসাইতে হয়। দরজা দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। দড়িটী কাটিয়া দিলেই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। দরজার নিকট হস্তীর খাদ্যও নানাবিধ থাকে। হস্তিযূথ সেই সকল খাদ্য খাইতে আরম্ভ করে, ক্রমে খাদ্যের লোভে বে-সামাল হইয়া দরজার ভিতর প্রবেশ করে। শিকারীরা তখনই দড়ি কাটিয়া দেয়। অমনই দরজা বন্ধ হইয়া যায়। হস্তিযূথ তখন বিকট চিৎকারে দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টায় থাকে। শীকারীরাও তখন আগুন জ্বালিয়া বাদ্য-বাজনা করে। হস্তীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। ক্রমে তাহারা দৌড়া-দৌড়ি করিয়া, ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেই সময় হস্তিনী আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিক্ষিত হস্তিনীর মোহন ফাঁদে পড়িয়া, হস্তিযূথ আপন অবস্থা ভুলিয়া যায়। সেই সুযোগে শিকারীরা, তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ক্রমেই সেই মত্ত মাতঙ্গ, মানুষের করায়ত্ত ও বশীভূত হয়।

মোগলসম্রাট আকবরের পূর্ব্বে এই চারি প্রথার যে কোন প্রথায় হস্তী ধৃত হইত। আকবর একটী কৌশল উদ্ভাবিত করেন। সেই কৌশল এই;—বন্য হস্তিযূথের তিন দিকে হস্তিচালকগণ ঘেরিয়া রহিত; একদিক খোলা থাকিত। এই দিকে বহু সংখ্যক হস্তিনী রাখিয়া দেওয়া হইত। চারিদিক হইতে, বন্য হস্তী সকল আসিয়া, হস্তিনীদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। হস্তিনীরা তখন একটী রক্ষিত স্থানে যাইত; হস্তীরাও তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইত। তাহার পর তাহারা উপরোক্ত উপায়ে ধৃত হইত।*

এখনও হস্তী ধরিবার নানা কৌশল প্রচলিত আছে।

ভারতের নানা স্থানে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। এখন কিন্তু আর পূর্ব্বের মতন হস্তী পাওয়া যায় না। ১৮৬৮ সালে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হস্তিনী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এ কার্য্যে নেপাল-গবর্ণমেণ্টের অনেক আয় হয়। সিংহলে এখনও অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। আসামেও হস্তী ধৃত হয়। সিংহলের হস্তীরা বড় দুর্দ্ধর্ষ। তাহারা সময়ে সময়ে কর্ষিত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ক্ষেত্রের সমগ্র ফসলাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য সিংহল গবর্ণমেণ্ট হাতী মারিবার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটী লাঙ্গুল আনিলেই চারি টাকা পুরস্কার। একবার ছয়শত হস্তী মারিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে হাজার টাকা পুরস্কার দিতে হইয়াছিল। শিকারীরা হস্তীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া গুলি করে। গুলি কপাল ভেদ করিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে মৃত্যু নিশ্চিত। এতদ্ব্যতীত কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে গুলি করিতে হয়। সিংহলে হস্তী ধরিবার কৌশল চমৎকার। তাহার চিত্র এবং তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

সিংহলদ্বীপের হস্তী ধরিবার কৌশল।

সিংহলের হস্তী বিশাল ক্ষেত্রের মধ্যগত হইলে, ১০।১৫ ক্রোশ স্থান মণ্ডলাকারে ব্যাপিয়া, তাহার চারিদিকে আলো জ্বালিতে হয়। আলোকে সতত প্রজ্বলিত থাকে। এই আলোক দূরস্থ হওয়া উচিত নহে। ইহার মধ্যে সহস্র সহস্র লোক রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ২॥০ হাত উর্দ্ধ বংশাদি-স্তম্ভের উপর ঐ আলোক থাকিবে। স্তম্ভগুলি ১২ হস্তের অধিক দূরস্থ হইবে না। ক্রমে ক্রমে সেই স্তম্ভ অগ্রে অগ্রে সরাইয়া আনিতে হয়। সেই স্তম্ভের উপর কিঞ্চিৎ কর্দ্দম দিয়া তদুপরি পত্রাদি দগ্ধ রাখিতে হয়। আলোকের উপর নারিকেল পাতায় আচ্ছাদন থাকে। বৃষ্টি পড়িলে আলো সহজে নিবে না। আলো যত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, হাতীরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। চিত্রের বামভাগে যে বেড়া অঙ্কিত রহিয়াছে, ঐ সেই মণ্ডলাকার স্থান। যখন হস্তিগণ মণ্ডলাকার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই

* পূর্ব্বে মোগল-সম্রাটেরা স্বচক্ষে হস্তি-শীকার দেখিয়া কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শীকার দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। বহুসংখ্যক লোকে জঙ্গল ঘেরিয়া থাকিত। বাহিরে একটী শূন্য স্থানে, বৃক্ষের উপর একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহাসন স্থাপিত হইত। এই সিংহাসনে সম্রাট বসিতেন। নিকটস্থ বৃক্ষের উপর, বড় বড় বাহাদুরি কাঠ পাতিয়া অমাত্য ও অনুচরবর্গ উপবেশন করিতেন। পরে বহুসংখ্যক পালিত হস্তী ও হস্তিনীর উপর বসিয়া মাহুতেরা বন্য হস্তীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া আসিত। সম্রাট স্বচক্ষে এই সব দেখিতেন।

মণ্ডলের এক দিকে, শিকারীরা অতি স্থূল কাষ্ঠের বেড়া দিয়া, "ফন্দিয়ালের" মত, এক অপ্রশস্ত স্থান প্রস্তুত করে যে সে পথ দিয়া,একটী হাতী অতি কষ্টে বিনির্গত হইতে পারে। তখন হস্তি-যূথের চারি দিকে আলো জালিয়া রাখিতে হয়। সেই মণ্ডলাকার স্থানের চতুর্দ্দিকে মোটা কাষ্ঠের বেড়া দিয়া লতায় পাতায় ঢাকিয়া রাখিতে হয়। হস্তী মনে করে, এ সব বন; সুতরাং তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে না; করিলেও সহজে ভাঙ্গিতে পারে না। হস্তীরা যে মণ্ডপে অবরুদ্ধ হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধ তাহারই সংলগ্ন আর একটী ক্ষুদ্র অল্পায়তন মণ্ডল প্রস্তুত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য ৬০ হস্ত এবং প্রস্থ ১৩ হস্তের অধিক হয় না, তাহার মধ্যে প্রায় তিন হাত গভীর একটা খাত কাটা থাকে। হস্তিযূথ অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া, বৃহৎ মণ্ডল হইতে সেই পথ দিয়া, একে একে ঐ ক্ষুদ্র মণ্ডপে প্রবেশ করে। যখন সকল হস্তী এই মণ্ডপে আসিয়া পড়ে, তখন আর তাহাদের নড়িবার শক্তি থাকে না। এই মণ্ডপের সুদৃঢ় দ্বার বন্ধ থাকে। যাহারা আলো দেয়—তাহারা তখন পলায়ন করে, নহিলে তাহারা হস্তী দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। হস্তীরা যখন ভয়ে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়, তখন মণ্ডপ-পার্শ্বে যাইয়া 'ফন্দিয়ালের' ন্যায় সঙ্কীর্ণ পথের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়, হস্তীরা তন্মধ্যে প্রবেশ করে। কেহ পলাইবার চেষ্টা করিলে, শিকারীরা বরছী দ্বারা তাহার মুখে আঘাত করে, সুতরাং তার ভয়ে পলাইতে পারে না। ঐ সময় শিকারারা তাহাদের পায়ে বন্ধন করে। এই সময় বেড়ার পার্শ্বে দুইটী পোষা হাতী বাঁধা থাকে। শিকারীরা ঐ অবরুদ্ধ হস্তীর গলার রজ্জু ঐ গৃহপালিত হস্তিদ্বয়ের দেহে বাঁধিয়া দেয়; এবং তৎপরে বেড়ার দ্বার খুলিয়া ফেলে। অবরুদ্ধ হস্তী তখন গৃহপালিত হস্তীর সহিত গিয়া মিশে, কিন্তু পলাইতে পারে না; কেন না তাহার পশ্চাতের পায়ে দড়ি বাঁধা থাকে। ক্রমে শিকারী গৃহপালিত হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া, হস্তিত্রয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে।

বন্যহস্তী বদ্ধ হইলে পর শিকারীরা তাহাকে সন্নিকটবর্ত্তী দুই স্থূল বৃক্ষের মধ্যগত স্থানে আনিয়া, তাহাকে ঐ বৃক্ষদ্বয়ে অতি দৃঢ় করিয়া বন্ধন করে। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ সুপ্রাপ্য না হইলে, অতি স্থূল কাষ্ঠের এক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তলে বন্য হস্তীকে বদ্ধ করে এবং আপনারা মঞ্চোপরি অবস্থিতি করে; ও হস্তীর ভোজ্যার্থে নারিকেল-পত্র, নবীন কদলী-বৃক্ষ ও জল তাহার সম্মুখে স্থাপন করে। কিন্তু গৃহপালিত হস্তীরা বন্যহস্তীর নিকট হইতে দূরে গমন করিলেই বন্যহস্তী উন্মত্ত হইয়া পত্র বৃক্ষাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিতে থাকে; এবং সাধ্যানুসারে স্বাধীনতা পাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুই তিন দিবস গত হইলে পর, তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অবশেষে পান-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়; ও শিকারীরা গৃহপালিত হস্তীর সাহায্যে তাহাদিগকে ক্রমশঃ এক বা দুই মাস কালে বশাভূত ও সুশিক্ষিত করে। কোন কোন হস্তী অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়; সে কোন ক্রমে বশীভূত হয় না; অনাহারে বন্ধনমুক্তির বিফল চেষ্টায় অবশেষে প্রাণত্যাগ করে; হস্তী অপেক্ষা হস্তিনীরা এ প্রকারে অধিক নষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম বন্ধনাবস্থায় হস্তীরা যে চীৎকার করে তাহাতে ক্রমে ক্রমে ক্রোধ,গর্জ্জন খেদ, দুঃখ, ও নিরাশের লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীত হয়, এবং অবশেষে তাহাদিগের নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়া থাকে।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হস্তী ধরিবার যে সকল কৌশল সম্প্রতি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য। বৎসর বৎসর বহু লক্ষ টাকা এই কার্য্যে ব্যয়িত হয়। সে সমুদয় কথা বিস্তৃতভাবে লিখিতে হইলে, এক খানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। পরিশেষে আমরা সকলকে একবার 'খেঁদা' দেখিতে অনুরোধ করি;—দুর্গম গিরিগুহায়, ভীষণ অরণ্যে কঠোর পার্ব্বত্য প্রদেশে সেই অদ্ভুত লীলা অবলোকন করিলে, সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়।

এইবার এই পর্য্যন্ত। অবশিষ্ট এখনও অনেক, আগামীবারে প্রকাশ্য।

রাজপৌত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর।

'Oh ! Fairest flower, no sooner blown but balsted." Milton.

অহো! বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্ন-তপন আজ অস্তমিত! প্রিয় "প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর" আজ লোকান্তরিত! লোকান্তরিত,—ঐ জ্যোতিষ্মান যৌবনের প্রস্ফুটিত প্রারম্ভে! বুক ফাটিয়া যায় রে! এ যে সুদারুণ অকাল মৃত্যু! শোক সহিব কিসে?

কি কুক্ষণেই ৩০ শে পৌষের নিশি পোহাইয়াছিল। ১লা মাঘ পূর্ব্বাহ্নেই, ভারতের ভাবী রাজ-রাজেশ্বর, "ডিউক্ অব্ ক্লেয়ারেন্স,"—আমাদের সেই সু-পরিচিত, "প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর" ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ২৭ শে পৌষের পূর্ব্বে তাঁহার কোন পীড়ার সংবাদ ভারতে আসে নাই। ২৭শে সংবাদ পাইলাম, তিনি "ইনফ্লুয়েঞ্জায়" আক্রান্ত হইয়াছেন। পরে সংবাদ পাইলাম, "ইনফ্লুয়েঞ্জার" সঙ্গে সঙ্গে "নিউমোনিয়া" বা দারুণ ফুস্ ফুস্ প্রদাহ রোগ উপস্থিত হইয়াছে। ৩০ শে সংবাদ আসিল,—ভয়ানক জ্বর-বিকার,—অবস্থা সঙ্কটাপন্ন,—তাপ ১০৭ ডিগ্রি। পর দিন বড়লাট বাহাদুর লর্ড ল্যান্সডাউন সংবাদ পাইলেন,—"প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর" আর ইহলোকে নাই।" সেই দিন অপরাহ্নে টাউনহলে লেডী ডফরীণের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইবে বলিয়া মহা-সমিতি হইয়াছিল। বড়লাট বাহাদুরেরও উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সভাস্থ সকলে এ দুঃসংবাদ পাইলেন। উৎসব বন্ধ হইল। এ দুঃসহ-দুঃসংবাদ লইয়া আজ পাঠকবর্গের সম্মুখে আমাদিগকেও উপস্থিত হইতে হইল। অহো! কি দুরদৃষ্ট!

বিধি হে! জানিনা,—কোন্ মহাপাপে এ মনস্তাপ পাইলাম! রাজপৌত্রের অকাল মৃত্যু যে অসহ্য! মানুষ সময়ে মরিলে, তবুও শোক সান্ত্বনার অনেকটা সম্ভাবনা থাকে। এ শোকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব বল? এ শোকে য়ুরোপ, এসিয়া এফ্রিকা, এমেরিকা,—সম্পূর্ণ ভূগোলের সমগ্র-ভূভাগ যে বিদীর্ণ; বিদ্যা-সাগর সময়ে মরিয়াছেন, রাজেন্দ্রলালও সময়ে মরিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের শোক সহিয়াছি,—রাজেন্দ্রলালের শোকও সহিয়াছি। রাজপৌত্রের শোক সহিব কেমনে! এ অকাল-মৃত্যুতে যে অনেক কথা মনে আসে। এক একটী কথা মনে আসে, আর হৃদয়পঞ্জরের এক একখানি অস্থি খসিয়া পড়ে!

এক দিকে সেই দ্বিসপ্ততি-বর্ষীয়া বৃদ্ধা পিতামহী প্রাণের পুতলী প্রিয়পৌত্রের অকাল-মৃত্যুতে মুহ্য-মান; আর এক দিকে পুত্রগত-প্রাণ পিতা এবং পুত্র-বৎসলা মাতা শোকে দুঃখে মৃতকল্প! আবার এক দিকে স্নেহাস্পদ প্রাণ-প্রতিম ভাই-ভগিনী; অপর দিকে পূজনীয় পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী বিষাদ-আর্ত্তনাদে অবসন্ন! এ সব কি প্রাণে সয় রে! সে শোকাবসাদের চিত্র কে অঙ্কিত করিতে পারে?

দারুণ শোকানল যে দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠে;—বারেক ভাবিলে, সেই সরোজ-সুন্দরী সরলা টেকনেয়ার কথা! ভাব দেখি, সেই রাজপৌত্রগত-প্রাণা সরলার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! তিনি যে মনঃ-প্রাণ—সর্ব্বস্ব ভাবী জীবন-সঙ্গী রাজপৌত্রে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কোথায় ভাবী সম্রাট-স্বামীর জীবন সঙ্গিনী; আর কোথায় আজ

বিয়োগ-বিধুরা অভাগিনী অনাথিনী! আর কয়েক দিন পরে যে চির-পোষিত আশা-লতা অঙ্কুরিত হইবে ভাবিয়া, তিনি বুক বাঁধিয়া ছিলেন,—কালের কঠোর কুঠারে আজ তাহা নির্ম্মূলিত! মরি! মরি! শোকের দারুণ শক্তিশেলে যে বুক বিদীর্ণ হইল। মর্ম্ম যাতনার অনন্ত উত্তাপে যে প্রাণ পুড়িয়া গেল! অভাগিনী বাঁচিবে কিসে! কে না জানিত, এই ফেব্রুয়ারি মাসে, শুভ পরিণয়ে, নব-দম্পতীর শুভসম্মিলন হইত! কে না আশা করিয়াছিল, সমগ্র ব্রিটিশজাতি এ পরিণয় প্রস্তাবে পুলকিত হইয়া কায়মনোবাক্যে দম্পতীর মঙ্গল কামনা করিতেন?

সুখের প্রস্তাবে সুখের সাগর উথলিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু সে প্রস্তাব কি শোকাবহ পরিণামে পর্য্যবসিত হইল! আজ যে সমগ্র ব্রিটিশ রাজ্য ঘন-ঘোর তিমির-বসনে আবৃত! বিপুল বৈজয়ন্তী ধাম ইংলণ্ডের রাজপুরী শূন্য শ্মশান-ক্ষেত্র! প্রেম পরিণয়ের সে পবিত্র প্রস্তাব, প্রেত-পত্তন সমাধি-শয্যার অন্তর্ভুক্ত! কোথায় পবিত্র পরিণয় সজ্জা;—আর কোথায় শোকাবহ সমাধি-সজ্জা! এমন বিধির-বিড়ম্বনা কি ইংলণ্ডের রাজ-সংসারে আর কখন হইয়াছিল! জানি না, আর কখনও কোথাও এমন হইয়াছে কি না?

শোকানল যে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, মনে করিলে, সেই মুখখানি! সেই মুখখানি,—যে মুখখানি প্রথমে দেখিয়াই, হৃদয়পটে প্রস্তরাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি। এখনও মনে হয়, সেই ১২৯৬ সালের ২০শে পৌষের সেই অপরাহ্ণ-অরুণের কনক-কিরণোদ্ভাসিত সমুজ্জ্বল দৃশ্য,—যেন চক্ষের উপর জাজ্জ্বল্যমান। এই দিনই রাজপৌত্র ভারত ভ্রমণে আসিয়া, প্রথমে কলিকাতার প্রিন্সেপঘাটে পদার্পণ করেন। এই দিনই সে সুন্দর মুখখানি হৃদয়মাঝে অঙ্কিত করিয়া রাখি। মনে পড়ে, সেই মুখখানি; আর মনে পড়ে, কেবল সেই শান্তিময়ী স্থির-স্নিগ্ধোজ্জ্বল মোহিনী মূর্ত্তিখানি,—যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম,—২৪শে পৌষের চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে, ময়দানের সেই মহোৎসবে। মরি! মরি! সে কি মাধুরি রে! সে মাধুরি উদ্ভাসিত ও উচ্ছ্বাসিত হইয়াছিল, স্ফাটিক আধারে দীপ-মালার বিমল-বিভায়; আর প্রফুল্ল চন্দ্রমায় পুলকিত জ্যোৎস্নায়।

পাঠক! ঐ সেই মোহিনী মূর্ত্তি,—প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রকটিত। একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও। আর যাঁহার জীবনময়ী প্রতিমূর্ত্তি, ইহলোকে মুহূর্ত্তমাত্র দেখিবার প্রত্যাশা নাই, তাঁহার ঐ প্রতিকৃতি দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক কর।

আজি এ শোকব্যসনে, ঐ মূর্ত্তি দেখিলে, শোক উথলিয়া উঠে বটে; কিন্তু উহার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিলে, মনে হয় না, রাজপৌত্র মরিয়াছেন;—মনে হয় না,—ভূ-গর্ভের অন্ধকারে মুখখানি মলিনীকৃত;—মনে হয় না, ঐ সৌন্দর্য্য-রাজি, সমাধির গর্ভস্থ, মানব-জগতের অদৃশ্য,—কৃমি-কীটময় শয্যায় শায়িত। এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের এমন পরিণাম হইতে পারে না! যখনই ঐ মুখখানি মনে পড়িবে, তখনই সেই ইংলণ্ডীয় কবিকুল-চূড়ামণি মিলটনের মতন আমরাও বলিতে পারিব,—

"Yet can I not persuade me thou art dead,
Or that thy corse corrupts in earth's dark womb
Or that thy beauties lie in wormy bed
Hid from the world in a low delved tomb;
Could Heaven for pity thee so strictly doom,
Oh no! for something in thy face did shine.
Above mortality, that show'd thou wast divine."

সাহিত্য-সেবকের কর্ত্তব্যানুরোধে এইখানে রাজপৌত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল। ১২৭০ সালের ২৫শে পৌষ ইঁহার জন্ম হয়। প্রথমে ইনি ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ কলেজে বিদ্যা লাভ করেন; পরে জর্ম্মাণীর হীডলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ইনি দুই বৎসর নৌ-সেনার শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। ১২৮৬ সালে ইনি "বেকাণ্ট" নামক জাহাজে করিয়া, অনুজ জর্জ্জের সহিত পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১২৮৯ সালে প্রত্যাবর্ত্তণ করিয়া, ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য সমরবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১২৯০ সালে মহারাণী ইঁহাকে "গার্টার" উপাধি দান

করেন। ১২৯৫ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ইনি ডি,এল, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে পিতা প্রিন্স অব ওয়েলসের নিকট ইনি রাজনীতি শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইনি ১২৯৬ সালের ২৪শে কার্ত্তিক বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। পরে ভারতের প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিয়া সর্ব্বত্রই যথা-যোগ্য অভ্যর্থিত হইয়া, ১৬ই চৈত্র ভারত পরিত্যাগ করেন। ভারতে আসিবার পূর্ব্বে টেক-তনয়ার প্রতি ইহাঁর অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, প্রত্যাগমনে সেই অনুরাগ প্রগাঢ় হইয়া উঠে। প্রথমতঃ টেক-তনয়ার সহিত পৌত্রের বিবাহ দিতে মহারাণী সম্মত হন নাই; কিন্তু উভয়ের প্রণয়ের প্রগাঢ়তা বুঝিতে পারিয়া, শেষে বিবাহ দিতে সম্মত হন। বিবাহ এই ফেব্রুয়ারি মাসে হইত। রাজপৌত্রের জীবন নাটকের যবনিকা পতন, ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বেই হইল! সব সাধ ফুরাইল। রাজপৌত্রের জন্ম ১২৭০ সালের ২৫শে পৌষ, মৃত্যু ১২৯৮ সালের ১লা মাঘ; সুতরাং বয়স,—২৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। মৃত্যু হয়, সান্‌ড্রিংহামে; সমাধি হয়, ৭ই মাঘ উইণ্ডসরে,—পিতামহ এলবার্টের পার্শ্বে। ভারতের ত কথাই নাই, মহারাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে সমবেদনা-সূচক পত্রাদি পাইয়াছেন। তিনি এ শোক-ব্যসনেও সকলের উত্তর দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

আমাদের হাজত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হাজত গৃহের সংক্ষিপ্ত বর্ণন।

নিশা-যাপনের জন্য, আমরা যে গৃহে প্রবেশ করিলাম, সে গৃহটী অতীব বৃহৎ। আগে যদি জানিতাম যে, মুক্তি-লাভের পর, আমাকে হাজত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, তাহা হইলে, আমি সেই গৃহের দীর্ঘ প্রস্থ পরিমাণ ঠিক্ করিয়া লইয়া আসিতাম। কিন্তু দূরদর্শিতার কিঞ্চিৎ অভাব বশতঃ ঘরের মাপটী আনা হয় নাই। শুধু মাপ নহে, সে ঘরে এমন অনেক সামগ্রী আছে, যাহা গণনা করিয়া, লিখিয়া-পড়িয়া আনা, আমার একান্ত উচিত ছিল। যাহা হউক, তথাচ ক্ষান্ত হইব না। পরীক্ষায় পুরা নম্বর পাইয়া, প্রথম শ্রেণীর প্রথম নাই বা হইতে পারিলাম; কিন্তু স-সম্মানে এবং স-গৌরবে, যে উত্তীর্ণ হইব, তাহা'ত নিশ্চয়ই।

সেই ঘরটী লম্বা আন্দাজি ৩২ হাত, প্রস্থ ১২ হাত। ঘরের মেজে পীচ ঢালিয়া প্রস্তুত; ইট, চুণ, সুরকীর সহিত কোন সম্পর্ক নাই। মেজের স্থানে স্থানে, পীচ উঠিয়া গিয়া, মাটী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেই মাটী-গুলি বেশ পিটিয়া-পাটিয়া চৌরস করিয়া, পীচের সহিত সমভাবে রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সে চেষ্টা, বৃথা। শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে ভৃগু-মুনি-পদ চিহ্নের ন্যায়, সেই মাটী সুশোভিত। লৌকিক উপমা দিলে, বলা যাইতে পারে যে, কোন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের অঙ্গ যেন দাদরূপ চর্ম্ম-রোগে আবৃত হইয়াছে। সে যাই হউক, সেই মাটীর উপর দিয়া জোরে জুতা পায়ে দিয়া চলা নিষেধ। জুতা-খুরে পাছে মাটী উঠিয়া যায়, অথবা পীচ ফাটিয়া যায়, ইহাই অধিকারী মহাশয়ের ভয়।

হাজত গৃহটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। দক্ষিণ-মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, আমার উভয় পার্শ্বে, সারি সারি, বেদী-বৎ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মঞ্চ বিরাজিত রহিয়াছে। উহাকে কেহ যদি মঞ্চ না বলিতে চাহেন, তবে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত নিরেট বেঞ্চ বলিতে পারেন। ফল কথা,—বেদীর ভাবই আগে মনে হয়! তবে বেদীর সঙ্গে তফাৎ এই, বেদী সাধারণতঃ চারি-চৌকশ হয়, ইহা কিছু লম্বা। আমি ভাবিলাম, "হাজত-গৃহে এতগুলি বেদী,—সারি সারি দুধারী কেবলই বেদী,—কেন?—কিসের জন্য? প্রত্যহ রাত্রে এখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয় না কি?" কিন্তু অধিকক্ষণ আমায় আর সংশয়-দোলায় দুলিতে হইল না। অধিকারী মহাশয় বলিলেন, "বাবু ভাবিতেছেন কি? এই এক একটী মাটীর ঢিপির উপর, আপনাদিগকে শয়ন করিতে হইবে। হাজতের ইহাই শয়ন-খাট জানিবেন।"

আমি বলিলাম,—তথাস্তু।

কৃষ্ণবাবু বলিলেন; "আমাদের চারিজনকে এক দিকে চারি খানি খাট দিবেন। চারিজনকে এ রাত্রে দূরে দূরে স্বতন্ত্র ভাবে চারি স্থানে না থাকিতে হয়, ইহাই আমার অনুরোধ।"

অধিকারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনাদের বেশ গল্প করিবার মজা হয় আর কি? কিন্তু হাজতে রাত্রিকালে পরস্পর গল্প করিবার নিয়ম নাই। হাজতের এই মাটীর খাটে ঐ বালিশ দেখিতে পাইতেছেন না কি?

কৃষ্ণবাবু। না।

অধিকারী। (হাসিয়া) ঐ যে বালিস।

কৃষ্ণবাবু। কৈ?

তখন অধিকারী একটী বালিশের গায়ে হাত বুলাইয়া, বলিলেন,—"এই দেখুন মহাশয়! হাজতের বালিশ দেখুন। হাজতের বালিশ তূলার নয়, নারিকেল ছোবড়ারও নয়, শণেরও নয়, সরিষারও নয়,—হাজতে খাটও মাটীর, বালিসও মাটীর।"

বালিশটা কি পদার্থ, তাহা কেহ বুঝিয়াছেন কি? ঐ যে মাটীর বেদী বা খাটের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারই অগ্রভাগটা একটু উচ্চ করিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। সেই উচ্চ স্থানটীর নাম বালিশ। আমি কিঞ্চিৎ কৌতূহলপরবশ হইয়া, অধিকারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসিলাম, "মহাশয়! এ কি রকম হইল? প্রত্যেক খাটে, এক একটী করিয়া কৈ বালিশ তো নাই? একটী খাট অন্তর, এক একটী বালিশ দেখিতেছি যে! এ, কি রকম নিয়ম?

অধিকারী। ভাল করিয়া দেখুন।

আমি। দেখার দোষ বোধ হয় কিছুই নাই। এই খাটের সারি দেখুন না? বালিশ তো ঐ একটী খাট অন্তরই রহিয়াছে।

অধিকারী হাসিয়া বলিলেন,—"আমার আঙ্গুল পানে তাকাইয়া দেখুন, এ খাটের বালিশ উত্তরে; আর, ও-খাটের বালিশ দক্ষিণে।"

আমি দেখিয়া বুঝিলাম, "তাইতো বটে, অধিকারীর কথাই সত্য! একটী খাটের বালিশ এদিকে আছে, তার পরের খাটের বালিসটী ঠিক বিপরীত দিকেই আছে। আমি যদি দক্ষিণ দিকে মাথা করিয়া শুই, তবে আমার পরের খাটে যিনি শুইবেন, তাঁহাকে উত্তর দিকে মাথা করিয়া শুইতে হইবে। অর্থাৎ আমার যেদিকে মাথা থাকিবে, আমার পার্শ্বস্থ খট্টা-শায়ী ব্যক্তির পা সেই দিকে থাকিবে। একই দিকে পাশাপাশি দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি মাথা করিয়া শুইতে পাইবে না। সারি সারি দেখিয়া যাও, কেবল মাথা আর পা,—কেবল মাথা আর পা পড়িয়া রহিয়াছে। অন্য দিক দেখ, কেবল পা আর মাথা,—কেবল পা আর মাথা পড়িয়া রহিয়াছে। মুখোমুখী হইবার যো নাই, "পদোমুখী" হওয়াই এখানে নিয়ম।"

মৃত্তিকার খাট গুলি আবার খুব নিকটে নিকটে গ্রথিত। পরস্পরের মধ্যে বোধ হয় আধ হাত বা আড়াই পোয়া ব্যবধান আছে। প্রত্যেক খাট গুলি এক হাত পরিমাণ চওড়া হইবে। তদুপরি হাজতের আসামীগণ শয়ন করিলে, পদের ও মাথার,—বুকের এবং কোমরের এক অপূর্ব্ব বাহার খুলিয়া থাকে।

আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, অধিকারীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"হাজতে মাথার কাছে মাথা না রাখিয়া, মাথার কাছে পা রাখিবার বন্দোবস্ত কেন হইল? ইহার কারণ কি?"

অধিকারী বলিলেন,—"কারণ তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাথার কাছে মাথা অর্থাৎ মুখের কাছে মুখ রাখিলে, পরস্পরে কথাবার্ত্তা গালগল্প করা সম্ভব। অথবা মুখ-চুম্বন করাও সম্ভব! তাই এরূপ বন্দোবস্ত।

আমি তখন মনে মনে বলিলাম,—"হে হাজত! তুমিই ধন্য! হে অধিকারী মহাশয়! আপনিও ধন্য! এবং হে আমরা! আমরাও ধন্য!!

অধিকারী মহাশয়, আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া, আমাদের চারিজনকে সঙ্গে লইয়া, পাশাপাশি অবস্থিত চারি খানি খাটে বসাইলেন। বলা বাহুল্য, আমরা চারিজনে এক স্থানেই রহিলাম। আমি মাটীর বালিশ ঠেস্ দিয়া, মাটীর খাটে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। অধিকারী হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চাহিয়া, অথচ আমাদের চারিজনকেই উদ্দেশ করিয়া, বলিলেন,—"একটু সাবধান হইয়া বসিবেন, উঠিবেন, শুইবেন এবং নড়িবেন-চড়িবেন; দেখিবেন যেন, খাটের ধারের মাটী আপনাদের ভরে ভাঙ্গিয়া না পড়ে।"

আমি বলিলাম—"খুব সাবধানেই আছি।"

অধিকারী আমাদের খাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, কার্য্যান্তরে অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন। আমরা চারিজন কেবল অনিমিষ-লোচনে গৃহের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। এই হাজত-ঘরে চারিটী বড় বড় দ্বার আছে। একটী দ্বার পূর্ব্বে, দুইটী দ্বার উত্তরে, একটী দ্বার দক্ষিণে অবস্থিত। দ্বারে কিন্তু কপাট নাই। কিঞ্চিৎ কাঠের কণাও নাই। দ্বার গুলি লোহার মোটা-মোটা রেল দ্বারা বন্ধ। খাঁচার ভিতরে যেমন পাখী, পিঞ্জরের ভিতরে যেমন বাঘ, হাজত-ঘরের ভিতর কতকটা সেইরূপ আমরা

লোহার বেড়ার দ্বার-দেশ চাবির দ্বারা বন্ধ থাকিলেও, হাজত-ঘরের ভিতর কি হইতেছে, কি না হইতেছে,—বাহির দিক দিয়া, তাহা বেশ দেখা যায়। আমি কৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসিলাম,—বলুন,দেখি—"এই হাজত ঘরের চারিধারে কপাট নাই কেন? এরূপ লোহার রেলের বেড়া দিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য কি?

কৃষ্ণবাবু। সম্ভবত দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য,—ঐ লৌহ-রেলের ফাঁক দিয়া আসামী-গণের কর্ম্ম-কাণ্ড, সদাই বহির্দেশস্থ প্রহরীগণের চক্ষুর গোচরীভূত হইতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য,—বেণ্টিলেশন। সর্ব্বদা সমভাবে বায়ুর চলাচল হইলে, হাজত-গৃহে রোগের সম্ভাবনা অতি অল্পই হইয়া থাকে।

আমি। আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। এইত বর্ষাকালে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি হইতেছে; আপনার বেণ্টিলেশন দিয়া জলের ছাট আসিয়া, হাজতের আসামীগণকে কি নীরোগ করিয়া তুলিতেছে? শীতকালের রাত্রে, যখন এই চারি দ্বার দিয়া হিম ঢুকিতে আরম্ভ করিবে, তখন কয়েদীগণ অবশ্যই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে,—নয়? পৌষের প্রখর শীতে চারি দ্বার খুলিয়া শোয়া, আর অবিলম্বে যমের বাড়ী গমন করা, বোধ হয় একই কথা। সাবাস্ বেণ্টিলেশন!! এই ছাতটা ভাঙ্গিয়া দিলে, বোধ হয় আরও বেণ্টিলেশন হয়!

হঠাৎ সম্মুখে দেখিলাম, সেই শিবচন্দ্রের স্কন্ধ-দেশে অধিকারী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শিবচন্দ্র খর্ব্বাকৃতি, অথচ খুব জোয়ান,—প্রশস্ত-বক্ষ। তাহার দুইটী কাঁধে দুখানি পা রাখিয়া অধিকারী মহাশয় ঠায় ঠিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, বলিলেন,—"চল্ শিবে।"

ব্যাপার দেখিয়াই আমি ত অবাক্! শিবচন্দ্র একজন হাজতের আসামী, আমিও ত একজন সেই-রূপ আসামী। অধিকারী, সকল আসামীরই কাঁধে এইরূপ চাপিয়া বেড়াইবে না কি? যদি হাজতের ইহাই নিয়ম হয়, তাহা হইলে আসামীগণের সুখ ত নিতান্ত সামান্য নয়!

অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, শিবচন্দ্র, অধিকারীকে স্কন্ধদেশে বহন করিয়া আনিয়া, একটী লণ্ঠনের তলদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। অধিকারী, লণ্ঠনটী খুলিলেন; লণ্ঠনের গ্লাসে তেল দিলেন; শেষে তাহার পলিতা জ্বালিয়া দিয়া, শিবুর কাঁধ হইতে দুপ্ করিয়া লাফাইয়া পড়িলেন।

হাজতে মানুষের কাঁধে চাপিয়া লণ্ঠন জ্বালিতে হয়। মৈ নাই। হাজতে গাছে তুলিয়া কেহ কাহারও মৈ খুলিয়া লইতে পান না!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ফাইল, ফাইল, ফাইল!

এইবার এক হিন্দুস্থানী জমাদার হাজত-গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে এক বিষম চাবির থলো। সম্ভবত তাহাতে বিশ-ত্রিশটা চাবি আছে। ছোট, বড় 'মাঝারী' ঢ্যাঙ্গা, গ্যাঁড়া, চ্যাপটা, আবশ্যক মত—সকল রকমেরই চাবিকাটী আছে। এক প্রকাণ্ড লৌহ-শিকলে সে চাবিগুলি বাঁধা। জমাদার, নড়িতেছে-চড়িতেছে, আর চাবি গুলির ঝম্ ঝম্ শব্দ হইতেছে। সেই ঝম্ ঝম্ শব্দ তাহার পায়ের জুতার মশ্ মশ্ শব্দের সহিত মিশিয়া, বেশ এক মিঠে-কড়া মনোমোহন ধ্বনি উত্থিত করিতেছে। জমাদারের আগমন মাত্র, হাজতের প্রত্যেক আসামীই কেমন যেন একটু জড়-সড় হইল। নীলমণির মুখে আর কথা নাই, তিনিও যেন একটু ভীত হইলেন।

জমাদার আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া, বলিল, —"বাবু! আপনাদের ত কোন কষ্ট হয় নাই? আপনারা ভদ্রলোক, বড়লোক;—এখানে আপনাদের কতকটা কষ্ট হওয়াই সম্ভব।"

কৃষ্ণবাবু। না। বিশেষ কোন কষ্ট নাই।

জমাদার। যদি কোন কষ্ট হয়, তবে দরখাস্ত দ্বারা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জানাইবেন। অদ্যরাত্রে আপনাদের আহারের কি কোনরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে?

কৃষ্ণবাবু। আমরা জেলখানার কোন জিনিষই খাইব না। অদ্য রাত্রে আমাদের আর আহারের আবশ্যক নাই। কারণ, ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার পুলিশ-আদালতে, আমরা বিলক্ষণরূপ জলযোগ করিয়া আসিয়াছি। ক্ষুধা আর কিছুমাত্র নাই।

জমাদার। আপনারা যদি জেলখানার অন্ন না খান, তাহা হইলে কল্য প্রাতে দরখাস্ত দ্বারা বড়-সাহেবকে জানাইতে হইবে।

কৃষ্ণবাবু। নিকটে ব্রাহ্মণ-হালুইকরের দোকান আছে কি?

জমাদার। আছে।

কৃষ্ণবাবু। আমরা বড়-সাহেবকে কল্য প্রাতে

এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিব যে, ব্রাহ্মণ-হালুইকরের দোকান হইতে কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা আমাদের চারি জনের জন্য, লুচি, কচুরি, সন্দেশ প্রভৃতি যেন আনাইয়া দেওয়া হয়।

জমাদার। টাকা আপনাদের মজুদ আছে তো?

কৃষ্ণবাবু। হাঁ। নায়েব-জেলারের কাছে, আমাদের প্রায় ৮৲১০৲ টাকা মজুদ আছে।

জমাদার। দরখাস্তে বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন,—নায়েব জেলারের কাছে আমাদের যে টাকা মজুদ আছে, সেই টাকা হইতে আমাদের আহারীয় সামগ্রী খরিদ করাইয়া পাঠাইবেন।'

এই কথা বলিয়া জমাদার, হাজত-গৃহের অন্য দিকে গেল। অমনি একটা শব্দ উঠিল,—

"ফাইল, ফাইল, ফাইল।"

আমি ভাবিতে লাগিলাম,—"এবার দেখিতেছি, কি একটা নূতন কাণ্ড উপস্থিত। "ফাইল কিরে বাপু? এ শব্দের অর্থ কি? অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়া আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। এদিকে দেখি, হাজতের আসামীগণ, যে যেখানে ছিল, সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং হাজত-গৃহের ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া দু'জন দু'জন করিয়া একত্রে যোট বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

আমরা চারিজন "অবাক্" হইয়া তখনও ফ্যাল্‌ফ্যাল চোখে বসিয়া আছি। অধিকারী মহাশয় কহিলেন,—"আপনাদিগকেও এস্থান হইতে উঠিতে হইবে; উঠিয়া দুই দুই জনে যোট বাঁধিয়া, উহাদের সহিত একত্র দাঁড়াইতে হইবে।"

ব্রজবাবু। এ-যে ভাল বিপদে ফেলিল দেখিতেছি!—মুচি-মুদ্দাফরাস হাড়ী-ডোমের সহিত একত্র গায়ে-গায়ে ঠেকা-ঠেকি করিয়া, সারি দিয়া দাঁড়াইয়া লাভ কি হইবে? বিপদ ক্রমশই যে ঘনীভূত হইতেছে!!"

আমি। বিপদে কে বলে বিপদ!
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ!

ব্রজবাবু। দেখুন, এ সময় আপনি যদি এরূপ জ্বালাতন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমি এ হাজতে কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিব না।

কৃষ্ণবাবু। আপনারা দুজনে এখন ঝগড়া করিবেন,—না, উঠিয়া ফাইল দিবেন?

আমি। ঝগড়াও করিব, ফাইলও দিব,—আরও যাহা করিতে হয়, তাহাও করিব;—কেহ আমাকে অক্ষম বা অপারগ না মনে করে, ইহাই আমার সাধ।

অধিকারী মহাশয় আবার একটী মৃদুমন্দ মধুর স্বরে হাঁক দিয়া বলিলেন,—"বাবুমহাশয়গণ! এ সব কাজে দেরি করিলে চলিবে না,—আপনারা শীঘ্র আসুন।"

কৃষ্ণবাবু ও ব্রজবাবু এক-যোট,—অরুণ এবং আমি এক-যোট,—এই দুইটী যোট বাঁধিয়া আমরা তাহাদের পশ্চাতে গিয়া দাড়াইলাম। ঐইরূপ দাঁড়াইবার পর উপবেশন। অর্থাৎ সকলে উবু হইয়া বসিয়া পড়িল। হাঁটু দুইটী উচু করিয়া দুই পায়ে ভর দিয়া বসিতে হইল। অধিকারী মহাশয় তখন বলিতে লাগিলেন,—"সকলে ঠিক সোজা হইয়া খাড়া ব'স, বাঁকা হইওনা;—চুপ কর, গোল করিও না; নড়িও না; কেহ কাহারও গায়ে ঠেশ দিও না।"

আমি এবং অরুণ এক সারি হইয়া সর্ব্বশেষে বসিয়াছি। আমার পরেই ব্রজবাবু এবং কৃষ্ণবাবু সারি বাঁধিয়া আছেন। অর্থাৎ ব্রজবাবু ও কৃষ্ণবাবুর পশ্চাদ্ভাগ আমাদের মুখে বুকে একরূপ সংলগ্ন আছে বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। সেইরূপ অন্য দুই জন আসামীর পশ্চাদ্ভাগ ব্রজবাবু ও কৃষ্ণবাবুর মুখে বুকে সংলগ্ন আছে। সেই দুই জন আসামী হাড়ী, মুচি, কি বাগ্দী, তাহা কে জানে? আবার সেই দুই জনের মুখ বুক, অন্য দুই আসামীর পশ্চাতে গিয়া ঠেকিয়াছে। এইরূপ আমরা দশ কি এগার সারি হইলাম। প্রত্যেক সারিতে দুই জন করিয়া আছি; সুতরাং দশ বা এগার সারিতে আমরা কুড়ি বাইশ জন আসামী হইব।

আমার পক্ষে হাঁটু উচু করিয়া, উবু হইয়া বসা কিঞ্চিৎ কষ্টকর। বঙ্গবাসীর মতে দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইলেও, আমার দেহ কথঞ্চিৎ পরিপুষ্ট। বিশেষ, এরূপ ভাবে উবু হইয়া অধিকক্ষণ বসিতে, আমি কখন অভ্যাস করি নাই। কাজেই আমার হাঁটু চড়চড়্ করিতে লাগিল, কোমর কট্‌কট্ করিতে আরম্ভ করিল, পায়ে ঝিন্‌ঝিন্ ধরিবার উপক্রম হইল। আমি দুই হস্ত দ্বারা কৃষ্ণবাবুর পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়া, আমার দেহের ঝোঁক তাঁহার উপর কতকটা রাখিলাম। পাঠকের স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বে অধিকারী বলিয়াছিলেন যে, "কেহ কাহার গায়ে ঠেশ দিও না, ঠিক্ খাড়া হইয়া বসিয়া

থাক।" আমি পূর্ব্বোক্তরূপে কৃষ্ণবাবুর গায়ে ঠেশ্ দেওয়াতে কৃষ্ণবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন,—"ওকি করিতেছেন? আপনার কার্য্য বে-আইনি হইতেছে।" আমি বলিলাম,—"বে-আইনি বটে; কিন্তু উপায় নাই। আইন লঙ্ঘন করিলে দণ্ড পাইতে হয় বটে, কিন্তু আইন লঙ্ঘন করিবার পূর্ব্বেই যে, আমি উবু-হইয়া-বসা রূপ ঘোরতর দণ্ড পাইতেছি। সুতরাং এক্ষণে আমার পক্ষে লঙ্ঘন অলঙ্ঘন সবই সমান। চরম অবস্থায় দোষ-গুণ, সুখ-দুঃখ,—সব সমান হয়।"

কৃষ্ণবাবু। আপনার বৈজ্ঞানিক বিবৃতি আমি চাই না। এখন অধিকারী না দেখিতে পাইলেই হইল।

ইত্যবসরে আমি একবার অধিকারীর মুখ পানে চাহিলাম। দেখিলাম, অধিকারী মহাশয় মুচ্‌কি-মুচকি হাসিতেছেন। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"বাবুর বুঝি কষ্ট হইতেছে। তা আপনি যদি উবু হইয়া বসিতে না পারেন, তবে "আসনপীঁড়ি" হইয়া বসুন।

সেই সারি বদ্ধ হইয়া অবস্থিত, আসামীদের মধ্যে, এক ব্যক্তি অর্দ্ধোত্থিত হইয়া যেন অধিকারীর কথা অনুমোদন পূর্ব্বক, ঠিক অধিকারীর সুর অনুকরণ করিয়াই বলিল,—"বাবু আপনি "আসনপীঁড়ি" হইয়া বসুন। আপনি আমাদের সঙ্গে উবু হইয়া বসিতে পারিবেন কেন? আপনাদের কি এ কাজ? আপনার যেমন যেমন ইচ্ছা, সেইরূপই আপনি বসুন।"

এই কথা শুনিবামাত্র অধিকারী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভ্রূভঙ্গী পূর্ব্বক গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"পুলিন! তুই আবার গোল কাচ্চস্? তুই ফের যদি কথা ক'বি, তা'হলে, কা'ল তোকে বড়-সাহেবের কাছে হাজির ক'রে, ২৫ বেত খাওয়াব। তুই জানিস্—এটা ব্লাড়ী নয়, এটা হাজত;—ইহা 'ফাজলেম' করবার জায়গা নয়।"

অর্দ্ধোত্থিত পুলিন, অমনি একটু 'ফিক্' করিয়া হাসিয়া নিম্নলিখিত কথাটী অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে বলিয়া, বসিয়া পড়িল। সে কথাটী এই,—"হুঁ হুঁ বটে! বটে! এটা হাজত বটে! আমি ভেবেছিলাম,—শ্বশুর-বাড়ী!

অধিকারী কতক আপন মনে, কতক অন্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আমি ঢের ঢের বেয়াড়া লোক দেখেছি, কিন্তু পুলিনের মত বেয়াড়া লোক দেখি নাই।"

অধিকারী নীরব হইলে, আমি পশ্চাৎপ্রদেশ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া, পায়ের উপর পা দিয়া, উপবেশন করিলাম। এইরূপে সকলের উপবেশন করা যখন ঠিক হইল, তখন সেই জমাদার, প্রকাশ্যত উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রত্যেক আসামীর উপর অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, গণনা আরম্ভ করিল;—এক, দো, তীন, চার, পাঁচ, ছঃ ইত্যাদি। এইরূপ গণনায় আমরা সেদিন কতজন আসামী হইলাম তাহা ঠিক মনে নাই; সম্ভবত বাইস হইবে।

জমাদারের গণনা শেষ হইলে, আর এক ব্যক্তি আমাদের গণনা আরম্ভ করিল। সে ব্যক্তির অঙ্গে কয়েদীর পোষাক। তাহার গলার সুর এবং কথার বাঁকা-বাঁকা টান শুনিয়া মনে হইল, এ লোকটী চট্টগ্রাম-বাসী।

সে ব্যক্তি প্রত্যেক আসামীর নিকট গিয়া গণিতে লাগিল। জমাদারের গণনার সহিত তাহার গণনার ঠিক মিল হইল কি না, জানিবার জন্য, জমাদার তাহাকে জিজ্ঞাসিল,—"এখানে কত আসামী আছে?" সে বলিল,—"বাইস।" (?) জমাদার বলিল,—"ঠিক হইয়াছে।"

গণনা ঠিক হইলে, জমাদার প্রস্থান করিল। আমরা তখনও ফাইল দিয়া তদ্ভাবেই বসিয়া আছি। অর্থাৎ কার্য্য শেষ হইলেও, অধিকারীর হুকুম ব্যতীত কাহারও উঠিবার যো নাই, ইহাই নিয়ম। জমাদার পশ্চাৎপদ হইয়া দুই চারি পা গমন করিবামাত্র, অধিকারী বলিলেন,—"তোমরা সকলে উঠিয়া আস্তে আস্তে, আপনার জায়গায় যাও।" অধিকারীর কথা অনুসারে অনেকেই নীরবে ধীরে-ধীরে স্ব স্ব স্থানে আসিল। পুলিনচন্দ্র, কিন্তু একটী তুড়ী-লাফ খাইয়া আপন স্থানে পৌছিলেন। আরও দুই এক জন আসামী, অল্প মাত্রায় গোলযোগ আরম্ভ করিল। কেহবা লুম্-ঝিঁঝিটে তান ধরিল:—

ওঠ ওঠ হে ফাইল হলো শেষ।
না উঠিলে অধিকারী টেনে ধরবে কেশ॥
হাজতে মজাতে আছি খেয়ে-দেয়ে বেশ।
কষ্ট নাই কিছু হেথা সুখের একশেষ॥

গোলযোগ এবং গান, শুনিবামাত্র অধিকারী, "চুপ্ চুপ্ চুপ্," এইরূপ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পুলিনচন্দ্র নিজ বেদীতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,

"দেখুন, অধিকারী মহাশয় এবার আমি গোলও করি নাই, গানও গাহি নাই। যে ব্যক্তি গান করিয়াছে, আমি তাহাকে জানি; আপনি যদি বলেন, তবে তাহাকে ধরিয়া দি।

অধিকারী। পুলিন! তুই থাম; তোকে কোন কথা কহিতে হইবে না।

পুলিন। তা আমি ছাড়ব না। আমি একটী মাত্র কথা কহিলেই, আপনি আমাকে 'বড়-সাহেবের নিকট হাজির করিয়া দিব' বলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি এই মাত্র গান করিল, তাহাকে আমি ধরিয়া দিতেছি,—আপনি তাহাকে বড়-সাহেবের নিকট হাজির করিবেন না কেন?

অধিকারী। দেখ্! ফের যদি তুই কথা ক'বি, তাহা হ'ই'লে, বেত লাগাইয়া, তোর পাছার চামড়া ছিঁড়িয়া আনিব।

পুলিন। (অর্দ্ধস্ফুট স্বরে) কথা কহিলেই দোষ; কিন্তু কেহ গান করিলে দোষ হইবে না! তবে আজ থেকে অবধি আমি গানই করিব, কথা আর কব না। শৌচ-প্রস্রাবের আবশ্যক হইলে, গান গাহিয়া, অধিকারী মহাশয়কে জানাইব। বলিব;—

পেয়েছে প্রস্রাব হে অধিকারী!
বলনা এখন কি করি?
এ যে লাজে মরি!

বলা বাহুল্য যাহারা গান গাহিয়াছিল, এবং গোল করিয়াছিল, তাহারা ইতিপূর্ব্বেই, আপনা-আপনি নীরব হইয়া বসিয়া ছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কম্বল-শয্যা।

অধিকারী, পুলিনচন্দ্রকে আঁটিতে না পারিয়া, আপন কার্য্যে অন্য স্থানে গমন করিলেন। আমরাও ফাইল-শ্রেণী হইতে উঠিয়া আসিয়া, স্ব স্ব মৃত্তিকা-খাটে উপবেশন করিলাম। খাটগুলি বেশ নিকান-পোচান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাহার উপর বসিতে কোন কষ্ট বা বিঘ্ন নাই। বেশ একটু সোঁদা সোদা গন্ধও আছে;—বোধ হয়, দেওয়াল-ভাঙ্গা মাটী দিয়া নিকান হইয়াছে। খাটটী তের পোয়া, কি চৌদ্দ পোয়া লম্বা। চওড়া, পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—একহাতের অধিক নহে। কৃষ্ণবাবু সেই খাটের উপর শুইয়া, নিজ দেহের সহিত খাটের কিরূপ সামঞ্জস্য হয়, তাহা দেখিয়া লইতেছিলেন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণবাবু খাটে কুলাইলেন না;—খাট অতিক্রম করিয়া তাঁহার পা বাহির হইয়া পড়িল;—বুকও কিঞ্চিৎ বাহিরে আসিল। খাটের উপর কৃষ্ণবাবু আছেন, অথবা কৃষ্ণবাবুতে খাট সংলগ্ন আছেন, প্রথম-দৃষ্টে তাহা ভাল বুঝা গেল না।

কৃষ্ণবাবুকে তদবস্থায় নিপতিত দেখিয়া, অধিকারী দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন,—"ধূলায় শুইবেন না,—বড়-সাহেব জানিতে পারিলে দণ্ড দিবেন। খাটের বিছানা আছে, কম্বল আছে,—তাহা পাতিয়া শয়ন করুন।"

খাটের বিছানা এবং কম্বলের কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল। লালবাজারের "পুলিস-লক্-অপে" একবার একখানি কম্বল পাইয়া বিব্রত হইয়াছিলাম; হরিণবাড়ীর হাজতের যদি সেই-রূপই কম্বল হয়, তাহা হইলে ত একবারেই গিয়াছি।

অধিকারী, কৃষ্ণবাবুকে কহিলেন,—"আপনারা বিছানা নিজে নিজে করিতে পারিবেন কি?"

কৃষ্ণবাবু। বিছানা করিতে পারিব না কেন? পারি সব।

আমি। না পারিও কিছু!

অধিকারী। আপনাদের আর কষ্ট করিয়া কাজ নাই। শিবু আসিয়া আপনাদের বিছানা করিয়া দিতেছে।

এই বলিয়া, অধিকারী "শিবে! শিবে!" বলিয়া এক ডাক দিলেন। শিবু অমনি উপস্থিত হইল। অধিকারী কহিলেন, "দেখ্ শিবে! তুই বাবুদের বিছানা ক'রে দে।"

সেই হাজত-গৃহের এক কোণ হইতে শিবচন্দ্র একে একে চারিটী শয্যা আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই বিছানার বাহ্য রূপ দেখিয়াই অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। বহু পুরাতন মলিন-মুখ-চন্দ্র চট এবং কত কালের কীট-দষ্ট কামিনী-কুন্তল-কমনীয় দুই খানি কম্বল,—ইহাই হইল, হাজত-ভবনের শয্যা! এই সুখ-শয্যা গুটান ছিল। শিবচন্দ্র যেমন তাহার এক পাক খুলিবেন, অমনি একটা 'ভক্' করিয়া গন্ধ উঠিল। ব্রজবাবু নাকে কাপড় দিলেন। আর এক পাক খুলিবামাত্র, আবার একটু গন্ধ অধিক বিস্তার হইল। এইরূপ পাকে পাকে গন্ধ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। দেখিয়া-শুনিয়া আমার মন

মোহিত হইয়া উঠিল। আমি ব্রজবাবুকে বলিলাম,—"এই চট এবং কম্বল স্বর্গীয়! নন্দন-কাননে ছিল বলিয়া উহার অভ্যন্তর হইতে পারিজাত-পুষ্পের সৌরভ আসিতেছে। আরও একটা কথার বিচার করুন,—

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

অদ্য সর্ব্বজীবকে,—সর্ব্বশ্রেণীর মনুষ্যকে আপনার আত্মবৎ ভাবিবার শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবত এইবার আপনার চরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। হাজতের এই শয্যায় পূর্ব্বে কত লোক শয়ন করিয়াছিল। ধনী নির্দ্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ—নীচ,—কত কত ব্যক্তিই যে, এই হাজত-বাসরে ইহার উপর সুখ-নিশা যাপন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা আমি কেমন করিয়া করিব? ব্রজবাবু! ঐ চট ও কম্বলের উপর মুচি শুইয়াছিল, মুদ্দফরাস, শুইয়াছিল, মেথর শুইয়াছিল! আর অদ্য আপনি নিরামিষাশী,হবিষ্যান্নভোজী ব্রাহ্মণ হইয়াও, সেইচট ও কম্বলের উপর শয়নের অধিকার পাইবেন। ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা!! আজ আপনি পঙ্ক চন্দন একই দেখিতে পাইবেন,—সুধা-বিষ্ঠায় আপনার সমভাব হইবে!

কৃষ্ণবাবু। ঐ কম্বলে ইতিপূর্ব্বে যে, মুচি ও মেথর শুইয়াছিল, সে কথা আপনাকে কে বলিল

আমি। কলিকাতার কোন মুচি বা মেথর কস্মিন্‌কালে রাজদ্বারে যে দণ্ডিত হয় নাই বা হইবে না,—তাহা কখন সম্ভব নহে। মেথর ও মুদ্দাফরাসের যে, স্বতন্ত্রহাজত আছে, তাহাও নহে। হাজতে যে, ব্রাহ্মণের কম্বল স্বতন্ত্র, ক্ষত্রিয়ের কম্বল স্বতন্ত্র, বৈশ্যের কম্বল স্বতন্ত্র,—তাহাও নহে। তবে আপনি কেমন করিয়া বলিবেন, ঐ কম্বলে মেথর বা মুদ্দাফরাস পূর্ব্বে শোয় নাই?

কৃষ্ণবাবু ঊর্দ্ধমুখ হইয়া নীরব; ব্রজবাবু নাকে কাপড় দিয়া নীরব! অরুণোদয় রায় বলিলেন,—"আমাদিগকে যদি শুধু মাটীতে শুইতে দিত, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল ছিল। এই কম্বলগুলা হইতে যেন শুট্‌কী-মাছ-পচা একটা গন্ধ বাহির হইতেছে। যেন শ্মশান হইতে কম্বল গুলাকে কুড়াইয়া আনা হইয়াছে।"

আমি। আমার বোধ হয়, ইহা ওলাউঠা-রোগীর কম্বল।

এইরূপ বিচার-বিতর্ক হইতেছে, ইত্যবসরে শিবচন্দ্র চারিখানি মৃৎ-খট্টায় চারিজনের কম্বলশয্যা রচনা করিয়া রাখিল। অরুণ আমার গায়ের চাদর খানি লইয়া আমার শয্যার উপর পাতিয়া দিল। আমি তাহাতে বসিলাম। কৃষ্ণবাবুও আমার খাটেই তখন বসিলেন।

আমি। কৃষ্ণবাবু! অমন নীরব হইয়া রহিলেন কেন?—কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা হইল নাকি?

কৃষ্ণবাবু। অন্য ভাবনা কিছুই নাই, হাজতের বিচার-আচার নিয়ম-পদ্ধতির বিষয় কেবল ভাবিতেছি। কেন এমন হইল? এক একটা কাণ্ডে শরীর কেমন শিহরিয়া উঠিতেছে।

আমি। "শিহরে কদম্ব ডরে দাড়িম্ব বিদরে।" তা, আমার কি? আমরা কদম্বও নহি, দাড়িম্বও নহি—

কৃষ্ণবাবু। না—না,—তামাসা নহে; সত্য সত্যই কথা গুরুতর!

আমি। এখনই আবার কি নূতন গুরুতর কথা উপস্থিত হইল?

কৃষ্ণবাবু। আমি ইতিপূর্ব্বে ঐ দিকে গিয়াছিলাম; আমার দীর্ঘ টীকি দেখিয়া একজন আসামী তামাসা করিয়া বলিল, "কাল বুঝা যাবে!—পেঁয়াজের তরকারি দিয়া কাল যখন আপনাকে ভাত খাইতে হইবে, তখন টীকি আপনার কোথায় থাকিবে?" তবেই'ত দেখিতেছি, জেলখানায় পেঁয়াজ চলে। হিন্দুর ছেলে হইয়া পেঁয়াজ খাইব কিরূপে?

কৃষ্ণবাবুর চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল।

আমি কৃষ্ণবাবুকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"তা'ও কি কখন সম্ভব হয়?—পেঁয়াজ আমাদিগকে দিবে কেন? হয়ত মুসলমান বা অন্যান্য জাতির জন্য পেঁয়াজের তরকারি রন্ধন হয়; তাই বোধ হয়, কোন কোন হিন্দুর সু-সন্তান পেঁয়াজ চাহিয়া লইয়া খায়। পেঁয়াজ-ভক্ষণ যে অবশ্য-কর্ত্তব্য—পেঁয়াজ না খাইলে যে, দণ্ডনীয় হইতে হয়, এমন নিয়ম জেলখানায় অবশ্যই নাই।"

আমরা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছি,—এমন সময় আমাদের পশ্চাদ্ভাগে জলপ্রপাতের ন্যায় একটা কল্‌কল্ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম; সেই গৃহমধ্যে একজন যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তদীয় অপ্রকাশ্য অঙ্গ

প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বজন-সমক্ষে মূত্রত্যাগ করিতেছে। লৌহনির্ম্মিত এক টবে সেই মূত্র পতিত হইতেছে।

কৃষ্ণবাবু বলিলেন,—"একি! একি!"

অধিকারী মহাশয় নিকটে আসিয়া উত্তর দিলেন,—"সন্ধ্যার পর হইতে বাহিরে গিয়া প্রস্রাবত্যাগের নিয়ম নাই; ঘরের ভিতর ঐ টবে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতে হইবে। রাত্রে যদি কাহারও বাহ্যে পায়, তাহা হইলে, এই ঘরের ভিতর বাহ্যে বসিতে হইবে।"

কৃষ্ণবাবু। এখানে আমরা প্রায় বাইশ তেইশ জন আসামী আছি,—সমস্ত রাত্রে ঐ টব পূর্ণ হইয়া ত ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ উঠিবে। তাহার উপর এ ঘরে দুই চারিজন ব্যক্তি যদি মলত্যাগ করেন, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে?

অধিকারী। রক্ষা কেন থাকিবে না, বাবু? ইহাই ত বারমাস হইয়া আসিতেছে।

শরীরেরনাম মহাশয়,—
যা সওয়াবে তাই সয়!!

কৃষ্ণবাবু হেঁটমুণ্ডে নীরব হইয়া রহিলেন। আমি ইত্যবসরে আর একটী মজা দেখিলাম। লোহার যে ছোট সরাখানি লইয়া কৃষ্ণবাবু জলশৌচ করিয়াছিলেন,—শিবু ডোম যে সরাখানি মাজিয়াছিল, সেই সরাখানিতে একটু জল লইয়া, তাহা সম্মুখে রাখিয়া, ব্রজবাবু মুদ্রিত-নয়নে, খাটের পাশে নিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রজবাবুর খাটের পার্শ্বদেশ, মূত্রত্যাগের টবের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। মূত্রজল-কণাপূর্ণ বায়ু, মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া, সে সময় ব্রজবাবুর শরীর সুশীতল করিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না!!

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

হাসে কি কমল-বন!

(১)

এসেছি বাঁশরী শুনে,
আকুল পরাণ মন,
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন!

হেথা কি সুনীল জলে
নীলাকাশ ভাসি' চলে,
উজল মুকুতা ফলে
রবি-করে অগণন—
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন!

(২)

হেথা কি বিরাজে চির-
মধু চির-মধুময়,
বাসিত সুবাসে ধীর
মলয় কি হেথা বয়;
শ্বেত শতদল সরে—
কাঁপে কি সমীর-ভরে
মরাল মরালী করে
তালে তালে সন্তরণ—
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন!

(৩)

হেথা কি না ভাসে নর
কিন্নর নয়ন-পথে,
বীণা-রব ওঠে শুধু
দূর পদ্মবন হ'তে;
জলে নভ-নীলিমায়
সে সুধা মিলিয়া যায়,
তীরে উপবন-ছায়
গেয়ে ওঠে পিকগণ—
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন!

(৪)

এ কি সে বিজনে দিব্য
মানসের সরোবর,
তীরে কি সে উপবন
স্বপনের মনোহর;
এ নিকুঞ্জে শুনি গান
চিরধন্য হয় প্রাণ,
চিরতৃষা অবসান
পানে কি এ সুধা-ধন—
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন!

২য় ভাগ। } ফাল্গুন। ১২৯৮। { ৩য় সংখ্যা।

মনুসংহিতার সার-মর্ম্ম।

ভূমিকা।

যেন একটু বাতাস ফিরিয়াছে। দুই এক জন নব্য শিক্ষিতকেও আজকাল সনাতন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন দেখা যাইতেছে। কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞানাভাবে, শাস্ত্রদর্শনে অসামর্থ্যে এবং কুশিক্ষা বশত পুরুষানুক্রমিক সংস্কার হইতে বিচ্যুত হওয়ায়—ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুযুবকগণের মনোভাব,আবর্ত্ত-পতিত পোতের ন্যায় মহা সঙ্কটে নিপতিত। এ সময়ে ধর্ম্মবক্তৃশ্রেষ্ঠ মহর্ষি মনুর উপদেশ-পরম্পরা, প্রচলিত ভাষায়, সাধারণ্যে প্রকাশ করিলে, কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে,—অন্ততঃ আমরা এইরূপ আশা করি। সেই আশাতেই উৎফুল্ল হইয়া আজ এই দুরূহতর মনুবিবৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

আশার মধ্যেও কিন্তু আশঙ্কা আছে। শারদী পূর্ণিমার চন্দ্রিকা-বিধৌত গগনমণ্ডলেও কদাচিৎ জলদরেখা দেখা যায়। আশঙ্কা,—ধর্ম্মজিজ্ঞাসু যুবকগণ, অস্থিরচিত্তে স্বল্পমাত্র পাঠ করিয়া মনু-সংহিতার তাৎপর্য্য-গ্রহণে বিপরীত-পথগামী হইতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ের নিয়মই এইরূপ। তাই, আমরা আশঙ্কিত-চিত্তে যুবকদিগকে বলি, ধৈর্য্য-ধরুন,—বেশ স্থিরচিত্তে ভাল করিয়া আলোচনা করুন। পূর্ণ আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, মনূক্ত এক একটী বিষয়, বিভিন্ন-উপক্রমে লিখিলাম

—

নাম।

মনূক্ত বিধি-নিষেধাদি-ঘটিত শাস্ত্রের নাম মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি। এই শাস্ত্রের অন্য নাম মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র।

শাস্ত্রবক্তা।

স্বায়ম্ভুব মনু, এই শাস্ত্র ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মরীচ্যাদি মুনিগণকে ইহা অধ্যয়ন করান। মহর্ষি ভৃগু, মনুর নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অপর মহর্ষিগণকে তাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন

স্মৃতির প্রামাণ্য

সমস্ত বেদ, বেদবেত্তা মন্বাদি ঋষিদিগের স্মৃতি, তাঁহাদের ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার শীল অর্থাৎ চরিত্র, সাধুদিগের সদাচার এবং আত্মতুষ্টি—এই সকল প্রমাণে ধর্ম্ম-নির্ণয় হয়। সমুদয় বেদ, ধর্ম্মের মূল; মনু সেই সমস্ত বেদের সর্ব্বার্থ-বেত্তা। অতএব মনুর স্মৃতি দ্বারা সকল বেদার্থ ও সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হয়। মনুর মতের বিপরীত ধর্ম্ম গ্রহণীয় নহে।

ইহাতে আছে কি?

এই মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে "সমুদায় ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে। বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের গুণ ও দোষ বর্ণিত হইয়াছে এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের পরম্পরাগত আচার-ব্যবহারও কথিত হইয়াছে।"

গ্রন্থের বিভাগ।

এই গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহার

প্রথম অধ্যায়ে——সৃষ্টি-প্রকরণ;
দ্বিতীয় অধ্যায়ে——চাতুর্ব্বর্ণ্যের বর্ণ-সংস্কার;
তৃতীয় অধ্যায়ে——গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম;
চতুর্থ অধ্যায়ে——জীবিকা;

পঞ্চম অধ্যায়ে——শৌচ-বিধি;
ষষ্ঠ অধ্যায়ে———বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম;
সপ্তম অধ্যায়ে———রাজনীতি;
অষ্টম অধ্যায়ে———ব্যবহার-শাস্ত্র;
নবম অধ্যায়ে———স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম ও দায়বিভাগ;
দশম অধ্যায়ে———ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি-প্রকরণও আপৎকালে জীবিকার উপদেশ;
একাদশ অধ্যায়ে—শুভাশুভ কর্ম্ম ও তাহার ফল, এবং দেশ, জাতি ও কুলানুযায়ী ধর্ম্ম;
দ্বাদশ অধ্যায়ে———কর্ম্মবিপাক, সত্ত্বাদি গুণের পরিচয়, বৈদিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রশংসা, বেদবেদজ্ঞ-প্রশংসা, আত্মতত্ত্ব এবং মনুতত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

এই সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অব্যক্ত-শক্তি পরমেষ্ঠী স্বয়ম্ভূ, সনাতন পুরুষ ছিলেন। আর সমস্তই অন্ধকার-স্থিত পদার্থের ন্যায় অপরিজ্ঞেয় ছিল। প্রলয়াবসানে, সেই স্বয়ম্ভূ সমুদয় জগৎ পুনরায় প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা তাঁহারই সৃষ্ট। ব্রহ্মা হইতে বহুতর স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টি। বিরাট্ পুরুষও এই ব্রহ্মার সৃষ্ট। বিরাট্ পুরুষ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণ—মনুর পুত্র, তাঁহারাও সৃষ্টি-কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। তৎপরে আর্ষ-সৃষ্টি, ব্রহ্ম-সৃষ্টির সহিত সম্মিলিত হইয়া জগতের সমুদয় অভাব ও অপূর্ণতা দূর করিল। এইরূপে জগৎসৃষ্টি ও প্রলয়, পুনঃপুন হইয়া থাকে।

কাল-বিভাগ।

নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত—এ গুলি ক্ষুদ্র-কালের সংজ্ঞা। এই কালবিভাগ, মনুষ্য ক্রিয়া দ্বারা হইয়া থাকে;—চক্ষুর নিমীলন-উন্মীলনের নাম নিমেষ; অষ্টাদশ নিমেষে কাষ্ঠা; ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা; ত্রিংশৎ কলাতে মুহূর্ত্ত। অহোরাত্রের পরিমাণ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্ত বটে; কিন্তু তাহা সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা বিভক্ত হয়। অহোরাত্র চতুর্ব্বিধ;—মানুষ, পৈত্র্য, দৈব এবং ব্রাহ্ম। এই সমুদয় অহোরাত্রের পরিমাণ উত্তরোত্তর অধিক। এতদ্ভিন্ন পক্ষ, মাস, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বৎসর, যুগ, চতুর্যুগ, মন্বন্তর—এই সমুদয় সংজ্ঞা দ্বারা কালের বিভাগ করা হইয়াছে।

যুগ-ভেদ।

মনুষ্যদিগের পরমায়ু, প্রভাব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অনুসারে যুগের গণনা হয়। চারি যুগ। তাহাদের নাম এই;—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতা যুগে ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর ছিল এবং কলিতে ১০০ বৎসর হইয়াছে।

পরমায়ুর অনুরূপ শক্তি হ্রাস হওয়াতে যুগভেদে মনুষ্যের ধর্ম্মের ও কিছু কিছু ভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছে। সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান কর্ম্ম ছিল; ত্রেতায় জ্ঞান প্রধান, দ্বাপরে যজ্ঞ প্রধান, কলিতে কেবল দান প্রধান। কলিযুগে, ধর্ম্মহানি এবং অধর্ম্মবৃদ্ধি অতিশয় হইয়া থাকে।

বর্ণ-ধর্ম্ম।

বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, বানর, কিন্নর প্রভৃতি জীব,—যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি-লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ মনুষ্যগণ ও আজন্মসিদ্ধ সত্ত্বগুণাদি-অনুসারে এক এক জাতিতে পরিগণিত হইয়াছে। এই জাতিকে বর্ণ বলা যায়।

মনুষ্য চারিবর্ণে বিভক্ত; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বর্ণানুসারে তাহাদের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে।

ব্রাহ্মণের কর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ।

ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়নও বিষয়ে অপ্রসক্তি।

বৈশ্যের কর্ম্ম—পশু-রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, ঋণ-দান, কৃষি।

শূদ্রের কর্ম্ম—উপরি-উক্ত তিন বর্ণের শুশ্রূষা।

আশ্রম ধর্ম্ম।

যেমন সকল মনুষ্যের বর্ণানুযায়ী এক এক প্রকার কর্ম্ম নির্দ্ধারিত আছে, তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের সমস্ত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম ক্রমে এক এক প্রকার ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা আছে; সেই ধর্ম্মকে আশ্রম-ধর্ম্ম বলে। আশ্রম চারি প্রকার;—১ম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ২য় গার্হস্থ্য-আশ্রম, ৩য় বানপ্রস্থাশ্রম, ৪র্থ সন্ন্যাস-আশ্রম।

বয়ঃক্রম ৬ বৎসর ২ মাসের পর আশ্রমে

প্রবেশ। এই প্রথমাশ্রমে ৩৬, ১৮ বা ১২ বৎসর কিংবা যতদিন প্রথমাশ্রমের ব্রতপালন এবং অন্তত বেদের এক শাখাধ্যয়ন না হয়, ততদিন থাকিয়া দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর বৃদ্ধদশার আরম্ভ পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য-আশ্রম। প্রথম বার্দ্ধক্য হইতে বা পৌত্রমুখ দর্শনান্তে বানপ্রস্থাশ্রম। বানপ্রস্থাশ্রমের পর পরমায়ুর চতুর্থভাগে সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত।

এইরূপে আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমনপূর্ব্বক সেই সেই আশ্রমের নিয়ম পালন করিতে হইবে। কেহই অনাশ্রমী অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—সংস্কার।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মধ্যে কতকগুলি সংস্কার ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের জন্মগ্রহণ কালে যে বীজদোষ ও গর্ভদোষ থাকে, নিম্নোক্ত নয়টী সংস্কার দ্বারা সে দোষ মোচন হয়।

(১) গর্ভাধান।
(২) পুংসবন।
(৩) সীমন্তোন্নয়ন।
(৪) জাতকর্ম্ম।
(৫) নামকরণ।
(৬) নিষ্ক্রামণ।
(৭) অন্নপ্রাশন।
(৮) চূড়াকরণ।
(৯) উপনয়ন।

দশম সংস্কার বিবাহ। এই সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ হয়।

এতন্মধ্যে উপনয়ন বর্ণধর্ম্ম; উপনীত ব্যক্তির ভিক্ষাদণ্ডাদি ধারণ, আশ্রম-ধর্ম্ম; দ্বিজাতিরা যে চিরদিন উপবীত ধারণ করেন, তাহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য।

গুণ-নৈমিত্তিকাদি-ধর্ম্ম।

বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম ভিন্ন আরও তিন প্রকার ধর্ম্ম আছে। রাজার প্রজাপালনাদি কর্ম্মকে গুণ ধর্ম্ম, পাপজন্য প্রায়শ্চিত্তকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম; এবং আপৎকালে করণীয় কর্ম্মকে আপদ্ধর্ম্ম বলা যায়।

চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম ও মর্য্যাদা।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা গুণ-নৈমিত্তিকাদি-ধর্ম্ম,—যে কোন ধর্ম্মের বিধান উক্ত হয়, তাহা দ্বিজাতির ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। শূদ্রের যোগ্যতা-অনুসারে উন্নত ধর্ম্মের ব্যবস্থা হয়। দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের নিমিত্ত বহুল ধর্ম্ম-নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে। তত ধর্ম্ম-নিয়ম পালন জন্য ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা সর্ব্বোচ্চ। উৎপত্তি-প্রকরণ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম ও মর্য্যাদা নিরূপণ হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকরণে ব্রাহ্মণের (মুখের) কর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের (বাহুর) কর্ম্ম রাজ্যরক্ষা, বৈশ্যের (উরুর) কর্ম্ম কৃষিবাণিজ্যাদি এবং শূদ্রের (পদস্থাচিত) কর্ম্ম ত্রিবর্ণের সেবা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ভগবান স্বয়ম্ভুর উক্তি এই;—পুরুষের শরীর,—পবিত্র; তাহার নাভির ঊর্দ্ধভাগ,—পবিত্রতর; তাহা হইতে মুখ,—পবিত্রতম। সুতরাং ব্রহ্ম-মুখোৎপন্ন ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়,—উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মের সনাতন মূর্ত্তিস্বরূপ; তেমনি ক্ষত্রিয় রাজা, ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের সারাংশস্বরূপ। সংসার-রক্ষার নিমিত্ত এই বর্ণানুসারী কর্ম্ম ও মর্য্যাদাভেদ নিরূপিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা।

মস্তকের সহিত দেহের যেরূপ সম্বন্ধ ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের সেইরূপ সম্বন্ধ থাকাতে ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যের প্রভু হয়েন। ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম-ভাণ্ডার বেদরক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত সংসারকে রক্ষা করেন। দেবতারা ও পিতৃলোকেরা ব্রাহ্মণের মুখেই হবনীয় দ্রব্য এবং শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন। ভূত সকলের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ; প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ; মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ; বিদ্বানের মধ্যে যাঁহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; আবার সেই (শাস্ত্রোক্ত) কর্ত্তব্য-কর্ম্মকারীদিগের মধ্যে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবেত্তারাই শ্রেষ্ঠ হয়েন।

ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি-দেশ-সম্ভূত উক্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবেন।

দ্বিজের বসতিযোগ্য স্থান।

যজ্ঞিয় দেশ।—যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে, তাহা 'যজ্ঞিয় দেশ। তদ্ভিন্ন

অপর স্থান ম্লেচ্ছদেশ। ব্রাহ্মণগণ প্রযত্ন-সহকারে এই যজ্ঞিয় দেশ আশ্রয় করিবেন।

ব্রাহ্মণের বসতি-যোগ্য স্থানের মধ্যে নিম্নোক্ত দেশ সকল উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর।

আর্য্যাবর্ত্ত।—ইহার সীমা,—উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র।

মধ্যদেশ। ইহার সীমা,—উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র।

ব্রহ্মর্ষি-দেশ।—কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন।

ব্রহ্মাবর্ত্ত।—এই দেশ-স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত।

সদাচার-ধর্ম্ম।

সদাচারকে ধর্ম্মের এক প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। "পরম্পরাগত আচার যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ইহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই প্রতিপন্ন আছে।" "আচার-বিহীন ব্রাহ্মণ বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন না। কিন্তু যদি তিনি সদাচার-সম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন।" "মুনিগণ আচার দ্বারা ধর্ম্ম প্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিতা অবগত হইয়া আচারকেই সকল তপস্যার প্রধান কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।" স্ত্রী ও শূদ্রেরা যে কোন মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাও দ্বিজাতির করণীয় হয়। শাস্ত্রের অনিষিদ্ধ কোন বিষয়ে মনের প্রীতি হইলে, তাহারও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

প্রথম আশ্রম।

উপনয়ন—ব্রহ্মচর্য্য।

যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ পূর্ব্বক গুরুর নিকট সাবিত্রী-উপদেশ গ্রহণ করাকে উপনয়ন বলা হয়।

জাতকর্ম্ম নামকরণাদি যে সকল সংস্কার হয়, তাহাতে শিশুর কোন কার্য্য থাকে না। উপনয়ন সংস্কার হইতে বালক ক্রিয়াশীল হয়। অতএব উপনয়নকে আশ্রম প্রবেশের দ্বার বিবেচনা করা যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানগণ উপনয়নের পূর্ব্বে শূদ্রবৎ থাকেন। এই সংস্কার দ্বারা তাঁহারা দ্বিজ-শব্দ-বাচ্য হয়েন। মাতার গর্ভে যে জন্মলাভ হয়, তাহা প্রথম জন্ম; উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম। উপনয়ন দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ-জাতি মধ্যে পরিগণিত হয় বটে; কিন্তু আচার্য্যের নিকট সাবিত্রী উপদেশ লাভ দ্বারা যে জাতি হয়, তাহা অজর ও অমর। সে জাতি-লক্ষণ ইহকালে ও পরকালে দেদীপ্যমান হয়।

উপনয়নের কাল।

ব্রাহ্মণের পক্ষে	গর্ভ হইতে	৮ম বৎসর	মুখ্য
ক্ষত্রিয়ের "	"	১১শ বৎসর।	"
বৈশ্যের "	"	১২শ বৎসর।	"

বিশেষ বিশেষ কামনা অনুসারে,—

ব্রাহ্মণের পক্ষে	গর্ভ হইতে	৫ম বৎসরে;
ক্ষত্রিয়ের "	"	৬ষ্ঠ বৎসরে এবং
বৈশ্যের "	"	৮ম বৎসরে উপনয়ন হওয়া বিধি।

মুখ্যকালে উপনয়নের ব্যাঘাত হইলে,—

ব্রাহ্মণের পক্ষে	১৬,
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে	২২,
বৈশ্যের পক্ষে	২৪ বৎসর বয়ঃক্রম

পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যাহার উপনয়ন না হয়, তাহাকে ব্রাত্য বলে। ব্রাত্য ব্যক্তি নিন্দিত হয়; তাহার সহিত কোন ব্যবহার করা যায় না।

উপনয়ন-বিধি।

উপনীত—ব্রহ্মচারী এই সকল চিহ্ন ধারণ করিবে,—

চিহ্ন	নির্ম্মাণোপকরণ।		
	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
উত্তরীয়	কৃষ্ণসার-চর্ম্ম	রুরু-চর্ম্ম	ছাগ-চর্ম্ম
বস্ত্র	শণ	ক্ষৌম	মেষলোম
মেখলা	মুঞ্জ	মূর্ব্বা	শণ
দণ্ড	বিল্ব বা পলাশ (কেশপর্য্যন্ত দীর্ঘ)	বট বা খদির (ললাটপর্য্যন্ত দীর্ঘ)	পীলু বা উডুম্বর (নাসাপর্য্যন্ত দীর্ঘ)
উপবীত	কার্পাস	শণ	মেষলোম।

এই সকল চিহ্নধারী ব্রহ্মচারী সূর্য্যোপস্থান পূর্ব্বক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া মাতা, ভগিনী, বা মাতৃস্বসা প্রভৃতির নিকট প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। তার পর আর তাঁহাদিগের নিকট ভিক্ষা করিবে না। গুরুবংশে, আপনার জ্ঞাতিবর্গের নিকট এবং বন্ধুবর্গের গৃহে ভিক্ষা করিবে না। নিতান্ত অভাবপক্ষে বন্ধুবর্গের নিকট, তদভাবে জ্ঞাতির

নিকট, তদভাবে গুরুজ্ঞাতিদিগের নিকট ভিক্ষা করিবে। সেই ভিক্ষান্ন গুরুকে নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে, আচমন করিয়া পূর্ব্বাস্যে ভোজন করিবে।

শিক্ষা-বিধান।

গুরু, শিষ্যকে উপনীত করিয়া প্রথমত তাহাকে আদ্যোপান্ত শৌচ ক্রিয়া শিক্ষা দিবেন। পরে স্নান, আচমন, প্রভৃতি আচার শিক্ষা দিবেন। তাহার পর, সন্ধ্যাবন্দন ও সায়ংপ্রাতঃ সমিধ্-হোমের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয়, উপদেশ দিবেন।

ধার্ম্মিক অধ্যাপক, শিষ্যদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ না করিয়া নানা প্রকারে সদ্‌ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিবেন। যাহাতে তাঁহার প্রতি শিষ্যের প্রীতি জন্মে, এমন বাক্য প্রয়োগ করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্য।

উপনীত ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন কাল-পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করিয়া নিম্নোক্ত বিধি-নিষেধ পালন করিবেন। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত।

বিধি,—

ইন্দ্রিয়জয়, প্রতিদিন জল-পুষ্প-গোময়-কুশ-সমিধ্-আদি আহরণ, অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে 'মাধুকরী' বৃত্তি অনুসারে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ, স্নান, দেবতা ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতাদিগের পূজা, সন্ধ্যাবন্দন, সায়ংপ্রাতর্হোম,—বেদপাঠ, গুরুর নিকট সর্ব্ব প্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি পিতৃবৎ ভক্তি, গুরুর প্রসন্নতা-সাধন, গুরুজনের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন, গৃহস্থ-কর্ত্তব্য শৌচাপেক্ষা দ্বিগুণ শৌচানুষ্ঠান।

নিষেধ,—

মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ রসাল দ্রব্য, প্রাণিহিংসা, সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন, দিবাভাগে শয়ন, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার, বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ, লোভ, স্ত্রীসঙ্গ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ, পরের দোষোদ্ঘোষণ, মিথ্যা কথন, মন্দ অভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন করা, পরের অনিষ্টাচরণ, ক্ষৌরকর্ম্ম, একবার দিবাভাগে একবার রাত্রিতে—এই দুই বারের অধিক ভোজন।

এই সকল বিধি-নিষেধাত্মক ব্রতনিয়ম পালনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া প্রণব ব্যাহৃতি-সহকৃত গায়ত্রীজপ ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা আপনার তপস্যাবৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। যাঁহার বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহার মিথ্যাকথা নাই এবং রাগ দ্বেষাদি দ্বারা মন দূষিত হয় না, যাঁহার মন ও বাক্য নিষিদ্ধ বিষয় হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত, সেই ব্যক্তি বেদ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের জ্ঞান জনিত সকল ফল প্রাপ্ত হয়েন।

বেদাধ্যয়ন ও উপদেশ গ্রহণ।

উপনীত ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিয়া ৩৬ বৎসর ব্যাপিয়া ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবেন। যদি তাহাতে অসমর্থ হয়েন, তবে প্রত্যেক বেদ ৬ বৎসর পড়িয়া ১৮ বৎসরে পাঠ সমাপন করিবেন। যদি তাহাও না হয়, তবে প্রত্যেক বেদ ৩ বৎসর পড়িয়া ৯ বৎসরে তিন বেদ অধ্যয়ন করিবেন। অথবা যত কালে ঐ বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতে পারেন, ততকালে গুরুগৃহে অবস্থিত থাকিয়া তাহা করিবেন। যদি তাহাতেও অসমর্থ হয়েন, তবে স্বীয় শাখা অধ্যয়ন করিয়া আর ২।১ শাখা, না হয়, মাত্র স্বশাখা অধ্যয়ন করিবেন। আচার্য্যের নিকট লৌকিক, বৈদিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ জ্ঞান লাভ করিবেন। যিনি বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তাঁহার নিকটেও উপদেশ গ্রহণ করা বিহিত। সুভাষিত বাক্য বালকের নিকটেও শিক্ষা করা যাইতে পারে। মোক্ষতত্ত্ব-উপদেশ, নীচ জাতির নিকটেও গ্রহণীয়।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য,—যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুকুলে থাকিয়া গুরুর—তদভাবে গুরুপুত্রাদির সেবা করেন; এবং গৃহে প্রত্যাগমন ও বিবাহাদি গার্হস্থ্যাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম না করেন, তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

সমাবর্ত্তন।

ব্রহ্মচারী ব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারী যে গুরুগৃহ হইতে পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহাকে সমাবর্ত্তন বলে। সমাবর্ত্তানন্তর ব্রহ্মচারীকে ব্রতাঙ্গ স্নান করিতে হয়।

দ্বিতীয়াশ্রম—গার্হস্থ্য।

ঋণত্রয়।

মনুষ্য, ঋণত্রয়ে জড়িত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ঋণত্রয়,—ঋষি-ঋণ; দেব-ঋণ; পিতৃ-ঋণ। শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা ঋষি-ঋণের, যজ্ঞদ্বারা দেব-ঋণের এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণের পরিশোধ হয়। প্রথমাশ্রমে প্রথমোক্ত দুই ঋণ পরিশোধ

হইতে পারে ; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিলে শেষোক্ত পিতৃঋণ হইতে মোচন হইতে পারে না। এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভ না করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন ও মোক্ষ ইচ্ছা করিলে সদ্গতি লাভ হয় না। পিতৃঋণ পরিশোধার্থ সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজন ; তন্নিমিত্ত দার-পরিগ্রহ কর্ত্তব্য।

বিবাহ।

দার-পরিগ্রহের প্রশস্ত বিধি এইঃ—

(১) গুরু অনুমতি করিলে সমাবর্ত্তনানন্তর ব্রতাঙ্গ স্নান সমাপন করিয়া দ্বিজাতি, দোষ-বর্জ্জিতা সুলক্ষণাক্রান্তা সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবে।

(২) যে স্ত্রী মাতামহ সগোত্রা, মাতামহ পক্ষের বা মাতৃবন্ধুর পঞ্চপুরুষান্তর্গতা না হয় এবং পিতার সগোত্রা পিতৃপক্ষের বা পিতৃবন্ধুর সপ্তম পুরুষান্তর্গতা না হয় এমন স্ত্রী বিবাহ করিবে।

(৩) ক্রিয়া-হীন, সঞ্চারি-দুষ্ট-রোগাক্রান্ত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত কুলের কন্যাকে গ্রহণ করিবে না।

বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার ; বিশেষতঃ দ্বিজ-রমণীর এই সংস্কারই উপনয়ন-স্থানীয়। এই সংস্কার দ্বারা মনুষ্য শুদ্ধভাবে পত্নী লাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়। সবর্ণা প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী-পদ-বাচ্য হয়েন।

বিবাহের অপ্রশস্ত বিধি ও বিচার।

বিবাহ বিষয়ে এই প্রশস্ত বিধি ভিন্ন আরো অনেক প্রকার বিধি ও ব্যবস্থা আছে। তত্তদ্বিষয়ে পূর্ব্বাপর কালের রাজা ও ঋষিদিগের মত, বিচার এবং ইতিহাস গ্রথিত আছে। বিবাহ প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন।

দ্বিবিধ বিবাহ।

বর্ণ বিচারে বিবাহ দ্বিবিধ ;—সবর্ণা-বিবাহ, অনুলোম-বিবাহ।*

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারিবর্ণের লোক স্ব স্ব বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহা সবর্ণ বিবাহ হয়। উচ্চ বর্ণের পুরুষ যদি নিম্ন বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করে, তাহাকে অনুলোম বিবাহ বলে।

একাধিকবার বিবাহ।

স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ, সকল জীবের মধ্যেই আছে। সংস্কার-সম্পন্ন মনুষ্যের মধ্যে এই ব্যবহার নিয়মবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম বারেই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ দ্বারা মনুষ্যের গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন ও বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইয়া যায়। পরন্তু নানা কারণে পুনশ্চ স্ত্রীগ্রহণে প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ঘটে, একাধিকবার বিবাহকে অধিবেদন বলে। অধিবেদনের কয়েকটী নিয়ম আছে। স্বেচ্ছামাত্রে অধিবেদন হয় না।

বিবাহ প্রণালী।

বিবাহের প্রণালী অষ্টবিধ ; যথা—

বিবাহ	প্রধান অঙ্গ।
ব্রাহ্ম	অধীত-বেদ, কৃতসমাবর্ত্তন, বরকে আহ্বানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া কন্যাদান।
দৈব	যজ্ঞ-কর্ম্ম-কর্ত্তা পুরোহিতকে দক্ষিণারূপে কন্যাদান।
আর্ষ	বরপক্ষ হইতে ধর্ম্মের জন্য এক বা দুই গোমিথুন লইয়া কন্যাদান।
প্রাজাপত্য	তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ কর, এই কথা বলিয়া উপস্থিত বরকে অর্চ্চনা করিয়া কন্যাদান।
আসুর	কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে কন্যা গ্রহণ।
গান্ধর্ব্ব	কন্যা এবং বরের পরস্পর-অনুরাগ-নিবন্ধন বিবাহ।
রাক্ষস	রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ।
পৈশাচ	নিদ্রিতা মদবিহ্বলা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন।

বিবাহের উত্তমাধম বিচার।

বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান-উৎপাদন। সন্তানের গুণ অনুসারে কুলের হীনতা বা উৎকর্ষ সাধন হয়। সেই ফল ধরিয়া বিবাহের গুণাগুণ বিচার হইয়া থাকে।

যেমন স্ত্রীকে ও যে বিধিতে বিবাহ করা যায়, তদনুসারে সন্তানের গুণ জন্মে। এই জন্য সমান বর্ণের সুলক্ষণা কন্যাকে ব্রাহ্ম বিধিতে গ্রহণ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবাহ। ব্রাহ্মবিবাহে-বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান,—পিত্রাদি দশপুরুষ, পুত্রাদি দশ পুরুষ এবং আপনি—এই একবিংশতি পুরুষের পারত্রিক মঙ্গল-দায়ক হয়েন।

সবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ প্রশস্ত কল্প। বিবাহ সংস্কার সবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

* একালে অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বীজের উৎকর্ষ বশতঃ অনুলোম বিধিতে বিবাহিতা অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট বর্ণের সমান হইতে পারে।

প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ বিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান,—বিদ্বান, সাধু, সুরূপ, ধনবান, যশস্বী, ভোগবান এবং দীর্ঘায়ু হয়। সুতরাং উক্ত চতুর্ব্বিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব রাক্ষস। বৈশ্য শূদ্রের, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্বই প্রশস্ত। আসুরও অভাবপক্ষে চলে। শেষোক্ত পৈশাচ বিবাহ সকলের পক্ষেই সর্ব্বাধম।

শুল্ক গ্রহণ।

কন্যার পিতা নিঃস্বার্থ হইয়া বিবাহ বিধিতে কন্যা দান করিবেন। তদুপলক্ষে বর পক্ষ হইতে কোন প্রকারে কিছু শুল্ক গ্রহণ করিবেন না। লোভ বশতঃ অর্থ গ্রহণ করিলে কন্যা বিক্রয় করার জন্য পাপ হয়। আর্ষ বিবাহে দত্ত গোযুগলকে শুল্ক বলিয়া কেহ কেহ দোষ দেন; বস্তুতঃ তাহা শুল্ক নহে; তাহা ঐ বিবাহ প্রণালীর অঙ্গীভূত ক্রিয়া-মাত্র। কন্যাকে বরপক্ষেরা প্রীতি-পূর্ব্বক যে ধনদান করেন, পিত্রাদি তাহা গ্রহণ করিবেন না। তাহা স্ত্রীদিগের অর্হণ—যৌতক মাত্র।

বিবাহের বয়ঃক্রম।

কন্যার বয়ঃক্রম অপেক্ষা বরের বয়ঃক্রম অন্যূন আড়াই গুণ, বা তিন গুণ হওয়া চাই। ব্রহ্মচর্য্য-পালনের পর যখন বিবাহ করা নিয়ম, দ্বিজের ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ প্রায়ই ঘটে না। স্ত্রী-লোকের বিবাহ রজোদর্শনের পূর্ব্বে হওয়া বিধি।

স্ত্রী-গমন।

কৃতদার ব্যক্তির স্ত্রীগমনের বিধান এই :——

আপন ভার্য্যার প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিবে। ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিবে। ভার্য্যার প্রীতির জন্য ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়েও গমন করিতে পারিবে, তাহাতে পাপ জন্মে না; কিন্তু ঋতুকালেই হউক, বা অন্য সময়েই হউক, অমাবস্যাদি পর্ব্বে গমন করিবে না। স্ত্রীলোকের ঋতু ষোড়শ রাত্রি স্বাভাবিক। তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি অতি নিন্দিত। একাদশ এবং ত্রয়োদশ রাত্রিও নিষিদ্ধ। তদ্ভিন্ন দশ রাত্রি স্ত্রীগমনে প্রশস্ত।

পুত্রত্ব।

পুত্রের সহিত পিতার এরূপ অভেদ সম্বন্ধ যে পিতাই যেন বীজরূপে পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনশ্চ ভূমিষ্ঠ হন। পুত্র এবং পুত্রের পুত্র দ্বারা লোক প্রবাহ রক্ষা হয় বলিয়া পুত্র উৎপাদনের এবং পুত্র পৌত্রাদি জন্ম দর্শনের ফল—পুণ্যলাভ। পুত্র জন্মিলে পিতৃঋণ শোধ হয়। পুত্র দ্বারা স্বর্গলাভ হয়; পৌত্র প্রপৌত্রাদি দ্বারা সেই স্বর্গলাভ চির-স্থায়ী হয়।

বংশ রক্ষা এবং ধনের উত্তরাধিকার করিবার জন্য সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে পুত্রকামনা করে। যদি পুত্র না জন্মে, তবে বিবিধ প্রকারে পুত্র-প্রতি-নিধি কল্পনা করা হয়। পুত্র ও পুত্র প্রতিনিধি—সাকল্যে দ্বাদশ প্রকার।

ঔরস—সবর্ণা পত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করা যায়।

ক্ষেত্রজ—আপনার স্ত্রীতে অপর সাপিণ্ডাদি ব্যক্তি দ্বারা যথানিয়মে যে পুত্র উৎপন্ন করিয়া লওয়া হয়।

দত্তক—অপুত্র অবস্থা দেখিয়া অপরে প্রীতিপূর্ব্বক যে পুত্র দান করে।

কৃত্রিম—যে পুত্রবৎ সেবা করিয়া পুত্ররূপে গৃহীত হয়।

গূঢ়োৎপন্ন—আপনার ভার্য্যাতে অপর কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির উৎপাদিত।

অপবিদ্ধ—মাতা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পালিত-পুত্র।

কানীন—পত্নীর কন্যাকালে কোন পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন।

সহোঢ়—সগর্ভা বিবাহিতা পত্নীর ঐ গর্ভজাত পুত্র।

ক্রীত—পিতা মাতার নিকট হইতে মূল্য দ্বারা ক্রীত।

পৌনর্ভব—পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা স্ত্রী পুনর্ব্বার স্বামী গ্রহণ করিয়া যে পুত্র উৎপাদন করে।

স্বয়ংদত্ত—যে স্বয়ং আপনাকে দান করিয়াছে।

পারশব—ব্রাহ্মণের শূদ্রা-পত্নী-গর্ভজাত পুত্র।

এতন্মধ্যে ঔরসপুত্রই পিতার সম্পূর্ণ উত্তরাধি-কারী যথার্থ পুত্র। অপর যে ক্ষেত্রজাদি একাদশ পুত্র—পুত্রপ্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত। পুত্রাভাবে পিণ্ড লোপাদি দোষ হয়, এই জন্য এইরূপ পুত্র-প্রতিনিধি আবশ্যক।*

* এক্ষণে ঔরস এবং দত্তক এই দ্বিবিধ পুত্র বিহিত।

পুত্রিকাপুত্র—দৌহিত্র।

পূর্ব্বে এইরূপ প্রথা ছিল যে, অপুত্র ব্যক্তি মনঃস্থ করিয়া পরে প্রকাশ করিতেন যে এই কন্যার সন্তান হইলে সে তাঁহার শ্রাদ্ধ-পিণ্ডের অধিকারী পুত্র হইবে। এই বিধিতে কন্যা সম্প্রদত্তা হইলে তাহাকে পুত্রিকা এবং তাহার পুত্রকে পুত্রিকাপুত্র বা পৌত্রিকেয় বলে। পুত্রিকা-পুত্র বা পৌত্রিকেয় পৌত্রের সমান। পূর্ব্বকালে দক্ষপ্রজাপতি আপনার বংশ বৃদ্ধির জন্য অনেক পুত্রিকা করিয়াছিলেন।

পঞ্চযজ্ঞ-শ্রাদ্ধ।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদাধ্যাপন ও বেদাধ্যয়ন।

পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ বা তর্পণ।

দেবযজ্ঞ—হোম।

ভূতযজ্ঞ—সর্ব্বপ্রাণি-উদ্দেশে যথাবিধি অন্নদান।

নৃযজ্ঞ—অতিথি সৎকার।

শ্রাদ্ধ নিত্য কর্ত্তব্য। প্রতিদিন শ্রাদ্ধ-করণে অসমর্থ ব্যক্তি, স্নান করিয়া জল দ্বারা পিতৃ-লোকের যে তর্পণ করেন, তদ্দ্বারা নিত্য শ্রাদ্ধের ফল হয়। তদ্ভিন্ন মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক, আভ্যুদয়িক, একোদ্দিষ্ট, সপিণ্ডীকরণাদি বহুবিধ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।

শ্রাদ্ধ বিধি।

শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্রাহ্মণেরাই দেবতা ও পিতৃগণের প্রতিনিধিস্বরূপ। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ ও তাঁহাদের সৎকার করা প্রথম ও প্রধান কর্ম্ম।

বেদার্থবিৎ, বেদবক্তা, ব্রহ্মচারী, গোসহস্রদাতা, শতবর্ষবয়স্ক, শ্রোত্রিয়বংশজ অর্থাৎ দশপুরুষ পর্য্যন্ত যাহাদিগের মধ্যে বেদাধ্যয়নের বিচ্ছেদ নাই,—এই প্রকার শ্রুতশীলসম্পন্ন, পংক্তিপাবক ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। যে সকল ব্রাহ্মণের জন্মগত এবং কর্ম্মগত দোষ আছে, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না। পিতৃগণ যেমন রাগদ্বেষাদি শূন্য, দয়াদি-অষ্টগুণযুক্ত, পবিত্র দেবাত্মা, সেইরূপ নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণদিগের এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তার শুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন হওয়া উচিত। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েরই সংযমাদি আবশ্যক।

মনুর পুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদিগের সন্তান সকলকে পিতৃগণ বলা যায়। এই পিতৃগণ সোমপ, হবির্ভুজ, আজ্যপ, সুকালিন্ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েন। সনাতনী শ্রুতি অনুসারে পিতৃলোককে বসুগণ, পিতামহলোকদিগকে একাদশ রুদ্র ও প্রপিতামহলোকদিগকে দ্বাদশ আদিত্য বলা যায়। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণকে এইরূপে দেবতাবৎ চিন্তা করিতে হয়।

শ্রাদ্ধক্রিয়া।

স্বভাবশুদ্ধ স্থানে কুশযুক্ত আসনে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট হইলে শ্রাদ্ধকর্ম্ম আরম্ভ হইবে। ব্রাহ্মণেরাই দেবতা ও পিতৃগণের প্রতিনিধি। সেই ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠা স্থান স্বরূপ দুই আসন রচনা হইবে। দেব-ব্রাহ্মণের আসনে দুই কুশ এবং পিতৃ ব্রাহ্মণের আসনে এক কুশ রাখিয়া গন্ধ মাল্য অর্ঘ্য জল ও তিলাদি দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবে। পরে হোম করিবে। হোমের অবশিষ্ট হবিঃশেষ দ্বারা তিনটী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা যথাবিধানে পিতৃপিতামহাদির উদ্দেশে সেই কুশের উপর প্রদান করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণ-গণকে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। সমাগত অতিথি ও ভিক্ষুকদিগকেও তৃপ্তিসাধক ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্রাহ্মণদিগকে বেদ স্মৃতি পুরাণ এবং মহাভারতাদি ইতিহাস শ্রবণ করাইবে। পরমাত্মবিষয়ক তত্ত্ব কথা সকল পিতৃলোকের অভীপ্সিত।

শ্রাদ্ধে প্রার্থনা।

শ্রাদ্ধশেষে পিতৃগণের নিকট এই প্রার্থনা করিবে ;—আমাদিগের বংশে দাতৃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ সকল পরিবর্দ্ধিত হউক। অধ্যয়ন অধ্যাপন দ্বারা বেদশাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হউক। পুত্র পৌত্রাদি সন্ততি সকল পরিবর্দ্ধিত হউক। শ্রদ্ধা ভক্তি যেন আমার কুলে কাহারও কখন অপগত না হয় এবং দান করিবার জন্য যথেষ্ট ধনাদি সম্পত্তি হউক।

পঞ্চযজ্ঞের অবশিষ্ট কর্ম্ম।

অতিথি-সেবা নৃযজ্ঞ শব্দে আখ্যাত হয়। অতিথি সেবা শ্রাদ্ধাদিবৎ নিত্য কর্ত্তব্য। কোন গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে ভোজন, শয়ন, পানীয়, ফলমূল এবং প্রিয়বচনাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা অবশ্য করিবেন.

না করিলে মহাপাপ। অতিথির কর্ত্তব্য এই যে, তিনি যেন কোনরূপে গৃহস্থের পীড়াকর না হয়েন। অন্ত্যজ চাণ্ডাল পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবৎ প্রাণীকে যথাবিধানে অন্নদানের নাম ভূতযজ্ঞ। বৃক্ষাদির জীবনও জলসেকাদি দ্বারা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ভিক্ষুককে যে অন্ন দেওয়া যাইবে তাহা যেন একগ্রাসের ন্যূন না হয়।

গার্হস্থ্যধর্ম্মে উপদেশ।

গার্হস্থ্যধর্ম্মের উপদেশ এই যে—বিঘসাশী ও অমৃতভোজী হইবে। ব্রাহ্মণদিগের ভোজনাবশিষ্ট অন্নাদিকে বিঘস এবং যজ্ঞের অবশিষ্ট পুরোডাশকে অমৃত বলা যায়। দেব, ঋষি, পিতৃ ও মনুষ্যগণ এবং গৃহদেবতা সকলকে অন্ন দ্বারা পূজা করিয়া গৃহস্থ ব্যক্তি শেষান্ন ভোজন করিবেন। আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বিদ্যাধ্যয়ন ও যাদৃশ কুলাচার, তদনুরূপ বেশ-ভূষাদি করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবে।

নীতি ও সদাচার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের লোকের কর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন। অতএব কোন কোন বিষয়ে তাহাদের পালনীয় নীতিরও পার্থক্য ও বিশেষত্ব আছে। যাহা কেবল ব্রাহ্মণের জন্য বলা হইয়াছে তাহাতে অন্য বর্ণের অধিকার ক্রমশঃ জন্মিবে, অথবা তাহার শক্তি অনুসারে তাহা পালন করিবে, ইহা অভিপ্রেত।

ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবসন্ন হইলেও কদাপি অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। অধর্ম্মের দ্বারা প্রথমে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু পরে পুত্রে বা পৌত্রে, তাহার ফল হয়; শেষে সমূলে তাহার বিনাশ হয়।

সত্যধর্ম্ম, সদাচার ও শুচিত্ব বিষয়ে সতত অভিলাষ করিবে; শিষ্য, পত্নী, পুত্র, ছাত্র, ভৃত্য, ইহাদিগকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিবে। সত্য কথন দ্বারা বাক্য সংযম; বাহুবলে কাহারো পীড়া উৎপাদন না করায় বাহু সংযম; এবং যথালব্ধ আহার দ্বারা উদর সংযম করিবে। ধর্ম্মের বিরোধী অর্থ ও কামনা পরিত্যাগ করিবে। হস্ত, পদ, নয়ন ও বাক্যের চঞ্চলতা ত্যাগ করিবে।

যম—অর্থাৎ দয়া ক্ষমা, ধ্যানাদি অন্তঃকরণের ভাবশুদ্ধি এবং নিয়ম—অর্থাৎ স্নান, উপবাস, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম ও শুশ্রূষা—এই যম ও নিয়ম উভয়ই পালন করিবে।

সত্য কথা বলিবে। প্রিয় কথা বলিবে। যাহা অপ্রিয় অথচ সত্য, তাহা (ইচ্ছাপূর্ব্বক) বলিবে না। কিন্তু প্রিয় হইলেও মিথ্যা কথা কখনই বলিবে না। স্পষ্ট কথা বলিবে। বঞ্চনাভিপ্রায়ে শ্লিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবে না। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া প্রকাশ করিবে না।

কাহারও মনে কষ্ট দিবে না। আপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। ব্রাহ্মণাদির ছায়া লঙ্ঘন করিবে না।

সরল হইবে। কুটিলতা, কপটতা, বক-ধার্ম্মিকতা, বিড়াল-ব্রতিকতা, ধর্ম্মধ্বজিত্ব ত্যাগ করিবে। যে আপনাকে অন্যথাভূত করিয়া প্রকাশ করে, তাহার পাপ অসীম।

দম্ভ, মাৎসর্য্য ত্যাগ করিবে। অভিমানী হইয়া থাকিবে না। যাহর যেরূপ মান ও মর্য্যাদা, তদনুসারে তাহাকে অভিবাদনাদি করিবে।

আচার্য্য, পুরোহিত, মাতৃপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় গুরুজন, গৃহাগত, আগন্তুক, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতা-পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা ও ভৃত্যবর্গ,—ইহাদের সহিত এমন সম্পর্ক যে, মনের কষ্ট ও বিবাদের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহা পরিহার করিয়া ইহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে হয়।

পর-হিংসা বা পর-নিন্দা করিবে না, কটু ও কর্কশ বচন বলিবে না। পরের কোনপ্রকার অনিষ্টাচরণ করিবে না। পরের দ্রব্য অপহরণ করিবে না। যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান, গৃহাদি বাহিরের বস্তু (অব্যবহৃত থাকিলেও) সে ব্যক্তি না দিলে লইবে না। পরদারাভিগমন অপেক্ষা পাপ ইহলোকে আর নাই।

আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন করিতেই হইবে, এইরূপ ভাবে দৃঢ়তা আছে। যাঁহার শান্ত স্বভাব, যিনি শীতোতপাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, যিনি ক্রূরাচারীদিগের সংসর্গে থাকেন না, যিনি পরের হিংসা করেন না, তিনি ইন্দ্রিয় সংযম ও দানাদি দ্বারা স্বর্গলাভ করেন।

বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিধবা, পোষ্য ও ভৃত্য বর্গকে আহার করাইয়া গৃহস্থ দম্পতি, শেষে ভোজন করিবে।

দান ও প্রতিগ্রহ বিষয়ে পাত্রাপাত্র বিচার কর্ত্তব্য। বিদ্যা ও তপস্যা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, দানের

বিশিষ্ট পাত্র। কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে, দ্বেষ না করিয়া, যথাশক্তি দান করিবে। কখন দানের এমন সৎপাত্রও উপস্থিত হইতে পারেন, যাঁহাকে দান করিলে সর্ব্বপ্রকারে উদ্ধার পাওয়া যায়।

ধন, ধান্য, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, দীপ, ভূমি, স্বর্ণ, রৌপ্য, গৃহ, গো, যান,—এই সকল বস্তু দানের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ভীতকে অভয় দানাদি অন্যবিধ দানও আছে। বিদ্যাদান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বিনীতভাবে শ্রদ্ধা সহকারে দান করিতে হয়। যে, অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক বা দম্ভভাবে দান করে, অথবা দান করিয়া তাহার ঘোষণা ও গৌরব করে, তাহার দানে ফল হয় না।

বারংবার প্রতিগ্রহ করিলে প্রভাব নষ্ট হয়। তপস্যা ও বেদাধ্যায়নাদি করিয়া কেবল প্রতিগ্রহ-লোলুপ ব্রাহ্মণ নিন্দাস্পদ। প্রাজ্ঞব্যক্তি যদি ক্ষুধায় অসমর্থ হয়েন, তথাপি যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবেন না।

বিচার করিয়া অন্নগ্রহণ করিবে। মত্ত, ক্রোধী, ব্যাধিযুক্ত, পিশুন, কৃতঘ্ন, কূটসাক্ষী নিষ্ঠুরকর্ম্মা, গোঘাতী, ভ্রূণঘাতী, চৌর, কুবৃত্তিজীবী, রজস্বলা স্ত্রী, ভ্রষ্টা স্ত্রী, ভ্রষ্ট স্ত্রীর ভর্ত্তা,—এই সকল লোকের অন্ন এবং কেশ কীটাদি যুক্ত, পদস্পৃষ্ট, পর্য্যুষিত বা কাকাদি পক্ষী ও পশুর উচ্ছিষ্ট অন্ন আহার করিবে না। কৃষিকারী, পুরুষানুক্রমে মিত্র, গোপাল, দাস, নাপিত,—এ সকল শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে। (২)

নদী তড়াগাদিতে প্রত্যহ স্নান করিবে। বিষ্ঠা মূত্রাদি দূরে ত্যাগ করিবে। জলে রক্তশ্লেষ্মা, বিষ্ঠামূত্রাদি নিঃক্ষেপ করিবে না।

অন্তর্ব্বাহ্যে শুচি থাকিবে। মঙ্গলাচারযুক্ত হইবে। সর্ব্বদা বেদভ্যাসে রত এবং তপস্যা-পরায়ণ হইয়া পরলোক-সাহায্যার্থ ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে।

ঔষধ তিক্ত হইলেও সেব্য। পাঠকগণ! ঔষধ বোধে এই প্রবন্ধরস আস্বাদন করুন।

মনু-সংহিতার সারমর্ম্মের অবশিষ্টাংশ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

---

(২) এইরূপ শূদ্রান্ন ভোজন—কলিকালে নিষিদ্ধ।

আমাদের হাজত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ব্রজবাবুর আহ্নিক।

হাজত-গৃহের ভিতর, একটী জলের কল আছে। কলটীকে বাহিরে বলিলেও হয়, ভিতরে বলিলেও হয়; কেননা, ভিতর-বাহির উভয় স্থান দিয়াই, সে কলের জল লওয়া যায়। 'ফাইল' হইবার পর, অর্থাৎ শয়নের পূর্ব্বেই, অনেকে লোহার সরা লইয়া, কল হইতে জল ধরিয়া, পান করিতে আরম্ভ করিল। যে পথে ব্রজবাবু বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন, সেইখান দিয়াই সকলের জল আনিবার পথ। ব্রজবাবু কতকটা পথ জুড়িয়া বসায়, লোকের গতি-বিধির কিছু অসুবিধা হইতে লাগিল। ঘটনাক্রমে কোন একজন আসামীর, হস্তস্থিত সরা হইতে খানিক জল পড়িয়া গেল। তারপর যে যে ব্যক্তি জল আনিতে গেল, সকলেই বলিতে লাগিল,—"এখানে জল ফেলিল কে? ভয়ানক কাদা এবং পিছল।" কেহবা ব্রজবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"বাবু! আপনার সন্ধ্যাহ্নিকের জল তো পড়িয়া যায় নাই?" ফল কথা, তখন কল-তলায় একটু গোল উঠিল। গোল শুনিয়াই নীলমণি অধিকারী সেই দিকে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?" একজন উত্তর দিল,—"পথে জল পড়িয়া ভয়ানক কাদা হইয়াছে। এই বাবুটী পথে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন, ইহাঁরই সরার জল পড়ুক, বা অন্য কোন রূপে পথে জল পড়ুক!—ফলে, পথে ভয়ানক কাদা হইয়াছে, পথ চলিবার যো নাই।"

অধিকারী, ব্রজবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "বাবু! আপনার পথে বসাটা ভাল হয় নাই; এটা হইল, যাতায়াতের রাস্তা। আপনার যদি আরও আহ্নিক করিতে হয়, তবে ঐ পূর্ব্বদিক্-কার দেওয়ালের নিকটে একটী বাড়তি মাটীর ঢিপি আছে, সেইটীর উপর বসিয়া, আহ্নিক করুন।"

ব্রজবাবু এতক্ষণ মুদ্রিত-নয়নে নীরব ছিলেন, অধিকারীর কথা শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। কৃষ্ণবাবু কহিলেন,—"ঢের হইয়াছে, আজ আর আহ্নিক করিয়া কাজ নাই।" ব্রজবাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, সেই সরা-খানি হাতে করিয়া

তুলিয়া লইয়া, নির্দ্দিষ্ট মাটীর ঢিপির উপর উপবেশন পূর্ব্বক, পুনরায় আহ্নিক জুড়িয়া দিলেন। ব্রজবাবুর গতিক বড় সুবিধা নয় দেখিয়া, কৃষ্ণবাবু এবং আমি শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণবাবুর পকেটে ষ্টেট্‌সম্যান এবং অমৃতবাজার কাগজ ছিল। কম্বলের উপর সেই কাগজ দুখানি তিনি পাতিলেন। চাদর খানি গুটাইয়া তিনি মাথার বালিস করিলেন। আমি অরুণকে বলিলাম,—"অরুণ! তুমি আর দেখিতেছ কি? তুমিও শয়নের যোগাড় কর।" অরুণ আপন চাদর খানি চারি ভাঁজ করিল; করিয়া,বালিস ঢাকিয়া তাহা কম্বলের উপর পাতিল। আগে কৃষ্ণবাবু, দক্ষিণদিকে মাথা এবং উত্তরদিকে পা করিয়া শুইলেন। তার পর আমি, উত্তরদিকে মাথা এবং দক্ষিণদিকে পা করিয়া শুইলাম। ব্রজবাবুর খাটটী খালি রহিল; কেননা, তিনি আহ্নিক ক্রিয়ায় নিরত। শয়নের সময় ব্রজবাবুকে দক্ষিণদিকে মাথা এবং উত্তরদিকে পা করিয়া শুইতে হইবে। আমরা যথানিয়মে দুই জনে শয়ন করিয়া, অরুণকে বলিলাম,—"তুমি অমন ভাবিতেছ কি? শোওনা কেন?" অরুণ উত্তর করিল,—"ম্যানেজার বাবু হইলেন ব্রাহ্মণ; আমি শূদ্র হইয়া, উহাঁর মাথার নিকট পা রাখিয়া কিরূপে সমস্ত রাত্রি শুইয়া থাকিব?—ইহাই ভাবিতেছি। কি জানি, যদি ঘুমের ঘোরে, উহাঁর মাথার উপর আমার পা পড়ে! তাহা হইলে তো সর্ব্বনাশ দেখিতেছি।

আমি। হাজতে বা জেলখানায়, এরূপ বিচার-আচার করিতে গেলে, কার্য্য চলিবে না। "আতুরে নিয়মো নাস্তি।" তোমার চিন্তা নাই, তুমি শয়ন কর। কতক্ষণ আর এ রাত্রে বসিয়া থাকিবে?

আমার কথায় অরুণ শয়ন করিল বটে, কিন্তু মন তাহার প্রফুল্ল হইল না। অতিকুণ্ঠিতভাবে পা দুখানি গুটাইয়া, সেই মৃৎখট্টায় অরুণ শুইয়া রহিল।

ব্রজবাবুর আহ্নিক তথাপি ভাঙ্গিল না। এদিকে অধিকারী জুতা খুলিয়া, চাপরাস খুলিয়া, পাগ্‌ড়ি খুলিয়া, গায়ের গোটা দুই কোর্ত্তা খুলিয়া, একটু ভদ্র-লোকের মতন হইয়া দাঁড়াইলেন। একখানি সরায় একটু জল লইয়া, তিনি মুদ্রিত-নয়ন ব্রজবাবুর নিকট গিয়া কহিলেন,—"বাবু মহাশয়! আপনার যদি আহ্নিক এখনও না হইয়া থাকে, তবে আপনি একটু সরিয়া বসুন, আমিও আহ্নিক করিব। আপনি ওদিকে একটু সরিয়া বসিলে, এ বেদীর উপর দুইজনকারই স্থান হইতে পারে।"

ব্রজবাবু তথাচ নীরব। অধিকারী ঐ কথা বলিয়া, বেদী ঠেশ দিয়া, সরা হাতে লইয়া, ব্রজবাবুর মুখপানে চাহিয়াই রহিলেন। প্রায় দুই মিনিট কাল পরে ব্রজবাবু নয়ন মেলিলেন। বলিলেন,—"অধিকারী মহাশয়! আমার আহ্নিক হইয়াছে, আপনি বেদীর উপর বসুন।"

কৃষ্ণবাবু আমার পানে কোণাকোণি চাহিয়া, অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কোণাকোণি কহিলেন,—"অধিকারী আহ্নিকও করেন-যে!"

আমি কোণাকোণি উত্তর দিলাম,—"করিবেন না কেন? অধিকারীর অভাব কি?"

ব্রজবাবুর উত্থানমাত্র, অধিকারী আহ্নিকে বসিয়া গেলেন। ব্রজবাবু আহ্নিকের সরা খানি হাতে করিয়া লইয়া, আপন খাটের নিকট আসিলেন। জলটুকু কোথায় ফেলেন, ইহার জন্য বিব্রত হইলেন। শেষে লোহার রেলিং গলাইয়া, জলটুকু ফেলিয়া আপন খাটে আসিয়া শুইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নানা প্রসঙ্গ।

হাজতের নিয়ম-অনুসারে, সন্ধ্যাবেলাই শয়ন করিয়াছি। কিন্তু ঘুম আসিবে কেন? ঘুম তো আর হাজতের আজ্ঞাকারী অবশ্য-পোষ্য প্রতিপাল্য শ্রীদুঃখারাম দাস নহে!! কাজেই কোন আসামীর চক্ষে তখন ঘুম আসে নাই। সকলেই ফিস্ ফিস্, ফুস্ ফাস্, কুট্ কাট্, খুট্ খাট্, গুট্ গাট্, ঘুট্ ঘাট্ জুড়িয়া দিয়াছে। সেই শব্দ-সমূহ একত্রে সুমিশ্রিত হইয়া, যেন এক সুখময় স্বর্গীয় ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে।

আমি কৃষ্ণবাবুকে সেইরূপ কোণাকোণি ভাবেই কহিলাম,—"কৃষ্ণবাবু! মাথার পর পা এবং পায়ের পর মাথা আছে বটে; কিন্তু গল্পের তো কৈ কামাই দেখি না। মুখামুখী রাখিলে বরং শব্দ কম হইতে পারিত, কিন্তু এই কোণাকোণি মুখ রাখিয়া শব্দের বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে।"

কৃষ্ণবাবু। বেশী বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিতে গেলেই, ফল এইরূপ আল্গা হয়। "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গিরো",——এখানে এই প্রবাদ-বাক্য মূর্ত্তিমান্। এখানে চলে সব, না চলেও কিছু।

সাধারণতঃ সূচ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু কখন কখন হাতী গলিয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে অধিকারীর আহ্নিক শেষ হইল। অধিকারী হাজতের আসামীগণের সহিত শেষ-খাটে শয়ন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ব্রজবাবুর সহিত অধিকারীর ভাব কিঞ্চিৎ বেশী হইয়াছিল। তিনি অধিকারীর সহিত ফুস্ ফাস্ কথা আরম্ভ করিলেন। জেলখানায় একটী পেয়ারা গাছের ডাল, প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া, হাজতের উঠানের ভিতর আসিয়াছে। ব্রজবাবু জিজ্ঞাসিতেছেন, 'কল্য যদি পেয়ারা-ডাল ভাঙ্গিয়া আমি দাঁতন করি, তাহা হইলে কোন দোষ কাছে কি না?" অধিকারী তাহার উত্তর এইরূপ দিলেন,—বাপ্‌রে! তা হ'লে তো একবারে সর্ব্বনাশ!

ব্রজবাবু। কেন কেন? পেয়ারা-ডাল তো একটু একটু ভাঙ্গাও দেখিতেছি! সম্ভবতঃ অনেকেই ডাল ভাঙ্গিয়া দাঁতন করিয়া থাকিবে।

অধিকারী। যাহারা ভাঙ্গিয়াছে, তাহারা অবশ্য লুকাইয়া একাজ করিয়াছে। দেখাইয়া, বলিয়া-কহিয়া ভাঙ্গিলে কি রক্ষা ছিল? অমনি পশ্চাতে বেত পড়িত। এখানে লুকাইয়া সব কাজ চলে, কিন্তু দেখাইয়া কিছুই চলে না। এ, জোমালয়! জোমালয়! জোমালয়!—জেলখানায় খুন হয়, সিঁধ হয় চুরি হয়, দাঙ্গা হয়;—হয় না কি? এখানে গাঁজা খাওয়া চলে, আফিং খাওয়া চলে, তামাক খাওয়া চলে;—চলে না কি? এমন পাপ নাই, এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা জেলখানায় ঘটে না। বীভৎসরসের কথা আজ রাত্রে আর আপনাকে বলিব না। রাত হইয়াছে নিদ্রা যাউন, আর কথায় কাজ নাই, আবার সেই চারিটার সময় ভোর-ভোর উঠিতে হইবে।

আমি কৃষ্ণবাবুকে, আস্তে আস্তে বলিলাম,—"অধিকারীর বীভৎস-রসের কথা কিছু বুঝিয়াছেন কি?

কৃষ্ণবাবু। না।

অধিকারী আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"বাবু মহাশয়! ঘুমান, আজ আর অধিক কথাবার্ত্তা কহিয়া কাজ নাই। বাতিক চড়িয়া চো'খে আর ঘুম আসিবে না!

অধিকারীর উপদেশ অনুসারে আমরা সকলেই ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাজত-গৃহে দক্ষিণে একসা'র বেদী, উত্তরে একসা'র বেদী, মধ্যে তিন হাত প্রশস্ত এক রাস্তা। সেই পথ দিয়া, একজন কয়েদী প্রহরীর স্বরূপ হইয়া, পায়চালি করিতে লাগিল। একবার এ-ধার, একবার ও-ধার;—পায়চালির বিরাম নাই।

ঘুমাইবার জন্য চেষ্টা করিবার সময়, সে ব্যক্তির প্রতি আমার বিশেষ লক্ষ্য পড়িল। আমি কৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসিলাম,—"এ ব্যক্তিই এইরূপ ভাবে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবে নাকি?"

কৃষ্ণবাবু। বোধ হয়, পাহারার বদলী আছে।

আমি। কতক্ষণ অন্তর পাহারা বদলী হয়, জানেন কি?

কৃষ্ণবাবু। তা কেমন করিয়া বলিব?

আমি। ঐ প্রহরীকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন?

জিজ্ঞাসা করি কি না, কৃষ্ণবাবু এই বিষয়ে কিছু ইতস্তত করিতেছেন, এমন সময় সেই প্রহরী একটু দাঁড়াইয়া বলিল,—"না বাবু! সমস্ত রাত্রি আমায় পাহারা দিতে হইবে না; প্রথম দুই ঘণ্টা আমার পালা। সবশুদ্ধ আমরা ৫জন প্রহরী এই ঘরে আছি; ৫জনে আমরা ১০ঘণ্টা কাল পাহারা দিব।

কৃষ্ণবাবু। আর চারিজন কোথায়?

প্রহরী। ঐ দেখুন, সারি সারি সকলে শুইয়া আছে। দুই ঘণ্টা পরে আমি একজনকে উঠাইয়া নিদ্রা যাইব। সে আবার দুই ঘণ্টা অতীত হইলে অন্য একজনকে উঠাইবে। এরূপ সমস্ত রাত্রি চলিবে। পাহারার কামাই পড়িবে না।

এই কথা বলিয়া আবার সে পায়চালি করিতে লাগিল। দুই চারিবার এইরূপ এ-দিক ও-দিক করিয়া, আবার আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল,—"মহাশয়! আপনাদের কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছি। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে; সেজন্য আর দুঃখ কি আছে? আমি একজন "বঙ্গবাসীর" গ্রাহক ছিলাম। বঙ্গবাসীকে আমি বড়ই ভালবাসি।"

কৃষ্ণবাবু। আপনি আগে কি কাজ করিতেন?

প্রহরী। আমি পোষ্ট-মাষ্টার ছিলাম। যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে পাহারা দিবে, সে ব্যক্তিও আপনাদের বঙ্গবাসীর গ্রাহক ছিল।

কৃষ্ণবাবু। কতদিন আপনার কারাবাস-দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে?

প্রহরী। চারি বৎসর কাল। বাকী আর দেড় বৎসর।

প্রহরী আবার পায়চালি করিয়া পাহারা দিতে লাগিল

কৃষ্ণবাবু আমায় বলিলেন,—"সুখ এই টুকু,—যেখানে যাই, সেইখানেই বঙ্গবাসীর গ্রাহক দেখিতে পাই। অরণ্য, পার্ব্বত্য-প্রদেশ, বালুকাময় ভূমি,—যেখানে বাঙ্গালীর বসতি আছে, সেই খানেই বঙ্গবাসী আছে। এই 'কৃতান্তের আলয়' কারাগারেও বঙ্গবাসী। এই যে এখানে কুড়ি-বাইশ জনহাজতের আসামী আছে, ইহার মধ্যে তিন জন বঙ্গবাসীর গ্রাহক, এ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই লইয়াছি।"

আমি। কারাগারে বা হাজতে বঙ্গবাসীর অধিক গ্রাহক আছে বলিয়া গৌরব করিবেন না। একথা শুনিলে, লোকে হয়ত মনে করিতে পারে, বঙ্গবাসীর গ্রাহক হইলেই, কারাগার ও হাজতে যাইতে হয়, অথবা অধিকাংশ গ্রাহককেই ঐ-দশাপন্ন হইতে হয়। কেহ বা এমনও মনে করিতে পারে, বঙ্গবাসীর লেখা পড়িয়া লোকের দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়;—চোর, সিঁধেল ডাকাত হয়,—কাজেই দলে দলে বঙ্গবাসীর গ্রাহক, হাজতে আসে এবং জেলে যায়। সে যাহা হউক, আমার কাছে আপনি একথা বলিয়াছেন, কোন দোষ নাই; কিন্তু আর কাহারও কাছে এ অপ্রকাশ্য কথা প্রকাশ করিবেন না।

কৃষ্ণবাবু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি সোজা কথার উল্টা অর্থ করিতে বেশ পারদর্শী।

অধিকারী কহিলেন, "বাবু মহাশয়! এখন আর কথা-বার্ত্তা কহিবেন না। এইবার জমাদার-সাহেব রোঁদ দিতে আসিবে। হাজতের আসামীকে কথা কহিতে দেখিলে, জমাদার বড়ই রাগ করে। আপনাদিগকে হয়ত কিছু বলিবে না, কিন্তু আমাকে খুব ধমকাইবে। আর রাতও হইয়াছে, আপনারা নিদ্রা যাউন।

অধিকারীর কথা আমরা শিরোধার্য্য করিলাম। নিদ্রা যাইবার জন্য পাশ ফিরিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, কথাবার্ত্তা বন্ধ করিলাম।

পাশ-বালিশ আমার বড় প্রিয়-সামগ্রী। পাশ-বালিশটী না হইলে আমার কিছুতেই ঘুম হয় না। সুতরাং সুখ-শয্যাকে কণ্টকময়ী বলিয়া বোধ হয়। বরং মাথার বালিস একদিন না থাকিলে আমার চলে, কিন্তু পাশ-বালিশ বিহনে কিছুতেই চলিবার যো নাই। বিদেশে, অপরিচিত লোকের গৃহে, নিশা-যাপন কালে, যখন কেবল মাথার-বালিশটী পাইয়াছি,—আর পাশ-বালিশ প্রাপ্ত হই নাই; তখন মাথার-বালিশকেই পাশ-বালিশ করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছি। কিন্তু হাজতের মাথার-বালিশ মাটীর, খাটের সঙ্গে সংলগ্ন। সুতরাং মাথার-বালিশ উঠাইয়া পাশে দিবার যো নাই। আমি তখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, ব্যাগ, বস্তানী, বা কোন রকম ছোট পুঁটুলি আছে কি না। মধু অভাবে গুড়, কুশ অভাবে কেশে, সেইরূপ পাশ-বালিশ অভাবে ব্যাগ বা বস্তানি। কিন্তু পাশ-বালিশের অভাব পুরণ করিতে পারে এমন কোন বস্তুই, নজরে লাগিল না। কি করি, উপায় কি? তবে কি পাশ-বালিশ বিহনে আজ ঘুম হইবে না? ভাবিতে ভাবিতে, আমি এক নিরাকার পাশ-বালিশ কল্পনা করিয়া লইলাম। হাওয়ার এক নিরাকার বালিস মনে মনে গঠন করিলাম। ভগবান নিরাকার হইতে পারেন, আর আমার এই পাশ-বালিশটী নিরাকার হইতে কি সক্ষম হইবে না? অবশ্যই হইবে। আমি তখন দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, নিরাকার পাশ-বালিশ পাশে দিয়া, ঘুমাইতে আরম্ভ করিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নাসিকার-ধ্বনি।

মানুষ ঘুমাইল তো মরিল। যে বালক হুড়া-হুড়ী দৌড়াদৌড়ী, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া পাড়া কাঁপাইতেছিল, সে বালক যেমন নিদ্রাগত হইল, অমনি পৃথিবী যুড়াইল। যে বাগ্মী, বিষম বিরাট বক্তৃতায় সহস্র সহস্র লোকের এক কালে কাণে তালা ধরাইয়া দিতে সক্ষম, ঘোর ঘুমে অভিভূত হইলে, সে বাগ্মীও নিষ্পন্দ নীরব বাকৃশক্তি-হীন। ভুক্তভোগী জানেন, বাগীশ্বরী প্রাণ-প্রিয়-তমা ঘুমাইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঠাণ্ডা হয়। ঘুম এমনি জিনিষ।

ঘুমাইলে মানুষ এক রকম মরে বটে, আমি কিন্তু ঘুমাইলে বিশেষরূপে বাঁচিয়া উঠি। জাগ্রত অবস্থায় আমি, অধিকাংশ সময় নীরব থাকি, কিন্তু (লোকমুখে শ্রুত আছি) ঘুমাইলেই গম্ভীর গর্জ্জন

করিতে আরম্ভ করে। সেই ঘন ঘোর নির্ঘোষে লোকপাল অস্থির হয়। ব্যাপার কি, রহস্য কি,—কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন কি?

অর্থাৎ আমার নাক ডাকে। নাক ডাকে, কথাটী শুনিতে ছোট বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ বিলক্ষণ বলবান। আমার নাসিকাধ্বনিতে পল্লী প্রকম্পিত হয়। কোন প্রিয় সুহৃদ, আমার এই বিভীষণ নাসিকাধ্বনি সম্বন্ধে অমিত্রাক্ষরে এইরূপ একটী পদ্য রচনা করিয়াছিলেন।

শুনিয়াছি জগঝম্প ভূমিকম্প যায়,
শুনিয়াছি ঢক্কাবাদ্য কাঁসরের সনে,
ষাঁড়া ঘণ্টা ভেঁপু সহ হইয়া মিশ্রিত।
শুনেছিরে এককালে শতেক সানাই,
অথবা যাঁতার পাকে ভাঙ্গিতে কলাই,
কিন্তু হেন নাসাধ্বনি শুনি নাই কভু।

গুড়ুম গুড়ুম গর্জ্জে সুদূর অম্বরে,
সম্বর্ত্তাদি চারি মেঘ; সপ্ত তোয়নিধি
কল্লোলিয়া আস্ফালিয়া করয়ে প্রলয়;
ব্যোমপথে ইরম্মদ; বিষম ব্রহ্মাস্ত্রে
ভাঙ্গি পড়ে তুঙ্গগিরি শৃঙ্গ মনোহর!
ঝড়ে উড়ে মহীরুহ; জলে দাবানল;
চলে বাষ্পকল মহীতলে, ভীমতেজা
প্রভঞ্জন যেন; কুরুক্ষেত্রে কোটী কোটী
কার্ম্মুক টঙ্কার, হুঙ্কার ঝঙ্কার কত!
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ; গাণ্ডীব নির্ঘোষ;
দেখেছি শুনেছি কত বত্রিশ বৎসরে!
বাঘ ভালুকের রব; মত্ত ভগদত্ত,
হয়, হরি, হরিণীর মর্ম্মভেদীস্বর!
কিন্তু হেন নাসাধ্বনি শুনি নাই কভু।

প্রায় প্রতি বৎসর ৺পূজার বন্ধে আমার একবার করিয়া "দেশ ভ্রমণ" আছে। উত্তরপশ্চিম, রাজপুতনা, মধ্যপ্রদেশ," অযোধ্যাপ্রদেশ, হিমালয়-পার্ব্বত্য প্রদেশ, দার্জ্জিলিং প্রদেশ,—সাধারণতঃ এই সকল স্থানে আমি কমবেশী একমাস কাল, আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে, বেড়াইয়া বেড়াই। সময়ে সময়ে অনেক অপরিচিত ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইতে হয়। ক্রমশঃ পরিচর্য্যাদি হইলে আনন্দে, উৎসবে, বিহারে আহারে, দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া, যখন রজনী সমাগতা হইতেন, তখন আমি গৃহস্বামীকে বলিতাম;—"মহাশয় রাত্রে আমার একটু উপদ্রব আছে।"

গৃহস্বামী। (হাসিয়া) রাত্রে একটু আবার কি উপদ্রব!

আমি। (হাসিয়া) একটু বড় নয়,—উপদ্রব বিলক্ষণই।

গৃহস্বামী। ব্যাপার কি? উপদ্রবটা কি?

আমি। উপদ্রব আর কিছু নয়, রাত্রে ঘুমাইলে আমার নাক ডাকে।

গৃহস্বামী। নাক ডাকিলেই বা তাতে ক্ষতি কি?

আমি। ইহা যেমন-তেমন নাক-ডাকা নয়,—ইহা এক ভীম ভৈরব কাণ্ড। ইহা মেঘ গর্জ্জনের সহিত তুলনীয়। পাছে রাত্রে আপনারা ভয় খান বা বিরক্ত হন, তাই আমি আগে থাকিতে বলিয়া রাখিতেছি।

গৃহস্বামী অবশ্যই হাসিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যে কত মজা আছে, তাহা তখন ভাল বুঝিলেন না।

আজ আমি হাজতে অতিথি; নিদ্রাকালে নাসিকাধ্বনি বন্ধ হইবার কোন কারণ তো দেখি না। কৃষ্ণবাবুকে বলিলাম;—"ঘুমাইলেই তো নাক ডাকিবে; নাক ডাকিলে অন্যান্য আসামীগণ সম্ভবতঃ চমকাইয়া উঠিবে।

কৃষ্ণবাবু। আপনার নাকডাকা পূর্ব্বের মতন আছে নাকি?

আমি। পূর্ব্ব অপেক্ষা একটু কমিলেও তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। সমুদ্র হইতে শতাধিক জালা জল তুলিয়া লইলেও, সমুদ্রের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

কৃষ্ণবাবু। (হাসিয়া) নাক ডাকে ডাকিবে! এখন হইতে তার আর চিন্তা করিলে কি হইবে?

আমি। লোকগুলা হঠাৎ চমকাইবে। কাঁচা-ঘুমে হঠাৎ উঠিয়া, তাহারা হয়ত বিভীষিকা-গ্রস্ত হইবে।

কৃষ্ণবাবু। আপনি সুখে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যান, আপনার কোন চিন্তা নাই।

ব্রজবাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম, তিনি বুঝি ঘুমাইয়াছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, চিন্তা অন্য কাহারও না থাকিতে পারে, আমার কিন্তু ষোল আনাই চিন্তা আছে।

কৃষ্ণবাবু ব্রজবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার চিন্তা কিসের?"

ব্রজবাবু। আমার চিন্তা নিজের; যদি উহাঁর

নাক ডাকে, তাহা হইলে আমার সমস্ত রাত্রি ঘুম হইবে না।

কৃষ্ণবাবু। ধন্য ধন্য !!

প্রথমেই আমার ঘুমে একটু ব্যাঘাত পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লৌহনির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড টব, হাজত-গৃহের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সেই মূত্র-টবের সন্নিকটেই মল-ত্যাগের একটী গামলা। আমরা গৃহের পূর্ব্বদিক ঘেঁসিয়াই আছি, সুতরাং টব ও গামলার সহিত, আমাদের কিছু নিকট সম্পর্ক।

সেদিন হাজত গৃহে আমরা ২২জন আসামী এবং প্রহরীতে সর্ব্বশুদ্ধ বোধ হয় ২৮ বা ২৯ জনের অধিক ছিলাম না। কিন্তু বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা, সেই টবে মূত্রত্যাগরূপ কলকল শব্দের কামাই দেখিতে পাইলাম না। সে অনন্ত স্রোত, সে অনন্ত ধ্বনি, যেন অনন্ত কালই চলিয়াছে। তখন আসামীগণের অনন্ত শক্তির বিষয়, আমি অনন্যমনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। দার-জিলিঙ্গের ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাতের কথা মনে হইল। হরিদ্বারের কথা মনে হইল। গোমুখীর কথা মনে হইল। আমার এ বর্ণন অতি রঞ্জিত নহে,—কামাই নাই, কামাই নাই, সমভাবেই চলিয়াছে, চলিয়াছে!

চলুক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু টব হইতে মধুর মধুর নাসিকা-রোচক ঝাঁজ,রাত্রি ৮॥টা হইতেই, উত্থিত হইতে লাগিল। আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম। অর্থাৎ টবের দিকে পশ্চাৎভাগ করিলাম।

ব্রজবাবু ঈষৎ রসিকতা করিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনার এ-কি-ও? আপনি পাশ ফিরিয়া শুইতেছেন কেন? আপনার তো পঙ্ক-চন্দন এক।

আমি। (হাসিয়া) ব্রজবাবু ভুলিয়া গিয়াছি। দুঃখ এই, পঙ্ক-চন্দন যে সমান ইহা সকল সময় স্মরণ থাকে না।

ব্রজবাবু। তবে এইবার ঠকিলেন বলুন?

আমি। ঠকিতে কেন গেলাম? পঙ্ক চন্দন এক বলিয়াছি বটে, কিন্তু মানবমূত্র আর জাহ্নবীজল কখন তো এক বলি নাই? এ কথা যদি বলিতাম, তাহা হইলে আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করা দূষনীয় হইত বটে। গামলার ব্যাপার ঘটিলে আপনার পঙ্ক-চন্দনের উপমা দেওয়া চলিত। আপনার উপমারই ভুল হইয়াছে।

ব্রজবাবু। তা বেশ, আপনারই জয় হইল।

কৃষ্ণবাবু ইত্যবসরে কোঁচা এলাইয়া নাকের উপর সেই কাপড় ধরিয়াছেন। কোঁচা এলাইবার কালে কটীর বসন কিঞ্চিৎ মাত্র শ্লথ হইয়া যায়। তাহাতে কিঞ্চিৎ কথিত কুরুচির আভাস আসিয়া পড়ে! এক হিসাবে তাহা কিছুই নয়, অন্য হিসাবে তাহাই সব। তেল মাখিবার সময় নাভিস্থল বাহির করিয়া একখানি ছোট কাপড় পরিয়া থাকিলে, যে ভাব দেখায়, তাহা হইতেই ইহা যৎকিঞ্চিৎ অধিক ভাব।

অধিকারী মহাশয়, এই "যৎ-কিঞ্চিৎ-অধিক ভাব" অবলোকন করিয়া বলিলেন, "বাবু মহাশয়গণ! আপনারা হাজতে নূতন আসিয়াছেন, হাজতের আইন-কানুন জানেন না। এখানে রাত্রে খুব কসিয়া কাপড় পরিয়া শুইতে হয়। রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় কাপড় যাহাতে খুলিয়া না যায়, এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এরূপ বন্দোবস্ত করিতে যিনি অক্ষম, তাহাকে জাঙ্গিয়া পরাইয়া রাখাই নিয়ম। বাবু মহাশয়! এ বড় কঠিন জায়গা,—এ জোমালয়, জোমালয়।"

কৃষ্ণবাবু তৎক্ষণাৎ অমনি আঁটিয়া-সাঁটিয়া কাপড়খানি পরিতে আরম্ভ করিলেন। আমার আরো একটু ভয় হইল। রাত্রিকালে সময়ে সময়ে নিদ্রিতাবস্থায় আমার কাপড় কিঞ্চিৎ খুলিয়া যায়। শুধু নিদ্রিতাবস্থাতেই কেন, জাগ্রত অবস্থাতেও কোমরের কষনি স্বভাবতঃই এলাইয়া পড়ে—ইতি স্থূলোদরাৎ।

আমি ভাবিতে লাগিলাম—

একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে॥

আগে নাক ডাকার ভয়েই ব্যকুল ছিলাম; তাহার সহিত এখন যোগ দিলেন আলুলায়িত বসন। এই উভয় দোষে আমাকে হাজত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে নাকি? শেষে স্থির করিলাম ভয় কিছু নাই, কেননা হাজতের অন্তর বাহির নাই, আদি অন্ত মধ্য শেষ সবই এইখানে।

সহজে চক্ষে ঘুম আসিল না। ও-দিকে জল-প্রপাতের ধ্বনি সমভাবে বর্ত্তমান আছেই; এ-দিকে মাঝে মাঝে শব্দ শুনিয়া অনুভব দ্বারা টের পাইতে লাগিলাম যে, গামলায় মলত্যাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। চাহিয়া দেখি, ব্রজবাবু অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। নাকে তো কাপড় জড়ান আছেই।

আমি। ব্রজবাবুকে কহিলাম ;—“জলপ্রপাত অর্থাৎ বারিবর্ষণ হইলেই মেঘগর্জ্জন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে, ভীরুবৎ, মেঘ গর্জ্জন-ভয়ে, কর্ণে অঙ্গুলী দান করা উচিত নয়।

ব্রজবাবু ইহার কোন উত্তর দিলেন না।

আমিও আর কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নির্য্যাতন।

অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা আসিল। যেমন নিদ্রা-কর্ষণ, অমনি নাসিকার ঘনগর্জ্জন। বলা বাহুল্য, আমি স্বয়ং এসব কিছুই শুনিতে পাই নাই, বা অনুভব করিতে সক্ষম হই নাই। আমি নিদ্রিত হইলেও কৃষ্ণবাবু জাগিয়া ছিলেন। তিনি বলেন, আমার নাক-ডাকার শব্দ শুনিয়া, প্রথমে অনেকেই চমকিয়া উঠে। কেহ বলে, “বাপ্!” কেহ বলে,—“বাঘ গর্জ্জাইতেছে,” কেহ বলে, “এমনটী ত আর কখনও দেখি নাই।” অধিকারী মহাশয় কৃষ্ণ-বাবুকে বলেন যে, “উহঁাকে পাশ ফিরাইয়া দিউন।” কৃষ্ণবাবু উত্তর দেন, “পাশ ফিরান বৃথা, এ-পাশেও যা, ও-পাশেও তা।” কেহ আমাকে জাগাইবার প্রস্তাব করে। কিন্তু কৃষ্ণবাবু বলেন, “জাগাইয়া লাভ কি? জাগাইলে কিছুক্ষণের জন্য নাক ডাকা বন্ধ হইবে বটে ; কিন্তু যেই ঘুমাইবেন, অমনি উহঁার নাক ডাকিবে। যদি সমস্ত রাত্র উহঁাকে জাগাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই নাক ডাকার শব্দ উত্থিত হইবে না।”

এইরূপ, বিচার-বিতর্ক বাদানুবাদ প্রায় বিশ মিনিট কাল হইয়াছিল। শেষে হাজত-সভায় স্থির হইল, আমাকে ঘুম হইতে না উঠানই উচিত।

পুলিনচন্দ্র আপত্তি করিয়াছিলেন, “বাবুর নাক ডাকিলে, আমরা কেহই ঘুমাইতে পারিব না। অতএব বাবুকে জাগাইয়া, আমাদের সকলকে ঘুমাইতে দেওয়া হউক।”

অধিকারী বলেন, “অন্য আসামীগণ তো কেহ ঘুমাইতে পারিব না বলিতেছে না, তবে তুমি অন্য সকলের পক্ষ হইয়া কথা কও কেন?

পুলিন উত্তর দেন,—“আচ্ছা আমি একাই ঘুমা-ইতে পারিব না। হয় ইহঁাকে জাগান হউক, না হয় আমাকে জাগিয়া থাকিবার অনুমতি দেওয়া হউক। জাগিয়া থাকিতে হইলে, আমি শুইয়া বা বসিয়া থাকিতে পারিব না, আমাকে ঠিক এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।”

এই বলিয়া পুলিনচন্দ্র, বেদীর উপর, কৃষ্ণ ঠাকুরটীর ন্যায়, ত্রিবঙ্কিম ভাবে দাঁড়াইয়া, যেন ঈষৎ পা-দুলাইয়া নাচিতে লাগিল।

তখন অধিকারী, পুলিনকে এক মহা ধমক্ দেন। পুলিনের আর কথাবার্ত্তা নাই, অমনি নীরব হইয়া আপন শয্যায় শুইয়া পড়িল।

অধিকারী মৃদু মৃদু কহিলেন,—“এখানে কে এমন নবাব আছে যে, “নাক ডাকা” শুনিলে তাহার ঘুম হয় না!! যে সব বড়লোকের বাড়ী বড় রাস্তার ধারে, সে সব বাড়ীর বড়লোকদের অবশ্যই তবে রাত্রে ঘুম হয় না!! কেননা দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে পথ দিয়া, ট্রাম গাড়ী, ঘোড় গাড়ী চলি-তেছে,—হড়-হড় গড়-গড় শব্দের কামাই নাই। ফল কথা এই, কেবল হড়হড়ানীতে ঘুমের বাধা হয় না। যাত্রা শুনিতে গিয়া, নৃত্য গীত বাদ্যের মধ্যেও, কেহ কেহ ঘুমাইয়া পড়েন। ঘোড়া ছুটাইতে ছুটা-ইতেও কাহারও কাহারও ঘুম আসে। তাই বলিতে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে নিদ্রার আবির্ভাব হইলে, নাসিকাধ্বনিতে তাহার বাধা বিঘ্ন জন্মে না।”

অধিকারীর সুমধুর বৈজ্ঞানিক উপদেশ বাক্য শুনিয়া, অনেকেই নীরব হইল। অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে, অধিকাংশ আসামীই ঘুমাইয়া পড়িল। আমিও অবাধে ঘোর গভীর গর্জ্জনে নিদ্রা যাইতে লাগিলাম।

রাত্র ২টা কি ২৷৹টা,—ঠিক বলিতে পারি না,—এমন সময় একজন আমাকে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠাইতেছে ;—“বাবু উঠুন, বাবু উঠুন।” আমি চমকিয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম ; “কে-রে? কে-রে?” সেই লোকটী একটু রুক্ষস্বরে বলিল, “উঠুন, উঠুন, পাশ ফিরিয়া শুন,—আপনার বড়ই বেজায় নাক ডাকিতেছে।” আমি বলিলাম, “আমি উঠিতেও রাজি আছি, পাশ ফিরিয়া শুইতেও রাজি আছি ; কিন্তু তাহা হইলে তো নাক ডাকা বন্ধ হইবে না। যেমন ঘুম আসিবে, অমনি আবার নাক ডাকিতে আরম্ভ হইবে।”

যে ব্যক্তি আমার গা ঠেলিয়া আমাকে উঠাইল, সে একজন কয়েদী-প্রহরী। রাত্র ২টার পর বোধ হয়, তাহার পাহারা দিবার পালা পড়িয়াছে। পরে জানিলাম, সে লোকটী জাতিতে তন্তুবায়।

আমাকে ঐ কথা বলিয়া সে আবার পা-চালি করিতে লাগিল। আবার আমার ঘুম আসিল। আবার নাক ডাকিতে লাগিল। আবার সেই তন্তুবায় আমার নিকট আসিয়া, আমাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া, উঠাইয়া দিল। বলিল, "এই আপনাকে নাক ডাকাইতে নিষেধ করিলাম, আবার আপনি নাক ডাকাইতেছেন কেন?"

আমি। বাপু! নাক-ডাকা আমার হাত ধরা নয়। ঘুম আসিলেই নিশ্চয় নাক ডাকিবে। তবে যদি তুমি আমাকে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে বল, তাহা হইলে অবশ্যই নাক ডাকিবে না। কিন্তু এই ২টা রাত্রি হইতে, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়াই বা থাকিব কেমন করিয়া? আর ইহাও তোমার দেখা উচিত, আমার নাক ডাকার জন্য এ ঘরে অন্য কাহার ঘুমও ভাঙ্গে নাই, কেহ বিরক্তও হয় নাই; সকলেই এখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

তন্তুবায় কহিল,—"আমি কি করিব বাবু! আমি আপনাকে জাগাইতেছিনা। এই মাত্র জমাদার আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেলেন, 'যে ব্যক্তির নাক ডাকিতেছে, তাহাকে জাগাইয়া দাও বা উঠাইয়া বসাইয়া রাখ।' তাঁহার আদেশ আমি পালন করিতেছি মাত্র।"

আমি অগত্যা তখন বসিয়া রহিলাম। কিন্তু বসিয়া বসিয়াও আমার ঘুম আসিতে লাগিল। বসিয়া-বসিয়া ঢুলিয়া-ঢুলিয়া মাটীর ঢিপি হইতে এক একবার পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলাম! এদিকে আবার বসিয়া-বসিয়াই আমার নাক ডাকিতে লাগিল। তন্তুবায় পুনরায় আসিয়া আমাকে ঠেলা দিল। এবার তীব্রস্বরে কহিল, "বাবু খবরদার, নাক ডাকাইবেন না।"

আমি। বাপু! চেষ্টার ক্রটী করি নাই। দেখ, সকলে ঘুমাইতেছে,—আর আমিই কেবল জাগিয়া বসিয়া আছি। ইহা কি কম কষ্ট? তাহার উপর মাঝে মাঝে তুমি ধাক্কা মারিতেছ;— কটু কথা কহিতেছ! তাই বলি, সাধ করিয়া কি আমি নাক ডাকাইতেছি? নাক আমি ডাকাইতেছি না, বাপু!—রোগে নাক ডাকিতেছে। তুমি আর ধাক্কা মারিও না।

তন্তুবায়। আমার নিকট সে সব চালাকি খাটিবে না। এবার একটু নাক ডাকিলে খুব জোরে ধাক্কা মারিব।

এমন সময় ব্রজবাবু ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া, আপন শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, ভ্রূভঙ্গী-পূর্ব্বক তন্তুবায়কে কহিলেন,—"তুই ফের যদি বাবুর গায়ে হাত দিবি, অথবা বাবুকে ঠেলিবি, তাহা হইলে তোকে গলাধাক্কা দিয়া এস্থান হইতে তাড়াইব।"

ব্রজবাবুর কর্কশ কথায়, তন্তুবায় কিঞ্চিৎ থতমত খাইল। বলিল,—"আমি কি করিব, বাবু! যেমন হুকুম, সেইরূপ কার্য্য করিতেছি।"

ব্রজবাবু। চোপ্‌রাও,—জানওয়ার! এ রাত্রে একটা মানুষকে খুন কর্‌বার হুকুম তোর উপর হয়েছে কি? তুইতো মানুষ খুন করিতে বসিয়াছিস্?

ব্রজবাবুর হাঁকাহাঁকিতে, নীলমণি অধিকারী উঠিলেন, কৃষ্ণবাবু উঠিলেন, অরুণোদয় রায় উঠিলেন, শিবু ডোম উঠিলেন; আর উঠিলেন আমাদের সেই পুলিনচন্দ্র।

একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল। অধিকারী, প্রহরীকে কহিলেন, "তোমার কাজ বাপু! ভাল হয় নাই। বাবুকে লইয়া এরূপ ঠেলাঠেলি কি করিতে আছে?"

তন্তুবায়। আমার প্রতি যেমন হুকুম হইয়াছিল, সেইরূপ কার্য্য করিয়াছি। জমাদারের হুকুম যদি অমান্য করি, তাহা হইলে তিনি আসিয়া আমাকে ধমকাইবেন। আর জমাদারের হুকুম যদি মান্য করি, তাহা হইলে আপনারা আমাকে ধমকাইবেন;—তাহা হইলে, আমি যাই কোথায়?

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় আর একজন জমাদার, হাজত-গৃহ-পরিদর্শনার্থ আগমন করিল। অধিকারী তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "বঙ্গবাসীর বাবুকে কি আপনি সমস্তরাত্রি জাগিয়া থাকিবার হুকুম দিয়া গিয়াছিলেন?"

জমাদার। না।

তন্তুবায়। ইনি নূতন জমাদার; পূর্ব্বকার অন্য একজন জমাদার আসিয়া ঐ হুকুম দিয়াছিলেন।

নূতন জমাদার অধিকারীর নিকট ব্যাপার সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন,—"তাও কি কখন উচিত হয়? বাবুর নাক ডাকে বলিয়া বাবুকে সমস্ত রাত্র জাগাইয়া রাখিতে হইবে, ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? আমি পাঁচ বৎসর কাল হরিণবাড়ীতে জমাদারী করিতেছি;—কিন্তু এমন নিয়ম কখন শুনি নাই।

জমাদার, তন্তুবায়কে ভর্ৎসনা করিয়া চলিয়া গেল; তন্তুবায় নিরুত্তর হইয়া রহিল।

রাত্রি প্রায় তিনটা। হাজতের অধিকাংশ

আসামীগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা শয়ন,—কাজেই রাত থাকিতে থাকিতেই গাত্রোত্থান। বিশেষ, এ সময় নাক-ডাকা-ঘটিত একটু গোলযোগও হইয়াছিল।

আবার আসামীগণমধ্যে পরস্পর গল্প আরম্ভ হইল। আবার সেই কলকলনাদী জল-প্রপাতের সৃষ্টি হইল! আবার পুলিনচন্দ্র ধীরে ধীরে ঘুণ ঘুণ স্বরে গান ধরিল;—

স্বজনী মোর একাকিনী কোথা রহিল রে!
না হেরি সে চন্দ্রানন, বিদীর্ণ হতেছে প্রাণ,
সে যে মোর প্রাণ ধন, কোথা লুকাল রে!!

আবার মল-মূত্রের ঝাঁজ্ যেন নূতন ভাবে নাকে আসিতে লাগিল। আবার মাঝে মাঝে আমার তন্দ্রাভাব হওয়ায় আবার নাক্ ডাকিতে লাগিল। কৃষ্ণবাবু কহিলেন,—"আবার যে, আপনার নাক ডাকে!!"

আমি। নাক-ডাকার'ত আর লজ্জা-ভয়-ঘৃণা-তুষ্টি নাই যে, নীরব হইয়া থাকিবে! লজ্জা-ভয় যা কিছু আছে, তাহা আমার!

কৃষ্ণবাবু। সে যাহাহউক,—প্রাতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তে এই প্রার্থনা থাকিবে যে, নাক ডাকিলে কেহ যেন আপনাকে বিরক্ত করিতে না পারে। আর, ঐ কয়েদী-প্রহরী রাত্রে যে, আপনার উপর উপদ্রব করিয়াছিল, সে বিষয়ও দরখাস্তে লেখা থাকিবে।

আমি। ইহা অতি সাধ্বী কথা।

আবার সম্মুখে দেখিলাম,—অধিকারী, শিবু-ডোমের কাঁধে চড়িয়াছেন। কাঁধে চড়িয়া, তিনি হাজতের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বদিক্ যেন একটু ফর্সা বোধ হইল। আবার চাবির-গুচ্ছ হাতে করিয়া একজন জমাদার-প্রহরী আসিল। আবার শব্দ হইল,—

"ফাইল, ফাইল, ফাইল!"

আবার আমরা সেইরূপভাবে, মেষপালের ন্যায়, গায়ে গা ঠেকাইয়া উবু হইয়া বসিলাম। আবার আমাদের গণনা হইল। আবার "উঠ-উঠ" শব্দ উঠিল। আবার ফাইল ভঙ্গ হইল। আবার আমরা স্ব-স্ব মৃত্তিকাখাটে গিয়া বসিলাম।

এইবার জমাদার হাজত-গৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অধিকারী আজ্ঞা প্রচার করিলেন,—"সকলে আস্তে আস্তে, দুইজন করিয়া জোট বাঁধিয়া, বাহিরে যাও। এবং পায়খানার নিকট গিয়া এক এক সারিতে চারিজন করিয়া, ফাইল দিয়া বসিয়া থাক।"

এইরূপ হুকুমমাত্র আমরা সকলে হাজত-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পিছল-পথ অতিক্রম করিয়া, পায়খানার নিকটস্থ ভূমিতে গিয়া, ফাইল দিয়া বসিলাম। যে স্থানে উবু হইয়া উপবিষ্ট হইলাম, সে স্থান ভিজা, কঙ্করময়, এবং কিছু উচু নীচু। কাজেই আমার আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিবার সুবিধা, হইল না।

সকলের এইরূপ উপবেশন-কার্য্য সমাধা হইলে, অধিকারী কহিলেন, "প্রথম সারির চারিজন এই-বার একত্র পায়খানায় যাও।" প্রথম চারিজন অমনি সেই লৌহ সরা হাতে করিয়া ছুটিল। অধি-কারী পায়খানার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমরা শেষ সারিতে ছিলাম। অল্পক্ষণ পরে অধিকারী আমাদের কষ্ট দেখিয়া বলিলেন যে, "আপনাদের যদি এখানে বসিবার কষ্ট হয়, তবে আপনারা দাঁড়াইয়া না-হয়, রাস্তায় একটু পা-চালি করুন।" এই কথা শুনিয়া আমরা দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বলাবাহুল্য, পায়খানা যাইবার জন্য এক একখানি সরা আমাদের হাতে আছে।

এইরূপে চারিজন করিয়া, একত্র হইয়া, পায়-খানা যাইতে লাগিল; এবং ক্রমশ একে একে বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ব-বর্ণনানুসারে জলশৌচ করিতে আরম্ভ করিল। যদি কোনও ব্যক্তির পায়খানায় একটু বিলম্ব ঘটে, অধিকারী অমনি তাহাকে ধমক দিয়া বলেন,—শালারা পায়খানায় এত দেরী করিস্ কেন? এ কি বাগানবাড়ী পেয়েছিস্? তাই কি ফুলের সৌরভে মন মোহিত হয়ে উঠেছে?"

প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যে সকলেরই পায়খানা-গমন-কার্য্য সমাধা হইল। বাকি রহিলাম কেবল আমরা চারিজন। অধিকারী কহিলেন,—"এই-বার আপনারা চারিজন একত্র যাউন।" (আমার প্রতি) "বাবু কিছু মোটা আছেন,—পূর্ব্বদিকের টাটীতে আপনি যাইবেন, সে ঘরটী একটু বড় বাকী তিনটী টাটীর একটীতেও বোধ হয় আপনার বসিবার স্থান কুলাইবে না।"

তাহাই হইল। পূর্ব্ব-অধ্যায়ের বর্ণনবৎ সকল কর্ম্মই করিলাম।

এখনও প্রত্যূষকাল!

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আহার এবং ঔষধ।

দেখিতে দেখিতে অতি-প্রত্যূষের ঘোর ঘোর রঙ অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল।

সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!—

প্রভাতে যঃস্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমস্সূর্য্যোদয়ে যথা।

বহুপূর্ব্বে কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার গাহিয়া ছিলেন,—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল!

আজ আমি কবি না হইয়াও গাহিতেছি,—"কয়েদীগণের

বেড়ী সব করে রব রাতি পোহাইল!

টন্‌টান্‌,—ঠন্‌ঠান্‌,—ঝিন্‌ ঝিন্‌ ঝিন্‌—এইরূপ শব্দ চারিদিকেই উত্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"এ কিসের শব্দ?

আমি। কয়েদীগণের লৌহ-শৃঙ্খলের শব্দ।

পাইখানার নিকটবর্ত্তী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, আমরা চারিজন কাণ পাতিয়া সেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি,—একি! একি! একি!—মুসলমান, মুচী, মুর্দাফরাশ, হাড়ী ডোম, ইহারা ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সঙ্গে, একত্র, এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিবে নাকি?

কৃষ্ণবাবু আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, "ঐ দেখুন, যোগীন বাবু! হাজতের আসামীগণ, এক এক খানি সরা সম্মুখে রাখিয়া সানন্দ-মনে বসিয়া আছে। বোধ হয়, উহারা এইবার আহার করিবে। এত প্রভাতে, ইহারা কোন্‌ জিনিষ আহার করিবে, বলিতে পারি না?"

আমি। আহার যে জিনিষই করুক, আপাততঃ উহাদের এক পংক্তিতে উপবেশন দেখিলেই চক্ষুঃস্থির হয়।

কৃষ্ণবাবু। তাইতো বটে! পংক্তির প্রথমে, দেখিতেছি কয়েকজন মুসলমান বসিয়াছে; পংক্তির শেষে, কয়েকজন পৈতাধারী ব্রাহ্মণ।

হাজত-গৃহে যাইবার উঠানের মধ্যস্থ যে, বড় রাস্তাটী আছে, সেই রাস্তাতেই, আসামীগণ আহারের জন্য সরা সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া আছে। সেই পথে লোকে থুথু ফেলে, গয়ের ফেলে, জুতা পায়ে দিয়া চলে, মেথর মল বহন করিয়া লইয়া যায়,—সাধারণত পথে যেরূপ হইয়া থাকে,এ পথেও সেইরূপ হয়। অথচ এই পথের উপরই পংক্তি-ভোজন হইতে চলিল। পথ পরিষ্কার করা নাই, ঝাড়ু দেওয়া নাই, জল তড়-তড়া দেওয়া নাই; সেই অসংস্কৃত অশুদ্ধ স্থানেই আসামীগণ আহারার্থে উপবিষ্ট। বিনা আসনে উবু হইয়া উপবিষ্ট। উবু হইবার বোধ হয় কারণ এই,—সেই পথটী কঙ্করযুক্ত, ভিজা, এবং স্থানে স্থানে শেওলাময়। বর্ষাকালে, রাত্রে জল হইয়াছিল। কাজেই পথটী বিশেষরূপ আর্দ্র। এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া, আসামীগণ আদেশমতে পথমধ্যে বসিয়া আছে। আমরাও মাথায় চাদর জড়াইয়া হাত মুখ প্রক্ষালনার্থ, উঠানের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি, এবং আসামীগণের পথিমধ্যে আহারার্থে উপবেশন-কার্য্য অবলোকন করিতেছি।

এমন সময়, অধিকারী মহাশয় হাসি-হাসি-মুখে, আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—এই বেলা ঠিক করিয়া বলুন, আপনারা জেলখানার খাবার খাইবেন কিনা?"

কৃষ্ণবাবু। না।

ব্রজবাবু। না, না, কিছুতেই না।

কৃষ্ণবাবু। অধিকারী মহাশয়! এখানে আদৌ জাতি-বিচার নাই নাকি? বড়ই সর্ব্বনেশে ব্যাপার দেখিতেছি।

অধিকারী। কেন, কেন, কি হইয়াছে?

কৃষ্ণবাবু। ঐ দেখুন, হাজতের ১৮ জন আসামী, একশ্রেণীতে একপংক্তিতে আহারের জন্য বসিয়া আছে। মুসলমান, ডোম, হাড়ী বাগ্দী ব্রাহ্মণ—সকলেই এক পংক্তিতে উপবিষ্ট। বড়ই মাখামাখি ভাব,—যেন জগন্নাথক্ষেত্র।

অধিকারী। চোখে চস্‌মা দিন, তবেই দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

কৃষ্ণবাবু। কি বুঝিব?

অধিকারী। বুঝিবেন এই যে, আসামীগণ মাখামাখিভাবে খাইতে বসে নাই, জাতিবিচার করিয়াই বসিয়াছে। ঐ দেখুন হাজত-গৃহের দোয়ার গোড়াতেই চারিজন মুসলমান বসিয়াছে। ঐ চারিজন বেশ ঘনসন্নিবিষ্ট। ঐ চারিজনের পর, আধ হাত বা ৮ ইঞ্চি, কিম্বা ছয় ইঞ্চি স্থান ফাঁক আছে। ফাঁকের পর শিবুডোম এবং ঐ জাতীয় আরো চারি

জন উপবিষ্ট। তারপর আবার ঐরূপ একটু ফাঁক। এইরূপ এক এক জাতি ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া বসিয়াছে। এবং জাতিরক্ষার্থ পরস্পরের মধ্যে ঐ ফাকটুকু আছে।

কৃষ্ণবাবু। আমি আপনার ফাঁকও দেখিতে পাইতেছি না, ঘন সন্নিবেশও দেখিতে পাইতেছি না। ঐ তো সব একত্র হইয়াই এক সারেই বসিয়াছে।

অধিকারী। (হাসিয়া) তাইতো বলিতে-ছিলাম, চস্‌মা চোখে দিন। শুধু চোখে এসব দেখার কর্ম্ম নয়।

আমি। কৃষ্ণবাবু! প্রিন্‌টিং কাজে দখল থাকিলে, আপনি এ বিষয় সহজেই বুঝিতে পারি-তেন। ঘন সন্নিবেশ হইল,—একলেডা বা অন্‌লেডা ম্যাটার। আর ফাঁক হইল,—ফোর্‌ট্‌-পাইকার এক-লেড বা ডুলেডা ম্যাটার।

কৃষ্ণবাবু অধিকারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা মাঝে একটু ফাঁকই না-হয় আছে, ধরিয়া লইলাম। কিন্তু এক পংক্তিতে সর্ব্ববর্ণের লোকতো বসিয়াছে? তাহা হইলে পংক্তি-ভোজন দোষ দূর হইল কৈ?

অধিকারী। এত খুঁটীনাটী ধরিলে, হাজতে থাকা চলে না। আপনাদের হাজতে না আসাই উচিত ছিল। হাজত কি ঘর যে, সর্ব্বপ্রকার বিচার আচার এখানে সুরক্ষিত হইবে? এ জোমালয়! জোমালয়! জোমালয়! সে যাহ'ক আপনারা চারিজনে এক্ষণে ঔষধ খাউন, আপ-নাদের জন্য এই ঔষধ আনিয়াছি।

কৃষ্ণবাবু। (আশ্চর্য্য হইয়া) ঔষধ কেন? ঔষধ কিসের? আমাদের তো কোন ব্যারাম হয় নাই!

অধিকারী। ব্যারাম হউক, আর না হউক, হাজতে প্রভাতে উঠিয়া এই ঔষধ খাওয়াই নিয়ম। জেলখানার ভাত আপনি খাইবনা বলিতে পারেন, কিন্তু ঔষধ খাইবনা বলিবার যো নাই। যিনি ঔষধ না খাইবেন, তাঁহার পশ্চাৎ এই সপাৎ সপাৎ বেত পড়িবে।

এই বলিয়া অধিকারী, তদীয় পশ্চাৎ-প্রদেশ কয়েকবার চাপড়াইয়া ফেলিলেন।

কৃষ্ণবাবু। দেখি,ঔষধ কি রকম?

অধিকারী কাগজের ঠোঙ্গা হইতে একটী গোল সাদা বড়ি বাহির করিয়া কৃষ্ণবাবুর হাতে দিলেন। এইরূপে তিনি আমার, ব্রজবাবুর, ও অরুণের হস্তে এক একটী বড়ি অর্পণ করিলেন।

আমি বড়িটী লইয়া, নাসারন্ধ্রে নিবিষ্ট করিয়া আঘ্রাণ লইলাম। গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিবার উপক্রম হইল। মল-মূত্রের গন্ধে আমি দৃক্‌পাত করি নাই; কিন্তু একবার বটিকার গন্ধে বাস্তবিকই প্রাণ যেন যায়-যায় হইল।

আমি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, অধিকারীকে জিজ্ঞাসিলাম;—"অধিকারী মহাশয়! আপনি সত্য করিয়া বলুন, এ বড়ি খাইলে কি হয়? এ কোন্ রোগের ঔষধ?"

অধিকারী। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, সে সব আমি কিছুই জানিনা। নিয়মানুসারে আমিও বারমাস ঔষধ খাইয়া আসিতেছি। আপ-নারা আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র ঔষধ সেবন করুন। আমি চলিলাম। দেখিবেন যেন মাথা ডিঙ্গাইয়া ঘাসের বনে ঔষধ ফেলিয়া দিবেন না।

অধিকারী পশ্চাৎপদ হইলে, আমি "জয় ধন্ব-ন্তরি" বলিয়া ঔষধটীকে শীর্ষদেশে স্থাপন করিলাম। বলিলাম,—"হে ঔষধ! হে বটিকে! হে গোলমূর্ত্তে! হে দুর্গন্ধযুক্তে! হে রোগ-শোক-দুঃখ-নাশিকে! এ যাত্রা তুমি আমায় রক্ষা কর। কৃপা করিয়া এ অধমকে এবার ক্ষমা কর।"

কৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি ও কি করি-তেছেন?" আমি বলিলাম,—"আমি একটা মন্ত্র পড়িতেছি।"

কৃষ্ণবাবু। মন্ত্র পড়িবার পূর্ব্বেই আমি ঔষধ পার করিয়াছি। এখন চলুন উঁহাদের প্রভাতের আহার ব্যাপার দেখি'গে।

দেখিলাম,—দুইজন পাচক বা আহারীয় দ্রব্য-বণ্টনকারী,—আসামীগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান। মূত্র-ত্যাগের যেরূপ টবটী দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ একটী টবে ভাতের তরল মণ্ড টল টল করিতেছে। অধিকারী কহিলেন,—"ইহার নাম, খিচুড়ী। মসূরির ডেলে এবং চেলে ঘাঁটিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।"

কৃষ্ণবাবু। খিচুড়ী এমন সাদা কেন?

অধিকারী। ডেলের ভাগ অতি অল্প আছে,—তাই সাদা।

একজন বিভীষণমূর্ত্তি পাচক, খুব এক বড় চটাল হাতা করিয়া কয়েদীদের প্রত্যেকের সরায়, এক-এক হাতা খিচড়ী দিতেছে। সে খিচড়ী চমুক দিয়াও

খাওয়া যায়, হাতে করিয়া তুলিয়া হাপুরাণও যায়। যাহার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপ ভাবেই খিচুড়ী খাইতেছে। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, ব্রজবাবু নাকে কাপড় দিয়া,আসামীগণের খিচুড়ী-ভক্ষণ অবলোকন করিতেছেন। খিচুড়ীর-আকার, প্রকার বর্ণ-লাবণ্য, ভাব-গন্ধ দেখিয়া-শুনিয়া ঘ্রাণ লইয়া, আমার নানা অনির্ব্বচনীয় উপমার কথা মনে হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সকলের আহার শেষ হইল। হাজতে আহার করিতে বসিয়া,—"আর একটু দাও"—"এখনও আমার পেট ভরে নাই,"—একথা বলিবার যো নাই। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বাঁধা নিয়মে এখানে অন্ন বিতরিত হয়। যে কম খায় তাহাকে যে-পরিমাণে অন্ন,—যে বেশী খায় তাহাকেও সেই-পরিমাণে অন্ন প্রদত্ত হয়। এইরূপ পরিবেশনের ফলে এই ঘটে,—কাহারও পাতে অন্ন পড়িয়া থাকে, কাহারও পাতে পিপীলিকা আসিয়া কাঁদে। কেহ খাইতে পারে না, কেহ খাইতে পায় না।

আহার কার্য্য শেষ হইলে,সকলে আপন আপন সরা হাতে করিয়া পায়খানার দিকে আঁচাইতে আসিল; পথের সগড়ী কিন্তু কেহই লইল না। পথ দিয়া এতক্ষণ চলাচল বন্ধ ছিল; আসামীগণের উত্থানমাত্র সেই সগড়ী-পূর্ণ-পথে চলাচল আরম্ভ হইল।

আমরা সেই সগড়ী-পথ মাড়াইয়া হাজত গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। অধিকারীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"প্রাতে ত কয়েদীদের খিচুড়ী আহার হইল,—অন্নাহার হইবে কখন? কত পরিমাণে চাল ডাল তৈল লবণ প্রত্যেক কয়েদীর প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে?"

অধিকারী। (হাসিয়া) এসব কথার জবাব মুখে মুখে আমি কত দিব?—হাজতে বসবাস ও আহারাদি সম্বন্ধীয় এক নিয়মাবলীর বিজ্ঞাপন-পত্র ঐ দেওয়ালে টাঙ্গান আছে দেখুন। উহা পড়িলে, আপনারা এ সকল বিষয় অনেকটা জানিতে পারিবেন।

আমি বলিলাম,—"এ বেশ কথা। চলুন কৃষ্ণবাবু! আমরা দুজনে গিয়া নিয়মাবলী পাঠ করি।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হাজতের নিয়মাবলী।

গত ২৪শে শ্রাবণ শনিবার বৈকালে আমাদের হাজতের হুকুম হয়। ২৪শে শ্রাবণ বৈকালের বেলাটুকু এবং ঐ তারিখের সমস্ত রাত্রির বিষয়, অর্থাৎ প্রায় ১৫ ঘণ্টা কালের বিষয়—বর্ণন করিতেই ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল। হাজতে আমরা চারিদিন ছিলাম। ১৫ ঘণ্টায় যদি ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ লাগে, তবে অবশিষ্ট ৮১ ঘণ্টায় কত পরিচ্ছেদ লাগিবে? ত্রৈরাশিক কসিয়া জানিতে পারা যায় যে, ৮১ ঘণ্টায় আরও অন্যূন ১০৪ পরিচ্ছেদ লাগিবে। যদি সত্য সত্যই আরও ১০৪ পরিচ্ছেদ লাগে, তাহা হইলে পাঠকও মাটী, গ্রন্থকারও মাটী। মাটী হইবার কাহারও প্রয়োজন নাই; সম্ভবতঃ আর স্বল্প-সংখ্যক পরিচ্ছেদেই, এই হাজত-কাহিনী সাঙ্গ হইবে।

হাজত-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর বিজ্ঞাপন পত্রটী বাঙ্গালা এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত। ২৫শে শ্রাবণ রবিবার আমরা তাহা পাঠ করি, আর আজ হইল ৪ঠা ফাল্গুন সোমবার; কিছুকম সাত মাস অতিবাহিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের লেখায় যদি এক আধটা ভ্রম দৃষ্ট হয়, তবে সুধীগণ যেন তাহা ক্ষমা করেন।

নিয়মাবলী।

১। হাজতের কয়েদীগণ, অবশ্যই জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুম মান্য করিবে, এবং কি মাহিনা-প্রাপ্ত জেলের কর্ম্মচারী, কি অবৈতনিক জেলের কয়েদী, যাহাদিগকে ঐ হাজতের আসামীগণের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদিগকেও ঐ হাজতের আসামীগণ অবশ্যই মান্য করিবে।

২। হাজতের আসামিগণের যদি কোন দুঃখ বা কষ্ট জানাইবার কারণ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রাতঃকালে যখন হাজত-পরিদর্শনার্থ আসিবেন, তখন তাঁহাকে জানাইবে।

৩। হাজতের যাবতীয় কয়েদীকেই সকল সময় নীরব থাকিবার জন্য জেদ করিয়া বলা হইবে।

৪। হাজতের আসামীগণ আপন আপন

কাপড় চোপড় পরিতে পারে; কিন্তু শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহারা হাজতে অবস্থানকালে আপন মাথার চুল কাটিতে পারিবে না। যাহাতে তাহাদের চেহারার ভাবপরিবর্ত্তন হয়, এমন কোনরূপ কার্য্য করিতে পারিবে না। যে সকল কয়েদী এক মাসের অধিক জেলে আছে, তাহারা প্রার্থনা করিলে, তাহাদের মাথার চুল কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু হাজতে প্রবেশকালীন, তাহাদের মাথার চুল যেরূপ লম্বা ছিল, সেইরূপ লম্বা রাখিয়া চুল কাটিয়া দেওয়া হইবে। সকলে,—আপনার বিছানা, বালিশ, ঘরের মেজে, খাট পরিষ্কার রাখিতে বাধ্য। কিন্তু যে সকল উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, এসকল কাজ তাঁহাদের ঘরে কখনও করেন নাই, তাঁহারা এ সমুদয় কার্য্য করিতে বাধ্য নন। অতি জঘন্য নীচ কাজ কাহাকেও করিতে হইবে না।

৫। হাজতের কয়েদীগণ প্রত্যহ নিম্নলিখিত-রূপ, আহারীয় সামগ্রী পাইবার অধিকারী।

দেশীয়		ইউরোপীয়									
খাদ্যের নাম	পরিমাণ	সাহেবদের প্রাতঃকালের ভোজন		সাহেবদের মধ্যাহ্ন ভোজ — রবি এবং বুধবারে		সোম এবং শুক্রবারে		মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবারে		সাহেবদিগের প্রাত্যহিক সান্ধ্যভোজ	
	ছটাক		ছটাক		ছটাক		ছটাক		ছটাক		ছটাক
চাল	১১	বার্লির পালো	৮	কাঁচা হাড়শুদ্ধ ভেড়ার মাংস	৮	কাঁচা গোমাংস	৮	ঝোল	৮	বার্লির পালো	৮
ডাল	৩	আটা	৬	তরকারি	৮	তরকারি	৮	গোমাংস	৩	আটা	৪
জেল বাগানের তরকারি	৩	মাখম	১/৪	ঘৃত বা চর্ব্বি	১/৮	লবণ	১/৪	তরকারি	৮	সুজি	১/৪
তৈল	১/৪	সুজি	৩/৮	হলুদ	১/১৬			মরিচ	১/১৬		
জেল বাগানের মসলা ধনে পেঁড় প্রভৃতি	১/৮			রশুন	১/১৬			পদিনা পাতা ইত্যাদি	১/২০		
লবণ	১/১৬			মসলা	১/৮			লবণ	১/৪		
তেঁতুল	১/৪			লঙ্কা	১/১৬						
কাঠ	৮			তেঁতুল	৩/১৬						
				লবণ	১/৪						

৬। হাজতের আসামীগণের আহারীয় সামগ্রী, জেল খানার পাচকগণ রন্ধন করিয়া দিবে।

৭। হাজতের কোন আসামী যদি খুব উচ্চ-পদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত হন, তবে তিনি জেলখানার খাবার না খাইতে পারেন। জেলের অধ্যক্ষ তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র আহারীয় সামগ্রী আনাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন; কিন্তু এই সকল খাদ্য দ্রব্যের মূল্য উক্ত সম্ভ্রান্ত হাজতের-কয়েদীকে দিতে হইবে।

৮। হাজতের যে সকল কয়েদী বড় বদমাইস্, দাঙ্গাবাজ, কলহপ্রিয়, তাহাদিগকে পায়ে বেড়ি-দিয়া রাখিলে কোন দোষ হয় না। সময়ে সময়ে তাহাদের উপর নির্জ্জন-বাসের এবং বেত্রাঘাত-দণ্ডের বিধি আছে।

৯। হাজতের আসামীগণ, যাহাতে বন্ধু-বান্ধব উকীল বারিষ্টারের সহিত জেল, মধ্যে দেখা করিতে পারেন, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

১০। হাজতের আসামীর কাছে যদি কিছু টাকা কড়ী থাকে, তবে তাহা জেল-অধ্যক্ষর নিকট রাখিয়া আসিতে হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দেশীয় এবং ইউরোপীয় এ উভয়ের আহারীয় সামগ্রীর তুলনায় সমালোচন পাঠকগণ করুন;—এ বিষয়ে আমি একান্তই অক্ষম।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

হস্তী।

(৩)

প্রয়োজনীয় কথা।

হস্তী সম্বন্ধে অবশিষ্ট বিবরণ বিবৃত করিবার পূর্ব্বে একটী বিশিষ্ট কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। গতবার "হস্তি-শাবকের স্তনপান" সম্বন্ধে যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কোন কোন পাঠক চমকিত হইয়াছেন। চমকিত হইবারই কথা; কেননা চিত্রে হস্তিনীর "দন্ত" অঙ্কিত রহিয়াছে। সত্য সত্যই কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—"মহাশয় গো! এ কি! হস্তিনীর দাঁত কেন? হস্তিনীর দাঁত আছে বটে; সেত অত বড় বড় নহে,—অতি ক্ষুদ্র; আমরা হস্তিনীর অত বড় বড় দাঁত কখনও দেখি নাই; তবে এ কোথাকার হস্তিনী?" আমার দুই এক জন বন্ধুও আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বাচনিক প্রশ্নের অবশ্য বাচনিক উত্তর দিয়াছি। এখন লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজনীয়; যেহেতু এমন সন্দেহ অনেকেরই হইতে পারে। তবে এ সন্দেহের জন্য অবশ্য আমিই অনেকটা দায়ী; কেননা গতবার কথাটা খোলসা করিয়া বলিয়া দিই নাই। যাহা-হউক, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আবার কিছু কাগজ ও কালী খরচ করিতে হইল। প্রথমবার-চিত্রিত এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর সহিত দ্বিতীয়বার-চিত্রিত হস্তিনীর তুলনা করিয়া দেখিলে আর কোন সন্দেহ থাকিত না। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকমাত্রেরই বোধ হয় সে সন্দেহ নাই। এসিয়া ও এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর বৈলক্ষণ্যের বিবরণে বলিয়া রাখিয়াছি, "দন্তের" তারতম্য আছে; তবে কথাটা খোলসা করিয়া বলি নাই; এবার খোলসা করিতে বাধ্য হইলাম। ভারতীয় হস্তীর দন্ত খুব বড় বড়; হস্তিনীর দন্ত খুব ছোট ছোট; কিন্তু এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর দন্ত যেমন বৃহৎ; হস্তিনীর দন্তও তেমনই বৃহৎ।* ভারতীয় হস্তিনী আমাদিগের অনেক পাঠক দেখিয়া থাকিবেন; সেই জন্য ভারতীয় হস্তিনীর চিত্র না দিয়া, এফ্রিকা দেশীয় হস্তিনীর চিত্র দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। এখন বোধ হয়, আর কোন সন্দেহ রহিল না। এসিয়া দেশীয় এবং এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর মধ্যে আর একটু তারতম্য আছে। এফ্রিকা দেশীয় হস্তীর পঞ্জর-অস্থি ১৯ খানি; এসিয়া দেশীয় হস্তীর পঞ্জর-অস্থি ২২ খানি। সিংহল দেশীয় হস্তীর প্রায় দাঁত দেখা যায় না; যদি কখন দেখা যায়, সে বড় ছোট-ছোট।

বোর্ণিওর হস্তী।

হস্তী ধরিবার নানা প্রকার প্রথা প্রচলিত। গতবার বলিয়াছি, "খেদা" বা হস্তী ধরিবার প্রথা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র বৃহৎ বিভাগ আছে। সে সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিবৃত করা, এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে; এ প্রথাটা অবশ্য পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রথা-বৎ; সুতরাং ইহার উল্লেখ আপাততঃ না করিলেও এ প্রবন্ধের অঙ্গ-ত্রুটি হইবে না; তবে একটা কথা বলিয়া রাখি, দাক্ষিণাত্যে কয়ম্বুটুরে এবং বাঙ্গালার ঢাক-অঞ্চলে হাতী ধরিবার প্রধান আড্ডা। মহীশূর রাজ্যেও হস্তী ধরিবার সুবন্দোবস্ত আছে। সেও এক বৃহৎ ব্যাপার।

ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত বোর্ণিও দ্বীপের হস্তী ধরিবার কৌশল কতকটা কৌতূহলোদ্দীপক। সেই জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এই খানে হইল।

বোর্ণিও দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে সমুদ্র-তীর-বর্ত্তী বন-জঙ্গলে বন্য-হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। তত্রত্য "কিনা বাটানগান"-নদী-তীরস্থ স্থানে হস্তী দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল হস্তীও সচরাচর কর্ষিত কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ শস্যাদি নষ্ট করে। এই সময় বোর্ণিওবাসীরা "মশাল" জ্বালাইয়া তাহাদের সম্মুখে ধরে। "মশালের" তীব্র আলো সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা বনমধ্যে পলায়ন করে। ভারতে হস্তী ধরিবার

---

* *The African elephant, Elephas africanus, cuvier, is not now tamed in Africa, though it appears to have been so in the time of the Carthaginians. The tusks are very large, and are nearly of the same size in the male and female.* T. C. Jerdon's "*Mammals of India*" *P. 231.*

যেমন "খেদা" প্রচলিত, সেখানে সেরূপ নহে। শিকারী গভীর রজনীতে একটী ছোট অথচ তীব্র-তীক্ষ্ণ বরিসা লইয়া, হামাগুড়ি দিয়া, হস্তি-যূথের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং অতি সুকৌশলে সেই বরিসাটী একটী বৃহৎ হস্তীর পেটে বসাইয়া দেয়। হস্তী আঘাতে অস্থির হইয়া, চাৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকার শুনিয়া অন্যান্য হস্তী ভয়-বিহ্বল চিত্তে বন-মধ্যে পলায়ন করে। পর দিন প্রাতে শিকারী, ভূমিতে রক্ত-চিহ্ন দেখিয়া আহত হস্তীর অনুসরণ করে। কতক দূর গিয়া সে দেখিতে পায়, আহত হস্তী শোণিত-স্রাবে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া আছে। হস্তীকে এই অবস্থায় দেখিয়া সে আবার একবার বরিসার আঘাত করে। তাহাতে হস্তী আশুই আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই রূপে দুর্ব্বল হইলে, শিকারী হস্তীকে করায়ত্ত করিয়া ফেলে। *

সুমাত্রার হস্তী।

ভারত মহাসাগরের সুমাত্রা দ্বীপেও হস্তী পাওয়া যায়। ইহাদের ২০ খানি পঞ্জর-অস্থি। ভারতীয় হস্তীর দাঁতের মেড়ো অপেক্ষা ইহাদের মেড়ো চওড়া; বুদ্ধিও ভারতীয় হস্তী অপেক্ষা অনেক বেশী।

হস্তিযূথ।

হস্তী দলে দলে বহির্গত হয়। এক এক দলে বহু সংখ্যক করিয়া হস্তী ও হস্তিনী থাকে। সংখ্যার স্থিরতা নাই। তবে প্রাচীন কালে হস্তিযূথে যত সংখ্যক হস্তী ও হস্তিনী থাকিত, বর্ত্তমান কালে তাহার সিকি সংখ্যা থাকে কিনা সন্দেহ। নানা কারণে হস্তীর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হস্তী বড় পাওয়া যায় না বলিয়া, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হস্তিনী ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন আইন-আকবরীর মতে আকবরের রাজত্বকালে সময়ে সময়ে, এক এক ভারতীয় হস্তীর দলে সহস্র সংখ্যক হস্তী দেখা যাইত।* বন্য-হস্তীরা বড় সতর্ক ভাবে বন-মধ্যে বহির্গত হইয়া বিচরণ করে। শীত কালে এবং গ্রীষ্ম কালে তাহারা একটী বিশ্রাম স্থান পছন্দ করিয়া লয়; এবং নিদ্রা যাইবার স্থানসমীপস্থ বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ফেলে। হস্তী প্রাণে সখও ভোরপুর। তাহারা সখ করিয়া, আমোদ করিতে করিতে, দলে দলে বহু যোজন পথ ভ্রমণ করে; আহার পানীয়ের জন্য ত কথাই নাই। হস্তিযূথ যখন ভ্রমণে বাহির হয়, তখন অনেক সময় একটী হস্তিনী তাহাদের বহুদূরে অগ্রে অগ্রে যাইয়া, প্রহরীর কার্য্য করে। কখন কখন হস্তীর উপরও এ ভার পড়িয়া থাকে। যখন হস্তিযূথ নিদ্রা যায়, তখন চারিটী করিয়া হস্তিনী প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ঠিক প্রহর মাপিয়া না হউক, এই চারিটী হস্তিনী পাল্টাপাল্টি করিয়া চৌকি দেয়।

হস্তীর স্বরভেদ।

হস্তীর তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বর। (১) আহ্লাদসূচক। হস্তী শুণ্ড উত্তোলন করিয়া তূরীর ন্যায় শব্দ করিলে বুঝা যায়, সেই শব্দ আহ্লাদ-সূচক। (২) অভাবপ্রকাশক। কেবল মুখে যে অনুদাত্ত শব্দ হয়, তাহাতে বুঝা যায়, হস্তীর কোন অভাব হইয়াছে। (৩) ক্রোধজ্ঞাপক কণ্ঠদেশোৎপন্ন ভীষণ শব্দে হস্তীর ক্রোধ অভিব্যক্ত হয়।

হস্তীর ব্যবহার।

বন্য হস্তীর বিবরণ বিবৃত হইল। এইবার গৃহপালিত হস্তীর কথা। বলা বাহুল্য, অশ্বে যেমন আরোহণ করিতে হয়, হস্তীও তেমনই আরোহণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যিনি হস্তীর দান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া দান লইতে হয়।† অশ্ব মূল্যবান,

* অনেকের ধারণা, বঙ্গে এ অঞ্চলে আদৌ হস্তী ছিল না। একশত বৎসরেরও উপর হইল "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী" সুলুর সুলতানকে কতকগুলি হস্তী উপহার দেন। সুলতান দেখিলেন, এ সব হস্তী তাঁহার রাজ্যের যাবতীয় শস্যাদি খাইয়া ফেলিবে। তিনি তখন কোম্পানীকে বলিলেন;—"আপনারা এ সব হস্তী, বোর্ণিওর উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে 'উনসাং' অন্তরীপে পাঠাইয়া দিন। সেখানকার লোকেরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" কোম্পানী তাহাই করিলেন; কিন্তু তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার না লইয়া তাহাদিগকে বনে ছাড়িয়া দেয়। তাহারা অচিরে বন্য হইয়া পড়ে।

Mr. Spencer St. John's 'Life in the forests of the East' (1862). I. 86.

* *Blochmann's Translation of Ain I Akbari P. 122.*

† "——প্রতিগ্রহঃ।
আরুহ্য চ গজস্যোক্তঃ——"
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

হস্তী কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান। এক একটী হস্তীর মূল্য, ১ শত হইতে ১ লক্ষ পর্য্যন্ত।[1] আইন-আকবরীর মতে, পাঁচ শত অশ্বের মূল্য যা, একটী উত্তম হস্তীর মূল্য তাই। এখন অবশ্য এরূপ নহে। তবুও আজ কাল উৎকৃষ্ট হস্তীর মূল্য ২ সহস্র হইতে ১০ সহস্র পর্য্যন্ত। সুতরাং ধনবান ভিন্ন এ মূল্যবান জীবের অধিকারী আর কে হইতে পারে? পূর্ব্বে ধনবানই ইহার ব্যবহার করিতেন, এখনও ধনবানই ব্যবহার করিয়া থাকেন। হস্তী ভাগ্যবানের সমৃদ্ধি-পরিচায়ক। পূর্ব্বে হস্তী ভারতের নৃপতিগণের যুদ্ধকালে সবিশেষ সহায়তা করিত, এখন ইহা ভারতীয় নৃপতিগণের সখ ও সমৃদ্ধি পরিচায়কমাত্র। অনেক সময়, মফস্বল বিহারী ইংরেজ শাসককর্ত্তৃপক্ষের বিহার বা শীকারেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থূল কথা,—বনে, রণে, বিহারে, শীকারে হস্তী প্রধান সহায়। হস্তী আরোহীকে পৃষ্ঠের উপর লইয়া, শুণ্ডটী উচ্চ করিয়া, অবাধে নির্ভয় চিত্তে প্রবল তরঙ্গসঙ্কুল নদী পার হইয়া যায়; ধীর পদক্ষেপে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে উচ্চ পর্ব্বতেও উঠিতে পারে।

এ অধম লেখক প্রথম, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, জয়পুর হইতে অম্বরের রাজা মানসিংহের প্রাচীন প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিল। জয়পুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ গাড়ী করিয়া যাইতে হয়। সেই খানে অম্বর পর্ব্বতের প্রারম্ভ। এই খানে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে হয়। সেখান হইতে অম্বর দেড় ক্রোশ। আরোহণ বড় সোজা কথা নহে। হস্তিচালক বা মাহুতের ইঙ্গিতে, হস্তী বসিয়া পড়িল; বসিলে তবুও কিন্তু উচ্চ ৩।৪ হাত। একখানি কাটের সিঁড়ি দিয়া, তবে হস্তীর উপর চড়িয়া, হাওদার উপর বসিতে হইল। হাওদাটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত,—চতুর্দ্দোলার মত,—হস্তীর পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত। দুই জন হাওদার এক দিকে অর্থাৎ হস্তিপৃষ্ঠের এক দিকে এবং এ লেখক ও অপর একজন, অপর দিকে বসিবার স্থান পাইয়াছিল। হস্তীর স্কন্ধোপরি বসিয়াছিল মাহুত,—অঙ্কুশ (ডাঙ্গশ) হস্তে। সকলে বসিলাম;—সিঁড়িটী খুলিয়া লওয়া হইল। মাহুত বলিল, "বাবুরা সাবধানে হাতীতে বসিবেন।" মাহুতের কথায় হাওদার কাষ্ঠদণ্ড আঁকড়াইয়া ধরিলাম। না ধরিলে হয়ত পড়িয়া যাইতাম। যাহা হউক, হস্তী উঠিল উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল; কদমে কদমে পা ফেলিয়া, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। মনে হইল, হস্তী এই পড়ে, এই পড়ে; আমরাও বুঝি পড়ি পড়ি; হস্তী কিন্তু পড়িল না; আমরাও পড়িলাম না; সেই সমভাবে ধীর পদক্ষেপে, হেলিতে দুলিতে, উঠিতে লাগিল; ক্রমে নিম্ন স্থান হইতে উচ্চে,—তার পর, তদুচ্চে, এইরূপ উচ্চে উঠিতে উঠিতে প্রাসাদের সমতল প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইল। আবার পূর্ব্ববৎ মাহুতের ইঙ্গিতে বসিয়া পড়িল; আবার পূর্ব্ববৎ সিঁড়ি দিয়া নামিতে হইল গৃহপালিত। হস্তীর অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। শিখাইলে হস্তী যখন দড়ির উপর দিয়াও চলিতে পারে, তখন পর্ব্বতে উঠা আর বিচিত্র কি? তাহাকে যা শিখাইবে, সে তাহাই শিখিবে। মানুষের মতন শিক্ষিত হস্তী গানের সুরতাল স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে; এবং তালে তালে নাচিতে পারে। শিক্ষিত হস্তী ধনুকে বাণ যুড়িয়া, বাণ ছুঁড়িতে পারে; বন্দুকও ছুড়িতে পারে। একটী ছুঁচ ফেলিয়া দাও, হস্তী শুঁড়ে করিয়া তুলিয়া, তাহা মাহুতের হাতে দিবে। এই কৌশল-চাতুর্য্যর অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। নিম্নে সংক্ষেপে কয়েকটী উল্লিখিত হইল মাত্র।

কাপ্তেন ইয়ুস অমরপুরে দুইটী হাতীকে নাচিতে দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন রোমে, হাতী থিয়েটরে, তালে তালে ঠমকে ঠমকে নাচিত;—ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত;—এই মণ্ডলাকারে চলিল, আবার কটাক্ষের ইঙ্গিতে সমভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। হস্তীদিগকে পুরুষ ও স্ত্রীর বেশে সজ্জিত করিয়া, খানার টেবিলের নিকট বসাইয়া দেওয়া হইত। তাহারা নির্ব্বিবাদে নির্বিঘ্নে, সকল আহারীয়, একে একে যথাপর গ্রহণ করিত;—একটী শব্দ হইত না; একটু গোল হইত না; একটু অনিয়ম হইত না। তাহারা সুরার স্বর্ণও রৌপ্য পাত্র শুণ্ড দ্বারা তুলিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে সুরা পান করিত; কিন্তু মাতাল হইত না। প্লিনি বলেন,—হস্তীরা দড়ির উপর নাচিতে শিখিত; সারি সারি দড়ি টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত, তাহার উপর দিয়া, চারিটী হস্তী অপর একটী হস্তীকে বহিয়া লইয়া যাইত। তাহারা অবিচলিত ভাবে, যথানিয়মে

১। জাহাঙ্গীরের সময়, হস্তীর মূল্য অনেক অধিক ছিল। তৌজুকি, জাহাঙ্গীরী, ১৯৮ পৃষ্ঠা। শাজেহানের সময় পেগু হইতে প্রথম শ্বেত হস্তী আনীত হয়।

দড়ির উপর দিয়া চলিয়া যাইত,—আবার ফিরিয়া আসিত। সেনেকা বলেন,—হাতী দড়ির উপর দিয়া চলিয়া যাইত এবং হাটু গাড়িয়া বসিত। থিয়েটরের ছাদে দড়ি বাঁধিয়া, গড়ানে ভাবে মাটির সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইত, হাতী স্বচ্ছন্দে সেই দড়ি দিয়া ছাদে উঠিত এবং নামিত। হাতীর গলায় ঢোলক বাঁধিয়া দেওয়া হইত; হাতী তালে তালে বাজাইত; অন্যান্য হাতী তালে তালে নাচিত।* হাতীর এরূপ অদ্ভুত কীর্ত্তি অনেকই শুনিয়াছি। আজ কালকার সারকাসেও তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

যুদ্ধে হস্তী।

রামায়ণ-মহাভারত-পাঠকবর্গের অবিদিত নাই, সমর-রঙ্গে হস্তী ভারতের নৃপতিবর্গের কিরূপ সহায়তা করিত। ব্যূহভেদে হস্তীই প্রধান অবলম্বন।† যাঁহারা ভারত পাঠ করেন নাই; অথচ হস্তীর সমরকৌশল জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে মহাভারতে দ্রোণ পর্ব্বের পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হস্তী যুদ্ধকালে ক্রমনিম্ন ভূমিস্থ শত্রুদিগকে কিরূপে অনায়াসে আক্রমণ করিত, তাহা মহাভারত পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য অনেক স্থানে হস্তী, যুদ্ধের প্রধান সহায় ছিল। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণও অনেক পাওয়া যায়। কার্থেজবীর হানিবল, বহুসংখ্যক হস্তী লইয়া ইতালী জয় করিতে গিয়াছিলেন। আলপস্ পর্ব্বত পার হইবার পর, "ট্রেবিয়ার" যুদ্ধান্তে দুরন্ত শীতে বরফে প্রায় সকল হস্তী মরিয়া গিয়াছিল; যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে ৭টী এপিনাইন পার হইবার সময় মারা পড়ে। তারপর কেবল একটীমাত্র "আরণো"র জলাভূমি পার হইয়া গিয়াছিল।‡ প্রাচীনকালে সিরিয়া দেশীয় নৃপতিবর্গের বহুসংখ্যক সৈন্য হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিত। আণ্টিয়কস্ যখন জুডাস্ মাকাবিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, তখন তাঁহার সৈন্যে হস্তী থাকিত।* এই হস্তী ভারতীয় হস্তিচালক কর্ত্তৃক চালিত হইত। এক একটী হস্তীর পৃষ্ঠে হাওদার ভিতর ৩২টী করিয়া যোদ্ধা থাকিত। টলিমি যখন এসিয়া আক্রমণ করেন, তখন অনেক যোদ্ধা হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্‌বীর এলেক্‌জেণ্ডার প্রবল হস্তি-সৈন্য-ভয়ে ভারতবর্ষের অধিকদূরে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। মদক্ষরণ সময়ে হস্তী যেমন উন্মত্ত হইয়া উঠে, অনেক হস্তী রণ-রব শুনিলেও সেই রূপ হয়। সম্রাট আকবরের "গজমুক্তা" নামে একটী হস্তী, জয়ঢক্কার রব শুনিলেই মাতিয়া উঠিত; এমন কি সে রবে তাহার মদক্ষরণও হইত। মদক্ষরণের সময় নির্দ্ধারিত আছে বটে; কোন হস্তীর শীতে, কোন হস্তীর গ্রীষ্মে, এবং কোন হস্তীর বর্ষাকালে মদক্ষরণ হয়; কিন্তু সময় না হইলেও রণ-রবে অনেক হস্তীরই মদক্ষরণ হইয়া থাকে।

হস্তীর গতি ও শক্তি।

বর্ত্তমানকালে হস্তীর উপর চড়িয়া যুদ্ধ করিবার রীতি নাই। তবে দুর্গাদি আক্রমণ করিতে হইলে হাতীর উপর, কামান রাখিয়া গোলা ছুঁড়িতে হয়। ইংরেজের যুদ্ধকালে হস্তী ভারবহনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হস্তীকে এখন কামান টানিয়া এবং তাম্বু প্রভৃতি বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। উষ্ট্র ও বৃষ যাহা না পারে, তাহাই হস্তীকে বহিতে হয়। হস্তী ২২৷৷ মণ হইতে ৩০ মণ ওজনের মাল বহন করিয়া থাকে। ভার লইয়া হাতী ঘণ্টায় ১৷৷০ ক্রোশ বা দিনে ৮।১০ ক্রোশ চলিতে পারে; তবে আবশ্যক হইলে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক দূর যাইতে পারে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে, হাতীতে আরোহণ করিয়া ঘণ্টায় ২৷৷০ ক্রোশ পথ যাওয়া যায়। হস্তী জঙ্গল হইতে কাঠ বহিয়া নদীর উপকূলে বহিয়া লইয়া যায়।†

---

* *Balfour's Cyclopædia of India Vol II*

† "গজে সত্যপ্রবোধিত্বমুচ্চৈঃ কর্ণচামরম্।
অরিব্যূহবিভেদিত্বং কুম্ভমুক্তাফলাদয়ঃ।"
কবিকল্পলতা।

‡ ইহাতেই কেহ কেহ বলেন, যে শীত প্রধান দেশে বরফ জমিয়া থাকে, সেখানে হস্তী বাঁচে না; তবে কোন রকমে হস্তী বাঁচিয়া গেলে, তদ্দেশীয় জলবায়ু তাহার বংশানুক্রমে সহিয়া যায়।

Journal of the Asiatic Society Vol. **111. P.** *23.*

* *1st Maccabees. vi 33, 37.*

† *Balfour's Cyclopædia of India. Vol. II.*

বল পরীক্ষা।

বৃহস্পতির মতে—যে হস্তী অষ্টাদশসহস্র পল পরিমিত (৪ তোলায় এক পল হয়, সুতরাং সাড়ে বাইশ মণ), সুবর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র গ্রহণ করিয়া সবেগে দশ যোজন পথ গমন করে, এবং তাহাতেও ক্লান্ত হয় না, হস্তীর মধ্যে সেই হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বলবান্।

যে হস্তী ঐরূপ চতুর্দ্দশসহস্র পল স্বর্ণাদি ভার বহন করত অনায়াসে সপ্ত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হয়, সেই মধ্যবলী হস্তী।

আর যে হস্তী দশসহস্র পল স্বর্ণাদি ভার গ্রহণ করিয়া পঞ্চ যোজন পথ যাইতে ক্ষমবান্ হয়, সেই হস্তীই হীনবল।

সত্রিভাগদ্বিহস্ত (পৌনে তিন হাত) পরিণাহযুক্ত ও চতুর্হস্তনিখাত স্তম্ভকে অক্লেশে ভাঙ্গিতে পারে, বা উৎপাটন করিতে পারে, সেই হস্তী উত্তম বলবান্।

যে হস্তী, সাড়ে তিনহাত প্রোথিত, সপ্ত হস্ত উন্নত এবং পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি পরিণাহযুক্ত স্তম্ভকে শীঘ্র উৎপাটন করিয়া ভাঙ্গিতে পারে, সে সমস্ত গজের মধ্যে মধ্যবলী।

আর যে গজ, তিন হস্ত নিখাত, ছয় হস্ত উচ্চ ও পঞ্চবিংশতি অঙ্গুলি স্থূল স্তম্ভকে অনায়াসে ভাঙ্গিতে বা উৎপাটন করিতে সমর্থ হয়, সেই হস্তী হীনবল।

বেগ পরীক্ষা।

পূর্ব্বে যে ভদ্র, মন্দ ও মৃগ নামভেদে তিন জাতীয় হস্তীর কথা বলিয়াছি, এক্ষণে সেই তিন জাতীয় হস্তীরই উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার বেগের লক্ষণ কথিত হইতেছে। সকল জাতিরই বেগ তিন প্রকার।

কোন এক জন যুবা পুরুষ ও একটী হস্তী, উভয়ে দশপদ অন্তরে থাকিয়া যদি এক সময়েই ছুটিতে আরম্ভ করে, আর হস্তীটী মনে করিবামাত্রই বেগের সাহায্যে ঐ যুবার নিকট পৌঁছিতে পারে, তাহাকে উত্তম বেগ বলা যায়।

যে হস্তী, বেগের সাহায্যে ঐরূপ সপ্তপদান্তরিত পুরুষকে, একশত পদের মধ্যে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে মধ্যম-বেগ বলে।

আর ঐরূপ পঞ্চপদস্থ ব্যক্তিকে যে বেগ দ্বারা গমনপূর্ব্বক দেড় শত পদ অন্তরে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধম বেগ বলে।

প্রকারান্তর।

দ্বাত্রিংশৎ মাত্রা অর্থাৎ বত্রিশটী লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে যে হস্তী আটশত হাত পথ গমন করিতে পারে, তাহাকে উত্তম-বেগশালী হস্তী কহে।

ঐরূপ পঞ্চাশত মাত্রা উচ্চারণ সময়ের মধ্যে যে হস্তী ঐ আট শত হাত চলিতে পারে, সেই হস্তী মধ্যম-বেগবান্।

আর যে হস্তীর আট শত হাত গমন করিতে দুই শত মাত্রা সময় লাগে, সেই হস্তীই অধম বেগবান্।*

হস্তীর আহার।

হস্তীর দেহটী যেমন, আহারটীও তেমনই। দেহ পর্ব্বতাকার,—আহারও স্তূপাকার। সচরাচর হস্তী এক মণ তণ্ডুল এবং ৩।০ মণ জল খাইতে পারে। মোগল সম্রাট আক্‌বর, হস্তীকে ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন ;—(১) মস্ত, (২) সেরগির, † (৩) সাদা, (৪) মাঝলা, (৫) কড়া, (৬) ফাণডুরকিয়া, (৭) মোকাল। এই সপ্ত শ্রেণীর প্রত্যেক আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা ;—বড়-আড়া, মাঝারি-আড়া এবং ছোট-আড়া। মোকালের আবার ১০টী ভাগ। প্রত্যেক শ্রেণীর আহার বিভাগও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল।

মস্ত।—বড়-আড়া ২ মণ ২৪ সের; মাঝারি-আড়া, ২ মণ ১৩ সের; ছোট-আড়া ২ মণ ৪ সের। সেরগির।—বড়-আড়া ২ মণ ৯ সের; মাঝারি-আড়া ২ মণ ৪ সের; ছোট-আড়া ১ মণ ৩৯ সের। সাদা।—বড়-আড়া ১ মণ ৩৪ সের; মাঝারি-আড়া ১ মণ ২৩ সের; ছোট-আড়া ১ মণ ২৪ সের। মাঝলা।—বড়-আড়া ১ মণ ২২ সের; মাঝারি-আড়া ১ মণ ২০ সের; ছোট-আড়া ১ মণ ১৮ সের। কড়া।—বড়-আড়া ১ মণ ১৪ সের; মাঝারি-আড়া ১ মণ ৯ সের; ছোট-আড়া ১ মণ ৪ সের। ফাণডুরকিয়া।—বড়-আড়া ১ মণ; মাঝারি-আড়া ২৪ সের; ছোট-আড়া ২২ সের; মোকাল।—বড়-আড়া ২৬ সের; মাঝারি-আড়া, ২৪ সের; তৃতীয় শ্রেণী ২২ সের; চতুর্থ শ্রেণী ২০

* বাচস্পত্য।

† এই সকল হস্তী ব্যাঘ্রশীকার করিত।

সের; ৫ম শ্রেণী ১৮ সের; ৬ষ্ঠ শ্রেণী ১৬ সের; ৭ম শ্রেণী ১৪ সের; ৮ম শ্রেণী ১২ সের; ৯ম শ্রেণী ১০ সের; ১০ম শ্রেণী ৮ সের। হস্তিনীরও বিভাগ ছিল। ইহাদেরও ক্রমানুসারে আহারের ব্যবস্থা ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হস্তনী ১ মণ ২২ সের। আহার পাইত; সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হস্তিনী পাইত ৬ সের মাত্র।

আকবরের ব্যবহারার্থ ১০১টী হাতী ছিল। এই সকল হাতী পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে আহার পাইত; তবে আহারের কিছু গুণভেদ ছিল। এই সকল হস্তীদের মধ্যে কতকগুলি ৫ সের চিনি, ৪ সের ঘি, এবং অর্দ্ধ মণ মসলা-মিশ্রিত চাউল পাইত; এবং কতক হস্তীকে চাউল, ঘি, প্রভৃতির উপর অর্দ্ধ মণ দুগ্ধ দেওয়া হইত। আকের সময়ে অনেক হাতী দুইমাস কাল ৩ শত করিয়া আক খাইতে পাইত।* বর্ত্তমান কালের আহার ব্যবস্থাও অনেকের এইরূপ।

হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া বহুদূর ভ্রমণ করিতে হইলে, অনেকে হস্তীকে ময়দার রুটি খাওয়াইয়া থাকে। প্রায় ১২।১৩ সের ময়দা মাখিয়া রুটি তৈয়ারি করিতে হয়। রুটি তৈয়ারি করিবার অগ্রে ময়দায় আধ সের ঘি এবং আধ সের লবণ দিতে হয়। এই ময়দায় আধ সের ওজনের এক এক খানি করিয়া রুটি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই রুটি দিনের মধ্যে দুইবার খাওয়াইতে হয়। ইহাতে কি পেট ভরে? পেট ভরাইবার জন্য হস্তীরা বড় বড় গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলে; ডাল ভাঙ্গিয়াই কিন্তু খায় না; পৃষ্ঠে করিয়া বহিয়া লইয়া আসে; তাহার পর ধীরে ধীরে পাতা ও ডাল বাদ দিয়া কেবল ছাল খায়। তাহারা শুঁড়ে করিয়া এমনই কৌশলে ছালগুলি ছাড়ায় যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বন্য হস্তীরা বনে অবশ্য গাছের ছাল, ডাল, পাতা প্রভৃতি খাইয়া থাকে। "কৎবেল" খাইতে হস্তী খুব মজবুদ্। একটী আস্ত "কৎবেল" দাও, হস্তী গিলিয়া ফেলিবে; মলত্যাগ করিলে দেখিবে, "কৎবেলটী" তেমনই আস্ত আছে; কিন্তু ভিতরে শাঁস নাই। এই জন্যই "গজ-ভুক্ত-কাপিত্থবৎ" কথাটী প্রচলিত। সকাল-সন্ধ্যা হস্তীকে স্নান করাইতে হয়। ভ্রমণে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে হস্তীর কপালে, কাণে ও পায়ে মাখম মাখাইতে হয়; নতুবা রৌদ্রের তাপে এই সব স্থান সহজেই ফাটিয়া যায়।

হস্তীর সাজ-সজ্জা।

সাজ-সজ্জা বহু প্রকার। আকবরের সময় বিবিধ প্রকার প্রচলিত ছিল এবং অনেক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশ এখনও প্রচলিত। সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র উল্লিখিত হইল।

ধরণ এক প্রকার শিকল। এই শিকল,—সোণা, রূপা বা লৌহে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শিকলের এক দিকটা হস্তীর পশ্চাৎপদে বাঁধা থাকে; অপর দিকটা মৃত্তিকায় প্রোথিত খুঁটায় বাঁধা থাকে। বেড়ি নামক শিকলেও পশ্চাতের পা বাঁধিতে হয়। বলান্দ নামক শিকলে পশ্চাতের পা বাঁধা থাকে বটে; কিন্তু হস্তী অনেক দূর স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পারে; পলাইতে পারে না। লো-লাঙ্গর নামক শিকলে হস্তীর সম্মুখের পা বাঁধা থাকে। হস্তী দৌড়াইলে বা ক্ষেপিয়া অত্যাচার করিলে, মাহুত এই শিকল এমনই কৌশলে ঘুরাইয়া দেয় যে, তাহাতে হস্তীর আর নড়িবার শক্তি থাকে না। স্বয়ং আকবর এই কৌশল আবিষ্কার করেন। চরক।—একহাত আন্দাজ বংশখণ্ড মধ্যে-ফাঁপা থাকে। সেই বংশখণ্ডের মধ্যে এমনই কৌশলে বারুদ পূরা থাকে যে, হস্তী অবাধ্য হইয়া উঠিলে, আগুনদিবামাত্র সেই বারুদপূর্ণ বংশখণ্ডে মহা শব্দ হয়। চরকে শব্দ হইলে হস্তী আর উৎপাত না করিয়া, ভয়ে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পড়ে। এটীও আকবরের আবিষ্কার। হস্তী অশান্ত হইয়া উঠিলে, চক্ষুর উপর কাপড় প্রস্তুত একটী ঠুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। হস্তী আর দেখিতে পায় না, কাজেই ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। কালাওয়া নামক দড়িতে লোহার কড়া বাঁধা থাকে। সেই কড়া হস্তীর স্কন্ধ দেশের দুই পার্শ্বে ফেলিয়া দিতে হয়। মাহুত এই কড়ায় পা দিয়া চড়িয়া থাকে।

দুলতি একটী দড়ির নাম। উহা লম্বে ১০ হাত মোটা একটী লাঠির মত। উহা কালাওয়াতে দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হয়।

কেনার ডাঙ্গস।—একহস্ত লম্বা; মুখটী ক্রমশঃ সরু। উহা কালাওয়াতে বান্ধা থাকে। যখন

---

* *Blochmann's Translation of Ain I Akbari,*

হাতীকে তাড়না করিবার প্রয়োজন হয়, তখন কেনার দিয়া হস্তির কর্ণে খোঁচা মারা হয়। এক গাছি দড়ি লেজের ভিতর দিয়া গলায় বান্ধা থাকে। উহাদের দর বা দড় বলে। দরটী হস্তির একটী অলঙ্কারের মত। অনেক অলঙ্কারও ইহাতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। আবার ইহাতে লাগামের কার্য্যও করে। যখন হস্তী বিপথে যায়, তখন এই দর ধরিয়া টানিতে হয়। হস্তীর পৃষ্ঠে বসিবার যে আসন থাকে, তাহাকে গদেলা বলে। ইহা দুলতির নিম্নে থাকে। এইটী থাকাতে হস্তীর গায়ে কোন প্রকার আঘাত লাগে না বা কষ্ট হয় না। আরোহীরও কষ্ট হয় না। ইহা ব্যতীত একটী পিত্তলের শিকল থাকে। ইহার কতকটা শোভার নিমিত্ত।, ইহাতে দুলতি বহনের কষ্ট অনেকটা নিবারিত হয়। ইহার নাম শুদৌতি। হস্তীর পাছার উপর দড়ির দুইটী বিড়ার মত রাখা হয়। ইহার উপর কামান রাখিয়া গোলা ছুড়িলে হস্তীর অঙ্গে কোন প্রকার আঘাত লাগে না। ইহাকে পেচওয়া বলে। হস্তীর আর একটী সাজ আছে, তাহা বড় শোভাময়। এক খানি বনাতের উপর কতক গুলি ছোট ছোট ঘণ্টা বান্ধা থাকে। সেই বনাত খানি সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত একটী দড়িতে ঝোলান থাকে। তাহাকে চৌরাণী বলে। আর এক গাছি দড়িতেও ঘণ্টা ঝোলান থাকে, তাহা উভয় পার্শ্ব হইয়া, পেটের নিম্ন দিয়া বান্ধা থাকে। ইহার নাম পিট-কচ্ছ।

মনুষ্যগণ পুরাকালে যুদ্ধের সময় বর্ম্ম পরিধান করিতেন। হস্তীর জন্যও বহুবিধ বর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। দুই প্রকার বর্ম্ম প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে পাকহার এক প্রকার। ইহা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। এক খণ্ড মস্তকের উপর এবং এক খণ্ড গ্রীবাদেশের উপর থাকে। পাকহারের উপর তিনপুরু মোটা কাপড় ঢাকা থাকে। ধারে ফিতা দিয়া মোড়া হয়। ইহার শোভা যথেষ্ট। ইহাকে গজঝম্প বলে। হস্তীর উপর মাহুত বসিয়া হস্তী চালনা করিবে, তাহার ব্যবস্থাও আছে। রৌদ্র বৃষ্টি হইতে মাহুতকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার আসনের উপর একটী শোভাময়ী চাঁদওয়া খাটান হয়। ইহাকে মেঘ ডম্বর বলে। রাজারাজড়া যেরূপ সোনা-রূপার কাজকরা টুপি ব্যবহার করেন, হস্তীর জন্য সেইরূপ শোভাময়ী অলঙ্কার আছে। উহাকে রণ-পিয়ালা বলে। রণ-পিয়ালা স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত একটী পেটী। উহার মস্তকের সম্মুখভাগে পরাইতে হয়। উহা পরিলে হস্তীর মুখের বড়ই শোভা হয়। সুন্দরীগণ সৌন্দর্য্যে তুষ্ট নহেন। সৌন্দর্য্যের সহিত মিশাইবার জন্য চরণে মল ও নূপুরে নিনাদ করেন। গজগামিনীগণ যখন গজেন্দ্রগমনে গমন করিতে থাকেন, তখন চরণপাতের শব্দ মাধুরীতে মোহিত করেন। সুন্দরীগণের গর্ব্বমোচনের জন্যই যেন হস্তীর চরণে চরণালঙ্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হস্তীর চরণেও পাঁইজোর পরান হইয়া থাকে, তবে উহার গড়ন ভিন্ন প্রকৃতির; নামও বিভিন্ন। গুজরিপঞ্চম নহে। উহার নাম গাতেলি ও পাইরঞ্জন। গাতেলি কতকটা পাঁইজোরের মত, পাইরঞ্জন কতকটা ঘুঙ্গুর দেওয়া মলের মত। চরণে অলঙ্কার দিয়া যখন হাতী চলিতে থাকে, তখন অপূর্ব্ব শব্দ শ্রুত হয়। হস্তিগণের জন্য অঙ্কুশ আছে; রমণীগণের তাহা নাই। সৌভাগ্যক্রমে হস্তিগণের জন্য কেনার, অঙ্কুশ, গদ ও জগবৎ আছে। কেনারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অঙ্কুশ ছোট লাঠির মত। ইহার আঘাতে হস্তী চলিতে আরম্ভ করে ও থামে। বজ্জাতি করিলে গদ ব্যবহার করিতে হয়। হস্তীকে যখন বেগে চালাইবার প্রয়োজন হয়, তখন জগবৎ ব্যবহার করা হয়। এতদ্ব্যতীত হস্তির আরও যে কত অলঙ্কার আছে, তাহা বলিতে গেলে প্রস্তাব অনেক বিস্তীর্ণ হয় বলিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হওয়া গেল। হিন্দু রাজত্বকালে হস্তি-সজ্জা বিবিধ প্রকার ছিল, প্রস্তাববাহুল্য ভয়েই তাহাও প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পালকের প্রতি ব্যবহার।

হস্তী পালক ও চালকের সম্পূর্ণ বশীভূত। চালকের কটাক্ষে ও ইঙ্গিতে হস্তী অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে; চালকের সঙ্কেতে বসে এবং চালকের সঙ্কেতে উঠে; তীব্রতীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশাঘাতে বিচলিত হয় না। এমনও দেখা যায়, হস্তী চালক বা মাহুতের খাদ্যোপযোগী কোন বস্তু পাইলেই, তাহা মুখের ভিতর লুকাইয়া রাখে, পরে মাহুতকে একলা পাইলেই, সেই লুক্কায়িত আহারীয় বাহির করিয়া দেয়। আবার মাহুত কর্ত্তৃক কোনরূপে উত্ত্যক্ত হইলেও হস্তী তাহা বিস্মৃত হয় না; যে কোন

প্রকারে হউক সুবিধা পাইলেই, প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। এ সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প প্রচারিত আছে। তদ্বর্ণনের স্থান আর হইবে না। তবে সংক্ষেপে একটা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এইখানে উল্লেখ করি। আকবরের "আয়িয়াজ" নামে এক হস্তী ছিল। কোন কারণে "আয়িয়াজ" মাহুতের প্রতি বিরক্ত হয়। সে মাহুতকে মারিবার সময় খুঁজিতে লাগিল। একদিন মাহুত নিদ্রিত ছিল; "আয়িয়াজ"ও সময় বুঝিয়া একখণ্ড কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল। পরে সেই কাষ্ঠের দ্বারা সে মাহুতের মাথার পাগড়ী তুলিয়া লইল এবং তাহাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। মাহুত তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল।

হস্তীর দয়া ও কৃতজ্ঞতা।

পশু হইলেও হস্তীর দয়া আছে; উপকার পাইলে হস্তী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে জানে; এ বিষয়ে অনেক সময় বুদ্ধিজীবী মানুষকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয়। হস্তীর দয়া ও কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে সহস্র প্রকারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সকলই বিস্ময়কর। এই স্থানে হস্তীর দয়া ও কৃতজ্ঞতার দুইটী দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিলাম;—

এক দিন লক্ষ্ণৌ দেশের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হন। তাঁহাকে একটি অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে হইয়াছিল। ঐ পথে কতকগুলি পীড়িত ব্যক্তি শয়ন করিয়াছিল। সেই সব পীড়িত ব্যক্তির আত্মীয় লোকেরা, সম্ভ্রান্ত লোক জনকে দেখিয়া পলায়ন করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই পীড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, হস্তী-চালককে তাহাদের উপর দিয়া হস্তী চালাইবার জন্য আদেশ করিলেন। হস্তী-চালকও তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হস্তী চালাইল। হস্তী কিন্তু পীড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া, একপদও অগ্রসর হইল না। হুকুম রদ্ হইবার নহে। মাহুত হস্তীকে অঙ্কুশাঘাতে পুনঃ পুনঃ তাড়না করিতে লাগিল। হস্তী তবুও একপদ অগ্রসর হইল না। পরে হস্তী যখন দেখিল, পীড়িত ব্যক্তিদের আত্মীয় লোক কেহ আসিল না, তখন সে পীড়িত ব্যক্তিদিগের এক একটীকে শুঁড়ে করিয়া তুলিয়া, স্থানান্তরিত করিল। মানুষের দুঃখে পশু গলিল; কিন্তু মানুষ গলিল না!

এক দিন এক সম্ভ্রান্ত সাহেব হস্তীতে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ার্থ বন মধ্যে প্রবেশ করেন। অকস্মাৎ একটা সিংহ আসিয়া হস্তীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই সময় হস্তি-পৃষ্ঠস্থিত "আমারি" (হাওদা বিশেষ) ভাঙ্গিয়া যায়। শিকারী সাহেব তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইবামাত্র সিংহ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। হস্তীও তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ এক বৃক্ষ হইতে একটী প্রকাণ্ড শাখা ভগ্ন করিয়া, সিংহের পৃষ্ঠের উপর বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিল। সিংহ শাখা-ভারে বিব্রত হইয়া, শীকার পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। পর-পৃষ্ঠায় এই ঘটনার একখানি চিত্র প্রদর্শিত হইল।

হস্তি-যুদ্ধ।

বন্য হস্তীকে অনেক সময় বন্য সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। অনেক সময় হস্তীতে হস্তীতে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া থাকে। মদক্ষরণ কালেই এইরূপ যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। যখন মদক্ষরণে উন্মত্ত হইয়া হস্তিদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করে, তখন অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। একটা যতক্ষণ না আক্রান্ত হইয়া পড়িয়া যায়, ততক্ষণই যুদ্ধ চলে। সে যুদ্ধ সহজে ক্ষান্ত হয় না। যদি হঠাৎ কোন হস্তিশিশু সেই যুধ্যমান হস্তীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একটী হস্তী, শিশুটীকে শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন করিয়া, স্থানান্তরিত করে; পরে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। হস্তী কখন হস্তিনীর সহিত যুদ্ধ করে না। গৃহপালিত শিক্ষিত হস্তীরও হস্তী, মানুষ, অশ্ব প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ হইয়া থাকে। এ যুদ্ধ ভয়ঙ্কর হইলেও, কৌতূহলোদ্দীপক। পূর্ব্বে ভারতীয় রাজগণের ইহা সবিশেষ আমোদজনক ছিল।

সম্রাট আকবরের সময়, অনেক হস্তীই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত। হস্তীকে যুদ্ধ শিখাইবার জন্য বেতনভোগী লোক নিযুক্ত ছিল। বর্ত্তমান কালে হস্তিযুদ্ধ প্রায়ই দেখা যায় না; তবে কোন কোন দেশীয় রাজ্যে মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। বিখ্যাত ফরাসি গ্রন্থকার একজন ভারত ভ্রমণ কালে বরদা রাজ্যে হস্তীর যুদ্ধ ক্রীড়া স্বচক্ষে দেখিয়া, তৎসম্বন্ধে যে সুবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন, আমি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম; পাঠক ইহাতে হস্তিযুদ্ধের কতক আভাস পাইবেন।

হস্তীর কৃতজ্ঞতায় সিংহের আক্রমণ হইতে মনুষ্যের রক্ষা।

বরদায় প্রতি বৎসরেই প্রায়, হস্তি যুদ্ধ-হইত। যে সকল হস্তী যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে এক রকম মাদক দ্রব্য সেবন করান হয়। ইহাতেই হস্তী উত্তেজিত ও উষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাকে "মুস্থ" বলে। হস্তী কেবল মুস্থি হইবার যোগ্য; হস্তিনী নহে। এইরূপ করিতে হইলে, তিন মাস কাল মাখন ও চিনি খাওয়াইতে হয়।

এইরূপ উত্তেজিত অবস্থার দুইটী হস্তীকে যুদ্ধার্থ আনয়ন করা হয়। অনেকেই এজন্য বাজি রাখিয়া থাকেন। কে জিতিবে, কে হারিবে, তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু যাঁহার যে হস্তীর উপর জিতিবে বলিয়া বিশ্বাস, তিনি তাহার হইয়া বাজি রাখেন। যে দুইটী হস্তী যুদ্ধ করে, তাহাদের পা খুব শক্ত শিকল দিয়া বাঁধা থাকে; এবং সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে তাহাদিগকে রাখিয়া দেওয়া হয়।

হস্তি-যুদ্ধের রঙ্গ-ভূমি দৈর্ঘ্যে ৬ শত হাত এবং প্রস্থে ৪ শত হাত। এই রঙ্গ-ভূমির এক-দিকে রাজা ও তদীয় অমাত্যবর্গের আসন প্রস্তুত থাকে। আসন এমনই ভাবে প্রস্তুত হয় যে, তাহাতে উপবেশন করিলে রঙ্গ-ক্ষেত্রের যাবতীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রঙ্গ-ভূমির চারি-

দিক্ সুদৃঢ় প্রাচারে বেষ্টিত। এই সকল প্রাচারে আবার হস্তি-পালক ও রক্ষকদিগের যাতায়াত করিবার জন্য ছোট ছোট দরজা আছে। এই দরজা দিয়া হস্তী যাইতে পারিত না। প্রাচীরের চারিদিকে বৃক্ষোপরি লোক জমা হয়; আশে পাশে ছাদে লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে। একটা উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপে হস্তিনী রাখিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গক্ষেত্রের এক দিকে একটী ও অপর দিকে আর একটী হাতী শিকলে বাঁধা থাকে। দুই বদ্ধ হস্তী তখন ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে থাকে; এবং দন্তের দ্বারা মৃত্তিকা খনন করে। হস্তী নিজ সংস্কারে আপন মাহুতকে চিনিয়া লয়। সে অবস্থায় মাহুত স্বচ্ছন্দে তাহার নিকট যাইতে পারে। সুদৃঢ়-কলেবর আঁটা-পাইজামা পরা কতকগুলি যুবা পুরুষ রঙ্গ-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে "মাতমারি-ওয়ালা" বলে। ইহারাও হাতীর সহিত লড়াই করে। উহাদের মধ্যে অতি চতুর যাহারা, তাহাদিগের হাতে চাবুক থাকে। কতকগুলি লোকের হাতে লাঠির মাথায় বাঁধা বারুদ-মাখান পলিতা এবং প্রজ্জ্বলিত দেশেলাই থাকে। যে হাতীর লড়াই করায়, তাহার কোন বিপদ হইলে, ইহারা তাহাকে রক্ষা করে। ইহারা রঙ্গ-ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান থাকে, বিপদ দেখিলেই প্রজ্জ্বলিত দেশেলাইতে পলিতা ধরাইয়া দিয়া হস্তীর সম্মুখে ধরে। পলিতা পুড়িয়া শব্দ হইলে হস্তী জড়-সড় হইয়া পড়ে; কাহারও অনিষ্ট করিবার আর অবসর পায় না। কাহারও হস্তে লাল কাপড়ের ঝালর থাকে। ঝালর নাড়িলেই হাতী ক্ষেপিয়া উঠে।

যুদ্ধের একটা সঙ্কেত আছে। সেই সঙ্কেতটী হইবামাত্র, রঙ্গ-ক্ষেত্রের লোকজন যে যার আপন আপন স্থানে সরিয়া দাঁড়ায়। তখনই হস্তিদ্বয়ের শিকল শ্লথ করিয়া দেওয়া হয়। উভয়েই তখন শুণ্ড উত্তোলন করিয়া, গর্জ্জন করিতে করিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে রঙ্গক্ষেত্রের মধ্য স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরস্পরে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, মস্তকে মস্তকে সংঘর্ষণ করিতে থাকে। দুইটী মস্তকে যখন সংঘর্ষণ হয়, তখন দুইটীরই সম্মুখবর্ত্তী পা উঠিয়া পড়ে; এবং পরস্পর পরস্পরে ঠেস দিয়া দাঁড়ায়। তখন শুঁড়ে শুঁড়ে জড়া-জড়ি হয়। উভয় হস্তীর পৃষ্ঠেই মাহুত থাকে। যখন শুঁড়ে শুঁড়ে জড়া-জড়ি হয়, তখন মাহুত অঙ্কুশ দ্বারা আত্মরক্ষা করে। মিনিট কতক এইরূপ অবস্থায় যায়। কেহ কাহারও মাথা হইতে মাথা উঠায় না। কেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও সহজে মাথা ছাড়িয়া দেয় না। সে জানে, ছাড়িয়া দিয়া পলাইলে, অন্যটা তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া, দন্তের দ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিবে। সেই জন্য সে প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া, বলপূর্ব্বক ভীষণ ধাক্কা দিয়া, পলায়ন করে। তখন পরাজিত হস্তীকে রঙ্গ-ক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। যেটা জয় লাভ করে, সেটা তখনও রঙ্গ-ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিতি করে। তাহার মাহুত নামিয়া পড়ে। অন্যান্য লোকজন আসিয়া তাহাকে কৌশলক্রমে বাঁধিয়া ফেলে।

হস্তীতে হস্তীতে যুদ্ধ হইয়া গেলে পর, হস্তীতে মানুষেও যুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই "আঁটা-ইজার-পরা" লোকগুলো তখন সেই জয়ী হস্তীকে আক্রমণ করে। এই সময় আবার হস্তীর শিকল শ্লথ করিয়া দেওয়া হয়। কেহ চাবুক মারে; কেহ খোঁচা দেয়; কেহ বা সম্মুখে লাল ঝালর নাড়ে। হস্তী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়; তাহারাও দ্রুতপদে পলায়ন করে; পলাইবার স্থান না থাকিলে, সেই ক্ষুদ্র দরজা দিয়া রণ-ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া পড়ে। লোকগুলো এমনই সুচতুর এবং সুকৌশলী যে, হাতী যেমন কাহাকেও শুঁড় দিয়া আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করে, তাহারাও অমনই কৌশল করিয়া অপর দিকে সরিয়া দাঁড়ায়। একান্ত কেহ আক্রান্ত হইলে, হস্তীর সম্মুখে তখন সেই পলিতা জ্বালাইয়া শব্দ করিতে হয়। হস্তী তখনই ভয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ খানিকটা ক্রীড়া-কৌতুক হইলে পর সব লোক রঙ্গক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যায়। হস্তী তখন অন্য আক্রমণকারীর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

দেখিতে দেখিতে, অশ্বারোহণে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

সে অশ্বের লাঙ্গুল ছাঁটা; সুতরাং অশ্বকে ধরিবার পক্ষে হস্তীর সুবিধা হয় না। অশ্বারোহী পুরুষ হস্তীর নিকটবর্ত্তী হইয়া বরিসার খোঁচা মারে। হস্তীও তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হয়। অশ্ব এমনই সুশিক্ষিত যে, আরোহীর সঙ্কেতমাত্রেই মুহূর্ত্তমধ্যে স্থানান্তরে ছুটিয়া চলিয়া যায়। হস্তী পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারে না। কখন কখন হস্তী খুব চালাকি খেলে। অশ্বারোহী তাহার

হস্তি-সাহায্যে শীকার।
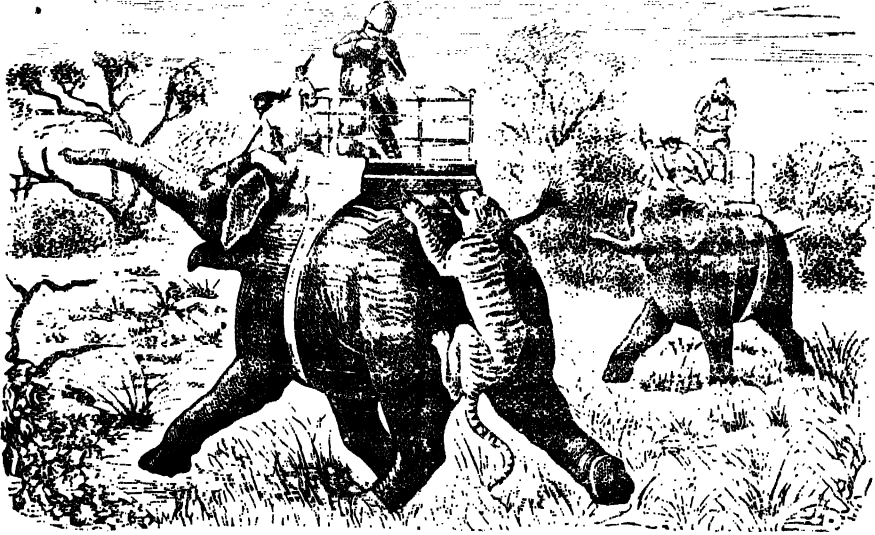
পশ্চাদ্ভাগে থাকে, এ যেন হস্তী জানিতে পারে না, এমনই ভাব দেখায়; কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়ায়। অশ্বও তেমনই চতুর ও শিক্ষিত;—সে নিমেষমধ্যে পলায়ন করে। অশ্বের প্রতি হস্তীর ঘৃণা চির কাল। অন্য সময়েও অশ্বের প্রতি হস্তী ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহা হউক, অশ্বারোহী এইরূপ ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর আবার হস্তী সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। ক্রীড়কগণ যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়া থাকে।*

হস্তি-সাহায্যে শীকার।

হস্তী, শীকারের প্রধান সহায়। প্রাচীনকালে লোকে হস্তী চড়িয়া শীকার করিত; এখনও করিয়া থাকে। এখন ইংরেজ-রাজপুরুষেরা প্রায়ই হস্তীতে আরোহণ করিয়া ব্যাঘ্র শীকারে গমন করে। প্রায়ই তাঁহারা দল বদ্ধ হইয়া, অনেক হস্তী সঙ্গে লইয়া শীকার করেন। শীকার বড় আমোদজনক; কিন্তু বিপদজনক কম নহে। উপরে শীকারের একখানি ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

শীকার করিতে গিয়া সময়ে সময়ে কিরূপ বিপদে পড়িতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য পর পৃষ্ঠায় একটী ভয়াবহ বিবরণ প্রকাশিত করিলাম; গল্পের আভাস চিত্রে প্রকাশিত।

একদিন কয়েকজন সাহেব কয়েকটী হস্তিনীর উপর আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বনমধ্যে প্রবেশ করেন। অকস্মাৎ এক ভীমকায়া ব্যাঘ্রী আসিয়া সম্মুখস্থ হস্তিনীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। এমন সময় শিকারী হস্তী কখন পশ্চাৎপদ হয় না; বরং শুণ্ড উত্তোলন করিয়া ব্যাঘ্র বা অন্য হিংস্র জন্তুকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করে; সেই সময় আবার শিকারী হস্তিপৃষ্ঠ হইতে গুলি ছাড়েন। উপস্থিত ক্ষেত্রে হস্তিনীটী ভাল শিক্ষিত ছিল না। সেটা ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল; মাহুতের তাড়না মানিল না। ইত্যবসরে ব্যাঘ্রী হস্তিনীর পৃষ্ঠে উঠিয়া, আরোহী সাহেবকে আক্রমণ করিল; পরে তাঁহার উরুদেশে দংশনপূর্ব্বক তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া পলায়ন করিল। সমভিব্যহারী সাহেবেরা বন্দুক ছুঁড়িবার উপক্রম করিলেন; কিন্তু ব্যাঘ্রী-পৃষ্ঠস্থ সাহেবকে গুলি লাগিবার ভয়ে, তাঁহারা বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাঘ্রী বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

* *India and its Native Princes.* 103

শীকারে বিপদ।

সঙ্গিগণ তখন নিরুপায় হইয়া, রক্তের চিহ্ন দৃষ্টে, ব্যাঘ্রীর পথানুসারী হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া, তাঁহারা দেখেন, এক ঘোর বনে, ব্যাঘ্রী সাহেবের উরুদেশ মুখের মধ্যে লইয়া মরিয়া আছে। তাঁহারা তখন ব্যাঘ্রীর মুণ্ডটী কাটিয়া ফেলিলেন; সাহেবেরও উদ্ধার হইল। তখনও কিন্তু তিনি অচেতন। সঙ্গীদের মধ্যে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় আহত সাহেব চৈতন্ত লাভ করিলেন।

সাহেব চৈতন্ত লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমায় যখন ব্যাঘ্রী পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া আসে, তখন আমি অচেতন হইয়া পড়ি; কিয়ৎক্ষণ পরে আমার চেতনা হইল। আমার মনে পড়িল, বারুদ-ভরা দুইটী পিস্তল আমার কটিদেশে আছে। আমি একটী বাহির করিয়া, ব্যাঘ্রীর মস্তকে আঘাত করিলাম; ব্যাঘ্রী তাহাতে আমাকে আরও কঠিনরূপে দংশন করে; আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম; কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া, অপর পিস্তলটী তাহার সম্মুখের পায়ে আঘাত করি। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।" সাহেব বড় পুণ্যবলে বাঁচিয়াছিলেন।

গজ-আয়ুর্ব্বেদ।

বনে হস্তী বা হস্তিনী পীড়া-গ্রস্ত হইলে, সংস্কার-বশে ঔষধ অন্বেষণ করিয়া লইয়া আসিয়া সেবন করে। হস্তীদের পেটে প্রায়ই কৃমি হইয়া থাকে। হস্তীরা জানে, কৃমির ঔষধ কর্দ্দম। কৃমি হইলে, তাহারা কাদার গোলা পাকাইয়া খাইয়া ফেলে। গৃহপালিত হস্তীরও ব্যারামে সুচিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা আমাদিগের শাস্ত্রে আছে। মনুষ্যের পীড়াদি হইলে যেমন শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিতে হয়, হস্তীর পীড়াদি হইলেও সেইরূপ করিতে হয়। এই শান্তি ও ঔষধাদির বিবরণ লিখিতে হইলে, এক খানি বৃহৎ পুস্তক হয়। ঔষধাদি ও শান্তির বিবরণ অবগত হইবার জন্ত আমার পাঠকবর্গকে অগ্নিপুরাণের ২৯৭ এবং ৩০১ অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মনুষ্য যে মাত্রায় ঔষধ সেবন করে, হস্তীর ঔষধ মাত্রা তাহার চতুর্গুণ অধিক।*

শিক্ষিত হস্তীর মানসিক শক্তি।

শিক্ষিত হস্তী পর্ব্বতে উঠিতে পারে, আবশ্যক হইলে পর্ব্বতের "খাদে" নামিতে পারে। একবার ফরাসি গ্রন্থকার লুই রুসিলেট, ভারত-ভ্রমণ কালে রাচি হইতে ভূপাল যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটী পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ "খাদ" পার হইয়া যাইবার তাঁহার প্রয়োজন হয়। তিনি হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। "খাদ"টী প্রায় ৫০ ফিট গভীর। পর্ব্বতের উপর হইতে এই "খাদে" অবতরণ করা সহজ নহে, মানুষের পক্ষেই দুঃসাধ্য; হস্তীর ত কথাই নাই। সাহেব দুঃসাধ্য ভাবিয়া হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলে, মাহুত নিষেধ করিল। মাহুত বলিল,—"ভয় নাই সাহেব; হাতী নামিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া, সে হাতীকে নামিবার জন্য সঙ্কেত করিল। পথটী এত সঙ্কীর্ণ যে হস্তীর পদতল সম্পূর্ণভাবে থাকিবার স্থান তাহাতে হয় না। মাহুত চিৎকার করিয়া হাতীকে অনেক উপদেশ দিল। হাতী তখন সাহস করিয়া ঐ সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে আরম্ভ করিল। তবে সাবধান হইতে হাতীকে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হইল। হাতী যে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝা গেল। হাতীর সর্ব্ব শরীরে এক প্রকার কম্পন হইতে লাগিল। শরীরের ভার-মধ্য, পশ্চাতে রাখিয়া সে এক পদ বাড়াইয়া অগ্রে সম্মুখের প্রস্তর খণ্ডের ভার-সহতা পরীক্ষা করিয়া, তবে তাহাতে পদক্ষেপ করিল। এইরূপে সে পর্ব্বত-সংলগ্ন এক এক খানি প্রস্তরখণ্ডে সাবধানে পা তুলিয়া দিয়া নামিতে লাগিল। "খাদে"র তলদেশে নামিবার আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল। সাহেব কয়েক ফিটমাত্র উপরে ছিলেন, এমন সময় তিনি হস্তীর উপর হইতে নামিয়া এক খানি প্রস্তরখণ্ডে দাঁড়াইলেন। আর কয়েক খণ্ড প্রস্তর পার হইলে, "খাদে"র তলদেশে অবতরণ করা যাইত; কিন্তু ভার সহিতে পারিবে কি না হস্তী তাহা বুঝিবার জন্য, বার কতক একখানি প্রস্তর-খণ্ডের উপর পা চাপাইয়া দিতেছিল। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, মাহুত তাড়না করিতে লাগিল। মাহুতের তাড়নায় হস্তী যেমন সেই প্রস্তর-খণ্ডের উপর উঠিল, অমনই সেই প্রস্তর-খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। সাহেব যদি হস্তীর পৃষ্ঠের উপর থাকিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে হয়ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইত। যাহা হউক সাহেব ৪০ মিনিটে, এই ৫০ ফিট গভীর "খাদে" অবতরণ করিয়াছিলেন।*

পরিশিষ্ট।

প্রাচীন কালে হস্তী অপেক্ষা এক বৃহত্তর জীব ছিল। ইহারা আকার প্রকারে হস্তীরই মতন; তবে ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ দুই প্রকার পুরু লোমে আচ্ছাদিত থাকিত, ইহাতেই অনুমান হয়, ইহারা শীত প্রধান দেশেই জন্মাইত। ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যে মধ্যে ইহাদের প্রোথিত কঙ্কাল পাওয়া যায়

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

প্রয়াগে মাঘ-মেলা।

হরিদ্বার, বিঠুর, গড়মুক্তেশ্বর ইত্যাদি স্থানে যেমন এক একটী মেলা হয়, এলাহাবাদ ত্রিবেণী-তীরে প্রতিবৎসর মাঘ মাসে সেইরূপ একটী বৃহতী মেলা হইয়া থাকে। ইহা পৌষ মাসের শেষ সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ হইয়া মাঘ মাসের শেষ সংক্রান্তিতে শেষ হয়। এইজন্য ইহা "মাঘ-মেলা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই মাঘ-মেলায় সংক্রান্তি অমাবস্যা এবং "বসন্ত-পঞ্চমী" বা শ্রীপঞ্চমী এই তিন দিন বিস্তর লোকের সমাগম হয়। তবে সর্ব্বাপেক্ষা অমাবস্যার দিনই অসংখ্য যাত্রী এই মোক্ষদায়িনী মন্দাকিনী-সলিলে স্নানের জন্য আসিয়া থাকে।

এ বৎসর তাদৃশ কোন যোগ ছিল না, তাই মনে করিয়াছিলাম, হয় ত এবার যাত্রীদের তেমন ভিড় হইবে না। কিন্তু ১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার অমাবস্যার পূর্ব্বরাত্রে আপনার ঘরে শুইয়া আছি, লোকের কোলাহল শব্দে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখি, পিঙ্গল-বসনা ঊষাসুন্দরী

* গজায়ুর্ব্বেদমাধ্যাস্থে উক্তাঃ কল্পা গজে হিতাঃ।
গজে চতুর্গুণামাত্রা তাভির্গজরুগর্দ্দনং।
(গরুড়পুরাণ ২০৭ অধ্যায়)

* *India and its Native Princes*, P. 443.

এখনও দেখা দেয় নাই। পূর্ব্বদিকে উ ল নক্ষত্র এখনও তেজোহীন হয় নাই;—সমভাবে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। অথচ এখন হইতে চারিদিকে মানুষের কোলাহল শব্দ শোনা যাইতেছে। কেহ ডাকিতেছে, "দিদি উঠ"; কেহ বলিতেছে, "ভাইয়া উঠো"। কেহ কাপড় পরিতেছে, কেহ উঠিয়া মুখ ধুইতেছে; কেহ মোট বাঁধিতেছে। সকলেই শশব্যস্ত; সকলেই ত্রস্ত এবং হর্ষোৎফুল্ল। এই অল্প সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ সহর হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সকলেই দ্রুতপদে ত্রিবেণীদিকে ছুটিতে লাগিল। প্র ত হইলে আমরাও প্রতিবৎসরের ন্যায়, সেই বিষ্ণুপাদ-প্রসূতা প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী-সলিলে স্নান করিবার জন্য বহির্গত হইলাম।

চক দিয়া যে রাস্তা ত্রিবেণীতীরে গিয়াছে, আমরা সেই রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখি, রাস্তায় আর লোক ধরে না। জানি না, রাত্রিমধ্যে এতলোক কোথা হইতে আসিল? রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রীরা চলিতেছে, মধ্যে এক্কা গাড়ি, বয়েলি গাড়ি, পাল্কী, ডুলি যাইতেছে। কিন্তু এক্কাওয়ালা এবং গাড়ওয়ানদের মাহেন্দ্র-যোগ। তাহাদের আজ আর পায় কে! তাহারা সংবৎসর আশা করিয়া বসিয়া আছে, মাঘ-মেলায় দু-পয়সা রোজগার করিবে। তাই তাহারা যাত্রীদের নিকট হইতে চারি আনার স্থলে আট আনা, আট আনার স্থলে এক টাকা চাহিতেছে। যাত্রীরা কি করে!—অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তাহাই দিতেছে। কিন্তু অধিকাংশ যাত্রী পদব্রজেই যাইতেছে। ইহাদের অনেকেরই মস্তকে, স্কন্ধে এবং পৃষ্ঠে এক একটী মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় মোট সেই এক মোটের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জিনিস মোটের ভরে ঋজুত্ব হারাইয়া হেঁট হইয়া মস্‌মস্ করিয়া চলিতেছে। যাহারা একগ্রাম বা এক পল্লী হইতে আসিয়াছে, তাহারা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে সস্বরে "জয় বেণীমাধবকী জয়" "জয় গঙ্গামায়ীকী জয় এইরূপ ধ্বনি করিয়া চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিতেছে। আজ তাহাদের সকলের মন উৎসাহে এবং উল্লাসে পূর্ণ, হৃদয় ধর্ম্মভাবে বিভোর। রাস্তা রাস্তায় প্রয়াগওয়ালাদের লোক বসিয়া আছে তাহারা যাত্রীদের আপন-আপন "প্রয়াগী"দের নাম এবং ধ্বজার চিহ্ন বলিয়া দিতেছে। ত্রিবেণীতীরের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই যেন লোকের ভিড় অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাত্রিমধ্যে যেন এলাহাবাদে সহস্র সহস্র রাস্তা হইয়াছে, সেই পথ দিয়া লোক-জন অবিরাম-গতিতে চলিতেছে।

বাঁধের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, এবার বন্দোবস্ত কিছু নূতন হইয়াছে। নূতন বলিয়াই বোধ হইল। কীডগঞ্জের রাস্তার শেষ হইতেই মেলা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমেই দেখিলাম, রাস্তার দুই ধারে বৈদ্যনাথের গরু নানা সাজে সাজাইয়াছে। কাহার স্কন্ধ, কাহার পৃষ্ঠ কাহার বা পেট হইতে—পা, অথবা অন্য কোন অঙ্গুল বাহির হইয়াছে। কাহার বা দুই পুচ্ছ, দুই মলদ্বার, দুই প্রস্রাবের দ্বার আছে। গো-রক্ষকেরা তাহাই দেখাইবার জন্য ঘড়ি পিটিয়া যাত্রীদিগকে ডাকিতেছে এবং বলিতেছে,—"গৌমাতাকা পা পূজো, বহুৎ ফল হোগা।" যাত্রারা যৎকিঞ্চিৎ দিয়া গো-পাদ স্পর্শ করিতেছে। আর এক স্থলে বিভূতি-ভূষিত একটী সন্ন্যাসী চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহার ভিতর চিত হইয়া শুইয়া আছে। কিছুদূরে আর একজন সন্ন্যাসী;—প্রোথিত-দণ্ডে কাষ্ঠ-ফলক বাঁধিয়া তাহাতে ভর দিয়া আভূমি-লুণ্ঠিত সুদীর্ঘ মালা জাপতেছে। ইহা দেখিতে দেখিতে আমরা একেবারে বাঁধের উপর উঠিলাম।

এই বাঁধ, সম্রাট আকবর শাহের সময় নির্ম্মিত। বাঁধের দক্ষিণ-প্রান্তে এলাহাবাদ-দুর্গ, উত্তরে দারাগঞ্জ। ইহার পূর্ব্বে ত্রিলোক-পাবনী সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা। পশ্চিমে গাড়ী ঘোড়া এবং মেলার দোকান-পসার। এই স্থানটী আমাদের চির-পরিচিত অথচ চির-অভিনব। এখানে আমরা যে কতবার আসিয়াছি, তাহা বলা যায় না। বিভিন্ন সময়ে ভাগীরথীর বিভিন্ন ভাব দেখিয়া বিস্মিত এবং বিমোহিত হইয়াছি। বর্ষাকালের কথা মনে হইলে এখনও হৃদয়ে বিস্ময় এবং আতঙ্ক যুগপৎ উদয় হইয়া থাকে। তখন এই তটাভিঘাতিনী, বিশালহৃদয়া বিপুল-জল কল্লোলিনী উচ্ছ্বসিত-সলিলা জাহ্নবী মহা শব্দে দুকূল পরিপ্লাবিত করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিতেছেন। আর আজ শীত কাল; শীতে সেই বিপুল-দেহ সঙ্কীর্ণায়তন হইয়া যেন একগাছি রূপার তারের ন্যায় প্রবাহিতা। যাহা হউক, এই বাঁধের উপর আমরা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এখানে যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যের অতীত বলিয়া বোধ

হয়। এই বাঁধটী যেন সন্ধিস্থল; ইহার উপর হইতে তুমি যেদিকে চাহিবে, সেই দিকে দেখিবে,—কেবল অসংখ্য যাত্রীর শ্রেণী—ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে আসিয়া মিলিত হইতেছে। সকল দিক হইতে লোক আসিয়া এইখানে যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। ঘেঁসা ঘেঁসি, ঠেসা ঠেসিতে লোকের প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতেছে, তথাপি সকলেই ত্রিবেণী-তীরাভিমুখে যাইতে ছাড়িতেছে না। কেন যে এখানে এত লোকের সমাগম হয়, তাহা হিন্দু-ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কে বুঝিবে? আজ অমাবস্যা,—মহা পুণ্যাহ, এই কথা বলিয়া ঘোর আড়ম্বরের সহিত সংবাদপত্রে কেহ বিজ্ঞাপন দেয় নাই; রাস্তায় রাস্তায় কেহ প্লাকার্ড মারে নাই; দেশময় কেহ ঢেটরা দেয় নাই; দেশে দেশে, লোক পাঠাইয়া এসংবাদ প্রচার করিতে যায় নাই;—অথচ দেখিবে, আজ লক্ষ লক্ষ লোক—বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সকলেই এই পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাই বলি অহিন্দু! তুমি এই মহামহোৎসবের কথা এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি। কোন্ মন্ত্রবলে সংসারের মায়া-মমতার কথা ভুলিয়া, কত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বহু দূর-দূরান্তর হইতে কেন এত লোক এখানে সমবেত হয়, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার? তবে যদি তুমি তোমার হৃদয়ের কলুষিত ভাব কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হইয়া এই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখ, তাহা হইলে তোমার হৃদয় বজ্রাদপি কঠিন হইলেও, হিন্দুদের এই অগাধ, অপরিমেয় প্রগাঢ় ভক্তি দেখিলে তুমিও বিচলিত হইবে,—তোমারও শুষ্ক হৃদয় "মুঞ্জরিত" হইবে, তোমারও দিব্য চক্ষু ফুটিবে। যাহা হউক, আমরা এখানে আর অধিকক্ষণ না থাকিয়া, সেই উৎসাহপূর্ণ আনন্দময় অনন্ত জনস্রোতে মিশিয়া, ধীরে ধীরে ত্রিবেণীতীরে চলিলাম।

ত্রিবেণী তীরে বাঁধাঘাট নাই। যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রয়াগওয়ালারা উচ্চ পাড় কাটিয়া ঘাট বাঁধিয়া দিয়াছে; কোন স্থানে আপনা হইতেই ঘাট হইয়া আছে। এই সকল ঘাটের সন্নিকটে প্রয়াগওয়ালারা কেহ বা তিন, কেহ বা চারি, কেহ বা ততোধিক তক্তাপোষ পাতিয়া অতি আড়ম্বরের সহিত কুশ, কাশ, ফুল, চন্দন লইয়া বসিয়া আছে। সকলের নিকটেই এক একটী গরু এবং এক একটী পতাকা। এখানে কত পতাকা যে আছে, তাহা গণিয়া সংখ্যা হয় না। পতাকাগুলি প্রাতঃসমীরণের মৃদু-মন্দহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া পতপত শব্দ করিতেছে। প্রতি পতাকায় এক একটী চিহ্ন। অধিকাংশ স্থলে হিন্দুদিগের দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। প্রতি চিত্রে ধর্ম্মভাব এবং কবিত্ব পরিস্ফুট হইতেছে। কোন পতাকায় সিংহারূঢ়া নানা প্রহরণ ধারিণী চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী, তাঁহার সম্মুখে একজন ভক্ত করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। আর একটীতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কৌস্তুভমণি-শোভিত বিষ্ণু, শেষ-শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। কোনটীতে বা শিবারূঢ়া নৃমুণ্ডমালিনী মুক্তকেশী, রণমদে উন্মাদিনী হইয়া অট্ট অট্ট হাসিতেছেন। কোনটীতে গোপী-পরিবেষ্টিত পীতাম্বর;—ফুল্লাধরে হাস্যরেখা ঈষৎ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। অপর আর একটী পতাকায় কদম্বৃক্ষ অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার মূলে পীতবসন-পরিধান শ্রীকৃষ্ণ, মধুর অধরে মোহন মুরলী বাজাইতেছেন; সম্মুখে অনন্তরত্ন-বিভূষিতা মহার্হবস্ত্র-পরিধানা বিশ্ববিমোহিনী শ্রীরাধিকা ঈষৎ নত হইয়া যোড়-হাতে রহিয়াছেন। যেন বলিতেছেন—

> অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া!
> যোগীর আরাধ্য ধন।
> গোপ-গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
> না জানি ভজন পূজন॥
> পিরীতি রসেতে, ঢালি' তনু মন,
> দিয়াছি তোমার পায়।
> তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
> মন নাহি আন ভায়॥
> কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
> তাহাতে নাহিক দুখ।
> তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
> গলায় পরিতে সুখ॥

এইরূপ নানা পতাকায় নানা প্রকার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই চিহ্ন অনুসারে যাত্রীরা আপন আপন পাণ্ডা চিনিয়া লইতেছে। আমাদের পাণ্ডা ছিল, কিন্তু সেখানে যে ভিড়!—যায় কার সাধ্য! সুতরাং আপনার সুবিধা মত একদিনের জন্য এক নূতন পাণ্ডার তক্তাপোষে বসিয়া গেলাম। এদেশ-বাসীরা বড় তৈল-ভক্ত নহে, তাহারা স্নানের সময় তৈল ব্যবহার করে না; কিন্তু আমরা বাঙ্গালী;

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে তেলের সঙ্গে আমাদের সম্ভাব হয়, সুতরাং সে অভ্যাস কস্মিনকালে যাইবে কি না জানি না। যাহা হউক, সেই তক্তাপোষের উপর বসিয়া অতিযত্নে অঙ্গযষ্টিতে তৈল নিষিক্ত করত স্নানের জন্য সঙ্গম-স্থানে চলিলাম। কিন্তু যে ভিড়!—অগ্রসর হওয়াই দায়!! তাহার উপর জল পড়িয়া পথ এত পিচ্ছিল হইয়াছে যে, একটু অসাবধান হইলেই চিৎপাত হইয়া পড়িতে হয়।

আমরা অতি কষ্টে এবং অতি সাবধানে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে প্রয়াগীরা যাত্রীদের বসিবার জন্য তক্তা দিয়া মাচা করিয়া দিয়াছে। সেই মাচার উপর বসিয়া, কেহ সিক্ত বসন ত্যাগ করিতেছে, কেহ পূজা করিতেছে। কোন সুস্নাতা শোভন-বসনা কামিনী মাটীর শিব গড়িয়া, তাঁহার প্রাণগত শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। কোনভক্ত একপদে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিতেছেন। কেহ বা তদ্গত-হৃদয়ে সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনা-পূর্ণকারিণী ভাগীরথীর এইরূপ স্তবপাঠ করিতেছেন :—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥

হরি-পাদপদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে
হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারম্॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবর-কন্যে
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি মাতর্গঙ্গে
বিমুখবনিতাকৃত-তরলাপাঙ্গে॥

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরক নিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥

পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুট-মণি-রাজিত-চরণে
সুখদে শুভদে সেবকশরণে॥

রোগং শোকং তাপং পাপং
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধা-হারে
ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে॥

আবার ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তপ জপ করিতেছে; অথচ সুবিধা মত স্নানাবগাহন-নিরতা লাবণ্যময়ী রমণীগণের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিতেও ছাড়িতেছে না।

আমরা সঙ্গম-স্থলে যাইবার জন্য জলে নামিলাম। আমাদের সঙ্গে কত লোক নামিল; তাহাদের মধ্যে অনেকেই জলে নামিবার পূর্ব্বে ভক্তি-বিনম্র-চিত্তে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া, পাপহারী পবিত্র গঙ্গাবারি অতি সযত্নে মস্তকে দিয়া, "জয় গঙ্গামায়াকী জয়" বলিয়া জলে নামিতেছে। সঙ্গম-স্থানের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ নৌকায় পুষ্পমালা-ভূষিত দেবদেবীর মূর্ত্তি, আর এক একটী বৎসতরী। সকল নৌকাতেই দেখিলাম, এক একজন পাণ্ডা, যাত্রীদের মন তাহার দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নৌকায় লগুড় দ্বারা আঘাত করিতেছে। আমরা ক্রমে সঙ্গম-স্থানে উপস্থিতহইলাম। এস্থান যেমন পবিত্র, তেমনি রমণীয়। পশ্চিমদিক হইতে মন্দগামিনী নীলাম্বুময়ী যমুনা নীলপ্রভ বারি-রাশি লইয়া, হরি-পাদপদ্ম-সম্ভূতা মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহারিণী ত্রিলোক-পাবনী জাহ্নবীতে আসিয়া মিলিত হইতেছেন। এখানে লোকের ভিড় আরও অধিক। আমরা ভিড় পরিত্যাগ করত অন্যস্থানে গিয়া পূত-সলিলা-মন্দাকিনী-জলে অবগাহন করিলাম। স্নান করিবামাত্র দেখি, পুষ্পপাত্র লইয়া মালী আমার নিকট দণ্ডায়মান। আবার তাহার

পরই দেখি, দুগ্ধভাণ্ড লইয়া গোপ-তনয় উপস্থিত। এক একটী পয়সা দিলে তোমার সকল কাজই সমাধা হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে গোপ-নন্দনের কিছু বাহাদুরী দেখিলাম। আমরা সঙ্গম-স্থলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছিলাম, এই সময়ে সে কত লোককে যে দুগ্ধ-বিক্রয় করিল, তাহা বলা যায় না; অথচ তাহার অক্ষয় দুগ্ধপাত্র কিছুতেই শেষ হইল না। এ বিষয়ে মা গঙ্গা যে, তাহার বিস্তর সহায়তা করিতেছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যে সে দুগ্ধের রঙ বজায় রাখিয়াছে, সেই তাহার তারিফ!! যাহা হউক, এই সঙ্গম-স্থানে কত লোক যে স্নান করিতে আসিতেছে, কত লোক যে স্নান করিয়া যাইতেছে, তাহার আর শেষ নাই। মাঘ মাসের দুরন্ত শীত,—তাহা কাহারও গ্রাহ্য নাই, ভক্তি-প্রফুল্লচিত্তে স্নান করিতেছে, স্নানের পর পূজা-আহ্নিক করিতেছে। অদূরে দেখিলাম, প্রভাত-বায়ু-তাড়িত গঙ্গাজল মধ্যে অর্দ্ধ-নিমগ্ন পরম-নিষ্ঠাবান এক হিন্দুসন্তান ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে সুস্বরে বলিতেছেন,—

"গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি-চরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥"

চারি দিকে এই পবিত্র ধর্ম্মভাব সহস্রধারে যেন উথলিয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া কিয়ৎকালের জন্য আমরা জগতের সকল কথা যেন ভুলিয়া গেলাম। তখন মনে হইল, যাঁহাদের ধর্ম্মগত প্রাণ যাঁহারা মনোমোহ-কারী মায়া-জাল ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহারা নিস্পৃহ—বিষয়-বাসনাশূন্য—পার্থিবতা-পরিমুক্ত তাঁহাদের মুক্তির পথ অতি প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহারা মোহকরী জগতের মায়ায় জড়িত, ভোগলালসায় পরিপূর্ণ,—বল মা, অভয়-বরদে, পাপ-তাপ-ভয়-শোক-নাশিকে, ধূর্জ্জটী-জটা-কলাপ-বিভূষিতে জহ্নুকন্যে! তুমি বল মা নিস্তারকারিণি! আমরা গতিবিহীন, আমাদের দশা কি হইবে? যদি আমাদের নিস্তার করিতে পার, তবেই ত তোমার মহত্ত্ব। এইজন্যই তোমার একজন ভক্ত বলিয়াছেন,—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥"

আমরা পুনরায় ঘাটে উঠিয়া সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম এবং মেলা দেখিবার জন্য চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

এক স্থানে দেখি, কতগুলি লোক স্নান করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া গিয়াছে, সম্মুখে পত্রোপরি শক্তু-পিণ্ড; পিতৃপুরুষের উদ্দেশে সেই পিণ্ড দান করিবে বলিয়া ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইতেছেন; কিন্তু শ্রাদ্ধকর্ত্তা দারুণ শীতে থর থর কাঁপিতেছে। আর একস্থানে কতকগুলি লোক, গঙ্গার মৃত্তিকা গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অতি সযত্নে শিশি করিয়া "কোমরের" মধ্যে রাখিতেছে। এবার ভাগীরথী, বাঁধের অতি নিকট দিয়া প্রবাহিত বলিয়া এখানে দোকান-পাট বসিবার স্থান হয় নাই। কেবল ৩।৪ খানি দোকান অনেক কর দিয়া নদী-সৈকতে আছে, আর সকলকে বাঁধের পশ্চিমে যাইতে হইয়াছে। এখানে একটী স্থান ঘেরা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক লোক। এই সাহাকে সযত্নরক্ষিত-ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি-বিভূষিত দেখিলাম, এস্থান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার আর কিছুই নাই। কত সুকেশী, নিবিড় নীল কাদম্বিনীর ন্যায় কেশদাম এখানে মুণ্ডন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না। কত ব্যক্তি রাস্তার ধারে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা সাজিয়া বসিয়া আছে। আর আর লোকেরা খড়ি পিটিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। এক স্থানে অনেক লোক দেখিলাম; সেখানে গিয়া দেখি, একটী কন্যা ভিক্ষা-পাত্র হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পিতা মাতা "কুমারী-কন্যা"-দায়গ্রস্ত বলিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। আর একস্থলে পৃথুকলেবর মুণ্ডিত-মস্তক এক সাধু বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানি,—কতই রহিয়াছে। স্থানে স্থানে লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া একতারা, সারেঙ্গ, খঞ্জনী ইত্যাদি লইয়া গান গাহিতেছে। আর একস্থানে এক মথুরাবাসিনী তাহার দুইটী পুত্র লইয়া ভজন গাইতেছে। সে কোমল-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত গঙ্গা-সৈকত আপূরিত করিয়া তুলিয়াছে। মেলার মধ্যে কয়েকটী হাতী দেখিলাম। তাহার উপর সাহেব এবং সাহেব-ঘরণীরা বসিয়া মেলা দেখিয়া বেড়াইতেছেন। সাহেব-সীমন্তিনীদের মধ্যে কেহ বা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে যাত্রীদিগকে দেখিতেছেন, কেহ বা তাহাদের ভাব-গতিক দেখিয়া অমল-ধবল, কুন্দ-বিনিন্দিত দন্তশ্রেণী বাহির করিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছেন।

আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া দেব-দেবী দর্শনের জন্য স্থানান্তরে গেলাম। সেখানে সারি সারি কয়েকখানি পর্ণকুটীর। তাহার ভিতর কুসুম-সমুচ্চয়ে পরিব্যাপ্ত বেদী, তদুপরি সুগন্ধ-পুষ্প এবং বিল্বপত্র-ভরে প্রপীড়িত দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। পুরোহিতেরা কেহ বা ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা করিতেছেন, কেহ বা যাত্রীদিগকে পঞ্চামৃত বিতরণ করিতেছেন; আবার কেহ বা যাত্রীদের প্রদত্ত দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে ব্যগ্র। এই কুটীরের সম্মুখে এবং পশ্চাতে সাধু সন্ন্যাসীর আড্ডা। তাহারা সকলে আপন আপন কাজে ব্যস্ত। কেহ নিমীলিত-নেত্রে বসিয়া আছে, কেহ যাত্রীদের সঙ্গে কথা কহিতেছে, কেহ বা তাহাদের প্রদত্ত মিষ্টান্ন স্মিতমুখে হাত বাড়াইয়া লইতেছে, কেহ বা ভোজনে বসিয়া গিয়াছে, আবার কেহ বা সজোরে গাঁজায় দম্ দিতেছে। কিন্তু এবার সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা অতি কম বলিয়া বোধ হইল। ইহার এক স্থানে কথক-ঠাকুরদিগকে দেখিলাম, তাঁহারা উচ্চমঞ্চে বসিয়া কাকতা করিতেছেন। যাহা হউক, এই তীর্থ-স্থানে বিচিত্র লোকের সমাবেশ দেখিলাম। এখানে সাধু-অসাধু, ধার্ম্মিক বিধর্ম্মী, শঠ-লম্পট, কুলটা-কলঙ্কিনী, ঠগ-বাটপাড়, চোর-ছ্যাচড়—সবই আসিয়াছে। কেহ বা নানা প্রকারে পুণ্যসঞ্চয় করিতেছে; কেহ বা পরস্বাপহরণ করিয়া হাতে হাতকড়ি পরিতেছে। অনেক দুষ্কর্ম্মান্বিত লোক এই পবিত্র তীর্থস্থানকে কলুষিত করিবার জন্য সুরা-রঞ্জিত হইয়া আসিয়াছে। আবার ততোধিক-দুষ্কৃতকারীরা গণিকা সঙ্গে আনিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। যতই বেলা হইতে লাগিল, ততই তেড়ি-কাটা, মোজা-আঁটা, বুকে-ঘড়ি, হাতে-ছড়ি বাবুদলের আবির্ভাব হইতে লাগিল। তাঁহাদের চঞ্চল চক্ষু এখানকার পরম পবিত্র-ভাব দেখিবার জন্য ব্যস্ত নহে; তাঁহাদের দৃষ্টি অন্যদিকে। আমরা পুনরায় বাঁধের উপর উঠিতে লাগিলাম। এখানকার রাস্তার দুইধারে শতগ্রন্থি-যুক্ত--মলিন-জীর্ণ-সঙ্কীর্ণ--বস্ত্র-পরিধান শীতক্লিষ্ট-শীর্ণকায় কাঙ্গালেরা ভিক্ষার্থী হইয়া বসিয়া আছে; যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সে তদনুরূপই দিতেছে। কিন্তু এখানে কাহাকে কিছু দিলে বড় বিভ্রাট বাধিয়া যায়। আমরা দেখিলাম, একটী ভদ্রলোক তাহাদের কিছু দিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহাকে কতকগুলি লোকে ঘেরিয়া বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে লোক ছিল বলিয়া তাহাদের হাত হইতে তিনি কোন মতে নিস্তার পাইলেন। আমরা অনতিবিলম্বে বাঁধের পশ্চিমধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে চিত্তরঞ্জন পণ্য-পরিপূর্ণ সারি সারি দোকান। প্রতি দোকানে বহুসংখ্যক খরিদ্দার রহিয়াছে। কেহ কিনিতেছে, কেহ জিনিসের দর জিজ্ঞাসা করিতেছে, কাহারও বা পয়সা নাই,—সে কেবল হাঁ করিয়া দ্রব্য-সামগ্রীর শোভা দেখিতেছে। এই স্থানে পুলিশ, ডিস্পেন্সারি, খৃষ্টান প্রভুদিগের আড্ডা, প্রয়াগ-বিদ্যা-ধর্ম্ম-বর্দ্ধিনী সভা ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সকল দোকানের পশ্চাতে বাজার এবং কল্পবাসীদের কুটীর। কল্পবাসীরা এক মাস কাল এই সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিবেন এবং পৌর্ণমাসীর দিন গঙ্গা স্নান করত, কেহ কেহ বা সাধু সজ্জনকে খাওয়াইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইবেন। কল্পবাসীদের এখানে মাসাবধি শীত বাত এবং এবং নানা প্রকার কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। ধন্য ইহাঁদের ধর্ম্ম নিষ্ঠা!!

আমরা একে একে সকল স্থানই দেখিয়া বেড়াইলাম। এবারকার বন্দোবস্ত নিতান্ত নিন্দনীয় হয় নাই। ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় হইয়া আসিল দেখিয়া আবার সেই বাঁধের উপর আসিলাম। এখনও কত লোক স্নানের জন্য ত্রিবেণী-তীরে যাইতেছে। আবার যাহাদের গতি গৃহাভিমুখে তাহারা এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিয়া যাইতেছে। আমরা কিছুদিনের জন্য, সেই সুখ-মোক্ষ-বিধায়িনী কৈবল্যদায়িনী ভাগীরথীর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে যুক্তকরে—কবির সঙ্গে বলিলাম,—

"কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥
* * * শেষে শমন ভয়ে
তুয়া বিনু গতি নাই আরা।
দীন-দয়াময়ি, মাতঃ কৃপাময়ি,
ভব-তারণ ভার তোহারা॥

শ্রীসঃ—

বেদান্ত-দর্শন।

(ষষ্ঠ প্রস্তাব)

"বজ্রপাত হয় বটে, কিন্তু এরূপ সূচীভেদ্য অন্ধকার হয় না। ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অমা-রজনী হইলেও আগে অন্ততঃ নিমেষের জন্যও দিগন্ত-বিসর্পী উজ্জ্বল-মধুর—বিকটোজ্জ্বল আলোক-রশ্মি না দেখাইয়া, ক্ষণপ্রভার চঞ্চল হাস্যে হৃদয় বিচলিত না করিয়া বজ্রপাতও হয় না। কিন্তু হে বেদান্ত! তোমার সকল বাক্যই বজ্রাদপি কঠোরাণি,—তুমি পাঁচবার আমাদের নিকটে নিপতিত হইলে, কিন্তু কৈ? আলো ত একবারও দেখিলাম না! কেবল, সেই শ্রবণ-ভৈরব বিকট গর্জ্জন। অন্ধকার, অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার;—আর সেই শত-বজ্র গর্জ্জন-ধিক্কারী প্রলয়-পয়োধি-কল্লোল-কোলাহল।—এখনও যেন কর্ণ-পটহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঠিক বটে, তোমার মায়াবাদ। দয়া-মায়া বাদ না দিলে কি আর এই ভাবে মনুষ্য পেষণ করিতে পারিতে? হে শারীরক! আর কাজ নাই,—ঢের হইয়াছে; এখন সরিয়া পড়।"

আমি জানিতাম সকল পাঠকেরই মনোভাব ঐরূপ। তবে কাহারও ব্যক্ত, কাহারও অব্যক্ত,—এইমাত্র ভেদ। বিশ্বস্তসূত্রে এমনও অবগত আছি যে, বেদান্ত-বহির্ভাবের আশঙ্কা-শূন্য হইয়া গত পূর্ণিমাতে অনেকে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়াছেন। এই সকল কারণে, বেদান্তের 'ইত্যলং' করিবার চেষ্টায় ছিলাম; কিন্তু হইল না। অভাগা দেশে, কাহারও কপালে সুখ নাই। ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমিও ত পরম আরাম অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু কতিপয় পাঠকের তাহা সহ্য হইল না। তাঁহারা দেখিতেছি, 'বেদান্তদর্শন' 'বেদান্তদর্শন' করিয়া, আজকাল হাঁকা-হাঁকি আরম্ভ করিয়াছেন, কাজেই কামান পাতিতে হইল। পুনরায় 'বেদান্ত' লিখিতে বসিলাম, এবার ইনি পঞ্চমে উঠিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখন সকলেই চুপ করিবেন,—কেহ ভয়ে, কেহ বা দায়ে।

৫ম সূত্র-

আভাস।

ব্রহ্ম, জগৎ-কারণ,—ইহা হইল, নিজ মত। এখন অপর মতাবলম্বীদিগের যুক্তি-তর্ক নিরাকৃত হইবে। পঞ্চম প্রভৃতি কতিপয় সূত্র সাংখ্য-মত খণ্ডনের জন্য।

সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে,—প্রকৃতিই জগৎ-কারণ; ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে। যে সকল শ্রুতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; তৎসমুদয় দ্বারা প্রকৃতির জগৎকারণত্বও সিদ্ধ হইতে পারে। তবে এক কথা সর্ব্বজ্ঞত্ব লইয়া। বেদে আছে, "জগৎস্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ"। প্রকৃতি কিন্তু অচেতন। কাজেই প্রকৃতিকে জগৎস্রষ্টা বলা যায় না। এই আপত্তির উত্তরে, সাংখ্য-মতানুবর্ত্তিগণ বলেন, প্রকৃতি অচেতন হইলেও সর্ব্বজ্ঞ। তবে এই 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থ-বৈলক্ষণ্য করিতে হয়। সর্ব্ব-বিষয়ক জ্ঞানে যাঁহার সামর্থ্য আছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" জ্ঞান,—সত্ত্ব-গুণ হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতি হইতেছেন,—সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী—ত্রিগুণাত্মিকা। সুতরাং সকল জ্ঞানের উপরই যাঁহার অসীম ক্ষমতা, সেই সত্ত্বগুণও প্রকৃতি-বহির্ভূত নহে। তবে প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ না বলিব কেন? সর্ব্বজ্ঞ শব্দের এরূপ অর্থ বেদান্ত-মতেও করিতে হইবে, নতুবা ব্রহ্মেও সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ,—এরূপ অর্থ করিলে, জ্ঞানকে নিত্য (উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জ্জিত) বলিতে হয়; তাহা হইলে কিন্তু জ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মের কোন ক্ষমতা থাকে না; এইরূপে তাঁহার সর্ব্বশক্তি-মত্ত্বের ব্যাঘাত হয়। আর যদি বলা যায়, জ্ঞান অনিত্য; তাহা হইলে প্রলয়াদি সময় অর্থাৎ যে সময়ে কোন জন্য-বস্তু (ভাব) না থাকে, তখন ব্রহ্মের জ্ঞানও থাকে না, বলিতে হয়। হে বেদান্ত! তখন ত তুমি তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিবে। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ শব্দের অস্মৎপ্রদর্শিত অর্থ তোমাকেও আশ্রয় করিতে হইতেছে—সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানে যাঁহার সামর্থ্য আছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। আর এক কথা,—প্রকৃতির জগৎকারণত্ব পক্ষে আর একটী বিশেষ যুক্তি আছে। দেখ, জগতে সকল কার্য্যই নানা কারণের ফল;—একটী কারণ দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। ঘটের কত কারণ!—মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, জল কুম্ভকার ইত্যাদি। কিন্তু তুমি বল, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম থাকেন; তিনিই সকলের কারণ। একা ব্রহ্ম, কারণ হইবেন কিরূপে? কত কার্য্য দেখা যায়, কিন্তু একটী মাত্র কারণে কোন কার্য্যই হইতে দেখা যায় না। আমার মতে প্রকৃতি

ত্রিগুণাত্মিকা, তাঁহাকে কারণ বলিলে, তিন গুণকেই কারণ বলা হইল;—বহু কারণে কার্য্যোৎপত্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই দেখা যায়। অতএব প্রকৃতিই জগৎকারণ—এই সব কথার উত্তর করিবার জন্য পঞ্চম সূত্রের আরম্ভ।

"ঈক্ষতে নাশব্দম্।"

সূত্রস্থিত পদাবলীর অর্থ।

ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণ হেতু) ন (জগতের কারণ নহে) অশব্দম্ (বেদ-শব্দ-বাচ্য নহে)

ব্যাখ্যা।

প্রকৃতি, জগৎকারণ বলিয়া বেদে কথিত হয় নাই। যেহেতু—জগৎকারণের দর্শন-কর্তৃত্ব শ্রুতিতে কথিত আছে। যথা;—"স ঈক্ষাঞ্চক্রে স প্রাণমসৃজত" "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদি। প্রকৃতি,—জড়,—চৈতন্যহীন;—এ কথা সাংখ্য-মতেও স্বীকৃত। অথচ এই সাংখ্যই কেবল প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলেন। যখন দেখা যাইতেছে, বেদ,—জগৎকারণকে দর্শনকর্ত্তা বলিতেছেন; তখন সর্ব্ববাদি-সিদ্ধ দর্শনকর্তৃত্ব-হীন প্রকৃতি, যে জগৎকারণ নহেন, ইহা বেদের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত,—এ কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। প্রথম, শ্রুতি বিরুদ্ধ বলিয়া এই সাংখ্য-পক্ষ অগ্রাহ্য।

আপত্তি।

১। জ্ঞান, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম; সত্ত্বগুণ প্রকৃতি হইতে পৃথক নহে; এইজন্যই প্রকৃতিতে দর্শন-কর্তৃত্ব বা সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার করি।

২। জ্ঞানশক্তি আছে বলিয়াই, প্রকৃতিতে "সর্ব্বজ্ঞত্ব" বা দর্শনকর্তৃত্ব মানিয়া থাকি।

৩। কিংবা যেমন অগ্নি-সংযোগে তপ্ত লৌহ-পিণ্ডকেও 'দাহকারী' বলিয়া ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ পুরুষ-সংসর্গে প্রকৃতিকেও জ্ঞানবতী বা বা দর্শনকারিণী বলা যাইতে পারে। এই জন্যই "ঐক্ষত" প্রয়োগ করা হইয়াছে।

খণ্ডন।

১। সত্ত্বগুণ—যখন প্রকৃতি-সংজ্ঞার অন্তর্নিবিষ্ট হয়, তখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণই সমভাবে অবস্থিত থাকে। সাম্যাবস্থায় তদ্দ্বারা জ্ঞানাদি উৎপন্ন হয় না। তবে তখন প্রকৃতিকে জ্ঞানবতী বলিবে কিরূপে?

২। যদি প্রকৃতির অন্তর্গত সত্ত্বগুণে, জ্ঞান আছে বলিয়া—প্রকৃতিকে 'জ্ঞানবতী' বলিতে হয়, তাহা হইলে, জ্ঞান-বিরোধী রজস্তমোগুণের ধর্ম্ম লইয়া প্রকৃতিকে 'অল্পজ্ঞা'ও ত বলিতে হয়। শুধু সত্ত্বগুণ ত আর প্রকৃতি নহে; তিন গুণই প্রকৃতি-পদ-বাচ্য।

৩। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে বলিয়াই, তপ্ত লৌহ-পিণ্ডে ঔপচারিক দাহকত্ব ব্যবহার হয়; সেইরূপ কোন পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার করিলে, তবে প্রকৃতিতেও ঔপচারিক 'সর্ব্বজ্ঞত্ব' সিদ্ধ হয়। তাই যদি হইল, তবে আর ঔপচারিক সর্ব্বজ্ঞত্ব লইয়া কাজ কি? যাঁহাকে আসল সর্ব্বজ্ঞ বলিতেছ, তাঁহাকেই জগৎকারণ বল না কেন?

আপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মে নিত্যজ্ঞানও স্বীকার করা যায় না; জন্য-জ্ঞানও স্বীকার করা যায় না। নিত্যজ্ঞান স্বীকার করিলে জ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মের কর্তৃত্ব থাকে না। জন্য-জ্ঞান স্বীকার করিলে, ব্রহ্মে কোন সময়ে জ্ঞানাভাবও সিদ্ধ হইতে পারে।

খণ্ডন।

ব্রহ্মে নিত্য জ্ঞান আছে। সর্ব্বজ্ঞান-কর্ত্তার নাম সর্ব্বজ্ঞ নহে; সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। জ্ঞানে কর্তৃত্ব না থাকিলেও দোষ নাই। কেননা, কোন জ্ঞানই কৃতিসাধ্য নহে।

আপত্তি।

জ্ঞান-কর্তৃত্ব না থাকিলে "সর্ব্বং জানাতি" এরূপ ব্যবহার হয় কিরূপে?

খণ্ডন।

"সূর্য্যঃ প্রকাশয়তি, প্রকাশতে" অর্থাৎ, সূর্য্যে প্রকাশকতা ও প্রকাশমানত্ব সদা সর্ব্বদা থাকিলেও যেমন সূর্য্য, প্রকাশ করিতেছেন, সূর্য্য প্রকাশ হইতেছেন,—এইরূপ ব্যবহার হয়, সেইরূপই ব্রহ্মের সর্ব্বদা জ্ঞান থাকিলেও "সর্ব্বং জানাতি" এইরূপ ব্যবহার জানিবে।

উপসংহার।

যাঁহার প্রসাদে যোগিগণ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-বিষয়ক সমুদয় জ্ঞানলাভ করেন, সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সাক্ষাৎ পরমেষ্ঠী যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহা আর কি বলিতে হইবে? তিনি অশরীরী হইয়াও জ্ঞান-বান্। জীবগণ, তৎস্বরূপ হইলেও অবিদ্যাবশে সর্ব্বজ্ঞত্ব হইতে বঞ্চিত। ব্রহ্ম এক হইলেও তিনিই জগৎকারণ; প্রকৃতি, বহু বস্তুর সমষ্টি হইলেও জগৎকারণ নহে। তর্ক দ্বারা এ সমুদয় বিষয় পরে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

অঙ্গ-সংস্কার।

পাদ-প্রক্ষালন।*

শীতকাল,—সকালবেলা। পসমী-রেসমী-বসনে দেহযষ্টি সুমণ্ডিত থাকিলেও মাঝে মাঝে শীতের দৌরাত্ম্য অল্পস্বল্প ভোগ করিতে হয়। হয় বলিয়াই শীতোপযোগী বিবিধ গরম ঔষধও সেবন করিতে হয়। একালে এদেশে সুসম্প্রদায়ে এইরূপই ব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু সেকালের নিয়ম,—সমস্ত সকাল ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে হইবে; আর জল শোষণ করিতে হইবে। হাত কন্‌কন্‌ করিবে, পা জ্বালা করিবে, হৃদয় দুরদুর করিবে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতে থাকিবে। তবু কিন্তু জল ছাড়িবার যো নাই। এই শৌচের শীতল সলিল-রাশি ভোগ করা হইল, আবার এখনই ভাল করিয়া হস্ত-পদ-প্রক্ষালন, তার পরেই আচমন, তার পরেই দন্তধাবন বা মুখ-প্রক্ষালন, তার পরেই স্নান। এই নিয়মাধীন দারুণ দেশে, কাজেই "জানু ভানু কৃশানু"ই শীত-নিবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গায়ে জামা, পায়ে মোজা জুতা, হাতে দস্তানা দেয় কখন?

নিয়মের এটা দোষ হইতে পারে, শাস্ত্রের এটা বেয়াদুবী হইতে পারে, কিন্তু সে সুসম্প্রদায়! নিজগুণে মার্জ্জনা কর, সে দোষ ধরিও না। অনুমতি কর, আমি যথানিয়মে সেই সব দারুণ কাহিনী বর্ণনা করিতে থাকি।

শৌচকার্য্য-সমাধার পর, হস্তপাদ-প্রক্ষালন করিবে। সাধারণ কার্য্যে, পশ্চিমমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিতে হয়; দেবকার্য্যে পূর্ব্বমুখ কি উত্তর মুখ হইয়া এবং পিতৃকার্য্যে দক্ষিণমুখ হইয়া পাদ-প্রক্ষালন করিবে। স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন করিলে বাম-পাদ-প্রক্ষালন—প্রথমে, দক্ষিণপাদ-প্রক্ষালন—শেষে কর্ত্তব্য। শূদ্রে যদি পা ধোয়াইয়া দেয়, তাহার পক্ষেও এই ক্রম। ব্রাহ্মণ যদি পা ধোয়াইয়া দেন, তাহা হইলে, তিনি প্রথমে দক্ষিণ পা ও পরে বাম পা ধোয়াইবেন।

এক,—পা-ধোয়ান ইহাতেই কত কারখানা দেখুন; এই সকল দেখিলে, ঋষিদিগের "খেয়ে দেয়ে আর কোন কাজ ছিল না" বলিয়াই বোধ হয়, কি বল—বাবু! যা'হউক, খুসী হও বাবু! এখনই কিঞ্চিৎ খোস-খবর দিতেছি :—

"পাদ-প্রক্ষালনে এত কড়াকড়ি, হস্তপ্রক্ষালনে কিন্তু কোন গোল নাই।" যেরূপ হউক, ভাল করিয়া হাত দুখানি ধুইয়া ফেলিলেই হইল। তবে কফোনী পর্য্যন্ত হস্ত-প্রক্ষালন ও জানু পর্য্যন্ত পাদপ্রক্ষালন করিতে পারিলে, বড়ই ভাল হয়।

হিন্দু মাত্রেরই "টীকি" রাখিতে হয়। সভ্যাভিধানের "টীকি" শাস্ত্রে শিখা বলিয়া পরিচিত। এই সময়ে দ্বিজগণ, গায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখা বন্ধন করিবেন। শূদ্রের স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। শিখা-বন্ধনের পর বৈধ-কর্ম্মে অধিকার হয়।

"তরমুজের বোঁটা সম টীকি শোভে শিরে।"

যে-হিন্দুসন্তান, শিখা সম্বন্ধে এই উপহাসময় কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেই হিন্দুগণের পূর্ব্ব-পুরুষেরা শিখার ঘোরতর পক্ষপাতী! আজ নিদারুণ গ্রীষ্ম; ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে, সর্ব্বদা শৈত্য-সেবায় কালযাপন করিতে অভিলাষ হইতেছে; আবার কিছুদিন পরে দেখ, কোথায় সে ঘর্ম্ম, কোথায় সে শৈত্য-সেবায় অনুরাগ! বহুবস্ত্র-মণ্ডিত হইয়া অগ্নি-তাপের নিকট বা অবরুদ্ধ গৃহে বসিয়া শীতকে পরাস্ত করিতে হইতেছে। অচিন্ত্য শক্তি কালের নিয়মই এই।

"যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টি-সংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালে প্রলীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ॥"

যখন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তারাও কালগ্রাসে পতিত হন; তখন সামান্য দুই দশটা নিয়ম বা বিধি-ব্যবস্থা যে কালের করাল করতাড়না সহ্য করিবে, এ বিষয়ে আর চিন্তা করিব কি? "কালো হি বলবত্তরঃ।"

কেবল শিখার জন্যই বিলাপ করিতে বসি নাই; একটা উপলক্ষমাত্রে নির্ভর করিয়া অতীত ও বর্ত্তমান কালের পার্থক্য প্রদর্শন করিলাম।

---

* প্রথমং প্রাঙ্মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েচ্ছনৈঃ। উদঙ্মুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ॥ দেবলঃ।
প্রত্যক্ পাদাবসেচনম্। আপস্তম্বঃ।
সব্যং পাদমবনেনিজে ইতি সব্যং পাদং প্রক্ষালয়েৎ দক্ষিণং পাদমবনেনিজে ইতি দক্ষিণং পাদং প্রক্ষালয়েদিতি॥ গোভিলঃ।
দক্ষিণমগ্রে ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছেৎ, সব্যং শূদ্রায়েতি। আশ্বলায়নঃ।
স্বয়ং প্রক্ষালনে সব্যস্যৈব প্রাথম্যমিতি। হরিশর্ম্মা
গায়ত্র্যাতু শিখাং বদ্ধা।

আচমন।*

"সপ্‌, সপ্‌, সপ্‌।" ছিঃ! বাবা! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঐরূপে জল লইয়া অমন শব্দ ক'রে কি আচমন করিতে আছে!—আচমন করিতে হইলে, প্রথমত সঙ্কুচিত উত্তান হস্তে অল্প-অল্প জল লইয়া তিনবার পান করিতে হয়।

উপরি উল্লিখিত "সপ্‌ সপ্‌" শব্দ সেই জলপানের জানিবে। ঠিক বলিতে পারি না, সেই শব্দটা "সপ সপ" কি "হুস্‌ হুস্‌"। যা'ই কেন হউক না, ফল কথাটা, শব্দ হইতেছিল। তাই বৃদ্ধ আচার্য্য শিষ্যকে উক্তরূপে শিক্ষা দিয়াছেন।

দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া ডোঙ্গার মতন সঙ্কুচিত করিবে; মাঝের তিনটী অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত হইবে। হস্ত-সঙ্কোচ করার দরুণ, উক্ত অঙ্গুলিত্রয় ঈষৎ বক্রভাবে ও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধমুখে থাকিবে। দুই পার্শ্বের অঙ্গুলি—কনিষ্ঠা এবং অঙ্গুষ্ঠকে মধ্য-অঙ্গুলিত্রয়ের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে ও যথাসম্ভব অসঙ্কুচিত করিয়া রাখিবে। সেই হস্তে এক একবিন্দু জল লইয়া ব্রাহ্মতীর্থে নিঃশব্দে পান করিবে। তিনবার পান করিবে। একবার জল লইয়া তিনবার পান করিবে না; তিনবারই জল লইতে হইবে।

"ব্রাহ্মতীর্থ" কথাটী কিছু তোমাদের নূতন লাগিয়াছে বোধ হয়। কথাটী শুনিয়া কেহ বা আনন্দে গদ্গদ, কেহ বা বিষাদে বিহ্বল হইয়াছেন, এরূপ বিশ্বাসও আমার হইতেছে।

বৃদ্ধ মাতা, বৃদ্ধ ভগিনী, অশিক্ষিতা স্ত্রী লইয়াও কোন কোন হতভাগ্য ব্রাহ্মের ঘর করিতে হয়, কাজেই কখন কখন নিতান্ত বিব্রত হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ত্রীকে না হউক, মাতা ভগিনীকেও ত হিন্দুর তীর্থে পাঠাইতে হয়, ইহা কিন্তু নিদারুণ পরিতাপের বিষয়। তথাপি নাচার। মাতা প্রভৃতি

---

* প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃতাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততো মুখম্।
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃপুনঃ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥ দক্ষঃ।
আচমনন্তু হৃতৌ অশব্দবদিতি।
অন্তর্জানু শুচৌ দেশে উপবিষ্টউদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজোনিত্যমুপস্পৃশেৎ।
ব্রাহ্মেণ তীর্থেনাঙ্গুষ্ঠমূলেন। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
স্ত্রিয়াস্ত্রৈদশিকং তীর্থং শূদ্রজাতেস্তথৈবচ।
সকৃদাচমনাচ্ছুদ্ধিরেতয়োরেব চোভয়োঃ।
ব্রাহ্মেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ।
কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন পিত্রেণ কদাচন। মনুঃ।

অদ্ভিস্তু প্রকৃতিস্থাভির্হীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ। হৃৎকণ্ঠতালুগাভিশ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ। শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎস্পৃষ্টাভিরন্ততঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্ততঃ ওষ্ঠপ্রান্তে।

কাংস্যায়সেন পাত্রেণ রঙ্গসীসকপিত্তলৈঃ। আচান্তঃ শতকৃত্বোঽপি ন কদাচিচ্ছুচির্ভবেৎ। উশনাঃ।

ন শূদ্রাশুচ্যেকপাণ্যাবর্জিতেনেতি। শঙ্খ-লিখিতৌ।

অত্রাশুচিপদং আচমনকর্তৃভিন্নপরং শূদ্রসাহচর্য্যাৎ একপাণিপদমপিকর্তৃপাণিভিন্নপরম্। তেন স্বীয়বামপাণ্যাবর্জ্জিতমনিষিদ্ধম্।

রাত্রাববীক্ষিতেনাপি শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।
উদকেনাতুরাণাঞ্চ তথোষ্ণেনোষ্ণপায়িনাথম্। যমঃ।

যস্মিন্ দেশে বর্ণাদিদুষ্টমেব তোয়ং তত্র তদপি গ্রাহ্যম্।

ন গচ্ছন্ ন শয়ানশ্চ ন চলন্ ন পরান্ স্পৃশন্।
ন হসন্ নৈব সংজল্পন্ নাত্মানঞ্চৈব বীক্ষয়ন্॥
দেবলঃ।

কেশান্ নীবীমধঃকায়মস্পৃশন্ধরণীমপি।
যদি স্পৃশতি চৈতান্ন ভূয়ঃ প্রক্ষালয়েৎ করৎ।
গোভিলঃ।

নান্তরীয়ৈকদেশেন কল্পয়িত্বোত্তরীয়কম্॥
বহির্জানুস্ত্বরয়া নাসনস্থো নচোত্থিতঃ।
ন পাদুকাস্থো নাচিত্তঃ শুচিঃ প্রযতমানসঃ॥ মরীচিঃ।
আর্দ্রবাসা জলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্।
শুষ্কবাসাঃ স্থলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্॥
হারীতঃ।

অন্তরুদকে আচান্তোঽন্তরেব পূতো ভবতি, বহিরুদকে আচান্তো বহিরেব শুদ্ধঃ স্যাৎ তস্মাদন্তরেকং বহিরেকঞ্চ পাদং কৃত্বা আচামেৎ, সর্ব্বত্র শুদ্ধো ভবতীতি।
পৈঠীনসিঃ।

স্নানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনম্।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্॥
আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্জ্জঙ্ঘয়োস্তথা।
কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে॥
কাত্যায়নঃ।

দক্ষিণেন পাণিনা সব্যং প্রোক্ষ্য পাদৌ শিরশ্চেতি।
বিনা যোজ্ঞোপবীতেন নিত্যমেবমুপস্পৃশেৎ॥
বায়ুপুরাণম্।

স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্ত্বা রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্বাসো বিপরিধায় চ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ
মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্॥
বৃদ্ধশতাতপঃ।

তীর্থে যাইবার জন্য উৎপাত করিলে, ব্যস্ত করিলে, ব্রাহ্ম ভায়া কি করেন, আপনাদের ত আর তীর্থ নাই, কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে হিন্দুর তীর্থে পাঠাইয়া দেন। যদি ব্রাহ্মতীর্থের সন্ধান পাওয়া যায় ত বড়ই ভাল হয়। মাতা প্রভৃতিকে তীর্থেও পাঠান হয়, অথচ হিন্দুর নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতে হয় না। আর এক কথা,—হিন্দুর তীর্থ আছে, বৌদ্ধের তীর্থ আছে, খৃষ্টানের তীর্থ আছে, মুসলমানের তীর্থ আছে;—সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই তীর্থ আছে, নাই কেবল ব্রাহ্মের। এ কি কম দুঃখের বিষয়! সুতরাং আজ ব্রাহ্মতীর্থ নাম শুনিয়া ব্রাহ্ম কি আনন্দে বিভোর না হইয়া থাকিতে পারেন? ঠিক এই কারণেই কোন কোন হিন্দুও মর্ম্মাহত হইবেন, ইহাও বিচিত্র নহে। তাই সকলের শোক-দুঃখ, সুখ-হর্ষ ঘুচাইয়া আমাকে ব্রাহ্মতীর্থের প্রকৃতার্থ প্রকাশ করিতে হইল। ব্রাহ্মতীর্থ শব্দে অঙ্গুষ্ঠ-মূল। করতলের মধ্যস্থলে মূল পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিবে, যেদিকে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি, রেখার সেই পার্শ্ব—করতল-মূল,—ব্রাহ্মতীর্থ নামে অভিহিত।

তিনবার জলপানের পর অধোমুখ সঙ্কুচিত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা করিবে; তৎপরে দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া বামহস্ত, পাদদ্বয় ও মস্তকে ছিটা দিবে। অনন্তর, সজল অঙ্গুলি দ্বারা মুখ, নাসিকা-ছিদ্রদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, এবং নাভি স্পর্শ করিবে। করতল দ্বারা হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা মস্তক, শেষ সমুদয় অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। মুখস্পর্শ—মধ্যের তিন অঙ্গুলি দ্বারা; নাসিকাস্পর্শ—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা; চক্ষু ও কর্ণস্পর্শ—অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা; এবং নাভিস্পর্শ অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কর্ত্তব্য। এই আচমন-কার্য্য উত্তরমুখ, পূর্ব্বমুখ বা ঈশান-কোণ ভিমুখ হইয়া কর্ত্তব্য তিনবার যে জল পান করিতে হয়, তাহার পরিমাণ,—যাহা গলাধঃকরণ হইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, কিন্তু উদরে যাইতে পারে না; ব্রাহ্মণ ততটুকু জল পান করিবেন। যে জলটুকু, কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, আর অধোগত হইতে পারে না, আচমনে ততটুকু জল-পান করাই ক্ষত্রিয়ের উচিত। যাহাতে তালু পর্য্যন্ত আর্দ্র হয়, আচমনে এইরূপ সামান্য জল পান—বৈশ্যের কর্ত্তব্য। আর স্ত্রী শূদ্র, এবং অনুপনীত দ্বিজ বালক অঙ্গুলির অগ্রভাগে জল লইয়া একবার মাত্র ওষ্ঠপ্রান্তে ছিটা দিবে। তিনবার জল পান করিতে হইবে না। মুখমার্জ্জনা মুখাদি স্পর্শ সকলেরই কর্ত্তব্য। আচমনের জল,—বিশেষ পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক; "উষ্ণ জল" হইবে না, ফেণা থাকিবে না; বুদ্‌বুদ থাকিবে না। গন্ধ, বর্ণ বা রস বিকৃত হইবে না। আচমন করিবার সময়ে, আচমন-জল বেশ দেখিয়া লইবে।

"উষ্ণ-জল"-পায়ী রোগী, উষ্ণ জল দ্বারা আচমন করিতে পারে। রাত্রিকালে আচমন-জল, না দেখিলেও চলিবে; এবং যে দেশে অবিকৃত-গন্ধ-বর্ণ-রস জল না পাওয়া যায়, তথায় তদ্দ্বারাই আচমন করিবে।

আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ও দিব্য কর্ণে শুনিতেছি, কেহ কেহ মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন,—"গরজ বড় বালাই।"

"তথাস্তু।"

দ্বিজ,—শূদ্রের আনীত জল আচমন-কার্য্যে ব্যবহার করিবেন না। অপরে একহাতে করিয়া জল দিলে, তদ্দ্বারা আচমন করা অবিহিত। অপর অশুচি ব্যক্তি জল আনিয়া দিলে, তদ্দ্বারাও আচমন করিতে নাই। নিজে এক হস্তে করিয়া অর্থাৎ বাম হস্তে করিয়া দক্ষিণ হস্তে জল লওয়া হয়,—অশুচি থাকিয়া শৌচার্থ আচমন করা হয় সুতরাং জলও লইতে হয়,—তাহাতে দোষ নাই। অনেকেই বলেন, শূদ্রও আচমন করিবার সময়ে অন্য শূদ্রের আনীত জল গ্রহণ করিবে না।

কাংস্যময়, লৌহময়, রঙ্গনির্ম্মিত, * সীস-গঠিত এবং পিত্তলময় পাত্রে জল লইয়া তদ্দ্বারা আচমন নিষিদ্ধ। পাদ-প্রক্ষালনাবশিষ্ট জল দ্বারাও আচমন করিতে নাই। নিতান্ত অভাব পক্ষে, সেই জল মাটীতে গড়াইয়া দিয়া তদ্দ্বারা আচমন করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মতীর্থে ব্রণাদি হইলে, করতল-মধ্যে, অঙ্গুল্যগ্রে বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলে জল লইয়া আচমন করা যাইতে পারে। কিন্তু, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, জল লইয়া কদাচ আচমন কর্ত্তব্য নহে। বাতরোগাদি বশতঃ নিজ হস্তে আচমন করিতে অপারগ হইলে, অপরের হস্তের সাহায্যে আচমন করিবে।

"কোন মতেই নিস্তার নাই; নাছোড়-বান্দার একশেষ! পীড়া হইলে, আফিসে ছুটী পাওয়া যায়,

* রঙ্গ—রাং

তোমরা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বল, নিষ্ঠুর বল, তাহাদেরও হস্তের পীড়ায় দয়া হয়,—হাতের পীড়া হইলে, কেরাণীকুলের অপরের হস্ত ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতে হয় না; আর তুমি, দয়াময় ঋষি! কোন মতেই অব্যাহতি দিবে না,—হাতের পীড়া হইলেও নহে; না দেও;—জান ত,মনিব, তেরিয়া হইলে, ভৃত্যেরা ভাল কাজ করে না; অধিকাংশ ফাঁকি দিবারই চেষ্টা করে। আমরাও তদনুসারে তোমাদিগকে, ষোল আনাই ফাঁকি দিতেছি।"

"দর্দ্দূরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্।"

শয়ন করা অবস্থায়,আচমন করিতে নাই। যাইতে যাইতে আচমন করিতে নাই। অপরকে স্পর্শ করিয়া আচমন করিতে নাই। হাস্য করিতে করিতে আচমন করিতে নাই। দাঁড়াইয়া আচমন করিতে নাই। উবু হইয়া বসিয়া আচমন করিতে নাই। কোঁচার মুড়া গায়ে দিয়া আচমন করা নিষেধ। কথা কহিতে কহিতে আচমন করিতে নাই। আচমন করিবার সময়, হস্ত,—জানুর বহির্ভাগে রাখিবে না। জুতা পায়ে দিয়াও আচমন করিতে নাই। এক-কথায় বলিতে হইলে, সুস্থ চিত্তে, মনোযোগ সহকারে উত্তমরূপে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিবে। প্রথমে আচমন করা থাকিলেও হাঁচি, থুথু-ফেলা, স্নান, পান, ভোজন, স্ত্রীশূদ্রাদির সহিত সম্ভাষণ, বস্ত্র পরিধান, শিখা-বন্ধন, পথভ্রমণ ইত্যাদি কার্য্য করিবার পর, পুনরাচমন করা কর্ত্তব্য। কোন রকমে যদি যজ্ঞোপবীত দেহ হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে, পুনরায় যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া আচমন করিতে হয়।

হোম, সন্ধ্যা এবং ভোজন-সময়ে দুইবার করিয়া আচমন করিবে। শৌচান্তেও দুইবার আচমন কর্ত্তব্য। আচমন জলের অভাবে, স্বীয় দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে।

"তবু ভাল, একটু বাঁচোয়া।

আচমনের কথা আর বলিব না। সত্যই ভয় করিতেছে। এতেই বা কি জানি, আমার বা জন্মভূমির অদৃষ্টে কি আছে!

"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।"

এখন একবার দন্তধাবনের কথা বলা যা'ক; কেহ শুনিবে কি?

দন্তধাবন।*

চা-খড়ি, ফুলখড়ি, তামাকের গুল, এই তিন জিনিসে, কাহারও আটটায়, কাহারও নয়টায়, কোন ভাগ্যবানের বা দুই প্রহরে তর্জ্জনী মধ্যমা অঙ্গুলি সাহায্যে দন্ত-ঘর্ষণ হইয়া থাকে। আমি যদি সে গুলিকে বাতিল করিয়া দিতে বসি, তবে আমাকে লোকে ভাল বলিবে কেন? আমাকে যদি লোকপ্রিয় করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে হে মদীয় লেখনি! প্রচলিত নিয়মের পক্ষপাতিনী হইয়াই চলিবে। তাহা না করিলে, তোমাকে নিশ্চয়ই জানিব, তুমি ঘোর কৃতঘ্না,—ললনাকুলে তোমার ন্যায় কলঙ্কিনী আর কেহ নাই।

লেখনী চুপ করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করিতেছে, আমি কিন্তু তাহার কালা-মুখ দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছি, সে আমার হইলেও আমার অপকার করিবে;—ঘোর কৃতঘ্নতা করিবে। এখন হে পাঠকবৃন্দ! তোমরা আমার এই বিচারপূর্ণ লেখনী-সংবাদে প্রীত হইয়া দোষ মার্জ্জনা করিবে; তোমরা ত আর মূর্খ নহ; অবশ্য তোমাদের জানা আছে,—

"লেখকো নাস্তি দূষকঃ।"

বাসিমুখে থাকিলে, অপবিত্রতা হয়, "মুখে দুর্গন্ধ থাকে, মুখ বিস্বাদ থাকে, এই জন্য দন্তধাবন করিতে হয়। দন্তধাবন করিতে হয় নিম্ব, বিল্ব, এরণ্ড, আম্র ইত্যাদি বৃক্ষশাখা দ্বারা। দন্তধাবন-

---

* কনিষ্ঠাগ্রসমস্থৌল্যং সকূর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
প্রাতর্ভুক্ত্বা চ যতবাক্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্॥ বিষ্ণুঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলন্তু ছন্দোগেতরেষাম্।
দ্বাদশাঙ্গুলন্তু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং নবাঙ্গুলম্।
অষ্টাঙ্গুলন্তু বৈশ্যানাং শূদ্রানাস্তু ষড়ঙ্গুলম্।
চতুরঙ্গুলমানন্তু নারীণাং বিধিরুচ্যতে।
অন্তরপ্রভবানদঞ্চ ষড়ঙ্গুলমুদাহৃতম্।
ক্ষীরিণো বৃক্ষগুল্মানাং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্।
ভক্ষয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টানি পর্ব্বস্বপি চ বর্জ্জয়েৎ।
মহাভারতম্।
প্রতিপদ্দর্শ-ষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চৈব সত্তমাঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগাদ্দহত্যাসপ্তমং কুলম্।
অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা।
আপাং দ্বাদশ গণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধি-র্বিধীয়তে।
নরসিংহ পুরাণম্।
ইষ্টকালোষ্ট্রপাষাণৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা।
ত্যক্ত্বা চানামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্।
বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্যঃ।
এ সমুদয় প্রকরণ স্মার্ত্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

কাষ্ঠটী কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল হইবে, ছাল থাকিবে, এবং শুষ্ক হইবে না। দন্তধাবন-কাষ্ঠ দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, সামবেদি-ভিন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে; নবাঙ্গুল দীর্ঘ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে; অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ, বৈশ্য ও সামবেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে; শূদ্র এবং বর্ণসঙ্কর জাতির পক্ষে ষড়ঙ্গুল দীর্ঘ হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে চতুরঙ্গুল দীর্ঘ।

সুপারি, তাল, হিন্তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, তাড়ী এবং কেতকা বৃক্ষ শাখা দ্বারা দন্তধাবন করা নিষিদ্ধ।

নিম্ব অপামার্গ প্রভৃতি বৃক্ষশাখা দ্বারা দন্তধাবন কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দন্তধাবন করিতে হয়। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, উপবাস-দিন এবং শ্রাদ্ধ-তিথিতে কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিতে নাই। সে দিন কাঁচা আম্র-পত্র দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিয়া শেষে জিহ্বা পরিষ্কার করিবে। অভাব পক্ষে এবং নিষিদ্ধ দিনে, দ্বাদশবার কুলকুচা করিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিলেও চলিতে পারে। ফলকথা জিহ্বা পরিষ্কার করা খুব আবশ্যক। অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠের দ্বারাও দন্তঘর্ষণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অপর অঙ্গুলি দ্বারা কদাচ দন্তমার্জ্জনা করিবে না। দন্তধাবনের পর উত্তমরূপ কুলকুচা করিয়া মুখ পরিষ্কার করিবে। ইহার পর প্রাতঃ-স্নানের বিধি।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

আমার জীবন-চরিত।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময়, আমরা দুই ভাই,—জহরীমল শেঠের গৃহে উপনীত হইলাম। আমাদের প্রহরী ছয় জন, আমাকে সেলাম করিয়া সেনা-নিবাসে প্রস্থান করিল দেখিলাম,—জহরী-মলের মুখটী শুষ্ক; চোখের কোল বসা। তিনি যেন নিরানন্দ-নীরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। বুঝিলাম,—শেঠজী চিন্তা-জ্বরব্যাধিতে বিষম আক্রান্ত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসিলাম—"শেঠজী আজ আপনার মুখ এত ম্লান কেন?" শেঠজী হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"ম্লান মুখের কারণ কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? অথবা অদ্য এক্ষণে আপনার না বুঝাই সম্ভব। কারণ আপনার এখন উদর পূর্ণ, চিত্ত প্রফুল্ল, দেহ বলযুক্ত। সম্পদ-কালে লোকে অন্যের কষ্ট বা কষ্টের কারণ বুঝিতে সক্ষম হয় না।"

আমি। আমার আবার এখন সম্পদ-কাল কি দেখিলেন?

শেঠজী। যাঁহার জঠর-জ্বালা নাই, তিনিই সর্ব্বসম্পদের অধিকারী।

আমি। আপনার কি এখনও কি আহারাদি হয় নাই?

শেঠজী। না।

আমি। ডাল আটা কি এখনও সেনা-নিবাস হইতে আসে নাই?

শেঠজী। আসিয়াছে।—আপনার আসিবার একটু পূর্ব্বেই আসিয়াছে।

আমি। আজ কি কি জিনিস কত পরিমাণে আসিল?

শেঠজী। পরিমাণ খুবই কম, তবে আজকার জিনিসগুলি ভাল। ভাল ঘৃত, ভাল আটা, ভাল ডাল অদ্য আসিয়াছে। ইহার উপর বেগুন, সিম এবং আলু আছে। মসলার ভাগ কিছু প্রচুর।

আমি। আজ তা'হলে জামাই-আদর বলুন!

শেঠজী। জামাই-আদর সন্দেহ নাই,—কিন্তু বেলা প্রায় তৃতীয়-প্রহর অতীত হইল,—এই যা দুঃখ।

আমি। রসদ আসিতে এত বেলা হইবার কারণ কি?

শেঠজী। রসদ যে, আসিয়াছে,—তাই ঢের। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে কোন্ দিন হয় ত অনাহারে এই ঘরে মরিয়া থাকিতে হইবে। চারি-দিকে পাহারা,—বাহিরে যাইবার যো নাই। যাহারা এই বাটীর প্রহরী নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে যদি রসদের কথা বলি,—তাহারা উত্তর দেয়, "রসদের বিষয় আমরা কি করিয়া জানিব?" সিপাহীদের সব গোলমাল! আদৌ বন্দোবস্ত নাই।

আমি। কথা সবই সত্য, কিন্তু উপায় তো কিছু দেখি না।

শেঠজী। "(হাসিয়া) আপনার কিন্তু নিতান্ত মন্দ উপায় হয় নাই। বেশ দুই ভাই ঘোড়ায়

চড়িয়া যাইতেছেন, আর সহর হইতে আহার করিয়া আসিতেছেন। কোন্ দিন হয় ত আসিয়া দেখিবেন, শেঠজীর রসদও আসে নাই, শেঠজী দাঁতে দাঁত দিয়া, আকাশ পানে চাহিয়া পড়িয়া আছে।

শেঠজীর এই সকল কথা শুনিয়া আমার অন্তরে বড়ই কষ্ট হইল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া চতুর্থ প্রহর প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তথাচ শেঠজী অভুক্ত, ক্ষুধিত। আমি হাঁকিয়া পাচক-ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলাম, 'মহারাজ! রুটী তৈয়ারির আর বিলম্ব কত?' মহারাজ উত্তর দিল,—"আওর আধে ঘণ্টেকে বিচমে তৈয়ার হো জায়েগা।" শেঠজী কহিলেন,—"মহারাজকে আর বিরক্ত করিয়া ফল কি? এই তো উহারা আটা ঘি প্রাপ্ত হইল। বিশেষ উহারা এত বেলা পর্য্যন্ত না খাইতে পাইয়া, ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছে।"

বেলা যখন প্রায় চারিটা, তখন মহারাজ আসিয়া সংবাদ দিল,—"আহার প্রস্তুত।" ক্ষুধায় কাতর শেঠজী ধীরে ধীরে উঠিয়া আহার করিতে গেলেন। আমিও শেঠজীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। রন্ধন-গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—নির্ম্মল শ্বেত প্রস্তরের উপর চারি-পাঁচখানি ফুলা ফুলা রুটী বর্ত্তমান। ছোট ১টী শ্বেত-প্রস্তরের বাটীতে আলুর তরকারী। ডালও আছে।

শেঠজী আহারের আশায় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ হস্ত ধৌত করিলেন, মহারাজ আরও দুখানি ফুলা ফুলা রুটী তৎক্ষণাৎ সেঁকিয়া শেঠজীর পাতে নিক্ষেপ করিল।

এ সময় আমি বলিলাম,—"মহারাজ! রোটী [illegible] আচ্ছি বনতি [illegible]য়—খুব ফুলতি হ্যায়, আওর তরকারি কি রং ভি আচ্ছি হুই হ্যায়।"

শেঠজী জিহ্বা কাটিলেন। কহিলেন,—"রাম, রাম! বাবুজী! আপনে ইয়ে ক্যা কহ দিয়া?"

শেঠজী আহারীয় সামগ্রীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ঘুরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

আমি তো অবাক্! অপ্রতিভের একশেষ। বিস্মিত হইয়া শেঠজীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"কেন কেন, শেঠজী! কি হইয়াছে? আমি এমন কি কথা বলিলাম, যাহাতে আপনি ওদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন?"

শেঠজী। যাহা বলিবার নয়, তাহাই আপনি বলিয়াছেন। যাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়,—যাহা শুনিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই কথাই আপনি উচ্চারণ করিয়াছেন।

সম্মুখে হঠাৎ শত বজ্রপাত হইলে মানুষ যেরূপ চমকিত হয়, আমিও সেইরূপ চমকিত হইলাম।—আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সমস্ত দিনের পর ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অপরাহ্নে আহার করিতে বসিয়াছে, আমি সেই আহারে বাধা দিলাম,—ধিক্ আমাকে! কিন্তু কেন, কি হেতু, কিসের জন্য, শেঠজী আহার করিলেন না, ইহা জানিবার জন্য মনে বড়ই বিস্ময়-বিমিশ্রিত কৌতূহল জন্মিল। আমি শেঠজীকে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলাম,—"কি হেতু আপনি আহার বন্ধ করিলেন, আমায় বলুন,—শীঘ্র বলুন।"

শেঠজী। ভগবান্ আমার অদৃষ্টে আজ আহার লেখেন নাই, তাই, আমি আহার প্রস্তুত থাকিলেও, আহার করিতে বসিলেও, আহারে বঞ্চিত হইলাম। বাবু সাহেব! আপনার দোষ কিছুই নাই, দোষ আমার অদৃষ্টের।

আমি। আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আপনাকে আমি যোড়হাতে বলিতেছি, আমার কোন্ অপরাধে, আপনি আহার করিলেন না,—এ কথা শীঘ্র আমাকে বলিয়া, আমার অস্থির প্রাণকে রক্ষা করুন।

শেঠজী হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"আপনি বালকের ন্যায় এত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন?"

আমি। উৎকণ্ঠিত তো হইবারই কথা। ইহাতে যে উৎকণ্ঠিত না হয়, সে মানুষ নয়। আমি এমন একটী কাজ করিয়াছি বা অপরাধ করিয়াছি, যদ্দ্বারা আপনার এই অপরাহ্নের আহার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল, অথচ আমি, সেই কার্য্যটী কি, বা অপরাধটী কি, তাহা এখনও জানিতে বা বুঝিতে পারিলাম না।

শেঠজী মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"বাবু সাহেব! সে কথা আমার মুখে বলিতেও কষ্ট হয়,—তাহা বড়ই বদ কথা। আপনার নিকট সে কথা শুনিয়া অবধি আমার গা ঘিন্ঘিন্ করিতেছে।"

আমার কৌতূহলের মাত্রা আরও বৃদ্ধি হইল। আমি বলিলাম,—"আপনার কষ্টই হউক, আর গা ঘিন্ঘিনই করুক, আপনাকে সে কথা বলিতেই হইবে। অন্তত আমাকে শিক্ষা-প্রদানের জন্য, আমার নিকট সে কথা প্রকাশ করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য!

শেঠজী বলিলেন,—"বাবুজি! শুনিয়ে,—ঢোর যব মর্‌তে হৈঁ তো ফুলতে হৈঁ, রোটী ভেহ্‌ড়তী হৈঁ। আওর মাংস্‌কো "তরকারী" কহতে হৈঁ;—আলু বৈঁয়গুন্ ইন্‌সবকোঁ শাগ কহা যাতা হৈঁ, 'তরকারী' কহনেসে হামারা হিঁয়া নেহি খাতেঁ হৈঁ।"

ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—মহিষ এবং গরু প্রভৃতি জন্তু মরিলেই ফুলিয়া উঠে। রুটীকে ফুলা বলিতে নাই, তাহা হইলে জন্তু ফুলার ভাব আমাদের মনে উদয় হয়। ফুলা রুটীকে আমরা 'ভেহ্‌ড়া' বলি। ছাগ, ভেড়া প্রভৃতির মাংসকে আমরা তরকারী কহিয়া থাকি। আলু বেগুনকে আমরা তরকারী বলি না,—বলি, আলুর শাগ বেগুনের শাগ। আলু বা বেগুনকে তরকারী বলিলে আমরা তাহা খাই না।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। শেঠজী আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। আমি হতভম্ব হইয়া বসিয়াই রহিলাম। শেঠজী আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া, বলিলেন,—"বাবুজি! আপনি ভাবিতেছেন কেন? আপনি আসুন,—আমার সঙ্গে আসুন। মনে করুন, আজ আমার 'ভীম-একাদশী'। একাদশীর উপবাসে কোন কষ্ট আছে কি?"

সেদিন শেঠজীর আহারার্থ বাজার বা সে নিবাস হইতে আটা, ঘি, ডাল আনাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সর্দ্দার-প্রহরীকে কত অনুনয়-বিনয় করিলাম, কিন্তু সে আমার এ-কথা শুনিল না।

সেদিন আমার কথার দোষে চারি ব্যক্তির আহার হইল না;—শেঠজী, তাঁহার গোমস্তা, পাচক-ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য। গোমস্তা, পাচক-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পক্ষে "রুটী ফুলিয়াছে" বা 'তরকারী' এই শব্দ উচ্চারণ করায়, আহারে তাদৃশ ব্যাঘাত ঘটিত না বটে, কিন্তু প্রভু শেঠজী অনাহারে রহিলেন বলিয়া তাহারা আর ডাল রুটী মুখে দিতে পারিল না।

যতদিন বাঁচিব, ততদিন এই নিদারুণ ঘটনা আমার স্মৃতি-পথে জাগরূক থাকিবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য বেরেলীর সিপাহী-বিদ্রোহের পঞ্চম দিন;—১৮৫৭ সাল ৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবার।

প্রভাত হইল। রৌদ্র উঠিল। ধরাধাম হাসিল; কিন্তু আমার মনের অন্ধকার দূর হইল না। অন্য কয়েক দিন অপেক্ষা, অদ্য আমার মনের ভাব বড়ই খারাপ।

বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইল, আমি পথপানে চাহিয়া আছি, শেঠজীর রসদ কখন্ আসে। আমার জন্য গত কল্য শেঠজী এবং তাঁহার অনুচরবর্গ, আহার করিতে পান নাই,—ইহাকি কম ক্ষোভের কথা? বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইল, তখনও শেঠজীর রসদ আসিল না। আমি আই ঢাই ছটফট করিতে লাগিলাম। সহর হইতে ভাতৃগৃহে আহার করাইয়া আনিবার জন্য, এখনও অশ্বারোহী প্রহরীও আসিয়া পঁহুছিল না। যদি অশ্বারোহিগণও আসিত তাহা হইলে দাদার গৃহ হইতে, লুকাইয়া শেঠজীর জন্য ঘি আটা আনিতাম। কিন্তু অদ্য "কা কস্য পরিদেবনা।" হয় কি? করি কি? আর যে তিষ্ঠিতে পারি না! হয় আমাকে কেহ মারিয়া ফেলুক, না হয় আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুক। শেঠজী যে মৃত ব্যক্তির ন্যায় চাদর খানি গায়ে দিয়া, ভয়ে এবং অন্নাভাবে খাটের উপর নীরবে শুইয়া থাকিবেন, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। মহম্মদ সফির কি এই কাজ? তাঁহার সহিত আমার এতদিনের বন্ধুত্ব,—এতদিনের ভালবাসা; কিন্তু বিপদের সময় দেখিতেছি, তিনিও বিমুখ হইলেন। তিনি যদি সত্য সত্যই আমাদের অনুকূল থাকিতেন, তাহা হইলে কি এতক্ষণ রসদ আসিয়া পঁহুছিত না? অথবা আমার জন্য অশ্বারোহী প্রহরী আসিত না? অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে; আর এখানে থাকিব না,—পলাইব। এখানে থাকিলে মরণ নিশ্চয়। পলাইলে বরঞ্চ প্রাণ বাঁচিতে পারে।

এতদিন কোন্ কালে আমি পলাইতাম, কিন্তু কাশীর জন্য আমি পলাইতে পারি নাই। কাশী ছেলে মানুষ, দৌড়িতে ও প্রাচীর ডিঙ্গাইতে অক্ষম। দ্রুতপদে পথ চলিতে, বা অনাহারে থাকিতে অক্ষম। কাশীর এখনও ভূতের ভয় আছে। ক্ষুধা পাইলে এখনও তাহার কাঁদিয়া-

ফেলা আছে। এ-কাশীকে লইয়া আমি পলাই কি করিয়া?

ভাবিতে ভাবিতে বেলা ১টা হইল। একবার স্থির করিলাম, কাশীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করি, "ভাই তুমি পলাইতে পারিবে কি না?" না,—পলায়নের কথা হঠাৎ কাহাকেও বলা হইবে না। হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গাও যা, আর কাশীকে কোন গোপনীয় কথা বলাও তা,—কাশীর পেটে একটুও কথা থাকে না।

বেলা যখন ১॥০টা, তখন দেখিলাম, অদূরে রসদ আসিতেছে, এবং আমার জন্য অশ্বারোহী-প্রহরী আসিতেছে। অনন্ত দুঃখরাশির উপর, ঈষৎ আনন্দের আবির্ভাব হইল। উহারা সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, আমি দফাদারকে জিজ্ঞাসিলাম,—"দফাদার সাহেব! এত বিলম্ব কেন? খাইতে না পাইয়া আমরা যে মারা পড়িলাম।"

দফাদার হাসিয়া উত্তর দিল,—"বাবু-সাহেব! অদ্য যে আসিতে পারিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিবেন। মহম্মদসফির আমার প্রতি হুকুম ছিল, প্রাতে আসিয়াই, আপনাকে সহরে লইয়া যাওয়া। অদ্য প্রাতে আপনাকে লইতে আসিতেছি, এমন সময় বখ্‌ত খাঁর হুকুম হইল,—"পিলিভিত যাইবার পথে পাহারা দেওয়া।" আমি বলিলাম,—বাবু দুর্গাদাসকে আমি আনিতে যাইতেছি। বখ্‌ত খাঁ উত্তর দিলেন,—"দুর্গাদাসকে আনিবার আমি দোসরা বন্দোবস্ত করিতেছি।" আমি হুকুমের দাস, কাজেই বখ্‌ত খাঁর হুকুমে পিলিভিতের পথে পাহারা দিতে গিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে, কিছু পূর্ব্বে মহম্মদসফির সহিত আমার তথায় সাক্ষাৎ হয়, তিনি আমাকে এ কার্য্য করিতে দেখিয়াই ক্রোধান্বিত হইলেন। বলিলেন,—"তুমি দুর্গাদাস বাবুকে সহরে না লইয়া গিয়া কাহার হুকুমে এখানে পাহারা দিতে আসিয়াছ?" আমি বখ্‌ত খাঁর নাম করিলাম, তখন মহম্মদ সফি নীরব হইলেন অন্য কয়েকজন অশ্বারোহীকে পিলিভিতের পথে পাহারা রাখিয়া, আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তাই আসিতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে।

আমি বেণিয়া-মুদীর চাকরকে জিজ্ঞাসিলাম,—"বাপু! রসদ আনিতে তোমাদের এত দেরি হইল কেন? দেখিতেছ না, চারি জন লোকের প্রাণ তোমার রসদ যোগাইবার উপর নির্ভর করিতেছে? চাকর উত্তর দিল,—"আমি কি করিব বাবু? যেমন মিলিয়াছে তেমন লইয়া আসিয়াছি। তবু আপনাদের এ রসদ সকালে-সকালে আনিয়াছি, এখনও অনেকের রসদ যোগাইতে হইবে; সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ কার্য্য চলিবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি শেঠজীকে ডাকিলাম। বলিলাম,—"আজ আর আমি থাকিতেছি না;—আপনার আহারের পর আসিব। আপনি যত শীঘ্র পারেন, আহারাদি করুন।

শেঠজী হাসিলেন। আমি এবং কাশীপ্রসাদ অশ্বারোহিদলে পরিবৃত হইয়া বেগে অশ্ব চালনা করিলাম। বেলা তৃতীয় প্রহর দাদার গৃহে গিয়া আহার করিলাম। বেলা চারিটার পর প্রত্যাগমন-কালে, নর্ত্তকী পান্নাসুন্দরীর গৃহের নিকট দিয়া আসিলাম; কিন্তু পান্নার সহিত দেখা হইল না। আমি শুষ্কমুখে শেঠজীর নিকট ফিরিলাম।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

৫ই জুন শুক্রবার। বিদ্রোহের ষষ্ঠ দিন। আজ সকাল-সকাল রসদ আসিল, আমার অশ্বারোহী-প্রহরীও আসিল। বেলা ৯টার মধ্যে আমি যাত্রা করিলাম। প্রথমে পান্নার গৃহেই গেলাম। "পান্না পান্না" বলিয়া ডাকিলাম, দ্বারে ধাক্কা দিলাম; কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। অবশেষে পান্নার ভাই আসিয়া খিল খুলিয়া দিল। বলিল,—"বাবু-সাহেব! আপনি ডাকিতেছেন, আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই।

আমি। পান্নার সহিত আমি একবার দেখা করিব।

পান্নার-ভাই। আসুন, তবে উপরে আসুন।

আমি। আমার সময় খুব কম, পথে ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ অশ্বারোহণে আছে এবং সওয়ারগণ আছে।

ইত্যবসরে আমার স্বর-সংযোগে পান্নাসুন্দরী, আমার আগমন-বার্ত্তা বুঝিতে পারিয়া, স্বয়ং নীচে নামিয়া আসিল। বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে বলিল,—"অধিনীর গৃহে যদি আপনি পায়ের ধুলা দিয়াছেন, তবে একবার উপরে আসিয়া বসিলেই অধিনী কৃতার্থ হয়।"

আমি পান্নাকে ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলাম,—"বড়ই বিপদ-কাল উপস্থিত, সত্য সত্যই উপরে যাইয়া বসিবার আমার সময় নাই। তোমাকে

কোন বিশেষ কথা আমার বলিবার আছে, অন্যের অগোচরে গোপনে তাহা বলিব।"

পান্না যোড় হাতে কহিল,—"আপনি যা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হউক;—নিম্নের এই ছোট কুঠারীতে আসুন।

পান্না এবং আমি নিম্নতলস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র খাটে পান্না আমাকে বসাইয়া, যুক্ত-করে অবনত-মস্তকে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি কহিলাম,—"পান্না! বড় বিষম কথা!—তোমার প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইবার কথা। কিন্তু অন্য উপায় নাই বলিয়াই আমি তোমাকে এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। দেখিও কোন রকমে এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হইলেই সদ্য সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

পান্না। প্রাণের জন্য আমি ভয় করি না। প্রাণ থাকিতে গুপ্ত কথা কিছুতেই প্রকাশ হইবে না,—আপনি বলুন।

আমি। তবে কাণে কাণে শুন। কথা উচ্চারণ করিয়া বলিলে, কি জানি পাছে কেহ শুনিয়া ফেলে, তাই কাণে-কাণে বলিতেছি। শুন, ধীর হইয়া শুন;—বিচলিত হইও না।

আমি তখন পান্নার সুন্দর গোলাপী রঙ্গের আভাযুক্ত, কর্ণমূল প্রদেশে, আপনার কৃষ্ণবর্ণের মুখটী লইয়া গিয়া, অতি ধীরে ধীরে সন্তর্পণে সেই গূঢ় কথা বলিলাম।

কথাশ্রবণানন্তর পান্না কহিল,—"আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ জানিবেন। আমি এ কথা শুনিয়া ভীত বা বিচলিত হই নাই বরং আনন্দিতই হইয়াছি।

যাত্রা কালে পান্না আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, পান্নার চক্ষু হইতে মুক্তাফল-নিভ অশ্রুজল-বিন্দু টপ্ টপ্ পড়িতেছে।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"একি এ!—তুমি কাঁদিতেছ কেন?" প্রত্যুৎপন্ন-মতি পান্না উত্তর দিল,—"আমি কাঁদি নাই, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি।"

আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া অশ্বারোহণে আমরা দাদার গৃহে গমন করিলাম। যোড়শোপচারে আহার-কার্য্য সম্পন্ন হইল। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আবার অশ্বারোহণে শেঠজীর গৃহে উপনীত হইলাম।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

৬ই জুন তারিখে বেরেলীর সিপাহী-বিদ্রোহের সপ্তম দিবস। অদ্য আমার কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ নাই। ভ্রাতার সহিত কথা কহিতে ভাল লাগিতেছে না, শেঠজীর সহিত গল্প করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না; আমি একাকী নীরবে, আপন মনে, বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিতেছি। জড়-ভরতের ন্যায় গুম্ হইয়া, স্থাণুবৎ উপবিষ্ট আছি। আজ মৃদু মন্দ প্রভাত-সমীরণ সেবনে বিরক্তি বোধ হইতেছে, তাম্রকূট-ধূম-পানে বিরক্তি বোধ হইতেছে, পক্ষিকুলের কলরব-শ্রবণে বিরক্তি বোধ হইতেছে।

হৃদয় কেমন গুর্ গুর্ করিতেছে, শরীরে কাঁটা দিতেছে, কখন বা এক হাত অগ্রসর হইয়া, দশ হাত পশ্চাৎ গমন করিতেছি। কখন বা বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কে অস্থির হইয়া, অন্তরে "মা, মা," শব্দ উচ্চারণ করিতেছি। কখনও মনে হইতেছে,—কাশীপ্রসাদ কাছে আর নাই, দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদল তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—আমি একাকী প্রান্তরে পতিত হইয়া কেবল 'হায় হায়' করিতেছি।

কখন মনে মনে বলিতেছি,—"মাভৈঃ মাভৈঃ", "ভয় নাই, ভয় নাই",—হর্ষোদ্গমে মুখ-কমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। কখন বা যেন স্বর্গরাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এখানে হিংসা-দ্বেষ নাই, দ্বন্দ্ব-কলহ নাই, বন্ধন-হনন নাই,—যেন মূর্ত্তিমতী চির-শান্তি সদা বিরাজিত। কিন্তু এই সুখ-ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, এককালে সহস্ররূপ দুঃখের ভাব সমুত্থিত হইতে লাগিল। এক বিন্দু অমৃতের সঙ্গে রাশি রাশি মহাবিষ পাইতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল,—দুর্ব্বৃত্ত দানবদল ঐ আসিতেছে, ঐ ধরিল, ঐ গ্রাস করিল!

আর ভাবিতে পারি না। অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা হইবে,—অদ্য নিশাযোগে নিশ্চয় পলাইব। আর চিত্তকে চঞ্চল করিব না, পলায়নই স্থির। আর সুবিধা-অসুবিধা, লাভ অলাভ, মঙ্গল-অমঙ্গল—এ সকল বিষয় কিছুই ভাবিব না; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, অদ্য অবশ্যই পলাইব।

তবু কিন্তু মন মানিল না। "ভাবিব না" বলিলে ভাবনা কখন থামে না। মনোমধ্যে আবার পূর্ব্ববৎ ভাবনাবলীর সমাবেশ হইতে লাগিল। গত কল্য

রাত্রে এইরূপ ভাবিয়া-ভাবিয়া আমার ভাল নিদ্রা হয় নাই। যখন অল্প নিদ্রা-ভাব আসিয়াছে, তখন অমনি স্বপ্নে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। যখন জাগিয়াছিলাম, তখন তো অবশ্যই ভাবিয়াছি।

পলাইব,—তা এত ভাবনা হইতেছে কেন, কেহ বলিতে পারেন কি? দাঙ্গা, মারামারি, লাঠা-লাঠি, অস্ত্র-চালন ও সম্মুখ-সমর—ইহার মধ্যে কোন কার্য্যেই তো আমার কিঞ্চিন্মাত্র ভয় হয় নাই। ভয় হওয়া দূরে যাউক, বরং এইরূপ কার্য্যে আমার অধিকতর প্রীতি, অনুরক্তি, উল্লাস, উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। বাল্যকাল হইতেই সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেছি। প্রকৃত সেনা বা সেনা-নায়ক না হই,—সেনা ও সেনা-নায়কের সকল কার্য্যই শিখিয়াছি। অশ্বারোহণে, বন্দুক-পরিচালনে, বর্শা-উত্তোলনে, তরবারির খেলনে আমার সমকক্ষ-ব্যক্তি—তৎ-কালে সেই রেজিমেণ্ট মধ্যে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। সাহসও আমার অতুল ছিল পর্ব্বতীয় সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া, অশ্বারোহণে গিরিশৃঙ্গে উঠিতে আমার কিছুমাত্র ভয় হইত না। সাহেবদের সঙ্গে ব্যাঘ্র-শীকারে গমন করিয়া, আমি সর্ব্বজনের অগ্রণী হইয়া সর্ব্ব-সমক্ষে অবস্থিতি করিতাম। ভয় কাহাকে বলে, এভাব তখন আমার মনেই আসিত না। কিন্তু আজ পলাইব,—এই চিন্তা-তেই হৃদয়ে এত আতঙ্ক উপস্থিত হয় কেন? গা এত ঝিম্ ঝিম্ করে কেন? মাথা এরূপ ঘোরে কেন? মন এমন ধুকধুক্ করে কেন? আমার মনে হইতেছে,—পলাইবার অভিপ্রায়ে দ্বারদেশে যাইলে, সিপাহীরা আমায় ধরিয়া আনিবে এবং কালীকে কাটিয়া ফেলিবে। কখন বা মনে হই-তেছে,—মধ্য পথে সিপাহীরা আমাদিগকে বেষ্টন করিবে, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাকূপে নিক্ষেপ করিবে। কখন বা এমন মনে হইতে লাগিল,—যে স্থলে আশ্রয় লইয়া লুকাইয়া থাকিব স্থির করিয়াছি, সে স্থলে আশ্রয় পাইব না। সেই গৃহস্বামী হয় ত বলিবে, এখানে তোমাকে স্থান দিতে আমি অক্ষম, তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমি কি সবংশে নিধন হইব?' ফল কথা,—আমার খুব সাহসই থাকুক, যুদ্ধ-কৌশলে পার-দর্শিতাই থাকুক, আমার মনে কিন্তু পলায়ন-ব্যাপারে বিশেষ ভীতি সঞ্চার হইল।

বেলা ৯টা বাজিল। আমার নির্দ্দিষ্ট অশ্বারোহী-দল আসিল। আমরা দুই ভাই তাঁহাদের সঙ্গে আহারার্থ দাদার বাসায় গমন করিলাম। অন্য দিন দফাদারের সহিত যেরূপ হাসিয়া-হাসিয়া গাল-গল্প করি; অদ্য তাহা আর কিছুই করিলাম না। যেন কলে কাটের পুতুলের ন্যায় যাইতে লাগিলাম। হরগোবিন্দ দাদার সহিতও বিশেষ কোন বাক্যা-লাপ হইল না। তথা হইতে যাত্রাকালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"দুর্গাদাস! তোমার মুখ এত শুষ্ক কেন? কোন রকম অসুখ হইয়াছে নাকি?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ।"

দাদা। কি অসুখ?

আমি মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে আমৃতা-আমৃতা স্বরে বলিলাম,—"অসুখ এমন কিছু নয়, এই গা-হাত-পা কামড়াইতেছে।

দাদা। খুব সাবধানে থাকিও।

আমি একথার উত্তর না দিয়াই দ্রুতপদে আসিয়া ঘোড়ার উপর উঠিলাম। পথি-মধ্যে দফাদারকে জিজ্ঞাসিলাম,—আজকাল তোমাদের আহারাদি কেমন হইতেছে? নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপ-যুক্ত পরিমাণে ভাল আটা ঘৃত পাইতেছ তো?"

দফাদার হাসিল। বলিল,—"বাবু সাহেব! বন্দো-বস্ত কিছুরই নাই। আজকাল যে চুরী করিতে বেশী মজপুত, সেই ঘি আটা বেশী পাইতেছে। কেহ বা একবার স্থানে দুইবার করিয়া লইতেছে, কেহ বা একবারও পাইতেছে না। কাহার অদৃষ্টে একবারও মিলিতেছে না। এই গত কল্য আমার অদৃষ্টে কিছুই মিলে নাই, তার পর বেণিয়া-মুদিকে গিয়া বলিলাম,—তুমি যদি ঘি আটা না দাও, তাহা হইলে তোমার পেটে এক ছুরী চালাইব।' তখন ভয়ে-ভয়ে বেণিয়া-মুদি আমাকে ঘি আটা দিল।'

আমি। তোমরা কবে দিল্লী যাইতেছ?

দফাদার। বাবু সাহেব! সত্য বলিতে কি, সে সকল সংবাদ আমি কিছুই রাখি না।

আমি। তোমাদের দলে রোজ রোজ লোক বৃদ্ধি হইতেছে তো? শুনিয়াছি, দশ হাজার সৈন্য পূর্ণ হইলে, বখ্‌ত খাঁ দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

দফাদার। এক পক্ষে লোক যেমন বৃদ্ধি হই-তেছে, অন্য পক্ষে লোক তেমনি কমিতেছে। অনেক সিপাহী এবং সওয়ার কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশে চলিয়া যাইতেছে। শুনিতে পাই, পথে বা গ্রামে গিয়া তাহারা লুটপাট করি-

তেছে। এদিকে সহরের এবং নিকটস্থ পল্লীগ্রামের যত বদমাইস্ লোক, যত ভিখারী-জাতীয় লোক, বখ্‌ত খাঁর দলে আসিয়া মিশিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য,—রসদ চুরী করা, ঘোড়া চুরী করা, তাঁবু চুরী করা। সুবিধা পাইলে, তাহারা টাকাও চুরী করিয়া থাকে। সেদিন খাজনাখানায় সিঁধ হইয়াছিল; কিন্তু টাকা তো গুণা নাই, রাশি-রাশি বাক্স-বাক্স পর্ব্বতপ্রমাণ টাকা পড়িয়া আছে; কাজেই কত টাকা চুরী হইল, তাহার ঠিক হইল না। আসল চোর ধরা পড়ে নাই, কতকগুলি নিরপরাধ লোককে বখ্‌ত খাঁ কয়েদ করিয়াছেন এবং কতকগুলিকে বেত্রাঘাত দণ্ড দিয়াছেন। সেনানিবাস বড়ই ভীষণ স্থান হইয়া উঠিয়াছে। গত পরশ্ব একজন তায়ফাওয়ালী নর্ত্তকীর জন্য ১০।১২ জন সিপাহী, আপনা-আপনি খুনা-খুনি করিয়া মরিয়াছে। বাবুজি! পাপস্থানে আর থাকিতে নাই।

আমি। তবে তুমিও কি দেশে চলিয়া যাইতেছ?

দফাদার। হাঁ বাবুজি! আমি অদ্য রাত্রেই দেশে যাইব। কিন্তু ইহা বড় গোপনীয় কথা; দেখিবেন, যেন কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

আমি জিহ্বা কাটিয়া বলিলাম,—"তাহাও কি কখন সম্ভব?

দফাদার। আপনি আমার অনিষ্ট করিবেন না জানি বলিয়াই, আপনাকে একথা বলিয়াছি। এ গোপনীয় কথা পলাইবার পূর্ব্বে প্রকাশ হইলে, আমার প্রাণ-দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়াই আমি নীরব হইলাম। আবার কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দফাদারের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলাম। অবিলম্বে শেঠজীর নিকট উপস্থিত হইলাম।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনে যখন অমঙ্গলের কথা সদাই উদিত হইতেছে, তখন অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক। পলায়নে নিশ্চয়ই বিঘ্ন-বাধা বিপত্তি ঘটিবে। কিন্তু পলায়নই স্থির।

আটঘাট বাঁধিতে আরম্ভ করিলাম। একটী একখানি তরবারী এবং একটা মোটা লাঠির অনুসন্ধানে রহিলাম। পথে ৫।৭ জন সিপাহী যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে কিছুতেই ধরা দিব না। হয় লগুড়াঘাতে, না হয় তরবারীর আঘাতে অথবা পিস্তল দ্বারা,—যেরূপ সুবিধা বুঝিব, সেইরূপই আত্মরক্ষার্থ এবং শত্রু-বিনাশার্থ চেষ্টা করিব। মনে মনে অহঙ্কার ছিল,—অন্তত ৮ জন সিপাহীকে আমি একা ভাগাইতে পারিব। সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, আমি ঐরূপ অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইলাম। সকলেই জানেন, আমার নিকট কোনরূপ অস্ত্র ছিল না। শেঠজীর ঘর খুঁজিয়া একটী মোটা লাঠী পাইলাম। সে লাঠীর দ্বারা মানুষ-মারাও চলে, বেড়ানও চলে। তরবারী কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। দেখিলাম,—দেওয়ালে একজাল কিরীচ টাঙ্গান আছে। গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, শেঠজীর ভাল পিস্তল আছে, কিন্তু তাহা সিন্ধুকের ভিতর চাবি বন্ধ। কিসে সেই পিস্তল আমার হস্তগত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অস্ত্র শস্ত্র এরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে যে, শেঠজী যেন কিছুই না জানিতে পারেন, এবং ভ্রাতাও প্রথমে সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকে। কারণ, ভায়া একটী ঢাক;—ঢাকে কাটি দিলে কাহারও অগোচর থাকে না।

বেলা দ্বিতীয়প্রহর অতীত হইল। শেঠজীর আহারাদি কার্য্য শেষ হইল। আমি শেঠজীর সহিত 'ভাব' করিবার জন্য তামাক খাইতে-খাইতে, নানারূপ প্রীতিকর মুখরোচক কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম। একথা-সেকথা, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের কথা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা,—কত কথাই পাড়িলাম; দেখিলাম, শেঠজীর মন কিছুতেই ভিজিল না, কিছুতেই মনের একাগ্রতা জন্মিল না। অবশেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া, সুদের কথা পাড়িলাম, সুদে সহজেই শেঠজীর মন খুসী হইল। সুদ, সুদের সুদ, তস্য সুদ, সিকি পয়সা পর্য্যন্ত সুদ ত্যাগ করিতে নাই, এককড়া কড়ি সুদও ত্যাগ করিলে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হয় না,—লক্ষ্মীশ্রী থাকেনা;—এইরূপ কথা কহিতে কহিতে শেঠজীর মন ক্রমশ আর্দ্র হইয়া আসিল! ক্রমশ গলিয়া দ্রব হইল! যেন অমল ধবল-কাঁচা-পারার ন্যায় ঢল-ঢল করিতে লাগিল!

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি প্রস্তাব করিলাম,

—'শেঠজী! নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া তো আর থাকা যায় না। সমস্ত দিন বসিয়া-বসিয়া হাতে-পায়ে যেন বাত ধরিয়া যাইতেছে। আপন সুদের হিসাবের কাগজ-পত্র যদি বাহিরে থাকত, তাহা হইলে দুইজনে বসিয়া সুদই কষিতাম। কিন্তু সে সকল হিসাবের কাগজ পত্র সিপাহীগণ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া চাবি লাগাইয়া গিয়াছে। যদি আপনার পিস্তলটীও লোহার সিন্দুকের ভিতরে না রাখিত, তাহা হইলে বৈকালে ২।১টা পাখীই শীকার করিতাম।"

শেঠজী। পিস্তল তো উহারা লোহার সিন্দুকে রাখিয়া যায় নাই, পিস্তলটী আমার ঐ কাঠের সিন্দুকে আছে। তাহার চাবি আমার গোমস্তার নিকট। কিন্তু কথা হইতেছে এই, প্রহরীগণ আমাদিগকে পিস্তল ছুড়িয়া পাখী শীকার করিতে দিবে কেন? আমরা হইলাম বন্দী, বন্দীর হাতে পিস্তল দেখিলেই বখ্‌ত খাঁ কাড়িয়া লইয়া যাইবে।

আমি। সেজন্য কোন চিন্তা নাই, আমি মহম্মদ সফির অনুমতি লইয়া পাখী শীকার করিব। তাঁহার আমার উপর যথেষ্ট স্নেহ-ভক্তি আছে। নির্দ্দোষ আমোদ করিতে তিনি কখনই আমাদিগকে বাধা দিবেন না।

শেঠজী। (হাসিয়া) আপনি জানেন, আমাদের শাস্ত্রানুসারে জীবহিংসা মহাপাপ। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার পিস্তল দ্বারা পক্ষিকুলের ধ্বংস-সাধন করিয়া কাজ নাই।

আমি বেগতিক বুঝিয়া শেঠজীর রায়ে রায় দিয়া বলিলাম,—আপনার কথাই ঠিক্। বৃথা পাখী মারা উচিত নয়। পাখী-শীকারের কথা বলাই আমার ভুল হইয়াছিল। আত্মরক্ষার্থই গুলি চালান চাই।

শেঠজী। সিংহ,ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সম্মুখে আক্রমণোদ্যত,—ইহা দেখিলে গুলি চালাইতে হয়, কিন্তু পাখী তো আর গ্রাস করিতে আসিতেছে না যে, অনর্থক গুলি চালাইয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে?

আমি। ঠিক কথা।

শেঠজী। আর, পিস্তলটী এমন চমৎকার যে, এক গুলিতেই, বাঘ মরিতে পারে। আমার বোধ হয়, এই পিস্তলের গুলির একটুকু আঁচ লাগিলেই পাখী মরিয়া যাইবে।

আমি। অতি চমৎকার পিস্তল তো! কত টাকা দিয়া খরিদ করিয়াছিলেন?

শেঠজী। আড়াই শত টাকা। ছয়নলা পিস্তল। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ কারিকর দ্বারা ইহা নির্ম্মিত।

আমি। কারিকরের কি নাম?

শেঠজী। নামটী আমার মনে নাই,—পিস্তলের গায়ে ইংরেজিতে সে নাম লেখা আছে।

আমি। আপনার গোমস্তাকে একবার পিস্তলটী বাহির করিতে বলুন,—দেখি কার নাম লেখা। আমি অনেক রকম পিস্তল দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ আড়াই শত টাকা মূল্যের পিস্তল কখনও দেখি নাই;—অতি চমৎকার জিনিস হইবে,—দর্শনীয় জিনিস বটে!

শেঠজী আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। গোমস্তাকে পিস্তলটী আনিতে তৎক্ষণাৎ অনুমতি করিলেন। পিস্তল সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল, আমার মন প্রফুল্ল হইল। পিস্তলটীকে আর সিন্দুকের ভিতর ঢুকিতে দিব না; যে কোন গতিকে হউক বাহিরে রাখিব, অথবা আমার আয়ত্তাধীনে রাখিব,—ইহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। পিস্তলটী দেখিয়া আমি তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলাম। বলিলাম, এরূপ পিস্তলের পাঁচ শত টাকা মূল্য হইলেও অধিক হয় না। সুদপ্রিয় শেঠজী এ কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আমি পিস্তলটীকে খুলিলাম, মাজিলাম, ঘসিলাম। জিজ্ঞাসিলাম,—"টোটা বারুদ কোথায়?"

শেঠজী বলিলেন,—"সমস্তই ঐ সিন্দুকের ভিতর একটী ছোট বাক্সে আছে।"

আমি। থাক্, থাক্,—সিন্দুকেই থাক্।

এইরূপ দেখিয়া-শুনিয়া গোমস্তার নিকট হইতে সিন্দুকের চাবি লইয়া, আমি স্বয়ং পিস্তলটীকে সিন্দুকে রাখিতে গেলাম। সিন্দুকে রাখিবার সময় টোটা-বারুদের বাক্সটী খুলিয়া দেখিলাম, দেখিয়া আবার তদবস্থায় তাহাকে স্থাপন করিলাম। পিস্তলটী সিন্দুকে রক্ষিত হইল। সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিলাম। বাহিরে চাবি আনিয়া শেঠজীর সাক্ষাতে গোমস্তাকে দিলাম।

বেলা তখন প্রায় ৫টা। ঠিক করিলাম, অদ্য রাত্রি আড়াই প্রহরে বা তৃতীয় প্রহরে অথবা প্রভাত হইবার একটু পূর্ব্বেই আমি ভ্রাতার সহিত এ স্থান হইতে পলায়ন করিব। ভ্রাতাকে

রাত্রি ১০টার পর এই সংবাদ দিব, এখন এ কথা বলিয়া কোন লাভ নাই।

বলা উচিত—শেঠজীর সিন্দুক-স্থিত ক্ষুদ্র আগ্নেয় যন্ত্রটী, পিস্তল নহে,—ইহাকে 'রিভলবার' কহে। পিস্তল্ এবং রিভলবার দুইটী স্বতন্ত্র সামগ্রী।

আরও একটী কথা বলিয়া রাখি,—যে সিন্দুকে পিস্তলটী রাখিলাম সে সিন্দুকের ডালাটী ফেলিলাম বটে, কিন্তু চাবি বন্ধ করিলাম না। এমন কৌশলে এ কাজ করিয়াছিলাম যে, শেঠজী বা গোমস্তার মনে কিছুমাত্র আমার প্রতি সন্দেহ জন্মে নাই।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য অস্তমিত-প্রায়। কিন্তু কোন কোন বৃক্ষের অগ্রভাগে এখনও একটু-আধটু রৌদ্র আছে। আমি অস্থির হইয়া উঠানে পায়চালি করিতেছি। যত বেলা যাইতেছে, ততই আমার মন উচাটন হইতেছে।

এক মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ভাবিলাম,—আবার "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে" শব্দ উত্থিত হইয়াছে নাকি? কাণ পাতিয়া শুনিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দ্বারদেশে প্রহরী-বৃন্দের নিকট গেলাম। দেখিলাম,—তাহারাও অনিমিষ-লোচনে এবং উৎকর্ণে সে ব্যাপার দেখিতেছে এবং শুনিতেছে। আমি তাহাদের প্রধান ব্যক্তিকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলাম,—"ভাই! এ কিসের গোলযোগ বলিতে পার?"

প্রহরী। না—জানিনা, আবার কি ফসাদ হইয়াছে।

আমি। আপনার উচিত, এখনি একজন সওয়ার পাঠাইয়া এ সংবাদ জানা। আমরা অবশ্যই পলাইতেছি না। আর, একজন সওয়ার এ স্থান হইতে গেলে, আমরা যে, পলায়নে সক্ষম হইব, তাহাও নহে।

প্রহরী। আপনাকে ত আমি জানি,—আপনি অতি ভদ্র ব্যক্তি। আপনি কখনই পলাইবেন না। আর পলাইয়াই বা যাইবেন কোথা? তবে কথা এই,—বখ্ত খাঁ যদি জানিতে পারেন, আমাদের কেহ অন্যত্র গিয়াছে, তা হইলে মুস্কিল বাধাইবেন।

আমি। এস্থান হইতে ১০ মিনিটের জন্য একজন সওয়ার চলিয়া গেলে, বখ্ত খাঁর জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

প্রধান-প্রহরীর ইঙ্গিতমাত্র একজন সওয়ার সেনা-নিবাসের দিকে ছুটিল।

ক্রমশই গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রহরী-বৃন্দ ক্রমশই দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল। আমি সেই উচ্চ মাটীর ঢিপির উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, প্রায় ৩০।৪০টী হস্তী; অসংখ্য অশ্বারোহী; পদাতিকও অসংখ্য। ভাবিলাম,—আবার নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ সসৈন্যে বখত খাঁর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন নাকি? তাই বটে। তখন আমি প্রধান-প্রহরীকে বলিলাম,—"সহর হইতে নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ আবার আসিতেছেন। সৈন্যাধ্যক্ষ বখ্ত খাঁর সহিত দেখা করাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য।

প্রধান-প্রহরীর হৃদয়ে সম্ভবত তখন গৌরাঙ্গের বিভীষণ-মূর্ত্তি জাগিতেছিল। সে কহিল,—"না, বাবু সাহেব! আমার বোধ হয়, গোরালোগ আসিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে সেই সওয়ার প্রত্যাগত হইয়া বলিল,—"খাঁ বাহাদুর খাঁ তাঁহার রাজ্যের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমভিব্যাহারে বখ্ত খাঁর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। শুনিলাম,—সৈন্যদলমধ্যে বিতরণের জন্য তিনি নগদ বিশ হাজার টাকা এবং এক হাজার সোণার বালা লইয়া আসিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রায় দশ বার জন প্রহরী অমনি সেনা-নিবাসের দিকে ছুটিল। বালা বা টাকা পাইবার লোভে তাহারা অস্ত্র পশ্চাৎ পানে ফিরিয়া চাহিল না। প্রধান-প্রহরী তাহাদিগকে দুই একবার ক্ষীণকণ্ঠে "ফের ফের" বলিয়া ডাকিল;—কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিল না। অবশেষে প্রধান-প্রহরী স্বয়ং সুবর্ণ-বলয়-লাভ-লালসায় অবশিষ্ট সওয়ারগণকে সঙ্গে লইয়া দৌড়িল যাত্রাকালে আমাকে বলিল,—"বাবুজ! আপনি একবার ঘরের ভিতর যান,—আমরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।"

আমি ভাবিলাম,—আর কোন্ সময়?—এই বার পলাইব।" ঘরে ঢুকিয়াই দ্বারদেশে ভ্রাতা কালীপ্রসাদকে দেখিয়া বলিলাম,—"ভাই! ভীত হইও না,—চল আমার সঙ্গে। এইবার পলাইতে হইবে। এস্থানে থাকা হইবে না। আমি বিশেষ

কিন্তু তখনও সুন্দরীর সজ্জা শেষ হইল না। কাজেই তিনি অনুপমাকে আহ্বান করিবার জন্য যে, আমার সঙ্গে ষ্টেশনে যাইতে সমর্থা হইবেন, সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। আমি বাহির হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে একখানা পাল্কী গাড়ী নিয়ে কি আমি ষ্টেশনে যাব?"

গৃহিণী "টয়েলেট টেবিলের" উপর হইতেই উত্তর করিলেন,—"না—না—না; তা ক'রো না; পাল্কী গাড়ী নিয়ে যেয়ো না; ডাক্তার বাবুর "ট্যানৃডম" খানা চেয়ে নিয়ে যাও।"

"তবে তোমার যাওয়া হোচ্ছে না" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"না, আমার এখনও অনেক বাকি, এত তাড়াতাড়ি কোল্লুম তবুও হয়ে উঠ্লো না। * * কোম্পানি এবার যে, পিন্ গুলো পাঠিয়ে দিয়েছে, নেহাত জঘন্য।" লক্ষ্মী এই কথা বলিয়া "সোপ" ও 'সেকরা' সম্বন্ধেও কঠিন সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'বশংবদ' ভাবে বসিয়া সে সব শোনার আর আমার অবকাশ হইল না। আমি "টমটম" লইয়া ষ্টেশনে ছুটিলাম।

আমি ষ্টেশন "প্ল্যাটফরমে" পৌছিতেই ট্রেন আসিয়া পড়িল।

কুমারী অনুপমা বটব্যালকে আমি যদিও আর কখনও দেখি নাই, কিন্তু তাঁহাকে চিনিয়া লইতে আমার এক বিন্দুও দেরি হইল না। অথবা আমি এমনও বলিতে পারি যে, তিনিই আমাকে অগ্রে চিনিয়া ফেলিলেন।

একটী আঠার বা উনিশ বৎসর বয়স্কা বালিকা অথবা যুবতী (স্ব স্ব রুচি অনুসারে আপনারা যাহা ইচ্ছা বুঝিতে পারেন)।—গড়নটী একহারা,—"থ্যাটে থ্যাটে", কিছু খর্ব্বাকৃতও বটে; মুখের ভাবও কৃশ, কিন্তু কোমল; চক্ষু দুটী দিব্য জ্যোতিষ্মান ও ভাবময়। বদন ও নয়নমণ্ডল বিলক্ষণ বুদ্ধিশক্তি-ব্যঞ্জক,—কল্পনা ও অধ্যয়ন-প্রিয়তা-ব্যঞ্জক; কিন্তু অন্যমনস্ক, যেন পূর্ব্ব-চিন্তাপরায়ণ। ইনি,—এই মূর্ত্তিই আমাদের উপস্থিতা বন্ধু 'কুমারী অনুপমা বটব্যাল।' ইহাঁকে আপনি প্রথম দৃষ্টিতে দেখিয়া বরং বালিকা বলিয়া মনে করিবেন;—অন্ততঃ যতটা বালিকা বলিয়া বিবেচনা করিবেন ততটা যুবতী বলিয়া "ঠাওর" করিতে পারিবেন না তাঁর চেহারার ভাব তেমন তর রকমেরই নয়,—তা তাঁর বয়স যতই হউক না! অনুপমা-বালা মুখখানি দেখিয়া, তাঁহার বর্ণ গৌর বলিয়াই আমি বিবেচনা এবং বিশ্বাস করিয়াছিলাম। কিন্তু খুব নিষ্ঠাযুক্ত সত্য বলিতে হইলে আমার বলা উচিত যে, সেই সান্ধ্য মুহূর্ত্তে ও "ষ্টেশন-বাতির" জ্যোতিতে আমি অনুপমার অঙ্গের আসল বর্ণ, তৎকালে আদৌ আবিষ্কার করিতে পারি নাই, কারণ প্রথমতঃ উপযুক্ত আলোকাভাব; দ্বিতীয়ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিশেষরূপে বসনাবৃত ছিল।

বাঙ্গালিনী-ফ্যাসনের বিবি-আনা-পোষাক পরিহিতা—মিস্ বটব্যাল;—এ কথা অবশ্য না বলিলেও চলে। কিন্তু কেবল এ কথা বলিলে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সব কথা ঠিক বলা হয় না। মিস্ বটব্যালের আধুনিক ফ্যাসনের পোষাকের উপর খাকি-রঙ্গের একখানি সুদীর্ঘ "ওড়না" এমনতর ভাবে ও কৌশলে বিন্যস্ত,—যাহাতে করিয়া পরিচ্ছদ-ধারিণীকে বেশ একটু অভুতপূর্ব্ব বা *eccentric* রকম দেখাইতেছিল। পৌরাণিক-সময়ে ঋষিকন্যাদিগের যে প্রকার বেশ বর্ণিত,—কতকটা যেন সেই রকমের ভাব অনুপমার পরিচ্ছদে পরিলক্ষিত হইতেছিল।

অগ্রেই অনুপমা আমাকে সম্বোধন করিলেন,—"আপনি মিঃ মোকার্জ্জী,—ইহা নিশ্চিত।"

আমি মনে করিয়া গিয়াছিলাম এবং মনে করিতেছিলাম, অনুপমা ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা কহিবেন; কিন্তু অনুপমা আমাকে সম্বোধন করিলেন,—সংস্কৃতে। আমি বিস্মিত হইলাম,—কিঞ্চিৎ 'বোকাত্ব' প্রাপ্তও হইলাম। রহস্যটা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক অভ্যাগতাকে উপযুক্ত আহ্বান করিয়া গাড়ীতে উঠাইলাম এবং গাড়ী হাঁকাইয়া দিলাম।

বাল্যকালে আমি সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সংস্কৃত-ভাষায় কথাবার্ত্তা চালাইতে আমি পারগ নহি, আর সেজন্য উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি প্রস্তুতও ছিলাম না। অতএব লজ্জাকর হইলেও বলা উচিত যে, আবশ্যক স্থলে অনুপমার সংস্কৃত প্রশ্নের উত্তর আমি গৌড়ীয় বঙ্গ ভাষাতেই দিতেছিলাম। অনুপমা মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে অনর্গল অনেক কথাই কহিতে ছিলেন; সে সব কথার প্রায় সমস্তই কিন্তু আমার তখন প্রলাপ বলিয়া মনে হইতেছিল, আর বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হইতেছিল।

গাড়ী সতেজে চালাইয়া দিয়াছি। কিয়দ্দূরে যাইয়া অনুপমা জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার প্রিয়-বন্ধু অনসূয়া কেমন আছেন? তাঁহার সহিত আপনার পরিণয়ের পর তাঁহাকে আমি আজ কত দিন হইল দেখি নাই!! আহা! কোথায় আমাদের সেই পবিত্র প্রমোদময় সময়, সেই সুখের সাহচর্য্য! আহা কোথায় সেই পুণ্যভূমি বিদ্যালয়ের তপোবন এখন! বলুন,—আমার প্রাণের সঙ্গিনী কেমন আছেন? "হলা রমণীয়ো কৃখ্ কালো ইমস্‌স পাদব-মিহুণস্‌স রদিঅরো সমুত্তো জেণ ণবকুসুমজোব্বণা ণোমালিয়া অঅংপি বহুফলদাএ উঅভোঅকৃখমো সহআরো।" এই প্রশ্নে ও মন্তব্যে আমার বিস্ময় আরও বত্রিশ যোজন উর্দ্ধে উঠিল। কারণ প্রথমত, আমার পরিবারের নাম—"আভা"—"অনসূয়া" নহে; দ্বিতীয়ত অনুপমা এই সব 'হিজি-বিজি' মন্ত্রগুলাই বা কি পড়েন? আমার বিস্ময় "বয়েলিং পয়েণ্ট"ও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি করি, শিষ্টাচারের খাতিরে যথাসম্ভব মনোভাব আবৃত করিয়া অর্দ্ধ-স্বরে আস্তে আস্তে উত্তর করিলাম,—তিনি "ভাল আছেন"। কিন্তু অন্তঃকরণে অতি ভয়ানক ভাবনা উপস্থিত হইল। ভাবিতে লাগিলাম,—"এ কি প্রমাদ করিয়া বসিলাম! কি মহাভ্রমে পড়িয়া, কাহাকে লইতে কাহাকে লইয়া যাইতেছি। এখনি পরস্ত্রী-অপহরণ অপরাধে ধৃত হইব নাকি?" দুশ্চিন্তার অবধি নাই। অশ্বপৃষ্ঠে সজোরে চাবুক কসিলাম। অনুপমা কহিলেন,—"এতাধিক ব্যস্ততার প্রয়োজন কি?" তাঁহার কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই আমি অশ্বপৃষ্ঠে আর এক চাবুক প্রয়োগ করিলাম। অনুপমাকে বলিলাম,—"আমাদের বিলম্বে গৃহিণী পাছে উতলা হন, এইজন্য এত বেগে যাইতেছি।

গাড়ী যাইয়া বাসায় পৌঁছিল। গৃহিণী গৃহের বাহিরে আসিয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাদের গাড়ীর শব্দ পাইয়া তিনি শশব্যস্তে বারেন্দা হইতে নামিয়া আসিলেন এবং অপরিসীম আদরের সহিত অনুপমাকে নামাইয়া লইলেন।

অনুপমায় এবং আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীতে তাঁহাদের সজাতীয় স্বভাব ও প্রথা অনুসারে অনেক 'কোলাকোলি' 'কান্দাকান্দি' ও 'চুম্বনাচুম্বনি' চলিতে লাগিল। আমি দেখিয়া নিস্তার পাইলাম। পরস্ত্রী-অপহরণের আশঙ্কা তখন আমার প্রাণ হইতে দূর হইল।

আমি এখন ইহাঁদিগকে অর্থাৎ আমার অর্দ্ধাঙ্গিনাকে ও আমাদের অভ্যাগতকে অসঙ্কুচিতভাবে ও একাধিপত্যের সহিত আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য আসরে রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামার্থে উদ্যোগী হইলাম। এত দুশ্চিন্তা, মানসিক অশান্তি ও গোলমালের পর গুড়ুকই অবশ্য শান্তিপ্রদ,—সর্ব্বশ্রান্তি-অপহারক;—আমি তাহাকে স্মরণ করিলাম।

গুড়ুক-সেবন পক্ষে আমার কিন্তু অত্যুন্নত এক অন্তরায় বিদ্যমান। গৃহিণী গুরুমহাশয়বৎ গুড়ুক সেবনে আমায় বিরত করিবার জন্য সদা প্রয়াস পাইয়া থাকেন। গুরুমহাশয়-রূপিণী ব্রাহ্মণী যদিও গুড়ুক-পানাপরাধে কোনও দিন আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করেন নাই, কিন্তু তজ্জনিত পাপ প্রযুক্ত আমি আমাদের শুভ পাণিগ্রহণের পর এই ছয় মাসের মধ্যে শত বারেরও অধিক তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছি। তবুও কিন্তু কু-অভ্যাস বশত ধূমপান পরিত্যাগ করিতে পারগ হই নাই। আমার 'ত্রৈস্কুলিক' জীবনে আমাদের এক পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন; তিনি 'টীপনের' ছুটীর পর ছাত্রগণ স্ব স্ব শ্রেণীতে সমবেত হইলে, একে একে প্রতি ছাত্রের মুখাঘ্রাণ করিতেন। ইহা কাল্পনিক কথা নহে,—যথার্থ কথা। পণ্ডিত-মহাশয়, যাহার মুখে গুড়ুকের গন্ধ অনুভব করিতেন, তাহারই পৃষ্ঠে ভীমগর্জ্জনে গদাঘাত করিতেন। আমি ঠিক জানি, শতকরা ৯৯ জন ছাত্র সেই 'গদাপর্ব্বের' অন্তর্গত ছিলেন। আমিও অবশ্য ছিলাম। তখন ভাবিতাম,—বিদ্যালয়ের এ বিড়ম্বনা বিবাহের পর ঘুচিবে!—কিন্তু হায়! গুড়ুক সম্বন্ধে আমার বিবাহিত জীবন বিদ্যালয়-বাসেরই তুল্য হইয়াছে। আমি অনুমান করি, সেই পণ্ডিত-মহাশয় মৃত্যুর পর পত্নীরূপে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন। পণ্ডিত ঠাকুর বলিতেন,—"তাম্রকূট-সেবনে স্মৃতি শক্তি লোপ হয়।" পত্নী মহাশয় মতে "ও! অত্যন্ত নোংরা ব্যাপার।" তবে "সিগারেটে" তিনি সম্মতা হইতে পারেন, কিন্তু সেটাতে আদপে অভ্যাস নাই।

গৃহদেবীর শয়ন-কক্ষের ত কথাই নাই, তাঁহার সম্মুখে ত্রিসীমার মধ্যে গুড়ুক-সেবন নিষিদ্ধ।

আমি উপরোক্ত কুকর্ম্ম করিবার জন্য বহিঃ-প্রাঙ্গণের কক্ষান্তরে যাইতে উন্মুখ হইয়াছি, এমন সময়ে শুনিলাম,—অনুপমা আমার উত্তমার্দ্ধকে কহিলেন,—

"হলা সহি অনসূএ অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদহ্মি সিঢ়িলেহি দাব ণং।"

মদীয় অৰ্দ্ধাঙ্গিনী আনন্দে গদ্গদ হইয়া উত্তরিলেন,—"হলা পিঅতমে,—আমি প্রিয়ংবদার হইয়াই তোকে জবাবটা দিতে চাচ্ছিলুম যে, 'এত্থ পওহর-বিত্থারহেতুঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ।' "কিন্তু হায় হায়! তা, হলো না। তুই যেমনটী ছিলি, প্রায় তেমনিটী আছিস লো। এই ছ' মাসের পরেও হদ্দ ছটাক খানেক হয়েছে।"

আমি রহস্য বুঝিলাম না, কিন্তু আর বিদুষী-দিগের নিকটে থাকা আমার উচিত নয়,—তাহা বুঝিলাম।

সটান সঙ্কট স্থান ত্যাগ করিয়া যাইয়া 'শটকার' শীতল ছায়ায় বসিলাম। কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া গিয়া দেখি, অনুপমা "বার্থ-রুমে" প্রবেশ, করিয়াছেন। আমি তখন "আমাদের তাঁহাকে" ইসারায় একটু আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বলি, তোমাদের এসব ব্যাপার কি, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

গৃহিণী। এতক্ষণেও এ আর ছাই বোঝ নাই? তোমার বুদ্ধিটা এমনি সূক্ষ্মই বটে! অনুপমা যে "শকুন্তলা" পোড়ছেন। এও এত ক্ষণে বুঝিলে না।

আমি বলিলাম,—"বটে! তা এভাব কি এখন ক্রমাগতই চলিবে নাকি?

গৃহিণী। "আ কপাল! তা কেন? কাল এতক্ষণে দেখিবে, হয় "কাদম্বরী", নয় "ক্লিওপেট্রা", না হয় "কুন্দনন্দিনী" অথবা অন্য যা হয়, একটা কিছু।

অনুপমা আমাদের গৃহে কিছুদিনের জন্য অবস্থিত হইলেন;—গৃহিণীর সহিত ক্রীড়া-কৌতুক ও ষ্টেশনস্থ আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদিগের বাটীতে গতায়াত করিতে লাগিলেন। আমি ক্রমে আমার নিয়মিত কাজ-কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনুপমা আমার এক অধ্যয়নের বিষয় হইলেন। শকুন্তলার ভাবটা তাঁহাতে প্রায় দিন দুই রহিল। ক্রমে সেটা কমিয়া গেল। অনুপমা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ভাবান্বিত হইতে লাগিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি 'জর্জ ইলিয়টে'র ও 'বুলুয়র লিটনে'র ও 'বিকন্সফীল্ডের' অনেক গুলি নবেল উদরস্থ ও অভিনয় করিলেন। "এডাম বিডের" কারাগার-দৃশ্যাবলী পাঠ করিয়া অনুপমা একক্রমে দুই দিন আহারই করিলেন না। "এলিস" অভিনয়ে অনুপমা কয় দিন দুঃখিনী ও ব্রতধারিণী হইয়া কাটাইলেন। আবার কয় দিন "ভিনিসিয়া" সাজিয়া ৺ কবিবর 'লর্ড বায়রণ'কে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য পাগলিনী-প্রায় হইয়া উঠিলেন। অনুপমার প্রেমানুরাগের উচ্ছ্বাস এক এক দিন এত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, তাহা অব্যক্ত এবং বাক্যের অতীত। পুনশ্চ প্রেম-বৈরাগ্যেও তিনি কোন দিন বিষণ্ন এবং কোন দিন বিষাক্ত ফণিনীর ন্যায় হইতে লাগিলেন। পঠিত পুস্তকের সুর ও বর্ণ অনুসারে অনুপমার সুর ও বর্ণ-বৈচিত্র্য হইত। ক্রমে আমাদের পুস্তকাগারের বাঙ্গালা নবেলাবলীর প্রতি অনুপমার দৃষ্টি পড়িল। তিনি, প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঙ্গালা ভাষার আদ্য উপন্যাস কোন্ গুলি ও নবেল-বিকাশের অঙ্কুর সে ভাষায় কবে জন্মিয়াছিল। আমি বলিলাম,—"আমাদের "মঙ্গলকাব্য" গুলিকে নবেল বলিলেও বলা যাইতে পারে; পরন্তু পদ্য-নবেলের অনুষ্ঠান আমাদের ইংরেজী আমলেই হইয়াছে।" অনুপমা ইংরেজী-আভা-যুক্ত নবেলের প্রতি কিঞ্চিৎ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করত "খাঁটী বাঙ্গালা" নবেল অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। আমি প্রথমত মনে করিয়াছিলাম,—সাবেক আমলের ভাবনাকুলার পদ্যাধ্যয়নে অনুপমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে, কিন্তু সেটা আমার ভ্রম।

একদিন সায়ংকালে গৃহে ফিরিয়া দেখি, সেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয়কর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। চাকর-চাকরাণীরা কাণাকাণি করিতেছে; স্বয়ং গৃহিণী উতলা হইয়া 'আগুন-খাগীর' মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ফেনী ও মেনী কুকুরদ্বয় মহা কোলাহল করিতেছে। ব্যাপার কি?—ব্যাপার কি? কাহারও নিকট উত্তরের অপেক্ষায় রহিতে হইল না; স্বচক্ষেই দেখিলাম,—যে ব্যাপার।

অনুপমা আমাদের গৃহ-পোষিত-ছাগ-গৃহের প্রাঙ্গণে কয়েকটী ছাগ-বেষ্টিত হইয়া অৰ্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় উপবিষ্ট,—হাতে এক পাঁচন-বাড়ী;—কৃষ্ণ কুন্তল-রাশি আলুথালু খসিয়া পড়িয়াছে। অনুপমা ক্রন্দন করিতেছেন এবং "সর্ব্বসী" "সর্ব্বসী" করিয়া ডাকিতেছেন। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আমি যথার্থই হাস্য-সংবরণ করিতে পারি নাই। বুঝিলাম,—ব্যাপার কি! আপনারাও অবশ্য এতক্ষণে

বুঝিয়াছেন যে, অনুপমাকে "কবিকঙ্কণ" ধরিয়াছে। আমি উচ্ছ্বসিত হাস্য ক্ষণেকের জন্য গলাধঃকরণ করিয়া বলিলাম—"কে-ও?—বেণেবৌ নাকি গো?"

অনুপমা যথারীতি মানিনীর ভাবে অধোবদনা হইলেন।

আমি এবার দামুন্যার চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ের ভাষাতেই অনুপমাকে ডাকিলাম;—

"সুন্দরি! মাথা তুলি কহ মোরে কথা।"

অনুপমা এবার তাঁহার আলুলায়িত ওড়না টানিয়া ঝাড়া এক হস্ত পরিমিত ঘোমটা দিলেন। অতি মৃদু ও মানব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"তা বুঝেছি, নাথ!

"তোমার যত দয়া!

তুমি হেন মোর স্বামী, ছাগল রাখিনু আমি।"

খুল্লনা-রূপিণী অনুপমা তাঁহার "বারমাস্যা" "বিনাইতে" বসিবার পুর্ব্বেই, আমি তাঁর হাতখানি উঠাইয়া বলিলাম,—"চল প্রিয়ে! এখন; আজ লহনার শতেক লাঞ্ছনা ক'রব, তাহার নাসাচ্ছেদ ক'রে 'ঢেকিশালে' শোয়াইব, "পাউড়ীর বাড়ি" মারিয়া আজ লহনার পৃষ্ঠ ভঙ্গ করিব। "বাঁঝি"র বড়ই বড়াই বেড়েছে।"

আমরা 'হলে'র মধ্যে গেলাম। অনুপমা অন্যমনস্ক। পরিহাস-রস তখন গাঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; আমি প্রতিজ্ঞাটা পুর্ণমাত্রায় না হউক কতক অংশে পালন করিলাম। গৃহিণীকে লহনা-স্থানীয়া করিয়া খুব এক হাত লইলাম। বলিলাম,—

"কপটে লিখিয়া পাঁতি মজাইলে মোর জাতি,
যুগে যুগে রহিল গঞ্জন।"

অর্দ্ধাঙ্গিনী এ উপহাসের আনন্দ সম্পূর্ণরূপে সম্ভোগ করিলেন বটে, কিন্তু তবুও যেন তাঁর হৃদয়ে একটু সূচ ফুটিল বুঝিতে পারিলাম। অত্যন্ত কাল্পনিক ও পরিহাস-মূলক হইলেও উপরোক্ত অভিনয়ে মৎপ্রেয়সীর পদ্মবৎ প্রফুল্ল মুখ খানিতে সপত্নী-ভাবের ছায়া পতিত হইয়া, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান করিল বেশ বুঝিতে পারিলাম।

আমাদের দিন কতক খুব ঘন-ঘন নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। ইহার প্রথম কারণ আমাদের বাসায় অভ্যাগতার আগমন ও দ্বিতীয় কারণ, পূজার বন্ধ। আমাদের প্রথম নিমন্ত্রণ হইল, "মুন্সেফ বাবুর" বাসায়। তার পর হইল, 'ডেপুটী বাবুর' বাসায়। ইহাঁরা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। ক্রমে আমরা 'ইন্‌জিনিয়ার বাবু'র আলয়ে এবং "জয়েণ্ট-সাহেবের" "বাঙলায়" ও ডাক্তার-সাহেবের বাগানে "ইভ্‌নিংপার্টী"তে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করি। এ সকল স্থলে "মিওজিক" ও "বলের" বন্দোবস্ত ছিল। অনুপমা এ কয় দিন "বিলাতী ও ফরাসী" নূতন নবেল রোজ প্রায় দুইখানা করিয়া "কাবার" করিতেছিলেন। অতএব সঙ্গীতে ও নৃত্যে সমূহ ভাবে "যোগদান" করিয়া, সভ্যদিগের চিত্তরঞ্জন ও সভ্যাদিগের ঈর্ষা উদ্দীপন করিতেছিলেন। এমন সঙ্গীতে ও নৃত্যে অনুপমা আদৌ শ্রান্তি বোধ করেন না। রজনীর শেষ প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত নৃত্য-গীত করেন। আমাকে একদিন বলিলেন,—"আহা! এ আমোদ কি আরাম-কর! ইহা না থাকিলে তিনি জীবিতই থাকিতে পারিতেন না; অন্ততঃ জীবন শ্মশানবৎ হইত।"

অতঃপর আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ হইল, আমার জনৈক ব্রাহ্মকারাদ্য বন্ধুর বাড়ীতে। ইনি আমাদের স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক,—অতি "নিষ্ঠাবান আনুষ্ঠানিক।" ইহাঁর আলয়ে নিরামিষ "ডিম" হইলেও তাহা অতি পরিপাটীরূপে "সার্ভ্" হইয়াছিল। বলের বন্দোবস্ত ছিল না; আহারের পূর্ব্বে মিওজিক কিঞ্চিৎ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা উপাসনা বিষয়ক। আমরা আহারান্তে আসিবার প্রায় উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে অনুপমা আমার বন্ধুর বৈঠকখানার একটী "বুককেশে"র উপরে একখণ্ড "রাজ সংস্করণের" "মডেল-ভগিনী" দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেতাব খানি তিনি পাঠ করিতে পারেন কি না? আমার বন্ধু-পত্নী উত্তর করিলেন, পুস্তকখানি তথায় কিরূপে আসিয়াছে, তিনি অবগত নহেন; তবে তিনি যতটা শুনিয়াছেন, তাহাতে উহা আদৌ কাহারও পাঠ্য হওয়া উচিত হইতে পারে না। আমার গৃহিণী তখন একখানি "ওয়াল" আয়নায় অস্বরূপ প্রতি-বিম্বিত করিয়া তাহা তদ্গত ভাবে নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন। উপরোক্ত প্রশ্ন-উত্তরের আওয়াজ পাইয়া তিনি আমাদের সম্মুখীন হইয়া অনুপমাকে মুরুব্বি-আনা স্বরে আদেশ করিলেন "অনু,—দাও ত ঐ বই খানা; দেখি, উহা তোমার পাঠের যোগ্য হইতে পারে কি না?"

অনুপমা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"যাহা তোমার পাঠের যোগ্য হইতে পারে, তাহা আমারও হইতে পারে।"

"না তা কক্‌খনই হইতে পারে না।" মদীয় গৃহিণী গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন।

অনুপমা বলিলেন,—'কেন? তোমায়-আমায় তিন মাসের ছোট-বড় বৈ ত নয়। আমিই তোমার তিন মাসের বড়। তবে তোমার সঙ্গে আমার তফাৎটা আর কি?"

"তফাৎটা যে কি, তা তুমি কি এখন বুঝিতে পারিবে?"—মদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনা খুব সটান লম্বমান হইয়া দাঁড়াইয়া, পূর্ণাবয়ব প্রদর্শনপূর্ব্বক গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন,—"তফাৎ এই যে, আমি বিবাহিতা যুবতী, আর তুমি বিদ্যালয়ের বালিকা।"

অনুপমা। তবুও আমি তিন মাসের বড়।

গৃহিণী। ওলো, এখনি তোর এমন চোপা!

আমার বন্ধুনীও উপরোক্ত বিতর্কে যোগ প্রদান করিলেন। খুব একটা "মেয়েপাঁচা" বাধিয়া উঠিল। আমার বন্ধুটী নিরীহ মাষ্টার মানুষ;—দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! আমি ভাবিলাম —রাত্রিকালে বা একটা "কুরুক্ষেত্র" ঘটে! তিন জনকে তিন ঠাই করিয়া দুইজনকে গাড়ীতে উঠাইলাম।

অনুপমার 'বল' নাচের ঝোঁকটা রহিল প্রায় আরও দিন দুই তিন। তার পর একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, অনুপমা "প্রাতরাশ টেবিলে" উপস্থিত নাই। বাহিরে যাইয়া দেখি, অনুপমা অঙ্গনের মাটীর উপর উপবিষ্টা;—পরিধানে এক লাল-কস্তাপেড়ে সাড়ী, সীমন্তে সিন্দূর, সম্মুখে বাসনের রাশি; অনুপমা অধোবদনে বাসন মাজিতেছেন। আমি বলিলাম,—"এ কি আবার? প্রাতরাশে আসুন।"

অনুপমা। প্রাতঃকালে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। এখন বাসিপাটে যাচ্ছি।

আমি। বটে!! তা আসুন একটু চা খেয়ে যা'ন।

অনু। চা খাইব! স্ত্রী-লোক হ'য়ে চা খাইব! এ কি কথা বলিতেছেন আপনি! গৃহস্থের মেয়ে, তায় আমাদের মত গরিব লোকে কি চা খায়? আমার গোপাল কোথায় গেল গা?

ভাবটা আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার চারুবদনা চা'এর চামচে ফুঁ দিতে দিতে বলিলেন,—"বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?—কাল যে 'স্বর্ণলতা' পড়া হয়েছে।"

অনুপমার এতাদৃশ প্রবল ভাব-প্রবণতা ও অদ্ভুত রকমের সব অভিনয় দেখিয়া, আমি বস্তুতই তাঁহার সম্বন্ধে এক প্রকার আন্তরিক অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা আমার পরিবার পছন্দ করিতেছিলেন না।

বলা বাহুল্য যে, আমার পত্নী প্রকৃত প্রস্তাবেই আমার প্রণয়িনী এবং আমি তাঁহার মত অপ্সরার অধিকারী হইয়া কোনক্রমেই একটী অপ্রাপ্ত-পূর্ণ-বিকাস নবেল-বালিকার সহিত 'প্রণয়' করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু তা'তে কি হইবে? সন্দেহ—সীমন্তিনীদের সর্ব্বগ্রাসী গুণ। কাজেই অভ্যাগতা অনুপমা নামের সঙ্গে অভাগা-আমার নাম গৃহিণী গুণ গুণ স্বরে এবং গাম্ভীর্য্য সহকারে সর্ব্বদাই "সঙ্কলন" করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি অবাক! অনুপমা অত বোঝেন না, নিত্য নূতন নভেলের ভাবে ভোর।

একদিন আমি প্রাতে 'গোসল-খানার' অভ্যন্তরে মামুলী ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন করিতেছি;—গৃহলক্ষ্মী সহসা তথায় যাইয়া উপস্থিত,—হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতেছেন,—"ওগো অনুপমা কোথায় গেল?—কোথায় গেল"। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"তা আমি অনুপমাকে এই ঘরের মধ্যে কোথাও লুকাইয়া রাখি নাই।"

গৃহিণী। ওগো, তা—নয়, তা নয়। সে কথাত আমি বল্‌ছিনে,—তুমি দূষ্য ভাব কেন? অনুপমাকে আজ উঠিয়া অবধি দেখ্‌ছিনে;—কেহই তা'র তল্লাস পা'চ্ছে না।

আমি। তা, কি আর কর্ব্ব বল? এত আশঙ্কাই বা কেন?

গৃহিণী। আশঙ্কা কেন?—অনুপমা কাল রাত্রে "বিষবৃক্ষ" পড়িতেছিলেন। জানিনা, কি করিয়া বসিলেন।

আমি। ভয় নাই। যাও; আমি আস্‌ছি।

আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে গেলাম। আমাকে দেখিয়াই মালী বলিল,—"বাবুজী উও দরক্ত পর বয়েট রহী হৈঁ।"

আমি একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, যথার্থই তাই। বলিলাম,—"বলি, বসিয়া কে—ও? সূর্য্য-মুখী?—না কুন্দ-নন্দিনী?

অনুপমা আদৌ কথা কহিলেন না। বুঝিলাম, ইনি নিশ্চয়ই কুন্দনন্দিনী; কারণ "কুন্দ কথা জানে না।"

অনুপমা, অতঃপর ধীরে ধীরে বলিলেন,—যা ছিল, কি করিলে তা আবার হয়?

"তা চল"—আমি বলিলাম,—"তা চল, দেখি যাইয়া,—কি করলে, যা ছিল তা আবার হয়।"

অনুপমা আমার বাহুতে স্কন্ধ স্থাপন করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। আমরা 'টি-টেবিলে' যাইয়া যোগদান করিলাম। আমার অঙ্গলক্ষ্মীর তখন অতিশয় উগ্রভাব; সমুহ-গাম্ভীর্য্য সহকারে ধীরে ধীরে চা-মিশ্রিত দুগ্ধ-শর্করার সহিত বিস্কুট বংশের ধ্বংস করিতে ছিলেন।

অতি গর্হিত হইলেও আমি এমন সময়ে একটু বেয়াদবি করিয়া বসিলাম। বলিলাম,—আমি অম্লান-বদনেই বলিলাম,—"মেজবৌ, দেখ দেখি এটী কে? এই ক্ষুদ্র কুন্দ-কলিটীকে কি তোমার সপত্নীর মত দেখায়"?

আমাদের "মেজবৌ" খুব মার্জ্জিত মেয়ে হইলেও,—মজলিসী লোক বলিয়া বোধ হয় না। আমার রসিকতাটুকু অনর্থক মারা পড়িল। মেজবৌ আদৌ উত্তর করিলেন না; এক বিন্দু ইসারাও জানাইলেন না। কেবল দেখিতে পাইলাম, তাঁহার আপাদ-মস্তকে ঈর্ষার এক অতি হৃদয়গ্রাহিণী মুর্ত্তি। নয়নে তাহার বহ্নি, বক্ষে তাহার বিস্ফারণ, সর্ব্ব-শরীরে তাহার কম্পন। আমি বুঝিলাম,—"এই হয় বুঝি।"

তখনি হইল।

'ওলো' তোর এ কেমন ব্যবহার লা? বলি, এই বুঝি তোর সতীপনা, আর বন্ধুত্বের বড়াই? বুঝেছি লো বুঝেছি, এ সব ত কেবল নবেলি-আনা নয়, এর ভেতর আরও নানান খানা আছে।'

আমার প্রেয়সী শ্রীমতী 'মেজ-বৌ' তর্জ্জন গর্জ্জন এবং পরিক্রমণ ও কম্পন সহকারে, কুন্দ-নন্দিনী-রূপিণী কুমারী অনুপমাকে উপরোক্ত সুমিষ্ট সম্বোধন সহ আরও বিস্তর শিষ্টাচার-সম্মত সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার দীর্ঘ কালের স্কুলে-অর্জ্জিত সুসভ্য শিক্ষিত স্বভাব যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, তাহা আমি আজও স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার এ ব্যবহারে আমি তখন একটুও আশ্চর্য্য হই নাই; কেবল অবাক হইয়াছিলাম। সূর্য্যমুখীর ন্যায় নারী যাহা সহিতে পারেন নাই, তাহা (অসত্য হইলেও) আমার ঘর-গৃহস্থালীর গৃহিণী 'আভা' যে সহিতে পারিবেন, এমন আশা আমি করি না। কাজেই আশ্চর্য্য হই নাই। অবাক হইয়াছিলাম। কারণ সে ক্ষেত্রে অন্য কাহারও বাক্য-ব্যয়ের অবসর ছিল না।

'ধারাবাহিক-রূপে' গৃহিণীর বাক্যস্রোত বহির্গত হইতে লাগিল। পল্লীগ্রামের পাড়া-কুঁদুলীদের পঞ্চাশ জনও যদি তখন আমার—বিদ্যাধরীর সম্মুখে উপস্থিত হইত, নিশ্চয়ই সংগ্রামে ধরাশায়ী হইয়া যাইত,—সন্দেহ নাই।

অনুপমা কিন্তু নীরব। কারণ 'কুন্দ কথা জানে না।' কথা কহিলেই কুন্দত্ব যায়, কাজেই অনুপমার আঁখি দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি দেখিয়া কাতর হইলাম। কিন্তু কথা কহিতে সাহসী হইলাম না।

কমলিনীর কোপ ক্রমে বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনানু-সারে স্ফুরিত, বর্দ্ধিত, ও পুনঃস্ফুরিত হইয়া মধ্যমে, পঞ্চমে—গ্রামে গ্রামে ফিরিতে লাগিল। সপ্তমে চড়িয়া অষ্টমেও উঠিল। চা, পড়িয়া গেল,—চামচ পড়িয়া গেল,—পিয়ালা ভাঙ্গিল,—প্লেট ভাঙ্গিল। চাকর, খানসামা, বাবুর্চি কাণাকাণি করিতে লাগিল। কুকুর দুইটা কেউ কেউ করিতে লাগিল। সবই কেন্দ্রচ্যুত। প্রাতঃকালে, একি মহাপ্রলয়!!

আমি সেই অবসরে "তামাক ডাকিলাম।" গৃহদেবীর সম্মুখে, তাঁহার ভোজন-টেবিলের বক্ষের উপর শট্‌কা রাখিয়া সজোরে টানিতে লাগিলাম। তাম্রকূট-ধূম কুণ্ডলাকারে আকাশ ভেদ করিল,—গৃহ পূর্ণ করিল,—গৃহিণীর গাত্রস্পর্শ করিল। শশীমুখী সে সব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আমি অনেক দিনের পর একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম। আত্ম মর্য্যাদায় স্ফীত হইয়া উঠিলাম।

গুড়ুকে গম্ভীরা বুদ্ধির উদ্রেক হইল। মধ্যাহ্ন-ট্রেণেই অনুপকে লাহোরে পাঠাইয়া দিলাম।

আমার ধর্ম্মপত্নী আমাকে অচিরাৎ ধলন্দায় পাঠাইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া, নৈশট্রেণে পিতৃগৃহে গেলেন। আজিও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কবে নিষ্ঠুরতার নালিশ করিয়া আমাকে ডাইভোর্স করিবেন, সেই অপেক্ষা করিতেছি' আমি গৃহচ্ছিদ্র ব্যক্ত করিতে পারি না। তবে গৃহিণী যদি দয়া করিয়া আমাকে ধলন্দায় না পাঠাইয়া, পত্যন্তর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনুপমা, আমার হইবেন কি।

শ্রী——মোকার্জি।

সমালোচন।

পাগলের পাগলামী।

প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মহাদেবপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থকারের নাম নাই। উৎসর্গপত্রে স্বাক্ষর আছে—"আপনার পাগল"। এ গ্রন্থ কোথায় বিক্রীত হয় তাহা জানি না। আছে কেবল এক প্রকাশকের নাম,—আর প্রকাশের স্থান,—মহাদেবপুর। কিন্তু মহাদেবপুর কোথায়? কৈলাসপর্ব্বতে কি? দিনাজপুরের এক গণ্ডগ্রামের নাম মহাদেবপুর। অথবা মহাদেবপুর নামে এক ডাকঘরহীন "নিবিড়" পল্লীগ্রাম কোথাও আছে! এ সকল বার্ত্তা কিছুই অবগত নহি। গ্রন্থই লিখুন, পত্রই লিখুন, প্রবন্ধই লিখুন,—ঠিকানা দেওয়া যদি তাহাতে আবশ্যক বোধ করেন, তবে গ্রাম, পোষ্টাফীস, এবং জেলা লেখা আবশ্যক। রসিক নাপিতের নিবাস ছিল, কুল্‌টীগ্রামে। তাহার ধারণা ছিল, কুল্‌টী গ্রামের কথা বিশ্বসংসারের সকল লোকই জানে। ইস্তক সুদূর হিমালয় হইতে নাগাইদ কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের সকল লোকই কুল্‌টীগ্রামের কথা অবগত আছ। একবার একজন দিল্লিবাসী সওদাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—'তোমার বাড়ী কোথা?' রসিক উত্তর দিল,—'কুল্‌টী গ্রামে।'

সওদাগর। কুল্‌টীগ্রাম কোথা?

রসিক। কুল্‌টী জানেন না? সে-যে, মুল্‌টীর কাছে।

জামালপুর তিনটী আছে। এক, মুঙ্গের—জামালপুর; এক, ময়মনসিং—জামালপুর; আর এক বর্দ্ধমান—জামালপুর। আমি যদি লিখি, আমার নিবাস—জামালপুর, তাহা হইলে লেখা অসম্পূর্ণ হইল। তাই বলিতেছি, যখন সাধারণের জন্য ঠিকানা লিখিতে হইবে, পোষ্টাফীস ও জেলা লেখা একান্ত বিধেয়।

পাগলের পাগলামী গ্রন্থে ঠিকানা লিখিবার তালে ভুল থাকুক, ইহার কয়েকটী কবিতা সুন্দর হইয়াছে। খোলা প্রাণের খোলা কথা! বড়ই মিঠা মোলায়েম। বাউলে সুর।

বাউলের সুর।

বাড়ীর গিন্নি আজ চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে।
এই যে জাত্‌বেহার কাঁধে চ'ড়ে,খাটুলীতে শু'য়ে॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে,
আহা, হাঁড়ী কল্‌সী পাকাইলে তেলে আর ঘিয়ে।
সোণা রূপার গয়না গাঁটি, বাসন, কোসন, ঘটী,বাটী,
এই যে, খাট, বিছানা, শীতলপাটী রেখেছ সাজায়ে।
রেখে হাঁড়ী, কল্‌সী, জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে কুলডালা, খৈচাল', রেখেছ টাঙ্গায়ে।
গৃহস্থালীর যত আসবাব,কিছুরতো রাখ নাই অভাব,
আহা, ক্রমে ক্রমে করেছ সব, কত কষ্ট সয়ে।
ঘর কন্নার জিনিষ যত, রাখ্‌তে ধরে যকের মত,
তুমি কাউকে ছুতে দিতে নাতো, অপচয়ের ভয়ে।
কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো,
তুমি, থাকৃতে বল্‌তে সব "বাড়ন্ত" চক্ষু লজ্জা খেয়ে।
সদাই বলতে আমার ২, আজ কিছুই হলনা তোমার
আহা, কেবল মলে পণ দুইচার চাবির বোঝা বয়ে।
পাগল বলে হরি হরি, এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি,
তোমার এত সাধের, পাকা হাঁড়ী যাওনা তুট নিয়ে।

আর একটী গানের কতকাংশ এই;—

পাহাড়!
যখন দেখি দূরে থাকি, মনে বড় হইরে সুখী,
সর্ব্বাঙ্গ তুই রাখিস্ ঢাকি,
সুনীল ধূমায় রে (পাহাড়, সুনীল ধূমায় রে।)
মেঘের মাঝে লুকাস্ যখন,
খুঁজে দেখা পাইনা তখন,
ধরিস্ রূপ মেঘের মত, চিন্‌তে পারা দায়রে:
যখন সান্ধ্য-সূর্য্যকরে, লোহিত মেঘে গগণ ঘেরে,
তখন কে তোয় সোহাগ ক'রে
আবীরে সাজায় রে (পাহাড়, আবীরে সাজায়রে।)
তোর উপরে উঠি যখন, মর্ত্ত্যে দেখি স্বর্গের স্বপন,
নিসর্গের ক্রীড়া কানন, দেখে প্রাণ জুড়ায় রে;
নির্ঝরেতে বাদ্য করে, পাখী গায় সুললিত স্বরে,
কাদম্বিনী তোর শিখরে,
ময়ূরে নাচায় রে (পাহাড়, ময়ূরে নাচায় রে)।
দেখলে তোর অতিথিশালা ঘিবে যায়রে সকল জ্বালা,
ভাবাবেশে শান্তির গলা, ধরতে প্রাণ চায়রে;
শিলাতল শয্যা শীতল, বৃক্ষে দেয় সুমিষ্ট ফল,
নির্ঝরিণী দিয়ে জল, আতিথ্য যোগায় রে,
(পাহাড়, আতিথ্য যোগায় রে!)

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } চৈত্র। ১২৯৮। { ৪র্থ সংখ্যা।

স্নানাহার।

সাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্য।—কেবল যদি সাহিত্যই চাহিবে, তাহা হইলে, আমাদের ন্যায় লেখক যে মারা যায়।

অথবা

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।
শৃগালেন হতো হস্তী গচ্ছতা পঙ্কবর্ত্মনা॥

আমি স্বলিখিত প্রবন্ধকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য করিবার উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। মুখপাতে 'উ'এর অনুপ্রাসে চরমের গতিকখানা অনুমান কর। আমার উদ্ভাবিত উপায়ে ময়রার দোকান সাহিত্য, ইক্ষু-যন্ত্র সাহিত্য, খর্জ্জুর-বৃক্ষও সাহিত্য। আমার উদ্ভাবিত উপায়ের প্রভাবে, কত সাহিত্য সেবক হইবেন এবং কত সাহিত্য সেবক আছেন, তাহারও ইয়ত্তা নাই। কথাটা মন দিয়া শুন,—

আলঙ্কারিকেরা বলেন, রসই সাহিত্যের আত্মা। রসময় কথাই সাহিত্য।' রসের অভাবেই সাহিত্যের অভাব। এখন যে আমরা সাহিত্য যোগাইতে পারি না, তাহার কারণও এই রসের অনাটন। রুচির খাতিরে, আদি-করুণ-শান্ত-বীভৎস-ভয়ানককে বিদায় দিতে হইয়াছে। ফৌজদারী আইনের ভয়ে, রৌদ্র-বীরের সঙ্গে বৈর করিতে হইয়াছে। শিক্ষিত সমাজের উপহাসের ভয়ে অদ্ভুত অপদস্থ। আছেন কেবল হাস্য আর বাৎসল্য। কিন্তু হাস্য আর পোড়া আস্যে আসে না। শুধু বাৎসল্যে কয় জনের মন যোগান যায় তাই বলিতেছিলাম, রসের অনাটন,—সাহিত্য আসিবে কোথা হইতে? আমাকে ধন্যবাদ না দিয়া তোমাদের থাকা উচিত নয়, এ হেন রসের অনাটন সময়ে,—নেপোলিয়ন যেমন ইক্ষু প্রভৃতির চিনির অনাটনে বিটরুটের চিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ—আমিও সাহিত্য-জগতে অন্যবিধ রসের আবিষ্কার করিয়াছি।

আমি এখন, মধুর, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল—এই ষড়্বিধ রসের সাহায্যে সাহিত্য-নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প। কেমন সাহিত্য-প্রিয়, প্রিয় পাঠক! সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?

ঐ দেখুন, উপরে প্রবন্ধের নাম—"স্নানাহার।" স্নানে জলের আবশ্যকতা, জলে মধুর রস,—নৈয়ায়িক মাত্রেই অবগত আছেন। আহারে ষড়্রস। সুতরাং এই রসময় প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে কেন?

এই স্নানাহারে ব্যাকরণের কারিগরি আছে, অলঙ্কারের খেলা আছে, দর্শনের লীলা আছে। স্নান এবং আহার, এই দুইটী কথা দ্বারা প্রাতঃস্নান হইতে আহার পর্য্যন্ত যে কিছু কর্ম্ম আছে, তৎসমুদায়ের সূচনা করা হইয়াছে—এই আদ্যন্ত-কার্য্য-উল্লেখে মধ্যস্থিত যাবৎ কার্য্যের গ্রহণ দ্বারা সুপদ্ম-ব্যাকরণের সমধ্যসংজ্ঞা প্রকটিত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম-দৃষ্টি করিলে এখানে অর্থাপত্তি অলঙ্কারের ছায়া দেখিতে পাইবেন। সুতরাং দর্শনের কৈমুতিক-ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান।

প্রবন্ধের নামেই যখন এত কারখানা, তখন ভিতর দেখুন আর না দেখুন, গুণে মুগ্ধ না

হইবেন কেন? বাহিরের চটকে মজিয়া বিলাতী বস্তু কিনিতে পারেন, আর আমার প্রবন্ধে সুপ্রীত না হইবেন কেন? সুতরাং সু-সাহিত্য, নবীন সাহিত্য, নব-রসের পরিবর্ত্তে—ষড়্‌রসময় সাহিত্য, সাজাইতেছি—আসুন, মজিতে অনুরোধ করি।

প্রাতঃস্নান।

স্নান না করিয়া যে ধর্ম্মকার্য্য করিবে, তাহা নিষ্ফল হয়। গৃহস্থের দুইবার স্নান করা নিয়ম—প্রাতঃকালে এবং দিবসে। তবে, অশক্তের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। পবিত্র নদ-নদী অভাবে সামান্যতঃ স্রোতোজল, তদভাবে স্বীয় তড়াগাদিতে স্নান করা কর্ত্তব্য। তদভাবে পরকীয় জলাশয়ে। কিন্তু তাহাতে স্নান করিতে হইলে, প্রথমতঃ জলমধ্য হইতে সাত-দলা, পাঁচ-দলা, অথবা তিন-দলা পঙ্ক তুলিয়া ফেলিবে। সর্ব্বাভাবে গৃহে উদ্ধৃত-জলেও স্নান করিবে। স্নান যেখানেই হউক না, স্নান-বিহিত মন্ত্রপাঠ অবশ্যই করিতে হয়। তবে উদ্ধৃত জল দ্বারা স্নান করিবার পক্ষে, মন্ত্রপাঠের কড়াকড়ি কিঞ্চিৎ কম।

পূর্ব্বদিক্ আরক্তবর্ণ হইলে,—ভোর-ভোর—প্রাতঃস্নান করা বিধি। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী চারি দণ্ড প্রাতঃস্নানের কাল। নাভি-প্রমাণ জলে দণ্ডায়মান হইয়া, কর্ণ, নাসিকা এবং মুখচ্ছিদ্র হস্তযুগল দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক তিনবার ডুব দিবে। উত্তরীয় বস্ত্র বা গাত্রমার্জ্জনী লইয়া স্নান করিতে হয়। উলঙ্গ হইয়া বা বহুবস্ত্র কিংবা জীর্ণবস্ত্র ধারণ করিয়া স্নান করিতে নাই। বিনা কারণে বহুবার স্নান করা নিষিদ্ধ। স্নান করিবার সময়ে কথা কহিতে নাই। স্রোতোজলে স্নান করিতে হইলে, স্রোত যেদিকে, সেই দিকেই স্নান করিবে। সরোবরাদিতে স্নান—সূর্য্যের দিকে অভিমুখ হইয়া কর্ত্তব্য। প্রাতঃস্নানে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। সর্ব্বসময়েই তিলচূর্ণ বা আমলকচূর্ণ মাখিয়া স্নান করা ভাল। সপ্তমী, নবমী এবং পর্ব্বদিনে তাহাও নিষিদ্ধ। স্নান করিলে, যে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, তাহাতে স্নান করিতে নাই। অলঙ্কৃত হইয়া স্নান করা নিষিদ্ধ ভোজন করিতে করিতে বা ভোজন কারবার পরেও স্নান করিতে নাই। অধিক জলে, অপবিত্র জলে, 'আঘাটায়' বা নাভি-নিম্ন জলে স্নান করিতে নাই। নৈমিত্তিক স্নান যখন-তখন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা না হইলে, অপরাহ্নে, সায়ংকালে এবং রাত্রিতে স্নান করা নিষিদ্ধ। উদ্ধৃত জলে স্নান,—দ্বারসমীপে এবং ভূতযজ্ঞ-স্থলে করিবে না। সমুদয় বৈধ-কার্য্যেই বাম হস্তের অনামিকাঙ্গুলিতে, বহুকুশ-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয় এবং দক্ষিণ হস্তের অনামিকাঙ্গুলিতে, পবিত্র সংজ্ঞক—অন্তর্গর্ভশূন্য, প্রাদেশ * প্রমাণ, অনখচ্ছিন্ন দ্বিদল সাগ্র—কুশময় অঙ্গুরীয়, তদভাবে সামান্য কুশ-পত্র-চতুষ্টয়, কুশপত্র-ত্রয় বা কুশপত্র-দ্বয় দ্বারা নির্ম্মিত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিবে।

স্নানকালে-পরিহিত অধোবস্ত্র দ্বারা বা কেবল হস্ত দ্বারা স্নানোত্তর গাত্র-মার্জ্জনা করিবে না। স্নানান্তে নির্ম্মল, প্রক্ষালিত, পবিত্র শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, পরিত্যক্ত আর্দ্র বস্ত্র, তিন বার মৃত্তিকা-যোগে প্রক্ষালিত করিবে। কিন্তু যাহার তর্পণাধিকার আছে, সে ব্যক্তি তখন বস্ত্র নিংড়াইবে না। তবে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি এবং শ্রাদ্ধ দিনে নিংড়াইতে পারে। তাহার কারণ, তর্পণে, মৃত অপুত্র জ্ঞাতিদিগের উদ্দেশে, বস্ত্র-নিষ্পীড়ন জল দিতে হয়, কেবল অমাবস্যা প্রভৃতি উক্ত কতিপয় দিবসে তাহা দিতে নাই। তর্পণান্তে যথেচ্ছ বস্ত্র-নিষ্পীড়ন করিতে পারে। স্নানের পর তর্পণাদি করিয়াও জল হইতে উঠিতে পারে। স্নানের পর মস্তক কম্পনাদি করা নিষিদ্ধ। অন্ত্যজাদির সহিত সম্ভাষণ করা নিষিদ্ধ।

অবগাহন-স্নানে অশক্ত ব্যক্তি, আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব-শরীর মুছিলেই কর্ম্মাধিকারী হইবে। অনুরূপ নিয়মও আছে;—সর্ব্বশুদ্ধ স্নান,—অষ্টপ্রকার। সমস্তক অবগাহন-স্নানে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে, অপর সপ্তবিধ স্নান বিহিত আছে, তন্মধ্যে সম্ভব এবং যোগ্যতানুসারে, যে-কোন-রূপ স্নান করিতে পারে। সপ্তবিধ স্নান যথা—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ এবং মানস।

মান্ত্র—আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ-পূর্ব্বক, মস্তকাদিতে জল-ছিটা দেওয়া।

ভৌম—গঙ্গা-মৃত্তিকাদির তিলক ধারণ।

আগ্নেয়—সংশোধিত ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন।

* তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া যে বিভক্তি (বিগৎ) করা হয়, তাহার নাম প্রাদেশ।

বায়ব্য—গোখুরোদ্ধূত ধূলিপটলে আবৃত হওয়া।
দিব্য—রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে যে বৃষ্টি হয়, তদ্দ্বারা অভিষেক।
বারুণ—অমন্ত্রক অবগাহন-স্নান।
মানস—বিষ্ণু-চিন্তা।

সমন্ত্রক স্নান ত্রিবিধ,—বৈদিক, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক। অদীক্ষিত ব্যক্তির—হয় বৈদিক, না হয় পৌরাণিক স্নান করিতে হয়। দীক্ষিত হইলে, আবার তান্ত্রিক স্নানও করিতে হয়। শূদ্র,—স্নান-কালে, স্বয়ং পৌরাণিক মন্ত্রও পাঠ করিবে না, কেবল "নমঃ নমঃ" বলিবে,—আর মন্ত্র-পাঠ করিবেন তাহার পুরোহিত।

স্নানান্তে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ দীর্ঘ তিলক করিবেন, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র করিবেন, বৈশ্যের তিলক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শূদ্রের বর্ত্তুলাকৃতি। সমস্ত বৈধকার্য্যই তিলক ধারণ করিয়া করিতে হয়। নতুবা কর্ম্ম পণ্ড হয়। গঙ্গা-মৃত্তিকা, গোস্বামীদিগের গোপীচন্দন ইত্যাদির অভাবে, কেবল জল দ্বারাও তিলক করিবে। স্নানের অঙ্গ তর্পণ। স্নানের পর তর্পণ করিতে হয়। কিন্তু স্নানের পর যদি সন্ধ্যা করিবার যথাসময় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, প্রথমে সন্ধ্যা, পরে তর্পণ কর্ত্তব্য। প্রাতঃসন্ধ্যার কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে,—

১। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে অর্দ্ধোদয় পর্য্যন্ত যে দুই দণ্ড বা এক মুহূর্ত্ত, তাহাই প্রাতঃসন্ধ্যার কাল।

২। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব এক দণ্ড এবং পর এক দণ্ড, এই দুই দণ্ড প্রাতঃ-সন্ধ্যার কাল।

আমি প্রথম মত অবলম্বন করিয়া আছি।

তর্পণ।

তর্পণের কথাটা এই সময়ে একটু বিবৃত করিয়া বলা যাইতেছে।

তর্পণ, কেবল যে স্নানেরই অঙ্গ, তাহা নহে। তর্পণের স্বতন্ত্র কর্ত্তব্যতাও আছে। তর্পণ, নিত্য শ্রাদ্ধের অনুকল্প। নিজ নিজ শাখানুসারে সকলেরই যথাকালে সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। দৈবাৎ কালাত্যয় ঘটিলে দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। তর্পণ না করিলে মহা পাপ হয়। তবে কিনা, স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলে আর স্বতন্ত্র পুনর্ব্বার তর্পণ করিতে হয় না। তর্পণ দ্বিবিধ;—বৈদিক এবং পৌরাণিক। তান্ত্রিক তর্পণও আছে বটে, কিন্তু সে তর্পণ এ-জাতীয় নহে। স্নান যে মতানুসারে করিবে, তর্পণও তন্মতানুসারে কর্ত্তব্য। আর্দ্রবস্ত্র হইলে, নাভিজলে দণ্ডায়মান হইয়া তর্পণ করিবে। নতুবা শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া তীরে তর্পণ করিতে হইলে, এক পা জলে এক পা তীরে রাখিয়া তর্পণ করা নিয়ম। একবার স্নান করিলে বা স্নান না করিলেও একবার তর্পণ করিতে হয়। প্রাতঃস্নান ও মধ্যাহ্ন স্নান করিলে দুই বার তর্পণ করিতে হয়।

অনন্তর সাগ্নিক ব্যক্তির সায়ংপ্রাতর্হোম আছে। সে কথা এখন না তুলিলেও হয়। পুষ্পচয়ন, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, বহ্নি, স্বর্ণ ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা—এই অষ্টবিধ মঙ্গল দ্রব্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে বংশ, বয়ঃক্রম, বিদ্যা এবং ধনের উপযুক্ত বেশভূষা করিবে, কেশ প্রসাধণ করিবে। দিবসের প্রথম যামার্দ্ধ* এইরূপে অতিবাহনীয়। দ্বিতীয় যামার্দ্ধে, অধ্যাপক, বেদাধ্যাপনা, বেদাঙ্গ† অধ্যাপনা বা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করিবেন। বিদ্যার্থী,—বেদ, বেদাঙ্গ বা স্মৃতি অধ্যয়ন করিবেন। এবং বেদাভ্যাস, বেদ-বিচার বা বেদমন্ত্র জপ, এ সময়ে সকল দ্বিজেরই কর্ত্তব্য।

পিতৃগণোদ্দেশে তিল জল দ্বারা তর্পণ করা কর্ত্তব্য। গঙ্গাজলে, তিল না হইলেও চলে, হয় ত ভালই;—"সোণার উপর সোহাগা"। একান্ত পক্ষে তিলাভাবে, অন্য জল দ্বারাও তর্পণ করিতে পারিবে। অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকাঙ্গুলি দ্বারা তিল লইয়া তর্পণের জলে মিশাইবে। রোমযুক্ত অঙ্গে বা স্নান-বস্ত্রাঞ্চলে তিল রাখিবে না। বাম করতলে, বা পাত্রান্তরে তিল রাখিবে। জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতে হইলে বাম-তলেই তিল রাখিবে, আর দক্ষিণ তর্জ্জনী বা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিল লইবে। কুশ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ এবং তুলসী-সংসৃষ্ট জলে তর্পণ করা প্রশস্ত। গণ্ডারের খড়্গ-পাত্রে তর্পণ, পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী,

* দিবসের অষ্টভাগের এক ভাগের নাম যামার্দ্ধ ১২ ঘণ্টা দিবামান হইলে, ১॥ ঘণ্টা যামার্দ্ধ ইত্যাদি।

† শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং ছন্দঃ এই ছয় প্রকার বেদাঙ্গ।

অমাবস্যা-শ্রাদ্ধ ভিন্ন শ্রাদ্ধ-দিবস, সপ্তমী, জন্মতিথি, সংক্রান্তি, এবং রাত্রিকালে তিল তর্পণ করিতে নাই। কিন্তু গঙ্গাতে কোন দিনেই তিল তর্পণ নিষিদ্ধ নহে। বৃষ্টিজল সংশ্রব হইলে, সেই জল দ্বারা তর্পণ করিতে নাই। তর্পণের পর সূর্য্যার্ঘ্যদান ও সূর্য্য-নমস্কার কর্ত্তব্য।

তৃতীয় যামার্দ্ধে পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণার্থ চেষ্টা করিতে হয়। পোষ্যবর্গের প্রতিপালন, গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম কার্য্য, অপালনে মহা পাপ। অতিথি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আশ্রিত, ভার্য্যা, পুত্রকন্যা এবং ভিক্ষুক প্রভৃতি, গৃহস্থের পোষ্য। গৃহস্থ ইহাদিগের পোষণার্থ আত্ম-জাতির অনুরূপ বৃত্তি অনুসারে ধনোপার্জ্জনে এই—চারি দণ্ডকাল যত্ন করিবে। স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা পোষ্যবর্গ-পালন অসম্ভব হইলে, আপদ্‌বৃত্তি অবলম্বনীয়। এ কালে ব্রাহ্মণের যে যে বৃত্তি দেখা যায়, তৎ সমস্তই আপদ্‌বৃত্তি। ইদানীন্তন প্রধান বৃত্তি চাকরীটী কিন্তু ব্রাহ্মণের আপদ্‌বৃত্তিও নহে। না হউক, ব্রাহ্মণ কিন্তু এই শ্ববৃত্তিকেই এখন স্ববৃত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আর স্ববৃত্তি-কেই শ্ববৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন। সে যাহা হউক, চারি দণ্ডের চেষ্টায় সেকালে পরিবার প্রতিপালন হইত, তখন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল, এখনকার অপেক্ষা অন্ততঃ ষোড়শাংশের একাংশ। সেই হারে হিসাব করিলে, এখন বৃত্তি চেষ্টায় দিন রাত ফিরিলেও তখনকার চারি দণ্ডের কাজ হয় না। সুতরাং পোষ্যবর্গের প্রতিপালন ফেলিয়া অন্য বৈধ কার্য্যে—সময় ক্ষেপ করি, কিছু বলিও না ; না হয়, সব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগের পালনার্থ চেষ্টা করত দিবারাত্রি কাটাই, কিছু বলিও না ;—এও করিতে হইবে, ও-ও করিতে হইবে, সে কাল কি আর এখন আছে ?

না, তা ত নাইহ। পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে এখন সুরাপান করিতে হয়, হোটেলে খাইতে হয়, কত রকম কাজে সময় কাটাইতে হয়, ধর্ম্ম খোয়াইতে হয়! তথাপি কিন্তু আমি বলিতে ছাড়িতেছি না।

চতুর্থ যামার্দ্ধ হইল, দিবাস্নানের প্রধান কাল। প্রাতঃস্নান ও দিবাস্নানের সকল নিয়মই তুল্য, কেবল প্রাতঃকালে তৈল মর্দ্দন করিতে নাই, দিবাস্নানে তাহা আছে। কেবল রবি, মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবারে, শ্রাদ্ধদিনে, ব্রতদিনে, উপবাসদিনে, দ্বাদশীতে, গ্রহণে ও অমাবস্যাদি পর্ব্বে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। চিত্রা, হস্তা, শ্রবণা নক্ষত্রেও তৈলমর্দ্দন করিতে নাই। ষষ্ঠী, নবমী এবং প্রতিপদে মস্তকে তৈল দেওয়া নিষিদ্ধ। রবিবারে তৈলে পুষ্প ফেলিয়া, বৃহস্পতিবারে দূর্ব্বা ফেলিয়া, মঙ্গলবারে মৃত্তিকা ফেলিয়া এবং শুক্রবারে গোময় ফেলিয়া সেই তৈল মাখিতে পারে। তিলের তৈলই ঐ সকল বারাদিতে মর্দ্দনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সার্ষপ তৈলাদি দূষণীয় নহে। প্রথমে মাথায় তৈল মাখিয়া অবশিষ্ট তৈল অন্য গাত্রে কদাচ মাখিবে না।

এই দুইবার নিত্য স্নান ভিন্ন কতকগুলি নৈমিত্তিক স্নান আছে ;—

ক্ষৌরকার্য্য, অশুচি-স্পর্শ, অশৌচান্ত দিন, পুত্র-জন্ম, তীর্থ, পুণ্যাহ (যোগ, মহাবারুণী ইত্যাদি), গ্রহণ, ইত্যাদি কারণেও স্নান করিতে হয়।

অশুচি-স্পর্শ, ক্ষৌরকার্য্য ইত্যাদি কারণে যে স্নান করা যায়, তর্পণ তাহার অঙ্গ নহে। তর্পণ, অদৃষ্ট-জনক স্নানেরই অঙ্গ।

ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদপাঠ—এই সময়ে কর্ত্তব্য। সামবেদী, দিবাস্নান করিয়া মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার সূর্য্যোপস্থানের পর এবং গায়ত্রী-জপের পূর্ব্বে তর্পণ করিবেন ; গায়ত্রী জপাদির পর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন। অন্য বেদী ব্রাহ্মণ, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া সূর্য্যার্ঘ দিবার পূর্ব্বে তর্পণ করিবেন।

প্রাতঃস্নানের পর প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উপস্থিত হইলে, তখনও সামবেদী ব্রাহ্মণ, প্রাতঃ-সন্ধ্যায় সূর্য্যোপস্থানের পর, গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে তর্পণ করিবেন। অন্য বেদী, সূর্য্যার্ঘ দিবার পূর্ব্বে।

ব্রহ্মযজ্ঞ, চারি বেদের চারিটী মন্ত্র পাঠ— অশক্ত পক্ষে। অনিরুদ্ধ ভট্টও তাহাই লিখিয়াছেন।

ব্রহ্মযজ্ঞের পর দেবপূজা। সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা, শিব, নারায়ণ, কুলদেবতা, অগ্নি, লক্ষ্মী ইত্যাদি দেবতাদিগকে, ষোড়শোপচার, দশোপচার, পঞ্চোপচার, গন্ধপুষ্প, সর্ব্বাভাবে জল দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিবে। পার্থিব (মৃণ্ময়,)

শিবলিঙ্গ-পূজনে বিশেষ ফল আছে। জলে অবস্থিত হইয়া দেবপূজা করিতে হইলেও উপবেশন করিতে হইবে; দণ্ডায়মান হইয়া করিলে চলিবে না।

ষোড়শোপচার যথা;—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, এবং বন্দনা।

দশোপচার যথা,—পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, (মধুপর্ক অথবা স্নানীয়) আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য।

পঞ্চোপচার যথা,—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য।

শক্তিপূজা ও শিবপূজা উত্তর-মুখ হইয়া কর্ত্তব্য। অন্য পূজা পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া করিবে। অনন্তর, পঞ্চম যামার্দ্ধে পিতৃলোক, বিশ্বদেব এবং অভ্যাগত অতিথির তৃপ্তিসাধন করিবে। আর সাধারণ মনুষ্য কীট পতঙ্গ এবং পোষ্যবর্গকে ভোজন করাইয়া গৃহস্থ সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিবে। ষড়্রসময়, সুখাদ্য, অনিষিদ্ধ খাদ্য পরম সুখে ভোজন করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি, পিতৃদিগকে অন্নদান, বিশ্বদেবোদ্দেশে অন্নদান, অতিথিসৎকার, সাধারণ প্রাণীদিগকে অন্নদান করিবার উদ্দেশ না করিয়া, কেবল আপনার জন্য পাক করিয়া ভোজন করে, তাহার ন্যায় পাপী জগতে দুর্লভ। হিন্দুসন্তান! এ শিক্ষা আজ তুমি কেন ভুলিলে বলিতে পার?

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কার্য্যাবস্থা।

ফোর্টউইলিয়ম কলেজ—পণ্ডিতি।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ন্যায়-দর্শনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলেজের পাঠ সমাপন করিলে, কলেজ হইতেই "বিদ্যাসাগর" * উপাধি প্রাপ্ত হন। বিংশতি-বর্ষীয় যুবক—"বিদ্যাসাগর!" এমন ভাগ্যবান এ সংসারে কয় জন? ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ বিংশতি বর্ষ বয়ক্রমে কয় জন? কি অপূর্ব্ব বুদ্ধি-বিক্রম! কলেজের অধ্যাপকমাত্রেই বিস্মিত! যিনি ব্যাকরণের অধ্যাপক, তিনি ভাবেন,—"আমি ধন্য"; যিনি সাহিত্যের অধ্যাপক, তিনি বলেন,—"আমার অধ্যাপনা সার্থক"; যিনি দর্শন-স্মৃতির অধ্যাপক, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন,—"ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চিতই অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন।" প্রত্যেকেই প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। সকল প্রশংসাপত্রের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবে, "বিদ্যাসাগর"উপাধি-লিখিত এক সনন্দপত্রে। এই সনন্দ-পত্র কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৺রসময় দত্তের স্বাক্ষরিত। সনন্দপত্রের অনুলিপি এই,—

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুতকোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান্।

ব্যাকরণম্.....................শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্ ....শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্ ....শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্ ....শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্ ....শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্ ....শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ....................শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্যৈতস্যৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।

১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ং।

Sd. Rasamoy Dutta,
Secretary.
10 Decr. 1841.

* ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষে পাঠ্যাবস্থা শেষ করিয়া সংস্কৃতকলেজ পরিত্যাগ সময়ে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ অগ্রজ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করেন।" ১৮৪৩খৃষ্টাব্দ নিশ্চিতই ভুল; কেননা, তিনি সংস্কৃতকলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকুরি করেন।

পাঠ্যাবস্থার অবসানে,—কার্য্য-কালের প্রারম্ভ। এই বার কার্য্য-বীর বিদ্যাসাগর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কার্য্যময় সংসারে কার্য্যের কীর্ত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু প্রকারে; কৃতিত্ব তাঁর কোন কার্য্যে নয়? বাল্যে ও পাঠ্যে যে অপরিসীম শ্রমশীলতা, যে প্রগাঢ় গভীর একাগ্রতা, যে অবিচলিত আত্মনির্ভরতা এবং যে অনিবার্য্য বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা দেখিয়াছেন; কার্য্যক্ষেত্রে তাহারই প্রচুর প্রমাণ ও পরিচয় পাইবেন।

বিপদে নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, নিরাশায় সজীবতা এবং সর্ব্বাবস্থায় নিরভিমানিতা ও সর্ব্ব কার্য্যে নিঃস্বার্থতা দেখিতে চাহেন ত, পাঠক দেখিবেন, বিদ্যাসাগরের জীবনে, কার্য্যাবস্থার প্রারম্ভ হইতে, দেহাবসানের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত। করুণার কথা আর কি বলিব? বলিয়াছি ত তাহার তুলনা নাই। এ বহু-বর্ণময় ভারতভূমিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল কার্য্যই সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া সম্ভব নহে; এবং হয়ও নাই। কিন্তু সকল কার্য্যেই যে সেই শ্রমশীলতা, সেই দৃঢ়তা, সেই নির্ভীকতা, সেই বুদ্ধিমত্তা এবং সেই বিদ্যাবত্তা, সকল সময়েই পূর্ণমাত্রায় পরিচালিত হইত, তাহা তাঁহার জীবনী-পর্য্যালোচনায় নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইবে। তিনি সকল কার্য্যে সকল সময়েই স্বাধিকারভূতা ও স্বকীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্মতা শক্তিরই আমূল সঞ্চালন ও পূর্ণ প্রয়োগ করিতেন। এক কথায় বলি, এমন এক-টানা খরস্রোত ইহ-সংসারে মনুষ্য-জীবনে বড়ই দুর্লভ। এইবার তার পূর্ণ পরিচয়;—করুণার পরিচয় অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পাইবেন। কার্য্যাকার্য্যের বিচার বড় একটা করিব না, কারণ তাহার পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তবে যেটা শিখিবার, সেটা সাধ্যানুসারে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। স্থূল কথা, স্বকার্য্য-সাধনে জীবনে যাহা যাহা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের জীবনীতে তাহাই যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইবে। হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু-সন্তানকে অবশ্য অতি সাবধানে বিদ্যাসাগরের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দোষ-ভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক, গুণভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। তেমন গুণগ্রাম বিদ্যাসাগরে যে বহুপ্রকার আছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কর্ম্মীর জীবনে যে কখন কর্ম্মাবসাদ হয় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে তাহারই পরিচয়। তাহাই সর্ব্ব সময়ে সকলেরই অনুকরণীয় এবং শিক্ষণীয়। কর্ম্মীর কার্য্যাভাব কখন থাকে না, তাহার প্রমাণও বিদ্যাসাগরের কর্ম্মাবস্থার প্রথম হইতেই। বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থকার সিডনি স্মিথ বলিয়াছেন,—

"Let every man be occupied, and occupied in the highest employment of which his nature is capable, and die with the consciousness that he has done his best."

অর্থাৎ সকলেই যেন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি যেন তদনুসারে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হন। আপন কার্য্য যথাসাধ্য সাধন করিয়াছেন, এইটী বুঝিয়াই যেন তিনি মরিতে পারেন।

এ মহাবাণীর সার্থকতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতেই পরিলক্ষিত হয়। সেই টুকুই সহৃদয় পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিলেই, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যারম্ভ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে। এখানে কার্য্য-অর্থে চাকুরী বুঝিতে হইবে। কার্য্যের অবশ্য সু-বিশাল অর্থ,—মনুষ্যের করণীয় মাত্র। চাকুরী কার্য্যের অন্তর্ভূত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপন করেন, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বীরসিংহ গ্রামে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তাৎকালিক সেক্রেটরী মার্সেল সাহেব, তাঁহাকে বাড়ী হইতে আনাইয়া, এই পদে অভিষিক্ত করেন। এই খানে মার্সেল সাহেবের গুণগ্রাহিতার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রধান-পণ্ডিত-পদ শূন্য হওয়ায়, অনেকেই সেই পদের প্রার্থী হন। বহুবাজার মলঙ্গাপাড়া-নিবাসী ৺কালিদাস দত্ত মার্সেল সাহেবের সবিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, মার্সেল সাহেব, কালীদাস বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন। কালিদাস বাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহার একজন পরিচিত পণ্ডিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান-পণ্ডিত-পদে নিযুক্ত হন। মার্সেল সাহেব কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ

পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি জানিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন; অধিকন্তু একজন অসামান্য শক্তিশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কালিদাস বাবু, সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দ্বিরুক্তি করিলেন না; বরং আনন্দিত হইলেন। কালিদাস বাবুও ঈশ্বরচন্দ্রের দক্ষতা ও বিদ্যা-বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আদৌ সন্দিহান ছিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত করা, মার্সেল সাহেবের একান্ত ইচ্ছা, পিতা ঠাকুরদাস এ সংবাদ পাইয়া, বীরসিংহ গ্রাম হইতে বিদ্যাসাগরকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। তৎকালে মার্সেল সাহেবের গুণগ্রাহিতা দেখিয়া, অনেকেই সাহেবকে ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই মার্সেল সাহেব প্রকৃত সহৃদয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তদানীন্তন সাহেব-সম্প্রদায়ের এইরূপ সহৃদয়তা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যাইত। প্রকৃত গুণগ্রাহী, উপরোধ-অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া যে, কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হন না, এখানে সেইটুকুও বুঝা গেল। ক্রমশঃ আরও বুঝা যাইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের বেতন ৫০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে মধুসূদন তর্কালঙ্কার এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদ প্রাপ্ত হন।

বিলাত হইতে যে সকল সিবিলিয়ান, ভারতে চাকুরী করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দ ও পার্শী শিখিতে হইত। ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তাঁহারা কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই সকল ভাষার সাহেব-পরীক্ষকদিগকে সাহায্য করিবার এবং সিবিলিয়ন দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পণ্ডিত ও মৌলবী নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হন, সে সময় এখনকার মতন বিলাতে, তখন প্রতিযোগী সিবিলিয়ান পরীক্ষা ছিল না। তখন মনোনীত হইয়া, তত্রত্য "হালীবরী কলেজে" পড়িতে হইত; এবং তৎপরে সিবিলিয়ান হইয়া, এ দেশে আসিতে হইত। এই সকল সিবিলিয়ান তখন "রাইটাস অব দি কম্পানী" নামে অভিহিত হইতেন। এইজন্য তাঁহারা যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার নাম ছিল "রাইটার্স বিল্ডীং"। এই "রাইটার্স বিল্ডীং" হইতে বর্ত্তমান "রাইটার্স বিল্ডীং" নাম। এখন কলিকাতার যেখানে "রাইটার্স বিল্ডীং" অবস্থিত, তদানীন্তন "রাইটার্স বিল্ডীং" সেই খানেই ছিল। সিবিলিয়ানগণ এই "রাইটার্স বিল্ডীং"য়ে বাস করিতেন। এখানে সিবিলিয়ান সাহেবদের নাচ, ভোজ, আমোদ, প্রমোদ যথারীতি সম্পন্ন হইত। বাড়ীর মধ্যস্থলে, "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে" ও তাহার "আফিস" ছিল। আফিসে পণ্ডিত ও মৌলবী ব্যতীত, "হেড রাইটার" বা "কেসিয়ার" এবং তদধীন দুই তিনটী কেরাণী কার্য্য করিতেন। সিবিলিয়ানদিগকে প্রতি মাসে পরীক্ষা দিতে হইত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার একটা সময় নির্দ্ধারিত ছিল; সেই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, সিবিলিয়ানদিগকে বিলাতে প্রত্যাগমন করিতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতি মাসে পরীক্ষার কাগজ পত্র দেখিতেন। এতদ্ভিন্ন মার্সেল সাহেব তাঁহার নিকট সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিতেন। পদে পণ্ডিত হইলেও, কার্য্যে তাঁহার ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক; সুতরাং তাঁহার ইংরেজি শিখিবার প্রয়োজন হইল। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে হিন্দী পরীক্ষারও কাগজপত্র দেখিতে হইত; কাজেই হিন্দী শিক্ষাও আবশ্যক হইল। ইংরেজি শিক্ষা অপেক্ষা হিন্দী শিক্ষা অবশ্য অপেক্ষাকৃত সহজ; কেননা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্য অনেকটা। তিনি মাসকতক পরিশ্রম করিয়া একজন হিন্দী-ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হিন্দী শিখিয়া লইলেন।

ইংরেজি-শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর, বিশেষ এ চাকুরীর অবস্থায়; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতন অসাধারণ শ্রমশীল এবং অসীম অধ্যবসায়ী ব্যক্তির নিকট কষ্টকর আর কি? তাহা হইলে, অন্যান্য সাধারণের সহিত তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রহিল কোথায়? সাধারণ্যের সহিত অসাধারণ্যের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্ব দেশে। তাহা হইলে ৫০৲ টাকার বেতনভোগী একজন সামান্য কর্ম্মচারী, সংসারের সর্ব্বোচ্চ পথে, ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য সজীব পদাঙ্ক রাখিয়া যাইতে পারে কি? বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন, প্রথম

"প্রিণ্টার"; রালে ছিলেন, সামান্য সৈনিক পুরুষ; ইংলণ্ডের কবি-গুরু চসরও ছিলেন, সৈনিক পুরুষ; সেক্সপিয়র ছিলেন, নাট্যশালার নট;—আর কত নাম করিব? ইহাঁরা যে গুণে বড়, বিদ্যাসাগর সেই গুণে বড়। ইহাঁদের স্বাতন্ত্র্য সাধারণ হইতে যে গুণে, বিদ্যাসাগরেরও স্বাতন্ত্র্য সেই গুণে। সেই গুণ,—সেই শ্রমশীলতা ও একাগ্রতা।

পৃথিবীতে যাহারা সর্ব্বোচ্চ প্রতিভাশালী বলিয়া পরিচিত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, বুঝা যাইবে এবং বলিতেই হইবে, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মশীল; এমন কি, তাঁহাদের অধিকাংশকে অতি হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। এই জন্যই বলিতে হয়, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ, মানুষের সহিষ্ণুতায় এবং শ্রমশীলতায়। প্রতিভার কার্য্য-বিরাম কোন কালে থাকে না। ওয়াসিংটন বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থায় অবসরে রসিদ, ছাড়, হাতচিঠী প্রভৃতি নকল করিতেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা পরিপুষ্ট বাল্যকাল হইতেই, তাঁহার শ্রমশীলতায়। পাঠ্যাবস্থায় কাজ না থাকিলে এবং আবশ্যক না হইলেও, যিনি অবসরে পুঁথি নকল করিয়া কার্য্যানুরাগিতার পরিচয় দিতেন, তাঁহার পক্ষে এই চাকুরীর অবস্থায় অত্যাবশ্যক ইংরেজি শিক্ষাটা আর কষ্টকর কি? বিখ্যাত ইতিহাসলেখক নিবর চাকুরী করিতে করিতে, অবসর সময়ে আরব্য, রোমান এবং অন্যান্য "শ্রাবনিক" ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় একজন অতি-শ্রমশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে ইংরেজিটা শিখিয়া লইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? ইংরেজি শিক্ষার উপর তাঁহাকে আরও গুরুতর পরিশ্রমসাপেক্ষ কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছিল। এই সময়, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পড়িতে আসিতেন। এই সকল লোককে পড়াইয়া, তিনি আবার স্বয়ং ইংরেজি পড়িতেন। ভাবিলে মুণ্ড ঘুরিয়া পড়ে! মনে হয়, কখনই বা তিনি সময় পাইতেন, আর অত গুরুতর পরিশ্রমই বা কেমন করিয়া করিতেন? সত্য সত্যই কিন্তু তাঁহাকে তাহাই করিতে হইত।

এই সময় তাঁহার বাসা ছিল, বহুবাজার পঞ্চাননতলা নিতাই সেনের বাড়ীতে। এ বাহিরে দুইটী বড় বড় ঘর ছিল। একটী ঘরে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা থাকিতেন; এবং অপর ঘরে তাঁহার দেশস্থ লোক বাস করিতেন। এখান হইতে পরে অতি নিকটেই ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৈঠকখানা" বাড়ীতে বাসা উঠিয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এখন ইংরেজি শিখিবার বাসনা বড়ই বলবতী হইল। যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই উপায়। তিনি ৺নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রত্যহ প্রাতে ইংরেজি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। নীলমাধব বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবুর পিশতুতা-ভাই। ইনি তালতলা-নিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। দুর্গাচরণ বাবু তখন ডাক্তার হন নাই,—হেয়ার সাহেবের স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। দুর্গাচরণ বাবু এই সময় প্রায়ই প্রত্যহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় আসিতেন। ক্রমে তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ হয়। দুর্গাচরণ বাবু ডাক্তার হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার হৃদয়ের কার্য্যে অনেক সহায়তা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দুর্গাচরণ বাবুর সহায়তায় ও চিকিৎসায় অনেক আর্ত্ত-পীড়িতের কষ্ট নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন। নীলমাধব বাবুও ডাক্তার হইয়া, তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিতেন। নীলমাধব বাবুর নিকট কিছুদিন ইংরেজি শিখিয়া, তিনি হিন্দুকলেজের অন্যতম ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের নিকট রীতিমত ইংরেজি শিক্ষা করেন।* ইংরেজি অঙ্ক শিখিবার জন্যও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই শোভাবাজার রাজবাড়ীতে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বসু এবং ৺ শ্রীনাথ ঘোষের নিকট যাইতেন। অঙ্ক শিখিবার জন্য, তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল; কিন্তু বিষয়টা তাঁহার তত প্রীতিপ্রদ হয় নাই, অথচ ইহাতে অনেকটা সময় অনর্থক অতিবাহিত হইত, তদুপরি বিষয়টা তাঁহার নীরস বলিয়া বিবেচিত হইত; অগত্যা

* বিদ্যরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, রাজনারাণ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন পাইতেন; কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রত্যহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় আহার করিয়া কলেজে পড়িতে যাইতেন; এবং মাসে মাসে যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইতেন।

তিনি তাহা হইতে বিরত হন। এই সময় শোভা-বাজার রাজবাটীতে, চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি প্রণেতা ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। তখন অক্ষয় বাবু তত্ত্ব-বোধিনীর একজন প্রধান লেখক। তত্ত্ববোধিনীর সহিত আনন্দ বাবুপ্রমুখ অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। অক্ষয় বাবু যাহা লিখিতেন, তাঁহাদিগকে তাহা দেখিয়া, আবশ্যক-মত সংশোধনাদি করিয়া দিতে হইত। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন, এমন সময় অক্ষয় বাবুর একটা লেখা তথায় উপস্থিত হয়। আনন্দ বাবু বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে অক্ষয় বাবুর লেখাটা পড়াইয়া শুনাইয়া দেন। অক্ষয় বাবু পূর্ব্বে যে সব অনু-বাদ করিতেন, তাহাতে কতকটা ইংরেজি ভাব থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুর লেখা দেখিয়া বলিলেন,—"লেখা বেশ বটে; কিন্তু অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজি ভাব আছে।" আনন্দ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ও যথাযোগ্য পরিষ্কার বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় সংশোধন করিয়া দেন। এইরূপ তিনি বার কতক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু সেই সুন্দর সংশোধন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেন। তখনও কিন্তু তিনি বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে জানিতেন না। লোকের দ্বারা প্রবন্ধ প্রেরিত হইত; এবং লোকের দ্বারায় ফিরিয়া আসিত। তিনি সংশোধিত অংশের বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল বাঙ্গালা দেখিয়া ভাবিতেন,—"এমন বাঙ্গালা কে লিখে?" কৌতূহল নিবারণার্থ তিনি একদিন স্বয়ং আনন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হন; এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় পান। আনন্দ বাবুর অনুগ্রহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। ইহার পর অক্ষয় বাবু যাহা কিছু লিখি-তেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইয়া লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিতেন। পরে পরস্পরের প্রগাঢ় সৌহার্দ্দও সংগঠিত হইল। অক্ষয় বাবু এবং তত্ত্ব-বোধিনীর অন্যান্য সভ্যগণের অনুরোধে বিদ্যা-সাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হন। এই সূত্রে তিনি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের অত্যন্ত প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৭৭০ শকের ফাল্গুন মাসে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার ৬৭ সংখ্যায় মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। আদিপর্ব্বের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়া-ছিল। অনুবাদের একটু নমুনা এই;—

নারায়ণ ও সর্ব্বনরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

কোনকালে কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিবস ব্রত-পরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন এই অবসরে সূত লোমহর্ষণ-পুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবা বিনীত ভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈমিষা-রণ্যবাসী তপস্বিগণ দর্শনমাত্র অদ্ভুত কথা শ্রবণ-বাসনাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবা বিনয়-নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত অতিথি-সং-কারান্তে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে সমুদায় ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দ্দিষ্ট আসনে নিবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রান্তি দূর হইলে কোন ঋষি কথাপ্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্ম-পলাশলোচন সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিলে বল।" *

ইহাই অনুবাদ। বিলাতের জনসন, মিণ্টন, স্কট, কারলাইল্ প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী লেখক-দিগকেও প্রথম প্রথম অনুবাদেই হাত পাকা-ইতে হইয়াছিল। অনুবাদ হউক, ইহাতেও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়। সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায়, অক্ষরে অক্ষরে কিরূপ সুন্দর অনুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পথ দেখাইলেন। ইহার পূর্ব্বে কেবল সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এরূপ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে পারিতেন না। তবে

* বলা বাহুল্য, ইহার পূর্ব্বে মহাভারতের এরূপ বঙ্গানুবাদ হয় নাই।

এ অনুবাদের ভাষা ও লিপিভঙ্গী অপেক্ষা তাঁহার পরবর্ত্তী অনুবাদ ও প্রবন্ধাদির লিপিভঙ্গী যে অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। "*Voyage to Abysinia*" নামক গ্রন্থের জনসন সর্ব্বপ্রথম যে গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার লিপি-পদ্ধতির সহিত, তৎকৃত পরবর্ত্তী পুস্তকাদির লিপি-পদ্ধতির তুলনা করিলে যেমন তারতম্য অনুভূত হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরবর্ত্তী গ্রন্থাদির লিপি-পদ্ধতির সহিত এ অনুবাদের লিপি-পদ্ধতির তুলনা করিলে তেমনই তারতম্য বোধ হয়।

বঙ্গভাষার যতই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাসীকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চির-ঋণী থাকিতে হইবে। তাঁহার লিপি-ভঙ্গী ও বাক্-বিন্যাস-চাতুরী যেন "নিত্যই নব।" অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু ভাব-ভঙ্গী রতি-ভোরও হয় নাই। সংস্কৃত-ভাঙ্গা দুরূহ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিবে; কিন্তু লালিত্য-মাধুর্য্যের ত্রুটি কুত্রাপি নাই। যখনই পড়, তখনই অভিনব বলিয়া অনুভব হয়।

স্বল্পাক্ষরে যিনি বহুভাব প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি শক্তিশালী লেখক বলিয়া পরিচিত। ভাব-পূর্ণ সংযমিত শব্দ-প্রয়োগে যিনি নিপুণ, তিনি সু-লেখক নামে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ প্রতিষ্ঠা যে আছে, তাহা তাঁহার"বিধবা-বিবাহ"ও"বহু-বিবাহ"সম্বন্ধে পুস্তক এবং অন্যান্য অনুবাদিত ও সঙ্কলিত পুস্তকাবলীর মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা প্রভৃতি পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়। বিদ্যাসাগর সাহিত্য-জগতে অমর হইয়া রহিলেন।

কোন বিশেষ কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব পরিত্যাগ করেন। সে কারণের উল্লেখে, কাহারও কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে ভাবিয়া, তাহার উল্লেখ এখানে করিলাম না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাসায় ইংরেজি শিখিতেন, তখন হইকোর্টের অন্যতম অনুবাদক ৺শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীল- ·· মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালী এমনই কৌশলময় যে, অতি দুরূহ বিষয়ও অল্প দিনের মধ্যে সহজে শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হইত। সে শিক্ষাপ্রণালীর কথা শুনিয়া, সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পণ্ডিত মণ্ডলীও চমৎকৃত হইতেন। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন, এবং তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালীটা কিরূপ ছিল, রাজকৃষ্ণ বাবুর সংস্কৃত শিক্ষাতত্ত্বটা বিবৃত করিলেই, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। বুঝিবেন, এ জগতে শ্রমশীল কর্ম্মশূরের অসাধ্য কিছুই নাই।

রাজকৃষ্ণ বাবু বহুবাজার-নিবাসী ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার সম্মুখেই ইহাঁর বাড়ী ছিল। তখন ইহাঁর বয়স ১৫।১৬ বৎসর। ইনি হিন্দু কলেজে ইংরেজি পড়িয়া, এই বয়সেই পড়া-শুনা ছাড়িয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইহাঁর আলাপ-পরিচয় হওয়াতে, ইনি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় যাইতেন। এক দিন তিনি দেখিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু, সুর করিয়া, মেঘদূত পড়িতেছেন। সুন্দর সুরলয়ে উচ্চারিত মেঘদূতের সেই রসপূর্ণ ও ভাবময় শ্লোকের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবু বিমোহিত হইলেন। তখন তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার বাসনা হইল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এত বয়সে মুগ্ধবোধ পড়িয়া, সংস্কৃত শিখিতে গেলে, সংস্কৃত শিক্ষা দুষ্কর হইবে; অধিকন্তু অনর্থক সময় নষ্ট হইবে। এইরূপ ভাবিয়া, তিনি ব্যাকরণ শিখাইবার একটা সরল পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলিলেন,—"দেখ আমি যখন মুগ্ধবোধ মুখস্থ করি, তখন ইহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই; পরে যখন সংস্কৃত সাহিত্যে অগ্রসর হইলাম, তখন ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হই। তোমাকে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করাইয়া, সংস্কৃত শিখাইতে হইলে, সংস্কৃত শিক্ষা দায় হইবে। অতএব তোমাকে একটা সহজ উপায়ে ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি সেদিন রাজকৃষ্ণ বাবুকে বিদায় দিলেন। পরদিন রাজকৃষ্ণ বাবু আসিয়া দেখেন, তাঁহার জন্য ব্যাকরণ শিখিবার সরল ও সহজ উপায় উপস্থিত। চারি 'তা' ফুল-স্কেপ কাগজে, বাঙ্গালা অক্ষরে, বর্ণমালা হইতে ধাতু প্রত্যয়াদি পর্য্যন্ত, মুগ্ধবোধের সারাংশ

লিখিত। রাজকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া অবাক্ হইলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, "ইহাই উপক্রমণিকা ব্যাকরণের সূত্রপাত। উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পূর্ব্বাভাস এইখানেই তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করে। ইহা অনুবাদ নহে; ইহাতে উদ্ভাবনা-শক্তির পরিচয় পত্রে পত্রে। রাজকৃষ্ণ বাবু সেই ফুলস্কেপ কাগজে লিখিত ব্যাকরণের সারাংশ এবং তাৎকালিক ব্যাপ্‌টিষ্ট প্রেসে মুদ্রিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মাস দুই তিন পড়িয়া তিনি ব্যাকরণের আভাস কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তিন চারি মাসের পর তিনি মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালী গুণে এবং স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমবলে রাজকৃষ্ণ বাবু ছয় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ পড়া সাঙ্গ করেন। পরে তিনি কাব্যাদি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজে "জুনিয়ার" ও "সিনিয়র" পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণবাবুকে "জুনিয়ার" পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুও সম্মত হইলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন সংস্কৃত কলেজে গিয়া শুনেন, একটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ৮টী টাকা "জুনিয়ার" বৃত্তি পাইতেছেন। ব্রাহ্মণের সেই ৮টী টাকার উপর পড়া-শুনা এবং আহারাদি সবই নির্ভর করিত। এ সংবাদ পাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিলেন,—"রাজকৃষ্ণের" জুনিয়ার পরীক্ষা দেওয়া হইল না; কেননা, রাজকৃষ্ণ যদি পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, তাহা হইলে পরবর্ষে এই ব্রাহ্মণের বৃত্তি রোধ হইবে। স্বভাবসিদ্ধ পরদুঃখ-কাতর বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্মণের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে, দয়ার্দ্রচিত্তে বিগলিত হইলেন। তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবুকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুও "জুনিয়ার" পরীক্ষা দিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। ইহা গুরু শিষ্যেরই সহৃদয়তার পরিচয় নহে কি? করুণা-স্রোতে উভয়েরই বলবতী বাসনা ভাসিয়া গেল! যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণ বাবুকে "সিনিয়র" পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—"আমি কি পারিব?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"কেন পারিবে না? তবে একটু বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে, তুমি প্রত্যহ ৯টার সময় আহারাদি করিয়া আমার সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাইতে পারিবে?" রাজকৃষ্ণ বাবু সম্মত হইলেন। তিনি প্রত্যহ ৯টার সময় আহারাদি করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সাহেবকে পড়াইতেন এবং অন্যান্য কাজ করিতেন। ইহার মধ্যে কোন রকমে অবকাশ পাইলেই, তিনি সাহেবের গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবুকে পড়াইয়া যাইতেন। তিনটার সময় আফিসের কার্য্য সমাধা হইলেই, তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই রাজকৃষ্ণ বাবুকে পড়াইতেন। পরে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়া, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতেন। ঐ সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীদিগকেও শিক্ষা দিতে হইত। রাজকৃষ্ণ বাবু কোন কোন দিন পড়িতে পড়িতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় ঘুমাইয়া পড়িতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জাগরিত করিয়া পড়াইতেন। এইরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার সুপ্রণালীতে এবং নিজের অবিচলিত অধ্যবসায়ে, রাজকৃষ্ণ বাবু ২॥০ আড়াই বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। চমৎকার! চমৎকার! ৪।৫ বৎসরের শিক্ষা ২॥০ বৎসরে। কথাটা সহরময় রাষ্ট্র হইল। দলে দলে পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বাবুকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। অকৃতপূর্ব্ব অভিনব পদ্ধতি ও প্রথার প্রতিষ্ঠা এইরূপই। বিখ্যাত স্বচ-গ্রন্থকার কারলাইলের নূতন পদ্ধতি ও প্রণালী মতে প্রবন্ধসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে পরে, বহুতর বিজ্ঞতম বিদ্বানমণ্ডলী সুদূর স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য-প্রদেশ "ডমফ্রের" ক্ষেত্রাবাসে গিয়া কারলাইলকে দেখিতে যাইতেন। আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার এমারসন সাহেব, কেবল কারলাইকে দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিবার জন্য স্কটলণ্ডে আসিয়াছিলেন

১৮৪৩-৪৪ সালে রাজকৃষ্ণ বাবু সংস্কৃতকলেজের সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ টাকা বৃত্তি পান; পরে দুই বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

আর একবার পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; এমন কি, তিনি মৃতকল্প হইয়াছিলেন। শরীর শোধরাইবার জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়; সুতরাং আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

পাঠক, অবশ্য বুঝিলেন, বাঙ্গালী বিদ্যাসাগর কি অদ্ভুত শক্তি লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময় একদিন পথে পিতা ঠাকুরদাসের কি একটা দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। কাহারও কাহারও মুখে শুনি, অশ্বের পদাঘাতে তিনি আহত হন; কিন্তু এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে কেহই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত নহেন। যাহা হউক, এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, পিতাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন,—"বাবা! এখন ত আমি ৫০৲ টাকা পাইতেছি, স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবে, আপনি আর কেন পরিশ্রম করেন? আপনি দেশে গিয়া থাকুন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিতান্ত অনুরোধে পিতা ঠাকুরদাস কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, দেশে যাইয়া বাস করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে মাসে মাসে ২০৲ টাকা পাঠাইয়া দিতেন এবং বাসায় ৩০৲ টাকা খরচ করিতেন। এই সময় বাসায় তাঁহার দুই সহোদর, দুই জন পিতৃব্যপুত্র, দুই জন পিস্‌তুতা-ভাই, একজন মাস্‌তুতা-ভাই এবং অনুগত ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত * থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত দুই চারিজন অতিরিক্ত লোকও প্রায়ই দুই বেলা আহার পাইত। বাসায় সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে রন্ধন করিতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও রন্ধন করিতেন। তা না করিলে কি, ৩০৲ টাকায় এতগুলি লোকের অন্নসংস্থান হয়? বিদ্যাসাগরের নিকট কি শিখিবার, পাঠক! তাহা বুঝিতে কি এখনও বাকি রহিল? পঞ্চাশ টাকা বেতনভোগী বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ "কৃচ্ছ্রসাধ্য" ব্যবস্থা কয়জনের দেখিতে পাও? দেখুন,—দেখুন,—আরও দেখুন। পরিশ্রমের সীমা এইখানেই নহে।

এই সময়ে মার্সেল সাহেব, সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়ার পরীক্ষার পরীক্ষক হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া সাহেবের সাহায্য করিতে হইত। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি সকল প্রশ্নই তিনি নিজেই লিখিয়া দিতেন। ভাবি তাই, একটা মানুষ এত কাজ কি করিয়া করিতেন? ভাবি, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়ি! কিন্তু আবার যখন বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিক কবডেনের কথা মনে হয়,—"আমি ঘোড়ার মতন, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া খাটিতেছি"; যখন ভাবি,—"রোমক সম্রাট সিজর আল্পস্ হইতে সৈন্য সঞ্চালন করিবার সময় "লাটিন অলঙ্কার" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন,—তখনই মনকে প্রবোধ দিই, শক্তিশালী শ্রমশীল ব্যক্তির ইহজগতে অসাধ্য কি? এই গুণেইত পশুর উপর মনুষ্যের রাজত্ব; সামান্যের উপর অসামান্যের প্রভুত্ব।

এই সময় বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ ১০১টী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। যাঁহারা সংস্কৃত কলেজে উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহারা এই সকল স্কুলের পণ্ডিতী পদ পাইতেন। এই উদ্দেশ্যেই এই সকল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিতপদ-প্রার্থীদিগের পরীক্ষা করিতেন।

মস্তিষ্কের পরিচয় পাইলেন, এখন এই সময়ের একটু হৃদয়ের পরিচয় লউন। পাঠ্যাবস্থায় যখন সামান্য বৃত্তি পাইতেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা হইতেই অন্নার্থী ও বস্ত্রার্থীকে সাধ্যানুসারে অন্ন-বস্ত্র দান করিতেন। এখন তিনি ৫০৲ টাকা বেতনভোগী। ২০৲ টাকা দেশে পিতার নিকট পাঠাইতেন; আর ৩০৲ টাকা মাত্র রাখিতেন বাসাখরচের জন্য। এই ৩০৲ টাকার মধ্যেও তিনি বাসাখরচ চালাইয়া,আবশ্যক মত সাধ্যানুসারে অন্ন-বস্ত্রার্থী এবং পীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করিতেন। দৃষ্টান্ত অনেক আছে; কত বলিব? দুই একটীর মাত্র উল্লেখ করি।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গদাধর তর্কবাগীশের বিসূচিকা পীড়া হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদ পাইয়া, ডাক্তার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, তর্কবাগীশ

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যখন সুকিয়া-ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা ছিল, তখন কতকগুলি আত্মীয় লোক তাঁহার প্রাণনাশ কল্পে ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তখন এই অনুগত ভৃত্য শ্রীরামের কল্যাণেই তিনি আত্মরক্ষায় সক্ষম হন। সে ব্যাপার বর্ত্তমান কালে বিবৃত করিবার পক্ষে নানা বাধা আছে।

মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হন। ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করেন এবং তিনি নিজহস্তে বিষ্ঠামূত্র পরিষ্কার করিয়াছিলেন। ঔষধের মূল্য বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে দিয়াছিলেন। কোন অনাথ দুঃস্থ লোক পীড়িত হইলে,তিনি স্বয়ং গিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন; এবং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নিজের ব্যয়ে সাধ্যানুসারে ঔষধ-পথ্য যোগাইতেন।

একবার নারিকেলডাঙ্গায় অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাত্রিকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চিকিৎসা করান। তিনি নিজের বাসা হইতে মাদুর-বিছানা লইয়া গিয়া, রোগীর শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, "তাঁহাকে প্রায়ই এইরূপ করিতে হইত। তাঁহার সে অকৃত্রিম দয়ার কার্য্য কি সব আমার স্মরণ আছে? আর কতই বা বলিব মহাশয়, আর কতই বা শুনিবেন? সে সব কথা স্মরণ হইলে, বিদ্যাসাগরের সে বীরমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরূক হয়; তাঁহার কথা ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়; চক্ষের জল রাখিতে পারি না! আহা! তেমন দয়ালু দাতা কি আর এ জগতে দেখিব?" একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার সম্মুখে, কোন এক ব্যক্তির ভৃত্য ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়। যাহার ভৃত্য, তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেন। আহা! সে অনাথ-পীড়িতের এমন কেহই ছিল না যে, তাহার মুখে একটু জল দেয়। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর সংবাদ পাইয়া, তখনই গিয়া, সেই পীড়িত ভৃত্যকে বুকে করিয়া তুলিয়া আনিয়া আপনার শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। তাঁহার অবিরাম যত্ন-শুশ্রূষায় এবং সুহৃদ্ চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগী দুই চারি দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। কি দয়া! কি করুণা!

বিদ্যাসাগর মহাশয়, সুবিধা পাইলেই, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব এবং গুণবান কৃতবিদ্য লোকের চাকুরী করিয়া দিতেন। কোন কোন সময় তিনি অপরের জন্য আত্মত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সময় সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পদ শূন্য হয়। মার্সেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই পদের বেতন ৮০৲ টাকা। ৫০৲ টাকার বেতনভোগী বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। তাহার কারণ শুনিতে পাই, তিনি পূর্ব্বে তাৎকালিক বহু-শাস্ত্রাধ্যাপক ৺ তারানাথ বাচস্পতি মহাশয়কে যেরূপেই হউক কোন একটী চাকুরী করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন; এবং উপস্থিত পদে বাচস্পতি মহাশয় উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। সুযোগ পাইয়া, তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। এই পদে বাচস্পতি মহাশয় যাহাতে নিযুক্ত হন, তাহার জন্য তিনি মার্সেল সাহেবকে অনুরোধ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, যখন সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি বলেন,—"মহাশয় টাকার প্রত্যাশা করি না, আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই, আমি চরিতার্থ হইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এরূপ চাটুবাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার জীবন-সমালোচনা করিলে, এরূপ করিতে সাহস হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রকৃত প্রতিশ্রুতির কথা বলিলে সাহেব হয়ত, তাঁহাকে অহঙ্কারী মনে করিবেন, সুতরাং কথা রক্ষার সম্ভাবনা নহে বলিয়া, তিনি এইরূপ তুষ্টিকর কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর আত্মগোপন করিয়া, সাহেবের তুষ্টিকর কথা বলিবেন, এ কথা বিশ্বাস করিতেও কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না।" আর মার্সেল সাহেবও যে, আত্মতুষ্টিকর কথায় বিমূঢ় হইয়া পড়িবেন,এ ধারণাও আমাদের নাই। যাহা হউক, মার্সেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায়, বাচস্পতি মহাশয়কেই উক্ত পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। যে দিক দিয়াই হউক, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বার্থত্যাগের সজীব সঙ্কেত। এরূপ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে একটু হৃদয়-বলের প্রয়োজন। জার্ম্মণ পণ্ডিত হীনের জীবনী পাঠে, তদানীন্তন মনস্বী রস্কিনের এইরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাকে একবার একটী উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব হয়; তিনি কিন্তু হীনকে ঐ পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, উক্ত পদ তাঁহাকেই দিবার জন্য অনুরোধ করেন।[*] এ ব্যাপারে কেবল বিদ্যাসাগরের স্বার্থত্যাগের পরিচয় নহে; প্রতি-

তি রক্ষা করিতে, তাঁহাকে কিরূপ কঠোরতা হ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাইলে, পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

যে সময় বাচস্পতি মহাশয়কে নিযুক্ত করিবার কথা, সে সময় বাচস্পতি মহাশয় অম্বিকা-কালনায় অবস্থিতি করিয়া, তেজারতীর কারবার করিতেছিলেন; এতদ্ব্যতীত তথায় তাঁহার একটী টোলও ছিল। তাঁহাকে প্রয়োজন সোমবার; কথা হয় শনিবার; সুতরাং পত্র পাঠাইলে পত্র পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই; পৌঁছিলেও বাচস্পতি মহাশয় এ কার্য্য স্বীকার করিবেন কিনা, তাহার স্থিরতা ছিল না। এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দিনই একজন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া কালনা অভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে কালনা প্রায় ২৪।২৫ ক্রোশ দূর। তিনি ও সেই সঙ্গী আত্মীয়, সারা-রাত পদব্রজে চলিয়া পরদিন বাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। বাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার পিতা, বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের মুখে তাঁহার গমন-কারণ জানিয়া চমৎকৃত হইলেন; এবং শতবার ধন্যবাদ করি-লেন। প্রতিশ্রুত রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর অনা-য়াসে ও অক্লেশে এত পথ-পরিশ্রম সহ্য করিয়াছেন, এ কথা ভাবিয়া তাঁহারা বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—"ধন্য বিদ্যসাগর! তুমিই নরাকারে দেবতা।" যাহা হউক, শুনিয়াছি, এ পদগ্রহণে বাচস্পতি মহাশয়ের কি একটা আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহা-শয় সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া, তাঁহাকে এ পদ গ্রহণে সম্মত করান। পরদিন তিনি আবার সেই আত্মীয় সঙ্গে কলিকাতায় উপস্থিত হন। বাচস্পতি মহাশয় সঙ্গে আসেন নাই; তাঁহার প্রশংসাপত্রাদি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রদত্ত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সব প্রশংসাপত্র মার্সেল সাহেবকে প্রদান করিলেন। মার্শেল সাহেব, বাচস্পতি মহাশয়কে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করেন। পরে বাচস্পতি মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া পদ প্রাপ্ত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ "পথ-চলার" কথাটা কবি-কল্পনাই বলিয়া যেন মনে হয়। সত্য সত্যই কিন্তু তাঁহার "পথ-চলা", শক্তি এমনই ছিল। তাঁহার "পথ-চলা' সম্বন্ধে কত কথাই শুনিয়াছি; তখনত তিনি হৃষ্ট-বলিষ্ঠ-কলেবর শক্তিশালী যুবক ছিলেন। তিনি রোগ-ভগ্ন দেহে যেরূপ চলিতে পারিতেন, একজন ভীম-কলেবর সুদৃঢ়-দেহসম্পন্ন যুবকও তেমন চলিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিয়াছেন,—"একদিন কর্ম্মটায় আমি, দাদামহাশয় এবং আর কয়েক জন, প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করি। আমি বলিলাম, 'দাদামহাশয় আজ আপনাকে হারাইয়া দিব। দেখি আপনি কেমন আমাদের অপেক্ষা হাঁটিয়া যাইতে পারেন।' দাদামহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলি-লেন,—'ভাল তাহাই হইবে'। এই বলিয়া আমারা সকলে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম; আমাদের সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন; আমি কেবল তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিলাম; কিয়দ্দুর যাইয়া দেখি দাদামহাশয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, চটি জুতা পায়ে চটচট করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। আমি চেষ্টা করিয়াও, তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। দাদা মহাশয়, দূর হইতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'হারাবি না?' আমি অবাক্!"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"সংস্কৃত কলেজে চাকুরী করিবার সময়, একদিন বাবার বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় একদিনে আসিবার প্রয়োজন হয়। তিনি তাড়া-তাড়ি বাহির হইবার উদ্যোগ করেন। সেই সময় মদনমণ্ডল নামে একজন পাইক বাবাকে বলিল, আমি তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব।' বাবা বলিলেন,—'তুমি আমার সঙ্গে হাঁটিতে পারিবে?' সে স্বীকার করিল। পরে উভয়েই হাঁটিতে লাগি-লেন। ৪।৫ ক্রোশ পথ আসিয়া মদনমণ্ডল দেখিল; বাবা তাহাকে ছাড়িয়া, ৩।৪ রসি অগ্রসর হইয়াছেন। সে 'হা রা রা' করিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, আপনি দু-চার পাক ঘুরিয়া, দ্রুতপদে বাবাকে ধরিবার চেষ্টা করিল; এবং ছুটিয়া গিয়া বাবাকে ধরিল। উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। ১০।১২ ক্রোশ দূরে গিয়া মদন বাবাকে বলিল,—দেখ আজ আর কলি-কাতায় যাওয়া হইবে না; এই চটিতে থাকা

যাক।' বাবা হাসিয়া বলিলেন, 'আমাকে যাইতেই হইবে। তুমি এই পয়সা লইয়া, চটিতে থাক, কাল তখন যাইও।' মদন চটিতে রহিয়া গেল। বাবা কলিকাতায় আসিলেন।"

"বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে এক দিনেই হাঁটিয়া বাড়ী যাইতেন, একদিনেই বাড়ী হইতে কলিকাতা আসিতেন। বীরসিংহ গ্রাম হইতে প্রায় ১০।১২ ক্রোশ দূরে মসাট নামক স্থানে একটী করিয়া ডাব খাইতেন মাত্র। যখন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখনও তিনি হাঁটিয়া যাইতেন, এমন কি সঙ্গীদের মোট-বোঝা ভারী হইলে, তিনি তাহাদের মোট বোঝা কতক নিজের মস্তকে লইয়া হাঁটিতেন। একবার পথে তিনি এইরূপ অবস্থায় যাইবার সময়, কলেজের দুইজন দ্বারবানের সম্মুখে পতিত হন। দ্বারবানেরা তাঁহার তদবস্থা দেখিয়া তাঁহার মোট লইবার চেষ্টা করে; তিনি কিন্তু তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় বিদায় দিয়া, মোট বহিয়া আপনি চলিয়া যান।

বাড়ী যাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে ভ্রাতা, পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সঙ্গে মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন। পথে কৌতুক করিবার জন্য কোন নালা-নর্দ্দামা দেখিলেই লাফাইয়া পার হইতেন এবং মধ্যম ভ্রাতাকে সেই নালা-নর্দ্দামা পার হইবার জন্য উপরোধ করিতেন। মধ্যম ভ্রাতা বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কখন কখন লাফাইতে গিয়া পড়িয়া যাইতেন। সেই সময় হো হো হাসির রব হইত। তিনি মধ্যম ভ্রাতাকে লইয়া এইরূপ কৌতুক প্রায়ই করিতেন।

একবার তিনি বীরসিংহ গ্রাম হইতে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন, এক মাঠের মাঝে দেখিলেন, একটী অতি বৃদ্ধ কৃষক মাথায় মোট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হতভাগ্যের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, লোকটীর বাড়ী সেখান হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে। তাহার যুবক পুত্র, তাহার মস্তকে বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়াছে। বৃদ্ধ এখন চলচ্ছক্তিহীন। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া এবং পুত্রের ব্যবহারের কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের মস্তক হইতে সেই বোঝা আপন মস্তকে তুলিয়া লইলেন; এবং বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গেলেন। তিনি সেই মোট বৃদ্ধের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়া, আবার হাঁটিয়া কলিকাতায় আসেন।

এমন অনেক গল্প শুনিয়াছি, সব কথা বলিতে গেলে জন্মভূমিতে স্থান হইবে না। ইহাতেই অবশ্য বুঝিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের চলচ্ছক্তি কিরূপ অসামান্য। বল দেখি, মস্তিষ্ক ও দেহের এরূপ শক্তিসমাহার ইহ-সংসারে অতি বিরল কি না? আর কোন বাঙ্গালীর এমন দেখিয়াছ কি? কেবলই কি তাই; এমন অনাত্মপরতা বা কয় জনের আছে বল? বল, বুদ্ধি, দয়া,—তিনটীর একত্র সমাবেশ, বড় ভাগ্যবান না হইলে কি হয়? একাধারে যে ত্রিবেণীর ত্রিধারা।

ইহার উপর আবার ভাতৃভক্তির মন্দাকিনী-ধারা পূর্ণোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত। এই খানে তাহারও একটু পরিচয় দিব।

এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্য করিবার সময়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতার বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল। বীরসিংহ গ্রাম হইতে জননী পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন,—"তুমি অতি অবশ্য আসিবে।" মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন মার্সেল সাহেবের নিকট ছুটীর জন্য প্রার্থনা করেন; ছুটী কিন্তু পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন,—"আমাকে না দেখিয়া "মা" মরিবেন। অত্যন্ত কৃতঘ্ন আমি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না। হা ধিক! শত ধিক।" সকলেই বাড়ী গিয়াছেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় শূন্য প্রাণে ও উদাস মনে, সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইলেন। পর দিন প্রাতঃকালে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছুটী না পাই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। অদ্য কিন্তু বাড়ী নিশ্চয়ই যাইব।" তিনি মার্সেল সাহেবকে গিয়া বলিলেন,—"ছুটী না দেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম,—মঞ্জুর করুন; চাকুরীর জন্য জননীর অশ্রুজল সহ্য করিতে পারিব না।" সাহেব স্তম্ভিত হইলেন! ভাবিলেন,—"একি এ অদ্ভুত মাতৃভক্তি!" তিনি তখনই ছুটী মঞ্জুর করিলেন। ছুটী পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসায় আসি-

লেন এবং বেলা তিনটার সময় ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। আষাঢ় মাস,—আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ;—মূষলধারে বৃষ্টি হইতেছে,—পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত। বিদ্যাসাগর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মাতৃ-উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীরামের অনুরোধে, তাঁহাকে সে রাত্রি, কৃষ্ণরামপুরের এক দোকানে অবস্থিত করিতে হয়। এখনও ১২।১৩ ক্রোশ অবশিষ্ট। পরদিন প্রত্যুষে তিনি আবার চলিতে লাগিলেন। শ্রীরাম ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বাড়ী নিকটস্থ কোন গ্রামে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন। শ্রীরাম কিন্তু প্রভুর বিপদাশঙ্কায় সঙ্গ ছাড়িল না। তবে সে ধীরে ধীরে প্রভুর পদানুসরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত শ্রীরামকে একখানি দোকানে ফলার করিতে বসাইয়া বলিলেন,—"শ্রীরাম এই পয়সা লও,—বাড়ী যাও।" এই কথা বলিয়া, তিনি দ্রুতপদে তীরবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাম সঙ্গ লইতে পারিল না। ক্রমে তিনি দামোদর নদের তীরে উপস্থিত হইলেন। বিষম বরষায় দামোদরে খরতর একটানা স্রোত,—দুকূল ভরা,—'কানে কান।' পারাপারের নৌকা আর-পারে; তিনি কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নৌকার অপেক্ষা না করিয়া, দামোদরের জলে ঝাঁপ দিলেন। বিপুল বলশালী তেজস্বী বিদ্যাসাগর তখন প্রবল বিক্রমে দামোদর সাঁতরাইয়া পার হইলেন। পার হইয়া তিনি আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন; মধ্যে পাতুল গ্রামে আহারাদি করিয়া, আবার চলিলেন। পথে তাঁহাকে দ্বারকেশ্বর নদ সাঁতরাইয়া পার হইতে হয়। মাঠের মাঝে কুড়ান খালের নিকট সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। এইখানে ভয়ানক দস্যুর ভয় ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অকুতোভয়ে মাতৃপদ স্মরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। রাত্রি ৯ টার সময় তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, বর বিবাহ করিতে গিয়াছে; মা কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া, অনাহারে পড়িয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা! মা! আমি এসেছি।" বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া, মা ঘরের বাহিরে আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মাও কাঁদেন পুত্রও কাঁদেন। পরে মাতা ও পুত্র একত্র আহার করিতে বসেন।

বহুতর-বিদেশী-গ্রন্থ-পাঠক, বহুতর মাতৃভক্ত বিদেশী পুরুষের নাম শুনিয়া থাকিবেন। জনষ্টন, জেনারল ওয়াসিংটন প্রভৃতির মাতৃভক্তি অতুলনীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; কিন্তু বল দেখি, বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের এ মাতৃভক্তির তুলনা কি হয়? শুনিয়াছি, রোমক বীর সম্রাট সিজর যখন ইংলণ্ড-বিজয় মানসে, সাগর পার হইবার উপক্রম করেন, তখন ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাকে তখন জাহাজে উঠিতে অনেকেই নিষেধ করেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ শুনেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দামোদরে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করেন, তখন নিকটস্থ জনকয়েক লোক, তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া, সে দুষ্কর কার্য্যে বাধা দেয়; বিদ্যাসাগর কিন্তু কোন বাধা মানেন নাই। বাহ্য জগতে উভয়েরই অবস্থা একরূপ; অন্তর্জগতের ক্রিয়া নিশ্চিতই ভিন্ন রূপ। একজনের বিজয়-বাসনা, অপরের মাতৃপূজা। পাঠক! বল দেখি, কাহার সাহস প্রশংসনীয়? এ জগতে কোন্ বীর স্মরণীয়? বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত পাইলেন, পরে আরও বহুপ্রকার পাইবেন।

বার্দ্ধক্যে শক্তির হ্রাস হইলেও, দয়ার হ্রাস তিল মাত্র হয় নাই; তাঁর দয়া সকল সময়েই সমান ছিল। দয়ার ফলে অন্নার্থী যেমন অন্ন পাইত, অর্থার্থী অর্থ পাইত, রোগী ঔষধ-পথ্য পাইত, তেমনই পদার্থী পদ পাইত। তাঁহার দয়ায়, বহু জনে বহু চাকুরী পাইয়াছেন পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে চাকুরী পাইয়াছিলেন। সে সব কথার সবিস্তর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাল্য-রচনায় যেমন সুন্দর সুপাঠ্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, যৌবনেও তাঁহার সেইরূপ কবিতা রচনা করিবার শক্তি ছিল। তিনি যখন ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, তখন কষ্টনামে এক সিবিলিয়ন সাহেব নিজের নামে একটী কবিতা রচনা

করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অনুরোধের বশে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচিত হইয়াছিল,—

"শ্রীমান রবর্টকষ্টোঽহিদ্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাং মামতোষয়ৎ॥
স হি সদ্গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী॥"

কষ্ট সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ২০০৲ টাকা পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা গ্রহণ না করিয়া কলেজে জমা দিতে বলেন। সাহেব তাহাই করিলেন। যে ছাত্র সংস্কৃত রচনায় প্রথম হইতেন, তিনি এই টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইতেন। চারি বৎসর চারিটী ছাত্র এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইহার নাম হইয়াছিল, "কষ্ট পুরস্কার"। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে টাকা না লইয়া, সংস্কৃত-চর্চ্চার শুভোদ্দেশে চারিটী স্বদেশীয় পণ্ডিতকে প্রকারান্তরে এই টাকা দেওয়াইলেন। ইহা কি কম মহত্ত্ব! আবার কষ্ট সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন;—

"দোষৈর্বিনাকৃতঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বৈরাসেবিতো গুণৈঃ।
কৃতী সর্ব্বাসু বিদ্যাসু জীয়াৎ কষ্টো মহামতিঃ॥
দয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্য্যগাম্ভীর্য্যপ্রমুখা গুণাঃ।
নয়বত্ম্র্যরতে নূনং রমন্তেঽস্মিন্ নিরন্তরম্॥
সদা সদালাপরতের্নিত্যং সৎপথবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকপ্রিয়স্যাস্য সম্পদস্তু সদা স্থিরা॥
অস্য প্রশান্তচিত্তস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রবীণস্য কীর্ত্তিরায়ুশ্চ বর্দ্ধতাম্॥
বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদারৈঃ।
নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিরায়।
দূরং নিরস্তখলদুর্ব্বচনাবকাশঃ
শ্রীমান্ সদা বিজয়তাং নু রবর্টকষ্টঃ॥"

কষ্ট সাহেব যখন এই কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি পঞ্জাবের সিবিলিয়ান পদ হইতে চির-বিদায় লইয়া বিলাত যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখন তিনি জন মিয়র নামক এক সিবিলিয়ন সাহেবের প্রস্তাবমতে পুরাণ মতে এবং সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ইউরোপীয় প্রথানুসারে ভূগোল ও খগোল বিষয়ে পদ্য-প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১০০৲ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে শাল্মলীদ্বীপবর্ণনম্, কুশদ্বীপবর্ণনম্, ক্রৌঞ্চদ্বীপবর্ণনম্, শাকদ্বীপবর্ণনম্, প্রভৃতি এবং ইউরোপীয় মতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পর্ত্তুগাল, স্পেন, আফ্রিকা, আমেরিকা, এসিয়া, প্রভৃতি বিষয়ে ৪০৮ টী শ্লোক রচিত হয়, সকল শ্লোক উদ্ধারের স্থান হইবে না; নমুনা স্বরূপ গোটা-কতক মাত্রও উদ্ধৃত হইল। দেখুন রচনার কি পরিপাটী ও মাধুরী।*

যৎক্রীড়াভাণ্ডবদ্ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমিদমদ্ভুতম্।
অসীমমহিমানং তং প্রণমামি মহেশ্বরম্॥
পুরাণসূর্য্যসিদ্ধান্তয়ুরোপীয়মতানুগম্।
কর্ত্তব্যং কিল ভূগোলখগোলপরিবর্ণনম্॥
প্রথমং বর্ণনীয়ন্তু তত্র পৌরাণিকং মতম্।
কার্য্যং ক্রমেণাপরয়োর্মতয়োর্বর্ণনং ততঃ॥
জগদ্বর্ণনকর্ম্মেদং শর্ম্মণে কিমু মাদৃশাম্।
খদ্যোতানাং তমোনাশোদ্যমো হাস্যায় কস্য ন॥

আমেরিকাখ্যচতুর্থখণ্ডবর্ণনম্।

পঞ্চত্রিংশচ্ছতক্রোশদীর্ঘোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্লাটামেজামপ্রমুখা বহ্ব্যঃ সন্ত্যত্র নিম্নগাঃ।
সহস্রত্রিতয়ক্রোশদীর্ঘাস্তাঃ প্রায়শো মতাঃ।
ধাতূনামাকরাস্তত্র বহবঃ সন্তি সন্ততাঃ।
বহিষ্ক্রিয়ন্তে রৌপ্যাণি তেভ্যেকস্মান্নিরন্তরম্॥
অত্রাস্তি নগরী কাপি লিমা নাম মনোরমা।
সা রাজধানী জ্ঞেয়াস্য প্রজানন্দবিবর্দ্ধিনী॥
ব্রাজলো নামকোঽপ্যন্যঃপ্রদেশোঽস্ত্যতিবিস্তৃতঃ
মনোহরাণাং হীরাণামাকরস্তত্র বর্ত্ততে॥

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"কোন কোন সম্ভ্রান্ত সিবিলিয়নকে পরীক্ষায় পাস না হইলে, দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। এ কারণ মার্শেল সাহেব দয়া করিয়া, ঐ সকল সিবিলিয়নদের কাগজে নম্বর বাড়াইয়া দিতে বলিতেন। অধ্যক্ষেরও কথা না শুনিয়া অগ্রজ ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিতেন। উপরোধ করিলে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেন, অন্যায় দেখিলে কার্য্য পরিত্যাগ করিব। এ কারণ সিবিলিয়ান ছাত্রগণ ও অধ্যক্ষ মার্সেল সাহেব, তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।"

* সম্প্রতি এতৎসম্বন্ধে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠ্যাবস্থা বিবৃতি কালেই, এই বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত ছিল; কিন্তু তখন ইহা সংগৃহীত হয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ ন্যায়পরতা অসম্ভব নহে ; কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে মার্সেল সাহেবের যেরূপ সদাশয়তা ও সৎসাহসিকতার কথা শুনি, তাহাতে তিনি বিদ্যাসাগরকে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এ কথা হঠাৎ স্বীকার করিতে যেন মন চাহে না। তবে স্বজাতি-প্রেমের কথা স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত কলেজ—এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদে অভিষিক্ত হন। এ পদের বেতনও ৫০ টাকা। আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে, মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবকে বলিয়া কহিয়া, বিখ্যাত কলিকাতা-তালতলা-নিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার-পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরে ইহাঁরই পদ প্রাপ্ত হন।

সংস্কৃত-কলেজের আসিষ্টাণ্ট-সেক্রেটরী হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, কলেজের অনেক সংস্কার সাধন করেন। পূর্ব্বে শিক্ষকই কি,আর ছাত্রই কি, কলেজে আসিবার বা যাইবার কাহারও কোন বাঁধা-বাঁধি, আঁটা-আঁটি নিয়ম ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এতৎসম্বন্ধে সু-ব্যবস্থা ও সুনিয়ম করিয়া দেন। তিনি সংস্কৃত-কলেজে প্রথম কাষ্ঠের পাশ, প্রচলিত করেন। কোন ছাত্র এই পাশ না লইয়া বাহিরে যাইতে পারিত না। কাহারও সেক্রেটরীর অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করিবার অধিকার ছিল না। ইনি যে সকল কবিতা অশ্লীল মনে করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত পাঠ্য-সাহিত্য হইতে তুলিয়া দেন। ব্যাকরণ-শিক্ষার স্রোত কিছু কমিয়াছিল। তিনি সুব্যবস্থা করিয়া ব্যাকরণ-শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। সাহিত্যশ্রেণীতে অঙ্কশিক্ষার ব্যবস্থা ইহাঁরই দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে এ ব্যবস্থা ছিল না। স্থূল কথা, সকল বিষয়ই সু-নিয়মিত করিবার পক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। কলেজের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অনেকটা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

এই সময় হিন্দু-কলেজের "প্রিন্সিপল" কার সাহেবের সহিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটু মনান্তর ঘটিয়াছিল। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়, কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব তখন টেবিলের উপর পা তুলিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি তদবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করেন ; কিন্তু সে দিন তৎসম্বন্ধে কোন কথা না কহিয়া, ফিরিয়া আসেন। এক দিন কার সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া, আপনার চটরাজ-শোভিত পা-দুখানি টেবিলের উপর তুলিয়া দেন ; অধিকন্তু সাহেবকে বসিতেও বলেন নাই। সাহেব সে দিন সংক্ষুব্ধ-চিত্তে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহার-কথা, শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটরী ময়েট সাহেবকে বিদিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৈফিয়ৎ লওয়া হইল। কৈফিয়তে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কার সাহেবের দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। ময়েট সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইহা তীব্র তেজস্বিতা ভাবিয়া সন্তুষ্ট হন। এটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা নিশ্চিতই ; কিন্তু তিনি যদি সাহেবের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার না করিয়া, সাহেবকে দুটো মিষ্ট কথায় উপদেশ দিয়া, অথবা কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া কহিয়া শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহার অধিকতর মাহাত্ম্য প্রকাশ হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী, সেই সময় ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদ শূন্য হয়। রামবাগান-নিবাসী ৺ রসময় দত্ত, তখনও কলেজের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। শুনিতে পাই, এ পদ গ্রহণ করিলেই অনেকটা কর্ত্তৃত্ব লোপ হইবে এবং কর্ত্তৃত্ব লোপ হইলে, কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর

শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেকটা অন্তরায় ঘটিবে ভাবিয়া, তিনি এপদ গ্রহণে অসম্মত হন; তবে এপদে যাহাতে একজন প্রকৃত গুণবান উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হন, ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল। সেই সময়, তাঁহার বাল্য সহাধ্যায়ী মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন, তর্কালঙ্কার মহাশয়, সাহিত্য শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনিই যোগাড়-যন্ত্র করিয়া, তর্কালঙ্কার মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আসিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, দিনকতক সাহিত্য শ্রেণীতে পড়াইয়াছিলেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্সেল সাহেবের অনুরোধে, হিন্দী "বৈতাল-পচীসী" নামক গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। এ সময়ে সিবিলিয়নদের পাঠ্য ছিল, জ্ঞানপ্রদীপ, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়, পুরুষ-পরীক্ষা, হিতোপদেশ প্রভৃতি। এ গুলি আদৌ সুপাঠ্য ছিল না বলিয়াই, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে অনুরুদ্ধ হন। বলা বাহুল্য, "বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে" সাহেবের অনুরোধ সার্থক হইয়াছিল। বেতালের ভাষা প্রাঞ্জল, ললিত মধুর ও বিশুদ্ধ। ইহার পূর্ব্বে এমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গদ্য পাঠ্য পুস্তক ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্যের তখন শৈশব কাল; বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পাঠ্য তখনও সংগঠিত হয় নাই; বিদ্যাসাগরের "বেতাল" সে অভাব দূর করিল। বলিতে পার,—ভবিষ্যৎ বঙ্গ গদ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল,—"বেতালে।" লিপি-পদ্ধতির নূতন প্রবর্ত্তন, "বেতালে" নিশ্চিতই। এই কারণেই হউক বা আর যে কারণেই হউক, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথমে যেমন সমাদৃত হয় নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতালও" প্রথম সেরূপ সমাদর পায় নাই। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামপুরের মিশনীরা ইহার আদর প্রথম বাড়াইয়া দেন। অসম্ভবই বা কি? স্কটের "ওয়েভারলি" প্রকাশিত হইবামাত্রই সমাদৃত হয় নাই। তাহার সমাদর হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। সেকস্পিয়রের আদর, তদীয় জীবিত-কালে হয় নাই। জার্ম্মণ-পণ্ডিতের গুণগ্রাহিতাগুণেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই; নহিলে সে প্রতিপত্তি প্রস্ফুটিত হইতে হয়ত আরও অনেক সময় লাগিত। মিলটনের জীবদবস্থায়, "প্যারাডাইস্ লষ্টের" প্রতিপত্তি ছিল না। এমন অনেক দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। যাহাই হউক, বেতালের আদর প্রথম হউক বা না হউক; যখন ইহা আদরণীয় হইয়া উঠে, তখন অনেকেই বেতালের অনেক অংশ মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখেই আমরা এ কথা শুনিয়াছি; এবং বিদ্যারত্ন মহাশয়ও এ কথা লিখিয়াছেন। "বেতালের" প্রথম কয়েক সংস্করণে বিরাম চিহ্ন অর্থাৎ , ; প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নাই, পরে সাধারণের সুবিধার্থ ব্যবহৃত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ৩ শত টাকা দিয়া, একশত খণ্ড বেতাল ক্রয় করিয়াছিলেন।

২৮ বৎসর পূর্ব্বে, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবন-চরিত লিখেন। এই জীবন-চরিতের ৪২ পৃষ্ঠায় "বেতাল" সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কয়েক ছত্র লিখিত হয়;—

"বিদ্যাসাগর-প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে "বেতাল" পড়াইয়া শুনান হইয়াছিলমাত্র। তাঁহাদের কথামতে দুই একটী শব্দমাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ কথার সত্যতা প্রমাণ জন্য তিনি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক পত্র লেখেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় তদুত্তরে যে পত্র লেখেন, তাহা এইখানে সন্নিবেশিত হইল,—

"পরমশ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতাল-

পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত, আমার বিবেচনায়, এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্র নাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কলঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটী শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্র খানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

সোদরাভিমানিনঃ
কলিকাতা। শ্রীগিরিশচন্দ্রশর্ম্মণঃ"
১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল।

প্রমাণ প্রয়োগের জন্য প্রয়াস কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সুলেখক "বেতাল" প্রণয়ণে যে অপরের এতটা সাহায্য লইবেন, একথা অবশ্য সহজেই কেহ বিশ্বাস করিবেন না।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা দ্বাদশ বর্ষীয় বালক হরচন্দ্রের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। ভ্রাতৃ-শোকে বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত-কল্প হন। ভ্রাতার মৃত্যু-সময়ে তিনি দেশে উপস্থিত ছিলেন। কার্য্যবশে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু ভ্রাতৃ-শোকে তিনি ৫।৬ মাস এক রকম আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে হয়।

এই দুর্ঘটনার পর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্তের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে তিনি শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব করিতেন, তাহা সময় সময় সেক্রেটরীর অনুমোদিত হইত না। মতান্তরই মনান্তরের কারণ। তেজস্বী বিদ্যাসাগর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। পদত্যাগ করিতে দেখিয়া, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, স্বজন, পরিজন, সকলে অবাক্ হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন, বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু এত বড় সংসার চালাইবেন কিসে? সত্য সত্যই ইহা ঘোরতর অবিমৃষ্যকারিতা; কিন্তু তেজস্বী বিদ্যাসাগর দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় অচল অটলভাবেও অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "আলু পটল বেচিয়া খাইব, মুদীর দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ লইব না। এ সময় তাঁহার বাসায় অনেকগুলি অনাথবালক অন্নবস্ত্র পাইত; তিনি কাহাকেও বিদায় করিয়া দেন নাই। মধ্যম ভ্রাতা ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে চাকুরী করিয়া যে পঞ্চাশটী টাকা পাইতেন, তাহাই একমাত্র সম্বল ছিল। এই টাকায় বাসা খরচ চলিতে লাগিল। মাসে মাসে ৫০৲ টাকা ঋণ করিয়া বাড়ীতে পাঠাইতে হইত। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট শুনিয়াছি, পদ পরিত্যাগের পর তাঁহাকে একটী দিনের জন্য মলিন বা বিষন্ন দেখা যায় নাই; পূর্ব্বের ন্যায় তেমনই হিমগিরিবৎ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। মুখ দেখিয়া মনে হইত না, তাঁহার মনে কোন কষ্ট কি দুঃখ আছে। অনন্যোপায় সামান্যাবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ পদত্যাগ দুষ্কর নিশ্চিতই; কিন্তু যাঁহাদের ভিতরে তেজ আছে, যাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম জ্ঞান আছে, যাঁহাদের আত্মশক্তি ও সামর্থ্যের উপর অচল বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিচিত্র কিছুই নহে।

১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন চাকুরীতে পুনঃ প্রবৃত্ত হন নাই। কেবল শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মার্সেল সাহেবের অনুরোধে কাপ্তেন ব্যাঙ্ক সাহেবকে কয়েক মাস হিন্দী ও বাইবেল শিক্ষা দেন। ব্যাঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০৲ টাকার হিসাবে তাঁহাকে কয়েক মাসের বেতন একবারে দিতে চাহেন। তিনি কিন্তু তাহা লয়েন নাই।

এই সময় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় "সংস্কৃতযন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত করেন।* ছয়শত টাকা

* বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কলঙ্কার মহাশয় উভয়েই এই মুদ্রাযন্ত্রের সমান অংশীদার ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে মদনমোহন তর্কলঙ্কারের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনান্তর হয়। বিদ্যাসাগর

ঋণ করিয়া একটী প্রেস ক্রয় করা হয়। এই প্রেসে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত করেন।* গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কৃষ্ণনগরের মহারাজার বাড়ী হইতে আনীত হয়। মার্সেল সাহেব ফোর্টউইলিয়ম কলেজের জন্য ৬০০ টাকায় ১০০ খণ্ড ভারতচন্দ্র ক্রয় করেন। এই টাকায় দেনা শোধ হয়। এই প্রেসে সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ক্রমে "প্রেসটী" লাভবান হইতে লাগিল।

আবির—উৎসব।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চাঁদ!

*   *   *

আগু ফাগু দেঈ   নাগরী নয়ানে,
অবসরে নাগর   চুম্বঈ বয়ানে;
চকিতে চন্দ্রমুখী   সহচরী কহনে,
বাঈ ধরল   গিরিধারীক বসনে;
তরল-নয়ানী   তুরিতে এক যাই;
কর সঞে কাড়ি,   মুরলী লঈ ধাই।
ঘন করতালি,   ভালি ভালি বোল;
হো হো হরি,   তুমুল উতরোল!

বাঁশী বাজিল আবার! সরস বসন্তে,—রস "বিন্দ্রাবনে" বাঁশী বাজিল;—ফুকারিল ব্রজেশ্বরের মোহন বাঁশী!

বাঁশী শুনে—

"অনিল নাচল
কোকিল গায়ল
ভ্রমর মাতিয়া
ঝঙ্কারি বৈঠল ফুলে!"

স্বর্গের সুতীব্র মদিরা-সঞ্চারী বাঁশরী! ঝঙ্কার মাত্রে স্থাবর জঙ্গম জাগিল; জড় জীবিত হইয়া উঠিল! সেই মিষ্ট

"———মুরলী-সুতান
শুনি পশু পাখী   শাখী কুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান!"

স্বভাব-সুন্দরী সুন্দর-তর সাজে সাজিলেন। পুষ্পরাজ্য পুলকে পূর্ণ বিকশিত হইল। মলয়ানিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বর ছুটাইয়া, মধুরিমা মিশাইয়া, ব্রজেশ্বর বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন; স্বর্গীয় সুধাস্রোতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শিরায় শিরায় ছুটিল; জড়-জগৎ জীব-জগৎ মাতোয়ারা, আত্মহারা, মুরলী-বিনিঃসৃত মদিরা-পানে! বাঁশী-স্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল! বাঁশী "ফুকারিল"—"তোরা কে যাবি রে আয় বৈকুণ্ঠে;—দুঃখী, তাপী, পাপী প্রেমিকা, দেব-দানব, সৎ-অসৎ সবাই আয় আমি সাযুজ্য দিব।" মানুষ মানুষী ছুটিল, পশু পাখী ছুটিল; দেবতা, গন্ধর্ব্ব নাগনর কাহার সাধ্য সে স্বরে স্থির থাকে? জগৎ ভাবোন্মত্ত, রসোদ্বেলিত;—ফুল্ল কদম্ব-পুষ্পবৎ কাঁপিতে লাগিল! মুরলীর সেই প্রাণ-মন-বিমোহন স্বর,—সে স্বরের অনাহত স্বর্গীয় শব্দ সংসার ব্যাপিল;—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাইল! ত্রৈলোক্য বিমোহিত করিল! গৃহী গৃহ-কর্ম্ম ত্যজিল,—সে স্বরে যোগীর যোগভঙ্গ হইল! সর্ব্বত্যাগী হইয়া সবাই সেই স্বরে প্রাণ ঢালিয়া দিল; ভাববিহ্বল চিত্তে ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া নাচিতে লাগিল! কেহ নাচিল "বাৎসল্যে," কেহ "দাস্যে," কেহ "সখ্যে," কেহ নাচিল সুমিষ্ট "শান্ত" রসে!

বংশী পুনর্ব্বার বাজিল! এবার—

"————বাঁশরী
সম্মোহন উম্মাদন   শোষণ তাপন
স্তম্ভন ভীষণ বাণ-লহরী"

ছুটাইল! ছুটাইল সে কেমন! সে কি যেমন-তেমন! বৈদ্যুতিক বেগাকর্ষণ,—তোমার অদ্যকার টেলিগ্রাফের তড়িৎ;—ইহা ত অতি তুচ্ছ পদার্থ! সেই সম্মোহন সংগীতের আকর্ষণ একান্ত উপমা-রহিত; তাহা সংঘাতিকেরও সংঘাতিক; মিষ্ট, সুমিষ্ট,—মিষ্টতর হইতেও মিষ্টতম;—তাহা মুরলীর "মধুর রস"! ব্রজেশ্বর বাঁশরীতে, এবার "মধুর রস" ছুটাইলেন! সে

মহাশয় কোন কারণে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন। ৺ শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সালাসি হইয়া গোল মিটাইয়া দেন। প্রেস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পত্তি হয়।

* ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদরের ধন ছিল। তিনি বলিতেন, সংস্কৃতে যেমন কালিদাসের গ্রন্থ বাঙ্গালায় তেমনই ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ। কালিদাসের গ্রন্থে সংস্কৃতের যেমন পরিপাটী, ভরতচন্দ্র গ্রন্থে বাঙ্গালার তেমন পরিপাটী।"

রসে বৃন্দাবন পূর্ণ উচ্ছ্বসিত, প্লাবিত হইল। মুরলী 'মধুর রস' গাইল মুরারির বিশেষ অনুগৃহীতাদিগের জন্য। লক্ষ্মী-অংশে জন্ম-পরিগৃহীতা ষোল সহস্র আহিরিণীকে উন্মত্তা ও উদ্ধার করিবার জন্য মুরলীতে 'মধুর রস' বাজিল। এই ষোল সহস্র গোপাঙ্গনা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি কোন রসের স্বতন্ত্র ভাবে অধিকারিণী নহেন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসের একান্ত ঘনীভূত যে অত্যুচ্চ "মাধুর্য্য রস" তাহারই অংশ-ভাগিনী এই দেবীগণ।

বাঁশীতে 'মধুর রস' বহিল। প্রেমিক প্রেমিকের প্রাণ ত কোমলাদপি কোমল পদার্থ;—পাষাণও বাঁশীর সে গীতে দ্রবীভূত হইল! মাধুর্য্য-রস-উন্মত্তা, মুক্তি-পথে-মাতোয়ারা "আহিরিনীগণ" বংশী-স্বর অনুসরণ করিয়া ছুটিলেন। মুরলী আরও জোরে বাজিল; ষোল সহস্র গোপাঙ্গনার প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিল।

"শ্যামতনু অপরূপী, ষোল সহস্রেক গোপী,
বাজে বংশী সবাকার নামে।"

বড়ই বিষম ব্যাপার! অন্তঃপুর-বাসিনী অঙ্গনা অভিসার-ধাবিতা! সতী পতি-পদ ছাড়িয়া চলিলেন; গৃহিণীর গৃহ-কার্য্য সমাধা হইল না, সঘনে ছুটিলেন; প্রসূতি দুগ্ধ-পোষ্যকে স্তন্য-দানে আর পারগ হইলেন না; প্রাণের বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া পথে উঠিলেন। সুন্দরী সাজ-সজ্জা করিতেছিলেন; "শিঙ্গার" আর সমাপন হইল না; পরিচ্ছদ ফেলিয়া, অঙ্গের অর্দ্ধ পরিবেষ্টিত বসন দূরে নিক্ষেপ করিয়া, মুক্ত-কেশে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় অভিসার-গামিনী হইলেন। পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, পরিজনাদি ত্যজিয়া, ধন-সম্পদ বস্ত্র-অলঙ্কারাদি ছাড়িয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে স্নেহ-মমতার বন্ধন কাটিয়া, লাজ-কুল-ভয়ে, সতীত্বে ও সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া গোপ-যুবতীগণ নিকুঞ্জবিহারীর উদ্দেশে কুঞ্জ-কুটীরাভিমুখে ছুটিলেন। "কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কান্ত! কোথায় আছ প্রাণ বল্লভ!" দশ দিক্ ব্যাপিয়া এই মাত্র শব্দ;—গোপবালা প্রেম-বিহ্বলা, নারায়ণ-রতি-কাতরা, বিবসনা, অর্দ্ধ-বস্ত্রা;—সাংসারিক সংজ্ঞা-মাত্র বিরহিতা;—"হা কৃষ্ণ! প্রাণবল্লভ!" এই এক মাত্র রবে রোরুদ্যমানা!

কি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র জানে "তুরা-বাণী" বনোয়ারি! হায় আজ

নব-বধূ নিলাজ ভইলা।

কুঞ্জ-কুটীরে সমবেতা ষোল সহস্র সুন্দরী কুঞ্জাধিপ, কামিনী-মণ্ডলীকে, তখন সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—"কল্যাণীগণ! আমি তোমাদিগের প্রেমানুরাগে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন কর। পতি-সেবাই সতীদিগের একমাত্র ধর্ম্ম। পতি—অকুলীন, অসুন্দর, আতুর, যাহাই হউন না, বিষ্ণুবৎ তাঁহার সেবা করিবে। পতি-সেবা করিবে, সন্তান-পালন করিবে, সংসার-ধর্ম্মই তোমাদিগের পালনীয়। আমার রূপ-লাবণ্য দেখিবার জন্য তোমরা আসিয়াছিলে; এখন ত তাহা নয়ন ভরিয়া দেখা হইয়াছে; অতএব আর বিলম্ব করিও না; গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি তোমাদের ভক্তি-প্রীতিতে তৃপ্ত হইয়াছি।"

বনোয়ারীর এ কথা কিন্তু ব্রজাঙ্গনাদিগের মনে ধরিল না; মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল। তাহারা—

"পদনখে লিখি ক্ষিতি, দশনে অধর বাঁতি
অধোদৃষ্টে রাঙ্গাপদে চায়!
মোহিত পিরীতি-ফাঁদে, কেহ ফুকরিয়া কাঁদে
কেহ কহে কানু রাখ প্রাণ!

ক্রন্দনশীলা কামিনীগণ কহিলেন; প্রাণেশ! আমরা কৃষ্ণ-কিঙ্করী, অন্যের ত নহি; তবে কেমন করিয়া অন্যত্র তুমি আমাদিগকে যাইতে বলিতেছ? পাপ-পুণ্য, স্বর্গ নরক, সবই আমাদের ঐ পাদপদ্মে। কান্ত তবে কেন এ কৌতুক কর!

"আর না যাইব ঘর, গুরুজন বরাবর;
না করিব গৃহ-প্রবেশন!"

সর্ব্বত্যাগী না হইলে, তোমায় পাওয়া যায় না; আমরা তোমায় পাইবার আশায় আজ সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া আসিয়াছি। হায়!

"কত না যাতনা দেখ, পরশিয়া প্রাণ রাখ।

গোপিনীরা গোপালকে একেবারে "ঘেরয়া" করিয়া ফেলিলেন।

"ছল করিয়ে যাবে হে ভুলায়ে
সে আশা ত্যজহে বঁধু!
ছল করিয়ে ভকতে ভুলাও
হরি হে তু' বড় সাধু।

বঁধুরে—আমরি!—
তু' বড় কল্পতরু!—
মুটের লাগিয়ে আঁচর পাতলু
নিরাশ করিলি তাহে!
লাজ তেজিয়ে যাচলু একটী
না দিলি নাগর মোহে।"

পুনশ্চ আর এক দিক্ দিয়া আর এক সম্প্রদায় সুন্দরী, শ্যামসুন্দরকে আক্রমণ করিলেন;—

ছি ছি রে কালিয়া কাঠের পুত্তলি
পাখানে রচিত হিয়া!
সাধনে সদয় না ভেলি কালিয়া,
সাধব আর কি দিয়া?
সরমে যদি হে নীরব বঁধুয়া—
সরম করত কাঁহে?
ধরায় নিরখি কাঁহেরে নাগর?
সুধাই কহত মোহে!—
তুলহে বদন দাগহে চুম্বন
না রবি এমন ধারা!
তমাল বকুল লবঙ্গ বল্লরী
সুঝে কি অবথ তারা?

একদিকে তিনি একা; আর অপর দিকে রতি-প্রার্থিনী ষোল সহস্র গোপিনী!! এ দৃশ্য সুন্দর কি ভয়ঙ্কর? এ দৃশ্য যে কি, তাহা কেবল ভক্তেরই অনুভবনীয়। ইহা অন্যের একান্ত অবোধ-গম্য।

এখন আবির-কুঙ্কুম চুয়া-চন্দনার্চ্চিত অনুপম এবং অসঙ্খ্য

"————রাস মণ্ডলের মাঝে।
যত গোপী তত কৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে সাজে॥"

বনমালী মোহন-খেলায়, বাসন্তী লীলায় মাতিলেন।

যুবতী-যূথ শত গাওত ঝুমরি।
কেহ অম্বর ধর, কেহ ধরু হার,
কেহ তনু পরশিয়া রহিল হি ভোরি॥
কেহ লেই মুরলী, কেহ লেঈ মৃদলী,
দূরেহি দূরেগেও গায়ত হোরি।
ডমরু ররাব, উপাঙ্গ পাখোয়াজ,
করতল তাল সুমেলি করি।

বিন্দ্রাবন আবিরে আবৃত! "লালে লাল গুলাব।

ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।

* * * *

সুন্দরী-বৃন্দ, করে কর মণ্ডিত,
মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ।
নাচত নারীগণ, ঘন পরিরম্ভণ,
চুম্বল লুবধল নটবর রাজ।
কানু পরশ-রসে, অবশ রমণীগণ,
অঙ্গে অঙ্গ মিলি কাঁপি রহুঁ।
পূরল সবহুঁ মনোরথ, মনোভবমোহন,
গোবিন্দদাস কহুঁ।

* * * *

দ্বাপরে যে বিশ্ববিমোহনকর বংশী বাজিয়াছিল, তাহার মধুরধ্বনি এখনও ভক্ত হৃদয়ে বাজে। বৃন্দাবন মুরলী-নিঃসৃত সেই পঞ্চ রসে নিত্য মাতে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ হিন্দুস্থানের কোথায় না আবির—উৎসব হয়? শ্রীহরির দ্বাদশ যাত্রা হিন্দু-জীবনে জীবন্ত আছে;—চিরকালই জাগ্রত থাকিবে। বাসুদেবের এই বাসন্তী-লীলা, আবির-উৎসবের নাম পূর্ব্ব হিন্দুস্থানে "দোল"—পশ্চিমে "ফাগুয়া বা "হোলি"। আমাদের দুর্গোৎসবের ন্যায় হিন্দুস্থানীদের আবিরোৎসবের আমোদ এবং উৎসাহ। প্রীতি, প্রফুল্লতা, আনন্দ, আহার, নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রণয় এবং প্রমোদ, বিলাস এবং ব্যঙ্গ পশ্চিম-হিন্দুস্থানে এই হোলির সময় সশরীরে রক্তে মাংসে মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হয়। আর মহা মহা মূর্ত্তি ধারণ করে, আবির এবং প্রিয় পিচকারি! নূতন গীতি রচিত হয় এবং নূতন গালি প্রণীত হয়,—এই হোলির সময়; কারণ, গীতি এবং গালি 'হোলির' সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। এই গীতি এবং গালি অবশ্য প্রেমের এবং প্রমোদের; সোহাগের এবং সৌখিনতার। এ গালি অতি প্রিয়-সম্ভাষণ; অতএব রসিক নাগর ও সুরসিকা নাগরীরা পরস্পরে অম্লান-বদনে এবং অবাধে, অতি আহ্লাদের সহিত ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। গৃহাভ্যন্তরে, অঙ্গণে, রাজপথে রসিক-রসিকাদের মেলা,—এই "হোলিতে।" সকলেই "মোহন- খেলা" খেলিতেছেন;—সকলেরই মুখে "মোহনখেলে হোরি"। বসন্তাদি বিবিধ বর্ণের বসনে, আঙ্গিয়ায়, ওড়নায় এবং পেশোয়াজে সুসজ্জিতা সুন্দরী;—সুন্দর পরিচ্ছদ, আবির-প্রবাহে শতস্থলে

অঙ্কিত ;—নয়নে কজ্জল,—অঞ্চলে আবির,—ওষ্ঠাধরে তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত মিষ্ট হাসির অত্যুচ্চ হিল্লোল,—আর সুকোমল করে প্রিয় পিচকারী ; হেলিয়া-দুলিয়া "দুলহীন"গণ "হোলি" খেলিতেছেন। কোন রসবতী নবীনা,—আবির-ক্রীড়া-পরায়ণা প্রবীণাকে পিচকারী-সহ, হয় ত সম্বোধন করিলেন ;—

"বুড়িয়া ভইলি দিন কাটালি
তবু না মিটল আশ !
যৌবন-নিদাঘ কেমনে কাটালি
হায়রে সরবনাশ !
জোয়ার সরল দিন গয়িল
এখনও বাসনা মনে,
ধন লুটায়ে দেউলা ভইলি
সখ রাখিয়া প্রাণে !

প্রবীণা, নবীনার নধর অঙ্গে ডবল পিচকারী প্রবাহিত করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর গাইলেন ;—

"বয়স হইলে বাসনা ফুরায়
কাঁহা পায়লি পাঠ ?
প্রবীণে বাসনা প্রবীণ ভয়লো
বুঝিবি দু'দিন যাক !

তা আমি সে বাহার আর কি বর্ণনা করিব ! কবি হোলি-ক্রীড়া-রতা কামিনীর যে কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাই এখানে কহিয়া দেই ;—

কালীয়-কেশি-কংস-করি-কর্ষণ
কেশর-কুঞ্চিত-কেশ।
কুলবনিতা-কুচ-কুঙ্কুমাঙ্কিত,
কুসুমিত কুন্তল-বন্ধ।
কালিন্দী-কমল-কলিত-কর-কিশলয়,
কৌতুক-কন্দন-কন্দ ॥

ইহাঁরাই,—এই "কুসুমিত-কুন্তল-বন্ধ" কামিনীরাই "হোরি" খেলিতেছেন,—

হাসি হাসি সুন্দরী মন্মথ-রঙ্গে ;
ফাগু দেঈ ডাকিয়ে নাগর-অঙ্গে।
রসে ধস ধস তনু, আধ আধ হেরি ;
চুয়া চন্দন দেঈ বেরি বেরি।
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি ;
চমকি চমকি মুখ, রহলিহঁ গোরী।
ফাগু দেওল হরি লোচনে জোর ;
মুদল ধনী দুহুঁ লোচন চকোর।

লোফা-লুফি।

কোহিনুর জগতে দুর্লভ। যাহা দুর্লভ তাহাই মূল্যবান—সকলে তার আদর করে। এক জনের নিকট হইতে অন্যে তাহা কাড়িয়া লইতে যত্ন করে—ছলে বলে কৌশলে। কেহ বা বলিয়া-কহিয়া চাহিয়া লয়। পরস্বাপহরণে লজ্জা ভয় থাকে না। যে দ্রব্যের যত মূল্য, সে দ্রব্য কাড়িতে লজ্জা তত কম হয়। আত্মগৌরব মানুষের এতই প্রবল ; সাধারণ দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়—চুরি করা বড় ঘৃণিত, ছোট লোকের কাজ। ডাকাতি গৌরবের জিনিস। চাহিতে লজ্জা হয় না।

কবি-বচনে এক একটী কোহিনুর দেখিতে পাওয়া যায়। কবি-মণ্ডলে সে কোহিনুরের কাড়াকাড়ি। ডাকাতি করিয়া লইয়া কেহ বা নূতন রকমে কোথায় একটু ছাঁট-ছুট করিয়া,আপনার মনের মত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কেহ বা যেমন তেমনি রাখিয়াছেন ;—পরের নয় আমার নিজস্ব বলিয়া প্রতারণা করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। পরের জিনিসকে আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে যে চেষ্টা করে, সে নীচ ;—পরের জিনিস গুণে দখল করিয়াছি বলিয়া পরিচয় দিলে গৌরব বৃদ্ধি হয়। কবি-বচনের কাড়াকাড়ির আজ কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাঠকগণকে উপহার দিব। এক ভাব যে দুই জনের মনে স্বতঃ উদয় হয় না, এ কথা আমরা বলি না।

(১)

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া বহুদূরে সাগর-পারে লইয়া গিয়াছে শুনিয়া, রামচন্দ্রের হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। এই সময় কোন প্রাচীন কবি, রামের মুখে এই শ্লোকটী আরোপিত করিয়াছিলেন ;—

"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীতয়া।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরাঃ ॥"

মহানাটক।

আর একজন এই কথাই অন্য রকমে বলিয়াছেন ;—

"বকুল মালিকয়াপি ময়ানসাতনুরভূষিতদন্তরভীরুণা
তদধুনাবিধিনাকথমাবয়োর্গিরিদরীনগরীশতমন্তরম্

কবিবচন সুধায় তারাকুমার কবিরত্ন প্রথম শ্লোকটী এইরূপে অনুবাদ করিয়াছেন।

"বক্ষে বক্ষে ব্যবধান ঘুচাবার তরে।
হার ছড়াটীও নাহি দিতে বক্ষপরে॥
প্রিয়তমে! আজি দেখ তোমায় আমায়;
গিরি নদী মহাসিন্ধু ব্যবধান হায়॥"

কবি বিদ্যাপতি এই ভাবটী এইরূপে রাধিকার মুখে আরোপ করিয়াছেন;—

"ধরা চির চন্দন উর হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥"

জ্ঞানদাস গাহিয়াছেন;—

"হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া,
চন্দন না পরে অঙ্গে।"

বলরামদাস গাহিয়াছেন;—

"হার নাহি পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন না মাখে গায়।"

একজন অজ্ঞাত কবি বলিয়াছেন—

"হার উতারহুঁ সহোঁ মিলনমে
সো অব কাহে নিঠুর ভয়ে।
যব বিরহিণী পরদেশ রহতহে,
বিচহিমে কত নদিয়া বহে॥"

কৃষ্ণকান্ত পাঠক গাহিয়াছেন;—

"এক দিন কুঞ্জে করিতে বিহার,
গলে ছিল মম নীলকণ্ঠ-হার।
পরিহরি হার পরি' হরি-হার
হরি-হার তুলে লইলাম গলে।"

(২)

আর একটী ভাব দেখুন;—

"হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
[illegible]
গলে কস্তূরায়ং শিরসি শশিরেখা ন কুসুম।
ইয়ং ভূতির্নাঙ্গে প্রিয়-বিরহ-জন্মা ধবলিমা
পুরারাতিভ্রান্ত্যা কুসুম-শর কিং মাং ব্যথয়সি॥"
শার্ঙ্গধর।

বিদ্যাপতি এই ভাবটী এইরূপে অনুবাদ করিয়াছেন;—

"কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারী॥
নহ জটা সিঞ্চিত বেণীবিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধে মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর-বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘ-ছাল।
কেলিক মাল ইহ নহ রে কপাল॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ সুছন্দ।
অঙ্গে ভস্ম নহ মলয়জ পঙ্ক॥"

কবিওয়ালা রামবসু এইরূপে গাহিয়াছেন;—

"হর নহি—হে আমি যুবতী,
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি
করোনা আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ—
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি।
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ,
একি রঙ্গ হে তোমার।
হর-ভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বার বার।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ দেখে কও মহেশ
চেন না পুরুষ ও প্রকৃতি।
হায় শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি
বৈরী হইও না আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা বিগলিত-কেশা
নহে এতো জটাভার।
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীল রতন
অরুণ হলো লোচন করে পতি-বিরহে রোদন,
এ অঙ্গ আমার ধুলায় ধুসর, মাখি নাহি বিভূতি।"

আর একজন গাহিয়াছেন;—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তুমি তাহা না ভাবিলে রাগের প্রভাবে
বুঝিলে কি বিভূতি ভূষণ—
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু আর চন্দন হেরিয়া
ভাবিলে কি চন্দ্র হুতাশন;
পরাজয় ঋণ যদি চাহ সুধিবারে
যাও তবে হরেরি সদন॥"

বিদ্যাপতি ও রামবসু, বিরহিণী রমণীকে শঙ্কর-রূপে সাজাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের

রাধিকা, চন্দ্রাবলীর অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণকেও এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—

"আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর-দহনা।
চন্দন চন্দ্রমাহা লাগল মৃগমদ কৈ
বেকত তিন নয়না॥
মাধব অব তুঁহু শঙ্কর দেবা।
ভূজগের পুষ্প-ফলে প্রাতরে ভেটিনু
দূরহি দূরে রও সেবা॥
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল।
নেহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঙ্গে জরি গেল॥"

মন্মথ বিরহিণীকে শঙ্করভ্রমে শরাঘাত করেন, খণ্ডিতার মনোরথ শঙ্করের অক্ষি-জ্বালায় দগ্ধ হয় কবির কারুকরী এইখানে।

(৩)

বিদ্যাপতি বৃন্দা রাধিকাকে এই উপদেশটী দিয়াছিলেন ;—

"পহিলহি বৈঠবী শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে বারবি পাণি।
মৌনী করবি পঁহু করইতে বাণী॥
যব কর সোঁপব করে কর আপি।
সাথমে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥"

গীতচিন্তামণিতে একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয় ;—

"যব পিয়া ধরি বলে লয় নিজ পাশ।
নহি নহি বলবি গদ গদ ভাষ॥
প্রিয় পরিরম্ভলে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুন দেয় বিভঙ্গ॥"

শশিশেখর রায় এই কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন ;—

"আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম।
পহিলহি ভেটবি শয়নক সীম॥
হরি-পরি-রম্ভলে মোড়বি অঙ্গ।
হাঁ হুঁ না বলবি প্রেমতরঙ্গ॥

(৪)

বিদ্যাপতির এই কথাটী মদনমোহন তর্কালঙ্কার অপহরণ করিয়াছিলেন। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র, তাঁহার বিদ্যাপতি গ্রন্থে এ সকল দেখাইয়া দিয়াছেন।

"যো থল সকল মহীতলে গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরিয়ে লেহ॥
যব কোই ক্ষীর অনলমুখে আনি।
ক্ষীর দগ্ধ দেই নিরসত পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উনড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোহি পানি আনি তাহে দেল
বিরহি-বিয়োগ তবহি দূরে গেল॥"

তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন ;—

"জ্বাল দিয়া দুগ্ধেরে বিনাশ যবে করে।
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগে ভাগে মরে।
জলের দেখিয়া মৃত্যু দুগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ দিতে সেই দাহে॥"

(৫)

বৃন্দাবনে বাঁশী কিছু বেশী গোলমাল করিয়াছে। বাঁশীর মিষ্ট স্বরে পশু পক্ষী মুগ্ধ হয়—এটী বৈজ্ঞানিক সত্য,—সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকায় এ সত্যের চর্চ্চা হইতেছে। বৈষ্ণবকবিগণ অনেক দিন পূর্ব্বে এ সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বাঁশীর স্বরে জীব জন্তু মুগ্ধ হয়, এমন নহে,—বাঁশীর স্বরে পাথর গলে, যমুনার জল উজান বহে। শ্যামের বাঁশী, কিন্তু বাজিবার সময় জানে না—অসময় বাজিয়া উঠিয়া পাগলিনী রাধাকে বিপদ্গ্রস্ত করিয়া ফেলে। বাঁশীর দৌরাত্ম্যে বৈষ্ণব কবি বিদ্রোহী হইয়াছেন। অথচ বাঁশীর প্রাণ-মজান মধুর স্বরে সকলকে কাণ পাতিয়া থাকিতে দেখা যায়। যখন লালসার উদ্রেক বেশী হয়, তখন মোহের সম্ভাবনা অধিক হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন ;—

"ও সখি কোন বনে মুরলীর ধ্বনি শুনা যায়।
বংশীবট কি ভাণ্ডীর বনে দেখে আয়॥"

আর একটু মিষ্ট করিয়া আর এক জন কবি গাহিয়াছেন ;—

"সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে,
বন মাঝে, কি মন মাঝে?"

একজন সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন,—

"মুরহর! রন্ধনসময়ে মা কুরু মুরলীরবং মধুরম্।
নীরসমেধো রসতনুতাং কৃশতনুতাং কৃশানুরপ্যেতি॥"

তারানাথ ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ;—

"রন্ধন সময় ওহে রসময়
ও বাঁশরীধ্বনি করিতে কি হয় ?
শুষ্ক কাষ্ঠে বহে রসের উজান
জ্বলন্ত উনান হয় যে নির্ব্বাণ"

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন ;—

"সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধরে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী,
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী,
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল ;
সভার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল,
অন্তরে গরল বাঁশী বাহিরে সরল ;
পিবয়ে অধরসুধা উগারে গরল ॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগি পাঁউ,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সায়রে ভাসাউ ॥"

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন গ্রাম্য কবি চণ্ডীদাসের গানটী আপন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু শেষ চরণটী যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন ;—

"বাঁশী বাজান জানে না
যখন আমি বসে থাকি গুরুজনার মাঝে ;
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশী শুনে মরি লাজে।
রন্ধন-শালাতে বসে যখন আমি রাধি ;
ভিজে কাষ্ঠ চুলায় দিয়ে ধূঁয়ার ছলে কাঁদি।
যেনা ঝাড়ের বাঁশী ওতার লাগুর যদি পাই ;
জড়ে মূলে উঠাইয়া সায়রে ভাসাই।"

কবি দীনদাসও ধূঁয়ার ছলে কাঁদিয়াছেন ;—

"তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি ;
রন্ধন-শালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

আর একজন গাহিয়াছেন ;—

"ওরে বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে।
কৃষ্ণ-অধর-সুধাপানে গৌরব বেড়েছে মনে
উন্মত্ত আছ গানে না কর বিচার।
বসি গুরুজন মাঝে, বাজ বাঁশী মরি লাজে
নাম ধরে বেজনা রে আর।"

আর একজন গাহিয়াছেন ;—

"শঠের বাঁশীর গানে বৃন্দাবনে কুলবধূর কুল যায়।
কোন্ বনেতে বাজিল বাঁশী—খুজে তার পাই না
লাগুর, সে বা কোন দেশী,
বাঁশীর লাগুর পেলে বন্ধন করে ভাসাইতাম
যমুনায়।"

আর একজন গাহিয়াছেন ;—

"সখি! তারে ক'রে আর মানা,
অসময়ে রসরাজ যেন বাঁশী বাজায় না,
বাঁশী উচ্চস্বরে বাজলে পরে ননদিনী শুনতে
পায়
বাঁশীর গানে যমুনার জল উজান বহে,
আর বাঁশী বাজাওনা ওরে নিলাজ শ্যাম,
হরে নিলে অবলার প্রাণ।
বাঁশী তোরে করি মানা, আমার আছে সব জানা
যমুনার জল উজান বহে শুনে বাঁশীর গান।"

অনন্তদাস গাহিয়াছেন ;—

"মুরলীর আলাপনে, পবন রহিয়া শুনে
যমুনায় বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ, কাজ নাহি পায় পথ,
দরবয়ে দারু পাষাণ॥"

একজন গাহিয়াছেন ;—

শুনিয়া মুরলীর ধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি
জপ তপ কিছুই না হয়।
তৃণমুখে ধেনু যত ঊর্দ্ধ মুখে রহয়
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায়।

আর একজন,—

"যখন শ্যাম বঁধু বাঁশীটী পূরে
বনের পশু কাঁদে বিরিখি ঝুরে"

কবি বসন্তরায় গাহিয়াছেন,—

"সখি হে! শুন শুন বাঁশী কিবা বলে,
আনন্দ আধার কিয়া সে নাগর আইল কদম্বতলে
নাম বেড়াজালে খেয়াতি জগতে সহজে,
বিষম বাঁশী,
কানু উপদেশে কেবল কঠিন কামিনী
মোহন ফাঁসী।"

গোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন ;—

'মরকত-মঞ্জু-মুকুর-মুখমণ্ডল-মুখরিত মুরলী সুতান
শুনি পশু-পাখী-শাখী-কুল পুলকিত কালিন্দী
বহয়ে উজান।"

আর একজন অজ্ঞাত কবি গাহিয়াছেন ;—

দশমল্লার—ঝাপতাল।

"বনমে ব্রজরাজকি বাঁশরী কাঁহে বাজি রে।
বয়নামে বয়ন নাহি নিদ নাহি আও রে॥

উড়ত আকাশে পেয়াসমে চাতকী,
মুরলীকী ধ্বনি শুনি নীর নাহি খাও রে।
মরুত স্থগিত হুই, পাষাণে দ্রবত ভেই,
উলট যমুনা বহই, পালট নাহি আও রে॥"

একজন নূতন কবি গাহিয়াছেন,—

মধ্যমান-ঠেকা।

'একবার বেজে গেছে গো-গোপীর কুল মান,
আবার ঐ বাজিছে বাঁশী লবে বুঝি রাধার প্রাণ;
মুরলীর আলাপনে, পবন দাঁড়া'য়ে শুনে,
মৃত তরু মুঞ্জরে, যমুনা বহে উজান।'

(৬)

বিদায় কালে সমস্ত প্রাণ তোল-পাড় হইয়া উঠে,—মনে কত কথাই উঠে, চোখের জলে মুখ ঢাকিয়া যায়, কণ্ঠে বাক্য ফুটে না। "বলি বলি করিয়া আর বলা হয় না। এই ভাবটী অনেকের কবিতায় দেখা যায়,—

রাম বসু গাহিয়াছেন ;—

"মনে রহিল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলি আর বলা হল না।"

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন ;—

হলো না লো হলো না সই!
মরমে মরম লুকান রহিল বলা হল না;
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হল না লো হল না সই।

(৭)

কোন সংস্কৃত কবি লিখিয়াছিলেন ;—

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি তু ন জাত মম্বুজাদম্বু।
মুরহর বিপরীতং পদাম্বুজাম্মহানদী জাতা॥'

তারাকুমার অনুবাদ করিয়াছেন ;

'সলিলেই কমলের হয়ত জনন।
কমলে সলিল না জনমে কদাচন॥
তোমাতে হে মুরহর হেরি! অসম্ভব।
ও পদ-কমলে হৈল গঙ্গার উদ্ভব॥'

ঈশ্বরগুপ্ত এইরূপে একটু গুণপণার সহিত অনুবাদ করিয়াছেন ;—

'সলিলে কমল হয়, সই সদা সবে কয়,
হেরি পদ্মের উপর পদ্ম, আবার তাতে বারিচয়॥'

(৮)

বিদায় সহা যায়, কিন্তু বিদায়ের কথা—"যাই যাই সহা যায় না:—

"যদি যাস্যসি নাথ নিশ্চিতং
যামি যামি বচনং হি মা বদ।
অশনেঃ পতনে ন বেদনা
পতনজ্ঞানমতীব দুঃসহম্॥

তারানাথ ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—

'হে কান্ত! একান্ত যদি করিবে গমন,
যাও কিন্তু যাই যাই বলোনা বচন।
বজ্রের পতনে তত নহেত বেদনা,
কিন্তু পতনের শব্দ সহেনা সহেনা।"

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ;—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

'যাই যাই বলে নাথ দিওনা মোরে যাতনা;
যেতে হয় যাও তবে, যাব কথা আর সহেনা।
বজ্রপাত হবে হবে, বলিয়ে আশঙ্কা তবে,
পতনে বেদনা কবে, যাও তবে যাই বলোনা।'

দীননাথ ধর গাহিয়াছেন ;—

'যাবে নাথ যদি যাও তবে যাও
যাই যাই বলে কেন আমারে জ্বালাও।'

আর একজন গাহিয়াছেন ;—

'নিদয় হ'য়ে বিদায় চেয়োনা।
যাও যাবে প্রাণ নাথ, যাই যাই আর বলো না।

(৯)

প্রণয়ীর নিকট সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করিলেও প্রণয়ের স্বভাব এই যে, প্রণয়ীর মঙ্গল প্রার্থনা করে। ভালবাসিয়াই সুখ পাইব, "পরাব না পরবো ফাঁসি",— এ ভাব প্রণয়িমণ্ডলে দুর্লভ। আদান-প্রদানের একটা আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক—নিঃস্বার্থ ভালবাসা, নিষ্কাম প্রেম প্রায় দেখা যায় না। নির্য্যাতনের সময়েও এই আশা থাকে, কখন এদুঃখের অবসান হইবে—ইহ জন্মে, না হয় পর জন্মেও সখার সহানুভূতি মিলিবে মরিবার সময়ও এ আশা হৃদয় হইতে দূর হয় না। একজন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন ;—
"Even in the ashes live the wonted fire"
দশমী দশায় রাধিকার কাতরোক্তি শুনিয়া "দরবে পাষাণ"। কিন্তু তখনও মনে হয় অভাগিনী যদি ভাল বাসিয়াই—তৃপ্ত হইত, ভাল বাসার প্রতিদান না চাহিত, তবে বুঝি সুখী হইত। সে যাহা হউক, রাধিকার এই কাতর দশা বর্ণনায় বৈষ্ণবমণ্ডলে বড়ই সাদৃশ্য দেখা যায়।

ম'লে যদি আসে বনমালী
বলো শ্যাম বলে মরিল ধনী।" দীনবন্ধু মিত্র।
"সোহি পদমূলে রহি কাহে লো হামারি
মরণ না ভেল।" বঙ্কিমচন্দ্র।
"নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ।" ঐ
"আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি আমার সুখে থেকো, এ দেহে সকলি সবে।"
নিধুবাবু।
"তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল।
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল।"
রামবসু।
"যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি,
সেখানে লেখিহ মোর নাম দুই চারি।
সখীগণ গণাইতে গণিহ মোর নাম,
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম।
দিনে একবার পঁহু লিএ মোর নাম,
অরুণ তুলহ করে দিএ জল দান।
শ্রবণ হি শ্যামনাম করু গান;
শুনইতে নিকশউ কঠিন পরাণ।" চণ্ডীদাস।
বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন;—
"তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গ,
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গ।
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে,
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম সনে।
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে,
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়,
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়।
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে,
পরাণ পাওব হাম পিয়া দরশনে।"
গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন;—
"জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার,
বিহি-পায় মাগেঁ মুই এই বর সার।
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুঃখ,
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ।"
কৃষ্ণকান্ত পাঠক স্বপ্নবিলাসে বিদ্যাপতির ভাবটী অপহরণ করিয়াছেন;
"দেহ দাহন করো না দহন-দাহে।
ভাসাইও না আমায় যমুনা-প্রবাহে।
সব সহচরী, দুটী করে ধরি,
বাঁধিও তমালের ডালে।
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি,
আসে গো আমার প্রাণ হরি,
বন্ধুর শ্রীঅঙ্গ-সমীর পরশে
শরীর জুড়াইব সেই কালে।"
শশিশেখর রায় গাহিয়াছেন;—
"কহিও কানুরে সোই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিল মোর এই হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
যেই তরুশাখায় রহল সারি-শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে।
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥"

(১০)

সব জিনিষের তুলনা মিলে না। রাম-রাবণের যুদ্ধের তুলনা মিলে নাই; সমতুল্যের অভাবে তাহার সঙ্গে তাহারই তুলনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। একাধারে যাহার সর্ব্বস্ব সঞ্চিত, সে ভাগ্যবান্ কি অভাগা?

"নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে বরং পয়ঃ
চাতকস্য তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনম্॥"
"নদ নদী হ্রদ হতে অন্যে খায় জল।
চাতকের কিন্তু সেব্য তুমিই সম্বল॥"
তারাকুমার।
"অহমিব ভবতো বহবো মম তু ভবানিব ভবানেব
কুমুদিন্যঃ কতি ন বিধোর্বিধুরিব বিধুরেব কুমুদিন্যাঃ।"
"আমা হেন কত আছে আশ্রিত তোমার।
মোর কিন্তু তোমা ভিন্ন গতি নাহি আর॥
চন্দ্রমার কত শত কুমুদিনী রয়।
কুমুদীর কিন্তু সেই চন্দ্রই আশ্রয়॥
আমার মত তোমার শতেক রমণী।
তোমার মত বঁধু তুমিই গুণমণি॥
দিনমণির আছে শত কমলিনী।
কমলিনীগণের ঐ দিনমণি॥"
"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।"
নিধুবাবু।

কাব্য যত প্রাচীন, ভাবের গাঢ়তা তত অধিক। নবীন কবির জল-দুগ্ধে চুরির অভাব নাই, কিন্তু সে চুরি ধরিয়া লাভ কি? তাঁহাদের কাব্যে অবিশ্য কথারক জ্বালাতন হইতে হইবে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

আমার জীবন-চরিত।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি মরি নাই। পলাইবার কালে, পথে প্রহারিতও হই নাই। কেহ ধৃত করিবারও চেষ্টা করে নাই। অধিক কি, কেহ আমার সঙ্গে একটী কথা পর্য্যন্তও কহে নাই। বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, বিপত্তি নাই; আমি স্বচ্ছন্দে, পরমানন্দে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া, লুক্কায়িত হইলাম।

কোথায় লুকাইলাম বলুন দেখি? কোন্ দেশে, কোন নগরে, কিরূপ গৃহে, কাহার ভবনে, কিরূপ ভাবে, ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিলাম,—তাহা বলুন দেখি? আমি মোদ্দা আপাতত সে কথা বলিতেছি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি,—এ স্থান তাদৃশ নিরাপদ নয়, তাদৃশ প্রীতিকরও নয়। শেঠজীর গৃহে যেরূপ বন্দী ছিলাম, এখানেও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকরূপ বন্দী হইয়া রহিলাম। এখানে বাহির হইবার যো নাই, বারান্দায় বসিয়া থাকিবার যো নাই। এমন কি ছাদে উঠিলেও গৃহস্বামী টিক্-টিক্ করেন। বলেন,—'নাবুন,নাবুন,—এখনই সর্ব্বনাশ হইবে! কে কোনদিক্ হইতে দেখিয়া ফেলিবে,—আর আপনারও জান যাইবে, আমারও জান যাইবে।' কূপের ভিতর বাস করিতে হইলে, মানুষের যেরূপ হাঁপানি সম্ভব, আমার মন সেই রূপ হাঁপাইতে লাগিল। এক একবার ভাবিতে লাগিলাম, 'শেঠজীর গৃহে বন্দী হইয়া বরং ছিলাম ভাল,—এ-যে পলাইয়া স্বাধীনতা পাইয়া, ঘটাইলাম অধিক মন্দ! অদৃষ্টের ফের এমনি!

গতকল্য সন্ধ্যার সময় আমি পলায়ন করি। সত্য সত্যই সেই সন্ধ্যা কালে, খাঁ বাহাদুরখাঁ, বখ্‌ত খাঁর নিকট আসিয়াছিলেন। সত্য সত্যই তিনি সৈন্যদের মধ্যে কিছু টাকা ছড়াইয়াছিলেন এবং দুই চারি জনকে সোণার বালাও দিয়াছিলেন। সৈন্য-সমূহের বিশেষ প্রিয়তম পাত্র হইবার জন্যই, খাঁ বাহাদুরখাঁ এরূপ দানাদি আরম্ভ করেন। সেদিন তিনি বখ্‌ত খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া চারিটী কামান প্রার্থনা করেন। এমন কি, চতুর্গুণ মূল্যে সেই চারিটী কামান খরিদ করিতেও চাহেন। কিন্তু বখ্‌ত খাঁ শক্ত লোক। কিছুতেই কামান দিতে স্বীকৃত হইলেন না। শেষে খাঁ বাহাদুরখাঁ কহিলেন,—"আমি বড়ই কাতর হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। সহরের বদ্‌মাইস-লোকদিগকে শাসন করিতে, সেরূপ সক্ষম হইতেছি না। বদমাইসগণ কখন কখন দলবদ্ধ হইয়া, আমার সিপাহীদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। সেই বদ্‌মাইস-দলনের জন্যই চারিটী কামান চাহিতেছি। আপনি যদি মূল্য লইয়া একেবারে চারিটী কামান না দেন, তাহা হইলে অন্তত দুই তিন দিনের জন্য আমাকে কামান ধার দিউন। কার্য্য সিদ্ধ হইলে, আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব।"

বখ্‌ত খাঁ উত্তর, দিলেন—"আমি একায়েক কামান দিতে পারিব না, তবে বদ্‌মাইস-দলনার্থ যাহা সাহায্য করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

এইরূপ ভগ্নমনোরথ হইয়া, নবাব খাঁ বাহাদুরখাঁ তথা হইতে বিরস-বদনে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে সৈন্যবৃন্দ স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিল। শেঠজীর গৃহের প্রহরীগণ অবশ্যই আবার পাহারা দিবার জন্য শেঠজীর ভবনের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইল। এ সময় যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহার কোন বিষয়ই আমি স্বচক্ষে সন্দর্শন করি নাই। পরে বিশ্বস্ত লোক-মুখে এবং অনুসন্ধানে যাহা জানিয়াছি, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

দফাদার দেখিল, দ্বার খোলা। তাহার মনে একটু সন্দেহ হইল। দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে সে প্রবেশ করিল। গৃহের নিকটস্থ হইয়া, আমার এবং শেঠজীর নাম ধরিয়া ডাকিল। শেঠজীর গোমস্তা তাহার নিকটে গিয়া বলিল,—"কেন কি হইয়াছে?" দফাদার উত্তর দিল, "বাবুসাহেব কোথায়? শেঠজী কোথায়?"

গোমস্তা। বাবু সাহেব তো অনেকক্ষণ তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেনা-নিবাসে গিয়াছেন। কৈ তিনি তো এখনও ফেরেন নাই।

দফাদার। তবেই বোধ হয় সর্ব্বনাশ হইয়াছে! তাঁহার ভাই কাশীপ্রসাদ কোথায়?

গোমস্তা। তিনিও তাহার দাদার সঙ্গে গিয়াছেন।

দফাদারের মুখ শুকাইল। কয়েদী পলাইয়াছে বুঝিয়া, তাহার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়া উঠিল। বলিল,—"শেঠজীর সহিত আমি একবার দেখা করিব।"

পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে, শেঠজী কহিলেন, "দুর্গাদাস বাবু সেনা-নিবাসেই গিয়াছেন, যাইবার সময় এই কথা আমায় বলিয়া যান যে, 'আমি এখনই সেনা-নিবাস হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, আমার মোটা লাঠীটীও সঙ্গে লন।"

রাত্রি ৯টা বাজিল, তথাচ ফিরিয়া আসিলাম না দেখিয়া, দফাদার এ সংবাদ সেনা-নিবাসে বখ্‌ত খাঁর নিকট প্রেরণ করে। বখ্‌ত খাঁ এ সংবাদ পাইয়া একেবারে, তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠেন। চারিদিকে 'ধর ধর' সংবাদ পড়িয়া যায়। মহম্মদ সফির সহিত এই সূত্রে বখ্‌ত খাঁর ঘোরতর বিবাদ হয়। বখ্‌তখাঁ ইঙ্গিতে এই ভাব প্রকাশ করেন যে, মহম্মদ সফির আদরে এবং আনুকূল্যে দুর্গাদাস পলাইয়াছে, নহিলে সাধ্য কি ... ... বিবাদ-বিতণ্ডা, বিচার-বিতর্ক, পরামর্শ-মন্তব্য, এইরূপ করিতেই রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। শেষে বখ্‌তখাঁ কহিলেন,—"দুর্গাদাস নিশ্চয়ই সহরে আছে। যাহার নিকট প্রত্যহ আহার করিতে যাইত, তাহারই সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্গাদাস তাহারই পরিচিত স্থানে লুক্কায়িত আছে সহর পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান কর সহরবাসীগণকে বল, তাহারা দুর্গাদাসকে যদি বাহির করিয়া না দেয়, তাহা হইলে বখ্‌ত খাঁ তোপে সহর উড়াইয়া দিবে। আর কোরাণ স্পর্শপূর্ব্বক আমি এই ঘোষণা করিতেছি, যে ব্যক্তি দুর্গাদাসকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে দশসহস্র টাকা পুরস্কার দিব.

এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়া দরবার ভঙ্গ পূর্ব্বক বখ্‌ত খাঁ বিশ্রাম-তাঁবুতে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

প্রাতঃকালে সেনা-নিবাস মধ্যে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড পড়িয়া গেল। প্রত্যেক সিপাহী, প্রত্যেক সওয়ার, প্রত্যেক গোলন্দাজই দশহাজার টাকা পুরস্কার লাভ-লালসায় বলিতে লাগিল, "আমি দুর্গাদাসকে ধরিয়া আনিব। আমি দুর্গাদাসকে ধরিয়া আনিব।" কেহ দলবদ্ধ হয় না, প্রত্যেকেই একাকেক ধরিতে চায়। কেননা, দলবদ্ধ হইলে তাহার দলস্থ অন্য সহচরগণকে, পুরস্কারের টাকার অংশ দিতে হইবে। টাকার অংশ দিতে যাই কেন, একাই দুর্গাদাসকে ধরিয়া আনিয়া এক কালে দশ হাজার টাকা গ্রহণ করিব।

মহম্মদ সফি দেখিলেন, বেরিলী সহর এইবার বুঝি ধ্বংস হইল, ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় এই দশ বার হাজার লোক যদি বেরিলী সহর এক কালে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সহর এক কালে সমূলে বিনষ্ট হইবে। তাঁহার বন্দোবস্ত মতে ;—২৫ জন অশ্বারোহী ৫০ জন পদাতিক এবং ২টী কামান, আমাকে ধৃত করিবার জন্য সহরাভিমুখে চলিল।

এই সৈন্যদল সহরে পৌঁছিয়া রাষ্ট্র করিল ;— "সহরবাসীগণ মধ্যে যিনি দুর্গাদাসের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন বা দুর্গাদাসকে ধরিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিব। যদি সহরবাসীগণ দুর্গাদাসের অনুসন্ধান না করিয়া দেন, তাহা হইলে বখ্‌ত খাঁর হুকুমে, তোপে আজ সহর উড়াইব।"

বাড়ী-বাড়ী ঘর-ঘর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। সহরের বদ্‌মাইস গুণ্ডাগণ, ভদ্রলোকের খানাতল্লাসি করিবার ভয় দেখাইয়া, গৃহস্বামীর নিকট টাকা ঘুস লইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদল, হরগোবিন্দ দাদার গৃহে গিয়া পৌঁছিল। বলিল,—"এখনই দুর্গাদাসকে বাহির করিয়া দাও, নিশ্চয়ই দুর্গাদাস এইখানে লুকাইয়া আছে।" দাদা, ব্যাপার দেখিয়াই ত একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। সৈন্যদল বলিল, —"যদি দুর্গাদাসকে এখনই বাহির করিয়া না দাও, তাহা হইলে পরিজনবর্গ-সহিত এখনি তোপে তোমার গৃহ উড়াইয়া দিব।"

দাদা বালকের ন্যায় হাউ হাউ কাঁদিতে লাগিলেন। প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী রূক্ষস্বরে ক্রোধভরে বলিল, "কাঁদিলে চলিবে না। বল, শীঘ্র বল।"

দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দুর্গাদাস ভায়া যে কোথায়, আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না।"

এই কথা বলিবামাত্র, একজন প্রধান সৈনিক

কর্ম্মচারী দাদার দক্ষিণ গণ্ডে এক বিষম চপেটাঘাত করিল। কড়া হাতের কড়া চড় খাইয়া দা ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিলেন তখন হরদেব দাদা সাহসে ভর করিয়া, যোড়হাতে, কাতরকণ্ঠে, বলিতে লাগিলেন, "আমাদিগকে মারা কাটা এখন তোমাদিগের এক্তার। যা ইচ্ছা তোমরা করিতে পার। কিন্তু দুর্গাদাসের সংবাদ আমরা কিছুই জানি না। এই ঘর বাড়ী তোমাদিগকে এখন অর্পণ করিলাম, তোমরা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখ, দুর্গাদাস কোথাও লুকাইয়া আছে কি না। কিন্তু এক মিনতি এই, এই ঘরে যে সকল স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিও।"

এইরূপ অনুনয় বিনয় করিয়া বলায়, তাহারা হরদেব দাদাকে আর কিছু বলিল না, কেবল ঘর খানা-তল্লাসি করিয়াই ক্ষান্ত হইল। বলা উচিত, খানা-তল্লাসি কালে, সিপাহীগণ, স্ত্রীলোকদের উপর কোনরূপ অত্যাচার বা উপদ্রব করে নাই তবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহের জিনিস-পত্র কিছু কিছু চুরী করিয়াছিল।

সহরে আমার যে সকল বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই গৃহে সিপাহীগণ আমার অনুসন্ধানার্থ গমন করেন। মিশ্র বৈজনাথ, রায় চেতরাম, লালা লক্ষ্মীনারায়ণ, আলতাপ আলী খাঁ, হাকিম সহোদৎআলী খাঁ, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সম্মানার্হ, সম্পত্তিপন্ন হিন্দু ও মুসলমানের ভবনে সিপাহীগণ গমন করিয়া নানারূপ উপদ্রব করিয়াছিল। কিন্তু আমি তো এ সকল স্থানে নাই, আমাকে খুঁজিয়া পাইবে কিরূপে? আমাকে না পাইয়া, হতাশ হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের পর, সিপাহীগণ সেনা-নিবাসে প্রস্থান করে।

যখন বখ্‌ত খাঁ শুনিলেন, অন্বেষণ করিয়া আমাকে কেহ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। মহাদাবানলের ন্যায় তাঁহার ক্রোধ-বৈশ্বানর যেন আকাশস্পর্শী হইয়া ধূ ধূ জ্বলিতে লাগিল। "দুর্গাদাস কো আবহি লে আনে হোগা, আবহি লে আনে হোগা," বলিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, "বাঙ্গালী কৈসা বদমাইস্ হ্যায়, হম্ এক দম দেখলেঙ্গে"—এ কথাও তাঁহার মুখ দিয়া সজোরে উচ্চারিত হইতে লাগিল

বখ্‌ত খাঁর রাগ কেন যে আমার উপর এত হইল, তাহা বলিতে পারি না। অনেক লোকেই তো পলাইতেছে, কিন্তু কৈ তাহাদিগকে ধরিবার জন্য এরূপ সৈন্যও বাহির হয় নাই, তোপও বাহির হয় নাই। আর হিসাব কিতাব রাখিবার জন্য বেরিলী সহরে যে, আমা ভিন্ন দ্বিতীয় লোক নাই, এমনও কিছু নয়; সুতরাং আমাকে ধৃত না করিলে যে, বখ্‌ত খাঁর সংসার অচল হয়, তাহাও নহে; তবে তাঁহার এত ক্রোধ কেন,—আমাকে লইয়া এত পীড়াপীড়ি কেন? বোধ হয়, বখ্‌ত খাঁর আমার উপর কেমন একটা ঝোঁক পড়িয়াছিল, বিশেষ, আমি তাঁহার চোখে ধূলা দিয়া যে পলাইলাম, তাতে তাঁহার আরও রাগ হৈল। তাই সদাই তিনি ধর্ ধর্ ধ্বনিতে ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন।

যে দফাদার আমার প্রহরী স্বরূপ হইয়া দাদার বাসা হইতে আমাকে প্রত্যহ খাওয়াইয়া লইয়া যাইত, সেই দফাদারকে ডাকিবার হুকুম হইল। কিছুক্ষণ পরে বখ্‌ত খাঁর নিকট সংবাদ আসিল, সে দফাদারকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; সম্ভবত সে পলাইয়াছে। অনেকে অনুমান করিল, আমি এবং দফাদার একত্রে একযোগে এক পরামর্শে রাত্রে কোন নিকটস্থ পল্লীগ্রামে পলাইয়া লুকাইয়া আছি।

বখ্‌ত খাঁ হুকুম দিলেন,—"দফাদারের সঙ্গে যে সব সওয়ার যাইত, তাহাদিগকে হাজির কর।"

অনতিবিলম্বে পাঁচজনের পরিবর্ত্তে তিনজন সওয়ার হাজির হইল, বাকি দুইজন পলাতক।

বখ্‌ত খাঁ বলিলেন,—'ভাই ঠিক্ ঠিক্ কথা কহিও, যাহা সত্য জান; তাহাই বলিবে; মিথ্যার লেশ যেন তাহাতে না থাকে।"

তাহারা যোড়হাতে উত্তর দিল,—'হুজুর যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে।"

বখ্‌ত খাঁ। এই যখন দুর্গাদাস বাবুর সহিত তোমরা প্রত্যহ যাইতে এবং প্রত্যাগত হইতে, তখন দুর্গাদাস বাবু পথি-মধ্যে কাহারও সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেন কিনা?

সওয়ারগণ এক-বাক্যে বলিল,—"না। কথা-বার্ত্তা যাহা কিছু হইত, তাহা আমাদেরই সঙ্গে।"

বখ্‌ত খাঁ। দুর্গাদাস পথিমধ্যে কখন কাহার গৃহে ঢুকিয়াছিল কিনা?

প্রহরীগণ উত্তর দিল,—"অন্যের গৃহে ২।৩ দিন তিনি ঢুকিয়াছিলেন।"

বখ্‌ত খাঁ। কার গৃহে?

সওয়ারগণ। নর্ত্তকী পান্নার গৃহে।

বখ্‌ত খাঁ মন্ত্রিবর্গকে জিজ্ঞাসিলেন, "পান্নার গৃহে দুর্গাদাসের অনুসন্ধান বা পান্নার গৃহ খানা-তল্লাসী হইয়াছিল কিনা? এ কথা জানিয়া আমাকে শীঘ্র বল।"

ইহার উত্তর হইল, "না,—খানা-তল্লাসী হয় নাই। পান্নার গৃহে কেহ যায়ও নাই।

বখ্‌ত খাঁ কহিলেন,—"আমার বিশ্বাস দুর্গাদাস নিশ্চয়ই পান্নার গৃহে লুকাইয়া আছে, এখনই তোমরা সসৈন্যে গমন কর। দুর্গাদাস, মৃতই হউক, আর জীবিতই থাক্, যে তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব।"

তখন আবার 'সাজ সাজ সাজ' সাড়া পড়িয়া গেল, আবার ২৫ জন সওয়ার ৫০ জন সিপাহী ২ তোপ, আমাকে ধরিবার জন্য সহরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এত যে কাণ্ড ঘটিতেছে,—সেনানিবাসে এবং সহরে এমন যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে,—এ পর্য্যন্ত আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি। আমি পলাইয়া আসিয়াছি, আর লুকাইয়া আছি। খাইয়াছি, ঘুমাইয়াছি, আবার জাগিয়া বসিয়া আছি। আমার জন্য যে, ত্রিসংসারে এরূপ কল্লোল-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও এ পর্য্যন্ত অবগত নহি। সেনাদল পান্নার গৃহ আক্রমণ করিবার জন্য যে ছুটিয়াছে, বলা বাহুল্য সে সংবাদ আমি স্বপ্নেও প্রাপ্ত হই নাই।

আমি এখন কোথায়? কাহার ভবনে, কাহার গুপ্তগৃহে আমি লুক্কায়িত? কে আমাকে সাহস করিয়া আপনার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন?

এইবার খুলিয়াই বলিতে হইল,—পান্নার গৃহই আমার আশ্রয়-ভূমি, পান্নাই আমার আশ্রয়-দাত্রী, পান্নাই এখন রক্ষয়িত্রী। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, পলাইবার একদিন পূর্ব্বে আমি পান্নার নিকট আসিয়া, কাণে-কাণে এক গুপ্ত কথা বলিয়াছিলাম,—সে গুপ্ত কথা আর কিছুই নয়,—এই 'আশ্রয়-স্থান-ভিক্ষা'।

নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, নর্ত্তকী-ভবনে বাস করিয়াছিলাম। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, পান্না দ্বিচারিণী, বিলাসিনী ভুবন-মোহিনী। তাহার পাপ-পঙ্কিল ভবনে আমার বসবাস কিরূপে সম্ভবে? সম্ভব নহে বলিয়াই, একান্ত অসম্ভব বলিয়াই পান্নার গৃহে আমি গমন করিয়াছিলাম।

আমি যে নিশি দিবা, পান্নার কুঞ্জ-কাননে যাপন করিব, ইহা লোকের মনে কখনই ধারণা হইতে পারে না। তাই আমি পান্নার নিকট গমন করিয়াছিলাম। যাহা লোকের বিশ্বাসের বিপরীত, ধারণার বিপরীত, এ বিপদে সেই কার্য্যই করা আমার উচিত, তাই আমি পান্নার গৃহে গমন করিয়াছিলাম। এরূপ বেশ্যাভবন-বাস দূষণীয় হইলেও, প্রাণরক্ষার্থ আমি তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

আমি পলাইলে আমার জন্য যে, এরূপ অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে, তাহা আমি কখন ভাবি নাই, কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি নাই। এই মাত্র স্থির করিয়াছিলাম, যদি একান্তই আমার অনুসন্ধান হয়, তো সহরের দুই এক স্থানে, আমার বিশেষ পরিচিত লোকের ভবনেই হইবে। কিন্তু ইহা তো তাহা নহে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত দুর্য্যোধনের ন্যায় আমার অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। অথবা বিরাট-গৃহে ছদ্মবেশে অবস্থিত পঞ্চ পাণ্ডবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন দুর্য্যোধনের দূতগণ ছুটিয়াছে!

পান্নার গৃহ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বৈঠকখানা, দ্বিতীয় খণ্ডে অন্দর। বৈঠকখানা বাড়ী,—দ্বিতল চক্-মিলান। অন্দর বাড়ীও দ্বিতল বটে, কিন্তু চক্-মিলান ঠিক নহে। বৈঠকখানার বাহার বেশী; ঘর বেশী; আলোক-বায়ু গমনাগমনের পথ বেশী। বৈঠকখানা-বিভাগের দ্বিতলের ঘরগুলি উত্তমরূপ সজ্জিত। তন্মধ্যে প্রধান ঘরটী বা হলটীর শোভা-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়! ঝাড়, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি,—সোফা, চেয়ার, আলমারি,—রেশম-পশম কার্পেটের কত রকম যে কারিকুরি,—তাহার বর্ণন আর করিব? সেই বৃহৎ হলের দুই পার্শ্বে দুইটী কুঠারী আছে। সেই প্রকোষ্ঠ দ্বয়

আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও, সাজসজ্জায় নিতান্ত কম নহে।

বৃহৎ হলটী পান্নার বৈঠকখানার সদর খণ্ড। ঐখানে ওস্তাদজী আসিয়া, পান্নাকে নাচ শিখায়, গান শিখায়, বাজনা শিখায়। পান্নার বন্ধু বান্ধব ঐ স্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করে। ভদ্রলোকগণ পান্নার নাচ-গানের বায়না করিতে আসিয়া ঐ স্থানেই উপবিষ্ট হন। ঐ হলের উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী কুঠারী, পান্নার অন্দর, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা ব্যতীত দ্বিতলে অন্য দিকে চারি পাঁচটী কুঠারী আছে। তাহার মধ্যে কোনটী ভাণ্ডার গৃহ, কোনটী বেশ-বিন্যাসের গৃহ, কোনটী স্নানের গৃহ, কোনটী বা আহারের গৃহ, —ভাব এই রূপই।

অন্দর মহলের দ্বিতলে দুইটী মাত্র কুঠারী আছে। একটীতে পান্নার জননী বাস করে, আর একটীতে পান্নার ভ্রাতা পত্নীর সহিত বাস করে।

পান্নার মা এবং ভ্রাতৃবধূ উভয়েই পরদা-নসীন। তাহারা বৈঠকখানায় আসেনা, পর পুরুষের সাক্ষাতে কখন বাহির হয় না। পান্নার ভ্রাতা বৈঠকখানা বাটীতে, সাধারণত পান্নার অনুমতি ব্যতীত আসিতে পায় না। পান্নার ভ্রাতার, বৈঠকখানা বাটীতে আসিবার আবশ্যক হইলে, লোক দ্বারা এ বিষয় পান্নাকে জানান হয়। তখন পান্নার অবশ্যই অনুমতি হয়। এইরূপে শ্রীমতীর অনুমত্যনুসারে ভ্রাতা বৈঠক-খানায় আসিতে পায়।

বলাই বাহুল্য, পান্নার উপার্জ্জনে, মাতা ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির ভরণ পোষণ হইয়া থাকে। সংসারের যা কিছু খরচ পত্র আহারীয় সামগ্রী বস্ত্রাদি, বাটীভাড়া ভৃত্যাদির বেতন,—সমস্তই পান্না প্রদান করিয়া থাকে। পান্না যেন, এম,এ, বি,এল, পাশ রোজকারী পুত্র। একজন প্রথম শ্রেণীর সদরালার অপেক্ষাও পান্নার আয় অধিক।

অন্দরে দ্বিতল গৃহের নিম্নে,—অর্থাৎ এক তলে দুইটী কুঠারী আছে। তন্মধ্যে একটী কুঠারীর নিম্নে পাতাল প্রদেশে, আর একটী কুঠারী আছে। তাহার নাম,—তহ্‌খানা অথবা পাতাল-ঘর। দুরন্ত গ্রীষ্মের সময় সেই পাতাল ঘরে থাকিলে, বড়ই আরাম বোধ হয়। মাটীর নীচের ঘর বড়ই ঠাণ্ডা।

সেই পাতাল ঘরটী, দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নূতন চুণকাম্ করা। বায়ু আসিবার নিমিত্ত, উপরিতলস্থ কুঠারীর দেওয়ালের গায়ে, মাঝে মাঝে গর্ত্ত কাটা আছে। সে গর্ত্ত দেখিলে মনে হয়, বুঝি ক্রন্দন-প্রিয় বালক ভুলাইবার জন্য এই গর্ত্ত কর্ত্তিত হইয়াছে। পাতাল-ঘরের ভিতর দাঁড়াইলে, কড়ী মাথায় ঠেকে না। ঊর্দ্ধে প্রায় চারি হাত হইবে। ভিতরে অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিয়া না রাখিলে, বিশেষরূপ কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। উপরিতল হইতে কাঠের সিঁড়ি দিয়া এই ঘরে নামিতে হয়। নামিয়া আসিলে কাঠের সিঁড়ি খুলিয়া রাখা যায়, এবং অবতরণের দ্বার এক খানি তক্তা দিয়া বন্ধ করা হয়। সেই তক্তার উপর জিনিষ পত্র রাখ, আলমারি রাখ, চেয়ার রাখ, যাহা ইচ্ছা তাহাই রাখিতে পার। যাঁহার পাতাল-ঘরে বসবাস করা অভ্যাস নাই, প্রথম তথায় বাস করিলে, তাঁহার কেমন এক রকম হাঁপ লাগে, বিশেষ পান্নার তহ্‌খানায় নানা দিক্ হইতে বায়ু আসিত, অথচ উপরে দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হইত, ভিতরে বায়ু-প্রবেশের দ্বার অতি অল্পই আছে।

আমার ও কাশীপ্রসাদের লুকাইবার জন্য পান্না ঐ পাতাল-ঘরটী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু আমার হাঁপ লাগায় আমি তথায় থাকিতে পারি নাই, কাশীপ্রসাদের এই নিম্ন ঘরটী বেশ পছন্দ হইয়াছিল। সে বলিত, "দাদা! এ ঘরে আমরা তো বেশ আছি, উপরে যাইবার দরকার কি?" আমার উত্তর এইরূপ,—"বরং বখ্‌ত খাঁকে আমি ধরা দিতে রাজি আছি, কিন্তু এ পাতাল-ঘরে থাকিতে আমি কিছুতেই রাজি নহি। বাপ! এ পাতালপুরীর ভিতর অন্ধকারে কি মানুষ তিষ্ঠিতে পারে? তুমি পার, থাক, আমি কিন্তু উপরে যাইব।"

বলা বাহুল্য আমি কখন দ্বিতলে, কখন নিম্নতলে, কখন ছাদে, এইরূপ করিয়াই সেদিন কাটাইলাম। পান্না আমাকে ছাদে উঠিতে বা দ্বিতলে উঠিতে দেখিয়া বড়ই বিব্রত হইল,—তাহার প্রাণ যেন ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। আমাকে যোড় হাতে, কাতর কণ্ঠে বলিল, "বাবু সাহেব! আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি নিম্ন তলে লুক্কায়িত থাকুন। আমি পান্নার কথায়

একবার নীচে আসিলাম। আবার এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া যখন দেখিলাম, পান্না সম্মুখে উপস্থিত নাই, অমনি নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে উপরে গিয়া বসিলাম।"

নীরবে বসিয়া থাকিতে আমি নারাজ, আমার স্বভাব বড়ই চঞ্চল। নিস্পন্দ হইয়া, নিষ্কর্ম্মা হইয়া, জড় পদার্থের ন্যায় বসিয়া থাকা আমার কোষ্ঠীতে কখন লেখে নাই।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। দেখিলাম পান্না ত্রিতলের গৃহে একাকিনী উপবিষ্টা, হাতে একটী দূরবীণ। আমি পাছে ছাদে যাই, সেই ভয়ে পান্না বোধ হয় ছাদের দ্বার আটক করিয়া ত্রিতলের গৃহে বসিয়া আছে। আমি এই অবসর বুঝিয়া পান্নার বৈঠকখানা-গৃহের দ্বিতলের হলে আসিলাম। খানিক সোফায় শুইলাম, খানিক চেয়ারে বসিলাম, খানিক খাটে গড়াগড়ি দিলাম, প্রাণ কেমন ছট্-ফট্ করিতে লাগিল। "কি করি, কি করি" ইহা মনোমধ্যে স্থির করিতে লাগিলাম। কাজ তো কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে পান্নার সেতারের দিকে নজর পড়িল। ভাবিলাম, যদি সেতার খুলিয়া ঝঙ্কার দি, তাহা হইলে, পান্না অমনি রায় বাঘিনীর মতন গাঁক করিয়া আসিবে। কিন্তু মন মানিল না। সেতার-বাজনায় ভয়ঙ্কর নেশা জন্মিয়াছিল। বিদ্রোহের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি সেতার চক্ষে দেখি নাই, সেতারও বাজাইতে পারি নাই। গোলে-মালে, ভাবনায়-চিন্তায়, সেতারের কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ সুন্দর সুসজ্জিত সেতার দেখিয়া হৃদয়-সরিতে যেন এক মহা কোটালের বান ডাকিয়া উঠিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন ক্ষীরময় জননী-স্তন দেখিলে 'আকুলি ব্যাকুলি' করে, সেতার দেখিয়া আমার মন সেইরূপ করিতে লাগিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। ধীর-পদে উঠিয়া আস্তে আস্তে সেতারটী পাড়িলাম। অতি ধীরে ধীরে সন্তর্পণে সুর বাঁধিলাম। সেতারের তারে ঘা দিলেই যে, এক মহা শব্দ উত্থিত হইবে, সে জ্ঞান তখন আমার আর নাই, অথচ সেতার-বাজাইবার পূর্ব্ব কার্য্য সকল, ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করিতেছি। সমুদয় ঠিক হইলে, ভীমপলাশী রাগ আরম্ভ করিলাম।

দুই চারিবার সেতারে ঝঙ্কার পড়িতে না পড়িতে, সম্মুখে দেখিলাম, এক আলু-থালু-বেশা ক্ষিপ্তপ্রায়া নারী-মূর্ত্তি। রমণীর মুখ দিয়া বাক্য-নিঃসরণ হয় না, থাকিয়া থাকিয়া সে কেবল হাঁপাইতে লাগিল। আমি চমকিত হইয়া রমণীর মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "পান্না! তুমি এমন করিতেছ কেন, কি হইয়াছে?" পান্না তখনও স্পষ্টরূপে কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। কিন্তু পান্না যাহা বলিল, তাহার ভাব এইরূপ, "আমি ছাতে উঠিয়া দূরবীণ দিয়া দেখিলাম, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য কামান লইয়া এই দিকে আসিতেছে, বোধ হয়, আপনাকে ধরিবার জন্য বিদ্রোহী সিপাহীগণ ধাবিত হইয়াছে।" "সেতার ছাড়ুন, শীঘ্র আপনি অন্দর-বাটীর পাতাল-ঘরে গিয়া লুক্কায়িত হউন।"

এই কথা বলিয়া পান্না আমার হাত হইতে সেতার কাড়িয়া লইল এবং আমাকে 'উঠুন উঠুন' শব্দে অভিবাদন করিতে লাগিল।

আমি উঠিলাম, কিন্তু পাতাল-ঘরে শীঘ্র যাইতে মন সরিল না। পান্নাকে কহিলাম,—"সিপাহীরা যে কামান লইয়া আমাকেই ধরিতে আসিতেছে, তাহার এখন ঠিক কি? এমনও তো হইতে পারে যে, সিপাহীগণ এই বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া অন্য কোথাও যাইতেছে।"

পান্না এই ভাবে উত্তর করিল,—"এ সকল কথার বিচার বিতর্ক করিবার সময় এখন নহে। ঐ দেখুন, ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ পাওয়া যাইতেছে। ঐ ঐ ঐ দেখুন, একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। আপনি শীঘ্র গমন করুন, আপনার ভ্রাতাকে লইয়া তহ্-খানায় লুক্কায়িত হউন।"

পান্নার দেহ বাতান্দোলিত কদলীবৃক্ষের ন্যায়, কম্পিত হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম, বিপদ সত্য সত্যই সম্মুখবর্ত্তী। সত্য সত্যই অশ্বের হ্রেষারব, সৈন্য-সমূহের কণ্ঠরব, আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

এই ঘোর বিপত্তি কালে আমার কোন্ পথ অবলম্বনীয়, তাহাই মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলাম, দাঁড়াইয়া উঠিলাম। পান্নাকে কহিলাম,—তুমি ভীত হইও না। তুমি আমাকে লুকাইয়া থাকিতে বলিতেছ, কিন্তু আমি লুকাইব না,—আমি ধরা

দিব। সেনাগণ এই বাটীতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, আমি ডাকিয়া বলিব,—'এই আমি,—এই দুর্গাদাস উপস্থিত। যদি তোমরা আমাকে ধরিতে আসিয়া থাক, তবে আমি যাইতেছি, আমাকে লইয়া যাও। কিন্তু তোমাদিগকে এক অনুরোধ, এই পান্না নিরপরাধিনী, ইহার বাটী লুণ্ঠন করিও না; অথবা পান্নার সম্ভ্রম নষ্ট বা ইহাকে হনন করিও না।' পান্না! তুমিই ভাবিয়া দেখ, আমার জন্য কেন তুমি সবংশে মরিবে? আমি পাতাল-ঘরে লুক্কায়িত আছি, যদি ইহারা জানিতে পারে, তাহা হইলে, তোমাকে প্রহার করিবে, বে-ইজ্জত করিবে, অবশেষে হয়ত প্রাণেও মারিবে। তাই বলিতেছি, কেন তুমি আমার জন্য সবংশে মজিবে? পান্না! তুমি মনে কিছু করিও না। আমি ধরা দিব।

পান্না নয়নজলে গণ্ডস্থল অভিষিক্ত করিয়া, ভূলুণ্ঠিত হইয়া ব্রততীর ন্যায় আমার পদযুগল বেষ্টন পূর্ব্বক, নিতান্ত করুণস্বরে কহিল,—"প্রভু! আপনি সর্ব্বনাশ করিবেন না। আপনি লুক্কায়িত হউন, যে কোন উপায়ে হউক আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে আমি দেবতার ন্যায় দেখি, গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি করি। আপনাকে কিছুতেই ছাড়িতেছি না, আপনি সহজে না যান, আপনার পদযুগল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইব।"

আমি গম্ভীরস্বরে কহিলাম, "পান্না! কর কি? কর কি? আমার পা শীঘ্র ছাড়িয়া দাও।"

পান্না পা ছাড়িল না। কাতর-কণ্ঠে কহিল,—"আমার গৃহে এবং আমার দ্বারা আমি ব্রহ্মহত্যা হইতে দিব না। আজ দুর্ব্বৃত্ত সিপাহীগণ আপনাকে পাইলে ফাঁসী দিবে, অথবা তরবারি-আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিবে। তাই বলিতেছি, আমি ব্রহ্মহত্যার কারণ হইতে পারিব না।"

সিপাহীদের কোলাহল ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পান্না কহিল,—"আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র চলুন, শীঘ্র চলুন,—লুক্কায়িত হউন। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন, আপনার জন্য আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে প্রাণ দিতে হইবে। আপনি যখন ধরা দিবেন, তখন অবশ্যই সিপাহীগণ, কাশীপ্রসাদের সংবাদ আপনাকে জিজ্ঞাসিবে, আপনি যদি কোন কথার উত্তর না দেন, তথাচ তাহারা কাশীপ্রসাদ এই বাটীতে আছে জানিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, কাশীপ্রসাদকে বাহির করিয়া ফেলিবে। কাশীপ্রসাদের জন্য তাহারা এই বাটীর ইট এক একখানি করিয়া খুলিয়া দেখিবে। তাই বলিতেছি,—আপনি ভ্রাতৃ-বধ করিবেন না, অথবা ভ্রাতৃ-বধের কারণ হইবেন না। সর্ব্বদিক্ ভাবিয়া দেখিলে এক পলায়নই মঙ্গলকর। আপনি যদি সৈনিকদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলে, আপনারও নিধন এবং যে কারণেই হউক, আমারও নিধন ঘটিবে, ইহা স্থির বলিলাম। অবশেষে কাশীপ্রসাদেরও যে নিধন ঘটিবে, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। সুতরাং আত্মসমর্পণ করিয়া ফল কি? আমি মায়াবিনী, নানা কৌশল জানি। বলিতে কষ্ট হয়, দুঃখ হয়,—কুটিল-কটাক্ষে, মধুর হাস্যে ভ্রূভঙ্গীতে, আমি ভুবন জয় করিতে পারি, মুনি-ঋষিরও মন ভুলাইতে পারি। সুতরাং পাশব-বলসম্পন্ন সৈন্য সকলকে আমি যে স্ববশে আনিতে পারিব না, ইহা আপনাকে কে বলিল?"

পান্নার মনোহর মধুর বক্তৃতা-মন্ত্রে আমি মোহিত হইলাম। পান্না যাহা বলিল, তখন তাহাই করিতে প্রবৃত্ত জন্মিল। পান্না লুকাইবার উপদেশ দিল, তাহাই তখন ভাল বোধ হইল।

আর বাক্যব্যয় করিলাম না। দ্রুতপদে অন্দরাভিমুখে চলিলাম। আমি যখন যাই, তখন সৈনিকদল পান্নার গৃহের প্রায় দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বোধ হইল।

আমি কাশীপ্রসাদের সহিত পাতাল-ঘরে লুকাইলাম। শ্রুত আছি, পাতাল-ঘরের মুখ প্রথমে একখানি তক্তা দিয়া বন্ধ করা হইল পান্নার ভ্রাতা সেই তক্তার উপর একখানি জলচৌকি বসাইয়া রাখিল। চৌকির উপর কলসী কুঁজা, গেলাস-থাল, প্রভৃতি রক্ষিত হইল চৌকির আসে-পাশে এরূপভাবে জিনিস-পত্র সাজান হইল যে, বাহ্য-দৃশ্যে সহজে বুঝিবার যো রহিল না—চৌকির নীচে পাতাল-ঘরের দ্বার আছে।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পাতল-ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতই আমি হাঁপাইতে লাগিলাম। ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ স্বচ্ছন্দ-মনে একখানি উৎকৃষ্ট খাটে শুইয়া রহিল। ভাবনার আদি-অন্ত-মধ্য নাই;—আমি ভাবনা-সাগরে ডুবিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সৈনিক-দল সেই নিম্নতলের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুভবে বুঝিলাম, খানাতল্লাসী আরম্ভ হইয়াছে। আমরা নীচে, উপরে সৈন্যদল,—তাহাদের পদভরে গৃহ টলমল করিতে লাগিল। কাশীপ্রসাদ ব্যাপার বুঝিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে আমাকে বলিল,—"দাদা! এই বার কি হবে?" আমি অতি-ধীর-স্বরে উত্তর দিলাম, "ভাই! চুপ করিয়া থাক, কথা কহিও না।" সৈন্যসমূহের পায়ের দূপ দূপ শব্দে এক একবার মনে হইতে লাগিল, ছাদ বুঝি বা ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়ে! প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সমস্তই একেবারে নীরব হইল;—আমার বোধ হইল, খানাতল্লাসী কার্য্য শেষ করিয়া, এ ঘর হইতে সৈন্যদল অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে। তখন আমি, ভয়ে-মৃতপ্রায় ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে বলিলাম, "ভাই! বুঝি আর ভয় নাই।"

কিয়ৎক্ষণ পরে পান্না ও তাহার ভ্রাতা, আসিয়া, পাতাল-ঘরের দ্বার উদ্ঘাটন করিল। আমরা উপরে উঠিলাম। পান্না কহিল,—"দেখুন, বাবুজি! আপনার প্রাণ আপাততঃ রক্ষা হইল ত! আপনি যদি আমার কথা না শুনিয়া সিপাহীদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে, এতক্ষণ মহা সর্ব্বনাশ ঘটিত।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—রুধিরে পান্নার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত। জিজ্ঞাসিলাম,—"এ কি? পান্না! এ কি?"

পান্না হাসিয়া উত্তর দিল,—"বাবুজি! আজ আমি রণজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ। ঘোর সংগ্রামে সম্মুখ সমরে আহত হইয়াছি মাত্র। কিন্তু এ সৈনিক জীবনে ইহাতেই আমাদের সুখ।"

পান্নার হিঁয়ালীর ছন্দে উত্তর শুনিয়া, আমি কহিলাম,—"আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, যথার্থ ঘটনা কি আমায় বল।"

কি রূপে পান্নাকে বাঁধিয়াছিল, কি রূপে পান্নাকে তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিতে গিয়াছিল, কি রূপে পান্নার পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, কিরূপে পান্নার অঙ্গে তীক্ষ্ণধার সূচিকা বিদ্ধ করিয়াছিল, কিরূপে পান্নাকে সহস্রাধিক টাকা দিবার লোভ দেখাইয়াছিল, সমস্ত কথাই পান্না একে একে আনুপূর্ব্বিক বিবৃতি করিল। কিন্তু শত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও বুদ্ধিমতী পান্না এরূপ ধীরতার সহিত কৌশলে অথচ সুমিষ্ট ভাষায়, উত্তর দিয়াছিলেন যে, সিপাহীদলের সমস্ত চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ হইয়া যায়। মায়াবিনী পান্নার ক্ষুরধার বুদ্ধির নিকট, সিপাহীদের সমস্ত কৌশল-জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, পান্নার অনুগ্রহে, পান্নার বুদ্ধির জোরে, পান্নার আত্মত্যাগে, আমি সে যাত্রা পাতাল-ঘরে লুকাইয়া রক্ষা পাইয়াছিলাম।

আমরা দুই ভাই দিবসে পাতাল-ঘরে থাকিতাম, সন্ধ্যার পর পাতাল ঘর হইতে উঠিয়া স্নান আহ্নিক করিতাম, এবং স্বপাক অন্ন খাইতাম। পান্নার যত্নের ক্রটী থাকে নাই, কিন্তু আমার কষ্টের অবধি ছিল না। দিবসে অন্তঃপুর পাতাল-ঘরে কি থাকা যায়! কবে বখ্‌ত খাঁ সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন, কেবল ইহারই সংবাদ লইতে লাগিলাম। ১০ই জুন শুনিলাম, বখ্‌ত খাঁ দিল্লী যাইবার উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক গরুর গাড়ীতে মাল-পত্র বোঝাই করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক উষ্ট্র, হস্তীর উপর টাকা ও আসবাব বোঝাই হইয়াছে। ভাবিলাম, ১১ই জুন ইহারা নিশ্চয় বেরিলী সহর পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে সংবাদ পাইলাম, যাত্রার জন্য সকলেই সজ্জিত বটে, কিন্তু যাত্রা কেহ করে নাই। ভাবিলাম, আপদ দূর হইয়াও হয় না কেন?

এক একবার মনে হইতে লাগিল, বুঝি আমাকেই ধরিবার জন্য বখ্‌ত খাঁ অপেক্ষা করিতেছে। কারণ ইতিপূর্ব্বে তিনি বেরিলী সহরে ঘোষণা দিয়াছিলেন যে,—"যে ব্যক্তি দুর্গাদাস বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারিবে, সে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।"

১৩ই জুন প্রাতঃকালে, পান্নার ভ্রাতা পাতাল-ঘরে হাসি-হাসি-মুখে আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"বাবু সাহেব! শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি, আমাকে কি খাওয়াইবেন বলুন।"

আমি বলিলাম, "ইংরেজ-রাজ সসৈন্যে পুনরায় আসিয়াছেন নাকি?"

ভ্রাতা। না, তা নয়—বখ্‌ত খাঁ সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করিয়াছে।

আমি। এ সংবাদও শুভ বটে;—কেননা, এইবার আমি কারামুক্ত হইব।

পান্নাসুন্দরীও এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারও মুখে ঐ কথা।

আমাদের গৃহে আনন্দের উচ্চরোল উঠিল। সুখের প্রস্রবণ হৃদয়-কন্দরে উচ্ছলিত হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বখ্‌ত খাঁ ত সসৈন্যে সহর ত্যাগ করিলেন, এদিকে কিন্তু অরাজকতার এবং অশান্তির সংবাদ প্রতিনিয়ত আসিতে লাগিল। বিদ্রোহের সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, সকলেই যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বিদ্রোহীরা যে, কেবল বৃটিশ-শাসনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল এমন নহে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার শাসনের উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে এই সুযোগে আপনাদের চির-শত্রুদের নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। আজ এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কল্য অপর স্থানে মার-পিট ইত্যাদি হইতে লাগিল। পূর্ণমাত্রায় দেশ-ব্যাপী অশান্তির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি চারিদিকে বিরাজ করিতে লাগিল। কিরূপে এই সকল বিশৃঙ্খলতা নিবারিত হইবে, তাহার উপায় চিন্তার জন্য খাঁ বাহাদুর খাঁ তাঁহার বিশস্ত কয়েক জন অনুচর লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক যুক্তির পর এই স্থির হইল যে, একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিতে হইবে, তিনি দেশের রাজস্ব এবং পুলিশ-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিবেন। সদরআলি খাঁর অনুরোধে খাঁ বাহাদুর খাঁর অধীনে শোভারাম নামক এক ব্যক্তি এই দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইল।

শোভারাম স্থূলকায়; শ্যাম বর্ণ; খঞ্জ। চলিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তঞ্জামের উপর আরোহণ করিয়া, অর্দ্ধ-উপবিষ্ট, অর্দ্ধ-শয়িত ভাবে তিনি নগর পরিভ্রমণ করিতেন। শোভারাম বাহ্যদৃশ্যে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু,—কিন্তু অন্তরে দারুণ নাস্তিক। এ দিকে তিলক ফোঁটা কাটেন, —ও দিকে কিন্তু সব ফাঁকি; তিনি তেজস্বী, দাম্ভিক, প্রবল-প্রতাপ। প্রজার উপর ভীষণ অত্যাচারী বলিয়াও তিনি প্রসিদ্ধ।

যে বদ্‌মায়েশ ফজলু ইতিপূর্ব্বে হামিদ হোসেনের বাড়ীতে ইংরেজেরা লুক্কায়িত ছিল বলিয়া, তাহার গৃহে প্রবেশ করত নিঃসহায় বৃটিশ-তনয়দের বধ করে, সে আজি সন্ধ্যার সময় খাঁ বাহাদুর খাঁ সমীপে আনীত হইল। সে ব্যক্তি, কসায়াত উল্লা খাঁ এবং আরও অনেক মুসলমানের গৃহে প্রবেশ করত যথাসর্ব্বস্ব লুট-পাট করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত। দেওয়ান শোভারাম বহু কৌশলে ইহাকে ধৃত করেন। তাহার অপরাধ সপ্রমাণিত হইলে, তাহার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা হইল যে, তাহার দক্ষিণ হস্ত এবং বাম পদ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এ দণ্ড পাইয়াও তাহার পরাক্রমের লাঘব হইল না। সে সাধারণ লোকের বড় প্রিয় ছিল। উক্ত কঠোর শাস্তি পাইয়াও তাহাকে সকলে সমারোহের সহিত তাঞ্জামে করিয়া সহরের মধ্য দিয়া লইয়া গেল। খাঁ বাহাদুরের শাসনকাল পর্য্যন্ত সে বেরিলীতে ছিল। তাহার পর ১৮৫৮ সালে এই যে নারকাটিয়া পুলের নিকট ইংরেজ-সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নবীন দেওয়ান শোভারাম ২০শে জুন দরবারে উপস্থিত হইয়া এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। সরকারের জন্য যে সকল ব্যয় হইবে, তাহা বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার অর্দ্ধেক অংশ শোভারাম পাইবে। ইহা ব্যতীত আর কয়েকটী পদের সৃষ্টি হইল। মাদারআলিখাঁ ও নিয়াজমহম্মদখাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহাদের বেতন মাসিক হাজার টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত হইল। মূলচাঁদ, শোভারামের সহকারী নিযুক্ত হইল, তাহার মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা। শোভারামের পুত্র হরিলাল ১০০০৲ টাকা বেতনে পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইল। মাদার আলির পুত্র আলিহোসেন খাঁ ৫০০৲ টাকা বেতনে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কের পদ পাইল সায়ফুল্লা খাঁ ৫০০৲ টাকা বেতনে জেলখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ পাইল। এইরূপে অনেকগুলি লোককে ভিন্ন ভিন্ন পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল।

যতদিন বিদ্রোহীসেনারা বেরিলীতে ছিল,

তত দিন কেহই খাঁ বাহাদুরের আদেশ প্রতিপালন করিত না। যাহার যাহা ইচ্ছা হইত, সে তাহাই করিত। বখ্‌তখাঁর বেরিলী-সহরে অবস্থান কালে, ৭ই জুন আমাদের পদাতিক-রেজিমেণ্টের, কয়েক জন সিপাহী সৌহারা-মহল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। সেই মহল্লায় মিশ্র বৈজনাথ ব্যাঙ্কার এবং গবর্ণমেণ্টের কোষাধ্যক্ষ কানজেটলাল বাস করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সিপাহীরা টাকা চাহিল। প্রথমে তাঁহারা কিছু দিন লুক্কায়িত ছিলেন, শেষে তাঁহারা ধৃত হইয়া খাঁ বাহাদুরের সমীপে নীত হইলেন। সে সময়ে তিনি মহাসমারোহে দরবার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের উপর এই আদেশ হইল, তাঁহাদের নিকট সরকারী এবং বে-সরকারী যত টাকা আছে, অবিলম্বে তাহা আনিয়া হাজির করিতে হইবে। কিন্তু উহাঁরা টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাদের দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বখ্‌ত খাঁর নিকট প্রেরণ করা হইল। তাঁহাদের দুই জনকে সৈনিক-নিবাসে লইয়া গিয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছিল। দারুণ গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে দুই দিন তাঁহাদের দুই জনকে দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের জীবন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলা হইবে, কিংবা তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে, বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছিল। শেষে তাঁহাদের নিকট হইতে ৫৪০০০৲ টাকা আদায় করিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাও সহজে হয় নাই; রেসালদার মেজর মহম্মদ সফিকে ৪০০০৲ টাকা উৎকোচ দিয়া উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল। বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লী চলিয়া গেলে, প্রজার উপর উৎপীড়নের যে, কিছু হ্রাস হইয়াছিল, তাহা নহে। অত্যাচার সমভাবে বা অধিক ভাবে চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে বখ্‌ত খাঁ অত্যাচার করিত;—এখন নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর শাসনে আরও যেন অত্যাচার বৃদ্ধি হইল। নবাবের মনের ভাব কি তাহা জানি না,—কিন্তু কার্য্যত খুবই উৎপীড়ন আরম্ভ হইল।

২৫শে জুন খাঁ বাহাদুর খাঁ আর একটী মন্ত্রণা-সভা আহূত করিলেন। সেখানে সকলের বিবেচনায় এই স্থির হইল; মকদ্দমা-মামলা নিষ্পত্তি করিবার জন্য একটী সভার প্রয়োজন; তদনুসারে একটী কমিটি গঠিত হইয়া তাহার কয়েকজন সদস্যও নিযুক্ত করা হইল। পরদিন মন্ত্রণা-সভায় রাজস্বের কথা উত্থাপন হয়। ধনাগারে অর্থ নাই, একেবারে শূন্য। বিদ্রোহীরা বেরিলী পরিত্যাগ করিবার সময় যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তৎপ্রদেশ-বাসীর উপর কর ধার্য্য করাই স্থিরীকৃত হয়। কর সংগ্রহ শাস্ত্র সম্মত কি না তাহা দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা আর মুফ্‌তি-দের নিকট "ফাতওয়া" লওয়া হইল। পণ্ডিত এবং মুফ্‌তিরা এই ব্যবস্থা দিলেন যে, সাধারণ কার্য্যের জন্য যদি রাজার কিংবা নবাবের অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি প্রজাদের সম্পত্তি হইতে দশভাগের এক ভাগ অনায়াসে লইতে পারেন। এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া কর আদায়ের জন্য আর একটী সভা সংগঠিত এবং কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য ৫ জন লোক উক্ত সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইল। কানাইয়া লাল নামক এক ব্যক্তি ... সভার সভ্যগণ স্থির করিল যে, মহাজন এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে চারি কিস্তিতে একলক্ষ সত্তর হাজারটাকা আদায় করিতে হইবে। কাশীরাম নামক এক ব্যক্তির উপর প্রথম এই কর-সংগ্রহের ভার অর্পিত হয়। তাহার পর দুই জন মুসলমানকে এই ভার দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহারা কিরূপ কঠোর এবং নৃশংসভাবে এই কার্য্য আরম্ভ করিল, নিম্ন লিখিত ঘটনাই সম্পূর্ণরূপে তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। সেই পাষণ্ডেরা হিন্দুদের নিকট কর আদায়ের সময় গো-হাড় তাহাদের সম্মুখে ধরিত, অন্য কেহ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে উত্তপ্ত লৌহ কটাহের উপর বসাইয়া দিত। ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচারের দ্বারা দুরাচারেরা প্রথম দিনে প্রায় ৮২০০০৲ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। সংগৃহীত অর্থে কামান বারুদ ইত্যাদি ক্রয় করা হইল।

এরূপ অরাজকতা, এরূপ অত্যাচার, আমি আর কখন দেখি নাই। কোন হিন্দু ব্রাহ্মণ যদি কর দিতে বিলম্ব করিত, অমনি এক জন মুসলমান বরকন্দাজ তাহার মুখে থুথু দিত; —থুথুতে কাজ না হইলে, গো-হাড় বা গো-মাংসের বন্দোবস্ত ছিল। এ দিকে মুসলমানের

পক্ষে শূকর-হাড় বা শূকর-মাংসের বরাদ্দ করা হইয়াছিল। পক্ষপাত ছিল না। এইরূপ অত্যাচারের দরুণ, সময়ে সময়ে নবাব-সৈন্যের সহিত অধিবাসিগণের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিত। উভয় পক্ষে দশ বিশটা খুন-জখম হইত।

আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লী যাত্রা করিবার পর বেরিলী সহরে সোণার মোহর বা সোণা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক একটী কুড়ি-বাইশ টাকার মোহর, সিপাহীগণ পঞ্চাশ-ষাট টাকা পর্য্যন্ত দিয়া খরিদ করিয়াছিল। ইহার কারণ এই;—প্রায় প্রত্যেক সিপাহী বা অশ্বারোহী লুটপাট করিয়া পাঁচ সাত শত টাকা বা দুই এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু এত টাকা বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন। তাই তাহারা টাকার পরিবর্ত্তে মোহর বা সোণার গহনাদি ক্রয় করিতে এত ইচ্ছুক হইয়াছিল। কাজেই বেরিলীতে সোণার বাজার গরম হইয়া উঠে।

বিদ্রোহী সৈন্য দিল্লী যাত্রা করিলে, আমি পান্নার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পর দিন শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ দাদার বাসায় আসি। জুন, জুলাই এই দুই মাস কাল আমি বেরিলীতে থাকি। তার পর ঘটনা-চক্রে পড়িয়া নানা স্থানে নীত হই,—নানা অদ্ভুত কর্ম্মের কারণ হই,—পর্ব্বতে, অরণ্যে, তোপ-তরবারির মুখে পতিত হই,—স্বয়ং অস্ত্র-শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া কখন একাকী, কখন বা ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনাও করি।

এ পর্য্যন্ত আমি যাহা লিখিয়াছি,—তাহা "আমার জীবনচরিতের" ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকা বা সূচনাতেই আমার জীবন-চরিতের প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম।

ন্যায়-দর্শন।

১।—দর্শনের মধ্যে ন্যায়-দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কাব্যের মধ্যে গীতগোবিন্দে যেমন বাঙ্গালার গৌরব, সংগীতের মধ্যে কীর্ত্তনে যেমন বাঙ্গালীর বাহাদুরী, ন্যায়-শাস্ত্রে বাঙ্গালার সম্বন্ধ তদপেক্ষা কম নহে।

২।—অনেক দর্শনের অনেক তত্ত্ব বাঙ্গালায় কোন না কোনরূপে প্রকটিত হইয়াছে; কিন্তু ন্যায়-দর্শন সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই হয় নাই;—অনেকের বিশ্বাস হইতে পারে না—যাহা হউক, বুভুৎসা—তত্ত্বজিজ্ঞাসা অনেকেরই আছে।

৩।—কোনরূপে সাধারণ সমাজে ন্যায়তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হওয়ায়, বহুকালব্যাপী ন্যায়ের তর্ক, সাধারণের অবুদ্ধ থাকায়, বৃথা বাগ্বিতণ্ডা, অনর্থক তর্ক, 'নেই-তক্‌রার' 'নেই' ইত্যাদি নামে সাধারণ ভাষায় অভিহিত হইতেছে; বলা বাহুল্য, এই "নেই-তক্‌রার" "ন্যায়-তর্ক" শব্দের এবং 'নেই' কথাটী 'ন্যায়' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। যে নাছোড়-বান্দা হইয়া অনেক ক্ষণ যদৃচ্ছা তর্ক করে, দেশীয় প্রচলিত ভাষায় তাহার নাম 'নেই-আঁচড়া।' এইজন্যই ন্যায়ের তর্ক অসার, এরূপ ধারণাও কাহারও না কাহারও হইয়া থাকে। —এই সব এবং ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায়-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত উচিত। কিন্তু প্রকৃত আলোচনা হওয়া বাঙ্গালা ভাষায় অসম্ভব। তবে, আলোচনায় শাস্ত্রের আভাস পাওয়া যাইতে পারে;—এ টুকুও কি কম লাভ!

আমাদিগের আলোচনীয় ন্যায়-দর্শন প্রবন্ধে কতিপয় পদার্থ, প্রমা, প্রমাণ ও প্রমাণাঙ্গ ইত্যাদি অভিহিত হইবে। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হইল, মুক্তি, ভক্তি, ধর্ম্ম, জ্ঞান; যে যাহাতে চাও।

শাস্ত্র এবং তৎপ্রতিপাদ্যে যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই দিকে মন রাখিয়া ন্যায়-দর্শন পড়িতে আরম্ভ করা উচিত। সূক্ষ্মবুদ্ধি, স্থিরচিত্ত ন্যায়-সংবাদবেত্তা ব্যক্তিই ন্যায়-প্রবন্ধ পাঠে অধিকারী। এই অধিকার প্রদান করিবার সাহায্যার্থ, প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ন্যায়-সংবাদ প্রদান করিতেছি;—

উৎকৃষ্ট নৈয়ায়িকগণের বিশ্বাস এবং মুখেও তাঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ন্যায়-দর্শনের ন্যায় উত্তম দর্শন বা শাস্ত্র জগতে নাই। বাঙ্গালা-দেশের সকল শাস্ত্র-বেত্তাই এ কথা স্বীকার করেন। সমাজেও তদনুসারে ন্যায়-শাস্ত্রের—সুতরাং নৈয়ায়িকগণের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অপর দেশের, অপর দার্শনিকেরা স্ব স্ব মত উৎকৃষ্ট বলিয়া মানিলেও ন্যায়-দর্শনের বুদ্ধি-মার্জ্জনী শক্তি নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন। সকল শাস্ত্রে অবিসংবাদে বুদ্ধি-প্রবেশ, ন্যায়ানু-শীলনের প্রভাবে হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। এই গুণে সকলেই ন্যায়-শাস্ত্রকে সর্ব্ব-শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ বলিতে পারেন। তবে দ্বেষ্টা সবারই আছে, ন্যায়-শাস্ত্রেরও আছে।—ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বন গমন করিলে, ন্যায়-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তয়িতা অস্মৎপূর্ব্বপুরুষ গৌতমের শিষ্য জাবালি, তর্ক দ্বারা এইরূপ বনগমনের অযৌক্তি-কতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে বলেন, তাহাতে শ্রীরাম রোষতপ্ত হইয়াছিলেন ; বাল্মীকিতে এইটুকু দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়-দ্বেষ্টাগণ, এই স্থলে কল্পনা-সাহায্যে বলিয়া থাকেন, অনন্তর শ্রীরাম ন্যায়-শাস্ত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন,—

"আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহার শৃগালযোনি-প্রাপ্তি হইবে। আন্বীক্ষিকী শব্দে ন্যায়শাস্ত্র বা তর্কবিদ্যা। বলা বাহুল্য, এটুকু রামায়ণের মূলে নাই। বিশেষত ভাগবতের দশম স্কন্ধে কথিত হইয়াছে ;—

"যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নাম-নৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্॥"

ভাবার্থ ;—আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা ব্যতীত ভব-সমুদ্র পার কিছুতেই হওয়া যায় না। কর্ম্মময় যাগযজ্ঞাদির ফল নশ্বর, তদ্দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় বটে ; কিন্তু ভবসমুদ্র পার অর্থাৎ মুক্তিলাভ তাহাতেও হয় না। এই শ্লোকটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ কথিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যান্তর করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সকল শ্লোকেরই অন্তবিধ ব্যাখ্যা করা যায়। তবে কু-তর্ক করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু,

"————————বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

ন্যায়ের কথা,—রামায়ণ,মহাভারত, মহাপুরাণ এবং দর্শন সর্ব্বত্রই আছে। 'মীমাংসা ন্যায়-বিস্তরঃ।'—ন্যায় ; বেদাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্যতম।

এহেন, অত্যুত্তম শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা থাকিলে, হে পাঠক! শিরোমণির বেদ-বাক্যটী সর্ব্বদা মনে রাখিবে ;—

"ন্যায়মধীতে সর্ব্বস্তনুতে কুতুকান্নিবন্ধমপ্যত্র।
অস্য তু কিমপিরহস্যংকেচনবিজ্ঞাতুমীশতেসুধিয়ঃ॥"

অনেকেই ন্যায় অধ্যয়ন করে, কৌতূহলক্রমে ন্যায় সম্বন্ধে গ্রন্থাদিও অনেকে লিখে ; কিন্তু এই শাস্ত্রের যে অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় রহস্য, তাহা জানিতে উত্তম সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন অতি অল্প ব্যক্তিই পারেন।

আবশ্যক বোধে ন্যায়-দর্শনের কিঞ্চিৎ পরিচয় এই স্থলেই দিতেছি ;—ন্যায়-দর্শন, প্রাচীন এবং নব্য—এই দুই নামে অভিহিত। মহর্ষি গোতমের প্রণীত সূত্রসমূহ এবং তাহার ভাষ্য, টীকা, টীপ্পনী প্রভৃতি তদনুসারী গ্রন্থনিচয় প্রাচীন ন্যায়-দর্শন।

উদয়নাচার্য্য বা গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত মূল এবং শিরোমণি প্রভৃতির কৃত তদীয় টীকা-টীপ্পনী নব্য ন্যায়-দর্শন। ভাষাপরিচ্ছেদ, বা তর্ক সংগ্রহকেও এখন নব্য ন্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

আমি এইরূপ নব্য প্রাচীন বিভাগ করিলাম,—যুক্তি করিয়া। কিন্তু পণ্ডিত-সমাজে টীকা-টীপ্পনী-সমেত গঙ্গোপাধ্যায়ের কতিপয় মূল গ্রন্থই নব্য ন্যায় শব্দে ব্যবহৃত।

ইংরেজ-ঐতিহাসিক যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, বহুলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ন্যায়মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক মহর্ষি গোতম, অঙ্গিরার পৌত্র, উতথ্যের পুত্র। ইহাঁর নামান্তর—দীর্ঘতমাঃ এবং অক্ষপাদ। পিতৃব্য বৃহস্পতির শাপে ইনি জন্মান্ধ হন, এইজন্য ইহাঁর নাম 'দীর্ঘতমাঃ'। পরে, যোগবলে স্বীয় চরণে চক্ষুঃ উন্মীলিত করেন, এইজন্য ইহাঁর নাম হয় 'অক্ষপাদ'। এই মতের সমর্থন অনেকে করেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি লিখিয়াছেন, "বেদব্যাস, গোতমের শিষ্য। শিষ্য হইয়াও তিনি স্বীয় বেদান্ত-সূত্রে ন্যায়মত-খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন ; জানিতে পারিয়া

বৃদ্ধ মহর্ষি গোতম, এ চক্ষুতে আর ব্যাসের মুখাবলোকন করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পরে কিন্তু প্রিয় শিষ্য বেদব্যাসের অনুনয়-বিনয়ে মুগ্ধ হইয়াও প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ স্বাভাবিক নয়নে তদীয় মুখাবলোকন না করিয়া চরণে চক্ষুঃ সৃজন করিলেন।"

তৎপুত্র মহর্ষি গৌতমের আশ্রম, জনকপুরীর সন্নিকটে; এখনও তাহা 'গৌতম-ক্ষেত্র' নামে পরিচিত আছে। কেহ কেহ এই গৌতমকেই ন্যায়-মত-প্রবর্ত্তয়িতা বলেন। ইঁহার পুত্র মহর্ষি শতানন্দ, জনক রাজার পুরোহিত। তদবধিই মিথিলা প্রদেশে ন্যায়-মত অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। বহু লক্ষ বৎসর পরে, কত শত ন্যায়-শাস্ত্রাভিজ্ঞ মহামুনির, কত শত ন্যায়াধ্যাপকের এবং কতশত ন্যায় গ্রন্থের উদ্ভব-বিলয় হইবার পরে, ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, সেই মিথিলা প্রদেশেই গঙ্গেশোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁহাকে গোতমের অংশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গোতমোক্ত প্রথম সূত্রের প্রমাণ পদার্থ লইয়াই নানা প্রসঙ্গে 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয় রচনা করেন। ইঁহার কিছু পূর্ব্বে, বাঙ্গালাদেশের বরেন্দ্র ভূমিতে (কেহ কেহ বলেন, অন্য দেশে) উদয়নাচার্য্যের জন্ম হয়।

ইনি ন্যায়পদার্থ-সংস্থাপক কতিপয় গ্রন্থ, 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক' নামক বৌদ্ধধিক্কার অর্থাৎ বৌদ্ধমতনিরাসক গ্রন্থ, 'প্রামাণ্যবাদ' এবং 'কুসুমাঞ্জলি' রচনা করেন। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান, কুসুমাঞ্জলির প্রসিদ্ধ টীকাকার।

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পরে, মিথিলা প্রদেশে জয়দেব মিশ্র নামে আর একজন ন্যায়-দর্শনে মহাপণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার উপাধি ছিল 'পক্ষধর'। এক্ষণে ইনি পক্ষধর মিশ্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ। 'পক্ষধর' উপাধি হইবার কারণ-নির্দ্দেশ, নানাজনে নানারূপ করিয়া থাকে ;—

(১) যে কোন কথা একবার মাত্র শ্রবণ করিলেই বিনা আলোচনাতেও এক পক্ষকাল তাঁহার স্মরণ থাকিত, এই জন্য তাঁহার উপাধি হয় 'পক্ষধর'।

(২) যে কোন শাস্ত্রীয় বিচার অতি সুন্দর রূপে এক পক্ষকাল করিতে পারিতেন। এক পক্ষের মধ্যে তাঁহার নিকট কেহ মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিত না, এই জন্য তাঁহার নাম হয় 'পক্ষধর'।

(৩) তিনি পূর্ব্বপক্ষ বা উত্তরপক্ষ যে পক্ষেই থাকুন না, তাহা কখন স্খলিত হয় নাই; তাঁহার পক্ষই, স্থির থাকিত অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে, কেহ উত্তর করিতে পারিত না; উত্তর পক্ষে থাকিলে, সে উত্তরের আর কেহ দোষ দিতে পারিত না। এই জন্য তাঁহার রাজদত্ত উপাধি হয়, 'পক্ষধর'।

নবদ্বীপ নিবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম, এই পক্ষধর মিশ্রের সমসাময়িক এবং সহাধ্যায়ী। বাসুদেব হইতেই এদেশে ন্যায়-শাস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত। ধরিতে গেলে, বাঙ্গালার ন্যায়-দর্শন-জ্ঞান-গৌরবের বাসুদেবই মূল। তৎকালে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে মিথিলায় যাইতে হইত। মৈথিল পণ্ডিতগণ, সকল দেশীয় ছাত্রবৃন্দকে অধ্যয়ন করাইতেন বটে, কিন্তু স্বদেশীয় ভিন্ন আর কাহাকে কোন গ্রন্থ দিতেন না। মৈথিল ছাত্রেরাও কোনরূপ শাস্ত্রীয় চর্চ্চা পরদেশীয়ের সহিত করিত না। গ্রন্থাভাবে এবং উত্তমরূপ চর্চ্চাভাবে বিদেশীয় ছাত্রগণ, বহু কালেও শাস্ত্রে সংস্কারযুক্ত হইত না। সুতরাং এক মিথিলা ভিন্ন উত্তম নৈয়ায়িক কোন স্থলেই মিলিত না।

বাসুদেব আপনার অসীম ক্ষমতা-বলে, এই দোষ দূর করেন। তিনি পাঠ শ্রবণমাত্র তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। তৎপরে নিশীথ ও শেষরাত্রে অন্ধকারে সেইটুকু কোন মতে লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে অসামান্য মেধাবলে, গ্রন্থসংগ্রহ এবং পাঠালোচনা করত, তিনি পরম পণ্ডিত হইয়া মিথিলা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে আসিয়া বহুতর ছাত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি এবং মহাপ্রভু চৈতন্য এই বাসুদেবের ছাত্র। নবদ্বীপের যে অংশে এই মহাপুরুষের বাসস্থান ছিল, তাহা অদ্যাপি 'বাসুদেবপুর' নামে প্রসিদ্ধ আছে। প্রবাদ আছে, বাসুদেব কোন সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া মিথিলা প্রদেশে গমন করেন, কিন্তু সহাধ্যায়ী পক্ষধর মিশ্রের নিকট পরাভূত হন; তিনি বাটীতে আসিয়াও তদবধি মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে রোদন করিতেন এবং বলিতেন, "হায়! পক্ষধর মিশ্রকে কিরূপে পরাজয় করি? আমার

কোন ছাত্রের নিকট যদি পক্ষধরের পরাজয় হয়, তবেই আমার মনঃক্ষোভ মিটে; ভগবন্! দাসের আশা কি পূর্ণ করিবেন না?"

তাঁহার উপযুক্ত ছাত্র শিরোমণি, একদা গুরুর আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া সাগ্রহে তাঁহাকে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি মিথিলা প্রদেশে গিয়া সেই ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিব।"

বাসুদেব, আনন্দ-বিহ্বলান্তঃকরণে শিরোমণির মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিরোমণি, শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া ক্রমে মিথিলা প্রদেশে পক্ষধরমিশ্র-সকাশে উপস্থিত হইলেন। পক্ষধর, তাঁহার অতিথি সৎকার করিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো মহেশানস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥"

ইন্দ্র,—সহস্র লোচন, মহাদেব,—ত্রিলোচন; আর সকলেই দ্বিলোচন; কিন্তু এক-লোচন * আপনি কে?

তদুত্তরে শিরোমণি বলিলেন;—

"কুশদ্বীপ-মহাদ্বীপ-নবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণিমনীষিণঃ॥"

কুশদ্বীপের ন্যায় প্রধানদ্বীপ নবদ্বীপে আমার নিবাস, আমি তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধ শিরোমণি পণ্ডিত।

পরিচয় প্রয়োজনোল্লেখাদি শেষ হইলে, পক্ষধর মিশ্র ও শিরোমণির শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে উত্তর-প্রত্যুত্তর অনেকগুলি শ্লোক মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত আছে, নমুনা স্বরূপ পক্ষধর-কথিত একটী শ্লোক উদ্ধার করিলাম;—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটে।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলোপ্যতে॥"

হে স্তনপানরত কাণা-বালক! যখন স্ফুট ব্যক্ত সংশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন সহসা সামান্য-লক্ষণা লোপ করিবে কি করিয়া?*

বহুদিন বিচারের পর, পক্ষধর মিশ্র বাসুদেব-শিষ্যের নিকট পরাস্ত হইলেন। শিরোমণি, মিথিলা-রাজের সভায় বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং তৎকর্ত্তৃক উত্তম সৎকৃত হইয়া ব্যগ্রান্তে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

শিরোমণি স্বীয় পরিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত মতানুসারে গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত, 'প্রত্যক্ষ-চিন্তামণি' এবং 'অনুমান-চিন্তামণি'র ও 'শব্দ-চিন্তামণির' কোন কোন গ্রন্থের টীকা করেন। কেহ কেহ বলেন, শিরোমণি চিন্তামণি-চতুষ্টয়েরই টীকা করেন। এই টীকার নাম 'দীধিতি'। পূর্ব্বে পক্ষধর-মিশ্র চিন্তামণি-চতুষ্টয়েরই 'আলোক' নামে টীকা করেন; কিন্তু দীধিতির প্রভায় আলোক অবিলম্বেই হতপ্রভ হইল। আলোক অপেক্ষা দীধিতিই প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদ্ভিন্ন শিরোমণি, 'প্রামাণ্যবাদ' এবং 'বৌদ্ধাধিকারে'র টীকা করেন। আরও কতিপয় গ্রন্থ, শিরোমণি রচনা করেন। শিরোমণিরূপ মহাবজ্রই মৈথিলের গর্ব্বপর্ব্বত চূর্ণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পরে অনেক বঙ্গীয় পণ্ডিত, ন্যায়-দর্শনের পুষ্টিসাধন করেন; যে মিথিলা বহুকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্রাভিজ্ঞতায় গৌরবান্বিত ছিল, সেই মিথিলা-প্রদেশ-বাসিগণও বঙ্গীয়-পণ্ডিত-প্রকটিত ন্যায়মত এবং তাঁহাদের ন্যায় গ্রন্থ পাঠ করিয়াই এখন পাণ্ডিত্য লাভ করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশে ন্যায়-শাস্ত্র পাঠ না করিলে, মৈথিলেরও তত গৌরব হয় না। এখন সর্ব্বস্থানের লোকেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাঙ্গালা-দেশকে বিশেষতঃ নবদ্বীপকে ন্যায়শাস্ত্র-চর্চ্চার জন্য বিশেষ গৌরব করিয়া থাকে। যাঁহাদিগের প্রভাবে এবং সামর্থ্যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—তাঁহাদিগের পরিচয় একটু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি;—

১ম—বাসুদেবসর্ব্বভৌম। নিবাস নবদ্বীপ। ইনিও 'চিন্তামণি' গ্রন্থের টীকাকার। গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অনেক গ্রন্থেই ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

---

* শিরোমণির একটী বৈ চক্ষু ছিল না। কথিত আছে, শিরোমণি, সপ্তমী রাত্রিতে আকাশের দিকে চাহিয়া শাস্ত্র-চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় একটা পতঙ্গ তাঁহার একটী চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। সপ্তমী রাত্রিতে পাঠ করা একে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, তদুপরি সে দিনকার ন্যায়-শাস্ত্র চিন্তারও প্রতিফল শিরোমণির হাতে হাতে হইল। সেই জন্য নৈয়ায়িকগণ, সপ্তমীর রাত্রে শাস্ত্র-চর্চ্চা একেবারেই করেন না।

* সামান্য লক্ষণা ও সংশয়াদির কথা যথাসময়ে আলোচিত হইবে।

২য়—রঘুনাথ শিরোমণি। নিবাস নবদ্বীপ। ইনি বাসুদেব সর্ব্বভৌমের ছাত্র। ইহাঁর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শিরোমণি, স্বীয় গ্রন্থে 'কৃত-বিদ্যো গুরুং দ্বেষ্টি' এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন পুরঃসর কোনরূপে নিজগুরু সার্ব্বভৌমের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় অদ্বিতীয় প্রতিভাসম্পন্ন ন্যায়গ্রন্থকার বাঙ্গালা দেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

পক্ষধর মিশ্র বামমার্গে শক্তির উপাসক ছিলেন, শিরোমণি ছিলেন বৈষ্ণব। শিরোমণি, পক্ষধরের নিকট বলিয়াছিলেন ;—

"অনাস্বাদ্য গৌড়ীমনারাধ্য গৌরীং
বিনা তন্ত্র-মন্ত্রৈর্বিনা শব্দচৌর্য্যাৎ।
প্রবুদ্ধ-প্রসিদ্ধ-প্রবন্ধ-প্রবক্তা
বিরিঞ্চি-প্রপঞ্চে মদন্যঃ কবিঃ কঃ॥"

অর্থাৎ সুরাপান, শক্তি-আরাধনা, তন্ত্র-মন্ত্র-প্রয়োগ এবং পরকীয় শব্দ গ্রহণ ব্যতীত ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আমা ভিন্ন সূক্ষ্মার্থসম্পন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা কবি আর কে আছে ?

আর তিনি স্বকৃত চিন্তামণিটীকার শেষে লিখিয়াছেন ;—

"বিদুষাং নিবহৈরিহৈকমত্যা
যদদুষ্টং নিরটঙ্কি যচ্চ দুষ্টম্।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে
রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব॥"

সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলী ঐক্যমত পুরঃসর, যাহা অদুষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কল্পনাধিপতি আমার বিচারমুখে তাহা দুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহা দুষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা অদুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

শিরোমণির এই সমস্ত অসামান্য গর্ব্বোক্তিও বিফল হয় নাই।

৩য়—মথুরানাথ তর্কবাগীশ। নিবাস কোটালিপাড়া জেলা ফরিদপুর। ইনি সম্ভবতঃ রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র। মথুরানাথ, চিন্তামণি-চতুষ্টয়ের এবং কুসুমাঞ্জলি ভিন্ন উদয়নাচার্য্যকৃত সমুদয় গ্রন্থের টীকা করেন।

মথুরানাথ, সমুদয় গ্রন্থেরই টীকা করেন, কিন্তু একজন উপযুক্ত ছাত্রের অনুরোধে মাত্র অবয়বের টীকা করেন নাই। ছাত্র, বিনয় সহকারে অনুরোধ করেন ;—ভট্টাচার্য্য মহাশয়। আপনার গ্রন্থের সহিত আমার একখানি গ্রন্থ যাহাতে প্রচলিত হয়, তাহা আপনাকে করিতে হইবে ; আপনি অবয়বের টীকা করিবেন না আমি ঐ পুস্তকের টীকা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিলে, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ছাত্রবৎসল অধ্যাপক, ছাত্রের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। মথুরানাথের সেই ছাত্রটীর নাম কণাদ। মথুরানাথের টীকাগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে কণাদকৃত অবয়ব-টীকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মথুরানাথ, শিরোমণিকৃত গ্রন্থেরও টীকা করেন।

৪র্থ—ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি শিরোমণি কৃত গ্রন্থের টীকাকার। গ্রন্থ এক্ষণে দুর্লভ

৫ম—জগদীশ তর্কালঙ্কার। নিবাস নবদ্বীপ ইনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র এবং শিরোমণিকৃত গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইহাঁর কৃত 'ব্যাপ্তিবাদ' প্রভৃতির টীকা এবং 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' সুপ্রচরিত।

৬ষ্ঠ—গদাধর ভট্টাচার্য্য। নিবাস নবদ্বীপ। ইনিও একজন নূতন প্রণালীতে শিরোমণিকৃত গ্রন্থসমূহের টীকা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'শক্তি-বাদ,' 'মুক্তিবাদ,' 'নঞবাদ,' 'প্রথমাদি-ব্যুৎপত্তি-বাদ' ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ গদাধর ভট্টাচার্য্যের অসামান্য প্রতিভার ফল।

এতদ্ভিন্ন ভাষা-পরিচ্ছেদ সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থকার, বিশ্বনাথ পঞ্চানন, কুসুমাঞ্জলি টীকাকার হরিদাস তর্কাচার্য্য, গুণবিবৃতি বিবেকাদি প্রণেতা বিদ্যাবাগীশ, প্রত্যক্ষপ্রসারণী প্রভৃতির রচয়িতা কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, প্রভৃতি বহুতর পণ্ডিত, এই শাস্ত্রের সৃষ্টি ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

এই সুবিস্তৃত বাঙ্গালাদেশে এ পর্য্যন্ত বহুসহস্র নৈয়ায়িক উৎপন্ন হইয়া গিয়াছেন, গ্রন্থও অনেকে করিয়াছেন ; বাঙ্গালার ন্যায়-গৌরবের নিদান, ন্যূনাধিকভাবে ইহাঁরা সকলেই। আমি সেই পূর্ব্ববর্ত্তী নৈয়ায়িক-মণ্ডলীকে নমস্কার করিয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচনা নব্য ন্যায়মত অবলম্বন করিয়া। সুতরাং নব্য ন্যায়ের উপযোগী ভাষাপরিচ্ছেদ, মুক্তাবলী প্রভৃতির পথ অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রথমতঃ ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত পদার্থই নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ;—

পদার্থ সাত প্রকার; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ, সমবায়, এবং অভাব।

দ্রব্য,—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা (জীবাত্মা পরমাত্মা) এবং মনঃ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

এরণ্ড বা রেড়ি।

সূচনা।

অনেক দিন ধরিয়া এ দেশে রেড়ির কার্য্য ভালরূপ চলিতে ছিল। রেড়ির চাষ, রেড়ির ব্যবসা, রেড়ির তেল প্রস্তুত, এইরূপ নানা কার্য্যে সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছিল। এই সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিদেশ হইতে এ দেশে অনেক অর্থের সমাগম হইতেছিল। এক্ষণে এই ব্যবসার অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা দেশের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, জাতীয় ধনোৎপত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এ কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই দুঃখিত হইবেন। কিন্তু কেবল দুঃখ করিলে চলিবে না। যথাশক্তি প্রতিবিধান করা আবশ্যক। যে রূপ রোগাক্রমণের কাল হইতেই সুচিকিৎসক, তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান্ হইয়া থাকেন, সেইরূপ জাতীয় ধনের উপর কোনও রূপ আক্রমণ হইলেই তাহার নিবারণের উপায় করা আবশ্যক। রোগ-নির্ণয় ও প্রতিকার করিতে যেরূপ চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষরূপ জ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন; সেইরূপ জাতীয় ধন সম্পর্কে কোনও রূপ প্রতিবিধান করিতে হইলে, কৃষি-নীতি অর্থ-নীতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। সে জন্য আমি এই রেড়ির বিষয় কিছু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিব। কার্য্যে কিছু হউক না হউক, পাঠকদিগকে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারিলেও আমি আমার পরিশ্রম সফল বলিয়া মানিব।

নাম।

অতি প্রাচীন কাল হইতে রেড়ির ব্যবহার এ দেশে প্রচলিত ছিল। সেই-জন্য সংস্কৃত ভাষায় ইহার অনেক নাম। ইহার আকার, ইহার গুণ, ইহার শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্দ্ধন, এই সকল ধরিয়া ইহার নানারূপ নাম হইয়াছে। রাজনির্ঘণ্ট পুস্তকে ইহার এইরূপ পর্য্যায় প্রদত্ত হইয়াছে—ব্যাঘ্র-পুচ্ছ, গন্ধর্ব্ব-হস্ত, উরুবুক, রুবুক, চিত্রক, চঞ্চু, পঞ্চাঙ্গুল, মণ্ড, বর্দ্ধমান, ব্যড়ম্বক, রূবুক, রূবক, বুক, অমণ্ড, আমণ্ড, ব্যড়ন্দন, কান্ত, তরুণ, শুক্ল, বাতারি ও দীর্ঘপত্রক। ভারতীয় আধুনিক ভাষা-সমূহেও রেড়ি নানা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদিগের কিন্তু অধিকাংশই এরণ্ড নামের রূপান্তর মাত্র। যথা—হিন্দী ভাষায় ইহাকে অরণ্ড, রাণ্ড বলে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে ভেরেণ্ডা বলে। সাঁওতালি, এরডম। আসামি, এড়ি। নেপালি, অরেটা, লেপ্চা, রকলোপ। মগধী, রেড, লেড়, অণ্ড। উড়িয়া, গাব, গোণ্ড, মেরিণ্ডা। মারহাটী, এরেণ্ডি। তেলুগু, এরামুডপু। তামিল, অমনক্কম, কোটিমুট্। কর্ণাটি, হরালু। ব্রহ্ম, কেশু। সিংহলি, এণ্ডারু। চীন, পীমা। পুস্ত, অরহণ্ড। পারস্য, বসাঞ্জির, বেদাঞ্জির। আরব্য, খিরওয়া ইত্যাদি। প্রাচীন কালে অন্য দেশেও রেড়ির ব্যবহার লোকে জানিত। প্রাচীন মিসর ভাষায়, যাহা এক্ষণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাকে 'কি কি' বলিত। সেকালে মিসর দেশে মনুষ্যের মৃত দেহ অতি যত্নে রক্ষিত হইত। মৃত দেহের উদরে মসলা ও গন্ধদ্রব্য দিয়া, পাথরের সিন্দুকের ভিতর উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া লোকে গোর দিত। মিসরের বায়ু অতি শুষ্ক বলিয়া সে দেহ পচিয়া যায় নাই। যে সকল মনুষ্য তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল, তাহাদিগের দেহ এখনও শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। লোকে তাহা কুড়াইয়া লইয়া যাদুঘরে রাখিয়াছে। এই শুষ্ক দেহকে 'মমী' বলে। যে বাক্সে মমী থাকে, তাহাকে সারকোভেগস (*Sarcophagus*) বলে। মমীর সঙ্গে এই বাক্সের ভিতর নানারূপ দ্রব্য থাকে। কাপড় থাকে, ভূর্জ্জপত্রের ন্যায় লেখা কাগজ (*Papyri*) থাকে, আবার গমও থাকে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিন হাজার বৎসরের এই গম লইয়া লোকে চাষও করিয়াছে, সে গম হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, ফলও হইয়াছে। এই সিন্দুকের ভিতর লোকে রেড়ির বীজও প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, অতি প্রাচীন কালে মিসর দেশের

লোকে রেড়ির ব্যবহার জানিত। মিসর দেশে ইহার যথাবিধি চাষ হইত, এ কথা হেরোডোটাস, প্লিনি, ডিওডোরাস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন মিসর ভাষায় রেড়ির নাম 'কিকি' ছিল বলিয়া, লাটিন ভাষায়ও এই নাম পরিগৃহীত হইয়াছিল। লাটিন ভাষায় কিন্তু ঐ নাম শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর ইহার নাম হয় রিসিনস্ (*Ricinus*)। রিসিনস্ এক জাতীয় পোকার নাম। রেড়ির ফলের সহিত এই পোকার সাদৃশ্য থাকায়, ইহার এইরূপ নাম হইল। উদ্ভিদ বিদ্যায় অড়র গাছের নাম রিসিনস্-কমিউনিস। (*Ricinus communis*) সেকালে বিলাতে রেড়ির একেবারে ব্যবহার ছিল না। শোভার জন্য বাগানে লোকে এ-খানে ও-খানে দুটী একটী গাছ পুতিত। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে টরনার সাহেব নামক এক ব্যক্তি ইহার তেল বাহির করিয়া তেলের নাম ওলিয়ম কিকিনম ভেল রিসিনিয়ম (*Oleum cicinum vel ricinium*) দিয়াছিলেন। জিরারড্ সাহেব নামক আর একজন পণ্ডিত ইহার নাম ওলিয়ম কিকি-নম বা ওলিয়ম দে চেরুয়া (*Oleum cicinum or Oleum de cherue*) দিয়াছিলেন। সেকালে ইহার পামাক্রিষ্ট জিরাসোল প্রভৃতি আরও অনেক নাম ছিল। যাহা হউক, ইংরেজি ভাষায় রেড়ির ক্যাষ্টর (*castor*) নামই এক্ষণে প্রসিদ্ধ। একশত বৎসর পূর্ব্বে জ্যামেকা দ্বীপে রেড়ির অনেক চাষ হইত। সেখানে পোর্ত্তুগিজ ও স্পেন দেশীয় অধিবাসীরা ইহাকে ক্যাষ্টো (*casto*) বলিয়া ডাকিত। ভাইটেকস অ্যাগনস ক্যাসটস (*Vitex agnus castus*) বলিয়া একটী ওষধীর গাছ আছে। তাহারা মনে করিত, ঐ গাছও যা আর রেড়ির গাছও তা। তাই তাহারা রেড়িকে ক্যাষ্টো বলিত। যখন রেড়ি বিলাতে আমদানি হইতে আরম্ভ হইল, তখন সেখানকার বণি-কেরা ক্যাষ্টো নামকে ক্যাষ্টর করিয়া তুলিলেন।

নিবাস।

কোন্ দেশ রেড়ির আদিম বাসভূমি তাহা লইয়া উদ্ভিদ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে বড়ই গোল কেহ বলেন, ভারতবর্ষই ইহার আদি বাসস্থান। কেহ বলেন, আফ্রিকা। যেমন বন্য পশু ধরিয়া লোকে গো, মহিষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতিকে পোষা পশু করিয়াছে, সেইরূপ বন্য বৃক্ষ তৃণাদির চাষ করিয়া মনুষ্যে উৎকৃষ্ট ফল ফুল আবির্ভূত করি-য়াছে। সকল পশুই এককালে অরণ্যবাসী ছিল, সকল গাছই এককালে বন্য ছিল। এক দল পণ্ডিতেরা বলেন যে, সংস্কৃতভাষায় রেড়ির নানা নাম, সুতরাং রেড়ির আদি বাস ভারতভূমি। সেখান হইতে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিয়া, হিন্দুধর্ম্ম না মানিয়া, রেড়ি, নানা দেশে গমন করিয়াছে স্থলপথে একদিকে আটক পার হইয়া রেড়ি বেলুচিস্থান, পারস্য, তুরস্ক, আরব্য, আফ্রিকা, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছে। অপরদিকে নানা বন, নানা নদ নদী, নানা গিরি অতিক্রম করিয়া রেড়ি,—ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম এবং চীন গিয়াছে। আবার সমুদ্রযাত্রা করিয়া মহাসাগর-মধ্যস্থিত নানা-নাম-ধারী দ্বীপ পুঞ্জে, এমন কি আমেরিকাতেও আজ রেড়ি বিরাজ করিতেছে। এই হইল এক সম্প্রদায় মুনির মত অপর সম্প্রদায় মুনিরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যদি রেড়ির আদি বাস ভারতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় কোনও না কোনও বনে ইহাকে বন্য অবস্থায় দেখিতে পাইতাম। সত্য বটে, হিমালয় প্রদেশের কোনও কোনও স্থানে ইহাকে বেল, কত্‌বেল, কমীলা, সোঁদাল প্রভৃতি বৃক্ষের সহিত একত্রে বনবাসী হইয়া থাকিতে দেখিতে পাই, কিন্তু সে রেড়ি প্রকৃত বন্য নহে। গৃহপালিত বিড়াল প্রভৃতি যেরূপ মনুষ্য-সহবাস পরিত্যাগ করিয়া বন্য হইয়া যায়, এ রেড়িও সেইরূপ উদাসীন ভাবাপন্ন কৃষিজাত রেড়ি মাত্র বলা যাইে বৃক্ষ, যুগ যুগান্তর ধ ষ্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, সুবিধা পাইলে পুনরায় বন্য হইয়া যায়। কলিকাতার নিকট 'নোনা' নামক যে ফলটী আমরা দেখিতে পাই, তাহা বিদেশ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। আদি বাসস্থানে ইহা অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখানে আসিয়াও বহুদিনাবধি মানুষে ইহাকে আদর করিয়াছিল। এখন আর ইহার সে আদর নাই। মনের দুঃখে ইহা ক্রমে বন্য হইয়া পড়িতেছে। এখন ফল যাহা হয়, তাহা আর পূর্ব্বের ন্যায় সুমিষ্ট ও সুস্বাদু নহে। এখন ফল বীজে পরিপূর্ণ, শাঁসে কর্-কোরে দানা, খাইতে

...া শিহরিয়া উঠে। এখন নোনা গাছ বনে দেখিতে পাই বলিয়া, ভারত যে নোনার আদি বাসস্থান এ কথা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সেইরূপ হিমালয়ের দুই এক স্থানে রেড়িকে বন্য অবস্থায় দেখিতে পাই বলিয়া ভারত যে রেড়ির আদি বাসস্থান, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না! এই গেল অপর সম্প্রদায় মুনিদিগের মত। যাহা হউক মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। মুনিদিগের মতিভ্রম হয়, তা বলিয়া আমার মতিভ্রম হইতে পারে না। আমি যদি এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাই, তাহা হইলে জানিবে যে, আমারও মতিভ্রম হইয়াছে। তাই এ তর্কের কোনও রূপ একটা উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। এ বিষয় বিশেষ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আলোচনা... ...বসর আছে, তাঁহারা ডিক্যাণ্ডোল সাহেবের ...রাশি গ্রন্থ পাঠ করিবেন। পুস্তক খানির ইংরেজি নাম *Origin of Cultivated Plants.*

জাতি।

আমাদের একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"এই ভূমণ্ডলে অসংখ্য উদ্ভিদ আছে। অতএব নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বা চিহ্ন এবং সৌসাদৃশ্য ধরিয়া তৎসমুদয় শ্রেণি, জাতি, বর্ণ, ...ণ, প্রকার ইত্যাকারে বিভক্ত না হইলে উদ্ভিদ সকলের বিশেষ বিশেষ স্বভাব কখনই জ্ঞাত হইতে পারা যাইত না, এবং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিবরণ হইতে অপরের গোচর করিতে পারা যাইত না।" ষোল বৎসরের অধিক হইল ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে উদ্ভিদ-বিদ্যা তখনও যে ভাবে ছিল, আজও সেই ভাবে রহিয়াছে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। আমরা দুঃখী মানুষ, পেটের চিন্তায় সর্ব্বদা পাগল। কিন্তু ধনবান্ লোকের ছেলেরা কেন এই সকল বিষয় আলোচনা করেন না? উদ্ভিদ-শাস্ত্র রসায়ন শাস্ত্র, তাড়িত-শাস্ত্র এইরূপ নানাশাস্ত্রের চর্চ্চা ও পরীক্ষা লইয়া থাকিলে যে কত আনন্দ লাভ হয়, তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন। মন উন্নত হয়, চিন্তাশক্তি গভীর হয়, পদে পদে ঈশ্বরের অসীম মহিমা উপলব্ধি করিয়া নীচ প্রকৃতি-গত সাংসারিক সামান্য সুখের উপর অভক্তি জন্মে। বালককাল হইতে এইরূপ শাস্ত্র-চর্চ্চায় ক্রমে মন নিয়োজিত করার রীতি এদেশে প্রচলিত নাই বলিয়া আমরা ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিশেষ কোনও ফল লাভ করি না। রাগ করিবেন না। আমি ধনবান্ ব্যক্তিদিগকে বলি যে, তাঁহারা মহাভারত রামায়ণ প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, সে উত্তম কার্য্য। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ বিজ্ঞান-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, তিনি যে দেশের কত উপকার করিবেন, তাহা বলিতে পারি না।

যাহা হউক, উদ্ভিদ-শাস্ত্রের আলোচনা নাই বলিয়া রেড়ি কোন্ শ্রেণী কোন্ জাতিভুক্ত, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে উদ্ভিদদিগের মধ্যে ইউফরবিয়েসি (*Euphorbiaceæ*) বলিয়া এক প্রকার জাতি আছে, রেড়ি সেই জাতিভুক্ত। এই ইউফরবিয়েসি জাতির ভিতর বড় বড় গাছ হইতে অল্পকায় সামান্য ওষধী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতিতে প্রায় তিন সহস্র উদ্ভিদ আছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে কেবল ৩২৩ টীর পরিচয় পাইয়াছি। সচরাচর এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে দুগ্ধবৎ রস নিঃসরণ হয়, তাহা হইতে রবার প্রস্তুত করিতে পারা যায়। মনসা গাছ তাহার দৃষ্টান্ত। ইহাদের এক ফুলের ভিতরেই পুরুষ প্রকৃতি থাকে না, ভিন্ন ফুলে এই রূপ লক্ষণভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় কোনও কোনও বৃক্ষের দুগ্ধবৎ আটা ভয়ানক বিষময়। অনেকগুলির আটা ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। বিরেচক, বমনকারক মূত্র কারক প্রভৃতি তাহা নানা প্রকার। জয়পাল, আমলকী, মনসা, কমীলা প্রভৃতি বৃক্ষ ইউফরবিয়েসি জাতির অন্তর্গত।

রেড়ি, ইউফরবিয়েসি জাতির রিসিনস পরিবার ভুক্ত। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে ইহার নাম রিসিনস কমিউনিস (*Ricinus communis*) রেড়িগাছ, নানাস্থানে নানারূপ আকার ধারণ করে। কোনও স্থানে ইহা বিশ ত্রিশ হাত উচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অনেক দিন জীবিত থাকে, আবার কোথাও বা ইহা সামান্য ওষধী রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়। সচরাচর ইহা সাত আট হস্তের অধিক উচ্চ হয় না। কাণ্ড

ফাঁপা, চিক্কণ, গোলাকার, লোমশূন্য। উপরিভাগে ঈষৎ রক্তবর্ণ, পত্র বিপর্য্যস্ত (*olternate*), অর্থাৎ ওবার্টর পর আর একটী পত্রের বৃন্ত দীর্ঘ, বক্র, গোলাকার, ঈষৎরক্তবর্ণ। পত্র ঈষৎ নিম্নমুখ, উপত্বণ সংযুক্ত, ছয় হইতে আটইঞ্চ দীর্ঘ, বহুভিন্ন পুষ্প গুচ্ছক, পুংকেশর ও গর্ভকেশর ভিন্ন ফুল থাকে। ফল ত্রিকোষ, কাঁটাযুক্ত। পক্বাবস্থায় ষড়্‌ভাগে বিভক্ত হইয়া বীজ নির্গত হয়। বীজ গোলাকার, চেপ্টা, ⅛ হইতে ½ ইঞ্চ দীর্ঘ, ⅛ হইতে ⅜ ইঞ্চ প্রস্থ, ⅙ ইঞ্চ স্থূল, চিক্কণ, রেখা-বিশিষ্ট, নানা বর্ণে রঞ্জিত।

সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা এরণ্ডকে দুই বর্ণে বিভেদ করিয়াছেন, শ্বেত ও রক্ত। হেকিমি মতে রক্ত বর্ণের রেড়িই অধিক ফলদায়ক বলিয়া পরিগণিত উদ্ভিদ্ শাস্ত্রমতে রেড়ি বড় ও ছোট এই দুই বর্ণে বিভক্ত। বড় দানাকে ফ্রক্টস্ মেজর ও ছোট দানাকে ফ্রক্টস মাইনর বলে (*Fructus major and minor*)। অনেকের মত এই যে ছোট দানা হইতে ভাল তেল প্রস্তুত হয়; কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চয়তা নাই।

মোকাম।

যে হাটে কি গঞ্জে, কি রেলওয়ে ষ্টেশনে, কি সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরে, রেড়ি জমা হইয়া কলিকাতায় বা অন্য স্থানে প্রেরিত হয়, তাহাকে মোকামবলে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রেড়ি ভিন্ন ভাবাপন্ন। কোনও স্থানের রেড়ি বড় কোনও স্থানের রেড়ি ছোট। কোনও স্থানের রেড়ির খোশা পাতলা, কোনও স্থানের রেড়ির খোশা পুরু। কোনও স্থানের রেড়ি হইতে ঘন তেল বাহির হয়, কোন স্থানের রেড়ি হইতে পাতলা তেল বাহির হয়। কোনও স্থানের রেড়ির তেল পরিষ্কার ও শুভ্র বর্ণ। কোনও স্থানের রেড়ির তেল অপরিষ্কার, গাঢ় ও ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ। কোন স্থানের রেড়িতে অধিক তেল বাহির হয়, কোনও স্থানের রেড়ি হইতে কম তেল বাহির হয়। এই সকল গুণ ধরিয়া রেড়ির মূল্য ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্থানবিশেষে রেড়ির এত অধিক ইতর বিশেষ হইয়া পড়ে। এমন কি অতি নিকটস্থ দুই স্থানের রেড়ি সমান হয় না। অনেক স্থলে নদীর এক পারে একরূপ রেড়ি হয় অপর পারে অন্যরূপ। যে মোকাম হইতে রেড়ির আমদানি হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবাপন্ন রেড়ি, সেই মোকামের নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে এক শত প্রকারেরও অধিক রেড়ি আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল রেড়িকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—(১) যে সকল রেড়ি উপরদেশ অর্থাৎ ভাগলপুর, বেহার ও উত্তর পশ্চিম হইতে আমদানি হয়। (২) যাহা সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান হইতে আইসে। উপর দেশের রেড়ির মধ্যে কয়েকটীকে প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। পীরপৈঁতি, কহলগাঁ, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর মকায়া, বামুনগামা, মথুরাপুর, বিহুনি, রেভেলগঞ্জ, সিতারা, রসুলপুর, বখতীয়ারপুর, জুমাই, দারভাঙ্গা, রোশড়া, বীরপুর ইটোয়া, হাত্রাস, ইত্যাদি। সমুদ্রকূলবর্ত্তী রেড়ির মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান,—কোখাপটনম্ মান্দ্রাজ, মসুলিপাটাম, কোকোনাডা, ব্রজবাহা, কটক, বালেশ্বর ও মেদিনীপুর। উপর দেশের রেড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে, পীরপৈঁতিরই রেড়ি ভাল বলিয়া পরিগণিত, তাহার নীচে কহলগাঁ, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর ও মকায়া। সমুদ্রতীরবর্ত্তী রেড়ির মধ্যে কোখাপটনম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কোখাপটনমের তুল্য কোন রেড়িই কলিকাতার বাজারে আমদানি হয় না। কোখাপাটনমের নীচে কোকোনাডা। মোটামুটি কথা এই পাহাড়তলি স্থানে যে রেড়ি হয় তাহা চর জমির রেড়ির অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

চাষ।

বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই রেড়ির চাষ হইতে পারে, কিন্তু পাটনা অঞ্চলেই ইহার অধিক চাষ হয়। কৃষকেরা এখানে তিন প্রকার রেড়ির চাষ করিয়া থাকে, যথা ভাদোই, বাসন্তী বা সালুক, এবং চনাকি। প্রথমটী অন্যান্য খরিফ বা বর্ষাকালের ফসলের সহিত উৎপত্তি হয় বলিয়া তাই ইহার ভাদোই নাম হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম জল পড়িলে কৃষকেরা ইহা ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বুনিয়া দেয়। মাঘ মাসে ইহার ফল পরিপক্ব হয়। ভাদোই রেড়ির দানা বড়, কিন্তু খোশা স্থূল। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাসন্তী রেড়ির বুনন হইয়া থাকে ও চৈত্র মাসে ইহার ফল পরিপক্ব হয়। চনাকি রেড়ির বঙ্গ

অধিক চাষ হয় না। ইহার ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়, আর বীজ দূরে গিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তাই ইহার এরূপ নাম হইয়াছে। চনাকি রেড়ির দানা ভাল, কিন্তু বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক নষ্ট হয়, লোকে তাই ইহার বড় অধিক চাষ করে না। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে চনাকি রেড়ীর গাছ তিন বৎসর পর্য্যন্ত কৃষকেরা রাখিয়া দেয়। কিন্তু প্রথম বৎসরে যেরূপ ফল হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে সেরূপ হয় না। তার পর গাছ মরিয়া যায়। নদীর ধারে দোঁয়াস ভূমিতেই রেড়ি ভালরূপ জন্মে। রেড়ির চাষে কোনরূপ বিশেষ পরিশ্রম নাই। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া, দেড় হাত কি দুই হাত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। কোনও কোনও স্থানে লোকে দুই হাত অন্তর কেবল একটী ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতেই বীজ বপন করিয়া দেয়। বুনিবার সময় বীজের মুখের দিক্ নীচে রাখিতে হয়। এক বিঘা বুনিতে পাঁচসের বীজ যথেষ্ট। আট নয় দিনে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন মাঝে মাঝে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিলে রেড়ির বিশেষ উপকার হয়। তাহা যদি না হয়,তবে নিড়াইয়া দিলেও চলিতে পারে। অর্থাৎ কি না, গোড়া গুলি একটু আলগা থাকে। অার ঘাসে কি অপর কোনও গাছে ইহাকে চাপিয়া না ধরে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মাঝে মাঝে লাঙ্গল দেওয়া ও গোড়া আলগা করিয়া দেওয়ার আরও উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দারা আশে-পাশের ছোট ছোট শিকড় কাটিয়া যায়, তাহাতে গাছ লম্বা হইয়া ঊর্দ্ধমুখে বাড়িতে পারে না, তখন ইহার প্রতিগাঁ'ট হইতে শাখা প্রশাখা বাহির হইতে থাকে। ঊর্দ্ধমুখে দীর্ঘ হইয়া বাড়িয়া উঠিলে, মাথায় কেবল এক গুচ্ছ ফল হইবে অধিক হইবে না। আর চারি দিকে শাখা প্রশাখা হইলে, প্রতি শাখায় দুই তিন থোলো করিয়া ফল হইবে। এক এক গুচ্ছে ২৫ হইতে ৩০টী করিয়া ফল থাকে, প্রতি ফলে তিনটী করিয়া বীজ থাকে। যদি অপর কোন ফসলের সহিত ইহার চাষ করা হয়, তাহা হইলে সেই ফসলের পা'টের সঙ্গে সঙ্গে রেড়িরও পা'ট হইয়া যায়। এক্ষণে বঙ্গদেশের যে যে বিভাগে রেড়ির চাষ করিবার প্রথা প্রচলিত নাই, সেই সেই স্থানে কৃষকেরা যদি ক্ষেত্রের চারি ধারে সা'র দিয়া রেড়ি বুনিয়া দেয়, তাহা হইলে ক্ষেত্র-মধ্যস্থিত অন্য ফসলকে এই গাছ বড় হইয়া রক্ষা করিতে পারে, আর বিনা ব্যয়ে বিনা পরিশ্রমে রেড়ি হইতে কৃষকদিগের কিছু কিছু লাভ হইতে পারে। পোস্তর চেঁড়ি চিরিয়া, রতি রতি আটা জমা করিয়া, দেখ কত সহস্র মন আফিম জন্মিতেছে। দেশ আমাদের এত বড়, যে কোনও বস্তু অল্প অল্প করিয়া জমা করিলেও বৃহৎ কাণ্ড হইয়া পড়ে। সেইরূপ, যেখানে লোকে যা বুনুক না কেন? উচ্চ ভূমিতে, আশে-পাশে অব্যবহার্য্য স্থানে—গুটিকতক রেড়ির গাছ পুতিয়া দিলে, জাতীয় ধনের উন্নতি হইতে পারে। এইরূপ উচ্চতর ভূমিতে, এখানে ওখানে, যদি প্রতি বিঘায় এক আনা মূল্যেরও রেড়ির বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গদেশে যে খানে আজ এক পয়সা হইতেছে না, সেখানে পাঁচ ছয় লক্ষটাকা লাভ হইতে পারে। রেড়ির ফল 'পাকো-পাকো' হইয়া আসিলে কৃষকদিগের ছেলেরা দেখিতে থাকে, কোন্ থোলোটীর বীজ একআধটী ফাটিয়া বাহির হয়। থালোর এক আধটী ফল ফাটিলেই সমস্ত থোলোটী কাটিয়া লইতে হয়। তার পর থোলো গুলি ঘরের ভিতর ছায়াতে রাখিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ফল সংগ্রহ হইলে, যখন গাছগুলি ফল-শূন্য হইয়া পড়ে, তখন সংগৃহীত ফল সকল একত্র করিয়া একটী গর্ত্তের ভিতর রাখিতে হয়। অল্প জলে কিঞ্চিৎ গোবর গুলিয়া সেই জল ইহার উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। তার পর হয় একখণ্ড মাদুর না হয় গুন দিয়া তাহা চাপা দিতে হয়। তিন দিন পরে ফল গুলিকে বাহির করিয়া রৌদ্রে দিয়া অল্প পিটিলেই সমুদয় খোশা বীজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। কিন্তু বুনিবার নিমিত্ত যে বীজ রাখিতে হইবে, তাহা এরূপ করিলে চলিবে না। তাহাতে জল-আছড়া দিয়া শুকাইলে রসে ও উত্তাপে বীজ-নিহিত অঙ্কুরের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। বীজের জন্য যে রেড়ি রাখিতে হইবে, তাহার ফল দুই তিন দিন রৌদ্রে শুকাইয়া একখণ্ড তক্তার উপর রাখিয়া পিটিয়া খোসা পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে। এক বিঘায় একেলা রেড়ির চাষ করিলে চারি হইতে বার মণ রেড়ি উৎপন্ন হইতে পারে।

উৎপত্তি স্থানে রেড়ি সচরাচর দুই কি তিন টাকা মণ এই মূল্যে বিক্রীত হয়। কলিকাতার বাজারে রেড়ি তিন হইতে চারি টাকা মণ হিসাবে বিক্রয় হয়। ক্ষেত্রে রস থাকিলে রেড়ির বার মাসই চাষ হইতে পারে।

ভাগলপুর, মুঙ্গের, মালহদা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে পাঁচ প্রকার রেড়ির চাষ হইয়া থাকে, যথা—মুঠীয়া,ঝোকিয়া, চনাকি,গোহুমা ও ভাদোইয়া। প্রথম চারি প্রকার রেড়ির অগ্রহায়ণ মাসে বুনন হইয়া থাকে, চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহাদের ফল সংগৃহীত হয়। ভাদোইয়া রেড়ির জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনন হয়; অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ইহার ফল সংগৃহীত হয়। রেশমের জন্য যে খানে তুতেঁর চাষ হয়, সেই খানে অনেক স্থানে ক্ষেত্রের আলের উপর, লোকে রেড়ি বুনিয়া দেয়। যশোহর জিলায় দুই প্রকার রেড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, খুদে ও বাঘা। খুদে অবশ্য ছোট, আর বাঘা বড়। খুদে, বনে-বাদাড়ে আপনা-আপনি হয়, কেহ ইহার চাষ করে না, ইহার ফলও কেহ কুড়ায় না। বাঘা, লোকে খেতের ধারে বুনিয়া দেয়। গাছ বড় হইলে ইহা এক প্রকার বেড়ার মত হইয়া ভিতরের ফসলকে গরু বাছুর হইতে রক্ষা করে। পূর্ব্বদেশে রেড়ির বড় চাষ হয় না। কখনও কখনও হরিদ্রার সঙ্গে লোকে ইহা বুনিয়া থাকে। কিশোরগঞ্জ, জমালপুর, নেত্রকোণা প্রভৃতি স্থানে ক্ষেত্রের ধারে ধারে রেড়ি-গাছের সা'র দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি সুসঙের বনে না-কি অনেক রেড়ির গাছ আপনা-আপনি জন্মে। লোকে কিন্তু ইহার ফল আহরণ করে না। বীজ গাছ-তলায় পড়িয়া পচিয়া যায় গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতার বাজারে কখনও কখনও এক প্রকার ক্ষুদ্র রেড়ির আমদানি হয় তাহার কিন্তু বড় আদর নাই।

মেদিনীপুর জিলায় সুবর্ণরেখা ও দোলঙ্গ নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে রেড়ি জন্মে। বালেশ্বর ও কটকেও রেড়ি হইয়া থাকে। উৎকল ভাষায় রেড়িকে গাব বা জড় বলে। প্রধানতঃ রেড়ি এখানে দুই জাতিতে বিভক্ত, বড় ও ছোট বড়কে উড়িয়া ভাষায় বড়-গাব আর ছোটকে চুনি-গাব বলে। বড় গাবের আবার দুইটী ভেদ আছে, যথা পতা-জড় আর কলা-জড়। ছোট জাতিরও দুইটী ভেদ, চুনি ও জহুরি। বড় গাবের গাছ প্রায় আট হাত উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পত্র ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ। ছোট-গাব তিন চারি হস্তের অধিক উচ্চ হয় না,ইহার পত্র হরিদ্রা-বর্ণ। বপন করিবার পূর্ব্বে উৎকলবাসীরা, বীজ তিন চারি দিন জলে ভিজাইয়া রাখে। পূর্ব্বদেশেরও কোনও কোনও স্থানে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকল স্থানেই রেড়ির চাষ হয়। লোকে ইহাকে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে বুনিয়া থাকে। ক্ষেত্রের পার্শ্বে ইহার পংক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। খরিফ ফসলের ক্ষেত্রের মাঝে-মাঝেও রেড়ি গাছ থাকে। কৃষকেরা তাহার কাছে লোবিয়া অর্থাৎ বরবটি ও সিম গাছ পুতিয়া দেয়। এই দুই লতা রেড়ি-গাছের উপর গিয়া উঠে, সুতরাং কৃষকেরা এক কালে দুইটী দ্রব্য লাভ করে। বাহিরে আদর করুক, অন্তরে কিন্তু এখানকার কৃষকেরা রেড়ি-গাছকে ঘৃণা করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রেড়ি-গাছ জাতি কুল বিসর্জ্জন দিয়া, জাহাজে চড়িয়া, বিলাতে গিয়াছে। একথাটী বুঝিয়া-সুঝিয়াই বলিয়াছি। সকলের এ কথাটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যেমন মনুষ্যদিগের জাতিভেদ আছে; গাছদিগেরও সেইরূপ জাতি আছে। গাছদিগের মধ্যে নারিকেল অশ্বত্থ হইতেছেন ব্রাহ্মণ, রেড়ি জাতিতে চামার। সুতরাং রেড়ির ঘরে যখন কোনও কাজ কর্ম্ম হয়, তখন নারিকেল অশ্বত্থ নিমন্ত্রণে আসেন না। তবে গোপনে পুরোহিতগিরি করেন কি না, আর চা'লটে কলাটার পুঁটলি বাঁধেন কি না তাহা বলিতে সাহস করি না। যেহেতু আজ কা'ল সকলেই অর্থডক্স হিন্দু। আমিও অর্থডক্স, মহাশয়ও অর্থডক্স, আর হানিফ সেখও অর্থডক্স। সাহেবেরা বলিয়াছেন যে "সেই যে যারা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলে, ঝুঁকে-ঝুঁকে সেলাম করে, পেট বাজায় আর কাঁদিয়া বলে, 'সাহেব খেতে পাই না', আমরা সেই অর্থডক্স কেলাশকে বড়ই ভালবাসি।" তাই মহাশয়! আমরা আজ সকলেই অর্থডক্স। সে যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় শুনুন। মানুষ-চামারে আর বৃক্ষ-চামারে কিছুমাত্র সদ্ভাব নাই; জ্ঞাতি শত্রু কি না! মানুষ-চামার বৃক্ষ-চামারের ডাটাকে বড়ই ভয় করেন। তাঁহারা

স্থির বিশ্বাস এই যে, রেড়ির ডাটাটার বাড়ি যদি কেহ তাঁহাকে ঠুস্ করিয়া এক ঘা মারে, তাহা হইলে তাঁহার জীবন সংশয় হইবে। পাঠকগণ! যখন আপনারা চামারের দোকানে জুতা কিনিতে যাইবেন, তখন একগাছি রেড়ির ডাঁটা হাতে করিয়া যাইবেন। তাহার ফল দুই প্রকার হইতে পারে। হয়, মা'র খাইয়া আসিবেন, না হয় জুতা শস্তা পাইবেন। পঞ্জাবে বড় অধিক রেড়ির চাষ হয় না। এখানকার দুরন্ত শীতে রেড়ি-গাছ মরিয়া যায়। "পালা" রেড়ির পরম শত্রু। শীতকালে রাত্রিতে শিশির জমিয়া যে সাদা-সাদা ননের মত হয়, তাহাকে 'পালা' বলে। ইংরেজিতে ইহাকে ফ্রষ্ট (*Frost*) বলে, বাঙ্গালায় কি বলে তা জানি না।

বোম্বাই অঞ্চলে, সুরাট, আহ্মদনগর প্রভৃতি স্থানে রেড়ির চাষ হয়। এখানে রেড়ির গাছ দুই প্রকার, বড় ও ছোট। ইক্ষু, পান প্রভৃতি ক্ষেত্রের চারিদিকে লোকে বড় জাতির গাছ পুতিয়া দেয়। প্রচুর পরিমাণে জল ও সার পাইয়া এই জাতীয় রেড়ি উচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, আর অনেক দিন জীবিত থাকে। কিন্তু ইহার তেল ভাল নয়। অপরিষ্কার ও ঘন। জ্বালাইবার কাজ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে লাগে না। ছোট জাতীয় রেড়ি, লোকে অন্যান্য খরিফ ফসলের সহিত বুনিয়া থাকে। ইহার গাছ বাৎসরিক, অর্থাৎ এক বৎসরেই ফল ফলিয়া মরিয়া যায়। ইহার তেল উৎকৃষ্ট, ঔষধেও ব্যবহার হইতে পারে।

বোম্বাইয়ের মত মান্দ্রাজেও রেড়ি বড় ও ছোট জাতিতে বিভক্ত। তাহা ছাড়া স্থানে স্থানে আরও কিছু সামান্য জাতিভেদ আছে। কৃষ্ণা নদীর কূলে পিয়ারা নামক এক জাতীয় রেড়ির গাছ দৃষ্ট হয়। এ গাছের শাখা-প্রশাখা বাহির হয় না। আবার কোইমবাটুর জিলায় মুলিকোটাই নামক এক প্রকার রেড়ি আছে, ইহার ফল ক্ষুদ্র ও তাহার উপর কাঁটা থাকে না। বড় জাতীয় রেড়ির,—গাছও বড়, বীজও বড়। ইহাকে লোকে একেলা পুতিয়া থাকে। ইহার তেল কিন্তু ভাল নহে। প্রদীপে জ্বালাইবার জন্যই কেবল ব্যবহৃত হয়। ছোট জাতীয় রেড়ি অন্যান্য ফসলের সহিত জন্মে। ইহার তেল উৎকৃষ্ট। কলিকাতার বাজারে এই রেড়ি অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। গোদাবরী, কৃষ্ণা, সালেম, বেল্লারি প্রভৃতি জিলায় অনেক পরিমাণে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে। কোকনাডা, মসুলিপাটাম, কোখাপটনম, মান্দ্রাজ এই সমুদয় বন্দর হইতে—রেড়ি, বিদেশে প্রেরিত হয়। কলিকাতা হইতে তেলের রপ্তানি অধিক, মান্দ্রাজ হইতে বীজের রপ্তানি অধিক। মান্দ্রাজ হইতে যে বীজ বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহার অধিকাংশ ফরাশি দেশে—মারসেলি নগরে ও ইতালি দেশে ভেনিসে গিয়া থাকে। পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন ও রুষ দেশে সিবাষ্টপুল ও ওডেসাতেও কতক কতক বীজ প্রেরিত হয়।

চাষের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই যে, এক দিকে পিরপৈঁতি অপর দিকে কোখাপটনম, এই দুই স্থানের বীজ সর্ব্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত। এই দুই বীজ কলিকাতার বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। অতএব যে সকল জমিদারদিগের এলাকাতে রেড়ির চাষ হইয়া থাকে, তাঁহারা যদি পিরপৈঁতি ও কোখাপটনম বীজ আনিয়া কৃষকদিগকে প্রদান করেন, তাহা হইলে বোধ হয় উপকার হইতে পারে। এই দুই বীজ হইতে রেড়ি উৎপন্ন করিলে, ভাল দানা হইবার সম্ভাবনা। ভাল রেড়ি হইলে মূল্যও তাহার অধিক হয়। অধিক মূল্য পাইলে কৃষকেরা আপনারাই আগ্রহের সহিত ভাল বীজ কিনিয়া লইবে। ইহার পর কৃষকদিগকে আর লাভালাভ বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ধনবান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা যে কাজ টুকু হইতে পারে, সেই কাজ টুকুর প্রথম প্রয়োজন। প্রথম তাঁহারা ভাল বীজ আনয়ন করুন, সেই বীজ হয় আপনারা না হয় কৃষকদিগের দ্বারা রোপণ করিয়া,পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করুন যে, তাঁহাদিগের এলাকাতে ভাল বীজ বপন করিলে ভাল ফল হইতে পারে, আর তাহাতে প্রকৃত পক্ষে অধিক লাভও হয়। লাভের কথা প্রমাণ হইলে আর বড় অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। গুড়ের আয়োজন করিয়া কাহাকেও পিপীলিকার নিকট গলায় কাপড় দিয়া নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে হয় না। কলিকাতায় কিন্তু তেল করিবার নিমিত্ত যে পিরপৈঁতি ও কোখাপটনম দানা আনীত হয়, তাহা বুনিবার পক্ষে কতদূর উপযোগী বলিতে পারি না। গোবর-জল-আছড়ায়, রস্মে ও

উত্তাপে। সে বীজের প্রাণ নাশ না হইলেও তাহার কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। সে জন্য ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, নেল্লোর, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি জিলায় বুনিবার নিমিত্ত কৃষকেরা যে বীজ রাখিয়া দেয়, তাহাই লইয়া আসা কর্ত্তব্য। আবার আর একটী কথা আপাততঃ ভাল বীজ হইতে ভাল রেড়ি উৎপন্ন হইলেও যদি এ দেশজাত বীজ বার বার রোপিত হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রমে অবনতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাই দেশ-জাত বীজ বপন না করিয়া বিদেশ-জাত বীজ বপন করাই ভাল। ভাল বীজ হইতে যে ভাল ফল হয়, তাহা বিলাতের লোকে বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। বীজ প্রস্তুত করা, বীজ বিক্রয় করা, সেখানে একটী স্বতন্ত্র ব্যবসা। বীজ ব্যবসায়ীরা কেবল বীজের জন্য যাহা কিছু সামান্য চাষ করেন, ফসলের জন্য চাষ করেন না। যেমন কৃষকের চেষ্টা কিসে অধিক ফসল হইবে; তেমনই বীজ-ব্যবসায়ীদিগের কেবল এই চেষ্টা, এই ভাবনা যে, কিসে আমার বীজটী সর্ব্বোত্তম হইবে, আর কৃষকেরা আসিয়া অধিক মূল্য দিয়া কিনিবে। বীজ-ওয়ালা সটনের নাম কে না শুনিয়াছেন? বীজের ব্যবসা এ দেশে নাই বলিলেও হয়। তবে এই মাত্র দেখিতে পাই যে, কলিকাতার নিকট মূলার চাষ করিতে হইলে, তমলুক হইতে যে বীজ আসে, তাহাই কিনিয়া বপন করিতে হয়। দেশী বীজ বপন করিলে ভাল মূলা হয় না, শীকড়ি হইয়া যায়। আবার মুজফরপুর প্রভৃতি স্থানে সাহেবেরা যে নীলের চাষ করিয়া থাকেন; তাহার জন্য মুজফরপুরের বীজ বপন করেন না। তাঁহারা কাণপুর হইতে বীজ আনয়ন করেন। কাণপুরে নীলের বীজ-ব্যবসাটী বড় মন্দ নয়। গভীর চিন্তাশীল, কৃষিবিদ্যা-মহাসাগরেরা এখন ঘোরতর অনুধাবনা করিয়া এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন যে, ভারতে কৃষি-কার্য্যের একবারেই অণুমাত্র উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে না। সত্য বটে, বিলাতি মতে একবার হল চালনা করিলে, বিলাতি মতে একবার শস্য বপন করিলে, রাতি পোহাইলেই দেখিতে পাই না যে, ক্ষেত্রটী সব সোণার গাছে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সোণার গাছও হয় না, হীরার ডালও হয় না, মণির পাতাও হয় না, মাণিকের ফুলও হয় না, মুক্তার ফলও হয় না। কাজেই মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, কৃষি শাস্ত্র ও রাসায়ন শাস্ত্রের প্রতি এক বারেই বৈরাগ্য জন্মে। রেড়ি-বীজ লইয়া যে পরীক্ষার কথা বলিলাম, ইহা তাঁহাদিগের জন্য নয়। তাঁহারা উর্দ্ধমুখে আকাশ পানে চাহিয়া থাকুন, আকাশ হইতে কখন মণি মাণিক্যের বৃষ্টি হয়। যাঁহারা সামান্য উন্নতিকেও অবহেলা করেন না, যাঁহাদিগের ঐকান্তিক অধ্যবসায় আছে, যাঁহারা পরিশ্রমকে ভয় করেন না, রেড়ি-বীজ-পরীক্ষার বিষয় আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম।

তেল।

অনেক স্থানে প্রদীপে জ্বালাইবার নিমিত্ত লোকে ঘরে রেড়ির তেল বাহির করে। ঘরে, তেল বাহির করিতে হইলে, রেড়িকে প্রথম অল্প খোলায় ভাজিতে হয়। তাহার পর ঐ ভাজা-রেড়িকে ঢেঁকি কি উখলি কি হামামদিস্তায় কুটিয়া লইতে হয়। কুটা-রেড়িকে জলের সহিত মিশাইয়া সিদ্ধ করিলে তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। সেই তেল উঠাইয়া লইয়া আর একবার সিদ্ধ করিলে জল শুকাইয়া যায়, কেবল তেল রহিয়া যায়। কুটা রেড়ি একবার সিদ্ধ করিলে যদি সমস্ত তেল বাহির না হয়, তাহা হইলে আর দু একবারও সিদ্ধ করিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থানে কুটিবার পূর্ব্বে আস্ত রেড়িকে লোকে প্রথম সিদ্ধ করে, তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া কুটিয়া লয়। এরূপ করিলে তেল উত্তমরূপ বাহির হইয়া আইসে। ঘরে কৃষকেরা যে তেল বাহির করে, তাহা অপরিষ্কার। প্রদীপে ভিন্ন আর তাহা অন্য কাজে লাগে না। কলুদিগের ঘানি দ্বারাও রেড়ির তেল বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তেল বাহির হয় না, অনেক রহিয়া যায় ও নষ্ট হয়।

অধিক পরিমাণে রেড়ির তেল বাহির করিতে হইলে কলের আবশ্যক হয়। ঐ কল লৌহ নির্ম্মিত, ইহাকে প্রেস বলে। কলিকাতার আজ কাল এই কল প্রস্তুত হইতেছে। এই কলটী ইস্‌ক্রুপের দ্বারা প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিতে পারা যায়। সেই সঙ্কুচনেই রেড়িতে চাপ পড়ে, তাহাতেই তেল বাহির হয়। কলে সম্মুখে অগ্নি জ্বালাইবার স্থান আছে। তেল বাহির

করিবার সময় এই স্থানে আগুন জ্বালিতে হয়। আগুনের উত্তাপ গিয়া রেড়িতে লাগে, তাহাতে তৈল বিগলিত হইয়া নিঃসরণের সহায়তা করে। প্রধানত রেড়ি তৈল চারি প্রকার। যথা,—কোল্ডড্রন (*Cold drawn*) প্রথম নম্বর (*No 1*), দ্বিতীয় নম্বর (*No 2*), তৃতীয় নম্বর (*No 3*), দ্বিতীয় নম্বরের আবার নানারূপ ভেদ আছে, যথা গুডসেকণ্ড (*Good Second*) অরডিনারি নম্বর টু (*Ordinary No 2*) লণ্ডন কোয়ালিটি (*London Quality*) লিভারপুল কোয়ালিটি (*Liverpool Quality*) গ্লাসগো কোয়ালিটি (*Glasgaw Quality*) ইত্যাদি। রেড়ির তেল কিছুদিন ধরে থাকিলে পরিষ্কার হইয়া আইসে। সুতরাং আজ যে তেলটী এক প্রকার, কাল সেটী অন্য প্রকার হইয়া যায়। এজন্য উপরি উক্ত কয়প্রকার তেলের বিশেষ একটী নির্দ্ধারিত লক্ষণ নাই। পরিষ্কার, শুভ্রবর্ণ, তরল তৈল উৎকৃষ্ট; তদ্বিপরীত নিকৃষ্ট।

কলের দ্বারা রেড়ি হইতে ঐ প্রণালীতে তেল বাহির হইয়া থাকে। ভাল তেল করিতে হইলে প্রথম রেড়িকে কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া লইতে হয়। ইহাতে ছোট দানা, ধূলা প্রভৃতি দ্রব্য পৃথক্ হইয়া যায়। তাহার পর তক্তার উপর একবারে যতগুলি ধরে ততগুলি রেড়ি রাখিয়া কাঠের হাতল দিয়া এক ঘা মারিতে হয়। ইহাতে বীজের উপরে যে খোসা থাকে, তাহা পৃথক্ হইয়া যায়। ইহাকে পুনরায় কুলা দ্বারা ঝাড়িলে খোসা সমুদয় উড়িয়া যায়। আর হাতলের আঘাতে যেসকল বীজ একেবারেই চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাও পৃথক হইয়া পড়ে। গোটা গোটা শাঁসগুলি তখন কুলার উপর ছড়াইয়া হাতে একটী একটী করিয়া বাছিতে হয়। যেসকল শাঁস ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ হরিদ্রা বর্ণের একটী শাঁস যদি পাঁচ সের শুভ্র বর্ণের শাঁসের সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে সমুদয় তেল টুকুকে বিবর্ণ করিয়া ফেলে। যখন বীজগুলি খোশা দ্বারা আবৃত থাকে, তখন কোন্‌টীর ভিতর শুভ্রবর্ণের আর কোন্‌টীতে হরিদ্রা বর্ণের শস্য আছে, তাহা বলিবার যো নাই। বীজ না ভাঙ্গিলে ইহা টের পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, বীজ অধিক পাকিয়া যাইলে ভিতরে এইরূপ হরিদ্রা বর্ণের শস্য হয়। এইরূপ মন্দ শাস বাছিয়া ফেলিয়া ভাল শাসগুলিকে রৌদ্রে দিতে হয়। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে শাঁসকে এক প্রকার চক্রের ভিতর দিয়া অল্প ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। কোল্ডড্রন তেল প্রস্তুত করিতে হইলে শাস ভাঙ্গিতে হয় না। তাহার পর, প্রায় এক ফুট লম্বা চট কাপড়ের ভিতর যতগুলি শাঁস ধরে, তাহা রাখিয়া চট মুড়িয়া দিতে হয়। শাঁস-সম্বলিত এক এক খণ্ড চটকে পুডিং বলে। এই পুডিংগুলি লইয়া তখন কলের ভিতর সাজাইয়া দিতে হয়। একটী করিয়া পুডিং আর একখানি করিয়া ছোট লৌহপাত্র রাখিয়া পুডিংদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া সাজাইয়া দিতে হয়। পুডিং দ্বারা কলটী আগা-গোড়া পূরিয়া যাইলে, তখন কলের স্ক্রুপে পাক দিতে হয়। তাহাতে পুডিংএর উপর চাপ পড়ে, নিষ্পীড়িত হইয়া তাহা হইতে তেল বাহির হইতে থাকে, আর সেই তেল ফোঁটায় ফোঁটায় নীচে পড়িতে থাকে। এই সময় পুডিংদিগের সম্মুখে অগ্নি জ্বালিবার স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে হয়। পুডিং-মধ্যস্থিত রেড়ির শাসে সেই অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া তেল বিগলিত হইয়া ভালরূপে বাহির হইতে থাকে। কোল্ডড্রন তেল করিতে হইলে, অগ্নি ব্যবহার করিতে নাই, কিন্তু কেহ কেহ অল্প উত্তাপ দিয়াও থাকেন। কি কোল্ডড্রন কি ১ নম্বর তেলের জন্য ভাল কাঠের কয়লা বা কোক্ কয়লার আবশ্যক। কয়লা মন্দ হইলে আগুন হইতে ধূম নির্গত হইয়া তেল বিবর্ণ হইয়া পড়ে। কোল্ডড্রন তেল প্রস্তুত করিতে হইলে শাঁস হইতে সমস্ত তেল বাহির করিয়া লইতে নাই। তাহাতে তেল পরিষ্কার ও তরল হয় না। বার আনা রূপ তৈল বাহির হইলেই ছাড়িয়া দিতে হয়। যে খোল রহিয়া যায়, তাহা ৩ নম্বর তেলের রেড়ির সহিত মিশাইয়া পুনরায় অবশিষ্ট তেল বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। ১ নম্বর তেল করিতেও লোকে সম্পূর্ণরূপ তেল বাহির করে না; শাঁসে কিছু তেল বাকি থাকিতে নিষ্পাড়ন কার্য্য স্থগিত করিয়া দেয়। ২ কি ৩ নম্বর তেল করিতে শাঁস হইতে সমুদয় তেলটুকু লোকে বাহির করিয়া লয়। তেল বাহির হইয়া পুডিং সব যেমন আল্গা হইতে থাকে, তেমনি আরও স্ক্রুপ আঁটিয়া দিতে হয়। এই সময় স্ক্রুপ

আঁটিতে অতিশয় বলপ্রয়োগের আবশ্যক। তাই তৈলনিষ্পাড়ক একবার নীচে নামে আবার পুনরায় কলের উপর চড়িয়া বসিয়া স্ক্রুপে তাহার সমুদয় দেহের ভার ও বল প্রয়োগ করিতে থাকে। এই সময় সে শীঘ্রই অতিশয় শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া পড়ে। কলে চাপ দিবার নিমিত্ত কোনও কোনও স্থানে জলীয় বলের (*Hydraulic power*) সহায়তা গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু কলিকাতার প্রায় সকল কলই মানুষের বল দ্বারা পরিচালিত হয়। বাষ্পীয় বলে ইহার কার্য্য ভালরূপ হয় না, কারণ স্ক্রুপের চাপ অতি সাবধানে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয়। তিন মণ রেড়ি ভাঙ্গিলে দুই মণ শাস হয়, ঐ দুই মণ শাঁসে কলটী পরিপূর্ণ হয়, আর একবারের নিষ্পীড়ন কার্য্য ইহাতেই হইয়া থাকে। সকল রেড়িতে সমান তেল বাহির হয় না। কোথাপটনম ও পিরপৈঁতির ১০০ মণ বীজে ৪১ মণ তৈল বাহির হয়। কহলগাঁ, কোকোনাডা, ভাগলপুরের ১০০ মণে ৪০ মণ বাহির হইয়া থাকে। অপরাপর নিকৃষ্ট রেড়ি হইতে শতকরা ৩০ হইতে ৩৮ মণ তেল বাহির হয়। সকল রেড়িতে কোল্ডড্রন কি ১ নম্বর তেল প্রস্তুত হয় না। ইহার জন্য কোথা-পটনম, কোকনাডা ও পিরপৈঁতিই সর্ব্বোত্তম। আজ কাল কলিকাতায় কেহ বড় কোল্ডড্রন তেল প্রস্তুত করেন না। ইতিপূর্ব্বে ক্ষেত্রমোহন বসাকেরা এই কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা ফেল হইয়া গিয়াছেন। যতদূর আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে যাঁহারা রেড়ির তেল প্রস্তুত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাবু অম্বিকাচরণ কুমার, বাবু অবিনাশচন্দ্র কুমার, বাবু বিধুভূষণ কুমার, বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু ও বাবু গোরাচাঁদ দাস প্রসিদ্ধ।

কল হইতে তেল বাহির করা হইল। এই তেল এক্ষণে অতিশয় অপরিষ্কার ও গাঢ়। ইহাকে পরিষ্কার ও তরল করিতে হইবে। জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাকে এক্ষণে অনেকক্ষণ ধরিয়া কলাই-করা-তাঁবার-ডেকচিতে সিদ্ধ করিতে হইবে। সিদ্ধ করিবার সময় বড়ই সাবধানতার আবশ্যক। যেরূপ বৈদ্যদিগের পাক তেল নামাইতে বিশেষরূপ বিচক্ষণতার আবশ্যক করে, ইহাও তদ্রূপ। যদি খরপাক হইয়া যায়, তাহা হইলে রেড়ির তেল বিবর্ণ হইয়া পড়ে। উত্তমবর্ণ থাকে না; অপরিষ্কৃত হইয়া যায়, এবং তাহাতে রক্তিমা আভার উদয় হয়। রক্তিমা-আভাযুক্ত তেলের আদর কম, মূল্যও কম। আবার তেল কাঁচা থাকিলে তাহাতে জল রহিয়া যায়, সুতরাং অল্প দিন পরে সে তেল পচিয়া যায়। সিদ্ধ হইলে তেল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহার জন্য কাঠের ফ্রেম আছে। সেই ফ্রেমের উপরিভাগে এক খানির নীচে আর একখানি, এইরূপ অনেক খণ্ড কাপড় সংলগ্ন থাকে, তলভাগে দুই তিন খণ্ড ফেলানেল থাকে। প্রথম কাপড়ের উপর তেল ঢালিয়া দিলে, ফোঁটায় ফোঁটায় দ্বিতীয় কাপড় খণ্ডে তেল পড়িতে থাকে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়। এইরূপে সমস্ত কাপড় ও ফেলানেল পার হইয়া তেল নীচে গিয়া একটী গামলায় পতিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়-খণ্ডে কাঠের কয়লার গুঁড়া রাখিতে হয়। তাহাতে তেল উত্তমরূপ পরিষ্কার হয়। কোল্ডড্রনের পক্ষে, শুনিয়াছি, পশু-হাড়ের কয়লা (*animal charcoal*) বিশেষ পরিষ্কারক। কেহ কেহ আবার কোল্ডড্রন তেল এ প্রণালীতে না ছাঁকিয়া ব্লটিং কাগজে ছাঁকিয়া লন। ইহার জন্য ছিদ্রময় টিনের অনেকগুলি ফনেলের আবশ্যক করে। ফনেলের ভিতর কয়লার গুঁড়া ও ব্লটিং পেপার রাখিয়া উপরেরটীতে তেল ঢালিয়া দিলে, টোসায় টোসায় সব ফনেল পার হইয়া তেল বিশুদ্ধ হইয়া যায়। ছাঁকিবার পর কোল্ডড্রন তেলের আর কিছুই করিতে হয় না। কোল্ডড্রন ও ১ নম্বর তেলই ছাঁকিতে বিশেষরূপে যত্ন করিতে হয়। অপর সব নিকৃষ্ট নম্বরের তেল কেবল দুই তিন-খানি কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেই চলিতে পারে। ছাঁকা হইয়া যাইলে ১ নম্বর প্রভৃতি তৈল এক্ষণে হৌজ বা ট্যাঙ্কে লইয়া ফেলিতে হয়। এখানে চারি পাঁচ দিন রৌদ্র খাইলে তেল আরও পরিষ্কার হইয়া আসে। তাহার পর টিনের ক্যানেস্তারায় বন্ধ করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। রেড়ি কিনিতে আর রেড়ির বীজ বিক্রয় করিতে, নবাবগঞ্জের শ্রীযুক্ত শ্রীধর মণ্ডল মহাশয়ের জামাই শ্রীবিনোদ-বেহারি শাহা বিশেষ পারদর্শী। বীজ উৎপন্ন করিয়া, কোথায় কি করিয়া বিক্রয় করি, পল্লী-গ্রামস্থ লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ সমস্যা হইয়া উঠিতে পারে। তার জন্য ইঁহার নাম করিলাম। তেলের বিষয়ে শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার দত্ত অভি-

বিচক্ষণ। কোল্ডড্রন ও ১ নম্বর তেলের জন্য বীজ বাছিতে ও পরিষ্কার করিতে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, অপর সকল নম্বরের তেলের জন্য লোকে সেরূপ যত্ন করে না। ৩ নম্বর তেলের জন্য লোকে যৎসামান্যই যত্ন করিয়া থাকে।

কোল্ডড্রন্ তেল ঔষধে ব্যবহার হয়। কিন্তু কলিকাতায় আজ কাল আর কেহ এ তেল বড় প্রস্তুত করে না। সাহেবদের দোকান, ও শ্রীযুক্ত বাবু শিরীষচন্দ্র দত্তের দোকান ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ১ নম্বর তেলও আজকাল ঔষধে ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু ইহা অন্যায়; কারণ এ তেলে অনেকটা রেড়ির রুক্ষ স্বভাব (*acridity*) বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত করিতে পারে। শস্তা ঔষধ ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে। সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কল-কব্জার নানা স্থানে পরস্পরে ঘর্ষণ নিবারণের জন্য ২ নম্বর তেল বিশেষ প্রয়োজন হয়। ৩ নম্বর তেল প্রদীপে জ্বালাইবার নিমিত্তই লোকে ক্রয় করে। ইহা অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রেরিত হয়। শুনিয়াছি সেখানকার লোকে ইহা মেষের গায়ে মাখাইয়া দেয়। তাহা করিলে পশম বর্দ্ধিত হয়।

ব্যবসা।

গত বৎসর (১৮৯০—৯১) সালে, ৫১, ৪৭, ৮৫৫ টাকার রেড়ি বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে বিলাতে যায়, ১১, ২৭, ৪৩০ টাকার, আর ফরাসিদেশে যায়, ২৭, ২৩, ০১৭ টাকার। সেই বৎসর ৩৭, ৩৩, ৬৫১ টাকার তেল ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে, ১১, ৯৮, ৩০৫ টাকার তেল বিলাত বাসীরা ও ১৪, ৯৫, ৭১৮ টাকার তেল অষ্ট্রেলিয়া বাসীরা ক্রয় করে। রেড়ির বীজ বঙ্গদেশ হইতে বড় বিদেশে যায় না, বোম্বাই হইতে অধিক রপ্তানি হয়। গত বৎসর যে ৫১ লক্ষ টাকার বীজ বিদেশে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে বোম্বাই হইতে ৪১ লক্ষ টাকার রেড়ি রপ্তানি হয়, বঙ্গদেশ হইতে কেবল ৯ লক্ষ টাকার রেড়ি বিদেশে গিয়াছিল। ৩৭ লক্ষ টাকার তেলের মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে যায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার।

খোল ও রেশম।

রেড়ির খোল অতি উত্তম সার। ইক্ষু ও আলু প্রভৃতি ফসলে, (যাহার মূল লইয়া আমাদের প্রয়োজন, তাহার জন্য) ইহা বিশেষ উপকারী। অন্যান্য দ্রব্যের খোল ক্ষেতে কিছু বিলম্বে ফলদায়ক হয়। কিন্তু রেড়ির খোল সত্বর ফসলকে বলশালী করিয়া তুলে। আসাম ও বঙ্গদেশের উত্তর বিভাগে এড়ি নামক এক প্রকার রেশমের কীট আছে। ইহারা রেড়ির পাতা খাইয়া জীবিত থাকে। এই রেশম হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার তুল্য দীর্ঘকাল-স্থায়ী কাপড় আর পৃথিবীতে নাই। ছিঁড়িতে জানে না। এক কাপড় পুরুষ-পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করিতে পারা যায়, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। আজকাল এই কাপড় ইংরেজ ও ভদ্র দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এড়ি-রেশমের কথা স্বতন্ত্র। সে কাহিনী এখানে আরম্ভ করিলে পুঁথি বড়ই বাড়িয়া যাইবে।

শেষ।

রেড়ির সারপদার্থ হইল তেল। এই তেল প্রস্তুত ও তেলের ব্যবসা করিয়াই এতদিন অনেকে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। ইহাতে কোনওরূপ ব্যাঘাত হইলে দেশের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। ব্যাঘাত হইবার কথাও কিন্তু শুনিতেছি। শুনিতেছি কি, যে আমেরিকায় মৃত্তিকা-উদ্ভূত কি একপ্রকার সুলভ তেল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলে ও মেষের গায়ে লাগাইবার জন্য তাহা বিশেষ উপযোগী। একতো কেরাসিন তেল বাহির হওয়ায়, পোড়াইবার জন্য কিন্তু রেড়ির তেলের আর এক্ষণে তত আদর নাই। আবার যদি অন্য কোনও তেল বাহির হওয়ায় রেড়ির তেলের আরও আদর কমিয়া যায়, তাহা হইলে অনেকের পক্ষে ইহা সর্ব্বনাশের কথা। আমাদের কিন্তু স্থির বিশ্বাস যে, নূতন আবিষ্কৃত তৈল রেড়ির তেলের মত কার্য্যোপযোগী হইবে না। সেজন্য কলওয়ালাদিগকে আমি এবিষয়ে অনেকটা আশ্বস্ত করিতে পারি। যাহা হউক, তথাপি সাবধান হওয়া উচিত। রেড়ির ব্যবসাতে যে কোনও দোষ আছে, তাহা দূরীকরণ করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। রেড়ির বীজে আজকাল

দেখিতে পাই, অনেক মিশ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বড় দানার সহিত ছোট দানা, ভাল দানার সহিত মন্দ দানা, এইরূপ সচরাচর দেখিতে পাই. এই প্রকার মিশ্রিত দানা হইতে তেল বাহির করিতে ব্যয় অধিক। তেলও নিকৃষ্ট হয়। যদি কলওয়ালারা ধর্ম্মঘট করিয়া, কৃত-সঙ্কল্প হন যে, এরূপ মিশ্রণ কার্য্য করিতে দিব না, তাহা হইলে বীজ ব্যবসায়ীরা কখনও এ কার্য্য করিতে পারে না। তার পর তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা পাইলেও পাইতে পারেন। যদি গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, এইরূপ মিশ্রণ কার্য্য দ্বারা ব্যবসাটী মাটী হইতেছে; আর ইহা আইন দ্বারা নিবারণ করিবার উপায় আছে, যুক্তিসঙ্গত হইলে তাঁহাদিগের কথা গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় শুনিবেন।

তার পর দেখ, ফরাসি, ইতালি প্রভৃতি দেশে এখান হইতে অনেক রেড়ির বীজ প্রেরিত হইয়া থাকে। বীজ না লইয়া যাহাতে তাহারা তেল লয়, এ বিষয়ে আমাদের যত্নবান্ হওয়া উচিত। তেল বাহির করিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহার মূল্য আমরা পাই না, তাহার লাভও পাই না। আবার এ দেশে 'খোল' রহিয়া যাইলে ভূমির সার হইতে পারে। তাহাতে ভূমি তেজঃশালী হইয়া যে অধিক পরিমাণে ফসল হয়, তাহাও আমরা এক্ষণে পাই না সুতরাং বিদেশে বীজ না গিয়া যাহাতে তেল যায়, সে বিষয়ে আমাদিগের যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে, যে ফরাসিরা এখান হইতে প্রতি বৎসর ২৭ লক্ষ টাকার বীজ লইয়া কিরূপে তেল বাহির করে? তাহারা যেরূপ তেল বাহির করে, আমরাও যে সেইরূপ তেল বাহির করিতে পারিব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা যে তাহাদিগের চেয়ে সুলভ মূল্যও করিতে পারিব, তাহাও বোধ হয় নিশ্চিত কথা। দুঃখের কথা বলিব কি, বিদেশীয়েরা আমাদিগের নিকট হইতে বীজ লইয়া, তাহা হইতে তেল বাহির করিয়া, পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরণ করিতেছে, এমন কি, এই ভারতেই পুনরায় পাঠাইতেছে। আবার এ কথা শুনিয়াছি যে, আমাদের ২ নম্বরের তেলে সাহেবেরা ১ নম্বরের টিকিট লাগাইয়া দিলেই, তৎক্ষণাৎ সে তেল ১ নম্বর হইয়া যায়। সাহেব নামের গৌরব এমনই! তাহা না হইলে বিশুদ্ধ ঔষধের প্রয়োজন হইলে সাহেবদিগের দোকানে ছুটি কেন? মনে করিলে, বোধ হয়, এই বিদেশীয় ব্যবসার অধিকাংশ আমরা হস্তগত করিতে পারি। তবে সকল বিষয়ে তত্ত্বসংগ্রহ, জ্ঞানসংগ্রহ, এই হইতেছে প্রথম কথা। কোথায়, কোন্ দেশে, কি হইতেছে, কে কি করিতেছে, এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত প্রয়োজন। যাহাতে আমাদের লাভ হয়, সেইরূপ বিদেশীয় জ্ঞান, চাহিয়া পাই, চুরি করিয়া পাই, ছলে পাই, কৌশলে পাই, আমাদিগকে লইতে হইবে। আমাদিগের যাহা কিছু ছিল, বিদেশীয়েরা সে সমুদয় লইয়াছে। তাই তাহারা আজ বড়। আমাদিগের প্রাচীন বিদ্যার উপর এক্ষণে তাহারা যে অসীম উন্নতি সম্পাদন করিয়াছে, সেই উন্নতি টুকু এক্ষণে আমাদিগকে লইতে হইবে। ফল কথা, নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে এখন সকল বিষয়ে কার্য্য করিতে হইবে। বাঙ্গালীদিগের মত প্রখর বুদ্ধি বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও জাতির নাই। তবে ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে এ বুদ্ধি অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় হইবে। বাঙ্গালী জাতি সমৃদ্ধিশালী গৌরবান্বিত হইবে, যে বাঙ্গালী এ কামনা করিয়া থাকেন, তিনি প্রার্থনা করুন যেন বাঙ্গালীকৃত নানা দ্রব্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

পৃথিবীর সকল স্থানেই যেন বণিক্ বাঙ্গালীর উপনিবেশ হয়। পৃথিবীর সাগর মহাসাগরে যেন বণিক্ বাঙ্গালীর জাহাজ গমনাগমন করে। হাসিবার কথা ইহাতে কিছুই নাই। কেন, আমরা কি মানুষ নই? বুদ্ধিবলে আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কে পরাজয় করিয়াছে? বরং, যেটুকু সুবিধা পাইয়াছি, সেই টুকুতে আমরাই সকলকে পরাজয় করিয়াছি। এইরূপ মহা উদ্দেশ্য আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া, আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে, আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ আমরা যতটুকু পারি ততটুকু আগে যাই। আমাদিগের সন্তান সন্ততিদিগের নিমিত্ত যতটুকু পারি, পথ পরিষ্কার করিয়া রাখি. বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, গৌরব হারাইয়া আমাদের পুত্র পৌত্রগণ যেন কোল সাঁওতালদিগের মত হইয়া না যায়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

৺ব্রজেন্দ্রকুমার।

ঐ যে ধীর-গম্ভীর বদন, প্রতিভাময় নয়ন, শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতেছেন,—উনি কে? উনিই কলিকাতার ৺ব্রজেন্দ্রকুমার। নিজগুণে ব্রজেন্দ্রকুমার কবিরাজ-কুলে শ্রেষ্ঠ পদ পাইয়াছিলেন।

অধুনা এক শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ডাক্তার ছাড়িয়া, অনেকে কবিরাজ ডাকিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফলও পাইতেছেন। আজ কাল ভাল কবিরাজের আয়, ভাল ডাক্তারের আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। হিন্দুর চিকিৎসা হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী হওরাই উচিত,—ইহা কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—সকলেই এক্ষণে বুঝিতেছেন। কলিকাতা কুমারটুলীর সেই প্রবীণ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, ভারত-প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়, কবিরাজ-তারাদল-মধ্যে পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ। তাঁহার বয়স সত্তর হউক, কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় এখনও নবযুবকের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্—শুকতারাবৎ সদা যেন ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। এখনও তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতে সক্ষম, কোন নবীন পুরুষ সেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন কি না সন্দেহ। বদনমণ্ডল হইতে প্রতিভা-লাবণ্য যেন সদাই ফুটিয়া পড়িতেছে। ইহাঁরই সফল-চিকিৎসায় আজ আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের উপর, কবিরাজকুলের উপর, লোকের এত শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিয়াছে। উপযুক্ত পুত্র বহুগুণ-সম্পন্ন এক সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন ক্রমশই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেছেন। আর, কবিরাজ-কুল-ভূষণ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের ত কথাই নাই;—নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় ইনি দেদীপ্যমান। ও-দিকে হাতীবাগানের কবিরাজ কালিদাস সেনগুপ্ত, পাথুরিয়া-ঘাটার দ্বারিকানাথ, সিমলার গোপীনাথ, ফৌজদারী-বালাখানার প্যারীমোহন, যোড়াসাঁকোর কৈলাসচন্দ্র, আহিরীটোলার শ্যাম[illegible]শোর, বেনিয়াটোলার মহানন্দ প্রভৃতি ইঁ[illegible] সকলেই সুপ্রথিতনামা এবং নানা গুণের আস্পদ। আর ভুলিব না,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের নাম। ইনি উদ্যোগী, উৎসাহসী এবং 'স্বনামাপুরুষো ধন্য' কবিরাজ।

৺ব্রজেন্দ্রকুমার প্রথম শ্রেণীর কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার দ্বারাও অনেকের, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উপর প্রীতিভক্তি হইয়াছে। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১২৪৫ সালের ভাদ্র মাসে বর্দ্ধমান জেলায় গঙ্গার তীরবর্ত্তী অম্বিকা-কাল্‌নার অধীন বৈদ্য নওপাড়া গ্রামে ব্রজেন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কলিকাতার প্রথিতনামা কবিরাজ হারাধন সেন। মাতা ধনমণি দেবী।—ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ রমানাথ সেন, ব্রজেন্দ্রকুমারের মাতৃ-ষসের ছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমারের পর হারাধনের আরও দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়। মধ্যম ৺ রাধারমণ সেন বি, এ, মহারাণী শরৎ-সুন্দরী দেবীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শৈশব কাল হইতে দশ জনের সহিত আহার-ব্যবহার করিবার অভিলাষ, ব্রজেন্দ্রকুমারের হৃদয়ে অত্যন্ত বলবান্ ছিল। তিনি ক্রীড়া-পুত্তলিকা-পূজা করিয়া সমবয়স্কদিগকে নিমন্ত্রণ

করিয়া ভোজন করাইতেন। দশ এগার বৎসর বয়ঃক্রমে ব্রজেন্দ্রকুমার স্বগ্রামে ৺ কুড়ারাম পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

অনন্তর ব্রজেন্দ্রকুমার পিতার নিকট চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অধিক অনুরাগ ছিল সুশ্রুতের উপর। সুশ্রুতের শারীর স্থান তন্ন তন্ন রূপে বুঝিবার জন্য তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়া অনেক দূর হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে পিতামহীর মৃত্যু নিবন্ধন ব্যাঘাতে ও পিতার অনিচ্ছা প্রযুক্ত আর ডাক্তারী পড়িতে পারিলেন না।

এইরূপে ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ব্রজেন্দ্রকুমার কলিকাতায় একজন নূতন ধরণের নব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক হইলেন। বাল্যকাল হইতে ব্রজেন্দ্রকুমারকে হারাধন, ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী ও চিকিৎসা বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং তজ্জন্য আর তাঁহাকে অধিক কাল অতিবাহিত করিতে হয় নাই। ১২৭৮ সালে তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহিত তাঁহার (*Calcutta journal of medicine*) নামক মাসিক পত্রে চরক-সংহিতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

"আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী ব্রজেন্দ্রকুমার ১২৭৯ সালের আর্য্যদর্শনে প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা, শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা এবং নিরপেক্ষ বিচার শক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৯১ সালের ভারতীতে, তিনি "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার পরিণাম" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

অনেক সময়ে তিনি গোপনে অনেকের উপকার করিয়াছেন। একবার একটী বন্ধুর অর্থের নিতান্ত কষ্ট হওয়ায়, তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজের শাল বন্ধক দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসরের অধিক হয় নাই। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার কিছুদিন পরে তিনি কয়েকটী বন্ধুর সাহায্যে একটী ঔষধালয় সংস্থাপিত করেন। ঔষধালয়ে যে কর্ম্মচারীটীর উপর টাকা কড়ীর হিসাব থাকিত, তিনি একবার অনেকগুলি টাকা গোলমাল করেন। ব্রজেন্দ্রকুমার তাহা জানিতে পারিয়া ঐ কর্ম্মচারীর বেতন হইতে দুই মাসের বেতন কাটিয়া লইব বলায় তিনি ছোট আদালতে ব্রজেন্দ্রকুমারের নামে নালিশ করেন। নালিশের নামে ব্রজেন্দ্রকুমার স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। কাজেই উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্ম্মচারীটীকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা শেষ করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ঐ কর্ম্মচারীটী, পুনর্ব্বার অর্থাভাব হওয়ায় যখন ব্রজেন্দ্রকুমারের নিকট যোড় হাতে সাহায্য চাহিতে আসিল, তখন তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কর্ম্মচারীর প্রার্থিত টাকা দিলেন।

এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা যেরূপে রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করেন, আমরা, শেষ অবস্থাতেও তাঁহাকে সেইরূপ রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি। কি সংস্কৃত কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা, কোন গ্রন্থই তাঁহার নিকট অনাদৃত হইত না। অধ্যয়নে তাঁহার যেমন আনন্দ ও আগ্রহ ছিল অধ্যাপনাতেও তদ্রূপ। তিনি নিজ গৃহে সাত আটটী ছাত্র রাখিয়া তাঁহাদিগকে তিনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতেন। স্থানের সঙ্কীর্ণতা বশত ইচ্ছা সত্ত্বেও অধিক ছাত্রকে বাসায় রাখিতে পারিতেন না। সেই জন্য আরও ২.৩টী ছাত্র বাসায় আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া যাইত। ছাত্র ব্যতীত কতকগুলি সহায়হীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রতিপালিত হইত। কেহ কেহ আবার অন্যত্র শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার বাসায় থাকিয়া আহারাদি করিয়া যাইত। অনুগ্রহে পালিত বলিয়া তিনি তাহাদিগের প্রতি কখন কোন বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করেন নাই। পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র, ছাত্র অথবা আশ্রিত, যিনিই হউন না কেন, চিরকালই তাঁহার নিকট সমান আদর ও সমান ব্যবহার পাইতেন। একবার একটী নূতন পাচক আসিয়া আহারাদি সম্বন্ধে বাটীর ছেলেদের সহিত অন্যান্য ছাত্রগণের প্রভেদ করিতে আরম্ভ

করেন। এই কথা ক্রমে তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়া দেন "আমার ছেলেরা যাহা কিছু খাইতে পাইবে, অন্যান্য সকলকেও তাহাই দিতে হইবে, —সকলে মিলিয়া এক হাতা করিয়া দুধ্ পায় সেও ভাল, তথাপি ছেলেরা আধ সের করিয়া দুধ্ পাইবে, আর সকলে বসিয়া থাকিবে ইহা আমি দেখিতে পারি না, অতঃপর যেন এরূপ না হয়।" শেষ দশায় তিনি পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর হইতে, আমরা তাঁহাকে অধিকাংশ সময় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করিতে দেখিয়াছি।

রোগ-নির্দ্ধারণ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রকুমারের যেরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল, দেশপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গা-প্রসাদ সেন ব্যতীত অতি অল্প চিকিৎসককেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যে রোগ তিনি বুঝিতে পারিতেন না, স্পষ্টই তাহা স্বীকার করিতেন। তিনি বৈদ্যক চিকিৎসায় পাচন, ঘৃত ও তৈলাদি এবং তান্ত্রিক চিকিৎসায় বটিকাদি অতি সুন্দররূপে বাছিয়া লইয়া, তাহাদের মলা মাটী বাদ দিয়া প্রয়োগ করিতেন। নবজ্বর, উদরাময়, প্রমেহ, বহুমূত্র, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা রোগে, তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফল দেখাইতে পারিতেন। কিছু দিন হইতে তিনি যক্ষ্মারোগের প্রতি বিশেষ মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তিনি সকল বিষয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিতেন বলিয়াই সৌভাগ্য-শালী হইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রী ——সেনগুপ্ত।

ভারতীয় নির্ব্বাচন।

নির্ব্বাচন-সঙ্গীত।

আমি কল্য রাজা হ'ব, কমিশনার পদ পা'ব,
নির্ব্বাচন-প্রথা-অনুসারে।
লক্ষ ভোট মোর পক্ষে, আর কি আছে গো রক্ষে,
বিপক্ষে ভ্রূক্ষেপ কেবা করে॥

লেখাপড়া নাহি জানি, তাতে'ত নাহিক হানি,
ক-অক্ষর মহামাংস মোর।
ঢেরা-কেটে করি সই, তবু নির্ব্বাচিত হই,
হই-হই হৈল শব্দ ঘোর॥

কলিকালে ধন্য ধন্য, আমি হৈনু গণ্য মান্য,
অগ্রগণ্য বরেণ্য প্রধান।
রসনায় বহে ঝড়, বৃক্ষ ভাঙ্গে মড়-মড়,
কড় কড় ডাকে নব-ঘন॥

নাহি ছিল কুলশীল, বাস্তুভিটা না আছিল,
মজুরিতে নাহি ছিল লাজ।
মা মোর কুড়া'ত ঘুঁটে, বাপ্-বেটা ছিল মুটে,
মোর ছিল কুলি ধরা কাজ॥

দারুণ দৈবের বশে, সিংহাসনে বসি শেষে,
মাথায় মুকুট শোভে অতি।
সভার হইব সভ্য, হাতে স্বর্গ-রাজ্য লভ্য,
রাজ-কন্যা সঙ্গে রূপবতী॥

তদ্বিরে টাকার জোরে, হাতে ধরে পায়ে ধরে,
দিবা রাতি ঘুরে ঘুরে দ্বারে।
হয়েছি আমি গো রাজা, সবলোক মোর প্রজা,
হেন মজা কেবা কোথা হেরে॥

হাড়ী-বাড়ী মুচি-বাড়ী, যাই চড়ি জুড়ি-গাড়ী,
ভোট দাও বলি যোড় করে।
হয়েছি আমি গো রাজা, সবলোক মোর প্রজা,
হেন মজা কেবা কোথা হেরে॥

"মঙ্গলে" রেখো গো মনে, পায়ে ধরে কত জনে,
বলেছি কেঁদেছি কত ছাঁদে।
তাই আমি এবে রাজা, সবে কর মোর পূজা,
ধরি করে আকাশের চাঁদে॥

লুচি গোল্লা গাড়ী-গাড়ী, শাম্পেনের ছড়াছড়ি,
বরফের হুড়াহুড়ি তায়।
লেমনেড ঝুড়ি ঝুড়ি, কট্‌লেট বুড়ি-বুড়ি,
'বিষকূট' গণা নাহি যায়॥

তামাক ত্রিতাপ-নাশা, রঙ্গস্থলে আছে ঠাশা,
আমোদিত গন্ধে দশ-দিশি।
ছিবে ছাজা খেয়ে পান, না,না,—তবু খা'ন্ খা'ন,
মুখে গুঁজে কেহ দেন হাসি॥

সবে বল হরি হরি, পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি,
বামন ধরয়ে পূর্ণশশী!
বোবায় বক্তৃতা করে, মূর্খেতে কলম ধরে,
হস্ত-হীন অঙ্ক ধরে অসি!!

সবে বলি কালী কালী, ঘুচাও মনের কালী,
"নির্ব্বাচনী"-গালে কালি দাও।
মায়াবিনী নিশাচরী, তুমি'হে পূতনা-নারী,
সুন্দরীর সাজে না ভুলাও॥

কহ বহ কৃষ্ণ নাম, কথা হৈল সায়।
কলিকালে কপালেতে কত কষ্ট হায়!॥

১—ভোটভিক্ষা—তৈলিক ভবনে।

পাত্র-মিত্র সঙ্গে করে, যায় বাবু কলু-ঘরে,
গিয়ে পড়ে কলুর চরণে।
দোহাই তোমায় লাগে, "ভোট" দাও আগে-ভাগে,
কহি শুন কাতর-বচনে॥
"ভোট" কটা ক'রে দান, রাখিলে আমার মান,
তব মান বাড়িয়ে যাইবে।
গা'ব হে তোমার গুণ, ল'ব চা'ল তেল-নুন,
অন্যথা যে কভু না হইবে॥
যত কাল বেঁচে রব, দোকানে 'উঠনা' লব,
অন্য কোথা যাবনা'কো আর।

হ'ও নাকো মোরে বাম, পূরাও হে মনস্কাম,
কেনা রব চরণে তোমার॥
যে পদ পা'বার তরে, লুঠি তব পদ'পরে,
হবে তব তাহে উপকার।
গো-চোনা গোময় তত, রেখো তুমি পার যত,
পথ জুড়ে ক'রে স্তূপাকার

বাবুর কাতর বাণী, শুনি অতঃপর।
কহে কলু বিনয়েতে, জুড়ি দুটী কর।

দিব বলে রাখিয়াছি, আর এক জনে।
এখন তোমারে বাবু, দিব বা কেমনে?
কথার খেলাপ হ'লে, লোকে মন্দ ক'বে।
এক ব'লে আর কল্লে, ধরম কি রবে?
দান হীন কস্লু ব'লে ধরম কি নাই!
আশায় নিরাশ কল্লে নরকে যে ঠাই॥
দোহাই তোমার বাবু বলি বার বার।
অধমে 'অধর্ম্মে' কথা বলনা'ক আর॥

শুনিয়ে তখন বাবু, কস্লুর সে বাণী।
আঁকাড়ি ধরিল জোরে, চরণ দু-খানি॥
বলে সাধু মহাশয়, বলি হে তোমায়।
"ভোট" না পাইলে প্রাণ, ত্যজিব হেথায়॥
প্রাণ যায় মান যায়, করেছি "গুমরি"।
হয় মোরে "ভোট" দাও, নহে মার ছুরি॥
এতেক বলিয়া বাবু, ধরণী লুটায়।
উষ্ণীষ-মণ্ডিত-মুণ্ড গড়াগড়ি যায়॥
দেখ হে পাঠক প্রিয়! মন প্রাণ-ভরে।
অই সে করুণ-মূর্ত্তি অঙ্কিত অন্তরে॥

২—ভোটভিক্ষা—ধীবর-গৃহে।

শুন হে ধীবর-রাজ, বলি জুড়ি কর।
বারেক মধুর বাক্যে জুড়াও অন্তর॥
জালুক-তিলক তুমি, বহুগুণ ধর।
মীন-রসে মর্ত্ত্য-জনে, তুমি মত্ত কর॥
তোমার অশেষ গুণ, কে বর্ণিতে পারে?
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন, বর্ণিবারে নারে॥
তাই সে তোমার কাছে, এসেছি এখন।
"ভোট" দিয়া কিনে লও, জনম মতন॥

পিতৃ-শ্রাদ্ধে বিশ মণ, মাছের বায়না।
লও মূল্য, গণি এবে, টাকা—পাই—আনা॥

আমি বটে রাজ-পুত্র—তুমি সে ধীবর।
তোমায় আমায় কিন্তু নাহিক অন্তর॥
তুমি আমি আর মুটে সবাই সমান।
সুখের সাম্যের রাজ্যে এই ত বিধান॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ ধরণী যখন।
জীবের সে ভেদাভেদ রহে কি কখন?
আজ আমি তব কাছে যাচি যার তবে।
তুমিও তা পে'তে পার দুই দিন পরে॥

তাই বলি মান রাখ, এবার আমার।
তোমার বারে হে মান রাখিব তোমার॥
উপস্থিত উপকার, এই মাত্র চাই।
তোমার "ভোটটী" ওই দাও মোরে ভাই॥

পোলিং চক্র।

পাঁচজন কমিশনর পদপ্রার্থী। ভোটারের আগমনে,—১ম প্রার্থীর সম্ভাষণ;—

এসো এসো বঁধু এস ব'স সুখাসনে।
তৃষাদূর কর মোর ভোট-সুধাদানে॥

২য় প্রার্থী;—

তুমি আমি এক প্রাণ জানে সর্ব্ব জনে।
হেথা তুমি বসি তবে আছ কি কারণে॥

৩য় প্রার্থী;—

রাখো মান রাখো প্রাণ বুঝি জান্ যায়।
অসময়ে দাদা তুমি ভুলো না আমায়॥

৪র্থ প্রার্থী;—

তুমিই তুলেছ গাছে, মই খুলে লও পাছে।
তাই বলি এস কাছে বস মোর ভাই।
তুমি বিনা প্রভু নাই, যাইবার নাহি ঠাঁই,
কুমুদের চাঁদ হেন তোরে আমি পাই!

৫ম প্রার্থী;—

লও লও সুধা লও, আমি ধন্বন্তরি।
কলসে কলসে ঢালি লও মুখ ভরি!

তখন—

কেহবা ধরিল হাত কেহবা চরণ।
উঠ উঠ এস এস বলে পাঁচজন॥
হানা-হানি টানা-টানি হেঁচ্ড়ানি কত!
ভোট দাতা বলে হায় হইলাম হ'ত।
বাপ্ বাপ্ মরি মরি গেলাম গেলাম।
ছেড়ে দাও কেঁদে বাঁচি পেয়েছি ইনাম॥

উল্লাস।

পাত্র-মিত্র কেবা কোথা, আছ প্রিয়জন।
সবে মিলে বাহু তুলে নাচ হে এখন ॥
ভোটে সর্ব্ব-জয়ী হৈনু, কি আনন্দ ভাই।
দেখ ভাই প্রাণ-ভরে 'ডিগ্‌বাজি' খাই ॥
নাচ তুঙ্গ হিমালয় নাচ হে সাগর।
নাচ 'ঘাট' গিরিবর বিন্ধ্য মনোহর ॥
নাচ স্বর্গ, নাচ মর্ত্ত্য, নাচ হে পাতাল।
যাদুঘরে নেচে উঠ যতেক কঙ্কাল ॥
নেচে উঠ গুপ্ত গুহা গভীরকন্দর।
নেচে উঠ মনুমেণ্ট, নাচ চরাচর ॥
তাধিন্ তাধিন্ নাচে মহান্তের হাতী।
বৃক্ষেতে ফড়িঙ্গ নাচে, আর প্রজাপতি ॥
জলেতে পদ্মিনী নাচে, আকাশেতে রবি।
অন্তরে ব্রহ্মাণ্ড নাচে, নেচে উঠে কবি ॥

ভোট অভাবে—শোক ও সর্ব্বনাশ।

ধরিত্রি গো দ্বিধা হও,—পাত্র মিত্র সনে
প্রবেশি তোমার গর্ভে,—জুড়াই জীবন!
ব'ল মাগো কোন্ প্রাণে, দেখাইব আর
মানব-সমাজে পুন, কলঙ্কী এ মুখ—
অর্দ্ধদগ্ধ-কাষ্ঠসম, ঘন কালিময়—
আপনি দেখিয়ে ঘৃণা, হয় মনে মনে।
মনে ছিল পরাজিব, বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে
বিপক্ষ সে নীচ সবে,—কিন্তু গো জননি!
হইল যে বিপরীত,—হারিনু আপনি
হীন সে মুর্খের কাছে। বিপক্ষের বাক্য
বিঁধে যে কোমল প্রাণে, বিঁধে ছিলা যথা—
বাঁটুল সে বজ্রসম মারুতির বুকে।
ঘুষিবে যে অপবাদ, জগৎ জুড়িয়া
চরাচর জীবচয়,—কেমনে ব'ল গো,
সহিব সে জ্বালা এবে—দাবানলসম
দাউ দাউ জ্বলে যাহা, বুকের ভিতর।
অহো! স্মরিলে সে কথা, বুক ফেটে যায়,—
তেমতি চৌ-চির হয়ে,—যেমতি জননি!
'কুটী' ফাটে রবিতেজে, দারুণ নিদাঘে।
হায় কেন না জননি, খাওয়াইলে লুণ,
সুতিকা-আগারে মোরে, জনমিনু যবে;
অথবা টিপিয়া গলা, মারিল না মোরে?
তা হ'লে এতেক জ্বালা,—এ দারুণ জ্বালা,
সহিতে হ'ত না এবে, অথবা এ কালি
মাখিতে হ'ত না মুখে,—অপমানে মরি!
হায়! হায়! মাটী খেয়ে, এ কি কৈনু কাজ।
রতন ফেলিয়া ফাঁস বাঁধিনু অঞ্চলে,
নরুণের লোভে প'ড়ে নাকটী কাটিনু,
পরিনু বৃশ্চিক-হার মণি-হার ভ্রমে,
সুধা-ভ্রমে চুমুকিনু পচা সে পনির,
খাইনু পায়স ভাবি,—পাইনু রে হায়,
দারুণ দুর্গন্ধময়, বমনের ভাত।

শোক—সর্ব্বনাশ !!

কোথা আছ বিশ্বকর্ম্মা, এস গো এখনি,
এ পাপ ধরণী মাঝে ;—বিদর মস্তক—
ভীম সে হাতুড়ী-ঘায়ে,—পাতি দিই বুক,
বিদরিত যাহা এবে, অপমান-শেলে।
হান সে হাতুড়ি,—দেব ! নির্ঘাত নিশ্চিত ;
হানে যথা ডোম-রাজ,—সারমেয়-মাথে
আয়স-মণ্ডিত-মুণ্ড, লগুড় ভীষণ।
ডুবাও আমারে দেব, শোণিত-সাগরে ;
নির্ব্বাপিত হ'ক্ মোর হৃদয়ের জ্বালা ;
আর মুখ দেখাব না সংসারে কাহারে।
কি কাজ সংসারে আর, পুত্র পরিবারে !
বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান গর্ব্বে কি সুখ(ই) বা আর ?
হারিনু যদ্যপি দেব, "বাছাই"-সমরে,
নির্ব্বাচন"-কুরুক্ষেত্রে,—কপটীর কাছে।
নিস্ফল হইল যদি সব সুখ-সাধ,
মিটিল না আশা যদি,—গৌরব-গুমান
হয়ে গেলা গুঁড়া-নুড়া ; কি কাজ জীবনে ;
স্বপনের স্মৃতিসম, জাগয়ে এখনো,
এ পোড়া তাপিত প্রাণে, সে সুখের কথা।

কি বলি প্রবোধি মনে,—প্রবোধি কেমনে,
প্রফুল্ল-পঙ্কজাননা,—প্রাণপ্রেয়সীরে।
আর না সহিতে পারি,—বিষম যন্ত্রণা,—
অসহ্য সে অপমান, বিপক্ষ মাঝারে !
সহ্য হয় শক্তিশেল ; মরে যদি এবে
এক মাত্র পুত্র মোর, সহিতে তা পারি ;
বিপক্ষের টিটকারী সহা নাহি যায়।
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে, ভীম অসি লয়ে—
খণ্ড খণ্ড করি মুণ্ড ; অথবা এখনি
শাণিত কুঠার ল'য়ে, হানি নিজ মাথে ;
হানে যথা কাঠুরিয়া, শাল-বৃক্ষ শিরে।
কিংবা লয়ে এই দণ্ডে "হালালের" ছুরি
কাটি হে আপন কণ্ঠ,—কাটে গো যেমতি
কোমল কুক্কুট-কণ্ঠ,—"পীরুর" হোটেলে।
অথবা বন্দুকে ঠাশি টোটা সহ গুলি,
বসায়ে টু টির মাঝে, দিব জোরে টিপি,
যাহে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি, চলি যাবে গুলি।

২য় ভাগ। } বৈশাখ। ১২৯৯। { ৫ম সংখ্যা।

কবি-কাহিনী।

বহু শতাব্দী অতীত হইল, এই ভারতে ব্রাহ্মণকুলে এক ভাগ্যবান্ কবি জন্মিয়াছিলেন। এখন আমরা তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, কিন্তু জীবদ্দশায় কেহ তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলে নাই। তাঁহার ভাগ্যবত্তার নিদর্শনও কিছু বাহিরে দেখিতে পাওয়া যাইত না। ব্রাহ্মণ-জাতির সম্পত্তি কখনই ছিল না, তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির সম্ভাবনা কি? তবে পৈতৃক ব্রহ্মত্র-ভূমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তাহাতে কষ্ট-স্বষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত, এই মাত্র। ইহাতে আর লোকে কি বলিয়া তাঁহাকে সৌভাগ্যশালী বলিবে? কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে, সৌভাগ্যসঞ্চয়ে তাঁহার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কিঞ্চিৎ অবহেলা বা আলস্য ছিল। নতুবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-শ্রেণীতে যাঁহারা বিশেষ বিদ্বান্, তাঁহারা চেষ্টা করিলে তখন যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইতে না পারিতেন, এমন নহে। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ,—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট জীবিকা। সুপণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা কে না যাজনক্রিয়া করাইতে চাহে? সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতে কে না আগ্রহশীল হয়? তপোবিদ্যা-শীলসম্পন্ন পাত্রে কে না দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়? কিন্তু সকল কার্য্যেই কিছু উদ্‌যোগ চাই, কিছু আত্মখ্যাপন চাই। তাহা তাঁহার ছিল না; তাহাতে তাঁহার ইচ্ছাই ছিল না। অধিকন্তু তিনি কিছু স্বাধীন-চিত্ত লোক ছিলেন। নিজের যাহা ভাল বোধ হইত, তাহাই তিনি ভাল বলিয়া বুঝিতেন। অন্যে অন্যরূপ বুঝাইলেও তিনি তাহা সেরূপ বুঝিতেন না। বিনা আবাহনে কোথাও তাঁহার গতায়াত ছিল না। আবাহন স্থলেও অসৎপ্রতিগ্রহ ছিল না। সুতরাং এরূপ লোকের সাংসারিক উন্নতি হইবে কিরূপে? এ সংসারে উদ্যম ও আনুগত্যই উন্নতির মূল। এ নিয়ম এখনও যেমন অব্যভিচারী দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বেও প্রায় সেইরূপই ছিল।

এই কবির নাম যেরূপই হউক, তাহা অপেক্ষা ইহাঁর প্রতিবেশী এক ব্যক্তির নাম কবিত্বগুণে সাধারণের নিকটে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। আজি কালি যদিও তাঁহার নাম কেহ জানে না, কিন্তু তৎকালে তাঁহার নামে গগন-মেদিনী ফাটিয়া যাইত। তিনি লোক-সমীপে পূজনীয় ও স্বদেশীয়-রাজ-সমীপে আদরণীয় হইয়াছিলেন। রাজা সযত্নে তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক হস্তিযোগে রাজধানীতে লইয়া গিয়া "প্রচণ্ডকবিমার্ত্তণ্ড" এই উপাধি দিয়াছিলেন। মার্ত্তণ্ড মহাশয়ের কবিতায় রসাপেক্ষা শব্দাড়ম্বরই প্রবল থাকিত ও শব্দগুলি ওজোগুণব্যঞ্জক হইত বলিয়া ঐ উপাধিটী তাঁহাতে বিশেষ উপযুক্তই হইয়াছিল। ঐ উপাধির নিদারুণ প্রতাপে তাঁহার অধ্যাপক-দত্ত উপাধিটী একবারে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। তবে এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি নিজেও ঐ উপাধির লোপ বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলেন। এমন কি, কেহ তাঁহাকে পূর্ব্ব উপাধিতে আহ্বান করিলে

তিনি বলিতেন, "ওহে, তোমরা ও উপাধিটা ভুলিয়াই যাও। ওরূপ নরম উপাধির কাল আর নাই। বিশেষ, রাজ-দত্ত উপাধির তেজখানা একবার দেখ দেখি! অধিকন্তু উহা ব্যবহার না করিলে রাজার অনাদর করা হইতে পারে। ইত্যাদি।" কিন্তু সাধারণ লোকের জিহ্বার সহিত তাঁহার ঐ রাজ-দত্ত উপাধির বড় একটা বনি-বনাও হইত না। নিম্নশ্রেণীর অনেক লোকে তাঁহাকে "চণ্ডমুণ্ড মশায়" বলিয়াও ডাকিত। তাহাতেও তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন না। উপাধির মোহিনী-শক্তি চিরকালই আছে। তবে কালভেদে তাহার কিছু ন্যূনাধিক্য ঘটিয়াছে, এই মাত্র।

মার্ত্তণ্ড মহাশয়ের লোক-প্রিয়তার,—এমন কি, রাজ-প্রিয়তারও যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি বেশ স্তাবক লোক ছিলেন; লোকের গতিক বুঝিয়া কথা কহিতেন, তাহাতে নিজের মতামতের অপেক্ষা রাখিতেন না। অধিকন্তু উপস্থিত-কবি ছিলেন, অর্থাৎ সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেন। এই শেষোক্ত গুণেই তিনি রাজ-সমীপে উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সর্ব্বসাধারণের নিকটও অদ্বিতীয় যশস্বী হইয়াছিলেন। অর্থও এরূপ যশের অনুগামী হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার অর্থভাগ্যও বিলক্ষণ প্রসন্ন হইয়াছিল। রাজবাটীতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তিই ছিল ও যখন তখন তিনি তথায় আহূত হইয়া গমন করিতেন।

আমাদিগের প্রথমোক্ত কবিটীর কি উপাধি ছিল, বলা যায় না। সেটা বোধ হয়, তাদৃশ লোক-প্রসিদ্ধ হয় নাই। নামটা সাধারণে না হউক, পণ্ডিত-সমাজে কেহ কেহ জানিত; এখন বিদ্বৎসমাজে, বিশেষতঃ সহৃদয় সমাজে সকলেই জানে। উপাধিটা একবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উপাধির প্রায়ই ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। পদার্থটা অতি অসার কি না, কতকাল টিকিয়া থাকিবে বল? কোন কোনটা যদিও টিকে, তাহার অর্থগৌরব কিছুই থাকে না; সে নামরূপে পরিণত হয়। যেমন কবিকর্ণপূর, কবিকঙ্কণ, রসসাগর প্রভৃতি।

এই দরিদ্র কবির নাম ছিল 'অমরু'। গ্রন্থও ঐ নামানুসারেই বিখ্যাত, 'অমরু-শতক'। হায়! মাতা পিতা এত বিনয় করিয়া এত অকিঞ্চনতার সহিত অ-মরু নাম রাখিয়াছিলেন কেন? ক্ষীর-সাগর বা সুধাসমুদ্র নাম রাখিলেই পারিতেন; জাহ্নবীজীবন বা যমুনাপুলিন নাম রাখিলেই পারিতেন; বসন্তবিহগ বা বিনোদবাঁশরী নাম রাখিলেই পারিতেন। তাহা না করিয়া তাঁহারা প্রাণ-প্রিয় পুত্রের 'অমরু' এই নাম রাখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা কিন্তু তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলে নিশ্চয়ই উহার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতাম। অথবা তাঁহারা বুঝিয়া সুঝিয়াই ঐ নাম রাখিয়াছিলেন। পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা; তাঁহারা না বুঝিবেন ত কে বুঝিবে? তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডের সমীপে আমার পুত্রের সরস হৃদয় মরুবৎই হইয়া থাকিবে। তথাপি সে কখনই মরু হইবে না, মরুর ন্যায় বন্ধ্য হইবে না। তাঁহারা অ-মরু নাম রাখিয়া ইঙ্গিতে ঐ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর যদি অমর এই অর্থে তাঁহারা অমরু পদের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই। কারণ, এ কবির অমরত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও এখন মতভেদ নাই।

আমাদিগের এই দরিদ্র কবিও যে লোক-বিখ্যাত ছিলেন না, এমন নহে। কতিপয় লোক,—যেমন একটী সহৃদয় বন্ধু, পতিপ্রাণা ভার্য্যা ও কতকগুলি ছাত্র,—ইহাদের নিকট তাঁহার গুণগ্রাম বিলক্ষণ পরিচিত ও আদৃত হইয়াছিল। এরূপ হইবারও অসম্ভাবনা ছিল না। প্রথমতঃ, বন্ধু সতত-সহচর, অকপট-প্রণয়শীল, হৃদয়বেদনার অংশভাগী ও সহৃদয়। তাদৃশ বন্ধু কি জন্যই বা নিজ বন্ধুর অসামান্য উদার চরিতের ও উদার হৃদয়ের একান্ত পক্ষপাতী না হইবেন? দ্বিতীয়তঃ, পত্নী। সে কালের পত্নী ত আপনারই প্রতিরূপ, "কায়ার ছায়া," "অর্দ্ধো বা আত্মন এষ যৎ পত্নী" এই শ্রুতিবাক্যের প্রকৃতই উদাহরণ-ভূমি ছিল। সে কালের পতিরও যেমন প্রার্থনা "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্"—পত্নীও সেই প্রার্থনার অনুরূপ পতির মনোবৃত্ত্যনুসারিণী হইতেন। যেমন শাস্ত্রবাক্য "পতির্ব্বন্ধুঃ পতির্ভর্ত্তা পতির্দৈবতমেব চ",—পত্নীও সেইরূপ ছিলেন। যেমন শাস্ত্রের আদর্শ সীতা-সাবিত্রী, অনসূয়া-অরুন্ধতী,—পত্নীও সেই আদর্শেই গঠিত হইতেন। তাঁহারা ত একালের বিলাসিনীদিগের ন্যায় নিজ স্বাভাবিক স্বত্ব ও স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিয়া তাহা অক্ষতভাবে রক্ষা

করিতে জানিতেন না! সুতরাং তাদৃশ পতি-দেবতা ভার্য্যা, ঈদৃশ প্রেমপরায়ণ স্বামীর গুণে কেননা অন্ধ হইবেন? আর ছাত্রমণ্ডলী।—যাহারা চলিবার সময়ও গুরুর ছায়ার দিকেই লক্ষ্য করে, গুরু বাক্যকেই শাস্ত্রবাক্য বোধে শ্রদ্ধা করে, বংশক্রমে গুরুবংশ ত্যাগ না করিয়া সম্প্রদায় রক্ষা করে, সে সকল ছাত্রের কথা আর বলিতে হইবে কেন? ঈদৃশ অধ্যাপক ত স্বভাবতই উক্তবিধ ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়-মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেবতা হইবেন। কিন্তু এই সকল লোকের নিকট পরিচিত, বিখ্যাত ও পূজিত থাকাও যাহা, আপনার মনে আপনাকে বড় বলিয়া জ্ঞান থাকাও তাহা। একই কথা। উহা কোন কার্য্যকর নহে, কোনরূপ ফলোপ-ধায়ক নহে।

এই কবির খ্যাতি-প্রতিপত্তি আর আরণ্য পুষ্পের সৌরভসম্পত্তি, উভয় একই অবস্থায় ছিল। তৎকালীন জনসমাজে তদীয় যথার্থ খ্যাতির প্রচার হয় নাই। জনসমাজে প্রচারেই বস্তুর আদর। আবার যে সমাজ যেমন গুণ-গ্রাহী, তদনুরূপই তথায় বস্তুর সমাদর হইয়া থাকে। অগাধ সমুদ্র-গর্ভে মুক্তাফলের শোভা-সম্পত্তি বিফল মাত্র। সৈকত-তটে তাহার শোভা কিয়দংশে প্রকাশ পায়। নৃপতি-কণ্ঠেই তাহার বিহিত বহুমান হইয়া থাকে। কিন্তু মৌক্তিক মাত্রেরই অদৃষ্ট ত সেরূপ প্রসন্ন হয় না!

এই কবির যে বন্ধুর কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লি-খিত হইল, তিনি ইহাঁর প্রকৃত গুণগৌরব প্রচারের নিমিত্ত একবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, রাজসমীপে ইহাঁকে পরিচিত করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। তদনুসারে সেইরূপ চেষ্টা হইতে লাগিল। রাজধানীতে গমনের নিমিত্ত একটা শুভ যাত্রিক দিন নির্দ্ধারিত হইল। প্রভাতে চারি দণ্ডের মধ্যেই উক্ত যাত্রিক সময় ছিল। কিন্তু ঐ সময় মধ্যে কবির যাত্রা করা ঘটিল না। তখন তিনি একটী ভাবে এমনই বিভোর ছিলেন ও তৎপরেই সেইটী কবিতাকারে প্রকাশার্থ এমনই ব্যস্ত হইলেন যে, তন্মধ্যে তাঁহার যাত্রা করার অবকাশই ঘটিয়া উঠিল না। তিনি সে শুভক্ষণ কিছুতেই যাত্রাকার্য্যে ব্যয় করিতে পারিলেন না। বিশেষ অনুরোধপূর্ব্বক বন্ধুকে বসাইয়া কবিতাটী রচনা করিলেন ও রচনান্তে বন্ধুকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন! সেটী এই ;—

"প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈ-
রস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং
চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে
সর্ব্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতি জীবিত! প্রিয়সুহৃৎ-
সার্থঃ কিমু ত্যজ্যতে॥"

ভাবানুবাদ,—

প্রবাসে যাইতে পতি, করিলেন যদি মতি,
সবে সেই সাথে যেতে চায়,
হাদে এ বলয়ভার, খ'সে পড়ে বার বার,
আঁখি-ধার পথেরে ভিজায়।
ধৈরয মুহূর্ত্ত তরে, যদি রহে এ অন্তরে,
কি বলিব তাও না দাঁড়ায় ;
চিত সে ত আগে যেতে, ছুটেছে উল্লাসে মেতে,
বারেক না সুধা'ল আমায়।
সবে যদি এক মতে, চলিল সে একপথে,
তুমি বা জীবন কেন রহ?
যেতেই ত এক দিন,—হবে তবে প্রেমাধীন,
সঙ্গিগণে কেনগো ত্যজহ?

কবিতা শুনিয়া শ্রোতা হাসিয়া কহিলেন, "বন্ধু! তোমায় প্রোষিত হইতে দেখিয়া তোমার প্রাণপ্রিয়া কবিতা-দেবীর কি এই খেদোক্তি?" কবি হাসিয়া কহিলেন "বন্ধু! মনে এই ভাবটীর বড় আকুলভাবে উদয় হইয়াছিল, তাই না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাত্রিক সময়টা অতীত হইল? তা হউক, বন্ধু! ক্ষুণ্ণ হইও না। কত শুভক্ষণ পাওয়া যাইবে, এ শুভক্ষণ ত সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। আর বন্ধু! তোমার রাজা কি ইহার পরিবর্ত্তে ইহার অনুরূপ সম্পত্তি আমায় দিতে পারিতেন?" শুনিয়া বন্ধুর চক্ষে অশ্রুর উদয় হইল। তিনি এই দরিদ্র-বন্ধুর ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যে এত চেষ্টা করিতে-ছেন, দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃক্পাতও নাই। তিনি যে-ধনকে জীবন সর্ব্বস্বেরও অধিক বলিয়া জানেন,তাহার উপার্জ্জনেই তিনি আগ্রহ-শীল; কিন্তু তাহাতে যে জীবিকা-নির্ব্বাহের

সদুপায় ঘটে না, তাহা ত তাঁহার জ্ঞান ছিল না। যাঁহার সে জ্ঞান আছে, তিনি তথাবিধ বন্ধুর দারিদ্র্যে অশ্রুমোচন না করিয়া আর কি করিবেন?

কিন্তু ঐ কবি যাহাকে জীবনসর্ব্বস্ব মনে করিতেন, তাহার উপার্জ্জনেই কি তিনি প্রয়াসশীল ছিলেন? কিছুই না। তাঁহাকে তন্নিমিত্ত ত কখনই বিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে শুনা যায় নাই। বরং তিনি বলিতেন, "আপনি না আসিলে, আমি কাহাকেও লই না। আমি সাধ্যসাধনা করিয়া কাহাকেও আনিতে পারিব না। যাহার জন্য বহু যত্ন স্বীকার করিতে হইবে, সে ত কখনই আমার নহে। তাহাকে আমি আপন বলিলেও লোকে ত তাহাকে চিনিয়া ফেলিবে। তবে তাহাকে লইয়া আমি কি করিব? না ভাই। আমি আপন অঙ্গ ভার করিতে পারিব না। আপন ফলই গাছের ভার নহে, অন্য ভার চাপাইলে তাহার অঙ্গ যে ভাঙ্গিয়া যাইবে!" হায় হায়! এই দরিদ্র কবির সকল বিষয়েই এইরূপ দরিদ্রতা ছিল। জীবনের মধ্যে তাঁহার এক শতের অধিক কবিতা রচনা করা ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তিনি বলিতেন, "ঐ সকলের মধ্যে সকলেই একাই এক শত। উহাদিগকে আমি কালের স্রোতে ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু দেখ, ইহার পরেও দেখিও, একটীও ভাসিয়া যাইবে না। শত ধৌত, শত প্রক্ষালিত হইলেও উহার স্বাদ-গন্ধের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিবে না। তোমরা ব্যস্ত হও কেন? কতকগুলা অন্যায় উপার্জ্জন করিলে থাকে না।" লোকে মনে করিত, "এ বড়ই আমোদের লোক দেখিতেছি! যাবজ্জীবনে ইহাঁর একখানি গ্রন্থ লেখা হইয়া উঠিল না, ইনিই আবার উহার অহঙ্কার করেন! এমন অসার অহঙ্কার করিতে লজ্জা করে না! অহঙ্কার করুন, আমাদের প্রচণ্ড-কবিমার্ত্তণ্ড মহাশয়। সর্ব্বদাই মুখে কবিতার স্রোত! তত্তৎক্ষণেই কবিতার পূরণ! যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী আসিয়া জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিয়াছেন! তিনি ত কবি হইয়াই জন্মিয়াছেন! তাঁহার কাছে তোমার এই চিরনিদ্রিত কবিতার অহঙ্কার? কস্মিন্‌কালে কখনও একবার জাগিয়া উঠিল ত সেই পর্য্যন্ত। বস্! আর তাহাকে দুদণ্ড খাড়া দেখিতে পাইবে না। অমনি চিরাভ্যস্ত শয়ন! ছি ছি, এমন কবিত্বশক্তি থাকিলেই কি, না থাকিলেই কি!"

যাহা হউক, বন্ধু নিজ কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। সময়ান্তরে পুনর্ব্বার শুভ দিন দেখিয়া বন্ধুকে লইয়া রাজ-সাক্ষাৎকার-উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। কবি-মার্ত্তণ্ড মহাশয়কেও এ নিমিত্ত বন্ধু পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তিনিও এ সময়ে রাজবাটীতে উপস্থিত ছিলেন। সুযোগ উত্তম হইল। সকলে সভাস্থ হইলে, যথাসময়ে রাজা সমাগত হইলেন। মার্ত্তণ্ড মহাশয়, অমরুকে জনৈক কবি বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলে, রাজা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমরাও সতত সহৃদয়-সমাগম-প্রার্থী। সরস্বতীর নব নব ভঙ্গী দর্শনেরই আশা করিয়া থাকি।" অমরু, রাজার বিনয়ে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে একটী আশীর্ব্বাদ-সূচক কবিতা আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। কবিতাটী এই,—

"ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহতো-
হপ্যাদদানোহংশুকান্তং
গৃহ্ণন্ কেশেষ্বপাস্তশ্চরণনিপতিতো
নেক্ষিতঃ সম্ভ্রমেণ।
আলিঙ্গন্ যোহবধূতস্ত্রিপুরযুবতিভিঃ
সাশ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ
কামীবার্দ্রাপরাধঃ স দহতু দুরিতং
শাম্ভবো বঃ শরাগ্নিঃ॥"

ভাবার্থ,—সদ্যঃকৃতাপরাধ কামী যেমন অনুনয়পূর্ব্বক নিজ দয়িতার হস্তধারণ করিলেও দয়িতাকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, সবলে তাড়িত হইলেও যেমন বসনাঞ্চল গ্রহণ করে, কেশপাশ অবলম্বন করিলেও অপক্ষিপ্ত হয়, চরণে নিপতিত হইলেও সম্ভ্রম-সহকারে নিরীক্ষিত হয় না, আলিঙ্গন করিলেও নির্ভৎসিত হয়, সেইরূপ ত্রিপুরদাহ সময়ে মহাদেবের যে শরানল, সাশ্রুনয়না ত্রিপুরললনাদিগের হস্তে লগ্ন হইলেও তাঁহাদের কর্ত্তৃক ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, আহত হইলেও বসনাঞ্চল গ্রহণ করিয়াছিল, কেশপাশ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হইয়াছিল, চরণতলে পতিত হইয়াছে, অথচ ভয়জনিত ত্বরা বশত নিরীক্ষিত হয় নাই, আলিঙ্গন করিতে করিতে অমনই অবধূত হইয়াছিল, সেই শম্ভুশরাগ্নি আপনার দুরিতরাশি দহন করুক

রাজা শ্লোক শুনিয়া, প্রসন্নবদনে পণ্ডিতগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পণ্ডিতেরা কেহ বলিলেন, "উত্তম কবিতা"; কেহ বলিলেন, "মন্দ নহে"; কেহ বলিলেন, "এ কালে এই-ই যথেষ্ট।" রাজা কহিলেন, "আপনারা ইহার গুণ-দোষ বিচার করুন"। তখন একজন আলঙ্কারিক পণ্ডিত আর একবার শ্লোকটী শুনিয়া লইলেন। শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, "এ কবিতায় শম্ভুবিষয়ক রতি-ভাবই উত্তম প্রকাশ পাইয়াছে, রাজবিষয়ক রতিভাব তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই; কিন্তু তাহাই মুখ্যরূপে প্রকাশিত হওয়া এখানকার উচিত ছিল। 'লগ্ন' 'অভিহত' 'গৃহ্নন্' ইত্যাদি স্থলে, ও 'ক্ষিপ্ত' 'আদদান' ইত্যাদি স্থলে প্রত্যয় ও বাচ্যগত প্রক্রমভঙ্গ দোষ হইয়াছে। অপিচ, রাজবিষয়ক যশোবর্ণনা বা কুশল প্রার্থনা করা এ স্থলে উচিত ছিল, তবে দুরিত-দহনেচ্ছা প্রকাশে একরূপ আশীর্ব্বাদই করা হইয়াছে বটে। তবে কি জানেন, যেটা অধিক প্রচলিত, সেইটাই ভাল। আর অগ্নিদাহ-বর্ণন তাদৃশ শুভসূচকও নহে। কবিতাটীতে শ্রুতি-লালিত্যও তাদৃশ ঘটে নাই, কিন্তু ঐটীই কবিতার রূপ, সর্ব্বাগ্রে দৃশ্য।" অনেকেই এই মতের অনুমোদন করিলেন এবং কেহ কেহ এই উপলক্ষে সমালোচক মহাশয়ের সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া লইলেন। কেবল একজন অতি অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আপনারা একবাক্যে অতি চমৎকার বিচারই করিলেন! শ্লোকটীর গুণ-দোষের বিচারার্থ ভার পাইয়াছেন। মক্ষি-কার ন্যায় স্পষ্ট দোষ না থাকিলেও খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা বাহির করিলেন, আর সুস্পষ্ট প্রকাশমান মহৎগুণের কথা একবার উল্লেখও করিলেন না! দেখুন, দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরদৈত্যের বিমর্দ্দন-বর্ণনায় ভগবানের দুষ্টনিগ্রহে উৎসাহ দেখাইয়া কবি ভগবদ্বিষয়ক যথার্থ অনুরাগ কেমন প্রকাশ করিয়া-ছেন! কিন্তু কবির বিচিত্র সহৃদয়তা দেখুন, ঐ দৈত্যের দলনাবসরেই তদীয় ললনাগণের শম্ভু-শরানলে কীদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে,—কবির তাহা মনে পড়িয়াছে! তখন সেই চিরসুখোচিতা সুকুমারাঙ্গীদিগের সর্ব্বাঙ্গে প্রদীপ্ত দহনের নিদারুণ ক্রীড়া, কবি কি বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারেন? আহা, প্রাণেশ্বর তাহাদের নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়া সেই অপরাধ-প্রমার্জ্জনের নিমিত্তও ঐরূপ কতিবিধ উপচার-চতুরতা দেখা-ইত! কখনও হস্তধারণ করিত, কখনও বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিত, কখনও চরণে পতিত হইত, কখন বা মত্তচিত্তে সবলে আলিঙ্গনে উদ্যত হইত! হায় হায়! আজি কি না, জলন্ত প্রবল জ্বালাময় লকলক্ জিহ্বা বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদের পতিকৃত সেই সেই ব্যব-হারের তুলনা করিয়া যেন ব্যঙ্গচ্ছলে এই অপূর্ব্ব নিষ্ঠুর নিপীড়ন করিতেছে! এ স্থলে দুঃসহ অপ-রাধের সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেই দহনের বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, কোথায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভগবানের দুষ্টনিগ্রহার্থ ক্রোধস্পর্শ শূন্য বীররসের আবির্ভাব, কোথায় তাহার প্রসঙ্গে সুখলালিতা ললনা-মণ্ডলীর ক্লেশাতিশয়-স্মরণে করুণরসের অবতারণ, কোথায় সেই ললনাকুলের নিপীড়ন সমকালীন সেই সেই অবস্থার সাদৃশ্যে শৃঙ্গার-রসের আকস্মিক উপ-স্থাপন? এক শ্লোকে কতরূপ রসের সমাবেশ! কিন্তু মূলে সেই ভগবদ্বিষয়িণী রতি অক্ষুণ্ণই আছে! ভগবদ্ভক্ত কবি, নিজ ভক্তিজনিত যোগ্যতা বুঝিয়াই ভগবানের উক্ত শরাগ্নির ক্রীড়াবসরে তদ্দ্বারা, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দুরিত-দাহের প্রার্থনা করিয়াছেন। মনুষ্যের দুরিত-রাশিও ত্রিপুরদৈত্যের ন্যায়ই দুর্দ্দম! শম্ভুশরানল ব্যতিরেকে কেই বা তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে? যোগ্য উপায়েই যোগ্য ব্যাপারের সমাধান করা হইয়াছে। আর এ দুরিতদাহ-প্রার্থনা অপেক্ষা প্রকৃত কুশল-কামনা আর কি হইতে পারে? পাপরাশিই সকল অনিষ্ট-ঘটনার মূল এবং পাপ-ধ্বংসই সকল অভীষ্ট-প্রাপ্তির প্রধান উপায়। আপনারা অন্ধের ন্যায় এ সকল গুণ কিছুই দেখিলেন না, অথচ কবিতার বাহ্যরূপ দোষাদি দর্শনে দিব্যচক্ষুঃ ধারণ করিলেন! ঐ সকল দোষই কি বিচার-সহ? আর তাহা হইলেও কি অপরিমেয় গুণরাশির মধ্যে ঐ অকিঞ্চিৎকর দোষের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, কালিদাসের পর আর এরূপ কবিতার রচনা হয় নাই। কালিদাসের গ্রন্থেও এরূপ সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা প্রচুর নাই। ইহার ভাবপ্রবাহে কি আপনাদের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হয় নাই, তাই এখনও কর্ণের তৃপ্তির জন্য পদমাধুর্য্যের প্রার্থনা করিতেছেন? এরূপ কবিতা ত এ রাজসভায় আমি এক দিনও শ্রবণ করি

নাই।" ১ম সমালোচক মহাশয় উচ্চ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "অহে ভায়া! "স্থিরো ভব, স্থিরো ভব! উহার গুণ কি মহারাজ বুঝিতে পারেন নাই, তাই তুমি উহার গুণভাগেরই কেবল সবিস্তর ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছ? তবে সজ্জনেরা ত দোষ দর্শন করেন না, বিশেষতঃ রাজাজ্ঞা; এই নিমিত্তই আমাকে সাধারণের জন্য দোষগুলির উল্লেখ করিতে হইল। তবে ভায়া যে কালিদাসের অপেক্ষা এ ব্যক্তিকে উচ্চপদ প্রদান করিলেন, এ বিষয়ে আপনাদের"—বলিয়া সকলের দিকে সহাস দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সকলে উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। একজন মৃদুস্বরে বলিলেন, "নূতন কবির সহিত ইহাঁর কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা থাকিবে।" কেহ বলিলেন, "উহাঁর গতিকই ঐরূপ; দেখ না, চিরকালই উনি সকলের বিপরীত ঐরূপ এক একটা মত দেন।" একজন বলিলেন, "ওরূপ ব্যক্তি রাজসভার উপযুক্তই নহে।" ২য় সমালোচক বলিলেন, "যথার্থ কথা, আমি এ রাজসভায় বসিবার উপযুক্তই নহি। এই শর্ম্মা গাত্রোত্থান করিলেন,"—বলিয়াই সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। সকলে "হাঁ হাঁ বসুন, বসুন, কে এমন কথা বলিল" ইত্যাকার সাধ্য-সাধনা করিলেও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

রাজা বলিলেন, "এই পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধটা কিছু অধিক।" অমনি পণ্ডিতবর্গ বলিয়া উঠিলেন, "কিছু অধিক কেন? মহারাজ! অত্যন্ত অধিক।" কেহ কহিলেন, "শুদ্ধ ক্রোধ নহে, অহঙ্কারও যৎপরোনাস্তি।" কেহ বলিলেন, "নম্রতার নাম মাত্র নাই, বিজাতীয় ঔদ্ধত্য!" কেহ কহিলেন, "অতি অর্ব্বাচীন, বাচাল, অদূরদর্শী!" রাজা কহিলেন, "সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। পরোক্ষে প্রকৃত দোষোল্লেখ করিলেও তাহা নিন্দাবাদ মধ্যে গণ্য হয়। আর সমালোচনা করিতেও বলা হইবে না। মহাশয়! আপনার সমস্যা-পূরণ করা হয় কি?"

অমরু কহিলেন, "না।"

"তবে অন্য ২।১টী শ্লোক বলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, বলিতে পারেন।"

অমরু কহিলেন, "না, আর আকাঙ্ক্ষা নাই।"

একজন জিজ্ঞাসিলেন, আপনি একখানি কাব্যরচনা করিয়াছেন, শুনিয়াছি কোন্ উপাখ্যান অবলম্বনে তাহা রচিত হইয়াছে?"

অমরু কহিলেন, "কোন উপাখ্যান তাহার অবলম্বন নহে। সেখানি শত-শ্লোকাত্মক কোষকাব্য। তাহার শ্লোকগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ।" শুনিয়া সেই ১ম সমালোচক মহাশয় হাস্য করিলেন। কহিলেন, "প্রবন্ধ ভিন্ন উদ্ভট শ্লোকে রসের আবির্ভাবই হইতে পারে না।" রাজা কহিলেন, "তবে প্রচণ্ড-কবিমার্ত্তণ্ড মহাশয় এক আধটা কবিতা বলুন।" মার্ত্তণ্ড মহাশয় কহিলেন, "আমার "খর্ব্বাখ্যান" ও "দোর্দ্দণ্ডদাশরথি" দুই কাব্যই বর্ত্তমান। কোন্ খানির কবিতা বলা যায়?" এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্যক্তি তাঁহার কাণে-কাণে কি কহিল। তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্রকাশে কহিলেন, "অবশ্য, আমি কাব্যের ব্যাখ্যা করিব না। উনি যে ভাবের শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন, আমার সেইরূপই করা উচিত। নতুবা তুলনার সুবিধা হয় না। এই বলিয়া অবিলম্বে স্বকীয় একটী প্রসিদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কবিতাটী এই,—

"ঝঞ্ঝাপ্রভঞ্জন-ঘনাঘনগাঢ়গূঢ়ে
দিঙ্মণ্ডলেঽপি খলখণ্ডনচণ্ডবীর্য্য!
হিণ্ডীরপিণ্ডপরিপাণ্ডুভবদ্-যশাংসি
জ্যোৎস্না-জ্বলন্তি চ জগন্তি পুনন্তি শশ্বৎ॥"

শ্রুতিমাত্রেই পণ্ডিতবর্গ আন্তরিক হর্ষোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে কবির স্বকৃত ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল,—"মহারাজ! ভূমণ্ডলে খল অর্থাৎ বৈরিগণের খণ্ডন দ্বারা আপনার প্রচণ্ডবীর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। আপনার যশোরাশি ফেনপুঞ্জের ন্যায় ধবলবর্ণ। সেই যশোরাশি এক অপূর্ব্ব জোৎস্নারাশি স্বরূপ। অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাশি কেন বলি? না, দেখুন, সাধারণ জ্যোৎস্না, ঝঞ্ঝাবায়ু কি বর্ষণশীল মেঘজালে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে প্রকাশ পায় না। আর ভবদীয় এই যশোজ্যোৎস্না তাদৃশ সময়েও প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে কেমন? শশ্বৎ অর্থাৎ নিত্য, অর্থাৎ কি দিবা, কি রাত্রি, প্রকাশ পাইয়া থাকে;—সুতরাং অপূর্ব্ব। আপনার তাদৃশ যশোরূপ জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে এবং সে নিজে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক বলিয়া এই জগৎকেও

পবিত্র করিতেছে।—এই আমার যৎকিঞ্চিৎ কবিতা”—বলিয়া কবিবর গর্ব্বগম্ভীর-বদনে নীরব হইলেন। রাজা মহাসন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সকলেই তাহার অনুমোদন করিয়া তাঁহার প্রাধান্য-সূচক প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ড মহাশয় বলিলেন, “অমরু ভায়াও মন্দ নহেন, তবে পল্লীগ্রামে সর্ব্বদা অবস্থিতি, সভাক্ষোভটা কিছু আছে। ক্রমে রাজধানীতে গতায়াতে কবিতা মার্জ্জিত হইতে থাকিবে, আর কি? যা হোক্, ইহাঁর প্রতি মহারাজের কিছু দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, আমাদের বলা বাহুল্য। মহারাজ নিজেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সকল গুণগ্রাহী, সহৃদয়ের চূড়ামণি।” সকলে উক্ত বাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, “তাহাতে সন্দেহ কি? মনুষ্যে যত গুণ সম্ভব হইতে পারে, এক মহারাজে তৎসমস্ত বিদ্যমান আছে। মহারাজ সাক্ষাৎ বিক্রমাদিত্য আর কি! রাজা সসন্তোষে কহিলেন, “ব্রাহ্মণবাক্য শিরোধার্য্য। আপনারা এখন বিশ্রাম করুন।” এই বলিয়া নূতন কবির পরিচর্য্যার্থ দেওয়ানকে ইঙ্গিত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান করিলেন। দেওয়ানজীর আদেশমত ভৃত্যেরা অমরু মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুর পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ ও পাকাদির আয়োজন করিয়া দিল।

অমরু বাসায় আসিয়া বন্ধুকে কহিলেন, “বন্ধু! চল এখানে আর আমার থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। পথে গিয়া পাক-শাকাদি করা যাইবে।” বন্ধুও ক্ষুণ্ণমনা হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি ধীরতার সহিত কহিলেন, “না, তাহা উচিত হয় না। তোমার গুণের সুবিচার হউক না হউক, তুমি রাজার আতিথ্যে অবহেলা করিতে পারিতেছ না।” অমরু কহিলেন, “আচ্ছা তাহাই হউক। কিন্তু বিদায়ের জন্য মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করা হইবে না। ভোজনোত্তরই প্রস্থান করিতে হইবে।” বন্ধু বলিলেন, “তথাস্তু।”

ক্রমে পাক ও ভোজন সমাধা হইল। তখন শরীর ও অন্তঃকরণ প্রকৃতিস্থ হইল। অনেক স্থলে ক্ষোভ-ক্রোধাদি ক্ষুধাশান্তির সঙ্গে অনেকাংশে উপশম প্রাপ্ত হয়। তাহার উপর ঐরূপ বন্ধুর অনুরোধ। বন্ধু বুঝাইলেন, “কয়েকদিনে অত্যন্ত পথশ্রম হইয়াছে, রাত্রিটা বিশ্রাম করিয়া প্রত্যূষে প্রস্থান করিলেই ভাল হয়। এক বিদায়ের ভয়, তা বিদায়ের জন্য উপস্থিত না হইলে তাহা হইবে না। বিদায়ের জন্য আমাদের রাজসভায় উপস্থিত হইবারই প্রয়োজন নাই। এমন কি, মার্ত্তণ্ড মহাশয় তাঁহার রাজবাটীতে অবস্থিতির সুখ-স্বচ্ছন্দতা আমাদিগকে দেখাইবার জন্য যে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাও আর যাওয়া হইবে না। তাহা হইলেই হইল।” অমরু তাহাতেই সম্মত হইলেন। সে রাত্রিতে আর পাক না করিয়া উভয়ে জলযোগ পূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বন্ধু কহিলেন “বন্ধু! দেশের গতিকই এইরূপ। পণ্ডিতেরা তোষামোদকারী, ধনবানেরা তোষামোদপ্রিয় আবার রাজার কিঞ্চিৎ বিদ্যাবুদ্ধি আছে। সুতরাং তিনি আপনাকে আপনি অদ্বিতীয় গুণগ্রাহী সহৃদয় বলিয়া ধারণা করিয়াই ত রাখিবেন। বিক্রমাদিত্যের মত লোক ত সর্ব্বদা জগতে জন্মে না! এরূপ স্থলে রাজা অভিমতরূপই রাজকবি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আর তাঁহার গুণদোষ-বিচারক আলঙ্কারিক পণ্ডিতও ঐ রাজার উপযুক্ত বলিয়াই রাজসভায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঐ পণ্ডিতটী ঐরূপ উপযুক্ত না হইলেও অর্থপ্রত্যাশায় উক্তরূপই হইবেন। নৈয়ায়িকেরা ত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া এ সকল আলাপে কর্ণপাতই করেন না, শব্দশাস্ত্রে বা সাহিত্যশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিকে তাঁহারা পাপ বলিয়াই গণনা করেন। অবশিষ্ট যাবতীয় পণ্ডিত যে উক্ত রাজকীয় কবি ও আলঙ্কারিকের ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? এই সমস্ত একমতের একবুদ্ধির লোককে বিরক্ত করিয়া আমাদের লাভ কি? নহিলে আমরাও তো কিছু কিছু বুঝি। ঐ যে মাথামুণ্ড হিণ্ডীর-পিণ্ডের শ্লোক, উহাতে যে কত দোষ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে কি অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন করে? দেখনা কেন, ফেনরাশি বুঝানই যখন অভিপ্রেত, তখন হিণ্ডীরপুঞ্জ না বলিয়া হিণ্ডীরপিণ্ড বলা কেন? “ণ্ড”এর অনুরোধে কেবল অর্থলাঘব করা হইয়াছে বৈ ত নয়? আর ফেনপুঞ্জ যতটুকু পাণ্ডুবর্ণ, যশ যদি সর্ব্বতোভাবে ততটুকুই পাণ্ডুবর্ণ হইল, তবে আর জ্যোৎস্নার সঙ্গে তুলনা কেন? না হয়, জ্যোৎস্না-রূপেই যশের

রূপণ হউক, কিন্তু জ্যোৎস্না প্রজ্বলিত হয় কি প্রকারে? যদি পাবকাদির ন্যায় তাহার প্রজ্বলিত হওয়াই স্বীকার করা যায়, তথাপি সে জগত্রয়কে পবিত্র করিতে পারে এমন কোন কারণ ত তাহাতে দৃষ্ট হয় না। আর খলশব্দ কি বৈরিশব্দের বাচক, তাই তাহার 'বৈরী' এই অর্থ করা হইয়াছে? আর শ্লোকের ভাবার্থ এমন কি যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে,তাহাতে গদ্গদ-চিত্তে প্রশংসাবাদ করিতে হয়, তাহা ত এ অভাগ্যের হৃদয়ঙ্গমই হইল না। যাহা হউক, ঐ সমস্ত দোষও ত আমি দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু দেখাইয়া কি ফল? বুদ্ধিস্থ হইবে না। পক্ষপাতান্ধ চক্ষুতে প্রকৃত দৃষ্টি কিছুতেই হয় না। বিশেষতঃ যাঁহাদের এরূপ সংস্কার যে, বেশবনিতার অলঙ্কার-ঝঙ্কারের ন্যায় কবিতার শব্দাড়ম্বর প্রতিপদে শ্রুত না হইলে তাহা মনোরম হইবে না, তর্ক দ্বারা তাঁহাদের সে সংস্কারের নিরাস করিতে যাওয়া অসাধ্য-সাধনের প্রয়াসমাত্র। যাহা হউক, তোমার অব্যক্ত কোপ ও মনঃক্ষোভ দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছিলাম। তোমার দিকে আমি তখন দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই। দুইটা সান্ত্বনা-বাক্য প্রয়োগেও সাহস হইল না। কেননা, তখন তুমি অনুরুদ্ধ হইয়া অকারণে আমার অবিমৃষ্যকৃত কর্ম্মের কটুফল ভোগ করিতেছ।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

ন্যায়-দর্শন।

(২)

গুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম।

কর্ম্ম,—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন।

জাতি,—পর (ব্যাপক) এবং অপর (ব্যাপ্য)।

বিশেষ,—নানা। সকলে বিশেষ পদার্থ মানে না।

সমবায়,—নিত্যসম্বন্ধ এবং ইহা একমাত্র।

অভাব,—দ্বিবিধ; সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব।

স্থূলতঃ এই সপ্ত পদার্থের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে, বিশেষ বিবরণ দ্বারা তৎসমুদয়ের ক্রমে পরিচয় প্রদান করিতেছি;— প্রথমেই ধর,—

পৃথিবী।

পৃথিবীর অনেকগুলি লক্ষণ;—যথা, (১) গন্ধবত্ত্ব, (২) নানাজাতীয়-রূপবত্ত্ব, (৩) ষড়্‌বিধ-রসবত্ত্ব এবং (৪) পাকজ-স্পর্শবত্ত্ব।

(১) গন্ধ, পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতে নাই; এইজন্য গন্ধবান্ বলিলেই পৃথিবীকে বুঝা যায়; তাই গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। পচাজলে যে গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা অন্য পদার্থের সম্পর্কাধীন জানিবে। পঙ্ক, শৈবাল এবং অপর আবর্জ্জনা প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ মিশ্রিত হইয়াই জলকে গন্ধযুক্ত করে। মনে কর, যেমন গোলাপ-জল। গোলাপের মিশ্রণেই ঐ জলে সৌগন্ধ্য। বায়ুর গন্ধও ঐরূপ। বায়ুতে গন্ধ নাই, কিন্তু পুষ্পাদি-পরাগ বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত থাকাতেই বায়ুতে গন্ধ অনুভব হয়। নতুবা বস্তুগত্যা বায়ুতে গন্ধ নাই। এইজন্যই সংস্কৃত ভাষায় 'গন্ধবহ' বায়ুর নামান্তর, কিন্তু গন্ধবান্ নহে। পরের গন্ধ বহন করে বলিয়াই গন্ধবহ নাম হইয়াছে, যেমন বার্ত্তাবহ।

(২) নানাজাতীয় রূপ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতে নাই, এজন্য নানাজাতীয়-রূপবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। জলে রূপ আছে, তেজে রূপ আছে বটে; কিন্তু তাহা শুক্লরূপ। কাল জল, লাল জল,—সবই মাটীর গুণে। অগ্নির বর্ণভেদ, তাহাও ইন্ধনের গুণে। পার্থিবাংশ লইয়াই জলে বর্ণভেদ দেখা যায়; পার্থিবাংশটুকুই অগ্নির ভিতর থাকিয়া অগ্নিরও বর্ণভেদ করে। ফলতঃ উহার পার্থিবাংশটুকু বাদ দিলে শুক্লবর্ণই প্রতিভাত হয়। নানাজাতীয় রূপ কেবল পৃথিবীতে বর্ত্তমান।

(৩) ষড়্‌বিধ রস কেবল পার্থিব পদার্থেই বিদ্যমান, এইজন্য ষড়্‌বিধ-রসবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। জলের স্বাভাবিক রস মধুর। কষায় লবণ প্রভৃতি রস, পার্থিবাংশ সহযোগে জলে উৎপন্ন হয়।

(৪) পাকজ স্পর্শ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতে নাই, এইজন্য পাকজ স্পর্শবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ।

পার্থিব ঘট-শরাবাদিরই আমাবস্থায় একরূপ স্পর্শ, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কোমলত্ব-স্পর্শ থাকে; অগ্নিতে পাক হইবার পর কঠিনত্ব-স্পর্শ হয়, অথচ জল, বায়ু বা খাঁটি তেজের স্পর্শ, পাকে বিভিন্ন হয় না। তবেই দেখা যাইতেছে, পাকজ স্পর্শ কেবল পৃথিবীতেই আছে। পৃথিবীর স্পর্শ উষ্ণ নহে, শীতল নহে, তবে যে উষ্ণ-শীত-স্পর্শ-তারতম্য অনুভূত হয়, তাহা জলীয়াংশ এবং তৈজসাংশের সম্বন্ধে জানিবে।

তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সকল পৃথিবীতে কিছু নানা-জাতীয় রূপ, ষড়্বিধ রস বা পাকজ স্পর্শ নাই। মনেকর,—একটী ঘট, তাহার বর্ণ লাল, অন্যবর্ণ তাহাতে নাই, সুতরাং সে ঘটে পৃথিবীত্ব থাকিলেও নানাজাতীয় রূপ নাই; তবে নানাজাতীয় রূপকে পৃথিবী-লক্ষণ বলি কি করিয়া? বলিলে অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ বস্তুগত্যা যাহা পৃথিবী,তোমার কৃত লক্ষণ তাহাতে বর্ত্তিল না। একটী মিষ্টদ্রব্য,—তাহাকেও তুমি পৃথিবীর অন্তর্ভূত করিবে; কিন্তু তাহাতে এক মধুর রস ছাড়া আর কোন রস নাই, ষড়্বিধ রস তাহাতে নাই। তবে ষড়্বিধ রসবত্ত্বকে পৃথিবী-লক্ষণ বলিবে কিরূপে? সকল ক্ষিতির কিছু পাক হয় না, পাকজ স্পর্শ সকল পৃথিবীতে নাই, তবে পাকজ স্পর্শবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ হইবে কিরূপে? গন্ধও যে সর্ব্ব সময়ে পৃথিবীতে আছে তাহা তোমরা বল না, কিন্তু যেকালে গন্ধ নাই, তখন পৃথিবী কি পৃথিবী নহে? তবে গন্ধবত্ত্বকে পৃথিবী-লক্ষণ বল কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছি। কিন্তু প্রথমে একটা কথা বলিয়া রাখি;—ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব জান? যে, যাহা হইতে কম স্থানে থাকে, সে তাহার ব্যাপ্য। যে যদপেক্ষা অধিক স্থানে থাকে, সে তাহার ব্যাপক। যথা;—পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্ব অপেক্ষা কম স্থানে থাকে; কেননা, পৃথিবীত্ব কেবল পৃথিবীতেই বর্ত্তমান, জলাদিতে নাই; দ্রব্যত্ব পৃথিবীতেও আছে, জলাদিতেও আছে;—পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য। জলত্ব, তেজস্ত্ব, বায়ুত্ব,—এ সবই দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য। এবং দ্রব্যত্ব পৃথিবীত্বাদি অপেক্ষা অধিক স্থানে থাকে বলিয়া দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্বাদির ব্যাপক। সর্ব্বত্র এ নিয়ম না হইলেও আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে ঐরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবেরই প্রয়োজন।

এই দ্রব্যত্ব-পৃথিবীত্বাদিকে এক একটী 'জাতি' বলা যায়। কেন যে জাতি বলা যায়, তাহা পরে বুঝিবে। এক্ষণে গন্ধবত্ত্ব প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ কি, শুন;—

(১) "গন্ধবদ্বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"ই গন্ধবত্ত্বের চরম অর্থ।

কোন এক সময়ে পৃথিবীতে গন্ধ না থাকিলেও 'গন্ধবদ্বৃত্তি দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি' তাহাতে আছে। সুতরাং লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ নাই। মনোযোগ কর;—গন্ধবৎ হইল কে? না,—পৃথিবী; গন্ধ ত আর-কোন স্থানে নাই, যে সময়েই হউক, গন্ধ পৃথিবীতেই আছে, সুতরাং সেই সময়ে পৃথিবীকেই 'গন্ধবৎ' বলিয়া ধরিব। পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব জাতি সকল সময়েই আছে। পৃথিবীত্ব যে দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। সুতরাং গন্ধবৎ-(পৃথিবী) বৃত্তি দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি (পৃথিবীত্ব), সকল পৃথিবীতেই বর্ত্তমান। অতএব লক্ষণে দোষ নাই।

(২) নানাজাতীয়-রূপবত্ত্বের চরম অর্থ হইল,—"রূপদ্বয়বদ্বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব।"

দ্বিবিধ রূপ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতে নাই, পৃথিবীতে আছে। মনেকর ঘট;—ঘটে আমাবস্থায় শ্যামরূপ, পক্কাবস্থায় রক্তরূপ, সুতরাং 'রূপদ্বয়বৎ' বলিতে 'ঘট' পাইতে পারি; তাহাতে বৃত্তি যে দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য-জাতি অর্থাৎ পৃথিবীত্ব, তাহা সকল পৃথিবীতেই সকল সময়ে আছে। অতএব উক্ত লক্ষণ নির্দ্দোষ।

(৩) 'ষড়্বিধ রসবত্ত্ব' এই লক্ষণের চরম অর্থ হইল,—"রসদ্বয়বদ্বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব।"

পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই দুই রস নাই। 'রসদ্বয়বৎ' হইতে কোন একটী ফল হইতে পারে; মনে কর, আম্র;—আম্রে অপক্কাবস্থায় অম্লরস ও পক্কাবস্থায় মধুর রস, আম্র পার্থিব, পৃথিবীর অন্তর্গত,—তাহাতে পৃথিবীত্ব আছে; পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি; সেই পৃথিবীত্ব আবার সকল পৃথিবীতেই সর্ব্বসময়ে আছে। সুতরাং এ লক্ষণও নির্দ্দোষ।

(৪) এইরূপ, 'পাকজ-স্পর্শবত্ত্ব' এই লক্ষণের চরম অর্থ হইল,—"পাকজ-স্পর্শবদ্বৃত্তি-দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব।"

পাকজস্পর্শবৎ হইল,—ঘটাদি; তাহাতে পৃথিবীত্ব আছে; দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্ব,—

আবার সর্ব্বদা সর্ব্ব পৃথিবীতে বর্ত্তমান। অতএব এ লক্ষণেও কোন দোষ নাই।

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশটী গুণ আছে। যথা;—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ (সংস্কার বিশেষ), গুরুত্ব এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। এতন্মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ,—এই চারিটী বশেষ গুণ। এই বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই পৃথিবী, একটী 'ভূত'—পঞ্চভূতের অন্তর্গত। কর্ম্ম মোটা-মুটি সকল গুলিই কোন না কোন পৃথিবীতে আছে।

পৃথিবী দ্বিবিধ; নিত্য এবং অনিত্য। পার্থিব পরমাণু, নিত্য পৃথিবী; অপর সমুদয় পৃথিবীই অনিত্য। এই পার্থিব পরমাণু হইতেই ক্রমে এই সুবৃহৎ পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। পরমাণুর অবয়ব নাই। তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, স্পর্শন-গোচর নহে। তাহাতেও গন্ধ আছে, সে গন্ধ কিন্তু আমরা ঘ্রাণ করিতে পাই না। অধিক কি, পৃথিবীর যে চতুর্দ্দশ গুণ, তৎ সমস্তই পরমাণুতে আছে, ক্রিয়াও পরমাণুতে আছে; কিন্তু পরমাণুর কিছুই আমরা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

তবে তাহা মানি কেন?—মানিতে হয়, ফল দেখিয়া। মূল পৃথিবীতে সে গুণ না থাকিলে, স্থূল পৃথিবীতে এ সব গুণ আসিল? কোথা হইতে মানিবার ইহাই প্রধান যুক্তি। স্থূল পৃথিবীর হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিয়া স্থির করা যায় যে,এ পৃথিবীরও উৎপত্তি-বিনাশ আছে; কিন্তু যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, সেই সুসূক্ষ্ম পৃথিবীর উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে পারে না, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ-কল্পনা যুক্তি-তর্ক-বিরুদ্ধ। দুই পরমাণুতে দ্ব্যণুক হয়, দ্ব্যণুকেরও প্রত্যক্ষ নাই। তিন দ্ব্যণুকে এক ত্রসরেণু;—ত্রসরেণু হইতেই পৃথিবী প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে।

"জালান্তর গতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥"
মনু ৮।১৩২।

ভাবার্থ,—গবাক্ষ-জালরন্ধ্র-প্রবিষ্ট নবোদিত সূর্য্য-কিরণে যে সব সূক্ষ্ম ধূলিকণা দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মকণাই 'ত্রসরেণু'।

স্থূল পৃথিবীর আদি ও অন্ত অবস্থা সেই পরমাণু।

অনিত্য পৃথিবী তিনরূপে বিভক্ত করা যায়; দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। পার্থিব দেহ, চতুর্ব্বিধ;—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। মনুষ্যাদির দেহ,—জরায়ুজ; পক্ষি প্রভৃতির দেহ,—অণ্ডজ; উকুন ছারপোকা প্রভৃতির দেহ,—স্বেদজ এবং বৃক্ষ লতাদি,—উদ্ভিজ্জ। এই চতুর্ব্বিধ দেহের প্রথম দ্বিবিধ দেহ,—যোনিজ; শেষ দ্বিবিধ দেহ,—অযোনিজ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই পার্থিবেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ অনুভব করা যায়, তাহাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাসিকার নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-স্থান নাসিকা এই পর্য্যন্ত। কেন যে নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে, তাহা পরে বলিব।

বিষয়;—যাহা দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ পৃথিবী; তাহাই বিষয়। স্থূলতঃ ভোগ্য পৃথিবী বলিলেও বলা যায়। দ্ব্যণুক হইতে এই বিস্তৃত পৃথিবী,—সমুদয়ই বিষয়

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

আমার নব বর্ষ।

সেই রবি শশী আছে, সেই ফুল ফোটে গাছে,
তেমনি প্রভাত সন্ধ্যা করে আগমন!
সেই নিশি সেই দিবা, নূতন হয়েছে কিবা?
সেই আলো অন্ধকার আগের মতন!
বসন্তের পিছে পিছে, কোকিল ডাকিছে মিছে,
পুরাণা সেকেলে সেই অলির গুঞ্জন!
সেই আমি সেই তুমি, সেই তো আকাশ ভূমি,
সেই জন্ম সেই মৃত্যু—সব পুরাতন!
পুরাণা পথের ধূলি, অণু পরমাণু গুলি,
পুরাতন এ জীবন দেহ আত্মা মন।
পুরাতন এই আঁখি, অশ্রুজলে মাখামাখি,
পুরাতন হাহাকারে বিদীর্ণ গগন!
কি বিপুল কি বিশাল, অনাদি এ মহাকাল,
অতি পুরাতন সৃষ্টি করিছে বহন!
পুরাতন এই রাজ্যে, প্রতি কথা প্রতি কার্য্যে,
সেত গো হইয়ে গেছে শত পুরাতন!
সকলে ভুলেছে তারে, মনে নাই একেবারে,
সে যে গো এদেশে আহা ছিল একজন!

লইয়ে দুখিনী মেয়ে, গেছে কত দুঃখ পেয়ে,—
ভাবিতে তাহার কথা কার প্রয়োজন ?
আছে—প্রয়োজন আছে, নহিলে কি প্রাণ বাঁচে,
নহিলে কি তার কথা করি আন্দোলন !
পুরাণো চিতার ছাই, বটে প্রয়োজন নাই,
পুরাতন্ হ'য়ে গেছে চুম্ব আলিঙ্গন !
রক্ত মাংসে মাখামাখি, সে আকাঙ্ক্ষা নাহি রাখি,
করে না কলুষ ইচ্ছা কলঙ্কিত মন !
পবিত্র তাহার স্মৃতি, পবিত্র উজ্জ্বল নিতি,
পবিত্র করিয়া দেয় প্রাণ পুরাতন !
সেই মম নব বর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
বিনোদ বৈশাখে নব চম্পক-চন্দন !
উষার কদম্ব-কেলি, সাঁঝের ফুটন্ত বেলি,
সিক্ত-বেণামূল-গন্ধী শীত সমীরণ !
সেই মম প্রিয় নারী, নবীন মেঘের বারি,
অবনীতে শ্যাম শোভা করে আনয়ন !
শিখী নাচে পাখী গায়, আনন্দে চাতক চায়,
উল্লাসে ভরিয়া যায় সমস্ত ভুবন !
মর্দ্দিত বরাহ-পদে, বিশুষ্ক পল্বলে হ্রদে,
শাপলা শালুক সুঁদি জাগে পদ্মবন !
নদ নদী খালে বিলে, সেই নিমন্ত্রণ দিলে,
জলচর পাখীগণ করে আগমন !
ক্ষুদ্র ও(ই) খলিশা পুটী, খেলে ছোট বোন্ দু'টী
সে দেয় নূতন শাড়ী পরা'য়ে যখন !
পোনা মাছ দলে দলে, ভাসে এ নূতন জলে,
তাহারি স্নেহের কণা হেন লয় মন !
রক্ত পীত ঘনশ্যাম, কাঁচা কড়া পাকা আম,
কাঁটাল গোলাপজাম—ফল অগণন,
তারি কাছে কোল ভরা, অজস্র পেয়েছে ধরা,
তাহারি দয়ার ভারে নমিত কানন !
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি, তারি প্রেম—তারি প্রীতি,
পবিত্র কিরণে আহা ভাসায় ভুবন !
নিদাঘ-তপন-তপ্ত, অবনীর অভিশপ্ত,
জীবের যন্ত্রণাময় জুড়ায় জীবন !
সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
শুভ চন্দ্র মম তার শুভ চন্দ্রানন,
কি পুণ্য অমৃতযোগ, প্রাণে করি উপভোগ,
একটী মুহূর্ত্ত তারে করিলে স্মরণ !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

হিন্দুর অবশিষ্ট প্রাত্যহিক কর্ম্ম।

গতবারে পঞ্চযজ্ঞের আভাস দিয়াছি। কিন্তু হেতু-নির্দ্দেশ বা বিশেষ কিছু পরিচয় প্রদান করি নাই। এবার প্রথমেই সেইটুকু বলিতেছি ;—

(১) উনুন বা আখা, (২) শিল, নোড়া, (৩) ঝাঁটা, (৪) ঢেঁকি, উখলি এবং (৫) জলপাত্র না হইলে গৃহস্থের চলে না, গৃহস্থালী করিতে গেলেই এ কয়েকটী জিনিসই আবশ্যক ; অথচ এগুলি এক একটী প্রাণি-বধের যন্ত্র। উনুন জ্বলিতে থাকিবে, তবে পাক হইবে। কিন্তু এই জ্বলন্ত উনুনে কত কীট-পতঙ্গ দগ্ধ হয়, তাহার ইয়ত্তা কে করে ? মসলা প্রভৃতি পিষিয়া লইতে হয়, মসলা না হইলে ব্যঞ্জন হয় না। কিন্তু এই পেষণের সঙ্গে কত কত ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পিষ্ট হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করে, তাহার কি সংখ্যা আছে ? ঝাঁট না দিলে গৃহ পরিষ্কার থাকে না, অপরিষ্কৃত স্থানে আহারাদি করিতে নাই ; কিন্তু আবর্জ্জনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্মার্জ্জনী-মুখে, কত প্রাণীই যে প্রাণ হারায়, তাহা কি আর বলিতে হইবে ? ধান্য বিতুষ না করিলে, অর্থাৎ না ভানিলে, তণ্ডুল প্রস্তুত হয় না, ডাল না কাঁড়াইলে, ভোজনই হয় না, সুতরাং ঢেঁকি বা উদূখল-মুষল সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করা যায়, কিন্তু এই কাঁড়াইবার সময় কত জীবই না চূর্ণ হইয়া যায়। আর জল-পাত্র !—পাত্রে জল রাখিলেই সেই জলে পড়িয়া ক্ষুদ্র, অনতি ক্ষুদ্র অনেক প্রাণীই বিনষ্ট হয়। এ সব প্রাণি-হিংসার বৃত্তান্ত সকলেই ত অবগত আছেন। তাই বলিতেছি,—উক্ত পঞ্চবিধ বস্তু প্রাণি-বধের যন্ত্র। * শাস্ত্রে ঐ গুলিকে বধ্যস্থান বা সূনা বলা হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু,—যাঁহার সকল কার্য্যই ধর্ম্মের জন্য, তিনি এই অপরিহার্য্য প্রাত্যহিক পাপে লিপ্ত হইবেন অথচ তাহার প্রতীকার হইবে না, ইহা হইতে পারে না। অহিংসা, দয়া, সত্য,—যে ধর্ম্মের মূল, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ জাতি, পাপের তাড়না অনবরত সহ্য করিতে প্রস্তুত না হইলে, আর সংসারী হইতে পারিবে না, গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে

* পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাংস্তু বাহয়ন্॥ মনু, ৩।৬৮

না,—এরূপ অসামঞ্জস্য হইতে পারে না; তাই বেদ বলিয়াছেন ;—

"পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে। দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞো ভূতযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি।" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

মনু বলিয়াছেন,—

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।
পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহেঽপি বসন্ নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে॥"

গৃহস্থের পঞ্চযজ্ঞ সতত কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ স্বীয় শক্ত্যনুসারে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন; তিনি গৃহস্থ হইলেও সূনাদোষে লিপ্ত হইবেন না।

এই অপরিহার্য্য জীব-হিংসা-পাপের পঞ্চযজ্ঞই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। কেননা, **অপর বহুতর জীবের তৃপ্তি-সাধন, জীবন রক্ষণ পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম উদ্দেশ্য।**

গৃহস্থ ঠিক বুঝিবে, সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবে,—"নিজের বা স্ত্রী-পরিবার আত্মীয়-স্বজনের জন্য এ গৃহস্থালী নহে। অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর স্বীয় শরীরের জন্য হিংস্র জন্তুগণের ন্যায় বহুতর জীব-হিংসা মনুষ্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় না; ভাল হউক, মন্দ হউক, শাস্ত্রাজ্ঞা মানিয়া যাহা কিছু কৃত হয়, তৎ সমস্তই গার্হস্থ্যধর্ম্মের জন্য। মায়া-মোহ অপগত হয় নাই, রাগ-দ্বেষ দূর হয় নাই, সুখ-দুঃখে সমতা হয় নাই,—আমি এখন আর কোন আশ্রমের অধিকারী নহি; সুতরাং গার্হস্থ্য ধর্ম্মই পালনীয়। গৃহস্থাশ্রম ভিক্ষুর জন্য, গৃহস্থাশ্রম সন্ন্যাসীর জন্য, গৃহস্থাশ্রম অতিথির জন্য, গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রাণীর জন্য। গৃহস্থাশ্রম আত্ম-পোষণের জন্য নহে, গৃহস্থাশ্রম সকলের জন্য।" পঞ্চ মহাযজ্ঞই গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্বজনীনতা এবং অত্যন্ত পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছে। পঞ্চযজ্ঞই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রাণ। সর্ব্ব প্রাণীর হিতোদ্দেশে আচরিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কোন দোষ থাকিতে পারে না। অপরিহার্য্য জীব-হিংসা সর্ব্বজন-কল্যাণকর গৃহাশ্রমের দুষ্টতা-সম্পাদক হইতে পারে না। তবে যে গার্হস্থ্য কাহারও হিতকর নহে, যে গার্হস্থ্যের সঙ্গে পঞ্চযজ্ঞের সম্বন্ধ নাই, সে গার্হস্থ্য প্রকৃতই বধ্যভূমি। জীব-হিংসা ভিন্ন তাহাতে আর কি আছে?

এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।"

মনু এই শ্রুতিবাক্যই স্পষ্ট করিয়াছেন, "অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।" যে ব্যক্তি কেবল আপনার জন্য পাক করে, অর্থাৎ যে পঞ্চযজ্ঞ করে না, সে কেবল পাপ-ভাগী হয়।

পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে বেদপাঠ ও বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ। ইহার ফল তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান হইলে, আর সংসারে আসিতে হয় না, আর জীবহিংসা করিতে হয় না; বেদপাঠে চিত্ত শুদ্ধ হয়। যম-নিয়ম-পালনে সাহায্য হয়। এইজন্যই পঞ্চযজ্ঞ নিত্য কর্ত্তব্য।

"পঞ্চমে চ তথাভাগে সংবিভাগো যথার্হতঃ।
পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে।
সংবিভাগং ততঃ কৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভুগ্‌ ভবেৎ॥"

দিবা দুইপ্রহরের পর অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে পিতৃলোক, বিশ্বদেব, অতিথি, অভ্যাগত, আশ্রিত এবং কীট-পতঙ্গদিগকে যথাযোগ্য অন্নদান করিয়া সর্ব্বশেষে গৃহস্থ আহার করিবেন।

গৃহস্থ স্বয়ং আহার না করিলেও পঞ্চযজ্ঞ করিবেন। বৈশ্বদেব ও বলিকর্ম্ম রাত্রিতেও করিবে। রাত্রিতে যদি গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করেন, তাহা হইলে, পুনঃপাক না হইলেও,—আর যদি অতিথি উপস্থিত হওয়ায় রাত্রিতে পুনঃপাক করিতে হয়, তাহা হইলেও বৈশ্বদেব ও বলিকর্ম্ম রাত্রিতে করিবে। নচেৎ কেবল দিবসেই একবার করিবে। যাহারা সাগ্নিক নহে, বৈশ্বদেব তাহারা করিবে না; শাকল হোম তাহারা করিবে। বৈশ্বদেব (নিরগ্নিক পক্ষে শাকল হোম) ও বলিকর্ম্ম যেদিন প্রথমারম্ভ করিবে, সেইদিন প্রথমতঃ বৈশ্বদেবার্থে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করিবে। বলিকর্ম্মের জন্য স্বতন্ত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করিয়াই হউক, আর না করিয়াই হউক, উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়া পিতৃ-মৃত্যুর অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিনে পুনরারম্ভ করিলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় না; কেবল কার্য্য বাদ দিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

নিরগ্নি ব্যক্তি, শাকল হোম,—জল বা মৃত্তিকাতে করিবে। অন্ন, তণ্ডুল, ফল-মূল অন্ততঃ জল দ্বারাও আট বার শাকল হোম করিয়া

বিশ্বদেব, সমুদয় ভূতবৃন্দ এবং পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর যক্ষ্ম-বলি দিবে।

সংক্ষেপে এইরূপ বলিপ্রদানে তৃপ্তি না হইলে বা ইচ্ছা থাকিলে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পবিত্র ভূভাগে নিম্ন-লিখিত রূপে বলিপ্রদান করিবে ;—

"দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগ-দৈত্যসংঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকাঃ কীট-পতঙ্গকাদ্যা
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্নৈবান্নসিদ্ধি র্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতং
প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেত-
দহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোহন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-
মন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥
চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এষ
যত্র স্থিতা যেহখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং
তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥"

দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, হিন্দু-গৃহস্থ স্বয়ং এক বিন্দুও জলপান করেন নাই ; মাথায় সূর্য্য, সেদিকে দৃষ্টিপাত নাই ; চতুষ্পথে পবিত্র ভূভাগে এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া সমুদয় জীব-গণের উদ্দেশে বলিতেছেন,—"দেবগণ, দৈত্যগণ, পশু-পক্ষিগণ, যক্ষ-সিদ্ধ-সর্পগণ, প্রেত-পিশাচগণ, বৃক্ষগণ, কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকাবৃন্দ, এবং আমার প্রদত্ত অন্নভোজনে ইচ্ছুক জীববৃন্দ, সকলের উদ্দেশেই আমি অন্নদান করিতেছি, ভোজন করিয়া তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করুন। যাঁহারা নিরাশ্রয়, পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু—যাঁহাদিগের কেহ নাই, অন্নসংস্থান নাই,—এই ভূতলে তাঁহা-দিগের তৃপ্তির জন্য আমি অন্নপ্রদান করিতেছি, তাঁহারা তৃপ্তি লাভ করুন। সর্ব্বভূত—বিষ্ণু, অন্নও বিষ্ণু, আমিও বিষ্ণু ; সর্ব্বভূতের মঙ্গল-সম্পাদক এই অন্ন আমি প্রদান করিতেছি।" ইত্যাদি।

"ইত্যুচ্চার্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ॥
শ্ব-চণ্ডাল-বিহঙ্গানাং ভুবি দদ্যাৎ ততোনরঃ।
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্রাঃ পাপযোনয়ঃ॥

উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে সমুদয় ভূতোদ্দেশে ভূতলে অন্নদান করিবে। অনন্তর চণ্ডাল প্রভৃতি সমুদয় নীচজাতি, অতি পাপ-রোগাক্রান্ত নীচ ব্যক্তি, কাক, কুক্কুর,—ইহাদিগের উদ্দেশে ভূতলে অন্নপ্রদান করিবে। কেননা, গৃহস্থ সকলের আশ্রয়।

কিন্তু হায়! সেই সর্ব্বাশ্রয় হিন্দু-গৃহস্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন সকলেই নিরাশ্রয় এবং কাহারও আশ্রয় নহে। যে জাতির গৃহস্থেরা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গকে পর্য্যন্ত অন্নদান না করিয়া আপনি জলস্পর্শ করি-তেন না ; অগত্যা অনিচ্ছাক্রমে অবশ্যম্ভাব-বশতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-হত্যার পাপ-প্রতীকারার্থ যাঁহারা কত চেষ্টা করিয়াছেন ; আমরাও সেই জাতি, তাঁহাদিগেরই কুসন্তান। হিন্দুসন্তানের মধ্যে প্রাতঃকাল হইতে ভোজনে সময় যাপন করেন অনেকে ; পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত কুক্কুটাদি জীব ইচ্ছামত হত্যা করাইয়া স্বীয় রসনার তৃপ্তি সাধন করেন অনেকে ; অথচ তাঁহারাই আবার কাজের লোক হইয়াছেন, গণ্য-মান্য হিন্দু-গৃহস্থ হইয়া-ছেন। এ সব কথা তুলিলেও তাঁহারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। করুন,—ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার যেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন, "কি ছিল, আর কি হইয়াছে ?

বৈশ্বদেব বলিকার্য্যে নিজের অশক্তি হইলে, পুত্র ভ্রাতা শিষ্য প্রভৃতি প্রতিনিধি হইতে পারে। ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরু-ভরণকর্ত্তা, পথিক এবং দরিদ্র,—এই কয় জন ভিক্ষুক। ভিক্ষুক উপস্থিত হইবামাত্র, বৈশ্বদেবান্ন প্রদান করিবে।

বলিপ্রদান হইবার পর অতিথির আগমন-প্রতীক্ষায় ১৫ পল বা ৬ মিনিট অথবা ইচ্ছামত তদূর্দ্ধ কাল গৃহের সম্মুখ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকিবে। পণ্ডিত, মূর্খ, শত্রু, বিদ্বেষ-পাত্র,—যেই কেন এই সময়ে অতিথিরূপে উপস্থিত হউন না, তিনিই সেই গৃহীর স্বর্গ-গমনের সোপান-স্বরূপ। গৃহস্থ তখন সেই অতিথির কোন্ গোত্র, কোন্ শাখা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবেন না ; গৃহস্থ সেই অভ্যাগতকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বলিয়া মানিবেন।

অতিথি, হিন্দু-গৃহস্থের বড় মান্য; "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।" অতিথি গুরুর ন্যায় পূজনীয়। অতিথিকে না দিয়া কোন বস্তু ভোজন করিবে না। অতিথির অসম্মাননায় মহাপাপ ও সমুদায় পূর্ব্ব পুণ্য নষ্ট হয়। সেই আতিথ্যপ্রিয় জাতি এখন মুষ্টি-ভিক্ষা দিতেও বদ্ধ-মুষ্টি হইতেছে। অতিথি-ব্রাহ্মণেরও ভোজন করিবার পূর্ব্বে কুল-গোত্রাদি পরিচয় দিতে নাই। ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণই মুখ্য অতিথি। তবে অতিথি-ধর্ম্মে উপস্থিত ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রকেও যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। ক্ষত্রিয়-অতিথিদিগকে ব্রাহ্মণ-অতিথি-ভোজনের পর ভোজন করাইবে। বৈশ্য-শূদ্রদিগকে ভৃত্যগণের সঙ্গে সযত্নে ভোজন করাইবে। ক্ষত্রিয়াদির গৃহে ক্ষত্রিয়াদি-অতিথিও মুখ্য। অতিথি-সৎকারের পর নিত্য-শ্রাদ্ধ। পিতা জীবিত থাকিলে সনকাদি ঋষিগণের শ্রাদ্ধ করিলেই নিত্যশ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, রোগিণী, গর্ব্বিণী এবং নব-বিবাহিতা রমণীগণকে অতিথিদিগেরও অগ্রে ভোজন করাইবে। শেষে যথাবিধানে গোগ্রাস প্রদান করিবে। অনন্তর গৃহস্থ,—অভ্যাগত কুটুম্ব এবং পরিবার-বর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবেন।

দুই পদে, দুই হস্তে এবং মুখে জল দিয়া দুইবার আচমন করিয়া, আপোশান-ক্রিয়ার পর আহারে বসিবে। আহার করিবার সময়ে কথা কহিবে না। 'হুঁ, হাঁ' শব্দও করিবে না। পূর্ব্বাস্যে ভোজন করাই প্রশস্ত। পিতা বা মাতা জীবিত থাকিতে দক্ষিণ-মুখে ভোজন করিতে নাই। উত্তর-মুখে কাহারও ভোজন করিতে নাই। পশ্চিম-মুখে ভোজন করিতে আছে। তবে নিয়ম থাকিলে স্বতন্ত্র। কোণাভিমুখে ভোজন করিতে নাই। ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া হিতকর, পথ্য, সুরস, তৃপ্তিকর, শাস্ত্রের অনিষিদ্ধ অন্ন প্রীতি-সহকারে ভোজন করিয়া শেষে গণ্ডূষ করিয়া উঠিবে। অনন্তর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্ত-মুখাদি উত্তমরূপ প্রক্ষালন করিবে ও তৃণ দ্বারা দন্ত-লগ্ন অন্নকণাদি দূর করিবে। তবে অপরিহার্য্য দন্ত-লগ্ন বস্তু দন্তবৎ বিবেচনা করিবে। অনন্তর পুনরায় আচমন করিয়া "অন্নং বলায় মে ভূয়াৎ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাম্বুলাদি দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে।

অন্ন, দিবসে একবার ও রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে একবার,—এই দুইবার ভোজন করিতে পারে। ফল-মূল জল অধিক বারও ভোজন করিতে পারে। ইতিহাস ও পুরাণাদি প্রসঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ অর্থাৎ ২॥৹ প্রহরের পর ১ প্রহর অতিবাহিত করিবে। শেষ অর্দ্ধ প্রহর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পবিত্র গল্প-গুজবে কাটাইবে। অনন্তর পবিত্র হইয়া সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত হইতে ২ দণ্ডের মধ্যে যথাকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে। সন্ধ্যার কাল উত্তীর্ণ হইলে, প্রায়শ্চিত্তার্থ দশবার গায়ত্রী জপ করিতে হয়।

রাত্রিতে অতিথি উপস্থিত হইলে, বৈশ্বদেব ও বলিকর্ম্ম করিয়া সযত্নে তাঁহার সৎকার করিবে। দিবসের অতিথি বিমুখ হইলে যে পাপ হয়, রাত্রির অতিথি-বৈমুখ্যে তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক পাপ হয়।

রাত্রিতে ভোজন-সমাধা করিয়া পবিত্র স্থানে পবিত্র শয্যায় শয়ন করিবে। পূর্ব্বশিরা বা দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করা ভাল। প্রবাসী ব্যক্তি পশ্চিমশিরা হইয়াও শয়ন করিতে পারে। উত্তরশিরা হইয়া কাহারও শয়ন করিতে নাই। মস্তক-শিয়রে পূর্ণ-কুম্ভাদি রাখিতে হয়। শয়ন করিবার পূর্ব্বে বিষ্ণু এবং ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিতে হয়। শয্যা দিন থাকিতে পাতিতে নাই। ভোরে আবার শয্যা তুলিতে হয়। আত্ম-শয্যা আপনার নিকট শুচি; পরের নিকট নহে। শূন্য গৃহ, দেবগৃহ, শ্মশান, চতুষ্পথ প্রভৃতি স্থানে ও ধূলি-লোষ্ট্রাদির উপরে শয়ন করিতে নাই। ভিজা কাপড়ে বা উলঙ্গ হইয়া শয়ন করা নিষেধ। বৃক্ষাদির উপর শয়ন করিতে নাই।

দিবসে বা সন্ধ্যায় স্ত্রীগমন করিতে নাই। রাত্রিই স্ত্রীগমনে প্রশস্তকাল। ঋতুর প্রথম তিন দিন ত্যাগ করিয়া ষোল দিন পর্য্যন্ত পুত্রার্থী ব্যক্তি, যুগ্ম দিনে, জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, মঘা, মূলা, উত্তর-ফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র এবং ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী ও সংক্রান্তি ত্যাগ করিয়া পত্নী গমন করিবে। পত্নী সকামা হইলে, ঋতু ভিন্ন সময়েও, কিন্তু ষষ্ঠী প্রভৃতি বাদ দিয়া, দারোপগমন করিতে পারে। ষোল দিন ঋতুকালের মধ্যেও প্রথম তিন দিন, একাদশ দিন ও ত্রয়োদশ দিনে গমন করিবে না। ঋতুলঙ্ঘন করিলে পাপ হয়।

গর্ভাবস্থাতেও অত্যন্ত-কামা পত্নীতে গমন করিতে পারে। নিত্যশ্রাদ্ধ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ব্যতীত শ্রাদ্ধ-দিনে স্ত্রীগমন করিতে নাই। অন্যান্য নৈমিত্তিক কার্য্য উপস্থিত হইলেও তৎপূর্ব্ব দিনে ঋতুর বিহিত যুগ্মদিন ব্যতীত গমন করিতে নাই। হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্ম্ম এই সংক্ষেপে বলিলাম। এতদনুসারে সংযত ভাবে চলিলে, হিন্দু-গৃহস্থ নিঃসংশয় উত্তম লোক লাভ করেন।

এখন সকলের দৃষ্টি ইহলোকের দিকে; পরকালের ভাবনা নাই। কিন্তু স্বল্পসময়-ভোগ্য ইহলোকের জন্য অনন্তকালের পরলোকে উপায়-হীন হওয়া হিন্দু-সন্তানের কার্য্য নহে। হিন্দু-সন্তান! তোমাদের শিরায় এখনও সেই ধর্ম্ম-রক্ত বহমান; তোমাদের মঙ্গলের জন্য পূর্ব্বপুরুষগণ যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কিছুদিনের জন্য তাহা অনুষ্ঠান করিয়া দেখ। এই আমার অনুরোধ।

নতুবা, এখন,—

বিদ্যা সাগরপারমারদচিরাদাচারিতা চোরিতা
ধর্ম্মো নর্ম্ম বভূব কর্ম্ম চ দদৌ মর্ম্মস্পৃশং যাতনাম্।
নীতির্ভীতিমুপাগতা ধৃতিমতী প্রেতে প্রয়াতোন্নতিঃ
কিং ভো বীর্য্যবিবর্জ্জিতা ভরতভূসম্ভূতয়স্তিষ্ঠথ॥

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

নারীতন্ত্র শাসনপ্রণালী।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, আপনারা পৃথিবী শুদ্ধ প্রতাপান্বিত ও প্রতিষ্ঠান্বিত পণ্ডিতগণের পরমপ্রার্থনীয় প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তনা প্রয়োজনীয় বোধ করেন না; প্রত্যুত তাহা আত্যন্তিক অনর্থ ও অনিষ্টের আকর, বিষম বিদ্রোহের বীজ এবং বিপরীত ও বিসদৃশ ব্যবস্থা বলিয়া বিরক্তি প্রকাশই করেন, ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। বিরক্তিরই ত কথা! যখন সাম্য ও স্বাধীনতা সর্ব্বঘটে সমানরূপে শোভমান, তখন সকলেই সম্রাট্ অথবা সকলেই প্রজা। সেই অপরিমেয় মহাপ্রাণীর পরিপালনার্থ তাহাদেরই মধ্যে কতিপয়কে ভাবতের প্রতিনিধি বা পরিপালক বা প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া সেই প্রতিনিধির প্রভুশক্তির সমীপে সকলকে প্রণত থাকিতে হইবে, ইহা যে স্বভাবতই অসহনীয়। তাহার নামই ত রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ। তাহা হইলে আর সুসম্ভোচিত সাম্যের সার্ব্বজনীন সুপ্রসার ও সদ্ব্যবহার হইল কৈ? অতএব আমিও উক্ত প্রথায় আপনাদের সহিত একযোগে ঐকান্তিকী বিরক্তি প্রকাশ করিতেছি।

পরন্তু সাম্য ও স্বাধীনতা বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠরত্ন, সমুদ্র-মন্থনোত্থিত কৌস্তুভ মণি। উহাও অক্ষত রাখিয়া যাহাতে সকলে উক্ত অমূল্য ধনে ধনী হইতে পারেন, আমরা তাহার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। আমি আমার পরম পরিচর্য্যাপটু প্রিয় পতির পরামর্শ পরিগ্রহ করিয়াই অবশ্য এ প্রকৃষ্ট প্রণালীর প্রকাশে ও প্রচারে প্রবৃত্তা হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, আমার উদ্ভাবিত শাসনপ্রণালীর নাম "নারীতন্ত্র শাসন-প্রণালী"।

সকলেই এ প্রণালীকে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী বলিবেন। বাস্তবিক বুঝিলে ইহা সম্পূর্ণ পুরাতন। বিতণ্ডা করিবেন না, আমি বুঝাইতেছি। পুরাণে প্রথিত আছে যে, নারীর চরণধারী নরোত্তম বা প্রেয়সীর পদতলে পুরুষোত্তম। মৃত্যুঞ্জয় শক্তি-তেজেই পরাজিত, পদাশ্রিত! আর নব্যেরা ত নারী-মন্ত্রেরই উপাসক। অতএব ইহা যে চির-প্রচলিত প্রণালী ইহাতে সন্দেহ রহিল না।

এই শাসন-প্রণালীতে কাহারও বিদ্রোহ-বুদ্ধি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কেননা, সজাতীয়ের আধিপত্যই লোকের অসহ্য হয় ও অসহ্যতা সীমা অতিক্রম করিলে তাহা বিদ্রোহের কারণ হইয়া পড়ে। নর ও নারী পরস্পর পৃথক্ জাতি, বিদ্রোহ কেন হইবে?

সকলে বোধ হয়, এ কথায় আন্তরিক সম্মতি প্রদান না করিতে পারেন, বলিতে পারেন, চির-আধিপত্য মাত্রই অসহনীয়। তা নারীরই কি, আর পুরুষেরই কি! কিন্তু এ কথা সর্ব্বথা প্রমাণসিদ্ধ বা দৃষ্টান্তসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ নারীর আধিপত্যস্থলে। সম্পাদক মহাশয় ইহাতে সম্মতি না দেন, কিন্তু আপনারা হে বঙ্গভরসা, প্রিয় বাঙ্গালি-বাবুগণ! এখন হইতে আপনাদিগকেই আহ্বান করিয়া বলিতেছি, আপনারাই বলুন, আপনারা কি মহানারীস্বরূপা মহারাণীর কর্ত্তৃত্বে পরম মনঃপ্রীতির সহিত বাস করিতেছেন না? প্রজাতন্ত্রের নাম উল্লেখ করিবেন না। মহারাণীর শাসনপ্রণালী যদি

প্রজাতন্ত্রই হয়, তাহা হইলে সে প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বাঙ্গালী প্রজার বা সমগ্র ভারতীয় প্রজার কোন সম্বন্ধ নাই। এখন বলুন দেখি, এ কর্ত্তৃত্বে আপনাদের মনঃপ্রীতি কেমন? আমি দেখিতেছি, আপনাদের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়াছে। এরূপ স্থলে কোন সিদ্ধান্ত অবধারণ হয় না; আমিও তাহা করিব না। আচ্ছা, ঝান্সীর লক্ষ্মীবাই, রাজসাহীর রাণীভবানী, ইহাঁদের নাম শুনিয়াছেন। তাঁহাদের শাসনে তাঁহাদের প্রজা কি বিদ্রোহী হইয়াছিল? অবশ্য আমিও ঐ ঐ রাজত্বকে নারীতন্ত্র রাজত্ব বলি না। মূল সিদ্ধান্তটা হৃদয়গ্রাহী করিবার নিমিত্ত তাহারই অদূরবর্ত্তী ও পোষক দৃষ্টান্ত গুলি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। এখন বলুন, ঐ ঐ সজাতীয় রাণীর রাজত্বে আপনাদের সম্মতি ছিল কি না?

আপনারা এবার বিলক্ষণ মুখ লইয়াছেন দেখিতেছি। সকলে সমকালে উত্তরে অগ্রসর হইয়া গোলবৃদ্ধি করিবেন না। আপনাদের সকলের উক্তির স্থূল তাৎপর্য্য ত এই,—"তাঁহাদের প্রজা তাঁহাদের শাসনে বিরক্ত বা বিদ্রোহী হইয়াছিল কি না, প্রত্যক্ষ-প্রমাণাভাবে তাহার সিদ্ধান্ত স্থির হইতে পারে না। হইলেও তৎকালীন প্রজাপুঞ্জের অসভ্যতার সহিত সে শাসনের হয় ত সামঞ্জস্য হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহাদের তাদৃশ রাজত্ব বা একাধিপত্য, মাদৃশ সুশিক্ষিত সভ্যশিরোমণি সম্প্রদায়ের সম্মত কি না, তাহা সূক্ষ্ম সমালোচনার অগ্নি-পরীক্ষায় আমরা অর্পণ করিতে প্রস্তুত নহি। কেননা, তাঁহারা প্রাচীনা রাজ্ঞী, ভক্তির পাত্র; কিন্তু ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, ভক্তিতে সঙ্কুচিত হয় না। অথচ অপ্রয়োজনে অভক্তি-প্রকাশেও আমরা একান্ত কুণ্ঠিত।"

সাধু, সাধু! কিন্তু অবধান করুন, অবধান করুন। এবার আমি যাহা বলিব, তাহা অখণ্ডনীয় সত্য, তাহাই আমার আবিষ্কৃত প্রণালীর প্রধান পোষক, তাহা ঐ স্থূলপ্রণালীর সূক্ষ্মমূর্ত্তি, অথবা তাহাই সর্ব্বস্ব! অতএব বিশেষ বিবেচনার সহিত আপনারা বলুন, আপনারা আপন আপন গৃহিণীর শাসনাধীন কি না? আপনারা যে সুশিক্ষিত সভ্যশিরোমণি সম্প্রদায়, ইহা মনে করিয়াই অবশ্য উত্তর দিবেন। কেননা, ঐ সুশিক্ষা ও সভ্যতার শাসনেই আপনারা কমলিনীকুলের ক্রীত কিঙ্কর! এ কথায় আপনাদের মতভেদ হইবে না বুঝিয়াই আমি প্রস্তাবিত শাসনপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছি। তবে আনুষঙ্গিক অনেক অসার আপত্তি উত্থাপন করিবেন, তাহা বুঝিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রধান কথাটী এই যে, সকলে 'স্বীয় স্বীয় সীমন্তিনীর শাসনাধীন হইলেও সাধারণ নারীজাতির আধিপত্যে সম্মত হইবেন কেন? আপন আপন স্ত্রী ও সাধারণ নারীজাতি ত এক পদার্থ নহে?

কিন্তু এই প্রধান কথাই আমার নিকট অতি তুচ্ছ, অতি অপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আপনারা তর্কের খাতিরে সুশিক্ষার, সৎদৃষ্টান্তের অসম্মান করিতেছেন এবং হয় ত সূক্ষ্ম-ভেদের নিমিত্ত সত্যেরও কিয়দংশে অপলাপ করিতেছেন। তর্কেই বা কি ত্রুটি পড়িতেছে? প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় সীমন্তিনীর শাসনাধীন হওয়াও যাহা, সাধারণে সাধারণ-নারীজাতির আধিপত্যের অধীন হওয়াও তাহা। তবে তাহাতে বিধবাগণ বাদ পড়িতেছেন। কিন্তু আপনাদের শিক্ষা কি বলে? নারীজাতিই সম্মানার্হ; এমন কি, তাঁহাদের সহিত পুরুষকুলের সেব্য-সেবক সম্পর্ক। তাহার উপর সাম্যনীতির প্রচারে এই পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, নারীকুলে সকলে সমান। দেখুন, তাহা হইলে নারীজাতি-সাধারণের কর্ত্তৃত্বের অবশিষ্ট কি রহিল?

দৃষ্টান্ত কি বলে, শিব-বিষ্ণুর ব্যাপারে তাহা সম্পাদক মহাশয়কে সর্ব্বাগ্রেই বুঝান হইয়াছে। আপনাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত আমি অগষ্ট কমৃটির উল্লেখ করি। ইহার উপর অবশ্যই আপনাদের আর আপত্তি চলিবে না।

সংখ্যাধিক্যেও নারী-কর্ত্তৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এবারের লোকগণনায় স্থির হইয়াছে যে, ভারতভূমে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ বেশী। আর কি চান?

বাস্তবিক, মূলযুক্তিই এই যে, নারীর কর্ত্তৃত্ব এ জগতে একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য। পূর্ব্বাবধিই নারী,—'শক্তি' বলিয়া স্বীকৃত। তবে পুরুষের অস্বাভাবিক আধিপত্যে ঐ শক্তি লুপ্ত বা নামমাত্রে অবস্থিত আছে। এক্ষণে সেই শক্তিপুঞ্জ বিকসিত ও সমবেত হইলে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব কত বাড়িবে! ঐ কর্ত্তৃত্বের সময়ও সমুপস্থিত। পূর্ব্বেও দুর্দ্দান্ত দৈত্যাদি-দলনকালে এইরূপ শক্তি-সম্মিলন হইয়াছিল।

এই শক্তিকর্তৃত্ব যে সুসহ বা সুখসেব্য, আপন আপন পত্নী দ্বারা আংশিকরূপে তাহা পরীক্ষিতই হইয়া আছে। এক্ষণে প্রণয়শাসন ও রাজশাসন-জনিত কর্তৃত্ব সম্মিলিত হইলে তাহা বেদ-বাক্যাপেক্ষাও শিরোধার্য্য হইয়া উঠিবে। * অতএব হে শিক্ষিত সম্প্রদায়! আপনাদের সুমতি-সঞ্চার হউক। আমার আবিষ্কৃত নারীতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হউক।

ভরসা করি, কলিকাতাস্থ "স্ত্রী-সমিতি" এ কার্য্যে একমতি হইয়া স্বকীয় সমগ্র সম্প্রদায়কে সুখী করিবেন এবং "বাবুরাও" অবশ্য ইহার বিজয় ঘোষণা করিবেন।

নব-নবতি সালে নব নব প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া যে সমুচিত, তাহা উহার নামানুসারেই নিশ্চিত হইতেছে। অতএব নব্য ও নবীনাগণের নিকটে বর্ষের নবীন মাসেই এই অভিনব শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি।

এই প্রণালীতে প্রীতির স্রোত প্রকৃষ্টরূপে প্রত্যেক পাত্রে প্রধাবিত হইবে। জেনানা জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সদয়ভাবে কার্য্যবিধি ও দণ্ডবিধি-সম্মত বিচার বিধান করিতে থাকিবেন। পাণিনি-প্রোক্ত "আচার্য্যা" পদ এতদ্দিনে অলঙ্কৃত হইবে। কেরাণীকুলের কুইল তো কমলিনীকুলের কর-কমলে কমনীয়রূপেই ক্রীড়া করিতে থাকিবে। প্রেমিকাগণ পেয়াদা ও পিয়নগণের পদবীও পরিশোভিত করিতে থাকিবেন। আহা, তখন কি সুখের দিনই হইবে! আর কেহ কাহাকে কটু কথা কহিবে না। অহঙ্কার করিয়া কেহ কাহাকে ঘৃণা করিবে না। মিথ্যা, প্রতারণা, চৌর্য্য একবারে দূর হইয়া যাইবে। ঘোরতর নির্দ্দয়ের কর্ম্ম যে যুদ্ধ, তাহার আর কথাও থাকিবে না। পৃথিবী আর মনুষ্যরক্তে দূষিত হইবে না। তখন সকলেরই অন্তঃকরণ দয়াতে পরিপূর্ণ হইবে। সকলেরই নয়ন আহ্লাদে প্রফুল্ল হইবে। সকল লোকই একবাক্য হইয়া এই সুখের অবস্থার প্রশংসা করিতে থাকিবে। অতএব যাহাতে এরূপ সুখের অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সকলেরই সর্ব্বতোভাবে সযত্ন হওয়া উচিত।

শ্রীমতী এস্, পি, বি।
নারীস্বত্বসংরক্ষণী সভা—মেছুতলা।

লর্ড মেয়ো।

They gauged him better, those who knew him best,
They read, beneath that bright and blithesome cheer
The statesman's wide and watchful eye, the breast
Unwarped by favour and unwrung by fear.

রাজ-প্রতিনিধিদিগের সাময়িক পরিবর্ত্তনে,—এক অর্থে,—ভারত-সাম্রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্রাট। ভারতে বৃটিশ-শাসন-নীতি অথবা শাসন-নীতির মূল সূত্র যদিও সর্ব্বথা অপরিবর্ত্তনীয়, তথাচ সে নীতির সাময়িক নিয়ন্তাদিগের স্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন শাসন-কার্য্যে যৎকিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। সে বৈচিত্র্য অতি সূক্ষ্ম এবং সামান্য; অতএব অধিকতর অনুশীলনীয়।

বৃটিশ শাসন ও শাসন-নীতি;— তাহার পরিণাম ও প্রজার আকাঙ্ক্ষা।

বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের বিপুল শাসন-যন্ত্র। শাসন-যন্ত্র বিপুল, বহুব্যাপক, বৈচিত্র্যহীন এবং এক। একই যন্ত্রে এবং একই যন্ত্রের একই সুরে বিশাল ও বহু-বৈচিত্র্যময় ভারত-ভূমি শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। একই গঠন, একই রূপ, একই বাদ্য—একই বাদ্যের একই সুর সর্ব্বত্র;—উচ্চ হিমাদ্রিশিখরে যদ্রূপ, নিম্ন বঙ্গোপসাগর-গর্ভেও তাদৃশ—বৃটিশ-শাসন-যন্ত্র একতান বাদ্যময়। উহার সুর-বৈলক্ষণ্য,—রূপ ও রস-বৈচিত্র্য কুত্রাপি নাই;—ভারত-সাম্রাজ্যের "আব্রহ্ম স্তম্ব" অবধি উহা একই তানে অহরহ বাজিতেছে। নিজের বৈচিত্র্য ত কিছু মাত্রই নাই; প্রত্যুত অপরের বৈচিত্র্য-বিনাশ-শক্তি এই যন্ত্রে সমূহ ভাবে বিদ্যমান। যে কিছু, যাহা কিছু এবং যত কিছু এই যন্ত্রের অভ্যন্তরে নিপতিত হয়, নিপতিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাদের বৈচিত্র্য বিলুপ্ত ও যন্ত্রস্থিত "একমেবাদ্বিতীয়" সুরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায়। শাসন-যন্ত্রের এবম্প্রকার সম-সুরময় সংগঠন শাসন-কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযোগী,—অতীব আবশ্যক। শাসন-যন্ত্রের সম-সুরময়তা না থাকিলে, সুবিস্তীর্ণ ভারত-রাজ্য একচ্ছত্রাধীন সাম্রাজ্যে পরিণত

লর্ড মেয়ো।

হইতে পারিত না; বৃটিশ-হস্তে উহা সুশাসিত, সুপালিত ও সংরক্ষিতও হইত না;—ইহা নিশ্চয়। শাসন-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থেই শাসন-যন্ত্রের এই প্রকার গঠন,—এইরূপ বৈচিত্র্য-বিহীনতা এবং বিপুলতার অভ্যন্তরে অভূতপূর্ব্ব একতা। বৃটিশ-রাজনীতি সমগ্র রাজ্য এক কেন্দ্রে আকর্ষণ ও একাকরণ করিয়া শাসন-কার্য্য সম্পন্ন করে। রাজ্যমধ্যে বহুভাগ, বিভাগ, উপভাগ এবং উপভাগেরও আবার বিবিধ ভাগ-বিভাগ আছে বটে, আর তাহাও আছে শাসন-সৌকর্য্যার্থে; কিন্তু সে সমস্তই এক-কেন্দ্রস্থিত শক্তি দ্বারা সঞ্চালিত, একই যন্ত্রস্থ সুর-সংযোগে নিনাদিত। বৃটিশ-রাজ্যের শাসন-শরীর বিশ্লেষ করিলে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক শিরা, ধমনি, অস্থি পৃথক্ করা যাইতে পারে, পৃথক্ করাই রহিয়াছে; পৃথক্ থাকিয়াও তাহারা সমস্তই একই শরীরে সংযুক্ত, একটী অণু-পরমাণুও ক্ষণেকের জন্য শরীর হইতে বিযুক্ত নহে। বৃটিশ-শাসন সম্পূর্ণ রূপে 'সাংশ্লেষিক' অর্থাৎ (*Synthetic*) যেন মাধ্যাকর্ষণে সমগ্র সাম্রাজ্যটা শাসন-যন্ত্রের সর্ব্বমহাকেন্দ্রাভিমুখে টানিয়া রাখিয়াছে! কি অপূর্ব্ব কৌশলে, কি গভীর নীতি-নৈপুণ্য সহকারে এই মহাযন্ত্রবিনির্ম্মিত! এরূপ যন্ত্র আর কখনও কোনও জাতি গঠিত করিতে পারিয়াছিল কি না ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। প্রাচীন ভারত, রোম, গ্রীস,—প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য বহুতর সাম্রাজ্য —যাহাদের গৌরব-গীতিতে পুরাবৃত্ত পূর্ণ,—তাহাদেরও কেহ কখনও এ প্রকার বিস্তীর্ণ, সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ, সর্ব্বগ্রাসী এবং সম-সুরময় শাসন-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। "কলে কাজ" বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কলে সাম্রাজ্য-শাসন, বিশেষতঃ বিজিত, বিজাতীয়,

বিদেশীয়, বহুজাতির ও বহু প্রকৃতির বিবিধ স্বার্থ-সংযুক্ত বিস্তীর্ণ রাজ্য-শাসন,—পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বোধ করি, এই প্রথম। চঞ্চলমতি স্বদেশীয় যুবকগণ বৃটিশ-শাসনের সমালোচনা করেন, নিন্দা করেন, তাহার প্রতি শ্লেষ ও ব্যঙ্গ করেন, তাহার দোষ ও দুর্ব্বলতা উদ্ঘাটন করেন, উচ্চতম পদস্থ শাসয়িতারও অনুপযুক্ততা প্রতিপাদন করিতে সাহসী হন ;—কিন্তু এই বৃটিশ-শাসন ব্যাপারটী যে কি বিপুল, তাহা বোধ করি, কখনও বারেক বিবেচনা করিবার অবকাশও পান না। ইহার বিপুলতা, ইহার কৌশল, ইহার নৈপুণ্য, ইহার কাঠিন্য, ইহার প্রকৃতি, প্রক্রিয়া, গতি ও প্রণালী এবং সর্ব্বোপরি ইহার মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য যে কি, তাহা এখনও অভিনিবেশ পূর্ব্বক এ দেশীয়দিগের অনুশীলনের বিষয়। মস্তিষ্কে এতাদৃশ তেজস্বী ব্যক্তি এদেশে আজও কেহ জন্মেন নাই, যিনি এই শাসন-তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে সমর্থ। স্বদেশীয়ই হউন, আর বিদেশীয়ই হউন, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের পরম শত্রুকেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে বৃটিশ শাসন স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র হইলেও সুশাসন ; মোটের উপর ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসন সহস্রাধিক বৎসর মধ্যে এদেশে কখনও ছিল না। পরন্তু প্রাচীন পুরাবৃত্তে হিন্দু-রাজত্বের যে সকল স্বপ্ন-কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনাতেও বৃটিশ-শাসিত বর্ত্তমান-ভারতরাজ্যে প্রকৃতিপুঞ্জ কোনও কোনও বিষয়ে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি লাভ করিয়াছে, অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। বৃটিশ-শাসন যে সুশাসন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; সন্দেহ হইতেই পারে না। বৃটিশ রাজ্যের সুশাসনের সাক্ষী সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে,—যেদিকে নয়ন ফিরাই, দেখিতে পাই,—শান্তি, শৃঙ্খলা, শ্রম, প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সুবিধা ; সাধারণতঃ সর্ব্ব বিষয়েই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি। এই সকল যদি সুশাসনের সাক্ষী এবং লক্ষণ না হয়, তবে সুশাসন পদার্থটা যে কি, আমি জানিনা,—তাহা কাহারও আমাকে বলিয়া দিতে হইবে। স্বীকার করি, ইংরেজ-রাজ্যে কচিৎ বিচার-বিভ্রাট ঘটে ; কিন্তু বিভ্রাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিসে না ঘটে, শত সাবধানতার মধ্যেও ত সঙ্কট অলক্ষ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে মনস্বী ব্যক্তির জীবনী এবং শাসন-নীতি বিবৃত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, যাঁহার বিশ্ববিখ্যাত নাম প্রবন্ধের শীর্ষদেশে অঙ্কিত, তাঁহারই মহা মূল্যবান জীবন যেরূপে এবং যে অবস্থায় সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই শোচনীয় এবং সাংঘাতিক ঘটনাই স্মরণ কর না ? শরীরে রোমাঞ্চ হয়,—দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইল না। শত সাবধানতা ও সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও সঙ্কট ঘটে ; বৃটিশ-রাজ্যের বিশালতার সহিত তাহার বিচার-বিভ্রাটাদির বিরলতার তুলনা করিয়া রাজ্যের সুশাসন সম্বন্ধে কে সন্দিহান হইতে পারেন ? পুনশ্চ ইহাও স্বীকার করি যে, স্থল বিশেষে ব্যবস্থাপকগণ হয় ত সর্ব্ববাদি-সম্মত সুব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ হন না ; কিন্তু তাহাতেও সুশাসনের অভাব স্বীকার করা যায় না। কারণ "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। মনুষ্য যত বড় মনস্বীই হউন না, ভ্রান্তির অতীত নহেন। তা যেদিক দিয়াই দেখ, বৃটিশ-শাসনকে সুশাসন বলিতেই হইবে। তবে সে শাসনের শেষ ফল যে কি দাঁড়াইবে, তাহার প্রকৃত পরিণাম যে কি প্রকার ঘটিবে, তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভারতীয়-জাতি আর দুই বা তিন শতাব্দী পরে কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইবে,—এ তত্ত্বের মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। এ সম্বন্ধে কোনও একটি অনুমানে উপস্থিত হওয়াও সুকঠিন। এ বিষয়ে বিশিষ্ট বৃটিশ-রাজনীতিকগণ কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত সংগঠন করিতে পারিয়াছেন কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ ; কারণ তাদৃশ কোনও সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে কখনও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। এ দেশীয় লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজি-শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চিন্তা-পরায়ণ তাঁহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক উপরোক্ত বিষয়ে চিন্তা করিয়া দুই প্রকার অনুমান করেন। সে অনুমানদ্বয় খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত না হইলেও তাহার এক আভাস প্রসঙ্গ ক্রমে আমি কিঞ্চিৎ পরে দিতেছি।

বৈচিত্র্য-বিহীন বৃটিশ-শাসন-দণ্ডের এক করণ-শক্তি সমগ্র ভারত-রাজ্যকে এক-কেন্দ্র করিয়াছে, এবং সমস্ত ভারতবাসীকে এক-কেন্দ্রাভিমুখে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে। যাঁহা

বলেন, বৃটিশ-রাজনীতির মূলমন্ত্র "*Divide and rule*" অর্থাৎ "বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া শাসন কর"; তাঁহারা হয় অনভিজ্ঞ, নয় ইংরেজের শত্রু—নতুবা কথাটা অন্য অর্থে ব্যবহার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ-রাজ্যের শাসন-নীতি একীকরণোন্মুখিনী এবং বৈচিত্র্য-বিনাশিনী। একীকরণ এবং বৈচিত্র্য-বিনাশ শাসনে এবং শিক্ষায়,মুখ্য ফলে নহে;—শাসনের এবং শিক্ষার গৌণ ফল হইতেছে একীকরণ এবং বৈচিত্র্য-বিনাশন। শাসন একই প্রকার; শিক্ষাও একই প্রকার সর্ব্বত্র। ইউনিভার্সিটী ও স্কুল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু শিক্ষা এক। পঞ্জাবী শিখেরও যে শিক্ষা, বাঙ্গালী বাবুরও সেই শিক্ষা। মারহাট্টার শিক্ষা যে প্রকৃতির, মাদ্রাজীরও সেই প্রকৃতির শিক্ষা। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান,—সকলেই এক প্রণালীতে শিক্ষিত হন। নর এবং নারী উভয়েরই একই প্রকৃতির শিক্ষায় একই প্রণালী মতে শিক্ষিত এবং শিক্ষিতা হইবার বিধি আছে, বন্দোবস্তও আছে। ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সত্ত্বেও রাজ-ভাষা সকলেরই সাধারণ-ভাষা হইতেছে, কারণ এখনকার অক্ষরজ্ঞ মাত্রেই রাজ-ভাষায় শিক্ষিত,—অন্ততঃ রাজভাষার ভাবেও দীক্ষিত। একই প্রকৃতির শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষিত মাত্রেরই চিন্তা প্রায় একই প্রকারের স্রোতে প্রবাহিত। ইষ্টানিষ্ট উভয়ই ইহাতে ঘটাইতেছে। ইহার উভয়বিধ ফল-নিচয়ের মধ্যে অব্যবহিত একটা ফল—শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মৌলিকতার অভাব, আমার বিবেচনা হয়। একজাতীয় শিক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের চিন্তা ও চিন্তা-পদ্ধতি একই প্রকার প্রবাহে প্রবাহিতা, সুতরাং তাহাদের জাতিগত এবং ব্যক্তিগত বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হইলেও বিলক্ষণ হ্রস্বীকৃত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? পরন্তু ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোকেরই চিন্তা এবং মনোভাব পরস্পরে আদান-প্রদান করিবার শত বিধ সুবিধা; সর্ব্বত্র-ব্যাপী এবং সমীরণবৎ শীঘ্র-গামী অগ্নি-শকট প্রভাবে ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির, এক এক শাসন-কেন্দ্রে একত্রে সংমিলন; ইংরেজী ভাষার সাধারণত্ব-নিবন্ধন পরস্পরে এক জাতিবৎ কথোপকথন;—শিক্ষা ও শাসন গুণে একীকরণের বিবিধ ব্যবস্থা এবং বহুল বন্দোবস্ত। অলক্ষ্যে একীকরণ ঘটিতেছেও বিলক্ষণ। উৎকল-বাসী আফ্ গান-প্রান্তস্থ ইংরেজী-নবিশ ভারতীয় প্রজাকে "গুড্ মর্নিং" করিয়া, করে কর-মর্দ্দন করে। হিন্দু, মুসলমানে ও খৃষ্টানে এবং নিরা-মিষাশী বৌদ্ধে ও জৈনে এক "টেবিলে" বসিয়া "হাজিরা" খায়!! আর অধিক কি চাও? এ দৃশ্য অভূতপূর্ব্ব। ইহা ইষ্ট কিংবা অনিষ্টের আকর, তাহা জানি না। কিন্তু এ দৃশ্য সত্য, প্রত্যক্ষ, নিত্য সংঘটিত এবং নিয়ত জাগ্রত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রাজ-নীতিক ইতিহাসে এমনটী কখনও ঘটিয়াছে কিনা জানি না। যত দূর জানি, তাহাতে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই; কখনও ঘটিবে কিনা, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন; ইংরেজ নিজেও তাহা জানেন না। অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য,—ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির একীকরণ!! ইহা ইংরেজ ভিন্ন আর কেহ কখনও করিতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। ইংরেজ-রাজনীতি কিন্তু স্বতঃসাবধান, নিয়ত উদার এবং সতর্ক। অতি অল্প সংখ্যক লোকেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও সভ্যীকৃত হইয়া স্বজাতীয় পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও জাতিত্ব স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের সহিত একীকৃত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ইংরেজ-রাজ-নীতি স্বভাবতই কাহারও ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং আইন-অবিরোধী স্বাধীনতা সংস্পর্শ করে না। "*Secular*" অর্থাৎ "ধর্ম্ম-অসংস্পর্শিনী সাংসারিকী" শিক্ষা দিতেছি, যাহার যদ্রূপ ইচ্ছা করিতে পারে, আমি ইংরেজ-রাজনীতি—কোনও কথা কহিব না; আমার কৃত উদার-আইন-বিরোধী না হইলেই কাহারও কোন কার্য্যে আমি কোনও কথা বলি না; যাহার যে পথে ইচ্ছা যাইতে পারে; আমি সে বিষয়ে অসাড়, নিস্পন্দ। আমি কখনও কাহারও ধর্ম্মে, সমাজে এবং ব্যক্তিগত আইন-সঙ্গত স্বাধীনতায় ও বাসনায় অন্তরায় হই না; আমি আমার বিবেচনায় যাহা সৎ এবং সন্নীতি-সংযুক্ত সেই শিক্ষাই প্রদান করি; সে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অথবা অশি-ক্ষিত থাকিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা অনায়াসেই করিতে পারে, আমার তাহাতে আপত্তি নাই,—তাহাতে আপত্তি করিবার আমার অধিকারই নাই। আমি যাহা চাই, তাহা কেবল আমার আইনের মর্য্যাদা এবং আইন-সঙ্গত কার্য্য; তাহা

ব্যতীত আমি ইংরেজ-রাজ-নীতি—আর কিছুই চাহি না; সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছা ও স্বাধীনতা অনুসারে কার্য্য করুক,—আমি একটী কথাও কহিব না।" ইংরেজ-রাজ-নীতির নিয়ম এই! কি আশ্চর্য্য, কি অভূতপূর্ব্ব এবং কি উদার এই নিয়ম! রাজনীতিক রহস্য এবং নিপুণতা এ নীতির প্রত্যেক অণু-পরমাণুতেও ওতপ্রোত ভাবে প্রবিষ্ট!!—"শাসন-সমতা ব্যতীত অন্য একীকরণ করা আমার ইচ্ছাও নয়, উদ্দেশ্যও নয়; কারণ, এ ইচ্ছায় এবং উদ্দেশ্যে আমার কিছু মাত্র ইষ্ট নাই, বরং অনিষ্ট আছে। কিন্তু যদি তোমাদের নিজের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য এবং ইষ্ট থাকে, তোমরা অনায়াসেই একত্রীভূত হইতে পার; আমার তাহাতে আপত্তি নাই; আমি সে পক্ষে সকল পথই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি।"

ইংরেজের শাসন এবং শিক্ষা-নীতি সংক্ষেপতঃ এই। ইহারা (নীতিদ্বয়) পদ্মপত্রস্থিত বারির ন্যায় নিজে নির্লিপ্ত অথচ ইহাদের দ্বারা সহস্রবিধ বিভিন্ন জাতি এবং প্রকৃতি অলক্ষ্যে এককেন্দ্রে আনীত হইতেছে! বন্য, শাসন-মাত্র অসহিষ্ণু, সাঁওতাল, কুকি, নাগর, হুনজা, আফরিডি আদি সঙ্কটময় সীমান্তস্থ পার্ব্বত্যেরাও ভারতীয় বৃটিশ-পতাকার বশীভূত;—তাহাদের বন্য বৈচিত্র্য হারাইয়া তাহারা ইংরেজী স্কুলে আর্য্যদিগের সহিত একত্রে অধ্যয়ন করিতেছে। কি আশ্চর্য্য, কি অসাধারণ, এই একীকরণ ব্যাপার,—এই নিগূঢ় রাজনীতিক রহস্য! বহুধা বিভক্ত, আভ্যন্তরীণ-বিসংবাদ-বিচ্ছিন্ন, বহুবর্ণ, বহুজাতি, বহুভাষা ও বিবিধ স্বার্থ-সঙ্কুল প্রাচীনাদপি প্রাচীন-বয়স্ক বিশাল ভারতবর্ষে যাহা কোনও কালে ঘটে নাই; যাহা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে একদিনের জন্য আংশিক রূপে সম্ভাবিত হইতে শতবিধ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন বৈচিত্র্য-বিহীন বৃটিশ-শাসনে চক্ষের উপর বিদ্যমান! ইহা কি একতা অথবা একীকরণ? যাহাই হউক, ইহা অতি উজ্জ্বল জাজ্বল্যমান ঘটনা। ইহা কেবল ইতিহাস-অধ্যায়ী ও রাজনীতি-আলোচকের অনুশীলনীয় নহে; ইহা জড়-বিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞান ব্যবসায়ীদিগেরও গভীর চিন্তার বিষয়। ইহারই ফল,—অধুনাকার ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস; ইহারই ফল,—তথা-কথিত রাজনীতিক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি (*Political Hindooism and Nationality*) গঠনের চেষ্টা; ইহারই ফল,—প্রজা-প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির প্রয়াস এবং প্রার্থনা। পক্ষান্তরে ইহারই ফল,—ইংরেজী-শিক্ষিতদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের পুনরালোচনা ও পুনরুদ্দীপনা,—প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম ও শাস্ত্রীয় সংস্কারাদি অধিকতর সজীব করিবার উদ্যোগ। কিন্তু ইংরেজ-শাসনের এই একীকরণ আসক্তির শেষ ফল যে কি ফলিবে, তাহা এখন অনুমানেরও অতীত তাহার মীমাংসা সুদূর ভবিষ্যৎ ব্যতীত, বোধ করি, আর কেহই করিতে পারিবে না। তবে এ বিষয়ে এ দেশীয় লোকদিগের মধ্যে দুই পক্ষের দুই প্রকার অনুমান আছে, তাহার আভাস আমি "দিব"—অগ্রেই বলিয়াছি। এক শ্রেণীর লোক অনুমান করেন যে, "বৃটিশ-শাসন-নীতির এই একীকরণ-প্রণালী দ্বারা ভারতে একটী রাজনীতিক জাতিত্ব (*Political Nationality*) এবং সেই জাতিত্ব সূত্রে সৌহৃদ্য-জনিত একতা সৃষ্ট হইবে এবং তদ্দ্বারা ইংরেজ-অধিকারাধীনে থাকিয়াও ভারত-রাজ্যে ক্রমে প্রজাতান্ত্রিক শাসন সংস্থাপিত হইবে।" পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অনুমান এই যে, "ইংরেজশাসন-নীতির একীকরণ গতিতে ভারতীয় জাতি-নিচয়ের জাতি-পার্থক্য ও বর্ণ-বৈচিত্র্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। প্রকৃতি-পুঞ্জের পারস্পরিক জাতি-পার্থক্য ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করিয়া ভারতরাজ্য শাসন করিতে পারিলেই ইংরেজ-রাজের গৌরব বৃদ্ধি হইবে তদ্দ্বারা বৃটিশ-শাসন স্থায়ী হইবে এবং সে শাসন প্রজাবর্গের পক্ষে সুখের হইবে। প্রজাতন্ত্র, প্রতিনিধিপ্রণালী বা পার্লামেণ্ট কিছুরই প্রয়োজন নাই। রাজতন্ত্র শাসনই উত্তম; রাজা,—প্রজাদিগের স্বধর্ম্ম, স্বজাতিত্ব এবং বর্ণ-বিভাগ সংরক্ষণ করেন, ইহাই কেবল প্রার্থনীয় এবং ইহাই সুশাসয়িতার প্রধান কর্ত্তব্য।" দুই শ্রেণীর লোকের এই দুই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা। দুই শ্রেণীর লোকই সম্পূর্ণরূপে রাজভক্ত ও সমভাবে বৃটিশ-শাসনের পক্ষপাতী। তবে দুই শ্রেণীর দুই প্রকার আকাঙ্ক্ষা। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরা ইংরেজের অনুরূপ ও ইংরেজ-তুল্য রাজনীতিক

অধিকার প্রাপ্ত হইতে প্রয়াসী এবং শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজাবর্গ স্বজাতিত্ব সম্পূর্ণভাবে অটুট রাখিয়া ইংরেজ-শাসনে শাসিত হইতে অভিলাষী। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক; পরন্তু ইহাঁদেরই আকাঙ্ক্ষা অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত এবং স্বাভাবিক বলিয়া আমার ধারণা। ইহাও আমার ধারণা যে, বুদ্ধি-বিশারদ বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট প্রজার যুক্তি-সঙ্গত আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করিবেন। চিরকালই তাহা যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়াছেন।

কথায় কথায় প্রসঙ্গ ক্রমে আমি অনেক কথাই, বিষয়ের গুরুত্ব বোধে, কহিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মূল কথা এখনও স্পর্শ করা হয় নাই। কিন্তু শাসয়িতাদিগের বা শাসয়িত্-বিশেষের শাসন-কীর্ত্তন ও সমালোচন কল্পে সাধারণতঃ মূল শাসন-নীতির আলোচনা অত্যাবশ্যক। অতএব উপরোক্ত আলোচনা অতি বিস্তৃত হইলেও অপ্রাসঙ্গিক নহে। বৃটিশ শাসন 'বৈচিত্র্য-বিহীন' ও 'বৈচিত্র্য-হর' আমি যে অর্থে বলিয়াছি, তাহা বৃটিশ-শাসনের স্বরূপেরই পরিচায়ক,—সে অর্থ প্রকৃত গুণেরই বিবৃতি; আশা করি, সকলেই শব্দ দুইটীর সদর্থ গ্রহণ করিবেন।

বৃটিশ-শাসন বৈচিত্র্য-বিহীন; অথচ বিস্ময়কর। উহার বিপুলতা ও বিপুলতার মধ্যে সর্ব্বত্র-ব্যাপী, সমসূত্র-যুক্ত সূক্ষ্ম,—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শৃঙ্খলা দেখিয়া বস্তুতই স্তম্ভিত হইতে হয়।

উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-নীতির সাময়িক নিয়ন্তাদিগের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-নিবন্ধন, শাসন-নীতি সর্ব্বথা অপরিবর্ত্তনীয় থাকা সত্ত্বেও, শাসন-কার্য্যে যৎকিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে,—রাজ-স্থানীয় রাজ-প্রতিনিধিদিগের ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য-নিবন্ধন এবং আরও দুইটী কারণে। প্রথম,—রাজ্যের অবস্থা এবং স্থান-কাল-পাত্রাদির শনৈঃ পরিবর্ত্তন; দ্বিতীয়, তন্নিবন্ধন শাসন-নীতির ক্রম-বিকাশ। এই কারণত্রয়ে যে সকল বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা অবশ্য অতি ধীরে ধীরে এবং মৃদু-পদ-সঞ্চারে। তবে বিশেষ বিশেষ শাসয়িতা ও রাজকর্ম্মচারীদিগের চিত্ত-চাঞ্চল্য ও মস্তিষ্ক-তারল্য হেতু সময়ে সময়ে শাসন-সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত জন্মিয়া যে বৃহৎ "বৈচিত্র্য" ঘটে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; কারণ তাহা মূল শাসন-নীতির অন্তর্ভূত নহে।

বৈচিত্র্য-বিহীন বৃটিশ-শাসন একটানা স্রোতে সমানে চলিয়াছে; অলক্ষ্যে অতি শনৈঃ-শনৈঃ তাহাতে পরিবর্ত্তন সঞ্চার হইয়া শাসন-নীতি বিকাসিত করিতেছে। দ্রব্য একই, তবুও কোম্পানী বাহাদুরের আমলের হিন্দুস্থানে ও পরম পূজনীয়া সম্রাজ্ঞী-মাতার শাসিত ভারতবর্ষে প্রচুর প্রভেদ আছে। সম্রাজ্ঞী-শাসিত ভারতেও শাসয়িত্-ভেদে শাসন-পার্থক্য দ্রষ্টব্য। লর্ড ডালহুসীর ও লর্ড রীপনের শাসনে 'জমিন আসমান" তফাৎ; অথচ রাজ-নীতির 'নড়-চড়" হয় নাই। পুনশ্চ লর্ড লরেন্সের শাসন-কাল হইতে লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসন পর্য্যন্ত এতাবৎ কালের মধ্যেও শাসন-শরীরে কত পরিবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইংরেজ রাজ-নীতির শনৈঃ সমাগত ক্রম-বিকাশ অনুশীলন করিতে হইলে,—রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ ভারত-সাম্রাজ্যের সাময়িক সম্রাট গবর্ণর-জেনারালদিগের শাসনেতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক। এ আলোচনায় অনেক লাভ।

শাসনেতিহাস আলোচনার আবশ্যকতা।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য হইলেও, রাজ-স্থানীয় হইয়া বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের রাজ-সিংহাসন সুশোভন করিতে যাঁহারা নিয়োজিত হন, তাঁহারা অসামান্য ব্যক্তি। অসামান্য;—তজ্জন্যই রাজবংশ সম্ভূত, রাজকুলোদ্ভব না হইয়াও রাজা হন। অসামান্য ইহাঁরা জ্ঞানে, গুণে, বুদ্ধিমত্তায়, বিদ্যায়, শীলতায়, শ্রমে, সহিষ্ণুতায়, দৃঢ়তায়, কার্য্যদক্ষতায় ও তৎপরতায় এবং রাজনীতি-নৈপুণ্যে; সর্ব্বপ্রকারেই ইহাঁরা অসামান্য। মনস্বিতাই ইহাঁদিগকে অসংখ্য মনুষ্যের শাসক ও পরিপালক করিয়া রাজসিংহাসন প্রদান করে। রাজবংশ-সম্ভূত অনেক রাজা অপেক্ষাও ইহাঁরা মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। অতএব সাধারণ-শ্রেণীর পাঠককেও বলা বাহুল্য যে, ইহাঁদিগের জীবন-চরিত্র, শাসনেতিহাস ও শাসন-নীতি পর্য্যালোচনায় এক দিকে যেমন জ্ঞান-বৃদ্ধি, চরিত্র-গঠন, মানসিক উন্নতি, বুদ্ধির বিকাশ ও কৌতূহল-পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা;

অপর দিকে তেমনি নিগূঢ় রাজনৈতিক রহস্য নিচয়ের যথাসম্ভব আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব-বোধ দ্বারা ইতিহাস-পাঠের প্রকৃত ও আকাঙ্ক্ষণীয় ফল লভনীয়। রাজ-প্রতিনিধিদিগের কার্য্যাবলীই আমাদের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাস। এ ইতিহাস আলোচনা ব্যতীত বর্ত্তমানে সংঘটিত ঘটনাবলী বুঝিয়া উঠাও অসাধ্য। এক অর্থে,—বর্ত্তমান, অতীতেরই অভিব্যক্তি; বর্ত্তমানের ব্যস্ততায়, আদৌ আলোচনা না করিয়া, ইতিহাসের অর্গলে অতীতকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে,—বর্ত্তমান সম্বন্ধেও বস্তুগত্যা বোধ জন্মে না। ইতিহাস কেবল তাহার অস্তিত্বের জন্য নহে, কেবলমাত্র স্কুলে অধ্যয়নের জন্যও নহে; ইতিহাসের আলোচনা কার্য্য-ক্ষেত্রেও সদা প্রয়োজন।

লর্ড মেয়ো।

লর্ড ক্লাইব হইতে লর্ড ডফারিণ পর্য্যন্ত প্রতিনিধিদিগের প্রত্যেকেরই জীবনী ও শাসনেতিহাস বিশিষ্টরূপে আলোচ্য; তাহাতে শিক্ষণীয় সামগ্রী বিস্তর ত আছেই; পরন্ত তদ্ব্যতীত ভারতে বৃটিশ-শাসন নীতির বিকাশ ও ব্যাপ্তির বিষয় কিছুই বুঝা যায় না। এ আলোচনা পর্য্যায়ক্রমে হইলেই উত্তম হইত। লর্ড মেয়োর জীবনী ও শাসনেতিহাস প্রথম প্রবন্ধে গ্রহণ করাতে পর্য্যায়-ভঙ্গ হইল বটে; কিন্তু তাহাতে আলোচনার অঙ্গ-হীনত্ব ঘটিবে না। পরন্ত লর্ড মেয়োর সময় হইতে কতকগুলি কারণ-পরম্পরার সংযোগে ভারত-শাসনে একটা অভিনব স্রোত বহিয়াছে;—এতাদৃশ ঘটনা ও কার্য্য-পরম্পরার অভাব নাই; যাহারা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আপেক্ষিক উন্নত বা অবনত অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে, তাহাদের সূত্রপাত লর্ড মেয়োর শাসন-কালে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে বাৎসরিক "বজেট এষ্টিমেটে" এক্ষণে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে বর্দ্ধিত-সংখ্যক দেশীয় সদস্যদিগের আলোচনাধিকার দিবার প্রস্তাব বৃটিশ-পার্লামেণ্টে উপস্থিত (*Vide Lord Cross's Indian Council Bill*), লর্ড মেয়োর পূর্ব্বে পার্লামেণ্টেই সেই বজেট এষ্টিমেট পেস হইত না। লর্ড মেয়োর পূর্ব্বে কোনক্রমে তাহার ভ্রমও ঘুচিত না। পরন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের যে "ব্যয়-প্রণালীর" পঞ্চবর্ষ-ব্যাপী পুনঃসংস্কার লর্ড ল্যান্সডাউন এবৎসর করিলেন, ইহার অস্তিত্বই লর্ড মেয়োর পূর্ব্বে ছিল না। লর্ড মেয়ো নিজেই "*Decentralisation scheme*" অর্থাৎ প্রাদেশিক ব্যয়ের "কেন্দ্রচ্যুতি" প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এ বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা,—এ প্রবন্ধের উপযুক্ত স্থলেই করা যাইবে। পুনশ্চ লর্ড রীপন কর্ত্তৃক যে স্বায়ত্ত-শাসন-পদ্ধতি এদেশে সংস্থাপিত হয় এবং যাহার পুনঃসংস্কারের পাণ্ডুলিপি এবৎসর প্রস্তুত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে প্রতিবাদের রোল উঠিয়াছে, তাহার বীজাঙ্কুর লর্ড মেয়োই বপন করিয়াছিলেন। যে সুয়েজ-কেনালের সাহায্যে বিলাত-ভারতে সহজ পথ সংস্থাপিত হওয়াতে গমনাগমনের সুবিধা ও শীঘ্রত্ব সৃষ্টি হইয়া ভারত-শাসনের বিবিধ বিলাতী উপকরণ আনয়ন করিতেছে এবং যাহার অন্যতম ফল ভারতীয় উচ্চতর ইউরোপীয় রাজপুরুষদিগের দীর্ঘাবকাশ বীল এইক্ষণ হাউস অব কমন্সে সমালোচিত হইতেছে,—সেই সুয়েজ কেনাল লর্ড মেয়োর শাসন-কালের পূর্ব্বে "সুয়েজ-যোজক" ছিল। লর্ড মেয়োর সময়েই সুয়েজ কেনাল উন্মুক্ত হয়। যে রেল-রাস্তা আজ দেশের প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, লর্ড মেয়োর পূর্ব্বে তাহার কয়েক সহস্র মাইল মাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। সংক্ষেপত ভারতে বৃটিশ-শাসনের অধিকতর দার্ঢ্য-স্থাপন ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি-সাধন, লর্ড মেয়োর শাসন হইতেই আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে শেষ-পর্য্যায়ের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে লর্ড মেয়োই প্রথম। অতএব আলোচনায় লর্ড মেয়োর শাসনেতিহাস প্রথম গ্রহণ করাতে একদিকে পর্য্যায়-ভঙ্গ হইলেও অপর দিকে তাহা রক্ষিত হইবে।

পূর্ব্বাবস্থা।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে লর্ড মেয়ো ভারত-রাজ্যের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ, বহু-বায়ু-বারি-পরিপক্ব, আষাঢ়-উত্তাপ-সহ সিবিলিয়ান গবর্ণর জেনারল লর্ড লরেন্সের নিকট হইতে তিনি রাজ-প্রতিনিধিত্বের চার্জ প্রাপ্ত হন। সে আজ ২৩ বৎসরের কথা।

লর্ড মেয়োর শাসন-কাল অতি সংক্ষিপ্ত। নিয়তির নিষ্ঠুর হস্তেই হায়, তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল! সে ঘটনা সাংঘাতিক!! সুখের, সুশাসনের, স্বাস্থ্যের শোণিতাক্ত! সে

ঘটনা,—নিরীহ, নিরপরাধীর রক্তময়! অতি শোচনীয় সে ঘটনা! মানব-জীবনের উপর নিয়তির যে কি প্রচণ্ড প্রতাপ,—মানব-জীবন প্রতিমুহূর্ত্তেই যে কি প্রকার নিরাশ্রয়,—সে ঘটনা তাহার অতি সন্তাপনীয় সাক্ষী। যে নির্ম্মম নিয়তি-বশে কাল-আণ্ডামানে লর্ড মেয়োর মহামূল্য জীবন সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই নিয়তির কঠোর মূর্ত্তির সহিত,—সাংঘাতিক ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বেই বারেক তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—ইতিহাসে এ কথা উল্লেখ আছে। স্বগৃহ হইতে যেদিন ভারতবর্ষে যাত্রা করেন, তাহার পূর্ব্বদিন কি-যেন এক অজ্ঞাত কারণে লর্ড মেয়োর মন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়। ভদ্রাসন-স্থিত অনতি-বৃহৎ উপাসনা-মন্দিরটীর প্রাঙ্গণস্থ মৃত-নিবাসের মধ্যে একটী শান্ত, ছায়াময় স্থান দেখাইয়া দিয়া অতি করুণ, বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"যদি আর না ফিরি,—ভারত হইতে যদি জীবন্তে না ফিরি,—তবে আমার মৃত শরীরটী গৃহে আনিয়া ঐ স্থানটীতে প্রোথিত করিও।" লর্ড মেয়োর সেই চিত্তাবসাদ ও মৃত্যু-চিন্তার কারণ আর কি? নিয়তি-নিয়োজিত কাল-পুরুষের সহিত ক্ষণিক সাক্ষাৎ! লর্ড মেয়োর এই বাসনা ও আদেশানুসারে তাঁহার মৃতদেহ আণ্ডামান হইতে আয়র্লণ্ডে নীত হইয়া উপরি উক্ত পারিবারিক কবর-স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল। এই সকল হৃদয়-বিদারক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানেই বিবৃত হইবে।

১৮৬৯ সাল। শঙ্কা—সংহারময়ী। সিপাহী-বিদ্রোহের পর প্রায় বার বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু তখনও রাজা, প্রজা,—কাহারই মন হইতে সন্দেহ ও শঙ্কা তিরোহিত হয় নাই। দিল্লী-কানপুরাদির শোণিতাক্ত দৃশ্যাবলী,—বীভৎস, ভয়াবহ শ্মশান-নিচয় জাগ্রত থাকিয়া তখনও জীব-হৃদয়ে আতঙ্কের উদ্রেক করিতেছে। প্রজাকুল ব্যাকুল,—দেশীয় রাজন্যবর্গ ঘোর সন্দিহান, শঙ্কাযুক্ত। লর্ড ডালহুসীর (*annexation*) অঙ্গীকরণ-নীতির আঘাত-জনিত ক্ষত তখনও তাঁহাদের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। আফ্গানিস্তান গৃহ-বিবাদে উন্মত্ত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; আমির দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে; সিয়ার-আলি ও আফজুল খাঁ উভয়েই বৃটিশের প্রতি বিরক্ত,—যার পর নাই অসন্তুষ্ট। রুষ-ভল্লুক দ্রুত-পদবিক্ষেপে মধ্য আসিয়ায় ধাবমান। আফগান-আমির, সিংহ ছাড়িয়া ভল্লুকাসক্ত হয় হয় হইল। পারস্যাধিপ সাহ নাছেরুদ্দীনের সহিত সীমা-সংক্রান্ত বিসংবাদ। সাহ সংক্ষুব্ধ, সন্দিহান, সমরার্থে উদ্যোগী। সীমান্ত স্থান-সমূহ অদৃঢ়-বদ্ধ,—শিথিল-গ্রন্থি। লুশাই জাতি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ-অধিকার হইতে অসংখ্য নর-নারী হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দ্রব্য-জাত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে। গ্রাম দগ্ধ করিয়া দিতেছে। চা-ক্ষেত্র উৎসন্ন হইল। কুঠিয়ালগণ তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। ভারত পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু তখনও ভারতে প্রীতি স্থাপিত হয় নাই; রাজা-প্রজায় সৌহৃদ্য-সংমিলন হয় নাই। রাজকোষ শূন্য। আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক। বজেট ভ্রম-পূর্ণ। হিসাবের সহিত ট্রেজরী-নিচয়ের মজুদ তহবিল মিলে না। বয়ঃক্রমে এবং বহুশ্রমে লর্ড লরেন্স জরা-যুক্ত, অতি শ্রান্ত; —তথাচ বীর-শরীর নমিত নহে, দেহের সামরিক অনমনীয়তা অদ্যাপিও পূর্ব্ববৎ আছে। কিন্তু রক্ত-মাংসে আর কত সহিবে! ভারতে সুদীর্ঘ প্রবাস ও পরিশ্রমের পর, অন্তিমের অব্যবহিত পূর্ব্বাহ্ণেও ত অন্তত এক বিন্দু বিশ্রাম চাই। ১৮৬৯ অব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে শপথপূর্ব্বক এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করত লর্ড মেয়ো ভারতীয় রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন।

লর্ড মেয়োর জীবনী।

কিন্তু লর্ড মেয়োর শাসনেতিহাস বিবৃত ও শাসন-নীতি সমালোচিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্ত পাঠককে উপহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমি ডাক্তার হণ্টার-প্রণীত লর্ড মেয়োর সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে কয়েকটী স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া, সে কর্ত্তব্য পালন করিব।

লর্ড মেয়োর পূর্ণ এবং পারিবারিক নাম "রিচার্ড সাউথ ওয়েল আরল্ অব্ মেয়ো"। ইনি নরম্যান-জাতি-সম্ভূত আয়র্লণ্ডের অধিবাসী এবং স্ববংশের ষষ্ঠ আরল্। অতি প্রাচীন এবং সুপরিচিত বংশে ইঁহার জন্ম। আয়র্লণ্ডের ইতিহাসে ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অজ্ঞাত নহেন। ১৮২২ খৃঃ অব্দে, আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডবলিনে

নগরে লর্ড মেয়োর জন্ম হয়। ডবলিনের অদূরবর্ত্তী হেয়েজ নামক পল্লী-নিবাসে লর্ড মেয়ো লালিত-পালিত হন; তাঁহার বাল্য ও কৈশোর-শিক্ষা সেই স্থানেই সম্পন্ন হইয়াছিল। লর্ড মেয়োর পিতা মিষ্টার রবার্ট বর্ক, পারিবারিক আরল্ উপাধি ও তৎসংশ্লিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন,—১৮৪৯ অব্দে। তৎপূর্ব্বে তাঁহার এতাদৃশ অর্থ-স্বাচ্ছল্য ছিল না, যদ্দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষার্থে স্কুলে ও কলেজে প্রেরণ করিতে পারেন। সুতরাং আর কয়েকটী সহোদর-সহোদরাদিগের সহিত লর্ড মেয়ো স্বগৃহেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জনক-জননীর যত্নে ও অধ্যবসায়ে এই শিক্ষা-কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। যৌবনের উদ্রেকে দুই বৎসর কাল মেয়ো 'অক্সফোর্ড' শিক্ষা-নিবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রধানত গৃহ-শিক্ষাই তাঁহার শিক্ষা।

মাতা ধর্ম্ম-পরায়ণা, বুদ্ধিমতী এবং স্নেহ ও শ্রমশীলা না হইলে, পুত্র প্রায়শই গুণবান্ হয় না, ইহা সর্ব্বত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়োর মাতা উপরোক্ত গুণ-নিচয়ে গুণবতী ছিলেন। স্বধর্ম্মে বিশ্বাস তাঁহার এতাদৃশ ছিল যে, তৎপ্রদত্ত প্রাত্যহিক প্রার্থনা ভগবান্ শ্রবণ করিয়া, তাহার উত্তরে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ সমগ্র পরিবারের দৈনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রেরণ করেন, এ ধ্রুব ধারণা তাঁহার মন হইতে কখনও কিছুতেই টলে নাই। লর্ড মেয়োর একটী ভ্রাতা নিজেই এ কথা লিখিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "মাতার মিতব্যয়ে ও শ্রমশীলতাতেই পিতা অল্প আয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেন। পিতা মাতা উভয়েই অতিশয় স্নেহশীল ও স্নেহশীলা ছিলেন; সন্তানগুলি তাঁহাদের পঞ্জরের এক একখানি হাড় স্বরূপ ছিল। পল্লীর মধ্যে এমন দীন ও দুঃখী লোক ছিলেন না, যাঁহাদিগকে মাতা প্রাণপণে সহায়তা না করিতেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে কেহ কখনও দেখে নাই। মাতা বলিতেন,—"*Her mission was to work.*" কর্ম্মই তাঁহার জীবনের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। তাঁহা অপেক্ষা গুরুতর শ্রম করিতে কখনও কাহাকেও দেখি নাই।"

জননীর এই শ্রমশীলতার স্বত্বাধিকার লর্ড মেয়ো সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে প্রকাশ পাইবে যে, লর্ড মেয়োর কর্ম্মপরায়ণতা বস্তুতই বিস্ময়কর। কিন্তু সে শক্তি তিনি মাতার শিক্ষা ও শারীরিক দৃষ্টান্ত হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। পাঠক কিন্তু এস্থলে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবেন। লক্ষ্য করিবেন যে, "একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, আরল্-পত্নী,—সম্পদ সম্ভ্রম ও অত্যুচ্চ উপাধির অধিকারিণী,—বিলাস-সম্ভারের বক্ষের উপর বসিয়াও "বাবুগিরি" করেন না; শ্রমশীলতায় তাঁহার "মাথার ঘাম পায়ে পড়ে।" বর্ত্তমান সময়ের বাবু-গৃহের বঙ্গ-বধূগণও এই বিলাতী দৃশ্যটী "বিবেচনাধীন" করিবেন।

বাল্যকাল হইতে লর্ড মেয়োর মন স্বভাবতই স্বধর্ম্ম-প্রবণ; তাঁহার শিক্ষাও হইয়াছিল,—সেই প্রকারের ধর্ম্মভাব-সংমিশ্রিত শিক্ষায়; তবে—ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, মৃগয়াদি ক্ষাত্রোচিত শিক্ষাতেও তিনি বঞ্চিত হন নাই। পল্লী-নিবাসের প্রশস্ততায় এ সকল শিক্ষা তাঁহার প্রভূত রূপেই হইয়াছিল এবং তাহাতে তিনি দক্ষতা ও নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য এবং ইতিহাসে অতি অল্প বয়সেই বালক মেয়োর শক্তি প্রস্ফুট হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই তিনি কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ (*sermons*) রচনা করেন। সেগুলি সংগৃহীত হইয়া বিদ্যমান আছে। ডাক্তার হণ্টার লিখিয়াছেন, সেই "সারমন" গুলিতে বালক মেয়োর কল্পনা-শক্তির করুণা এবং ধর্ম্মানুরক্তির তীব্র তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রিচার্ড আর একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহার নাম "পবিত্র বাইবেলের ভূমিকা (*A Preface to the Holy Bible by R S B of H*) ইহাতে নূতন টেষ্টামেণ্টের প্রত্যেক অধ্যায়ের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। বালকের এতাধিক অনুসন্ধান ও অধ্যবসায় বড় সামান্য কথা নয়।

অতঃপর সঙ্গীতাদি সুকুমার-শিক্ষা-প্রাপ্তি; ফ্রান্সে, ইতালীতে ভ্রমণ; ১৮৪১ সালে ত্রিনীতি কলেজে,—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ। ১৮৪৩ সালে লর্ড মেয়ো "সাবালগ" হন। এই সময়ে লণ্ডন-সমাজে সামাজিক ক্রীড়া-কৌতুক। ক্রীড়া-কৌতুক নৃত্য-গীতাদিতে পারদর্শী যুবক মেয়ো

লণ্ডন-সমাজে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। সুন্দর, শৌর্য্যশালী, সুদীর্ঘ সৌম্যমূর্ত্তি যুবক সকলেরই প্রীতিভাজন হইলেন; শিষ্টাচার ও সামাজিকতায় সম্ভ্রান্ত-সমাজে তাঁহার বেশ একটু প্রতিপত্তি হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৪৫ অব্দে লর্ড মেয়ো ভ্রমণার্থে রুষিয়ায় গমন করেন। তথায় যাহা কিছু দর্শনীয় ও জ্ঞাতব্য, তাহা দর্শন ও তত্তৎ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। রাজ-দরবারে রাজনীতিকদিগের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া রুষ-রাজনীতিক প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন ও হাতে-কলমে অধ্যয়ন করেন। পরবর্ত্তী সময়ে ভারত-শাসন কালে লর্ড মেয়োর এই রুষ-অভিজ্ঞতা বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। রুষ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া লর্ড মেয়ো তাঁহার রুষ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে রুষ সম্বন্ধে অনেক অভিনব ও জ্ঞাতব্য কথা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সময়ে (১৮৪৫—৪৬) আয়র্লণ্ডে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মেয়ো স্বদেশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সংমিলিত হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে দুর্ভিক্ষ প্রশমনের চেষ্টা করেন। এই কার্য্য-সম্পাদনার্থে ক্রমাগত চারি মাস কাল তাঁহাকে অবিশ্রান্ত ভাবে অশ্বারোহণে দেশের চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল।

এই লোক-হিতকর কার্য্যে লর্ড মেয়োর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়, তাঁহাকে দেশমধ্যে বিশেষরূপে পরিচিত ও লোকপ্রিয় করিয়াছিল। এই লোকপ্রিয়তা-নিবন্ধন ১৮৪৭ সালে কাউন্‌টি কিলডোর হইতে যুবক মেয়ো পার্লামেণ্টে সদস্য নিযুক্ত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর মাত্র।

১৮৪৭—৪৯ অব্দ;—যুবক মেয়ো পার্লামেণ্টের নীরব ও চিন্তাশীল মেম্বর। এ সময়ে তিনি সেই বিশাল শাসন-সমিতি নিগূঢ় অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিতেছিলেন। ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। পার্লামেণ্টের মেম্বর মেয়ো কোন সময়েই বাগ্মিতায় বিশিষ্ট ছিলেন না,—বাক্‌পটুতা প্রদর্শনের জন্যও তিনি উন্মত্ত ছিলেন না;—নিয়তই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য থাকিত, আসল কার্য্য; বয়ঃক্রমের অল্পতা সত্ত্বেও বৃথা বাগ্মিতণ্ডায় চিত্ত-চপলতা প্রকাশ করেন নাই; তাঁহার প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতাটী সংক্ষিপ্ত হইলেও পার্লামেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। মহামন্ত্রী ডিস্‌রেলি স্বয়ং ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি সেই বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮৪৮ অব্দে মেয়ো মহোদয়ের বিবাহ হয়। ১৮৪৯ সালে তদীয় পিতা (আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি) "আর্ল অব মেয়ো". উপাধীর অধিকারী হওয়ায়, তিনি "লর্ড ন্যাস" নামে, (পিতৃ-উপাধি প্রাপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত) অভিহিত হইতে থাকেন। আমরা কিন্তু ইহাঁকে এ নামে অভিহিত না করিয়া "লর্ড মেয়ো"ই এ প্রবন্ধে লিখিব। লর্ড মেয়ো স্বদেশ-হিতৈষিতার অত্যুচ্চ আদর্শ এবং স্ব-কর্ত্তব্য-পালনে কর্ণতুল্য বীর। সুদীর্ঘ কাল পার্লামেণ্টের সদস্য থাকিয়া তিনি কেবলমাত্র স্বদেশ আয়র্লণ্ডের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, আয়র্লণ্ডের উন্নতি সাধন ও কার্য্য উদ্ধারার্থে যত্ন ও অসীম পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে উত্থিত অন্যান্য অসংখ্য প্রশ্নের একটীও তিনি কখনও স্পর্শ করেন নাই; একমাত্র আয়র্লণ্ডই তাঁহার আরাধ্য এবং আলোচনীয় হইয়াছিল। তিনি আয়র্লণ্ডের অধিবাসী, আয়র্লণ্ডের ভূম্যধিকারী, আয়র্লণ্ডের নির্ব্বাচিত সদস্য; অতএব অন্যান্য বিষয়ে অনধিকার-চর্চ্চা না করিয়া, আয়র্লণ্ডের কার্য্য করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। এক আয়র্লণ্ডই তাঁহার জ্ঞানের এবং ধ্যানের কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

১৮৫৭ হইতে ১৮৬৮ অব্দ অবধি ২১ বৎসর কাল লর্ড মেয়ো পার্লামেণ্টে সদস্যত্ব করেন। এই কালের মধ্যে আয়র্লণ্ডের উন্নতি-কল্পে তিনি ৩৬ খানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পার্লামেণ্টে পেস্ করেন ও ৩৬টী পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৩৩টী আইনে পরিণত করিয়া লইতে সমর্থ হন। সর্ব্বশুদ্ধ, পার্লামেণ্টে তাঁহার বক্তৃতা সংখ্যা ১৪০টী; তাহার ১৩৩টী আয়র্লণ্ড বিষয়ক।

এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, লর্ড মেয়ো স্থিতিশীল রাজনীতিক সম্প্রদায়স্থ লোক এবং স্থিতিশীল মন্ত্রীদিগেরই দ্বারা তাঁহার যাবতীয় উন্নতি ও উচ্চপদ প্রাপ্তি হইয়াছিল; কিন্তু

আয়র্লণ্ডের শাসন-সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ও প্রস্তাব-নিচয় স্থিতিশীল নীতি অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে গিয়াই পড়িয়াছিল। আয়র্লণ্ডের উন্নতিকল্পে তাঁহার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই; এ কারণ পার্লামেণ্ট-সদস্যত্বের শেষ তিন বৎসর অত্যন্ত মনোবেদনাতেই তাঁহার অতিবাহিত হইয়াছিল।

পাঠক এস্থলে, অনুধাবন করিবেন যে, স্বদেশের মঙ্গলার্থে নিজের স্বার্থ ও বন্ধুত্ব বিসর্জ্জন দিতে ল মেয়ো সঙ্কুচিত ছিলেন না। তবে তিনি সারবান্ ও সতর্ক-প্রকৃতির লোক ছিলেন। যা একান্তই অসম্ভাবিত বুঝিতেন, তাহা সম্ভাবিত করিবার জন্য উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়া "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" করিতেন না। গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে মনের ক্ষোভ মনেই রাখিয়া, যা সম্ভাবিত তাহাই তৎকালের জন্য সম্পন্ন করিয়া লইতেন। একদিকে হঠকারিতার অভাব, অপর দিকে কার্য্যকুশলতা!—লর্ড মেয়ো পার্লামেণ্টে সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতেন; স্বদলস্থ স্থিতিশীল মন্ত্রিসম্প্রদায়ের আদর ও অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছিলেন।

ইহার ফল-স্বরূপ স্থিতিশীল-সম্প্রদায়ের সাময়িক মন্ত্রিত্ব-কালে লর্ড মেয়ো এক আধ বার নয়, তিন তিন বার আয়র্লণ্ডের "চিফ সেক্রেটারী" পদে অভিষিক্ত হন। এই "চিফ সেক্রেটারী"র পদ সামান্য পদ নহে। ইহা প্রধান শাসয়িতার পদ। পার্লামেণ্টে প্রবেশের কয়েক বৎসর মাত্র মধ্যে,—সবে ত্রিশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রম কালে, লর্ড মেয়ো এই উচ্চ ও বহু-বিজ্ঞ-জন-আকাঙ্ক্ষণীয় পদ, প্রথম বারের জন্য, প্রাপ্ত হন। এত অল্প বয়সে এরূপ উচ্চপদ পাইয়া লর্ড মেয়ো এক বিন্দুও বিচলিত হন নাই। আত্মশক্তির জন্য, এক দিকে তিনি যেমন অভিমানী ছিলেন না, অপর দিকে তেমনি আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাসবানও ছিলেন না। উপরোক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি তাঁহার সহোদরকে লিখিয়াছিলেন,—

"I am a new hand, but at any rate I am not afraid of the work" অর্থাৎ "আমি যদিও নূতন লোক, কিন্তু এ কার্য্যে আমি কোন অংশেই শঙ্কা করি না।"

লর্ড মেয়ো আইরিষ চিফ্ সেক্রেটারীর গুরুতর কার্য্য এই অল্প বয়সেই এত যোগ্যতা, এত নিপুণতা এবং এতাদৃশ ধীরতা সহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, তাহা সকল পক্ষেরই সন্তুষ্টিকর হইয়াছিল এবং স্থিতিশীলদিগের মন্ত্রিত্বকালে আর যে দুইবার এই পদ শূন্য হইয়াছিল, তিনিই উহাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার শ্রম, সহিষ্ণুতা ও কার্য্য দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৬৮ সালে তিনি ভারতীয় রাজ-প্রতিনিধিত্বে মনোনীত ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আইরিষ চিফ্ সেক্রেটারীর পদ এক দিকে যেমন অত্যন্ত দায়িত্বসম্পন্ন, অপর দিকে তেমনি নানা প্রকার আপদ-জনক। উগ্রপ্রকৃতি আইরিষ প্রজা স্বতঃ সংক্ষোভশীল; তাহাদিগকে শাসনাধীনে রাখা এবং সন্তুষ্ট রাখা ও তৎসঙ্গে কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে কার্য্য করা, এক জন পারদর্শী শাসয়িতার পক্ষেও সুকঠিন ব্যাপার। কিন্তু লর্ড মেয়ো এমনি সাবধান ও সুকৌশলী লোক ছিলেন যে, এতাদৃশ দুরূহ কার্য্য দীর্ঘকাল সম্পন্ন করিয়াও কোন পক্ষে কাহারও সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করেন নাই; এটী বড় সহজ কথা নহে।

লর্ড ডার্ব্বি লিখিয়াছেন,—

"I do not think he had in the world a personal enemy." "সর্ব্ব পৃথিবীর মধ্যে লর্ড মেয়োর একটীও শত্রু আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি না।"

বিবাদ ভঞ্জন, সৌহৃদ্য স্থাপন করিবার শক্তি লর্ড মেয়োর অসাধারণ পরিমাণে ছিল; অন্যান্য যোগ্যতার মধ্যে এই বিশেষ যোগ্যতাটীর জন্যই তিনি তৎকালে রাজ-প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কারণ, তৎকালে অন্যান্য কার্য্যাপেক্ষা ভারতীয় মিত্র ও করদ রাজা এবং প্রজাদিগের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

বিপদ যতই গুরুতর হউক না, কার্য্যপথ যতই জঞ্জাল ও কণ্টকাকীর্ণ হউক না, লর্ড মেয়োর শীতল মস্তিষ্ক কিছুতেই বিচলিত হইত না। তাঁহার আয়র্লণ্ড শাসন কালে একবার (১৮৬৭ সাল) সুচির-রাজ-দ্রোহী ফিনিয়ানদিগের সংক্ষোভ উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে জনৈক সাক্ষাৎদ্রষ্টা যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম দিতেছি;—

"সাংঘাতিক ব্যাপারের সংবাদ আসিল, কিন্তু লর্ড মেয়ো অবিচলিত-চিত্ত; চিত্ত এমন শীতল, যেন কিছুই ঘটে নাই। অতি সহজ ভাবে এমনি ব্যবস্থা করিলেন যে, বিভ্রাটাগ্নি নিঃশব্দে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।"

১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে লর্ড মেয়োর মাতৃ-বিয়োগ হয়; তাহার ছয় মাস পরে ঐ বর্ষের আগষ্ট মাসেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। শেষোক্ত ঘটনায় তিনি পৈতৃক বিষয় ও আরল্ উপাধির উত্তরাধিকারী হন।

১৮৬৮ সালে লর্ড মেয়ো, রাজপ্রতিনিধি মনোনীত হন। এই সময়ে স্থিতিশীল মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের মন্ত্রিত্বের প্রায় শেষ অবস্থা। সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন সম্মুখবর্ত্তী। মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের এই মনোনয়নের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উঠিল; সাম্প্রদায়িক শত্রুদিগের ত কথাই নাই, মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের মিত্রবর্গও তাঁহাদের এই মনোনয়ন সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করিতে লাগিল; যাবতীয় বিলাতী সংবাদপত্র সমস্বরে তীব্র প্রতিবাদের রোল উঠাইল।

আইরিষ চিফ্ সেক্রেটারীর পদ যতই উচ্চ হউক না; ভারতীয় রাজপ্রতিনিধির তুলনায় তাহা নিম্ন-স্থানীয়। প্রথমোক্ত সেক্রেটারীর চেয়ার আর শেষোক্ত রাজকীয় সিংহাসন। চেয়ারে এবং সিংহাসনে তফাৎ বিস্তর। লর্ড মেয়ো ভারত-সিংহাসনের উপযুক্ত হইবেন কিনা, সে বিষয়ে তখনও গভীর সন্দেহ ছিল। বিশেষত লর্ড লরেন্সের চার্জ্জ দেওয়ার কথা—১৮৬৯ সালের প্রথমে। ১৮৬৮ সালেই মন্ত্রি-সম্প্রদায় সে কাজের জন্য লোক স্থির করিলেন এবং তাহা করিলেন, তাঁহাদের মন্ত্রিত্বের আসন্ন অবসান কালে। কাজেই নিন্দাস্রোত প্রখর বহিল।

লর্ড মেয়োর এই সময়ের মানসিক অবস্থা,—চিন্তনীয়। তল্লিখিত তাঁহার কোন বন্ধুর পত্রের কিয়দংশ অনুবাদিত করিয়া দিতেছি। লর্ড মেয়ো লিখিতেছেন;—

"আমার কর্ম্ম উপলক্ষে সংবাদপত্র সমুহের এই গঞ্জনা, গালি-গালাজ আমাকে বড়ই বেদনা দিতেছে। আমি নিজের জন্য ব্যথিত নহি, কিন্তু উহা গবর্ণমেণ্টকে সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত করিবে এবং যদি আমি কখনও ভারতে গমন করি,—আমার শক্তি হ্রাস করিবে, এই শঙ্কাই আমি করিতেছি। আমি চিন্তিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বিচলিত হই নাই। * * ভারত-শাসনের এই অত্যুচ্চ পদ আমি বিনা বিচার-বিবেচনায় গ্রহণ করি নাই; দীর্ঘকাল চিন্তা ও বহু বিচার-বিবেচনার পর তবে আমি এই পদ গ্রহণ করিয়াছি এবং ইহা আমার দৃঢ় প্রত্যয় ও ভরসা আছে যে, আমার বন্ধুগণ আমার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যে আশা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিতে আমি সমর্থ হইব। বিরুদ্ধ সমালোচনা হইবে ইহা আমি জানিতাম, কিন্তু এতকাল কাজ কর্ম্ম করার পর এ প্রকার ভাবে গালাগালি গুলা খাইতে হইবে, এরূপ বিশ্বাস ছিল না। যাহা হউক, ইহার জন্য মনে প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা উদিত হইতেছে না। ভগবানের নিকট কেবল এই একমাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, যেন নিন্দাকারীদিগের কথা অসত্য প্রমাণ করিতেই সমর্থ হই।"

লর্ড মেয়ো তাঁহার এই "নিন্দাকারীদিগের কথা" পরবর্ত্তী কার্য্যাবলী দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই অসত্য প্রমাণ করিয়াছিলেন। নিন্দাকারিগণ স্বয়ংই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

সংবাদপত্রের এবম্প্রকার দৌরাত্ম্য দ্বারা কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি না, এই সময়ে লর্ড মেয়ো একদিন প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার ডিস্‌রেলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে ডিস্‌রেলি কহিয়াছিলেন,—

"*It may retard the advancement of a young man, starting in life untried. But it is harmless after a man has become known and if unjust, it is in the long run beneficial.*" অর্থাৎ "সংবাদপত্রের এ প্রকার কঠোর আক্রমণ সংসার-প্রবেশোন্মুখ জনৈক নব্য যুবকের উন্নতি-কল্পে ব্যাঘাত করিতে পারে বটে; কিন্তু যিনি সংসারে উন্নত ও সাধারণ্যে পরিজ্ঞাত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উহা হানিজনক নহে; অন্যায় হইলেও উহা তাঁহার পক্ষে বরং উপকার-জনক।

রাজপ্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হওয়ার পর যে-কিছুকাল লণ্ডনে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল,—সে সময়ে লর্ড মেয়ো নিরতিশয় যত্ন ও শ্রম সহকারে ভারত-বিষয়ক তথ্যানুসন্ধানে ও অভিজ্ঞতা

উপার্জ্জনে নিরত ছিলেন। নিয়ত ইণ্ডিয়া আপিসে গমনাগমন, ভারত-বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তকনিচয় ও সরকারী সেরেস্তার কাগজ-পত্র পাঠ এবং ভারত-প্রত্যাগত পুরাতন রাজকর্ম্ম-চারীদিগের সহিত ভারত-শাসন-সম্বন্ধীয় কথা-বার্ত্তায় তাঁহার সমস্ত সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। ক্রমে সময় উপস্থিত হইল; লর্ড মেয়ো বিষণ্ণ-চিত্তে জন্মভূমির নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিয়া ১৮৬৮ সালের ১১ই নবেম্বর তারিখে ভারতাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পথে প্রায় দুই মাস গত হইল।

ইণ্ডিয়া আপিসে অবস্থিতি কালে লর্ড মেয়ো অবগত হইয়াছিলেন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের পুরাতন কাগজ-পত্র আদৌ শৃঙ্খলা-বিন্যস্ত নহে; তাহার সুশৃঙ্খলা-সাধন-কল্পে একটী দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক ছিল। তিনি প্যারিস নগরে অপেক্ষা করিয়া ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের শৃঙ্খলা-সমন্বিত দপ্তরখানা পরিদর্শন করিলেন ও তদবলম্বিত প্রণালী অনুসারে নিজ গবর্ণমেণ্টের কাগজাত সিজিল করা সম্বন্ধে চিন্তা ও বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বলা আবশ্যক যে, লর্ড মেয়োর সময় হইতেই এ সম্বন্ধে ভারত-গবর্ণ-মেণ্টের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে এবং ইংরেজ আমলের প্রথমাবধি ও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েরও পুরাতন ও অত্যাবশ্যক কাগজাত, ক্রমে সুপর্য্যায়ে বিন্যস্ত হইয়া ভারত-শাসনোতহাস সঙ্কলনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে।

পথি মধ্যে ক্রমে এডেন, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল করিয়া অপেক্ষা করত লর্ড মেয়ো ভারত সম্বন্ধে নানা বিষয়ের তথ্যানু-সন্ধান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঁহার এ সময়ের দৈনিক কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করি-লেও বিস্মিত হইতে হয়। জাহাজের উপর জলে ভাসিতে ভাসিতেও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম; মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই। ভারত-শাসন-বিষয়ক চিন্তায়, অধ্যয়নে ও অনুসন্ধানে অনবরত নিযুক্ত। সে এতাদৃশ শ্রম যে, লর্ড মেয়োর সুদৃঢ় শরীরও তাহা সম্যক রূপে সহ্য করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার একদিনকার ডায়েরীতে (৮ জানু-য়ারি) এই রূপ লিখিত আছে;—

"Paid the penalty of my imprudence and over exertion at Madras being attacked sharply by fever this morning.

"মান্দ্রাজে আমার অনবধানতা ও অতিশ্রমের প্রতিফল স্বরূপ অদ্য প্রাতে জ্বরাক্রান্ত হইয়াছি।"

লর্ড মেয়োর কলি-কাতায় উপস্থিতি।

১৮৬৯ সাল, ১২ই জানুয়ারী লর্ড মেয়ো কলিকাতায় পৌছিলেন এবং সেই দিনই ভারত রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন।

এক দিকে প্রবীণ, ভারতের দীর্ঘ-প্রবাসী, বহুজ্ঞতা-পরিপক্ব প্রতিনিধি লর্ড লরেন্স; অপর দিকে নবীন, ভারতানভিজ্ঞ, নবাগত লর্ড মেয়ো;— আকাশের একদিকে যেন সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, এবং অপর দিকে চন্দ্র উদিত হইতেছেন। শাসন-দণ্ড অর্পণ ও গ্রহণ-কালে উভয়ের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছিল জানি না; কিন্তু কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ-চিত্তেই যেন লর্ড লরেন্স তদীয় দীর্ঘকাল-চালিত শাসন-দণ্ডটী নবাগতের হস্তে প্রদান করিলেন। গবর্ণমেণ্ট হাউসে সমবেত সচিব, সেক্রেটারী ও অন্যান্য রাজপুরুষদিগের সকলেরই মনে কেমন সন্দেহের উদ্রেক হইল যে, এই নবাগত ও ভারতানভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারত-শাসনের গুরুভার বহন করিতে পারিবেন কিনা। বিলাতী সংবাদপত্র-সমূহের তীব্র আক্রমণই অবশ্য এই সন্দেহের অধিকতর হেতু হইয়াছিল; কিন্তু ভারতীয় রাজপুরুষদিগের মনে এই সন্দেহ অধিক কাল স্থায়ী হইতে পায় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই লর্ড মেয়োর অসাধারণ শাসন-শক্তি ও কার্য্য-ক্ষমতা এবং অভিনব কার্য্য-প্রণালী দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সচরাচর-দৃষ্ট সাধারণ-ধাতু-বিনির্ম্মিত লোক নহেন। সেই রাত্রের মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদে সমাগত রাজ-কর্ম্মচারিগণ বুঝিলেন যে, মিষ্টার ডিসরেলি-প্রেরিত এই নব প্রতিনিধি অন্তত কঠিন পরি-শ্রমে কিছুতেই কাতর হইবেন না।

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্যারম্ভ।—সেই দিন সায়ংকালে লর্ড লরেন্সের সহিত বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন হইল; রাজ-প্রতিনিধিকে স্বহস্তে কি কি কার্য্য করিতে হয় ও সে সকল কার্য্য কি প্রণালী অবলম্বনে অভ্রান্ত-রূপে অথচ অল্প সময়ে সম্পন্ন হইতে পারে ইত্যাদি অনেক আলোচনা হইল। লর্ড মেয়ো

যেন বৃহৎ হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র কার্য্যটী পর্য্যন্তও স্বচক্ষে দেখিয়া করিবার জন্য অগ্রেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(৪)

কার্য্যাবস্থা।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ—হেড রাইটার।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'হেড্ রাইটারী' পদ শূন্য হয়। ৺ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কাজ করিতেন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়াই, দুর্গাচরণ বাবু "মেডিকেল কলেজে" পড়িতেন। ইনি মেডিকেল কলেজের 'আউট ষ্টুডেণ্ট' ছিলেন; অর্থাৎ অবেতন পড়িতে পাইতেন; পরীক্ষা দিয়া উপাধি পাইবার অধিকারী ছিলেন না। চাকুরী করিতে করিতে, তাঁহার 'পড়া-শুনা' চলিত, কেবল মার্সেল সাহেবের অনুগ্রহে। একবার মার্সেল সাহেব, ছুটি লইয়া, বিলাত গিয়াছিলেন। সেই সময় কর্ণেল রাইলি সাহেব, তাঁহার হইয়া কাজ করিতেছিলেন। দুর্গাচরণ কাজ করিতে করিতে 'পড়া-শুনা' করেন, রাইলি সাহেবের এমন ইচ্ছা ছিল না। এইজন্য দুর্গাচরণকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, মার্সেল সাহেব ফিরিয়া আসিলে, দুর্গাচরণের আবার একটু সুবিধা হইয়াছিল। পরে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে তিনি "হেড্ রাইটারী" পদ পরিত্যাগ করেন। দুর্গাচরণের জীবনীতেও অনেক অলৌকিক 'ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক-সংঘটিত ঘটনাবলী একে একে বিবৃত করিলে, একখানি অতি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। কাহারও জীবনী লিখিতে গেলে, তৎসংশ্লিষ্ট খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গেরও জীবনীর অন্ততঃ কিছু কিছু আভাস দিয়া না যাইলে, জীবনী লেখা সার্থক বা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু জন্মভূমিতে স্থান সঙ্কুলন হওয়া অসম্ভব; স্থান হইলেও সেরূপ বিরাট বিস্তার মাসিকপত্র-পাঠকের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং এ ক্ষেত্রে কতকটা অসম্পূর্ণতার অভিযোগ আমাদিগকে শুনিতে ও সহিতে হইবে। স্থানাভাবের দায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-ভাগেরই অনেকটা সংক্ষেপ করিতে হইতেছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "হেড্ রাইটারের" বেতন ছিল ৮০৲ টাকা। এই পদে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা কতক স্বচ্ছল হইল। তিনি এ সময়ে স্বকীয় ইংরেজী বিদ্যার উন্নতি সাধনে অধিকতর যত্নশীল হইয়াছিলেন। যত্নে সিদ্ধি নিশ্চিতই। তাঁহার ইংরেজী লেখার লিপি-নৈপুণ্য দেখিয়া, সিবিলিয়ন সাহেবগণও সন্তুষ্ট হইতেন। বাঙ্গালা হস্তাক্ষরের ন্যায় তাঁহার ইংরেজী হস্তাক্ষরও সুন্দর হইয়াছিল; ইংরেজী হস্তাক্ষরের ছত্রগুলিও মুক্তাপঙ্‌ক্তিবৎ প্রতীয়মান হইত।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দে হিন্দু-কলেজের কয়েক জন ছাত্র "শুভকরী" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুরোধ পরবশে এই কাগজে বাল্য-বিবাহের দো[ষ] উল্লেখ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখেন। বিদ্যাসা[গর] মহাশয় লিখিয়াছেন,—"চৈত্র মাসে চৈ[ত্র] সংক্রান্তি সময়ে লোকে যে, জিহ্বা বিদ্ধ করে, পিঠ ফুড়িয়া চড়ক করিয়া থাকে, এবং মৃত্যু পূর্ব্বে যে গঙ্গায় অন্তর্জ্জলি করে, এই দ্বিবি[ধ] কু-প্রথার নিবারণপক্ষে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য দী[ন]বন্ধু ন্যায়রত্ন ও তৎকালীন সংস্কৃত কলেজে[র] সুলেখক মাধবচন্দ্র গোস্বামীর প্রতি তা[ঁহা] (বিদ্যাসাগর) দেন।" রাজকৃষ্ণ বাবুর মু[খে] শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার [গুণে] "শুভকরী" কতকটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। শুভকরীর অস্তিত্ব কিন্তু অল্প দিন মাত্র ছি[ল]। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, হিন্দু-কলে[জ] হুগলী-কলেজ এবং ঢাকা-কলেজের সিনিয়র ছা[ত্র]দিগের বাঙ্গালা পাঠ্যের পরীক্ষক হন। রচন[ার] প্রশ্ন ছিল, স্ত্রী-শিক্ষা হওয়া উচিত কি না। এ[ই] সূত্রে কলিকাতার বর্ত্তমান বালিকা বা স্ত্রী[-] বিদ্যালয় 'বেথুন কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা ড্রি[ঙ্ক]ওয়াটার বেথুন সাহেবের সহিত তাঁহার সম্ব[ন্ধ] সংস্থাপিত হয়।*

* ১৮৪৯ সালে বেথুন-বালিকাবিদ্যালয় প্রতি[ষ্ঠিত] হয়। ইহার নাম প্রথমে ছিল হিন্দু-বালিকাবিদ্যাল[য়]। প্রথম ২৫টী বালিকা লইয়া এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ[য়]।

এই সকল ব্যাপারে ঠিক বুঝা যায়, দেশের দুরদৃষ্টবশে ও সংসর্গদোষে বিদ্যাসাগর হেন পণ্ডিতেরও যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমুল হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পুনরায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ১৮৪৮ সালে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শমান সাহেব কৃত "*History of Bengal*" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন। সর্ব্বত্রেই ইহার আদর হইয়াছিল। ভাষা তেমনই মনোহর,—প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

যে সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "হেড রাইটার," সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের 'জুনিয়র' ও 'সিনিয়র' বিভাগের বাৎসরিক পরীক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। এ কাজেও তাঁহাকে সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হইয়াছিল। তিনি এবং জর্ম্মাণ-পণ্ডিত ডাক্তার রোয়ার সাহেব, উপরি-উক্ত দুই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করিতেন। রোয়ার সাহেব * সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বটে; কিন্তু সংস্কৃত প্রশ্ন প্রণয়নে তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেকটা সাহায্য লইতে হইত। প্রশ্ন সঙ্কলনের জন্য, প্রকৃত পারিশ্রমিক না হউক, পুরস্কারস্বরূপ উভয়েই কিছু কিছু অর্থ পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী সৎকার্য্যে সে অর্থের ব্যয় করেন। সিনিয়র পরীক্ষায় ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য কাব্যে ও অলঙ্কারে সর্ব্ব প্রথম হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুরস্কার-প্রাপ্ত অর্থ হইতে, তাঁহাকে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। যে অর্থ অবশিষ্ট ছিল, তাহা দীন-দরিদ্রে বিতরিত হইয়াছিল। এরূপ সদনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ১৪ই নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কিছু দিন পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবার ভাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার পঞ্চম সহোদর হরিশ্চন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বয়স তাঁহার ৮ বৎসর মাত্র। কলিকাতায় আসিবার কিয়দ্দিন পরে তাঁহারও ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, ভ্রাতৃশোকে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তিনি শোকাতুরা জননীকে, সান্ত্বনা করিবার জন্য, কলিকাতায় লইয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কলিকাতায় আসিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুর মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মাতাও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শোক কিছু শান্ত হইলে, পাঁচ ছয় মাস পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয় জননীকে দেশে পাঠাইয়া দেন। তিনি নিজে কিন্তু সহজে ও শীঘ্র ভ্রাতৃ-শোক ভুলিতে পারেন নাই। শুনা যায়, কোন উৎসবের বাদ্য-বাজনার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। এই সময় তাঁহার মৃত ভ্রাতার কথা হৃদয়ে জাগরূক হইত। ভ্রাতা হরিশ্চন্দ্র একদিন কোন বিবাহের বাজনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"দাদা। আমার বিয়ের সময় তোমায় এমনই বাজনা করিতে হইবে।" আহা! কনিষ্ঠের সেই আধ-আধ সুমিষ্ট কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে শক্তি-শেল-সম বিদ্ধ হইয়া ছিল।

সংস্কৃত কলেজ—সাহিত্যাধ্যাপক।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে ৯ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হন। এই পদের বেতন ছিল ৯০৲ টাকা। তিনি ৮ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "হেড রাইটারী পদ পরিত্যাগ করেন। শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মার্সেল সাহেবের অনুরোধে তিনি সংস্কৃত কলেজের পদ গ্রহণে সম্মত হন। ইহাঁর পূর্ব্বে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই কার্য্য করিতেন। তিনি মুরশিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হওয়ায় এই পদ শূন্য হয়।* বিদ্যাসাগরের অনুরোধে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সোদরসম মিত্র রাজকৃষ্ণ বাবু ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের "হেড রাইটার" পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ বাবু জার্ডিন কোম্পানির বাড়ীতে "খাজাঞ্চি" ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সাহিত্যাধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন

* ইনি সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ ও ভাষা-পরিচ্ছেদ নামক ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

* "জজ-পণ্ডিতি" পদ প্রাপ্ত হইবার কয়েক মাস পর তর্কালঙ্কার মহাশয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রর হন।

তখন তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"আমাকে যদি শীঘ্রই কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে, এ পদ গ্রহণ করিব।" শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব, তাঁহার নিকট হইতে এই মর্ম্মে পত্র লিখাইয়া লয়েন। ৺মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্বশুরের জীবনীতে লিখিয়াছেন, "কলেজের অধ্যক্ষপদ তর্কালঙ্কার মহাশয়কেই দিবার প্রস্তাব হয়; তিনি তাহা স্বয়ং না লইয়া বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেই পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা অস্বীকার করেন। তিনি নিজ পদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই;— মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত ডাক্তর মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি বলিয়াছিলাম, 'যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি।' তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছুদিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় কর্তৃক সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থা ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষা-সমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা কার্য্য, সেক্রেটারী ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবার জন্য, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যে অনুরোধ ছিল না, স্বয়ং বিদ্যা-সাগর মহাশয়ই তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় যে, তর্কা-লঙ্কার মহাশয়ের পদোন্নতি হইয়াছিল, তাহা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ পায়। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মনান্তর হয়, তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় দুঃখ করিয়া পরম মিত্র ৺শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই উক্ত কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রখানি এই;—

"ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি মাজেষ্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলই বিদ্যা-সাগরের সহায়তা-বলে হইয়াছে। অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন, তবে আর আমার এই চাকরী করায় কাজ নাই; আমার এখনি ইহাতে ইস্তাফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব; আমি এই সবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহা সাপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্ত্তিহীন-চিত্তে কর্ম্ম-কাজ করিতেছি। অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথা-মুণ্ড জানাইব, আমার বাল্যসহচর, এক-হৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই। আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।"

সংস্কৃত কলেজ—প্রিন্সিপাল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তাৎকালিক সংস্কৃতজ্ঞ সাহেব-সম্প্রদায় বড়ই ভক্তিমান্ ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শনে, সেই সব সাহেব বিমোহিত হইয়া তাঁহার পদোন্নতির চেষ্টা করিতেন। এই সময় সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী বাবু রসময় দত্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কর্তৃপক্ষগণকে

এ পদ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই এই পদ-লাভ হইল। বিদ্যাসাগর নিযুক্ত হইলে পর সংস্কৃত কলেজের "সেক্রেটরী" ও "আসিষ্টাণ্ট সেক্রিটরী"র পদ উঠিয়া যায়। এই দুই পদে এক পদ হইল,—"প্রিন্সিপালের" বেতন হইল ১৫০৲ টাকা। পরে বেতন ৩০০৲ শত টাকা হইয়াছিল।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগরের "জীবন-চরিত" রচিত হয়। "জীবন-চরিত" চেম্বারের "বিয়গ্রাফি" নামক ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বারের "*Rudiments of Knowledge*" নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ইহাই হইল "বোধোদয়"। "বোধোদয়" ও "জীবন-চরিত," কোন গ্রন্থই হিন্দু সন্তানের সম্যক্ পাঠোপযোগী নহে। "বোধোদয়ে" বুদ্ধির অনেকটা বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। "পদার্থ তিন প্রকার,— চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ"; আর "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ",—বালকে বুঝিবে কি? বালকের বৃদ্ধ পিতামহেরও যে, বুদ্ধির অগম্য।* "জীবন-চরিতে" যে সকল বিজাতীয় ও বিদেশীয় চরিত্রের অবতারণা হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষণীয় গুণ থাকিতে পারে; ফলে কিন্তু অলক্ষ্যে ইহাতেই কেমন একটা কু-শিক্ষা আসিয়া পড়ে। "জীবন-চরিতে"র বিষয়ীভূত চরিত্র পাঠে ধারণা জন্মে, তাঁহারাই মনুষ্যের আদর্শ; সুতরাং তাঁহাদের অন্যান্য আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতিও অনুকরণীয়। কাজেই সেই সবের অনুকরণেই প্রবৃত্তি সহজে ধাবিত হয়। মনে হয়, এই সকলের অনুকরণেই সেইরূপ আদর্শে উপস্থিত হওয়া যায়। সত্য সত্য সে সব কিছু আর হিন্দু-সন্তানের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় নহে। হিন্দুর তাহাতেই অধঃপতন। হিন্দুর অধুনাতন অধঃপতনও ত এইরূপ কারণে। অকাজের অনুকরণ করিতে অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধেরও সহজেই প্রবৃত্তি হয়; সুকুমারমতি বালকদিগের ত কথাই নাই? স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দুর অথবা 'পুরাণান্তর্গত পুণ্যশ্লোক-পবিত্র-চরিত্রাবলীর যে কোন গুণ, যে কোন আকারে প্রকটিত হউক না কেন, তাহাই হিন্দুসন্তানের শিক্ষণীয়। সেই প্রকটিত গুণানুসরণে, হিন্দু-সন্তান চরিত্র-সৃষ্টির যেখানে গিয়া উপস্থিত হউক না, দেখিবে হিন্দুর চরিত্র-গঠনোপযোগী উপকরণই তথায় জাজ্বল্যমান। সংস্কৃত-ভাষা-পারদর্শী ও বহু-শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে এইরূপ চরিত্র-সংগ্রহে সক্ষম ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহা হয় নাই, শুদ্ধ দেশের দুরদৃষ্ট-দোষে। শিক্ষার স্রোতঃ-প্রবাহ তখন বিপথে ধাবিত হইয়াছে।* সেই জন্যই "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" পুস্তকের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় "বাসুদেব-চরিত" নামক যে পুস্তকের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল।*

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে চেষ্টা করেন। তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ, তাঁহার তাদৃশী অসাধারণ শ্রম-শক্তি অবলোকনে, বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন; এবং মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন, "উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে এত দিনের পর উপযুক্ত কার্য্যের ভার পড়িয়াছে।" বিদ্যাসাগর সকলেরই প্রীতিপাত্র হইয়া উঠিলেন। ছাত্রবর্গকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। লেখকের সাহিত্য-গুরু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য এবং বর্ত্তমান দৈনিক-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন সেনগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন,— "আমরা যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই সংস্কৃত কলেজেই থাকিতেন।† কলেজের ছুটী হইলে পর অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। তিনি

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় কেহ কেহ বোধোদয়ে"র এইরূপই সমালোচনা করিয়াছিলেন।

* মার্সেল সাহেব কর্ত্তৃক যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়, পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নার্থ অনুরুদ্ধ হন, তখন তাঁহার "বাসুদেব-চরিত" রচিত হয়। কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই, পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কর্ত্তৃপক্ষের অননুমোদিত বলিয়া। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরে এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপি খুজিয়া পান নাই। কোথায় কিরূপে তাহা নষ্ট হইল, তাহার স্থিরতা নাই।

† রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, "বিধবা-বিবাহে"র আন্দোলন-কালে, তিনি প্রায়ই সংস্কৃত কলেজেই রাত্রি যাপন করিতেন; এবং নিজ মত সমর্থনার্থ নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। কলেজের সম্মুখেই শ্যামাচরণ বিশ্বাসের বাটী। রাত্রিকালে কখন কখন তিনি শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে আহার করিতেন;

সেই চির-প্রসন্ন সহাস্য বদনে সকলকেই যথা-রীতি সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া, নানা প্রসঙ্গে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও রহস্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা কহি-তেন। তাঁহার কাছে যাইলেই, ছাত্রেরা প্রায়ই "রসগোল্লা সন্দেশ" খাইতে পাইতেন। তাঁহার প্রীতিসম্ভাষণে কেহই বিমুখ হইতেন না। বালকদিগের প্রতি বান্ধব-ব্যবহার বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই করিতেন,—তা কি সংস্কৃত কলেজে; আর কি স্বকৃত বিদ্যালয়ে। ছাত্রবর্গকে সর্ব্বদাই মধুর আত্মীয় সম্ভাষণে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তাঁহার মুখে সেই অমৃতায়মান "তুই" সম্বোধন শুনিয়া, প্রিয় ছাত্রবর্গ আপনাদিগকে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় বিবেচনা করিত। সত্য সত্যই সেই "তুই" টুকু যেন স্বর্গীয় স্নেহের ক্ষীর-ধারে ভরা; বিশ্বস্তরা আত্মীয়তা যেন সেই "তুই" টুকুরই মধ্যে মনে হইত। বালকদিগের প্রতি যেমন তিনি সততই কোমল ব্যবহার করিতেন, আবার আবশ্যক হইলে, কর্ত্তব্যানুরোধে, তেমনই কঠোর হইতেন। বলা বাহুল্য, স্কুলের বা কলে-জের অধ্যাপক, শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ কখন কঠোরতা, কখন বা কোমলতা, কর্ত্তব্যানু-ষ্ঠানে প্রয়োজনীয়। কারুণ্যে যাঁহার হৃদয় পূর্ণ, কঠোরতা তাঁহার কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী। বিদ্যা-সাগর মহাশয় কর্ত্তব্যে কঠোর বটে, কিন্তু কঠোরতার কারণ দূর হইলেই কারুণ্যে ভাসিয়া যাইতেন। তখন সেই মুখে কি যেন একটা শোভনীয় সুন্দর শ্রীর আবির্ভাব হইত।

একবার তিনি "মেট্রপলিটান কলেজে"র শ্যামবাজার শাখা-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে, অবাধ্যতা দোষ জন্য, তাড়াইয়া দেন। কর্ত্তব্যানুরোধে দ্বিতীয় শ্রেণী একবারে উঠাইয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ বিতাড়িত হইয়া, পরদিন প্রাতে, তাঁহার বাদুড়-বাগানস্থ বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং কাতরকণ্ঠে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বালকদিগের কোমল করুণ মুখ দেখিয়া, দয়ার্ণব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে দুরন্ত রাগ কোথায় চলিয়া গেল। তখন তিনি সাদরস্নেহ-সম্ভাষণে বলিলেন,— "যা, আর এ কাজ করিস্ না; এবার ক্ষমা করি-লাম।" ছাত্রগণ এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। তখন বেলা ১২টা। বাড়ী ফিরিবার জন্য বিদায় লইয়া ঠিক সিঁড়িতে নামিবার সময় তাহাদের একজন হাসিতে হাসিতে অনুচ্চস্বরে বলিল,— "কি কঠোর-প্রাণ; এতখানি বেলা হ'ল, তা বলিল না, একটু জল খেয়ে যা।" কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাণে গেল। তিনি তখন তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়া, সকলকে বলিলেন,— "ঠিক বলিয়াছিস্; আমার কঠোর প্রাণ বটে; অন্যমনস্কে তোদের একটু জল খাইতেও বলি নাই; আয় আয় একটু একটু জল খেয়ে যা।" ছাত্রগণ তখন অপ্রস্তুত হইল। কেহ কেহ হাতযোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল; কেহ কেহ বা তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। পরে তিনি সকলকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। উপরে গিয়া সকলকেই জল খাইতে হইল। তখন তাঁহার সেই প্রফুল্ল প্রসন্ন বদনখানি দেখিয়া একজন আর একজনকে বলিয়াছিল;—"এ লোকের রাগ হয় কেমন করিয়া?"

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা নানা প্রকারেই হইয়া-ছিল। শিক্ষা-প্রণালীর সুশৃঙ্খলা-স্থাপনে তিনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং তৎপক্ষে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থ এই সময় তিনি রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব মুদ্রিত করেন। কুমারসম্ভব মুদ্রিত করিবার সময়, তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন,- অমর,—রঘুবংশে, কুমার-সম্ভবে ও শকুন্তলা-নাটকে। ইহাদের তুলনা ইহ জগতে নাই। কুমার মুদ্রিত হইয়া গেলে বলিতে পারিব, বঙ্গের গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমৎ কাব্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।" ইহার পূর্ব্বে রঘুবংশ মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু কুমার মুদ্রিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় কালিদাসের কাব্যা-বলী কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা তিনি স্ব-প্রকাশিত "সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কাব্য-পুস্তক ব্যতীত তিনি দর্শনশাস্ত্রের অনেক পাঠ্য-পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫।৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হন

কখন বা কলেজেই খাইতেন। প্রাতে কিন্তু প্রত্যহ রাজকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে আহারের ব্যবস্থা ছিল।

ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার শিরঃপীড়ার সূত্রপাত হয়। তবে তিনি সে সময় বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, শিরঃপীড়া তাঁহাকে বড় কাতর করিতে পারিত না। দেহে তখন বল এবং শরীরে রক্ত যথেষ্ট ছিল। সকাল সন্ধ্যা তিনি "মুগুর" ভাঁজিতেন, 'ডন' ফেলিতেন; এমন কি রীতিমত ব্যায়ামও করিতেন। ইহাতে তাঁহার দেহে এত রক্ত জন্মে যে, ডাক্তারেরা তাঁহার একটা কঠোর পীড়া হইবে বলিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি তখন ভাল করিয়া ঘাড় বাঁকাইতে পারিতেন না। কঠোর পীড়ার আশঙ্কা করিয়াই ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় দুইবার ঘাড়ে ফস্ত খুলিয়া খানিকটা খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার সে তেজস্বিনী মূর্ত্তির একখানি প্রতিকৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে এখনও দেখা যায়। সে প্রতিকৃতি দেখিলেই মনে হয়, যেন সেই উন্নত-ললাট তেজঃপুঞ্জ সুন্দর পুরুষের গণ্ডস্থলে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক মাস পরেই, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বেথুন সাহেবের মৃত্যুজন্য দারুণ মনস্তাপ পাইতে হইয়াছিল। বেথুন সাহেব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও শিক্ষা-সভার সভাপতি ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার বহু-বিস্তার উদ্দেশে ইনিই কলিকাতায় প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর এতৎপক্ষে বেথুন সাহেবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বেথুন সাহেব স্ব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবৈতনিক "সেক্রেটরী" করেন। মেয়েদের লেখাপড়া শিখান কর্ত্তব্য, এ ধারণা ছিল বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সম্বন্ধে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অনেক বিরুদ্ধ-বাদীর সহিতও তাঁহাকে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এ ধারণার মূল কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী শ্লোক,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখান উচিত; এবং বেথুন সাহেবকেও বুঝাইয়াছিলেন এইরূপ। যে গাড়ী করিয়া মেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করিত, তাহাতেও লেখা থাকিত, এই কয়েকটী কথা। আমরা অধম হিন্দু, এখনও এই বুঝি, আমাদের পূর্ব্বতন রমণীরা যে শিক্ষায়, অন্নপূর্ণারূপে কীর্ত্তিমতী হইয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষাই এই শ্লোকের উপপাদ্য। কেবল গুরূপদেশ শুনিয়া সীতা-দ্রৌপদী যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষাই হিন্দু-রমণীর গ্রহণীয়। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, লেখা-পড়া শিখিলেই সংসারে সুখের সীমা থাকিবে না। তিনি সেটাকে ভাল ভাবিতেন, তাই তাহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাই বেথুন সাহেবের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা ভাবিয়া যাহাই করুন, ফলে মেয়েদের লেখা-পড়া-শেখায় এ মুহূর্ত্তে গরল উদ্গীর্ণ হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ লোকান্তরিত; কিন্তু যদি তাঁহার মতন কোন ভাগ্যবান তাঁহার প্রতিনিধিরূপে উত্থিত হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে নিশ্চিতই বলিতে হইবে;—

"সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

ফলে যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্যে সাধুতার আরোপ করিতে আপত্তি বোধ হয় কাহারও হইবে না। তাৎকালিক শাসন-কর্ত্তৃপক্ষেরও সে সম্বন্ধে সন্দেহ কিছুই ছিল না। সেই জন্যই তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ সম্মান করিতেন। বেথুন সাহেবের সমাধিকালে তদানীন্তন ডেপুটী লাট হেলিডে সাহেব তাঁহাকে আপন শকটে আরোহণ করাইয়া, সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী, বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল এতদর্থে ৮ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। "হোমডিপার্টমেণ্টে"র তাৎকালিক সেক্রেটরী স্যর সিসিল বিডন, বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বেথুন সাহেবের শোকে এত অধীর হইয়াছিলেন যে, তিনি বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী-পদ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তিনি

স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"যে মহাত্মার অবিচলিত অধ্যবসায়ে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত; যিনি উহার প্রাণ; তিনিই যখন জন্মের মতন চলিয়া গেলেন, তখন আর এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে প্রবৃত্তি হয় না।" বেথুন সাহেবের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতাদৃশ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া আপন বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এখনও পুত্র নারায়ণ বাবু সেই প্রতিকৃতি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধনিবন্ধন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী-পদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

যতদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী ছিলেন, ততদিনই কায়মনোবাক্যে ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে তিনি কন্যার মত ভাল বাসিতেন। ভালবাসাই ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। তিনি কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী, কাহাকেও মা ইত্যাদিরূপ সম্বোধন করিয়া, সকলেরই সহিত সাদর সম্ভাষণ করিতেন। একবার রাজা দিনকর রাও, তাঁহার সহিত বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া, বালিকাদিগকে মিঠাই খাইবার জন্য তিন শত টাকা দিয়াছিলেন। 'মিঠাই' খাইলে, মেয়েদের পেটের পীড়া হইতে পারে, প্রেসিডেন্ট বিডন সাহেবের এই ধারণা হইল; সুতরাং তিনি মিঠাই খাওয়াইতে নিষেধ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সেই টাকায় বালিকাদিগকে কাপড় কিনিয়া দিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি মাসি, মা, দিদি ইত্যাদি সম্ভাষণে প্রত্যেক বালিকাকে ডাকিয়া, প্রত্যেকের মত চাহিলেন। অধিকাংশেরই কাপড় লওয়া মত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ঢাকাই সাড়ি ক্রয় করিয়া বালিকাদিগকে বিতরণ করিলেন। বেথুন বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী পদ পরিত্যাগ করিবার পরও বিদ্যালয়ের উপর তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ও মমতা ছিল। শুনিতে পাই, বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী পরিচালন-প্রথা তাদৃশ মনোমত না হওয়ায় তিনি ইহার প্রতি শেষে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভালই হউক, আর মন্দই হউক, বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কাজ করিবেন বলিয়া মনে করিতেন, যে কোন প্রকারে হউক, তাহা না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া, তিনি মনে করিলেন, সংস্কৃত কলেজে শূদ্র জাতিরাও শিক্ষা পাইবে না কেন? তখন কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-জাতিরাই শিক্ষা পাইতেন। যাহাতে শূদ্র-জাতিও সংস্কৃত-শিক্ষা লাভ করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তৎপক্ষে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি শিক্ষা-সভায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। চারিদিকেই ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী হইতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন পক্ষ সমর্থনার্থ, স্বকীয় স্বভাবোচিত দৃঢ়তা সহকারে, নানা বচন-প্রমাণ-প্রয়োগে এবং বহুবিধ যুক্তি-তর্কবলে, বিপক্ষ পক্ষের মত খণ্ডন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন,—"যদি এ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে এ ছার পদ পরিত্যাগ করিব।" তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাঁহারই প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল। সেই সময় হইতে শূদ্রগণ সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র পড়িবার অধিকার পাইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় অবাধে বেদ-পাঠের ব্যবস্থা করিয়া আরও বাহাদুরী লইবার চেষ্টা পাইতেছেন। অধঃপতন ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে কি না। অনধিকারী শূদ্রের বেদপাঠে প্রবৃত্তি, কলির চরম পরিণাম; শাস্ত্রের লেখা, ব্যর্থ হইবে কেন? যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় শূদ্রের সংস্কৃত শিখিবার ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু বেদে অধিকার দিতে পারিলেন না। তাঁহার সময় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা শূদ্র—যে-কোন বর্ণের ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহার নিকট হইতে বেতন লইবার ব্যবস্থা হয়। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিন্সিপাল হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বেতনের ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। রাজা রামমোহন রায়-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া যে গবর্ণমেণ্ট বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা

করেন, সেই গবর্ণমেণ্টই শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে বেতনের ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে সুনাম বা কুনাম, গবর্ণমেণ্টের কি বিদ্যাসাগরের, বুদ্ধিমান অবশ্য তাহার বিচার করিবেন।

১৮৫১ সালের ১৬ই নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। বঙ্গের বিদ্যার্থিমাত্রেরই নিকট উপক্রমণিকা পরিচিত। উপক্রমণিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবনী-শক্তির পূর্ণ পরিচয়; প্রতিভারও পূর্ণবিকাশ। উপক্রমণিকা পাঠে ব্যাকরণে অবশ্য তলস্পর্শিনী ব্যুৎপত্তি জন্মে না; কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার এমন সহজ প্রবেশ-পথ যে আর দ্বিতীয় নাই, তাহা সুনিশ্চিত। প্রিন্সিপাল হইবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি "*Moral class book*" নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুত্রগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা, স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, বিনয় এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, এই কয়টী মাত্র প্রবন্ধ অনুবাদিত হইয়াছিল। পরে সময়াভাব হেতু অবশিষ্ট প্রবন্ধের অনুবাদ-ভার বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুর হস্তে অর্পিত হয়। রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুবাদিত এবং পূর্ব্বোক্ত অনুবাদিত প্রবন্ধ লইয়া নীতিবোধ পুস্তক হইল। রাজকৃষ্ণ বাবুই এই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী হইলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ কয়টী যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদিত, রাজকৃষ্ণ বাবু নীতিবোধে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

উপক্রমণিকার পরই সংস্কৃত ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ এবং ১৮৫২ খৃঃ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চ দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে উভয়ই উপযোগী। উভয়ই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যপুরাণের সার সঙ্কলনমাত্র; সুতরাং হিন্দুপাঠার্থীরও সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দেই তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠও মুদ্রিত হইয়াছিল। তৃতীয় ভাগ প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য এবং পাঠের উপযোগী পুস্তক।

১৮৫২ সালের ১১ই মে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছিল। ৩০। ৪০ জন লোক তাঁহার বাড়ীতে পড়িয়া সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে ছিলেন। ডাকাইতি পড়িলে, তিনি পরিবারবর্গসহ খিড়কীর দ্বার দিয়া পলায়ন করেন। এই ডাকাইতি-কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় সপরিবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। তখনও পিতা ঠাকুরদাস বিদ্যমান ছিলেন। বাড়ীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত বালকবৎ আনন্দে কপাটী খেলিতেছিলেন। যে দারোগা তদন্তে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। আবার তিনি যখন শুনিলেন, এই নিশ্চিন্ত যুবা দেশের শাসনকর্তৃপক্ষেরও সম্মানাস্পদ, তখন তাঁহার সর্ব্বোন্নত মুণ্ড হেঁট হইয়াছিল। যাহা হউক, তদন্তে ডাকাইতির কোন কিনারা হয় নাই। গ্রীষ্মাবকাশের অবসানে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এইখানে বলিয়া রাখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই উদ্যোগে ও চেষ্টায় বাঙ্গালার স্কুলসমূহে গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্ত্তিত হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তদানীন্তন ছোট লাট হেলিডে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোট লাট বাহাদুর তাঁহার মুখে ডাকাইতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি ত বড় কাপুরুষ; বাড়ীতে ডাকাইতি পড়িল, আর তুমি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলে?" এতদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"এখন আমার প্রতি কাপুরুষতার অভিযোগ আরোপিত করিতে পারেন; কিন্তু এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী যুবক যদি একাকী সেই ৩০। ৪০ জন সবল ডাকাইতের সহিত যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই ইহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইত। তখন বিদ্যাসাগরের নির্ব্বুদ্ধিতারই কলঙ্ক জগতময় রাষ্ট্র হইত। আপনিই হয় ত সর্ব্বাগ্রেই তাহারই রটনা করিতেন। যখন প্রাণ লইয়া, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি, তখন লুণ্ঠিত সর্ব্বস্বের জন্য আর ভাবনা কি বলুন!"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে হঠাৎ ডাকাইতি হইল কেন, এ প্রশ্ন স্বতই উত্থিত হইতে পারে। বাস্তবিকই কি তিনি তখন তাদৃশ বিষয়-বিভবসম্পন্ন হইয়াছিলেন? এ বিষয়ের

সন্ধানে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এইখানে বিবৃত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীতে যাইলে, বীরসিংহ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের দীন-দরিদ্র জনকে অর্থসাহায্য করিতেন। নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, সন্ধ্যার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, চাদরের খুঁটে টাকা বাঁধিয়া, লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া, গোপনে অর্থ-সাহায্য করিতেন। এইরূপ গোপনে অর্থ-সাহায্য করিবার কারণ এই যে, এই সকল লোক অবস্থাহীন বটে; কিন্তু ভদ্র-পরিবারভুক্ত; সুতরাং প্রকাশ্যে অর্থ-সাহায্যের প্রার্থনা করা নিশ্চিতই তাহাদের পক্ষে ঘোরতর লজ্জাকর।

এইরূপ অকাতরে অর্থ-বিতরণ করিতেন বলিয়া, লোকের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবার বিলক্ষণ বিষয়-বিভবসম্পন্ন; ডাকাইতদের মনেও সেই ধারণা হইয়াছিল। সত্য সত্যই কিন্তু কোন কালেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঞ্চয়-বাসনা ছিল না। পিতা-মাতাও বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই সঞ্চিত সম্পত্তি মনে করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, একবার হারিসন সাহেবকে স্পষ্টাক্ষরেই এই কথাই বলিয়াছিলেন। নারায়ণ বাবুই তৎসম্বন্ধে এই গল্পটী করিয়াছেন;—

"১৮৬৮ অব্দে হারিসন সাহেব ইনকম্ ট্যাক্সের তদন্তার্থ কমিশনর নিযুক্ত হন। বাবা তখন অবশ্য স্বাধীন। তিনি একদিন হারিসন সাহেবকে বীরসিংহের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। হারিসন সাহেব বলেন,—'হিন্দুপ্রথানুসারে বাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী নিমন্ত্রণ না করিলে, নিমন্ত্রণ লইব না।' সুতরাং নিমন্ত্রণ স্থগিদ রহিল। সময়ান্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী হারিসন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। সাহেব বীরসিংহগ্রামে গিয়া, হিন্দুপ্রথামতে দণ্ডবৎ হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীকে প্রণাম করেন। তিনি হিন্দুপ্রথানুসারে আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া, আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক বিদ্যাসাগরের জননীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনার কত ধন?" জননী সহাস্য-বদনে উত্তর করিলেন,—"চারি ঘড়া ধন।" সাহেব বলিলেন,—"এত ধন?" জননী তখন সহাস্য-বদনে জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অপর তিনটী পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—"এই আমার চারি ঘড়া ধন?" সাহেব বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"ইনি দ্বিতীয় রোমক-রমণী কর্নিলিয়া।"

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণ-কৌমুদীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তৃতীয় ভাগ কৌমুদী মুদ্রিত হয়। কৌমুদী, উপক্রমণিকার উচ্চতর সোপান।

১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ বিদ্যালয়ে রাত্রিকালে কৃষকপুত্রেরাও লেখা-পড়া শিক্ষা করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের অর্থে বিদ্যালয়ের জমী ক্রয় করেন। বিদ্যালয়ের বাটী-নির্ম্মাণও তাঁহারই অর্থে হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কোদাল ধরিয়া, ভিত্তিমৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। এই সময়ে একটী বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি মাসে বিদ্যালয়ে শিক্ষকাদির বেতনে তিন শত টাকা ও শ্লেট পুস্তক প্রভৃতিতে ১০০৲ টাকা তাঁহার মাসিক ব্যয় হইত। বালিকাবিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যয় মাসে ৪০৲।৪৫৲ টাকার কমে হইত না। এই সময় গ্রামের দীনদরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হয়। সকলেই বিনা মূল্যে ঔষধ পাইত। বিনা দর্শনীতে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন। একান্ত অবস্থাহীন দীন-দরিদ্র লোককে সাগু, বাতাসা প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহাতেও মাসিক ১০০৲ টাকা খরচ পড়িত। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজে ৩০০৲ টাকামাত্র বেতন পাইতেন। কিন্তু পুস্তকাদি বিক্রয়ে ৪।৫ শত টাকা আয় হইত। সঞ্চিত কিছুই থাকিত না, এইরূপে দাতব্য কার্য্যেই আয়ের পর্য্যবসান হইত। স্বভাব-দাতা কি সঞ্চয়ের প্রত্যাশা রাখে? বৃহত্তর হৃদয়ে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি প্রায়ই স্থান পায় না।

১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রিন্সিপালের পদের উপর স্কুল-ইনস্পেক্টরের পদও প্রাপ্ত হন। এ পদের বেতন ২০০৲ টাকা। মোট বেতন হইল ৫ শত টাকা। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন করাই হইল ইনস্পেক্টরের কার্য্য।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। নরম্যাল স্কুলে পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, অন্যান্য স্কুলে শিক্ষকতা

করিবার অধিকার জন্মিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং পরে পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য নরম্যাল স্কুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের তাৎকালিক তত্ত্বাবধায়ক উডরফ সাহেবের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাদানুবাদ হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। নরম্যাল স্কুলের কাজ প্রথম প্রথম প্রাতঃকালে সংস্কৃতকলেজের প্রশস্ত ভবনেই সম্পন্ন হইত।

ইনস্পেক্টর হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, হুগলী, বর্দ্ধমান এবং নদীয়া জেলার অনেক গ্রামে বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অনেক স্থানের সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন লোকদিগকে স্কুল-প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ দেন। তাঁহাকে তখন প্রায়ই মফস্বল-পরিদর্শনে যাইতে হইত। পরিভ্রমণ কালে পথে কোন পীড়িত চলৎশক্তিহীন লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, তিনি আপনি পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই আতুর লোককে পাল্কীর ভিতর তুলিয়া দিতেন; এবং স্বয়ং পদব্রজে চলিয়া যাইতেন। পরে কোন চটি পাইলে, তিনি পীড়িত ব্যক্তিকে সেই চটিতে রাখিয়া, চটির কর্ত্তাকে টাকা কড়ি দিতেন। পরিভ্রমণ কালে তিনি সঙ্গে টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি রাখিয়া দিতেন; দরিদ্র লোককে অবস্থানুসারে তাহা দান করিতেন। দয়ার সীমা নাই! অভাব জানাইয়া কেহ কখন বিমুখ হইত না। কত অভিভাবকহীন বালককে যে তিনি পুস্তক, বস্ত্র, বেতন প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, তাহার কি গণনা হয়? কোথাও গিয়া যদি শুনিলেন, অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কাহারও লেখাপড়া হইতেছে না, তিনি তখনই তাহাকে আপনার বাসায় আনাইয়া অথবা অন্য কোন রকম বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। শুনিয়াছি, একবার পরিদর্শনকালে ২৪ পরগণার নিবাধই দত্তপুকুর নিবাসী কালীকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেই সময় একটী দীন-হীন অনাথ ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, কাতর-কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আপনার অভাব ও দুঃখের কথা নিবেদন করে। তাহার অবস্থার কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি পরে সেই ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আপনার বাসায় আনাইয়া, তাহার লেখা-পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এইরূপ কত জনের অন্নসংস্থান ও অভাব-মোচন হইয়াছে, তাহা কত বলিব? কলিকাতার বাসায় এবং বীরসিংহ-গ্রামের বাড়ীতে প্রত্যহ শতাবধি লোক অন্ন পাইত। অনেকেরই লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যয়-ভার তিনিই বহন করিতেন। তাই বলি, তাঁর তুলনা হয় না।

বিদ্যাসাগর যেমন পুত্র, তাঁহার পিতা-মাতাও তদ্রূপ। অন্নদানে পিতার অপার আনন্দ। প্রতিপালা অন্নার্থীদিগের জন্য তিনি প্রত্যহ স্বয়ং বাজার হাট করিয়া আনিতেন। আর অন্নপূর্ণা-রূপিণী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, পরিবেশন করিতেন। এই সম্বন্ধে, অনেক কথাই শুনা যায়। নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন,—"ঠাকুর-মা গ্রামের অবস্থাহীন চাষাভূষ লোককে টাকা কড়ি ধার দিতেন। যাহারা সহজে ধার শুধিতে পারিত না, তিনি স্বয়ং তাহাদের বাড়ী টাকা আদায় করিতে যাইতেন; কখন কখন খুব চটিয়া গিয়া টাকা চাহিতেন; বলিতেন,—'তোরা যদি টাকা না দিবি, তবে আমি আর কি করিয়া টাকা ধার দিব?' তাঁহাকে রাগিতে দেখিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে নানা কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা দু-ফোটা চক্ষের জল ফেলিয়া দুঃখের কথা জানাইত; আর কেহ বা বিদ্যাসাগরের নাম করিয়া, ভগবানের কাছে, তাঁহার মঙ্গল কামনা করিত। তখন ঠাকুর-মার রাগ থাকিত না। আগুন জল হইয়া যাইত। তিনি তখন বলিতেন,—'ভাল ভাল, যখন সুবিধা হবে, তখন দিস্। আজ কিন্তু আমার বাড়ীতে চারিটী প্রসাদ পাস্।' কৃষক-কন্যারা তাঁহাকে আদর করিয়া, মুড়ি, নারিকেল, বাতাসা, প্রভৃতি জলখাবার দিলে, তিনি তাহা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া আসিতেন। ঠাকুর মা! প্রত্যহ মধ্যাহ্নে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া, এবং আশ্রিত অতিথিদিগকে আহারাদি করাইয়া, বাড়ীর দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন। হেটোরা হাট হইতে ফিরিবার সময় দরজার সম্মুখ দিয়া যাইলে, তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। কাহারও মুখখানি শুকনা দেখিলে তিনি বলিতেন,—'আহা! আজ বুঝি তোর

খাওয়া হয়নি? আয় আয়, আমার বাড়ীতে খাবি আয়।' ঠাকুর মা বড় বড় মাছ ভাল বাসিতেন; মাছ কুটিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইবেন, এই তাঁর সাধ। এইজন্য ঠাকুরমা কখন কখন ঠাকুরদাদার উপর রাগ করিলে, ঠাকুরদাদা বড় বড় মাছ আনিয়া তাঁর মান-ভঞ্জন করিতেন। কোন দিন যদি ঠাকুরমা রাগ করিয়া ঘরের দরজা দিয়া শুইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ঠাকুরদাদা যেখান হইতেই হউক, একটা বড় মাছ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ঘরের দরজায় আছাড় মারিয়া মাছটাকে ফেলিয়া দিতেন। ঠাকুরমা ঘরের ভিতর হইতে মাছ আছড়ানির সাড়া পাইয়া তখনই খিল খুলিয়া বাহিরে আসিতেন; এবং হাসিতে হাসিতে আপনি মাছ কুটিতে বসিতেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্থব্যয়ে অন্নের যোগাড় করিতেন; পিতা তাঁর হাট বাজার করিতেন এবং মাতা রন্ধনাদি করিতেন। এমন নহিলে এমন পুত্র!

যাহাকে যেরূপ সাহায্য করিলে উপকার হইত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার জন্য তাহাই করিতেন। ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অনেক পাঠকেরই পরিচিত। ইনি হিন্দুস্কুল হইতে ৪০৲ টাকার বৃত্তি পাইয়া, ঢাকা কলেজের শিক্ষক হইয়াছিলেন। সে কার্য্যে সুবিধা না হওয়ায়, তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে পদত্যাগ করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আপনার বাসায় আশ্রয় দেন; এবং পরে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া, হিন্দুস্কুলে তাঁহার একটী চাকুরী করিয়া দেন। এই প্রসন্নবাবু পরে সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপাল এবং অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বীরসিংহ গ্রামে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অধিক বয়সেও প্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে ইংরেজী শিখিতেন।

কি আত্মীয়-পরিজন, কি ভ্রাতা-ভগিনী, কি বন্ধু-বান্ধব সকলের প্রতিই বিদ্যাসাগর মহাশয় সমান প্রীতিমান ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান ৺ শ্যামাচরণ বিশ্বাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। ইহাঁর বাড়ী সংস্কৃত কলেজের সম্মুখেই ছিল; ইহাঁর পৈতৃক বাসস্থান হুগলীজেলার অন্তর্গত পাঁইতেল গ্রাম;—কলিকাতা হইতে ৮।৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্যামাচরণ বাবুর অনুরোধে একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় পাঁইতেল গ্রামে গিয়াছিলেন।" লেখকের পিতৃ-মাতুলালয় এই পাঁইতেল গ্রামে। পিতার মুখেই শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁইতেলে গিয়া তত্রত্য অনেক দীন-দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন; পাঁইতেল ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য দলে দলে বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, পাঁইতেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হন। জ্বরের সঙ্গে নাসা রোগেরও সঞ্চার হয়। শুনা যায়, এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় নস্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পর তিনি নস্য ছাড়িয়া দেন। তিনি ৩০।৩২ বৎসর বয়সে তামাক ধরিয়াছিলেন।

নারায়ণ বাবু বলেন;—"বারাশত-নিবাসী ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্রের সহিত বাবার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ছিল। ইহাঁর সহোদর কালীকৃষ্ণ বাবুও বাবার বন্ধু ছিলেন। নবীন বাবু কলিকাতায় ঝামাপুকুরে থাকিতেন। বাবা প্রায়ই তাঁহার বাসায় যাইতেন। নবীন বাবু বড় তামাকপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি বাবাকে তামাক খাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বাবা কিছুতেই তামাক খাইতে সম্মত হন নাই; কিন্তু নবীন বাবু তাঁহাকে একবার তামাক না টানাইয়া ছাড়িলেন না। পরদিন নবীন বাবুকে আর তামাক খাইবার কথা বলিতে হয় নাই; বাবা স্বয়ংই হুকুম করিয়া তামাক আনাইলেন; বন্ধু নবীন বাবু কিন্তু সে তামাকের কলিকা পাইলেন না। এই সময় হইতে বাবা তামাকে অভ্যস্ত হন। তিনি তামাক ও পান বড় ভাল ভাসিতেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ "বেথুন-সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় তল্লিখিত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হয়।* এই প্রবন্ধ ১৮৫৬ সালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল;—সংস্কৃত ভাষা,—সাহিত্যশাস্ত্র,—মহাকাব্য,—রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ,

* শুনা যায়, ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এ প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন।

নৈষধ-চরিত, ভট্টিকাব্য, রাঘবপাণ্ডবীয়, গীত-গোবিন্দ; খণ্ডকাব্য,—মেঘদূত, ঋতুসংহার, নলোদয়, সূর্য্যশতক,; কোষকাব্য,—অমরুশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক, আর্য্যাসপ্তশতী; চম্পূকাব্য,—কাদম্বরী, দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা; দৃশ্যকাব্য,—অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বীরচরিত, উত্তর-চরিত, মালতীমাধব, রত্নাবলী, নাগানন্দ, মৃচ্ছ-কটিক, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার; নীতিগ্রন্থ,—পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, এবং কথাসরিৎসাগর।

১২ পেজি ডিমাই আকারে ৮৯ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। বিষয় বিবেচনায় আলোচনা যে অতি-সংক্ষিপ্তসার হইয়াছে, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"এই প্রস্তাব, প্রথমতঃ, কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুক্ত ডাক্তর মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।

"যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমাজের স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে; এজন্য, আমি উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি, অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক, আমাকে বিনা মূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে, আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

"আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, কোনও রূপেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে। বীটন সোসাইটিতে, এক ঘণ্টা মাত্র সময়, প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত, নিরূপিত আছে; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু অনবকাশহেতু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। বঙ্গের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে! এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও ভাষা-প্রাঞ্জলতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া অবধি, বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনেক দুঃস্থ ও নিঃস্ব ব্যক্তির মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার ও তৎপিতার আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্লভ সিংহের মৃত্যুর পর, সিংহপরিবারের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তৎপুত্র ভুবন-মোহন সিংহের ৩০৲ টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ভুবন বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সেই বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ভুবন সিংহের জামাতার প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল। জামাতা প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্যামাচরণ ঘোষাল নামক এক আত্মীয়ের ১০৲ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এমন মাসহারার বন্দোবস্ত অনেকেরই ছিল। মাসহারা ব্যতীত অনেকে অন্য প্রকারে সাহায্য পাইত। সকল জানিবার উপায় নাই। কেননা পাছে লজ্জা পায় বলিয়া, অনেককেই তিনি গোপনে গোপনে সাহায্য করিতেন। নারায়ণ বাবু বলেন,—"বাবা অনেককেই সাহায্য করিতেন বটে; দেখিতাম, অনেকেই তাঁহার নিকট সাহায্য লইতে আসিতেন; কিন্তু তাহাদের অনেকেরই নাম-ধাম জানিতাম না; এমন কি, অনেক দানের কথা খাতায় খরচ পর্য্যন্ত লিখা হইত না। তবে যাহাদের মাসিক বন্দোবস্ত ছিল, তাহাদের নাম পাওয়া যায়।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন কলেজে ইংরেজি পড়িবার ব্যবস্থা ছিল বটে; কিন্তু তৎ-সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত বা সুশৃঙ্খলা ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার সুশৃঙ্খলা বন্দোবস্ত করিয়াছেন। নিয়ম হইল, সংস্কৃত পরীক্ষার যেরূপ নম্বর রাখিতে হয়, ইংরেজিতে সেরূপ নম্বর রাখিতে হইবে। কাজেই তখন ছাত্রগণ ইংরেজি শিক্ষায় পূর্ব্বাপেক্ষা মনোনিবেশ করিলেন। সেই সময় হইতেই রীতিমত ইংরেজি শিক্ষা হই-

তেছে। ইহাতে সংস্কৃত-শিক্ষা-স্রোত কিন্তু অনেকটা তেজোহীন হইয়াছে। এই সময় কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব সচিব শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নীলাম্বর ভবিষ্যতে বড়লোক হইবেন।

পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে লীলাবতী ও বীজগণিত পড়ান হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহার স্থানে ইংরেজিতে অঙ্ক শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাৎকালিক বীজগণিতের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে সিবিল আইন শিক্ষা করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই চেষ্টায় ও যত্নে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুন্সেফ-পদ পাইয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃঃ অঃ ৯ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গলা "শকুন্তলা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা সংস্কৃত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র অনুবাদ। এ অনুবাদ অবশ্য নাটকাকারে নহে। অক্ষরে অক্ষরেও নহে;—প্রধানতঃ ভাবানুবাদ। বলা বাহুল্য, শকুন্তলার এমন সুন্দর অনুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "শকুন্তলা" পড়িয়া "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র মাহাত্ম্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

এইবার সেই বিরাট ব্যাপার। যাহাতে হিন্দুসমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘোরতর অখ্যাতি; এবং অহিন্দু ও অহিন্দু-ভাবাপন্ন সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি; সুতরাং যাহার জন্য তাঁহার নাম বিশ্বব্যাপী; এবার সেই "বিধবা-বিবাহে"র কথা আসিয়া পড়িল। এ সম্বন্ধে এক্ষেত্রে সবিস্তর সমালোচনার স্থান হইবে না; তবে এইখানে এই পর্য্যন্ত বলাই পর্য্যাপ্ত যে, তিনি এতদর্থ যেরূপ অটুট অধ্যবসায় সহকারে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই। এ অহিন্দু-আচার হিন্দুসমাজে যে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই, ইহাই হিন্দুসমাজের সম্যক্ সৌভাগ্যেরই পরিচয়। বলিতে হইবে, কারুণ্য-প্রাবল্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মসংযমে সক্ষম হন নাই। তাই তিনি ভ্রান্তবিশ্বাসের বশে এই অকীর্ত্তিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহার্থ, শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য অনেকে তাঁহাতে শাস্ত্রানুরাগিতা আরোপিত করেন; কিন্তু অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না। শেষোক্তের মতে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ি মহাশয় "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ" নামক গ্রন্থে এই কথার প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদের মতে, তিনি স্বেচ্ছামতে ও সজ্ঞানে অকার্য্য করিবার লোক নহেন; ভ্রান্তবিশ্বাসই মূলাধার। সারল্য ও কারুণ্যের পরিচয় কিন্তু পদে পদে। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুর আদর্শ নহেন সত্য; কিন্তু যে গুণে মোক্ষমূলর-প্রমুখ বিদেশী ব্যক্তিগণ বড় বলিয়া পরিচিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই গুণে এদেশে বড়। যেজন্য ডুবাল মোক্ষমূলরের জীবনী প্রয়োজনীয়, সেই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীরও প্রয়োজন।

বাল্য-বিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ব্যথিত হইতেন, তাই তিনি বাল্যকাল হইতেই বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের প্রয়াসী ছিলেন। শাস্ত্রানুসারে শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু বলেন;—"১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এক দিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতেছিলাম; তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাশরসংহিতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দবেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"পাইয়াছি, পাইয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"কি পাইয়াছ?" তিনি তখনই পরাশরসংহিতার সেই শ্লোকটী আওড়াইলেন,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

বিধবা-বিবাহের ইহাই অকাট্য প্রমাণ বলিয়া, তিনি তখন লিখিতে বসিলেন। এইরূপে তিনি সারা রাত্রিই লিখিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পরে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিলেন। সহরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারি দিকেই বাদ-প্রতিবাদের ধূম লাগিয়া গেল। তিনিও গুরুতর পরিশ্রম-সহকারে নানা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছিলেন। এমন কি,

একটী একটী শ্লোকের অর্থ-নির্ণয় করিতে সারা রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে বা ১২৯২ সংবতের ৪ঠা কার্ত্তিক 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' নামক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিপিচাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এক সপ্তাহ কালের মধ্যে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, বীরসিংহগ্রামে একবার একটী বালিকার বৈধব্য সংঘটনে ব্যথিত হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, শাস্ত্রীয় মতে বিধবার বিবাহ হইতে পারে কি না, পুত্রকে তাহাই প্রশ্ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দিন হইতেই শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সংগ্রহ করিতে থাকেন। পরে তিনি পিতার অনুমতিক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এ কথা কতদূর সত্য, তা জানি না; তবে নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর ধারণা ছিল, পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অভ্রান্ত। বিদ্যাসাগরমহাশয় যেসকল বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী তাহাদের কহারও কাহারও সহিত আহার করিতেন। এক দিন নারায়ণ বাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরমা! তুমি যে ইহাদের সহিত আহার করিতেছ? ইহাতে যে জাতি যাইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী উত্তর দিলেন,—"দোষ কি? ঈশ্বর বহুশাস্ত্রজ্ঞ; ঈশ্বর কি অন্যায় কাজ করিতে পারে?"

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ১৩ই জুলাই বিধবা-বিবাহের আইন পাস্ হয়। ১৮৫৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর এই আইনমতে প্রথম বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল, সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে। বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; কন্যা কালীমতী। কন্যা ৬ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল; ১০ বৎসর বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ হয়। পরে আর কয়েকটী মাত্র বিধবার বিবাহ হইয়াছিল।*

১৮৫৫ সালের ১৩ই এপ্রেল এবং ১৮৫৫ সালের ১৪ই জুন বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ এবং দ্বিতীয়ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বর্ণপরিচয়েও বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়। ইহার পূর্ব্বে শিশুদিগের বর্ণপরিচয় ও প্রথম শিক্ষার উপযোগী এমন সরল পুস্তক আর ছিল না।

একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺প্যারীচরণ সরকারের বাটীতে নির্দ্ধারিত হয়,—প্যারী বাবু ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ্যসমূহ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা পাঠ্যসমূহ প্রণয়ন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে দুই জনই এই ভার লইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মফস্বলে স্কুল-পরিদর্শনে যাইবার সময় পাল্কীতে বসিয়া বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেন। প্রথম প্রকাশেই বর্ণপরিচয়ের আদর হয় নাই। ইহাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ হন; কিন্তু ক্রমে ইহার আদর বাড়িতে থাকে।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কথামালা এবং ১৮৫৬ সালের ১৫ই জুন চরিতাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, দরিদ্র ও হীন অবস্থা হইতে স্বকীয় অধ্যবসায়ে লোকে কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করাই চরিতাবলী-রচনার উদ্দেশ্য; এই জন্যই এই গ্রন্থে ডুবাল, উইলিয়ম রস্কো প্রভৃতি বৈদেশিক খ্যাতনামা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনাভাস প্রকটিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বঙ্গের দ্বিতীয় ডুবাল। তবে যেজন্য জীবনচরিত হিন্দু-সন্তানের পাঠোপযোগী নহে, সেই কারণেই চরিতাবলীও হিন্দু-সন্তানের সুপাঠ্য নহে।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার অন্যতম সভ্য হন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইবার প্রস্তাব হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় একাই সিনেটের অন্যান্য সভ্যদিগের বিপক্ষে ব্রতী হইয়া, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। অবশেষে তাঁহারই জয় হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় "সেনট্রাল কমিটির" সভ্য হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ানেরা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পর, এই "সেণ্ট্রাল কমিটী"র নিকট দেশীয় ভাষার পরীক্ষা দিতেন। এই কমিটী বড় লাট বাহাদুর লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পণ্ডিতদের বেতন অল্প বলিয়া, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা পণ্ডিতি করিতে বড় একটা রাজি হইতেন না; এই সময় এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়

* বিধবা-বিবাহের সংক্ষিপ্ত বিচার ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের সুবিস্তর সমালোচনা স্বতন্ত্র পুস্তকে করিবার ইচ্ছা রহিল।

তদানীন্তন ইন্‌স্পেক্টর প্রাট সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। তাহার অনুলিপি এই ;—

NO. 1107.

From

THE PRINCIPAL, SANSCRIT COLLEGE.

TO.

Hodgson Pratt Esqr
Inspector of Schools, South Bengal
Fortwilliam, 13th March 1857.

Sir, I have the honor to acknowledge the receipt of your letter No. 174 dated 10th ultimo, and in reply to observe that the students of the Sanscrit College are certainly the most competent Vernacular Teachers, but in consequence of the salary proposed for the Teachers of science in the Anglo Vernacular Schools being very low, I regret that none of them who are qualified to fill the posts is willing to accept them, especially as there is a little or no prospect of advancement. If arrangements can be made to raise the salary to 50 Rupees per month, parties may come forward, but the Institution cannot by any means supply such Teachers monthly. The supplies can be made from the senior classes only, but as the number of students in them is generally small and as they cannot complete the requisite course and qualify themselves, it is only at the end of a year the Teachers can be furnished from among them. A large number of Teachers will perhaps never be available as all the students can scarcely be expected to accept of the proffered posts.

I have & &
Sd. Eshwar Chundra Sharma
Principal Sanscrit College.

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে এডুকেশন কৌন্সিলের স্থানে বর্ত্তমান পবলিক ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমান ডাইরেক্টরের পদ-সৃষ্টিও এই সময় হইল। গর্ডন ইয়ং সাহেব প্রথম ডাইরেক্টরি পদে নিযুক্ত হন। ইয়ং সাহেব তখন নবীন সিবিলিয়ান। ছোট লাট হেলিডে সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাস কয়েক ইহাঁকে শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যে শিক্ষা দেন।

তদানীন্তন ছোট লাট হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এমন কি, ছোট লাট বাহাদুর তাঁহাকে পরমাত্মীয় বন্ধু ভাবিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বাহাদুরের বাটীতে গিয়া নানা বিষয়ের পরামর্শ করিতেন। একদিন বহু সম্ভ্রান্ত লোক, ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহারা যাইলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় তথায় গিয়া উপস্থিত হন। ছোট লাট বাহাদুর সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, চটিজুতা পায়ে এবং মোটা চাদর গায়ে দিয়া। ছোটলাট বাহাদুর তাঁহাকে চোগা চাপকান ও পেণ্টুলন পরিয়া যাইতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার কথামতে দিন কয়েক মাত্র চোগা-চাপকান পরিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি লজ্জা ও কষ্ট বোধ করিতেন। সেইজন্য তিনি সে বেশ পরিত্যাগ করেন। ইহার পরজীবনে তিনি আর এ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন নাই। তিনি কখন মৎস্য ভিন্ন অন্য মাংস আহার করিতেন না ; একবার মৎস্যাহার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; মাতৃ-অনুরোধে পুনরায় মৎস্য খাইতে আরম্ভ করেন। নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন, "মুরগী বা অন্য কোন অখাদ্য মাংস খাইয়াছে শুনিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। স্বাধীনাবস্থায় একবার পীড়িত হইয়া তিনি ফরাসডাঙ্গায় ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে মুরগীর ঝোল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন,—প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, এ কাজ করিব না।"

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়, হেলিডে সাহেবের আদেশে বহুস্থানে বহু বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সব বিদ্যা-

য়ের শিক্ষক-পণ্ডিতগণ মাসিক বেতনের জন্য বিল করিয়া, বেতন প্রার্থনা করিলে, তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেব তাহা মঞ্জুর করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন, ইনস্পেক্টর-পদে নিযুক্ত হন, তখন হইতেই, ইয়ং সাহেবের সহিত মতান্তর হওয়ায়, তাঁহার একটু মনোবাদ হয়। বর্ত্তমান বিল নামঞ্জুরী সূত্রে সেই মনোবাদ প্রবলতর হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট বাহাদুরকে এ কথা জানাইলেন। ছোটলাট বাহাদুর নালিষ করিয়া টাকা আদায় করিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নালিষের চির-বিরোধী. কাজেই তিনি স্বয়ং ঋণ করিয়া বিলের টাকা দেন। ক্রমেই মনান্তর গুরুতর হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"হুগলি, নদীয়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, এই জেলা চতুষ্টয়ের স্কুল-সমূহের, এস্পেসিয়াল ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সকল জেলায় বিদ্যালয় সমূহের যেরূপ উন্নতি পরিদর্শন করেন, তদনুযায়ী রিপোর্ট করিয়া থাকেন, তজ্জন্য ডিরেক্টর অর্থাৎ শিক্ষাসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলেন, 'এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ভালরূপ সাজাইয়া, রিপোর্ট করিবে, নচেৎ সাধারণের নিকট গৌরব হইবে না।' অগ্রজ বলিলেন, 'যাহা হইতেছে, আমি তাহাই লিখিব ; বাড়াইয়া লেখা আমার কর্ম্ম নহে। যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।' তেজস্বী বিদ্যাসাগরে ইহা অসম্ভবই বা কি!"

রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইয়ং সাহেবের নামে ছোট লাট বাহাদুরের নিকট অনেক বারই অভিযোগ করিয়াছিলেন। ছোট লাট বাহাদুর, ডিরেক্টর মহাশয়ের সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া কাজ করিতে পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তৎপক্ষে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইয়ং সাহেবের সহিত সম্প্রীতি হইল না ; অথচ ছোট লাট বাহাদুর কোন সদুপায় করিলেন না ; অগত্যা রাগে দুঃখে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল ও ইনস্পেক্টর পদ পরিত্যাগ করিলেন। তেজস্বিতা বটে!

বিলাতী দেশলাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী দেশলাই আমরা চক্ষে দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজ কাল প্রতিবৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ লক্ষ টাকার দেশলাই বিলাত প্রভৃতি বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি হইয়া থাকে।

ইহার পূর্ব্বে দেশলাইএর জন্য আমাদের কি খরচ হইত? ৺শ্যামাপূজার সময়ে বালকদিগের খেলিবার প্যাঁকাটি হইতে দু-এক আটি রাখিয়া মধ্যে মধ্যে আধ-পয়সা বা সিকি-পয়সার গন্ধক কিনিয়া দেশলাই করিলেই, তখন সংবৎসর কাটিয়া যাইত ; কেবল কেবল সোলা-চকমকিতেই সংসারীর সুখে কাল অতিবাহিত হইত। এখন পঁচিশ লক্ষ টাকায় যে পরিমাণ বিলাতী দেশলাই পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ প্যাঁকাটির দেশলাই করিতে ৬৷৷০ মণ গন্ধক লাগিতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কার্য্য পঁচিশ বা ত্রিশ টাকায় হইতে পারিত, এখন তাহার জন্য পঁচিশ লক্ষের অধিক টাকা বা আট লক্ষ মণ চাউল দিতে হয়।

সেজন্য দুঃখ করা বৃথা! কেননা, আমরা যে এখন সভ্য হইতেছি! এখন গরবিণী গৃহিণী যদি সোলা-চকমকি লইয়া, অথবা প্যাঁকাটির দেশলাই লইয়া, আগুন করিতে বসেন, তবে লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে! আর এমন অসভ্য অভব্য অনব্য কার্য্য করিতেই বা বলে কে?

যাহা হউক, সভ্য হই, তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে জড়-ভাবাপন্ন হইতে হয়, তাহা ত জানি না! কেননা, যতই সভ্য হইতেছি, ততই নিজেদের কার্য্যগুলি অপর দেশের লোকের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতেছি। কাপড়-বুনিবার ভার ম্যাঞ্চেষ্টরে ; কর্ম্মকার-কার্য্যের ভার বার্ম্মিংহামে ; শীত-বস্ত্রের ভার জার্ম্মাণীতে ; ঔষধের ভার প্রধানত জার্ম্মাণীতে ; আলো জ্বালিবার (কেরোসিন) তৈলের ভার এমেরিকায় ; দেশলাইএর ভার প্রধানত সুইডেনে। সাত সমুদ্র-পারে এক একটী দেশের উপর এই রূপ সকল দ্রব্যের ভার দিয়া, বড়ই ব্যস্ত হইয়া "দেশের হিত" "মানবজাতির হিত সাধিয়া বেড়াইতেছি!

কেহ বলিবেন, আমরা বড় ধনী হইয়াছি, তাই আমাদের এ সকল খরচ বাড়িয়াছে; এই দেশলাইএর ব্যাপারেই তাহা বুঝুন। থর্পস্‌ সাহেবের কৃত ব্যাবহারিক রসায়ন পুস্তকে লিখিত আছে,—ইংলণ্ডে প্রতি জনে প্রতিদিন ৮টী কাঠী দেশলাই ব্যবহার করে; ফ্রান্সে ৯, বেলজিয়মে ৬ ইত্যাদি। সুতরাং আমাদেরও হিসাব করিয়া দেখিতে হয়, আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন কয়টী কাঠী ব্যবহার করি। ২৫ লক্ষ টাকায় ২৫ লক্ষ গ্রোস বাক্স দেশলাই পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রায় ৩৭ কোটি বাক্স। ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা ২৫ কোটি। সুতরাং ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে দেড় বাক্স বা মাসে ৬টী কাঠী ব্যবহার করে। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের অধিকাংশ লোকেই দেশলাই কিনিতে অক্ষম। যে ব্যক্তি দেশলাই ব্যবহার করে, তাহার অন্ততঃ মাসে এক বাক্স নহিলে চলে না। সে হিসাবে দেখা যায়, এই ২৫ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে দেড় কোটি মাত্র লোকে দেশলাই ব্যবহার করে। অবশিষ্ট ২৩॥০ কোটি লোকে দেশলাই মোটেই ব্যবহার করে না; অর্থাৎ মাসে বা দুই মাসে একটী পয়সা খরচ করিতেও অক্ষম। এখানে অক্ষম ভিন্ন আর কি অনুমান করা যাইতে পারে? এমন সুন্দর সুবিধার দ্রব্য পাইলে অক্ষম ব্যতীত, কে তাহা ছাড়ে? যদি ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের মত দেশলাই খরচ আমাদের দেশে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে লোক পিছু বৎসরে ষাট বাক্স খরচ হইতে পারে; সুতরাং বৎসরে ভারতে দশ কোটি টাকার দেশলাই আবশ্যক হইবে। কিন্তু যতদিন অন্ততঃ আমরা এ দেশে এ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে না পারি, ততদিন যেন দশ কোটি টাকার বিদেশী দেশলাই কিনিতে না হয়।

অন্যান্য বিলাতী শিল্প-কার্য্য, যেমন অনেক বিস্তৃত মূলধন এবং প্রকাণ্ড কল-কারখানা নহিলে হয় না, দেশলাই করিতে তাহা নহে; ইহাতে মূলধনও সামান্য এবং কল-কারখানাও তুলনায় সামান্যই লাগে বলিতে হইবে। আমাদের সাধারণত ধারণা আছে যে, না জানি কি অদ্ভুত উপায়েই এরূপ সস্তায় দ্রব্য বিক্রয় করে! সে ভ্রম ঘুচাইবার জন্য এবং যাহাতে এ সকল বিষয়ে লোকের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য দেশলাই প্রস্তুত করিবার নিয়মের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র নিম্নে দেওয়া গেল।

আমরা সচরাচর যে "পয়সায় দুইবাক্স" দেশলাই ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই সুইডেন-দেশীয়; কদাচিৎ দু-একটা ইংলণ্ডের বা জাপানের। খাস বিলাতেও সুইডিস্‌ দেশলাই এত অধিক প্রচলিত যে, সাহেবদিগকে এজন্য সময়ে সময়ে দুঃখ করিতে হয়। দেশলাইয়ের কাঠী যত শীঘ্র করিতে পারা যায় এবং লোকের মজুরী যত কম হয়, দেশলাই তত শস্তায় বিক্রয় হয়। ইংলণ্ডে এক গ্রোস দেশলাইএর জন্য সুইডেন অপেক্ষা আড়াই গুণ অধিক মজুরী লাগে। এই জন্য ইংলণ্ড, সুইডেনের মত সস্তা দেশলাই করিতে পারে না। আমাদের দেশে লোকের মজুরী, সুইডেন অপেক্ষায়ও কম পড়িবে।

দেশলাই করিবার কারখানায় একটী এঞ্জিন বা বাষ্পযন্ত্র থাকে; এবং বড় কাষ্ঠ ছোট করিয়া কাটিবার,—কাঠী কাটিবার,—বাক্সের কাষ্ঠ কাটিবার প্রভৃতি আরও অনেক যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রগুলি উপরোক্ত এঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। ইহা ছাড়া অপর অনেক কার্য্য হস্ত দ্বারা সাধিত হয়।

প্রথমত আবশ্যক মত পুরু কাষ্ঠের তক্তাকে কলের করাত দ্বারা ছোট ছোট সমান অংশে কাটা হয়। এই করাত হাত-করাতের মত নহে; ইহা চক্রাকার; এঞ্জিনের দ্বারা ঘুরিতে থাকে; সম্মুখে কাষ্ঠ ধরিলেই কাটিয়া যায়। এই সকল কাঠের টুকরা, লম্বে দেশলাই কাঠীর সমান বা দ্বিগুণ; প্রস্থ এবং পুরু ইচ্ছামত এক মাপের। কাঠী কাটিবার যন্ত্র দেশভেদে অনেক প্রকারের ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার ইউর কৃত পুস্তকে একপ্রকার যন্ত্র এইরূপে বর্ণিত আছে;—লৌহ বা তাম্রের এক খানি প্লেট; তাহাতে চালুনীর ন্যায় অনেক ছিদ্র আছে, ঠিক যেন মিহিদানা তৈয়ারির চৌকা ঝাজরি খানি; সেই ঝাজরির ছিদ্রের মুখগুলি ক্ষুরের ন্যায় ধারাল। ঐ কাষ্ঠগুলি, ইহার উপর দাঁড়ান ভাবে রাখিয়া এঞ্জিনের সাহায্যে কাষ্ঠের উপর চাপন দিলে, এক দমে উক্ত ছিদ্র দিয়া বহু সংখ্যক কাটি হইয়া বাহির হয়। ১ ফুট দীর্ঘ এক ফুট প্রস্থ তামার প্লেটে প্রায় হাজার ছিদ্র থাকিতে পারে। এঞ্জিনের দ্বারা তিন বা চারি বর্গফুট পরিমাণ অনেকগুলি প্লেটে এককালীন

...প দেওয়া যাইতে পারে; সুতরাং কাষ্ঠগুলি ...জান হইলেই প্রতি দশ মিনিটে লক্ষ লক্ষ কাঠী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুইডেন দেশে এস্পেন (*Aspen*) নামক এক প্রকার অতি নরম কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়; তাহাকে ...না করিয়া, গুঁড়িগুলি ১৪ ইঞ্চ দীর্ঘ করিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়; তাহার পর কুঁদ্‌যন্ত্রের ন্যায় কলে-চালিত 'লেদ' (*Lathe*) নামক যন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া, তাহার ছাল খুলিবার মত সমস্ত কাষ্ঠখণ্ডকে দেশলাই কাষ্ঠের মত পুরু ছালের আকারে পরিণত করা হয়। (আমাদের এখানে সোলাকে এই ভাবে কাটিয়া অনেকটা প্রশস্ত করা হয়, তাহাতে বিবাহের টোপর ইত্যাদি হয়।) কাষ্ঠখণ্ড ঘুরিবার সময়ে উপরে সংলগ্ন ছয়খানি ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া ছালটা ২ ইঞ্চি প্রস্থ ৭ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, দীর্ঘে অনেকটা লম্বা হয়। যে ইঞ্চি প্রস্থ বলা হইয়াছে, তাহা যে কাষ্ঠের লম্বা-ভাব, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছেন। উক্ত ২ ইঞ্চি প্রস্থ ৬ ফিট দীর্ঘ ৯০ খানি ছাল লইয়া জাঁতির আকারের যন্ত্রে চাপ দিয়া কাঠীর আকার কাটা হয়। প্রতি মিনিটে ১২০ বার চাপ দিলে ঘণ্টায় প্রায় দশ লক্ষ কাঠী কাটা হইয়া থাকে।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কাষ্ঠ অত্যন্ত নরম না হইলে উপরোক্ত দুই উপায় সচরাচর সম্ভবে না। ইংলণ্ডে পাইন (*Pine*) জাতীয় কাষ্ঠ এজন্য ব্যবহৃত হয়। সুইডেন এস্পেনে (*Aspen*) এবং অপরাপর কাষ্ঠও ব্যবহৃত হয়। সে সকলের ইংরেজি নাম—*Poplar, Linden, beech, Willow birch* ইত্যাদি। আমাদের দেশে দেবদারু, কোলু প্রভৃতি সেই জাতীয় কাষ্ঠ; সজিনা, গেঁয়ো, খলিষা, আম, নীল ও অরহরের ডাঁটা, কাঠীর জন্য উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। যদি ঝাঁটার কাঠীকে ভালরূপ জ্বালিবার উপযুক্ত করিয়া লইতে পারা যায়; তাহা হইলে কলও চাই না, ইঞ্জিনও চাই না, একচালে বাজিমাৎ হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা একবার বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। নারিকেলের ঝাঁটার কাঠীতে দেশলাই হইলে, এক পয়সায় ৮ বাক্স বিক্রয় হইতে পারে। গাছকতক ঝাঁটায় সুইডিস্, বিলাতী, জাপানী, সকলকে তাড়াইতে পারা যায়।

যাহাতে সকল প্রকার কাষ্ঠ অত্যন্ত শীঘ্র ও সুবিধায় কাটা যায়, সেজন্য এখন এমেরিকায়, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ প্রভৃতি দেশে আরও কৌশলময় যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

দেশলাই-বাক্সের কাষ্ঠও উপরোক্ত নানারূপ কৌশল দ্বারা যাহাতে অতি সহজে পরিষ্কার ভাবে কর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেরূপ যন্ত্র আমরা নিজে নির্ম্মাণ করিব এমনটা এখন অসম্ভব। বিদেশীয় যন্ত্রের উপর নির্ভর করাই ভাল।

যন্ত্রের দ্বারা কাঠীগুলি কাটা হইলে, হস্তের দ্বারায় কিংবা যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি লইয়া আঁটি বাঁধে। আঁটি বাঁধিয়া ভিজা থাকিলে শুকাইতে হয়। শুকাইয়া তাহার মুখে পূর্ব্বে গন্ধক লাগাইত, কিন্তু গন্ধক জ্বলিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় বলিয়া এখন আর গন্ধক না লাগাইয়া, কাঠীর মুখগুলি, লোহার চাদর তপ্ত করিয়া লাল হইলে, তাহাতে ঘষিয়া লয়, এইরূপে কাঠীর মুখগুলি ঈষৎ পোড়া-পোড়া হইলে, একটা পাত্রে অল্প কিরোসিন বা টার্পিনের ন্যায় শীঘ্র-দহনীয় তৈল রাখিয়া সেই মুখগুলি তাহাতে স্পর্শ করাইলেই অমনি একটু তৈল শুষিয়া লয়। ইহার পর অগ্নি-উৎপাদক একটী মিশ্র পদার্থে কাঠীর মুখগুলি ডুবাইয়া লইলেই কাঠী প্রস্তুত করা শেষ হয়। এই মিশ্রপদার্থকে আমরা "লেই" বলিব।

এই মিশ্র পদার্থের উদ্দেশ্য অগ্নি উৎপাদন করা। কতকগুলি দ্রব্য আছে, যাহা অল্প বা অধিক উত্তাপে বায়ু লাগিলেই অর্থাৎ বায়ুস্থিত অক্সিজেন সহযোগে জ্বলিয়া উঠে। এইরূপ দুই চারিটী পদার্থ মিশাইয়া দেশভেদে এবং কারখানাভেদে নানাপ্রকার "লেই" ব্যবহৃত হয়।

সচরাচর দুই প্রকার দেশলাই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; এক প্রকার যেখানে-সেখানে ঘষিলে জ্বলিয়া উঠে, আর এক প্রকার কেবল মাত্র বাক্সের পার্শ্বে যে কাগজ লাগান থাকে, কেবল তাহাতে ঘষিলেই জ্বলিয়া উঠে। প্রথমটীকে সাধারণ ও অপরটীকে সেফটিম্যাচ বা দেশলাই বলে। সাধারণ দেশলাইতে যে লেই ব্যবহৃত হয়, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।

এই লেই প্রস্তুত করিতে সাধারণত পাঁচ প্রকার বিভিন্ন-গুণসম্পন্ন দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

১। দাহ্য বস্তু। যাহা অল্প বা অধিক উত্তাপে বায়ুস্থিত অক্সিজেন-সহযোগে জ্বলিয়া উঠে। এই সকল অগ্নি-উৎপাদক দ্রব্যের মধ্যে ফস্ফরস

সর্ব্বপ্রধান। ইহা এক প্রকার খনিজ পদার্থ; মৃত্তিকায়, জীবশরীরে, বিশেষত অস্থিতে ইহা প্রচুর-পরিমাণে কেল্‌সিয়ম নামক মৌলিক পদার্থের সহিত (যাহা হইতে চূণ চা-খড়ি প্রভৃতি হয়) মিশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান আছে। বিশুদ্ধ ফস্ফরস্ স্বচ্ছ হরিদ্রাবর্ণ ;—বাতাস লাগিলেই জ্বলিয়া উঠে। সেই জন্য ফস্ফরসকে সর্ব্বদা জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। এই দাহগুণ আছে বলিয়া ফস্ফরস্ লেইএর সহিত ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, লেইতে প্রত্যেক দশ বা বার ভাগে একভাগ ফস্ফরসই যথেষ্ট, কিন্তু অধিকও ব্যবহৃত হয়

২। দাহক বস্তু। যেমন বায়ুতে অক্সিজেন আছে, তেমনি আরও অনেক পদার্থে বেশী পরিমাণ অক্সিজেন আছে ; সামান্য ঘর্ষণ পাইলেই দাহক হইতে বিচ্যুত হইয়া দাহ্য বস্তুর সহিত মিলিয়া অগ্নি উৎপাদন করে। আমরা যাহাকে দহন কার্য্য বা "পোড়া" বলি, তাহা আর কিছুই নহে, দাহ্য বস্তুর সহিত বায়ুস্থিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ মাত্র। এই সংযোগ-প্রক্রিয়া যখন মৃদুভাবে হয়, তখন আমরা সহজে চক্ষে দেখিতে পাই না। এক খণ্ড লৌহ বাতাসে পড়িয়া থাকিলে তাহাতে মরিচা ধরে ; লোহা পোড়াইলে যে দ্রব্য জন্মায়, এই মরিচাও সেই দ্রব্য ; অর্থাৎ অক্সিজেনে অল্পে অল্পে পুড়িয়া এই মরিচা জন্মায় ; সে দহন আমরা দেখিতে পাই না। কাষ্ঠ ও কয়লাকে যে আমরা পুড়িতে দেখি, তাহাও বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত কাষ্ঠ ও কয়লার অঙ্গারের উগ্র রাসায়নিক সংযোগ মাত্র। এখানে অক্সিজেন দাহক এবং কাঠ, কয়লা, লৌহ দাহ্য-বস্তু। সেইরূপ দেশলাইএর লেইএর মধ্যে যেমন দাহ্য-বস্তু ফস্ফরসের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সহিত বায়ুস্থিত অক্সিজেন মিশিলে যেমন জ্বলে, অপর প্রকারে অক্সিজেন দিতে পারিলেও সেইরূপই জ্বলে। ক্লোরেট অব্ পটাশ নামক দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট দাহক বস্তু বলিয়া ব্যবহৃত হয় ; ইহার সঙ্গে বা পরিবর্ত্তে আরও কতকগুলি দ্রব্য সমধর্ম্মা বলিয়া ব্যবহৃত হয় ; যেমন নাইট্রেট অব্ পটাশ বা সোরা, নাইট্রেট অব্ লেড (নাইট্রিক এসিড ও সীসা মিশ্রিত লাবণিক দ্রব্য), বাই ক্রোমেট অব্ পটাশ, ফেরিক অক্সাইড, ম্যাঙ্গানীজ পেরক্সাইড, লেড পেরক্সাইড, মিলিয়ম বা মেটে-সিন্দুর। ইংলণ্ডে যে সকল দেশলাই হয়, তাহাতে ক্লোরেট অব্ পটাশই অধিক-পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩। ধারক দ্রব্য। অর্থাৎ যাহা আটার কার্য্য করে। গঁদ, শিরীষ, জিলেটিন (অস্থি হইতে একরূপ স্বচ্ছ আটার ন্যায় দ্রব্য পাওয়া যায়), ডেক্সটিন (শ্বেতসারের *starch* ন্যায় উদ্ভিজ্জ দ্রব্য)—এই সকল দ্রব্য জলের সহিত, দাহ্য এবং দাহক প্রভৃতি সকল পদার্থগুলি মিশাইয়া লেই প্রস্তুত করে। শীতের জন্য ইংলণ্ডে শিরীষই ব্যবহৃত হয়। ভাল শিরীষ নহিলে লেই শুকাইয়া ভাল শক্ত হয় না।

৪। ঘর্ষণানুকূল দ্রব্য। অর্থাৎ যাহা লেইর সহিত মিশ্রিত থাকিয়া দহন কার্য্যের সহায়তা না করিলেও, লেইএর কঠিনত্ব-সম্পাদন করে ; সুতরাং কাঠীর মুখের লেই যখন শুকাইয়া যায়, তখন বেশী জোরে ঘষিলেও খসিয়া পড়ে না। কাচের গুঁড়া বা খুব ফাঁকি বালি এই জন্য লেইএর সহিত মিশ্রিত করা হয়।

৫। বর্ণোৎপাদক দ্রব্য। এই সকল দ্রব্যের সাহায্যে লেইকে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের করা যাইতে পারে। সিন্দূর, মেজেণ্টা, অল্ট্রামেরিণ, ক্রোম-ইওলো, প্রসিয়ান ব্লু প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্গিন দ্রব্য দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বে যে সেফ্‌টি দেশলাইএর কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন রঙ্গিন দ্রব্য ব্যবহৃত হয় না, সেজন্য তাহার কাঠীর মুখগুলি কৃষ্ণবর্ণ থাকে।

লেই প্রস্তুত-করণ।

উপরোক্ত পাঁচটী দ্রব্য মিশাইয়া লেই প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমত শিরীষ ও ক্লোরেট অব্ পটাশকে গরম জলে ফেলিতে হয়। এই উভয় পদার্থ গরম জলে গলিয়া গেলে, আবশ্যক মত ফস্ফরস্ সূক্ষ্মভাবে কাটিয়া ইহাতে দিয়া খুব করিয়া নাড়িতে হয়। এমন করিয়া জল দিতে হয় যে, লেই চিনির রসের মত ঘন হয়। এইরূপ অনেকক্ষণ নাড়িয়া দ্রব্যগুলি ভাল করিয়া মিশিলে পর, বালি বা কাচের গুঁড়া, রঙ্গিন দ্রব্য (এবং আর কোন দাহক দ্রব্য দিতে হইলে তাহা) এই সমস্ত পেষণ যন্ত্রে উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া লেইতে মিশ্রিত করা হয়।

কাটিতে লেই লাগান।

পূর্ব্বে ইহা হস্ত দ্বারা সাধিত হইত। কলে কাঠী কাটা হইলে, আটি বাঁধিয়া গন্ধক বা দাহ্য তৈল লাগান হইলে পর, সেই আটিতে মোচড় দিলে 'ডুগডুগীর' আকার ধারণ করে, অর্থাৎ মধ্যস্থল সরু এবং দুই পাশ ছড়াইয়া পড়ে; তাহাতে লেই লাগাইলে পরস্পর লাগিয়া যায় না। কিন্তু এখন উক্তরূপ হস্ত দ্বারা বাণ্ডিল না করিয়া কলে তাহা সাধিত হয়। অল্প-পুরু সরু ফিতা কলের সাহায্যে একটা কাটিমের উপর জড়ান হয় এবং জড়াইবার সময় কলের সাহায্যে এক একটী দেশলাই-কাটি এরূপ ভাবে দুই-পুরু ফিতার মধ্যে আসিয়া পড়ে যে, পরস্পর গায়ে গায়ে না লাগিয়া অল্প ব্যবধান থাকে। ফিতা মধ্যস্থলে থাকায় কাটির দুই মুখই খালি থাকে। ফিতা জড়াইয়া বাণ্ডিল বড় হইলে, সেটী সরাইয়া তাহার স্থানে আরও ঐরূপ বাণ্ডিল হইতে থাকে। বাণ্ডিলগুলি প্রস্তুত হইলে একটা অল্প-গভীর (চিট্‌কা) লোহার পাত্রে কাটি যতটুকু ডুবিবে সেই মত পুরু লেই ঢালিয়া তাহাতে বাণ্ডিলের এক মুখ ডুবাইয়া প্রায় কুড়ি মিনিট ঝুলাইয়া রাখা হয়;— বেশী লেই থাকিলে, তাহা ঝরিয়া পড়ে, এবং কাটির মুখ নীচু ভাবে থাকাতে বেশ গোল ফোঁটার মত হয়।

শুকান।

লেই লাগান হইলে, বাণ্ডিলগুলি বাতাসে রাখিয়া শুকান হয়। তাহাতে অসুবিধা হইলে একটা ঘরের মধ্যে কলের সাহায্যে গরম বাতাস প্রবিষ্ট করাইয়া সেই ঘরে বাণ্ডিল শুকান হয়। এক মুখ শুকাইয়া আর এক মুখে লেই লাগাইয়া আবার শুকাইতে হয়।

কর্ত্তন।

দুই মুখে লেই লাগান ও শুকান হইলে, কাটির মধ্যস্থলে কর্ত্তন করিলে কাটি করা শেষ হয়। বলা বাহুল্য, বাণ্ডিলের কাটিগুলি দেশলাই-কাটির দ্বিগুণ লম্বা ছিল। এই কর্ত্তন কার্য্য পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায় যন্ত্রে চাপ দিয়া সাধিত হইত, কিন্তু চাপ পাইয়া কাটিগুলি জ্বলিয়া উঠিয়া অনেক লোকসান হইত বলিয়া এখন কলের চক্রাকার করাত দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হয়।

বাক্স তৈয়ারী।

বাক্সের কাষ্ঠ কলে কাটা হয়; বাক্সের যে যে স্থানে ভাঁজ পড়ে, কলে সেই সেই স্থানে খাঁজ কাটা থাকে; সুতরাং একজনে চক্ষু বুজিয়া দিনে পাঁচ ছয় শত বাক্স মুড়িয়া এক এক খণ্ড কাগজ লাগাইয়া দেয়।

ঘষিবার কাগজ।

ইহা স্বতন্ত্র প্রস্তুত করা হয় না। কাচের গুঁড়া ও শিরীষে একটা লেই করিয়া, বাক্সের দুই পার্শ্বের কাগজে লাগাইয়া দেয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা সাধারণ দেশলাই করিবার প্রক্রিয়া। এই দেশলাই যদিও এখন ও অনেক প্রচলিত আছে, তবু যাঁহারা বিশেষ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ইহা ব্যবহার করেন না এবং অনেক দেশলাইকারক তাহা প্রস্তুত করিতেও ইচ্ছা করেন না; কেননা, এই দেশলাই যেথা সেথা একটু চাপ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। ক্লোরেট অব পটাশ ও গন্ধক একত্র মিশিলে সামান্য চাপে ভয়ানক শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আমাদের 'ভুঁই পটকা' এই দুই দ্রব্য মিলাইয়া প্রস্তুত করা হয়। শিশুরা খেলিতে খেলিতে, এবং কারিকরেরা বাক্স বন্দী করিতে করিতে অনেক বিপদ ঘটাইয়াছে। তদ্ভিন্ন ফস্‌ফরস অতি সাবধানে নাড়া-চাড়া করিলেও সামান্য বায়ু লাগিয়া তাহা হইতে এক প্রকার ধূম নির্গত হয়, সেই ধূম লাগিয়া কারিকর দিগের দন্ত মূলে ও দন্তাধার অস্থিতে এক প্রকার সাংঘাতিক রোগ জন্মায়। এই সকল বিপদ নিবারণ জন্য অনেক নিষ্ফল চেষ্টার পর অতি অল্প দিন হইল, এই ফস্‌ফরসের পরিবর্ত্তে এমর্ফ্‌স্ (*Amorphos*) ফস্‌ফরস ব্যবহৃত হইতেছে। এই এমর্ফ্‌স্ ফস্‌ফরস্, সাধারণ ফস্ফরস্ হইতে উৎপন্ন হয়; ইহার বর্ণ লাল; ইহাতে বায়ু লাগিলে জ্বলিয়া উঠে না বা ধূম নির্গত হয় না; অধিক উত্তপ্ত না হইলে ইহা জ্বলে না। ইহাতে আর আর দ্রব্য মিশাইয়া লেই করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও অনেক বিপদ ঘটে বলিয়া, একজন সুইডিস্ দেশলাইকারক স্বতন্ত্র ভাবে কেবল বাক্সের গায়ে মারিয়া ইহা ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন। এখন কাটির লেইএর সঙ্গে এই লাল ফস্ফরস না মিশাইয়া কেবল বাক্সের গায়ের

শিরীষের সহিত ব্যবহৃত হয়। কাটির লেইএর ক্লোরেট অব্ পটাশ, এই ফস্ফরসের একটুমাত্র সংস্পর্শে আসিলে জ্বলিয়া উঠে। এই লাল ফস্ফরসে প্রস্তুত দেশলাই, বাক্সের গায়ে ভিন্ন অপর স্থানে ঘষিলে জলে না;—সেই জন্য ইহাকে সেফ্‌টি ম্যাচ বা আপদশূন্য দেশলাই বলা যায়।

সেফ্‌টি ম্যাচেস লেই।

হা ইপূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত হয় কেবল তাহাতে ফস্ফরস্ থাকে না তাহার পরিবর্ত্তে লাল ফস্ফরস্ বাক্সের গায়ে লাগান হয়। এবং লেইএর এই দাহ্য বস্তু ফস্ফরসের পরিবর্ত্তে সলফিরেটেড এণ্টিমনি, (শূর্ম্মা) গন্ধক বা কখন কখন কয়লার গুঁড়াও মিশ্রিত করা হয়। দাহক বস্তু উভয় প্রকার দেশলাইরই সমান। ইংলণ্ডে সেফটি দেশলাইর জন্য নিম্ন লিখিত পরিমাণ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

কাটির মুখের জন্য;—

ক্লোরেট অব পটাশ	...	২ ভাগ (ওজনে)
সলফাইড অব এণ্টিমনি (শূর্ম্মা)		১ ,,
শিরীষ	...	২ ,,
জল	...	১২ ,,

বাক্সের গায়ের জন্য—

এমর্ফস ফস্ফরস	...	২ ভাগ
কাচের গুড়া ...	...	১ ,,
শিরীষ	...	১ ,,
জল		(আবশ্যকমত)

আমাদের দেশে 'সূর্য্যমার্কা' প্রভৃতি যে সকল ভাল দেশলাই এক পয়সায় দুইটা করিয়া বিক্রীত হয়,সে সমস্তই সুইডেন দেশীয়। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, সুইডেন দেশীয় এক প্রকার দেশলাইতে নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকল আছে;—

ক্লোরেট অব্ পটাশ	...	৪৫ ভাগ
বাইক্রোমেট অব্ পটাশ	...	৬ ,,
ফেরিক অক্সাইড	...	৪ ,,
ম্যাঙ্গানাজ ...	...	১৩ ,,
গন্ধক ...	...	৮ ,,
শিরীষ ...	...	৮ ,,
কাচ ...	...	৯ ,,

আর এক প্রকার :—

সল্‌ফাইড অব এণ্টিমনি	...	৭ ,,
ক্লোরেট অব পটাশ	...	৭০ ,,
ফেরিক অক্সাইড	...	১১ ,,
গঁদ ...	...	১২ ,,

বাক্সের গায়ে :—

এমর্ফস ফস্‌ফরস্		১০ ভাগ
সল্‌ফ এণ্টিমনি		৫
ম্যাঙ্গানাজ ...	...	৫০
শিরীষ ...	...	৫৫

আর এক প্রকার :—

ক্লোরেট অব্ পটাশ	...	৮ ,,
সল্‌ফ অব এণ্টিমনি	...	৮ ,,
অক্সিডাইজড মিনিয়ম (মেটিয়াসিন্দুর)		৮ ,,
সেনিগাল গঁদ ...	...	১ ,,

সুপ্রসিদ্ধ দেশলাইকারক বিলাতী ব্রায়াণ্ট এবং মে Bryant & may কৃত দেশলাই এই রূপ :—

সল্‌ভ অব এণ্টিমনি (শূর্ম্মা)		২—৩ ,,
ক্লোরেট অব পটাশ	...	৬ ,,
শিরীষ ...	...	১ ,,

বাক্সের গায়ে :—

এমর্ফস ফস্‌ফরস	...	১০ ,,
সল্‌ফ এণ্টিমনি	...	৮ ,,
শিরীষ ...	...	৩—৬ ,,
কাচের গুড়া	...	,, ,,

দেশলাইএর প্রবন্ধ ত লিখিলাম। কিন্তু এ প্রবন্ধ পাঠে অনেকেই যে বিরক্ত হইবেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, কথাগুলি বড়ই কঠোর, কর্কশ, নীরস। সম্ভবত অনেকেই গলাধঃকরণ করিতে সক্ষম হন নাই। রসগোল্লার মিষ্ট রস, ভাষা-সুন্দরীর মধুর নর্ত্তন,—এ প্রবন্ধে স্থান পায় নাই। কেহ ঈষৎ আস্বাদন লইয়াই থু থু করিয়া ফেলিয়াছেন,—কেহ বা একবার দেখিয়াই, ভ্রূ কুঞ্চিত ও নাসিকা বিকৃত করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিতেছেন।

এরূপ অনাদৃত, অসম্মানিত এবং অরুচিকর হইবে জানিয়াও, প্রবন্ধ লিখিলাম। লিখিলাম কেবল মন বুঝেনা বলিয়া। লিখিলাম, এখনও হৃদয়ে ধাঁধা আছে বলিয়া। এ নিবিড় অন্ধকারে মাঝে মাঝে এমন আলোক ঈষৎ দেখা দেয় কেন? এই দারুণ মরুভূমে,—পরিশুষ্ক প্রান্তরে —জলাশয়-প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় কেন? এই প্রখর, দেহ-মন-শুষ্ককর, ভীম-ভয়ঙ্কর রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এ যে সত্য সত্যই আতপত্রের সৃষ্টি হইতে চলিল!!

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

বর্ত্তমান বাস কলিকাতা ৬৬নং কলেজষ্ট্রীট ভবনে। ইনি ধনবান্ ব্যক্তির সন্তান। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামতারণ চট্টোপাধায়;—নিজগুণে পিতা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, এক্ষণে অধিক সময় ৺কাশীধামে কাটাইয়া থাকেন। ইহাঁদের আদি বাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দাঁইহাট গ্রামে। দাঁই-হাট ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান স্থান।

অক্ষয়চন্দ্র হুজুগপ্রিয় লোক নহেন। ব্যবসা কার্য্যে ইহার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। কলিকাতার "চাটুর্জ্জী ব্রাদাসে'র" পুস্তকালয় ইহাঁরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

অক্ষয়চন্দ্র লেখা-পড়া-অভিজ্ঞ। "মূর্খ" দোকানদার নহেন।

আজ প্রায় ছয় মাস হইল, অক্ষয়চন্দ্র এ দেশে একটী দেশলাই তৈয়ারির কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত করণার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন। এত দিন তিনি আপন ঘরে বসিয়া নীরবে কার্য্য করিতেছিলেন;—যোগাড় যন্ত্র, চেষ্টা-তদ্বির, বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ,—এতদিন এই সকলই হইতেছিল। ইংলণ্ডে কিরূপ কল চলে, তাহার দাম কত, কি মসলা লাগে, কত মজুরি পড়ে, প্রত্যহ কত বাক্স দেশলাই উৎপন্ন হয়, লাভ কি হয়,—এ সকল সংবাদও অক্ষয়চন্দ্র সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহের ফল এইরূপ;—

(১) দেশলাই তৈয়ারির সমগ্র যন্ত্রাদির মূল্য ১৭০০০ সতের হাজার টাকা। এই কলে প্রত্যহ পাঁচশত গ্রোস বাক্স দেশলাই হইতে পারে। এক গ্রোসে বার ডজন, অর্থাৎ ১৪৪ বাক্স দেশ-লাই থাকে।

(২) গৃহ নির্ম্মাণ;—কতক পাকা, কতক কর-গেটেড লোহার—মূল্য আট হাজার টাকা।

(৩) কল বসাইবার মজুরি দুই হাজার টাকা।

(৪) বাক্সের গায়ে লেবেল ছাপিবার ও মারিবার কল,—মূল্য চারিহাজার টাকা।

(৫) কাজ চালাইবার মূল ধন,—দশহাজার টাকা।

(৬) প্রথম পরীক্ষাদির ব্যয় দুইহাজার টাকা।

(৭) সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয় দুই হাজার টাকা।

(৮) রিজার্ভ ফণ্ড বা তহবিলে মজুদ টাকা সাতহাজার টাকা।

সুতরাং মোট মূল ধন আবশ্যক ৫২ বাহান্ন হাজার টাকা।

এই বাহান্ন হাজার টাকা মূল ধন হইলে প্রত্যহ পাঁচশত গ্রোস বাক্স দেশলাই উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যহ পূরাদমে কাজ চলিলে, অবশ্যই ঐ পাঁচশত গ্রোস উৎপন্ন হইবার কথা। ধরুন, পূরাদমে প্রত্যহ কাজ চলিল না,—বৎসরে নানা কারণে,—দৈবদুর্ঘটনায় কল চলা কয়েক দিন কামাই পড়িতে পারে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যহ এই কল হইতে চারিশত গ্রোস উৎপন্ন হওয়াই ধরা গেল।

এ দেশে আমরা ৷৷৵০ নয় আনা করিয়া প্রতি গ্রোস অবশ্যই বেচিতে পারিব। নয় আনা করিয়া গ্রোস বেচিলে, এক পয়সায় চারিটা করিয়া দেশলাই পড়ে। এক্ষণে হিসাব করিয়া দেখুন:—প্রত্যহ উৎপন্ন চারিশত গ্রোস; প্রতি গ্রোসের মূল্য ৷৷৵০ নয় আনা; সুতরাং এক বৎসরে ৬৭৫০০৲ সাতষট্টি হাজার পাঁচশত টাকার জিনিস তৈয়ারি হইল।

এক্ষণে প্রাত্যহিক ব্যয় দেখুন,—

(১) দেশলাই জন্য প্রত্যহ কাষ্ঠ আট মণ,—মূল্য ১৩।০

(২) কুলি ২৫ জন,—মজুরি, ৬।০

(৩) মিস্ত্রী ১জন—৷৷৵০

(৪) হেড মিস্ত্রী ১জন—১৲

(৫) দ্বারবান প্রভৃতি—৷৷৵০

(৬) এঞ্জিনের কয়লা—৫৲

(৭) দেশলাই তৈয়ারির রাসায়নিক দ্রব্য বা লেই—৫৪৲

(৮) কাগজ ও আঁটাই খরচ ইত্যাদি—১৫৲

(৯) সরঞ্জামি খরচ—৫৲

(১০) ম্যানেজার দিগর—১৫৲

সুতরাং প্রত্যহ মোট খরচ ১১০৲ একশত দশ টাকার অধিক নহে। এই হিসাবে এক বৎসরে ব্যয় হইল ৩৯৬০০ উনচল্লিশ হাজার ছয় শত টাকা। ওদিকে—দেশলাই বিক্রয় করিয়া এক বৎসরে পাইয়াছি,—৬৭৫০০৲ টাকা। সুতরাং খরচ বাদে লাভ হইল ২৭৯০০৲ সাতাইশ হাজার নয় শত টাকা।

মোট মূলধন ব্যয় হইয়াছে।—বাহান্ন হাজার টাকার অধিক নহে; ঐ মূলধনে লাভ হইল, সাতাইশ হাজার নয় শত টাকা। শতকরা পঞ্চাশ টাকার অধিক লাভ পোষাইল। কিন্তু এখনকার বাজারে শত করা ৯৲ নয় টাকা লাভ হইলেই তাহা

যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এদিকে আমরা শতকরা পঞ্চাশ টাকা,—লাভ দেখাইলাম। কত লোকসান হইবে, হউক না,—শেষে কি শতকরা ১২৲ টাকা বা ৯৲ টাকা লাভ দেখাইতে পারিব না? অবশ্যই পারিব।

আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে বলি, এ ব্যবসায় বাহান্ন হাজার টাকা মূলধন না করিয়া, পুরা একলক্ষ টাকা মূলধন করুন। একলক্ষ টাকা ব্যতীত এ ব্যবসায় সুচারুমতে চলা অসম্ভব। কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে, নানা দিকে নানারূপ খরচ দেখিতে পাইবেন। যে খরচ এক্ষণে কল্পনাতেও অঙ্কিত করিতে পারিবেন না,—কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, সে খরচ সজীব মূর্ত্তিমান্ হইয়া দাঁড়াইবে।

আবার বলি,—মূলধন এক লক্ষ টাকার কম করিবেন না। আপনার যেরূপ ধীরভাব, আপনার যেরূপ সুতীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি,—তাহাতে আমাদের আশা আছে, নিশ্চয়ই আপনি কৃতকার্য্য হইবেন। আপনার জয় হউক,—বঙ্গে দেশলাই-ব্যবসার আপনি প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হউন।

গজ-দন্ত।

বিড়ালের গল্পে জীবদিগের দন্তের কথা বলিয়াছি। সকল জীবের দন্ত সমান নয়, সংখ্যায়ও একরূপ নয়। তবে গঠন দেখিলেই বলিতে পারা যায়, এটী ইন্‌সাইসার বা কাটিবার দন্ত, এটী কেনাইন বা ছিঁড়িবার দন্ত, এটী মোলার বা খাদ্য পিশিবার দন্ত। হস্তীদিগের উপর-মাড়ীতে দুই পাশে যে দুইটী ইন্‌সাইসার দন্ত থাকে, তাহাই বৃদ্ধি হইয়া গজদন্ত হয়। নীচের মাড়ীর দন্তবৃদ্ধি হয় না। হস্তীর মত হস্তিনীর তত বড় গজদন্ত হয় না। বন্য শূকরের যে বড় বড় দন্ত দেখিতে পাই, তাহা কেনাইন দন্ত, ইন্‌সাইসার নহে। শূকরের উপর ও নীচের দুই মাড়ীর দন্তই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গাছের ছাল ছাড়াইতে, কি গাছ কাটিয়া ফেলিতে, বন্য হস্তীদিগের দন্ত মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যায়, সে জন্য অতিশয় বৃহৎ হইতে পায় না। একবার ভাঙ্গিয়া যাইলে পুনরায় গজাইয়া থাকে। গজদন্ত দীর্ঘে ছয় হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এরূপ এক জোড়া দন্ত ওজনে প্রায় চার মণ হয়। সচরাচর কিন্তু এত বড় গজদন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। সচরাচর ত্রিশ সের, এক মণ, এইরূপ ওজনে হইয়া থাকে। গজদন্ত আড়া-আড়ি ভাঙ্গিলে ইহার ভিতরে গোলাকার রেখা-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

হস্তীর ন্যায় অন্যান্য কতিপয় জন্তুরও বৃহৎ দন্ত হইয়া থাকে। গজদন্তের ন্যায় সে দন্ত কিন্তু তত কারুকার্য্যের উপযোগী নয়। সমুদ্র-হস্তী ও সমুদ্র-ঘোটকের এইরূপ দন্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইউরোপের অধিবাসিগণ ইহা হইতে নানারূপ বস্তু নির্ম্মাণ করিতেন। হস্তী কিরূপ, হস্তীর আবার এত বড় দন্ত হয়, এ কথা বোধ হয় তখন তাঁহারা কর্ণেও শুনেন নাই। তার পর যখন গজদন্ত ইউরোপে আমদানি হয়, তখন অনেক দিন ধরিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল যে, ইহা হস্তীর শৃঙ্গ। এত বড় দন্ত কোনও পশুর হইতে পারে, এ অভাবনীয় কথা কি করিয়া লোকের মনে উদয় হইবে? লণ্ডনে বণিক্‌দিগের ঘরে আমি পর্ব্বত-প্রমাণ নানা প্রকার দন্ত দেখিয়াছি। এক একটী রাশি, সাত রাজার ধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দন্তরাশির ভিতর আর এক প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিয়াছিলাম। ইহা ম্যামথ বলিয়া এক প্রকার বৃহদাকার পশুর দন্ত। এই পশু ঠিক হস্তীর ন্যায়। পশুতত্ত্বে ইহাকে এলিফাস প্রাইমিজিনিয়স্ বলে (*Elephas primigenius*), অতি প্রাচীনকালে যখন ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা ঘোর গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল, তখন এই হস্তী অসংখ্য দলে দলে সেই নিবিড় বনে বিচরণ করিত। এখন এ পশু সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, পৃথিবীতে আর একটীও নাই। সাইবিরিয়া প্রভৃতি তুষারময় দেশে বরফ খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া লোকে এক্ষণে ইহার কঙ্কাল বাহির করে। সেই কঙ্কালের সঙ্গে গজদন্ত থাকে, সেই দন্ত অনেক টাকায় বিক্রীত হয়। লণ্ডনে গজদন্ত-স্তূপে এরূপ দন্ত আমি অনেক দেখিয়াছিলাম। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর গত হইল, সাইবিরিয়া দেশে, অস্থি-মাংস-চর্ম্ম-সম্বলিত একটী ম্যামথের দেহ বরফ খুঁড়িতে খুঁড়িতে লোকে পাইয়াছিল। অনেক সহস্র বৎসর গত হইল, ম্যামথ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; তাই বলিতে পারা যায় না কত

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই পশুটী বীরমদে মত্ত হইয়া প্রকাণ্ড দন্ত দ্বারা অরণ্য বিদীর্ণ করিয়া বেড়াইত। বরফের ভিতর কোনও বস্তু রাখিলে পচিয়া যায় না; সেইজন্য ইহার মৃতদেহ এতদিন তুষার মধ্যে সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিত ছিল। "বরফের ভিতর রাখিলে দ্রব্যাদি পচিয়া যায় না," এই সামান্য কথাটীর সহায়তায় আজ-কাল অষ্ট্রেলিয়া-বাসীরা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছেন। তাঁহারা অনেক মেষ পালন করিয়া থাকেন, কিন্তু এত মেষ খায় কে? তাই তাঁহারা প্রথমত মেষ হইতে পশম লইতেন, তার পর যখন বৃদ্ধ হইলে ভালরূপ পশম আর না হইত, তখন তাহাদিগকে কাটিতেন, কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া চর্ব্বি বাহির করিয়া লইতেন, মাংস সব ফেলিয়া দিতেন। এখন ইহাঁরা করিয়াছেন কি, জাহাজের ভিতর বরফের ঘর করিয়াছেন। মাংস আর সিদ্ধ না করিয়া ও ফেলিয়া না দিয়া, সেই বরফের ঘরে রাখিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন। সেই শীতপ্রধান দেশে অনেক দুঃখী মানুষে মাংসের মুখ কখনও দেখিতে পায় না, আদরের সহিত তাহারা এই মাংস কিনিয়া খায়। মাংসপ্রিয় লোকদিগকে একটী সুসমাচার দিই—শুনিতেছি নাকি এই মাংস কলিকাতায়ও আমদানি হইবে। এই উপায়ে বিদেশে ফল প্রেরিত হইতে পারে। টাকা থাকিলে ইহা অতি উত্তম ব্যবসা। আম্র, আনারস ও কলা বিলাতে পাঠাইলে বিশেষরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষে যে গজদন্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে এদেশের খরচ চলে না। প্রতিবৎসর আফ্রিকা হইতে এ দেশে অনেক গজদন্ত আমদানি হইয়া থাকে। যে সকল গজদন্ত, ভারতবর্ষের বলিয়া পরিচিত, তন্মধ্যে অধিকাংশই আসাম ও ব্রহ্মদেশ উৎপন্ন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে আসামের নাগা জাতিরা তাহাদিগের পার্ব্বত্য গ্রামসমূহ হইতে হস্তিদন্ত আনিয়া বনের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিত, আর আপনারা বনের ভিতর লুকাইয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকিত। হিন্দু বণিকগণ সেইখানে গিয়া, নাগারা যে সকল দ্রব্য ভাল বাসে, বিনিময়ে তাহা রাখিয়া হস্তিদন্তগুলি লইয়া আসিতেন। বণিকেরা চলিয়া যাইলে, বন হইতে বাহির হইয়া, নাগারা সেই সমুদয় দ্রব্য লইয়া, ঘরে প্রস্থান করিত। চোরে-কামারে একেবারেই সাক্ষাৎ হইত না। হিন্দুদিগের সহিত নাগাদিগের এইরূপে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই হইত না। হিন্দুদিগের গ্রামে গিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নাগাধর্ম্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং গজদন্তের বিনিময়ে হিন্দু-বণিকগণ যাহা কিছু কৃপা করিয়া দিতেন, নাগাদিগকে তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইত। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না; কারণ পূর্ব্বকালে নাগারা আসামের আহম রাজাদের সহিত মাঝে মাঝে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। 'আসাম-বুরুঞ্জি' নামক আসামি পুস্তকে পড়িয়াছি যে, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে দেবরাজের মনে বড়ই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিলেন যে, "পৃথিবীতে সূর্য্যের বংশ আছে, চন্দ্রের বংশ আছে, কিন্তু আমার বংশ নাই।" পৃথিবীতে তাই আপনার বংশ সংস্থাপন করিবার অভিলাষে তিনি আহম রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষকে কোমরে শৃঙ্খল বাঁধিয়া আকাশ হইতে নামাইয়া দিলেন। আকাশ হইতে নামিয়া যেদিন তিনি 'লুংটুংচিং' পর্ব্বতের শিখরদেশে অবতরণ করিলেন, বলিতে গেলে, সেই দিন হইতেই আহমদিগের সহিত নাগাদিগের বিবাদ। তার পর, এখন হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন আহম-রাজ চচুংফা, নবদ্বীপের গোস্বামীদিগের শিক্ষায়, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, জয়ধ্বজ সিংহ নাম ধারণ করিলেন, তখনও এই নাগাদিগের সহিত আহমদিগের বিবাদ ভঞ্জন হয় নাই। বহুকাল হইল, আসাম-বুরুঞ্জি পড়িয়াছিলাম, নাম গুলি ঠিক হইল কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক, নাগারা এরূপ রীতিতে আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য করে না। নাগাপর্ব্বতের অধিকাংশই আজকাল ইংরেজ-অধিকারভুক্ত। এক্ষণে তাহারা সদীয়ার হাটে গজদন্ত ও গণ্ডারশৃঙ্গ প্রকাশ্য ভাবে বিক্রয় করে। আবার বলিতে গেলে, নাগারা অতি অল্পই গজদন্ত আনিয়া থাকে, অধিক পরিমাণে সিংফো ও খামতিরাই এই দ্রব্য বিক্রয় করে। প্রতি বৎসর আসাম হইতে বঙ্গদেশে একশত মণের অধিক হস্তিদন্ত প্রেরিত হয় না।

আফ্রিকা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ হাজার মণ গজদন্ত আনীত হয়। জাঞ্জিবার,

মোজাম্বিবক ও এডেন হইতেই ইহার অধিকাংশ আসিয়া থাকে। এই সমুদয় গজদন্ত প্রথম বোম্বাই নগরে আসিয়া জমা হয়। তাহার পর প্রায় ইহার অর্দ্ধেক ভাগ বিলাতে প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট এ দেশের ব্যবহারের নিমিত্ত থাকে। আফ্রিকা হইতে বোম্বাই নগরে যে গজদন্ত আনীত হয়, তাহা ওজন-দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের সের ২৮ তোলায় হয়। এক একটী ভাল গজদন্ত এইরূপ সেরের প্রায় চারি মণ ওজনে হয়। তাহার মূল্য ২৫০৲ টাকা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইবার পূর্ব্বে গজদন্তগুলিকে কাটিয়া বোম্বাইয়ের লোকে নানা ভাগে বিভক্ত করে। গজদন্তের অগ্রভাগটী নিরেট, কাটিয়া পৃথক্ করিলে ইহার নাম হয় "আকশাশ"। ইহা বিলাতে প্রেরিত হয়। ইহা হইতে বিলিয়ার্ড খেলিবার ভাঁটা প্রস্তুত হয়। গজদন্তের মধ্যভাগ ফাঁপা, ইহাকে "চুড়িবার" বলে। চুড়ি করিবার নিমিত্ত ইহার অধিকাংশ এ দেশে বিক্রীত হয়। দন্তের মূল-ভাগ বিদেশে প্রেরিত হয়। ফাঁপা-ভাগের আবার এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহাকে "চীনাইবার" বলে, তাহা চীনদেশে প্রেরিত হয়। গজদন্তের ব্যবসা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে বোম্বাই নগরে অন্যূন ২৫,০০০ জোড়া হস্তিদন্ত আমদানি হইত, এক্ষণে ১২,০০০ এর অধিক আসে না। ইহার কারণ এই যে, একে ত মারিয়া মারিয়া আফ্রিকার হস্তীর সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার ইংরেজ, ফরাশি প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা, দাস-ব্যবসায়ীদিগের উপর বড়ই উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। হস্তিদন্তের অধিকাংশই প্রথমে আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে একত্রিত হয়, সেখান হইতে সমুদ্রকূলে আনীত হয়, তাহার পর জাহাজ বোঝাই হইয়া নানা দেশে প্রেরিত হয়। হস্তিদন্তের ব্যবসা-প্রণালী দুই কথায় সারিলাম বটে, কিন্তু কার্য্যে ইহা ততটা সহজ নহে। আফ্রিকার মধ্যস্থল হইতে সমুদ্রকূল প্রায় সহস্র ক্রোশ। তাহার উপর দিয়া উত্তম রাজপথ নাই—পথ একবারেই নাই। কোন স্থান পর্ব্বতময়, কোনও স্থান নিবিড় অরণ্যময়, কোনও স্থান জনশূন্য, জলশূন্য ধূধূ বালুকাময়। এই বিষম ভয়াবহ সঙ্কট পথ অতিক্রম করিয়া তবে সমুদ্রকূলে হস্তিদন্ত আনিতে হইবে। কে আনে? গাড়ি নাই, ঘোড়া নাই, কুলি মজুর নাই। কিন্তু ব্যবসা ত চাই! অর্থ ত উপার্জ্জন করিতে হইবে! হস্তিদন্তগুলি জমা হইলে কাজেই আরব-বণিক্‌দিগকে বারবরদারির চিন্তা করিতে হয়। ঘোর নিশীথে, যখন মনুষ্যকুল নিদ্রায় আভিভূত থাকে, তখন তাঁহারা গিয়া একখানি গ্রাম ঘিরিয়া ফেলেন। ঘরে আগুন লাগাইয়া দেন, আর ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ করেন। সুষুপ্ত গ্রামবাসীরা চমকিত হইয়া উঠে, গ্রাম হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, আর সেই সময় আরবেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলেন। অতি বৃদ্ধ ও অতি শিশুদিগকে লইয়া কি করিবেন? তাই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলেন। অবশিষ্ট নর-নারীর পৃষ্ঠে গজদন্ত বোঝাই দিয়া সমুদ্র-কূলাভিমুখে তাড়াইয়া লইয়া যান। আহারাভাবে, পানাভাবে, দারুণ শ্রমে, দারুণ ক্লেশে, এই হতভাগা হতভাগিনীরা পথেই অনেক মরিয়া যায়। মর-মর হইলে দয়াশীল কোমল-হৃদয় আরব-বণিকেরা কৃপা করিয়া ইহাদের গলা কাটিয়া দেন। একবারে দুখানা করেন না। বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম, লা এলহো ইল্ লেল্লা মহম্মদর্ রসুলেল্লা, সুন্নতে ইব্রাহিম খলিলুল্লা। এইরূপ শাস্ত্রসঙ্গত মন্ত্রপূত করিয়া যথারীতি কোর্ব্বাণ করেন। হা জগদীশ্বর! তোমাকে উপলক্ষ করিয়া কত ধর্ম্মে, কত দেশে, কত জাতিতে কত যে কি নিষ্ঠুর আচরণ আচরিত হইয়া থাকে, তাহা মনে করিতে যাইলে আর জ্ঞান থাকে না; পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে তিল মাত্র আর ইচ্ছা হয় না!! সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া গজদন্তগুলি বণিকেরা জাহাজে বোঝাই দেন, আর অবশিষ্ট এই হতভাগা নর-নারীদিগকে বেচিয়া ফেলেন। দাস-ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে আরব্য, পারস্য, তুরুস্ক প্রভৃতি দেশে লইয়া বিক্রয় করে। এক্ষণে ইংরেজেরা এই দাস-ব্যবসার ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। আরব-বণিকেরা যে, আফ্রিকার পুরুষ-মানুষটী, মেয়ে-মানুষটী, ছেলেটী পিলেটী বেচিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিবেন, ইংরেজেরা তাহার আর যো রাখিলেন না। জাঞ্জিবারে অনেক হিন্দু অধিবাসী আছেন, দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত বলিয়া সম্প্রতি তাঁহাদিগের নামে একটী

কলঙ্ক রটিয়াছে। এ কথা কিন্তু তাঁহারা একেবারেই অস্বীকার করেন—"আমরা এ নৃশংস মহাপাতককে কায়মনঃপ্রাণে ঘৃণা করি" এই কথা বলিয়া তাঁহারা বিলাতে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন। যাহা হউক, দাস্-ব্যবসার উপর ইংরেজেরা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া, আফ্রিকার মধ্যস্থান হইতে গজদন্ত আনিবার আর এক্ষণে সুবিধা নাই। তার জন্য ব্যবসা কমিয়া আসিতেছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে গজদন্তের কারুকার্য্য প্রচলিত আছে। বৃহৎ-সংহিতার মতে খাট, পালঙ্ক প্রস্তুত করিবার উপযোগী ইহার তুল্য আর অপর বস্তু নাই। এই পুস্তকের মতে খাটের পায়া গুলি গজদন্তে নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক। অপরাপর অংশ কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর হস্তিদন্ত বসাইয়া দিলে চলিতে পারে। ভারতবর্ষে যেমন অন্যান্য কারুকার্য্যের অবনতি হইয়াছে, সেইরূপ একার্য্যেরও অবনতি হইয়াছে, আর দিন দিন অধিকতর অবনতি হইতেছে। চুড়ি করিবার নিমিত্তই এক্ষণে হস্তিদন্ত এ দেশে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের এ দিকে পূর্ব্বে যেরূপ শাখা না হইলে চলিত না, ভারতবর্ষের নানা স্থানে এখনও সেইরূপ গজদন্তের চুড়ি না হইলে চলে না। এ অঞ্চলে যেরূপ বিবাহের সময় কন্যাকে হীরা-মণি-মাণিক্যের সহস্র গহনা দিলেও সঙ্গে দুই গাছা কড় দিতেই হইবে; রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সেইরূপ অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত কন্যাকে গজদন্তের চুড়ি দিতেই হইবে। শঙ্খনির্ম্মাণ-ব্যবসাটী যেরূপ এ অঞ্চলে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, পশ্চিমাঞ্চলে হস্তিদন্তে চুড়ি করিবার কার্য্যটী সেইজন্য এখনও লোপ হয় নাই। হিন্দু মুসলমান সকল জাতিরই নারীগণ গজদন্তের চুড়ি পরিয়া থাকেন। বিবাহের সময় কন্যাকে গজদন্তের চুড়ি পিতা মাতা কিনিয়া দেন না। এই অলঙ্কারটী দিবার অধিকার মাতুলের; কন্যার মাতুল ইহা দিয়া থাকেন। শাঁখার ন্যায় গজদন্তের চুড়িও নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে; পীত, হরিৎ, লোহিত, ইত্যাদি। শাঁখার ন্যায় ইহার উপর অভ্র, রাঙতা প্রভৃতি চাক্‌চিক্য ময় বস্তুও আরোপিত হইয়া থাকে। রং ও রাঙতার ভিতরে যে হস্তিদন্ত আছে, তাহা একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। হস্তের আগা-গোড়া এই চুড়ি পরিতে হয়। বড় ঘরের মেয়েরা বিবাহের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত চুড়ি পরিয়া থাকেন, কেবল নিয়মরক্ষা মাত্র। তার পর খুলিয়া ফেলিয়া সোণা-রূপার গহনা পরেন। গরিব-দুঃখীরা গজদন্তের চুড়ি চিরকাল হাতে রাখে। রাজপুতানার রেলে, যেখানে যোধপুর যাইবার শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নিকট পালী বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। এইখানে প্রচুর-পরিমাণে হস্তিদন্তের চুড়ি প্রস্তুত হয়। গজদন্তের চুড়ি নানা প্রকার। সচরাচর যাহা হয়, তাহা অনেকটা শাঁখার ন্যায় দেখিতে। নিম্নে ইহার একখানি চিত্র দিলাম।
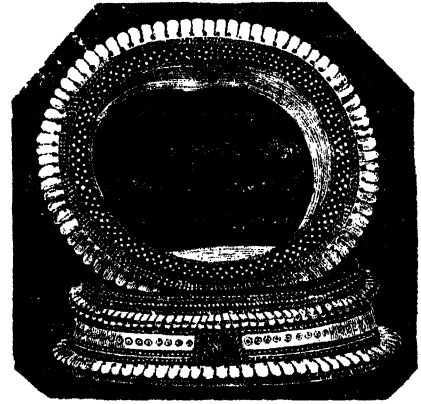
পালী প্রভৃতি স্থানে যে গজদন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহা বোম্বাই হইতে আনীত হয়। সেই যে ফাঁপা "চুড়িবার" অংশের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা হইতেই চুড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ে হস্তিদন্ত নানাভাগে কর্ত্তিত হইয়া, তাহার পর দেশ বিদেশে বিতরিত হয়। সূত্রধরেরাই হস্তিদন্ত করাত দিয়া কাটিয়া থাকেন। তাঁহারা মজুরি পান না। কাটিতে কাটিতে দন্তের যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহাই তাঁহাদিগের প্রাপ্য। এই দন্তচূর্ণ তাঁহারা গোপদিগকে বিক্রয় করেন। গোপদিগের এরূপ বিশ্বাস যে, গো-মহিষকে ইহা খাইতে দিলে দুধ অধিক হয়। মনুষ্যের পক্ষেও গজদন্ত-চূর্ণ বলকারক ঔষধের মধ্যে পরিগণিত। ইহার পর হস্তিদন্ত তিনটী আড়ঙে আসিয়া উপস্থিত হয়; তার পর সেখান হইতে অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়। এই তিনটী আড়ঙের নাম—পালি, সুরত ও অমৃতসর। নহরীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়ওয়ারিরাই গজদন্তের প্রধান

ব্যবসায়ী। ইহাঁরা জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং গজদন্ত ছুঁইলে ইহাঁদের মহাপাতক হয়। তাই ইহাঁরা নিজে স্পর্শ করেন না। গজদন্ত ছুঁইলে মুসলমানদিগের পাপ হয় না। তাই স্পর্শ করা, রাখা ঢাকা, ওজন করা প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা ইহাঁদিগের দ্বারাই করাইয়া লন। এতদ্দ্বারা জৈনদিগের পারলৌকিক ধর্ম্মটী রক্ষা পায় বটে, কিন্তু ঐহিক কার্য্য তত সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হয় না। মাঝে মাঝে মুসলমান কর্ম্মচারীদের সহিত বিবাদ ঘটে। মহাজন বলেন, 'আমার দ্রব্য অধিক ওজন করিয়া দিল' 'খরিদদার বলেন, 'আমাকে কম দিল; দাঁড়ি-পাল্লার ভাল করিয়া পাষাণ ভাঙ্গে নাই।' এইরূপ বিবাদ; কেহই সন্তুষ্ট নন।

চুড়ির পর এ দেশে গজদন্ত চিরুণি করিবার নিমিত্তই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিরুণির প্রধান আড্ডা দিল্লী ও অমৃতসর। চিরুণি করিয়া যাহা কিছু সামান্য গজদন্ত বাদ পড়ে, তাহা আবার অন্য লোকে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। সেই গজদন্তের পাত তাহারা বাক্স প্রভৃতি কাঠের দ্রব্যে বসাইয়া দেয়। মুলতান, ডেরা ইসমাইল খাঁ, হুশিয়ারপুর, সিয়ালকোট, সুরত, ব্যাঙ্গেলোর, বিজাগাপাটাম প্রভৃতি স্থানে এইরূপ হস্তিদন্ত-সম্বলিত অতি সুন্দর কাষ্ঠের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে বিজাগাপাটামের তুল্য এরূপ কার্য্য আর কুত্রাপি হয় না।

কেবল গজদন্ত হইতে যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা মুরশিদাবাদেই অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এরূপ সুন্দর শিল্প-কৌশল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মুরশিদাবাদের কারিগরেরা দুর্গাপ্রতিমা, কালীপ্রতিমা, হস্তী, শকট, ময়ূর-পঙ্খি নৌকা প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মুরশিদাবাদে এ ব্যবসায়ের কিন্তু ক্রমেই অবনতি হইয়া আসিতেছে। শুনিয়াছি কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যতগুলি লোকের ইহা উপজীবিকা ছিল, এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশও এ কর্ম্মে নিযুক্ত নাই। দ্রব্য বিক্রয় হয় না। কলিকাতা-প্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান হইতেও হস্তিদন্তের দ্রব্যাদি আসিয়াছিল। গয়া, ডুমরাওন, দারভাঙ্গা, কটক, উড়িষ্যা গড়জাত, রঙ্গপুর, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে গজদন্তের দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাদের সকল স্থানেই যে গজদন্তের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহা নহে। লোকের ঘরে পূর্ব্ব হইতে যা দুই একটী দ্রব্য সঞ্চিত ছিল, তাহাই তাঁহারা সাধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গজদন্তকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিরিয়া চামর হয়, আবার তাহাকে বুনিয়া মাদুর, শীতল-পাটি করিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টে এইরূপ পাটি অনেক হইত। এক্ষণে ব্যবসা লোপ পাইয়াছে। কলিকাতা-প্রদর্শনীতে দারভাঙ্গার মহারাজা এইরূপ একটী পাটী পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মূল্য ১৩২৫৲ টাকা। সে কালের রাজারা বাছিয়া বাছিয়া নানারূপ কারিগর চাকর রাখিতেন। তাহারা বসিয়া বসিয়া ধীরে-সুস্থে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত। সরকারি বেতন আছে, অন্নের চিন্তা নাই। তাড়াতাড়ি কর্ম্ম শেষ করিয়া বেচিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং পূর্ব্বে যেরূপ সূক্ষ্ম কাজ হইত, এক্ষণে আর সেরূপ সূক্ষ্ম কাজ হয় না। আবার কর্ম্মটী সমাধা হইলে যথাবিধি পুরস্কারও মিলিত। দারভাঙ্গা মহারাজের পাটিটী বোধ হয় এইরূপ বেতনভোগী শিল্পকার দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কাশীর মহারাজের নিকটও এইরূপ গজদন্তের শিল্পকার নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে আছে কি না বলিতে পারি না। এই শিল্পকার, বারাণসীর একটী ঘাট ও একখানি কোচ প্রস্তুত করিয়াছিল। মহারাজের ঘরে এইরূপ নানা দ্রব্য সঞ্চিত আছে। কোচখানি কিন্তু গৃহপালিত হস্তিদন্ত হইতে নির্ম্মিত। গৃহপালিত হস্তিদন্ত, বন্য গজদন্তের তুল্য উত্তম নহে। গৃহপালিত দন্ত কিছু ভঙ্গপ্রবণ হয়। দক্ষিণ দেশে ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজা হস্তিদন্তের দ্রব্য বড়ই ভাল বাসিতেন। এ অঞ্চলে বন্য হস্তীও অনেক আছে এবং তাহা হইতে গজদন্তও লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু অধিক নয়। ত্রিবাঙ্কুড়ে এখনও হস্তিদন্তের নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গজদন্তে দ্রব্য নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্রহ্মবাসীরাও বিশেষ পারদর্শী। তাঁহারা একটী দ্রব্য সচরাচর প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সে দ্রব্য ভারতবর্ষে হয় না। হস্তিদন্তের নিরেট অংশ কতকটা তাঁহারা পুরাপুরি কাটিয়া লন। প্রথম তাহার উপরিভাগে লতা পাতা কাটিয়া অলঙ্কৃত করেন। তাহার পর

সেই লতা পাতার মধ্য দিয়া ভিতরের গজদন্ত কুরিয়া কুরিয়া বাহির করেন। বাহিরের লতা পাতার অলঙ্কার ক্রমে জালবৎ ছিদ্রময় হইয়া পড়ে। সেই ছিদ্রসমূহ দিয়া ভিতরে অস্ত্র চালিত হয়। কুরিয়া কুরিয়া অস্ত্র যখন দন্তের মধ্যস্থলে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই মধ্যবর্ত্তী স্থানের দন্ত কাটিয়া ইহাঁরা একটী বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি বাহির করেন। বাহির হইতেই সমুদয় মূর্ত্তিটী প্রস্তুত হয়। গজদন্তকে পত্র আকারে চিরিয়া তাহার উপর নানারূপ চিত্র আঁকিতে পারা যায়। দিল্লীই হইল এ কার্য্যের প্রধান স্থান। মুসলমান বাদশাহগণের প্রতিমূর্ত্তি, নুরজহান প্রভৃতি বেগমগণের প্রতিমূর্ত্তি গজদন্তে চিত্রিত হইয়া বিক্রীত হয়। কতিপয় মুসলমান চিত্রকরেরা এই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন কলিকাতায় আসিয়া দোকান খুলিয়াছেন। ভারতবর্ষে এইরূপে নানা স্থানে নানারূপ গজদন্তের কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু সকল স্থানেই এ কার্য্যের অবনতি দৃষ্ট হইতেছে।

ইউরোপে যখন হস্তিদন্ত যাইতে আরম্ভ হইল, তখন সেখানকার অধিবাসীরাও ইহা হইতে নানারূপ কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। নানা বিপ্লব বশত ভারতবর্ষের প্রাচীন দ্রব্যাদি যেরূপ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, সেখানে সেরূপ নহে। শত শত বৎসরের দ্রব্যাদি সেখানে তাঁহারা অতি আদরের সহিত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীশদেশে গজদন্ত হইতে মনুষ্য-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত; সে মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। গজদন্তকে পাত করিয়া পুস্তকও হইত, তাহাও এখন বর্ত্তমান আছে। ফরাশি-দেশে পারিস নগরের পুস্তকাগারে এক খানি এইরূপ পুস্তক আছে। ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তক খানি প্রস্তুত ও লিখিত হইয়াছিল। ইহার পত্র গুলি ১৫ ইঞ্চ দীর্ঘে, ৬ ইঞ্চ প্রস্থে। হস্তিদন্ত চিরিয়া কিরূপে এ প্রকার বড় পত্র প্রস্তুত হইল, তাহার কিছু মীমাংসা হয় নাই। সকলে অনুমান করেন যে, গোলাকার হস্তিদন্তকে সমতল ও প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত, বাড়াইবার কমাইবার নিমিত্ত, সেকালের লোকে কোনও রূপ উপায় জানিতেন, এখনকার লোকে আর সে উপায় জানেন না। থিওফিলাস নামক এক জন প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, হস্তিদন্তকে যদি ক্ষার, লবণ, গন্ধক-দ্রাবক ও শিরকায় ভিজাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহা মোমের ন্যায় কোমল হয়, তখন ইহাকে ইচ্ছামত বড়াইতে কমাইতে পারা যায়। তাহার পর ইহাকে শুভ্র শিরকায় পুনরায় ভিজাইলে কঠিন হয়। এ কথা কিন্তু কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। বিশ্বাস হয় না। চতুরঙ্গের বল, নরমূর্ত্তি প্রভৃতি নানা কার্য্য সেকালে হস্তিদন্ত হইতে ইউরোপবাসীরা প্রস্তুত করিতেন। এখানে আমরা যে চিত্র খানি দিলাম, ইনি চতুরঙ্গের রাজা। কেমন মুখ খানি!

হস্তিদন্তের বিষয়ে অধিক আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কি কি বস্তু ইহা দ্বারা হয়, উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা হইতে এক প্রকার বুঝা যাইবে। স্থুল কথা এই, এ কার্য্যের উন্নতি নাই, উন্নতি হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল এ কার্য্য কেন? আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন কোনও সূক্ষ্ম কার্য্যেরই আর বিশেষরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত আজকাল নানা স্থানে সভা সংস্থাপিত হইতেছে। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে। তাহাদের

সহায়তায় আপাতত শিল্পকারদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতে পারিবে। কিন্তু পূর্ব্বের মত সূক্ষ্ম-কার্য্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া অধিক অর্থ-লাভের আর প্রত্যাশা নাই। লোকে এখন সকল দ্রব্যই সুলভ মূল্যে কিনিতে বাসনা করেন। ভাল দ্রব্য কিন্তু সুলভ হইতে পারে না। ভাল দ্রব্যের তাই ক্রেতা নাই। আহারীয় দ্রব্যাদি যেরূপ মহার্ঘ হইয়াছে, তাহাতে কারিগরেরা পূর্ব্বের দরেও এখন ভাল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। সেইরূপ দ্রব্য এখন কিন্তু লোকে অর্দ্ধেক দামে কিনিতে চান, এইরূপ অবস্থায় যে ফল ফলা সম্ভব, তাহাই ফলিতেছে। অন্নাভাবে কারিগরগণ স্ব স্ব ব্যবসা পরিত্যাগ করিতেছে। মোটা-মুটি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অতি সুলভ দ্রব্য প্রস্তুত না করিতে পারিলে এখন আর লোকের ঘরে অন্ন হইবে না। এক দিকে ৪০৲ টাকা গজের ঢাকাই মলমল, আর একদিকে চারি আনা গজের বিলাতী মলমল ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।—বিলাতী তন্তুবায়গণ ক্রোরপতি, আর ঢাকাই তন্তুবায়গণ নিরন্ন!

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমার জীবন চরিত।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সিপাহী-বিদ্রোহ যে, কেবল বেরিলীতেই ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। ভারতের নানা স্থানে একইকালে এই বিদ্রোহানল ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠে। বঙ্গে, বিহারে, উত্তর-পশ্চিমে, অযোধ্যা-লক্ষ্ণৌয়ে, পাঞ্জাবে, মধ্য-ভারতে, যেন সর্ব্বত্রই সমভাবে, সম-সময়ে সকলেই গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"ইংরেজ-রাজকে চাহি না,—ইংরেজ-রাজ্য ধ্বংস কর;—ইংরেজ দেখিলেই তাহার প্রাণ বধ কর।"

হঠাৎ কেন এমন হইল? হঠাৎ,—এক দিনের কল্পনা-জল্পনায়, এক মুহূর্ত্তের বিচার-বিতর্কে,—এ মহামারি ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। বিন্দু বিন্দু বারি-কণা একত্র হইয়া এক মহা সমুদ্রের উৎপত্তি হয়। অণু-অণু-প্রমাণ প্রস্তর-কণা একত্র হইয়া এই মহা হিমালয় পর্ব্বত সুগঠিত হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ-বীজ একে একে ধীরে ধীরে, ইংরেজের অলক্ষ্যে সংগৃহীত হইতেছিল। ক্রমে অঙ্কুর হইল,—বৃক্ষ পূর্ণায়বয়ব হইল,—ফুল ফলে পরিশোভিত হইল;—তখন দেখিয়া শুনিয়া ইংরেজ ভয়-চকিত হইলেন,—ইংরেজের অন্তরাত্মা শুখাইল।

অসংখ্য কারণে সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সম্পূর্ণরূপে, বিশদ এবং বিস্তৃত ভাবে, সে কারণাবলীর কথা কহিতে গেলে, তাহাই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। যথাসময়ে সংক্ষেপে সে কারণ-কাহিনী কীর্ত্তন করিব।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে মে বেরিলীতে সিপাহী-বিদ্রোহের আরম্ভ। ১১ই জুন বিদ্রোহী-দলের সেনাপতি বখ্‌তখাঁ সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন। তিনি সমস্ত বন্দুক, কামান, গুলি, গোলা, তরবারি, বল্লম, বেয়নেট, টাকাকড়ি, তাঁবু,—সাজসরঞ্জাম এবং অস্ত্রশস্ত্র,—ইংরেজের যাহা কিছু ছিল,—তৎসমুদায়ই সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হন।

বখ্‌তখাঁর যাত্রার পর, এ দিকে খাঁবাহাদুর খাঁ প্রকৃত প্রস্তাবে বেরিলী অঞ্চলের নবাব হইলেন। যত দিন বিদ্রোহী সিপাহীদল বেরিলীতে ছিল, তত দিন খাঁবাহাদুরের হুকুম সহজে কেহ মান্য করিত না। প্রবল প্রজার উপর উৎপীড়ন করিতে হইলে, খাঁবাহাদুর খাঁকে তখন বখ্‌তখাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত।

খাঁবাহাদুর এক্ষণে পুরা নবাব হইয়া, দেওয়ান শোভারামের সাহায্যে, স্বদেশের সুশাসন আরম্ভ করিলেন। সুশাসনের সদর্থ সু-উৎপীড়ন।

প্রথম সৈন্যসংগ্রহ হইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ হাজার পদাতি-সেনা, দুই হাজার অশ্বারোহী, এবং দশ বার হাজার মহম্মদী ঝণ্ডা—সংগৃহীত হইল।

খাঁবাহাদুর খাঁ ক্রমশ নিকটবর্ত্তী নানাদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। প্রায় সমগ্র রোহিল-খণ্ড-কুমায়ুন প্রদেশ তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল।

কিন্তু অন্য দেশ অধিকার-আয়ত্তে আনয়ন কালে তাঁহাকে অনেক ক্ষত্রিয় নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। কোথায় শত্রুপক্ষ রণে পরাজিত হয়, কোথাও বা শত্রুগণ বিনাযুদ্ধে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করে। ফলকথা, যুদ্ধে যত না হউক, কৌশলে এবং নামের প্রতাপে খাঁবাহাদুর খাঁ দিগ্বিজয়ী হইলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গুলি, গোলা, তোপ, বন্দুক, তরবারি প্রচুর-পরিমাণে তৈয়ারি হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয়-অন্তরঙ্গ অনেক ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক নানা দেশের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইলেন। কোন জামাই কোন নগরের গবর্ণরী পদ পাইলেন; কোন সম্বন্ধী কোন সৈন্যদলের সেনাপতি হইলেন; কোন ভ্রাতুষ্পুত্র কোন নবকুমার দেওয়ান হইলেন। এ অঞ্চলে ইংরেজের নাম এককালে লোপ পাইল। "জয় নবাব বাহাদুরের জয়"—এই কথা কেবল নানা স্থানে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

উৎপীড়ন, অত্যাচার, অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা—ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সতীর সতীত্ব রাখা দায় হইয়া উঠিল। অমুকের সহধর্ম্মিণী পরমা সুন্দরী, এবং নবযৌবন-ভূষণে-ভূষিতা;—এই কথা নবাববংশীয় কোন নবযুবকের কাণে উঠিল। নবযুবক অমনি পরস্ত্রীকে পাইবার জন্য কলবল-কৌশল আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তখন দুর্ব্বলের স্ত্রী, বলবান্ কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে লাগিল। ধনীব্যক্তি ধন-লুণ্ঠনের আশঙ্কায় রাত্রে প্রায় নিদ্রা যাইত না। চুরি, ডাকাতি, মারামারি, দাঙ্গা, সহরে এই সকল ঘটনা নিয়তই ঘটিতে লাগিল। লোক-সকল কেমন যেন উন্মত্তপ্রায় হইল; সকলেই স্ব স্ব প্রধান; কেহ কাহাকেও মানে না; কেহ কাহারও কথা গ্রাহ্য করে না; জোর যার, মুলুক তার। দুর্ব্বল শিষ্টশান্ত প্রজাসমূহ বিভীষিকা-গ্রস্ত হইয়া কেমন যেন দিশাহারা হইল।

একটী কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। সাধারণ প্রজাবৃন্দ "ইংরেজ-রাজ্য এরূপ ভাবে হঠাৎ লুপ্ত হইক"—এ কথা একটী দিনও বলে নাই, ইংরেজকে দূরীভূত করিবার জন্য এক দিনও ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই। প্রজাকুল স্বচ্ছন্দে খাইতেছিল, পরিতেছিল,—আপন কাজকর্ম্ম—কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল;—হঠাৎ এক-দিন শুনিল,—ইংরেজ আর নাই, ইংরেজ হত, আহত, পলায়িত,—ইংরেজ ভারত-সীমার বহির্ভূত। আবার রোহিলখন্দে—কুমায়ুন প্রদেশে নবাবী আমল উপস্থিত হইল। আবার সেই পুরাতন প্রথা, পুরাতন নীতি, পুরাতন পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল। আবার সেই অর্দ্ধচন্দ্র-অঙ্কিত ধ্বজপতাকা উড্ডীন হইতে আরম্ভ হইল। আবার সেই মুসলমানের মসজীদ, মুসলমানের মৌলুভী, মুসলমানের কোরাণের সম্মান-আদর-গৌরব বৃদ্ধি হইল। আবার সেই মুসলমান সম্রাট্, মুসলমান রাজা, মুসলমান সেনাপতি, মুসলমান শাসনকর্ত্তা,—সমস্তই মুসলমানময় হইল। সুখের আর সীমা নাই।

সুখ অসীমই হউক, বা স-সীমই হউক, সাধারণ-প্রজা কিন্তু এ সুখ-সম্ভোগ করিতে সক্ষম ছিল না,—সম্মতও ছিল না। প্রজা,—ভাবে, আমি তাঁত বুনি আর খাই,—আমি লাঙ্গল চষি আর খাই,—আমি দোকান-পাট করি,—খাই-দাই আর থাকি। তা, ইংরেজই আমার রাজা হউক, মুসলমানই আমার রাজা হউক,—আর হিন্দুই আমার রাজা হউক,—তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।—আমি দু-বেলা কাজকর্ম্ম করিয়া, খাটিয়া-খুটিয়া স্ত্রীপুত্রের পূর্ণ-মাত্রায় ভরণ পোষণ করিতে পারিলেই আমার যথেষ্ট হইল। সুতরাং সাধারণ প্রজা যে, 'ইংরেজ-রাজ্য-লোপ' এই কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল,—তাহা নহে।

আমি স্থির দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি,—মুসলমান-প্রজা-সাধারণ, ইংরেজ রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হয় নাই। বোধ হয়, তাহারা এই ভাবিয়াছিল যে, পাহারার পরিবর্ত্তন হইল মাত্র। কিছুকাল ইংরেজ আমাদের প্রহরী রক্ষক স্বরূপ ছিল, এক্ষণে আবার আমাদের মুসলমান প্রহরী, মুসলমান রক্ষকই আসিল। যে রক্ষক হয় হউক,—ভাল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিলেই হইল।

মুসলমান-প্রজার মনে ত ঐরূপ ভাব! হিন্দু-প্রজার হৃদয়ে আরও বিষম ভাব! সিপাহী-বিদ্রোহ-ব্যাপারে কোন হিন্দু নরপতি রোহিলখন্দের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন না,—হিন্দুর বসুন্ধরা হিন্দুরাজের করতলগতও হইল না,—ছিল বাইবেল, আসিল কোরাণ,—ছিল যীশু, আসিল মহম্মদ,—ছিল খৃষ্টমাস, আসিল

মহরম! হিন্দুর ইহাতে আনন্দ কেন হইবে? আঁধার রজনী, আর অমানিশা,—এক অর্থে এ উভয়ই সমান।

ইংরেজ-রাজ্য লুপ্ত হইল বলিয়া হিন্দু-প্রজার ত উৎসবের কোনও কারণ ছিল না; বরং কষ্টেরই বিশেষ কারণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইংরেজ-রাজত্বে এরূপ ভাবে অত্যাচার ছিল না, লুণ্ঠন ছিল না, স্ত্রীর সতীত্ব অপহরণ ছিল না;—পূর্ব্বে ইংরেজের ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ গ্রহণ করিবার রীতিমত ব্যবস্থা ছিল,—রীতিমত বিচার-প্রথা ছিল;—পূর্ব্বে অপরাধী দণ্ড পাইত—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন হইত,—কিন্তু এক্ষণে, এই নতন নবাবী আমলের আরম্ভে নিয়ম, শৃঙ্খলা, পদ্ধতি কিছুই ছিল না। কাজেই প্রজা-সাধারণ অস্থির, উদ্‌বিগ্নচিত্ত, আতঙ্কযুক্ত হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প এক রকম বন্ধ হইয়াছিল। প্রকৃতই প্রজার কষ্টের অবধি ছিল না। আবার ইংরেজের শুভাগমন হউক, ইহাই অনেকে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তখন আমি অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর মুখে এই কথা শুনিয়াছি,—"বাবুজি! আর সহ্য হয় না; শীঘ্র ইংরেজ আগমন করুন,—পুনরায় শাসনদণ্ড লউন,—ইহাই আমরা চাহি। পূর্ব্বে আমরা রামরাজ্যে বাস করিতেছিলাম।"

অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানও ইংরেজের পুনরাগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। মুখে তাঁহারা ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেন না,—মুখে খাঁ বাহাদুরের জয়-কীর্ত্তন করিতেন,—কিন্তু অন্তরে ইংরেজের গুণ গাহিতেন। অধিক কি, খাঁ বাহাদুরখাঁর খুড়তুতা ভাই হাফিজ নিয়ামৎ খাঁ বলিতেন,—"ভাই সাহেব তো পাগল হোগয়ে হ্যায়। ইংরেজ বাহাদুর-নে হামারে বুজরুগোঁসে মুলুক লেলিয়া হ্যায়, লেকিন্ হামলোগোঁকো ওসিকা দেতে হ্যায়। আওর আচ্ছি আচ্ছি নোকুরি,—তসিলদারি, মুনসেফি, সদরালা, সদরসদুর—ইয়ে সব ওহোদা দিয়া হ্যায়। আওর হামলোগোঁকা পরওরিষ কিয়া হ্যায়। হামলোগোঁকো নেহি চাহিয়ে সরকার সে দুষমণি করেঁ। আওর সরকার অব্ জলদি আওএগি,—ইস্‌মে কুচ্ শক্ নেই হ্যায়।"

বেরিলী সহরের আমি যে বাসায় থাকিতাম, তথা হইতে হাফিজ নিয়ামতের বাটী অতি অল্পদূরেই অবস্থিত। আমার সহিত প্রায় তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইত। আমি বলিতাম "আপনি ইংরেজরাজের এত প্রশংসাবাদ করেন, এ কথা আপনার ভ্রাতা খাঁবাহাদুর শুনিলে আপনার উপর রাগ করিতে পারেন, বিশেষ বিরক্তও হইতে পারেন।" বৃদ্ধ হাফিজ নিয়ামৎ খাঁ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিত, "ও পাগলকে আমি ভয় করিব? সে বিরক্ত হইয়া আমার কি অনিষ্ট সাধন করিবে?"

আমি। তাঁহার অধীনে এখন দশ হাজার ফৌজ হইয়াছে—

হাফিজ নিয়ামৎ। খাঁ বাহাদুরের এখনও এত অধিক বল হয় নাই যে, সৈন্য দ্বারা আমার বাড়ী লুণ্ঠন করিতে পারে। আর আমি ইচ্ছা করিলে, একদিনেই সেই সমস্ত সৈন্য আমার বশে আনিতে পারি।

আমি। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র চুন্নামিঞা ত খাঁ বাহাদুরের অধীনে চাকুরি লইয়া নাএব দেওয়ান হইয়াছে নয়?

হাফিজ নিয়ামৎ। হাঁ! চুন্না বড়ই বেকুফ। আমি নিষেধ করিলেও আমার সে কথা শুনে নাই। তাহাকে আমি আর এ বাড়ী ঢুকিতে দিই না।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই চুন্নামিঞা আমার বাসায় আসিয়া প্রত্যহ সেতার বাজাইত;—এবং আমি তাহাকে মাসিক সর্ব্বরকমে প্রায় ত্রিশ টাকা দিতাম। সেই চুন্নামিঞার এক্ষণে মাসিক ৩০০৲ শত টাকা মাহিনা হইয়াছে।

হাফিজ নিয়ামৎ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ যে, ইংরেজের শুভ কামনা করেন, তাহা নবাব খাঁবাহাদুর খাঁ মনে মনে জানিতেন। কিন্তু অন্তরে ইহাঁদের অভিসন্ধি বুঝিয়াও, তিনি প্রকাশ্যে ইহার কোন প্রতীকার করিতে সক্ষম হন নাই। বিশেষ তাঁহার একমাত্র কন্যা—পরম প্রিয়তমা কন্যা—রূপবতী গুণবতী কন্যার সহিত হাফিজ নিয়ামতের কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ হইয়াছিল। কাজেই হাফিজ নিয়ামতের অনিষ্ট করিতে হইলে, জামতার ও কন্যার অনিষ্ট করিতে হয়। আরও এক কথা এই,—তিনি সহসা যদি নিয়ামতের উপর উৎপীড়ন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে বেরিলীর সমগ্র মুসলমান-সম্প্রদায়

ক্ষেপিয়া উঠিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারে,—অথবা তাঁহার সৈন্যদল মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করিতে পারে। বস্তুত খাঁ বাহাদুরের উপর অধিকাংশ গণ্য-মান্য মুসলমান খড়্গহস্ত ছিলেন। দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা,—এই খড়্গহস্ততার মূল কারণ। খাঁ-বাহাদুর কোন্ গুণে নবাব হইলেন?—আর আমাদের গুণগ্রামের এতই অভাব কি ছিল যে, আমরা নবাব হইতে সক্ষম হইলাম না? খাঁ-বাহাদুরের দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ;—আমাদেরও তাই;—সুতরাং আমরা নবাব-পদে প্রতিষ্ঠিত না হইলাম কেন? অধিকন্তু আমাদের বিষয়-সম্পত্তি এবং টাকা-কড়ি খাঁবাহাদুর খাঁ হইতে বরং অধিক হইবে, তথাচ কম নহে। অতএব আমাদের স্বত্ব, অধিকার, দাবী-দাওয়া পদে রাখিয়া আমাদিগকে নগণ্য জ্ঞানে একেবারে উপেক্ষা করিয়া,—কেবল কতকগুলি তোষা-মোদ প্রিয় নীচকুলোদ্ভব মুসলমানের সাহায্যে, খাঁবাহাদুর খাঁ স্বয়ং নবাব হইয়া অবশ্যই ঘোর অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন।

সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানীগণ প্রত্যহ ভগবান্‌কে ডাকিতেন,—বলিতেন, "হে ঈশ্বর! এ দেশে ইংরেজের রাজত্ব পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত কর; জ্বালা আর সহিতে পারি না;—সদাই শরীরে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে।" মিশ্র বৈজনাথ, লালা লছমীনারায়ণ, রাজা নহবৎ রায়, রায় চেৎ-রাম প্রভৃতি অনেক ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি গোপনে নাইনিতালস্থ পলায়িত ইংরেজগণের সহিত চিঠি পত্র লেখালিখি করিতেন; এবং মুসলমান নবাবের গতিবিধি সমস্তই তাঁহারা এইরূপে ইংরেজের কর্ণগোচর করিতেন।

যদি হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষই নবাব বাহা-দুরের উপর এত বিরূপ ছিল, তবে তিনি এরূপ অসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন কিরূপে? নানা দেশ জয় করিলেন কিরূপে?

সৈন্য সংগ্রহ সহজ। দেশের যে সকল লোক খাইতে পাইত না, যাহারা গুণ্ডাগিরি করিয়া দিনপাত করিত, যাহাদের কাজকর্ম্ম না যুটায় অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়াছিল,—তাহারাই মাসিক ৫৲ টাকা, ৬৲ টাকা, বা ৭৲ টাকা মাহিনায়, নবাবসাহেবের সৈন্যদল মধ্যে প্রবেশ করিল। সকল দেশেই ভদ্রনামধারী অনেক চোর, বঞ্চক, বদমাইস থাকে,—তাহারা কাপ্তেন, লেফ্টে-নেণ্ট, কর্ণেল প্রভৃতি পদ গ্রহণ করিল। পেটের দায়ে, অথবা নবাবের ক্রোধানলে পড়িবার ভয়ে, অনেক ভালমানুষ ব্যক্তিও নবাবের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খাঁবাহাদুর খাঁর রাজত্ব সময়ে শোভারামের সম্মান এবং প্রভুত্ব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাঁহার ক্ষমতাবলে বহু হিন্দু-সন্তান রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন; কেননা, শোভারাম যাহা করেন তাহাই হয়। তাঁহার এ প্রকার অসীম ক্ষমতা ঈদৃশ সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা দেখিয়া নও-মহেল্লার সইয়দেরা বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ঈর্ষা-কষায়িত নেত্রে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। এবং কি কৌশলে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। জুলাই মাসের কোন একদিন শোভারাম রাজ-দরবারের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে কতকগুলি সইয়দ আসিয়া গুপ্তভাবে খাঁবাহাদুরকে সংবাদ দিল যে, শোভারাম আপনার বাড়ীতে একজন ইংরেজকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সুতারাং তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই সংবাদ পাইয়া খাঁবাহাদুর সৈন্যসামন্ত লইয়া শোভারামের বাড়ীতে তল্লাস লইতে আদেশ দিলেন। একেই শোভারামের উপর সইয়েদ্‌দের ভয়ঙ্কর জাত-ক্রোধ ছিল, তাহাতে আবার এই আদেশ পাইবা মাত্র তাহারা সৈন্য লইয়া শোভারামের বাড়ী ঘেরিয়া ফেলিল এবং দরজা ভাঙ্গিয়া লুট-পাট করিতে আরম্ভ করিল। এই ভয়ঙ্কর অত্যা-চার এবং উৎপীড়নের কথা শোভারামের বন্ধু ইনায়েতউল্লাখাঁ, এবং বকুসিস আলির কর্ণগোচর হইল; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে গিয়া সেই অত্যাচারাসক্ত সৈনিকদিগকে ক্ষান্ত করিলেন। এদিকে শোভারাম দরবারে বসিয়া অভিনিবেশ-পূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার এবং উৎপীড়ন হইতেছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। যাহা হউক, যখন তিনি এই সংবাদ পাইলেন,

তখন তাঁহার ক্রোধ এবং ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ দরবারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া নিজগৃহের দ্বার রুদ্ধ করত মনের ক্ষোভ, মনের আক্রোশ মনেই মিটাইতে লাগিলেন; তিনি আর দরবারে উপস্থিত হইলেন না। শোভারাম খাঁবাহাদুরের দক্ষিণ হস্ত; তিনিই তাঁহার বুদ্ধিবল; তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কাজ-কর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা হইয়া উঠিল। কাজেই খাঁবাহাদুর বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন এবং তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। যাহা হউক, শোভারামকে পুনঃ হস্তগত করিবার ইচ্ছা তাঁহার নিতান্ত বলবতী হইয়া উঠিল। মাদারআলিখাঁ শোভা-রামের পরম বন্ধু ছিলেন; খাঁবাহাদুর তাঁহার সাহায্যে এবং স্বীয় দোষের জন্য বিধিমতে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, শোভারাম পুনরায় আপনার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে বেরিলীর একটী উদ্যানস্থ কূপের মধ্যে ডেপুটী-কালেক্টর ওয়াট সাহেবের মৃতদেহ পাওয়া গেল। অনেকে অনুমান করেন, শোভারাম এই ওয়াটসাহেবকে আপনার গৃহে লুকাইয়া রাখেন, এবং পাছে আবার কোন বিপদপাত হয়, এই ভয়ে তাঁহাকে হত্যা করিয়া উক্ত কূপে নিক্ষেপ করেন। এ ঘটনাটী লোকে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলি-য়াছিল, ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বেরিলীতে বিদ্রোহ সূচনা হইবামাত্রই তত্রস্থ ইংরেজেরা নাইনিতালে গিয়া আশ্রয় লন। এক্ষণে খাঁবাহা-দুর খাঁ এবং তাঁহার পরামর্শদাতারা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যতদিন নাইনিতাল ইংরেজ-দের অধিকৃত থাকিবে, ততদিন খাঁবাহাদুরের প্রভুত্ব রোহিলখন্দে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইবার আশা নাই। তাঁহারা ইহাও শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, হয় ত একদিন ইংরেজেরা কোন এক নূতন রেজিমেণ্ট সংগঠিত করিয়া তাঁহাদের অনায়াসে আক্রমণ করিতে পারেন। আর ইহাও তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, বৃটিশ-সন্তানগণ শিয়রে দণ্ডায়মান থাকিলে তাঁহাদের রাজ্যশাসন নিতান্ত শিথিলমূল হইবে এবং দেশীয় কুচক্রীগণ নানারূপ ষড়যন্ত্র দ্বারা নিরতই তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিবে। এইরূপ চিন্তা করত নাইনীতাল আক্রমণের জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সৈন্য সংগৃহীত হইল; খাঁবাহাদুর খাঁর পৌত্র বন্নেমীর সেনানায়কের পদে বরিত হইল। জুলাই মাসে যুদ্ধার্থ সসৈন্যে যাত্রা করিল। কিন্তু সে বহেড়িতে গিয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে আর একটী ঘটনা ঘটে। খাঁবাহা-দুর খাঁর পরামর্শদাতার অভাব ছিল না। যিনি যাহা মতলব আঁটিতেন, তাহা তাঁহাকে বলিলে তদনুসারে তিনি প্রায়ই তাহা করিতেন। রুক্ন-উদ্দৌলা নামক এক ব্যক্তি এই পরামর্শ দিলেন যে, দিল্লীর সম্রাটকে নজর পাঠান বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। খাঁবাহাদুর তাঁহার যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্ন লিখিত উপ-ঢৌকন পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, এই উপ-ঢৌকনের পরিবর্ত্তে উপযুক্ত খেলাত পাইবেন। এই আশায় উৎসাহিত হইয়া একখানি সুবৃহৎ পত্রের সঙ্গে এই সকল দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইলেন।

১। স্বর্ণনির্ম্মিত হাওদা এবং তদুপযুক্ত শোভন আস্তরণ সমন্বিত একটী বৃহৎ হস্তী।
২। মণিমুক্তা-খচিত-পর্য্যাণযুক্ত একটী অশ্ব।
৩। এক খানি কোরাণ।
৪। একটী মুকুট।
৫। ১০১ মোহর।

আমেদ-সা-খাঁ, আলি ইয়ারখাঁ, আকবরখাঁ এই তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,—৫০ জন অশ্বারোহী এবং ২০০ শত পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে এই উপঢৌকন লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। আমেদ-সা-খাঁ রামপুর পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আইসে।

জুলাই মাসে বন্নেমীর যুদ্ধার্থ বেরিলী পরি-ত্যাগ করে, কিন্তু সে নাইনিতাল না গিয়া বহেড়িতে অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য গ্রাম লুণ্ঠন করিতে থাকে। নাচ, গান, রমণী ও বারুণী লইয়া সেনাপতি বাহাদুর বহেড়িতে দিন কাটাইতে লাগিল। সেনাপতির এরূপ কার্য্য-শৈথিল্য দেখিয়া এক রেজিমেণ্ট সৈন্য সঙ্গে করিয়া আলি খাঁ মেওয়াতি এবং হাফিজ কাল্লানখাঁ, বন্নেমীরের সঙ্গে যোগ দিল এবং তাহাকে যুদ্ধার্থ নাইনি-তালে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল।

কিন্তু বন্নেমীর তথায় একেবারে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে আলিখাঁ তাহাকে বেরিলী ফিরিয়া যাইতে বলিল এবং তাহার নিকট হইতে কামান এবং সৈন্য লইয়া হালদোয়ানি এবং কাটগুদাম নামক স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় পঁহুছিয়া সে স্থান লুঠ করিয়া ভস্মীভূত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের এ অত্যাচার তৎপ্রদেশবাসীদের অধিক দিন সহ্ করিতে হয় নাই। অনতিবিলম্বে হঠাৎ একদিন নাইনিতাল হইতে সৈন্য আসিয়া আলিখাঁকে সসৈন্যে পরাজিত করিল। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আলিখাঁর অনেক সৈন্য হত হয়। খাঁবাহাদুর খাঁ নাইনিতাল আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইবার পূর্ব্বেই এ সংবাদ বেরিলী হইতে নাইনিতালে ইংরেজের গুপ্ত চর দ্বারা নীত হইয়াছিল। যখন এ কথা তিনি শুনিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিলীস্থ ইংরেজি-অভিজ্ঞ লোকদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুই দিনের অধিক কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। কারামুক্তির সময় আদেশ দেওয়া হয় যে, যাঁহারা ইংরেজের সঙ্গে পত্রাদি লেখালিখি করিতেছেন বলিয়া ধৃত হইবেন, তাঁহাদের অতি কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। যে সকল বাঙ্গালী বেরিলীতে ছিলেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালীর বেরিলী-সহর পরিত্যাগের কথা একটু বিশদভাবে বলিব। ৩১শে মে বিদ্রোহ হয়,—আমি জুন, জুলাই এবং আগষ্ট মাসের কয়েক দিন পর্য্যন্ত বেরিলীতে থাকি। অর্থাৎ শ্রাব মাসের শেষে,—যখন ও-দেশে বিষম বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, পথসমূহ পিচ্ছিল এবং কর্দ্দমপূর্ণ হইয়াছে, সেই সময় আমি বেরিলী-সহর একাকী নীরবে, গোপনে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

বেরিলীতে যে সমস্ত বাঙ্গালীর স্ত্রী-পরিবার ছিল, তাঁহারা বহুদিন হইতে বেরিলী-সহর ত্যাগের চেষ্টা বিশেষরূপে করিতেছিলেন। আমাদের সাত আট জন বাঙ্গালীর সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র ছিল না; আমরাও কিন্তু সহর-ত্যাগের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এদিকে নবাব বাহাদুর একত্র এক সঙ্গে সকল বাঙ্গালীকে সহর পরিত্যাগের আজ্ঞা দিতে কিছুতেই স্বীকৃত নহেন। খাঁবাহাদুর বলিতেন, "বাঙ্গালী ইংরেজের গুরু; বাঙ্গালীকে কেহ বিশ্বাস করিও না; বাঙ্গালী ও ইংরেজ একপ্রাণ।" পাছে সমগ্র বাঙ্গালী নাইনিতালে গিয়া ইংরেজের সহিত মিশিয়া কি একটা হুলস্থূল ঘটায়, ইহাই নবাবের ভয় ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টার পর শেষে হুকুম হইল, যে সকল বাঙ্গালীর স্ত্রী-পরিবার আছে, তাহারা সহর ত্যাগ করিয়া, আপন গৃহে যাইতে পারিবে;—বঙ্গদেশে বাঙ্গালী যাইবে,—অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, এই হুকুম বাহির করিবার জন্য রাজ-দরবারে অনেক টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছিল। এই হুকুম পাইয়া আমার হরদেব ও হরগোবিন্দ দাদা-মহাশয়গণ এবং চারি জন পরিবার-যুক্ত বাঙ্গালী, বেরিলী ত্যাগ করিয়া, নবাবের মুক্তিপত্র লইয়া, স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বেরিলী হইতে বঙ্গদেশ বহুদূর; পথে কেবল লুণ্ঠন, ডাকাতি, খুন হইতেছে; কিছু দূর গিয়া, তাঁহারা অন্য এক বাঁকা পথ দিয়া আবার বেরিলীর দিকে ফিরিলেন; কিন্তু ঠিক্ বেরিলীতে না আসিয়া, বেরিলীকে বামে রাখিয়া তাঁহারা আরও উত্তরাভিমুখে চলিলেন। শেষে কাশীপুরের রাজা শিবরাজ সিংহের তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রাজা শিবরাজ সিংহ ইংরেজ-রাজের বিশেষ সাহায্য করেন;—নগদ টাকা, সৈন্য ও রসদ-দানে ইংরেজকে রক্ষা করেন। ইঁহারা, বিদ্রোহ-সময়ে কাশীপুরে পরমসুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে খাঁবাহাদুর শুনিলেন, বেরিলীর কোন কোন অধিবাসী নাইনিতালস্থ ইংরেজগণের সহিত চিঠিপত্র লেখালিখি করিয়া থাকে। এ কথা শুনিয়াই অমনি তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি সহসা হুকুম দিলেন,—"বেরিলী সহরে যে ব্যক্তি ইংরেজি জানে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্তার করিয়া কারা-কূপে নিক্ষেপ কর।" এইরূপ গ্রেফ্তারের হুকুম পাইয়া, নবাবের পুলিশ-কর্ম্মচারীগণ সহরে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকেই ইংরেজি-

বলিয়া ধরিতে লাগিল। যাহাদের টাকা ছিল, তাহারা পুলিশকে উৎকোচ দিয়া,—পুলিশের পদপ্রান্তে প্রচুর-পরিমাণে টাকা বর্ষণ করিয়া, অব্যাহতি লাভ করিল। নানা রহস্যজনক ব্যাপারও ঘটিতে আরম্ভ হইল। যে সকল ধনবানের সন্তান এ, বি, সি, ডি পড়ে, উৎকোচের লোভে পুলিশ তাহাদিগকেও গিয়া ধরিল। পুলিশ কাহারও হাতে হাতকড়ি দিল, কাহাকেও পেছমোড়া করিয়া বাঁধিল, কাহারও পৃষ্ঠে দারুণ বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। প্রজাকুল চারিদিকে গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুস্থানী এবং তাহাদের সন্তানগণ—সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই শত লোক হঠাৎ একদিনে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। "হায় হায়" শব্দে দিক্‌সমূহ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রথম দিন আমাদিগকে কেহ ধরিতে আসিল না। আমাদের দুই ভাইকে যে, দয়া করিয়া পুলিশ প্রথম দিন ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা নহে। প্রথম দিন দুই-তিন মহল্লার ইংরেজি-অভিজ্ঞ লোক গ্রেফতার করিতে করিতেই সূর্য্যদেব অস্তমিত হন। কাজেই আমাদের পাড়ায় সেদিন আর পুলিশ আসিল না। লোক-পরম্পরায় অবগত হইলাম, দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকাল হইতেই আমাদের পল্লীতে গ্রেফ্‌তার আরম্ভ হইবে। কাশীপ্রসাদের মুখটী একেবারে শুকাইয়াছে। কাশী কহিল,—"দাদা! আর বুঝি রক্ষা নাই। কল্য নিশ্চয়ই আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। বেরিলী-সহর মধ্যে আমরা দুই ভাই এক্ষণে যত ইংরেজি জানি, তত ইংরেজি আর কেহই জানে না। কাজেই আমাদিগকে আগে ধরিবে।"

আমি। ভাই! এত বিচলিত হইও না। বিপদে ভগবান্ রক্ষা করিবেন।

কাশী। এবার ত রক্ষার উপায় দেখি না। বেরিলী হইতে এ রাত্রে পলাইয়া যে, প্রাণ-রক্ষা করিব, তাহার উপায় নাই। কারণ, সহরের চারি দিকে প্রবল পাহারার ঘাটি আছে। মুক্তিপত্র ব্যতীত কাহারও সহর ত্যাগ করিয়া যাইবার যো নাই।

আমি। ভাই! ভাবিও না,—রাত্রি হইয়াছে, আহারাদি করিয়া ঘুমাও।

বলা বাহুল্য, কাশীপ্রসাদের সেরাত্রি ঘুম হয় নাই।

প্রাতঃকালে উঠিলাম,—ভাবিলাম, পুলিশের বড়কর্ত্তার নিকট গিয়া উপস্থিত হই,—তিনি আমার পরিচিত ব্যক্তি—তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দও আছে,—তাঁহাকে গিয়া আমাদের রক্ষার কথা বলি,—যদি কিছু টাকা তিনি লয়েন, তবে তাঁহাকে দিয়া আসিব।

আমার তখন টাকার নিতান্ত অভাব ছিল; কারণ যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল। উপায়হীন হইয়া আমি তখন প্রচ্ছন্নভাবে পান্নার নিকট গিয়া ১১টী মোহর ধার করিয়া আনিলাম। মোহর লইয়া, পথে আসিতে আসিতে শুনিলাম, গতকল্য যে সকল ব্যক্তি ইংরেজি-জানা অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের সকলেরই মুক্তির হুকুম হইয়াছে। হঠাৎ এ কথায় বিশ্বাস হইল না। শেষে জানিলাম, এ কথাই সত্য। ইহার কারণ এই,—সহরের প্রায় দশ বার হাজার অধিবাসী গত কল্য রাত্রে জেলখানা ঘেরাও করিয়াছিল, 'বল পূর্ব্বক জেল ভাঙ্গিয়া কারাবাসীগণকে মুক্তি দিব' এরূপ ভয় দেখাইয়াছিল। খাঁবাহাদুর, তাই শোভারামের পরামর্শে বার জন বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত, আর সকলকেই খালাসের হুকুম দেন। এইরূপ খালাসের হুকুম হইলেও, বন্দোবস্তের দোষে অনেককে ২।৩ দিন কারাগারে থাকিতেই হইয়াছিল।

যাহা হউক, খাঁবাহাদুর শেষে এই আজ্ঞা দিলেন, "যদি কোন ব্যক্তি ইংরেজকে চিঠিপত্র লেখেন,তবে তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর বেরিলী-সহরে যে সকল বাঙ্গালী আছে, তাহারা অবিলম্বে সহর ত্যাগ করিয়া যাউক।"

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া এ সংবাদ আমি কাশীপ্রসাদকে বলিলে, তাহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। আমি বলিলাম,—"দেখ, বিপদভঞ্জন মধুসূদন আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। বিপদে ধৈর্য্য ধরিবে। উতলা হইতে নাই। তবে সাধ্যমত ধীরভাবে বিপদ দূরীকরণার্থ সতত চেষ্টা করিবে।"

এই উপদেশ-বাক্য কাশীর কাণে গেল কি না বলিতে পারি না। কাশী কহিল,—"দাদা! আজই এখনি এ স্থান হইতে পলাইলে হয় না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ভাই! আবার তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে।"

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

লর্ড মেয়ো।

(২)

শাসনেতিহাস ও শাসন-নীতি।

অতঃপর লর্ড মেয়োর শাসনেতিহাস ও শাসন-নীতি পর্য্যালোচনা করার অবসর উপস্থিত। এ বিষয় আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব; যথা,—(১) মিত্র ও করদ রাজ্য সম্বন্ধীয় নীতি; (২) পররাষ্ট্র-নীতি; (৩) রাজস্বের আয়-ব্যয়-নীতি এবং (৪) আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি। এই কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিলে লর্ড মেয়োর শাসনেতিহাস সমস্তই বিবৃত হইবে। কিন্তু এ আলোচনা করার পূর্ব্বে সাধারণত রাজ-প্রতিনিধিদিগের সহিত "সুপ্রিম কাউন্সিলে"র সদস্যদিগের কিরূপ সম্বন্ধ এবং কাউন্সিলের কার্য্য-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কারণ, তদ্দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, শাসন-যন্ত্রের সর্ব্বাগ্রভাগ কিরূপে পরিচালিত হয়। তবে প্রবন্ধ এতাদৃশ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে যে, আশঙ্কা,—পাছে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়।

কাউন্সিলের গঠন ও কার্য্য প্রণালী।

গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রি-সভার গঠন এখন যে প্রকার, পূর্ব্বে সে প্রকার ছিল না। পূর্ব্বে অর্থাৎ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় পর্য্যন্ত মন্ত্রি-সভা বা কাউন্সিলের মেম্বরদিগের অধিকাংশের ঐকমত্যানুসারেই সরকারী-কার্য্য সম্পন্ন হইত; গবর্ণর জেনারেল নিজে সে মতের বিরোধী হইলেও তাঁহার মত টিকিত না; পরন্তু তাঁহার পক্ষে অল্প সংখ্যক মেম্বরের মত হইলেও তাহা টিকিত না, অধিকাংশের মতেই কাজ হইত। কাউন্সিলের গরূপ গঠন ছিল,—কোম্পানীর আমলে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত। লর্ড কর্ণওয়ালিসই কাউন্সিলের এরূপ সাধারণ-তন্ত্র গঠন সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি উত্থাপন করেন এবং শাসন-সৌকার্য্যার্থে উহা কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়েন। উহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠন ঘটে,—কোম্পানীর শাসনের পর, রাজকীয় শাসনের প্রথম প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিঙের শাসন-কালে। কোম্পানীর আমলে কাউন্সিলের উপরোক্ত সাধারণ-তান্ত্রিক প্রণালী নিবন্ধন কাউন্সিল-গৃহে প্রায়ই কন্দল বাধিত এবং তজ্জন্য কেলেঙ্কারীও অনেক হইত; কাজেই কাজ কর্ম্মের বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিত। লর্ড হেষ্টিংসের সহিত তদীয় কাউন্সিলের মেম্বরদিগের সহিত কি ভয়ানক বিসংবাদ ঘটিয়াছিল, তাহা অত্যল্প-ইতিহাসজ্ঞেরও স্মরণ আছে। স্বাধীন, প্রজা-তান্ত্রিক রাজ্যে যাহাই হউক, পরাজিত ও বহু জাতীয় প্রজা-সঙ্কুল রাজ্যে এরূপ সাধারণ-তান্ত্রিক কাউন্সিল সম্ভবে না। অন্তত এদেশে সম্ভবে নাই। স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র রাজত্বে একজন "সর্ব্বেসর্ব্বা" রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি প্রয়োজনই হয়। হেষ্টিংসের অবস্থা স্মরণ করিয়াই, বোধ হয়, কর্ণওয়ালিস কাউন্সিলের সংস্কার-সাধন করিয়া লইয়াছিলেন এবং সে সংস্কার ক্যানিঙের সময়ে

সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সংক্ষেপত তখনকার এবং এখনকার কাউন্সিলে তফাৎ এই যে, তখন কাউন্সিলের প্রত্যেক মেম্বরই গবর্ণর জেনারেলের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন; আর এখন তাঁহারা গবর্ণর জেনারেলের অধীনস্থ মন্ত্রী। তখন গবর্ণর জেনারেল, সমকক্ষদিগের মধ্যে প্রধান বা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন; আর এখন তিনি সর্ব্বময় প্রভু। তখন মেম্বরদিগের "ভোট"-সংখ্যানুসারে কার্য্যাকার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হইত; আর এখন মেম্বরদিগের ভোট-প্রদান-অধিকার থাকিলেও গবর্ণর জেনারেল স্বেচ্ছা ও আবশ্যকতানুসারে তাহা "রদ" করিয়া নিজের "রায়" অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন। এই পরিবর্ত্তন ঘটে,—কর্ণওয়ালিসের সময়ে। কিন্তু তখনও মেম্বরগণ প্রত্যেকেই বড় বড় "মিনিট" লিখিয়া সকল বিষয়ে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিতে বাধ্য ছিলেন। ডাক্তর হণ্টার বলেন যে, এই প্রণালীতে কেবল কার্য্য বাড়িয়া যাইত এবং অনর্থক কালক্ষেপ হইত। তখন গবর্ণর জেনারেল নিজে ও মেম্বরগণ মিলিয়া যে কার্য্য করিতেন, তাহা এখন একজন অণ্ডার সেক্রেটারী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, লর্ড ক্যানিঙের সময়ে এ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া এক এক মেম্বরকে এক একটী কার্য্য-বিভাগের ভার দেওয়া হয় এবং গবর্ণর জেনারেল নিজেও বিভাগ-বিশেষের "খাস" ভার প্রাপ্ত ও সমস্ত বিভাগের প্রেসিডেণ্ট হন। পরন্ত প্রত্যেক বিভাগেই এক একজন করিয়া চিফ্ সেক্রেটারী ও কয়েক জন করিয়া অণ্ডার সেক্রেটারীর ব্যবস্থা হয়। এতাবৎ কাল এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার গবর্ণর জেনারেলের নিজের হস্তে থাকা নিয়ম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল এই একটী বিভাগের ভারই সব গবর্ণর জেনারেল লইতেন এবং লইয়া থাকেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত কার্য্য-প্রিয় লর্ড মেয়ো দুইটী বিভাগের কার্য্য ও অব্যবহিত-দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পররাষ্ট্র-বিভাগ এবং পূর্ত্ত-বিভাগ তাঁহার নিজের হস্তে ছিল। পরন্ত "হোম ডিপার্টমেণ্ট" ছিল,—স্যর ব্যারো এলিসের হস্তে। রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন,—স্যর জন ষ্ট্রাচি; আয় ও ব্যয়-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন,—স্যর রিচার্ড টেম্পল; সমর-সচিব ছিলেন,—স্যর হেনরি নরম্যান এবং ব্যবস্থা-সচিব ছিলেন,—স্যর ফিটজেমস্ ষ্টেফেন। লর্ড মেয়োর আমলে কংগ্রেসের কর্ত্তা হিউম সাহেব ছিলেন,—রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য-বিভাগের চিফ্ সেক্রেটারী; ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর বেলি সাহেব ছিলেন,—হোম ডিপার্টমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারী; আয়-ব্যয়-বিভাগে ছিলেন,—চ্যাপম্যান সাহেব। সামরিক-বিভাগে জেনারেল বারণ এবং ব্যবস্থাবিভাগে ডাক্তার হুইট্‌লী ষ্টোক্‌স ছিলেন চিফ্ সেক্রেটারী। লর্ড মেয়োর প্রাইবেট সেক্রেটারী ছিলেন,—মেজর বারণ্।

নিজের হস্তে দুইটী বৃহৎ বৃহৎ বিভাগ। তদ্ব্যতীত কোন বিভাগেরই কার্য্য, লর্ড মেয়ো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দেখিয়া ছাড়িতেন না। তিনি সময়ের এমনি মিতব্যয়ী ছিলেন এবং এবং সময়ের এমনি সুন্দর বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে সমস্ত কার্য্য সমাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু পরিশ্রমের অবধি থাকিত না।

প্রত্যূষে উঠিয়াই লর্ড মেয়ো কাজে বসিতেন।

লর্ড মেয়োর কার্য্যশীলতা।

এ দেশে সাহেবেরা প্রায় সকলেই একটু "মর্ণিং-ওয়াক" করিয়া থাকেন। লর্ড মেয়োর ভাগ্যে কিন্তু সে সুখদ সামগ্রী টুকু জুটিত না। প্রত্যূষে উঠিয়াই কাজে বসিতেন এবং কাজ রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত সমানে চলিত;—ইহার মধ্যে পানাহারাদির জন্য অতি অল্পমাত্র সময় ব্যয়িত হইত মাত্র। সান্ধ্য-ভ্রমণে কয়েক মিনিট মাত্র বাহির হইতেন। কিন্তু অতিরিক্ত কাজ-নিবন্ধন তাহাও প্রায় ঘটিত না। কারণ, এমন কোন্ দিন যায়, যে দিন অতিরিক্ত ও অনির্দ্দিষ্ট কাজ লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত না হয়? আহারের পূর্ব্বে পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিবার সময় লর্ড মেয়ো তদীয় কনিষ্ঠ বালকটীকে লইয়া একটু ক্রীড়া করিতেন; তাহার সহিত বাইবেলের ও ম্যাকবেথের গল্প করিতেন। তিনি নিশীথ-সময়েও কাজ করিতেন; কিন্তু জলবায়ুর কঠোরতা-নিবন্ধন ক্রমে তাঁহাকে সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

এখন পাঠক! দেখুন, রাজ-প্রতিনিধির জন্য পুষ্প-শয্যা ব্যবস্থা নহে; নিরতিশয় শ্রম, তাহার উপর অসীম মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ—

অতএব বুঝুন, সসাগর রাজ্যের সম্রাট-স্থানীয় ব্যক্তিরও কিরূপে দিনপাত হয়! ইহা শিক্ষার বিষয়,—চিন্তার বিষয়; সংসারক্লিষ্ট সকল লোকেরই সান্ত্বনার বিষয় নয় কি?

ভারত-গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ্য সম্বন্ধীয় নীতি, কোম্পানীর আমলে যাহা ছিল; কুইনের আমলে অর্থাৎ লর্ড ক্যানিঙের সময় হইতে, নানা কারণে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছিল। কোম্পানী বাহাদুর, দেশীয় রাজাদিগকে শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচনা করিতেন; সুতরাং সেই চক্ষেই তাঁহাদিগকে দেখিতেন। ইহার ফল হইয়াছিল,—দেশীয় রাজার অধিকারাধীন রাজ্য, সুবিধামতে বৃটিশ রাজ্যের অঙ্গীকরণ; এবং ব্যবস্থা বুঝিয়া অবস্থানুসারে দেশীয় রাজাদিগের সহিত বহু-বন্ধনযুক্ত সন্ধি-সংস্থাপন। কোম্পানী বাহাদুরের রাজনীতিক বিশ্বাস এইরূপ ছিল যে, ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া সুশাসন করিলে নিজস্ব অধিকারের প্রজাবর্গ প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দেশীয় রাজন্যবর্গ কোন ক্রমেই কখনও অবাধ-বশ্যতা স্বীকার করিবেন না, সৌহার্দ্দ-সূত্রেও বদ্ধ হইবেন না; কারণ তাহা স্বার্থ-শাস্ত্রানুসারে অস্বাভাবিক। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উপরোক্ত নীতি সংগঠন ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কুইন-প্রবর্ত্তিত শাসনের প্রথম প্রতিনিধি-শাসয়িতা লর্ড ক্যানিঙ দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, 'কোম্পানীর এই নীতি সর্ব্বথা শুভ-ফল-প্রসূ হইবে না। এ নীতি অপরিবর্ত্তিত ভাবে অবলম্বন করিলে দেশ-মধ্যে অশান্তি ও অসন্তোষের অগ্নি একদিনের জন্যও নির্ব্বাপিত হইবে না; বহিঃবিরোধ ত লাগিয়াই থাকিবে, তদ্ব্যতীত আভ্যন্তরীণ শাসনেও নানা উপদ্রব ঘটিবে;—মিউটিনী"র পর পুনঃ "মিউটিনী" উপস্থিত হইবে। অগ্নি-অস্ত্র ও লৌহ-শৃঙ্খলে ইংরেজ-রাজত্ব অভ্যন্তর-প্রবিষ্ট-মূল ও চিরস্থায়ী হইবে না; অতএব "যেন তেন প্রকারেণ" শিক্ষা ও সৌহৃদ্য-জাল বিস্তার করিতেই হইবে এবং তদ্দ্বারা ভারতীয় রাজা ও প্রজা—উভয়েরই মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, উভয়কেই মিত্রতার মণিময়-শৃঙ্খলে "একাল-আখেরে"র জন্য আবদ্ধ করিতে হইবে। এই বিশ্ববিমোহিনী ও সর্ব্বত্র সাম্য-শক্তি-সঞ্চারিণী সুমধুর রাজ-নীতিক "বিজয়া-বটিকা" প্রস্তুত হইয়াছিল লর্ড ক্যানিঙের সময়ে এবং ইহার সার্ব্ব-ভৌমিক প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—লর্ড মেয়ো। ইদানী সময়ে সময়ে কোন কোন প্রয়োগকর্ত্তার চিত্ত-চাপল্যে বা অন্য যে কারণেই হউক বটিকা প্রয়োগে ক্বচিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে বটে; কিন্তু বটিকার বিজয়া-শক্তি তদ্বৎ বিদ্যমান আছে এবং তাহার ফলও চমৎকার ফলিয়াছে।

সদাশয় সূক্ষ্মদর্শী লর্ড মেয়ো অতি মধুরভাবে এই রাজনীতিক বটিকা, দেশীয় নৃপতিবর্গের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের মধ্যে ইংরেজ-শাসনের সৌহার্দ্দ-শক্তি বস্তুতই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মিষ্টালাপে, তাঁহার সরলতায়, তাঁহার আত্মীয়তায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দেশীয় ভূপতিদিগের সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি সকলেরই ভালবাসা ও বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজাদিগের প্রকৃত সম্বন্ধ স্পষ্ট ভাষায় ও সরলভাবে তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, "ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের রাজ-উপাধি বা রাজত্ব, স্বার্থ এবং সর্ব্ববিধ স্বত্বাধিকার ও সম্ভ্রম, পুরুষ-পরম্পরায় অনুমোদন ও সংরক্ষণ করিবেন; ইহার বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট আর কিছুই চাহেন না; চাহেন কেবল, দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে সুশাসন, প্রজাই স্বত্বের নির্ব্বিঘ্নতা, ন্যায়ানুমোদিত বিচার, বাণিজ্যাদির স্ফূর্ত্তি, পথঘাটের বিশিষ্ট বন্দোবস্ত, শিক্ষার উন্নতি ইত্যাদি। বাহ্যাড়ম্বরে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট বিমুগ্ধ হইবেন না। কেবলই তোপের সংখ্যাধিক্য বা দরবার-গৃহের চাকচিক্য ও উচ্চ-নিম্ন আসন-প্রদান, উক্ত গবর্ণমেণ্টের আদর ও অনুগ্রহের পরিচায়ক নহে। উহার প্রকৃত বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসভাজন হইতে হইলে, প্রত্যেক রাজারই স্বরাজ্যে সুশাসন ও শান্তি সংস্থাপন করা চাই। নতুবা বন্ধুত্বের অধিকারী কেহই হইতে পারিবেন না। বক্তৃতার উপসংহারে অতি সরল ও মিষ্টভাবে লর্ড মেয়ো যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম আমি ইত্যগ্রেই লিখিয়াছি। মেয়ো মহোদয় বলিয়াছিলেন;—

The steam-vessel and the railroad

enable England, year by year, to enfold India in a closer embrace. But the coils she seeks to entwine around her, are not iron fetters but the golden chains of affection and peace.

বর্ষে বর্ষে বাষ্পায় পোত ও রেলপথ বর্দ্ধিত করিয়া ইংলণ্ড, ইণ্ডিয়াকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ-ভাবে আলিঙ্গন করিতেছে। ইণ্ডিয়ার শরীরে ইংলণ্ডের এই ঘনিষ্ঠালিঙ্গন-সূত্রের বন্ধন লৌহময় বন্ধন নহে; ইহা স্নেহ এবং শান্তির স্বর্ণ শৃঙ্খলের বন্ধন।

দেশীয় রাজা ও রাজপুত্রদিগের—বিদ্যালয়-সম্ভূতা ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত,—লর্ড মেয়োর যত্নেই হইয়াছিল। কাটেওয়ারের রাজকুমার ও আজমীঢ়ের 'মেয়ো কলেজ' তাঁহারই উদ্যোগে অনুরোধে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহার পূর্ব্বে রাজা-রাজড়াদিগের সাধারণ শিক্ষালয় প্রকৃত প্রস্তাবে আর একটীও ছিল না।

এক আলোয়াড় ব্যতীত দেশীয় মিত্ররাজ্য-নিচয়ের আর কোথাও বিশেষ এমন কিছু উপদ্রব ও অশাসন উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে লর্ড মেয়োর সময়ে ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। ইতিহাসে যেরূপ বিবৃত আছে, তাহাতে আলোয়াড়-রাজ্যে অত্যন্ত অশাসন, অসন্তোষ উপস্থিত হওয়াতেই লর্ড মেয়ো অগত্যা রাজ্যের মঙ্গলার্থেই তাহার শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাশ্মীরে এ সময়ে আমরা যে প্রকার একটী শাসন-সমিতি দেখিতে পাইতেছি, আলোয়াড়েও লর্ড মেয়োর নূতন বন্দোবস্তে ঠিক তদনুরূপ একটী শাসন-সমিতি গঠিত হইয়া রাজকার্য্য সেই সমিতির হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত মহারাজের রাজ-সম্ভ্রম এক বিন্দুও ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। তিনি স্বরাজ্যে রাজভোগেই ছিলেন, তাঁহার রাজ-সম্ভ্রমোপযোগী ব্যয়ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; পরন্তু সুশাসনের উপযুক্ত শক্তি দেখাইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ শাসনদণ্ড স্বহস্তে পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন—এরূপ নিয়মও করা হইয়াছিল। মহারাজের চরিত্র সংশোধিত করিয়া তাঁহাকে সুশাসন-ক্ষম করিতে লর্ড মেয়ো চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অতিরিক্ত পানাসক্তি ও লাম্পট্যে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহারাজ অকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ইহাঁর চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতি কুৎসিত এবং তন্নিবন্ধন তদীয় রাজ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সময়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সুশাসনের ব্যবস্থা না করিলে রাজ্য নিশ্চয়ই ছারেখারে যাইত।

কাটেওয়াড়ের ১৮৭টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্যের অবস্থাও এ সময়ে সন্তোষকর ছিল না। গৃহ-বিবাদ, লুণ্ঠন-পরায়ণতা ও শাসন-বিশৃঙ্খলতা ইহাদের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল। অতি কৌশল পূর্ব্বক লর্ড মেয়ো এ সকল রাজ্যে সংস্কারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

মিত্ররাজ্য-নিচয়ের উন্নতি ও মঙ্গলার্থে লর্ড মেয়োর ব্যক্তিগত যত্ন ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইত এবং সে পক্ষে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থও হয় নাই। মিত্ররাজ্য-সমূহে "মিত্রতা" ও উন্নতি—উভয়ই প্রবর্ত্তিত করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। ভুপালের বেগম সাহেবা এই সময়ে শাসন-কার্য্যে বিশিষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেন; লর্ড মেয়ো তাঁহাকে সম্মানিতাও করিয়াছিলেন বিশিষ্ট প্রকারে। বেগম সাহেবা কলিকাতায় আগমন করিয়া যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মধ্যম রাজ-কুমার ডিউক অব এডিনবরার সহিত পরিচিতা হন।

সীমান্ত-শাসন।

লর্ড মেয়োর সীমান্ত-প্রদেশীয় শাসন-নীতি বিলক্ষণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। সীমান্তাধিবাসী বন্য ও পার্ব্বতীয় জাতিদিগকে শান্তিরক্ষা করিতে সর্ব্বথা বাধ্য কর; কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া তাহাদিগের প্রতি কোনও অত্যাচার করিতে পারিবে না, তাহাদিগের ধ্বংস-সাধন করিতে পারিবে না। এ প্রকার সাবধানতা অবলম্বন কর, যাহাতে সীমান্তস্থ জাতিরা ভারতাধিকারে আসিয়া শান্তিভঙ্গ ও উপদ্রব না করিতে পারে; কিন্তু এজন্য নিয়ত সমরাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে না। ইহাই লর্ড মেয়োর নীতি এবং এই উদার নীতি অনুসারেই তিনি অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই নীতি, সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ ও উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে উপাদেয় হইত না;

—তাঁহারা ইহা আদৌ অনুমোদন করিতেন না। তাঁহারা ইহার প্রবল প্রতিবাদও করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজ-প্রতিনিধি অটল। সৈনিক কর্ত্তাদিগের বাদ-প্রতিবাদ, উপরোধ-অনুরোধ—কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে সামরিক বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা-নিবারণার্থ তাঁহাকে অতিশয় দৃঢ়তা এবং কিয়ৎপরিমাণে কঠোরতাও অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সীমান্ত-নিচয়ে সৈন্য-সংস্থাপনার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন,—

"এ অনুরোধের অর্থ এই যে, বসন্তের প্রারম্ভে পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈন্য সংস্থাপন করা হউক আর বৃটিশ সৈন্যেরা উদ্দাম ও নিরঙ্কুশ হইয়া লোকের শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করুক, গ্রাম কি গ্রাম ধ্বংস-পুরে পাঠাক,—পুনর্ব্বার পূর্ব্বের সেই সংহার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক; তাহা না হইলে যেন আর সীমান্তে শান্তিরক্ষা হইবে না!! কিন্তু আমি কোনক্রমেই এ প্রকার সাঙ্ঘাতিক কার্য্য করিতে অনুমোদন করিব না, আদেশও দিব না। যে প্রতিহিংসা-নীতি পরিহার করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট উদ্বিগ্ন; তাহাই অবলম্বনার্থ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের উৎসাহপূর্ণ অর্দ্ধাবৃত বাসনা,—উপস্থিত উপরোধে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।"

যে "প্রেষ্টিজে"র জন্য সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করা অধুনাতন সময়ে গবর্ণমেণ্টের একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই প্রেষ্টিজ-সংগ্রাম সম্বন্ধে লর্ড মেয়োর নীতি কিরূপ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য বটে। তাঁহার নিজমুখের কয়েকটী মাত্র ইংরেজী কথা উদ্ধৃত করিতেছি,—

I object to fight for prestige. And even those who may still think that killing people for the sake of prestige, is morally right, will hardly assert that the character and authourity of the British arms in India are affected one way or the other by skirmishes with wild frontier tribes.

অর্থাৎ "প্রেষ্টিজের জন্য যুদ্ধ করিতে আমি সম্পূর্ণ নারাজ। যাঁহারা নরহত্যা করিয়া 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করা এখনও সমীতি-সঙ্গত বিবেচনা করেন, তাঁহারাও এ কথা বলিতে সমর্থ হইবেন না যে, সীমান্তের দুই দশটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ভারতে বৃটিশ-বলের কোনও অংশে ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়।"

কেবল ইহা নহে; লর্ড মেয়ো বলিতেন,—ভারতে বা তাহার সীমান্তে বৃটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক ক্রোধে নিক্ষিপ্ত বন্দুকের একটী মাত্র আওয়াজও এসিয়াখণ্ডে যে প্রতিধ্বনিত হয় এবং তদ্দ্বারা বৃটিশবলের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই ঘটে। কারণ তাহাতে প্রমাণ করে এবং সন্দেহ উদ্দীপন করে যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে অন্তত সীমান্ত-প্রদেশেও অদ্যাপি অস্ত্র-চালনা চলিতেছে।

সীমান্ত-যুদ্ধে ও তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় ইদানী রাজকোষ শূন্য। লর্ড মেয়োর এ সম্বন্ধীয় নীতি কেহই আর এখন বারেক স্মরণ করেন না,—ইহা কেবল আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয়। পরন্তু মিত্ররাজ্য ও স্বরাজ্যে পররাজ্য সংযোজন সম্বন্ধেও লর্ড মেয়োর নীতি সর্ব্বদা অনুসরণীয়। লর্ড মেয়োর ন্যায় দূরদর্শী রাজনীতিক-ভারতীয়-শাসন-তরীর কর্ণধার থাকিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মাপহরণ হইত না; মণিপুর-বিভ্রাটও ঘটিত না; সীমান্ত ব্যাপারে ভারত-সাম্রাজ্য সর্ব্বস্বান্তও হইত না; রাজকোষের বিপন্নাবস্থাও উপস্থিত হইত না। লর্ড মেয়োর সময়ে তাহার যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই বলিলেও চলে; অথচ 'চার্জ্জ' লইবার সময়ে রাজভাণ্ডার কেবল "শূন্য" নহে, তাহাতে "মহাশূন্য" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ভারত-গবর্ণমেণ্ট তখন প্রায় "দেউলে" হইতেছিলেন। ভারত-ভূমির দুরদৃষ্ট, তাই অতি অল্পকাল মধ্যেই লর্ড মেয়োর জীবনের সহিত তাঁহার শাসনকাল শেষ হইয়া গিয়াছিল।

লুসাই যুদ্ধ।

লর্ড মেয়োর সময়ে সীমান্ত-দেশের দুইটী মাত্র স্থানে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। প্রথম উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে 'কুকা' জাতির উপদ্রব। ১৮৭২ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে ইহারা লুধিয়ানা আক্রমণ করিয়া কএকটী হত্যা করে। দিল্লী হইতে অবিলম্বে সৈন্য প্রেরিত হইয়া ইহাদিগকে দমন করে। এক শত জন 'কুকা' হত এবং তাহাদের বহু সংখ্যক বন্দী হয়। দ্বিতীয় সংঘর্ষ উত্তর-পূর্ব্ব-সীমান্তে 'লুসাই' পাহাড়ে। প্রথমটার ন্যায় এ দ্বিতীয় সংঘর্ষ সহজে মিটে নাই। লুসাই-

দিগের দৌরাত্ম্য তখনও সহজে মিটে নাই ; উহা অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। এ মুহূর্ত্তে লুসাই-দিগকে লইয়া যেরূপ তোলপাড় পড়িয়া গিয়াছে, লর্ড মেয়োর সময়েও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। চা-বাগিচা আক্রমণ, দ্রব্যজাত লুণ্ঠন, মনুষ্য-হত্যা ও হরণ—এ বৎসর যেরূপ ঘটিয়াছে, সে বৎসরও (১৮৭১—৭২) সেইরূপ ঘটিয়াছিল। সে বৎসর, এ বৎসর অপেক্ষা ব্যাপারটা এক বিষয়ে বরং কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লুসাই "লুটিয়ারা"দিগের দ্বারা সেবার একটী বৃটিশ-বালিকা অপহৃত হইয়াছিল। বালিকাটীর নাম মেরিউইন চেষ্টার, বয়ঃক্রম ৬ বৎসর। বালিকা মাতৃহীনা,—পিতা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লুসাইদিগের আকস্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলায়ন করিতেছিলেন। দুরাত্মা "লুটিয়ারা" পিতাকে হত্যা করে ও বালিকাকে সঙ্গে লইয়া যায়। এ ঘটনা ঘটিয়াছিল,—কাছাড়ে সেলার সাহেবের চা-ক্ষেত্রে।

বন্যেরা বালিকাটীকে প্রাণে মারে নাই। বহুদিবসাবধি যত্নে লালন-পালন করিয়াছিল এবং আমাদিগের সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ার পর বালিকাটীকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। প্রায় এক বৎসরকাল বালিকা লুসাই ভূমে বাস করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রত্যাগমনের পর লুসাইদিগের সম্বন্ধীয় কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুমাত্র উত্তর করিত না ; অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইত; মুখখানি মলিন হইয়া উঠিত।

লর্ড ল্যান্সডাউন লুসাইদিগের বিরুদ্ধে এ বৎসর যেরূপ অভিযান প্রেরণ করিয়াছেন; লর্ড মেয়োও সেইরূপ করিয়াছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই তিনি সে কাজটা করিয়া-ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

It is with great reluctance that I have to express the opinion that it will be necessary to send in the ensuing cold weather an armed force into the country of the Lushais.

বলা বাহুল্য যে, লুসাইদিগকে বশতাপন্ন করিতে এ মুহূর্ত্তে আমাদিগের প্রেরিত সৈন্যাভি-যান যে প্রকার বেগ পাইতেছে, সে বৎসর প্রেরিত সৈন্যেরাও সেইরূপ বেগ পাইয়াছিল। লুসাইজাতি অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করিয়া-ছিল; এবারও করিবে। তবে কথা এই যে, বন্যজাতি কখনও বশে থাকে না; থাকা তাহা-দের স্বভাব নহে। অতএব তজ্জন্য তাহাদিগকে সমূলে সংহার করিবার প্রস্তাব প্রাজ্ঞোচিত নীতি নহে। লুসাইদিগকে "একেবারে পিষিয়া" দেওয়ার জন্য এখন চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তাব হইতেছে বটে; কিন্তু তাহা যেমন অসম্ভব, তেমনি অপব্যয়-জনক। স্বয়ং প্রকৃতিই সে পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। লুসাইদিগের সামরিক উপদ্রব নিবারণার্থ লর্ড মেয়োর নীতি এ সময়েও অবলম্বনীয়।

পররাষ্ট্রনীতি।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রনীতি প্রধানত মধ্য-এসিয়াতেই বিচরণ করে। মধ্য-এসিয়া-ঘটিত প্রশ্ন চিরকালই প্রবল। লর্ড মেয়োর সময়ে উহা প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছিল। রুষ-ভীতি তখনকার অপেক্ষা এখন যে কিছুমাত্র কমিয়াছে তাহা নহে; বরং বাড়িয়াছে বলিলেও বলা যায়। এ ভীতি, বোধ করি, ভারত-শাসনের চিরসঙ্গীই থাকিবে এবং দিন দিন ইহার পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি হইবে।

তবে লর্ড মেয়োর শাসন সময়ে রুষ-আক্র-মণের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল দুইটী কারণে। সে দুই কারণ এখন আর বিদ্যমান নাই; কিন্তু তখন ছিল এবং লর্ড মেয়ো তাহা বিদূরিত করিয়া-ছিলেন। প্রথম কারণ কাবুলের আমীরের সহিত অসৌহার্দ্দ; দ্বিতীয় কারণ পারস্যের "সাহে"র সহিত অসন্তোষকর সম্বন্ধ। এই দুই কারণে মধ্য-এসিয়া-ঘটিত প্রশ্ন অধিকতর জটিল করিয়া, রুষভীতি প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। আফগান-আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া তদীয় পুত্রদ্বয় সিয়ারআলি ও আফজুল খাঁ গৃহ-বিবাদের বিষম বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। কাবুল-সিংহাসনে আত্ম-স্বত্বাধিকার অনুমোদন করিবার জন্য, উভয়েই ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থী হন। লর্ড লরেন্স কোন পক্ষেরই স্বত্বাধিকার অনুমোদন করেন নাই। শাফ্ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যিনি বিজয়ী হইয়া রাজ্যমধ্যে স্বকীয় শাসন স্থাপন করিতে পারিবেন,

তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন। লর্ড লরেন্সের এ নীতি এক হিসাবে ন্যায়-সঙ্গত হইলেও ইহা ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহারই প্রীতিপ্রদ হয় নাই। সিয়ারআলি স্পষ্টাক্ষরেই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ যখন কেবলমাত্র এক আত্ম-স্বার্থই বুঝেন, তখন তিনি আর ইংরেজের ভরসায় মূল্যবান জীবন ক্ষয় করিবেন না; অবিলম্বে রুষের সহিত সৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ হইবেন। অবস্থা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

অতঃপর সিয়ারআলির বিজয়লক্ষ্মীই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছিলেন। লর্ড লরেন্স যৎকালে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেছিলেন, লর্ড মেয়ো সেই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ১৮৬৯ সালের মার্চ্চ মাসে সুবিখ্যাত অম্বালা-দরবারে সিয়ারআলিকে সাদর-সম্ভ্রমে গ্রহণ ও অভিনন্দন করিয়া সম্পূর্ণ রূপে হস্তগত করিলেন। বিস্তারে লিখিবার স্থান নাই; কিন্তু লর্ড মেয়ো যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে সেই প্রণালী অনুসৃত হইলে, বোধ করি, কাবুলে 'ক্যাভ্যাকনারী' বিভ্রাট ঘটিত না এবং আকাশ-কুসুমবৎ "বৈজ্ঞানিক সীমা" সৃজনার্থ অসীম অর্থরাশিরও ব্যর্থ ব্যয় হইত না।

সীন্ধু-সীমান্তে বেলুচিস্থান। বেলুচিস্থান লইয়া সীমান্তবাসী ভূম্যধিকারীদিগের সহিত পারস্য-সাহে"র বহুকালের বিবাদ। এই বিবাদ চির-স্থায়ী ও ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া মধ্য-এসিয়ায় বৃটিশ-স্বার্থের হানি করিতেছিল। লর্ড মেয়ো আফগান-আমীরের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করার পরই এবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহার সুমীমাংসা করিয়া শান্তি-স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পারস্য-সাহের সহিত বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সৌহার্দ্দ এখন বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু এ সৌহার্দ্দের সোপান নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন,—লর্ড মেয়ো।

মধ্য-এসিয়ায় প্রবল প্রতিবেশীর সহিত প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, পথ পরিষ্কার হইল; এখন প্রচণ্ড প্রতিযোগী রুষিয়ার নিজের সঙ্গে একটা "বন্দোবস্ত" করিবার সময়। এই উপস্থিত কার্য্যটীতেও লর্ড মেয়োর রাজনীতিক সূক্ষ্ম দর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

লর্ড মেয়োর রুষ-অভিজ্ঞতা তাঁহাকে দিব্য চক্ষে দেখাইল যে,—শুষ্ক "সরকারী" প্রণালীতে চিঠি-পত্র চালনা ও দূত-প্রেরণে কোনও কাজ হইবে না; বরং তদ্দ্বারা রুষের সহিত রাজ-নীতিক সম্বন্ধ অধিকতর তিক্ত হইয়া উঠিবে। অতএব মধ্য-এসিয়া সম্বন্ধে রুষের সহিত একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে, বেসরকারী পন্থাই প্রশস্ত। রুষ-মন্ত্রীদিগের অনেকের সহিত তাঁহার আলাপ ও আন্তরিক সখ্যতা ছিল; তিনি বেঙ্গল সিবিলিয়ান স্যর ডগলস ফরসিথকে বেসরকারী ভাবে রুষিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। পাঠাইয়া দিলেন,—মধ্য-এসিয়া সম্বন্ধে রুষ-মন্ত্রীদিগের সহিত "বেসরকারী" ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য। কিন্তু বেসরকারী ভাবে সরকারি-কার্য্য উদ্ধার হইয়া গেল। মন্ত্রিগণ তৎকালের প্রকৃত অবস্থা বুঝিলেন; সিয়ারআলির অধিকৃত আফ্গান-রাজ্যের চতুঃসীমা স্থিরীকৃত ও উভয় পক্ষে স্বীকৃত হইয়া গেল। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-বিভাগ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিলেন, কিন্তু সে "মামুলী" কাজ; আসল যে কাজ, তাহা সম্পন্ন হইল,—বেসরকারী উপায়ে।

মধ্য-এসিয়ায় রুষীয় আধিপত্য লর্ড মেয়ো উপেক্ষা করিতেন না; তিনি সেজন্য শঙ্কিতও ছিলেন না। তাঁহার বিবেচনায় সুনিয়মিত সতর্কতা অবলম্বন করিলেই যথেষ্ট; রুষ হইতে আত্মস্বত্ব-রক্ষার্থ আর কিছুই করিবার আবশ্যক ছিল না। কিন্তু তাঁহার শাসন-কালের পরে নানা প্রকার বাহাড়ম্বরের আবশ্যকতা হইয়া উঠিয়াছে।

পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় আর কোনও বিশেষ ঘটনা এ শাসনে, ঘটে নাই। কেবল নব-গঠিত রাজ্য পূর্ব্ব-তুর্কিস্থান পরিদর্শনার্থ দূত প্রেরিত হইয়াছিল।

লর্ড মেয়োর পররাষ্ট্র-নীতি তাঁহার নিজ মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া, নিজ হস্ত দ্বারাই চালিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে, তিনি জনৈক সেক্রেটারী ব্যতীত, কাহারই সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।

লর্ড মেয়ো তাঁহার অল্পস্থায়ী শাসন-কালের মধ্যে যে কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন,

রাজস্বের আয়-ব্যয়। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল, অধিকতর কঠোর কার্য্য,

তৎকৃত আয়-ব্যয়-বিষয়ক ব্যবস্থা। এই কার্য্যে তিনি অসীম পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায় ও নিরতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা যাহা ভারত-শাসনে একরূপ অসম্ভাবিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহা তিনি সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার দ্বারা এই 'অসম্ভব' সম্ভাবিত হওয়ার পূর্ব্বে, ভারত-শাসনে ব্যয়-অসঙ্কুলান সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। "বজেট" ভ্রমপূর্ণ,—ব্যয়ে শতবিধ বিশৃঙ্খলা,—রাজ্য ঋণজালে জড়িত,—হিসাবের বিপুল অমিলন; লর্ড মেয়ো দেখিলেন, বর্ত্তমানে বিষম বিভ্রাট, ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর অন্ধকারময়। ব্যাধি অসাধ্য, দুরারোগ্য; কিন্তু চিকিৎসকও তেমনি পরিপক্ক, প্রবল প্রতিজ্ঞারূঢ়। লর্ড মেয়ো প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যে প্রকারেই হউক, ব্যয়-অসঙ্কুলান নিবারণ করিয়া, আয়ের পরিমাণে সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত করিবেন।

"I am determined not to have another deficit, even if it leads to the deminution of the army, the reduction of civil establishments and the stoppage of public works."

সৈন্যসংখ্যা কমাইতেই হউক, সিবিল এষ্টাবলিসমেণ্ট সঙ্কোচ করিতেই হউক, আর পূর্ত্তকার্য্য বন্ধ করিয়া দিতেই হউক,—যেরূপেই হউক, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া অসঙ্কুলান হইতে দিব না। তিনি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া তবে নিরস্ত হইয়াছিলেন। যে যে উপায়ে তিনি এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা অতিমাত্র সংক্ষেপে লিখিতে হইলেও অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়। অতএব তাহার আভাসমাত্র দেওয়া হইতেছে।

লর্ড মেয়ো বুঝিয়াছিলেন যে, আয় যতই বৰ্দ্ধিত হউক না, ব্যয়-বিশৃঙ্খলা ধ্বংস না হইলে অসঙ্কুলান কিছুতেই ঘুচিবে না। অতএব ব্যয়-সংক্ষেপ ও ব্যয়ের সমীকরণ পক্ষে তিনি প্রথম মনোযোগ প্রদান করিলেন। সামরিক বিভাগ ও পূর্ত্তবিভাগ,—এই দুই বিভাগেই অর্থের শ্রাদ্ধ চিরকাল সমানে হইয়া থাকে, এখনও হইতেছে। লর্ড মেয়ো অত্যন্ত দৃঢ়-হস্তে এই দুই বিভাগ ধৃত করিলেন। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট-নিচয়ের ব্যয়ও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সামরিক বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করাই গুরুতর ব্যাপার। এ বিভাগে হস্তক্ষেপ করিতে কেবল লর্ড মেয়োর মত সাহসী ও সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকেই সমর্থ হন। চতুর্দ্দিকে আপত্তি, পরন্তু সামরিক বিভাগের ব্যয়-সঙ্কোচ করাও অত্যন্ত আশঙ্কা-জনক; বিশেষতঃ সিপাহী-বিদ্রোহের সেই অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে। কিন্তু লর্ড মেয়ো টলিবার লোক ছিলেন না। তিনি এমন কৌশল আবিষ্কার ও অবলম্বন করিলেন, যদ্দ্বারা সৈন্য-বলের কোনও ক্ষতি না হইয়া এক কোটী টাকা ব্যয় হ্রাস হইল। ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যনিচয়ের সামঞ্জস্য ও সংস্থাপন-শৃঙ্খলা স্থাপনেই এত টাকা বাঁচিয়া গেল, অথচ কাহারই বেতন কমিল না। এই সামরিক ব্যয়-সঙ্কোচ সম্বন্ধে লর্ড মেয়োর কয়েকটী কথা চির-স্মরণীয়। তদ্দ্বারা বুঝা যায়, তিনি কি প্রকৃতির লোক ছিলেন; অতএব সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

I have suggested nothing which in my opinion is calculated to diminish our military strength. But I do desire to reduce military expenditure by very large amount. I firmly believe that there are forces in India which we should be better without and that it is better to keep only those regiments in arms which would be useful in war.

পুনশ্চ,—*We can not think it is right to compel the people of this country to contribute one farthing more to military expenditure than the safety and defence of the country absolutely demand.*

অর্থাৎ ভারতে অনর্থক ও অতিরিক্ত সৈন্য রাখা হইয়াছে, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। আমি সামরিক ব্যয় অধিক পরিমাণেই কমাইব। ভারতবাসী অত্যন্ত আবশ্যকতার অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও সামরিক ব্যয় বহন করিতে বাধ্য নহে।

পরন্তু প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়। তখন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-সমূহের ব্যয়ের কোন ছিল না, দায়িত্বও ছিল না; যত তত ব্যয়ের এষ্টিমেট দিয়া ইণ্ডিয়া

হইতে টাকা গ্রহণ করিতেন; পরন্তু এষ্টিমেটের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া সে টাকাও লইতেন। ব্যয় সম্বন্ধে প্রদেশীয় আয়ের প্রতি লক্ষ্য ছিল না; অতএব আয় অপেক্ষা চতুর্গুণ ব্যয় হইত, বৃথা ব্যয়েও বিস্তর টাকা যাইত। তখন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-সমূহের ব্যয় সম্বন্ধে যেরূপ দায়িত্ব ছিল না, সেইরূপ স্ব স্ব প্রদেশীয় আয়ের উপরও কোন অধিকার ছিল না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাদের আয় গ্রহণ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যয় পূরণ করার 'কেন্দ্র' স্বরূপ ছিলেন। লর্ড মেয়ো আয়-ব্যয়ের এই "কেন্দ্রীকরণ" প্রথায় ব্যয়-বহুলতা, ব্যয়ের অসামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করিলেন; পরন্তু এ প্রথায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগের স্ব স্ব আয়ের উপর অনধিকার এবং ব্যয় সম্বন্ধে দায়িত্বের অভাবও দৃষ্টি করিলেন। এই প্রথা কোন প্রকারেই তাঁহার নিকট প্রকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল না। সকলেরই আয় একই কেন্দ্রে যাইয়া সঞ্চিত হয়; পরস্পরের ব্যয় নির্দ্ধারণ আয়ের অনুপাতে হয় না; অল্প আয়ে হয়ত কোন ও গবর্ণমেণ্ট অধিক ব্যয় করিয়া বসেন; অধিক আয় করিয়াও হয়ত কেহ উপযুক্ত পরিমাণে ব্যয় করিতে পান না। ইহা অতি অন্যায়; ব্যয় বাহুল্যও আবার ইহাতে। অতএব লর্ড মেয়ো "কেন্দ্রীকরণের" স্থলে "বিকেন্দ্রীকরণ" *Decentralisation* প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। লর্ড মেয়োর এই বিখ্যাত নূতন প্রণালী সম্বন্ধে ১৮৭০ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে রেজিলিউশন প্রকাশিত হয় ও পরে ষ্টেট সেক্রেটারী কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই প্রণালী দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগের বার্ষিক ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট টাকা মঞ্জুর করিয়া, সে মঞ্জুর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বাহাল রাখা হয় এবং তাহাদিগের ঐ মঞ্জুরী টাকার ব্যয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরূপ নিয়মও করিয়া দেওয়া হয় যে, নির্দ্দিষ্ট টাকা ব্যয় করিয়া যদি কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা আর ভারত-গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না; স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় অন্যবিধ উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে পারিবেন। এক সামরিক ব্যয় ব্যতীত আর সমস্ত ব্যয় সম্বন্ধেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-সমূহকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল। পূর্ত্ত, পুলিষ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেজিষ্ট্রেশন প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যয় সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-সমূহকে স্বাধীনতা ও আয়-অনুরূপ ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এই প্রথা পঞ্চবার্ষিক "কন্‌ট্রাক্ট" অনুসারে তদবধিই চলিতেছে, তবে ইদানী এ প্রথায় পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে বটে এবং সে পরিবর্ত্তন প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টদিগের পক্ষে সুখকরও নহে; এই প্রথা-প্রবর্ত্তন কালে লর্ড মেয়োর যে যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহার সমস্ত এ পরিবর্ত্তন দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। পরিবর্ত্তনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-নিচয়ের স্বাধীনতা হরণ করাই হইতেছে। লর্ড মেয়োর এই 'বিকেন্দ্রীকরণ' হইতেই লর্ড রীপনের 'আত্মশাসন' উদ্ভূত হইয়াছিল।

সামরিক বিভাগের ন্যায় পূর্ত্ত-বিভাগের ব্যয়ও লর্ড মেয়ো যথাসম্ভব সঙ্কোচ করিলেন। নিয়ম করিলেন যে, ঋণ করিয়া আর সাধারণ ও অনুৎপাদনকর পূর্ত্তকার্য্য প্রস্তুত করা হইবে না। ব্যয়-সংক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ত্তবিভাগের সংস্কারও করিলেন বিস্তর। এই বিভাগের তদানীন্তন (কিয়ৎপরিমাণে ইদানীন্তনও বটে) অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড মেয়োর কথাগুলি যেমন যথার্থ, তেমনই সুন্দর;—

"এষ্টিমেটে শতকরা একশতটা করিয়া
"ভ্রম। "ডিজাইন" অশেষ দোষযুক্ত বিনা
"অনুসন্ধানে ও উপযুক্ত পরীক্ষায় বড় বড়
"অট্টালিকার ভিত্তি-স্থাপন, এষ্টিমেটের
"অতিরিক্ত ব্যয়ে অনবধানতা, অফিসারদিগের
"অকর্ম্মণ্যতা, কন্‌ট্রাক্টারদিগের অসীম অপ-
"হরণ,—সংসারে এমন কোন দোষই আর
"অবশিষ্ট নাই, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার
"নির্ম্মাণে যাহা করা না হইয়াছে।"

বিবিধ প্রকারে ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াও কিন্তু অসঙ্কুলান সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা হইল না। কাজেই কিয়ৎ পরিমাণে আয় বৃদ্ধি করার আবশ্যক হইল। লর্ড মেয়ো অগত্যা ইনকমট্যাক্স এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে লবণ-কর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কতক কালের জন্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ইনকমট্যাক্স (১৮৭০-৭১) পুনরায় কিয়ৎ পরিমাণে তিনি কমাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ক্রমে ইনকমট্যাক্স ও লবণ-কর সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবেন, এরূপ আশাও তিনি করিয়া-

ছিলেন। কারণ, তদীয় হস্তে রাজকোষের অবস্থা দিন দিন উন্নতই হইতেছিল।

অত্যন্ত আবশ্যকতায় কর-বৃদ্ধি বা কর-স্থাপন কলঙ্কের কথা নহে। অতএব সেই সঙ্কট অবস্থায় লর্ড মেয়ো কিঞ্চিৎ কর-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না, তবে তৎকালে তিনি গমের রপ্তানী করটী উঠাইয়া দিয়া আয়ের উপর আঘাত করিতে কি প্রকারে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহা সমস্যার বিষয় বটে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব 'দোরস্ত' ও বজেটের ভ্রম-সংশোধন করিতেও লর্ড মেয়োকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। জমা-খরচের জটিলতা ও হিসাবের তপশীল-সমূহের সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম অংশ সকল তিনি নিজ চক্ষে দেখিয়া নিজ হস্তে কষিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের বিপুল ভুল সংশোধন ও অগাধ "অস্থিত-পঙ্কের" কিনারা করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎদর্শীরা লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে লর্ড মেয়োর পরিশ্রম "পরাকাষ্ঠায়" উঠিয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসন।

লর্ড মেয়ো দেশের অন্যান্যবিধ আভ্যন্তরীণ শাসন-কার্য্যে যদিও অত্যল্প মাত্র সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তথাচ তাহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। সকল বিষয় উল্লেখ করিবার আর স্থান নাই।

দুর্ভিক্ষ-দমন।

সর্ব্বাগ্রে দুর্ভিক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। সংক্রামক-দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থ কেহ কেহ ইউরোপের ন্যায় এদেশে *Poor Law* অর্থাৎ আইন দ্বারা অন্নক্লিষ্টের 'ক্লেশ-নিবারণ' কর স্থাপনের প্রস্তাব করেন। লর্ড মেয়ো এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্বদেশ আয়র্লণ্ডের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

"ইউরোপের একটী অতিশয় দুঃস্থ দেশে
" দুঃখী-কর-প্রয়োগে সারা জীবন নিযুক্ত থাকিয়া
" তাহার ফল সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা
" আছে,তাহাতে আমি বেশ বলিতে পারি যে,
" এই কর ভারতীয় দুর্ভিক্ষের কিছুই করিতে
" পারিবে না; তাহা বিদ্রূপকরই হইবে।
" সামান্য রকম দুর্ভিক্ষ, কর দ্বারা এদেশে
" প্রশমন করিতে হইবে না; দেশব্যাপী
" দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টকেই
" তাহার সর্ব্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে;
" গবর্ণমেণ্টই তাহা করিতে বাধ্য। যে প্রকার
" মহা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে সময়ে সময়ে অসংখ্য
" জীবন ধ্বংস করিয়াছে এবং ভারতে বৃটিশ-
" শাসন কলঙ্কিত করিয়াছে, ভগবানের কৃপায়,
" সেরূপ সাময়িক দুর্ভিক্ষ আমি কখনই আর
" উপস্থিত হইতে দিব না; ইহার উপায়-
" বিধানের শক্তি আমাদের নিজের হস্তেই
" আছে।

কেনাল ও সুলভ রেলওয়ে।

শস্য উৎপাদনের ও চলাচলের সুবিধা হইলেই দুর্ভিক্ষ দমন হয়,—ইহা ইউরোপীয় অর্থ-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তই হউক, আর অভ্রান্তই হউক, লর্ড মেয়ো এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সে কার্য্য তদানীন্তন অবস্থায় যতদূর অগ্রসর করা যাইতে পারিত, তাহা অপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত পরিমাণে অগ্রসর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জলাভাবেই অনেক সময়ে শস্য জন্মে না। কৃত্রিম উপায়ে জল-প্রাপ্তির প্রধান উপায়,—"কেনাল"। পরন্তু শীঘ্র শস্য চলাচলের প্রকৃষ্ট উপায়,—রেলওয়ে-বিস্তার। লর্ড মেয়ো এই উভয় উপায়ই প্রচুর পরিমাণে অগ্রসর করিয়াছিলেন। গঙ্গার কেনাল ও শোণকেনাল প্রভৃতি দেশ-ব্যাপী খাল-নিচয়ের এবং তদ্দ্বারা শস্য-ক্ষেত্রে জল-সিঞ্চনের সুব্যবস্থা সংস্থাপনের প্রথম অনুষ্ঠাতা,—লর্ড মেয়ো। পরন্তু দেশমধ্যে ষ্টেট রেলওয়ে ও সুলভ রেলওয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা লর্ড মেয়ো বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কোম্পানী-কৃত রেলওয়ে-নির্ম্মাণে গবর্ণমেণ্ট লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, কিন্তু লাভের ভাগী হইতেন না। পরন্তু রেলওয়ে প্রস্তুত জন্য কোম্পানী যত অর্থ ব্যয় করিতেন, সমস্তই গবর্ণমেণ্টের নামে ঋণ করিয়া লওয়া হইত; "হাজুক মজুক," গবর্ণমেণ্ট শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া লভ্য কোম্পানীকে দিতে দায়ী হইতেন, অথচ কোম্পানীর যখন লাভ হইত, গবর্ণমেণ্ট সিকি পয়সাও পাইতেন না। ইহার নাম "গরাণ্টিড্" অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বজনক প্রণালী। এ প্রণালীতে ব্যয়ও বিস্তর টাকা। প্রত্যেক মাইল রেল-পথ প্রস্তুত করিতে ব্যয় পড়িত,—গড়ে ১৭ সহস্র

অর্থাৎ এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকারও অধিক। তাহা ভিন্ন এ প্রণালীর রেলওয়ের তত্ত্বাবধান জন্য দুই "সেট" (কোম্পানীর এক ও গবর্ণমেণ্টের অপর "সেট") লোক রাখায় খরচ পড়িত। যতই খরচ পড়ুক, কোম্পানীর লাভ; গবর্ণমেণ্টের কেবল কর্ম্ম-ভোগ সার, উপরন্তু ঋণের ও লোকসানের দায়িত্ব। লর্ড মেয়ো এই প্রণালীর বিরোধী হইলেন এবং সুলভ ব্যয়ের ষ্টেট রেলওয়ে নির্ম্মাণের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি যে কাজই করিতেন, সেই কাজেই সর্ব্বোপরি লক্ষ্য রাখিতেন,—অল্প ব্যয় ও অধিক আয়ের দিকে। দেশে ট্যাক্স বসাইবার তিনি ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। দরিদ্র আয়র্লণ্ডের স্বদেশ-হিতৈষী সন্তান, দরিদ্র ভারত-সন্তানের দুঃখে স্বভাবতই সহানুভূতি করিতেন। এই রেল-পথ নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও মেয়ো মহোদয়ের উক্তি গুলি চির স্মরণীয়;—

"হয়, সুলভ রেলওয়ে হউক; নতুবা রেলওয়ে
"একবারেই আর হইয়া কাজ নাই। রেলওয়ে
"না হইলেও আমার চলিবে; কিন্তু রেল করিতে
"যাইয়া ব্যয়ভারে পীড়িত ও ঋণ-জালে জড়িত
"হইয়া, আমি ট্যাক্স বসাইতে পারিব না। যে
"ট্যাক্স আমি তুলিয়া দিয়াছি এবং সম্পূর্ণরূপে
"নির্ম্মূল করিবার চেষ্টায় আছি, আবার সেই
"ট্যাক্সের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বৃটিশ শাসনের
"বিপদ আনয়ন করিতে পারিব না; কারণ
"উহাই ভারতে বৃটিশের প্রকৃত বিপদের মূল।
"অনেকে বলে, 'ভারতবাসীর অতি অল্পই কর
"দিতে হয়'; আমি বলি, 'হাঁ তাহাই উচিত।'
"বিদেশী বিধর্ম্মী গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় লোকে
"শ্রদ্ধা করিবে কেন? সুশাসন, সুনিয়ম,
"লঘু কর ও ন্যায়নিষ্ঠা দেখাইতে পারিলেই
"তবে না তাহাদের সন্তোষ জন্মিবে, তবেই না
"তাহারা গবর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিবে।
"ভারতে প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতা নাই—
"বিদেশী রাজা সুশাসন করিতে পারিলেই
"সেই শাসন ভারতের উপযোগী। অতএব
"ভারতের অবস্থা এবং ভারতে বৃটিশের অবস্থা
"বিবেচনা করিয়া আমরা কোন ক্রমেই প্রজার
"পকেটে অধিক আঘাত করিতে পারি না

"ভারতে প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতা নাই" লর্ড মেয়ো ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বদেশ-হিতৈষী আইরিশমান ও আয়র্লণ্ডের ভূতপূর্ব্ব শাসয়িতা লর্ড মেয়ো স্বদেশ-হিতৈষিতার লক্ষণ কি,—যেমন জানিতেন, তেমন আর কে জানিবে? কিন্তু সে লক্ষণ ভারত-ভূমে কিছুমাত্রও দেখিতে পান নাই; তাই বোধ করি, উপরোক্ত ঐ কথাটা কহিয়াছিলেন।

লর্ড মেয়ো সুলভ-রেলপথ না করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। প্রতি মাইলে ১ লক্ষ ৭০ হাজারের স্থানে তংকৃত রেলওয়ে-লাইনের প্রতি মাইলে পড়িয়াছিল মাত্র ৫০ হাজার টাকা! তাঁহার প্রবর্ত্তিত সরকারী রেলপথে এখন দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে।

লোকসংখ্যা গ্রহণ।

লর্ড মেয়োর শাসন কালে সর্ব্বপ্রথম "সেনসাস" বা লোক-সংখ্যা গৃহীত হয়। এতদ্দ্বারা সুশাসনের অনেক উপায় ও উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরন্তু সেই সর্ব্বপ্রথম সেনসাসের দ্বারা আরও একটী কঠোর সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহাতে করিয়া রাজা প্রজা—উভয়েই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল আর অধিক কিছু নয়,—এক "বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনেই ২ কোটী ৬০ লক্ষ অতিরিক্ত মানুষ-মানুষীর অস্তিত্ব!!" ইহার পূর্ব্বে এই সকল লোকের অস্তিত্বই গবর্ণমেণ্ট জ্ঞাত ছিলেন না। এক একটা জেলার লোক-সংখ্যাই তখন কেহ জানিত না। ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষ এই অজ্ঞতা-নিবন্ধনই অধিকতর সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়া ছিল।

অভিনব অনুষ্ঠান।

লর্ড মেয়োর আদেশে প্রাথমিক "লোক-সংখ্যা" গৃহীত হয়। পরন্তু তাঁহার আদেশে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা দুইটী নূতন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম "কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ" দ্বিতীয় ষ্ট্যাটিষ্টীকাল সার্ভে। এই দুই বিভাগেরই উদ্দেশ্য এক,—দুর্ভিক্ষ নিবারণ। কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের অর্থ এই যে, গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে নিজে কৃষিকার্য্য করিয়া কৃষিজীবী জন-সাধারণকে আদর্শ-কৃষি শিক্ষা দিবেন এবং উত্তম বীজ ও টাকা প্রভৃতি তকাবী ও সেচের জল যোগাইয়া তাহাদের কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিবেন। ইহা ভিন্ন বহুবিস্তৃত সরকারী জঙ্গল-মহলের আবাদ করাও এ বিভাগের অন্যতম অংশ।

পরন্তু এ বিভাগের বাণিজ্য-শাখার উদ্দেশ্য,—দেশ-মধ্যে দেশীয় বাণিজ্যের বিকাশ ও উন্নতি-সাধন। এই বিভাগের কার্য্যের অবস্থা এখন যেরূপই হইয়া থাকুক; ইহার উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ ও উচ্চতর রাজনীতিক দর্শন-সাপেক্ষ,—ইহা সুনিশ্চিত। কৃষি-সম্বন্ধে লর্ড মেয়োর মত বিলাতী মতের অনুরূপ নহে। তাঁহার বিবেচনায় এ দেশী কৃষক বিলাতী কৃষির অনুকরণ করিলে কিছুই করিতে পারিবে না; কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই অভিমত-অনুসারেই তিনি তৎপ্রতিষ্ঠিত কৃষি-বিভাগের নিয়ম-গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর "ষ্ট্যাটিষ্টিকাল সার্ব্বে"র অর্থ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কোন স্থানের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের সহিত, তথাকার অধিবাসীদিগের আহারের জন্য আবশ্যকীয় শস্য-পরিমাণের অনুপাত কি,—তথাকার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি এবং তথায় যে প্রণালীতে অর্থ সংগৃহীত ও বিভক্ত হয়, তাহার বিস্তৃত ও সংখ্যা-গত বিবরণ; পরন্তু একস্থানে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শস্যাদির দ্বারা অপর স্থান সকলের অভাব যে উপায়ে বিমোচিত হয়, তাহার বিস্তৃত ও সংখ্যাগত বিবরণ ইত্যাদি এবং এবম্প্রকার তত্ত্ব সকল যদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম *Statistieal survy*; অর্থাৎ সংখ্যাদির পরিমাণ। লর্ড মেয়োর পূর্ব্বে এরূপ অনুষ্ঠান কখনও হয় নাই এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শাসয়িতাদিগের কেহই উপরোক্ত তত্ত্বনিচয় অবগত ছিলেন না। দুর্ভিক্ষ-নিবারণ-কল্পে লর্ড মেয়ো এই "সার্ব্বে" সংস্থাপন করেন। পরন্তু এই "সার্ব্বে" হইতে একটী অতি বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। সে ব্যাপার ডাক্তার হণ্টারের "*Imperial Gazetteer of India*" নামক মূল্যবান্ গ্রন্থাবলী। ইহা ইংরেজ-শাসনের "আইন-ই-আক্‌বরী" বলিলেও কিছু বলা হয় না। কারণ, ইহা আইন-ই-আক্‌বরী অপেক্ষা উচ্চতর ও বৃহত্তর ব্যাপার। ইহাতে ভারতীয় প্রত্যেক প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পল্লীটীর পর্য্যন্ত যথাযথ বিবরণ লিখিত আছে। পাঠক! লর্ড মেয়োর সময়ে কত প্রকার নূতন ও মহৎ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, একে একে গণিয়া যাইবেন এবং ইদানীন্তন শাসনে তাহাদের উন্নতি, অবনতি, বিকাশ বা বিলয়—যেটীর যেরূপ ঘটিয়া থাকে—অনুধাবন করিবেন। ইতিহাস-পাঠের ইহা অন্যতম উদ্দেশ্য।

আত্মশাসন ও বিকেন্দ্রী-করণ।

স্বায়ত্ত-শাসন ও নির্ব্বাচিত মিউনিসিপাল-শাসনের ফল ইদানী তাহাদের বর্ত্তমান ও পরীক্ষার অবস্থায় জন্ম-দেশে অসন্তোষকর হইতেছে-তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ফল আমাদের দেশের অবস্থানুসারে যাহাই ঘটুক উক্ত দুই প্রথা ইউরোপীয় রাজনীতির মতে সুশাসনের ও প্রজাপুঞ্জের অভীপ্সিত স্বত্বাধিকারের মূল-ভিত্তি। লর্ডমেয়ো এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন।

A man who has sueceded in establishing municipal institutions which have always been in every country in the world the basis of civil Government and the first germ of civilization is entitled to the highest praise.

"মিউনিসিপাল-প্রথা, সুশাসনের মূল এবং
"সভ্যতার প্রথম বীজ,—ইহা পৃথিবীর সকল
"দেশে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এদেশে যিনি এই
"প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতকার্য্য হন, তিনি
"অতীব প্রশংসাভাজন।

এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন লর্ড রীপনের সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়, মিউনিসিপাল-নির্ব্বাচনও তাঁহারই সময়ে প্রবলী-কৃত হয়; কিন্তু এই দুই দ্রব্যের বীজাঙ্কুর সৃষ্ট হইয়াছিল,—লর্ড মেয়োর শাসন-নীতির গর্ভে। অতএব এই দুই প্রথা ভালই হউক বা মন্দই হউক, ইহার যশ বা অপযশ লর্ড রীপনের ন্যায় লর্ড মেয়োর প্রতিও বর্ত্তিতেছে।

আমি ইত্যগ্রেই এই প্রবন্ধে কয়েক বার উল্লেখ করিয়াছি যে, লর্ড মেয়োর বিকেন্দ্রীকরণ-প্রথার অভ্যন্তরে স্বায়ত্ত-শাসনের বীজ নিহিত। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তাঁহার বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালীর সেই বিখ্যাত "রেজুলিউসন" লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"The operation of this Resolution in its full meaning and integrity will afford opportunities for the developement of Self-Government, for streng-

thening Municipal institutions and for the association of Natives and Europeans, to a greater extent than heretofore in the administration of affairs."

• "এই রেজিলিউসনের পূর্ণ-অর্থানুসারে কার্য্য "হইলে আত্মশাসন বিকসিত হইবার সুবিধা "হইবে; মিউনিসিপালিটী দৃঢ়ীভূত হইবার "সুযোগ হইবে এবং শাসন-কার্য্যে এদেশীয়-দিগের সহিত ইউরোপীয়দিগের সংমিলিত "হইবার অধিকতর সুবিধা বৃদ্ধি হইবে।"

শিক্ষা-নীতি। লর্ড মেয়োর সাধারণ-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নীতি, নিম্ন-শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতিনী। নিম্ন শিক্ষানুষ্ঠান লর্ড মেয়ো কর্ত্তৃক সূচিত হয়; বঙ্গে তাহার বিস্তার প্রবর্ত্তিত হয়,—স্যর জর্জ ক্যাম্বেল কর্ত্তৃক। উচ্চ-শিক্ষা হইতে নিম্ন-শিক্ষা নিঃসৃত হইয়া নিম্নে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ দেশের কতক লোকে,—উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকে, উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা এবং তাঁহাদের সম্মিলনে স্বতঃ পরতঃ নিম্ন-শ্রেণীর লোকে তাহাদের অবস্থার আবশ্যকতানুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ যে একটী "থিওরি" বা অভিমত আছে; সে "থিওরি" লর্ড মেয়ো অনুমোদন করিতেন্না; তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমি এ "থিওরি" (*Filtration Theory*) "আদৌ পছন্দ করি না। বঙ্গদেশে আমরা "কয়েক শত বাবুকে সরকারী খরচে ইংরেজী "শিখাইতেছি বটে, কিন্তু ইহাঁরা আপনা-"দিগের শিক্ষার ব্যয় আপনারাই বহন করিতে "পারেন। পরন্তু ইহাঁদের এ শিক্ষার একমাত্র "উদ্দেশ্য,—গবর্ণমেণ্টের চাকুরী-প্রাপ্তি। "দেশের কোটী কোটী লোকের মধ্যে শিক্ষা-"বিস্তারের জন্য অদ্যাবধি আমরা কিছুই করি "নাই। শিক্ষিত বাবুরা ইহা কখনই করি-"বেন না। তাঁহারা যতই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, "ততই নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর অধিকতর "অত্যাচার করিবেন।"

লর্ড মেয়োর এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, তিনি উচ্চ-শিক্ষার তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তিনি তাহার একান্ত বিরোধীও ছিলেন না। তিনি পুনশ্চ লিখিয়াছিলেন,—

"Let the Baboos learn English by all means. But let us also try to do some thing towards reaching the three R's to "Rural Bengal"

"বাবুগণ সর্ব্ববিধ উপায়ে ইংরেজী শিক্ষা "করুন। কিন্তু বঙ্গীয়-গ্রাম্য লোকদিগের "কিঞ্চিৎ শিক্ষার জন্যও আমাদিগকে চেষ্টা "করিতে হইতেছে।"

আমাদের সজাতি শিক্ষিত বাবুদিগের প্রতি লর্ড মেয়োর উপরোক্ত উক্তি অবশ্য আনন্দকর নহে। উহা আমাদের মর্ম্মান্তিক গ্লানি। তবে শিক্ষিতদিগের দ্বারা অশিক্ষিত অসঙ্খ্য জনসাধারণের যে কোনও উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, এ কথা যথার্থ। যাহা যথার্থ, তাহা গ্লানিজনক হইলেও গোপন করা যায় না। যাঁহারা অশিক্ষিত নিরক্ষর প্রজা-সাধারণের নাম করিয়া গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রজা-প্রতিনিধিত্বের আস্ফালন করেন,—প্রজা-প্রতিনিধিত্ব যাঁহাদের পেশা, তাঁহাদের দ্বারাও প্রজার একটী কথারও উপকার হয় না। অন্য উপকার ত পরের ও দূরের কথা; প্রত্যুত তাঁহাদের নিজের আবশ্যক মতে ও স্বার্থসাধনার্থে অনুপকার অশেষ প্রকারে হয়। দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানের বক্ষের উপর হইতেই দিতে পারিতাম; কিন্তু কাজ নাই আর সে কথায়।

আইন। লর্ডমেয়োর সময়ে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি আইন পাশ হয়। কিন্তু তাহার সমালোচনা করার স্থান নাই।

পরিদর্শন। মফস্বল-পরিদর্শন-কার্য্যেও লর্ড মেয়ো অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন। সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেন। ভ্রমণ-কালে পূর্ত্তকার্য্য ও জেল পরিদর্শন তাঁহার অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিত। পূর্ত্ত-বিভাগের ও জেলের আংশিক সংস্কারও তৎ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। নিজে যেমন শ্রম ও উদ্যম-শীলতার জীবন্ত মূর্ত্তি; লর্ড মেয়ো, তদীয় বঙ্গীয় সহকারী স্যর জর্জ ক্যাম্বেলে তেমনি শ্রম ও উদ্যম-শীলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমানে সমানে মিলিয়াছিল।

সমাপ্তি ও হাবী ব্যাপার। আমরা ক্রমে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইলাম। এ সময়ে একটা ঘটনা উল্লেখ করা আবশ্যক। এ ঘটনা যে ঘটনা হইতে উদ্ভূত, তাহার

চতুর্দ্দিকই গোপনীয়তার গাঢ় অন্ধকারে আবৃত; আমি লর্ড মেয়োর শাসনসময়ে "ওহাবী"-হাঙ্গামার বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

"ওহাবী" মুসলমান জাতির মধ্যে একটী সম্প্রদায়-বিশেষ। অপ্রকাশের মধ্যে যত টুকু প্রকাশ, তাহাতে রাজ-বিদ্রোহের বীজ হইতে এই সম্প্রদায় উদ্ভূত এবং বিদ্রোহের বিষাক্ত-বায়ু-বারি-ব্যবহারে ইহাদের অস্তিত্ব। ভারত-সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন ইহাদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত এবং তদুদ্দেশে ইহাদের অতি গোপনীয় নিগূঢ় কার্য্য-কলাপ। বিদ্রোহিতার বিষাক্ত ধর্ম্মে ইহাদের অনেকেই উন্মত্ত,—সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানান্ধ, দুঃসাহসী,—নরহন্তা,—গুপ্ত-ঘাতক।

লর্ড মেয়োর সময়ে এই ওহাবী সম্প্রদায়ের কোন কোন সংগোপনীয় কার্য্য অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ওহাবী-অধিনায়কগণ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রাপরাধে অভিযুক্ত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টে ইহাদের দূর-বিখ্যাত ও দীর্ঘদিন-ব্যাপী বিচার হয়। বিচার-কালে দেশ মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। অপরাধ সপ্রমাণ হয়। ওহাবী-অপরাধিগণ দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হয়। নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন,—হাইকোর্টের তদানীন্তন চিফ জষ্টিস্ নরম্যান বাহাদুর।

অনতিকাল বিলম্বে এক দিন মধ্যাহ্নসূর্য্যালোকে হাইকোর্টের * তোরণদ্বারের সোপানাবলীর সান্নিধ্যে,—উপরে ? গুপ্তহন্তার সাংঘাতিক ছুরী চিফ্ জষ্টিস্ নরম্যান বাহাদুরের বক্ষ বিদীর্ণ করিল! হতভাগ্য নরম্যান তৎক্ষণাৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। শোকে, শঙ্কায় এবং সন্দেহে সমগ্র দেশ ছাইল। আকাশ-ব্যাপী বায়ু বলিল,—"এই হত্যা ওহাবী মোকদ্দমার সহিত মিশ্রিত।"

এই সময়ে সিমলা শৈলে কয়েক খানা চিঠি পৌঁছিল যে, "বড় লাটের জীবন সংশয়, অতীব সঙ্কটাপন্ন; গুপ্তহন্তার শোণিতাক্ত হস্ত, তাঁহার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে অলক্ষ্যে ফিরিতেছে; অতএব সাবধান!"

সতর্কতা।

সাবধানতা অবলম্বিত হইল। লর্ড মেয়োর দেহ-রক্ষকগণ অধিকতর সতর্ক হইলেন। অনেক সময়ে তাঁহার অজ্ঞাতেও, সাবধানতার এবং নির্ব্বিঘ্নতার বিবিধ উপায় স্থিরীকৃত হইতে লাগিল। গমনাগমনের 'প্রগ্রামে' প্রকাশিত পথ শেষ-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; পথিমধ্যে প্রতিনিধির অশ্ব-শকটে অশ্ব পরিবর্ত্তন-প্রথা রহিত হইয়া গেল, তাহার জন্য অন্য বন্দোবস্ত হইল। কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াও ঐরূপ;—গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদে প্রহরার কঠোর ব্যবস্থা হইল। প্রত্যাগমন-কালে পশ্চিমাঞ্চলের পথে নগরে ও সহরে আরও অধিকতর সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। তাঁহার দেহের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য এতাদৃশ অধিক আড়ম্বর দেখিয়া লর্ড মেয়ো বিলক্ষণ একটু বিরক্তও হইতেন। বলিতেন,—"এত কেন? যতটুকু আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা এ যে অনেক অধিক হইতেছে!" লর্ড মেয়ো একদিকে যেমন অতীব লোকপ্রিয় ছিলেন, (ইউরোপীয় ও দেশীয়-উভয় শ্রেণীর লোকই তাঁহার স্বাভাবিক গুণে তাঁহাকে সমাদর করিতেন।) অপর দিকে তেমনি সাহসী ও শারীরিক-বল-সম্পন্ন,—তিনি মনোমধ্যে বিন্দুমাত্রও শঙ্কা রাখিতেন না। তিনি এক একবার হাসিয়া বলিতেন যে, "দেখ, তোমাদের এই সাবধানতা, সতর্কতা, এত সাজ-সজ্জা,—কাজে কিন্তু এসব অতি অল্পই আসে।"

লর্ড মেয়োর কনিষ্ঠ সহোদর মেজর এডওয়ার্ড বর্ক সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তিনি ছিলেন, মিলিটারী সেক্রেটারী। ওহাবী-সর্দ্দারদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, জ্যেষ্ঠ সহোদর সেই সাংঘাতিক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছেন; তাহারা তাঁহার জীবনের উপর নির্ঘাত লক্ষ্য রাখিয়াছে;—এই সকল চিন্তায় কনিষ্ঠের মন স্বভাবতই শঙ্কিত হইয়াছিল। ইঁহার এবং প্রাইবেট সেক্রেটারী মেজর বার্ণের উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া, যেন তাঁহাদিগকে সন্তোষ করিবার জন্যই লর্ড মেয়ো বহির্গমন-কালে তাঁহাদের প্রদত্ত একগাছি ভারিরকম ছড়ী হস্তে লইয়া যাইতেন। আণ্ডামানের সেই সাংঘাতিক সায়ংকালেও এই ছড়িটী তাঁহার হস্তে ছিল।

আণ্ডামান।

১৮৭২ সাল; জানুয়ারি মাস। বড় লাট শীতের "শফরে" বহির্গত হইবেন, ব্রহ্মদেশ হইয়া আণ্ডামানে যাইবেন, তথা হইতে উড়িষ্যা পরি-

* তখন হাইকোর্ট বসিত টাউনহলে

দর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন আণ্ডামানে বারেক যাওয়া বড়ই প্রয়োজন। আণ্ডামান, নির্ব্বাসিত কয়েদীদের আবাস-স্থান। তথাকার বিবিধ উন্নতি কল্পনা লর্ড মেয়োর মনে জাগিতেছিল। তথায় শাসন-বিশৃঙ্খলা ঘুচাইয়া সুশাসন স্থাপিত করিতে হইবে, জঙ্গল কাটিয়া ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে,—কৃষি প্রচলিত করিয়া কয়েদীদিগের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে,—কয়েদীদের স্বাস্থ্যোন্নতি ও চরিত্র-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে;—আণ্ডামানে কত কাজ। আণ্ডামানের জন্য ভারতকোষ হইতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়; তথায় শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে অন্তত তিন লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে,—লর্ড মেয়ো ইত্যগ্রেই এষ্টিমেট করিয়াছিলেন এবং ইত্যগ্রে জনৈক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখন তথায় একবার নিজে যাওয়া আবশ্যক।

যাত্রা।

দিন স্থির হইল। জাহাজ সজ্জিত হইল। "গ্লাসগো" "স্কসিয়া" "ঢাকা" ও "নেমিসিস" নামক চারি খানি জাহাজ। কাউন্সিলের কোন কোনও মেম্বর, সেক্রেটারী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষ ব্যতীত অনেক গুলি বিখ্যাত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাও সঙ্গে চলিলেন। সর্ব্বোপরি স্বয়ং লেডী মেয়ো সঙ্গে চলিলেন।

২৪শে জানুয়ারি (১৮৭২) রাজ-প্রতিনিধি কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। বঙ্গেশ্বর স্যর জর্জ ক্যাম্বেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষ সমবেত হইয়া অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। কিন্তু বিদায়-গ্রহণ কালে প্রতিনিধির স্বতঃ প্রসন্ন বদন বিষণ্ণ হইল কেন? হায়! কেন ঐ বিষণ্ণতা! নিয়তির নিবিড় কালিমারেখা কি ঐ বিষণ্ণতায় অঙ্কিত! অদৃষ্টের অভেদ্য অন্ধকারের অস্ফুট ছায়া পড়িয়া কি সে ফুল্ল সুন্দর মুখ ম্লান করিল! না-না-না, তাহা নহে; নিয়তিকে কেহ দেখিল না,—দেখিতে পাইল না; নিয়তি নর-নয়নের অগোচর। মলিনতার অন্য কারণ অনুমিত হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খিলাটে বিভ্রাটাশঙ্কা-জনিত বদনমণ্ডলে উদ্বেগ-চিহ্ন;—অন্তত উপস্থিত লোকেরা এইরূপ ভাবিলেন। কারণ, বিদায়কালে প্রতিনিধি মহোদয় স্যর জর্জকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ক্যাম্বেল, যদি সীমান্ত হইতে অমঙ্গল সংবাদ আইসে, ব্রহ্মে তাহা প্রেরণ করিও; আমি তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে ফিরিব; আণ্ডামানে এখন যাইব না।"

হায়! সীমান্ত হইতে অশুভ-সংবাদ আসাই যে ছিল ভাল!—তাহা হইলে কাল আণ্ডামানে যাওয়া হইত না।

বাষ্পীয় পোত, বেগে ছুটিল। রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া রাজ-প্রতিনিধি কলিকাতার টেলিগ্রাম পাইলেন,—সীমান্তের সংবাদ শুভ। ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রত্যুষে মৌলমেন হইতে আণ্ডামান-অভিমুখে রাজকীয় পোত ছুটিল। চতুর্থ দিন প্রাতঃকাল আটটার সময় "গ্লাসগো" আণ্ডামানস্থ "হোপ টাউনে" পৌঁছিয়া নঙ্গর গাড়িল। ত্বরিতাগমনে রাজপ্রতিনিধি হর্ষযুক্ত; তৎক্ষণাৎ পরিদর্শন-কার্য্য আরম্ভের উদ্যোগ করিলেন।

পরিদর্শন।

স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জাহাজে আসিয়া অভিবাদন করিবামাত্রই প্রাইবেট সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,——"প্রতিনিধির নির্ব্বিঘ্ন গমনাগমনের জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে?" তদুত্তরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন,—"প্রতিনিধির পরিদর্শন-কালাবধি সমস্ত কয়েদী স্ব স্ব দৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানান্তর হইতে পারিবে না;—ওয়ার্ডারদিগকে কঠোর আদেশ দিয়াছি। রাজকীয় পরিদর্শন "পার্টির" সম্মুখে, পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে সশস্ত্র পুলিশ-সৈন্য সতর্কভাবে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর-রক্ষা করিবে, কোন ক্রমেই কাহাকেই সান্নিধ্যে আসিতে দিবে না; তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। পরন্তু দুরন্ত ও দুর্বৃত্ত বন্দি-নিবাস রস্ ও ভাইপার দ্বীপে প্রশান্ত শান্তি-রক্ষার্থ পুলিশকে সহায়তা করিবার জন্য সশস্ত্র পদাতি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি;—সকলদিকেই সতর্কতাবলম্বন ও সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।"

আণ্ডামানে পৌঁছিবার দুই দিন পূর্ব্বে চিফ-জষ্টিস্ নরম্যানের হত্যা-সম্বন্ধে কথা উঠে। সে কথা প্রসঙ্গে রাজপ্রতিনিধি যাহা বলিয়াছিলেন, হায়! তাহা কতই সত্য! তিনি বলিয়াছিলেন,—

"These things when done at all, are done in a moment, and no number of guards would stop a resolute man's blow.

"এরূপ কাজ (হত্যা) যখন একান্তই হয়,—
" মুহূর্ত্তমাত্রেই হইয়া যায়; শরীর-রক্ষার্থ
" অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত থাকিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
" লোকের দৃঢ় হস্তের আঘাত নিবারণ করিতে
" পারে না।"

সাংঘাতিক সত্য, এই উক্তি!! এই উক্তির পর তিন দিন বিগত না হইতেই, উক্তিকারী নিজেই সেই নিজ উক্তির অধিকারাধীন হইলেন। অহো! নির্ম্মম নিয়তি!!

রস্‌দ্বীপে প্রথম পরিদর্শন আরম্ভ হইল। কাছারী, বন্দী-নিবাস, সাহেবদের বারিক—সব দেখা হইল; যে যে বিষয়ের যেরূপ উন্নতি করার আদেশ করিবেন, বড় লাট নোট করিয়া লইলেন। সশস্ত্র সৈন্যে চারি দিক্ বেষ্টিত,—স্বচ্ছন্দ "গতিবিধির" ব্যাঘাত;—লাটসাহেব কয়েকবার বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। ষ্টীমারে মধ্যাহ্নিক আহারাদি হইল। বৈকালে ভাইপার-দ্বীপ পরিদর্শন। সেইরূপ সশস্ত্র-প্রহরী-বেষ্টিত। ভাইপার-দ্বীপ পরিদর্শন হইয়া গেল; তখনও বেলা আছে,—এক ঘণ্টা। রস্ ও ভাইপার দ্বীপ—এ দুইটীই অতি সঙ্কটময় স্থান;—এই দুই স্থানেই অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ-প্রকৃতি বন্দীগণ বাস করে; কিন্তু পরিদর্শন-কালে এই দুই স্থানের কোথাও কোন উপদ্রবের উদ্যম হয় নাই। কেবল একবার কয়েকটী বন্দী "লাট সাহেবের" নিকট "দরখাস্ত" দিতে অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা প্রতিনিধির নিকটবর্ত্তী হইতে পায় নাই,—অপরে তাহাদের হস্ত হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অধিকাংশ বন্দীদিগের মধ্যে সন্তোষের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল;—লাট সাহেবের শুভাগমনে তাহাদের প্রতি কোন না কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইবে,—এই অনুমানে তাহারা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল।

রস্ ও ভাইপার দ্বীপ।

নির্ব্বিঘ্নে উক্ত দুই ভয়ঙ্কর স্থানের কার্য্য সমাধা হইয়া যাওয়ার পর রাজ-প্রতিনিধি একটু হাসিয়া বলিলেন,— "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সতর্কতা প্রচুর অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল; তা এখনও বেলা আছে, মাউণ্ট হ্যারিয়েটের কাজটাও তবে সারা যাউক।"

মাউণ্ট হারিয়েট।

এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মুখের কথা কয়টী এই,—

"*We have still an hour of daylight,*
"*let us do Mount Harriet.*"

"মাউণ্ট হারিয়েট", ১,১১৬ ফুট্ উচ্চ একটী পাহাড়। এই পাহাড়ের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উত্তম; তজ্জন্য ইহার উপর পীড়িত বন্দীদিগের নিমিত্ত একটী স্বাস্থ্য-নিবাস প্রস্তুত করিবেন,—সদাশয় লর্ড মেয়ো মনন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই পাহাড়ে উঠিয়া স্বচক্ষে তাহার উপরিভাগ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তাই বলিলেন;—

"*Let us do Mount Harriet*"

প্রাইবেট সেক্রেটারী মেজর বার্ণ এ প্রস্তাবে একটু "খুঁত-খুঁত" করিলেন। কারণ এই যে, বেলা ছিল না,—শীঘ্রই সন্ধ্যা হইবে, পাহাড় হইতে নামিতে সম্ভবত একটু রাত্রিও হইবে। বার্ণের ইচ্ছা নয় যে, লাটসাহেব নিশাকালে কোথাও কোন দিন বহিষ্কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। বার্ণ "খুঁত-খুঁত" করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বড়.বেশী ফল হইল না।

লাট সাহেব তখনি পাহাড়ে উঠার উদ্যোগ করিলেন। তরণী চলিল। হোপ টাউনের "জেটীর" উপর নামিলেন। সুদীর্ঘ সুন্দর মূর্ত্তি,—প্রসন্ন-বদন, সুপ্রশস্ত ললাট; প্রফুল্ল-ওষ্ঠাধরে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মিষ্ট, মৃদুল হাসি; সুগঠিত শরীরে শক্তি, স্বাস্থ্য এবং শ্রী—সমভাবে দীপ্যমান;—কার্য্যশীলতা এবং করুণা, উজ্জ্বল নয়ন দুইটি হইতে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। একটী তসাসিল্কের কোট গায়ে,—সেক্রেটারী-প্রদত্ত সেই সাবধানতার ছড়ী গাছটী হাতে;—ছড়ী-গাছটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে লাট সাহেব পাহাড়-আরোহণে চলিয়াছেন। জেটীর উপর দেখিলেন,—তথায় তাঁহার হর্ষপ্রফুল্ল নিমন্ত্রিত সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ পুঞ্জে পুঞ্জে দণ্ডায়মান হইয়া সুস্নিগ্ধ সমুদ্র-বায়ু সেবনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও আমোদ-লহরী ছুটাইতেছেন। একটু থামিয়া দাঁড়াইলেন। একটী মহিলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"*Do come up you'll*
have such a sunset"

"আসুন,—এমন সুন্দর "সূর্য্যাস্ত" দেখিবেন যে, সে আর কি বোল্‌বো।"

পাহাড়টী অত্যন্ত দুরারোহণীয়। নিমন্ত্রিত অতিথিদিগের মধ্যে কেবল একজন আসিয়া যোগ দিলেন। লাট সাহেবের নিজের পরিদর্শন-"পার্টির" সকলেই পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা কাল খাড়া হইয়া কাজ করিতেছেন, তাহাতে রৌদ্রের তীব্র তাপ, —ক্লান্ত হইবারই কথা। আরল্ নিজে কিন্তু অক্লান্ত, দিব্য সুস্থ;—সম্যভিব্যাহারীদিগের কোন কোন ব্যক্তিকে করুণ-সম্বোধনে কহিলেন,—"তোমরা থাক, বড় ক্লান্ত হইয়াছ, আমার সঙ্গে আর আসিয়া কাজ নাই।"

কিন্তু কেহই থাকিলেন না, সকলেই প্রতিনিধির পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন; ভাগে-ভাগে শিলা-তলস্থ বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাহাড়ের পাদ-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আরল্ একবার ফিরিয়া তাকাইলেন; দেখিলেন,—জনৈক "এডিকং" অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। এডিকংকে তথায় উপবিষ্ট হইবার জন্য প্রায় আদেশের মত অনুরোধ করিলেন।

পাহাড়ের পথে আরোহণের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটী "পনি" পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ অশ্বারোহণ করিতে প্রতিনিধি অস্বীকার করিলেন;—সকলেই পদব্রজে যাইতেছেন,—অশ্বারোহণ করা তাঁহার উচিত নয়; কিয়দ্দূর যাইয়া 'টাটু' হইতে নামিয়া বলিলেন;—"এখন আমার হাঁটিবার পালা; তোমরা কেহ অশ্বারোহণ কর।

পাহাড়ের উপরিভাগে উপস্থিত হইয়া, যত্নে সাবধানে, সে স্থান পরীক্ষা করা হইল। পরীক্ষার ফলে আরল্ অতীব পরিতুষ্ট হইলেন। নির্ব্বাসিত পীড়িত প্রাণি-পুঞ্জের একটু আরামের স্থল গঠিত হইবে,—এই কল্পনায় করুণ-হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পাহাড়ের উচ্চ চূড়া হইতে দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে কহিলেন,—

"Plenty of room here to settle two millions of men."

"অনেক স্থান আছে এখানে; বিশ লক্ষ লোক সুখে বসবাস করিতে পারিবে।"

আণ্ডামান আবাদ করিয়া "ইন্দ্রপুরে" পরিণত করা তখন আরলের মনে জাগিতেছিল।

আরল্ একটু বসিলেন। নীরবে, প্রশান্ত প্রগাঢ়তা সহকারে কিয়ৎকাল সেই অনুপম নৈসর্গিক দৃশ্য—নীল-সলিলময় সাগর-প্রান্তে অস্তাচল-গামী সুন্দর সুমহান্ ভাস্কর-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। ক্ষণেকের জন্য যেন অনন্ত অনুভূত হইল। অস্ফুট স্বরে কয়েকবার স্বগত বলিলেন,—

সাগরে সূর্য্যাস্ত।

"How beautiful, How beautiful"

"কি সুন্দর! কি সুন্দর!!"

কিছু পরে আরল্ একটু বারি পান করিলেন। পুনরায় পশ্চিমাকাশে সুদীর্ঘ দৃষ্টিপাত করিয়া সূর্য্যের সেই সাগরব্যাপী অনন্তস্পর্শী অস্তাচলারোহণ-সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। এবার হর্ষ-বিস্ময়ে প্রাইবেট সেক্রেটারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"It's the loveliest thing I think I ever saw"

"এমন মনোহর দৃশ্য এজন্মে আমি আর কখনও দেখি নাই।"

পাহাড় হইতে এখন নিম্নে অবতরণ হইতেছে। কিন্তু লেখনী আর চলে না। সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অতীব নিকটবর্ত্তী। বিস্মৃত অতীত যেন পুনঃ জীবন্ত হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। সহৃদয় পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন,—এই শোচনীয় সমাপ্তিতে উপস্থিত হইতে বস্তুতই হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

অবতরণ।

সান্ধ্য অন্ধকারে নভস্তল, দিঙ্মণ্ডল আবৃত হইয়াছে। মশালের আলোক লইয়া কতকগুলি লোক উপস্থিত হইল। এবার অধিকতর শৃঙ্খলা। সশস্ত্র প্রহরিবর্গ প্রতিনিধির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া সাবধানে, অতি সতর্ক-ভাবে চলিয়াছে। হোপ টাউনের জেটী সম্মুখে। সুশৃঙ্খল-স্থাপিত পোত-চতুষ্টয় হইতে উজ্জ্বল আলোক-রেখা দেখা যাইতেছে। পোতস্থিত ঘটিকায় সাতটা বাজিল, —শুনা গেল। ক্রমে সকলে জেটীতে উপস্থিত। দুই জন আলোকবাহী,—আরলের সম্মুখে;—উজ্জ্বল আলোক-রেখা সুন্দর শরীরের উপর কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়িতেছে। এক দিকে প্রাইবেট সেক্রেটারী এবং অপর দিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

লর্ড মেয়োর হত্যা।

অবস্থিত; কয়েক পদ পশ্চাতে, বামে ও দক্ষিণে কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার ও আরও কেহ কেহ আসিতেছেন। সশস্ত্র পুলিস-প্রহরী তাঁহাদের মধ্যস্থলে, আরলের অধিকতর সান্নিধ্যে সংস্থাপিত হইয়া চলিয়াছে। পরদিনের কার্য্যাবলীর অগ্রিম আয়োজন করিবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। এখন জেটীর উপর হইতে তরণী আরোহণ করিতে হইবে;—সেই তরণী, পোতে পৌঁছাইয়া দিবে। আরল কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সর্ব্বাগ্রে তরণী-আরোহণে উদ্যত। কিন্তু হায়! কি ঐ শব্দ!—অহো! দেখ দেখ! কি ঐ শব্দ!! সন্নিকটস্থ সকলেই সোপানের পশ্চাৎস্থিত স্খলিত প্রস্তর-রাশির মধ্য হইতে একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন, শব্দটা যেন বন্য জন্তুর দ্রুত গমনের মত। দুই এক জনে দেখিতে পাইলেন,—একখানা সকৃপাণ মনুষ্য-হস্ত মশালের আলোক-মধ্য হইতে নিম্নে নামিল। প্রাইবেট সেক্রেটারী একটা আঘাতের শব্দ শুনিলেন। তখনি দেখিলেন,—একটা লোক, রাজ-প্রতিনিধির পৃষ্ঠদেশে ব্যাঘ্রের মত "ঝাঁকড়াইয়া" রহিয়াছে! আরল্ প্রায় পতনোন্মুখ। মশালের আলোক নির্ব্বাপিত। জীবনালোক এখনও আছে কি?

নিমেষ-মধ্যেই বার জন প্রহরী যুগপৎ হত্যাকারীকে আক্রমণ করিল। দেশীয় প্রহরিগণ তখনি সেই পাপাত্মাকে সহস্র খণ্ডে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিতেছিল; কিন্তু জনৈক ইউরোপীয় অফিসার তরবারের আদেশে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

নিরীহ, অভাগ্য লর্ড মেয়ো, হায়! ধরাতলে নিপতিত,—আজানু জল-নিমগ্ন,—কম্পান্বিত, দেহ;—কিন্তু তবুও উঠিয়া দাঁড়াইবার উদ্যম করিতেছেন। বীর-শরীর, উপস্থিত মৃত্যুর সহিত তখনও সংগ্রাম করিতেছে। ভ্রূযুগে নিপতিত, বিশৃঙ্খল কেশগুলি আরল্ স্বহস্তে তখনও সংবরণ করিতেছেন,—যেন তদ্দ্বারা আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রিয়, প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত সেক্রেটারী বার্ণ অবিলম্বে নিকটে উপস্থিত হইয়া এই অবস্থায় আরল্‌কে প্রাপ্ত হন। বার্ণ বেলাভূমি হইতে তটোপরি প্রভুকে উত্থিত করিতেছিলেন;—*"Burne they've hit me"* "বার্ণ, তা'রা আমায় বিদ্ধ করেছে"—আস্তে আস্তে আরল্ এই ক'টী কথা কহিলেন। পরেই একটু উচ্চ স্বরে বলিলেন,—*It's allright, I dont think, I am much hurt* "আমি তত বেশী আঘাত পেয়েছি—এমন বোধ হোচ্ছে না; এখন সব ভাল হয়ে গেছে।" এই কথা কটী সকলেই শুনিতে পাইল।

যখন বলিলেন,—"সব ভাল হয়ে গেছে", তখন কিন্তু বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া রুধির-ধারা ছুটিয়াছে; তাহা তখনও কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।

আলোক পুনঃ জ্বলিত হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া জেটীর পার্শ্বে একখানা দেশীয় শকটে আরল্‌কে উঠাইল। আরল্ তখনও বসিয়া আছেন,—পা দুখানি গাড়ীর উপর হইতে ঝুলাইয়া দিয়াছেন। এই সময়ে কোট উছলিয়া রক্ত বহির্গত হইতেছে দেখা গেল;—রক্ত "হলকে হলকে" আসিতেছিল। সাহেবেরা সকলে স্ব স্ব রুমাল দ্বারা রক্ত নিবারণ করিতে লাগিলেন। আরল্ আর দুই এক মিনিটের বেশী বসিতে পারিলেন না,—গাড়ীর উপর শুইয়া পড়িলেন। *"Lift up my head"* "আমার মাথাটী উঁচু করে তুলে দাও।"—বস্! এই তাঁহার জীবনান্তের শেষ কথা। এ পৃথিবীতে তাঁহার আর কোন কথা কেহ কখনও শুনে নাই।

ষ্টীমারে উঠাইল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই সব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাণ-বায়ু দেহে নাই। সাহেবেরা অনেকেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও এটা অনুমান। অনুমানের জন্য আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া আরলের গায়ের কোট কাটিয়া ফেলিলেন,—বহুবিধ উপায়ে রক্ত নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ পদদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ষ্টীম-বোট যাইয়া জাহাজের নিকট পৌঁছিল। জাহাজের ঘড়ীতে আটটা বাজিল। আহার প্রস্তত। নিমন্ত্রিতগণ সকলেই আমোদ-আহ্লাদ, হাস্য-তামাসা করিতেছেন। সাংঘাতিক ঘটনা তখন গোপন রাখিবার জন্য ষ্টীম-বোটের আলোক নিবাইয়া দেওয়া হইল। ধীরে ধীরে আরল্‌কে লইয়া তাঁহার নিজের "ক্যাবিনে" শয্যায় শায়িত করা হইল। ডাক্তারেরা যাইয়া দেখিলেন,—স্কন্ধ দেশে পর পর কৃপাণের দুইটী আঘাত; আঘাত, হৃদয়ের রক্তকুম্ভ বিদীর্ণ করিয়াছে। মৃত্যুপক্ষে উহার এক আঘাতই প্রচুর হইত।

অবস্থিত ; কয়েক পদ পশ্চাতে, বামে ও দক্ষিণে কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার ও আরও কেহ কেহ আসিতেছেন। সশস্ত্র পুলিস-প্রহরী তাঁহাদের মধ্যস্থলে, আরলের অধিকতর সান্নিধ্যে সংস্থাপিত হইয়া চলিয়াছে। পরদিনের কার্য্যাবলীর অগ্রিম আয়োজন করিবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। এখন জেটীর উপর হইতে তরণী আরোহণ করিতে হইবে;—সেই তরণী, পোতে পৌঁছাইয়া দিবে। আরল কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সর্ব্বাগ্রে তরণী-আরোহণে উদ্যত। কিন্তু হায়! কি ঐ শব্দ!—অহো! দেখ দেখ! কি ঐ শব্দ!! সন্নিকটস্থ সকলেই সোপানের পশ্চাৎস্থিত স্খলিত প্রস্তর-রাশির মধ্য হইতে একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন, শব্দটা যেন বন্য জন্তুর দ্রুত গমনের মত। দুই এক জনে দেখিতে পাইলেন,—একখানা সকৃপাণ মনুষ্য-হস্ত মশালের আলোক-মধ্য হইতে নিম্নে নামিল। প্রাইবেট সেক্রেটারী একটা আঘাতের শব্দ শুনিলেন। তখনি দেখিলেন,—একটা লোক, রাজ-প্রতিনিধির পৃষ্ঠদেশে ব্যাঘ্রের মত "আঁকড়াইয়া" রহিয়াছে! আরল্ প্রায় পতনোন্মুখ। মশালের আলোক নির্ব্বাপিত। জীবনালোক এখনও আছে কি ?

নিমেষ-মধ্যেই বার জন প্রহরী যুগপৎ হত্যাকারীকে আক্রমণ করিল। দেশীয় প্রহরিগণ তখনি সেই পাপাত্মাকে সহস্র খণ্ডে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিতেছিল; কিন্তু জনৈক ইউরোপীয় অফিসার তরবারের আদেশে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

নিরীহ, অভাগ্য লর্ড মেয়ো, হায়! ধরাতলে নিপতিত,—আজানু জল-নিমগ্ন,—কম্পান্বিত, দেহ;—কিন্তু তবুও উঠিয়া দাঁড়াইবার উদ্যম করিতেছেন। বীর-শরীর, উপস্থিত মৃত্যুর সহিত তখনও সংগ্রাম করিতেছে। ভ্রূযুগে নিপতিত, বিশৃঙ্খল কেশগুলি আরল্ স্বহস্তে তখনও সংবরণ করিতেছেন,—যেন তদ্দ্বারা আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছেন! প্রিয়, প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত সেক্রেটারী বার্ণ অবিলম্বে নিকটে উপস্থিত হইয়া এই অবস্থায় আরল্‌কে প্রাপ্ত হন। বার্ণ বেলা-ভূমি হইতে তটোপরি প্রভুকে উত্থিত করিতেছিলেন;—*"Burne they've hit me"* "বার্ণ, তা'রা আমায় বিদ্ধ করেছে"—আস্তে আস্তে আরল্ এই ক'টী কথা কহিলেন। পরেই একটু উচ্চ স্বরে বলিলেন,—*It's allright, I dont think, I am much hurt* "আমি তত বেশী আঘাত পেয়েছি—এমন বোধ হোচ্ছে না; এখন সব ভাল হয়ে গেছে।" এই কথা কটী সকলেই শুনিতে পাইল।

যখন বলিলেন,—"সব ভাল হয়ে গেছে", তখন কিন্তু বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া রুধির-ধারা ছুটিয়াছে; তাহা তখনও কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।

আলোক পুনঃ জ্বলিত হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া জেটীর পার্শ্বে একখানা দেশীয় শকটে আরল্‌কে উঠাইল। আরল্ তখনও বসিয়া আছেন,—পা দুখানি গাড়ীর উপর হইতে ঝুলাইয়া দিয়াছেন। এই সময়ে কোট উছলিয়া রক্ত বহির্গত হইতেছে দেখা গেল;—রক্ত "হলকে হলকে" আসিতেছিল। সাহেবেরা সকলে স্ব স্ব রুমাল দ্বারা রক্ত নিবারণ করিতে লাগিলেন। আরল্ আর দুই এক মিনিটের বেশী বসিতে পারিলেন না,—গাড়ীর উপর শুইয়া পড়িলেন। *"Lift up my head"* "আমার মাথাটী উঁচু করে তুলে দাও।"—বস্! এই তাঁহার জীবনান্তের শেষ কথা। এ পৃথিবীতে তাঁহার আর কোন কথা কেহ কখনও শুনে নাই।

ষ্টীমারে উঠাইল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই সব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাণ-বায়ু দেহে নাই। সাহেবেরা অনেকেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও এটা অনুমান। অনুমানের জন্য আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া আরলের গায়ের কোট কাটিয়া ফেলিলেন,—বহুবিধ উপায়ে রক্ত নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ পদদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ষ্টীম-বোট যাইয়া জাহাজের নিকট পৌঁছিল। জাহাজের ঘড়ীতে আটটা বাজিল। আহার প্রস্তুত। নিমন্ত্রিতগণ সকলেই আমোদ-আহ্লাদ, হাস্য-তামাসা করিতেছেন। সাংঘাতিক ঘটনা তখন গোপন রাখিবার জন্য ষ্টীম-বোটের আলোক নিবাইয়া দেওয়া হইল। ধীরে ধীরে আরল্‌কে লইয়া তাঁহার নিজের "ক্যাবিনে" শয্যায় শায়িত করা হইল। ডাক্তারেরা যাইয়া দেখিলেন,—স্কন্ধ দেশে পর পর কৃপাণের দুইটী আঘাত; আঘাত, হৃদয়ের রক্তকুম্ভ বিদীর্ণ করিয়াছে। মৃত্যুপক্ষে উহার এক আঘাতই প্রচুর হইত।

তবে রাজসভায় ইহা ব্যাখ্যাত হইলে অদ্ভুত আলঙ্কারিকেরা ইহারও নানা দোষ বাহির করিতেন।"

অমরু হাসিয়া কহিলেন,—"ঐ দোষ-বাহির-করা-দোষ উহাদিগের জন্মগত। বোধ হয়, জন্মান্তরে ঐ মহাত্মারা 'ব্রণ-মক্ষিকা' ছিলেন। ফলতঃ কবিতার ঐরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-দূষণ, আর কুলস্ত্রীর বিবস্ত্রীকরণ একই কথা। আমি রাজা হইলে এই অপরাধে উহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিতাম। যাহা হউক, তাহাদের উপর আমার ততদূর অসন্তোষ নাই। অসন্তোষ আমার মার্ত্তণ্ডটার উপর। সে আমার উপর রাজার অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিয়াছিল।"

বন্ধু বলিলেন,—সে মার্জ্জনীয়। আত্মজ্ঞান-মতই সে প্রার্থনা করিয়াছিল। তোমাকে তাহার আপন অপেক্ষা হীন ও অনুগ্রহ-ভিখারী বলিয়াই তাহার ধারণা আছে।

সে কথা যাক্, এখন বাটীতে যদি জিজ্ঞাসা করে, 'রাজা কি পুরস্কার দিলেন ?'—কি বলিবে ?

অমরু। বলিব,—রাজা কবিতা-শ্রবণে এমনি মোহিত হইয়াছিলেন যে দেওয়ার কথা তাঁহার মনেই ছিল না !

বন্ধু। আচ্ছা, রাজা যদি কিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দেন ?

অমরু। তাহা লইব না। কামধেনু দান করাই ধর্ম্ম ; তাহা প্রদর্শন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা অতি হেয় ব্যবসায় বলিয়া পূর্ব্বাবধিই আমার ধারণা আছে।

বন্ধু। কিন্তু মার্ত্তণ্ডটা গ্রামে আসিয়া যদি রটনা করে ? অবশ্য 'রাজা দিয়াছেন' বলিয়া রটনা করিবে না, আমি রাজাকে বলিয়া দেওয়াইয়াছি—যদি এইরূপ প্রচার করে ?

অমরু। মন্দ নহে, তা করে করুক। নির্দ্ধন অপেক্ষা ধনী-পরিবাদ ভাল।

নানা কথায় পথের ছুদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে বাটী পৌঁছিলেন। কয়েক দিন পরে মার্ত্তণ্ড-মহাশয়ও বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রাজার নিকট হইতে অমরুর বিদায় ৫৲ টাকা ও তাঁহার বন্ধুর বিদায় ২৲ টাকা ও কিঞ্চিৎ পাথেয় আদায় করিয়া আনিয়াছি প্রকাশ করায় বন্ধু মহাশয় সত্বরেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মার্ত্তণ্ড মহা আড়ম্বর করিয়া বলিলেন, "তোমরা অগ্রে চলিয়া আসিয়া বড়ই নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছ। উপস্থিত থাকিলে বলিয়া কহিয়া ১০৲ টাকা করিয়া বিদায় দেওয়াইতে পারিতাম। অনুপস্থিতের বিদায় নাই। কেবল শর্ম্মারাম নিজ পদপ্রতিপত্তি-বলে ইহা আদায় করিয়া আনিয়াছেন। বন্ধু মহাশয় ঐ টাকা আদায় করিয়া লইলেন ও অমরুকে ঐকথা বলিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু মার্ত্তণ্ড-মহাশয় অমরুর ঐ অল্প বিদায়ের কথা ও তৎসঙ্গে নিজের প্রচুর বিদায়-প্রাপ্তির কথা কাহারও নিকট বলিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। যাহা হউক, বন্ধুবর, অমরুর টাকা কয়েকটী গোপনে বন্ধুপত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঐ টাকা লইতে অমরুর অনভিপ্রায় আছে জানিতে পারিলে, তদীয় পত্নী কখনও তাহা গ্রহণ করিবেন না,—ইহা নিশ্চিত জানা থাকায়, টাকা কয়েকটী লওয়াইতে তাঁহাকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

রাজবাটীতে যাইয়া অমরু আর একটী লাভ করিয়াছিলেন। সেটী মিত্র-লাভ। রাজসভায় অমরুর পঠিত শ্লোকটীর সমধিক প্রশংসা করায় যে ব্যক্তি উপহসিত হইয়া ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করেন, সেই ব্যক্তিই একদিন সন্ধান করিয়া অমরুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। অমরু তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। বন্ধুকে তখনি ডাকাইয়া আনিলেন। ভাল করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। সেদিন শিষ্টানধ্যায় হইল—ছাত্রদিগের পাঠবাধ রহিল।

আহারান্তে অমরু তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন।—কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া। কহিলেন,—"আমি বিশ্রাম করিতে আসি নাই। আমাদের জীবনে চির-বিশ্রাম ;—কখনও গাঢ় উৎকণ্ঠা জন্মায় না, কখনও আকুলতা উপস্থিত হয় না। তাই কবিবর! আপনার চির-উৎসাহোদ্দীপ্ত, নিত্যনবীন জীবনের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার স্নেহাকুল অন্তঃকরণ প্রকাশ করুন,—আপনার প্রেমার্দ্রভাব বিতরণ করুন, আপনার অলৌকিক রস-মাধুরী পরিবেষন করুন। ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরক্তিকর বিষয়মগ্ন জীবন বিস্মৃত হই।"

অমরু, কবিতার আদরে উন্মত্ত হইয়া গাহিলেন,—

প্রহরবিরতৌ মধ্যে বাহ্নস্ততোপি পরেণ বা
কিমুত সকলে যাতে বাহ্নি প্রিয় ত্বমিহৈষ্যসি।

ইতি দিন শতপ্রাপ্যং দেশং প্রিয়স্ত যিযাসতো
হরতি গমনং বালালাপৈঃ সবাষ্পঝলজ্ঝলৈঃ॥

ভাবানুবাদ,—

প্রহরের অবসানে আসিবে কি ফিরে?
কিম্বা দিবামধ্যভাগে, কিংবা তারো' পরে?
অথবা এ দিনমান সব হ'লে ক্ষয়,
আসিবে জীবিতনাথ, ফিরিয়া আলয়?
এত শুনি সমাকুলা বালার বচন,
দিনশত-গম্য দেশে গমনে মনন,
তখনি ত্যজিয়া ধীর অধীর-অন্তরে,
মুছায় যতনে তার নয়ন-নিঝরে:

আবার—

"যাতাঃ কিংনমিলন্তি সুন্দরি পুনশ্চিন্তা ত্বয়া মৎকৃতে
নাকার্য্যাতিতরাং কৃশাসি কথয়ত্যেবং সবাষ্পে ময়ি
লজ্জামন্থরকাতরেণ নিপতদ্ধারাশ্রুণা চক্ষুষা
দৃষ্ট্বাঁমাং হসিতেন ভাবিমরণোৎসাহস্তয়া সূচিতঃ॥"

ভাবানুবাদ,—

যায় যারা দূরদেশে ত্যজে প্রিয়জন,
পুনঃ কি তাদের প্রিয়ে না হয় মিলন?
দিবানিশি কেন এত চিন্তহ অধীরে,
দেখ দেখি চেয়ে তব কি আছে শরীরে!
এত শুনি প্রিয়া মোর মলিন-বয়ানে
বিগলিত-অশ্রুধারে আকুল নয়ানে,
চাহি মোর পানে ধীরে ঈষত হাসিল,
মরণে উৎসাহ দৃঢ় এই জানাইল!

অভিনব-শ্রোতা অশ্রুধারায় আপ্লুত হইয়া কহিলেন, "প্রবাসের প্রারম্ভভাগই এত করুণ-রসার্দ্র, না জানি অন্তভাগ কতই শোচনীয়!"

অমরু গাহিলেন,—

"অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু কৃতং চিন্তা গুরুষর্পিতা
দত্তং দৈন্যমশেষতঃ পরিজনে তাপঃ সখীষ্বাহিতঃ।
অদ্যশ্বঃ পরনির্বৃতিং ব্রজতিসা শ্বাসৈঃ পরংখিদ্যতে
বিশ্রব্ধোভব বিপ্রয়োগজনিতং দুঃখং বিভক্তং ত্বয়া

ভাবানুবাদ,—

সখী মোর আপনার তরে
এবে আর কিছু না রাখিলা,
নিদারুণ বিরহ-বেদনা
ভাগ করি সবে সমর্পিলা। ১

অবিরল নয়নের ধার
বন্ধুজনে করিলা অর্পণ,
হৃদয়ের গুরু চিন্তাভার
গুরুজনে কৈল বিসর্জ্জন। ২

দীনভাব দিলা পরিজনে,
বিতরিলা সখারে সন্তাপ;
শুধু তাঁরে দেয় বড় জ্বালা
মাঝে মাঝে নিশ্বাস—সে পাপ ৩

আজি কালি, পরম নির্বৃতি
সখী মোর ভুঞ্জিবে, এ আশ।
আর কেন, চিন্তা কর দূর,
ধর ধীর হিয়ায় আশ্বাস। ৪

আগন্তুক শ্রোতা কহিলেন,—"আহাহা! এ যে চরম অবস্থা! না, এ হৃদয়-বিদারিণী বর্ণনা আর শুনিতে চাই না। কিন্তু এ শ্লোকে নায়ককে কি মর্ম্মান্তিক ভর্ৎসনাই করা হইয়াছে! যাহা হউক, কবিবর! আপনি ক্ষান্ত হউন। শুনিয়াছি রাজ-পণ্ডিতেরা বিচার করিয়াছিলেন যে, প্রবন্ধ ব্যতীত পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোকে রসের আবির্ভাবই হইতে পারে না। আ হস্তিমূর্খগণ! হৃদয়ে স্থান পায় না এত রস, ইহাও তোমাদের অনুভবে আইসে নাই? ইহার এক একটী শ্লোকই প্রবন্ধ! এক একটী শ্লোকই যে হৃদয়ে এক একটী বৃহৎ প্রবন্ধের আবির্ভাব করিয়া দিয়া তবে ক্ষান্ত হয়। এ এক একটী ভাব কি মুহূর্ত্তে ফুরায়? কবিতার ক্ষুদ্র আকার বলিয়া কি ফুরাইবে? ইহার এক পঙক্তি স্থলে অন্যের শত পঙক্তিতেও যে কুলায় না। ইহার একটী পদ্মেই যে সহস্রটী দল! একটীতেই যে হৃদয় ভরিয়া যায়, যুড়াইয়া যায়! অন্ধ তোমরা, কেমনে এ মর্ম্ম বুঝিবে, কেমনে এ রসে মজিবে?"

অমরু কহিলেন,—"না মহাশয়! আর হয় না; নিন্দা অপেক্ষা আমার এ প্রশংসায় অধিক কষ্ট বোধ হইতেছে।"

আগন্তুক বলিলেন,—"না কবিবর! আর আমি কিছুই বলিব না; আপনি বলুন।"

অমরু কহিলেন,—ভাল, "তবে বিসর্জ্জন গাই,—

"পুরাসীদস্মাকং নিয়তমবিভিন্না তনুরিয়ং
ততোহনু ত্বং প্রেয়ানহমপি হতাশা প্রিয়তমা।
ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপিকলত্রং কিমপরং
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্॥"

ভাবানুবাদ,—

অভেদ আছিল তনু তোমার আমার,
মনে পড়ে প্রেমেমত্ত সে ভাব-প্রকার!
তার পর—তবু ভাগ্য!—হ'লে প্রিয়তম,

অভাগীও প্রিয়তমা হইল তখন।
আজি একি, তুমি প্রভু, আমি ভার্য্যা তব!
রসাতলে গড়াগড়ি অমরা-বৈভব!
কুলিশ-কঠোর করি ধরেছি যে প্রাণ,
সে তরুর সেই ফল কেন হবে আন?

"সহৃদয়' শ্রোতা কহিলেন,—আহা! এ রমণীর ক্রমে ক্রমে এইরূপে প্রেমের পরিণাম মর্ম্মে মর্ম্মে যেন বিদ্ধ হইয়াছে। সে কি সুখ-স্বপ্নেই মোহিতা ছিল, আর ক্রমে ক্রমে এখন তার কি কষ্টকর চৈতন্যই লাভ হইয়াছে! কিন্তু স্ত্রী-লোকেরা কি এত সহৃদয়া, এত হৃদয়জ্ঞা হইতে পারে? অথবা কবির জগতে সেরূপ নারী অবশ্যই জন্মিতে পারে। যাহা হউক্, ধন্য সেই নারী! দুঃখিনী হইলেও আমরা তাহাকে শতবার ধন্যা বলি।"

অমরু কহিলেন,—"আরও একটা—"

"কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রান্যোন্য স্মিতমনুনয়ো যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ।
তস্য প্রেম্ণস্তদিদমধুনা বৈশসং পশ্য জাতং
ত্বং পাদান্তে লুঠসি ন চ মে মন্যুমোক্ষঃ খলায়াঃ

ভাবানুবাদ,—

কোপের চরম যথা ভ্রূকুটিবন্ধন,
চরম নিগ্রহ যথা মৌনাবলম্বন,
দোঁহে দোঁহা অনুনয় ঈষৎ হাসিয়া,
কত প্রসন্নতা হয় কটাক্ষে চাহিয়া;
হায় হেন প্রেমে আজি একি বিঘটন,
তুমি এ দাসীর পায়ে কর বিলুণ্ঠন!
তথাপি এ পাষাণীর না গলে হৃদয়!
হায় নাথ, হায় বিধি, হায় রে প্রণয়!

শ্রোতা কহিলেন,—"এ বড় মর্ম্মান্তিক অপরাধের ফল। সহজ অপরাধের সরস বর্ণনা শুনিতে ইচ্ছা হয়।"

অমরু কহিলেন,—তথাস্তু,—

"কপোলে পত্রালী করতলনিরোধেন মৃদিতা
নিপীতো নিশ্বাসৈরয়মমৃতহৃদ্যোঽধররসঃ।
মুহুঃ কণ্ঠে লগ্নস্তরলয়তি বাষ্পঃ স্তনতটং
প্রিয়ো মন্যুর্জাতস্তব নিরনুরোধে ন তু বয়ম্॥"

ভাবানুবাদ,—

কপোলে রচিত পত্রাবলী,
করিল মর্দ্দন করতল,
অধরের অমৃত-মাধুরী
পান কৈল নিশ্বাস-পবন;
বার বার কণ্ঠে লগ্ন হ'য়ে
অশ্রুধার পরশয়ে স্তন,—
আমি যাহা-লাগি লালায়িত,
কোপ আজ সে সব করিল,
তাই বলি,—আমি কিছু নহি,—
'কোপ তব প্রিয়তম হ'ল!

শ্রোতা মোহিত হইয়া বলিলেন,—আহা! কি সুন্দর বাগ্-বৈদগ্ধী!"

অমরু কহিলেন,—"আর একটা শুনুন,—

ভ্রূভঙ্গো গুণিতশ্চিরং নয়নয়োরভ্যস্তমামীলনং
রোদ্ধুং শিক্ষিতমাদরেণহসিতং মৌনেঽভিযোগঃকৃতঃ।
ধৈর্য্যং কর্ত্তুমপি স্থিরীকৃতমিদং চেতঃকথঞ্চিন্ময়া
বদ্ধো মানপরিগ্রহে পরিকরঃ সিদ্ধিস্তু দৈবে স্থিতা।"

ভাবানুবাদ,—

ভ্রূভঙ্গী করিতে কত করিনু অভ্যাস,
নয়ন মুদিতে কত পাইনু প্রয়াস;
শিখেছি যতনে হাসি করিতে রোধন,
মৌনব্রতে রহিবারে দেখ প্রাণ-পণ;
ধৈর্য্যও ধরিতে চিতে করেছি নিশ্চয়,
সমান কঠিন রবে এ মোর হৃদয়;
মান তরে এই তো বাঁধিনু পরিকর,
কার্য্যসিদ্ধি প্রতি কিন্তু দৈবেতে নির্ভর॥"

এইরূপে সেই দিন সেই সহৃদয় শ্রোতারও আনন্দের সীমা ছিল না, অমরুরও উৎসাহের অবধি ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের সে আনন্দ, সে উৎসাহ, সে সময়ে সেই ক্ষুদ্র গৃহেই পরি-সমাপ্ত হইয়াছিল; সে গৃহের অঙ্গণ ছাড়াইয়া আর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। আজি পৃথিবীর অঙ্গণ ছাড়াইয়া সেই কুটীরবাসী কবির কবিত্ব-কীর্ত্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সে দরিদ্র কবি আজি আর সে পার্থিব-দরিদ্রতায় পীড়িত নহেন; তিনি আজি সুপবিত্র যশঃ-শরীরে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। রাজাধিরাজ বিশ্ববিধাতা স্বয়ং সুবিচার পূর্ব্বক তাঁহার পুরস্কার বিধান করিয়াছেন। ইতি।

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

হিন্দু-বিধবা।

মা ব্রহ্মচারিণি! হিন্দু-সংসার-পবিত্রতা-বিধায়িনি! ধর্ম্ম-মূর্ত্তি হিন্দু-বিধবে! তুমি দেবী, না—মানবী? তুমি স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী, না—পৃথিবী-বিহারিণী? আমি বুঝিতে পারি না,—মা! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার স্বরূপ, প্রভাব ও তেজ বুঝিতে সক্ষম হই।

* * * *
* * * *

মনোরম উদ্যান। ফলফুলে শোভিত কত শত বনস্পতি! কুসুম-স্মিত-শোভনা, মন্দানিল-বিকম্পিতা, তরু-নিহিতদেহযষ্টি কত শত ব্রততি! মধুলোভে ইতস্ততঃ ধাবমান কত শত মধুকর! অসীম শোভা। অনুপম সৌরভ। সন্তাপহারিণী সুশীতল ছায়া। এস দেখি ভাই! উদ্যানে প্রবেশ করি।

অহো সুন্দর! ভূতল-বিলুণ্ঠিতা, অবনত-মুখী, কুসুমহীনা,—তবু যেন জ্যোতির্ম্ময়ী, কি চমৎকার লতাটী চারি দিকে ঘুরিয়া রহিয়াছে। গাছে উঠিতে জানে না, লতায় মিশিতে জানে না;—ধূলায় ধূলায় বেড়াইতেছে! তবু ইহার কান্তি দেখে কে? ইহার জ্যোতি অতুলনীয়। পদতলে দলিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু দলিত করিতে কেহ পারে না, কাহারও পা যেন উঠে না। এই কান্তিহীনা অথচ কান্তিমতী জ্যোতির্ম্ময়ী লতাটীকে কি চিনিতে পার?—এ লতাটী হিন্দু বিধবা।

---

(১)

ষোড়শী সধবা, তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠাধর-পার্শ্ব আস্তে-আস্তে মুছিয়া, গণ্ডদ্বয় বসন-প্রান্তে সবলে ঘর্ষণ করিয়া, আর একবার ভাল করিয়া মুকুরে মুখ দেখিলেন। কিন্তু আপনি দেখিয়া । গৃহদ্বারের অপর পার্শ্বস্থ গবাক্ষে দাঁড়াইয়া সজোরে একখানি কবাট বন্ধ করিলেন। গবাক্ষের পর রাজপথ, রাজপথের অপর পার্শ্বে মোহিনীবাবুর বাড়ীর বারান্দা;—তৎক্ষণাৎ বারান্দায় সুতরাং সধবার সম্মুখে এক নবীন-পুরুষমূর্ত্তি; পশ্চাতে—গৃহদ্বারে, এক শুভ্রবসনা তরুণী বিধবা-মূর্ত্তি এবং সধবার অন্তরে এক কলুষমূর্ত্তি যুগপৎ আবির্ভূত হইল। তরুণী ঈষৎ-হাস্যমুখে, বদ্ধ কবাটের অন্তরালে মুখের অর্দ্ধাবয়ব তিরোহিত করিলেন; নবীন পুরুষ, হাস্য-ভয়-লজ্জা-শ্যাম-রক্ত-মুখে অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বারান্দা হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। বিধবা অবনতমুখী নির্ব্বিকারা।

"ছোট-বৌ!"—কথাটী তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই সধবা, পুরুষের এবংবিধ ভাব দর্শনে সভয়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, —ঠাকুর-ঝি! সধবার ভয়-জড়িতস্বরে "ঠাকুর-ঝি!"—সম্বোধন এবং বিধবার স্নেহ-প্রীতিমিশ্রিত "ছোট-বৌ!"—সম্বোধন যমুনা-জাহ্নবীর ন্যায় পরস্পরে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

সধবা তৎক্ষণাৎ বিধবার পায়ে পড়িয়া সরোদনে বলিতে লাগিলেন,—"বল ঠাকুর-ঝি! কাহাকেও বলিবে না।"—

বিধবা অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া ও ছোট-বৌকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—"ছোট-বৌ তুমি কি পাগল হলে! তুমি বড় ভাজ,—পায়ে পড়িতেআছে কি? কেন কি হইয়াছে?—এখন চল, ভাত বাড়া হইয়াছে। ছেলেদিগকে খাইতে বসাইয়া আসিয়াছি; কি চাই না-চাই দেখি গিয়া। তুমি এস, আমি চলিলাম।" বিধবা নিঃশব্দ দ্রুত গমনে চলিয়া গেলেন সধবাও অন্যমনস্ক ভাবে, তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

---

(২)

আজ সধবার ভাবান্তর উপস্থিত। আজ আর সদা-সর্ব্বদা তাঁহার মুকুরে মুখ দেখা নাই,—গাত্র-মার্জ্জনা নাই,—হাসি-হাসি ভাব নাই,—চাঞ্চল্য নাই; আজ সধবা, স্থির-গম্ভীর-ধীর-প্রকৃতি। 'বৃষ্টি নাই, বিদ্যুৎ নাই, গর্জ্জন নাই, বায়ু নাই,—আকাশতল কিন্তু মেঘে আচ্ছন্ন—প্রকৃতির স্থির-গম্ভীর ভাব,—চিন্তা করুন, সধবার ভাব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার কাজ, অদ্য কেবল বিধবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান। যেন কি বলিবেন। মনে যেন মহাসংগ্রাম, তুমুল-কোলাহল;—চাপিয়া রাখিয়াছেন, একটু নির্জ্জন পাইবেন আর বিধবাকে সে কথা বলিবেন; কিন্তু সুযোগ মিলিতেছে না। বলি বলি, করিতেছেন, বলা হইতেছে না। বিধবার কার্য্যের শেষও নাই,

নির্জ্জনও হইতেছে না। বিধবা কেবল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কেন ছোট-বৌ! সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছ কেন?"

বিধবার দৈনিক সংসার-কার্য্য শেষ হইয়াছে। পিতা, পুরাণপাঠ করিবেন, বিধবা তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া লইয়াছেন। "ছোট-বৌ! আজ আমার সঙ্গ ছাড়িতেছ না কেন? রোদে-রোদে জলে-জলে বেড়াইতেছ কেন ভাই?"—ভিজা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে, পশ্চাতে চাহিয়া বিধবা এই কথাগুলি বলিলেন।

তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া সধবা আবার বিধবার পদপ্রান্তে লুটাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বিধবা, তৎক্ষণাৎ হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"ছোট-বৌ! তোমার কি হইয়াছে?" সধবা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"বৌ! সংসারের এরূপ কুতূহল আমাদের ভালবাসা উচিত নহে। প্রহেলিকাময়, রহস্যময় বৃত্তান্ত অবগত হইতে আমার বাসনা হয় না। গৃহস্থের পরিচর্য্যা ও সৎপ্রসঙ্গে সময়াতিপাত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু কেন বৌ! তুমি নানা ছলে আমাকে কুতূহলিনী করিতেছ? যাহা বলিবার, সহজে বল।"—কিঞ্চিৎ রুক্ষ হইলেও বিধবা, অতি নম্রভাবে, অতি স্নেহের সহিত সধবাকে এই কথাগুলি বলিলেন।

সধবা, অগত্যা স্বীয় পাপ-বাসনা-সমুত্থিত সেই গৃহের ব্যাপার আমূল বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—"তোমার ভাব দেখিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে তোমার সম্মুখে গবাক্ষ-দ্বার, তুমি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াও সেদিকে দৃষ্টিপাত কর নাই; আমি বুঝিয়াছি, তোমার দৃষ্টি মৃত্তিকাতেই সংলগ্ন থাকে। আর আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই বহির্গমনের সুযোগান্বেষণে লালায়িত। তার পর তোমার অবস্থা ও আমার অবস্থার তুলনা করিয়াছি। এতদিন সহবাসে যাহা বুঝি নাই, অদ্যকার একটী ব্যাপারে তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ঠাকুর-ঝি! আমি নরকের কীট, তুমি স্বর্গের দেবী; তোমার নিকটেও থাকিতে আমি উপযুক্তা নহি। ঠাকুর-ঝি! বল, আমার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই?" সধবা কথাগুলি বিকৃতমুখে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বিধবা কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। সধবার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না; দ্রুত-পদে চলিয়া গেলেন।

(৩)

সধবার-প্রণয়পাত্র, বিধবা-দর্শনে অন্তর্হিত নবীন-পুরুষের নাম,—মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেই গ্রামের প্রাচীন জমীদার-বংশসম্ভূত। ইঁহার অংশে ২০০০ দুই হাজার টাকা বার্ষিক আয়।

মোহিনীমোহন, কালিদাস চক্রবর্ত্তীর পরমবন্ধু। কালিদাস, বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিয়দ্দূরে মাষ্টারী করিতে গমন করিয়াছেন। মাসে দুই বার করিয়া বাটী আসেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ষোড়শী সধবা তাঁহার আদরের পত্নী, নাম—বসন্তকুমারী। বিধবা তাঁহার ভগিনী; নাম রামমণি। এতদ্ভিন্ন পিতা মাতা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ এবং তিনটী ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার আছেন। সকলেই অদ্যাবধিএকসংসারভুক্ত। পিতা সেকেলে ধার্ম্মিক লোক; একালের ব্যবহারে অত্যন্ত চটা। বৈকালে পরিবারবর্গের নিকট পুরাণ ব্যাখ্যা করেন। মাতা, বধূদ্বয়কে পূর্ব্ব-রীতিনীতি শিক্ষা দেন। পুরাণ, কুরুচিপূর্ণ; প্রাচীন রীতি-নীতি, কুসংস্কার, অস্বাস্থ্য ও কুশিক্ষার মূল;—কালিদাসের ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এহেন অকার্য্যের প্রশ্রয়দাতা পিতা-মাতার উপর কালিদাস, সহজেই যে বিরক্ত হইবেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? কিন্তু 'পাড়াগেঁয়ে' ছেলের, মনে বিশেষ বিরাগ থাকিলেও জোর করিয়া পিতা মাতার সে অত্যাচার একেবারে নিবারণ করিতে তিনি সাহসী হন নাই। তবে মাকে একদিন বলিয়াছিলেন,—"মা! ছোট-বৌকে ঘর-গোবর দেওয়া শিখাইও না। অধিক খাটাইও না, সদাসর্ব্বদা একহাত ঘোমটা দিতে উপদেশ দিও না। জানালাটা খুলিয়া একটু দাঁড়াইলে, বা—বায়ু সেবন করিলে বাধা দিও না। দাদা বাড়ী না থাকিলে, বড়বৌকে যেমন রাখ না থাকিতে উপদেশ দিয়াছ,—আমি বাড়ী না থাকিলে, ছোট বৌকে সেরূপ থাকিতে উপদেশ দিও না। সে এখন যেমন দুবেলা গা ধুয়ে, গা-মাজে, বেশ-বিন্যাস করে, চুল-বাঁধে, আলতা পরে—আমি বাড়ী না থাকিলেও সে,

তাহাই করিবে, তুমি কোন কথা কহিও না। আমি বাড়ী না থাকিলেও সে যাহাতে মনের আমোদে থাকে, হাসিখুসী করে, তাহার চেষ্টা করিবে। মোহিনীবাবুর পরিবারের সঙ্গে ছোট-বৌ'এর ভাব আছে,—মাঝে মাঝে সেখানে যাইতে কহিলে, যাইতে দিবে; নতুবা স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে। আর বাবার "পুরাণ-পাঠের" কাছে তাহাকে কদাচ লইয়া যাইও না। মা! সেকেলে —কুনিয়ম অনেক আছে, কাজেই এ কথাগুলি আমাকে বলিতে হইল।"

এই কথা বলার একমাস পরে, কালিদাস মাকে, আর একবার বলেন,-"মা! আমার কথা ত রাখিলে না; অনেক বিষয়ে ছোট-বৌকে "টিক্-টিক" কর। আমি আর কি করিব! আমি চলিলাম,—আর আমায় দেখিতে পাইবে না। অকারণ 'নারী-নির্যাতন' অমি সহ্য করিতে অক্ষম।"

সেই পর্য্যন্ত ছোট বৌ নিজের ইচ্ছামত চলিতেন, শ্বশ্রূ কোন কথা কহিতেন না। অপরে কেহ কিছু বলিত না। কালিদাসও পরমানন্দে ছিলেন।

জ্যেষ্ঠের উপর কালিদাসের অধিক ঘৃণা ছিল। জ্যেষ্ঠ, পিতা-মাতার সকল কার্য্যের অনুমোদন করিতেন এবং তাঁহাদের নিতান্ত বাধ্য ছিলেন, এইজন্য জ্যেষ্ঠকে কালিদাস 'গাড়ল' ভাবিতেন এবং বন্ধু-বান্ধব-সকাশেও তাহাই বলিতেন।

বাল-বিধবা ভগিনীকে তিনি অনুগ্রহ করিতেন, দয়া করিতেন,—বিধবা নিঃসহায়া বলিয়া। তাঁহার জন্য অনুতাপ করিতেন,—আত্ম দুঃখে অনভিজ্ঞা বলিয়া। শেষে তাঁহার মনোভাব এরূপও হইয়াছিল যে ঈশ্বরানুকম্পায়, পিতার পরলোক যদি শীঘ্র হয়, তাহা হইলে তিনি, সর্ব্বাগ্রে "পৃথক্" হইয়া বিধবা-ভগিনীকে কোন সুপাত্রে অর্পণ করিবেন। এ সমুদয় তাঁহার প্রাণের কথা চলিত,—মোহিনী বাবুর সঙ্গে।

প্রত্যহ অপরাহ্নে যখন কালিদাসের পিতা রামকান্ত, পুরাণ বলিতেন, শ্রীমতী ছোট-বৌ'এর ইচ্ছামত কালিদাসের ব্যবস্থানুসারে তখন ছোট-বৌ, মোহিনী বাবুর বাটীতে গিয়া তাঁহার পরিবারের সঙ্গে তাস খেলিতেন, রমণীনাটক পড়িতেন, গান শিখিতেন, কত কি গল্প করিতেন। পুরাণের কাছে তাঁহার যাইতে নাই।

অদ্য মোহিনী বাবু ছট্‌ফট্ করিতেছেন ও সেই সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। ভাবনাও আজ তাঁহার অপরিসীম। "রামমণি কি আমাকে ও তদাবস্থাপন্না বসন্তকে দেখিতে পাইয়াছে? না; সে ত মাথা হেঁট করিয়াছিল। যদি আমি পশ্চাৎ ফিরিলে, আমাকে দেখিয়া থাকে এবং বসন্ত যদি থতমত খাইয়া থাকে?—এমন কি হইবে?—না; বসন্ত তত কাঁচা-মেয়ে নয়।

"আহা রামমণির কি লাবণ্য! বিধবা হইয়া তাহার যেন লাবণ্য বাড়িয়াছে। আমি তাহাকে অনেক দিন দেখি নাই; বাড়ীর বাহির হয় না; দেখিব কিরূপে? আজ আমার সুপ্রভাত বলিতে হইবে। কোথায় লাগে বসন্ত! রামমণির অঙ্গ-সংস্কার নাই, পরিচ্ছদ নাই,—তবু তাহার রূপ ধরে না। কিন্তু তাহার দিকে ক্ষণকালও চাহিতে পারিলাম না।

"ফাঁদ পাতিয়াছি, মৃগ পড়িবে,—যত মৃগ সবই পড়িবে; তবে মৃগের ভয়ে পলাইলাম কেন? বসন্তের জন্য?—নাই হইত আমার বসন্ত! না; ঠিক্ করিয়াছি;—বসন্ত হস্তগত, রামমণি যে হস্তে আসিবে, সে বিষয়ে স্থিরতা কি আছে?" চিন্তার সীমা নাই। কত রকম চিন্তা হইতে লাগিল।

ক্রমে বেলা অপরাহ্ন, মোহিনী বাবু দ্বারের দিকে পুনঃপুন দেখিতেছেন, বসন্ত ত আসিল না। 'এই আসে' 'এই আসে' করিতেছেন, এখনও ত দেখা নাই। আজ একবার দেখা হইলে, সব ঠিক্‌ঠাক হইবে,—কিন্তু কৈ, বসন্ত কৈ? মনে করিয়াছি,—"কল্য প্রত্যূষে গ্রামস্থ সমুদয় ব্যক্তির অজ্ঞাতে,কৌশলে পরিবারকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া, কল্য অপরাহ্নে মনস্কামনা পূর্ণ করিব,—কিন্তু সেই কিশোরী কৈ?

অস্থির-চিত্তে বারান্দায় বাহির হইলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুরাণ-পাঠ শুনিতে পাইলেন; কিন্তু বসন্ত-সমাগম হইল না। তখন তিনি সেই বসন্ত-গৃহের গবাক্ষ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শিস্ দিতে লাগিলেন, একটু গলার আওয়াজও করিলেন; কিন্তু হায়! অদ্য সবই বিফল!

এইবার মোহিনীমোহনের ভীতিসঞ্চার হইল। ঠিক্ বুঝিলেন,—"রামমণি সব দেখিয়াছে, সব বুঝিয়াছে। প্রকাশও করিয়াছে।" ঘরে গিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিধবা-পরিত্যক্তা ছোট-বৌ একবার ঘরে আসিয়া ছিলেন, মোহিনীর উপদ্রব সময়েই সেই ঘরে ছিলেন ;—কোন সাড়া-শব্দ দেন নাই। নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তাঁহার মনে দাবানল জ্বলিতেছিল, অনলের উত্তাপে চক্ষু শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে, যখন মোহিনীর উপদ্রব থামিল, তখন আস্তে আস্তে অধোমুখে সেই গবাক্ষের অপর কবাট অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং শ্বশুরের পুরাণ-ব্যাখ্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া যথাসম্ভব মনযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন নল-দময়ন্তীর কথা হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া, রামমণি সন্তুষ্টা হইলেন এবং পুরাণ-শ্রবণাভিলাষে সমাগত পল্লীস্থ বৃদ্ধা রমণীগণ একটু অস্ফুট তামাসা জুড়িয়া দিলেন। বসন্ত, পুরাণ-শ্রবণে, "দময়ন্তীর তেজে ব্যাধ ভস্ম হইতেছে," শুনিতে ব্যগ্র। তাঁহার মন, স্বাভাবিক আবরণে এবং বদন ও নয়ন, মহা অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল; সুতরাং বৃদ্ধামণ্ডলীর তামাসা ক্রমে লয় পাইল। তিনি, রামমণি এবং আমরা ভিন্ন তাঁহার প্রকৃত অবস্থা কেহই জানিতে পারেন নাই।

---

(৪)

মোহিনী বাবু, আর একবার বারান্দায় আসিলেন। দেখিলেন, সেই সুখময় গবাক্ষ,—যাহাকে মোহিনীমোহন একদিন পূর্ণিমা-সন্ধ্যা-শোভিত উদয়াচলের সঙ্গে উপমিত করিয়াছিলেন—সেই বসন্তমুখ-কমল-বিকাশ-সরোবর অপূর্ব্ব গবাক্ষ, আজ যেন অমা-রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেদিকে আর চাহিতে পারিলেন না। এতক্ষণ যাহা কিছু সন্দেহ ছিল, সম্পূর্ণ-গবাক্ষাবরোধ-দর্শনে তাহা আর, রহিল না। পোড়ার-মুখী রামমণিকে মনে মনে অশেষ-বিশেষ তিরস্কার করিলেন। আর ভাবিলেন,—"উপায় স্থির করিয়াছি, রামমণিকে এবার দেখিব!—"

"আচ্ছা রামমণির অপরাধ কি? সে, ঘরে আসিয়াছিল বৈ ত নয়? তাহার নির্যাতন করিয়া কি হইবে?"—

"রামমণি ষোল-আনা অপরাধী। সে, যখন বসন্তের ভাব বুঝিতে পারিল, তখন বসন্ত একথা প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া রামমণির নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক কাঁদা-কাটা নিশ্চয়ই করিয়াছিল। রামমণি, মদগর্ব্বে সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। তাই হায়! নিঃসহায়া বসন্ত, প্রাণের বসন্ত, আজ না জানি আমার জন্য কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছে! আজ সেই গবাক্ষ-প্রতিমা, নিশ্চয়ই অন্ধকার-গৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থিত। নতুবা একবার চকিতের ন্যায়ও আমাকে দেখা দিয়া যাইত। সেই কুসুমকোমলার এবংবিধ নির্যাতনে কে অপরাধী? পাপিষ্ঠা রামমণি নহে কি?—আর হতভাগিনি বিধবে! আমার বড় আশায় তুমি বাধ সাধিয়াছ। লব্ধপ্রায় রত্নকে তুমি আমার হস্তচ্যুত করিয়াছ। তোমার অপরাধ নাই ত অপরাধ কার? আমি তোমার গর্ব্ব ঘুচাইব, তোমার সতীপণা দূর করিব।"

মোহিনী বাবু দুরন্ত উপায় স্থির করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ শিবিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন; বাটীতে বিশেষ কার্য্য-ব্যগ্রতা জানাইয়া অবিলম্বে, সজ্জিত-শিবিকারোহণে যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে বাক্স হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া সঙ্গে লইলেন।

আজ একাদশী, বেলা ২৷৷০ প্রহর। বৈশাখ মাস রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া একটী সধবা, উপবাসিনী বিধবাকে বলিতেছে,—

"ঠাকুর-ঝি! তোমার কষ্ট হ'বে বলিয়া মা, তোমায় কাজ করিতে দিলেন না। আমি কিন্তু কতই বকাইতেছি! কি করিব ঠাকুর-ঝি! তিন দিন ঘুরিয়াও ত একটু সুযোগ পেলেম না যে, গোটা কয়েক কথা বুঝিয়া লই। এক কথায় আমার মনের দাবানল তুমি নিবাইয়াছ। আমি বুঝিয়াছি, তুমি উপদেশ না করিলে, এ পাপীয়সীর আর গতি নাই?"

বিধবা, সস্নেহে বলিলেন,—ছোট-বৌ! কষ্ট কি? মার মন,—তিনি ভাবেন, কাজ করিলে আমার কতই কষ্ট হয়! বিশেষত একাদশী-দিনে। তা তিনি অমন করিয়া বলিলেন;—মায়ের কথা ঠেলিতে পারিলাম না, ঘরে বসিয়া আছি। কিন্তু শুধু ঘরে বসিয়া থাকাতেই আমার অধিক কষ্ট। সে যা' হউক, তুমি আমাকে উপদেশ দিতে বলিতেছ,—আমি কি জানি যে উপদেশ দিব?

সধবা। তুমি যা জান, তাই জিজ্ঞাসা করিব।

বিধবা। বল।

সধবা। যৌবনে স্ত্রীলোকের হৃদয় পবিত্র ও কামনা নির্ম্মল থাকিতে পারে কিরূপে? ঠাকুর-ঝি! তুমি বিধবা, আর আমি সধবা; দুই দিন, দশদিনে, না হয়, মাসের মধ্যে স্বামিসহবাস এক-দিনও আমার ঘটিতে পারে;—বিশেষ চেষ্টা করিলে স্বামীর সঙ্গেও থাকিতে পারি; কিন্তু আমার সে অপেক্ষা সহিল না, দুষ্ট কামনার বশবর্ত্তিনী হইয়া কলুষ-হৃদয়ে ব্যভিচার-পাপে লিপ্ত হইতে উৎসুক হইয়াছিলাম। আর তুমি—তোমার স্বামিসহবাস চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তুমি সাবিত্রী,—তোমার স্বপ্নেও কথন ওরূপ দুষ্ট কামনা হয় না। তাই মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, হৃদয়ের পবিত্রতা, কামনার নৈর্ম্মল্য লাভ করা যায় কিরূপে?

বিধবা। আমার তুলনা তুলিতেছ কেন বৌ? আমি অতি পাপীয়সী। তবে তোমার প্রশ্নের উত্তর, আমি আপনার জ্ঞান-অনুসারে দিতেছি শ্রবণ কর। ভাই! মানুষের প্রবৃত্তি সুখের দিকে সুখের উপায়ের দিকে। যে ব্যক্তি যথার্থ সুখ কি, তাহা অবগত নহে, তাহার হৃদয় পবিত্র হয় না, কামনাও নির্ম্মল হয় না। সে, সুখ-ভ্রমে অভিভূত হইয়া দুষ্ট কামনার অধীন হয়,—হৃদয়ে কলুষরাশি সঞ্চয় করে। এই জন্য কাহার নাম সুখ, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা উচিত।

সধবা। ঠাকুরঝি! তোমার কথাটী বুঝিলামনা। সুখ ত আপনা-আপনিই বুঝা যায়। 'এইটা সুখ' 'এইটা দুঃখ' ইহা কি আর পরের কাছে শিখিতে হয়

বিধবা। সুখ দুঃখ, মনের অবস্থা-বিশেষ মাত্র। সেই টুকুর অনুভব, আপনা হইতেই হয়,—কাহারও নিকট শিখিতে হয় না। কিন্তু যথার্থ-সুখ কি, তাহা শিখিতে হয়। কাহারও মানুষ খুন করিলে সুখ হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃত সুখ নহে। চুরী করিতে পাইলে কাহারও সুখ হয়, তাহাও যথার্থ-সুখ নহে। এইজন্য যথার্থ সুখ কাহাকে বলে,—শিখিতে হয়। মনে কর, মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিলে যথার্থ-সুখ হয়; কিন্তু না শিখাইলে, নতন লোকে এ কার্য্যে সুখ আছে বলিয়া কি বুঝিতে পারে? তবে যাহার বাল্যাবধি সুসংস্কারে হৃদয় গঠিত, তাহার আর যথার্থ-সুখ কাহাকে বলে,—শিখিতে হয় না। কিন্তু সে সংস্কারের মূলেও শিক্ষা বর্ত্তমান। স্ত্রীজাতির সেই যথার্থ-সুখ হইল,—স্বামি সম্মিলনে।

সধবা। স্বামি-সম্মিলন ত প্রায় সবারই হয়।

বিধবা। তা হতে পারে—আমি বলিতে পারি না। কিন্তু স্বামি-সম্মিলন কাহাকে বলে—বলিতে পার,—

সধবা। কেন স্বামি-সহবাস?

বিধবা। না;—ঠিক তা নয়। স্বামি-সম্মিলন,—স্বামীর সহিত মিলিয়া থাকা। ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে,—স্বামী আর আপনি—এক। স্বামী—আত্মা আর আপনি—দেহ। স্বামীর কামনা ভিন্ন নিজের কোন কামনা থাকিবে না। স্বামীর প্রবৃত্তি ভিন্ন নিজের কোন প্রবৃত্তি থাকিবে না। স্বামী যাহা ভাল বাসেন, তাহাই করিবে। স্বামীর অস্তিত্বে আপনার অস্তিত্ব এবং স্বামীর অভাবে আপনারও অভাব বিবেচনা করিবে। ছোট-বৌ! বিধবার কোন কামনা নাই, কোন প্রবৃত্তি নাই। পরলোক-গত স্বামীর প্রীতি-সাধনার্থ ধর্ম্মকার্য্য করিবে। তবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, মানুষের কতরকম বিঘ্ন হইতে পারে,—কত কামনা, কত প্রবৃত্তি আসিতে পারে; এইজন্য আত্মকামনা-আত্মপ্রবৃত্তি-শূন্য হইয়া, নিরন্তর পরোপকারে, সংপ্রসঙ্গে ও নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্যে রত থাকিয়া সময়াতিপাত করা বিধবার কর্ত্তব্য। আর কর্ত্তব্য স্বামি-চিন্তা।

সধবা একেবারে নিষ্কাম বা প্রবৃত্তিশূন্যা নহে। স্বামি-কামনায় সধবার কামনা, স্বামি-প্রবৃত্তিতে সধবার প্রবৃত্তি। এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র কামনা বা প্রবৃত্তি যাহার থাকিল, সে-সধবার স্বামি-সম্মিলন হইল না।

এইরূপ স্বামি-সম্মিলিতা হও,—হৃদয় পবিত্র হইবে, কামনা নির্ম্মল হইবে।

পরস্পরের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

---

(৫)

শিবিকারূঢ় মোহিনীমোহন, রাত্রি ২টার সময়ে,কালিদাস চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মস্থলে বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। বন্ধুদ্বয়ের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল বটে,—আলুলায়িত-বসন নিদ্রাকষায়িত-লোচন কালিদাস, অনেক ডাকাডাকি,হাঁকাহাঁকির পর বাহির হইলেন বটে, কিন্তু বন্ধুর সমাদর করিলেন অত্যন্ত। মোহিনী-মোহন যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলেন। উঁহাদের

বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাসার ভিতর উভয়ে এক বিছানায় বসিলেন।

কালিদাস উদ্বিগ্নচিত্তে বলিলেন,—"এত রাত্রে যে বন্ধু!"

মোহিনী। রৌদ্রের সময়, রাত্রিতে গমনাগমনেই বেশ সুবিধা। নতুবা, তোমার কোন উদ্বেগ নাই। এবার বাসাটী একটু পরিষ্কার বোধ হইতেছেনা?

কালি। সেদিন মেরামত হইয়াছে।

মোহিনীবাবুর যথাসম্ভব জলযোগ, তমাকু-সেবন প্রভৃতি কার্য্য সমাধা হইল। বাহকেরা শয়নের প্রাঙ্গণ ও জল-খাবার পয়সা পাইল। মাষ্টার বাবুর ভৃত্য বাহিরে আসিল। দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া দুই বন্ধু একগৃহে শয়ন করিলেন। বাসা-বাটীতে পাঁচ খানি ঘর। এক এক ঘর, এক একজন শিক্ষকের। ঘরগুলি কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। মোহিনীমোহনের আগমন-ব্যাপারে সকল ঘরগুলিই বিশেষ রকম নিস্তব্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে কালিদাস ও মোহিনীমোহন, গৃহ-প্রবিষ্ট হইলে, ক্রমে কোন ঘরে এক-আধটু কাসির শব্দ, কোন ঘরে মশক-মারণ-তাল-শব্দ, কোন ঘরে বা অস্ফুট নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

শয়ন করিবার পূর্ব্বে কালিদাস, দীপ নির্ব্বাণ করিতে যাইতেছিলেন, মোহিনীমোহন বারণ করিলেন। শয়ন করিয়া উভয়ের গল্প আরম্ভ হইল। সামাজিক কুসংস্কার-বৃন্দ, পরাধীনতা, ভারতের দুর্গতি, ভারতে স্ত্রীজাতির অবনতি, জাতি-ভেদের অপকারিতা, বিধবার বৈধব্য-দুর্নীতি—এই সমস্ত বিষয় গল্পের অবলম্বন হইল। উন্নতির উপায় ও অবনতির প্রতিবিধানের উপায়-নির্দ্ধারণও এই সঙ্গে হইতে লাগিল। আদি, করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক রসের অভিনয়ও যে গল্পের মধ্যে না হইল, তাহা নহে। এইরূপে প্রায় ১ঘণ্টা অতীত হইল। এইবার মোহিনীমোহন, আরম্ভ করিলেন,—"বন্ধু! তোমায় আমায় কেবল দেহ ভিন্ন,—আত্মা মানি না বটে,—কিন্তু তুমি আমি একাত্মা; তাই মহাকষ্ট হইলেও, আমি অদ্য তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

"শ্রীমতী রামমণি, যেমন তোমার ভগিনী;—আমরও সেইরূপ ভগিনী। তাহার চরিত্র যদি কুলটা-কলঙ্কে কলুষিত হয়,—তাহার রমণী-হৃদয় যদি সমাজ বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিয়া, স্বাভাবিক যৌবন-বেগের বশবর্ত্তী হয়,—আর হায়! তাহার ফলে যদি সেই নিদারুণ নৃশংস ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেও সে অসঙ্কোচে হস্ত প্রসারণ করে, তাহা হইলে, হে বন্ধু! বল, তোমার কাণ্ডজ্ঞান-হীন পিতা, নিরেট মূর্খ জ্যেষ্ঠ, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রামমণিকে তপস্বিনী ভাবিয়া মৌনাবলম্বনে সময়াতিপাত করিতে পারেন;—কিন্তু তুমি আমি নিশ্চিন্ত থাকি কিরূপে?

"অল্পবয়স্কা রামমণির দোষ কি? নির্দ্দয় মূর্খ সমাজ, বুঝিতে পারে না,—এরূপ ঘটনা না ঘটাই বিচিত্র; পতিহীনা যুবতী, স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবে কিরূপে?"

কালি। (দুঃখের সহিত) বন্ধু! রামমণির চরিত্রে কি কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে?

মোহিনী। তাহা আমি বলিতেছি না; এখনও কলঙ্কস্পর্শ করুক বা না করুক, করিতে কতক্ষণ!

কালি। বন্ধু! আমাকে আর গোপন কর কেন? জানই ত আমি বহুদিন হইতেই বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। যদি বুঝিতে পারি,—রামমণি, গুপ্তভাবে আত্মক্লেশ-অপনয়নে চেষ্টাবতী হইয়াছে, তাহা হইলে, নিশ্চয় তাহার বিবাহ দিব। আমি প্রাণ থাকিতে ভ্রূণহত্যা করিতে দিব না। ইহাতে সমাজের বাধা মানিব না; পিতা-মাতার কথা শুনিব না। এই সৎকার্য্য করিয়া যদি "এক-ঘরে" হইতে হয়, সেও আমার শ্লাঘা!

মোহিনী। বন্ধু! তোমায় 'একঘরে' করে কাহার সাধ্য?

কালি। আমি বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি। বল, এখন রামমণির চরিত্র কেমন?

মোহিনীমোহন, কোন কথা না কহিয়া, পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। কালিদাস, আলোকের নিকট গিয়া পত্রখানি পড়িলেন। পড়িয়া বুঝিলেন,—কোন পতিহীনা রমণী, কোন গুপ্ত নায়ককে এই পত্র খানি দিতেছে। পত্রে নাম-স্বাক্ষর নাই। কিন্তু হাতের লেখাটা রামমণির ন্যায়ই বোধ হইল। সেই শ্রীছাঁদ-হীন আঁকাবাঁকা, উচ্চনীচ, বেয়াড়া অক্ষর—দেখিয়াই রামমণির বলিয়া বুঝিলেন। বাল্যকালে, কালিদাস, ভগিনীকে যখন লেখাপড়া শিক্ষা করাইতেন,—রামমণির তখনকার অক্ষর, আর এই পত্রের অক্ষর—তুলনা করিয়া এক বলি-

য়াই স্থির হইল। চর্চ্চা না থাকায়, অক্ষর আর ভাল হয় নাই,—ইহাও কালিদাস, তর্ক দ্বারা স্থির করিলেন।

অবশেষে কালিদাসের অনুরোধে মোহিনী-মোহন, যেন ইহাও অগত্যা বলিলেন,—"আমার এক নবাগত যুবা কর্ম্মচারীকে, রামমণি, এই চিঠি খানি তোমার ঘরের জানালা দিয়া ছুড়িয়া দিয়াছেন,—এমন সময় দৈবক্রমে আমি তথায় উপস্থিত হই। আমাকে দেখিয়া দুই-জনেই দুই দিকে পলায়ন করে। অদ্য দুই প্রহর বেলায় এই ঘটনা ঘটে।

কালি। আর কোন কথা কহিলেন না। স্থির বিশ্বাস করিলেন,—রামমণি, অরক্ষণীয়া হই-য়াছে। পরে উভয় বন্ধুই রামমণির বিধবা-বিবাহ দেওয়া সাব্যস্থ করিয়া একটু চুপ করিলেন।

ক্ষণপরে মোহিনী বাবু একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—"বিবাহ দিবে কিরূপে? সহজভাবে বিবাহ দিবার অধিকার ত তোমার নাই? তোমার পিতা-মাতার মত না হইলে, বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। এ বিবাহে রামমণির মত সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু সে যদি নিতান্ত দুশ্চরিত্রা হয়, তবুও পিতা-মাতার ভয়ে, লোক-লজ্জার ভয়ে, কখনই মুখে, সর্ব্বসাক্ষাতে ইহাতে সম্মতি দিবে না। পিতা-মাতা ত কদাচ সম্মত হইবেন না। সুতরাং উপায় কি?

কালি। তাহার ভাবনা নাই। আমি প্রকারান্তরে যখন বুঝিতেছি,—রামমণি, বিবাহ হইলে, সর্ব্বতোভাবে সুখিনী হইবে; যখন বুঝিতেছি,—মুখে, সে বলুক, না বলুক, বিবাহের প্রস্তাবে, মনে মনে বিশেষ আনন্দের সহিত সম্মতি দিবে;—তখন, আমি ভাই! কোনরূপে ছলে-বলে-কৌশলে, তাহাকে পিতা-মাতার করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইব। সে সময়ে বন্ধু! তোমায় অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে।

মোহিনী। অতি উত্তম কল্প। আমি যথা-সাধ্য বা তদধিক সাহায্য করিব ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিলম্ব করিও না। কি জানি, গর্ভসঞ্চারও ত শীঘ্র হইতে পারে।

কালি। আমি কল্যই একমাস কাল 'উইদ আউটপে' ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিয়া, সেক্রে-টারীর মত লইয়া চলিয়া যাইব। গিয়াই সমুদয় বন্দোবস্ত করা যাইবে। দুই দিনের মধ্যেই রামমণিকে কোনক্রমে যাহাতে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে।

আর কোন কথা হইল না। উভয়েই নীরবে শয়ন করিয়া রহিলেন। 'মোহিনী নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা গেলেন। কালিদাস, প্রাতঃকালে উঠি-য়াই, বন্ধুর নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া ছুটীর বন্দোবস্ত ও শিবিকার জন্য সেক্রেটারীর বাটী গেলেন। সেক্রেটারী, সেই গ্রামের জমীদার।

সব সুবিধা হইল। বেলা ৩৷৷০ টার সময় দুই বন্ধু, শুভকার্য্যোদ্দেশে নিজ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

---

(৬)

দুই জনেই এক পথে চলিয়াছেন, কিন্তু দুই জনের মন, দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে।

মোহিনীমোহন, আনন্দে উৎফুল্ল। তাঁহার কূটনীতি ফলবতী হইয়াছে। তিনি ভাবিতে-ছেন,—দুর্ব্বৃত্তা রামমণির শাসন, এই কার্য্যে যথেষ্ট হইবে। বসন্তেরও সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে। কালিদাস, যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক, তাহাতে সে ভগিনীর বিধবাবিবাহ অবশ্যই দিবে: তাহার ফলে, কালিদাসকে সমাজচ্যুত ও সংসার হইতে পৃথক্ হইতে হইবে। বসন্ত ত স্বামীর নিকটে অবশ্যই থাকিবে। কালিদাসের পিতা-মাতা, বসন্তকে রাখিবে না; সে যন্ত্রণাময় স্থানে বসন্তও থাকিবে না। সুতরাং কালিদাসের সঙ্গেই আসিবে। তখন আমি কালিদাসকে ত্যাগ করিব কি না? না;—পারিব না;—বসন্তের সহিত একে-বারে নিঃসম্পর্ক হইতে পারিব না। এক-দিনের জন্যও যদি পিপাসা মিটিত, তাহা হইলে, আমার মনোভাব আজ কিরূপ হইত বলা যায় না। লোকে বলে বটে,—অধিক দিন সংসর্গে ভালবাসা গাঢ় হয়; আমার কিন্তু তাহা ঘোর মিথ্যা বোধ হয়। কাছে আসে-আসে,—আসি-তেছে না; ধরা দেয়-দেয়,—দিতেছে না, এই পাই-পাই—পাইতেছি না সেই অবস্থাই ভাল-বাসার চরমাবস্থা। প্রথম প্রাপ্তি হইতেই ভাল-বাসার পতন আরম্ভ হয়; কাহারও বা কিছু দিন 'থমথমে' থাকে, তার পরেই পতন। বসন্তের প্রতি আমার এখন ভালবাসা,—অসীম, অগাধ;

বসন্তের প্রতি ভালবাসার অনুরোধেই আমি বসন্তপতি কালিদাসকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তবে, রামধন শীল, নবীন সাহা,—ইহাদিগের সঙ্গে যেরূপ গোপনে ভোজ্যান্নতা আছে, কালিদাসের সঙ্গে সেইরূপই থাকিবে। প্রকাশ্যে রাখিতে পারিব না।”

এদিকে কালিদাস ভাবিতেছেন,—“গত বৎসর একদিন আমি, রামমণিকে কতই বুঝাইলাম,—বিবাহ করিবার জন্য কত অনুরোধ করিলাম, কায়িক ও মানসিক ক্লেশে নিপীড়িত হইবার অনাবশ্যকতা বুঝাইলাম;—কিন্তু সে যেন আর সহ্য করিতে পারিল না—তাহার মুখের ভাব যেন কি রকম হইল; তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। তাহার তৎকালীন মুখের ভাব এখনও মনে হইলে আমার ভীতি-সঞ্চার হয়। সেই পর্য্যন্ত রামমণি আমার সঙ্গে কথা কহে না। আমি ভাবি,—রামমণি বড় বোকা আপনার দুঃখ বুঝে না। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র এই রকম বোকা স্ত্রীলোকদিগের নিকট প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে।

“হায়! সেই রামমণি—পাপে ডুবিল, কুলটা হইল,—তবু বিবাহ করিল না!! যাহা সমুদয় সভ্য-দেশের অনুমোদিত, সমুদয় সভ্য-জাতির স্বীকৃত, সেই পত্যন্তর-গ্রহণ অকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিল, আর ব্যভিচারকে কর্ত্তব্যবোধে আলিঙ্গন করিল!!! ইহাতে কিন্তু দোষী—সমাজ, দোষী—পিতামাতা। পিতাকে এই সব কথা বুঝাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তিনি নিতান্ত অবুঝ, নিতান্ত “গোঁড়া”—কিছুই বুঝিবেন না; লাভের মধ্যে আমার হয় ত প্রহার লাভ হইবে! তাঁহাকে কিছুই বলিব না। একবার রামমণিকে সব বলিব। সে যদি এখনও বিবাহে মত করে, তবু আমার হৃদয় শীতল হইবে। নচেৎ তাহার স্বাধীনতাতেও আমাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে;—ব্যভিচারের প্রশ্রয় আমি কদাচ দিব না।”

দুই খানি শিবিকা দেখিয়া, কোন কোন গ্রামের বালক ও বনিতাগণ, ‘বর-কনে’ ভাবিয়া বন্ধুদ্বয়ের চিন্তাস্রোত মধ্যে মধ্যে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতে আর তাঁহাদিগকে সে উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই। বাহক-বিশ্রাম, তমাকু-সেবন, অধিক গল্প, চিন্তা, নিদ্রা এবং বাহকদিগের গুন-গুন-স্বর সুন্দর ‘শালা বড় ভারি’ ইত্যাদি সুশ্রাব্য বচনাবলী শ্রবণ—এই ষড়্‌বিধ ব্যাপারে দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত হইল।

রাত্রি ১১৷৷০ টার সময় মোহিনী বাবুর বাটীর সম্মুখে শিবিকা উপস্থিত সেই স্থানেই শিবিকা হইতে উভয়ে অবতরণ করিলেন মোহিনী বাবুর আদেশমত উভয়-শিবিকাবাহকগণই এক স্থানে আশ্রয় পাইল।

বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া, মোহিনীমোহনের অন্তঃপুরচর বৃদ্ধভৃত্য বিষণ্ণ-মুখে দ্রুতপদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু কালিদাসকে দেখিয়া, কোন কথা বলিল না,—প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িল। কালিদাস ও মোহিনীমোহন, রামমণি-ঘটিত কথা কিঞ্চিৎ কহিয়া, নিশোচিত সম্ভাষণানন্তর স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

(৭)

কালিদাসের আহারাদি সমাপন হইয়াছে। তিনি নিজ শয়ন-গৃহে গিয়া চিন্তা ও বিশ্রাম করিতেছেন। নিদ্রা, নয়নের কাছে আসিবে-আসিবে করিতেছে, কিন্তু আসে নাই।

এমন সময়ে একজন আসিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিল। তিনি সবিস্ময়ে বুঝিলেন,—তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী বসন্তকুমারী। কালিদাস তৎক্ষণাৎ উঠিয়া, আদরের সহিত তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বসন্ত একটু সরিয়া গেলেন এবং বলিলেন,—“প্রভো! আমার সকল অপরাধ, সকল পাপ, সকল দোষ মার্জ্জনা কর। আমি মহাপাপিনী; তুমি দয়া না করিলে, আমার নিস্তার নাই। পাপক্ষয় হইবে বলিয়া তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়াছি; কিন্তু আমি তোমার আদরের যোগ্যা নহি। আমি অবিশ্বাসিনী, অত্যাচারিণী—”বসন্ত আর বলিতে পারিলেন না; বাষ্পগদ্গদ স্বর, বাষ্পাধিক্যে একেবারে রুদ্ধ হইল।

কালিদাস বিস্মিত, চিন্তিত এবং নিতান্ত দুঃখিত ভাবে ভগ্ন-হৃদয়ে বলিলেন,—“কি করিয়াছ বসন্ত! আমি ত কিছু জানি না।”

বসন্ত, একটু পরে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভগ্নস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“কুক্ষণে মোহিনী বাবুর পরিবারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল,

কুক্ষণে তাহার নিকট আমার যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার ভাবে, তাহার কথায়, তাহার আচরণে এবং তাহার সংসর্গে আমার হৃদয়,পাপে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার ন্যায় আমিও বুঝিয়াছিলাম,—যেন-তেন-প্রকারেণ সুখভোগ করাই মানুষের কর্ত্তব্য। একটা দুষ্প্রবৃত্তি-চরিতার্থ তাই চরম সুখ। আপনার সুখের জন্যই স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে হয়; স্বামী হইতে যদি আপনার সুখের ব্যাঘাত হয়, তবে সে স্বামীকে পরিত্যাগ করাও যাইতে পারে। 'স্বামী যাহাদের প্রবাসে থাকে, কখনও দুই একদিনের জন্য আসে,—সেই সব কামিনী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যশালিনী। তাহারা যথেচ্ছভাবে আত্মসুখ সম্পাদন করিতে পারে ও দুই একদিনের জন্য স্বামীর মনোরঞ্জনও করিতে পারে।"—মোহিনী বাবুর স্ত্রী, এই কথা বলিয়া আমাকে সৌভাগ্যশালিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই সৌভাগ্যের মর্ম্ম আমি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু গত কয়েক দিন বেশ বুঝিতেছিলাম,—আমি সৌভাগ্যবতী!"

দারুণ অনুতাপে বসন্তকুমারীর মুখ বিবর্ণ হইল। চক্ষু হইতে অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল। একটু চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেব! মোহিনীমোহন তোমার প্রিয়তম বন্ধু, আর আমি তোমার প্রিয়তমা পত্নী; সেই বন্ধু আর এই পত্নী—উভয়ে তোমার প্রীতির প্রতিদানে উদ্যত হইয়াছিল। মোহিনীমোহনের চেষ্টা ও আমার চাঞ্চল্য এক পাপ-পথে ধাবিত হইয়াছিল। পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য উভয়েই ব্যগ্র ছিলাম। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই—ধর্ম্মময়ী, ধর্ম্মপ্রাণ ঠাকুর-ঝির প্রসাদে। তাঁহার প্রভাবে, তাঁহার উপদেশে আমার সে পাপ-বাসনা দূর হইয়াছে।"—বলিয়া, কিরূপে যে তাঁহার চৈতন্য হইল, সেই সব কাহিনী বসন্তকুমারী আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। অবশেষে যোড়হাত করিয়া অতি কাতরতার সহিত বলিলেন,—"দেব! তুমি আমার ঈশ্বর। তুমি ক্ষমা করিলে, আমার হৃদয় পূর্ণ শান্তি লাভ করে।"

কালিদাস সব শুনিলেন,—একাগ্রহৃদয়ে শুনিলেন,কিন্তু ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার পূর্ব্বের কল্পনা ও উপস্থিত ঘটনা মনোমধ্যে একত্র হইল। সবই যেন ধূমাকার,—স্পষ্ট লক্ষ্য কিছুই হইল না। তথাপি পত্নীর কাতরতায়, তাঁহাকে বলিলেন,—"ক্ষমা করিলাম, তুমি শয়ন কর।"

বসন্ত, স্বামীর মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেদিন আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বামীর আদেশমত শয়ন করিলেন।

কালিদাস, ভাবিতে লাগিলেন,—"বন্ধু মোহিনীমোহনের এই কাজ! ইহা কি কখন সম্ভব হয়? না হইলেই বা বসন্ত ঐরূপ বলিবে কেন?

"রামমণির লিখিত প্রণয়পত্র আমি মোহিনীমোহনের নিকট দেখিয়াছি। বুঝিয়াছি, প্রমাণ পাইয়াছি,—রামমণি কুলটা। এদিকে বসন্তের নিকট যাহা শুনিতেছি, তাহাতে রামমণিকে ত মনুষ্য বলিতে ইচ্ছা হয় না। রামমণি,—দেবী। সে, যেরূপ উপদেশ দিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমার পর্য্যন্ত জ্ঞানোদয় হইয়াছে, হিন্দু-ধর্ম্মের উপর ভক্তি হইয়াছে। বিধবা ব্রহ্মচারিণীকে পূজা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ব্যাপার খানা কি? এই প্রহেলিকাময় রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইব কিরূপে?

"তবে একি রামমণির দুষ্ট-বুদ্ধির কৌশল? মোহিনীমোহন, তাহার পত্র-দেওয়া দেখেন, সে কথা আমার নিকটেও অবশ্য তিনি গল্প করিবেন, —এই ভাবিয়া রামমণিই কি মোহিনীমোহনকে আমার নিকট অবিশ্বাসী প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোমলপ্রাণা বসন্তকে কোন রূপে হস্তগত করিয়াছে। না,—এরূপ ভাবিতেও যেন ভয় হইতেছে, উদ্বেগ হইতেছে। আর আমার এরূপ আশঙ্কাও অমূলক;—আপনার দোষ স্বামীর নিকট নিজমুখে ব্যক্ত করা পরের প্ররোচনায় হয় না। বসন্ত, হাজার কোমলা হউক, হাজার অপরিণাম-দর্শিনী হউক, পরের জন্য মিথ্যা-দোষ আপনার স্কন্ধে লইয়া স্বামীর নিকট অপরাধিনী হইতে কখনই সে স্বীকার করিত না। তবে কি রামমণি নিজে কুলটা হইলেও আমার পত্নীকে প্রকৃতই,অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে; তাহার আপনার মনে যাহাই থাক, মৌখিক সদুপদেশদানে বসন্তকুমারীকে সৎপথে আনিয়াছে। এইরূপই কি হইবে? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

চিন্তার পর চিন্তা, তরঙ্গের পর তরঙ্গ; কালিদাসের হৃদয়-সাগর বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কালিদাসের চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

(৮)

বেলা ৮টা। কালিদাসের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। অবসন্ন-শরীরে, প্রত্যূষে নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। এখন নিদ্রাভঙ্গ হইল। কালিদাসের হৃদয়ে আবার ঝড় বহিতে লাগিল। ঘরের বাহিরে আসিলেন। শান্তি নাই, স্বস্তি নাই,—শূন্য মনে এ-দিক ও-দিক বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সময়ে কালিদাসের জ্যেষ্ঠ আসিয়া, তাঁহার হস্তে একখানা পত্র দিয়া বলিলেন,—"মোহিনী বাবুর বৃদ্ধ-ভৃত্য এই পত্র খানি, প্রাতঃকালে তোমাকে দিতে আসিয়াছিল; তোমার দেখা না পাইয়া আমার নিকট দিয়া গিয়াছে।" কালিদাস পত্র লইয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিবিধ চিন্তার সঙ্গে পত্রের আবরণ উন্মোচন পুরঃসর পড়িতে লাগিলেন,—

"প্রিয় বন্ধু!—অথবা তোমাকে বন্ধু বলিবার উপযুক্ত আমি নহি। আমি ঘোর পাপী, ঘোরতর দুরাচার,—আমি উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছি। এই শেষ পত্র খানিতে সংক্ষেপে আমার দুরাচার ও প্রতিফলের কথা লিখিত হইল।

"আমি তোমার পত্নী শ্রীমতী বসন্তকুমারীর চঞ্চল হৃদয় কলুষিত করিয়াছি, কিন্তু শরীর কলুষিত করিতে পারি নাই। না পারিবার কারণ,—তোমার ভগিনী রামমণি দেবী। এই সূত্রে রামমণির উপর আমার দারুণ আক্রোশ জন্মে। আমার ঠিক বিশ্বাস হইল,—বসন্তকে পাইলাম না,—রামমণির জন্য; বসন্ত ঘোর নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে, রামমণির জন্য; আমাকে বন্ধুর নিকট অবিশ্বাসী হইতে হইল,—রামমণির জন্য; বন্ধু-বিচ্ছেদ ও আমার বন্ধুর নিকট মুখ দেখান ভার হইল,—রামমণির জন্য। অতএব রামমণিকে ইহার প্রতিফল দিবার ও বন্ধুর নিকট বিশ্বাসী থাকিবার উপায় স্থির করিলাম। প্রথম উদ্দেশ্য হইল,—রামমণিকে তোমার সাহায্যে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা। তাহার পর আমি হস্তগত করিতে পারি—ভালই, না হয়, যাহা হয় হইবে। রামমণির দুশ্চরিত্রতা-প্রকাশক যে পত্রখানি তোমাকে দেখাইয়াছিলাম ও যে কথাগুলি বলিয়াছিলাম, তাহাই আমার দুরভিসন্ধি-সাধক অমোঘ উপায়। ফলে সে পত্রের বা সে দুষ্কার্য্যের বিন্দু-বিসর্গও রামমণি জানেন না। আমি একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম,—"যাহাদের লিখিতে অভ্যাস নাই, তাহাদের লেখা ও আমাদের বাম-হাতের লেখা এক রকম হয়" আর তোমার মুখে শুনিয়াছিলাম,—"বহুযত্নেও রামমণি লেখাপড়ায় উপযুক্ত হয় নাই; সামান্য রূপ লিখিতে পারিত মাত্র, বিধবা হইয়া তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছে"—পুস্তকের লেখা ও তোমার কথা চিন্তা করিয়া বাম হাতে ঐ পত্র খানি আমি লিখি। রামমণির অকার্য্যের প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস যাহাতে জন্মে এবং ভবিষ্যতে রামমণির মুখে বা তাহার প্রচারিত আমার নিন্দা অর্থাৎ বসন্তের প্রতি আমার অসদ্ব্যবহারের কথা ও বসন্তের লাঞ্ছনা-নিন্দার কথা শুনিয়াও তুমি যাহাতে রামমণির কথামত বিশ্বাস না কর, বরং রামমণিকেই সমধিক দুশ্চরিত্রা বলিয়া বোধ কর,—তাহারই জন্য তোমাকে এই ভাবে বলিয়াছিলাম যে, 'আমি রামমণির পত্র দেওয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও রামমণিও তাহা জানিতে পারিয়াছে।'

"এসব দুর্নীতি ফলবতী হইয়াছিল। তোমাকে সম্পূর্ণ উত্তেজিত করিতে পারিয়াছিলাম। এক জন বিচারকর্ত্তা না থাকিলে, বিধবা রামমণির দুর্দ্দশার একশেষ হইত। কিন্তু বিচারক, সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন,—এই পাপাচারীকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিয়াছেন। আমি যে রাত্রিতে সতী পরনারীকে কুলত্যাগিনী করিতে সচেষ্ট হইয়া তোমার নিকট গমন করি—সেই রাত্রেই আমার পত্নী, সমুদায় নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া একজন দ্বারবানের সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দুইজন পরিচারিকাও তাহার অনুগমন করিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়াও কোন ফল হয় নাই। ভালই হইয়াছে, আমার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে।

"শেষে একটী কথা বলিয়া রাখি, শ্রীমতী বসন্তকুমারীর নিকট অবশ্য তুমি কিছুই জ্ঞাত হও নাই, কিন্তু তা না হও আমার পত্রে ত সব বুঝিলে। এখন তাহার হৃদয় সংশোধনে তুমি যত্ন করিবে। সর্ব্বদা সতী রামমণির সহবাসে রাখিবে। হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান হইবে। রামমণির বিধবা-বিবাহের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবে। আমি শিক্ষা পাইয়া বুঝিয়াছি, রামমণি প্রকৃতই সতী, বিধবার ধর্ম্ম অতুলনীয়।

"ইচ্ছা হইতেছে, বন্ধু! তোমার নিকট একবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে; কিন্তু না, ক্ষমা করিও না। আমি ক্ষমার পাত্র নহি। ইহপরলোকের যত যন্ত্রণা আছে তৎ সমুদয় ভোগ না করিলে, আমার পাপ শেষ হইবে না। বন্ধু! চিরদিনের জন্য বিদায়।" ইতি

দুর্বৃত্ত মোহিনী-মোহন।

কালিদাস পত্র পাঠ করিয়া অবাক হইলেন

মোহিনী বাবু তদবধি নিরুদ্দেশ।

বসন্তকুমারী এখনও আছে। রামমণি স্বর্গে গিয়াছেন। বসন্তকুমারীর ন্যায় রমণী সংসারে এখনও দুর্লভ। আমরা দেখিয়া শুনিয়া এই কথা বলিতেছি।

মা ব্রহ্মচারিণি! হিন্দু-সংসার-পবিত্রতা-বিধায়িনি! ধর্ম্মমূর্ত্তি! হিন্দু বিধবে! তুমি দেবী না মানবী? তুমি স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী, না—পৃথিবীবিহারিণী? বুঝিতে পারিনা মা! আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার স্বরূপ, প্রভাব ও তেজ বুঝিতে সক্ষম হই।

সব বুঝিলাম, কিন্তু কি কথাটী বলিয়া যে রামমণি, বসন্তকুমারীর হৃদয়স্থিত দাবানল নিবাইয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। পাঠকগণ অনুসন্ধান করুন।

বিলাতযাত্রা নিষেধ।

হিন্দুদিগের বিলাত-গমন-সম্বন্ধী প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থার উপর দোষারোপ-অভিপ্রায়ে গত ২১শে চৈত্র তারিখে অহিন্দু-ভাবাপন্ন কোন এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর।

প্রতিবাদী স্মৃতিভূষণ মহাশয় প্রশ্নচ্ছলে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, ঐ প্রতিবাদটী চপলতাময়। ধর্ম্মসম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ গম্ভীর-ভাবে হওয়াই উচিত। কিন্তু এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়েরা বিচারকালে ক্রোধ-পরবশ হইয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও সময়ে সময়ে কটুবাক্য প্রয়োগও করিয়া থাকেন—ইহা প্রায় দেখা যায়। প্রতিবাদী মহাশয় যখন "স্মৃতিভূষণ" উপাধিধারী, তখন তিনিও একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হইবেন; সুতরাং এ প্রতিবাদে ক্রোধসূচক বর্ণগুলি দোষ বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। বিশেষতঃ প্রতিবাদী মহাশয় অনেকেরই পরিচিত নহেন; তাহাতে বোধ হয়, তিনি অল্পবয়স্ক হইবেন সন্দেহ নাই। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে ত ঔদ্ধত্য, চপলতা, ক্রোধ—এ গুলি ভূষণস্বরূপ।

নবদ্বীপাধিপতির সভায় নবদ্বীপ-প্রদেশীয় অধ্যাপক-সমুদায় এই ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা-পূর্ব্বক সকলেই তাদৃশ বিলাতগামীদিগের প্রায়শ্চিত্তার্হতা ও অব্যবহার্য্যতা নিশ্চয় করিয়া ব্যবস্থা-পত্রিকাখানি রচনা করিবার ভার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের উপর অর্পণ করেন ও ব্যবস্থাপত্র লিখিত হইলে, দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া সম্মতিপূর্ব্বক স্বাক্ষর করেন। যখন স্বাক্ষর করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বলা উচিত নহে যে "এ ব্যবস্থা আমার সঙ্কলিত নহে।" যাহা হউক, ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় নিজের সঙ্কলিত বলিয়াই স্বীকার করেন ও প্রশ্নের উত্তর দিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্রবর্গ থাকিতে এ সম্বন্ধে তাঁহার লেখনী ধারণ করার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আমিই ইহার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। চপলতা অনেক রকম জানা আছে, কিন্তু "ধর্ম্মশাস্ত্র-বিচারে চপলতা প্রকাশ করা উচিত নহে" এই গুরূপদেশ লঙ্ঘন করিলাম না।

এক-নৌকায় জবনাদির পাক ও ব্রাহ্মণাদির পাক হইলে, ব্রাহ্মণাদির পাক, জবনাদি-পাক-সঙ্কীর্ণ হয় কিনা,—এই বিষয়টী প্রতিবাদী মহাশয়কে বুঝাইতে হইলে, সঙ্কর শব্দের অর্থ বিবেচনা করা আবশ্যক। 'সঙ্কর' পদার্থ নিরূপিত হইলেই সঙ্কীর্ণ হইল কিনা—বুঝিতে পারিবেন।

যে দুইটী পদার্থ পরস্পরের অনধিকরণে বিদ্যমান থাকে, ঐ দুই পদার্থের যদি কোনস্থলে একাধিকরণে বিদ্যমানতা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সঙ্কর বলা যায়। যেমন জাতি-সঙ্কর। ভূতত্ব ধর্ম্ম ও মূর্ত্তত্ব ধর্ম্ম,—এই দুইটী ধর্ম্ম পরস্পরের অনধিকরণে থাকে; কিন্তু পৃথি-

...াদিতে ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব—উভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান থাকায় ঐ দুই পদার্থের জাতিত্ব স্বীকার করিলে জাতিসঙ্কর হয়। যেমন বর্ণসঙ্কর—কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, তিনি ক্ষত্রিয় নহেন। কেহ ক্ষত্রিয়, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যদি কোন ব্যক্তির কতক অবয়ব ব্রাহ্মণ হইতে, কতক অবয়ব ক্ষত্রিয় হইতে হয়, তবে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলা যায়। এবং যেমন রোগসঙ্কর; যে দুইটী রোগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদিত হয়, ঐ রোগদ্বয় যদি একপ্রকারে এক সময়ে উদ্ভূত হয়, তবে তাহাকে রোগসঙ্কর বলিয়া থাকে। ইহা দ্বারা নিশ্চিত হইল যে, যে পদার্থদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে ...কোই স্বভাব, তাহাদিগের যদি কোন স্থলে ...কাধিকরণে স্থিতি দেখা যায়, তবেই উভয়ের ...র বলিতে হইবে। অতএব চাণ্ডাল-সঙ্কর-প্রসঙ্গে মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন, যথা ;—

অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্‌যস্য বেশ্মনি।
...দ জ্ঞাত্বা তু কালেন কুর্য্যাৎ তত্র বিশোধনম্‌॥

এই বাক্যটী দ্বারা যে চাণ্ডাল-সঙ্কর নিরূপিত হইয়াছে, তাহা "চাণ্ডাল-সঙ্করে আপস্তম্বঃ" এইরূপ লিখিয়া শূলপাণি এই বচনটী উদ্ধার ...াতেই নিশ্চিত হইতেছে। যদি এরূপ হইল, তবে যে স্থলে এক গৃহে বা নৌকায় ম্লেচ্ছ-জবনাদির পাক ও ব্রাহ্মণাদির পাক হয়, সে স্থলে ব্রাহ্মণাদির পাক ম্লেচ্ছ-জবনাদির পাকের সহিত সঙ্কর-দোষ-যুক্ত হওয়ায় "ম্লেচ্ছ-জবনাদি পাক-সঙ্কীর্ণ"-পদবাচ্য অবশ্যই হইবে।

"পাতকি-পাক-সঙ্কীর্ণ-পাকান্ন-ভোজনে" এই প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকের পাঠটী ব্যাখ্য করিবার সময়ে গোবিন্দানন্দ, "পাতকি-পাক-পাত্রসংস্পৃষ্ট-নিজ-...কপাত্রান্ন-ভোজনে" এইরূপ যে লিখিয়াছেন, তাহা মূলের কোন বর্ণ দ্বারাই পাওয়া যায় না। "পাতকি-পাকের সহিত সঙ্কীর্ণ যে পাক, তদন্ন-ভোজনে" ইহাই মূলের বর্ণকয়েকটী দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং স্বকপোল-কল্পিত তাদৃশ অর্থ কোন প্রকারে আদৃত হইতে পারে না। ... গোবিন্দানন্দ, "সঙ্করিণো মূলপাপকর্ত্তৃত্বেন" এই মূল-ব্যাখ্যান স্থলে "সঙ্করিণঃ চাণ্ডালেন সহাজ্ঞানাদেকগৃহবাসিনঃ" এইরূপ লিখিয়াছেন ; "চাণ্ডাল-সঙ্করে ব্যাসঃ" এই অংশের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে "চাণ্ডাল-সঙ্করে চাণ্ডালেন সহাজ্ঞানাদেকগৃহবাসে" এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে,—সঙ্কর পদার্থ যে, উভয়ের একাধিকরণে কাদাচিৎক স্থিতি, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। অতএব তদ্বিপরীত স্থানান্তরীয় ব্যাখ্যাটী স্ববাক্য-বিরুদ্ধ বলিয়া সকলেরই অনাদরণীয়। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তাহার আদর করেন নাই বলিয়া কেন প্রত্যবায়ী হইবেন ?

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, "সমুদ্রযানে বিলাত-যাতায়াত করিতে দেড়মাস কাল লাগে" এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়া প্রতিবাদী মহাশয় ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়কে ঠাট্টা করিয়াছেন,—"মহাশয় কি কখন বিলাত গমন করিয়াছিলেন ?"

এই বাক্যটী আত্মবিস্মৃতের ন্যায় অভিহিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং যে ন্যূনকালে বিলাত যাওয়া প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনিই কি কখন স্বয়ং গিয়াছিলেন ?—ইহা ত বোধ হয় না। "স্মৃতিভূষণ" উপাধিধারীরা বিলাত-যাতায়াত করিয়াছেন,—এরূপ সভ্যতা এতদিন প্রচারিত হয় নাই। তবে কিরূপে "ন্যূনকালে যাতায়াত হয়" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন ? ফলতঃ যে কোন বিষয় মানিতে হইলে, সকল বিষয়েরই স্বয়ং দেখা আবশ্যক—এরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় সামান্য সামান্য লোকেও করে না। সকলেই জানেন, অধিকাংশ বিষয়ই অনুমান ও শব্দপ্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। কেবল তাদৃশ সিদ্ধান্ত প্রচলিত থাকিলে, যে ব্যক্তি মাতার একমাত্র সন্তান, সে মাতার প্রসব কখনই মানিত না,—"মম মাতা বন্ধ্যা" স্থির-নিশ্চয় করিত। ফলতঃ ঠাট্টাটী যথাস্থানে লাগাইতে পারেন নাই। "বিলাত-যাতায়াতে দেড় মাস কাল লাগে" অনেকেই এরূপ বলিয়া থাকেন ; ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তদনুসারেই লিখিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি তাড়াতাড়ি যাইয়া ২।৪ দিন কমাইতে পারেন, তাঁহার সেই কয়েক দিনের সমুদ্রযানে ভোজনের পাপ কমিবে ও প্রায়শ্চিত্তও কিছু অল্প হইবে ; তাহাতে আমাদিগের ক্ষতি কি ?

আর এক কথা বলিয়াছেন,—"নৌকায় গমন করিলে প্রত্যহ প্রতিনিয়ত দুইবার ভোজন করিতে হয়, ইহাই বা কিরূপে স্থির করিলেন ?"

এ জিজ্ঞাসাটী প্রতিবাদী মহাশয়ের সমুচিত হয় নাই। তাঁহার উপাধি দ্বারা প্রতীত হইতেছে,—তিনি স্মৃতিশাস্ত্র পড়িয়াছেন। তবে কেন—

"মুনিভির্দ্বিরশনমুক্তংবিপ্রাণাংমর্ত্তবাসিনাং নিত্যম্ অহর্নিচ তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রহরৈকযামান্তঃ।"

এই কাত্যায়ন-বচনটী দেখিলেন না? যেমন "নিত্যোপবাসী যো মর্ত্ত্যঃ সায়ং প্রাতর্ভুর্জিক্রিয়াম্ সন্ত্যজেন্মতিমান্ বিপ্রঃ সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।" এই বচনে 'মর্ত্ত্য'পদের উপাদান করায় মনুষ্য মাত্রেরই একাদশীব্রতে অধিকার,—'বিপ্র'পদের কীর্ত্তন কেবল বিপ্রের পক্ষে আবশ্যকতা-প্রতিপাদনের নিমিত্ত; তদ্রূপ এ বচনেও 'মর্ত্তবাসিনাং' এই পদ দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই ভোজন দ্বয়ের কাল নিয়মিত হইয়াছে; 'বিপ্র'পদ প্রয়োগ কেবল বিপ্রের পক্ষে নিয়মের আবশ্যকতা-জ্ঞাপনার্থ বলিতে হইবে। এইরূপে যদি সকল বর্ণেরই দ্বিরাহার শাস্ত্রীয় হইল, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষেও প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষে চতুর্থকালে ভোজনের বিধান সঙ্গত হইল। যদি ক্ষত্রিয়াদির প্রাত্যহিক ভোজনে সংখ্যা-বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিত, তাহা হইলে 'চতুর্থকালে ভোজন করিবে' এরূপ বিধি তাহাদের পক্ষে হইতে পারিত না। যাহার পক্ষে একদিনে ৪।৫বার ভোজন করারও সম্ভব আছে—কোন নিয়ম নাই, তাহার পক্ষে ভোজনের চতুর্থকাল বলিয়া কোন কাল-বিশেষ ধরিতে পারা যায় না। অতএব যখন হিন্দুদিগের দ্বিরাহার করা শাস্ত্রীয় ও ব্যবহার-সিদ্ধ, তখন সাহজিক বলিয়া প্রত্যহ দুইবার ভোজন করা কোন রূপে অসঙ্গত হয় না। তবে যদি কাহারও রোগাদি বশতঃ কোন দিন একাহার কমে বা অদ্মরতা বশতঃ কাহারও দুই একবার বাড়ে, তাহাদিগের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের কিঞ্চিৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে। ধরিতে গেলে, স্বাভাবিকটাই ধরিতে হয়। যেমন যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও একমাসের ভোজনীয় দ্রব্য দান করে, তাহা হইলে প্রাত্যহিক দুই বার ভোজন ধরিয়াই কত লাগিবে, তাহার হিসাব করিয়া থাকে; নতুবা কোন দিন একাহার করিলেও করিতে পারে—ইহা ধরে না; তদ্রূপ।

"প্রশ্নকর্ত্তা যখন প্রাত্যহিক দুইবার ভোজন করার কথা বিশেষ করিয়া বলেন নাই, তখন অজিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দান করা হইয়াছে" বলিয়া স্মৃতিভূষণ মহাশয় যে ঠাট্টা করিয়াছেন, সেটী কতদূর সঙ্গত, দেখুন। যদি কোন ব্যক্তি, স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, 'তিন দিন সন্ধ্যাবন্দন করা ঘটে নাই', তবে তিনি কি প্রাত্যহিক এক একটী ধরিয়া তিনটী সন্ধ্যার অকরণ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, কি নয়টী সন্ধ্যার অকরণ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন? যখন পড়িয়াছেন, তখন "বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে। স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্॥" এই মনু-বচনে প্রত্যেক নিত্যকর্ম্মের অকরণে যে এক উপবাস বা তদনুকল্প অর্দ্ধকার্ষাপণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, তাহারই নয় গুণ দিবেন—সন্দেহ নাই। সে সময়ে তিনি অজিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিয়া "গ্রামে না মানে আপনিই মণ্ডল" এই ঠাট্টার বিষয় হন না কেন?

যদি বলেন, "যখন প্রত্যহ তিনটী সন্ধ্যাবন্দন শাস্ত্রসিদ্ধ, তখন তিন দিন বাধ হইয়াছে বলিলেই নয়টী সন্ধ্যা বাধ হইয়াছে।" তবে "বিশুদ্ধপাকান্ন ভোজন করত" এইরূপ প্রশ্ন দ্বারাই শাস্ত্র ও ব্যবহার-সিদ্ধ প্রাত্যহিক দুইবার ভোজনই বলা হইয়াছে। তাহার উত্তর প্রদান করিলে কিরূপে "আপনি মণ্ডল" হওয়া হইল? বিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন কথা বলা উচিত নহে। ঘরে ঘরে বলিলেও তত হানি নাই; লেখাটা পরকালে অনিষ্টজনক। এই নিমিত্তই উপদেশ আছে,—"শতং বদ, মা লিখ।"

আর এক কথা বলিয়াছেন,—"সমুদ্র-যানে যে পাতিত্য আছে—ব্যবস্থা করিলেন, ইহা কি "অথ পতনীয়ানি" এই 'পতনীয়' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এইরূপ বলিলেন? ইহা কদাচ বলিতে পারেন না। যদি 'পতনীয়' শব্দে এ স্থলে পাতিত্য বুঝাইত, তাহা হইলে মহর্ষি বৌধায়ন চারি বৎসর প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান না করিয়া দ্বাদশ-বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই বিধান করিতেন" ইত্যাদি।

'পতনীয়' শব্দ প্রয়োগ থাকাতেই যে, সমুদ্রযানের পাতিত্য জনকতা আছে, ইহা ব্যবস্থাপত্রে স্পষ্টরূপেই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় লিখিয়াছেন; এ কথাটা জিজ্ঞাসা না করিলেই হইত। যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন পুনরুক্ত হইলেও বলিতেছি। হাঁ, 'পতনীয়' শব্দ প্রয়োগ থাকাতেই পাতিত্য-হেতুতা নিশ্চিত হইয়াছে। মহাশয়দিগের কি এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করা আছে যে, পাতিত্য হইলে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের

ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতে নাই? দেখুন, প্রযোজকাদির দ্বাদশবার্ষিকের ত্রিপাদ, অর্দ্ধ প্রভৃতি বিহিত আছে; প্রথম-সংসর্গী প্রভৃতি যাহারা পতিত-সমানতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরও ত্রিপাদ, অর্দ্ধ প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে তাহাদিগের কি পাতিত্য নাই? সগুণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-সুবর্ণাপহরণ করিলে অজ্ঞানকৃত স্থলে ষাড়্‌বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে; সে কি পতিত নহে? প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে সুবর্ণস্তেয়-প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণের শেষে লিখিত আছে,—

"অত্র সগুণস্য ব্রাহ্মণস্য কামতো দ্বাদশবার্ষিকম্। অকামতঃ ষড়্‌বার্ষিকম্।"

অগম্যাগমন ব্যতিরিক্ত অনুপাতকে জ্ঞানকৃত স্থলে দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রত; অজ্ঞানকৃত স্থলে ষাড়্‌বার্ষিক ব্রত বিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে "অনুপাতকিনস্ত্বেতে মহাপাতকিনো যথা অশ্বমেধেন শুধ্যেযুস্তীর্থানুসরণেন বা॥" এই বিষ্ণুবচন-ব্যাখ্যান স্থলে "অশ্বমেধেন শুধ্যেয়ুরিতি গুরুতল্পব্রতোপলক্ষণম্" এইরূপ লিখিয়া, "এতজ্‌ জ্ঞানতোঽনুপাতকে অগম্যাগমনব্যতিরিক্তে বোদ্ধব্যম্। অজ্ঞানতস্তদর্দ্ধম্। জ্ঞানতোঽগম্যাগমনরূপে অনুপাতকে মরণমেব। অজ্ঞানতঃ সম্পূর্ণং ব্রতম্" ইহা লিখিয়াছেন। তবে কি অগম্যাগমন ব্যতিরিক্ত অজ্ঞানকৃত-অনুপাতকীর পাতিত্য থাকিবে না? 'এই সকল ব্যক্তির পাতিত্য নাই'—ইহা কখন বলিতে পারিবেন না। যক্ষ্মাদি-রোগ-সূচিত মহাপাতকের শেষ পাপ—যাহা পনর কাহন কড়ি দিলেই যায়, তাহাতেও পাতিত্য থাকা সর্ব্বলোক-সিদ্ধ।

অতএব 'পাতিত্য থাকিলে দ্বাদশ বার্ষিকের ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় না' এটী অপসিদ্ধান্ত। অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক—এই তিন প্রকার পাপে পাতিত্য থাকিবেই। উপপাতক প্রভৃতিতে সর্ব্বত্র পাতিত্য থাকিবে না; যে যে স্থলে "পতন" শ্রুতি আছে, সেই সেই স্থলেই পাতিত্য মানিতে হইবে। তন্মধ্যে যে উপপাতকে অতি অল্প প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, সে স্থলে অভ্যাসে পাতিত্য বলিতে হইবে। যে স্থলে অল্প প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ আছে অথচ অভ্যাস-কল্পনা করিতেও পারা যায় না, সে স্থলে "পততি" পদ-কীর্ত্তন নিন্দার্থবাদ মাত্র বলিতে হইবে—পাতিত্য মানা হইবে না। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে পতনের সিদ্ধান্ত-লক্ষণে লিখিয়াছেন, যথা;—

"মহাপাতকানপকৃষ্টং পাপং পতনম্। অনুপাতকস্য তৎসমত্বাৎ। উপপাতকাদেশ্চ ক্বচিৎ পততীত্যভিধানাদপকর্ষ এব। অন্ত্যজন-ব্রাহ্মণীগমনে পতনপাদাদ্যুৎপত্তিশ্রবণাদনপকর্ষ এব। অতঃ সদ্যঃ পততি মাংসেনেতি শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরিতি নিন্দার্থমেব।"

ইহার তৎপর্য্য;—মহাপাতক হইতে যে পাপ অপকৃষ্ট নহে, তাহার নাম 'পতন'। অনুপাতক, মহাপাতক-সমান এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায়, অপকৃষ্ট হইল না। উপপাতক প্রভৃতি সর্ব্বত্রই যে অনপকৃষ্ট, এরূপ নহে; যেহেতু কোন কোন স্থলে "পততি" এইরূপ শ্রবণ আছে। অর্থাৎ যদি উপপাতক, সর্ব্বত্রই মহাপাতক হইতে অনপকৃষ্ট হইত, কোন কোন স্থলে "পততি" এইরূপ বলিয়া পাতিত্য জানাইতেন না। যখন এক এক স্থানে "পততি" এইরূপ বলিয়াছেন—তখন সেই সেই স্থানেই পতন-পদবাচ্য হইবে-অন্যত্র পতন-পদবাচ্য হইবে না। অন্ত্যজন-ব্রাহ্মণীগমনে পতনের পাদ, দ্বিপাদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায়, মহাপাতক হইতে অনপকৃষ্ট বলিয়া পতন বলিতে হইবে। 'মাংস-বিক্রয় একবার করিলেই পাতিত্য হয়' ইত্যাদি-স্থলীয় পতন পদ নিন্দার্থ মাত্র। যেহেতু তাহাতে অল্প প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, অথচ "সদ্যঃ" পদ প্রয়োগ থাকায় অভ্যাস-কল্পনা করিতেও পারা যায় না; সুতরাং নিন্দার্থবাদ মাত্র বলিতে হয়।

সমুদ্রযানে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহা যদি অল্প হইত, তবে অভ্যাসে পাতিত্য মানিতে হইত। এ প্রায়শ্চিত্ত অল্প নহে; যেহেতু এই ত্রৈবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত,চাতুর্ব্বার্ষিক-প্রাজাপত্য-তুল্য। ষাড়্‌বার্ষিক প্রাজাপত্য ও দ্বাদশবার্ষিক মহাব্রত উভয়ের তুল্যতা স্বীকার থাকায় চাতুর্ব্বার্ষিক, আষ্টবার্ষিক মহাব্রতের সমান। এই নিমিত্তই প্রায়শ্চিত্তবিবেকে সুরাপান, সুবর্ণ-স্তেয়, গুরুতল্পগমনরূপ মহাপাতকে পাপকর্ত্তা গুণবান্ হইলে এই ত্রৈবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দেখুন, যদি এই প্রায়শ্চিত্ত, সুরাপানাদি মহাপাতক-বিশেষে উপদিষ্ট থাকিল, তবে অল্প প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া অভ্যাস-কল্পনা করিবার আবশ্য-

কতা হইল না। সুরাপানাদি স্থলে পাপকর্ত্তার গুণবত্ত্ব থাকিলে যেরূপ মহাপাতক হয়, অন্ততঃ তাহার তুল্য পাপ বলিতেই হইবে। এই নিমিত্তই মহর্ষি "পতন" পদ প্রয়োগ দ্বারা পাতিত্য জানাইয়াছেন। "মহাপাতকানপকৃষ্টং পাপং পতনম্" এই পতন-লক্ষণও তাহাতে অব্যাহত হইল।

"ব্রাহ্মণন্যাসাপহরণম্" এই পদে গোবিন্দানন্দ যে "সুবর্ণ-ব্যতিরিক্ত" বিশেষণ নিবেশ করিয়াছেন, তাহাই উচিত। 'ন্যাস' শব্দের অর্থ নিক্ষেপ-বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে "গচ্ছিত" বলে। ব্রাহ্মণ,—সুবর্ণ গচ্ছিতই হউক, অগচ্ছিতই হউক, তাহার অপহরণ মাত্রেই মহাপাতক ও পাতিত্য হইবে। তদ্ভিন্ন বস্তু গচ্ছিত না হইলে হরণে পাতিত্য-জনক হইবে না। এইরূপ বিশেষ থাকায়, 'সুবর্ণ-ব্যতিরিক্ত' বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক। আরও কারণ আছে। ব্রাহ্মণ-ন্যাসাপহরণ, অনুপাতকগণে পঠিত ও সুবর্ণস্তেয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যথা মনু,—

"নিক্ষেপস্যাপহরণং নরাশ্ব-রজতস্য চ।
ভূমি-বজ্র-মণীনাঞ্চ রুক্মস্তেয়সমং স্মৃতম্"।

বিষ্ণু,—

"ব্রাহ্মণভূমিহরণং নিক্ষেপহরণং সুবর্ণস্তেয়সমম্"।

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেককার, মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ;—

"নিক্ষেপস্য ব্রাহ্মণসম্বন্ধিনো নরাদেরপহারো ব্রাহ্মণসুবর্ণস্তেয়সমঃ।"

ব্রাহ্মণ-সুবর্ণ হরণ মহাপাতক মধ্যে গণিত, তাহা অনুপাতক মধ্যে গণনা করিতে পারা যায় না এবং ব্রাহ্মণ-ন্যস্ত-সুবর্ণ-হরণ, ব্রাহ্মণ-সুবর্ণ-হরণের সমান—ইহাও বলিতে পারা যায় না ; সুতরাং নিক্ষেপ-হরণের সুবর্ণস্তেয়-সমত্ব বিধান করিতে হইলে, নিক্ষেপের 'সুবর্ণ-ব্যতিরিক্তত্ব' বিশেষণ দিতেই হইবে। অতএব,—

"অশ্ব-রত্ন-মনুষ্য-স্ত্রী-ধেনু-ভূহরণং তথা।
নিক্ষেপস্য চ সর্ব্বং হি সুবর্ণস্তেয়সম্মিতম্॥

এই যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের ব্যাখ্যা স্থলে মিতাক্ষরাকারও নিক্ষেপের 'সুবর্ণ-ব্যতিরিক্তত্ব' বিশেষণ নিবেশ করিয়াছেন, যথা ;—

"অশ্বাদীনাং ব্রাহ্মণসম্বন্ধিনাং নিক্ষেপস্য সুবর্ণ-ব্যতিরিক্তস্যাপহরণমেতৎ সর্ব্বং সুবর্ণস্তেয়সমং বেদিতব্যম্।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ব্রাহ্মণ-ন্যাসাপহরণের সুবর্ণস্তেয়-সমত্ব নিশ্চয় করিয়াই গোবিন্দানন্দ ন্যাসের 'সুবর্ণ-ব্যতিরিক্তত্ব' বিশেষণ নিবেশ করিয়াছেন।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে।" এক বাক্যে সঙ্গতি হইলে, বাক্য ভেদ স্বীকার করি না।—ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসা। প্রকৃত স্থলে যদি একবার সমুদ্রযানে চাতুর্ব্বার্ষিক প্রাজাপত্য ব্রত ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে একবার সমুদ্রগমনে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত এবং বারংবার শূদ্রসেবাদি করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত। সুতরাং বাক্যভেদ হইয়া উঠে" ইত্যাদি।

এই অংশটী স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিজের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না। কোন বিষয়িলোকের লিখিত হইবে। দেখুন, 'একবাক্য' ও 'বাক্যভেদ' শব্দটী যদি এক বিধি ও বিধিভেদ অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় মতেই বাক্যভেদ হইবে—কোন মতেই একবাক্য হইবে না। কারণ প্রতিবাদী মহাশয় সকল গুলিই অভ্যাস-বিষয়ে স্বীকার করিলেও "অভ্যস্ত-সমুদ্রযানে এতৎ প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ" "অভ্যস্তন্যাসাপহরণে এতৎ প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ "অভ্যস্ত শূদ্রসেবায়াম্ এতৎ প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিধি অবশ্যই স্বীকার করিবেন। যে হেতু নানা বিধেয়, একবিধি-প্রতিপাদ্য হইতেই পারে না। আমাদিগের মতেও "সমুদ্রযানে এতৎ প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ" "ব্রাহ্মণ-ন্যাসাপহরণে এতৎ প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ" "অভ্যস্ত-শূদ্রসেবায়াম্ এতৎপ্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিধি-বাক্যই হইবে। মুনিরা একবাক্য দ্বারা নানা কর্ম্ম প্রতিপাদন করুন না কেন, বিধেয়-ভেদ হইলে বিধি-ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। যেমন "স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধ-মনন্তং রাহুদর্শনে" ইত্যাদি বাক্যে "রাহুদর্শনে স্নানং কুর্য্যাৎ" "রাহুদর্শনে দানং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদিরূপে নানা বিধি স্বীকার করিতে হয়, তদ্বৎ।

যদি বলেন, "একবাক্য ও বাক্যভেদ শব্দটী মুনির উপদেশ-বাক্যের একত্ব ও অনেকত্ব অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে।" তাহাতে উভয় মতেই একবাক্য হইয়াছে ; কোন মতেই মুনির দুইটী বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় না। প্রতিবাদী মহা-

শয়ের মতে "অভ্যস্ত-সমুদ্রযানে, অভ্যস্ত-ব্রাহ্মণ-ন্যাসা-পহরণে, অভ্যস্ত-শূদ্রসেবায়াঞ্চ এতৎ প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ" এইরূপ উপদেশ মুনি একবাক্য দ্বারা করিলেন; আমাদিগের মতেও "সমুদ্রযানে, ব্রাহ্মণ ন্যাসাপহরণে, অভ্যস্ত-শূদ্রসেবায়াঞ্চ এতৎ প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ" এই একবাক্য দ্বারাই উপদেশ করা হইল। কোন মতেই বাক্যভেদ নাই। কেবল আমাদিগের মতে শূদ্রসেবা সকৃৎকরণে লঘু-প্রায়শ্চিত্তান্তরের উপদেশ থাকায়, গুরু-প্রায়শ্চিত্তটীও সকৃৎকরণ স্থলে বলিলে বিরোধ হয় বলিয়া, অগত্যা 'শূদ্রসেবা' পদের সঙ্কোচ করিতে হয়। প্রতিবাদী মহাশয়ের মতে সর্ব্বত্রই সঙ্কোচ করিতে হয়। ইহার মধ্যে শূদ্রসেবার সঙ্কোচক-কল্পনায় হেতু আছে, অন্যত্র নিষ্কারণ সঙ্কোচ করিতে হয়। সহেতু সঙ্কোচ-কল্পনা করাই উচিত; নিষ্কারণ সঙ্কোচ-কল্পনা করা দূষণাবহ। যদি সর্ব্বত্রই সকৃৎকরণে লঘু-প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই সঙ্কোচ হইতে পারিত; সহেতুক বলিয়া দূষণাবহও হইত না। তাহা না থাকায়, তাদৃশ দোষ কেন স্বীকার করা যাইবে?

একবচনের মধ্যে একত্র অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করিতে হইলে, সাহচর্য্য বশতঃ যে সর্ব্বত্রই অভ্যাস-বিষয়তা মানিতে হয়, এরূপ বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

"চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বাচ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥"

এই মনু বচনে প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা চাণ্ডালান্ন-ভোজনে ও চাণ্ডাল-প্রতিগ্রহ স্থলে অষ্টচত্বারিংশৎ বার অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করিলেন; তদ্বচনোপাত্ত চাণ্ডাল-স্ত্রীগমনেও অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করিলেন না! কেন এরূপ হয়? প্রতিবাদী মহাশয়ের মতে সাহচর্য্য বশতঃ সর্ব্বত্রই অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করা উচিত। যখন প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকাদিতে তাহা করেন নাই, তখন প্রতিবাদী মহাশয় সেরূপ ব্যাপ্তি কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারিবেন না। অতএব আমরা পূর্ব্বে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাই তাঁহার স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, চাণ্ডালান্ন-ভোজন ও চাণ্ডাল-প্রতিগ্রহে বচনান্তরে লঘু-প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ থাকায়, তাহার সহিত বিরোধ-ভয়ে তদুভয় স্থলে অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করিয়াছেন; চাণ্ডাল-স্ত্রীগমনের অনুপাতকত্ব নির্দ্দেশ থাকায়, সে পক্ষে অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করেন নাই।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলেন,—"চাণ্ডাল-দ্রব্য প্রতিগ্রহেও লঘু-প্রায়শ্চিত্তান্তর দৃষ্ট হয় না; সুতরাং একবার চাণ্ডাল-দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলেই আপনাদিগের যুক্ত্যনুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত বলিতে হয়" ইত্যাদি।

চাণ্ডাল-প্রতিগ্রহে যে লঘু-প্রায়শ্চিত্তান্তর দৃষ্ট হয় না, এমত নহে। বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পারিতেন। প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে শূলপাণি লিখিয়াছেন, যথা;—

"সৌরিক - ব্যাধ-নিষাদ-রজক-বরুড়-চর্ম্মকারাঃ অভোজ্যান্না অপ্রতিগ্রাহ্যাঃ। তদন্নাশন-প্রতিগ্রহয়োশ্চান্দ্রায়ণংচরেৎ॥"

এতদ্বচনোক্ত রজকাদি-প্রতিগ্রহে জ্ঞানকৃত বারদ্বয়াভ্যাসে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত—ইহা বিবেককার লিখিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানকৃত একবার রজকাদি-প্রতিগ্রহে তপ্তকৃচ্ছ্র বলিতে হইবে। রজকাদি হইতে চাণ্ডালাদির দ্বিগুণ-অপকর্ষ-হেতুক চাণ্ডালাদি-প্রতিগ্রহে জ্ঞানকৃত একবারে চান্দ্রায়ণ নিশ্চিত হইল। অতএব, মদন-পারিজাতে ম্লেচ্ছ-চাণ্ডালাদি নিন্দিত-দাতার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে, কুরুক্ষেত্রাদি দেশ-বিশেষে প্রতিগ্রহ করিলে, গ্রহণাদি-কালে প্রতিগ্রহ করিলে, সুরা, মেষী, মৃতশয্যা; উভয়তোমুখী গো প্রভৃতি প্রতিগ্রহ করিলে অসৎপ্রতিগ্রহ বলা যায় এরূপ নিরূপণ করিয়া কিয়দ্দূরে লিখিয়াছেন,—

"যদা ত্বনিন্দিতেভ্যো নিন্দিতদ্রব্যং গৃহ্লাতি নিন্দিতেভ্যো বা অনিন্দিতং দ্রব্যং গৃহ্লাতি নিন্দিতেভ্যো বা নিন্দিতং তত্র চতুর্বিংশতিমতোক্তম্।
পবিত্রেষ্ট্যা বিশুধ্যন্তি সর্ব্বে ঘোরাঃ প্রতিগ্রহাঃ।
ঐন্দবেন মৃগারেষ্ট্যা কদাচিন্মিত্রবিন্দয়া॥"

ইহা দ্বারা নিন্দিত চাণ্ডালাদি-দাতার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে। মিতাক্ষরাতেও ঐ বচন দ্বারা ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ স্থলে চাণ্ডাল-প্রতিগ্রহে যে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত বিধান হইয়াছে, তাহা সকৃৎপ্রতিগ্রহে বলিলে সম্পূর্ণ বিরোধ উপস্থিত হয় বলিয়াই শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়, অভ্যাস-বিষয়ে স্বীকার

করিয়াছেন। কেবল সাহচর্য্য দেখিয়াই যে, অভ্যাস-বিষয়তা বলিয়াছেন, এরূপ নহে।

'সাহচর্য্য দেখিয়াই কল্পনা করিতে হইবে' স্মৃতিভূষণ মহাশয় যদি এরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্প হন, তবে "সমুদ্রযানং ব্রাহ্মণন্যাসাপহরণং সর্ব্বপণ্যৈর্ব্যবহরণং ভূম্যনৃতং শূদ্রসেবা" ইত্যাদি বৌধায়ন-বচনে সন্নিহিত ব্রাহ্মণ-ন্যাসাপহরণের সাহচর্য্যই গ্রহণ করুন না কেন? তাহা হইলে সকৃদ্বিষয়তাই হইয়া পড়িবে। কারণ, ব্রাহ্মণ-ন্যাসাপহরণের অনুপাতকত্ব প্রযুক্ত পাপের গুরুত্ব থাকায়, তদংশে অভ্যাস-বিষয়তা কোন গ্রন্থকার করেন নাই, স্মৃতিভূষণ মহাশয়কেও তাহা অবশ্য মানিতে হইবে। দূরবর্ত্তী শূদ্রসেবার সাহচর্য্য গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? কেবল বিলাত-যাওয়াটা চালান ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বস্তুতঃ একবচনোপাত্ত নানা প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের মধ্যে একের অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করিলে যে অপরগুলিরও অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অন্যায্য। যাহার সকৃদ্বিষয়তা মানিবার বাধক আছে, তাহারই অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করিতে হয়; যাহার বাধক নাই, তাহার সকৃদ্বিষয়তাই বলিতে হয়; নিষ্কারণ সঙ্কোচ করা রীতি-বিরুদ্ধ। সমুদ্রযানের সকৃদ্বিষয়তা স্বীকার করিবার বাধক নাই; অভ্যাস-বিষয়তা মানিব কেন? একবারেই ঐ প্রায়শ্চিত্ত বলিতে হইবে। এই নিমিত্ত মিতাক্ষরা, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, পরাশর-ভাষ্য, মদন-পারিজাত প্রভৃতি গ্রন্থে কেহই সমুদ্রযানের বা ব্রাহ্মণ-ন্যাসাপহরণের অভ্যাস-বিষয়তা স্বীকার করেন নাই।

অপর অতিপাতকাদি পাপের মধ্যে সমুদ্রযানের গণনা না থাকায় স্মৃতিভূষণ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"সমুদ্রযান আপনারা কোন্ পাপের অন্তর্গত বলেন?"

আমরা সমুদ্রযানকে উপপাতক বলিয়া থাকি। শূলপাণি উপপাতক-বচনের ব্যাখ্যা করিয়া "অন্যান্যুপপাতকানি স্মৃত্যন্তরেঽনুসন্ধেয়ানি" এইরূপ লিখিয়া নিন্দিত-দেশ-গমন-প্রায়শ্চিত্তটী উপপাতক-প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণেই লিখিয়াছেন। যদি নিন্দিত-দেশগমন উপপাতক হইল, তবে সমুদ্রগমনও নিন্দিত-দেশগমনের অন্তর্গত, সুতরাং উপপাতক। মন্বাদি-বচনে উপপাতকগণের মধ্যে উহা পঠিত না থাকিলেও "ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকম্" এই যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে'চকার' দ্বারা নিন্দিত-দেশ-গমনাদির প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব মিতাক্ষরাকার ঐ 'চকার' দ্বারা যে অন্য কতকগুলি কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"সমুদ্রযানং ব্রাহ্মণন্যাসাপহরণং ভূম্যনৃতং শূদ্রসেবা" ইত্যাদি বৌধায়ন-বচনে শূদ্রসেবার সাহচর্য্যবশতঃ সমুদ্রযান অপাত্রীকরণ-পাপের অন্তর্গত হইতে পারে।"

এ সিদ্ধান্তও অসঙ্গত। প্রায়শ্চিত্ত-বিধায়ক একবাক্যের মধ্যে নানা প্রকার পাপ উল্লিখিত থাকে। সে স্থলে সাহচর্য্য মানিতে হইলে, কোন্ পাপের সাহচর্য্য ধরিয়া স্থির করিব, তাহার অনধ্যবসায় হইয়া উঠে। এই বচনেই দেখুন, ব্রাহ্মণ-ন্যাসাপহরণ অনুপাতক। যেহেতু "নিক্ষেপস্যাপহরণম্" এই মনু-বচনোক্ত অনুপাতক-গণনায় "নিক্ষেপস্য ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধিনো নরাদেরপহারো ব্রাহ্মণসুবর্ণস্তেয়সমঃ" শূলপাণি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি সাহচর্য্য বশতঃ পাপ-বিশেষ নিশ্চয় হয়, তবে সমুদ্রযানকে অনুপাতকের সাহচর্য্য দেখিয়া অনুপাতক বলুন না কেন? তাহা না বলিয়া অপাত্রীকরণপাপ বলিয়া স্বীকার-করত লঘু-প্রায়শ্চিত্ত-ঘটনা করেন কেন? বিলাত-যাওয়াটা চালান চাইই চাই,—এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ত অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হই নাই!

যদি একান্তই শূদ্রসেবার সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে বাসনা থাকে, তবে তাহাই করুন; তাহাতেও উপপাতকত্ব-ব্যাঘাত হইবে না। যাজ্ঞবল্ক্য, "শূদ্রপ্রেষ্যং হীনসখ্যম্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শূদ্রপ্রেষ্যকে উপপাতক বলিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার "শূদ্রসেবনং হীনেষু মৈত্রীকরণম্" এইরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা নিশ্চিত হইল,—শূদ্রসেবন উপপাতক। মনু,—"নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনম্। অপাত্রীকরণং জ্ঞেয়মসত্যস্য চ ভাষণম্॥" এই বচন দ্বারা শূদ্রসেবাকে অপাত্রীকরণ পাপের অন্তর্গত বলিলেন। ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, যখন উপপাতক হইতে অপাত্রীকরণ-পাপ লঘু, তখন চিরতর-কালাভ্যস্ত শূদ্রসেবা উপপাতক, স্বল্পকালীন শূদ্রসেবন অপাত্রীকরণ,—এইরূপ মীমাংসাই করিতে হইবে। যদি এরূপ

হইল, তবে বৌধায়ন-বচনোক্ত চিরতর-কালাভ্যস্ত শূদ্রসেবার সাহচর্য্যে উপপাতকই হইয়া উঠিল। অপাত্রীকরণ-পাপ বলিয়া লঘু করিবার কোন উপায় থাকিল না।

• "সমুদ্রযান এক্ষণে অনেকেই আচরণ করে, সুতরাং সেটা অতি লঘু কার্য্য, তাহাতে এতাদৃশ গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত নহে", কেবল এই বিবেচনায় যদি ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের ব্যবস্থায় অশ্রদ্ধা করেন, তবে মিথ্যা-সাক্ষ্য-যাহা অধুনা ধনাগমের উপায়রূপে প্রচরদ্রূপ হইয়াছে, তাহাতে যে শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়, দ্বাদশবার্ষিক-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তাহাও মহাশয়ের অবজ্ঞেয় হউক। শূলপাণি লিখিতেছেন,—

"সাক্ষিণোঽসত্যাভিধানে উক্ত্বা চৈবানৃতং সাক্ষ্যে ইতি মনুবচনাৎ জ্ঞানতো দ্বাদশবার্ষিকমিত্যুক্তংপ্রাক্। অত্র পাপলাঘবাৎ বার্ষিকং সম্পূর্ণশ্রুতিস্তু নিন্দার্থবাদ ইতি কশ্চিৎ। তচ্চিন্ত্যম্, বিষ্ণুনা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধ ইত্যাদিনা অনুপাতকত্বোক্তেঃ।"

'নৌকায় ভোজনে ৪৫ প্রাজাপত্য ও ঐ অন্ন ম্লেচ্ছ-জবনাদি-পাকসঙ্কীর্ণ পাকান্ন হইল বলিয়া ১২০ প্রাজাপত্য হইবে।' ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন দেখিয়া স্মৃতিভূষণ মহাশয় "একক্রিয়ায় দুই পাপ কিরূপে হইতে পারে" জিজ্ঞাসা দ্বারা ঠাট্টা করিয়াছেন,—"এক মুরগী কতদিকে জবাই হইতে পারে?" একক্রিয়া দ্বারা যে দুই পাপের উৎপত্তি হয়, ইহা দেখাইতে হইলে, 'একাদশীর দিনে যদি কেহ চাণ্ডালান্ন ভক্ষণ করে, তবে তাহার কয়টী পাপ উৎপন্ন হইবে?' স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট এই প্রশ্ন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ব্রহ্মচারীর গুরুদারগমন— যাহা নিজেই দেখাইয়াছেন, সেই বিষয়টী তলিয়া বুঝিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, এক ক্রিয়ায় দুইটী পাপ উৎপন্ন হয় কিনা। যদি বিশেষ করিয়া বুঝিতে চাহেন, মুরগী দ্বারাই বুঝাই। দেখুন, পরের মুরগী বাটীতে চরিতে আসিলে, যদি তাহাকে জবাই করা হয়, তাহা হইলে এক জবাই, দুই জবাই জন্য পাপ উৎপাদন করিল কিনা? এক—পক্ষি হত্যা পাপ, আর-পরদ্রব্যের স্বত্বধ্বংস-পূর্ব্বক স্বস্বত্বাপাদন জন্য পাপ,—এই দুইটী পাপ অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

যদি বলেন,—'পাপ দুইটী হইল বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর গুরুদার-জন্য-পাপ-ক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যেমন অবকীর্ণিতা জন্য পাপের ক্ষয় হয়, সেইরূপ এখানেও গুরু-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা লঘুপাপের নাশ হয় না কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরটা করিতে লজ্জা হইতেছে। স্মার্ত্তদিগের ত কথাই নাই, প্রায় সকল শাস্ত্রজ্ঞ লোকেই ইহা জানেন যে, উপপাতকে তন্ত্রতা বা প্রসঙ্গ হয় না।

"গোঘ্নবৎ বিহিতঃ কল্পশ্চান্দ্রায়ণমথাপিবা।
অভ্যাসে তু তয়োর্ভূয়স্ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"

এই যমবচনে স্পষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছে যে, উপপাতকের পুনঃপুনঃ করণ ঘটিলে পুনঃ পুনঃ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; এক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপর পাপের ক্ষয় হয় না। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-স্বামিক পূর্ণবয়স্ক গোবধ করে ও প্রযত্নান্তরে শূদ্রস্বামিক গোবধ করে কিংবা চাণ্ডালান্ন ভক্ষণ করে, তবে তাহার ব্রাহ্মণ-স্বামিক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শূদ্র-স্বামিক গোবধ জন্য পাপ বা চাণ্ডালান্ন-ভক্ষণ জন্য পাপ বিনষ্ট হইবে কি পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তই বলিবেন, সন্দেহ নাই? তবে এস্থলে প্রশ্ন করা কিরূপে সঙ্গত হয়? গুরুদার-গমন অনুপাতক; অকীর্ণিতা-জন্য পাপ উপপাতক। এস্থলে উপপাতকের আবৃত্তি বলা যাইতে পারে না। সুতরাং অনুপাতক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপপাতকের নাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে পারা যায়। এবং ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষত্রিয়-বধ-জন্য পাপের ক্ষয়ও স্বীকার হইয়া থাকে। ব্রহ্মবধ-জন্য পাপ মহাপাতক, ক্ষত্রিয়-বধ-জন্য পাপ উপপাতক। এস্থলেও উপপাতকের আবৃত্তি বলা যাইতে পারে না। যে স্থলে দুইটীই উপপাতক হইবে, সে স্থলে উপপাতকের আবৃত্তিতে পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত বিধান থাকায়, তন্ত্রতা বা প্রসঙ্গ হইতে পারিবে না। এই নিমিত্তই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহাই যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধ।

"যদি কোন ব্যক্তি একটী পিপীলিকা, একটী গোরু, একটী ব্রাহ্মণ বধ করিয়া থাকে, এমত স্থলে ব্রাহ্মণবধ-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সকল প্রকার

পাপের নাশ বলিতে হইবে; না—প্রত্যেক বিশ্রান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে?” এই প্রশ্নেরও পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ দ্বারা উত্তর দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—মহাপাতক অনুপাতক প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপপাতকের নাশ স্বীকার আছে; উপপাতক-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপপাতকের নাশ মানা নাই। যেহেতু তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং জিজ্ঞাসিত বিষয়েও ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপপাতকের নাশ হইবে—তাহাতে বাধা নাই। সকল কয়েকটীই যদি উপপাতক হইত, তাহা হইলে একটীর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপর কয়েকটীর নাশ হইত না। দেখুন, গর্ভবতী গো'র বধ স্থলে “প্রতিনিমিত্তং নৈমিত্তিকমাবর্ত্ততে” এই ন্যায়-মূলক গো ও গর্ভ উভয়-বধ-নিমিত্তক উভয় প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট আছে। মহর্ষিরা তাদৃশ উপদেশ কেন করেন? একের দ্বারা অপরের সিদ্ধি মানিলেই ত হইত!

প্রকৃতস্থলে সমুদ্র-যানাদি-জন্য পাপ সকল ক'টীই উপপাতক; ইহার একের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপরের নাশ হইতে পারে না বলিয়াই পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করা হইয়াছে; ইহাকে কি ভুল বলা উচিত। বচনটী ভুলিয়াই ভুল ধরা হইয়াছে।

ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সমুদায়ে ১২৮২৷৷০ কাহন দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন দেখিয়া স্মৃতিভূষণ মহাশয় একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন ও বলিয়াছেন—“যতই পাপ করুক না কেন,হাজার আশী কাহনের অতিরিক্ত প্রায়শ্চিত্ত কেহ কোন স্থানে শুনে নাই।” আবার কিয়দ্দূরে বলিয়াছেন,—“অগ্নিহোত্রাদি-গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে শূদ্র জ্ঞানকৃত বধ করিলে, দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রতানন্তর মরণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে' ইহা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি।”

কথাটা কেমন হইল বুঝিতে পারিলাম না। এক মরণেরই অনুকল্প হাজার আশী কাহন। দ্বাদশবার্ষিকাদি সমস্ত ব্রতের অনুকল্প তাহার সহিত যোগ করিলে কত হাজার আশী কাহন হয়, হিসাব করিয়া দেখুন দেখি! যদি বলেন,—‘বিশ্বামিত্র-বচনে সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবার যে বিধি আছে, তাহারই স্থূল-প্রদর্শনের নিমিত্ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐরূপ লিখিয়াছেন।' যদি স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের মতে হাজার আশী কাহনের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না—ইহাই বেদের অভিপ্রায় হয়, তবে মহর্ষি বিশ্বামিত্রই বা কেন অগ্নিহোত্রাদি-গুণযুক্ত-ব্রাহ্মণ-বধে হাজার আশী কাহনের অধিক প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করিলেন? তিনি কি বেদের অভিপ্রায় জানিতেন না? তাঁহার তৎকালে এরূপ চিন্তা করা উচিত যে, অগ্নিহোত্রাদি-গুণযুক্ত দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ভকে বধ করিলেও বেদের অভিপ্রায়ানুসারে হাজার আশী কাহনের অধিক প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না? যখন এক পাপেই হাজার আশী কাহনের অধিক প্রায়শ্চিত্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিতেছেন এবং মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও তাহা অম্লান-বদনে স্বীকার করিতেছেন, তখন হাজার আশী কাহনের অতিরিক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত স্মৃতিভূষণ মহাশয় কোথায় পাইলেন? কোন সংগ্রহকারই ইহা বলেন নাই। পাপ-ভেদে এক একটী প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কলন করিয়া যে হাজার আশী কাহনের অধিক হইতে পারিবে, তাহাতে কোনই প্রতিবন্ধক নাই। দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি ২৫ বারে ২৫টী ব্রাহ্মণ স্বামিক গো বধ করে ও সে ব্যক্তি প্রত্যেক বারে ৫১ কাহন উৎসর্গ করে,তবে তাহার ২৫ বারে ১২৭৫ কাহন লাগে কি না? যদি ২৫বারে ১২৭৫ কাহন লাগে, তবে অবশ্যই মানিবেন,—যে ব্যক্তি ঐ ২৫টী প্রায়শ্চিত্ত ২৫ দিনে না করিয়া একদিনে করিতে চাহে, তবে এক দিনেই ২৫ প্রস্থ প্রায়শ্চিত্তের দরুন—১২৭৫ কাহন দান করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এখানে হাজার আশী কাহনের অধিক প্রায়শ্চিত্ত হইল না কি? যদি সে স্থলে হইল, তবে সমুদ্রযানাদি কর্ম্মের এক একটী প্রায়শ্চিত্ত যোগ করিয়া ১২৮২৷৷০ কাহন হওয়ায় চীৎকার করেন কেন?

স্মৃতিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন,—“ফল কথা, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে বধ করিলে মরণে অশক্ত ও ব্রতকরণে অশক্ত শূদ্রের হাজার আশী কাহনের অধিক প্রায়শ্চিত্ত কেহই বলিবেন না।”

ইহার মত অযুক্ত বাক্য কখন শুনি নাই। যাহার পক্ষে যে ব্রত বিহিত, সে সেই ব্রতেরই অনুকল্প করিবে। যদি তাদৃশ শূদ্রের পক্ষে দ্বাদশ-বার্ষিকাদি ব্রত ও মরণ—এই দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্তই মহর্ষিগণের ও নিবন্ধকারদিগের মতে বিহিত বলিয়া নিশ্চিত হইল, তবে অনুকল্প করি-

বার সময়ে তাহার মধ্যে একটী মাত্রের অনুকল্প কিরূপে উপদেশ করা হইতে পারে? ব্রত ও মরণ উভয়েরই অনুকল্প নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মাত্রেই সেইরূপ উপদেশ করিবেন। হাজার আশী কাহনের অধিক প্রায়শ্চিত্ত কেহই বলিবেন না—কিসে জানিলেন? তাঁহার মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত যে জগতের সকলেই শিক্ষা করিয়াছেন, ইহার নিশ্চয় করা সর্ব্বজ্ঞতা ভিন্ন সম্ভবে না। তবে যাঁহাদের মতে প্রায়শ্চিত্তটা 'লোক-দেখানে', কড়া-কতক কড়ি-উৎসর্গ দেখাইতে পারিলেই হয়, তাঁহারাই বলিতে পারেন

'সমুদ্রযানে চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট না থাকিলেও তৎকারীর বাচনিক অব্যবহার্য্যতা।' ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন বলিয়া, স্মৃতিভূষণ মহাশয় অনেক আর্ত্তনাদ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন,—"আপনারা স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যাদির গ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা অধ্যাপক হইয়া গুরুমতখণ্ডনে প্রবর্ত্তমান হইলেন! যেহেতু শরণাগতাদি-হন্তার অব্যবহার্য্যতা বচন-বোধিত হইলেও তাহাতে অল্প প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ থাকায় বহুতর--গুণযুক্ত--শরণাগতাদি--হন্তারই অব্যবহার্য্যতা হীনতর শরণাগতাদি হন্তার অব্যবহার্য্যতা নহে—ইহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্বয়ং লিখিয়াছেন; ইঁহার সহিত বিরোধ হইতেছে।"

পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের বাক্যে অণুমাত্রও বিরোধ নাই। যেমন বহুতর-গুণযুক্ত-শরণাগতাদি-হন্তার অব্যবহার্য্যতা বলিয়াছেন, তদ্বৎ সমুদ্রগন্তার অব্যবহার্য্যতাও বহুতর-দোষযুক্ত-সমুদ্রগমন স্থলে বলিতে হইবে। অর্থাৎ কেবল সমুদ্রগমনে চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রতার্হ না হওয়ায় অব্যবহার্য্য না হউক; যে স্থলে সমুদ্রগমন, তদনুগত-বিবিধ-পাপজনক-ক্রিয়ান্বিত হইয়া বহুতর-দোষযুক্ত হইবে, সেই স্থলেই তৎকারীর অব্যবহার্য্যতা বলিতে হইবে। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় যে স্থলে অব্যবহার্য্যতা লিখিয়াছেন, সে স্থলে সমুদ্রগমনের বহুতর দোষযুক্ততা থাকায় সমুদ্রগন্তার চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রতের ন্যূনপ্রায়শ্চিত্তার্হতা হয় নাই, তবে কেন অব্যবহার্য্য হইবে না? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতের কিছুমাত্র বিপরীত বলা হয় নাই। তিনি হন্তার স্থলে, ইনি গন্তার স্থলে; তিনি গুণবাহুল্য স্থলে, ইনি দোষবাহুল্য স্থলে মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনুরূপই মীমাংসা করা হইয়াছে। চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতি-ব্যাখ্যাগ্রন্থকার—একবারেই অব্যবহার্য্য কি অভ্যাসে অব্যবহার্য্য, ইহা বিশেষরূপে না লিখিলেও একবারেই অব্যবহার্য্য হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, নিবন্ধকারেরা যে স্থলে 'অভ্যাস' বলিয়া নির্দ্দেশ না করেন, সেই স্থলে একবার বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মানিতে হয় এবং তিনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়ী নহেন, এ কারণ, তাঁহার মতে বহুতর-দোষযুক্ত সমুদ্রগমন স্থলেই অব্যবহার্য্য হইবে ইহাও বলিতে হইবে না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বতন গ্রন্থকারেরা অল্প-প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও বাচনিক অব্যবহার্য্যতা স্বীকার করিতেন। মিতাক্ষরার মত ত প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বেই দেখিতেছেন। শারীর-মীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদে 'নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী প্রব্রজিতদিগের আশ্রমচ্যুতি মহাপাতক কি উপপাতক এবং তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা, এ বিষয়ে বিচার করিয়া ঐ পাপ মহাপাতক নহে, উপপাতক এবং তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত গর্দ্দভযাগাদি, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া, 'তাহাদিগের ব্যবহার্য্যতা আছে কিনা' এই সংশয়ে ৯৩ সূত্রে মহর্ষি বাদরায়ণ লিখিয়াছেন,—

"বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ।"

ভগবান ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

যদ্যূর্দ্ধরেতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং যদিবা উপপাতকম্ উভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিষ্কার্য্যাঃ। নহি যজ্ঞাধ্যয়ন-বিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ।"

এই সিদ্ধান্তে ব্যক্তরূপে প্রতীত হইতেছে যে, গর্দ্দভ-যাগাদিরূপ স্বল্প-প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও বাচনিক অব্যবহার্য্যতা স্বীকার আছে।

আমরা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতাবলম্বী, তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করি না; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বের লিখিত "অত্র চ কামতো ব্রহ্মহত্যাদিবৃহৎ-পাপকর্ত্তুঃ" ইত্যাদি পাঠটী স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অনেক প্রাচীন পুস্তকে ঐ পাঠটী নাই, কোন কোন পুস্তকে উপরি লিখিত থাকে; আধুনিক পুস্তকে মূলে আছে এবং "শরণাগত-বাল-স্ত্রী"

এই যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের সমানার্থক "বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ" ইত্যাদি মনুবচনে মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্টও বহুতর গুণযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন না, অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও এরূপ তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না, প্রত্যুত বাদরায়ণ-সূত্রের সহিত বিরোধ হয়; এবং কৃতঘ্নের পক্ষেও কোন মীমাংসা করিলেন না; এই সকল কারণে আমার সংশয় আছে।

যাহা হউক, ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ঐ পাঠটী স্বীকার করিয়াই মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবাদীদিগের কোন আপত্তি চলিবে না।

এক্ষণে দেখুন, প্রতিবাদোক্ত দূষণ গুলি কর্ম্মণ্য হইল কি না ও সমুচিত উত্তর দেওয়া হইল কি না। বিশেষ না-দেখিয়া বা না-শুনিয়া চপলতা ও ঔদ্ধত্য করা নিতান্ত অন্যায় ও ক্রোধের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত।

অতএব আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধ; ইহার কোন অংশ শাস্ত্রানভিমত নহে।

শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ।

মেড়তলা।

পশম।

(২)

ভারতবর্ষে প্রায় তিনকোটি মেষ আছে। কিন্তু কোন্ প্রদেশে কত আছে, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশে মেষের সংখ্যা অল্প; যে হেতু এখানকার জলবায়ু মেষ-পালনের উপযোগী নয়। বেহার অঞ্চলে অনেক মেষ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখানকার বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং এখানে চরিবার স্থানও দুর্লভ নহে। শীত ও গ্রীষ্মকালে গঙ্গা, শোণ, গণ্ডক প্রভৃতি নদ-নদীর গর্ভে যে চড়া বাহির হয়, মেষেরা সেই চড়ায় চরিয়া বেড়ায়। বর্ষাকালে যে সকল ক্ষেত্রে নীল-বপন হইয়াছে, মেষেরা সেই নীল-ক্ষেত্রে চরিতে পায়। প্রথমাবস্থায় নীলক্ষেত্রে মেষ চরিলে, ফসলের কোনও অপকার হয় না। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মারটিন্ সাহেব অনুমান করিয়া বলিয়াছিলেন, যে, পাটনা ও শাহাবাদ জিলায় প্রায় ৪৫,০০০ মেষ আছে। মারটিন্ সাহেব বোধহয় ভুল করিয়াছিলেন,— এই দুই জিলায় মেষের সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক অধিক। জয়ন্তীপুরের আরট সাহেব সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, একা তাঁহার জমিদারীতেই এক লক্ষ মেষ আছে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মেষ ও ছাগলের সংখ্যা ৪৫ লক্ষেরও অধিক, আর আযোধ্যা-প্রদেশে ইহার সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। গো-চর ভূমির অভাবে এক্ষণে মেষের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। যমুনার দুই কূলে, ভগ্ন ভূমিতে, যাহাকে 'খাদিড়' বলে, যেখানে অন্য ফসল উৎপন্ন হয় না, এখন সেই খানেই কেবল মেষ ও ছাগল অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কুমাউন গড়ওয়ালেও অনেক পতিত ভূমি আছে। বর্ষাকালে এই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস হয়। সে ঘাস খাইয়া অনেক মেষ প্রতিপালিত হইতে পারে। কিন্তু শীতকালে বড় কষ্ট! সমুদয় পার্ব্বত্য ভূমি তুষারে আবৃত হইয়া যায়। সেই সময় উদ্ভিজ্জ-ভোজী পশুদিগের আহারীয় সামগ্রীর অতিশয় অনটন হয়। বাণ বৃক্ষের বাকল ও তুঁত গাছের পাতা লোকে শুকাইয়া রাখে, তাহাই তখন মেষদিগকে খাইতে দেয়। কিন্তু তাহা সুখাদ্য নহে, তাহা খাইয়া ধড়ে কেবল প্রাণটী মাত্র থাকে, শরীর অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া যায়। আবার বসন্তের আগমনে পাহাড়ে যখন পুনরায় ঘাস হয়, তখন তাহা খাইয়া মেষেরা অল্পদিনের মধ্যেই বলশালী ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া উঠে।

পঞ্জাবে ৬০ লক্ষের অধিক মেষ আছে। হিমালয়ে ও কাবুলের নিকটবর্ত্তী জিলা-সমূহে ইহার সংখ্যা অধিক। কুলু, লাহুল, স্পিটি, রামপুর প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে লোকে মেষ লইয়া এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে যায়। গ্রামে মেষ আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা মেষ-পালকদিগের নিকট হইতে পশম কিনিতে যায়। যাহার যেরূপ প্রয়োজন, মেষ-পালকেরা তদনুসারে গ্রামবাসীদিগকে মেষের গাত্র হইতে পশম কাটিয়া দেয়। পশমের বিনিময়ে গ্রামবাসীরা জনার, গোধূম প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী তাহাদিগকে প্রদান করে। সেই খাদ্য সামগ্রী মেষের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া মেষ-পালকেরা তাতারে গমন করে। সেই খানে এই খাদ্য সামগ্রী অধিক মূল্যে বিক্রীত

হয়। এই প্রকারে রামপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পশম একত্রীভূত হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের পশ্চিমাংশে শাপুর ও ডেরাইসমাইল খাঁ জিলায় বাড় ও থল নামক ভূমি আছে। এই ভূমি বহু বিস্তৃত, এখানে ফসল হয় না। মৃত্তিকা ফলশালী, কিন্তু জল নাই। পঞ্চাশ ষাট হাত গভীর কূপ খনন করিলে জল মিলিতে পারে; কিন্তু সে জল অতিশয় বোদা। এজন্য বাড় ভূমিতে শস্য উৎপন্ন করিতে পারা যায় না। ইহাতে ছোট ছোট বন্যবৃক্ষ আপনা-আপনি হয়, আর বর্ষার প্রারম্ভে ঘাসও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সে জন্য বাড় ভূমির উপর বহুসংখ্যক মেষ প্রতিপালিত হয়। থল ভূমি লবণ-পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাতেও কোন প্রকার কৃষিকার্য্য হয় না। এই বিস্তৃত প্রান্তর দেখিতে ঠিক সমুদ্রের ন্যায়, কেবল জলের তরঙ্গ না হইয়া, ইহার উপর বালুকার তরঙ্গ ক্রীড়া করে। বালুকা-তরঙ্গের মধ্যে মধ্যে কঠিন ভূমি আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মে। পাঁচ লক্ষ মেষ এই ঘাস খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। মেষ-পালনই এখানকার লোকের একমাত্র উপজীবিকা। মেষ-পালকেরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, এক্ষণে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের প্রতি তাহাদিগের ঘোরতর বিদ্বেষ। তাহারা বলে, "হিন্দু শব্দের অর্থ 'দাস' আর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, লোকে আপনাদিগকে ক্রীত দাস বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না!" ডেরা ইস্‌মাইল খাঁ বন্নু প্রভৃতি জিলার লোকেরা সে দিন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগকে পাগড়ি মাথায় দিতে দিত না। "হিন্দু" শব্দ "সিন্ধু" হইতে উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব; কিন্তু আরব্য, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের লোকেরা এই নামটী ভারতবাসী-দিগকে দিয়াছিলেন। সেই দেশের লোকেরা বলেন যে "হিন্দু" শব্দের অর্থ "ক্রীতদাস"। এই নিমিত্ত দয়ানন্দ স্বরস্বতীর শিষ্যগণ ও ভারত-ধর্ম্ম-মণ্ডলের সভ্যগণ হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রাজপুতানার নানা স্থানে অনেক মেষ পালিত হইয়া থাকে। রাজপুতানার মেষে অতি সুন্দর পশম হয়। বিকানির রাজ্যে প্রায় ৯ লক্ষ মেষ আছে, যোধপুরে ২॥০ লক্ষ, জয়পুরে ২॥০ লক্ষ, যসলমীড়ে ২ লক্ষ, সিরোহিতে ১ লক্ষ ইত্যাদি। বোম্বাই প্রদেশে ৩ লক্ষ মেষ আছে, বেরারে ৪ লক্ষ, মহীশূরে ২ লক্ষ ও মাদ্রাজে দশ লক্ষ। ভারতবর্ষে মেষের দুই জাতিই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণের মেষ,—যাহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, আর দুম্বা মেষ,—যাহা কাবুলের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিপালিত হয়। মেরিণো প্রভৃতি বিলাতি মেষ আনিয়া এ দেশে পশমের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত অনেক বার যত্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু সে যত্ন সফল হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে আমরা অষ্ট্রেলিয়া হইতে কাণপুরে একটী মেড়া আনিয়াছিলাম। মেড়াটী আমরা দেড় সহস্র টাকায় কিনিয়াছিলাম।

বৎসরের মধ্যে মেষের গা হইতে পশম দুইবার কাটিতে হয়, বসন্তে ও শরতে। প্রতিবার গড়ে আধ সের করিয়া পশম বাহির হয়, সুতরাং বৎসরে প্রতি মেষ হইতে এক সের করিয়া পশম হয়। এই হিসাবে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর সাড়ে সাত লক্ষ মণ পশম উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া বিদেশ হইতেও ভারতবর্ষে অনেক পশম আনীত হয়। বিদেশীয় পশম আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশ হইতেই অধিক আমদানি হয়। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার পশম আনীত হয়। ভারতবর্ষে যে পশম উৎপন্ন হয় ও বিদেশ হইতে যাহা এখানে আনীত হয়, তাহার কতক অংশ এ দেশে ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্ট বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকার পশম বিদেশে রপ্তানি হয়। ইতি পূর্ব্বে এ দেশ হইতে পশম বিদেশে প্রেরিত হইত না। এখানকার পশম নিকৃষ্ট বলিয়া বিদেশে ইহার কেহ ক্রেতা ছিল না। রপ্তানি ব্যবসা আরম্ভ হইয়া মেষ-পালক-দিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ঝঙ্গ প্রভৃতি জিলায় মেষ-পালকেরা পূর্ব্বে খাইতে পাইত না। আজ কাল মেষ-পালিকাদিগের হাতে সোণার বালা হইয়াছে। পঞ্জাব অঞ্চলের মেষ-পালকেরা পূর্ব্বে এক মণ পশম বেচিলে ৮ টাকার অধিক পাইত না, এক্ষণে তাহারা এক মণ পশম বেচিয়া ১৮॥০ টাকা পায়। ভারতবর্ষ হইতে যে পশম বিদেশে প্রেরিত হয়, তাহার অধিকাংশ বিলাত-বাসীরা ক্রয় করেন। ইহা হইতে তাঁহারা গালিচা, আসন ও কম্বল প্রস্তুত করেন। প্রতি বৎসর বিলাতে প্রায় দেড় কোটি মণ পশমের খরচ। এই পর্ব্বত-সদৃশ পশম-রাশির অধিকাংশ, অষ্ট্রেলিয়া

হইতে বিলাতে গিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ায় ইংরেজদিগের কীর্ত্তির কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ১০৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। যেরূপ আণ্ডামান দ্বীপে ভারতবর্ষের যাবজ্জীবন-কারাবাসিগণ প্রেরিত হয়, সেইরূপ ইংলণ্ড হইতে দ্বীপান্তরিত দুষ্টগণ তখন অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হইত। অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশই তখন জনশূন্য ছিল। অতি অল্পসংখ্যক অসভ্য অধিবাসীরা কেবল তখন এখানে বাস করিত। সেই অধিবাসীদিগের মাথার উপর ঘর ছিল না, দেহে বস্ত্র ছিল না, উদরে অন্ন ছিল না। উদরের জ্বালায় অনেক সময়ে তাহাদিগকে পোকা মাকড় খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইত। অষ্ট্রেলিয়ার তখন এইরূপ অবস্থা ছিল; কিন্তু যাই সেখানে জনকত ইংরেজ গমন করিলেন, আর দেশের অবস্থা অমনি পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথম প্রথম যে সকল ইংরেজ সেখানে গমন করে, তাহারা অতি নীচজাতীয়, আর অতি কঠোর অপরাধে অপরাধী; কেহ বা হত্যাকারী, কেহ বা চোর, এইরূপ; কিন্তু সেই জন কত নীচ-জাতীয় ইংরেজের বিক্রমে অতি অল্প কালের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইল। চারি দিকে বড় বড় নগর হইল, রেল হইল, তার হইল, জাহাজ হইল, নানা দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা অষ্ট্রেলিয়ায় আমদানি হইতে লাগিল। অধিক দূর যাইতে হইবে না, আমাদের এই দেশেই ইঁহারা যেরূপ উদ্যম, উৎসাহ ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। একদল সওদাগরের জন পাঁচ-ছয় গোমস্তা এখানে আসিয়াছিলেন। এই জন পাঁচ ছয় গোমস্তা, বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন!

ভারত বর্ষে যে পশম থাকিয়া যায়, তাহা হইতে কম্বল, লুই, শাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিলাতে যেরূপ ভাল কম্বল হয়, এ দেশে সেরূপ ভাল কম্বল হয় না। সেই জন্য ভাল কম্বল এ দেশে বিলাত হইতে আমদানি হয়। এ দেশের পশম হইতে যে ভাল কম্বল হইতে পারে না, তাহা নহে। পরিশ্রম করিলে এ দেশের পশম হইতে বিলাতি কম্বল প্রস্তুত হইতে পারে। মিরট জিলায় মিরপুর বলিয়া একটী স্থান আছে। পূর্ব্বকালে এখানে এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট কোমল কম্বল প্রস্তুত হইত। সে কম্বলের নাম ছিল 'সাঁস্‌লা'। মেষ-শাবক তিন চারি দিনের হইলে তাহার গাত্র হইতে পশম কাটিয়া এই কম্বল প্রস্তুত হইত। এক্ষণে আর এরূপ কম্বল হয় না, আর সেখানকার লোকে এখন ইহার নাম পর্য্যন্তও ভুলিয়া গিয়াছে। পঞ্জাবে নুরপুর বলিয়া একটী স্থান আছে, সেখানেএখন উত্তম কম্বল হয়। স্থূল কথা, ভারতবর্ষে যে কম্বল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি নিকৃষ্ট। দুঃখী লোকেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। হিন্দু সাধুদিগের যে রূপ গেরুয়া বসনটা না হইলে চলে না, পশ্চিমাঞ্চলে সেইরূপ মুসলমান ফকিরদিগের কম্বল না হইলে শোভা পায় না। রাজাদের রাজ্য-পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, এই কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শেখ সাদি বলিয়াছেন:—"দহ দরবেশ দর গলীমে বখস্পন্দ। ও দো বাদশাহ দর ইকলিমে ন গুঞ্জন্দ।"

দশজনফকির এক খানি কম্বলে শুইতে পারে, কিন্তু দুই জন রাজার এক দেশে সঙ্কুলান হয় না।

ভাল পশমের এই কয়েটী গুণ থাকা আবশ্যক—(১) কোমলতা, (২) স্থিতি-স্থাপকতা, (৩) সূক্ষ্মতা। এতদ্ব্যতীত পশম সব সমান দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। এ দেশের পশমে কিন্তু এ সকল গুণ ভালরূপে নাই। 'পশম ভাল করিব' এদেশের মেষ-পালকের মনে এ চিন্তা কখনও উদয় হয় নাই। অনেক স্থানে জল বায়ুর দোষে পশম ভাল হইবার সম্ভাবনাও নাই। অল্প দিন হইল, সংবাদপত্রে পড়িয়া ছিলাম যে, কোনও কোনও লোক মধ্য প্রদেশে মেষ-পালন করিবার কল্পনা করিতেছেন। পশম যাহাতে ভাল হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। যে জলে চূণের ভাগ অধিক আছে, সে জল পশমের পক্ষে বিশেষ অহিতকর। আর মেষের খাইবার নিমিত্ত ভাল ঘাসের চাষ করা আবশ্যক। ভূমিতে গন্ধকসংযুক্ত সার দিয়া ঘাসের চাষ করিলে, বিশেষ উপকারলাভ হইবার সম্ভাবনা। পশম পদার্থটীর প্রায় কুড়ি ভাগের এক ভাগ গন্ধক দিয়া নির্ম্মিত। সুতরাং মেষের আহারীয় দ্রব্যে গন্ধকের পরিমাণ কিছু অধিক থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষের পশমের আর একটী দোষ এই যে, ইহাতে অনেক কেশ মিশ্রিত থাকে। বন্য মেষের শরীরে পশম না হইয়া কেশের ভাগই অধিক হইয়া থাকে।

ন্য অবস্থায় মেষের কেশের মূলে অতি সামান্য ভাবে পশমের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের যত্নে কেশ গুলি ক্রমে খসিয়া যায়, তল-ভাগের পশম গুলি তখন বাড়িতে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়াছে যে, পুরুষ-মেষের গাত্রে কেশের পরিবর্ত্তে পশমের উৎপত্তি অতি শীঘ্র হয়, মেষী-গাত্রে তত শীঘ্র হয় না। এক-পুরুষে বন্য মেষের গাত্র হইতে সমুদয় কেশ অন্ত-র্হিত হইয়া পশমের আবির্ভাব হয় না। ক্রমে ক্রমে অনেক পুরুষে তবে এই ভাবান্তরটী সম্পূর্ণ ভাবে ঘটিয়া থাকে। যত্ন করিয়া এইরূপে কঠিন পশমের স্থানে কোমল পশম করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের মেষ পালকেরা কিন্তু নিতান্ত মূর্খ। সময়ের পরিবর্ত্তনের কথা তাহারা কিছুই জানে না। ভারতবর্ষে যে পশম উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে যে ৩০ লক্ষ টাকার পশম বিদেশে প্রেরিত হয়, এ কথা তাহারা কি করিয়া জানিবে? আর অল্প পরিশ্রম করিলে এখন যে কয় মণ পশম ৩০ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়, তাহাই ৪৫ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইতে পারে, তাহাও তাহারা জানে না। এই সকল বিষয়ে আমি যে প্রবন্ধ লিখিতেছে, তাহা যে, অরণ্যে রোদন হইতেছে, তাহা আমি বিলক্ষণরূপ জানি। তবে এই মনে করি যে, বীজ বপন করিয়া যাই, এক দিন না এক দিন এক ফল ফলিবে।

অল্প দিন হইল, তিব্বৎ হইতে ভারত বর্ষে পশম আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিব্বতের সহিত গোলমালে এখন কিছু কমিয়া গিয়াছে। তিব্বতের পশম, রজ্জুর আকারে এখানে আসিয়া-থাকে। কলিকাতার দুইচারি জন লোক তাহা খুলিয়া, তাহার পর সেই পশম ধুইয়া বিলাতে প্রেরণ করেন। শুনিতে পাই, এ কার্য্যে তাঁহা-দিগের দু-পয়সা লাভ হইতেছে। এরূপ শুনিয়াছি যে, চঙ্গ থঙ্গ উপত্যকায় অসংখ্য মেষ প্রতিপালিত হয়। খরিদদার নাই বলিয়া তাহার পশম লোকে ফেলিয়া দেয়। মেষ মারিয়া, তাহার মাংস শুকাইয়া মেষ-পালকেরা বিক্রয় করে। এক একটী শুকটী মেষের মূল্য আট আনা। শুটকী মেষের যদি কাহারও প্রয়োজন থাকে, তাঁহারা সিকিমের উত্তর কম্বলায় গিয়া কিনিয়া আনিবেন।

কম্বল, লুই প্রভৃতি বস্ত্র ব্যতীত, পশম হইতে এদেশে নমদা বলিয়া এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। নমদা করিতে হইলে পশমের সূতা কাটিয়া বুনিতে হয় না। পশম জমাইয়া নমদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, এক এক গাছি পশমের গায়ে শাখা-প্রশাখার ন্যায় অনেক গুলি দাড় আছে। অনেকগুলি পশম একত্র করিয়া চাপ দিলে এই দাড়ে দাড়ে লাগিয়া জমিয়া যায়। জমিয়া গিয়া যে কম্বলের মত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকে নমদা বলে। এই প্রকারে প্রস্তুত, আর এক প্রকার কম্বলকে গোদমা বলে। রাজপুতানা অঞ্চলে চকমা, দুমি প্রভৃতি নানা প্রকার কাপড় পশম হইতে প্রস্তুত হয়।

এই প্রবন্ধ যখন আরম্ভ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, বিলাতে পশম হইতে কি প্রকারে কাপড় হয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিব। কিন্তু এ কার্য্যে নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিষ্কার করিয়া সেই কলের কথা লিখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সাধারণে যাহা বুঝিতে পারিবেন না, এরূপ কথা লেখায় কোনও ফল নাই। কল কব্জার কথা ক্রমে ক্রমে হইবে। সেই জন্য এক্ষণে ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

নিরানব্বয়ের ধাক্কা।

(১২৯৯ সাল)

অনেক দিন অবধি আশার সহিত আশঙ্কা, নিরানব্বই সাল দেখিতে পাই, কি, না পাই। সে সাধ পূর্ণ হইল। এখন নিরানব্বয়ের ধাক্কা সাম-লাইয়া উঠিতে পারিলেই হয়!

আমার বয়স ত নিরানব্বই বৎসর হয় নাই, তথাপি তাহার দর্শনে এত আনন্দ! না জানি, যাহাদের যথার্থ নিরানব্বই বৎসর বয়স, তাহাদের এবার কত আনন্দ, কত আহ্লাদ! তাহারাই যথার্থ নিরানব্বয়ের ধাক্কা সামলাইতেছে!

এত আনন্দ, এত আহ্লাদ কেন? শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, উন্নতি-উচ্চা-ভিলাষ চূর্ণ-বিচূর্ণ; তবে এত আনন্দ, এত আহ্লাদ

কেন? হায়, ভোগ ত ভুক্ত হয় নাই, নিজেরই যে ভুক্ত হইতে হইয়াছে! তপ ত তপ্ত হয় নাই, নিজেই যে তপ্ত হইতে হইয়াছে! কালত গত হয় নাই, নিজেরই যে গত হইতে হইয়াছে! তবে এত আনন্দ, এত আহ্লাদ কেন? অবশ্যই এ আহ্লাদ-আনন্দের কারণ আছে। সে কারণ আর কিছু নহে,—লাভ, উপার্জ্জন। কতবার ভুক্তভোগী হইতে হয়, কত নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, কত নূতন বিষয় পুরাতন হইয়া যায়, কত পুরাতন বিষয় নূতন আকার ধারণ করে! কত রকমে লাভ, কত রকমে উপার্জ্জন! হারিলেও উপার্জ্জন, জিতিলেও উপার্জ্জন! জগতে উপার্জ্জন করিতেই আসা! যেমন শুদ্ধ বসিয়া থাকিলে, শরীর ভার বোধ হয়, তেমনি শুদ্ধ বসিয়া আছি মনে হইলে, জীবন ভার বোধ হয়। অতএব উপার্জ্জনই অবলম্বন, উপার্জ্জনই সুখ! আবার নিত্য-নূতন উপার্জ্জনে কত সুখ! "নূতন" কথাটীই কি স্বর্গীয়! নূতনের মূর্ত্তি কত উৎসাহে উদ্দীপ্ত, কত আনন্দে উৎফুল্ল! যত চমৎকারিত্ব, যেন নূতনেই নিহিত! যত মধুর ও যত সুন্দরের সঙ্গেই যেন নূতনের অ-বিনাভাব সম্বন্ধ! সেই নিত্য-নূতন উপার্জ্জনে কত সুখ! তাই এ জরাজীর্ণ দশাতেও বয়োবৃদ্ধিতে এত আনন্দ, এত আহ্লাদ।

আমরা জীর্ণ হই বটে, কিন্তু আমাদের জ্ঞান-পিপাসা কি জীর্ণ হয়? জীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন জ্ঞান-লালসা বাড়িতে থাকে। জ্ঞানোপার্জ্জনের কিঞ্চিৎ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, অপচয়ের কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা হইলে কতকষ্ট বোধ হয়! চক্ষুটী দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে, হায় হায়! জগৎ যেন আজি অন্ধকার হইল! কর্ণের আর শ্রবণ-পটুতা নাই, অর্দ্ধেক সুখ-সাধ অপূর্ণ হইয়া থাকিল! দন্তগুলি স্খলিত হইয়াছে, চর্ব্ব্য-চূষ্যে যেন সমস্ত স্বাদশক্তি লুপ্ত হইয়াছে! আবার উৎকট পীড়ায় সংশয়াপন্ন হইয়া যখন যাবতীয় জ্ঞেয় বা ভোগ্য হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় উপনীত হই, তখন কি মর্ম্মান্তিক কষ্টই অনুভব হইতে থাকে! অভাব হইয়াছে বলিয়া বা অভাব হইবে বলিয়া যে কষ্টানুভব, সেও ত একটা জ্ঞানলাভ। সেই-জাতীয় জ্ঞান হয় ত পূর্ব্বেওলাভ করিয়াছি, কিন্তু ঠিক্ সেই জ্ঞানটী ত পূর্ব্বে লাভ হয় নাই। সেই নিমিত্ত তাহাতে নূতনত্বও আছে, নূতনত্ব-জন্য লালসাও সুতরাং আছে। তবেই দেখ, জ্ঞানোপার্জ্জন-লালসা আমাদের নিবৃত্ত হয় না।

জ্ঞানার্জ্জন-পিপাসার নিবৃত্তি ত হয়ই না, অধিকন্তু অর্জ্জিত জ্ঞান, কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে ইচ্ছা হয়। ইহাই জ্ঞানের ভোগ-সুখ। ঐ ভোগ বিবিধ প্রকারে হয়। যেমন কতবার ঠেকিয়া শিখিয়াছি, তেমনি অর্ব্বাচীনদিগকে ঠেকিতে দেখিয়া শিখাইতে ইচ্ছা হয়। আর যাহারা আমাদের ন্যায় একবার শিক্ষা পাইয়াই তদবধি ঠিক্-পথে চলিতেছে, তাহাদিগের, আমাদিগেরই সজাতীয় জ্ঞান ও সেই জ্ঞানানুযায়ী কার্য্য দেখিয়া আনন্দ-বোধ হয়। অনেক কাল ধরিয়া অনেক প্রয়াসে যে আমরা ঐ সকল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত কিছু সম্মান পাইতেও ইচ্ছা হয়। ঐ অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের নিকট শিষ্যভাবে কেহ শিখিতে চাহিলে,পরমানন্দ বোধ হয়। শিখিতে না চাহিয়া অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কেহ যদি আত্মমতে চলিয়া বিপন্ন হয়, তাহাতেও একরূপ আনন্দ-বোধ হয়। যে সকল গৌরব-জনক, পুণ্যজনক কার্য্য করা হইয়াছে, তাহার স্মরণও জাগ্রৎ হইয়া কত আনন্দ প্রদান করে, তাহার কীর্ত্তনেও কত আনন্দ ও উৎসাহ! ফলত বৃদ্ধদশায় যাবজ্জীবনের সংগৃহীত বা উপযুক্ত জ্ঞানরাশির রোমন্থন করা যায় আর কি! সে একটা মহা-আরাম! বহুকালের গ্রাস, রোমন্থনেও বহুকাল লাগে। কোথায় তোমার নিরানব্বই!—নিরানব্বয়েই কি কুলায়? তবে কলিতে শতবর্ষই নাকি পরমায়ু, তাই তাহার কাছাকাছিতে এত আনন্দ!

এই নিমিত্তই ত বর্ষবৃদ্ধি আমাদের উৎসব। এই নিমিত্তই ত "চিরং জীব" আমাদের আশীর্ব্বাদ! এই নিমিত্তই ত আমাদের শ্রুতি "পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং, শৃণবাম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শতং, অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।" অর্থাৎ সেই ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে আমরা যেন শতবর্ষজীবী হই, যেন শত বর্ষকাল অস্খলিত দর্শনেন্দ্রিয়, অস্খলিত-শ্রবণেন্দ্রিয় ও অস্খলিত-বাগিন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া থাকি; ঐ শতবর্ষকাল যেন অদীনভাবে যাপন করি; শতবর্ষের পরও বহুকাল যেন আমরা ঐ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন

হইয়া থাকি। এই নিমিত্তই আমাদের শ্রুতি,—"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি, স জীব শরদঃ শতম্" হে কুমার, তুমি আমার পুত্রনামধারী আত্মা। তুমি শতবর্ষজীবী হও, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। কেননা, তোমার উক্ত জীবন আমারই তাবৎকাল-ব্যাপী জীবন মাত্র।

ফলত যেমন জীবন অপেক্ষা প্রিয় কিছুই নাই, তেমনি সেই জীবনের দীর্ঘতার ন্যায় কাম্য-পদার্থও আর কিছুই নাই। নিত্য নূতন পদার্থ জ্ঞান ও উপভোগের সহিত দিন দিন জীবন আরও প্রিয়তর হইয়া পড়ে। আমাদের জ্ঞেয় পদার্থের সীমা নাই; আমাদের জীবনের প্রিয়তাও নিঃশেষিত হয় না। যদিও যাঁহাকে জানিতে পারিলে আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—তাঁহার সম্যক্‌জ্ঞান বা মোক্ষ এ জীবনে লাভ না করাও যায়, তথাপি তাঁহার বিচিত্র রচনা ও তাঁহার অদ্ভুত মাহাত্ম্য-বোধাত্মক ধর্ম্ম এবং অর্থ ও কাম—এ সকলের প্রাপ্ত্যাশাও সামান্য প্রলোভন নহে। তদ্ভিন্ন, বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞানার্জ্জন-লোভও কি অসংবরণীয় নহে? দেখ, পূর্ব্বে যথায় গভীর-সলিলা নদী ছিল, এখন তথায় যে বিশাল বালুকাপ্রান্তর দেখিতেছ; পূর্ব্বে যথায় শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য ছিল, এখন তথায় যে শান্তজনপদ দেখিতেছ, তেমনি আবার পূর্ব্বে যাঁহাতে সর্ব্বগ্রাসী লোভ দেখিয়া-ছিলে, এখন তাঁহাতে যে সুমহৎ বৈরাগ্য দেখিতেছ; পূর্ব্বে যাঁহাতে ষড়্‌রিপুর আধিপত্যময় উন্মত্তযৌবনের সাম্রাজ্য দেখিয়াছ, তাঁহাতে এক্ষণে যে প্রৌঢ়-কালোচিত ধার্ম্মিকতার তপো-বন প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ;—ইহাও কি সামান্য উপভোগ্য পদার্থ! দৃশ্যের বিচিত্রতাই যে সর্ব্বা-পেক্ষা চিত্তাকর্ষক! সে দিনের জাত বালিকাকে আজি রত্নগর্ভা বসুন্ধরার ন্যায় গুরুগর্ভ-ভরক্লান্তা জননী দেখিলাম; ক্রীড়া ও রোদনমাত্র-পরায়ণ কুমারকে চপলস্বভাব স্ফূর্ত্তিশীল কিশোর দেখি-লাম; তাদৃশ কিশোরকে সুগঠিত-শরীর রূপ-লাবণ্যময় বল-বিক্রমশালী যুবা দেখিলাম; তাদৃশ যুবাকে আবার স্থিরতা, ধীরতা ও ধার্ম্মিকতার শান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ় দেখিলাম; তাদৃশ প্রৌঢ়কে আবার অস্তগমনোন্মুখ ভাস্করের ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি, শিথিলেন্দ্রিয়, ঋষিকল্প বৃদ্ধ দেখিলাম। এ সকল কি চমৎকার রঙ্গ! আবার দুই চারি বৎসর যাহার সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই, সেই কালের ব্যবধানে সাক্ষাৎ করিয়াও সহসা হয় ত তাহাকে চিনিতে কষ্ট হইল! কাহাকেও আবার তাহার নিজের মাত্র পরিচয়ে চিনিতেই পারিলাম না, কিন্তু তাহার পিতা বা পিতামহের পরিচয়ে তাহাকে বিলক্ষণরূপে চিনিলাম; এমন কি, তখন তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিতে, অবয়বে, আলাপে, ব্যবহারে, তাহার পিতৃ-পিতামহের পরিচয় পাইলাম! এ সকলই কি সামান্য কৌতুকাবহ? অন্যদিকে কাল-কৃত সামাজিক পরিবর্ত্তন দেখ। পূর্ব্বে পদব্রজে ভ্রমণপটু কত মহাত্মা অতিথি পাইতাম, আতিথ্য স্বীকারে কাহারও অপমান বোধ হইত না; আবার অতিথিসেবায় গৃহস্থেরই বা কত আগ্রহ ছিল! অতিথিরা প্রায়ই স্ব-পাকে ভোজন করিতেন, কেহ কখনও নারায়ণের প্রসাদ বলিয়া পরান্নও গ্রহণ করিতেন। এখন আর সে অতিথি-সমাগম নাই, গৃহস্থেরও আর সে অতিথি-সৎকার নাই। বিদেশীর সহিত আর সেরূপ আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছা নাই; স্বদেশীর সহিত,—এমন কি, স্বগ্রাম-বাসীর সহিতও আর সেরূপ আনুগত্যের অব-কাশ ও আকাঙ্ক্ষা নাই। কদাচিৎ কেহ অপরি-হার্য্য প্রয়োজনে পরগৃহে উপস্থিত হইলেও আর স্বপাক-পরপাক চিন্তা নাই। নগরে, দ্বারে-দ্বারে হিন্দু-আশ্রম বা হোটেল প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মজ্ঞান এখন অন্নেই আবদ্ধ! পূর্ব্বে ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষাদানে কাতরতা দূরে থাকুক্, পাছে গৃহ-স্থের কার্য্য-ব্যস্ততায় বা অসতর্কতায় ভিক্ষুক বিমুখ হইয়া যায়, এই চিন্তায় গৃহস্বামীকে উৎকর্ণ থাকিতে হইত; এখন খ্রীষ্টের পবিত্র বিশ্রাম-বাসরে কাহারও কাহারও দয়াস্রোত প্রবাহিত হয়। আবার উচ্চ শিক্ষিতের মুখে সে দিনেও কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহারা উদারতার সহিত ভিক্ষুকদিগকে বলেন,—"ঈশ্বর হাত-পা দিয়াছেন, তোমরা খাটিয়া খাইতে পার; তোমাদের সাহায্য করিলে আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনাদর করা হয়।" পূর্ব্বে পিতা ব্যবস্থাপক ও পুত্র ব্যবস্থানুবর্ত্তী, পতি প্রভু ও পত্নী দাসী, বৃদ্ধ পূজ্য ও যুবা পূজক ছিলেন, এখন তাহার কতই বৈপরীত্য দেখিতেছি! এখন পুরুষের অনেকাংশে স্ত্রীত্ব ও স্ত্রীর অনেকাংশে পুরুষত্ব

দেখিতে পাই! তখন বালককে জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার গোত্র, প্রবর, বেদ, শাখা, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিচয় পাওয়া যাইত; এখন তাহার কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কিরূপে বর্ত্তমান ইংরেজ-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার পবিত্র ইতিবৃত্ত এখনকার বালকগণের রসনাগ্রে সন্ধ্যাহ্নিকের ন্যায় অভ্রান্তভাবে বিরাজ করিতেছে দেখিতে পাইবে। এ সকলও কি সামান্য বিস্ময়কর! মতভেদে এ সকল সুখকর বা দুঃখকর যাহাই হউক, বিস্ময়কর ত বটেই। কিন্তু দুঃখেই হউক, সুখেই হউক, বিজ্ঞতা আমাদের বাড়িয়াছে। তাই বলি, যত দিন যায়, তত বিজ্ঞতা আমাদের বাড়ে। দীর্ঘজীবিনী নিকষা বলিয়াছিল,—"অনেককাল বাঁচিলে অনেক রকমই দেখা যায়, জলেও পাথর ভাসিতে দেখা গেল।" সেই বৃদ্ধার সহিত সকলকেই বলিতে হইবে,—"অনেককাল বাঁচিলে অনেক অদ্ভুতই দেখা যায়।" সেই অনেক অদ্ভুত দেখার প্রতি অনেককাল জীবন যে প্রধান কারণ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ফলত দীর্ঘজীবন সর্ব্বথা সকলের কাম্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ জগতে প্রায় কিছুই অব্যভিচারী দেখা যায় না। দীর্ঘজীবন সকলেরই সর্ব্বথা কাম্য বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিলাম, ইহাতেও ব্যভিচার আছে। এমন হতভাগ্যও দেখা যায়, যাহারা স্বচ্ছন্দে স্বহস্তে স্বজীবন ধ্বংস করে। এমন যে বেদের কঠোর শাসন,—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" অন্ধ-তমসাবৃত অসূর্য্য-নামক নরকে তাহারা বাস করে, যাহারা ইহলোকে আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়া থাকে। এমন যে সংহিতার গুরুতর নিষেধ,—"নাশৌচং নোদকং নাগ্নিং নাশ্রুপাতঞ্চ কারয়েৎ।" আত্মঘাতীর সম্বন্ধে অশৌচ, তর্পণ, অগ্নিক্রিয়া, এমন কি, অশ্রুপাতও করিবে না। এ সকল শাসনাদি-সত্ত্বেও দুর্ম্মতিরা আত্মঘাতী হইয়া থাকে। এরূপ সর্ব্বাধিকপ্রিয় জীবনরত্ন বিনশে মানুষের কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য কথা বটে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহাও অসম্ভব বোধ হয় না। যাহাদের জীবনে পূর্ব্বোক্ত অর্জ্জন-সুখ ও সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জিতের ভোগ-সুখ বা তাহার আশা নাই, তাহারা শুষ্ক জীবন লইয়া কি করিবে? চিরকাল ঐরূপ নিষ্কর্ম্মা-জীবন অতিবাহন তাহাদের পক্ষে মহাভার বোধ হয়। ঐ সকল অকর্ম্মা, আত্মবিরক্ত লোক জীবদবস্থাতেই আত্মহত্যা করিয়া বসিয়া থাকে। তাহারা যতকাল জীবিত থাকে, ততকাল ইহলোকেই তাহাদের অন্ধ-তমসাবৃত নরকলোক ভোগ হয়। দেখ, যাহারা এক একটী করিয়া যাবজ্জীবনে নিরানব্বইটী মুদ্রার সঞ্চয়ই করিয়াছে—কখনও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যয় করিতে সমর্থ হয় নাই, তাদৃশ ভোগহীন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই ত নিরানব্বয়ের ধাক্কারূপ অপবাদ রটিত হইয়াছে! ভোগহীন পরমায়ুও সেইরূপ অপবাদময়! তাই শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন,—"জীবেম শরদঃ শতং", তেমনি আবার স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" * ইহলোকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানশীল হইয়াই শতবর্ষকাল জীবিত থাকিবার বাসনা করিবে। গীতায়ও নানাস্থানে বলিয়াছেন,—"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।" হে পার্থ! উক্ত প্রকারে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্র যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে, ইন্দ্রিয়মাত্র-রমণশীল সেই পাপজীবন বৃথা দেহধারণ করে। স্থানান্তরে,—"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।" হে পার্থ! ফলে আসক্তিশূন্য হইয়া সতত কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অন্য স্থানে—,"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং" হে অর্জ্জুন! যে সকল কর্ম্মে শাস্ত্র তোমায় অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তুমি সেই সকল কর্ম্মের আচরণ কর।

তাই বলি, কর্ম্ম কর ভাই-বন্ধু সব! জগতে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মে অনন্ত পুণ্যসঞ্চয়, অনন্ত সুখ। কর্ম্মক্ষম শরীর পাইয়া কর্ম্মবঞ্চিত হইয়া থাকিও না। কর্ম্ম করিবার নিমিত্তই শতবর্ষ পরমায়ু কামনা কর। যাহা কর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন, ভোগহীন—শুদ্ধ ঔদাস্য ও বিরক্তিময় শুষ্কজীবন, নিরানব্বয়ের ধাক্কা বলিয়া যাহার নিন্দাবাদ প্রচারিত আছে, তাহা যেন তোমাদিগকে স্পর্শ না করে। তাহা ত জীবন্মৃত-দশা! সে মৃত্যুতেই বা কি হইবে, প্রকৃত মৃত্যুতেই বা কি হইবে।

* এই সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা দ্বৈতবাদিগণ ও অদ্বৈতবাদিগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার করিয়া থাকেন।

মৃত্যু হইলেই ত, চিরকালের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত হইলে না! মৃত্যু-অন্তেই যে পুনরাগমন! সেও ত মহা কর্ম্মভোগ! তবে কেন সৎকর্ম্ম সঞ্চয় কর না! সৎকর্ম্ম সঞ্চয় করিবার নিমিত্তই কেন দীর্ঘজীবন কামনা কর না! পুনঃপুনরাগমনময় সুদীর্ঘজীবনে কেন তোমাদের বিরক্তি হউক না! একজন্মেই কেন পুনরাবৃত্তির অঙ্কুর উন্মূলন কর না! নিরানন্দই অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হও, কেহ নিন্দা করিবে না;—ঋষিতুল্য বলিয়া সুখ্যাতি করিবে, সুপ্রতিষ্ঠাই করিবে। দীর্ঘজীবনোপার্জ্জিত সৎকর্ম্মরাশিতেই সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস হইবে! তাহাতেই পরম জ্ঞান বা মুক্তি!

আমরা অন্য কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া সাগর-সঙ্গমে অগ্রসর হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। অতএব নিবৃত্ত হইলাম। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

বিদ্যা।

মনুষ্যমাত্রেরই বিদ্যালাভে অধিকার আছে বিদ্যালাভ করিতে হয়, এই জন্য বিদ্যার প্রসঙ্গে মনুষ্যমাত্রেই সংস্পৃষ্ট। এতৎসম্বন্ধে অনেক কথাতেই সকল মনুষ্যেরই অধিকার আছে।

বিদ্যা সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য-বিষয়ে অভিজ্ঞতা, বিদ্যার উপর অধিকতর আসক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই সমুদায়ই বিদ্যাপ্রসঙ্গ-আলোচনার সাক্ষাৎ-পরম্পরা ফল।

যাহা লিখিত হইবে, তৎসমস্ত ভাবই—হয় মনে, না হয় গ্রন্থে বিকীর্ণ থাকিলেও তাহা একত্র সম্মিলিত করিয়া প্রকাশ করা উচিত; কেননা, সেই সংগঠিত প্রবন্ধ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রতিপত্তি, অনায়াসেও অনেকের হইয়া থাকে। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া এক্ষণে আমি বক্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

বিদ্যা, জ্ঞানের অন্যতমরূপ হইলেও জ্ঞান ও বিদ্যা দুইটী শব্দের অর্থ এক নহে। বিদ্যা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে বিদ্যার স্বরূপ কীর্ত্তন করা উচিত বিবেচনায় উপরে ঐ কয়টী কথা লিখিত হইল। বিবরণ এই স্থানে দিতেছি। জ্ঞান দ্বিবিধ;—স্বাভাবিক এবং শিক্ষা-জন্য স্বাভাবিক জ্ঞান,—জীব ও জড় জগতের সাধারণ পার্থক্য এবং তরু-লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির জাতিগত পার্থক্য সম্পাদন করিতেছে। "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে" এই বাক্য দ্বারা এই জ্ঞানেরই উল্লেখ হইয়াছে। শিক্ষাজন্য জ্ঞান, বিশেষতঃ বহুবিধ হইলেও বিদ্যা এবং তদ্ভিন্ন—এই দুই রূপে তাহার সাধারণতঃ বিভাগ করা যাইতে পারে। তবে শেষোক্ত শিক্ষাজন্য জ্ঞান ন্যূনাধিক পরিমাণে অপর জীবেরও আছে; কিন্তু বিদ্যা, মনুষ্য ভিন্ন অপর জীবে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। শুক-সারিকা প্রভৃতি পক্ষীর বিদ্যাবত্তার কথা গ্রন্থে শুনা যায়, কিঞ্চিৎ আভাস অনেকে স্বচক্ষেও পাইয়া থাকিবেন। বানরের শিল্পজ্ঞানের পরিচয়ও বোধ হয় অনেকেই পাইয়াছেন। কিন্তু পশুপক্ষীর এই বিদ্যাও মনুষ্য-প্রদত্ত।

সুখ-দুঃখানুভব সর্ব্বজীবের স্বাভাবিক; কিন্তু সুখ-দুঃখ সর্ব্বজীবের সমান নহে। ধাবনকৌশল জ্ঞান, ভোজন-ব্যাপার-কৌশল প্রভৃতি জ্ঞান, সকলেরই শিক্ষাজন্য। কিন্তু এই শিক্ষাজন্য জ্ঞান বিদ্যা নহে; বিশেষ রকম বুদ্ধির পরিচায়ক যে জ্ঞান, তাহারই নাম বিদ্যা। শিক্ষাজন্য অন্য জ্ঞান, বহু ব্যক্তির এক প্রকার হয়; কিন্তু বিদ্যা দুই জনেরও এক প্রকার হইতে পারে না।

বিদ্যা ভিন্ন জ্ঞানের শিক্ষা-রীতি কিছুই নাই; শিক্ষকের যত্ন কিছুমাত্র না থাকিলেও হইতে পারে। এ জ্ঞানলাভে, শিক্ষার্থীর অনুচিকীর্ষাই সর্ব্বপ্রধান কারণ। বিদ্যার পক্ষে তাহা নহে; শিক্ষারীতি চাহি, শিক্ষকের যত্ন চাহি, শিক্ষার্থীর বুভুৎসা চাহি, বুদ্ধি চাহি।

এই শিক্ষারীতি প্রভৃতির কথা পরম্পরাগত বিদ্যা সম্বন্ধেই জানিবে। কিন্তু প্রথম বিদ্যা সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। ফলতঃ শিক্ষাজন্য অপর জ্ঞানের মূল অনুচিকীর্ষা। বিদ্যার মূল অনুসন্ধিৎসা। প্রচলিত অপর জ্ঞানের শিক্ষক সজাতি। অথবা সজাতি হইতেই যে শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাই প্রচলিত অপর জ্ঞানের আর একটী কারণ। কিন্তু বিদ্যার শিক্ষক,—প্রকৃতি, জড়, অপর জীব এবং সজাতি।

বলা বাহুল্য যে,পরম্পরাগত বিদ্যার সজাতিই শিক্ষক। ইউরোপ প্রদেশে যে এক্ষণে রসায়ন ও বিজ্ঞান-বিদ্যার সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে,

প্রকৃতিই তাহার প্রধান শিক্ষক। পশু-পক্ষীর শিক্ষকতাও যে তাহাতে না আছে, এমন নহে। মর্ম্মবেত্তা মাত্রেই এ সব অবগত আছেন। ভাগবতে অপর জীবের নিকট তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষার কথাও আছে।

শিক্ষাজন্য অপর জ্ঞান, শিক্ষার সীমা লঙ্ঘন করে না, করিতে পারে না; করিলেও 'কিম্ভূত-কিমাকার' হয়।

বিদ্যা,—শিক্ষাকে সোপান করিয়া শিক্ষার সীমা অতিক্রম করে; করিতে করিতে অনেক সময় অত্যুৎকৃষ্ট হয়। শিক্ষাজন্য দ্বিবিধ জ্ঞানের তত্ত্ব এই সংক্ষেপে কথিত হইল। এইজন্যই বলিয়াছি, বিদ্যা—জ্ঞান-বিশেষ বটে, কিন্তু যাহাকে জ্ঞান বলা যাইবে, তাহাই যে বিদ্যাপদ-বাচ্য—এরূপ নহে। তত্ত্বোপদেশক শাস্ত্রে 'বিদ্যা' শব্দে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। আমরা ব্যবহার অনুসরণ করিয়া বিদ্যার সাধারণ লক্ষণ করিলাম। আমাদিগের লক্ষিত বিদ্যাপদার্থকে নীতিশাস্ত্র দুইটী সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, যথা;—বিদ্যা এবং কলা।

বিদ্যার প্রধানতঃ ভেদ, দ্বাত্রিংশৎ প্রকার। কলার প্রধানতঃ ভেদ, চতুঃষষ্টি প্রকার। যে জ্ঞানের সঙ্গে বাক্‌শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাই বিদ্যা এবং যে জ্ঞানবিশেষ বাক্‌শক্তি না থাকিলেও অর্জ্জন করা যায়, তাহাই কলা। শাস্ত্র এবং নৃত্যাদি কার্য্যও যথাক্রমে বিদ্যা এবং কলা নামে পরিচিত।

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ; আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব-শাস্ত্র এবং তন্ত্র—চতুর্ব্বেদের এই চারি উপবেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ—এই ছয় বেদাঙ্গ; মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, যোগ, ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, নাস্তিক-মত, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, কাব্য, দেশ-ভাষা, অবসরোক্তি, যাবন-মত এবং দেশাদি-প্রচলিত ধর্ম্ম—সর্ব্বসমেত এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার বিদ্যা। অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের মধ্যে এক একটী বিষয়ে জ্ঞান, এক একটী বিদ্যা। এই দ্বাত্রিংশৎ বিদ্যার মূলভিত্তি, দ্বাত্রিংশৎ বিদ্যা নামে পরিচিত শাস্ত্রাবলীর পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিতেছি;—

ঋগ্বেদ।—বেদমাত্রই দ্বিবিধ;—মন্ত্রাত্মক এবং ব্রাহ্মণাত্মক। যে সকল মন্ত্র এক পাদ বা অর্দ্ধরূপে পরিপঠিত হয় ও যে সকল মন্ত্র হোতৃ-বিহিত কার্য্যের উপযোগী, তাহাই ঋগ্বেদের মন্ত্র-ভাগ এবং তৎসমুদায়ের ভাবোদ্দেশ্য-প্রকাশক বেদাংশই ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণভাগ।

যজুর্ব্বেদ।—প্রশ্লিষ্টভাবে পঠিত, ছন্দোগান-বর্জ্জিত, অধ্বর্য্যু-কর্ম্ম-সম্পাদক মন্ত্র ও তদুপযোগী ব্রাহ্মণ,—যজুর্ব্বেদ।

সামবেদ।—গেয় মন্ত্র ও তদুপযোগী ব্রাহ্মণ,—সামবেদ-পদবাচ্য।

অথর্ব্ববেদ;—উপাস্য-উপাসনাত্মক।

আয়ুর্ব্বেদ;—ঋগ্বেদের উপবেদ। যাহার উপদেশ মত চলিলে দীর্ঘ-আয়ুঃ লাভ হয়, যাহা বিজ্ঞাত থাকিলে আয়ুর্জ্ঞান-হয়, সেই শাস্ত্রই আয়ুর্ব্বেদ। *

ধনুর্ব্বেদ;—যজুর্ব্বেদের উপবেদ। অস্ত্র-শস্ত্রাদি বিদ্যায় পারদর্শিতা, যুদ্ধনৈপুণ্য এবং ব্যূহ- রচনাদিকার্য্য-দক্ষতা যে শাস্ত্র হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাই ধনুর্ব্বেদ।

গান্ধর্ব্ব-শাস্ত্র বা গান্ধর্ব্ববেদ;—সামবেদের উপবেদ। যে শাস্ত্রে রাগ-রাগিণী, স্বর-তাল-সম্বলিত সংগীতে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাই গান্ধর্ব্ববেদ।

তন্ত্রশাস্ত্র;—অথর্ব্ববেদের উপবেদ। বিবিধ দেব-দেবীর মন্ত্র, রহস্য এবং ষট্‌কর্ম্ম-প্রয়োগ—যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, তাহাই তন্ত্রশাস্ত্র।

শিক্ষা।—স্বর, কাল, স্থান এবং প্রযত্ন ভেদে বর্ণপাঠের নিয়ম—যে শাস্ত্রে শিক্ষা দেয়, তাহাই শিক্ষা।

কল্প,—দ্বিবিধ;—শ্রৌতকল্প এবং স্মার্ত্ত-কল্প। কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদক শাস্ত্রই কল্প নামে অভিহিত।

ব্যাকরণ।—যে শাস্ত্রে ধাতু, সন্ধি, সমাস এবং প্রত্যয়াদি দ্বারা পদ-সাধন হয়, তাহাই ব্যাকরণ।

নিরুক্ত।—বৈদিক-পদাবলীর অর্থ পর্য্যায়-শব্দ—এই সমস্ত যাহাতে আছে, অর্থাৎ সহজ

* বিদ—বিদ্দ+লাভ। বিদ—জ্ঞান।

কথায় যাহাকে 'বৈদিক-অভিধান' বলা যায়, তাহাই নিরুক্ত।

জ্যোতিষ।—গণিতাদি-সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি-নিরূপণ ও তদ্দ্বারা কাল-নির্ণয় যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তাহাই জ্যোতিষ।

ছন্দঃশাস্ত্র।—কোন্ পদ্য কিরূপ, পদ্যের লক্ষণ কি, ইত্যাদি বিষয় যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই ছন্দঃশাস্ত্র।

মীমাংসা।—বেদবাক্যের বিধি-ঘটিত বিচার কর্ম্ম, ফল ইত্যাদি বিষয় যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই কর্ম্ম-প্রধান শাস্ত্রই মীমাংসা।

ন্যায়।—প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ-প্রমাণ-সাহায্যে ভাবাভাব-পদার্থ-ঘটিত বিচার-বিতর্ক যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই ন্যায়। কণাদোক্ত বৈশেষিক দর্শনও এই ন্যায়ের অন্তর্গত।

সাংখ্য।—মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতি এবং পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকৃতি,—সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা যাহাতে আছে, তাহাই সাংখ্য শাস্ত্র।

বেদান্ত।—'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম,' জগতে তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; পরিদৃশ্যমান সমুদয় বস্তুই মিথ্যা,—কেবল স্বপ্নবৎ মায়াকল্পিত;—এইমত যে শাস্ত্রের—তাহাই বেদান্ত।

যোগ বা পাতঞ্জল।—প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে যে শাস্ত্র প্রধানতঃ উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই যোগ বা পাতঞ্জল।

ইতিহাস।—কোন রাজার চরিত্র-বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাচীনকালের কথা যে শাস্ত্রে বর্ণিত থাকে, তাহাই ইতিহাস।

পুরাণ।—সৃষ্টি, প্রলয়, বংশচরিত, বংশানুচরিত এবং মন্বন্তর—এই পাঁচটী বিষয় যাহাতে কীর্ত্তিত হয়, তাহাই পুরাণ।

স্মৃতি।—যে শাস্ত্রে বেদের অবিরুদ্ধ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম এবং প্রাসঙ্গিক অর্থনীতি কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই স্মৃতি।

নাস্তিকমত।—যুক্তিই একমাত্র প্রবল; সমুদয় পদার্থই স্বাভাবিক, ঈশ্বর কিছুই করেন না, সুতরাং ঈশ্বর নাই; বেদও ধূর্ত্তপ্রলাপ-মাত্র;—এই সমুদয় লইয়াই নাস্তিকমত।

অর্থশাস্ত্র।—শ্রুতি-স্মৃতির অবিরোধে রাজার কর্ত্তব্য-উপদেশ যে শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে এবং অর্থোপার্জ্জনের সুযুক্তি যাহাতে আছে, তাহাই অর্থশাস্ত্র।

কামশাস্ত্র।—যাহাতে শশ-মৃগাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষজাতি, অনুকূল ধৃষ্ট প্রভৃতি নায়ক-ভেদ, পদ্মিনী শঙ্খিনী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ নারী-জাতি, স্বীয়া পরকীয়া প্রভৃতি নায়িকা-ভেদ এবং অনুরাগাদির লক্ষণ আছে, তাহাই কামশাস্ত্র।

অলঙ্কার।—উপমা, ব্যতিরেক, অপ্রস্তুত-প্রশংসা, রূপক, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা প্রভৃতি অলঙ্কার-নিচয়ের লক্ষণ যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাই অলঙ্কার। সুবর্ণাদির অলঙ্কার যেমন শারীরিক শোভা সম্পাদন করে, উক্ত উপমা প্রভৃতিও সেইরূপ কাব্যের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে; এইজন্যই তৎসমস্তের নাম অলঙ্কার।

কাব্য।—সরস বাক্যই কাব্য। কাব্য,—নির্দ্দোষ এবং অলঙ্কৃত হইলে, বড়ই চমৎকার হয়। পদ্যাদি-ভেদে, কাব্য নানা প্রকার।

দেশভাষা।—সংস্কৃত, দেবভাষা; তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত ভাষাই দেশভাষা। সেই সকল ভাষা দেশ-বিশেষে ব্যবহৃত বলিয়া তাহাকে দেশভাষা বলা যায়।

অবসরোক্তি।—শাস্ত্রীয় সঙ্কেত এবং কৌশিক বৃত্তির সাহায্য ব্যতীত তাৎপর্য্য-বোধক বাক্য-বৈচিত্র্যই অবসরোক্তি।

যাবন-মত।—ঈশ্বর জগতের কারণ; তিনি নিরাকার অদৃশ্য। শ্রুতি স্মৃতি কিছু নহে; কিন্তু বেদাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে;—এই সমুদয় যাবন-মত।

দেশাদি-ধর্ম্ম।—কল্পিত-শ্রুতি-মূলক বা অমূলক অথচ লোক-ব্যবহার-সিদ্ধ দেশভেদে ও বংশভেদে নানাবিধ দেশাদি ধর্ম্ম আছে।

এই দ্বাত্রিংশৎ বিদ্যা। কলা প্রধানতঃ চতুঃষষ্টি। এই কলারও লক্ষণ কীর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু কলার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নাই।

(১) হাবভাবাদি-যুক্ত নৃত্য, (২) বিবিধ বাদ্য-

ভেদ ও তদ্বাদনে অভিজ্ঞতা, (৩) স্ত্রীপুরুষের বস্ত্রালঙ্কার-পরিধাপন-কৌশল, (৪) বহুরূপী সাজা-ইতে জানা, (৫) শয্যাস্তরণ-সংযোজন ও মাল্যাদি গ্রন্থন, (৬) দ্যূতাদি বিবিধ ক্রীড়া এবং (৭) নানাবিধ সুরত-জ্ঞান—এই সপ্ত কলা, গান্ধর্ব্ব-শাস্ত্রের অনুগত।

(১) মকরন্দাদি দ্বারা আসব ও মদ্যাদি প্রস্তুত করা, (২) বিদ্ধ কণ্টকাদি অনায়াসে উদ্ধার করা এবং শিরাব্রণ-বেধন-নৈপুণ্য, (৩) দ্রব্যবিশেষ-যোগে অন্নাদি পাক করা, (৪) বৃক্ষাদি রোপণ ও তদীয় পালনে উত্তম রূপ জ্ঞান, (৫) পাষাণ এবং সুবর্ণাদির বিদারণ, পাষাণাদির ভস্মীকরণ, (৬) গুড় প্রভৃতি সমুদয় ইক্ষু-বিকারের উৎপাদনে অভিজ্ঞতা, (৭) ধাতু-মিশ্রণ এবং ওষধি-মিশ্রণে অভিজ্ঞতা, (৮) মিশ্রিত ধাতুকে অসঙ্কীর্ণভাবে পৃথক্ করা, (৯) ধাতু প্রভৃতির মিশ্রণে যে উৎকৃষ্ট ফল হয়, তাহাতে অভিজ্ঞতা এবং (১০) অপর দ্রব্য হইতে ক্ষার-নিষ্কাশনে সামর্থ্য—এই দশবিধ কলা, আয়ুর্ব্বেদের অনুগত।

ক্রমশঃ—

আমার জীবন-চরিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরদাদা রামকমল চক্রবর্ত্তীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইনিই বিদ্রোহের পর আফিঙ-বিহনে দুই দিনকাল এক রকম অচেতন ছিলেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম তখন ৭৫ বৎসরের কম নহে; বরং অধিক হইবে। দেখিতে ঠিক পাকা আমটীর মত। তাহার উপর আনাভি-বিলম্বিত প্রকাণ্ড শ্বেত চামরবৎ দাড়ী ছিল। গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা। কপালে, গ্রীবায়, বক্ষে, হস্তমূলে শ্বেত-চন্দনের শোভা। আজ প্রায় একমাস হইল, তিনি গৈরিক-বসন পরিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন;—তাহাতে তাঁহার অঙ্গের অধিকতর শ্রী-বৃদ্ধি হইয়াছে। নিরামিষাশী, হবিষ্যান্ন-ভোজী,—মুখে সদাই হর-হর, বম-বম ধ্বনি লাগিয়াই আছে। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে সেই প্রাচীনকালের পৌরাণিক মুনি-ঋষি-যোগী বলিয়া ভ্রম হইত।

হরদেব দাদার বাসায় ঠাকুরদাদা থাকিতেন। দাদা যখন সপরিবারে বেরিলী ত্যাগ করিয়া কাশীপুর রাজধানীতে গমন করেন, তখন ঠাকুর-দাদা বার্দ্ধক্য বশতঃ শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহাদের সহিত বিপদ্‌সঙ্কুল পথে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। সুতরাং হরদেব দাদার বেরিলীর বাসায় আমরা দুই ভাই এবং ঠাকুরদাদা—এই তিনজনে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

সকল বাঙ্গালীর বেরিলী-সহর ত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম হইল,—কিন্তু ঠাকুরদাদা অবাধে বেরিলীতে বাস করিবার আদেশ পাইলেন। ঠাকুরদাদা সহর-কোতোয়ালকে বলেন,—"আমি সন্ন্যাসী,—আমার অন্তিম-দশা উপস্থিত; আমার দেহ শিথিল হইয়া আসিতেছে; চলিবার শক্তি নাই;—আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইলে পথেই আমি মারা যাইব। আর আমার দ্বারা নবাব-খাহাদুরের কোনও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।" ঠাকুরদাদা এই কথাগুলি বেশ গুছাইয়া বলায় কোতোয়ালের কেমন দয়া হইল। সে অনিমিষ-লোচনে ঠাকুরদাদার সেই প্রশান্ত, সুন্দর, গম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিল। শেষে বলিল,—"আপনি ফকীর, আপনি এখানে থাকুন।"

শ্রাবণ মাসের শেষভাগ, বর্ষাকাল। গগন-পটে মেঘমালার শোভা। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। বোঁ-বোঁ শব্দে বায়ু বহিতেছে। পথ পিচ্ছিল,—একহাঁটু কাদা।

নগর-ত্যাগের ত হুকুম হইল,—কিন্তু এখন—এই দুর্দ্দিনে যাই কোথা? অর্থ নাই, বস্ত্র নাই, তৈজসপাত্র নাই,—এই ভিখারীর বেশে যাই কোথা? যে পথে যাইব, শুনিতে পাই, সেই পথেই দলে দলে দস্যু-তস্কর তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে লইয়া ঘুরিতেছে। শুনিতে পাই, পথে বাঙ্গালী দেখিলেই বিদ্রোহীগণ ধরিতেছে, মারিতেছে, কয়েদ করিতেছে, কাটিয়া ফেলিতেছে। আমি নিঃসম্বল, অস্ত্রশস্ত্র-বিহীন,—ইহার উপর, সঙ্গে ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ আছেন। কিন্তু পথে বিপদ্ বলিলে, ছাড়ে কে? বেরিলীতে থাকিলে,

হয় কয়েদ, না হয় ফাঁসি। ইহার পক্ষে সহর ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। পথে যাহা হয় হউক।

নাইনিতালে ইংরেজের সহিত মিলিত হইবার কি কোন উপায় নাই? পলায়িত ইংরেজগণের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা আমার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ইংরেজ আজ মহাভ্রমে পতিত; যদি আমি একশত সুশিক্ষিত গোরাসৈন্য পাই, তাহা হইলে, একদিনেই বেরিলী-বিজয় সংসাধিত হয়। ইংরেজের ভ্রম দূর করিব,—প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিব,—ইংরেজকে উৎসাহিত করিব—বলিব,—"ভয় নাই,—খাঁ বাহাদুরের উপর কেহই সন্তুষ্ট নহে,—নবাবের যে দশ বার হাজার ফৌজ আছে, তাহারা কাপুরুষ, অকর্ম্মণ্য,—একটী তোপের গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওয়াজ হইতে থাকিলে, তাহারা নিশ্চয়ই রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে পলাইবে।"

তবে নাইনিতাল যাওয়াই শ্রেয়স্কর। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া যাই? আগে কাশীপুরের রাজা শিবপ্রসাদের কাছে গমন করিব; তথা হইতে নাইনিতাল যাইব। এ পথ দিয়া গেলে, যদিও কিছু ঘোর হইবে বটে, কিন্তু হরগোবিন্দ দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইবে; তাঁহার পরামর্শ-অনুযায়ী, আমরা সকল বাঙ্গালীই তথা হইতে একত্র নাইনিতাল যাইব।

খাঁ বাহাদুর খাঁর সহিত যদিও পূর্ব্বে আমার কিঞ্চিৎ আলাপ-পরিচয় ছিল, কিন্তু বিদ্রোহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সহিত দেখা করি নাই। পাছে খাঁ বাহাদুর আদর করিয়া বলেন, "বাবুজী! আমার অধীনে একটী চাকরী গ্রহণ করুন,"—ইহাই আমার ভয়।

বখ্‌তখাঁ দিল্লী চলিয়া গেলেও, আমি বেরিলী সহরে এক রকম লুক্কায়িতই থাকিতাম, দিবসে বড় একটা বাহির হইতাম না। সন্ধ্যার পর পরিবর্ত্তিতবেশে, এক রকম ছদ্মবেশেই, বন্ধুবান্ধবের বাটী গমন করিতাম।

কল্য পলায়নই ঠিক হইল, কিন্তু রাজদরবারে দরখাস্ত করিয়া, মুক্তিপত্র লইতে গেলে, পাছে ধরা পড়ি, তখন ইহাই ভয় হইতে লাগিল। আবেদন-পত্রে আমার নাম স্বাক্ষর দেখিয়া, আমাকে চিনিতে পারিয়া, নবাব-সাহেব যদি বলেন, "দুর্গাদাসকে সহর ত্যাগ করিতে দেওয়া হইবে না। দুর্গাদাসকে দরবারে হাজির কর। দুর্গাদাস আমার অধীনে এক চাকুরি লইয়া এখানে থাকুক।" তাহা হইলে ত আমি গিয়াছি!! বরং বখ্‌ত খাঁকে পার ছিল, কিন্তু খাঁ বাহাদুরের হাত হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই। বিশেষ, দেওয়ান শোভারাম যেমন দুর্দ্ধর্ষ, তেমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ইহাঁদের জালে একবার পড়িলে আর উঠিবার বা অব্যাহতি পাইবার উপায় থাকিবে না। যদি 'চাকুরি করিব না' বলি, তাহা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েদ বা ফাঁসি হইতে পারে। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বে, বাধ্য হইয়া, প্রাণভয়ে যদি চাকুরিই করিতে থাকি, আর এ কথা যদি ইংরেজ-রাজের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে ইংরেজ ভাবিবে,—"দুর্গাদাস বাবু কি বেইমান!! এত দিন আমাদের লুণ খাইয়া, এক্ষণে মুসলমানের অধীনে চাকুরি লইয়া, মুসলমানেরই গুণ গাহিতে আরম্ভ করিল।" আরও এক কথা, দুই দিন হউক, দশ দিন হউক, একবৎসর হউক, দুই বৎসর হউক—অনতিবিলম্বে ইংরেজ সসৈন্যে আসিয়া নিশ্চয়ই এই বিদ্রোহ দমন করিবেন,—আর খাঁ বাহাদুরের রাজত্ব-লোপ হইবে। তখন আমার দশায় কি হইবে? আমি যে বাধ্য হইয়া, ইচ্ছার বিপরীতে, কেবল প্রাণের দায়ে মুসলমানের এ চাকুরি গ্রহণ করিয়াছি,—তাহা তখন কে শুনিবে? কেইবা তখন আমার কথায় বিশ্বাস করিবে? আমাকে 'নিমকহারাম' বলিয়া সম্ভবতঃ ইংরেজরাজ অগ্রে ফাঁসি দিবেন।

মুক্তিপত্র না লইয়া, ছদ্মবেশে সহর হইতে পলায়ন করিব। ইহা ভিন্ন আর গতি নাই।

কিন্তু পথে যদি ধরা পড়ি, তবে উপায়?

সে দিন এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, 'যদিই ধরা পড়ি, তখন ঘাটির প্রধান-প্রহরীকে কিছু টাকা দিয়া ক্ষান্ত করিব।' বলা বাহুল্য,—এ সময় খাঁ বাহাদুরের সকল কর্ম্মচারীই, কি ছোট কি বড়, বিষম ঘুষখোর হইয়া উঠিয়াছিল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—ঘুষে নিশ্চয় প্রহরীকে বশ করিব।

কিন্তু ঘুষের টাকা কোথা? আমি ত কপর্দ্দকবিহীন। অদ্য প্রাতে পান্নার নিকট হইতে যে, এগারটী মোহর আনিয়াছিলাম, তাহা আর তাহাকে ফেরত দিব না। সেই টাকা লইয়াই যাত্রা করিব।

কিরূপ বেশ ধারণ করিব,—তখন এই চিন্তাই

মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী সাজিব?—না, ভিক্ষুক, ফকীর হইব? অথবা আমি ত এখন বেশ সেতার বাজাইতে শিখিয়াছি :—'আমি পেশাদার সেতারবাদক' এইরূপ ভাণ করি না কেন? ঘাটির প্রহরীকে এক গৎ সেতার শুনাইয়া খুবি করিয়া, বলিব,—"আমার পেশাই এই ;—যদি অনুমতি করেন, নিকটস্থ গ্রামে অমুক জমীদারের বাটী গিয়া একবার সেতার বাজাইয়া আসি। এইরূপে দুপয়সা রোজগার না হইলে, আর উদর পূর্ণ হয় না।" প্রহরী যদি যাইতে নিষেধ করে, কিছুতেই পথ ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে ঘরে ফিরিয়া আসিব। যদি গ্রামান্তরে যাইবার অনুমতি পাই, তখন ঐ পথেই চম্পট দিয়া রামপুর অভিমুখে যাইব। ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে সেতার বাহক ও ডুগিদার করিব স্থির করিয়াছিলাম।

এইরূপ মন্ত্রণা স্থির করিয়া, কাশীপ্রসাদকে ডাকিয়া, সকল কথা বলিলাম। কাশীকে সেতারের সহিত ডুগি বাজাইতে হইবে শুনিয়া কাশী হাসিয়াই আকুল। আমি বলিলাম,—হাসিলে চলিবে না,—তোমাকে ভৃত্যের ন্যায় এ কাজ করিতেই হইবে। তুমি ঠিক যেন আমার চাকর সাজিয়া থাকিবে। আর এদেশীয়লোকের ন্যায় আমার সহিত হিন্দীভাষা উচ্চারণ করিয়া কথা কহিতে হইবে। খবরদার! আমাকে যেন সে সময় তুমি দাদা বলিয়া ফেলিও না।

কাশীপ্রসাদ আমার কথা শুনে, আর কেবল হাসে। তাহার মুখে আর হাসি ধরে না।

আমার ভয় হইল,—ভায়া প্রহরীর নিকট ডুগি বাজাইতে বাজাইতে যদি হাসিয়া ফেলে, বা অন্য কোনরূপ বেয়াদুবি করে,—তাহা হইলে মহামুস্কিল বাধিয়া যাইবে।

কাশীকে আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভায়া! বিপদ্‌কালে হাস্য করা উচিত নহে। তুমি এ কাজ করিতে পারিবে কি না বল?"

কাশীপ্রসাদ আমার কথার উত্তর দিতে পারিল না,—কেবল হাসিয়া পড়িল।

এ যে বড়ই বিপদ্ হইল দেখিতেছি! কাশী ছেলে-মানুষ। উহাকে বলিই বা কি?—বুঝাই বা কিরূপে? এখন উহার হাসির ঝোঁক ধরিয়াছে,—কিছুতেই ত ওর হাসি থামিবে না। ঘাটিতে প্রহরীর কাছে যদি উহার এইরূপ হাসির ঝোঁক ধরে,—তাহা হইলে মহা অনর্থপাত হইবে।

মন বড়ই খারাপ হইল। এমন সময় ঠাকুরদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কাশী এত হাসিতেছে কেন?" বলা উচিত, ইত্যবসরে কাশী বাহিরে গিয়া প্রাণ খুলিয়া হো হো শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি, সকল কথা ঠাকুরদাদাকে খুলিয়া বলিলাম। ঠাকুরদাদা ধীরভাবে বিচার করিয়া বলিলেন,—"তোমার এযুক্তি ভাল হয় নাই। প্রহরীর নিকট সেতার বাজাইতে গেলেই (কাশী না হাসিলেও), তুমি ধরা পড়িবে। তুমি বেরিলী সহরে কি ছোট, কি বড়,—কি সিপাহী, কি কনেষ্টবল,—অনেকের নিকট পরিচিত। তুমি তাহাদিগকে চেন আর না-চেন, তাহারা কিন্তু তোমাকে চেনে। তুমি যখন সেতার বাজাইবে, তখন কেহ-না-কেহ তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে,—হয় ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবে, 'আপ্‌কা নাম দুর্গাদাস বাবু হ্যায় না? আপ্‌ রেশালেকা বাবু থে না?' তাই বলি,—সেতার বাজাইবার এ মন্ত্রণা ভাল মন্ত্রণা নহে।"

আমি। ঠাকুরদাদা! পলাইবার কি উপায় করি বলুন দেখি?

ঠাকুরদাদা। এক কর্ম্ম কর, দুইজন টাট্টুওয়ালাকে ডাকাও। তাহাদের সহিত পরামর্শ কর। তাহাদিগকে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে স্বীকার কর। তাহারা মনে করিলে, তোমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইতে পারে।

একটী কথা বুঝা দরকার। ছোট ছোট দেশী ঘোড়ার উপর ঘি, আটা ডাল বোঝাই দিয়া টাট্টুওয়ালাগণ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া বেচা-কেনা করিয়া থাকে। তাহারা এইরূপে গ্রামের জিনিস সহরে আনে, সহরের জিনিস গ্রামে লইয়া যায়। বিদ্রোহের পর লুঠপাটের ভয়ে এইরূপ ব্যবসা বন্ধ হইয়াছিল। তার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে এ ব্যবসা আবার আরম্ভ হয়। কিন্তু খাঁবাহাদুর যখন, মুক্তিপত্র না লইয়া কেহ সহর ছাড়িতে পারিবেন না,—এরূপ আদেশ দিলেন,—তখন আবার ঐ ব্যবসা বন্ধ হইল। কেননা, মুক্তিপত্র লওয়া সহজ ছিল না। ঘুষ না দিলে সুবিধামত মুক্তিপত্র পাওয়া যাইত না। টাট্টুওয়ালারা ধর্ম্মঘট করিল। ভিন্নগ্রাম

হইতে সহরে জিনিস-আনা তাহারা একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। সহরে জিনিসপত্র দারুণ দুর্ম্মূল্য হইল। এমন কি,—একদিন এরূপ ঘটিল যে, খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রায় চারি পাঁচ হাজার সৈন্যকে সহরে আটা-অভাবে অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। দেওয়ান শোভারামের এ কথা কর্ণগোচর হইল। তিনি মূলতত্ত্ব বুঝিয়া আদেশ দিলেন,—কেবল টাটুওয়ালারা বেচা-কেনা অভিপ্রায়ে গমন করিলে বিনা মুক্তিপত্রে সহর ত্যাগ করিতে পারিবে।

আমি সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ঠাকুরদাদাকে বলিলাম, "টাটুওয়ালার সঙ্গে ত আমরা যাইব। আমাদের কেহ' পরিচয় জিজ্ঞাসিলে আমরা তাহার কি উত্তর দিব ?"

ঠাকুরদাদা। তোমরা বেপারি সাজিবে। তোমরাই খরিদ-বিক্রয়কারী ;—আর টাটুওয়ালার কাজ কেবল ঘোড়া তাড়াইয়া আনা। আমি বলিতেছি, তোমাদের কোন চিন্তা নাই ; টাটুওয়ালার সহিত তোমরা পলাও। আমি তোমাদের জন্য দুইজন টাটুওয়ালার সন্ধানে যাইতেছি।

ঠাকুরদাদা দুইজন টাটুওয়ালা আনিলেন। কাশীপুরের ভাড়া সাত টাকা হিসাবে ১৪৲ টাকা ধার্য্য হইল। আর, আমাদের দুই ভাইকে নির্ব্বিঘ্নে তথায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে, আরও পাঁচটাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। টাটুওয়ালারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। বলিল, "বাবুসাহেব! পথে আপনার কোন ভয় নাই,—আপনাকে কেহ কিছু বলিবে না। প্রত্যেক টাটুওয়ালাকে ১৲ হিসাবে বায়না দেওয়া হইল। তাহারা প্রত্যূষে আসিব বলিয়া চলিয়া গেল।

বেলা আড়াই প্রহর। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। ছাতা ছিল না,—আমি ভিজিয়া ভিজিয়া পান্নার গৃহে গমন করিলাম। পলায়নের কথা সমস্ত বলিলাম। প্রাতঃকালে যে, ১১টী মোহর আনিয়াছিলাম, তাহা ফেরত দিলাম। পান্না কহিল,—"আপনি দূরপথ—দূরতর নগরে যাইতেছেন, পথের আপনার সম্বল কি ?"

আমি। তুমি আমাকে একটী মোহর দাও। এবং ২০টী টাকা দাও।

পান্না। আপনি ১১টী মোহরই এক্ষণে লউন। পথে নানা কারণে অর্থের আবশ্যক হইতে পারে। আর এক কথা এই, আমার গৃহে, ডাকাইতির সদাই ভয় হয়। আগে দুই জন দ্বারবান্ রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার কথায় চারিজন দ্বারবান্ নিযুক্ত করিয়াছি। কিন্তু দ্বারবান্‌দিগকেও আমার বিশ্বাস হয় না। তাহাদের কোন কাজকর্ম্ম নাই,—সদাই কেবল ফুস্-ফাস্ করিয়া কি যেন ষড়যন্ত্র করে। প্রত্যহ রাত্রে সহরে নানা স্থানে ডাকাইতি, লুণ্ঠন হয়। আপনিও ত এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। এখন আমার গহনা, মোহর, টাকা আদি রাখি কোথায় ? নিরাপদ্ স্থান কোথায় ?

বহু তর্ক বিতর্কের পর, আমাদের বাসায় জামতলায় পান্নার গহনাদি পুঁতিয়া রাখা স্থির হইল। পান্না আমাকে দুইটী বাক্স দিল। একটী বাক্স পিতলের, একটী রূপার। রূপার বাক্সটীতে মোহর পূর্ণ ;—মোহর গণিয়া লইবার আবশ্যক হইল না। বোধ হয়, এক হাজার মোহরের কম নহে। পিতলের বাক্সটীতে মণি মুক্তা হীরক-জড়িত গহনা মূল্য প্রায় দশহাজার টাকা। নগদ রূপার টাকা ও কোম্পানীর নোট লইলাম না।

সেই দুই বাক্স কাপড়ে বাঁধিয়া, কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে বাসায় আসিলাম। এবার আর পথে ভিজিতে হয় নাই, কারণ পান্না ছাতা দিয়াছিল। কিন্তু পথে বড় পিছল হওয়ায় আমি পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে বিষম আঘাত পাইলাম। হাঁটু কন্ কন্ করিতে লাগিল।

হাঁটু কন্ কন্ করুক, কিন্তু বাসায় আসিয়া স্বয়ং কোদালি ধরিয়া জামতলার কাছে, গর্ত্ত খনন করিতে লাগিলাম। ঠিক আমার মাথা সমান গর্ত্ত হইল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গোল গর্ত্ত হইল। গর্ত্তের শেষ-সীমার দুই পাশ খানিক খুঁড়িয়া আবার গর্ত্তের গায়েই দুইটী গর্ত্ত কাটিলাম। একটী গর্ত্তে রৌপ্য-বাক্স, অপরটীতে পিতল-বাক্সটী রক্ষিত হইল। তৎপরে উপরে উঠিয়া গর্ত্তে মাটী-ঢাকা দিলাম ; গর্ত্তের মুখে একটী বৃহৎ পাথর চাপা দিলাম। সেই পাথরের উপর বসিয়া ঠাকুরদাদা প্রত্যহ হাত মুখ ধুইতেন।

গায়ে কাদা লাগিয়াছিল। স্নান করিলাম। ধৌত বসন পরিয়া কাশীর নিকট গেলাম। দেখিলাম, কাশী শুইয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে আঃ উঃ করিতেছে। জিজ্ঞাসিলাম, "কাশী!

তুমি অমন করিতেছ কেন? তোমার কি হই-য়াছে?

কাশী। বিশেষ কিছু হয় নাই, তবে,—

আমি। ভাল করিয়া খুলিয়াই বলনা—কি হইয়াছে?

কাশী। আমার পশ্চাতে একটী ফোড়া হইয়া বড়ই কন্ কন্ করিতেছে।

আমি। বল কি, কাশী?—ফোড়া কখন হইল?

কাশী। আজ তিন দিন হইল হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে নাই। আর তখন ফোড়ার বিষয় আমি গ্রাহ্যও করি নাই। আজ আহারের পর যেমন শুইয়াছি, অমনি হঠাৎ কেমন কন্ কন্ করিতে আরম্ভ হইল। ক্রমশঃই কনকনানির বৃদ্ধি——

আমি। তুমি যে মহা অনর্থপাত করিলে দেখিতেছি,—কল্য প্রাতে এস্থান পরিত্যাগের জন্য সব প্রস্তুত,—টাটুওয়ালাকে ২৲ টাকা বায়না পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে,—এখন তুমি বলিলে, আমার ফোড়া!! ইহাতে বোধ হইতেছে, ভগ-বান্ আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। দেখি,— ফোড়া কিরূপ?

অনিচ্ছাস্বত্বে কাশীপ্রসাদ পশ্চাৎভাগের কাপড় খুলিয়া আমাকে ফোড়া দেখাইল। দেখি-লাম,—এক ভয়ঙ্কর ফোড়া;—নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তাহার বর্ণ,—লাল টক্ টক্ করিতেছে। ফোড়া দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির। বলিলাম "ভায়া! এ যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিতেছি! কাল সকালে তুমি কেমন করিয়া আমার সঙ্গে যাইবে বল?"

কাশী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—"তা, তা—বোধ হয় পারিব।"

কাশী মুখে বলিল বটে,—'পারিব';—কিন্তু অন্তরে যেন কহিল,—'একান্তই অক্ষম হইব।'

আমি প্রমাদ গণিলাম। কি করিব, তাহার উপায় কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। "আমি যদি যাই, তবে ভায়া একা থাকে;—আমি যদি বেরিলী সহরেই অবস্থিতি করি, তাহা হইলে, দুই একদিন মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা কারারুদ্ধ হইব।"

ঠাকুরদাদা পরামর্শ দিলেন, "কাশী এখানে আমার নিকট থাকুক;—উহার জন্য চিন্তা নাই; উহাকে আমি নিরাপদ্ স্থানে লুকাইয়া রাখিব। বিশেষ তুমি যেমন বেরিলী সহরে সর্ব্বপরিচিত লোক, কাশী সেরূপ নহে।

আমি। তাওকি কখনও হয়? আমি কাশীকে এখানে একা রাখিয়া যাইব কেমন করিয়া?

ঠাকুরদাদা। যখন কয়েদ করিবার জন্য ধরিতে আসিবে, তখন তুমি কাশীর নিকট বসিয়া থাকি-য়াই বা কি করিবে? উভয়কেই বাঁধিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। আমার কথা শুন। তুমি কাশীপুর হইয়া, রাজা শিবপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করিয়া, নাইনিতালে যাও। সেখানে সাহেবদিগকে এখানকার অবস্থা বুঝাইয়া বল। সাহেবদিগকে সাহস দাও,—উৎসাহান্বিত কর;—এবং শীঘ্র বেরিলী-বিজয় করিতে বল। একশত শিক্ষিত গোরা এবং দুইটী কামান হইলে, একদিনেই এ দেশ জয় হইতে পারে। কালবিলম্বে অনর্থ ঘটিতে পারে। কেননা, খাঁবাহাদুর উপযুক্ত লোক দ্বারা সেনাসমূহকে সুশিক্ষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক গোলা, গুলি, কামান, বন্দুক খরিদ করিয়া নানাস্থানে গড়বন্দির সূত্র-পাত করিয়াছে।

আমি। এ সব কথা জানি। এবং সেই উদ্দেশেই আমার বেরিলী ত্যাগ করা। কিন্তু ভাইকে এ বিপদ্-সংকুল স্থানে একা রাখিয়া যাই কেমন করিয়া?

ঠাকুরদাদা। সঙ্গে লইয়া গেলেই বা বিপদ্ কোন্ কম? প্রথমত তুমি 'পাস' না লইয়া লুকাইয়া পলাইয়া যাইতেছ;—প্রথম ঘাটিতেই তোমরা দুই জন ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইতে পার। দ্বিতীয় কথা, যদি কোন গতিকে ঘাটি পার হইতে পার, তাহা হইলে আপাততঃ কতক মঙ্গল বটে, কিন্তু আজ কালি পথে—দিনে-রেতে—ডাকাইত দল ঘুরিতেছে,—রামপুরের পথে মাঝামাঝি যাইতে না-যাইতে, তোমাকে ডাকাইতে ধরিয়া, তোমার সর্ব্বস্ব লইতে পারে, অথবা প্রাণপর্য্যন্ত বধ করিতে পারে। তাই বলি, কোন্ স্থান বিপদ্-সঙ্কুল নয়? বরং এখানে থাকিলে, কাশী থাকিবে ভাল। এইত বর্ষাকাল উপস্থিত। পথে ভয়ঙ্কর কাদা। কাশীর কস্মিন্‌কালে পথ হাঁটাও অভ্যাস নাই। আর, তোমার ন্যায় কাশীর গায়ে অসু-রের মত জোরও নাই যে, কাশী প্রত্যহ আট দশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে সক্ষম হইবে। দুই দিন পথ হাঁটিলে কাশীর পা ফুলিয়া উঠিবে,—আর

পথ চলিতে পারিবে না;—শেষে কাশীকে লইয়াই পথে তোমার বিষম বিপদ্ ঘটিবে।"

ঠাকুরদাদার এই কথা শুনিয়া কাশী আপনা আপনিই বলিল,—"দাদা! আমি তোমার সহিত যাইব না।• এখানে আমি ঠাকুরদাদার বাসাতেই লুকাইয়া থাকি।"

ঠাকুরদাদা। এই কথাই ভাল। যদিই তোমাকে গ্রেফ্‌তারের হুকুম হয়, তবে সাধ্য পক্ষে তোমাকে ধরিতে দিব না। এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ তোমাকে সহজে খুঁজিয়া পাইবে না।

ঠাকুরদাদার কথায় কাশীর বেরিলীতে একা থাকিতে মন হইল এবং আমাকে বারংবার নাইনিতালে যাইয়া সাহেবদের সহিত মিলিত হইবার জন্য কাশী অনুরোধ করিতে লাগিল আমি তখন অগত্যা একা যাওয়াই স্থির করিলাম।

রাত্রি আসিল। কাশীর ফোড়ার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। যন্ত্রণা দেখিয়া আমার আর যাইতে মন সরে না; কিন্তু কাশীর ইচ্ছা যে, আমি যাই। কাশী পুনরায় বলিল, "দাদা! তুমি যাও, আমার জন্য ভাবিও না। আমি এখানে বেশ থাকিব।"

সে রাত্রি আমার ভাল নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রিই গুড়্ গুড়্ মেঘ ডাকিয়াছে, বিদ্যুৎ চমকিয়াছে এবং জল হইয়াছে।

পথের সম্বল, আমি একটী রিভলবার এবং একটী মোটা লাঠী লইলাম। রিভলবারটী কাপড়ে বাঁধিয়া চটে জড়াইলাম। লাঠিটী হাতে লইলাম। ঠাকুরদাদা একটী কাপড়ে বাঁধিয়া, কিছু আটা, দাল ও নুণ দিলেন। বলিলেন,—"পথে যদি কোন দিন কিছু না পাওয়া যায়, তবে এই আটায় তখন কাজ আসিবে।" ইহা ব্যতীত সঙ্গে লইলাম,—এক খানি ছোট শতরঞ্জ, একখানি ছোট বিছানার চাদর, আর একটী বড় ঘটী।

আর লইলাম, সর্ব্বলোকের অজ্ঞাত ভাবে, পান্না-প্রদত্ত সেই নয়টী মোহর।

অতি প্রত্যূষে দুইজন টাটুওয়ালা দুইটী টাটু সঙ্গে করিয়া আমার বাসায় আসিল। এদিকে আমি প্রস্তুতই ছিলাম। আসবাব সমস্ত টাটুর উপর উঠাইয়া দিলাম। হাতে রহিল কেবল সেই মোটা লাঠীটী,—আর কোঁচার খুঁটে বাঁধা,—পেট-কাপড়ে আবদ্ধ রহিল, সেই নয়টী মোহর।

ভায়ার জন্য যে, টাটুওয়ালা আসিয়াছিল, তাহাকে একটী টাকা দিয়া বিদায় দিলাম।

ভায়ার সহিত সজল-নয়নে দেখা করিয়া, ঠাকুরদাদার চরণধূলা মাথায় লইয়া, খুব ভোর বেলা, একটু ঘোর ঘোর থাকিতে, আমি যাত্রা করিলাম।

যাত্রা করিলাম বটে, কিন্তু মন প্রফুল্ল হইল না। কেমন যেন ভয়ের উদয় হইল,—কেমন যেন গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল,—পশ্চাৎদিক্ হইতে কে যেন আমার কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। কে যেন বলিল, "যাইও না,—পথে বড় বিপদ!"

আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে, দ্রুতপদে টাটুওয়ালার সঙ্গে চলিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিরাপদে প্রথম ঘাটি, দ্বিতীয় ঘাটি, তৃতীয় ঘাটি, পার হইলাম। টাটুওয়ালা, প্রথম ঘাটির সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র, কেবল এই একটী উপদেশ দিয়াছিল, "আপনি ও-দিকে চাহিবেন না,—ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়া, ঘোড়ার পানে চাহিয়া চলুন।"• বলা বাহুল্য, আমি এ উপদেশ পালন করি।

ঘাটি-ঘর গুলিকে যে আমি দেখি নাই, এমন নহে। কৌতূহলপ্রযুক্ত, ঘোড়ার দিকে চক্ষু রাখিয়াও, আড়-নয়নে ঘাটি-ঘরের সমস্তই দেখিয়া লই। প্রত্যেক ঘাটিতে লম্বা-লম্বা আটদশখানি চালা ঘর,—উহারই মধ্যে একখানি ঘর ভাল,—তাহা সাহেবদের "বাঙ্গালার" ধরণে নির্ম্মিত। টাটুওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রত্যেক ঘাটিতে দুইটী করিয়া তোপ, পঞ্চাশজন অশ্বারোহী এবং একশত জন পদাতি সিপাহী আছে।

যখন তৃতীয় ঘাটি পার হইলাম, বেলা তখন প্রায় আটটা। বেরিলী সহর হইতে তখন আমরা প্রায় পাঁচক্রোশ দূরে আসিয়াছি। এ পথটুকু খুব দ্রুতই আসিয়াছিলাম।

আকাশে আর মেঘ নাই,—গগনে সূর্য্যদেব

সমুদিত। আমরা আরও দেড় ক্রোশ পথ অতি দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে আসিলাম। এক গণ্ডগ্রামের নিকট পৌঁছিলাম। সে গ্রামে রাজপথের ধারেই এক বৃহৎ হাট। সেদিন হাটবার। টাটুওয়ালা বলিল, "এই হাটে অনেক গুলি ঘর ছিল,—প্রত্যহ বাজার বসিত, এবং হাটবার দিন হাট হইত। কিন্তু বিদ্রোহের পর হইতে বাজার আর বসে না;—দোকানদারগণ কে কোথায় পলাইয়াছে। তবে আজ একমাস হইতে হাট বসিতেছে;—কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অধিক লোক আসে না।"

আমি। কেন?

টাটুওয়ালা। সিপাহী-বিদ্রোহের তিন চারি দিন পরে, বখ্‌তখাঁর দুই তিন শত সিপাহী আসিয়া এই বাজার লুঠ করে, এবং ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। শেষে গ্রামে গিয়া লোকের উপর অশেষ উৎপীড়ন করে।

ক্রমশ রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল। মেঘ-মুক্ত রবি,—তেজ তিনগুণ বলিয়া বোধ হইল। দ্রুত-পদে আগমন-হেতু দেহ কিঞ্চিৎ যেন অবসন্ন হইয়াছে। আমি টাটুওয়ালাকে বলিলাম, "এবেলা এই স্থানেই আহারাদি করা যাউক।" সে বলিল, "হাঁ বাবু! এই খানে বই আর নিকটে চটি নাই,—এই স্থানেই অদ্য আহার করিতে হইবে। আর সাত ক্রোশ দূরে ভাল চটি আছে। আমাদিগকে শীঘ্র আহার করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই সেই দূরস্থ চটিতে পৌঁছিতে হইবে। কেননা, সেপথে ডাকাইতের ভয় আছে।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সমাপন করিলাম। আহারের পর বিশ্রাম। একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল। একঘণ্টার অধিক হইল, তথাচ নিদ্রা ভাঙ্গিল না। টাটুওয়ালা তখন আমার গা ঠেলিয়া উঠাইল। বলিল, "বাবু! এখানে এত ঘুমাইলে চলিবে কেন? এখনও সাতক্রোশ পথ যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম, "এ বেলা যে, আমি আটক্রোশ পথ হাঁটিতে পারি, তাহা ত বোধ হয় না। বাপ্! হাঁটাত আমার অভ্যাস ছিল না,—এই পাঁচ-ক্রোশ পথ চলিয়াই পায়ে ব্যথা হইয়াছে।"

টাটুওয়ালা বলিল, "আপনি এই ঘোড়ার উপর চড়ুন। আমি আপনার আসবাব সমস্ত মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

ঘোড়ার উপর চড়িতে হইবে শুনিয়া আমার মনে বড় হাসি আসিল। ঘোড়াটী দেশী, বেটো, ক্ষীণাঙ্গ, ক্ষুদ্রকায়। সেই পক্ষিরাজের বংশ-সম্ভূত,—সেই সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবায় আরোহণ করিলে, নিশ্চয় তাহার শিরদাঁড়াটী সুভগ্ন হইবে,—ইহাই আমার ভয় হইল। একটু দুঃখও হইল, কোথায় আমার সেই ব্রহ্মদেশ-জাত পঞ্চ সহস্র টাকার অশ্ব, আর কোথায় আজ এই বিকৃতদেহ বেটো ঘোড়া! আমি ইতি-পূর্ব্বে খুব বড় বড় দুর্দ্দান্ত ঘোড়া ভিন্ন চড়িতাম না। গবর্ণমেণ্টের অশ্বশালার মধ্যে যে অশ্বটী অধিকতর তেজী এবং দুষ্ট, সচরাচর সেইরূপ অশ্বেই আমি আরোহণ করিতাম। কিন্তু উপায় নাই, অগত্যা আজ সেই খর্ব্বকায়, ক্ষীণকণ্ঠ, বৃদ্ধ টাটুটীর উপর চড়িয়া বসিলাম। টাটুর পিট যেন মড়মড় করিতে লাগিল। টাটুর জীন নাই, রেকাব নাই, লাগাম নাই। পালান্ একখানি ছেঁড়া চট্, লাগাম দড়ির, রেকাব আদৌ নাই। টাটুওয়ালা আমার আসবাব সমস্ত মাথায় করিল, আর আমার মোটা লাঠীগাছটী হাতে লইল। আমি টাটুর উপর বসিয়া, আমার সেই ছয়ঘরা রিভলবারটীতে গুলি-বারুদ ভরিয়া ঠিক্ করিয়া রাখিলাম। টাটু ঠুক্ ঠুক্ করিয়া ধীরকদমে চলিতে লাগিল। বেশ স্বচ্ছন্দে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোড়াটীর যন্ত্রণাভাব-ব্যঞ্জক চলন দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল।

দেখিতে দেখিতে বেলা অবসানপ্রায় হইল। পূর্ব্ব দিন অতিবৃষ্টি হওয়ায় বৈকালিক বায়ু শীতল বোধ হইতে লাগিল। বেশ আরাম বোধ হইল। আর রৌদ্র নাই, সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন; পশ্চিম দিক্ কেবল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। আমরা এক প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে পতিত। রাজ-পথ সেই মাঠ ভেদ করিয়া চলিয়াছে। মাঠের নিকটে কোন গ্রাম নাই। টাটুওয়ালা কহিল,—"এই মাঠ বড় ভয়ঙ্কর। এইখানেই চোর ডাকাইতের ভয়। এই আড়াই ক্রোশ মাঠ পার হইলে, তবে অদ্য চটি পাওয়া যাইবে। আধ ক্রোশ মাত্র মাঠের পথ আমরা আসিয়াছি, এখনও দুই ক্রোশ বাকী। আপনি যতদূর সম্ভব, টাটু ছুটাইয়া দিন। আমি টাটুর সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছি।"

টাটুওয়ালার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম,—

"তুমি নিতান্ত ভীত হইও না। দস্যু দেখিলে হঠাৎ পলাইও না। কারণ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব। আর পলাইবেই বা কোথায়? যদি এ পথে দস্যুগণ আক্রমণ করে, তাহা হইলে নির্ভয়চিত্তে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ সঙ্কট স্থলে প্রাণের ভয় করিতে নাই। আর তুমিত দিব্য জোয়ান, তোমার শরীরে বেশ সামর্থ্য আছে বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তুমি কাপুরুষের ন্যায় পলাইবেই বা কেন?"

টাটুওয়ালা কহিল,—"হজুর! আমার সে সব কিছু ভয় নাই। ভয় যা কিছু, তা আপনাকে লইয়া।"

আমি কহিলাম,—"আমার নিকট যে রিভলবার আছে, তাহাতে এককালে ছয়জন লোককে ধরাশায়ী করিতে পারিব। আর আমি যদি লাঠী ধরি, তাহা হইলে দশজন লাঠীয়ালও আমার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইবে না।"

আমরা সেই দুর্গম প্রান্তরের দেড় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিতে না করিতে, সূর্য্য ডুবু-ডুবু হইলেন। পথে জন-মানব নাই, কেবল কঙ্করময় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। পথটী পাকা; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝুপি জঙ্গল আছে। আমি টাটুওয়ালাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"এখানে বাঘ-ভালুকের ভয় আছে কিনা?" টাটুওয়ালা বলিল,—"না। ভয় যা, তা কেবল ডাকাতেরই।"

সন্ধ্যা সমাগত হইল। আমি ঘোটক হইতে নামিলাম। উত্তমরূপ কোমর বাঁধিলাম। রিভলবারটী দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। টাটুওয়ালা সমস্ত আসবাব ঘোড়ার উপর চাপাইয়া, আমার সেই লাঠী লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। অদূরে দেখিলাম, এক বৃহৎ ইঁদারা। একটী লোক ইঁদারার উপর বসিয়া আছে। আমি টাটুওয়ালাকে জিজ্ঞাসিলাম "এই সন্ধ্যাকালে এই জনশূন্য প্রান্তরে ঐ একটী লোক ইঁদারার উপর কি মতলবে বসিয়া আছে, বলিতে পার?"

টাটুওয়ালা কহিল,—"বাবু সাহেব! উহার মতলব মন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ ব্যক্তি একাকী নহে। সম্ভবতঃ উহার দলের আরও কয়েক জন লোক ইঁদারার আশে-পাশে লুকাইয়া আছে। এই ইঁদারা অত্যন্ত গভীর। সাবেক নবাবী আমলে ইহা কাটা হইয়াছিল। ইঁদারার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রঘরও আছে। রাহিলোক ক্লান্ত হইলে, ইঁদারার ঐ ঘরে বিশ্রাম করে, এবং ইঁদারার জল খায়। কিন্তু শুনিতে পাই, ডাকাইতেরা সন্ধ্যার সময় আসিয়া ঐ ইঁদারার ঘরে আশ্রয় লয়, এবং রাহিলোককে মারিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। ঐ ইঁদারা হইতে আমাদের চটি একক্রোশ দূর হইবে। ইঁদারা পার হইলে আর কোন ভয় নাই। কিন্তু যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, অদ্য ডাকাইতদল নিশ্চয় ঐ ইঁদারার-ঘরে অবস্থিতি করিতেছে। আপনি সাবধান হউন।"

আমি বলিলাম,—"কিছু ভয় নাই। সাহস করিয়া চল, আনন্দ-মনে চল। যুদ্ধে জয় লাভ করিতে হইবে বলিয়া মনকে উৎসাহিত কর। আর এক কথা, তুমি কোনরূপ উহাদের সহিত বাক্যব্যয় করিও না। যা কিছু বলিতে কহিতে হইবে, তাহা আমিই কহিব। আর, আমার কথামত ঐ সময় তুমি কাজ করিবে।

ক্রমে সেই বৃহৎ ইঁদারা নিকটবর্ত্তী হইল। সেই লোকটী আমাদের পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়াই আছে। খুব নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র আমিও তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলাম। সেই লোকটী অমনি গম্ভীর বিকট-আওয়াজে জিজ্ঞাসিল, "তুমি কোথা যাইবে?"

বজ্রনিনাদে চীৎকার করা আমার অভ্যাস ছিল। আমি অধিকতর বিকটস্বরে ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এক নিনাদ করিলাম। সেই মহা-হাঁকে যেন স্থাবর-জঙ্গম কাঁপিয়া উঠিল। সেই ভীষণ নির্ঘোষের মর্ম্ম এইরূপ—"বদমাইস! ডাকাইত! তুই এখানে সন্ধ্যার সময় বসিয়া কি করিতেছিস্? তোদিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্যই আমরা আজ বাহির হইয়াছি। যদি ভাল চাস্, তবে আমার সঙ্গে আয়, নহিলে এক লগুড়াঘাতে তোর মাথা গুঁড়া করিয়া দিব।"

সে ব্যক্তি কেমন একটু থতমত খাইল। বলিল,—"আমি ডাকাইত নহি, আমি পথিক।" আমি কহিলাম,—"তুই যদি পথিক হস্, তবে তোর কোন ভয় নাই,—কিন্তু আমার সঙ্গে তুই এখন থানায় চল।" তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, এক গাছি লম্বা লাঠী পড়িয়া রহিয়াছে, সেই লাঠীর শীর্ষদেশ লোহমণ্ডিত। আমি সেই লাঠী

কুড়াইয়া লইয়া বলিলাম, "এই কি পথিকের লাঠী?—এতো মানুষমারা-যন্ত্র।"

আমি লাঠী বগলে করিয়া, বামহস্তে রিভল-বার ধরিয়া সেই লোকটীর গালে বিরাশী-সিক্কার ওজনে সজোরে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা এক ভীষণ চপেটাঘাত করিলাম। সে চড় বড় সহজ চড় নয়, সে লোকটী যদি বলবান্ না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, সেই এক চড়েই পঞ্চত্ব পাইত। তথাচ তাহার মাথা ঘুরিল, দেহ টলিল; সে ইঁদারা হইতে ভূতলে চীৎপাত হইয়া পড়িল। এমন সময় আমার টাটুওয়ালা বলিয়া উঠিল—"হজুর! এই বেটাই ডাকাইতের সর্দ্দার; এ অনেক লোক খুন করিয়াছে।" এই কথা বলিয়াই সে লাঠী ওঁচাইয়া সে লোকটীকে মারিতে উদ্যত হইল।

আমি তাহাকে কহিলাম,—"সবুর! সবুর! মারিওনা, মারিওনা। তুমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক, আমি যখন যাহা বলিব, তখন তাহা করিবে।"

টাটুওয়ালা লাঠী মারিতে আসিতেছে দেখিয়া সে লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"ওরে আমায় মেরে ফেল্‌লে-রে, তোরা কে আছিস্ এই বেলা আয়।"

দলপতির ইঙ্গিত মাত্রেই অমনি ষোল জন কৃষ্ণবর্ণ মুস্কি-জোয়ান, লম্বা লাঠী ঘুরাইতে ঘুরা-ইতে মার্-মার্ কাট্-কাট্ শব্দে আমাদের দিকে হঠাৎ অগ্রসর হইতে লাগিল,—ষোলজন লোকের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমিও ঈষৎ চমকিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া, টাটু-ওয়ালাকে কহিলাম,—"ভয় নাই। উহারা আমার আরও কতকটা নিকটে আসিলে, আমি রিভলবার চালাইব। সেই সময় আমার মাথার উপর লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ লাঠী মারিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তুমি সেই লাঠীকে তোমার লাঠীর দ্বারা নিবারণ করিও, ইহাই তোমার উপর ভার রহিল। আক্রমণকারীদিগকে তোমার আক্রমণ করিবার আবশ্যক নাই।"

সেই ষোলজন লোক একত্র মিশামিশি হইয়া যেন একখণ্ড নব-মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া ক্রমশই আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমি দ্রুতপদে ঈষৎ পশ্চাৎপদ হইলাম। একটী উচ্চস্থানে দাঁড়াইলাম। আমার দক্ষিণ ভাগে টাটুওয়ালা লাঠী হাতে করিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন অনুমানে বুঝিলাম, দস্যুদল আর ৮।৯ হাত মাত্র দূরে আছে, তখন রিভলবারের ঘোড়া টিপিলাম।

গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইল। আল্লা আল্লা বলিয়া একজন দস্যু ভূতলে পতিত হইল; তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রিভলবারের গুলি চলিয়া গেল। নিমিষ মধ্যে এই দস্যুদল-ঝাঁকে আর পাঁচটী আওয়াজ করিলাম। পাঁচটী আওয়াজে চারিজন দস্যু ধরায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অবশিষ্ট একজনের হাতের কব্জায় গুলি লাগিয়াছিল। সে লাঠী ফেলিয়া, মাঠের দিকে দৌড়িয়া পলাইল। কিন্তু এদিকে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া দুই জন দস্যু কর্ত্তৃক দুই বিষম লাঠী পরিচালিত হইল। তন্মধ্যে একটী লাঠী আমার কাঁধে আসিয়া পড়ে। অপর লাঠী-টী উত্তোলিত হইবা মাত্র টাটুওয়ালা এমন জোরে তাহার হাতের কব্জায় এক লাঠী মারে যে, তাহাতেই তাহার কব্জার হাড় গুঁড়া হইয়া যায়, এবং দস্যুর হস্তস্থিত সেই লাঠীটী দূরে যাইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়ে।

স্কন্ধে লাঠী পড়ায় আমি জখম হই নাই বটে, তবে কিঞ্চিৎ কাতর হইলাম। কিন্তু দস্যু-দিগকে পলায়ন-উদ্যত দেখিয়া মনে বড়ই উৎসাহ জন্মিল। তাহারা ঠিক এখন পলায় নাই, কেবল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিল। তখন ছয় জন দস্যু ধরাশায়ী হইয়াছে, তিনজন পলাই-য়াছে, সাতজনমাত্র রণস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। তখন আমি রিভলবারটী ভূতলে ফেলিয়া এক লাঠী কুড়াইয়া লইয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিলাম। এক লাঠীতে একজনের মাথা গুঁড়া হইয়া গেল। টাটুওয়ালা একজনের কোমরে এরূপ আঘাত করিল যে, সে ধড়াস্ করিয়া ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। অবশিষ্ট পাঁচজন দস্যু ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। আমরা দুইজন দুইরণী পথ পর্য্যন্ত ধব্‌ধব্ শব্দে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। কিন্তু তাহাদিগকে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা শীঘ্রই রণস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যাহারা গুলির আঘাত খাইয়াছিল, দেখিলাম, তাহাদের প্রাণ-সংশয়। দেহ হইতে কেবল অবিরল অবিশ্রান্ত রুধিরধারা বহির্গত হইতেছে, তাহারা অচেতন-বৎ পড়িয়া আছে। টাটুওয়ালা কহিল,—"হজুর!

এস্থানে আর থাকিয়া কাজ নাই, আমরা শীঘ্র পলাই চলুন,—কি জানি যদি আবার শতাধিক ডাকাইত আসিয়া আক্রমণ করে; কারণ, এখানে পাঁচ-সাত শত দস্যু আছে শুনিয়াছি।” আমি বলিলাম,—“ভয় নাই, আজ আর দস্যুদল কখনই আসিবে না। তাহারা উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়াছে।”

টাটুটী একস্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। এত যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বহিয়া গেল, তথাচ ঘোড়াটী ভয়বিহ্বল হইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করে নাই। টাটুটীর উপর আসবাব সমস্ত রাখিয়া আমরা পদব্রজে চলিলাম। আমি আগে, আমার পশ্চাতে টাটু, টাটুর পশ্চাতে টাটুওয়ালা। রিভলবারটী কিন্তু রণস্থলে খুঁজিয়া পাই নাই। দস্যুদলের যে ব্যক্তি দলপতি বলিয়া অনুমিত, অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে আমি প্রথমে এক চপেটাঘাতে ধরাশায়ী করিয়াছিলাম, সে ব্যক্তিকেও আর দেখিলাম না। আমরা যখন ধর্‌ধর্‌ রবে কয়েকজন দস্যুর প্রতি ধাবিত হই, বোধ হয়, সেই সময় দস্যুদলপতি উঠিয়া পিস্তলটী কুড়াইয়া লইয়া অন্যদিকে পলাইয়া থাকিবে। রিভলবার অভাবে মন বড় খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। রণজয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস রিভলবার-বিহনে কতক পরিমাণে হ্রাস হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময়, আমরা নির্দ্দিষ্ট চটিতে পৌঁছিলাম। বলা উচিত, আমাদের কাপড়ে, গায়ে, হাতে, মুখে যে নররক্তের দাগ লাগিয়াছিল, আমরা পথে সেই রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ধৌত বস্ত্র পরিধান করি, এবং এক কূপের নিকট আসিয়া উত্তমরূপ স্নান করিয়া, গায়ের রক্তচিহ্ন সকল পরিষ্কার করিয়া ফেলি। চটিতে দিব্য ভাল-মানুষটীর ন্যায় উপস্থিত হইয়া একটী ঘরভাড়া লইয়া, রাত্রি-যাপন করিলাম। মেজাজ কেমন গরম হইয়াছিল। সে রাত্রে আহার করিতে প্রবৃত্তি হইল না এবং নিদ্রাও হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিম্নে ঐ মান-চিত্র দেখুন,—মানচিত্রখানি না দেখিলে, আমি কোন্ পথে, কিরূপ পথে বেরিলী হইতে নাইনিতাল পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করি, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন না। আর মানচিত্রে লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি,—নগর-উপনগর-সমূহ, পাঠক স্মরণ করিয়া রাখিবেন।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, টাটুওয়ালা ও আমি কাশীপুর-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রায় ছয় ক্রোশ পথ আসিয়া এক দ্বিপথগামী রাস্তার সন্ধি-স্থানে আসিয়া পড়িলাম। তন্মধ্যে একটী রাস্তা কাঁচা, অপরটী পাকা রাস্তা ছিল। টাটুওয়ালা তখন পাকা রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া, কাঁচা রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে পাকা পথ পরিত্যাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলাম। টাটুওয়ালা কহিল,—“পাকা রাস্তাটী নাইনিতাল যাইবার পথ। আর যে কাঁচা পথটী দিয়া আমরা যাইতেছি, এটী কাশীপুর যাইবার সড়ক।” এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা প্রায় অর্দ্ধপোয়া পথ অতিক্রম করিয়াছি। আমি টাটুওয়ালাকে কহিলাম,—“দাঁড়াও আমি আগেই নাইনিতাল যাইব মনে করিতেছি। কাশীপুরে এখন যাইবার আমি তত আবশ্যক বোধ করি না। নাইনিতালে সাহেবদের সহিত সর্ব্বাগ্রে মিলিত হওয়াই এখন যুক্তি।”

এই কথা শুনিয়া টাটুওয়ালা কিছু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। বলিল,—“বাবুসাহেব! কাশীপুর যাইবারই ভাড়া অগ্রে হইয়াছে, এখন নাইনিতাল যাইতে বলিতেছেন কেন? বিশেষ নাইনিতালের পথ বড়ই দুর্গম এবং সে স্থান এখান হইতে বহু দূরবর্ত্তী।”

টাটুওয়ালাকে অনেক বুঝাইলাম এবং শেষে একটী অতিরিক্ত টাকা দিতে স্বীকৃত হওয়ায়, সে নাইনিতাল যাইতে সম্মত হইল। সেদিন অনাহারে প্রখর সূর্য্যরশ্মি ভোগ করিয়া একদমে ১২ ঘণ্টা কাল পথ চলিয়া, সন্ধ্যাকালে সাফাখানায় গিয়া পৌঁছিলাম। মানচিত্রে সাফাখানার অবস্থা দেখুন।

সাফাখানা অর্থে,—ঔষধালয়,—গবর্ণমেণ্টের দাওয়াইখানা। এই স্থান হইতেই নিবিড় জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। অরণ্যবাসীগণ, এই খানে আসিয়া চিকিৎসিত হয়। সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা খুব কম। সাফাখানার নিকট দুই খানি চালা ঘর। তাহাতে দুইজন বেণিয়া-মুদী জিনিষ-পত্র বেচা-কেনা করে। দোকানে
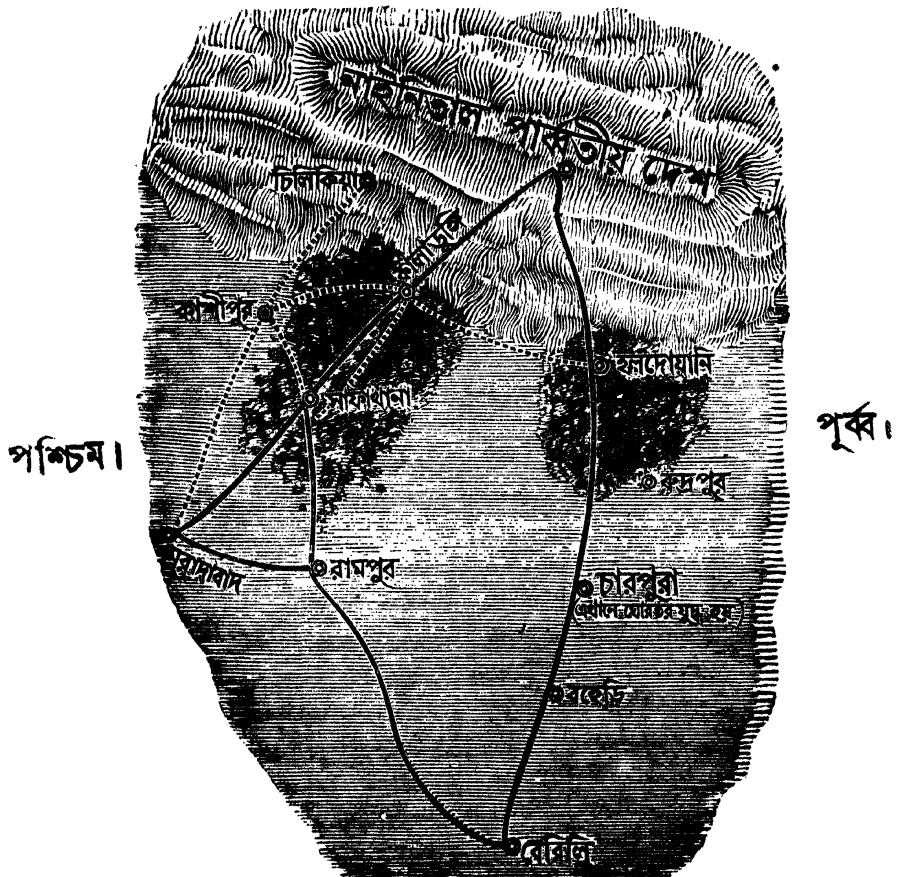
ভদ্রলোকের আহারোপযোগী কোন জিনিষ পত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এক প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী আরণ্য-বৃক্ষ-মূলে আমি উপবেশন করিলাম। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, তাহার উপর পথ-ক্লেশ। ক্ষুধায় এবং পিপাসায় বড়ই কাতর হইয়াছি। এমন সময় একজন বিংশতি-বর্ষীয় সুন্দর-মূর্ত্তি হিন্দুস্থানী পুরুষকে দেখিলাম। পাতলা এক-হারা চেহারা, কিন্তু চালাক-চুড়ামণি—যেন নাকে-মুখে কথা কয়। তাহাকে দেখিয়াই, আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি কে, কখন্ আসিলে, এবং তোমার নামই বা কি?"

হিন্দুস্থানী যুবকটী কিঞ্চিৎ যেন অপ্রতিভ হইল। আম্‌তা আম্‌তা স্বরে উত্তর করিল, "আমি অদ্য বৈকালে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। নাইনিতালে আমার ভাই আছে, তাই আমি তাহাকে দেখিতে যাইতেছি।"

এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি আমার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বলিল,—"আপনার নাম দুর্গাদাস বাবু নহে কি? আপনিইত রেশালার বড় বাবু ছিলেন?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"হাঁ।" আর জিজ্ঞাসিলাম,—'তুমি আমার নাম কেমন করিয়া জানিলে?

ক্রমশঃ—

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } আষাঢ়। ১২৯৯। { ৭ম সংখ্যা।

ন্যায়-দর্শন।

(৩)

জল—

দ্রব্য-গণনায় দ্বিতীয়। জলেরও লক্ষণ অনেকগুলি আছে, যথা ;—

(১) শুক্লরূপমাত্রবত্ত্ব, (২) মধুররসমাত্রবত্ত্ব, (৩) শীতলস্পর্শবত্ত্ব, (৪) স্নেহবত্ত্ব এবং (৫) সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ত্ববত্ত্ব। *

(১) জলে আর কোন রূপ নাই,—কেবল শুক্লরূপ আছে। পৃথিবীতে নানাবিধ রূপ ; সেই জন্য, "শুক্লরূপ-মাত্র-বিশিষ্ট" বলিলে কেবল জলই বোধ হয় ; অতএব শুক্লরূপ 'মাত্র' বত্ত্ব, জলের লক্ষণ হইতে পারে।

(২) মাত্র মধুর-রস জলে আছে,—অন্য কোন রস জলে নাই। পৃথিবীতে ষড়্‌বিধ রস; কেবল-মধুর-রস পৃথিবীতে নাই। সুতরাং "মধুর-রস-মাত্র বিশিষ্ট" বলিলে জলই বোধ হয় ; এইজন্য মধুর-রস-মাত্রবত্ত্ব, জলের লক্ষণ।

(৩) শীতল-স্পর্শ কেবল জলে আছে, আর কিছুতে নাই। পৃথিবী, তেজ এবং বায়ুতে যে স্পর্শ আছে, তাহা শীতল নহে। সে কথা পরে বলিব। "শীতল-স্পর্শ-বিশিষ্ট" বলিলে জলই বুঝা যায় ; অতএব শীতল-স্পর্শবত্ত্ব, জলের লক্ষণ।

(৪) স্নেহ—মসৃণতা। মসৃণতা, জলের গুণ। স্নেহ আর কিছুতে নাই। ঘৃত-তৈলে যে স্নেহ আছে, তাহাও ঘৃত-তৈলের অন্তর্গত জলীয়াংশের গুণ। "স্নেহ-বিশিষ্ট" বলিলে জলকেই বুঝা যায় ; অতএব "স্নেহবত্ত্ব" জলের লক্ষণ।

(৫) 'সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব' অর্থে স্বাভাবিক তরলতা। মাটী গলাইলে তরল হয়, সোণা গলাইলেও তরল হয়, লোহা গলাইলেও তরল হয় ; কিন্তু মাটী, সোণা বা লোহা স্বাভাবিক তরল নহে,—অগ্নি-তাপের আধিক্য বশতই উহাদিগের তরলতা ; অতএব ঐ সকল বস্তুকে স্বাভাবিক তরল বলা যায় না। "স্বাভাবিক তরল" বা "সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ব-বিশিষ্ট" বলিলে জলকেই বুঝা যায় ; অতএব সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ববত্ত্ব, জলের লক্ষণ।

এক্ষণে এই সংক্ষিপ্তসার কঠিনতর পাঁচটী লক্ষণের কিঞ্চিৎ সমালোচনা এস্থলে করা যাইতেছে।

প্রথম লক্ষণের কয়েকটী কথা।

জলের ত নানাবিধ রূপ দেখা যায়। কালিন্দীর কাল জল, সরস্বতীর লোহিত জল, গঙ্গার বিশদ জল ;—জলের যে কেবল শুক্ল-বর্ণ এ কথা বলি কিরূপে ? "মাটীর গুণে, জলের লাল কাল রঙ দেখা যায় ; বস্তুগত্যা সাদা রঙ ভিন্ন আর কোন রঙই জলে নাই।"—কৃত আপত্তির এই এক উত্তর আছে বটে, কিন্তু এই উত্তরের সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বিতীয় আপত্তির অবতারণা হইতেছে, ;—তবে জলে বর্ণ বা রঙ মানি কেন ?—মাটীর গুণেই

* শেষ দুইটীই লক্ষণ ; প্রথম তিনটী স্বরূপকথন মাত্র, অর্থাৎ জলে যে প্রকার রূপ, রস আছে, তাহারই পরিচায়ক মাত্র ; কিন্তু লক্ষণ নহে।—ইহাও অন্যতর মত।

জলের রঙ; সাদা, লাল, কাল—সকল প্রকার রঙই জলের,—মৃত্তিকাগুণে উৎপন্ন।

ইহার উত্তর এই যে, যমুনারই হউক, আর সরস্বতীরই হউক, একটু নির্ম্মল জল লইয়া আকাশে নিক্ষেপ করিলে, ঐ নিক্ষিপ্ত জলের রঙ দেখিবে,—ধপ্‌ধপে সাদা। যেখানে মাটীর সম্বন্ধ নাই, সেই নিরবলম্ব আকাশ-পথে জলের যে রঙ দেখা যায়, তাহাকেই ত প্রকৃত রঙ বলিতে হয়। ঘোলা জল, ফল-রস প্রভৃতি জলাংশের বর্ণ-বৈচিত্র্য, পার্থিবাংশ-যোগে উৎপন্ন,—তাহা ত প্রত্যক্ষতই দেখা যায়। যন্ত্র-সাহায্যে উহা হইতে পার্থিবাংশ বিশ্লিষ্ট করিলে, খাঁটি জল থাকে; তাহার বর্ণ সাদা। তুষার-রাশিও জল; জল হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে; তাহাতে শুক্লরূপ ত স্পষ্টই দেখা যায়।

এইরূপ বিবিধ বিচার-বিতর্ক করিয়া নৈয়ায়িকগণ, জলের শুক্ল বর্ণ স্থির করিয়াছেন।

"আচ্ছা, জল—না হয়, শুক্ল-বর্ণই হইল; কিন্তু জল যেমন মাত্র-শুক্ল-বর্ণ, তেজও ত সেইরূপ মাত্র-শুক্লবর্ণ। "শুক্লরূপ-মাত্রবত্ত্ব", জলের লক্ষণ হয় কিরূপে? জলের লক্ষণ কেবল জলে থাকিবে। জল ভিন্ন বস্তুও, যে-লক্ষণের লক্ষ্য হইয়া পড়ে, তাহাকে জলের লক্ষণ বলা যায় না।"

এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছি;—তেজ এবং জলের শুক্ল রূপ বটে; কিন্তু তেজের রূপ ভাস্বর (প্রভা-সম্পন্ন) শুক্ল, আর জলাদির রূপ অভাস্বর (প্রভাহীন) শুক্ল। সুতরাং "অভাস্বর-শুক্লরূপ-মাত্রবত্ত্ব"ই জলের লক্ষণ। মাত্র অভাস্বর শুক্লরূপ থাকিতে কেবল জলেই থাকে,—তেজে থাকে না, পৃথিবীতেও থাকে না।

"এখনও লক্ষণ স্থির হইল না। সর্ব্ব-শুক্ল ঘট আছে, সর্ব্ব-শুক্ল পট আছে, সুধা-ধবলিত প্রাসাদ আছে;—এ সমুদায়ের বর্ণ, অভাস্বর শুক্ল। অন্য বর্ণের সম্বন্ধও এ সমুদয়ে না থাকিতে পারে। যাহাতে অন্য বর্ণের সম্বন্ধ নাই, এমনতর অভাস্বর-শুক্লবর্ণ পার্থিব-পদার্থ কত শত আছে। তবে 'অভাস্বর-শুক্লরূপ-মাত্রবত্ত্ব'কে জলের লক্ষণ বলিব কিরূপে? জলের লক্ষণ ত কেবল জলেই থাকিবে; তাহা না হইলে, তাহাকে জলের লক্ষণই বলা যাইবে না।"

এই প্রশ্নের উত্তর।—"অভাস্বর-শুক্লেতররূপাসমানাধিকরণ-রূপবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"ই প্রথম লক্ষণের চরম তাৎপর্য্য। উহাই জলের লক্ষণ। এ লক্ষণে আর কোন দোষ নাই।

লক্ষণের অর্থ।—ব্যাপ্যব্যাপক ভাবের স্থূল অর্থ, পূর্ব্ব-প্রস্তাবে বলিয়াছি;—পৃথিবীত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব, জলত্ব ইত্যাদি বিবিধজাতি, দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হইয়া থাকে।

রূপ আছে, কোন্ কোন্ দ্রব্যে?—পৃথিবীতে, জলে আর তেজে। "রূপবৎ" বলিলে এই তিনটীকে পাওয়া যায়। দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য যে যে জাতি, উক্ত তিনটী দ্রব্যে থাকে, তৎসমস্তই রূপবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি। এ গুলির সহজ নাম,—পৃথিবীত্ব, জলত্ব এবং তেজস্ত্ব—ইত্যাদি।

অভাস্বর শুক্ল-রূপ কিসে আছে? জলে আছে, আর কোন কোন পৃথিবীতে আছে। অভাস্বর শুক্লরূপের ইতর যত রূপ আছে, তাহার একটীও কোন জলেই নাই; কিন্তু তেজে এবং অনেক পৃথিবীতে আছে। যে সকল রূপ 'অভাস্বর-শুক্ল' নহে, তৎসমুদয়ের আশ্রয় হইল,—তেজ এবং নানাবিধ পৃথিবী। 'পৃথিবীত্ব' জাতি পৃথিবীতে থাকে এবং 'তেজস্ত্ব' জাতি তেজে থাকে; সুতরাং উক্ত জাতিদ্বয় অভাস্বর শুক্লেতর রূপের সহিত "সমানাধিকরণ" হইল। 'সমানাধিকরণ' আর একস্থানস্থিত'—উভয়ই একার্থক।

অসমানাধিকরণ হইল কেবল জলত্ব। কেননা, তেজে এবং পৃথিবীতে ত আর জলত্ব থাকে না,—জলত্ব জলে থাকে; সেখানে অভাস্বর শুক্লরূপই থাকে,—অন্য রূপ থাকে না। 'অভাস্বর শুক্লেতর রূপের অসমানাধিকরণ এবং রূপবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি' হইল,—জলত্ব; তদ্বিশিষ্ট হইতে কেবল জলই হইয়া থাকে; অতএব 'তাদৃশ-জাতি-মত্ত্ব'ই উত্তম লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণের কথা।

জলে মধুর রস আছে;—হরীতকী চর্ব্বণ করিবার পরই জলপান করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। তীব্র-মধুর রস নাই বলিয়াই সর্ব্বদা মধুর রস পাওয়া যায় না।

"হরীতকী-রসাক্ত জিহ্বায় জলের যে মধুর-রস অনুভূত হয়, তাহা ঐ প্রকার বিশিষ্ট-মিশ্রণের গুণে; বস্তুগত্যা কিন্তু জলের মধুর-রস নহে।"

নৈয়ায়িক এই আপত্তির উত্তর করেন,—

কল্পনার লাঘব-গৌরব দেখাইয়া। যাহাতে স্পষ্ট মধুর-রস আস্বাদন করিতে পাওয়া যায়, সেই জলে রস-নাই বলিয়া কল্পনা হইল, আর এক অদ্ভুত-মিশ্রণে রসানুভাবকতার কল্পনা করা হইল; সুতরাং আপত্তিকারীর মতে কল্পনা-গৌরব আছে। এ গৌরব স্বীকার না করিয়া জলেরই মধুর-রস স্বীকার করা উচিত।

লাঘব-গৌরবের দোষ-গুণ ভাগ, আধুনিক সমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এইজন্য ন্যায়-মতের লাঘব-গৌরব-ঘটিত-দোষ তাঁহাদের ভাল লাগিবে না। না লাগুক, কি করা যাইবে?

"সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি অনেক পার্থিব দ্রব্যেও কেবল মধুর-রস আছে। তবে 'মধুর-রসমাত্রবত্ত্ব' জলের লক্ষণ হইবে কিরূপে?"

এইজন্য দ্বিতীয় লক্ষণটীরও চরম অর্থ হইল, —'তিক্তাবৃত্তি-মধুররসবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্ব ব্যাপ্য-জাতি-মত্ত্ব'। দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য কোন্ জাতি টী তিক্ত-দ্রব্যে থাকে না, অথচ মধুর-দ্রব্যে থাকে?—জলত্ব জাতি। জলত্ব জাতি জল ভিন্ন কিছুতেই নাই, অথচ জল মধুর বৈ তিক্ত হয় না। পৃথিবীত্ব জাতি, মধুর-পৃথিবীতে থাকিলেও তিক্তাবৃত্তি নহে; তিক্ত-পৃথিবীতেও পৃথিবীত্ব জাতি আছে। অতএব কথিত দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি জলত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বিতীয় লক্ষণের পরিষ্কার এইরূপে করিতে হয়।

তৃতীয়, চতুর্থ লক্ষণের কথা বিশেষ কিছু নাই। তবে সকল সময়ে জলে শীতলস্পর্শ বা স্নেহ থাকে না; এজন্য তৃতীয় লক্ষণ হইবে,—"শীতল-স্পর্শবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"। অর্থ;—শীতলস্পর্শবৎ হইল জল; তাহাতে জলত্ব আছে। জলত্ব,—দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য জাতি।

চতুর্থ লক্ষণ হইবে,—"স্নেহবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"। অর্থ;—স্নেহবৎ হইল,—জল; তাহাতে জলত্ব আছে,—জলত্ব দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য জাতি; জল সর্ব্ব সময়েই জলত্ব-বিশিষ্ট। এই হইল পরিষ্কৃত লক্ষণ। এই সকল কথার আভাস পূর্ব্বে হইতেই দেওয়া যাইতেছে।

পঞ্চম লক্ষণের কথা।

"সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক তরলতা জলে আছে বটে, কিন্তু বরফ, শিলাবৃষ্টির শিলা (করকা)—এ সকল বস্তু, জল হইলেও ইহাতে স্বাভাবিক তরলতা কৈ? জলের লক্ষণ,—সমুদয় জলে থাকিবে; নতুবা তাহা জলের লক্ষণই নহে। সুতরাং 'সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ববত্ত্ব'কে জলের লক্ষণ বলি কিরূপে?"

এই আপত্তির পরিহারার্থ আমরা বলি,—পঞ্চম লক্ষণের চরম অর্থ হইল,—"সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ববদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"। বরফ ও করকা যে জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। যুক্তি-তর্ক দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এক সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ব লইয়া গোল; তাহা এইবার চুকিয়া গেল।

স্বাভাবিক তরলতা—পৃথিবীতেও নাই, তেজেও নাই; আছে কেবল জলে। সকল জলে না থাকুক্,—কোন জলেও ত থাকে। অতএব 'সাং-সিদ্ধিক-দ্রবত্ববৎ' হইল,—জল; তদ্‌বৃত্তি, দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি, হইতে হয়—জলত্ব; জলত্ব সকল জলেই আছে,—খাল, বিল, নদী, সমুদ্র, বরফ, করকা—সর্ব্বত্রই আছে। অতএব এই লক্ষণই আমাদের উপাদেয়।

কথাগুলি বড়ই কঠিন হইল। কি করিব বল! সরল করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি; তথাপি বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা না করিলে ভাল বুঝিতে পারিবে না। অতএব আমি বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ যিনি পাঠ করিবেন, তিনি যেন বুঝিতে চেষ্টা করেন। বুদ্ধি ও চেষ্টা থাকিলে, নিশ্চয়ই বুঝিবেন। ভাসা-ভাসা পড়িয়া গেলে চলিবে না।

জলে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী গুণ আছে, যথা;—রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এবং স্নেহ। এতন্মধ্যে রূপ, রস, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এবং স্নেহ—এই পাঁচটী বিশেষ গুণ। বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই জল একটী 'ভূত'—পঞ্চভূতের অন্তর্গত। পঞ্চবিধ কর্ম্মই স্থূলতঃ কোননা-কোন জলে আছে।

জল দ্বিবিধ; নিত্য এবং অনিত্য। জলীয় পরমাণু, নিত্য-জল; অপর সমুদয় জলই অনিত্য। এই জলীয় পরমাণু হইতেই অপার দুস্তর জল-নিধির সৃষ্টি হইয়াছে, হিমালয়ের ধবল-ভূষণ তুষার-রাজিও এই পরমাণু হইতেই উৎপন্ন। স্থূল-জলের সমস্ত গুণই জলীয় পরমাণুতে আছে, ক্রিয়াও পরমাণুতে আছে। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম

বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

পরমাণু সম্বন্ধে অপরাপর কথা পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

অনিত্য পৃথিবীর ন্যায় অনিত্য জলও তিন রূপে বিভক্ত;—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। জলীয় দেহ, অযোনিজ। জলীয় দেহ—বরুণলোক-বাসীদিগের জানিবে।

রসনা-ইন্দ্রিয়ই জলীয় ইন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা রসাস্বাদন করা যায়, তাহাই রসনা-ইন্দ্রিয়; জিহ্বা নামে পরিচিত পরিদৃশ্যমান মাংসখণ্ড ইন্দ্রিয় নহে। জিহ্বা নামক লম্বমান মাংসখণ্ড আছে, অথচ রসাস্বাদন হয় না,—এমন লোক দেখা যায়। অর্থাৎ যাহার রসনেন্দ্রিয় নাই, রসাস্বাদন তাহার হইবে না। জিহ্বা রসনেন্দ্রিয়ের আশ্রয়—এই পর্য্যন্ত।

বিষয়।—যাহা দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ জল; তাহাই বিষয়াত্মক জল। স্থূলতঃ ভোগ্য জল বলিলেও বলা যায়। হিমকণা হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয়ই বিষয়।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সিপাহী-বিদ্রোহে ভুক্তভোগী।

মিরাট।

১৮৫৭ সালের ১০ই মে মিরাটে সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহীরা বৈর-নির্যাতন-স্পৃহায় অধীর হইয়া নরশোণিত-প্রবাহে ধরাতল কিরূপ সিক্ত করিয়াছিল, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে এবং হৃদয় বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই অকল্পিতপূর্ব্ব আকস্মিক বিপ্লবের ভীষণস্রোতে পড়িয়া মিরাটবাসীরা চারিদিক্ বিভীষিকাময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে ধন-প্রাণ, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পুত্রকন্যা, স্নেহময় ভ্রাতা-ভগিনী, প্রাণসম বনিতা লইয়া কিরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অত্যাচার-প্রিয় শোণিত-পিপাসু বিদ্রোহীদের হস্তে কত কত নিরপরাধীকে যে প্রাণ দিতে হইয়াছে, তাহা বলিয়া কে সংখ্যা করিবে? সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের মর্ম্ম-স্পর্শী কাতর-ধ্বনিতে উন্মত্ত সিপাহীদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় নাই। কত লোক-ললাম-ভূতা, সৌন্দর্য্য-সমন্বিতা মহিলাও এই সকল দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন! এই দুরাচারেরা কত লোকের প্রমোদ-কানন সুখসেবিত আনন্দময় বিশ্রাম-ভবনকে যে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছে, তাহা আর বলা যায় না। যাহা হউক, এই সকল লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর ঘটনা যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বর্ণিত বিষয় এস্থলে প্রকাশিত হইবে।

(১)

শ্রীযুক্ত মোহর সিং মিরাটে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—১৮৫৭ সালে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামে গ্রামে "চাপাটি" বা রুটি—চৌকিদারেরা লইয়া যাইত। কেন যে, এরূপ চাপাটি বিতরিত হইত, তৎসম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা উল্লেখ করিয়াছে। কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা বলিত,—দেশে 'মারি-ভয়' হইলে এই চাপাটি এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পাঠাইলে, সেই গ্রামের "রোগ-বালাই" অন্য গ্রামে যাইয়া থাকে। কেহ বলিত,—এই চাপাটি পাঠাইয়া দেশের লোককে একতা-সূত্রে বদ্ধ করিতেছে; তাহার পর সকলে একেবারে ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। এইরূপে যাহার কল্পনায় যে প্রকার ভাবের উদয় হইত, সে তাহাই রাষ্ট্র করিত। ফল কথা,—এই চাপাটি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিত, আর যে, ইহা বিতরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, তাহাকে অতি গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইত। এই প্রকারে এই চাপাটি লইয়া কয়েক মাস নানা গোলযোগ চলিতে লাগিল।

বিদ্রোহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ডেপুটী কালেক্টর বাবু মোহর সিং স্থানান্তর হইতে মিরাটে আসিয়া শুনিলেন,—"গবর্ণমেণ্ট, সিপাহীদের নূতন টোটা ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু টোটাতে চর্ব্বী মিশ্রিত আছে বলিয়া সিপাহীরা তাহা ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।" এই কথা লইয়া হাটে-

বাজারে, লোকেদের বাড়ী এবং বৈঠকখানায় সর্ব্বত্রই আন্দোলন হইতে লাগিল; কিন্তু বিদ্রোহের কোন আশঙ্কা তখন পর্য্যন্ত কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ৮ই মে কয়েক জন সওয়ার অবাধ্যতা-পরাধের জন্য কারারুদ্ধ হইল। তথাপি তখন পর্য্যন্ত মিরাটবাসিগণ ভাবে নাই যে, তাহাদের কি ভয়ঙ্কর বিপদ ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে নিহিত রহিয়াছে; এবং অচিরাৎ তাহারা যে সর্ব্বস্বান্ত হইবে, তাহার জন্য তাহারা তখন প্রস্তুত হইতে পারে নাই।

১০ই মে বেলা ৬টা বাজিয়া গিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপে লোকজন ছটফট করিতেছে। "লু" তখন পর্য্যন্ত চলিতেছে;—তাহার আর বিরাম নাই। এই সময়ে বাবু মোহর সিং আপনার ঘরে বসিয়া আছেন, মিরাটের সদর-বাজার হইতে আমীন শম্ভুনাথ আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, "ইংরেজদের সঙ্গে সিপাহীরা যুদ্ধ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া মিরাট-বাসীরা আপন-আপন ঘরবাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছে।" এ সংবাদ বাবু মোহর সিং প্রথমত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইংরেজদের সঙ্গে সিপাহীরা যুদ্ধ করিবে,—এ কথা তাঁহার যেন স্বপ্নের অগোচর ছিল। যাহা হউক, সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য তিনি বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখেন, লোকজন উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে ঊর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া তাড়াতাড়ি আপনাদের বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছে; কেহ বা ছুটাছুটী করিয়া আপনাদের আশ্রয়-স্থান অনুসন্ধান করিতেছে। সকলেই ভীত, ত্রস্ত এবং ভয়-চকিত। ইহা দেখিয়া তখন তাঁহার বিশ্বাস হইল,—অবশ্যই কোন প্রকার বিভ্রাট ঘটিয়া থাকিবে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে লোকের বাস-ভবন আগুন লাগিয়া ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। যে দিকে চাও, সেই দিকেই অগ্নি-কাণ্ড। প্রচণ্ড হুতাশন, বিশ্বসংহারকারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেশ রসাতলে দিবার জন্য যেন উদ্যত হইয়াছেন! চারিদিকে গৃহদাহের ভয়ঙ্কর শব্দ! সেই সঙ্গে গৃহবাসীদের গভীর আর্ত্তনাদ মিশ্রিত হওয়াতে যেন মহাপ্রলয়-কাল সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল! বাবু মোহর সিং দেখিলেন,—তিন জন সওয়ার নিষ্কাশিত অসি হস্তে, কষ্টম-গৃহে অগ্নিপ্রদান করত তাহার কম্পাউণ্ড হইতে বহির্গত হইল। সঙ্গে বহু-সংখ্যক ইতর লোক; তাহারা উন্মত্তভাবে "এ আলি আলি! একনারা হাইদারি" করিয়া চীৎকার করিতেছিল। এই সকল লোকদের মধ্যে অনেক কয়েদীরাও ছিল। তাহাদের কাহারও কাহারও পায়ের বেড়ীর ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইতেছিল,—তখন পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে নাই। সওয়ারেরা গর্ব্বিত ভাবে বলিতেছিল, তাহারা ক্যান্টন-মেণ্টে অগ্নি-প্রদান করিতেছে, ইংরেজদের হত্যা করিয়াছে, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছে এবং ইংরেজ-শাসনের পর্য্যবসান করিতে বসিয়াছে। ইংরেজেরা তাহাদের যে ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য এই সকল কাজ করিয়াছে। যাহা হউক, রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের বিকট শব্দে এবং তাহাদের অত্যাচারে সহর মথিত হইতেছিল। তাহার পর গভীর রাত্রে আর কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে শুনা গেল, বিদ্রোহী সিপাহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

১১ই মে মিরাটের মাজিষ্ট্রেট এবং কমিশনার সাহেবের আদেশে, ডেপুটী কালেক্টর উজির আলি খাঁ, তহসিলদার গঙ্গাপ্রসাদ এবং বাবু মোহের সিং সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকদের এক স্থানে সমবেত করত, তাঁহাদের নানা প্রকার সৎপরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কথায় এবং তাঁহাদের ভাবে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইল,—তাঁহারা কেহই ইংরেজ-রাজের বিপক্ষ নহেন। তদনন্তর তাঁহারা দোকানী-পসারীদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহাদের কোনরূপ আশঙ্কা নাই, তাহারা নির্ভয়ে আপন-আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক। তদনুসারে তাহারা ১২ই মে আপনাদের দোকান-পাট খুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু এই গোলযোগের জন্য তিন দিন কাল সহরের মধ্যে জিনিস-পত্রের আমদানি একেবারে বন্ধ ছিল।

পল্লীগ্রামবাসীরা অনেক দিন পর্য্যন্ত সহরময় বিচরণ করিয়া বেড়াইত। এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে গোলযোগ চলিয়াছিল। তাহার পর বৃটিশদের সুকৌশলে সর্ব্ব-প্রকার বিশৃঙ্খলা তিরোহিত হইয়া ক্রমশ শান্তি সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

(২)

উজীর আলি খাঁ, একজন ডেপুটি কালেক্টর। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত মিরাটের ক্যান্টনমেণ্টে বাস করিতেন। ১০ই মে যখন সূর্য্যদেব সমস্ত দিন অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়া অস্তমিত হইলেন, তাহার পর গোধূলি উপস্থিত হইল। এই সময়ে চারিদিকে গভীর কোলাহল শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। উজীর আলি খাঁ তাহা শুনিয়া সত্রাসে আপনার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। রাত্রে বিদ্রোহী-সেনাদের ভৈরবনাদে তিনি থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন। মনে দারুণ ভয়,—পাছে বিদ্রোহীরা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ উৎপাত করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে কোন প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় নাই। সে ভয়ঙ্কর রাত্রি অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইলে প্রতিদিনের ন্যায় তরুণ অরুণ আপনার কিরণ জাল বিস্তার করিয়া চারিদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। উজীর আলি খাঁ প্রভাত হইবামাত্র আপনার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, মহম্মদ আলি খাঁর গৃহে আশ্রয় লইলেন। দিল্লীর পতন পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানেই অবস্থান করেন।

বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে, সওয়ার এবং সহরের বদমায়েস-দল একত্র মিলিত হইয়া সহর তোলপাড় করিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে সহিসও 'পূরবিয়ারা' যোগ দিয়াছিল। রাত্রি ঘোর অন্ধকারময় এবং বিদ্রোহীরা অনেক দূরে ছিল বলিয়া তিনি কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার যে সকল লোকজন ছিল, তাহারা কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। তাহারা সকলে তাঁহাকে লইয়া বসিয়াছিল। রাত্রে কেবল "এ আলি আলি!" এই শব্দে সমস্ত সহর প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি যখন পরদিন প্রাতঃকালে নিজ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সহরে যান, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সওয়ারদের সঙ্গে কসাই, পাল্লাদার (মুটে) এবং কারামুক্ত কয়েদীরাই মিলিত হইয়া সহর মধ্যে খুন-জখম এবং লুঠ-পাট করিয়াছিল।

সওয়ারেরা এই রাষ্ট্র করিয়াছিল যে, ইংরেজেরা আর সহর-মধ্যে নাই। এই কথা শুনিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা নির্ভয়ে সহরের মধ্যে নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল। বিদ্রোহীরা রাত্রে কেবল সাহেবদের বাঙ্গালায় আগুন দিয়া ভস্মসাৎ করিয়াছিল এবং সুযোগ পাইলে সাহেবদিগকে হত্যা করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই; কিন্তু তাহারা কাহারও কোন দ্রব্য-সামগ্রীতে হস্তক্ষেপ করে নাই। বদমায়েসেরা এবং কয়েদীরাই সমস্ত রাত্রি পরস্বাপহরণ করিতে তৎপর ছিল।

১১ই মে যখন উজীর আলি খাঁ সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান, তখন তিনি দেখেন যে, সম্ভ্রান্ত ও শান্তিপ্রিয় লোকেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন এবং এই আকস্মিক বিপৎপাতের জন্য সবিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। যে সকল দুরাচারদের অত্যাচারে মিরাটবাসীরা উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের তিনি কাহাকেও জানিতেন না বটে, কিন্তু তিনি শুনিয়াছিলেন,—তাহারা সকলেই যে সমান ভাবে দুর্ব্বৃত্ত, তাহা নহে; অনেকে কেবল বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিল এবং একত্রে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল।

তিনি শুনিয়াছিলেন,—১০ই মে পুলিশের লোকেরা শান্তি-স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই প্রস্থান করিয়াছিল। ১১ই মে আবার সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলে, আবার সকলে একে একে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দেয় এবং সরকারী কাজ-কর্ম্ম পূর্ব্বমত চলিতে আরম্ভ করে।

মিরাটে বসা-মিশ্রিত টোটা লইয়া অনেক আন্দোলন হইতেছিল, কিন্তু সেজন্য যে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইবে—এ কথা কেহ ভাবে নাই এবং তাহার পূর্ব্ব-আভাসও কেহ পায় নাই। হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়া সকলকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিল।

মিরাটে 'গুজার' বলিয়া এক প্রকার জাতি আছে। চুরি ডাকাইতি তাহাদের একমাত্র ব্যবসায়। কোন একটা হুজুগ পাইলে তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তাহারা অজ্ঞাত লোকের সাহায্যে অনেক নিরাপরাধী ব্যক্তির

শোণিতে রসাতল অভিষিক্ত করিয়াছিল। তাহারা বিশেষ জানিত যে, ইংরেজরাজ্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদের ঈদৃশ পাপাচরণের জন্য সমুচিত ফল মিলিবে; সুতরাং তাহারা ইংরেজ-শাসন লোপ পাইয়া যাহাতে কোন বিদ্রোহী রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণপণে তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছিল।

উজীর আলি খাঁ ইহাও শুনিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহের দিন সন্ধ্যা হইবা মাত্র নিকটস্থ গ্রামবাসীরা ক্যাণ্টনমেণ্টে প্রবেশ করত অনেকে লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীর অংশ লইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত সহরবাসী ও ব্যবসাদারদের টাকাকড়ি লুঠ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তাহারা কেবল কালেক্টরী হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল মাত্র।

১১ই মের পর সহরে আর কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রামের জমীদারেরা প্রায় তিন চারি দিন সহর লুঠ-পাট করিবার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু পুলিশের তত্ত্বাবধানে, সহরবাসীদের সতর্কতায় এবং ইংরেজের শাসন-কৌশলে, তাহারা আর কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। যাহা হউক, লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল কোন্ স্থানে যে রাখিয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পল্লীগ্রামবাসীরা যাহা হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, তাহা লইয়া তাহারা আপন-আপন গ্রামে চলিয়া গিয়াছিল। কসাই এবং পাল্লাদারেরা যাহা ইতিপূর্ব্বে লুঠ করিয়াছিল, তাহা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীর সম্মুখে, গলিতে কিংবা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর তাহা স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রীসঃ—

মুঙ্গের।

মুঙ্গেরের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি, ইতিহাস-পাঠক মাত্রেরই নিকট পরিচিত; আরও আজকাল ইহা একটী সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই স্বীকৃত। স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলে, শরীর শোধরাইবার জন্য অবস্থাপন্ন অনেক বাঙ্গালী প্রায়ই মুঙ্গেরে যাইয়া থাকেন। মুঙ্গেরের ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বর্ত্তমান অবস্থা, অনেকেরই জ্ঞাতব্য; বিশেষতঃ মুঙ্গের সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনা যায় এবং ইতিহাসে ইহার যে সকল প্রাচীনতম বিবরণ বিবৃত আছে, তাহার অধিকাংশ বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক এবং প্রীতিপ্রদ। এমন একটী সুন্দর স্বাস্থ্যকর পুরাবৃত্ত-প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ জানিতে কৌতূহল কাহার না হয়? আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াই, স্বচক্ষে মুঙ্গের দেখিতে যাই; দেখিয়া শুনিয়া যে সব তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, জন্মভূমির পাঠকবর্গের পরিতৃপ্তির জন্য তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিলাম। আশা হয়, ইহাতে পাঠকবর্গের কতক পরিমাণে কৌতূহল নিবারিত হইতে পারিবে।

বাস্তবিকই মুঙ্গের বড়ই সুন্দর। যখন রেলের গাড়ীতে চড়িয়া মুঙ্গেরের নিকট উপস্থিত হই, তখন মনে হয়, যেন ধরাধাম ছাড়িয়া স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে শোভার সীমা নাই—সে সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই—সে দৃশ্যের উপমা নাই! দক্ষিণে প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবী বিপুল কায় বিস্তার করিয়া কুল্-কুল্-নাদে বহিয়া যাইতেছেন, আর বামে মুঙ্গেরের বৃহৎদুর্গ চিত্রবৎ বিরাজিত রহিয়াছে। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ছবিটী যিনি একবার স্বচক্ষে দর্শন করেন, তাঁহার হৃদয়ে ইহা আজীবন পাষাণাঙ্কিত হইয়া থাকে।

হাবড়া হইতে মুঙ্গের ২০৩ মাইল দূরে অবস্থিত। রেলপথে যাইতে হইলে বার ঘণ্টায় মুঙ্গেরে পৌঁছান যায়। হাবড়া ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠিলে একাদিক্রমে জামালপুর পর্য্যন্ত যাইয়া গাড়ী হইতে নামিতে হয়। এই স্থান হইতে আবার একটী শাখা-লাইন দিয়া মুঙ্গেরে যাওয়া যায়। জামালপুর হইতে মুঙ্গের তিন ক্রোশ দূর।

মুঙ্গের নগরটী দুই ভাগে বিভক্ত;—এক অংশ কেল্লা ও অপর অংশ সহর। বিচারালয়, পুলিশ, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যালয় এই দুর্গের মধ্যে সংস্থাপিত। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, বণিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ইংরেজগণ এবং উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী, উকীল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতিও কেল্লার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। মুঙ্গেরের সারাংশকেই প্রকৃত নগর—সহর—বলা যাইতে

পারে। এই বিভাগ-মধ্যেই দেশীয় ধনী, মানী, বণিক্ ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোকের বাস। এতদ্ব্যতীত মধ্য ও নিম্ন-পদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা এই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সহরের সমস্ত দোকান-পাট, হাট-বাজার প্রভৃতি এই খানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মুঙ্গের দুর্গটী একটী পার্ব্বত্য-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা দীর্ঘে চারি হাজার ফিট এবং প্রস্থে তিন হাজার পাঁচ শতফিট আন্দাজ হইবে। ইহার প্রাচীর ১৩।১৪ হাত উচ্চ। কেল্লাটীর তিন দিকে গড়খাই এবং একদিকে প্রসন্নপূত-সলিলা ভাগীরথী প্রবাহিতা। এই দুর্গটী বহু-প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। যদিও এখানে কোন পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাচ দুর্গের পূর্ব্ব-দ্বারে কতকগুলি লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ-মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকায়, অদ্যাপি ইহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন মুঙ্গের দুর্গের সে শোভা-সমৃদ্ধি নাই;—আছে কেবল অতীত-গৌরবের স্মৃতিমাত্র।

মুঙ্গের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, মুদ্গল ঋষি এই স্থানে বাস করিতেন। ঐ মহর্ষির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই এই স্থানের "মুদ্গলপুরী" বা "মুদ্গলগিরি" অথবা "মুদ্গলাশ্রম" নাম হইয়াছিল। কিন্তু হরিবংশে উল্লিখিত আছে যে, গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের তনয়-বৃন্দের মধ্যে মুদ্গল নামক নৃপতির নাম হইতে এই স্থানের নাম সমুদ্ভূত। মুদ্গল পিতার নিকট হইতে এই স্থানের অধিকার প্রাপ্ত হন। ডাক্তার বুকানান্ হ্যামিল্টন সাহেব বলেন যে, সাত আট শতাব্দীর প্রাচীন একটী প্রস্তর-ক্ষোদিত-লিপি মুঙ্গেরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে "মুদ্গলগিরি" শব্দ ক্ষোদিত আছে। মুদ্গল হইতে মুঙ্গের নাম যে, কিরূপে হইল, তৎসম্বন্ধে কাহার কাহার মত এইরূপ—"বিহারবাসীরা" 'ল' স্থানে সচরাচর "র" উচ্চারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং "মুদ্গল" হইতে "মুদ্গর" এবং মুদ্গরের অপভ্রংশে "মুঙ্গের" হইয়াছে।"

মুঙ্গের নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কনিংহাম সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"পাল রাজগণের ক্ষোদিত লিপিতে এই স্থান মুদ্গগিরি নামে উক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "মুগের দালের' সংস্কৃত শব্দ "মুদ্গ"; সেই হেতু সম্ভবতঃ "মুঙ্গের" শব্দ "মুদ্গ" শব্দের অপভ্রংশ হইবে। অথবা এই স্থানের আদি নামের সহিত "মন্" বা "মুণ্ড" শব্দের সংশ্রব থাকিতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বে এ স্থানটী 'মন্গিরি' বা 'মুণ্ডগিরি' নামে সম্ভবতঃ অভিহিত হইত। যেহেতু পূর্ব্বে এ স্থানে "মন্" বা "মুণ্ড" নামক অনার্য্যজাতিরও বাস ছিল। এই শেষোক্ত যুক্তিটী আমার অধিক সম্ভব বলিয়া বোধ হয়; কারণ মুঙ্গেরের কয়েক ক্রোশ নিম্নে যে স্থানে খড়্গপুর-শৈল-বিনির্গত ক্ষুদ্র নদী, গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সে স্থলটী এখনও "মন্" বা "মুন্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"

মুঙ্গের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার মত দেখা যায়; কিন্তু কোন্‌টী যে ঠিক্, তাহা নিরূপণ করা এখন দুষ্কর। যাহাই হউক, নামে কিছু আসে যায় না; নামের প্রত্নতত্ত্ব লইয়া বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখন মুঙ্গেরের অপরাপর আবশ্যকীয় বিষয়ের বিবৃতি করা যাউক।

মুঙ্গের-দুর্গের চারিটী দ্বার। ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই দ্বারটী দ্বার-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রধান। ইহার নাম "লাল দরওয়াজা"। এই তোরণ হইতে দুর্গের মধ্যে যে পথটী চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহদাকার পুষ্করিণী আছে। এই দুইটী পুষ্করিণীর এক পারে অবশ্যই এই রাস্তাটী; অপর দিকে এক একটী অনুচ্চ পাহাড় দণ্ডায়মান। বাম দিকের পর্ব্বতটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ। ইহার শিখর-দেশ "কর্ণচৌরা" নামে অভিহিত। সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে আমরা "চত্বর" বলি, হিন্দী ভাষায় তাহাকে "চবুতরা" বলিয়া থাকে। "চৌরা" শব্দটী "চবুতরার" অপভ্রংশ মাত্র। ফলে "কর্ণচৌরা" অর্থে—কর্ণের বসিবার স্থান বুঝায়। এইরূপ প্রবাদ যে, মহাভারতোক্ত মহাবীর কর্ণ, প্রত্যহ কষ্টহারিণীঘাটে স্নান করিয়া এই প্রস্তরের বেদীতে আসীন হইয়া দীন-দরিদ্র-দিগকে রত্ন-কাঞ্চনাদি দান করিতেন। এতৎসম্বন্ধে গল্পটী পশ্চাতে বিবৃত হইবে। কনিংহাম সাহেব বলেন,—"ইনি মহাভারতের প্রথিতনামা কর্ণ নহেন। ইনি অপর কর্ণ। এই কর্ণ নৃপতি, বিক্রমের সম-সাময়িক ছিলেন।"

"কর্ণচৌরার" চূড়ার উপরিভাগে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে পূর্ব্বে মুঙ্গেরের সিভিল-জজ বাস করিতেন। তৎপরে মুরশিদাবাদ-নিবাসী রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর নামক জনৈক ভূম্যধিকারী ইহা ক্রয় করেন। জন-সাধারণের বিশ্বাস যে, 'ইহার উপর যে, কেহ বাস করিবেন, তাঁহার অচিরেই মৃত্যু হইবে।' রায় অন্নদাপ্রসাদের অকাল-মৃত্যু হওয়াতে এই বিশ্বাসটী লোকের মনে অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

অন্য পর্ব্বতটীর উপরে "শাহ সাহেবের প্রাসাদ" নামক একটী অতীব সুন্দর অট্টালিকা সন্নিবিষ্ট। এক্ষণে স্থানীয় কালেক্টরগণ এই অট্টালিকায় বাস করিয়া থাকেন। ইহার ঠিক পশ্চাদ্ভাগে এক সময়ে সুজা সাহের—সম্রাট শাহজেহাঁনের পুত্র সুলতান্ সুজার—রম্য রাজ-প্রাসাদ ছিল; এক্ষণে উহার ভগ্নাবশেষ,—পরিবর্ত্তিত আকারে কতকাংশ ইংরেজ-রাজের কারাগার, কতকাংশ বা ইংরেজ বণিকের দোকানে পরিণত হইয়াছে। শাহ সুজার প্রাসাদ হইতে অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমগণ প্রস্তরময় সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তাঁহাদিগকে তখন প্রায় শতাধিক সোপান-বিশিষ্ট গঙ্গাপুলিন-প্রসারিণী সুরম্য "বৌলী"র অর্থাৎ অবগাহনের ঘাটে নামিতে হইত। এখন সে পথ বিলুপ্তপ্রায়; কেবল ভাগীরথীর তীরে একটী সেতুর নিম্নে ঘাটটী বিদ্যমান আছে। সুড়ঙ্গপথ অবশ্য অন্ধকারময়; সুন্দরী বেগমদিগের গমনাগমনের অসুবিধা নিশ্চিতই; সেই জন্য আলোক ও বায়ু আসিবার জন্য পথের উপর মধ্যে মধ্যে অনাবৃত-মুখ "চিমনী"র মতন আলোক স্তম্ভ ছিল। এখন দুইটী মাত্র স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। বেগমেরা এই স্থানে স্নান করিতেন এবং কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা হইলে এই গুপ্তপথ দিয়া পলাইয়া যাইতেন।

"বৌলীর" অতি সন্নিকটেই "কষ্টহারিণী" ঘাট। ঘাটটী বড় সুন্দররূপে বাঁধান। ঘাটের নিম্নে ভাগীরথী উত্তর-বাহিনী হইয়া কল-কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। ঘাটে কয়েকটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং কতকগুলি গঙ্গাপুত্র ও সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন।

এই ঘাট সম্বন্ধে লোক-সাধারণ-মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে;—

"পূর্ব্বকালে এই ঘাটে বসিয়া মুদ্‌গল ঋষি তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্যার এইরূপ নিয়ম ছিল যে,—এক পক্ষ উপবাস করিতেন এবং পক্ষান্তে একদিন মাত্র তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করিয়া আহার করিতেন। মুদ্‌গল ঋষির এইরূপ কঠোর তপশ্চরণে নারায়ণ অতীব প্রীত হইলেন। পক্ষান্তে ঋষিশ্রেষ্ঠ তণ্ডুলকণা সিদ্ধ করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছেন—এমন সময়ে নারায়ণ বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া অতিথি হইয়া উপস্থিত হইলেন। অতিথি-সমাগমে ঋষি অত্যন্ত প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে যথাবিধি তাঁহার সৎকার করিয়া ভোজ্য-দ্রব্যের অর্দ্ধেকাংশ প্রদান করিলেন এবং অপরার্দ্ধ নিজের জন্য রাখিলেন। কিন্তু ছদ্মবেশী নারায়ণ কহিলেন যে, ঐ অপরার্দ্ধ না দিলে তাঁহার আহারে তৃপ্তি হইতেছে না। তৎশ্রবণে ঋষি অবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্যও তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। অতিথি বিদায় হইলে, তিনি হৃষ্ট-চিত্তে তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। অনাহারে এইরূপে এক পক্ষ অতিবাহিত হইলে, দ্বিতীয় পক্ষে আবার যেমন তিনি তণ্ডুলকণা পাক করিয়া আহারে বসিবেন, নারায়ণ পুনর্ব্বার এক ব্রাহ্মণের বেশ-পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া অতিথি হইলেন এবং ঋষির সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া প্রস্থান করিলেন। ঋষিপুঙ্গব সন্তুষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দুই পক্ষ অনাহারে থাকিয়া তৃতীয় পক্ষে আহারের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় নারায়ণ আসিয়া পুনরায় সেইরূপে সমস্ত দ্রব্য আহার করিলেন। ঋষি তাহাতেও বিরক্ত বা রুষ্ট হন নাই। এই বার ছদ্মবেশী নারায়ণ সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'হে মুদ্‌গল! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' ঋষি কহিলেন,—'তুমি আমাকে বর দিতে চাহিতেছ,—তুমি কে?' নারায়ণ কহিলেন,—'তুমি যাহার জন্য এই কঠোর তপস্যা করিতেছ, আমি সেই নারায়ণ, তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিতেছি।' ঋষি উত্তর করিলেন,—'আমার কোন বর আবশ্যক হইতেছে না; যেহেতু পৃথিবীর কোন বিষয়েই আমার অভিলাষ নাই; এক পরম-ব্রহ্মে অভিলাষ ছিল, কিন্তু আপনার সাক্ষাৎলাভে সে আশাও পূর্ণ হইল। তবে একবার আপনার প্রকৃত রূপ দেখিতে

ইচ্ছা করি।” ঋষির কথা শুনিয়া নারায়ণ নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—‘তোমার উপর অতীব প্রীতি হইয়াই বর দিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; অতএব যে-কোন বর হউক, প্রার্থনা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।’ তখন ঋষি কর-যোড়ে কহিতে লাগিলেন,—‘প্রভো! যদ্যপি বর দিতে আপনার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর দিউন যে, ‘এই ঘাটে আপনার সাক্ষাৎকার হওয়াতে যেমন আমার সমস্ত কষ্ট দূর হইল, তেমনি অদ্য হইতে এই ঘাটের নাম ‘কষ্টহারিণী’ হউক এবং এই ঘাটে যে-কোন ব্যক্তি স্নান দানাদি করিবে, মরণান্তে সে যেন বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়।’ অনন্তর ভক্তবৎসল নারায়ণ ‘তথাস্তু’ বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।”

মুঙ্গের-নগর-প্রান্তে ভাগীরথী-তীরে মন্দির-মধ্যে চণ্ডিকাদেবী-মূর্ত্তি বিরাজিতা। এই স্থানের নাম চণ্ডীস্থান এবং দেবীর নাম “বিক্রম-চণ্ডী” অথবা “চণ্ডী মাতা”। নিকটে অপর একটী শিবমন্দির রহিয়াছে। অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে কয়েকটী সন্ন্যাসী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। বিহারবাসিগণ বলিয়া থাকেন যে, বাহান্ন পীঠের মধ্যে ইহা একটী পীঠস্থান। কিন্তু শাস্ত্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এতদ্দেশে এই চণ্ডিকাদেবী সম্বন্ধে এই গল্পটী প্রচলিত আছে;—

“নৃপতি কর্ণের রাজধানী ভাগলপুরে ছিল। তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে এইখানে দেবীর পূজা করিতে আসিতেন। আসিয়া প্রকাণ্ড একটী অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিতেন। তদুপরি একখানি বৃহৎ লৌহ-কটাহে ঘৃত চাপাইয়া পূজা করিতে বসিতেন। পূজান্তে ঐ কটাহস্থিত উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। তাঁহার মাংসাদি ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজা হইলে, দেবীর ডাকিনী যোগিনীগণ ঐ মাংস আহার করিত। আহারান্তে তাহারা একখণ্ড অস্থিতে অমৃত-কুণ্ডের জল সিঞ্চন করিয়া নৃপতিকে জীবিত করিত। তদনন্তর দেবী তাঁহাকে বর দিতে চাহিতেন। কর্ণ, দেবীর আজ্ঞাক্রমে এক কটাহপূর্ণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরক রত্নাদি প্রার্থনা করিতেন। নৃপতি ঐ রত্ন-কাঞ্চনাদি প্রত্যহ প্রাতে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান করিতেন।

“এতধন-রত্নাদি কর্ণ প্রত্যহ কোথা হইতে পান, এই গূঢ় রহস্য জানিবার জন্য রাজা বিক্রম, কর্ণের নিকট ছদ্মবেশে আসিয়া ভৃত্য হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ, তাঁহাকে পরিচারক পদে নিযুক্ত করিয়া পুষ্প-চন্দন ও পূজার উদ্যোগাদি করিবার জন্য তাঁহার উপর ভারার্পণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে রাজা বিক্রম, পূজার পদ্ধতি এবং উষ্ণ ঘৃতে প্রাণত্যাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। একদা কর্ণের আগমনের পূর্ব্বে বিক্রম স্বয়ং পূজাদি সমাপ্ত করিয়া ঘৃতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ডাকিনী যোগিনীগণ মাংস-ভোজন-করণানন্তর মৃত-সঞ্জীবনী-জল-সিঞ্চনে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিল। অনন্তর দেবী পূর্ব্ব-প্রথানুসারে বর দিতে চাহিলেন; বিক্রম তখন এই বর প্রার্থনা করিলেন যে,—‘অদ্য হইতে কর্ণ আসিবা মাত্র যেন তাঁহার প্রার্থিত রত্ন-কাঞ্চনাদি প্রাপ্ত হন—আর যেন এই লাভাশয়ে তাঁহাকে উত্তপ্ত ঘৃতে প্রাণত্যাগ করিতে না হয়।’ অনেক কষ্টে দেবী এই বর প্রদানে সম্মত হইলেন। বিক্রম, বর প্রাপ্ত হইবামাত্রই কটাহ খানি দেবীর গৃহের ছাদের উপর উল্টাইয়া রাখিয়া, চলিয়া গেলেন।”

সেই জন্য জনসাধারণ মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস যে, দেবীনিকেতনের ছাদটী হইয়াছে। ঐ কটাহের ন্যায়; ছাদের শীর্ষদেশে একটী আংটা সংলগ্ন আছে;—সমাগত ব্যক্তিগণকে উহা ধরিয়া নাড়িয়া খট্ খট্ শব্দ করিতে দেখা যায়। বিক্রম হইতেই দেবীর নাম হইয়াছে,—“বিক্রমচণ্ডী”—কথিত আছে,—“রজনীতে ঐ গৃহে কেহ একাকী থাকিতে পারে না,—থাকিলেই তাহার মৃত্যু হয়।’

এই গৃহের নিকট তিন চারিটী শিব, অন্নপূর্ণা এবং পার্ব্বতীর মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রবেশ-পথে মন্দির মধ্যে যে শিব-মূর্ত্তিটী দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি “কাল-ভৈরব” নামে অভিহিত। কালী-রূপা এই “বিক্রমচণ্ডী” একরূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় নগরের প্রান্তভাগে থাকিলেও মুঙ্গের-বাসিগণের নিকট নিয়মিতরূপে দৈনিক পূজা পাইয়া থাকেন। পর্ব্বদিনে এই স্থানে বহুবিধ লোকেরও সমাগম হইয়া থাকে।

মুসলমান বিজেতাদিগের প্রথম-অধিকার-

কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, মুঙ্গেরের শেষ মুসলমান-নৃপতি মীর কাশিমের ইংরেজকর্ত্তৃক পরাজয় হওয়া অবধি সংক্ষিপ্তরূপে বিবৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বাঙ্গালা-প্রবেশ কালে নির্ব্বিঘ্নে মুঙ্গের হস্তগত হয়। বিহার নগরে বসিয়া যখন মুসলমান-প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাগণ বিহার প্রদেশ শাসন করিতেন, তখন উক্ত প্রদেশের মধ্যে মুঙ্গের দ্বিতীয় নগর বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুঙ্গের বাঙ্গালার অন্তর্ভূত হয়। এই সময়ের পর হইতে মহম্মদ তোগ্‌লক্ মুঙ্গেরকে দিল্লীর অন্তর্গত নিজ শাসিত প্রদেশ সমূহের অন্তর্ভূত করিয়া লয়েন। বহলাল লোদীর শাসন কালের অবসানে এই স্থান আফ্‌গান-সর্দ্দার-দিগের হস্তগত থাকে। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন দিল্লীর সুল্‌তান সেকন্দর্‌ লোদীর সহিত হুসেইন সাহের পুত্র রাজকুমার দানিয়ালের বিহারের সন্নিকটে সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়, সেই সময় হইতে মুঙ্গের রীতিমত বাঙ্গালার অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকৃত হয়। দানিয়াল যখন তাঁহার পিতার অধীনে পূর্ব্ববিহারের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকেন, তৎকালে তিনি মুঙ্গের-দুর্গ সংস্কার করেন। এই সময়ে তিনি, "সাহনফা" নামক মুসলমান-পীরের দর্‌গাহের ('সমাধি'-সমন্বিত ভজনাগারের) উপর একটী সুপ্রশস্ত খিলান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্গের যে দ্বার (পশ্চিম দ্বার) দিয়া মুঙ্গের-সহর মধ্যে "বেলুনবাজার" পল্লীতে যাইতে হয়, দুর্গ হইতে বাহিরে যাইবার সময় ঐ দ্বারের বাম দিকে একটী উচ্চ-ভূমির উপর ঐ দর্‌গাহাটী নির্ম্মিত। উহার উপরে উঠিতে হইলে, বহুসংখ্যক অধিরোহণী অতিক্রম করিতে হয়। ইহার নিম্নে অনেক গুলি 'সমাধি' ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। দর্‌গাহের খাদিমের (আস্তানা-রক্ষকের) প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায়,—যে সময়ে দুর্গ সংস্কৃত হইতে ছিল, সেই সময়ে কুমার দানিয়াল স্বপ্ন দেখেন যে, দুর্গ-প্রাচীরের সন্নিকটে একটী সমাধি-মধ্য হইতে মৃগনাভির সৌরভ বাহির হইতেছে। রজনী অবসানে অনুসন্ধান দ্বারা ঐ সমাধি আবিষ্কৃত হয়। ঐ সমাধি-মধ্যে কোন মহাপুরুষ সমাহিত আছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়াতে ঐ অপরিজ্ঞাত মহাপুরুষকে "সাহনাফ" নামে অভিহিত করা হয়। পারস্য-ভাষায় "নাফ" শব্দার্থে কস্তুরীপূর্ণ বীজকোষ বুঝায়।

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে মুঙ্গের, বাঙ্গালার মুসলমান-নৃপতিদিগের বিহার-বিভাগীয় সৈন্য-দলের প্রধান সেনানিবাসে পরিণত হয়। মুঙ্গের,—শেরসাহ এবং হুমায়ুনের সহিত ভয়ানক একটী যুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়াছিল; ১৫৮০ সালে যখন বঙ্গীয় সামন্ত-বিপ্লব হয়, ঐ সময়ে কিছুকালের জন্য মুঙ্গের, সম্রাট্‌ আকবরের সেনানায়ক-দিগের অবলম্বন স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিল। রাজা তোদরমল্ল বহুদিবস এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ঐ বিদ্রোহ দমন করেন। এই সময়ে উক্ত রাজা পুনর্ব্বার মুঙ্গের-দুর্গ সংস্কার করেন।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন শাহ জেহাঁনের চতুর্থ পুত্র সুল্‌তান সুজা, পিতার আশঙ্কা-পূর্ণ পীড়ার বার্ত্তা শ্রবণ করেন, তখন তিনি সাম্রাজিক সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য মুঙ্গেরকে তাঁহার সমস্ত উদ্যোগের কেন্দ্রস্থল করিয়াছিলেন।

আই-ইন্‌-ই-আকবরীতে তোদরমল্লের রাজস্ব-তালিকায় মুঙ্গের-সরকারের উল্লেখ আছে। ইহা একত্রিশটী মহল বা পরগণায় বিভক্ত ছিল। সাম্রাজিক কোষে ১০,৯৬,২৫,৯৮১দাম (চল্লিশদামে এক আকবরী রৌপ্য-মুদ্রা বুঝায়) এবং সাম্রাজিক সৈন্য-দলে ২,১৫০ অশ্বারোহীও ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য এই প্রদেশ হইতে সরবরাহ করিতে হইত। যে সময়ে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা পুনর্ব্বিজয় করেন, সেই সময়ে তিনি কিয়ৎকাল মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মুঙ্গেরে শাহ দৌলৎ নামে জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান বাস করিতেন। রাজা মানসিংহ ঐ ব্যক্তিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। রাজাকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রবল বাসনা, শাহ দৌলতের হৃদয়ে বিরাজ করিত, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ দুরাশা ফলে পরিণত হয় নাই। জাহাঙ্গীর বাদসাহের শাসন-কালে কাশিম খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তে মুঙ্গের-সরকারের শাসন-ভার ন্যস্ত হয়। আওরঙ্গজেবের শাসন-কালের ঐতিহাসিকগণ, কবি মল্লা মহম্মদ সাই-ই-দের মৃত্যু ও সমাধি ব্যতীত মুঙ্গের-সংক্রান্ত অন্য কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। এই

মুসলমান কবি তাৎকালিক মুসলমান-সাহিত্য-সংসারে "আস্‌রফ"নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আওরঙ্গ জেব-তনয়া জেব-উন্‌-নিসার শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট্‌-দুহিতা স্বয়ংও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। বাঙ্গালা হইতে মক্কা তীর্থে "হজ" করিতে যাইবার সময়, মুঙ্গেরেই আস্‌রফের মৃত্যু হয়। অদ্যাপি এই স্থানে তাঁহার সমাধি-দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে আরও কয়েক জন মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত হন ; কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনকাল, বিশেষ ঘটনা-পরিশূন্য।

মুঙ্গেরের শেষ মুসলমান-নৃপতি নবাব কাশিম আলি খাঁ, সাধারণত মীর কাশিম বলিয়া পরিচিত। নবাব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কেবল নামে মাত্র নবাব,—তাঁহার হাতে কোনই ক্ষমতা নাই ; ইংরেজ-বণিক্‌গণ বাঙ্গালার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা—সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল, হৃদয় উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল, প্রাণের মধ্যে কি-যেন একটা মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ইংরেজ-বণিক্‌দিগের সুদৃঢ় দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া কিরূপে স্বাধীন হইবেন, এই ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল,—উষ্ণ শোণিত, শিরায় শিরায় প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নবাব মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। মুঙ্গের, তাৎকালিক বাসোপযোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এই স্থানে গ্রেগরী নামে জনৈক ইস্পাহান্‌-নিবাসী আর্ম্মানীকে সেনাপতি ও প্রধান-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি গর্গিন্‌ খাঁ নামে খ্যাত ছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। গর্গিন্‌ অসীম-বুদ্ধি ও কৌশল-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। দুই বৎসর কাল অতীত হইবার পূর্ব্বেই তিনি পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্যদল সংগঠিত করিলেন। ঐ সেনা সকল ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত ও অনুশাসিত হইয়াছিল। ফলে উহারা ইংরেজগণের সেনাদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। গর্গিন খাঁ,—কামান এবং বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য মুঙ্গেরে একটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অদ্যাপি উক্ত স্থানে ঐ সকল আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ ও উহার ব্যবসায় পরিচালিত হইয়া থাকে। গর্গিন একটী উৎকৃষ্ট গোলন্দাজও সংগঠিত করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, যাহাতে একজন ক্ষমতাশালী নৃপতি বলা যাইতে পারে, মীর কাশিমের তাহার কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। ইংরেজদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত থাকিয়া মীর কাশিম, স্বাধীনতা-লাভের এই উপায় ও কৌশল,—উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে পরিচালনা করিতে থাকেন।

উপরোক্ত ঘটনাটী ১৭৬০ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালার মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে মীর কাশিম একটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। কিন্তু কএকটী নিষ্ঠুর ও হৃদয়-বিহীন পাশব-কার্য্যে তাঁহার সমস্ত গুণরাশি বিনষ্ট হইয়াছিল। সে কথা এখনও স্মরণ হইলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, রাজা রাজবল্লভ, মুরশিদাবাদের শেঠেরা এবং আর কয়েক জন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ইংরেজদিগের নিতান্ত অনুগত ; এবং ভাবিলেন যে, তাঁহাদেরই ষড়যন্ত্রে ক্রমান্বয়ে নতন নবাব পদচ্যুত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ; অতএব ঐ কয়েকটী ব্যক্তিকে অগ্রে বধ করিয়া নিষ্কণ্টক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি এই স্থির করিয়া যে কয়েক জন বাঙ্গালা ও বিহারের শীর্ষস্থানীয় ধনী ও মানী ব্যক্তিছিলেন, তাঁহাদিগকে আনিয়া মুঙ্গের-দুর্গে বন্দী করিলেন। তদনন্তর তাঁহাদিগের মধ্যে পাটনার ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা (গবর্ণর) রাজা রামনারায়ণের গলদেশে বালুকাপূর্ণ থলি বাঁধিয়া গঙ্গার অতল জলে নিক্ষেপ করিলেন বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর রাজা রাজবল্লভকে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার কিরূপে মরিতে বাসনা হয়। প্রত্যুত্তরে রাজা কহিলেন যে, তাঁহাকে যেন পতিত-পাবনীর পূত-সলিলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ বধ করা হয়। তখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নবাব তাঁহার বক্ষে শিলা বাঁধিয়া জাহ্নবীর গভীর জলে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। নিক্ষেপ-কালে তিনি যে, "হা রাম!" শব্দে চীৎকার করিয়াছিলেন, সেই শব্দটী আজিও যেন ভাগীরথীর কূলে কূলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! বাঙ্গালার ধনকুবের জগদ্বিখ্যাত "জগৎশেঠ" ভ্রাতাদ্বয়কে একটী সমুচ্চ মুরচার উপর হইতে জাহ্নবীর অগাধ জলে নিক্ষেপ করা হয়। সেই দুঃখ-বার্ত্তা জগৎসমক্ষে যেন প্রচার করিবার জন্যই আজিও সেই মুরচাটী ভগ্নাবস্থায় গঙ্গার উপকূলে দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে! এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডটী যে সময়ে সংসাধিত হয়, সেই সময়ে যে সকল মাঝি নৌকা লইয়া এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল, তাহারা ঐ ঘটনার বহুদিন পর পর্য্যন্ত অঙ্গুলি দ্বারা ঐ স্থলটী নির্দ্দেশ করিয়া এই শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের দুঃখপূর্ণ কাহিনী লোকদিগের নিকট বিবৃত করিত। ইহা ব্যতীত রায়রায়ান, রাজা উমেদ সিং, রাজা বুনিয়াদি সিং, রাজা ফতে সিং এবং অন্যান্য ব্যক্তিকেও হত্যা করিয়া মীর কাশিম আপনাকে কলুষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই ঘটনার কিছুদিন পরে নবাবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার জনৈক ফরাসী সেনানায়ক সমরুকর্ত্তৃক এলিস্ ও লসিংটন নামক কাউন্সিলের ইংরেজ সদস্যদ্বয়কে নিহত করা হয়।

মুঙ্গের-সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মুঙ্গেরে দেশী কামান, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তত হইবার এবং উহার কারখানার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উহা ব্যতীত এই স্থানে হস্তিদন্ত-কারুকার্য্য-সমন্বিত সুন্দর সুন্দর আব্‌লুস কাষ্ঠের বাক্স, তালের ছড়ি, কাঠের কলমদানি, খেলানা, কৌটা, আলমারি এবং বেণামুলের পাখা, ফুলের সাজি প্রভৃতি তৈয়ার হইয়া থাকে।*

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।

হুয়েন সাঙ্গ। †

চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গের নিকট ভারত-ইতিবৃত্তের কয়েকটী সংবাদ পাওয়া যায়। হুয়েন সাঙ্গ, পণ্ডিত হইলেও বিচক্ষণ নহেন। তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন, (খৃষ্টীয় ৬৩০—৬৪৫) তখন এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা হীন হইলেও নিষ্প্রভ নহে। হুয়েন সাঙ্গ স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন,—অলৌকিক কাণ্ড বাদ দিলে, তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কিন্তু মহায়ন-ধর্ম্মের উপাসকের অলৌকিকতায় বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। হুয়েন সাঙ্গ যাহা শুনিয়া লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে সাবধানে বিশ্বাস করিতে হয়। অন্য সংবাদ-দাতার অভাবে তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে কিছুদূর চলিতে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের যোগকাণ্ড শিখিবার আশায় পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। যোগকাণ্ড হীনায়ন-ধর্ম্মে নাই—মহায়ন-শাখায় দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাও বোধ হয়, খুব প্রাচীন নহে। সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশে তাহার সংবাদ শুনিয়া শিখিবার আশায় হুয়েন সাঙ্গ এদেশে আগমন করেন। আমার অনুমান হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের পতিত অবস্থায় বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগের নিকট যোগকাণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ভাবে এ কথা বলা যাইতে পারে,—খৃষ্ট-জন্মের পরে মহায়ন-শাখায় যোগাচার্য্য-বৌদ্ধ-

---

* এ প্রবন্ধে "সীতাকুণ্ড রামকুণ্ড" প্রভৃতি জলাশয়ের এবং আরও দুই একটী কথা লিখিবার ছিল।

জ—স।

† এ প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ অনেকগুলি কথা আছে। যথা;—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত * * * বৈদিক যাগযজ্ঞে হিন্দুসমাজ কল্লোলিত হইয়াছিল আরণ্যক বা উপনিষদে অভিজ্ঞ জ্ঞান-যোগিগণ, অন্তরে এ সকল কার্য্যে বিশ্বাস না করিলেও বাহিরে সে কথা কাহাকে ফুটিয়া বলিতেন না।"

আর একস্থানে লিখিত আছে,—"(বুদ্ধ) শিক্ষিত অশিক্ষিত কিছুই বিচার না করিয়া, সকলের নিকট সমান ভাবে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা আরণ্যক বা উপনিষদের অংশবিশেষে বিশেষ সতর্কতার সহিত গোপনে এত দিন সংরক্ষিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম-সম্পন্ন সমাজে তিনি প্রচার করেন,—বৌদ্ধ-সঙ্গমে জাতিভেদ নাই; মোক্ষ-লাভে চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন নহে। দেব-দেবীর প্রসাদ অকিঞ্চিৎকর; বেদ মোক্ষলাভের সহায় নহে।" ইত্যাদি।

অপর স্থানে লিখিত আছে,—"বৌদ্ধ ধর্ম্মের * * সমন্বয়-চেষ্টা—ভগবদ্গীতায় ও অন্তে তান্ত্রিক-ধর্ম্মের উৎপত্তি।" ইত্যাদি।

এ কথাগুলি শুধু ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে; নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। উপনিষদ এবং গীতোক্ত ধর্ম্মে সামাঞ্জস্য আছে। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে উপনিষদ বা গীতার কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ম্ম-পরিত্যাগের নিন্দা, শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগের নিন্দা এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রভৃতির উপদেশ যেসব শাস্ত্রে পদে পদে রহিয়াছে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে তৎসমস্তের সম্বন্ধ থাকিবে কিরূপে? জ—স।

ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। যে সময়ে মৈত্রেয় অবলোকিতেশ্বর, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি অবতার ও মনীষিগণের উদয়, সেই সময়ে যোগাচার্য্য ধর্ম্মের উদয়। যে সময়ে বীরপূজা বৌদ্ধসঙ্ঘমে প্রবাহিত হয়, সেই পতিত-দশায় বুদ্ধের বিমল ধর্ম্ম যোগাচারে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু-যোগশাস্ত্র শাক্যসিংহেরও পূর্ব্বতন।

সকলেই হুয়েন সাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কোন কোন অংশও অনুবাদিত হইয়াছে; কিন্তু ধারাবাহিক বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিল সাহেবের গ্রন্থ হইতে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে সে বৃত্তান্ত আমরা প্রকাশিত করিব। সেই গ্রন্থ হইতে যে যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহাই সংগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য। এজন্য ভারতবর্ষের বাহিরে পরিব্রাজক যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা আমাদের প্রয়োজন নাই।

হুয়েন সাঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারত-ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। হুয়েন সাঙ্গ, যে দেশে যাহা দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্বাপর বৃত্তান্তের সহিত সে কথা সংযোগ করিতে পারিলে, ভারত-ইতিহাসের একটী লুপ্ত অধ্যায়ের উদ্ধার করিতে পারা যায়। ব্যাপারটী শ্রমসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। কিন্তু একটু সাবধানতার আবশ্যক আছে। হুয়েন সাঙ্গের সকল কথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। বস্তুতঃ কয়েকটী বিষয়ে তাঁহার মিথ্যা-সংবাদ ধরা পড়িয়াছে।

হুয়েন সাঙ্গ অনেক দূর হইতে আসিয়াছিলেন। পথে তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বস্তুত তীর্থচারী ভিন্ন সেরূপ কষ্ট সহ্য করা অন্য পরিব্রাজকের সাধ্যায়ত্ত নহে। হুয়েন সাঙ্গের সহিত তুলনা করিলে ষ্টনলী ও লিভিং ষ্টোন, বেকার ও মাঙ্গাপার্ক, সোমা ও ভুকারকে ভ্রমণকারী পাদরীতে গণ্য না করিলেও চলে। কিন্তু কষ্টের আধিক্য-অনুসারে হুয়েন সাঙ্গের কল্পনাশক্তি, প্রখরতা লাভ করিয়াছিল। সে কল্পনার চক্ষে তিনি যে সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, শুনিলে কখন কখন হাস্য সংবরণ করা যায় না। এ দুর্ব্বলতায় তিনি একাকী নহেন—তাঁহার সহচর শ্রেণীতে হের ভোটস ও মার্ক পোলোকে সমাবিষ্ট করা যাইতে পারে।

হুয়েন সাঙ্গ, উত্তর-দেশীয় বা মহায়ন-শাখার বৌদ্ধ। সাধারণত বলা যাইতে পারে,—উত্তরাপথে মহায়ন ও দক্ষিণাপথে হীনায়ন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। নাগার্জ্জুন, দক্ষিণাপথেও মহায়ন-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করেন। যাহা হউক উভয়বিধ ধর্ম্ম-শাখারই জন্ম উত্তরাপথে মগধ-দেশে হয়। বুদ্ধের জীবন-কালেই বৌদ্ধ-সমিতিতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর অনতিবিলম্বে তাঁহার শত্রু মগধরাজ অজাত-শত্রু, সেই বিবাদানল প্রজ্বলিত করিতে সহকারিতা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, দ্বিতীয় বা বৈশালী-সমিতিতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম, দুই প্রকাশ্য শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। প্রিয়দর্শী অশোক রাজা, হীনায়ন-শাখাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মহায়ন-শাখার শ্রীবৃদ্ধি রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। কাশ্মীররাজ কনিষ্ক, মহায়ন-শাখার পৃষ্ঠ পোষণ করেন।

'মহায়ন' বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, তান্ত্রিক-ধর্ম্মের অনুরূপ। বুদ্ধ, মোক্ষ-লাভে ঈশ্বর-বিশ্বাস আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহারই প্রচারিত-ধর্ম্মাবলম্বী মহায়নীয়েরা,—আদি-বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব অমিতাভ—প্রভৃতি প্রত্যেক বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বৌদ্ধদেবতার পূজা করিতেন। তাঁহারাই কঠোর যোগাচার উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন; তাঁহারাই শেষে হিন্দু-সমাজে মিশিয়া গিয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া, ভ্রান্ত লোককে বিশ্বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম এখনও তিব্বতদেশে প্রচারিত রহিয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা হীনায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করেন নাই। মহায়ন-বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও যোগ-পদ্ধতির সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ের অভিন্নতা দেখিয়া, তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে। অবিশ্বাস যেমন হীনায়ন-বৌদ্ধের লক্ষণ, অতি-বিশ্বাস তেমনি মহায়ন-বৌদ্ধের লক্ষণ। হুয়েন সাঙ্গ, মহায়ন-বৌদ্ধ এবং বোধ হয়, তাঁহার জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মহায়ন-বৌদ্ধেরা পতঞ্জলির যোগ-সূত্রের অনুকরণে নূতন কিন্তু অনতিভিন্ন যোগ সূত্র রচনা করেন। চীনদেশে থাকিয়া হুয়েন সাঙ্গ সে সংবাদ অবগত হন। যোগধর্ম্ম শিক্ষা করা তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল।

মোক্ষ-মার্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের অনাবশ্যকতা বুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতীয় আচার্য্য-মণ্ডলে অজ্ঞাত ছিল না। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ জ্ঞান-যোগীর অনাবশ্যক—এ কথা ভগবদ্গীতার পূর্ব্বেও,শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও আর্য্য মনীষি-মণ্ডলে প্রচারিত ছিল। দণ্ডস্বামী যোগাচারী সন্ন্যাসি-মণ্ডলে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের জাতিভেদ কোনও দিন আদরণীয় হয় নাই। বুদ্ধদেব,—শ্রমণ ও গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রথমে বিভিন্ন করেন নাই,—তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদ্ ও আরণ্যকে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ গৃহস্থের ও জ্ঞানযোগ বানপ্রস্থের জন্য বিহিত হইয়াছিল; সুতরাং কি ধর্ম্ম-মতে, কি আচার ব্যবহারে, সাধারণ লোকে বুদ্ধকে হিন্দু হইতে বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। যখন কাশ্যপাদি ব্রাহ্মণগণ, বুদ্ধের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও লোকে সেরূপ ঘটনা একটা নূতন ব্যাপার বলিয়া মনে করে নাই। বুদ্ধের পূর্ব্বেও এরূপ ঘটনা অনেকবার হইয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম নহে। বুদ্ধ, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ—সকলেই তাঁহার শান্তিময় জীবনে, অবিরল বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমাদর করিত,—তাঁহাকে স্বামী, ভিক্ষু বা শ্রমণ বলিয়া সম্মান করিত,—তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যবর্গের পরিচর্য্যা করিত।

কিন্তু দার্শনিক-মণ্ডলে বুদ্ধের চিরদিনই অগৌরব ছিল এবং যখন যুবকগণ দলে দলে সংসার অন্ধকার করিয়া বুদ্ধের সঙ্গমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তখন হিন্দু-সমাজে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিষমতা অনুভূত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব, যে সময়ে ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করেন, সে সময়ে সমাজে বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈদিক যাগ-যজ্ঞে হিন্দুসমাজ কল্লোলিত, হোম-ধূমে সুরভিত এবং পশু-রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। আরণ্যক বা উপনিষদে অভিজ্ঞ জ্ঞানযোগিগণ অন্তরে এ সকল কার্য্যে বিশ্বাস না করিলেও বাহিরে সে কথা কাহাকে ফুটিয়া বলিতেন না। শ্রেণী-ভেদে প্রচার তাঁহাদের মূলমন্ত্র ছিল। গৃহস্থ-জীবন সমাপন করিয়া যাহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিত, তাহাদের নিকটই সে সকল গুহ্য কথা তাঁহারা উদ্ঘাটন করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে গুহ্য কথা প্রচারে কখন তাঁহারা প্রশ্রয় দেন নাই।

বুদ্ধদেব বর্ণ ও আশ্রম বিচার করেন নাই। তিনিই সর্ব্ব-প্রথমে জগতে ধর্ম্ম-প্রচারক নিযুক্ত করিয়া, নবধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে দেশ-বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং অশীতিবর্ষ—জীবনের অর্দ্ধাংশ ধর্ম্ম-প্রচারে অতিবাহিত করেন। আচণ্ডাল সকলের নিকট,—বাল-বৃদ্ধ-যুবা, ধনী-নির্দ্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কিছুই বিচার না করিয়া সকলের নিকট সমান ভাবে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছেন—যাহা আরণ্যক ও উপনিষদের অংশ-বিশেষে বিশেষ সতর্কতার সহিত গোপনে এত দিন সংরক্ষিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম-সম্পন্ন সমাজে তিনি প্রচার করেন,—"বৌদ্ধ-সঙ্গমে জাতিভেদ নাই,—মোক্ষ-লাভে চণ্ডাল, ব্রাহ্মণের হীন নহে। যাগ যজ্ঞে মোক্ষলাভ হয় না,—দেবদেবীর প্রসাদ অকিঞ্চিৎকর,—যজ্ঞার্থেও পশুবধে পাতক আছে; বেদ মোক্ষলাভের সহায় নহে। গার্হস্থ্য-জীবন ভিক্ষুর জীবন অপেক্ষা অপকৃষ্ট। সংযম করিতে পারিলে, মোক্ষলাভে সকলের সমান অধিকার।"

আরণ্যক বা উপনিষদে রাজযোগের মহিমা কীর্ত্তন হইয়া থাকিলেও সাধারণতঃ সন্ন্যাসিগণ তখন কৃচ্ছ্রসাধন মোক্ষ-লাভের এক মাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কৃচ্ছ্রসাধনের অন্তরায় অপনোদিত করিয়া জন-সাধারণের সমক্ষে বুদ্ধদেব মোক্ষমার্গ উন্মুক্ত করিয়াছেন। সাধারণ লোকে বুঝিত না যে, দেহ-শাসন অপেক্ষা মনঃশাসন কষ্টসাধ্য—দলে দলে লোক আসিয়া বৌদ্ধ-সঙ্গম পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। নগরে গ্রামে হাহাকার উঠিল। ও-দিকে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, কি মোহন-মন্ত্রে বুদ্ধদেব তাহাদিগকে স্বামী-বন্ধু-ভ্রাতৃহারা করিলেন দেখিবার জন্য অধিকতর আগ্রহে তাহারা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ প্রচারকদিগের ধর্ম্মালাপ শ্রবণ ও সংগ্রহ করিতে লাগিল। বুঝিবার জন্য ভাষার অন্তরায়ও ছিল না। শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহ, কৌশাম্বী হইতে বৈশালী,—তখন সমগ্র কীকট-দেশে একই ভাষায় সাধারণ লোকে কথা কহিত। স্থানান্তরে আমি তাহাকে প্রাকৃতের জননী গাথা—গাথা-ভাষা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি। সেই সাধারণ-প্রচলিত গাথা-ভাষায় বক্তৃতা—বেদ বা উপ-

নিষদের দুরধিগম্য সংস্কৃত নহে, সুতরাং মর্ম্মার্থ গ্রহণে কাহারও বিঘ্ন ঘটিল না। অবিলম্বে বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল।

বৌদ্ধের সংখ্যা এক সময়ে অধিক হইয়া থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্ম কখন হিন্দুধর্ম্মকে দেশ-বহির্ভূত করিতে পারে নাই। দার্শনিক পণ্ডিতেরা, বৌদ্ধধর্ম্মের সত্যে বিশ্বাস করিলেও অশ্রেণী-ভেদে প্রচার—সমাজ-মধ্যে আগ্নেয়-গিরির অনর্গল উচ্ছ্বাসে কখন প্রশ্রয় দেন নাই এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ-বর্ণের লোকেরা তখন জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে বা গৃহস্থ-জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ভিখারী হইতে স্বীকৃত হয় নাই। অজাতশত্রু কিছুদিন বৌদ্ধদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন সত্য, সে কেবল পিতৃহত্যা করিয়া হিন্দুসমাজে ঘৃণিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনিই বুদ্ধের শত্রু বুদ্ধ-বন্ধু দেবদত্তের পৃষ্ঠপোষক এবং বুদ্ধের মৃত্যুর অনতি-বিলম্বে কপিলবস্তু অধিকার করিয়া, বুদ্ধের জন্মভূমি ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়াছিলেন। অশোকবর্দ্ধন—নীচকুল-সম্ভূত; যে ধর্ম্মে অনেকের গণ্য হওয়া যায়, নীচবংশীয়ের সে ধর্ম্মের প্রতি স্বভাবত অনুরাগ জন্মে। অশোক, রাজা হইয়াও সাত বৎসর হিন্দু ছিলেন—যাগ-যজ্ঞ হিন্দুমতে করিতেন; তাহার পর বৌদ্ধ হইয়াছিলেন—গৃহস্থ বৌদ্ধ; কিন্তু শেষ-জীবনে বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগের হ্রাস হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার শেষ-শাসনে দেখা যায়, তিনি বলিতেছেন,—"জীবন পবিত্র হইলে সকল ধর্ম্মেই মোক্ষলাভ ঘটে।" কাশ্মীর-রাজ কনিষ্ক আর একজন বৌদ্ধ রাজা; তিনি ঘৃণিত শক-বংশীয়। কে বলিতে পারে, হিন্দুদিগের মনোরঞ্জনার্থ আকবর যেমন আদিত্যপূজা-প্রধান নবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন—মোগলবংশ ভারতে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য,—কনিষ্ক সেইরূপ করেন নাই? তাঁহার মহায়ন-বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের প্রভেদ, অতি সামান্য ছিল। সাধারণ-বৌদ্ধদিগের মধ্যে শক, লিচ্ছবী প্রভৃতি অনার্য্য বংশীয়ের সংখ্যা অধিক দেখা যায়।

ছায়ার মত যে সকল মত, দার্শনিকের মস্তকে উঠিয়া মস্তকেই লীন হইত, বুদ্ধদেব তাহাদিগকে আকার ও গঠন দিয়া এবং শৈত্য বিধান করিয়া, দারুণ কালিম-মেঘে পরিণত করেন এবং বজ্রনাদে হিন্দুসমাজ আতঙ্কিত ও প্লাবনে ভাসাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারক ও প্রচারিকাগণ, দেশে দেশে ও গৃহে গৃহে সে প্লাবন প্রসারিত করেন এবং সাধনের প্রক্রিয়া বিধান না করাতে কাহারও সে প্লাবনে ভাসিতে অসুবিধা ঘটে নাই। যাগ-যজ্ঞ দেব-জাতি-ক্রিয়া-হীন প্রতিদ্বন্দ্বী নবধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেও পবিত্র-জীবন-হেতু বুদ্ধদেব স্বয়ং সকল সমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন—হিন্দু ও জৈন, কেহ তাঁহার অসম্মান করে নাই। কিন্তু নবধর্ম্ম—না, পণ্ডিতের অনুমোদিত হইয়াছিল; না, সমাজে আভিজাত্য লাভ করিয়াছিল! মহায়ন-বৌদ্ধেরা সে ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য অপনোদন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিবাদ—মীমাংসায়, সমন্বয়-চেষ্টা—ভগবদ্গীতায়ও অন্তে তান্ত্রিক-ধর্ম্মের উৎপত্তি। কনিষ্কের সমকালবর্ত্তী দাক্ষিণাপথবাসী নাগার্জ্জুন, মহায়ন-শাখার অন্তর্গত মাধ্যমিক প্রশাখা স্থাপন করেন। যে যোগাচার্য্য-ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হুয়েন সাঙ্গ ভারতবর্ষে আসেন, তাহা মাধ্যমিক-প্রশাখায় পরে উদ্ভূত হয়। তাহার পর তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্ম্ম। কনিষ্ক-সমিতির আচার্য্য বসুমিত্র, বৈভাষিক মতাবলম্বী ছিলেন। এই সময়ে সৌত্রান্তিকদিগেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুইটী প্রশাখা কনিষ্কের পূর্ব্বতন না হইলেও তাঁহার সমকালিক অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিতে হইবে। কনোজ-রাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যকে হুয়েন সাঙ্গ বৌদ্ধ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম শেষাবস্থায় কেমন একভাব ধারণ করিয়াছিল, এই রাজার জীবনে তাহা দেখা যায়। হর্ষচরিত কাব্য হইলেও ঐতিহাসিক কাব্য। তাম্রশাসনে প্রমাণ করিয়াছে,—হর্ষচরিতে উল্লিখিত ঐতিহাসিক-ঘটনা সকল সত্য।

হর্ষের পিতা জাতিতে ক্ষত্রিয় ও ধর্ম্মে হিন্দু—সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা রাজ্য-বর্দ্ধন "পরম সৌগত" বা বুদ্ধ ছিলেন। হর্ষ নিজে শৈব ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় নন্দীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে এবং শাসনে তাঁহাকে "পরম মাহেশ্বর" বা শৈব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে "পিতৃপদানুধ্যাত" বা পরম পিতৃভক্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্ত হর্ষ, সে দৃষ্টান্ত-সত্বেও

আপনাকে "ভ্রাতৃ-পদানুধ্যাত" বা ভ্রাতৃভক্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সে সামান্ত ভ্রাতৃ-ভক্তির কর্ম্ম নহে! অথচ সে ভ্রাতা "পরম সৌগত" অর্থাৎ ভাই বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া ভাইয়ের উপর তাঁহার একটুও অভক্তি জন্মে নাই। হুয়েন-সাঙ্গ-প্রচারিত বিখ্যাত "সন্তোষ-ক্ষেত্রে" হর্ষ-বর্দ্ধন,—সূর্য্যের, বুদ্ধের ও মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া হিন্দু-বৌদ্ধ লক্ষ লোকের সমক্ষে তিন জনকেই পূজা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বড় শিক্ষাপ্রদ এবং এমন রাজাকে বৌদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া, হুয়েন সাঙ্গ অতিবিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ রাজ্যবর্দ্ধন যে বৌদ্ধ ছিলেন, হুয়েন সাঙ্গ তাহা উল্লেখ করেন নাই। তিনি অনেক দিন হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানীতে বাস করিয়া-ছিলেন ও রাজার প্রিয় সহচর ছিলেন; সুতরাং সে কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল ইহা সম্ভব নহে। বোধ হয়, রাজ্যবর্দ্ধন হীনায়ন ছিলেন বলিয়া হুয়েনসাঙ্গ সে কথার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার নিকট হীনায়ন-বৌদ্ধ, হিন্দুর অপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এবং হর্ষচরিতে বাণ যে, এ কথার উল্লেখ করেন নাই, তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে;—রাজা মহারাজার ধর্ম্ম লইয়া রাজকবি একটা মনান্তর ঘটাইতে প্রস্তুত ছিলেন না।

অশোকের পুত্র মহীন্দ্র, সিংহলে হীনায়ন-বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। শাক্যসিংহের মতামত অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক ভাবে সিংহলীয় পালিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। স্থানান্তরে হীনায়ন-বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

জাপানে—সঙ্গীত-বালিকা।

জাপানে ইউরোপীয় উন্নতি খর-বেগে বহিয়াছে। জাপানে পাশ্চাত্য প্রণালীর পুরু-ষকার,—পাশ্চাত্য পার্লামেণ্ট;—পরিচ্ছদাদি পাশ্চাত্য 'প্যাটার্নের'। কিন্তু জাপান পদ্যময় স্থান। পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-বিসংবাদে সেদিন জাপানে প্রলয় হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইতেছে,—পাছে তথাকার সেই পার্লা-মেণ্টী প্রলয়ের পরুষ পদ্যের স্মৃতি-নিবন্ধন, জাপান সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব, তাহার পদ্যা-নুভব-কল্পে পাঠকের বিঘ্ন জন্মে। আমি আশা করি,—আমি অনুনয় করি, পাঠক তাঁহার প্রাণের সমস্ত পদ্যটুকু একত্র করিয়া এবং কঠিন সংসারের কঠোর গদ্য এক মুহূর্ত্তের জন্য অাণ্ডামানে প্রেরণ করিয়া, এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। কিন্তু কৌতুক নয়;—পাশ্চাত্য পুরুষ-কারের আধুনিক ও অনুকৃত প্রখরতা সত্ত্বেও জাপানের পদ্যময়তা বস্তুতই প্রসিদ্ধ।

এক কথায়,—জাপান জ্যোতির্ম্ময় ভূমি,—সর্ব্ব পৃথিবীর প্রমোদ-উদ্যান। তথায় মিষ্ট জ্যোৎস্না, মধুর মলয়ানিল; তথায় বসন্ত উপাদেয় এবং অতীব-উপভোগ্য। জাপান, কাব্যের কানন—কবিপ্রিয়-স্থান,—কল্পনার লীলাভূমি; কোমলতা, কমনীয়তা এবং কান্তি তথাকার নৈস-র্গিক নিজস্ব সামগ্রী। জাপানে আকাশ কোমল,—বাতাস এবং বর্ণ কোমল; সমগ্র প্রকৃতি তথায় কোমলতার একখানি আবেশ এবং উল্লাসময়ী প্রতিমা। "আসিয়ার আলোক" (*Light of Asia*) প্রণেতা ইংরেজ-কবি স্যর এডুইন আরনাণ্ড, জাপানের সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যে এতাদৃশ বিমোহিত যে, তাঁহার কবি-জীবন যেন তিনি তদুদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। জাপান তাঁহার প্রিয় প্রবাস-নিকেতন। তাঁহার "বিশ্বালোক" (*Light of the world*) নামক মহাকাব্য জাপানের জ্যোৎস্নালোকেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিতা, ফুল্ল-কুসুমবৎ তথায় নিত্য নিসর্গে ফুটিয়া উঠে।

জাপানে ক্রীড়া-কৌতুক প্রচুর এবং সে ক্রীড়া-কৌতুক তথাকার প্রকৃতিবৎ প্রফুল্ল ও প্রমোদময়। সর্ব্বোপরি জাপানের রমণী—রস-বতী। এখন বলা বাহুল্য, জাপানের সঙ্গীত কত মধুর এবং তথাকার সঙ্গীত-বালিকা কেমন! বাহুল্য কথা আমি বলিতে চাই না। আরনোল্ড বলেন,—"জাপান-রমণী *Semi angel* অর্থাৎ অর্দ্ধ-অপ্সরা।

পাঠক,—বঙ্গীয়-বামাকণ্ঠ ত শুনিয়াছেনই; বেনারসের বাইজীর প্রাণ-মন-বিমোহিনী স্বর-লহরীও অবশ্য আস্বাদ করিয়া থাকিবেন। পরন্ত

বোম্বাই-অঞ্চলের সঙ্গীত-সেবিকা সীমন্তিনী "নায়কিন" ও "ভাভীন" দিগের নৃত্য-গীতও কোন্ কেহ কেহ সন্দর্শন ও শ্রবণ না করিয়া থাকিবেন! দিল্লী—সঙ্গীতের স্বর্গপুরী; দিল্লীর "ডুলহিন" গুণবতী গায়িকারাও হয় ত তাঁহাদিগের নিকট অগোচরা নহে। বর্ম্মা এখন আমাদের বৃটীশ-রাজ্য; জন্মভূমির কত শত বাঙ্গালী পাঠক ব্রহ্মবিলাসিনী কল-কণ্ঠও আজকাল উপভোগ করিতেছেন; কারণ, বাঙ্গালী ত এখন বৃটীশ-পতাকার বরযাত্র। তার পর ইউরোপ, আমেরিকার অত্যুন্নত অভিনেত্রী, সঙ্গীতাদি সুকুমার-কলায় পূর্ণমাত্রায় পারদর্শিনী, নিশীথ-নৃত্যজীবিনা নিতম্বিনীগণও এখন আর এদেশে অপরিচিতা নহেন। নেটিবগণ নিত্য নিত্য নিশাযোগে "রাজকীয় রঙ্গমঞ্চে" তাঁহাদের অতুলনীয় অভিনয় অবলোকন করিতেছেন। সৌর-জগতের প্রায় সর্ব্বত্র পূজনীয়া, সম্মান ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমতী মিসেস লঙ্গষ্ট্রী যদিও অদ্যাপি ইণ্ডিয়ায় পদার্পণ করিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করেন নাই; তথাচ তৎতুল্যা—অন্ততঃ তৎসম-পাঠিনী, সঙ্গীত ও সৌকুমার্য্য নিপুণা সুন্দরীগণ বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষে আসিয়া আপনাদিগকে অভিনয়ে আনন্দিত ও সঙ্গীতে বিমোহিত করিয়া থাকেন; কিন্তু জাপানের সঙ্গীত-বালিকা, বোধ করি, আপনারা কেহ কখনও দেখেন নাই। আমি নিজেও যে দেখিয়াছি, তাহা নয়; তবে কিনা, কথাটা শুনিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিবেন,—জাপানে আমি যাই নাই! শাগ্রীর সমুদ্র-যাত্রাটা পাকেপ্রকারে 'পাস' হইয়া গেলেই আমি শীঘ্র এবং সর্ব্বাগ্রে জলপথে জাপানে যাইব।

জাপানে, সঙ্গীত-কামিনীর সাধারণ নাম "গ্যেইসা"। কথাটা সংস্কৃত "গায়িকা" হইতে উৎপন্ন বা অপভ্রংশীকৃত হইয়াছে কিনা—আমি অবগত নই। এ তত্ত্ব—ভাষা-বিজ্ঞান-বিৎ বিশিষ্ট-ব্যক্তিবর্গ উদ্ঘাটিত করিবেন। তবে "মাসিক পত্রের প্রবন্ধে" নাকি, যে প্রকারেই হউক, কতকটা পাণ্ডিত্যের আর গবেষণার গুরুতর দরকার; তাই 'ধাত্বর্থের' প্রসঙ্গ মাত্র করিয়াও পাণ্ডিত্যাদির পিণ্ড-রক্ষা করা গেল। প্রাজ্ঞেরা বুঝিবেন, প্রয়োজন হইলে পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করিতেও "পেছপাও" নই। পাণ্ডিত্য আর পুরাতত্ত্বের গবেষণা করিতে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যান্য বিদ্যাধরদিগের ন্যায় আমারও একটুও আটকায় না। এ নোটীশটা, উক্ত দুইটা কাজ করিবার পূর্ব্বেই আমি দিয়া রাখিলাম।

কিন্তু এস এখন "গ্যেইসা"! গ্যেইসা সুন্দরী,—গ্যেইসা গুণবতী,—গ্যেইসা চটুলা,—গ্যেইসা গম্ভীরা;—স্বভাবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছাঁচের সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য ও গঠন-ভঙ্গী, কে বল, বর্ণিবে? পরন্তু প্রতিভার ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহ কতই বা তুমি গণিয়া-গণিয়া হিসাব লিখিয়া রাখিবে? কিন্তু এ বর্ণনা, এ গণনা—জাপানে খুব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে, কার্য্যানুরোধে 'কর্ম্মবন্দ' করিয়া রাখা হইয়া থাকে। তথাকার আমোদ-আলয়ে, ক্রীড়া-নিকেতনে, 'চা'এর বৈঠকে ও জন-সাধারণের পান-ভোজন-ভবনে ভিন্ন ভিন্ন গ্যেইসার ভিন্ন ভিন্ন রূপ-গুণের, প্রকৃতির এবং প্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের নামে নামে পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি যথাযথ বিবৃত করিয়া এক একটা "ফিরহিস্তী" রাখা হয়। সেই "ফিরহিস্তী" দেখিয়া গ্যেইসার নৃত্য-গীত ও ক্রীড়া-কৌতুক-উপভোগেচ্ছুগণ স্বস্ব রুচি অনুসারে—যাঁহারা যে প্রকার সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য পছন্দ করেন, তাঁহাদের নিকট সেই প্রকার—"গ্যেইসা" নৃত্য-গীতাদির জন্য আনীত হয়। এ প্রথা এবং প্রণালী একটু নূতন রকম নয় কি? কিন্তু ইহা "অশ্লীল" বলিয়া অগ্রেই যেন কেহ সিদ্ধান্ত আঁটিয়া না বসেন। ইহার মধ্যে অশ্লীলতা বা অশিষ্টাচার যে কিছুই নাই, তাহা এই প্রবন্ধ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ প্রকাশ পাইবে। তবে ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। কথাটা এই যে, যে ইংরেজগণ আমাদের দেশের "বাই-নাচকে" সন্নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারাই কিন্তু আবার জাপানের 'পানা-লয়ে' বসিয়া 'গ্যেইসার' গীতে পুলকিত হন, আর সে ব্যাপারটা—'আগা-গোড়া' সমস্তটাই—'সশ্লীল' ও সুনীতি-সঙ্গত বলিয়া মনে করেন!! মনুষ্য-স্বভাবের এ সমস্যা বস্তুতই আমি বুঝিতে পারি না। মনুষ্য-স্বভাবের আর একটা সচরাচর-দৃষ্ট সমস্যাও আমি উদ্ভেদ করিতে অসমর্থ। সে সমস্যাটা এই যে, স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধীয় কোন কথা, হয় অস্পষ্ট পদ্যে, নতুবা

গর্দ্দভ-কণ্ঠ-নিঃসৃত-শব্দবৎ বাক্য-সংযুক্ত পদ্যে কহা চাই ; নহিলে তাহা অশ্লীল। অশ্লীলতা অবশ্যই অমার্জ্জনীয় ; কিন্তু অশ্লীলতা-নির্দ্দেশক এই নিয়মটাও ঠিক নয়। এ নিয়মটা অস্মদ্দেশে অকস্মাৎ কতকটা জায়গা জুড়িয়া ফেলিয়াছে এবং উহার "আধুনিক-আলোকাভিমান" সত্ত্বেও উহা যে শাফ অন্যায়, অসঙ্গত ও অসংলগ্ন নিয়ম, তাহা কেহ স্বীকার করিতে সাহসী হইতেছেন না। কিন্তু পৃথিবীতে অন্যায় ও "একপেশে" আইনের অভাব নাই, আর সেইরূপ হওয়াই হয়ত মনুষ্য-স্বভাবে এবং স্বার্থে স্বাভাবিক; তবুও সেটা একটা সমস্যা বটে। অশ্লীলতা সম্বন্ধীয় সমস্যাটা তখন আরও উর্দ্ধে উঠে—যখন মানুষের স্বভাব তাহার কৃত্রিম সাধুতার সঙ্গে সংগোপনে পরামর্শ করে। কিন্তু এ কথা আর অধিক নয়। এ সংসারে রুশোঁর মত, মৌলিক আর স্বাভাবিক,—রুশোঁর পর বোধ করি আর কেহ জন্মে নাই।

মূল কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে আমি এক একটা মন্তব্য লিখিতে বাধ্য হইতেছি, ইহাতে হয় ত, প্রিয় পাঠক, মর্ম্মান্তিক চটিতেছেন ; কারণ, এতদ্দ্বারা তাঁহার "গ্যেইসা"-ঘটিত ধারাবাহিক রস ভঙ্গ হইতেছে। কিন্তু তজ্জন্য আমি বিশেষ রকম দায়ী হইলেও "মন্তব্য-প্রকাশ" রহিত করিতে, পারি না।

গ্যেইসাদের গুণের কথা হইতেছিল। তাহাদের গুণানুসারে এক এক জনের এক এক প্রকার নাম অথবা উপাধি। যেমন তর আমাদের টোল-চৌপাড়ীতে ছাত্রদিগের এবং ইউনিবার্সিটীতে ছাত্র ও ছাত্রীদিগের বিদ্যার প্রকৃতি ও পরিমাণানুসারে "ন্যায়পঞ্চানন" "বিদ্যারত্ন" "শিরোমণি" "তর্কচূড়ামণি" "জ্যোতিষচুঞ্চু" "ন্যায়ালঙ্কার" এবং বিদ্যাবাগীশ,—তথা "বি, এ" "এম, এ" "বি, এল" ডি, এল "এম, ডি" "এম, বি" "এল, এল, বি" "এল, এল, ডি" "সি, ই" এবং "সি, এস" প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ উপাধি দেওয়া হয় ;—পুনশ্চ সম্ভ্রম, সম্পদ, জ্ঞান বা অজ্ঞানানুশীলন, বিদ্যা বা অবিদ্যা-চর্চ্চা, চতুরতা, চাটুকারিতা বা চ্যারিটীর ওজনানুসারে রাজ-সরকার হইতে "রায় বাহাদুর" "রাজাবাহাদুর" "নবাব" ও "খাঁ বাহাদুর" "সি, আই, ই" "সি, এস, আই" "মহামহোপাধ্যায়" "সামসুলউলমা" উপাধি বিতরিত হয়, সেইরূপ জাপান-নর্ত্তকী গ্যেইসারা তাহাদের গুণানুসারে উপাধি প্রাপ্ত হয়। কেবল গুণানুসারে নয়,—রূপ, রস, প্রকৃতি, অনুরক্তি ও আসক্তি অনুসারে ইহাদের উপাধি। তবে আমাদের এখানকার বিদ্যাবন্ত ও ধনবন্তদের ন্যায় ইহাদের উপাধি গুলি উদ্ভট ও বিকট নহে,—বেমানান ও বেয়াদবি-ব্যঞ্জকও নহে। সে গুলি মিষ্ট ও "মোলায়েম" এবং উপাধি-ধারিণীর সদর ও অন্দর-প্রকৃতির উপযুক্ততার ও মাধুর্য্যের ঠিক উপযোগী। কিন্তু গুণবতী গ্যেইসাদের উপাধিকে "উপাধি" না বলিয়া "ডাক-নাম" বলাই অধিকতর উচিত। পিতৃগৃহে পিতামাতা তাহাদের যে নাম রাখে, সে নাম গুলি তাহাদের শিক্ষার পর "রাশি-নামে" পরিণত হয় এবং সংগীতাদি সুকুমার-শিক্ষা-সমাপ্তির পর তাহারা যে নাম উপর্জ্জন করে, সেই নাম গুলি হয়—তাহাদের "ডাকনাম" ; অর্থাৎ আসল নামই সেই। উদাহরণে যদি বুঝিতে চাও, তাহাও বুঝাইতে পারি। মেয়ের মা-বাপের রাখা নাম, মনে কর, ছিল,—শুরবালা। শুরবালা আশৈশব কৈশোর ও যৌবনের অঙ্কুর পর্য্যন্ত শুরবালাই থাকিলেন। কিন্তু শুরবালা যখন নবযৌবনের প্রথম স্তবকে উপস্থিতা,—যখন সৌন্দর্য্যের সুকুমার "কোষ" বা "কলি" হইতে তাঁর যৌবন-শ্রী ফুটিতে লাগিল এবং সে শ্রীর "স্বরূপ" বুঝা গেল,—শুরবালা গুরু ও প্রভু-গৃহে সঙ্গীতাদি কলা-শাস্ত্রে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যখন "প্রতিযোগী পরীক্ষায়" পাস হইয়াছেন এবং সংসার ও সমাজ-প্রবেশের "প্রিপেরেটারী ক্লাসে" পাঠ লইতেছেন,—সংক্ষেপত যখন শুরবালার শরীর-গঠনের, হৃদ্বৃত্তির এবং স্বাভাবিক শক্তি ও শিল্প-নৈপুণ্যের প্রাথমিক পরিচয় দ্বারা তাহাদের ভাবী অভিব্যক্তি, অনুমিত হইয়াছে ; তখন সম্ভবত নাম হইল,—"মিসপাইন্যাপল" অর্থাৎ কুমারী আনারস-আলী। এ নাম অনর্থক নহে ; কারণ, শুরবালার রূপ এবং রস—উভয়েই আনারসের মত মিষ্টাম্ল—অম্ল-মধুর। দোহারা—পুরন্ত গড়ন, টক্টকে রঙ—টুক্‌টুকে ওষ্ঠ,—টসটসে চিবুক—স্ফুটন্ত মুখশ্রী ;—শুরবালার রূপলাবণ্যে, শরীরে এবং সৌন্দর্য্যে,—আস্যে এবং হাস্যে,—কৌতুকে, কামনায় এবং কটাক্ষে, অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট কিছুই নাই ;—সব সপ্রকাশ

শাফ এবং ষোলআনা প্রস্ফুট। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয়ই অম্ল-মধুর; শূরবালার সঙ্গীতও মিষ্টাম্ল; নৃত্যরঙ্গও তাই,—অম্লে-মধুরে মিশ্রিত, নিয়ত রসে-ভরা। শূরবালার শিল্প তাহার স্বভাবেরই অনুগামী;—মিষ্ট-মিষ্ট, টকটক, রসে অহরহ, টস্‌টসে—আনারসের মত। অতএব তিনি উপাধি পাইলেন,—'আনারস'। অতি উপযুক্ত,—ভাব ও অর্থ-ব্যঞ্জক এবং কিঞ্চিৎ কবিতা-উদ্দীপক উপাধি নয় কি? তা এইরূপ রূপ লাবণ্য ও গুণ-গৌরবানুসারে গেইসাদের কাহারও নাম,—"আনার-কলি"; কাহারও নাম,—"দাড়িম্ব-প্রভা"; কেহ বা "শিশির-বিন্দু"; কাহারও নাম,—"বাসন্তী-কুসুম"; কেহ বা "তুষার-বালা" ইত্যাদি।

কিন্তু একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি,—"শূরবালা" যখন "আনারস-সুন্দরী" বা "দাড়িম্ব-প্রভায়" পরিণত হন নাই, তখনও কবিতা-প্রিয় জাপানী তাঁহাকে একটী আদরের নামে ডাকেন। সে আদরের নামটী,—"হান জকু" অর্থাৎ *half jewel*; কি না, আধা-মাণিক। এই আদরের "হাফ জুয়েল" বা আধা-মাণিক নামটী জাপানে সঙ্গীত-বালিকা মাত্রেরই সাধারণ নাম। সঙ্গীত-বালিকা যখন নবযুবতী, তখন তিনি *full jewel* অর্থাৎ পূর্ণ-মাণিক। জাপানী-সাহিত্য এই মাণিক ও মাণিকাংশদিগের কথায় এবং গৌরব-গাথায় পূর্ণ। সঙ্গীত-সুন্দরীরা, জাপানীদিগের পদ্যময় অস্তিত্বের একটী অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

"আধা-মাণিক" গুলি অল্প-বয়সে,—অবশ্য শৈশবে নহে, কৈশোরারম্ভে,—তাহাদের পিতৃ-গৃহ হইতে, শিক্ষার্থে সঙ্গীত-শালায় নীত হয়। নীত হয়,—সঙ্গীতালয়ের এবং কাফি ও চা-গৃহের স্বত্বাধিকারীদিগের কর্ত্তৃক—ঠিকা-ইজারা বন্দোবস্তে। ইজারা-বন্দোবস্তটা পাঁচ, সাত;—কোন কোন স্থলে দশ-বৎসর-ব্যাপীও হয়। "হাফ জুয়েল"দিগকে ইজারা বিলি করেন জুয়েলদিগের পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ; তৎসূত্রে ইজারা-সেলামী স্বরূপ তাঁহাদের কিঞ্চিৎ অর্থাগমও হয়। পঞ্চাশ, ষাট, একশত, দেড় শত, দুই তিন শত টাকা সেলামী দিয়াও সুকুমার কলা-ব্যবসায়িগণ এক একখানি "হাফ জুয়েল" ইজারা গ্রহণ করেন। ইজারার মিয়াদের কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, জুয়েলগুলি ইজারাদারের অধীন। এক একজন ইজারাদার অনেক গুলি করিয়া জুয়েল কনট্রাক্ট লয়েন। জীবন্ত জুয়েল গুলির জ্যোতি, কান্তি, স্বর ও শরীর-মাধুরী অনুসারে তাহাদের কনট্রাক্ট কালের ও মূল্যের তারতম্য ঘটে।

ব্যবসায়ী, ব্যবসার হিসাবে বহুব্যয় করিয়া জুয়েলের ইজারা-গ্রহণ এবং বহুব্যয় ও যত্ন করিয়া জুয়েলের জ্যোতি ও কান্তির উন্নতি-সাধন করেন; কারণ, জুয়েলের জ্যোতি যতই বেশী ফুটে, ব্যবসায়ীর আয় ততই বৃদ্ধি হয়। এই জুয়েল-ব্যবসায়ী জহরীগণ, জাপানী-সাধারণের সঙ্গীত-সরবরাহকার। জাপানে যাইয়া নৃত্য-গীতের এবং ক্রীড়া-কৌতুকের প্রয়োজন হইলে, এই জহরীদের নিকট জুয়েলের জন্য অর্ডার পাঠাইতে হয়। সঙ্গীত ও ক্রীড়া-কৌতুক-কালের অল্পতা ও আধিক্যানুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "নিরিখ" নির্দ্দিষ্ট আছে।

সঙ্গীত-বালিকা, সঙ্গীতের প্রথম-শিক্ষা প্রাপ্ত হয়,—পিতৃগৃহে। এগার, বার বা তের বৎসর বয়সে, পিতা কিংবা অভিভাবক, বালিকাকে সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর হস্তে অর্পণ করেন। ব্যবসায়ী, বালিকাকে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া সুরুচি-মার্জ্জিত সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করেন; বিবিধ ও বিশিষ্ট প্রকারের বস্ত্রালঙ্কার, বিলাস-দ্রব্য, পোশাক এবং পেশোয়াজ দেন,—বালিকাকে সঙ্গীতাদির উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলেন। উত্তম আহারে, আদরে এবং যত্নে জুয়েলের জ্যোতি দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ফুটিতে থাকে। বালিকা, বয়ো-জ্যেষ্ঠা সম-ব্যবসায়িনী সঙ্গিনীদিগের সহিত চাগৃহে, কাফি-আগারে, উৎসব-কার্য্যে, পান্থ-নিবাসে বা ব্যক্তি-বিশেষের আহ্বানে, মনিব বা মনিবনীর আদেশানুসারে, ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শিতে ও নাচ-মুজরা করিতে গমন করে। তাহার উপার্জ্জিত-অর্থের অধিকাংশই—প্রায় সমস্তই—তাহার মনিব বা মনিবনীর প্রাপ্য; কারণ, বালিকা এখন সম্পূর্ণরূপে তাহার মনিব বা মনিবনীর ইজারাধীনা। বালিকার এখন যে কিছু স্বাধীনতা, তাহা কেবল তাহার হৃদয়ের অর্থাৎ প্রণয়ের ব্যাপারে। এ ব্যাপারে ইজারাদারের কোনও অধিকার তাহার উপর নাই; সে স্বত্বাধিকার সম্পূর্ণ-

রূপে তাহার নিজের। কন্‌ট্রাক্টের কাল পর্য্যন্ত স্বোপার্জ্জিত অর্থ ও অন্যান্য সর্ব্ব-বিষয়ে স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকার-বিহীনা হইলেও হৃদয়, মন, প্রেম, ভালবাসা ও শরীরের সম্ভ্রম সম্বন্ধে সে কাহারও আদেশ-বাহিকা নহে। জাপানী নর্ত্তকী-সম্প্রদায়,—নাচে, গায়, ক্রীড়া-কৌতুক করে, বচন-চাতুর্য্য ও রসিকতা প্রদর্শন করে, সর্ব্বতোভাবে আমোদ ও স্ফূর্ত্তি উৎপন্ন করে; কিন্তু তাহারা সাধারণ অশিষ্টাচার ও অশ্লীলতার অতীত। তাহারা আত্ম-সম্ভ্রম-শীলা ও প্রণয়-ক্ষমা। তাহারা অর্থের বিনিময়ে শারীরিক অনুগ্রহ বিক্রয় করে না।

সঙ্গীত-বালিকা অর্থাৎ হাফজুয়েল বা পূর্ণ গেইসারা সঙ্গীতাদির জন্য তাহার প্রভুর হিসাবে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহারও কবিতাময় নাম "জুয়েল"। পাঠক অবশ্যই বলিবেন,—" এ নাম অন্যায় নহে; কারণ, জহর, জহরই আকর্ষণ করে,—মাণিকের মূল্য, মাণিক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

নর্ত্তকীরা মুজরা করিয়া তাহাদের মনিব বা মনিবনীর হিসাবে যাহা পায়, তাহার নাম "জুয়েল"; আর তাহারা নিজে যাহা উপহার বা "পেলা" পায়, তাহার নাম "পুষ্প"। "গেইসার" মত গুণবতী, কবিতাময়ী কামিনীর কুসুমই উপযুক্ত উপহার বটে! টাকা-কড়ি, মোহর, নোট—গেইসাকে তুমি যাহাই দেও, তাহা "হানু" অর্থাৎ *flower*—কিনা, ফুল বলিয়া দিতে হইবে। পাঠক! জাপানীদের পদ্যময়তার এক-আধ বিন্দু আস্বাদ লইতেছেন ত? এ অধীনের অনুপযুক্ততায় আপনাদের কবিতা ব্যথা পাইতেছে, তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু বুঝিয়াও নাচার।

সঙ্গীত-বালা যখন হাফ্ জুয়েল, তখন সরল-কথায় তিনি "ম্যায়কো", অর্থাৎ নর্ত্তকী। বয়ঃক্রম যখন ষোল-সতর, তখনই তিনি পূর্ণ "গেইসা" অর্থাৎ শিল্পী। "গেইসা" শব্দের অর্থ আমি নিজে গায়িকা করিলেও সে শব্দে, জাপানী ভাষায় সচরাচর শিল্পী অর্থাৎ *artist* বুঝায়; এ কথা আর অধিক দূর গোপন রাখিতে পারিলাম না।

বালিকা, "গেইসায়" পরিণত হওয়ার পর, কলা-কার্য্যে কাহারও আর তাঁহাকে সহায়তা করিতে হয় না। তিনি তখন স্বয়ংসিদ্ধ। সুন্দরী তখন "একেশ্বরী" সর্ব্বত্র সংগীত করিতে যান; একাই এক সহস্র হইয়া ভাবুকদিগের মনঃপ্রাণ হরণ করেন।

গেইসাদিগের মধ্যে যিনি বিশেষ বুদ্ধিমতী, গুণবতী ও গায়িকা—মিষ্ট-প্রকৃতি ও মধুরভাষিণী,—সর্ব্বোপরি যিনি শ্রেষ্ঠা সুন্দরী; অতি শীঘ্রই তিনি সমগ্র সহর মধ্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেন,—যুবক-জাপানীরা তাঁহার পদ-প্রান্তে নিয়তই পুষ্প-চন্দন-হস্তে হাজির থাকে। আহ্বানের পর আহ্বান,—"বায়না," এত আসিয়া জুটে যে, সর্ব্বত্র যাইতে সুন্দরীর সময়েরই সঙ্কুলন হইয়া উঠে না। প্রত্যেক অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরী আভা পাইতেছে; কবরী ও কুন্তল, মুক্তায় ও মুক্তামালায় খচিত এবং গ্রথিত। নিবিড় কৃষ্ণ-নয়নে ঐন্দ্রজালিক জ্যোতি সঘনে ফুটিতেছেও ছুটিতেছে; হৃদয়ের পর হৃদয়—একে একে এবং যুগপৎ কত হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছে ও শোণিত ছুটাইতেছে সে জ্যোতি; তাহা কে বলিবে! সুখে, স্বাস্থ্যে, উৎসাহে, আনন্দে এবং আশায়, সুন্দরীর মন সপ্ত স্বর্গের সিঁড়ি ছাড়াইয়া উধাও আরও উপরে উঠিতেছে! ইহা গেইসা-গৌরবের পূর্ণ অবস্থা। এই অবস্থায় হয় ত এক দিন হঠাৎ শুনিলে যে, গেইসা, সাধারণের দৃষ্টি হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত! কোথায়! কোথায়!—চারিদিকে কোলাহল পড়িয়া গেল; কোথাও কোথাও বা "হায়!" "হায়!" আর্ত্ত-নাদ পড়িল। কেহই জানে না, গেইসা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। একদিন গেল, দুই দিন গেল; তিন দিনের দিন হয় ত শুনিলে,—

"মহিকিকোমি নি নারিন মাহস্তা"।

গেইসা, সঙ্গীত ব্যবসা ত্যজিয়া বিবাহিত-জীবন গ্রহণ করত অন্তঃপুর-বাসিনী হইয়াছেন। আন্তরিক প্রেমে পড়িয়া, ভালবাসিয়া ও "ভালবাসিত" হইয়া এইরূপ বিবাহ করা গেইসা-জীবনের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু গেইসাদিগের এইরূপ বিবাহ—সচরাচর কি সুচিরস্থায়ী এবং সুখের হয়? এ কথা ক্রমে কহিতেছি।

যে যুবক, ভাবুক, কবি বা ধনাঢ্য রসিকব্যক্তি, গেইসার রূপে-গুণে বিমোহিত হইয়া, গেইসাকে ভালবাসিয়া হৃদয়-মন অর্পিয়া, তাহার পানি-প্রার্থী হন; তিনি প্রথম কল্পে কন্‌ট্রাক্টরের হস্ত হইতে গেইসার কন্‌ট্রাক্ট-বন্ধন ছেদন

করিতে বাধ্য ; নতুবা গ্যেইসা স্বীয় সংগীতব্যবসা ছাড়িয়া বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইতে সমর্থ হয় না। কারণ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'কোটকিনার' কাল উত্তীর্ণ না হওয়া অবধি গ্যেইসার স্বাধীনতা তাহার কোটকিনাদারের হস্তে। কাজেই এ বিবাহের বরকে এক-থোকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে তৎপর হইলেও, হয় ত অনেক সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হয় না,—ইজারাদার কিছুতেই গ্যেইসারূপ তাহার সুফলা মহাল ছাড়িতে সম্মত হয় না ; কারণ, তাহা হইতে তাহার অনেক অর্থাগম। ইংরেজ লেখক মিষ্টার নরম্যান—যাঁহার গ্যেইসা-বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে আমার এই প্রবন্ধের উৎপত্তি—স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, "টকিও" নগরে জনৈক যুবক এক সহস্র ডলার নগদ গণিয়া দিতে চাহিয়াও ইজারদারের হস্ত হইতে তাঁহার বাঞ্ছিত গ্যেইসার ব্যবসায়-বন্ধন মুক্ত করিতে পারেন নাই।

এখন মনে করুন, কোন ব্যক্তি বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া, গ্যেইসার অধীনতা ঘুচাইল এবং তাহাকে বিবাহ করিল। কিন্তু এরূপ বিবাহের স্থায়িত্বের এবং দৃঢ়ত্বের ভিত্তি কি ? প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই না। গ্যেইসার যদি মন চাহিল আর মন টিকিল এবং তোমার ভালবাসা যদি তাহার উপর হইতে কোন ক্রমে, কোন কালেই না টলিল, তাহা হইলে তাহার ভালবাসাই এ বিবাহের স্থায়িত্ব-পক্ষে মূল-ভিত্তি ;—সে তোমার সহিত সুখে ঘর-সংসার করিতে লাগিল। নহিলে বিবাহের কিছুদিন পরেই সে, যে গ্যেইসা, সেই গ্যেইসা,—সে তোমার ঘর ছাড়িয়া আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেক স্থলে গ্যেইসা উত্তম-গৃহিণী হয়, অনেক স্থলে হয়ও না। না হওয়ার কারণ, মোটের উপর দুইটা ধরা হইয়া থাকে। প্রথমত সঙ্গীতামোদের উত্তপ্ত মদিরা অত দিন উপভোগ করার পর, সংসার-আশ্রমের প্রশান্ত সুখ গ্যেইসাদিগের পক্ষে সম্ভবত অতি নীরস ও বৈচিত্র্য-হীন বোধ হয়,—তারা অন্তঃপুর ছাড়িয়া আবার নৃত্য-গীতের আসরে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে পুরুষ-পক্ষের চিত্ত-চাপল্য ও রমণ্যন্তরপ্রসক্তিই গ্যেইসার পতি-গৃহত্যাগের আর একটা কারণ। গ্যেইসা আর সব বরং সহিতে পারে, কিন্তু প্রণয়ের স্থলে প্রীতির অভাব তাহাদের আদৌ অসহ্য। পুরুষ-হৃদয়ের প্রেমাভাব ও পুরুষ-প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতা, এ দেশীয়াদিগের ন্যায়, গ্যেইসারাও গীত করে। সে গীত কোমল, মধুর, কবিতা-উদ্দীপক এবং করুণ। গ্যেইসা তাহার আক্ষেপ-গীতিতে সাঁমান্যার মত "পুরুষ পাষাণ-হিয়ে" বলিয়া পুরুষকে অসভ্য-আক্রমণ করে না এবং অত্যুক্তির উচ্ছ্বাসে "ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসিনে" গাইয়া আত্ম-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখায় না ; পুনশ্চ "প্রেম গেল, কেন প্রাণ গেল না" ইত্যাকার উক্তিতে প্রেমের মাহাত্ম্য ও প্রাণের অবিলম্বে যমালয়ে যাওয়ার একান্ত জরুরির আবশ্যকত্ব জানায় না। গ্যেইসা তাহার গীতে পুরুষের চপলতা চাপিয়া নিজের দুর্ব্বলতা জ্ঞাপন করে। সে তাহার "সামিসেন" বা সারঙে (?) কোমল কণ্ঠ মিলাইয়া সচরাচর যে একটী সকরুণ সঙ্গীত করে, তাহার অতি স্থূল ইংরেজী অনুবাদের স্থূলতর বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিতেছি। গ্যেইসা আপনাকে অশ্রুমতী "উইলোর" সহিত উপমিত করিয়া গায়,—

"অনিলে যেমতি দোলেলো উইলো,
এ-পাশে, ও-পাশে, দখিনে, পচিমে ;
সমুখে, পচাতে, পূরবে, উতরে ;
অনিলে যেমতি দোলেলো উইলো,—
মলয়-অনিলে কোমল উইলো ;
গ্যেইসা-হৃদয় তেমতি দোলেলো,
ঢুলিয়া ঢলিয়া তথায় পড়েলো,—
এ-পাশে, ও-পাশে, দখিনে, পচিমে,—
স্নেহের বাতাস যথায় বহেলো,
প্রণয়-প্রসূন যথায় ফুটেলো ;
ঢুলিয়া ঢলিয়া তথায় পড়েলো।"

আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত জাপানের চা-গৃহে বা কাফি-ভবনে যাইয়া গ্যেইসার গীত শুনিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। গৃহকর্ত্রী পার্শ্বস্থিত টেবিলের উপর "গ্যেইসা-লিষ্ট" দেখাইয়া দিয়া বলিল, "মহাশয়! আপনারা কি প্রকৃতির এবং কোন্ কোন্ গ্যেইসার গীত শুনিতে উৎসুক, অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ লিষ্ট-লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আদেশ করুন। আপনি ও আপনার বন্ধুরা গ্যেইসা-বিবরণীর পাতা উল্টাইয়া-উল্টাইয়া তাহাদের রূপ-গুণের "কালি-কলম-অঙ্কিত" সংক্ষিপ্ত চিত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে। আপনি কোন স্থানে পড়িলেন,—

"কুমারী তরুবালা,—দীর্ঘাকৃতি, দেখিতে
"ভাল, কোমল-কণ্ঠে উচ্চ আওয়াজ; কিন্তু
"অত্যন্ত পয়সা-প্রিয়,চতুরা আর মিথ্যাবাদিনী।"

অন্যত্র পড়িলেন,—

"মিস্ গুর্জ্জরকলি,—খাটো-খোটো খর্ব্বা-
"কৃতি চটুল-মুখ, চটকদার চোখ;—রহস্যে
"তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং তড়িৎবৎ তৎপর।"

আবার আর এক পাতায় দৃষ্টি করিলেন,—

"কুমারী তুষার-বালা,—বালিকাটী বড়ই
"সুন্দরী; মুখ খানিতে মাধুর্য্য সদাই ফুটে
"রয়েছে; চোখ দুটী অতি মোলায়েম,—
"নিবিড় কৃষ্ণ; শিষ্ট, শান্ত এবং সুশীলা;
"মুখশ্রীতে কেমন যেন একটু মধুর বিষণ্ন-
"ভাব; বালিকাটীর পূর্ব্বেতিবৃত্ত করুণ ও
"রহস্যময়।"

পুনশ্চ পত্রান্তরে দেখিলেন,—

"মিস্ শিশির-কুমারী,—একহারা-গড়ন, খুব
"রূপসী, গম্ভীরা, অত্যুৎকৃষ্টা নর্ত্তকী।"

ইহার পর গোটা পনর পাতা বাদ দিয়া, একটা পাতায় তুমি পাঠ করিলেন,—

"কুমারী অদৃষ্ট-বালা।—কৃশাঙ্গজনিত এই কৃশাঙ্গিনীকে যেন ঈষদতিরিক্ত লম্বা বলিয়া বোধ হয়। এই সুন্দরী যখন নৃত্য-কালে পরিক্রমণ করেন, তখন বারি-স্রোত বহিতেছে বা বৃক্ষপত্র দুলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার বর্ণ দুদে-আলতা-মিশ্রিত; নেত্রদ্বয় শরতের সরসীবৎ—সরসীটী যেন বিমল বনভূমে বিরাজ করিতেছে; হস্ত-পদের গঠন এমনতর যে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে কেবল একমাত্র জাপানেই জন্মিতে পারে। ইঁহার যুবতী-জন-সুলভ মনোহর আকর্ষণে শৈশব-সরলতা মিশ্রিত।"

আপনি সহরের সুপ্রসিদ্ধ আরও কত গেয়েইসার বিবরণ পাঠ করিয়া, নিজের রুচি অনুসারে পছন্দ করিয়া যে যে গেয়েইসা,—জুয়েল ও জুয়েলানুকে দেখিতে চান, নাম উল্লেখ করিয়া তাহার আদেশ দিলেন। গৃহকর্ত্রী তদনুসারে "গেয়েইসা ষ্ট্রীটে" ডাক পাঠাইল।

কাফি-গৃহের অদূরেই "গেয়েইসা ষ্ট্রীট"। গেয়েইসা ষ্ট্রীট, একটী অতি অপ্রশস্ত সুদীর্ঘ সড়ক; সড়ক এত অপ্রশস্ত যে, তাহার এক ধারে দাঁড়াইলে অপর-ধারস্থ লোকের হাতে হাত ঠেকে,—রাস্তার এক পারের অধিবাসিনীরা আর এক পারের অধিবাসিনীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে "সেকহাণ্ড" করিতে পারে। পথ অপ্রশস্ত, কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—চমৎকার "ফিট-ফাট" শৃঙ্খলা-যুক্ত। পথের দোধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একতলা বাড়ী সারবন্দী অবস্থিত,—যেন এক একখানি আলেখ্যবৎ প্রতিভাত। প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে এক একটী কাগজ-নির্ম্মিত জাপানী লণ্ঠন; লণ্ঠনের উপর সেই গৃহাধিষ্ঠাত্রী গেয়েইসার নাম ও তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটী কবিতা অঙ্কিত। গৃহাভ্যন্তরে "সামিসেনের" সুরের সহিত মিলিত হইয়া মধুর হাস্য-লহরী অনবরত উত্থিত হইতেছে।

এই সকল গৃহে গেয়েইসারা বাস করে। বৈকাল-চারিটার প্রাক্কালে দেখিবেন,—গেয়েইসাগণ পুঞ্জে পুঞ্জে সাধারণ স্নানাগারে যাইতেছে এবং তথা হইতে আসিতেছে। আহ্লাদ-প্যাটনের ওড়নায় অঙ্গ আবৃত,—শিথিল অঞ্চল অসাবধান দোলায়মান; অলক-রাশি আলুলায়িত;—যেন অপ্সরারা আকাশ হইতে নামিয়া কঠিন বসুন্ধরার বক্ষে কবিতা সিক্ত করিতেছে। গেয়েইসাদিগকে আহ্বানার্থে অবিলম্বেই চারি দিক হইতে কিঙ্কর-কিঙ্করীরা আসিতে লাগিল। সুন্দরীরা সঙ্গীতাভিসারে সাজিলেন। সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং গৌরবশালিনী গেয়েইসা, তৎপশ্চাতে তদীয়া কিঙ্করী এবং "সেমিসেন"-বাহক;—ত্রিমূর্ত্তি মিলিত এক এক সম্প্রদায়; কত কত সম্প্রদায় সহরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে চলিল।

মহাশয়! আপনি কিন্তু এখন গেয়েইসা ষ্ট্রীটে নহেন; আশা করি, ইহা আপনার "ইয়াদ" আছে যে, কাফিগৃহে আপনি গেয়েইসার আগমনের অপেক্ষা করিতেছেন। ক্রমে একে একে আপনার আদেশানুরূপ গেয়েইসা গুলি আপনার সম্মুখে উপস্থিতা; তৎক্ষণাৎ গল-লগ্ন-বাসে ভূমিনত-মস্তকে মহাশয়কে "ঢিপ্ ঢিপ্" করিয়া এক এক নমস্কার। এই নমস্কার-করাটা গেয়েইসাদের শিষ্টাচার,—একটা অনিবার্য্য আদপ-কায়দা। এই শিষ্টাচার এবং সভ্যতার কায়দা তাহারা পরিচিত, অপরিচিত—কোনও স্থলে কিছুতেই ছাড়ে না। কিন্তু এ কথা যাউক।

আপনার আমন্ত্রিতা গেয়েইসারা আপনাদের মজলিসের মধ্যেই বসিয়া গেল। ক্রীড়া-কৌতুক-কথোপকথন, রহস্য ও রসিকতা—সতেজে চলিল; বাক্‌চাতুরী ও বুদ্ধির কারুগিরী প্রদর্শিত হইতে

লাগিল। গেয়েইসার উপস্থিত-বুদ্ধি প্রখরা; উপস্থিত বিষয়ে রহস্য ও রসিকতা উড়াইতেও তাহারা বিলক্ষণ তৎপর; শ্লেষ, তামাসা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অতীব সিদ্ধহস্ত। কত রকমের খুটি-নাটি খেলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌশল, আপনাকে দেখাইল। গেয়েইসা হস্তে খেলিল, অঙ্গুলীতে খেলিল, কাগজের ছোট ছোট টুক্‌রা ও সূত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রীড়ার কৌশল এবং কৌশলের কৌতুক আপনাদের সম্মুখে অভিনয় করিল; হস্তের এবং অঙ্গুলীর অভ্যস্ত শিক্ষায় কত শত বার মহাশয়দিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ও দৃষ্টি-শক্তিকে ঠকাইল। তারপর গেয়েইসা "সেমিসেন" বাজাইয়া গান গাইল। ভাব ও ভাবুকতার গীত গাইল, টপ্পা গাইল; নিন্দা-কুৎসার গানও আপনাকে দুই-চারিটা শুনাইয়া দিল। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গেই গেয়েইসা নাচিল:—নৃত্য, গীত ও বাদ্য—এ তিনই সে যুগপৎ করিতে পারে। গেয়েইসা প্রথমত গম্ভীর-অঙ্গের নৃত্য করিল, তার পর প্রহসন-সূচক নাচও নাচিল। আপনাকে আমোদিত করা তাহার কর্ত্তব্য,—স্বীয় কর্ত্তব্য সে সর্ব্বতোভাবে পালন করিল। অভিনয়-কালে হয় ত তাহার অন্তর উদ্বেগ-ভারাক্রান্ত; কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে ওষ্ঠের হাসিটুকু সে আপনার সম্মুখে কিছুতেই শুকাইতে দিবে না। গেয়েইসার অস্তিত্ব,—কবিতা-প্রবণ, কবিতা-উদ্দীপক; কিন্তু কে বলিবে, তাহার অস্তিত্ব ক্লেশকর নয়?

রজনী গভীর হইল। গেয়েইসাকে "কুসুম" দিয়া এখন বিদায় করিবার সময়। "কুসুম" কাগজে করিয়া দিতে হয়। গেয়েইসাদের "পকেট-বুকে" কতক গুলি করিয়া কাগজ থাকে। আপনি বলিলেন, "ভদ্রে! সন্তুষ্ট হইয়া আমায় এক টুক্‌রা কাগজ দেওয়ার কষ্ট করিবে?" গেয়েইসা তদুত্তরে এক টুক্‌রা কাগজ আপনার হস্তে দিল। আপনি সেই কাগজে করিয়া যথেচ্ছ রজত বা কাঞ্চন-মুদ্রারূপ কুসুম গেয়েইসাকে দিলেন। গেয়েইসা আপনাকে সসম্ভ্রমে ও সাদরে "ছায়ো-নারা" অর্থাৎ "গুড নাইট" করিয়া চলিয়া গেল। তার পর মাসকাবারে অভিনয়ের হিসাবে আপনার নিকট ইজারাদারের বিল আসিল। গেয়েইসা এই স্থলে "ইতি"। পাঠক! পায়ে-পায়ে গৃহে গমন করুন। কিন্তু এত কথার পর স্মরণীয় কথা স্মরণ রাখিবেন। স্মরণ রাখিবেন যে, পৃথিবী-ব্যাপী পদ্যে পৃথিবীর জীবের উপভোগাধিকার থাকিলেও তৎসংশ্লিষ্ট সাংঘাতিক প্রলোভন সর্ব্বথা সাবধানতার সহিত পরিত্যাজ্য। প্রলোভনে পড়িলে পদ্যানুভব হয় না,—পদ্যের পদ্যত্বই ঘুচিয়া যায়। উপদেশ দিতেছি না, সে অভ্যাস আমার নাই; আমোদের উপকারার্থেই কেবল উপরোক্ত অনুরোধটা করিলাম।

শ্রীমর্ত্ত্যভূমের মোসাপের।

নায়েব পতিতপাবন রায়।

সুবর্ণপুর একটী অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস। কায়স্থের অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক; তথায় তাঁহাদের প্রাধান্যও যথেষ্ট। এই গ্রামের এক প্রান্তে একখানি ছোট-খাট বাড়ী; তাহা ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বাহিরের একদিকে একখানি মণ্ডপ-ঘর, অপর দিকে বৈঠকখানা। ভিতরে কয়েকটী অতি পরিপাটী ঘর, গৃহস্থ-ভবনোপযোগী গোশালা ইত্যাদিও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যে শ্রী, যে সৌষ্ঠব, যে সৌন্দর্য্য ছিল এখন আর তাহার কিছুই নাই। এখন যেন সে সুন্দর পূর্ণিমার শশধরকে করাল কাদম্বিনীতে ঢাকিয়াছে; সে প্রস্ফুটিত পরিমল-পূর্ণ কুসুমদাম নিদাঘের আতপতাপে শুকাইয়া গিয়াছে! সে বাড়ীতে যে, লোক-জন নাই—এমত নহে; পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন আজিও তাঁহারাই আছেন; তবে এমন শ্রীভ্রষ্ট কেন হইল? একদিন বালক-বালিকাদের প্রফুল্ল-রাজীববৎ মুখে অকারণ-সঞ্জাত হৃদয়-তৃপ্তিকর সুমধুর উচ্চ-হাস্যে যে গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইত, আজ তাহাতে সেই উৎফুল্ল মুখে কে বিষাদের কালিমা মাখাইয়া দিয়াছে? তাহাদের সে উৎসাহ, সে স্ফূর্ত্তি, সে কমনীয় ভাব এখন কেন অন্তর্হিত হইল? তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—এক্ষণে তাহারা দুঃখ-দারিদ্র্যের চরম-সীমায় পতিত বলিয়া তাহাদের সে পূর্ব্বশ্রী একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত বাড়ীর একটী ঘরে, ছিন্ন মাদুরের উপর একজন, করতলোপরি চিন্তাসন্তপ্ত ললাট সংস্থাপিত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স

বেয়াল্লিশ বৎসর, আকৃতি কিছু খর্ব্ব এবং স্থূল; কপাল কিছু সঙ্কীর্ণ; চক্ষু দুটী কিছু ছোট; পরিধান একখানি মলিন বসন। মুখাকৃতি কিছু পরুষ-ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু এক্ষণে বিষাদের কালিমা সম্পূর্ণ রূপে অভিলিপ্ত। লোকটী গাঢ়-চিন্তামগ্ন। এমন সময়ে সেই ঘরে একটী স্ত্রীলোক অতি ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩০।৩২ বৎসর। তিনি শ্যামাঙ্গী; তাঁহার বসন মলিন, শতধাছিন্ন এবং শতগ্রন্থি-বিশিষ্ট। তাঁহার যে একদিন সৌন্দর্য্য ছিল, তাহার বহু শুভলক্ষণ এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যাহা হউক, ইনি পূর্ব্বোক্তব্যক্তির স্ত্রী। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার পূর্ব্বাবস্থায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—"আজও বাছাদের জন্য কোন উপায় কর্ত্তে পাল্লেম না। আমার রোজ অভাব, সুতরাং রোজ আমাকে কে দেবে বল? এত বেলা হ'ল, বাছাগুলি এখনও কিছু খেতে পায় নাই, খিদের জ্বালায় তাহারা ছটফট কচ্চে; কি যে কর্ব্বো, তা'ত বুঝ্‌তে পার্চ্চেছি না।" এই কথা বলিয়া স্নেহময়ী মাতা চক্ষের জল আর সংবরণ করিতে পারিলেন না,—নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীকে এই-রূপ কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার স্বামী কোন উত্তর করিলেন না, কেবল একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের গুরুভার যেন কিছু কমাই-লেন। তাহার পর কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একখানি চাদর লইয়া স্ত্রীকে বলিলেন,—"আজ যদি এই নিদারুণ কষ্টের কোন উপায় করিতে পারি, তবে ঘরে ফিরিব; নতুবা এই পর্য্যন্ত।" এই কথা বলিতে-বলিতে তিনি দ্রুত-পদে বাড়ীর বাহির হইলেন। তাঁহার স্ত্রী যে, তাঁহাকে আর কোন কথা বলিবেন, তাহার অবসর দিলেন না।

সুবর্ণপুর হইতে চারি ক্রোশ দূরে শ্রীকৃষ্ণপুর নামক এক বিশেষ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। বাবু নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সেই গ্রামের জমিদার। নগেন্দ্রনাথের বয়স ৩৭ বৎসর; শ্যামবর্ণ, দোহারা এবং বলিষ্ঠ গঠন। যদিও তিনি লেখা-পড়া তাদৃশ শিখেন নাই বটে, কিন্তু জমিদারী-সংক্রান্ত কাজ তিনি যেমন বুঝিতেন, অন্য কেহ তেমন বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার গরিবের প্রতি দয়া, লোকের প্রতি সৌজন্য, দীন-দুঃখীকে দান,—এ সকল ছিল। কিন্তু এদিকে আবার তাঁহার স্বভাব কিছু রুক্ষ, কমনীয়তা-শূন্য এবং তিনি অনেক সময়ে অপ্রিয়ভাষী ছিলেন। আবার লোকে তাঁহাকে প্রজাপীড়ক বলিয়া কিছু অখ্যাতিও করিত। সে যাহাই হউক, নগেন্দ্রনাথ অমিত-ধনশালী হইয়াও, তিনি ভোগাসক্ত বা ইন্দ্রিয়-পরবশ ছিলেন না। কিসে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি হয়, কিসে তাহার উন্নতি করিতে পারেন, এ চিন্তা তাঁহার মনে সদা জাগরিত থাকিত। তিনি বড় সৌখীন ছিলেন; আপনার বাড়ী ঘর নানা প্রকার চিত্তরঞ্জন দ্রব্য-সামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা; তাহার চারিদিকে নয়ন-তৃপ্তিকর বিবিধ ফুলের গাছ। গাছগুলি ফুলের ভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে; সন্ধ্যানিল তাহা-দের গাত্র স্পর্শ করিলে, স্মিত-মুখে সুস্নিগ্ধ সুবাসিত পরিমল বিতরণ করত সকলের তৃপ্তি-সাধন করিতে তাহারা বিমুখ হইত না। যাহা হউক, নগেন্দ্রনাথ একদিন আহারান্তে বেলা একটার সময় আপনার সুরম্য বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী লোক আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। লোকটীর কলেবর ঘর্ম্মাক্ত; বিশুষ্ক মুখ বড়ই দীন ভাবা-পন্ন। নগেন্দ্রনাথ তাহার প্রতি চাহিয়া বিস্মিত হইলেন এবং প্রতিনমস্কারের কথা ভুলিয়া গিয়া বলিলেন,—"কি পতিতপাবন! এত দিনের পর কি মনে ক'রে?" এই কথা শুনিয়া পতিত-পাবন যে কি উত্তর দিবেন, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না; চুপ করিয়া রহিলেন। পতিতপাবন আর কেহই নহেন, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুবর্ণপুর-নিবাসী দরিদ্রকায়স্থ-সন্তান। দারিদ্র্যের কঠোর-পীড়নে জ্বালাতন হইয়া, গৃহত্যাগ করত আজ জমিদার নগেন্দ্র-নাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

পতিতপাবন রায়,—কায়স্থ কুলোদ্ভব,—অতি ভদ্র-সন্তান। পিতা বাল্যকাল হইতে জমিদারী কাজ-কর্ম্ম ভাল করিয়া শিখাইয়াছিলেন বলিয়া, এই কাজে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি জমিদার নগেন্দ্রনাথের জমিদারী-সংক্রান্ত

কোন কাজে নিযুক্ত হইয়া, আপনার গুণে নায়েবী পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায় কার্য্য-কুশল ক্ষিপ্রকর্ম্মা লোক নগেন্দ্রনাথের জমিদারীতে আর কেহই ছিলেন না। তিনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি ছিলেন এবং তাঁহার শক্তি অচিন্তনীয় ও অপরিমেয় ছিল। যে মহলে খাজানা আদায় হইতেছে না,—প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারকে খাজানা দিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে,—একটী পয়সা আদায় হইবার কোন উপায় নাই, সেখানে পতিতপাবন গিয়া কড়ায়-গণ্ডায় সকল বাকী-বকেয়া উশুল করিয়া আনিতেন পতিতপাবন নানা প্রকার কৌশল জানিতেন, এবং যেখানে যে কৌশল খাটিবে, সেখানে তাহাই প্রয়োগ করিতেন। কোন স্থানে শুদ্ধ মিষ্ট কথায়, কোথাও ভয়-প্রদর্শন, কোথাও বা মারপিট,—আবার প্রয়োজন হইলে, প্রজাদের ঘর জ্বালাইয়া দিয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতেন। কাজেই নগেন্দ্রনাথের জমিদারীর প্রজা পতিতপাবনকে বিলক্ষণ চিনিত; তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তাহারা থরহরি কাঁপিত। যে সকল জমিদারী সহজে কেহ শাসন করিতে পারিত না, সেই সকল জমিদারী নগেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়া কিনিতেন। শাসন করিবার জন্য প্রথমত দুই একজন লোক পাঠাইয়া দিতেন; কিন্তু কোন ফলই ফলিত না, তাহারা মার খাইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিত। শেষে তিনি পতিতপাবনকে ডাকাইয়া বলিতেন,—"দেখ, পতিতপাবন! অমুক জমিদারী যে কিনিয়াছি, তাহার প্রজারা ত একপয়সা খাজানা দেয় না, লোকজন পাঠাইলে মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দেয়,—এখন উপায় কি বল?" পতিতপাবন বলিতেন,—"তার আর ভাবনা কি? আপনি আমাকে হুকুম দিন, আমি পনর দিনের মধ্যে সব ঠিক করিয়া দিতেছি। ইহার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।"

বাস্তবিক, পতিতপাবন যাহা বলিতেন তাহাই করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—জমিদারী-কাজে যে সকল কল-কৌশল, বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। আবার তাঁহার শরীরে অগাধ বল। যেখানে বিদ্যা-বুদ্ধির কোন ফল হইত না, সেখানে শুদ্ধ বল-প্রয়োগে তাহা সম্পন্ন হইত। জমিদারীর দশ বার জন যে কাজ করিতে পারিত না, পতিতপাবন একাই তাহা সমাধা করিতেন এই সকল কারণের জন্য তিনি জমিদার নগেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এত গুণ থাকিলে কি হইবে। তাঁহার চরিত্র এক মহাদোষে কলুষিত ছিল। সেই এক দোষে তাঁহার সকল গুণ নষ্ট করিয়াছিল। তাহারই জন্য তিনি আজ নিঃস্ব; তাঁহার উদরে অন্ন নাই, পরিধানে ভাল বস্ত্র নাই; ছেলে-পিলেরা অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ,—পথের ভিখারী। তাঁহার সেই মহৎ দোষ,—"তহবিল তছরুপাত"। তিনি এই বেশ কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন, কোন আপদ-বালাই নাই;—হঠাৎ যেন তাঁহার ঘাড়ে ভূত চাপিল; যেই দেখিলেন, জমিদারী-তহবিলে বেশ টাকা জমিয়াছে, আর লোভ-সংবরণ করিতে পারিলেন না,—অমনি তহবিল ভাঙ্গিয়া বসিলেন। প্রথমবার তাঁহার এই দোষের জন্য চাকরি যায়, কিন্তু আবার অনেক সাধ্য-সাধনার পর, বিশেষত তিনি কার্য্যক্ষম বলিয়া নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পুনরায় চাকরি দেন। কিন্তু যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহা কখনই যায় না। অঙ্গারকে শতবার ধৌত কর, তাহার যে স্বাভাবিক মালিন্য, তাহা কস্মিন্‌-কালেও যাইবে না; আর আমাদের নায়েব মহাশয়ের তহবিল-ভাঙ্গা রোগ, তাহা কখনই ঘুচিবে না। যাহা হউক, পতিতপাবন রায়, আবার চাকরি পাইলেন। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। জমিদার মহাশয় তাঁহার উৎসাহ এবং কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল, আবার দুষ্ট সরস্বতী তাঁহার ঘাড়ে চাপিল,—তিনি পুনরায় জমিদারের খাজানা ভাঙ্গিয়া বসিলেন। এবার নগেন্দ্রনাথ বিশেষ অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে জবাব দিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—আর তাঁহাকে কখন অনুগ্রহ করা হইবে না। পতিতপাবন, নিজ দোষে আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে চির-দারিদ্র্যে সমর্পণ করিলেন।

জমিদার মহাশয়ের বাড়ীর চাকরী যাওয়াতে পতিতপাবন কি করেন! বাটী আসিয়া বসিলেন। সৎ এবং অসৎ উপায়ে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অল্প দিনের মধ্যে খরচ হইয়া গেল। স্ত্রীর যে গহনা ছিল, তাহাও গেল;

পেতল-কাঁসার ঘটী-বাটী যাহা ছিল, তাহাও বেচিতে আরম্ভ করিলেন; শেষে গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন;—ক্রমে সব গেল। পরিশেষে প্রতিবেশীদের বাড়ী ধার করিতে আরম্ভ করিলেন;—কিন্তু তাই বা লোকে কত দিন দিবে? কিছু দিন দিয়া তাহারা তাহা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর একাহার,—শেষে উপবাস আরম্ভ হইল। তাঁহারা না হয় দুই একদিন উপবাস করিলেন, কিন্তু ছেলে-পিলে গুলি ত আর তাহা পারে না। তাহাদের ক্ষুধার সময় হইলে, তাহারা মার কাছে দৌড়িয়া আসিত। ঘরে যদি কিছু থাকিত, তবে তিনি তাহাদের দিতেন; আর না থাকিলে তিনি কাঁদিতে বসিতেন। এইরূপ করিয়া দুই এক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর দিন কাটে না। সংসারে প্রতিদিন যাহা ঘটিতে লাগিল, পতিতপাবন তাহা স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—এই সব কষ্টের মূল তিনি; তাঁহার দোষেই তাঁহার পরিবার আজ নিরন্ন। কিন্তু তিনি আর প্রতিদিন ইহা দেখিতে পারেন না, আর ইহার কোন উপায় না করিলে চলেও না; তাই তিনি সেদিন এই সঙ্কল্প করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হন যে, হয় তিনি এ দুঃসহ দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ঘুচাইবেন, না হয় দেশত্যাগী হইবেন। এরূপ মরণাধিক তীব্র-যাতনার তুষানলে আর তিনি দগ্ধ হইতে পারিবেন না। প্রথমে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"এখন যাই কোথা? করি কি? আজন্ম জমিদারী-সরকারে কাজ করিয়াছি; তাহাই জানি এবং তাহাই বুঝি; তাহা ভিন্ন আমার দ্বারা আর কোন কাজ হইবার ত উপায় নাই। চাকরি যাওয়া অবধি অনেক স্থানে চাকরির চেষ্টা করিলাম,—কোন স্থানে ত জুটিল না; তবে এখন উপায় কি?" এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া জমিদার নগেন্দ্রনাথের নিকট যাওয়াই স্থির করিলেন। তিনি একবার ভাবিলেন,—"জমিদার মহাশয় ত আমার প্রতি নিতান্তই বিরূপ, সেখানে গেলে কি কোন ফল দর্শিবে?" আবার ভাবিলেন,—"তা'হোক, যখন দেবতারা রুষ্ট হইলে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দ্বারা তাঁহাদের প্রীতি-সাধন করিতে পারা যায়; তখন নগেন্দ্রনাথ ত মানুষ,—তাঁহাকে কি প্রসন্ন করিতে পারা যাইবে না? আচ্ছা, একবার দেখাই যাক না।" তাঁহার আর অন্য উপায় নাই, সুতরাং তিনি সেই দ্বিপ্রহরের সময় নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব নায়েবকে সেই ভাবে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য এবং বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

পতিতপাবন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।"

নগেন্দ্র। তোমার আবার কি বিপদ?

পতিত। বিপদ সমূহ।

নগেন্দ্র। বিপদ কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলে, কেমন করিয়া বুঝিব? আবার কাহারও তহবিল ভাঙ্গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ নাকি?

পতিতপাবন কেমন করিয়া আপনার দুঃখ-কাহিনী বলেন, তাহার উপযুক্ত অবসর পাইতেছিলেন না; নগেন্দ্রনাথের শেষ-কথায় তাঁহার আপনার কথা বলিবার যেন কিছু সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন,—"আপনার এখান হইতে চাকরি যাওয়া অবধি আর কোন খানে চাকরি করি নাই, এবং জুটেও নাই।"

নগেন্দ্র। তবে কি তুমি এই প্রায় এক বৎসর চাকরি কর নাই? তাহা হইলে, এতদিন কি করিতেছিলে, আর তোমার সংসারই বা কেমন করিয়া চলিতেছিল?"

পতিত। আপনাকে কোন কথা গোপন করিব না, আর গোপন করিয়াই বা কি হইবে? এখান হইতে চাকরি যাওয়া পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আপনাকে অকপটে বলিতেছি। আপনার এখান হইতে চাকরি যাওয়া অবধি কত স্থানে চাকরির চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোথাও সুবিধা করিতে পারি নাই। কেহ আমাকে দেয়ও নাই, আর দিবেই বা কে? স্ব-ইচ্ছায় যে কলঙ্কের হার গলায় পরিয়াছি, তাহাতে লোকে চাকরি দেওয়া দূরে থাকুক, নিকটে বসিতে দিতেও যেন ঘৃণা করে। কাজেই ঘরে আসিয়া বসিতে হইল। তাহার পর, যাহা কিছু সংস্থান ছিল, একে একে তাহা নিঃশেষিত হইল। শেষে প্রতিবেশীদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কিছুদিন চলিল, কিন্তু তাহাতে ত আর চিরদিন চলে না,—কিছু দিনের পর তাহাও

বন্ধ হইল। তাহার পর অর্দ্ধাশন এবং অনশন। যে পাপ করিয়াছিলাম, তাহার ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে। তবে দুঃখ এই,—আমি পাপ করিয়াছি, তাহার ফল আমিই ভোগ করিব; কিন্তু সংসারে তাহা হয় না,—আমার পাপের জন্য আমার আশ্রিতেরা সমভাবে কষ্ট ভোগ করে। আমার পেটে অন্ন নাই, কি আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, তাহার জন্য আমার কোন আক্ষেপ নাই; কিন্তু আমার স্ত্রীর মলিন বেশ, তাহার রুক্ষ কেশ, শিশু গুলি অর্দ্ধ-উলঙ্গ এবং তাহারা অনাহারে আধ-মরা হইয়া রহিয়াছে। আজ সেই অপোগণ্ড গুলির জন্যই আবার আপনার দ্বারে আসিয়াছি; তাহাদের বাঁচাইতে ইচ্ছা হয়—বাঁচান, মারিতে ইচ্ছা হয়—মারুন।" এই বলিয়া সেই গর্ব্বিত দাম্ভিক পতিতপাবন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নগেন্দ্রনাথ এতক্ষণ তাঁহার কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেছিলেন, কোন কথার উত্তর দেন নাই; কিন্তু পতিতপাবনের এ দারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া তাঁহার মন যেন কিছু নরম হইয়া আসিল। তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব নায়েবকে বলিলেন,—"পতিতপাবন! আমি কি করিব বল? আমার ত কোন দোষ নাই। আমি তোমাকে অন্যায় করিয়া চাকরি হইতে জবাব দিই নাই; তুমি আপনার দোষে আপনি গিয়াছ। এইরূপ একবার নয়; দুইবার তুমি তহবিল ভাঙ্গিয়াছ। অন্য হইলে তোমাকে জেলখানায় দিত, কিন্তু আমি তাহা করি নাই; সুতরাং আমার দ্বারা আর তোমার কিছু হইবার আশা নাই।"

পতিত। দোষ যে আমার, তাহা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। যে কাজের যে পরিণাম, তাহাও বুঝি; কিন্তু এক এক সময়ে আমার যে কি কুমতি হয়, তখন আমি সকল ভুলিয়া অতি গর্হিত কাজ করিয়া ফেলি। যাহা হউক, যাহা করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে। আপনার অনুগ্রহে একদিন যাহার এত প্রতাপ, এত প্রভুতা ছিল, সে এখন দ্বারের ভিখারী হইয়াছে। এক মুটা ভাতের জন্য তাহার পুত্র-পরিবার মরিতেছে। আমি ঘোর-পাপী, ঘোর-নারকী,—আমার কথা ছাড়িয়া দিন; কিন্তু আমার সেই নিরপরাধী শিশু সন্তানগুলি অনাহারে উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের জন্যই আমার বড় কষ্ট। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, একজন লোক পাঠাইয়া দেখুন, তাহা হইলে সবই জানিতে পারিবেন। যদি এত কষ্ট পাইয়াও আমার শিক্ষা না হয়, তাহা হইলে আমার আর কখন শিক্ষা হইবে না।"

পতিতপাবন যে বলিয়াছিলেন,—"নগেন্দ্র বাবু মানুষ, তাঁহাকে কি প্রসন্ন করিতে পারা যাইবে না?" শেষে তাহাই ঘটিল। নগেন্দ্রনাথ বাস্তবিকই পতিতপাবনের দুঃখে কাতর হইলেন। যদিও তাঁহাকে আর কখন চাকরি দিবেন না বলিয়া এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরদুঃখ-কাতরতা তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল; শেষে দয়ার উচ্ছ্বাসে সে প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল। তিনি তাঁহাকে যে চাকরি দিবেন, তাহা মনে মনে এক প্রকার স্থির করিলেন। ইহার আর একটী কারণও ছিল। পতিতপাবন যে বিশেষ কর্ম্মক্ষম, তাহার অনেক পরিচয় তিনি ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন, সেজন্য পতিতপাবনকে তিনি মনে মনে ভালও বাসিতেন। তাহার পর কাশীপুরের জমিদারী কেনেন, কিন্তু সে গ্রামের প্রজারা এত দুর্দ্দান্ত যে, তিনি তাহা এপর্য্যন্ত কোন প্রকারে দখল করিতে পারেন নাই। যাহাকেই পাঠান, প্রজাদের হাতে নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, নাস্তানাবুদ হইয়া তাহাকেই ফিরিয়া আসিতে হয়। এই সময়ে পতিতপাবনের কথা তাঁহার অনেকবার মনে হইত এবং ভাবিতেন,—"যদি এ সময়ে পতিতপাবন থাকিত, তাহা হইলে কাশীপুর শাসন করা এত কষ্টসাধ্য হইত না। তাহার শরীরে যেমন অপরিমেয় শক্তি, ক্ষমতাও তেমনি অদ্ভুত।" যাহা হউক, আজ সেই পতিতপাবন দীনবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"দেখ পতিতপাবন! তুমি যে কাজ করিয়াছ, তাহাতে তোমার উপর আমার আর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই; সুতরাং তোমাকে কোন প্রকার কাজ দিতে আর সাহস হয় না।"

পতিতপাবন বুঝিলেন,—"বাবুর মন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নরম হইয়াছে।" তিনি এক্ষণে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বলিলেন,—"একথা সব সত্য। আপনি যে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহা আমি নিজে স্বীকার করিতেছি; কেননা,

আপনার নিকট আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। যাহা হউক, যাহা করিয়াছি, তাহার উপায় নাই এবং সেজন্য সমুচিত শিক্ষাও পাইয়াছি। আর যে আমার দ্বারা সেরূপ কাজ হইবে, এ কথা আপনি মনে আর স্থান দিবেন না। যদি এবার আপনি দয়া করেন, তাহা হইলে আপনাকে শপথ করিয়া বলিতে পারি,—এ দয়া-প্রকাশের জন্য ভবিষ্যতে কখন আর আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে না। যদি পুনরায় আমি সেরূপ কাজের জন্য অভিযুক্ত হই, তাহা হইলে জেলখানাই আমার উপযুক্ত স্থান হইবে।"

নগেন্দ্র। যাহা বলিতেছ, তাহা ত সব বুঝিলাম; তুমি কি টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিবে? মনে কর, তোমাকে কোন এক স্থানের নায়েবী-পদ দিলাম, সেখানে আদায়-উশুল করিতে লাগিলে, তহবিলে টাকা মজুদ হইল; অমনি দুষ্ট স্বরস্বতী তোমার কাঁধে চাপিল,—তুমি তহবিল ভাঙ্গিলে;—তখন কি হইবে বল?

পতিত। এবার আমি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি যে, যদি আপনি দয়া করিয়া আমাকে পূর্ব্বের কাজ দেন, তাহা হইলে জমিদারী হইতে প্রত্যহ যাহা আদায় হইবে, প্রত্যহই তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব,—আমার নিকট একটী পয়সাও রাখিব না। তাহা হইলে, লোভ জন্মিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।

নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, "এ যুক্তি নিতান্ত মন্দ নহে। যাহার জন্য এত গোল, সেই প্রলোভনের জিনিস যখন সে নিকটে রাখিতেছে না, তখন অনেকটা শুভ বলিতে হইবে। আর যখন লোকটা এত কষ্ট পাইয়াছে খতন আর যে সে এমন কাজ করিবে, তাহাও বোধ হয় না। বিশেষতঃ কাশীপুর শাসন করিবার জন্য পতিতপাবনের ন্যায় একজন জবরদস্ত লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে আর এক বার চাকরি দিয়া দেখা যাউক; লোকটার বোধ হয় উপযুক্ত শিক্ষা হইয়া থাকিবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,—"দেখ, পতিতপাবন! তোমাকে চাকরি দিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তোমার পুত্র-কন্যা এবং পরিবারের কথা মনে করিয়া তোমায় পুনরায় চাকরি দিতেছি; দেখিও আর যেন তোমার কোন প্রকার কুমতি না হয়। আর প্রত্যহ যাহা আমদানি হইবে, তাহা সন্ধ্যার মধ্যে এখানে পাঠাইয়া দিবে,—কখন আপনার নিকট রাখিও না।

পতিত। আবার আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—আমি আর কখন সেরূপ গর্হিত কাজ করিব না। আমার যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়াছে।

নগেন্দ্র। তবে আজ হইতে তোমাকে কাশীপুরের নায়েব করা গেল। শীঘ্র সেখানে গিয়া যাহাতে গ্রামটী সুশাসিত করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।

পতিত। আমি দুই চারি দিনের মধ্যে সেখানে যাইতেছি। আমার একটী নিবেদন আছে,—কাশীপুর অতি ভয়ঙ্কর স্থান; সে স্থান শাসিত করিতে হইলে, আমার মনোমত দুই চারি জন লোক লইতে ইচ্ছা করি।

নগেন্দ্র। তাহাতে আমার কিছু আপত্তি নাই; যাহাতে তোমার সুবিধা হইবে, তাহাই করিও। এখন তুমি বাড়ী যাও এবং বাড়ীতে সকল বন্দোবস্ত করিয়া কাশীপুর যাত্রা করিও।

এই কথা বলিয়া তিনি পতিতপাবনের হাতে ত্রিশটী টাকা দিলেন। পতিতপাবন অতি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাহা লইলেন এবং জমিদার মহাশয়কে অভিবাদন করত প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গৃহাভিমুখে চলিলেন। আসিবার সময় বাজার হইতে প্রয়োজন মত জিনিস-পত্র কিনিয়া বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখেন,—তাঁহার সহধর্ম্মিণী, শিশুগুলিকে লইয়া দালানে শুইয়া আছেন। তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়া তিনি উঠিয়া দেখেন,—তাঁহার স্বামী ও সঙ্গে আর একটী লোক; তাহার মাথায় একটী মোট। মোটটী 'নামান' হইলে দেখিলেন,—তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য-জিনিস রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সেই মলিন, বিশুষ্ক মুখে ঈষৎ হাসির রেখা প্রতিভাত হইল। তাহার পর তিনি স্বামীর মুখে তাঁহার পুনর্ব্বার চাকরি পাইবার কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং বাষ্পাকুল-লোচনে জমিদার মহাশয়ের অনেক প্রশংসা ও ঈশ্বরের নিকট তাঁহার পুত্র-কন্যাদের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বামীকে অতিবিনীত-ভাবে বলিলেন,—"অনেক কষ্টে আবার এই চাকরি পাইয়াছ, আবার

যেন তাহা খোয়াইও না। তুমি জান এবং নিজেও দেখিয়াছ,—পাপের কড়ি কাহারও ভোগ হয় না; তাই বলি, আর কোনরূপ অন্যায় করিয়া ছেলে-মেয়ে গুলিকে যেন দুঃখের সাগরে ভাসাইও না। জমিদার মহাশয় বড়ই দয়ালু বলিয়া আবার চাকরি পাইয়াছ; নতুবা অনাহারে কাহারও বাঁচিবার আশা ছিল না।”

পতিতপাবন,—সেই পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীর কথা শুনিয়া কিছু লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন,—“আর আমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না; এবার যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহা আর কস্মিন্ কালেও ভুলিব না।” যাহা হউক, পতিতপাবনের স্ত্রী, যত শীঘ্র পারিলেন, রন্ধনাদি করিয়া পুত্র-কন্যা এবং স্বামীকে আহার করাইয়া নিজে আহার করিলেন। দুই দিনের পর আজ তাঁহাদের আহার জুটিল।

পতিতপাবন, কাশীপুর যাইবার জন্য সকল প্রকার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এক মাসে তাঁহার সংসারের যাহা প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিলেন। যে চারিজন লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার কথা ছিল, তাহাদের প্রস্তুত হইতে বলিলেন এবং তাহাদের মধ্যে এক-জনকে পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিলেন। সে কাশী-পুরে গিয়াই নায়েব মহাশয়ের আসিবার কথা চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। পতিতপাবন [illegible]-পদ পাইয়া কাশীপুরে আসিতেছেন, মুহূর্ত-মধ্যে এ কথা উক্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। যাহারা খাজানা দিবে না বলিয়া ধর্ম্ম-ঘট করিয়াছিল, তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। স্থানে স্থানে তাহারা জোট বাঁধিয়া ঘোঁট করিতে লাগিল। আজকাল সকলের মুখে সেই এক কথা,—“ওরে সেই পতিতপাবন রায় আস্‌ছে রে; এবার আর নিস্তার নাই।” যাহা হউক, এদিকে পতিতপাবন, জমিদার নগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় হইয়া কাশীপুর যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাশীপুর সুবর্ণপুর হইতে পাঁচক্রোশ দূর। পতিতপাবন, যথাসময়ে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এখন আর সে চেহারা নাই, সে বেশও নাই। এখন কার সে জলদ-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলে, সহজেই লোকের মনে শঙ্কার উদয় হয়। প্রথম দিন তিনি কাছারী বাড়ীর অবস্থা ইত্যাদি সব দেখিলেন, কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। দ্বিতীয়দিন লোক,জন সঙ্গে করিয়া গ্রামটা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসি-লেন। তৃতীয়দিনে মহাসমারোহের সহিত খাজাঞ্চী, গোমস্তা, কারকুন, মুহুরি ইত্যাদি কর্ম্মচারি-সংবেষ্টিত হইয়া কাছারী করিতে লাগি-লেন। তখনকার তাঁহার সে ভাব দেখিলে, বোধ হইত যেন স্বয়ং দণ্ডধারী কৃতান্ত, যমপুরী পরি-ত্যাগ করত সশরীরে কাশীপুরের কাছারী-বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি সেখানকার কর্ম্মচারীদিগকে প্রথমে হুকুম দিলেন, —“যে সকল প্রজাদের নিকট অনেক দিনের খাজানা বাকী আছে, তাহাদের একটী তালিকা প্রস্তুত কর।” আদেশ-মতে তালিকা প্রস্তুত হইল। তিনি তাহাদের নাম পড়িয়া কাছারীতে যে সকল পাইক ছিল, তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন,—“দেখ্, এই সকল প্রজাদের বাড়ী যা; ইহারা যদি বাকী খাজানা দিতে না চায়, তাহা হইলে বলিস যে, পতিতপাবন রায় তাহাদের বুকে বাঁশ দিয়া খাজানা আদায় করিবে আর তাহাদের ঘর-বাড়ী একেবারে সমভূমি করিয়া দিবে।” পতিতপাবনের সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন,—“তোরাও ইহাদের সঙ্গে যা, শুনিস্,—কে কি বলে; যদি কেহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে আইসে, তাহা হইলে দুই এক জন লোকের ঝুঁটি ছিঁড়ে নিয়ে আসিস্; তাহার পর যাহা হয়, তাহা আমি করিব।” এই হুকুম পাইবামাত্র কাছারীর নগদী, পাইক,—ঢাল তলবার ইত্যাদি হাতিয়ার-বদ্ধ হইয়া চারিদিকে ছুটিল। অল্পক্ষণের মধ্যে গ্রাম-মধ্যে হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল।

পতিতপাবন রায় কাছারীতে কি হুকুম দেন এবং কি প্রণালীতে কাজ করিতে আরম্ভ করেন তাহা জানিবার জন্য অনেক প্রজা তথায় উপ-স্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকের খাজানা দিবার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কুলোকের কুপরামর্শে তাহারা এত দিন খাজানা দেয় নাই। আজ তাহাদের সঙ্গে টাকাও ছিল; নায়েব মহাশয়ের আদেশ শুনিয়া তাহারা একে একে আপন আপন খাজানা দিতে আরম্ভ করিল। আর

যাহাদের নিকট টাকা ছিল না, তাহারা আস্তে আস্তে আপনাদের গৃহে চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা টাকা আনিয়া দিল; কেহ বা—"দেখাই, যাক্ না, কি হয়" এই মনে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে যে সকল যমদূতেরা খাজানা আদায় করিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা খাজানার টাকা, কেহ কেহ বা দুই একজন দুর্দ্দান্ত প্রজাকে বাঁধিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নায়েব মহাশয়ের বিভীষণ-মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ বা তাঁহার বিকট চীৎকার শুনিয়া শশব্যস্তে টাকা দিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই আবার সমান নহে,—যাহারা পাকা বদমাইস, তাহারা কিছুতেই টলিল না। তখন তাহাদের উপর হুকুম হইল,—"ইহাদের বুকে বাঁশ দিয়ে আদায় কর।" ইতিপূর্ব্বে নায়েব মহাশয়ের আদেশে কাছারীবাড়ীর একপাশে একটী অখণ্ড বাঁশ আনিয়া রাখা হইয়াছিল। হুকুম পাইবামাত্র দুই জন সেই বাঁশ উঠাইল; আর অপর দুই জন, সেই খাজানা দিতে অনিচ্ছুক প্রজাদিগের মধ্যে এক একজনকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ব্যাপার সহজ নহে বুঝিয়া, কেহ বা তৎক্ষণাৎ টাকা দিল; কাহাকেও বা খানিক দূর লইয়া যাইতে হইল; কেহ বা সেই অপরিষ্কৃত অখণ্ড বাঁশের স্পর্শ-সুখ অনুভব করত টাকা দিল। এইরূপে নায়েব পতিতপাবনের খাজানা-আদায়-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

প্রথম দিনে প্রায় দুই শত টাকা আদায় হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই টাকা কাছারীর এবং পতিতপাবনের জানিত লোক দ্বারা জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে প্রেরিত হইল। নগেন্দ্রনাথ ত দেখিয়া অবাক্! যে জমিদারী হইতে আজ প্রায় এক বৎসরের মধ্যে একটী পয়সাও আদায় করিতে পারেন নাই, সেখানে তিন দিনের মধ্যে পতিতপাবন একেবারে [illegible] শত টাকা আদায় করিয়াছে। যাহা হউক, পতিতপাবন যে একজন অদ্বিতীয় লোক এবং তাহার যে ক্ষমতাও অসীম, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

এদিকে পতিতপাবন সোৎসাহে, সদর্পে, জমিদারীর খাজানা আদায় করিতে লাগিলেন। সকল স্থানেই যে সহজে আদায় হইল, তাহা নহে। স্থানে স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইতে লাগিল, প্রজাপক্ষের দুই একজন জখমও হইল; কিন্তু তাহাতে পতিতপাবনের ভ্রূক্ষেপ নাই,—তিনি সটানে আপনার কাজ করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহার নামে জমিদারের কাছে নালিস করিল। নগেন্দ্রনাথ এসব বিষয়ে নিতান্ত পাকা লোক; তিনি প্রজাদের প্রলোভ-বাক্যে এই বুঝাইলেন যে, নায়েব যদি নিতান্ত অন্যায় করে, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই বরতরফ করা যাইবে। কাহাকেও বা ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে কিছু দিন কাটিতে লাগিল। প্রজারা নিয়মিত খাজানা দিতে আর আপত্তি করিল না। ক্রমশ কালীপুর সুশাসিত হইয়া আসিতে লাগিল। ওদিকে প্রত্যহ জমিদারী-তহবিলে যাহা কিছু জমিত পতিতপাবন তাহা নিত্য না পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। দেখিতে দেখিতে দুই তিন মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল।

বর্ষাকাল, প্রায় সর্ব্বদাই বৃষ্টি হই[illegible] ডোবা বৃষ্টির জলে পূরি[illegible] উঠিয়াছে কাদায় পূর্ণ; পথিকদিগের [illegible] অসুবিধা। ওদিকে নূতন জল [illegible] মহা আনন্দ; তাহারা আর স্থির [illegible] চারিদিক পূরিয়া তুলিয়াছে [illegible] বর্ষাকালে একদিন বড়ই [illegible] দ্বিপ্রহরের পর হইতে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর [illegible] আছে; মধ্যে মধ্যে মহাভীতি[illegible] দিগন্তব্যাপী গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিতেছে। [illegible] পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হই[illegible] বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই;—অবিরল ধারে প[illegible] লাগিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহার যে কাজ করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা আর হইয়া উঠিল না। সকলকেই আপন-আপন ঘরে বসিয়া থাকিতে হইল। ওদিকে পতিতপাবন মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সেইদিন জমিদারী-তহবিলে পাঁচশত টাকা মজুদ হইয়াছে; তিনি তাহা পাঠাইয়া দিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ভাবিতেছেন,—এইবার বৃষ্টি থামিলেই পাঠাইয়া দিবেন, কিন্তু বৃষ্টি আর থামিতেছে না। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। তখন বৃষ্টি কিছু মন্দীভূত হইয়া আসিল। কিন্তু এতরাত্রে টাকা পাঠান নিতান্ত যুক্তি-সঙ্গত নহে বলিয়া সে রাত্রে আর টাকা পাঠান হইল না। পরদিন প্রত্যূষে পাঠানই স্থির হইল। রাত্রে আহারাদি করিয়া তিনি আপনার ঘরে শয়ন করিতে

গেলেন। টাকার তোড়াটী অন্য কোন স্থানে না রাখিয়া, আপনার শয়ন-ঘরে যে একটী কাঠের বড় সিন্দুক ছিল, তাহার ভিতর রাখিয়া, পতিতপাবন আপনার বিছানায় গিয়া শুইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভাবিলেন,—"আমার যে ভয়ানক ঘুম,চোর যদি সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া যায়, তাহা হইলে আমি ত তাহার বিন্দুমাত্র জানিতে পারিব না।" সুতরাং তাঁহার আর শোয়া হইল না; সিন্দুকের উপর অনিদ্র হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। তিনি মনে মনে কি ভাবিয়া উঠিলেন এবং সিন্দুক হইতে টাকার তোড়া বাহির করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন। সিন্দুকের ভিতর রাখিতে যেন তাঁহার বিশ্বাস হইল না। এজন্য তাহা আপনার সম্মুখে রাখিয়া বসিলেন।

পতিতপাবন মনে মনে এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—আজ আর তিনি ঘুমাইবেন না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা বুঝি থাকে না। এক ঘণ্টা পরে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন, কিছুক্ষণ পাদচারণ করিলেন এবং ঘুমনিবারণের জন্য নানা-প্রকার প্রক্রিয়া করত আবার সিন্দুকের উপর গিয়া বসিলেন। কিন্তু নিদ্রা বড়ই অবাধ্য, তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছাধীন নহে। তিনি কত দুর্দ্ধর্ষ বদমাইসকে শাসন করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছেন—তাহার আর শেষ নাই, কিন্তু ভুবন-বিজয়িনী নিদ্রাকে বশ করিতে পারেন নাই; সুতরাং কিছুক্ষণ পরেই আবার নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে 'ত্যক্ত' করিতে লাগিল। তিনি অনেকক্ষণ তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শেষে পরাস্ত হইলেন। ক্রমশ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ তাঁহার অজ্ঞাতসারে দেয়ালে সংলগ্ন হইল; অমনি ঘোর-রবে নানা মূর্চ্ছনার সহিত নায়েব মহাশয়ের নাসিকা-ধ্বনি হইতে লাগিল! প্রতিবেশীরা যদি কেহ সে সময়ে জাগিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বুঝিত,—নায়েব মহাশয় নিদ্রা যাইতেছেন। যাহা হউক, তিনি এক্ষণে জগতের সকল বিষয় ভুলিয়া গিয়া নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে যে কত সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি প্রথমেই হাত বাড়াইয়া দেখিলেন,—টাকার তোড়াটী যথাস্থানে আছে কিনা। কিন্তু তোড়াটী সেখানে নাই! পুনরায় হাত বুলাইয়া সিন্দুকের উপর দেখিলেন, কিন্তু হাতে ত কোন জিনিসই ঠেকিল না। কি সর্ব্বনাশ!! "তবে কি টাকার তোড়া সিন্দুকের উপর নাই?" এই মনে করিয়া তিনি উঠিলেন। তখন দিয়াশলায়ের ব্যবহার ছিল না, চকমকিই একমাত্র সম্বল; তাহার সাহায্যে প্রদীপ জ্বালিয়া দেখেন,—টাকার তোড়া সিন্দুকের উপর নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে লোপ পাইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মন স্থির হইলে ভাবিলেন,—"হয় ত টাকা সিন্দুকের ভিতর আছে, তথা হইতে বাহির করা হয় নাই।" এই মনে করিয়া সিন্দুক খুলিলেন এবং তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু টাকার তোড়া ত দেখিতে পাইলেন না। একবার ভাবিলেন,— "হয় ত বিছানার উপর আছে।" তাহাও দেখিলেন, সেখানেও টাকার তোড়া পাইলেন না। তিনি শয়ন-গৃহ ইতস্তত দেখিতে লাগিলেন; একটী স্থান তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। তথায় গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চেতনা যেন বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া গেল; তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেখানে দেখিলেন;—এক প্রকাণ্ড সিঁদ। এই সিঁদ কাটিয়া চোর যে টাকা লইয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এখন উপায় কি? তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন,—"বাস্তবিক যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বলিলে কেহই বিশ্বাস করিবে না। যদি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলি, তাহা হইলেও জমিদার মহাশয় আমার কথায় প্রত্যয় করিবেন না। তিনি শুনিলে নিশ্চয় ভাবিবেন যে, এ আমার কাজ। আমিই টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছি, আর লোককে দেখাইবার জন্য নিজে সিঁদ কাটিয়া রাখিয়াছি। আমার কি শোচনীয় অবস্থা! চুরি না করিয়াও আমি চোর!! তাই ভাবি, একবার চোর বলিয়া কলঙ্ক রটিলে, সে কলঙ্ক সহজে অপনীত হয় না। তাহাতে আবার আমাকে দুই দুইবার এই কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইয়াছে, সুতরাং এ কলঙ্কের বোঝা যে আমাকে চিরদিন বহিতে

হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এবার শুধু তাহা নহে; বোধ হয়, কিছুকাল জেলে গিয়াও বাস করিতে হইবে। জেলে যাই, তাহাতে আমার কোন কষ্ট নাই; কিন্তু আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের দশা কি হইবে, তাহা ত বলা যায় না। তাহারা যে অনাহারে মারা যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।" এই কথা মনে করিয়া সেই নির্ভীক অতিদর্পী পতিতপাবনের চক্ষে জল আসিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া, যখন তাঁহার মনের আবেগ কিছু কমিয়া আসিল, তখন তিনি ভাবিলেন,—"এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিলে ত কাজ চলিবে না, আর বিপদে অধীর হওয়াও উচিত নহে। এখন দেখা চাই, কাশীপুরে এমন কে চোর আছে যে, সে আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া যায়।" এই মনে করিয়া ঘরের কোণ হইতে তাঁহার প্রিয় ছড়ি-গাছটী লইলেন। ছড়িগাছটী বড় সহজ নহে; তাহার ভিতর তীক্ষ্ণধার একখানি অস্ত্র আছে। কতবার সেই গুপ্তির সাহায্যে তিনি নানা প্রকার বিপদ-সঙ্কুল স্থান হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। যাহা হউক, সেই গুপ্তি হাতে করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। বাহির হইবার সময় সেই বিঘ্নবিঘাতক শরণাগত-রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া বলিলেন,—"দেব! তুমি অন্তর্যামী, তুমি সকলের মনের কথা জান; আমি যে এবার কোন দোষে দোষী নই, তাহা তুমি ভিন্ন কে জানিবে? তুমি দয়াময় বিপদভঞ্জন; তুমি এই বিপদ হইতে রক্ষা কর।" এই কথা বলিয়া তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন।

গৃহের বাহির হইয়া দেখিলেন,—বর্ষার সেই গভীর রাত্রি, ঘোরতর অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ; সহজে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যদিও বৃষ্টি হইতেছে না বটে, কিন্তু নিবিড় মেঘ, আকাশকে একেবারে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। জগতের তিমিরময়ী মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ক্ষণপ্রভা চকিতের ন্যায় দেখা দিতেছে। আজ পথ-প্রান্তর, জন-মানব-শূন্য; অন্ধকারে পৃথিবী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই রাত্রে পতিতপাবন অতি সাবধানে রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলেন। চোর, ডাকাইত বা অন্য কোনরূপ ভয়ে তিনি কখন ভীত হইতেন না। তবে গ্রামে আজকাল বাঘের ভয় হইয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করিলেন,—"শেষে কি বাঘের মুখে পড়িতে হইবে! দেখা যাক, ভগবান কি করেন!" এই মনে করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোককেই তিনি বিশিষ্টরূপে জানিতেন। যাহাদের চরিত্রের উপর তাঁহার সন্দেহ ছিল, তিনি একে একে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কাহার কোন সাড়া-শব্দ পাইলেন না,—সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

এইরূপ তিনি কয়েক জনের বাড়ী যাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ভাবিলেন,—"বিধাতা নিতান্তই বাম দেখিতেছি; এখন করি কি? এবার ভাগ্যে নিশ্চয়ই জেল আছে। যাহা হউক, সহজে কোন কাজে একেবারে হতাশ হওয়া উচিত হয় না।" এই কথা মনে করিয়া তিনি আবার লোকের বাড়ী বাড়ী খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সকল স্থানই নিস্তব্ধ। শেষে একজনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার বাড়ীতে টাকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। অমনি আস্তে আস্তে সেই ঘরের দিকে গেলেন এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন,—বাস্তবিকই টাকার শব্দ হইতেছে। তিনি ঘরখানির নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন,—একখানি মাত্র ঘর, তাহা খড়ের; ঘরের দাওয়া কিছু উঁচু। পূর্ব্বদিকে, ঘরে উঠিবার জন্য সিঁড়ি, আর পশ্চিমদিকে আঁস্তাকুড়। পতিতপাবন, ক্রমে ক্রমে সিঁড়ির নিকটে আসিলেন; এবার টাকা-গণার আওয়াজ তিনি স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন। আর সেই ঘরের মধ্যে যে, দুই জন অনুচ্চস্বরে কথা কহিতেছে, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন। এই বাড়ীর লোক যে, টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে কি উপায়ে তিনি টাকা হস্তগত করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ঐ বাড়ীর একটী ছেলে বলিল,—"মা আমি বাহ্যে যাব।"

মা। "এত রাত্রে বাহ্যে যাবি কি রে?"

বালক। "আমায় বড় বাহ্যে পেয়েছে মা! আমি আর থাকিতে পারি না।"

মা। "আচ্ছা, তবে দাওয়ার ধারে আঁস্তাকুড়ের দিকে বাহ্যে যা; দেখিস্ যেন নীচে নামিস না, আজকাল বড় বাঘের ভয় হইয়াছে।"

এই কথার পর বালকটী বাহিরে, যথানির্দ্দিষ্ট

স্থানে আসিয়া বসিল। টাকাগুলি তুলিয়া মাতা ছেলেকে দাঁড়াইতে বাহিরে আসিবেন ইত্যবসরে পতিতপাবন ভাবিলেন,—আর কোন সময়! তিনি আস্তে আস্তে দাওয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গেলেন এবং বালকটীর গলা সজোরে টিপিয়া বাড়ীর পশ্চাতে যে সামান্য জঙ্গল ছিল, তাহাতেই ফেলিয়া দিলেন। বালকটীর গলা সজোরে টিপিয়া ধরিবার সময় "ক্যাক্"করিয়া একটী শব্দ হয়; ঐ শব্দ উহার পিতা-মাতা শুনিতে পাইয়া তাহারা উভয়ে বলিয়া উঠিল,—"ঐ রে বুঝি সর্ব্বনাশ হলো! ছেলেকে বুঝি বাঘে নিয়ে গেল!" এই কথা বলিয়া তাহারা দুইজনে দ্রুতপদে একেবারে ঘরের বাহিরে আসিল এবং ছেলেকে দাওয়ায় না দেখিতে পাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে খুঁজিতে গেল।

পতিপপাবন, মূর্চ্ছিত ছেলেটীকে বনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, ঘরের পশ্চাৎ দিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পিতা-মাতাকে পুত্রের অন্বেষণে যাইতে দেখিয়া, তিনি তাহাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন,—ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর টাকাগুলি—তোড়াটীর মুখ বাঁধা—একটী ভাঙ্গা বাক্সের উপর রহিয়াছে। তিনি সেখানে আর কালবিলম্ব না করিয়া টাকার তোড়া হাতে লইয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। আকাশ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু পরিষ্কার হইয়াছিল, সুতরাং তিনি অতি সত্বর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল; তিনি টাকার তোড়াটী সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে তাহার উপর বসিয়া রহিলেন,—আর ঘুমাইলেন না এবং মনে মনে পরমেশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহারই কৃপায় যে এ ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ ছিলনা। ক্রমে পূর্ব্বদিক ফরসা হইল: চারিদিকে কাক-কোকিল ডাকিল। সঙ্গে সঙ্গে তমসাচ্ছন্ন জগৎ হাসিয়া উঠিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে পতিতপাবন, স্বীয়হস্তে জমিদার মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিলেন এবং পূর্ব্বদিন ভয়ানক দুর্য্যোগ ছিল এজন্য টাকা পাঠাইতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাহিরে আসিয়া লোক দ্বারা টাকার তোড়া ও পত্র শ্রীকৃষ্ণপুর পাঠাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে যথারীতি নায়েব, গোমস্তা, মুহুরি, কারকুন ইত্যাদি সকলে কাছারী করিতে বসিয়াছেন। লোকজনে কাছারী-বাড়ী একেবারে পূর্ণ। সকলেই আপন আপন কাজে নিযুক্ত। এমন সময় একজন ভীমকায় পুরুষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে একখানি আধময়লা সঙ্কীর্ণায়তন কাপড়;—কাঁধে একখানি গামছা,—হাতে একটী একতারা। কাছারী-বাড়ীতে প্রায় মধ্যে মধ্যে ফকির, বৈষ্ণব এবং ভিখারীরা আসিয়া থাকে, সুতরাং আগন্তুকের প্রতি লোকের দৃষ্টি তাদৃশ আকর্ষণ করিল না; কিন্তু তাহার বিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কেহ দুই একবার তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। যেখানে বসিলে সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে, এমন একটী স্থান দেখিয়া লোকটী তথায় বসিল এবং একতারা বাজাইয়া ঋষভ-স্বরে এই গান ধরিল,—

"তুমি যদি এমত এমন কেন? তুমি যদি এমত এমন কেন?"

এই অশ্রুতপূর্ব্ব তানলয়-বিবর্জ্জিত নূতন প্রকার গান শুনিয়া অনেকেই হাসিতে লাগিল, কেহ কেহ বিরক্তও হইল। জমিদারী-কাছারীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে খাজাঞ্চী কিছু প্রবীণ এবং সুরসিক ছিলেন। তিনি গায়ককে একটী পয়সা দিয়া বলিলেন,—"ঢের হয়েছে বাপু! এখন চুপ কর; আর তোমাকে ও-সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতে হইবে না, এখন স্থানান্তরে যাও?" কিন্তু গায়কের কাহারও কথায় দৃকপাত নাই, সে আপন মনে গাইতেছে,—"তুমি যদি এমত এমন কেন?" খাজাঞ্চী মহাশয় আর একটী পয়সা দিয়া বলিলেন,—"বাপু ক্ষমা দেও, তোমার গানের জ্বালায় আর যে আমরা তিষ্ঠিতে পারি না। পয়সা পেয়েছ, বাড়ী চলে যাও, আর তোমার গান শুনাইয়া আমাদের কাণ ঝালা-পালা করিও না।" আমার বোধ হয়, গাথক আর জন্মে লুল্লু-ভূতের গল্পের তাঁতি ছিল, মরে কাশীপুরে জন্ম লইয়াছে।

পাঠক, খাজাঞ্চী মহাশয়ের কথা বুঝিল কিনা, তাহা জানি না; কিন্তু সে গান বন্ধ করিল না। কাছারীর লোকেরা বড় বিপদ্গ্রস্ত হইয়া উঠিল।

এতক্ষণ পতিতপাবন কোন কথা কহিতে-

ছিলেন না, তিনি চুপ করিয়া আপনার কাজ করিতেছিলেন এবং এই তামাসাও দেখিতে-ছিলেন। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন,—"ও পয়সা লইতে আসে নাই, আর আমাদের কথাতেও যাবে না। আমি উহাকে বিদায় করিতেছি।" এই বলিয়া সেই গায়ক-কুল শিরোভূষণকে বলিলেন,—'সকলেই যদি সব গানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে, তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি? তুমি একবার তোমার ঐ একতারাটা দেও ত বাপু!" এই বলিয়া নায়েব মহাশয় একতারা লইয়া তিনিও ঐরূপ স্বরে এই গান ধরিলেন,—

"কত শত করেছি কিছুতে কিছু হয় না।
কত শত করেছি কিছুতে কিছু হয় না"।

এই অপূর্ব্ব গান গাহিয়া তিনি একতারাটী তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। গায়ক, পয়সা না লইয়া এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একতারাটী লইয়া চলিয়া গেল।

কাছারীর লোকেরা ত অবাক! তাহারা কেহই কোন কথা বুঝিতে পারিল না। সকলেই মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। শেষে বৃদ্ধ খাজাঞ্চী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নায়েব মহাশয়! আপনারা দুইজন যে গান গাহিলেন, তাহার ত কিছু মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আপনাদের গানের গূঢ়-রহস্য আপনারাই বুঝিলেন, আমরা ত কিছুই বুঝিলাম না; আমাদের কি ইহার রহস্য-ভেদ করিয়া দিবেন?"

নায়েব পতিতপাবন হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। ঐ যে লোকটী আসিয়াছিল, সে একজন ভয়ঙ্কর সাহসী চোর। কাল রাত্রে আমার ঘরে সিঁদ দিয়া, সে টাকার তোড়াটী লইয়া গিয়াছিল।"

তাহার পর যে যে উপায়ে তিনি টাকা-তোড়াটী পুনরুদ্ধার করেন, একে একে তিনি তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বর্ণনা করিলেন। শেষে বলিলেন,—"যখন আমি ছেলেটীর গলা টিপিয়া বনের মধ্যে ফেলিয়া দেই, তখন তাহারা আমার কৌশল বুঝিতে পারে নাই; ভাবিয়াছিল,—সত্য সত্যই তাহাদের ছেলেকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা ছেলে-টীকে অক্ষত-শরীরে পাইল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া টাকার তোড়াটী দেখিতে পাইল না, তখন নিশ্চয় ভাবিল,—এ আমার কাজ। তাই ঐ লোকটী জানিতে আসিয়াছিল,—আমি যদি এত কৌশল জানি, তাহা হইলে কেন এই সামান্য বেতনে, পরের গোলামী করিতেছি? লোকটার জানিবার উদ্দেশ্য হ'লো এই;—সে, আপনার পয়সা নেবে কেন? কাজেই সে আপনাদের কোন কথায় যায় নাই। যখন আমি তাহার উত্তরে বলিলাম যে, এইরূপ আমি কত শত করেছি, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নাই; ইহাতে দুঃখও ঘুচে না,—বড় মানুষও হওয়া যায় না; তখন তাহার প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর হওয়াতে সে আপনিই চলিয়া গেল; আর কিছু বলিতে হইল না। যাহা হউক, লোকটা কাল বড়ই কষ্ট দিয়াছিল।"

পতিতপাবনের এই কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং তাঁহার অকল্পিত-পূর্ব্ব চাতুরীর অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল।

উপরোক্ত ঘটনার কথা ক্রমে জমিদার নগেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহার সবিশেষ বিবরণ শুনিয়া, পতিতপাবনের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। পতিতপাবন অনেক দিন পর্য্যন্ত নগেন্দ্রনাথের জমিদারীতে চাকরি করিয়াছিলেন এবং আর তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্কের আরোপ কেহই করিতে পারে নাই। তিনি নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত চাকরি করিয়া শেষে যৎকিঞ্চিৎ পেনসন পান এবং শেষ-জীবন ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত করেন। আমাদের সত্য আখ্যায়িকা এখানেই শেষ হইল। পতিতপাবন যে ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন স্থানে এই সকল কাজ করিয়াছিলেন, তাহার আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীসর্ব্বেশ্বর মিত্র।

সাহিত্য।

বাঙ্গালায় আমার শৈশব। আমি উঠি,—পড়ি,—আবার উঠি। আমি উঠি-উঠি উঠিতে পারি না, ফুটি-ফুটি প্রস্ফুট হই না,—অঙ্কুরোন্মুখ হইয়া কতবার ম্লান হইয়া পড়ি;—আমি পুষ্পোদ্গম-সময়েও সলিল অভাবে শুকাইয়া যাই আমার শরীর শুকাইয়া যায়; কিন্তু সত্তা সজীব থাকে; আমি ম্লান হই; কিন্তু মরি না। আমি পুনর্ব্বার ফুটি।

আমি উঠিতে-উঠিতে পড়িয়া যাই; পড়িয়া যাইয়া পুনর্ব্বার উঠি। একবার,—দুইবার,—অগণিত বার,—আমার উত্থান, পতন এবং পুনরুত্থান। বাহনও আমার অসংখ্য। এক পতিত হয়, আমি আর এক বাহন অবলম্বন করিয়া উত্থিত হই। দ্বিতীয় যায়, তৃতীয় গ্রহণ করি; তৃতীয় অচল হয়; চতুর্থে আমি আরোহণ করি। বাহনের বিলয় হয়, কিন্তু আরোহীর অস্তিত্ব অটুট থাকে; স্বতন্ত্র বাহনের ব্যবস্থা হয়। আমার বাহনও অনেক। অনেক-সংখ্যক, অনেক প্রকৃতির এবং অনেক নীতির,—আমার বহু বাহন। আমার প্রাত্যহিক বাহন, সাপ্তাহিক বাহন, পাক্ষিক, মাসিক এবং সাময়িক, বহু বাহন। আমি গ্রন্থরূপ গজে আরোহণ করি, সাপ্তাহিক মেলট্রেণেও গতিবিধি করি; পরন্তু প্রাত্যহিক পক্ষিরাজও আমার প্রিয় বাহন। পাক্ষিক প্যাসেঞ্জার ট্রেণ এবং মাসিক মালগাড়িও আমি ছাড়ি না। সাময়িক সন্দর্ভরূপ উচ্চতর উষ্ট্র-পৃষ্ঠেও আমি গতিবিধি করিয়া থাকি। আমি ঘরের ঘোটকে আরোহণ ত করিই, পরের পাল্কী ব্যবহার করিতেও ক্রটী করি না;—আমার বহু-বাহন;—"সোয়ারি" আমার সংখ্যাতীত। আমার চেরেট, বগি, ব্রুহাম—বহু এবং বিবিধ প্রকারের। আমার হয়, হস্তী, পাল্কী এবং পান্সী,—ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আমি "অমনিবাসে"ও উঠি, "ওপেনট্রাকে"ও ট্রাবেল করি; শাহাজাদা-বাঞ্ছিত "সেলুন" সর্ব্বদা আমার সেবা করিয়া থাকে। আমি "সেলুনে"ও সোয়ার হই; কিন্তু বুলক্-কাট ও কেরাঞ্চিও আমার বিলক্ষণ কাজে লাগে। আমি সৌখিন সোয়ারি যত ব্যবহার করি, সাদা-মাটা সোয়ারীর ততোধিক সাহায্য লই; আমি শীঘ্র-গামী-তুরঙ্গ আরোহণ কাম্য বলিয়া মন্থর-গতি মাতঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারি না; গজের ন্যায় গাধা-বোটেও আমার প্রভূত প্রয়োজন আছে;—আমার বহু বাহন। এক এবং অল্প-সংখ্যক বাহনে আমায় সংকুলান হয় না। এই শিশুকালেও আমার সাহিত্য-শরীর সুবিশাল ও সুবিস্তীর্ণ।

আমার রথের পর রথ, সারথির পর সারথি পরিবর্ত্তিত হয়, বিলুপ্ত হয়, অচল হয়, নষ্ট হয়; কিন্তু আমি,—রথী; রথ ও সারথির অভাবে অচল হই না;—এক রথ যায়, আর এক রথ নির্ম্মাণ করি; পুরাতন রথ বা সারথির ধ্বংসে আমার পথ বন্ধ হয় না এবং পর্য্যটন ক্লান্ত হয় না; রথের পর রথ-নির্ম্মাণ এবং সারথির পর সারথি নিযুক্ত, আমি কত কত বার করিয়াছি, করিতেছি এবং করিব;—পথ আমাকে চলিতেই হইবে। আমার অতি সুদীর্ঘ পথ এবং শত শত ও সহস্র সহস্র পথ। আমি একাকীই একেবারে শত সহস্র পথে পর্য্যটন করি। আমার নানা আকার, 'নানান' মূর্ত্তি, আমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ,—পৃথক্ পৃথক্ প্রতিমা;—আমার শত শত রকমের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "সুরৎ"; অথচ আমি 'এক'। আমি কোথায়ও প্রবীণ, কোথায়ও নবীন; আমার এক সময়ের এক স্থানের শিশুত্ব, সময়ে বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়া বানপ্রস্থে অবস্থিত; আমি আবার সেই সময়েই হয়ত স্বতন্ত্র স্থলে, সুকুমার-শৈশব, দুগ্ধ-পোষ্য, দুর্ব্বল বালক। সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রিক, লাটিন আদির—আমি এখন সংসারের কর্ম্ম-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে ধ্যান-নিমগ্ন আছি; পৃথিবীর কর্ম্ম-কাণ্ডের বহির্ভূত হইয়া তাহার প্রগাঢ় ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত হইয়াছি; আমার অটল, অনড়, হিমাচল তুল্য বিরাট্-দেহ দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইতেছে, স্তম্ভিত হইতেছে,—আমার অসীমতা অনুভব করিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে; ভয়ে, বিস্ময়ে এবং ভক্তিতে দূর হইতে আমায় পুনঃ-পুনঃ নমস্কার করিতেছে। ঋত্বিক্‌গণ আমার স্তুতিপাঠ করিতেছেন, পণ্ডিতগণ পূজা করিতেছেন;—আমার পূজা করিয়াই পণ্ডিত—'পণ্ডিত' বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। প্রত্ন-তত্ত্ব-ব্যবসায়ী আমার অন্তর্ভেদ করিতে দলে দলে অগ্রসর। তাঁহাদের

আবিষ্কারের আলোকে বা অন্ধকারে, দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ,—প্লাবিত। আমি কিন্তু অচল, অটল, উদাসীন, অবিমুক্ত।

সংস্কৃত—আদির—আমি এখন উদাসীন, অচল। কিন্তু আমার এখনকার একটা আকাঙ্ক্ষা আসক্তিময় সচল-মূর্ত্তি,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দে ঐ ইংরেজি সাহিত্যে। ইংরেজির—এখনকার—আমি অত্যন্ত সচল। তীরবৎ,—তড়িৎবৎ-ছুটিয়াছি। আমার জীবনী শক্তি এবং যৌবনের বেগ উত্তাল-তরঙ্গে, অতিমাত্র তেজে, অনবরত উদ্ভূত হইতেছে; আমি এ মূর্ত্তিতে এখন এত সচল যে, আমার সচলতা, দ্রুতগামী সময়কেও অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়, অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের আবিষ্কার এবং প্রচার করিয়া উনত্রিংশৎ তত্ত্বের অবতারণা করিতেছি। চাঞ্চল্যে আমি সৌদামিনী, গাম্ভীর্য্যে আমি অতলস্পর্শ। তীক্ষ্ণতায় আমি সূক্ষ্মতম হইতেও সূক্ষ্মতরকে স্পর্শ করিতেছি। পরন্তু প্রখরতায় আমি পাবক-তুল্য,—প্রভাবে আমি পবন। সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে আমি "সূচিকাভরণ"; অসীম শ্লেষ্মা-সাগর আমি স্পর্শমাত্রে অগ্নিময় করিয়া তুলি। আমি যাহা ধরি, আগুণ ছুটাইয়া ছাড়ি। হিমগিরির ঐ অনন্ত তুষার-রাশি আমার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে অগ্নি উদ্গিরণ করে। ঐ দেখ, আফ্রিকার মরুভূমে আমি কি করিয়াছি; ঐ দেখ, আমেরিকার অরণ্যে আমার প্রভাব; ঐ দেখ, আলস্যের আবাস-ভূমি ইণ্ডিয়ায় আমার তেজ। আমি বোবাকে অনর্গল বক্তৃতা করাইয়াছি; আমি আদিম কালের উলঙ্গ অসভ্যকে ইঙ্গিতে সভ্যতার উচ্চ সোপানে উত্তোলন করিয়াছি; আমি অদৃষ্টবাদের এবং অধীনতার অনন্ত আকরস্থান, হিন্দুস্থানে আত্ম-শাসন-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি এবং স্থিতি করিয়াছি; সে আকাঙ্ক্ষা বলবতী করিয়াছি, ফলবতী করিয়া তবে ছাড়িব। আমার এ মূর্ত্তির ভিতর হইতে অতি উগ্র মদিরা-স্রোত অনবরত ছুটিতেছে;—আমি এ মদিরায় স্বর্গ মর্ত্ত্য যুগপৎ উন্মত্ত করি,—রসাতলের অভেদ্য অন্ধকার-অভ্যন্তরে রৌদ্র উঠাই,—মুনির তপোবন আমার এ তীব্র মদিরায় লালসাময় হইয়া উঠে;—আমি তামাসা দেখি। কার সাধ্য আমার সুরা-রাগ সংবরণ করে? কার সাধ্য আমার স্পর্শমাত্রে প্রমত্ত না হয়। আমার সংস্পর্শ সংক্রামক, ভোগ-তৃষ্ণা আর বিষয়-বাসনা আমার শিরায় শিরায় শোণিতবৎ ছুটিতেছে;—আমার অক্ষরে অক্ষরে উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা, কে আমার বেগ ধারণ করিতে পারে? ঐ দেখ, আমি ঔদাসীন্যকেও অর্থকর ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছি, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকেও প্রকৃত প্রস্তাবে একটা "প্রফেশন" করিয়া তুলিয়াছি;—সংসারত্যাগী; 'সন্ন্যাসী' "স্বামী" ও "সরস্বতী" বাবাজীদিগকেও দেখ আমি অর্থ-উপার্জ্জনের কিবা অপূর্ব্ব দোকান খুলিয়া দিয়াছি!!! আমি বৈরাগ্যের পায়ে "বুট" পরাইয়াছি, টিকি ভেদিয়া টেড়ী কাটাইয়াছি। "আর্ক-ফলার" অভ্যন্তরে দেখ কিবা অপরূপ ঐ "আলবার্ট-টেড়ি"! আর দেখ, ঐ সম্মুখে গেরুয়া কৌপিনের সঙ্গে কালাপেড়ের সংগোপন-কের্দ্দানী। যেখানে সমীরণ-প্রবেশেরও পথ নাই, সেখানেও আমি 'অন্তঃসলিলা' হইয়া ছুটিয়াছি,—আমার সংক্রামক-বহ্নি সর্ব্বত্রই সজোরে ছুটিয়াছে;—টোলে ও তুলোটেও দেখ আমার আজ কত বড় আধিপত্য। আমি অধ্যাপককে "অঙ্গরক্ষা" পরাইয়াছি, হ্যাট ও পেনটুলান শীঘ্রই ধরাইব। আমার ইংরেজি মূর্ত্তিতে আমি আগুন, আমি উপার্জ্জন, আমি উত্তেজনা, আমি উপভোগ। সমগ্র বিশ্ব-সংসারটা উদরসাৎ করিয়াও আমার পেট ভরে না; আমার আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এ মূর্ত্তিতে আমি ইংরেজি-সাহিত্য, আমার এখন যৌবনাবস্থা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে সংপ্রতি আমার শৈশব। সবে মাত্র "হামা" দিতে শিখিতেছি। আমি প্রায় চারি শত বৎসর হইল জন্মিয়াছি,—কিন্তু আজও আমার ভাল করিয়া বিকাশ হয় নাই। আরবী, উর্দ্দু ও পারসীর পাথারে পড়িয়া আমি বহুকাল বিকলাঙ্গ হইয়াছিলাম। মুকুন্দরাম আমার "ষেটেড়া পূজা" করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র আমার "আটকৌড়ে" করিয়া গিয়াছেন। এই ইংরেজের আমলে—এই সে-দিন সবে আমার 'ষষ্ঠীপূজা" হইয়া গিয়াছে। আমি "হামাগুড়ি" দিতেছি। আমায় লইয়া কত লোকে কত ক্রীড়াই করিতেছে! কত কৌতুকই দেখাইতেছে আমার সম্ভ্রমের বিনিময়ে কত কীর্ত্তিধ্বজাই উড়িতেছে। পোষণের সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর

পেষণও হইতেছে খুব,—কিন্তু এরূপ হওয়া অনিবার্য্য। বালক আমার সঙ্গে খেলা করিতেছে, বৃদ্ধ আমার উপর বিদ্যা প্রকাশ করিতেছে,—যুবক জবরদস্তি করিয়া এক লম্ফে আমাকে আকাশে তুলিতে চাহিতেছে।—আমি ব্যবসায়ীর হাতে কেবলমাত্র বাণিজ্য-পণ্য ব্যতীত আর কিছুই নাই; জালিয়াৎ ও জুয়াচোরেরাও আমার উপর অনেক রকম অনাচার করিতেছে। পোষণ অপেক্ষা আমার পীড়নই হইতেছে অধিক। তা হউক, এরূপ হইয়াই থাকে। পণ্ডিত বলিতেছেন 'আমি ইংরেজী-নবিশের হাতে মরিলাম,' ইংরেজী নবিশ-বলিতেছে, 'পণ্ডিতরাই আমায় মারিল'; উভয়েই কিন্তু একই ওজনে আমার উপর অত্যাচার করিতেছেন। ইংরেজী-ওয়ালার মানয়ারি বাঙ্গালার মত,—ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" ভাষাও আমাকে জর-জর করিতেছে। সুবৃহৎ বহুব্রীহির সন্ত্রাসে আমি শিহরিয়া শত হস্ত সরিয়া দাঁড়াইতেছি; কিন্তু নিদারুণ দ্বন্দ্বসমাস যাইয়া তথায়ও আমার আক্রমণ করিতেছে;—শব্দালঙ্কারভারে সত্যসত্যই আমার প্রাণ এক এক বার "চঞ্চুপুটগত" হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক দিকে এই, আর এক দিকে অজগর ইংরেজী-ওয়ালা "আস্ত আস্ত" ইংরেজী "ইডিয়ম" গুলা আমার গলা টিপিয়া গিলাইতেছে;—কত রকমে যে এ শরীরের "শতেক খোয়ার" হইতেছে, তা আমিই জানি। কিন্তু এত অত্যাচারেও আমি কাতর নই। আমি সটানে সব সহিতেছি। যাহা স্বাভাবিক ও আমার শরীরের উপযোগী, তাহাই কেবল বাছিয়া লইয়া আমি আমার অঙ্গে অঙ্গীভূত করিতেছি, আর যাহা কিছু অসার ও অস্বাভাবিক, তাহা সমস্তই উদ্গার করিয়া ফেলিতেছি। অনেক রকমের বস্ত্রালঙ্কার ও পোষাক্-পরিচ্ছদ লোকে আমাকে দেয়;—কিন্তু তাহা সমস্তই আমি গ্রহণ করি না; যাহা আমার গ্রহণের যোগ্য, তাহাই আমি লই; আর সব অগ্নিসাৎ করি। যাহা আমি পরিপাক করিতে ও পরিধান করিতে অপারগ, তাহার মূল্য, অন্য স্থলে সাত মানিক্য হইলেও আমার নিকট সিকিপয়সাও নয়;—আমি তাহা স্পর্শও করি না। ময়লা মাটীর মত মণি-মাণিক্যের গহনাও আমায় অনেক সময় ভারাক্রান্ত করে,—আমি ময়লা মাটীর সঙ্গে, মণি-মাণিক্যের আবর্জ্জনাও অঙ্গ হইতে ঝাড়িয়া ফেলি। যা আমার অনাবশ্যক ও 'অমানানত' তৎ সমস্তই আমার নিকট আবর্জ্জনা।

আমার কিরূপ হওয়া উচিত আর কিরূপ হওয়া উচিত নয়, তাই লইয়া যত লোকেই যুদ্ধ করিতেছে;—আমি দেখিতেছি আর হাসিতেছি। ভগবান্‌কে যেমন সর্ব্বভূতে স্ব স্ব বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ভগবানের স্বরূপ আত্মানুরূপ দেখে,—আমারও অবস্থা ইদানী কতকটা সেইরূপ। যে যে-রূপ বুঝিতেছে, আমি যেন ঠিক সেইই রূপ,—আমার যে অন্য রকম রূপ আছে আর থাকিতে পারে, সেটা বুঝিতে আজকাল বঙ্গীয় বাবুদের অনেকেরই বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। এজন্য আমি কিঞ্চিৎ কাতর আছি।

আমার অনুগৃহীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ব্যক্তিগত বর্ণ আমার অঙ্গে অঙ্কিত হয় বটে; কিন্তু আমি ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নহি। ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত প্রলাপেরও আমি বিষয়ীভূত নহি। যাহা স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণরূপে শিল্পোপযোগী, তাহাতেই যদি কাহারও ব্যক্তিত্ব থাকে, আমি সোহাগ করিয়া তাহাই স্বশরীরে গ্রহণ করি; নহিলে নাথি মারিয়া ফেলিয়া দিই। আমি অনেকেরই "আত্ম-প্রকাশ" বটি, কিন্তু কাহারই আত্ম-প্রলাপ নহি। হাঁ, আবশ্যক হইলে,—"নিজের নাসাগ্রভাগের সমসূত্র ধরে ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্য্যন্ত একেবারে সোজা লাইনে" চল্‌তে হবে,—কারণ সেটা "সংযম"। সংযম-শিক্ষা না হইলে কোন শিক্ষাই হয় না; শিল্প-সাহিত্য ত দূরের কথা। শিল্পমাত্রেই সংযম সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন,—সাহিত্যেও উহা ষোল আনা প্রয়োজন।

অন্যান্য শিল্পের ন্যায় আমি সাহিত্য,—স্বভাবেরই অনুকৃতি। আমি স্বভাবের অনুকৃতি, কিন্তু কিঞ্চিৎ স্বভাবাতিরিক্তও বটি। স্বভাবাতিরিক্ত বলিয়া আমি স্বভাবের বহির্ভূত নহি। আমি স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত। স্বভাবাতিরিক্ত অর্থে সংসার-ছাড়া নয়। স্বভাবের মাল মশলা লইয়াই স্বভাবাতিরিক্তের সৃষ্টি। যাহা স্বভাবের বহুস্থানে বহুখণ্ডে ছড়ান, তাহার সারাংশ একস্থানে সংগ্রহ ও সামঞ্জস্য-সাধনকে এক অর্থে স্বভাবাতিরিক্ত বলিতে পার। তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিতে যাহা সচরাচর

যা কখনও একাধারে একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই আমার শরীরে স্বভাবাতিরিক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। স্বভাবাতিরিক্ত মানে অস্বাভাবিক নয়, সৃষ্টিরবহির্ভূতও নয়। সৃষ্টি-সম্ভূত ও স্বাভাবিক; অথচ নিয়ত পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির ও স্বভাবের কিছু অতিরিক্ত। এই "অতিরিক্ত" টুকু শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য-সম্ভূত। রূপ, রস, লাবণ্য, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, দোষ, গুণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুন্দর, মনোহর, ভয়ঙ্কর, কুৎসিত এবং কদর্য্য মহতের মহৎ, নীচের নীচ, সংসারে বা স্বভাবে সবই আছে। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় আমি সাহিত্য, সেই "সব" হইতে রকমারি বাছিয়া, বসিয়া, মাজিয়া, কাটিয়া, ছাঁটিয়া, যারপর যেটী বসিলে আমার অঙ্গে মানায়, মানুষের মনে ধরে ও মনের পরিসর বৃদ্ধি করে, সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, অথচ স্বভাবের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বভাবের সামগ্রীগুলি নিজের বক্ষে ধারণ করি। আমার উপকরণের "কাট-ছাঁট" এমনতর হওয়া চাই যে, তাহা একদিকে আমার অঙ্গে মানাইবে ও আর একদিকে স্বভাবের সহিত খাটিবে। এই উভয় দিক্ রক্ষা হইলে, তবেই আমি মানুষের মনের "মানানসই" হই,—কাব্যাদিরূপে কার্য্যক্ষম হই। যাহা স্বভাবের সহিত অখাটন্ত, তাহা অস্বাভাবিক। যাহা অস্বাভাবিক বা অত্যন্ত অতি-স্বাভাবিক, তাহা মানুষের মনে ধরে না, মানুষের মনকেও ধরিতে পারে না। মানুষের মনে ধরে, ও মনকে ধরিতে পারে,—যাহা স্বভাবাতিরিক্ত অথচ স্বাভাবিক। অতএব তাহাই আমার অঙ্গ-বিশেষের উপযোগী।

আমি প্রকৃতির প্রতিলেখ্য, কিন্তু তাহার অবিকল অনুলিপি নহি। আমার অঙ্গভুক্ত করিতে হইলে, লম্বা বিষয় খাট করিয়া লইতে হয়,—আবার সংকীর্ণকেও একটু প্রশস্ত করিতে হয়। অফুটন্তকে ফুটন্ত ও ফুটন্তকে আরও ফুটন্ত করিতে হয়; আবার জ্বলন্তকেও নিবাইতে হয়; উলঙ্গ ও অনাচ্ছাদিতের উপর আচ্ছাদন দিতে হয়। আবার ঐ আবৃত ও অনাবৃত-করণ-প্রণালীকেও সীমাবদ্ধ করিতে হয়।

প্রকৃতির পূর্ণ আলেখ্য লওয়া অসম্ভব,—কারণ লিপিকর অপূর্ণ। লওয়া উপযোগী নয়, তাহারও ঐ কারণ। আমার এই বিরাট্-দেহেও প্রকৃতির প্রকাণ্ড স্থূল শরীর ধরে না। কিন্তু তবুও আমি স্বভাবকে সম্যক্রূপে প্রতিফলিত করি। স্থূল ভাবে নহে,—সূক্ষ্মভাবে আমি প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করি। আমি স্বভাবের "সূক্ষ্ম শরীর"। মানুষের সূক্ষ্ম শরীরে যেমন তাহার স্থূল শরীরের সকল অঙ্গ থাকার বিষয় কথিত আছে, তেমনি আমার শরীরে প্রকৃতির মহা প্রকাণ্ডতাও সূক্ষ্মভাবে প্রতিভাত। সূক্ষ্ম শরীর যেমন স্থূল শরীরের অন্তর্ভূত অথচ অতিরিক্ত, সেইরূপ আমিও স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ স্বভাবাতিরিক্ত।

প্রকৃতির প্রত্যেক পদক্ষেপের পিছু পিছু ছুটিয়া আমি তাহার উনকোটী খুটিনাটি গণনা করি না;—ইঞ্চি ফুট, বট বুরুল মাপিয়া মাপিয়াও আমি কাজ করি না; তাহা করেন, বিজ্ঞান ও দর্শন, তাও বিশেষ বিশেষ স্থলে। কিন্তু তাই বলিয়া বিজ্ঞান ও দর্শন "আমা-ছাড়া" নহেন। এবং বিজ্ঞানও দর্শন-সম্ভূত সত্য মৎপ্রণীত বা মৎ প্রমাণিত সত্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র নহে। যেটা "সত্য" সেটা সর্ব্বত্রই "সত্য"—এক স্থলের সত্য ও অপর স্থলে মিথ্যা নহে। জ্যামিতির সত্য জটিল, জ্যোতিষের সত্য কুটিল, বীজগণিতের সত্য বক্র,—চিকিৎসা-শাস্ত্রের সত্য চক্রাকার, দার্শনিকের সত্য শুষ্ক, কাব্যের সত্য সরস ও স্বতন্ত্র রকমের; এইরূপে সত্যটাকে লইয়া একটা

* সহিত+ষ্ণ=সাহিত্য। শব্দশক্তির সহিত চিন্তা-শক্তির সংযোগকেই সাহিত্য বলি। * * সাহিত্য বলিতে বিস্তর বুঝায়। * * কর্ম্ম-শাস্ত্র, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, যোগ-শাস্ত্র বিয়োগ-শাস্ত্র, কাব্য-কবিতা, গণিত-জ্যোতিষ সকলেই মোটের উপর সাহিত্যেরই অধিকারাধীন। ভাগ-বিভাগ, শ্রেণী, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গাদি ভেদে, সাহিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রযুক্ত হয়।—"সাহিত্য মঙ্গল।"

I use the word Literature, not as opposed to science, but in its larger sense including every thing which is written, taking the term literature in its Primary sense, of an application of lettrs to the records of facts or oppinion. Mure. quoted by T. Buckle in his History of civiligation Sol; I.

হুঁড়োহুঁড়ি করা "ছেলেমো"। কিন্তু আমায় লইয়া ছেলেরা কি আর "ছেলোমো" করিবে না? অবশ্যই করিবে। আমি এ ছেলে-খেলায় খুব সন্তুষ্ট থাকি। বুড়োদের বাঁদরামি অপেক্ষা ছেলে দের ছেলে-খেলাও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তাহাতে আমার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই,—ভবিষ্যতে ইষ্ট হইলেও হইতে পারে।

আমি কাহারও নিকট সধবা, কা'রোও কাছে বিধবা, আমি কখন বিবি, কখনও বৌ, কভু বা বারাঙ্গনা। কিন্তু ফলিতার্থে আমি উহাদের কিছুই নই। আমি সাহিত্য,—সর্ব্ব-ভূতের শোভা। কা'রও মতে, আমার সর্ব্ব-দাই শেমিজ আঁটিয়া থাকা উচিত; কেহ বলেন, সিন্দূর-বিন্দুর উপরে আর এক বিন্দুও আমার উঠা উচিত নয়;—কাহারও আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীর উপর আমার চির কবর হয়; কাহারও রায়, আমি মনু-সংহিতাদির বাঙ্গালা ব্যাখ্যার ভিতর আমরণ কাল অবরুদ্ধ থাকি। একদিকে ব্রাহ্মবেদী ছাড়িয়া পাদমেকং অগ্রসর হইলেই আমি অপবিত্র, আর এক দিকে মুহূর্ত্তেকের জন্য মন্বাদি ছাড়া হইলেই আমার অপমৃত্যু। কবিরা বলেন, কেবল মাত্র জ্যোৎস্নালোক পান করিয়াই আমার জীবন কাটান কর্ত্তব্য; আবার *matter of fact Editor* দের মতে সংবাদপত্রের এক কলমী প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবার জন্যই আমার জন্ম হইয়াছে। এখন বল দেখি তোমরা, আমার উপায় কি? এক স্থানে 'গোঁজ' হইয়া বসিয়া থাকিলে ত আমার কোন ক্রমেই চলে না। আমি থানের ঠেঁট পরিয়া সৈন্ধব লবণ সহযোগে 'সিদ্ধপক্ব' ভোজন অবশ্যই করি, আর তাতে আমার বেশ পরিতৃপ্তিই হয়, পক্ষান্তরে প্রগাঢ় প্লুত স্বরে "পরম পিতা" করতপ করিতেও আমি ষোল আনা সমর্থ;—কিন্তু আবশ্যক হইলে অলক্তক-রঞ্জিত পদে আটগাছা মলও আমাকে পরিতে হয়। নহিলে আসলে আমার অস্তিত্বই থাকে না। আসমানে আবছায়া হইয়া বসন্তের বাতাসে শরতের জ্যোৎস্নালোক পান করিতে করিতেও আমি রক্ত-মাংসের জাজ্বল্যমান শরীরে মর্ত্ত্যলোকে নামি,—নামিয়া কঠিন সংসা-রের সহিত সংগ্রাম করি,—সর্ব্বদাই স্বর্গের সিঁড়ির উপর বসিয়া থাকিলে আমার চলে না; সময়ে সময়ে আদাড় ও আঁস্তাকুড়ে যাইয়াও আমি উঁকি মারি। ঊর্দ্ধে পঞ্চদশীতেও যেমন, নিম্নে পঞ্চরঙ্গেও তেমনি আমি বিদ্যমান। পরন্তু পঞ্চদশী ও পঞ্চরঙ্গ ভিন্ন আরও অনেক স্থলে আমার গতি-বিধি আছে। আমি প্রকৃতির বাহন হইয়া আমার এই শৈশব কালেও "সর্ব্বভূতে রমণ" করি। আমি সর্ব্বভৌমিক—এই সহজ সত্যটুকু তোমরা বোঝ না, এজন্য বস্তুতই আমি বড় ব্যথা পাই।

সাহিত্য।

পাথুরে কয়লা।

যুগ-যুগান্তরের সূর্য্য-কিরণ।

যে সাহেব প্রথম রেলগাড়ীর কল করেন, তাঁহার নাম ষ্টিফেনসন। কলে গাড়ী চলিবে শুনিয়া বিলাতের লোক আশ্চর্য্য হইলেন। অনেকে উপহাস করিলেন; অনেকে বলিলেন,—"ষ্টিফেনসন পাগল, তাহাকে পাগলা-গারদে রাখা উচিত।

এক দিন তাঁহার একটী বন্ধু জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"ষ্টিফেনসন! তোমার গাড়ী টানিতে যদি ঘোড়া চাই না, গরু চাই না, তবে তোমার গাড়ী কি করিয়া চলিবে?"

ষ্টিফেনসন উত্তর করিলেন,—"সূর্য্য-কিরণ আমার গাড়ী টানিবে। যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে রৌদ্র হইয়াছিল, সেই রৌদ্র পৃথিবীর ভিতর কারাবদ্ধ হইয়া আছে। আমি সেই রৌদ্রকে মুক্ত করিয়া আমার গাড়ীতে যুতিয়া দিব। তাহার বলে আমার গাড়ী চলিবে।"

ষ্টিফেনসনের কথা শুনিলে হাসি পায়। কিন্তু তিনি পরিহাস করেন নাই, সত্য কথাই বলিয়া-ছিলেন।

পাথুরে-কয়লার ভিতর সূর্য্য-কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে, পোড়াইলেই বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতেই আলো ও উত্তাপ হয়।

রেলগাড়ীর কলে লৌহ নির্ম্মিত একটী লম্বা পিপার ভিতর প্রচুর জল থাকে। এই পিপাটিকে "বয়লার" বা জল-গরমের হাঁড়ি বলে। ইহার

উপরদিকে একটু আলগা-ভাবে ছিপির ন্যায় একটী লৌহদণ্ড থাকে।

কয়লা পুড়িয়া, তাহার উত্তাপে কলের ভিতর যে জল থাকে, তাহা ফুটিয়া বাষ্পরূপ ধারণ করে। বাষ্প হইয়া বারিকণা সমুদয় আকাশে পলাইবার নিমিত্ত পথ অন্বেষণ করে। বয়লারের ছিদ্রের নিকট যাইয়া দেখিতে পায় যে, একটী লৌহ-দণ্ড পথ যোড়া করিয়া আছে। বাহিরে পলাইবার নিমিত্ত বারিকণাগণ সেই লৌহদণ্ডকে তুলিয়া ধরে। একটু উঠিয়া লৌহ-দণ্ডটী পুনরায় স্বস্থানে নামিয়া পড়ে। আবার বারি-কণারা তাহাকে তুলিয়া ধরে, আবার সে নামিয়া পড়ে। এইরূপ পুনঃপুন লৌহদণ্ডটী উঠিতে ও নামিতে থাকে।

ভাত উথলিয়াও ঠিক এইরূপ হয়। যতক্ষণ না ভাত ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণ হাঁড়ির মুখের সরাটী স্থির হইয়া থাকে। অগ্নির উত্তাপে হাঁড়ির ভিতরের জল যখন বাষ্পরূপ ধারণ করে, তখন আকাশে পলাইবার নিমিত্ত বারি-কণারা হাঁড়ির মুখ হইতে সরাখানিকে ফেলিয়া দিতে যত্ন করে। এখানে সরা খানি যা, বয়লারে লৌহদণ্ডটী তা।

বয়লারের লৌহদণ্ডটী এইরূপে একবার উঠিতে একবার নামিতে থাকে। এই লৌহ-দণ্ডটীর সহিত গাড়ীর চাকার যোগ থাকে। লৌহদণ্ডের উঠা-নামার বলে গাড়ির চাকা ঘুরিতে থাকে। তাহাতেই রেলগাড়ি চলে।

সুতরাং কথা হইল এই—পাথুরে-কয়লার ভিতর সূর্য্য-কিরণ নিহিত আছে। এই সূর্য্য-কিরণের বলে জল বাষ্পরূপে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প সূর্য্য-কিরণের শক্তি পাইয়া লৌহ-দণ্ডকে একবার উঠায়, একবার নামায়। সেই শক্তিতেই রেলগাড়ী চলে।

পাথুরে কয়লা কি?

পাথুরে-কয়লার ভিতর সূর্য্য-কিরণ কি করিয়া আসিল? এখন সেই বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

লৌহের গল্পে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাই-ট্রোজেন, কারবন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া-ছিলাম। তখন, এই নাম গুলি মনে করিয়া রাখিতে সকলকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যাঁহাদের মনে নাই, তাঁহারা পুনরায় লৌহের গল্পটী পড়িয়া লইবেন।

নিশ্বাসের সহিত আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। অক্সিজেন না পাইলে জীব জীবিত থাকিতে পারে না। যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে যাইলে জীব মরিয়া যায়।

কিন্তু নিশ্বাসের সহিত যদি আমরা কেবল খাঁটি অক্সিজেন লই, তাহা হইলে আমাদের শরীরের সমুদয় কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। অন্তরে অন্তরে গুমে গুমে পুড়িয়া আমরা শীঘ্রই মরিয়া যাই। তাই অক্সিজেনের সহিত প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। আমরা যে বায়ুর ভিতর ডুবিয়া আছি, তাহা আর কিছুই নহে; কেবল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুইটী বাষ্পীয় পদার্থ।

আহারের সহিত প্রচুর পরিমাণে আমরা কারবন গ্রহণ করি। নিশ্বাসের সহিত অক্সিজেন যাইয়া শরীরের ভিতর সেই কারবনের সহিত মিশ্রিত হয়। এই দুই বস্তুর মিশ্রণে নতন একটী যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। তাহার নাম কারবনিক অম্ল। ইহা বাষ্প, কঠিন বস্তু নয়। চক্ষে আমরা ইহাকে দেখিতে পাই না। কারব-নিক অম্ল বিষ, অধিক পরিমাণে নিশ্বাসের সহিত লইলে জীব মরিয়া যায়।

প্রাণি-শরীরে যেমনি মুহুর্মুহু কারবনিক অম্ল-বাষ্প প্রস্তুত হয়, তেমনি তাহা প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। কোটি কোটি প্রাণি- শরীর হইতে এইরূপে অহরহ কারবনিক অম্ল বাহির হইতেছে। এ কারবনিক অম্ল যায় কোথা? কারণ, এই সাংঘাতিক বিষ যদি বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে একটী প্রাণীও জীবিত থাকিতে পারে না।

বৃক্ষেরা এই কারবনিক অম্ল গ্রহণ করে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বাষ্প একটী যৌগিক পদার্থ, অর্থাৎ কিনা,—ইহা কেবল অক্সিজেন ও কারবন। পত্রের দ্বারা বৃক্ষেরা কারবনিক অম্লকে টানিয়া লয়। সেইখানে ইহা পরিপাক হয়। বৃক্ষেরা কারবন হইতে অক্সিজেনকে পৃথক্ করিয়া ফেলে। কারবন লইয়া বৃক্ষেরা আপনাদিগের শরীর, অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে। অক্সি-জেনে তাহাদের অধিক আবশ্যক নাই। অক্সি-জেনকে তাহারা ছাড়িয়া দেয়। বিশুদ্ধ অক্সিজেন পুনরায় বায়ুতে প্রত্যাগমন করে।

কিন্তু কারবনিক অম্লকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অক্সিজেন ও কারবনকে পৃথক্ পৃথক্ করা সহজ কথা নহে। রাসায়নিক বল-প্রয়োগ না করিলে একার্য্য সিদ্ধ হয় না। বৃক্ষেরা সেই বল, সেই শক্তি সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষ-পত্রের উপর যখন সূর্য্য-কিরণ পতিত হইতে থাকে, তখন বৃক্ষেরা সেই সূর্য্য-কিরণ গ্রহণ করিয়া, তাহার বলে কারবন হইতে অক্সিজেনকে পৃথক্ করিয়া ফেলে। অক্সিজেন ত বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু কারবন কাষ্ঠরূপে বৃক্ষ-শরীরে রহিয়া যায়। সুতরাং গৃহীত সূর্য্য-বল এই বৃক্ষ-কাষ্ঠে নিহিত থাকে। কাষ্ঠ পোড়াইলে পুনরায় তাহা বাহির হইয়া আলো ও উত্তাপ প্রদান করে।

পুনরায় বলিতেছি, স্থূল কথা এই,—বৃক্ষ-শরীর গুটিকতক ধাতু, কারবন ও গুটীকতক বাষ্প দিয়া নির্ম্মিত। বৃক্ষ-শরীর পোড়াইলে, অদৃশ্য-ভাবে যাহা উড়িয়া যায় ও বায়ুতে গিয়া মিশ্রিত হয়, তাহাই বাষ্প; আর অবশিষ্ট যাহা ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাই ধাতু।

বৃক্ষেরা ধাতু কোথায় পায়? কোথা হইতে ধাতু লইয়া তাহারা আপনাদিগের শরীর নির্ম্মাণ করে?—ভূমিতে ধাতু আছে, মূল দ্বারা বৃক্ষেরা সেই ধাতু ভোজন করে।

বৃক্ষেরা বাষ্প কোথায় পায়? কোথা হইতে বাষ্প লইয়া আপনাদিগের শরীর নির্ম্মাণ করে?—ভূমিতে জল আছে। জল আর কিছুই নয়, কেবল দুটী বাষ্প—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে রাসায়নিক ভাবে যোগ করিলেই জল হয়। মূল দ্বারা বৃক্ষেরা জল পান করে।

বৃক্ষেরা কারবন কোথায় পায়? কোথা হইতে কারবন লইয়া আপনাদিগের শরীর নির্ম্মাণ করে?—মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ প্রশ্বাসের সহিত কারবনিক অম্ল পরিত্যাগ করে। সেই কারবনিক অম্ল বায়ুতে থাকে। মনুষ্যের যেরূপ নাক, বৃক্ষদিগের সেইরূপ পত্র। পত্র দ্বারা তাহারা এই কারবনিক অম্ল নিশ্বাস লয়। নিশ্বাসের সহিত এই কারবনিক অম্ল বৃক্ষ-শরীরে প্রবেশ করে। কারবনিক অম্ল আর কিছুই নয়, কেবল কারবন ও অক্সিজেন।

এইরূপে ভূমি ও বায়ু হইতে বৃক্ষেরা ধাতু, কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পান-ভোজন করে। এতদ্ভিন্ন তাহারা নাইট্রোজেনও অধিক পরিমাণে লইয়া থাকে।

বৃক্ষদিগের পান-ভোজন হইল,—ভূমি ও বায়ু হইতে তাহারা ধাতু, কারবন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পান-ভোজন করিল; কিন্তু কেবল খাইলে হইবে না, এই সমস্ত পরিপাক করিতে হইবে, তবে বৃক্ষ-শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট হইবে; তবে ছাল হইবে; কাঠ হইবে, পাতা হইবে, ফুল হইবে; ফল হইবে।

পরিপাকের নিমিত্ত আর একটী দ্রব্যের প্রয়োজন। সে দ্রব্যটী সূর্য্য-কিরণ,—প্রবল প্রতাপশালী সূর্য্যরশ্মি, যাহা আলোক ও উত্তাপরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়। যখন সূর্য্যরশ্মি বৃক্ষ-শরীরে পতিত হইতে থাকে, তখন অতি আগ্রহের সহিত বৃক্ষেরা ইহা পান করে, ক্রমাগত গিলিতে থাকে। সূর্য্য-কিরণ বৃক্ষ-শরীরে রূপান্তর হয়, আলো ও উত্তাপরূপ পরিত্যাগ করিয়া "শক্তি" রূপ ধারণ করে। এই শক্তির সহায়তায় বৃক্ষদিগের পান-ভোজন পরিপাক হইয়া কাষ্ঠ পত্র, ফুল, ফলে পরিণত হয়।

লর্ড লিটন আপনার কবিতায় লিখিয়াছেন—

"*The wind and the Beam loved the Rose*

"বায়ু ও সূর্য্য-কিরণ গোলাপকে ভালবাসে।"

কেবল তাহা নহে। ঐ যে সুন্দর সুগন্ধময় মনোহর গোলাপটী, তাহা বায়ু ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা গঠিত, এ কথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না।

বৃক্ষেরা সূর্য্য-কিরণ গ্রহণ করিয়া এইরূপে আপনাদিগের শরীরে পরিপাক করিয়া রাখে। "শক্তি" রূপে বৃক্ষ-শরীরে ইহা অদৃশ্য-ভাবে নিহিত থাকে।

তাহার পর কি হয়? তাহার পর কালের বশে বৃক্ষ মরিয়া যায়। কিন্তু বৃক্ষেরা জীবিত থাকিতে যে সূর্য্য-কিরণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আর যায় না; তাহা তাহাদের মৃতদেহে রহিয়া যায়।

তবে হয় এই যে, বৃক্ষদিগের মৃতদেহ হইতে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বাহির হইয়া যাইতে থাকে। বৃক্ষ-শরীর বিশুদ্ধ কারবনে পরিণত হইতে থাকে। কতক পরিমাণে এই সমুদয় দ্রব্য বাহির হইয়া যাইলে, লোকে বলে,—"এ কাষ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে।"

কাষ্ঠ কারবন দিয়াই বিশেষরূপে গঠিত। এই কারবনের ভিতর সেই সূর্য্য-শক্তি সুষুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে। অগ্নি-সংযোগ করিলেই সেই সূর্য্যশক্তি পুনরায় জাগরিত হয়, পুনরায় তাহা আলোক ও উত্তাপরূপ ধারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাহাকেই লোকে বলে যে, "অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে।"

বৃক্ষ-শরীর শুষ্ক হইলেও কারবন ব্যতীত তাহাতে ধাতু, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন রহিয়া যায়। কিন্তু এই বৃক্ষ-শরীর যদি কোনরূপে মাটি-চাপা পড়ে, তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে ইহা হইতে আরও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইতে থাকে। কাঠে আগুন দিয়া, তাহার উপর আল্‌গা আল্‌গা মাটি-চাপা দিয়া, লোকে যাহা করে তাহাই হয়। ক্রমে কয়লা-রূপে পরিণত হয়।

অল্প পরিমাণে অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইলে, উদ্ভিদ-শরীর ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকারূপ ধারণ করে। তাহাকে তখন পিট্‌ (*Peat*) বলে। জলা প্রভৃতি স্থানে যে কাল মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অক্সিজেন-হীন উদ্ভিদ-শরীর। কিন্তু তাহাতে বালুকা প্রভৃতি অনেক ধাতব বস্তু মিশ্রিত থাকে, সজন্য তাহা জ্বালাইতে পারা যায় না। পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে অনেক স্থলে এরূপ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা বাহির হয়, তাহাতে উদ্ভিদের ভাগ অধিক, বালুকা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ কম; সেরূপ পিটকে জ্বালাইতে পারা যায়। আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে দরিদ্র-লোকেরা জলা হইতে এইরূপ পিট কাটিয়া অগ্নি করে, সেই অগ্নিতে রন্ধনাদি-কার্য্য নির্ব্বাহ করে। জলার ঘাস প্রভৃতি কোমল উদ্ভিদ-শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া সচরাচর "পিট" হয়।

মাটি-চাপা পড়িয়া, অক্সিজেন বাহির হইয়া, কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, ঘাস প্রভৃতি কোমল উদ্ভিদ-শরীর "পিট" রূপে পরিণত হয়। ঠিক সেইরূপ অবস্থায় পড়িলে কঠিন কাষ্ঠ "পিট" না হইয়া "লিগনাইট" (*Lignite*) হয়। লিগনাইট ঠিক কাঠের কয়লার মত দেখিতে। লিগনাইটের ভিতর হইতে সর্ব্বদা কারবন ও অক্সিজেন বাহির হয়। কারবন ও অক্সিজেন পৃথক্ পৃথক্ হইয়া বাহির হয় না। পূর্ব্বে যে কারবনিক অম্লের কথা বলিয়াছিলাম, সেই কারবনিক বাষ্প হইয়া বাহির হয়। এই বাষ্প বিষ। কয়লার খনিতে এই বিষ নিশ্বাসের সহিত লইয়া মাঝে মাঝে অনেক মনুষ্য মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া, লিগনাইট হইতে যদি অক্সিজেন বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে লিগনাইটের আকার ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। লিগনাইট আর তখন কাঠের কয়লার মত দেখায় না, তখন ইহা প্রস্তরের মত দেখিতে হয়। সেই জন্য লোকে তখন ইহাকে আর লিগনাইট বলে না; লোকে তখন ইহাকে "পাথুরে-কয়লা" বলে।

পৃথিবীর নানা স্থানে মাটির ভিতর অনেক লিগনাইট আছে। এই লিগনাইট হইতে এখন ক্রমে ক্রমে অক্সিজেন বাহির হইতেছে। তিন চারি সহস্র বৎসর পরে, যখন ইহার ভিতর হইতে অনেক অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইবে, তখন ইহা পাথুরেকয়লা হইয়া মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী হইবে। কিন্তু তিন চারি সহস্র বৎসর সময়টা নিতান্ত অল্প নহে। পোলণ্ড দেশের একটী লোক বলেন যে, "ততদিন আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। সম্প্রতি আমার পাথুরে-কয়লায় প্রয়োজন। কবে লিগনাইট হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া পাথুরে-কয়লা হইবে, সে প্রতীক্ষা করিয়া আমি থাকিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন; পৃথিবীর যেখানে যত লিগনাইট আছে, তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। মাটি চাপা পড়িয়া কাঠ কি করিয়া ক্রমে ক্রমে লিগনাইট হয়, লিগনাইট আবার কি করিয়া ধীরে ধীরে পাথুরে-কয়লা হয়, সে বিষয় তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তদন্ত করিয়া দেখিলেন। তাহার পর লিগনাইটকে একেবারে পাথুরে কয়লা করিবার নিমিত্ত তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। শুনিতেছি, তাঁহার চিন্তা নাকি সফল হইয়াছে। লিগনাইটকে একেবারে পাথুরে-কয়লা করিবার উপায় নাকি তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে পাথুরে-কয়লা আরও সুলভ হইবে।

লিগনাইট হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইলে যে পাথুরে-কয়লা হয়, তাহা অতি উত্তম কয়লা নহে। সে কয়লার ভিতর অধিক পরিমাণে হাইড্রোজেন রহিয়া যায়। সেই হাইড্রোজেন কারবনের সহিত মিশিয়া নানা প্রকার

তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে; যথা,—আলকাতরা, পিচ, পেট্রোলিয়ম বা অপরিষ্কার কেরোসিন তৈল, বিটুমেন ইত্যাদি। সেইজন্য এরূপ কয়লাকে বিটুমিনস্ কয়লা বলে। জ্বলিবার সময় এই কয়লা হইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়।

যদি এই পাথুরে-কয়লা হইতে হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হয়। খনির ভিতর থাকিয়া ইহা হইতে আপনা-আপনি হাইড্রোজেন বাহির হইতে থাকে। হাইড্রোজেন একেলা বাহির হয় না, ইহার সহিত কারবন মিশ্রিত থাকে। সেই জন্য এই হাইড্রোজেন ও কারবন-মিশ্রণে উৎপন্ন বাষ্পকে "কারবনেটেড হাইড্রোজেন" বলে। কলিকাতার রাস্তায় যে গ্যাস জ্বলে, ইহা এই কারবনেটেড হাইড্রোজেন। কোনও কোনও কয়লার খনিতে এই গ্যাস সময়ে সময়ে প্রচুর পরিমাণে একত্রীভূত হয়। কর্ম্মচারীরা যেই সেখানে মশাল লইয়া কাজ করিতে যায়, আর সেই গ্যাস 'দপ' করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহাতে অনেক লোক মরিয়া যায়।

ঘরে গ্যাসের নল থাকিলে, কখন কখন সেই নলে ছিদ্র হইয়া ঘর গ্যাসে পরিপূর্ণ হয়। সে গ্যাস দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা বেলা গ্যাস জ্বালাইবার নিমিত্ত দেশলাই জ্বালাইলেই সেই গ্যাসে আগুন লাগিয়া যায়। আমাদের দেশে ঘরের দ্বার-জানালা সর্ব্বদা মুক্ত থাকে বলিয়া সচরাচর বড় এজন্য বিপদ ঘটিতে শুনা যায় না; কারণ, সেই দ্বার-জানালা দিয়া গ্যাস বাহির হইয়া যায়। কিন্তু বিলাতে দ্বার-জানালা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে, সুতরাং সেখানে ঘরের ভিতর গ্যাস জমিয়া থাকে, আর সেই গ্যাসে আগুন লাগিয়া মাঝে মধ্যে লোক মারা পড়ে। যাহা হউক, গ্যাসের গন্ধ পাইলেই, যেখান হইতে গ্যাস বাহির হইতেছে, সেস্থান বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

বিটুমিনস কয়লা হইতে হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যাইলে, তাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ পাথুরে-কয়লা হয়। সে কয়লাকে অ্যান্থ্রাসাইট্ কয়লা বলে অ্যান্থ্রাসাইট্ কয়লা অনেকটা কোক-কয়লার মত। হাতে করিলে হাতে কালি লাগে না, আর জ্বালাইলে ইহাতে শিখা না হইয়া গন্‌গন্ করিয়া জ্বলে।

মাটি চাপা পড়িয়া এইরূপে কাঠ হইতে ক্রমে ক্রমে পাথুরে-কয়লার উৎপত্তি হয়। কাঠ হইতে লিগ্‌নাইট হয়, লিগনাইট হইতে বিটুমিনস কয়লা হয়, বিটুমিনস কয়লা হইতে ভাল অ্যান্থ্রাসাইট্ কয়লা হয়। কাঠ যতই কয়লা হইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ইহা হইতে অন্যান্য পদার্থ দূরীভূত হইয়া ইহাতে কারবনের ভাগ অধিক হয়। কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—এই তিন বস্তুই কাঠের প্রধান উপকরণ। এই তিন বস্তু শতকরা কিসে কত থাকে, তাহা পশ্চাৎলিখিত তালিকা দেখিলেই জানিতে পারা যায়।

	কাঠে,	পিটে,	লিগনাইটে,	কয়লায়,
কারবন	৫০.০	৬০.০	৬৫.৭	৮২.৬
হাইড্রোজেন	৬.২	৬.৫	৫.৩	৫.৬
ন	৪৩.৮	৩৩.৫	২৯.০	১১.৮
	১০০.			১০০.০

উপরি-উক্ত তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঠে ১০০ ভাগে কেবল ৫০ ভাগ কারবন থাকে, ও পাথুরে কয়লায় ১০০ ভাগে ৮২ ভাগ কারবন থাকে। ভাল অ্যান্থ্রাসাইট্ পাথুরে-কয়লায় কখন কখন ১০০ ভাগে ৯৪ ভাগ কারবন থাকে। আসল কথা,—কয়লা যত বিশুদ্ধ কারবন হইবে, ততই ভাল হইবে। বিশুদ্ধ কারবন না হইয়া কয়লায় যত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি অপর পদার্থ মিশ্রিত থাকিবে, সে কয়লা ততই নিকৃষ্ট হইবে।

বৃক্ষ-শরীর পৃথিবীর ভিতর অবস্থান করিয়া কয়লা হওয়াই কি ইহার রূপান্তরের চরম সীমা? তাহা বোধ হয় না। যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত ইহা আরও পরিশোধিত হইতে থাকে। ইহার রূপ আরও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তখন বোধ হয়, ইহা গ্র্যাফাইট বা কৃষ্ণসীসে পরিণত হয়, যাহা দিয়া উডপেন্‌সিল প্রস্তুত হয়।

বৃক্ষ-কাষ্ঠ কৃষ্ণসীস হইয়াই কি চুপ করিয়া থাকে? তাহা বোধ হয় না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ইহা আরও পরিশোধিত হইয়া বিশুদ্ধ কারবনে পরিণত হইতে থাকে। ইহার রূপ আরও পরিবর্ত্তিত হয়। বোধ হয়, তখন ইহা মহামূল্য, উজ্জ্বল হীরক হয়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বদেশানুরাগ ও স্বধর্ম্মানুরাগ।

একজন উচ্চ-দরের ইংরেজী-শিক্ষিত, প্রসঙ্গক্রমে তারস্বরে এই মর্ম্মে ঘোষণা করিতেছেন;—

"স্বদেশানুরাগ হিন্দুদিগের কখন ছিল না, ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া জ্ঞানও ছিল না। তবে, স্বধর্ম্মানুরাগ ছিল এবং আছে। কিন্তু স্বধর্ম্মানুরাগ, অপেক্ষা স্বদেশানুরাগ উত্তম; ইংরেজদিগের স্বদেশানুরাগ প্রবল, তাই তাঁহারা প্রধান, আর আমাদের তাহা নাই বলিয়া এবং কখন ছিল না বলিয়া আমরা অর্থাৎ হিন্দুজাতি স্বধর্ম্মানুরাগী হইলেও অবনত। স্বধর্ম্মানুরাগ এবং স্বজাতি-অনুরাগ একই কথা।"

কথাটী আলোচনীয় হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র—অনুসারে বিবেচনা করিলে বলিতে হয় কথাটী আলোচনীয়।

প্রথম দেখাযাক্, কথাগুলির তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে—

"স্বদেশের জন্য স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম অপেক্ষা স্বদেশ শ্রেষ্ঠ। আমরা যদি উন্নতি অভিলাষ করি, তবে ধর্ম্মকে সাগর পারে পাঠাইতেও সঙ্কুচিত হওয়া আমাদের উচিত নহে। আমরা হিন্দু থাকি, বা খ্রীষ্টান হই, আমরা এই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান কি নাস্তিক হই, তাহাতে কিছু যায় আসে না, উন্নত হইতেই হইবে।"

উক্ত-ভাবময় বাক্‌প্রপঞ্চে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় আলোচনীয়।

১। স্বদেশ কাহাকে বলে?

২। কোন্ দেশ ইংরেজের স্বদেশ?

৩। কোন্ দেশ আমাদের স্বদেশ? ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান আমাদের ছিল কি না?

৪। ভারতবর্ষের প্রতি ব্যাপকভাবে আমাদের অনুরাগ ছিল কিনা?

৫। ইংরেজ এবং আমরা—উভয়ের মধ্যে অধিক স্বদেশানুরাগী কোন্ জাতি?

৬। স্বদেশানুরাগ ও স্বধর্ম্মানুরাগের মধ্যে কোন্‌টী উত্তম?

৭। স্বধর্ম্মানুরাগ অপেক্ষা অধিক স্বদেশানুরাগে আমাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট—কি হইতে পারে? *

১। বহুনগর গ্রামাদিযুক্ত ভূভাগকে দেশ বলা যায়; শাস্ত্রমতে যেমন ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্যদেশ বঙ্গ ইত্যাদি, † ইংরেজী ভূগোলমতে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন—প্রদেশ এবং মহাদেশও দেশপদ-বাচ্য।

প্রথমোক্ত দেশের অপেক্ষা ক্ষুদ্র জনপদকে প্রদেশ বলা যায়। কতকগুলি দেশে এক মহাদেশ হয়।

মহাদেশ সংজ্ঞা আধুনিক। এখনকার মহাদেশের নাম পূর্ব্বে ছিল,—'বর্ষ' ইত্যাদি। ইংরেজের মতে যেমন,—ইউরোপ মহাদেশ; ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বহুদেশ লইয়া এই মহাদেশ গঠিত। শাস্ত্রমতে, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি বহুদেশ লইয়া ভারতবর্ষ গঠিত।

ইংরেজী মতে ভারতবর্ষ মহাদেশ না হইলেও শাস্ত্রমতে মহাদেশ স্থানীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাদেশও দেশপদ-বাচ্য। 'স্বদেশ' শব্দে নিজের দেশ। দেশে যে নিজত্ব ব্যবহার হয়, তাহা দেশ-কালাদি ভেদে পূর্ব্বাপর যেমন চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে জানিবে। স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে, অনেক দিন ধরিয়া পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে যে দেশের অন্তর্গত কোন স্থানে বসবাস করা যায়, তাহাই স্বদেশ। আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীর স্বদেশ আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্তবাসীর ব্রহ্মাবর্ত্ত; ইংলণ্ডবাসীর স্বদেশ ইংলণ্ড, ফ্রান্সবাসীর ফ্রান্স ইত্যাদিই স্বাভাবিক ব্যবহার। আর প্রদেশ, মহাদেশ লইয়াও স্বদেশ-ব্যবহার আছে। যেমন, কলিকাতা-প্রদেশের লোক, ঢাকায় বসিয়া ঢাকাকে বিদেশ ও কলিকাতা-প্রদেশকে স্বদেশ বলেন—এরূপ সচরাচর দেখা যায়; অথচ কলিকাতা ও ঢাকা—উভয় প্রদেশই

* আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত 'আমাদের' ও 'আমরা' উভয় শব্দেই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বুঝিবে। বলা বাহুল্য, আমাদের এখন স্বদেশানুরাগ, স্বধর্ম্মানুরাগ—কিছুই নাই বলিলেই হয়।

† "সরস্বতী-দৃষদ্বতোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"
ইত্যাদি। মনু ২য় অঃ

বাঙ্গালা-দেশের অন্তর্গত। এই গেল, প্রদেশ-ঘটিত স্বদেশ-ব্যবহারের কথা।

আবার ইউরোপে বসিয়া বা প্রাচীন হরিবর্ষে বসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলিয়া ব্যবহার করা যায়। তথায় একজন আর্য্যাবর্ত্তবাসী এবং একজন ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী উভয়েই স্বদেশীয় বলিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়। এই গেল, মহাদেশ-ঘটিত স্বদেশ-ব্যবহারের কথা।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, অবস্থাভেদে এক 'স্বদেশ' শব্দ স্বপ্রদেশ, স্বদেশ এবং স্বমহাদেশ এই তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অর্থ-কল্পনা করা এখন নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

২। ইংরেজশব্দে পুরুষানুক্রমে ইংলণ্ডবাসী অথবা এই রকম একটা কিছু বিশেষার্থ-বোধক জাতি।

স্বদেশ শব্দের যে অর্থ উপরে বিবৃত করা হইয়াছে, তদনুসারে, ইংরাজ জাতির স্বদেশ—ইংলণ্ডের প্রদেশ-বিশেষ, ইংলণ্ড এবং ইউরোপ।

৩। 'আমাদের স্বদেশ' নির্ণয় করিতে হইলে, 'আমাদের' কথাটার অর্থ বুঝিতে হয়। আভাস-মাত্র পূর্ব্বে দিয়াছি। আমাদের অর্থে সমুদয় হিন্দুজাতির পূর্ব্বপুরুষদিগের—বুঝিবে। এ অর্থে 'আমাদের' পদ প্রয়োগ করায় যদি কিছু দোষ হইয়া থাকে, ত তাহা আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি। এ বিচারে 'আমাদের' কথা বলিতে বড় সক হইয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্ত-দেশের অন্তর্গত মিথিলা প্রদেশ-বাসী—'আমাদিগের' স্বদেশ,—মিথিলা, আর্য্যাবর্ত্ত এবং ভারতবর্ষ। ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশান্তর্গত প্রদেশবাসী—'আমাদিগের'ও ঐরূপ নিয়মানুসারে 'স্বদেশ' বুঝিবে।

ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর দেশকে যদি বস্তুগত্যা 'নস্যাৎ' করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণ উড়াইয়া দিতেন, বা অপর দেশের সত্তা অবগত না হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ—প্রকৃতপক্ষে স্বদেশ-পদবীতে উত্থান করিতে পারিত না,—ইহা ঠিক বটে; কিন্তু "বিস্ মোল্লায় গলদ!" পূর্ব্বপুরুষগণ অপর দেশকে উড়াইয়াও দেন নাই, অপর দেশের অস্তিত্বও অবগত ছিলেন।

বলিলে হয় ত হাসিবে,

বরং এখনকার অপেক্ষা—ইংরেজদিগের অপেক্ষা, পূর্ব্বপুরুষগণ, অনেক অধিক দেশের কথা বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের পৃথিবী বরং আরও অনেক অধিক বিস্তৃত ছিল। এই আমলেই সে সব দেশকে 'নস্যাৎ' করিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; পৃথিবীকেও নিতান্ত ছোট করা হইয়াছে। এই দেখ, শাস্ত্র বা পূর্ব্বপুরুষগণ বলিতেছেন,—"পৃথিবী সপ্তদ্বীপা; তন্মধ্যে সর্ব্ব-ক্ষুদ্র দ্বীপ হইল,—জম্বুদ্বীপ; জম্বুদ্বীপ নয় ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ 'বর্ষ' নামে অভিহিত; তন্মধ্যে অন্যতম বর্ষ হইল,—এই ভারতবর্ষ।" অপরাপর 'বর্ষ' গুলিরও বিশেষ বিবরণ শাস্ত্রে আছে তৎসমুদয়ের উন্নতির কথাও আছে। তথাপি কেমন করিয়া বলিব, পূর্ব্ব-পুরুষগণ, অপর দেশকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন?

পূর্ব্বপুরুষগণের ধারণা-অনুসারে বলা যায়,—শুধু ভারতবর্ষ কেন,—ভারতবর্ষের নয়-গুণ অধিক বিস্তৃত—ভারতবর্ষের আশ্রয়—জম্বুদ্বীপও অপর দ্বীপের প্রতিযোগে, স্বদেশ বলিয়া গণ্য; সুতরাং নিঃসংশয়ে ইহা বলিতে পারি যে, "সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের ব্যাপক-ভাবে স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান ছিল।"

ইংরেজেরা যে হিসাবে ইউরোপকে স্বদেশ বলেন, সে হিসাবে আমরাও ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিতে পারি। ইহা বলাই বাহুল্য।

৪। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" "জননী এবং জন্মভূমি অর্থাৎ স্বদেশ স্বর্গাপেক্ষাও অত্যুচ্চ।" ভারতবর্ষ স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। দেব-গণও এইস্থানের প্রশংসা করেন; "ধন্যা নরা ভারতভূমি-জাতাঃ" ইত্যাদি বলিয়া দেবগণেও ভারতীয় মানবমণ্ডলীর গুণগান করেন।

ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ১৯শ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—

'এতদেবহি দেবা গায়ন্তি'
"অহো বতৈষাং কিমকারিশোভনং
প্রসন্নএষাং স্বিদুত স্বয়ংহরিঃ।
যৈর্জ্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ।"

"কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারত-ভূজয়ো বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতংমনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদংহরেঃ।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ, "ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম যে সর্ব্ব-পুরুষার্থের সাধক—ইহা দেবতারাও কীর্ত্তন করেন। দেবতারা বলেন, আহা! যাহারা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এই সকল মনুষ্য পূর্ব্বজন্মে কি উত্তম সৎকার্য্যই করিয়াছে! অথবা ভগবান্ হরি, নিজেই তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন। কেননা এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ, হরি সেবার উপযোগী। আমরাও এই স্থানে জন্ম গ্রহণ কামনা করি।

কল্পান্তজীবী হইয়া স্বর্গাদি ভোগ করা অপেক্ষা স্বল্পজীবন ভারতের-মনুষ্য হওয়া উত্তম। কেননা, স্বর্গ হইতে কখন না কখন পতন আছেই; কিন্তু ভারতে একবার সন্ন্যাস করিতে পারিলে শ্রীহরির নিত্য অভয় পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যাঁহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস এবং এইরূপ উক্তি; ভারতবর্ষের প্রতি ব্যাপকভাবে তাঁহাদিগের যে অনুরাগ ছিল, তাহা কি আর বিচার করিয়া বুঝাইতে হইবে? এই "যাঁহারা" এবং "তাঁহারা" আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ।

৫। এ সময়ে এরূপ বিতর্ক করিতে অবশ্য লজ্জা বোধ হয়। কোথায় স্বদেশানুরক্ত স্বদেশের প্রিয়-সন্তান ইংরেজ-জাতি; আর কোথায় স্বদেশানুরাগহীন, পরপদ-দলিত বর্ত্তমানকালীন হিন্দুজাতি! এ উভয়ের তুলনা করাও এ সময়ে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কিনা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ও-সব "আমরা"—এখনকার 'আমরা' নহি।

যে সময়ে যে জাতির উন্নতি থাকে, সে সময়ে সে জাতির স্বদেশানুরাগ থাকিবেই। তবে, দেশ, কাল, পাত্রভেদে অনুরাগের তারতম্য থাকিতে পারে। এখন দেখা যাক, আমাদের অনুরাগ,'তর' অথবা 'তম'—কি ছিল? কিন্তু বিচক্ষণমাত্রেই আমাকে এখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিবার জন্য স্থূলদর্শী বলিতে পারেন। কেননা, পূর্ব্বেই একরূপ এ প্রশ্নের উত্তর হইয়া গিয়াছে। স্বদেশকে স্বর্গাপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া বিশ্বাস,—হিন্দুপূর্ব্বপুরুষ ভিন্ন আর কোন্ জাতির আছে? বিশেষতঃ যে দেশে দেবতারা আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, অন্ততঃ হিন্দুর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস,—সেই স্বদেশের প্রতি উন্নত প্রাচীন হিন্দুজাতি কতদূর অনুরক্ত হইতে পারেন, তাহা উপমা দ্বারা বোধনীয় হইতে পারে না। আজ, "বাঙ্গালীর দেখিয়া খোট্টা হাসে; খোট্টার দেখিয়া বাঙ্গালী হাসে; পঞ্জাবীর দেখিয়া মাহারাষ্ট্রী হাসে, মাহারাষ্ট্রীর দেখিয়া পঞ্জাবী হাসে" বলিয়া পূর্ব্বেও স্বদেশানুরাগ ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। পূর্ব্বেও দুই এক বিষয়ে এসম্বন্ধে প্রমাণ পাইলেও তাহাতে স্বদেশানুরাগ নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ইউরোপ,ফ্রান্সবাসীরও স্বদেশ, ইংলণ্ডবাসীরও স্বদেশ; তাই বলিয়া, ইংলণ্ডে কি এমন কোন একটীও বিষয় নাই যাহা দেখিয়া ফরাসী হাস্য না করে, অথবা ফ্রান্সে এমন কোন একটীও বিষয় নাই, যাহা দেখিয়া ইংরেজ হাস্য না করে? পরস্পরের হাস্য-পরিহাস সর্ব্বত্রই আছে। তাহাতে কি হইল? বরং এরূপ হাস্যেও অনেকটা স্বদেশানুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিবেচনা কর, স্ব-মহাদেশে যে ব্যাপকভাবে অনুরাগ জন্মে, তাহার কারণ, স্বপ্রদেশ বা স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ। উক্তরূপ হাস্য-পরিহাস, তাহার অ-শিক্ষা-মার্জ্জিত ফল। হাস্য-পরিহাস ত সামান্য কথা!— এক মহাদেশের অন্তর্গত দেশ-প্রদেশে যুদ্ধাদিও হইয়া থাকে। ইহা ত নিত্য ঘটনা। 'রুষ-পোলাণ্ড' 'ফ্রান্স-জর্ম্মান'—এমন কত শত যুদ্ধ ইউরোপেও পূর্ব্বকালাবধি হইয়া আসিতেছে। এ দেশেও অনেক হইত। কি স্বদেশানুরাগ কাহারও নাই স্থির করিতে হইবে? তাহা নহে। প্রত্যুত ইহাও স্বদেশানুরাগের পরিচয়। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যখন মহাদেশও স্বদেশ-পদবাচ্য, তখন সেই মহাদেশের অন্তর্গত দেশে-দেশে বিরোধকে বা প্রদেশে-প্রদেশে বিরোধকে যেমন এক প্রকারে স্বদেশানুরাগের পরিচায়ক বলা যাইতেছে, সেইরূপ অপর প্রকারে স্বদেশ-দ্বেষের ও পরিচায়ক বলা যায় না কেন?

এ আপত্তির উত্তর, যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য। যুধিষ্ঠির এক স্থলে বলিয়া ছিলেন,—

তে শতানি বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ শতানিচ।

আমাদের এবং দুর্য্যোধনাদির যখন পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন, আমরা পাঁচ ভাই, এক পক্ষে এবং তাহারা শত ভ্রাতা এক পক্ষে। কিন্তু যখন পরের সঙ্গে যুদ্ধাদি হইবে, তখন আমারা সকলেই এক; আমরা তখন এক শত পাঁচ ভাই এক পক্ষ।

এখানেও তাহাই জানিবে; এক মহাদেশের

অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পর সংঘর্ষে দেশের অনুরাগই স্বদেশানুরাগ। এক মহাদেশের অন্তর্গত এক-দেশ এবং অপর প্রদেশের সংঘর্ষ স্থলেও স্ব-স্ব-দেশ-প্রদেশানুরাগই স্বদেশানুরাগ; এরূপ স্থলে মহাদেশানুরাগ থাকে না; থাকিলেও তাহাকে অনেকে দেশানুরাগ বলেন না।

ইউরোপের পোলাণ্ড অধিকারে এই দেশানুরাগ বিশেষ রূপে অভিব্যক্ত। আবার ভারতবর্ষে মিবার ও হার রাজ্যের যৎকিঞ্চিৎ সংঘর্ষে হারদিগের এইরূপ স্বদেশানুরাগ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

যখন, দুই মহাদেশের সংঘর্ষ, তখনই স্ব স্ব মহাদেশানুরাগ স্বদেশানুরাগ-পদবাচ্য।

মুসলমানগণ যখন ভারতাক্রমণে উদ্যোগ করেন, তখন এবং গ্রীকবীর আলেক্জাণ্ডারের ভারতাক্রমণ-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের এ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। এই সময় ভারতবাসীদিগের ব্যাপক ভাবে স্ব মহাদেশানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বদেশানুরাগের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন যদি কেবল সংগ্রাম রূপ সত্যবাদী সাক্ষীর সাহায্যে মীমাংসিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা স্বদেশানুরাগ বিষয়ে অপর কোন জাতি অপেক্ষা হীন ছিলাম না এইটুকু বলিতে পারি। কিন্তু ইহা অপেক্ষা উচ্চসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। বস্তুতঃ সম্ভবমত, স্বপ্রদেশ, স্বদেশ এবং স্বমহাদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই স্বদেশানুরাগের লক্ষণ। দেশ পরাধীন হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় না, এই জন্য স্বাধীনতা রক্ষার্থ যুদ্ধ করা উচিত। এইরূপ যুদ্ধই প্রকৃত প্রশংসনীয় যুদ্ধ। নতুবা দৈশিক উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল অন্ধ অহঙ্কার বশে স্বাধীনতা রক্ষার্থ যে জন সাধারণের যুদ্ধ তাহা পবিত্র হইলেও অনুকরণীয় নহে। উজ্জ্বল হইলেও দেশের অন্ধকার-নাশক নহে। সত্য কথা এই যে, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া স্বদেশের জন্য এই প্রকার জনসাধারণের যুদ্ধ যদি স্বদেশানুরাগের পূর্ণ পরিচয় হয়, তাহা হইলে, ইংরাজ বা ইউরোপীয় জাতি আমাদিগের অপেক্ষা কিছু অধিক স্বদেশানুরাগী হইবে। কিন্তু স্বদেশানুরাগের লক্ষণ ঐরূপ কদাচ নহে; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দেশের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সাধনই যদি স্বদেশানুরাগের লক্ষণ হয় ত আমরাই ইংরেজ অপেক্ষা অধিক স্বদেশানুরাগী ছিলাম। হাস্য করিও না, শুন বলিতেছি।

৬। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সকল সমাজেই শ্রেষ্ঠ। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম্মানুরাগ সম্পন্ন হইলে সমাজও শ্রেষ্ঠ হয়। কল কৌশল-উদ্ভাবন, বাণিজ্য-নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য এবং নীতি, উন্নতির হেতু হইলেও তাহার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকিলে স্থায়ি-উন্নতি-সাধনে সক্ষম হয় না। মূল কথা এই যে, ধর্ম্মই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রধান হেতু। কাজেই মূলে ধর্ম্মানুরাগ না থাকিলে, স্বদেশানুরাগী হওয়া যায় না। সুতরাং স্বদেশানুরাগ ও স্বধর্ম্মানুরাগ দুইটী বিরুদ্ধ জিনিশ নহে। একটী থাকিলে যে আর একটী থাকিতে পারে না এরূপ নহে; বরং স্বধর্ম্মানুরাগ না থাকিলে, প্রকৃত স্বদেশানুরাগই থাকিতে পারে না।

যাহাকে, তুমি-আমি প্রবল স্বদেশানুরাগ বলিতেছি, ধর্ম্মানুরাগ-মূলক না হইলে তাহা ও প্রকৃত-স্বদেশানুরাগ নহে ইহা নিশ্চিত জানিবে। এবং এই জাতীয় স্বদেশানুরাগীর অদূরবর্ত্তী অধস্তন পুরুষ, উক্ত বাক্যের সারবত্তা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

স্বদেশানুরাগের মূল বলিয়া স্বধর্ম্মানুরাগকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়।

যদি এ পক্ষ পরিত্যাগ করা যায়, তথাপি বলা যাইতে পারে, আমাদের পক্ষে স্বধর্ম্মানুরাগই উত্তম।

৭। বিভিন্ন জাতির শাসনে আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না, এই ধারণা স্বধর্ম্মানুরাগের ফল। এই ধারণাই মুসলমানরাজ্য উন্মূলনের হেতু। সুতরাং পরাধীনতার পরম শত্রু বলিয়া যাঁহারা স্বদেশানুরাগের ভক্ত, আমাদের পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ স্বধর্ম্মানুরাগকেও তাঁহারা কেন শ্রদ্ধা না করিবেন? আবার পারিবারিক ব্যবহার, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সামাজিক ব্যবহার, সচ্চরিত্রতা এবং রাজনীতি প্রভৃতি সমাজোপযোগী যাহা কিছু, তৎসমুদয়ই আমাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধ। অতএব এই ধর্ম্মানুরাগ তত্তদ্বিষয়েও প্রকর্ষ-লাভের কারণ। পরন্তু আমরা যদি ধর্ম্মানুরাগ ছাড়িয়া দেশানুরাগী হইতাম, বা এখনও

হই, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত অপকার হইত এবং হয়। এই ক্ষতিটুকু জানিবার জন্য একটী প্রশ্ন করিতেছি?

"আমরা যদি একেবারে সবংশে রসাতলে বা সাগর-মধ্যে প্রবেশ করি এবং পৃথিবীর অপর দেশের কোন জাতি এদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন, তাহা স্বদেশানুরাগিগণ, হৃষ্ট-চিত্তে অনুমোদন করিতে পারেন কি না?"

এক অতিবড় দুঃখে কেহ বলিতে পারেন,—"অনুমোদন করি" কিন্তু সে তপ্ত-নিশ্বাসপূর্ণ বিলাপ-বাক্য শুনিতে ইচ্ছা নাই। ফল কথা তাহা কাহারও স্বীকার করা সম্ভাবিত নহে। ধর্ম্মানুরাগ ত্যাগ করিলে, শেষে কিন্তু এ দেশের উন্নতি—যদি হয়, তাহাও—বিভিন্নজাতি-কৃতবৎ হইবে। তাই বলিতেছিলাম, স্বধর্ম্মানুরাগই আমাদের সম্মত হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বকালে এদেশে অপর-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কম ছিল,—ছিলনা বলিলেই হয়। যাহারা ছিল, তাহাদিগকে লইয়া আর দেশ ছিল না। সুতরাং এক—ধর্ম্মানুরাগেই সমুদয় ভারতবর্ষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তাহাতে আর প্রাদেশিক আত্যন্তিক অনুরাগ-নিবন্ধন প্রজা-সাধারণের মনঃক্ষোভ-সম্ভূত যুদ্ধ-বিগ্রহে উভয় প্রদেশের ধ্বংস বা উৎকট ক্ষতি হইত না। ইহা দেশের পক্ষে একটা খুব লাভের কথা! এই জন্যই ইউরোপে এরূপ যুদ্ধ, ইতিহাসের অনেক পত্র বিস্তৃত করিয়াছে; পক্ষান্তরে আমাদের দেশে এরূপ যুদ্ধ নাই বলিলেই হয়।

দেশানুরাগের শুভফল, ধর্ম্মানুরাগ দ্বারাও পাওয়া যায়। অশুভ ফল কিন্তু ধর্ম্মানুরাগে নাই। সুতরাং বলিতে পারি,—ধর্ম্মানুরাগ উত্তম। তবে বর্ত্তমান সময়ে কোন্ অনুরাগে উন্নতি হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য বটে। সে বিবেচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করা যাইবে।

মন্তব্য।

অপর জাতির দেশানুরাগের মূল,—অভিমান। আর, সকল জাতিরই ধর্ম্মানুরাগের মূল দৃঢ় সংস্কার এবং পবিত্র বিশ্বাস। আমাদিগের ধর্ম্মানুরাগই দেশানুরাগপ্রভৃতির হেতু এবং সর্ব্বতোভাবে উন্নতিকর। আমাদের ধর্ম্মানুরাগ নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই আমরা সর্ব্বতোভাবে অধঃপতিত হইয়াছি। শুধু দেশানুরাগে স্ব স্ব কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করা যায়; সমুদয় দেশের উপকার তত করা যায় না। যাহাদের দেশ লইয়া জাতি, তাহারা দেশানুরাগী হউক; আর যাহাদের ধর্ম্ম লইয়া জাতি, তাহাদিগকে ধর্ম্মানুরাগী হইতে হইবে। জাতির উন্নতিতে দেশের উন্নতি; গাছ-পাথরের উন্নতিতে দেশের উন্নতি নহে। আমাদের জাতীয় উন্নতির মূল,—স্বধর্ম্মানুরাগ। আমরা যতদিন স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলাম, ততদিন সম্পূর্ণ উন্নত ছিলাম। আমরা স্বধর্ম্মানুরাগও হারাইয়াছি, উন্নতিও দূরে গিয়াছে। আমাদের, ব্যাপকভাবে স্বদেশানুরাগ, স্বধর্ম্মানুরাগেরই ফল—ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

লতা-উর্ব্বশী *

বা

মিলন-রহস্য।

(১)

"আমি আকুল পরাণে, লতিকা হইয়া
কতকাল রব আর,
মোর হিয়ার মাঝারে, উঠিছে উথলি'
দারুণ শোকের ভার।
দেখ, পিশাচী স্মিরিতি, মথিছে হৃদয়,
হরিছে সকল জ্ঞান,
সে যে দারুণ আঘাত, নারি সহিবারে,—
গেল গেল বুঝি প্রাণ।

* পুরূরবা ও উর্ব্বশীর বিবরণ আমাদিগের অনেক পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ মৎস্য-পুরাণে উর্ব্বশীর লতা-পরিণতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস তদবলম্বনে, "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক যে নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার চতুর্থাঙ্ক পাঠ করিলে সকলে লতা-উর্ব্বশীর প্রকৃত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

ছিনু স্বরগ-রমণী, সুর-সোহাগিনী,
ইন্দ্রের আদরে মাখা,
শেষে হইল আমার, লতা-পরিণতি,
এই কি কপাল-লেখা!
কেন হেরিয়া সে মুখ, পতিব্রতা-ভরা-
আপনা ঢালিয়া দিনু,
আমি না জানি কেনবা, পুরূরবা সনে
পরাণে মিশিয়া গেনু।
পুনঃ অভিমান ভরে ছাড়িয়া সে পদ,
হয়ে পাগলিনী প্রায়।
এই কুমার-কানন, করিনু লঙ্ঘন
লতিকা হইতে হায়!
কোথা দেবযোনি ছিনু, কোটী অধঃস্তরে
পড়িলাম শেষে আসি,
ছাড়ি' মানব-জনম, পশু, পক্ষী, কীট
হয়ে নিয়তির দাসী।
সে যে দেবের দুর্লভ, পবিত্র প্রণয়,
আমি কেন পাব তারে,
হায় মুকুতা-মণির, আদর বানরে
কভু কি বুঝিতে পারে?
ছাই অভিমানে আমি, করেছি মলিন
সেই সে পবিত্র নিধি,
এবে সহিতেছি সদা, যা'মোর কপালে
লিখেছে দারুণ বিধি।
প্রেম লভিতে হইলে, আপনা হারায়ে
পরেতে মিশিতে হয়,
তার অভিমান যার, সে বল কেমনে
তাহারে পাইতে চায়?
মম পুড়িছে পরাণ, কত দিন বল,
রহিব কানন-মাঝে,
আর পারিনা সহিতে, হৃদয়ে সতত
নিদারুণ শেল বাজে।

(২)

"আমি শুনিয়াছি,—নাকি, লতা জনমের
নাহি স্ফুট 'অনুভূতি',
তবে অন্তস্থলে কেন, জাগিছে চেতনা
জাগিতেছে আশা-স্মৃতি?
কেন সুখ দুখ তবে উঠিছে, মিলিছে,
দহিতেছে অবিরত?
আমি ইন্দ্রিয়-বিহীন, তবু বাহ্য-জ্ঞান
কেন না হইল গত?

যথা গরভের মাঝে, সুপ্ত আত্মা থাকি,
বিশ্বের সঙ্কেত পায়,
মোর অন্তর-মাঝারে, সেই মত কেন
বাহ্যজ্ঞান আসে, যায়?
দূরে মন্দাকিনী-বালা, কুল কুল স্বরে
মধুর গাহিয়ে যায়,
মরি বুকের মাঝারে, ভাঙ্গা মেঘ-ছবি
কেমন শোভিছে হায়!
আহা! অলকা হইতে, আনন্দের রোল
আসিতেছে ক্ষীণস্বরে!
শুনি' সে রব মধুর, হৃদয় আমার
উঠে দুরু দুরু ক'রে।
সাদা মেঘখানি ছোট, যাইতে যাইতে,
ফেলি' দুই ফোঁটা জল,
দেখ, ভিজায় আমার, বিশুষ্ক শরীর
করে প্রাণ সুশীতল।
উঠি, রামধনু বাঁকা, হাসিয়ে ক্ষণেক
আপনি মিলায়ে যায়.
কাল মেঘের বুকেতে সৌদামিনী বালা
চমকি' চমকি' ভায়।
পিক, তমাল-পল্লব- -মাঝারে বসিয়ে
বর্ণে বর্ণ মিশাইয়ে,
যেন তার কণ্ঠরূপে, অবিরত সাড়া
দেয় প্রাণ কাঁপাইয়ে।
মোরে উদাস করিয়ে, উদাস পাপিয়ে,
নিশিতে কাঁদিয়া উঠে,
ভাসে সুধা-মাখা চাঁদ, আকাশ সাগরে
জোছনার হাসি ফুটে,
নব বধূটীর মত, মাঝের তারাটী
চুপি চুপি মোরে হেরে,'
যেন প্রেমের প্রথম, বিকাশ, মরিরে
অপরে জানিতে নারে।
আসি' মলয়-সমীর, ঈষৎ দোলায়
এই অভাগীর শিরে,
আমি চমকি' অমনি, উঠিয়া তাহায়
আর নাহি পাই ফিরে।
কত কুসুম-বালিকা, আধ-ফোটা হ'য়ে
পাতার মাঝারে বসি',
ঢালে উদার সমীর, প্রশান্ত হৃদয়ে
স্নিগ্ধ সৌরভের রাশি।
ছুটি' ভ্রমর-নিকর, করিয়া ঝঙ্কার
আসে চলে মোর পানে,

শেষে হেরিয়া আমায়, কুসুম-বিহীন
ফিরে যায় ক্ষুণ্ণ-মনে।
গেছে ইন্দ্রিয় সকল, তবু এই সব
কেন হয় বাহ্য-জ্ঞান।
মোর অঙ্গ যে সহেনা, দহিতেছি সদা
যাবে নাকি পোড়া প্রাণ!

(৩)

একি! পাগলের পারা, কে ওই পুরুষ
করিতেছে ছুটাছুটি!
আহা! কভুবা উঠিছে, আবার কভুবা
ভূতলে পড়িছে লুটি'
মরি নাজানি উহার, কোমল পরাণে,
কি শেল বিঁধিছে হায়,
ওকি আমার মতন, হৃদয় হারায়ে
হয়েছে পাগল প্রায়!
কভু মেঘের সহিত, কহিতেছে কথা
কখন মরাল সনে,
[illegible] ময়ূর, কোকিল, যাহারে পাইছে,
কি বলিছে আনমনে?
দেখ চলেছে ছুটিয়া, তটিনীর পানে
কি যেন বলিছে তায়,
হরি' তরুলতা সব, ধরিছে জড়ায়ে
ঘোর পাগলের প্রায়।
আহা! আসিতেছে ছুটি', এই দিকে কেন
ঝরিতেছে অশ্রুজল!
এ যে প্রাণেশ আমার, আত্মহারা হয়ে
ছুটিতেছে অবিরল!
উহু! সেই মুখ-ছবি, কালিমা-মণ্ডিত
সে কান্তি লুকা'ল কোথা!
বল' পুরূরবা মোর হৃদয় ঈশ্বরে
কে দিল দারুণ ব্যথা?
নাথ সংজ্ঞাহীন হ'য়ে, কেনবা এমন
হইল,—নাজানি আমি,
মোর হৃদয়-মাঝারে, হইতেছে যাহা,
জানি'ছে অন্তরযামী।
যদি অভাগীর তরে, প্রাণেশ আমার
হৃদয়ে আঘাত পায়,
বিধি! এ পাপের ঘোর প্রায়শ্চিত্ত যত
পাপিনী করিতে চায়।
অহো! "তুমি কি উর্ব্বশী!" বলি'প্রাণনাথ
বাহু প্রসারণ করি,'
এ যে আলিঙ্গন-পাশে, বাঁধিল আমায়
অন্তর-চেতনা হরি'।
মোর জ্ঞানের সকলি, পাইল বিলোপ
কি-এক মোহের ঘোরে,
বুঝি মূর্চ্ছিত হইয়া, পড়িলাম আমি,
চৌদিকে আঁধার হেরে।'

(৪)

পেয়ে প্রিয়-আলিঙ্গন, উর্ব্বশী তখন
অপ্সরা-মূরতি ধরে,
তার হৃদয়-মাঝারে, আনন্দ-লহরী
স্ফুরিল নিমেষ ভরে।
দোঁহে হৃদয়ে হৃদয়ে, অঙ্গে অঙ্গে কিবা
মুহূর্ত্তে মিশিয়া গেল,
মরি! নাজানি সহসা, কি-এক ভাবের
তথা আবির্ভাব হ'ল।
ফুটি' শত শত ফুল, অমনি সহসা
ঢালিল সৌরভ-রাশি,
ছুটি' মলয় পবন, কোথা হ'তে যেন
বহিল তথায় আসি'।
কত ভ্রমর, নিমেষে উঠিল ঝঙ্কারি,'
গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে
যত পাখীর কাকলী, ছাইল গগন
কানন ধ্বনিত ক'রে।
দিল কোকিল সকল, কুঞ্জ হ'তে সাড়া
ছাড়িয়ে পঞ্চম তান,
বেগে ছুটিল অমনি, তরলা তটিনী
গাহিয়ে মধুর গান।
কাল মেঘের বুকেতে, হাসিল বিজলী
পড়িল সে ছায়া জলে'
আসি' কণ্ডুয়ন করে মৃগীর শরীরে,
মৃগ যত, দলে দলে।
লয়ে চক্রবাক-বধূ, চক্রবাক গুলি
মৃণাল ভোজন করে,
যেন মিলনের রাজ্য হইল তথায়,
শোক, তাপ, পাপ, হ'রে।
লভি' প্রেয়সী আপন, পুরূরবা কহে,
"ধর প্রিয়ে! ধর মাথে,
লহ উপহার,—মণি, 'সঙ্গমনীয়' লো!
গৌরী-পদ-রাগ-জাতে"।
ধরি' উর্ব্বশী তখন, লইল মাথায়
সেই সে রতন-সার,;

তার হৃদয়ে সহসা, কে যেন ঢালিল
সহস্র আনন্দ ধার।

(৫)

প্রেম গাঢ় হয় যবে, মিলন মিলয়ে,
এইত প্রণয়-বিধি।
কেহ পেয়েছে কি কভু, ভাসা-ভাসা প্রেমে
মিলন-অমূল্যনিধি ?
মা যে পূত প্রেমময়ী, প্রেমের সাগর,
তাঁহাতে প্রেমের স্থান,
তিনি প্রেমরূপ ধরি, জীবের হৃদয়ে
ক্ষণেক স্ফুরতি পান।
সেই প্রেমনিধি হয়, অপার্থিব ধন
মায়ের শকতি তাহা,
জীব পাইলে সে ধন, আনন্দ সাগরে
একেবারে লীন আহা!
যথা প্রেমের বিকাশ, হয় ক্ষণকাল,
কুসুম ফুটিয়া উঠে,
তথা কোকিল কুহরে, ভ্রমর ঝঙ্কারে
মলয় আসিয়া জুটে।
সেই প্রেমময়ী মার, চরণ-সরোজে
প্রেম-রাগ সদা রয়,
তাই ঘনীভূত হয়ে, মরি! এ সুন্দর
মণির আকার হয়!
যেই লভিবে এ মণি, মিলন মিলিবে
মিলনে বিশ্বের স্থিতি,
দেখ, মিলন হইতে, বিশ্বের বিকাশ
এইত সৃষ্টির নীতি।
সব সৃষ্টির প্রথমে, এক আত্মময়;—
এ বিশ্ব কোথায় ছিল ?
পরে দ্বিধা হ'য়ে সেই, পুরুষ-প্রকৃতি-
মিলনে ব্রহ্মাণ্ড হ'ল।
তাই বিশ্ব-চরাচরে, যা'কিছু দেখিবে,
মিলনে রয়েছে স্থিত,
যত গ্রহ, উপগ্রহ, মিলনে বাঁধিয়ে
ঘুরিতেছে অবিরত।
ভীম মেঘেতে মিলিয়ে, রয়েছে বিজলী,
জোছনা চাঁদের সনে,
মিলি নির্ঝরিণী গুলি, আবার মিলিতে
ছুটিছে সাগর পানে।
লতা বিটপীর সনে মিলিয়া কেমন
ফুটাইছে ফুল-রাশি!
দেখ' মৃগীর সহিত হইছে মিলিত
মৃগ, দলে-দলে আসি।
কিবা ময়ূরীর সাথে ময়ূর মিলিছে,
মরাল, মরালী সহ,
এই ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে যা'কিছু দেখিবে,
মিলিতেছে অহরহ।
মাগো! বিশ্ব-চরাচরে, সবাই মিলিছে,
মিলন(ই) নিয়ম তব,
কবে সকলে মিলিয়ে, অনন্ত মিলনে
তোমাতে মিলিয়া যাব।

রা, কু, প্র।

আমার জীবন-চরিত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবীন-যুবক উত্তর দিল,—"আমি আপনাকে বেরিলীতে দেখিয়াছি। আপনি, মিশ্র বৈজনাথের গৃহে অনেকবার আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আপনার বিশেষ সদ্ভাবও ছিল। আমি বৈজনাথের সামান্য চাকর, আপনি আমাকে না চিনুন, কিন্তু আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি।"

এইরূপে সংক্ষেপে আলাপ পরিচয় হইল ক্রমশঃ খোলাখুলি কথাও হইল। বুঝিলাম, নবীন হিন্দুস্থানী যুবকটী, বৈজনাথ-প্রেরিত গুপ্তচর; কোন গোপনীয় সংবাদ লইয়া ইংরেজের নিকট নাইনিতালে যাইতেছে। যুবকের নিকট মিশ্র বৈজনাথের স্বহস্তের লিখিত একখানি পত্রও আছে। পাছে পথিমধ্যে যুবক গুপ্তচর বলিয়া ধৃত হয়,—এই জন্য সেই পত্রখানি, দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। দেহ উলঙ্গ করিয়া, কাপড়-ঝাড়া লইলেও সে পত্র বাহির হইত না। পত্র অবশ্যই মুখের ভিতর ছিল না। পত্রখানিকে 'মমজমায়' মুড়িয়া, মল-ত্যাগের দ্বারের ভিতর সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে, যুবক পত্রখানি খুলিয়া লইত এবং শৌচাদির পর পুনরায়, তৎস্থানে রাখিয়া দিত।

রস বীভৎস বটে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময়, বীর-বীভৎস-রসেরই বিশেষ বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

পথে সহচর পাইয়া, একই পথের পথিক পাইয়া, মনে আমার বড়ই আনন্দ জন্মিল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, মুখ শুকাইয়াছে, অধর-ওষ্ঠ শুকাইয়াছে, তথাচ আমাদের উভয়ের মধ্যে গল্প চলিতে লাগিল। শেষে যুবক কহিল,— "বাবুজি! আহারের উদ্যোগ করুন, কেননা, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া, এ স্থান হইতে এখনি চলিয়া যাইবে। রাত্রে এখানে কেহ থাকে না।"

শাফাখানায় একখানি মাত্র মুদীর দোকান। সেখানে আটা ও লবণ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া গেল না। সেই আটার লিট্টি (গুলি) পাকাইয়া, সেকিয়া, তাহাই গলাধঃকরণ করিলাম। কিন্তু সেদিন তাহাই বড় উপাদেয় বোধ হইল।

আমার সঙ্গে টাট্টুর পৃষ্ঠে যে, আটা, ঘৃত, লবণ প্রভৃতি ছিল, সংগ্রাম কালে, তাহা কথঞ্চিৎ রুধিরাপ্লুত হওয়ায়, আমি তৎসমুদায়ই পথি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সুতরাং সে রাত্রি অনন্যোপায় হইয়া লিট্টিতেই রসনার তৃপ্তি-সাধন করিতে হইল।

বৃক্ষমূলে টাট্টু বাঁধিলাম। আমরা তিন জনে, —আমি, মিশ্র বৈজনাথের প্রেরিত চর এবং সেই টাট্টুওয়ালা—এক মহা বৃক্ষের নিম্নদেশে রাত্রি-যাপনের জন্য শুইয়া রহিলাম। ঘাসযুক্ত জমী শয্যা হইল। গাছের শিকড় আমাদের মাথার বালিস হইল। পূর্ব্বে কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায়, ধরাধাম কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছিল, সুতরাং আমার সে সময়ের শয়নের সুখ, অনুভবের সামগ্রী। শুনিলাম, রাত্রে বাঘের ভয় আছে। বন্য হস্তীর ভয়ও আছে। মাঝে মাঝে চোর ডাকাইতেরাও উপদ্রব করিয়া থাকে। কিন্তু উপায় ত কিছুই নাই। ঠিক হইল, প্রথম প্রহরে আমি জাগিয়া থাকিব, দ্বিতীয় প্রহরে টাট্টুওয়ালা জাগিবে, তৃতীয় প্রহরে হিন্দুস্থানী যুবক জাগিবে। আর চতুর্থে আমরা সকলে উঠিয়া, একটু ফরসা হবহব হইলেই গন্তব্য পথে যাত্রা করিব। বন্দোবস্ত এইরূপ হইল বটে, কিন্তু প্রথম প্রহরেই আমি ঘোর ঘুমে অভিভূত হইলাম। জাগিবার ইচ্ছা থাকিলেও মন জাগিল না, চক্ষু জাগিল না, নিদ্রারূপ সর্পের দ্বারা দষ্ট হইয়া দেহ জর্জ্জরিত হইল। ক্রমেই চোখ বুজিয়া আসিল, দেহ ঢলিয়া-ঢলিয়া পড়িয়া গেল। নিশার সংবাদ আমি আর কিছুই জানি না,—একঘুমে রাত্রি পোহাইল। দেখিলাম পূর্ব্বদিক প্রফুল্ল হইয়া আসিতেছে। আমাদিগকে নিশাকালে বাঘে খায় নাই দেখিয়া আমার মনও কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল। দেখিলাম যে হিন্দুস্থানী যুবক উপবিষ্ট হইয়া জাগিয়া আছে। তাহাকে তদবস্থায় অবলোকন করিয়া, আমার একটু লজ্জা হইল ভাবিলাম,—আমার বেশ কর্ত্তব্য-জ্ঞান বটে! আমি ঘুমাইলাম, আর এই ব্যক্তি জাগিয়া রহিল।

হিন্দুস্থানী যুবক কহিল,—"বাবুজি! আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছি। আপনি শয়নের প্রায় কুড়ি মিনিট পরেই ঘুমাইয়া পড়েন, টাট্টুওয়ালা এক ঘণ্টা পরে নিদ্রিত হয়।"

প্রভাত হইল, সেই নিবিড় অরণ্যমধ্য হইতে পক্ষিকুল ডাকিয়া উঠিল, আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। বড়ই ভয়ঙ্কর পথ। দুই ধারে ঘন সন্নিবিষ্ট অসূর্য্যম্পশ্য মেঘমালাবৎ তমোময় মহারণ্যের মধ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, প্রভৃতি হিংস্র জন্তু-নিচয় সদাই ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতেছে,—এইরূপই যেন বোধ হয়। টাট্টুওয়ালা বলিল "বাবু সাহেব! এই বনে বাঘ আছে, সাবধান" আমি কহিলাম,—"সাবধান হইয়া কি করিব? আমি এখন নিরস্ত্র, লাঠী মাত্র ভরসা, পিস্তলটীও হারাইয়াছে। ভয় করিও না, ভগবান্ রক্ষা করিবেন।"

আমরা দ্রুতপদে চলিতেছি, বেলা যখন প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তখন শাফাখানা হইতে আমরা প্রায় ১০।১২ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছি। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, তৃষ্ণা হইলে জলপানের উপায় নাই। ক্ষুধা হইলে আহারের উপায় নাই, সেই জনশূন্য জল-শূন্য আহারীয়-সামগ্রী-শূন্য অরণ্যের মধ্য দিয়া আমরা অবিশ্রান্ত চলিতেছি। অন্তরে এক একবার দুর্গানাম স্মরণ করিয়া মাভৈ মাভৈ শব্দে চলিতেছি। অরণ্যে কিঞ্চিন্মাত্র শব্দ হইলেও অথবা শব্দ না হইলেও, হিন্দুস্থানী যুবক আমার গা টিপিয়া বলে, "বাবু সাহেব!

ঐ বুঝি বাঘ।” আমি কখন দক্ষিণে কখন বামে নেত্র নিহিত করিতেছি। কখন পশ্চাভাগে মুখ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, কখন সম্মুখ ভাগে সুদূর স্থান পর্য্যন্ত অনিমিষ-লোচনে লক্ষ্য করিতেছি। এইরূপে বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইল। আমাদের তিন জনেরই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যুগপৎ সমুপস্থিত হইয়াছে। ক্লান্তির ত কথাই নাই। হিন্দুস্থানী যুবক কহিল,—“বাবু সাহেব! এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করুন। তৃষ্ণায় আমার ছাতী ফাটিতেছে, এস্থানে জল আছে কি না, একবার অন্বেষণ করিয়া দেখুন; আমার পা আর চলে না” টাটুওয়ালা কহিল,—“এখানে বিশ্রাম করিলে চলিবে না। দিবাভাগে এই অরণ্য পার হইতে হইবে, আর এখানে জল নাই, কালাডুঙ্গি না পৌঁছিলে আহারীয় সামগ্রী বা জল কিছুই মিলিবে না। অতএব চলুন, শীঘ্র চলুন, কালাডুঙ্গি আর অধিক দূর নহে।” হিন্দুস্থানী কি করে, ধীরে ধীরে আমাদের সহিত চলিতে লাগিল। তাহার সেই সজীবতা, সেই স্ফূর্ত্তি আর নাই, ঠিক যেন কলে কাটের পুতুল চলিতেছে! অদূরে দেখিলাম, প্রায় ২০।২৫ জন হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষ আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহারা ইতর জাতীয়, সকলেই কাঁদিতেছিল, সেই ক্রন্দনধ্বনিতে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে এক একটী ছেলে, কোন কোন বৃদ্ধার পার্শ্বে যুবতী-রমণী অবস্থিতি করিতেছিল। অদূরে এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আমি ভাবিলাম, এ আবার কি! ছদ্মবেশী ডাকাইত নয় ত? দেখিতে দেখিতে আমরা পরস্পর পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম। আমি তাহাদের মধ্যে যাহাকে বয়োবৃদ্ধ ও দলপতির ন্যায় দেখিলাম; তাহাকে তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসিলাম;—“তোমরা কে কোথায় যাইতেছ?” বয়োবৃদ্ধ কহিল,—“আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বুঝি আমরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া মারা পড়িলাম।” এই বলিয়া সকলেই সমস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম “তোমাদের কি হইয়াছে, বল, ক্রন্দনের কারণ কি?” বয়োবৃদ্ধ কহিল,—“আমরা নাইনিতালে যাইতেছিলাম, আমাদের মধ্যে কাহার পুত্র, কাহার ভ্রাতা, কাহার স্বামী, কাহার স্ত্রী, বিদ্রোহের পূর্ব্বে, নাইনিতালে গিয়াছিল। সেখানে ইংরেজের চাকরী করিত বিদ্রোহের পর তাহারা জীবিত, কি মৃত, কি বন্দী, তাহা আমরা কিছুই জানি না, তাই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমরা যাইতেছিলাম। কিন্তু নাইনিতাল-পাহাড়ের মূল-দেশে যে ইংরেজ প্রহরীগণ অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা আমাদিগকে যাইতে দেয় নাই। মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া হতাশ মনে আমরা ফিরিয়া আসিতেছি কালাডুঙ্গিতেও থাকিবার স্থান পাইলাম না, বিদ্রোহ-সেনা সে স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।” আমি কহিলাম,—“সে যাহা হউক, তোমরা এক্ষণে জঙ্গল পার হইয়া শাফাধানায় কিরূপে পৌঁছিবে, তাই ভাবিতেছি। কারণ, পাঁচ সাত ক্রোশ যাইতে না যাইতেই রাত্রি আসিবে আর এরূপ বৃদ্ধ, স্ত্রী এবং শিশুসন্তান লইয়া তোমরা আর কতক্ষণই বা দৌড়িবে?” বয়োবৃদ্ধ কপালে করাঘাত করিয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ক্রন্দনের কোলাহলে দিক্ সমস্ত পূর্ণ হইল। শিশু কাঁদিল, বালক কাঁদিল, স্ত্রী কাঁদিল, পিতা কাঁদিল, মাতা কাঁদিল। আমি কহিলাম,—“আর তোমরা এখানে কালবিলম্ব করিও না। ভগবানের নাম করিতে করিতে তোমরা দ্রুতপদে চলিয়া যাও।”

তাহারা প্রস্থান করিলে, আমার এক বিষম ভাবনা হইল, এত কষ্ট করিয়া নাইনিতালে ইংরেজগণের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছি, পাছে, ইংরেজ-প্রহরীগণ আমাকে বিদ্রোহীদের গুপ্তচর মনে করিয়া যাইতে না দেয়, তখন উপায় কি হইবে? অথবা তাহারা যদি বন্দী করে, কিংবা প্রাণে মারিয়া ফেলে, তাহারই বা উপায় কি আছে? যদি ছাড়িয়াই দেয়, তাহা হইলেই বা যাই কোথায়? এই বিজন প্রান্তরে, এই অরণ্য-পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশে এই হিংস্রক-জন্তু-পূর্ণ বিজনবনে থাকিই বা কোথায়? কি খাইয়াই বা প্রাণধারণ করি? ভাবনার আদিও নাই অন্তও নাই, আমি ভাবনার সাগরে ডুবিলাম!

ভাবিতে ভাবিতে মনে একটু আশারও সঞ্চার হইল। আমি ছদ্মবেশী হইলেও ভদ্রলোক! কথা বার্ত্তা গুছাইয়া কহিতে পারিলে, হয়ত

আমাকে পথ ছাড়িয়া দিবে। আমি তাহাদের নিকট আত্ম-পরিচয় দিব। আমার ৮ নম্বর অশ্বারোহি-দলস্থ সাহেবগণের নাম করিব। বিশেষ আমার সঙ্গে মিশ্র বৈজনাথের লোক আছে, তাহার নিকট গুপ্ত চিঠী থাকার কথাও বলিব। আমাকে বিশ্বাস করিয়া পথ ছাড়িয়া না দিবে কেন?

এইরূপ আশায় বুক বাঁধিয়া চলিতে লাগিলাম। এখানকার রাস্তাটি পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। বড় বড় বৃক্ষ যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, সেই বৃক্ষ-সমূহ বিবিধ লতা পাতায় বেষ্টিত; প্রবল বেগে তখন বায়ু বহিতেছিল। শোঁ শোঁ সাঁই সাঁই—এক বিকট শব্দ সেই অরণ্যমধ্য হইতে উঠিতেছে। প্রকৃতই আমার গা এবার রোমাঞ্চিত হইল। মনে হইতে লাগিল, ভীষণ বন-দানব দারুণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে উড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। এ সময়ের অবস্থা বর্ণনাতীত। সকলেরই মুখ শুষ্ক। টাটুটী সমস্তদিন ঘাস-জল পায় নাই, সে আর চলিতে পারে না। টাটুওয়ালারও সেই দশা, সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুস্থানী যুবাটীর দশা অধিকতর শোচনীয়। সে যেন বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় টলিয়া-টলিয়া ঢলিয়া-ঢলিয়া পথ চলিয়াছে। আমার দেহে অতুল শক্তি থাকিলেও তখন তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কোমর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মুখে সকলকে বলিতেছি বটে, কোন ভয় নাই, পরওয়া নাই,—কিন্তু অন্তর দুরু দুরু করিতেছে। এদিকে অপরাহ্ণ উপস্থিত। শীঘ্র জঙ্গল পার হইতে হইবে, নচেৎ এই জঙ্গলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে বড়ই বিপদ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় দেখি, দুইজন বলবান্ ব্যক্তি, দীর্ঘ লাঠী হস্তে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। হিন্দুস্থানী-যুবক বলিল,—"বাবু সাহেব। সাবধান হউন, ঐ দেখুন, সত্য সত্যই এবার দুই জন দস্যু আসিতেছে।" আমি তাহার কথা শুনিয়া আর অগ্রসর না হইয়া, পথিপার্শ্বে আমার সেই লাঠী ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হিন্দুস্থানী যুবককে কহিলাম "ভয় নাই, দুই জন দস্যুতে আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না।" যখন সেই দীর্ঘ পুরুষদ্বয়, অর্দ্ধরশী অন্তরে আছে; আমি তাহাদিগকে হাঁকিয়া বলিলাম,—"তোম্ লোগ্ কোন্ হো, কাঁহাসে আতে হো, ঠ্যহর, পহিলে লাঠী য়েঁকো ফেঁক্ দো, তব আগে বঢ়ো। তাহারা কহিল-"আমরা ডাকাত বা দস্যু নহি, একটী ভয়ানক বন্য হস্তী আমাদিগকে তাড়া করিয়াছিল, আমাদের এখন কণ্ঠাগত প্রাণ। আমাদিগকে রক্ষা করুন বন্য হস্তীর কথা শুনিয়া হিন্দুস্থানী যুবকটীর শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হইল। ইহারা ডাকাইত হইলে তাহার তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বন্য হস্তীর সংবাদে তাহার যেন একেবারে প্রাণ উড়িয়া গেল। যেদিকে বন্য হস্তী ধাবিত, আমরা সেই দিকেই যাইতেছি। হিন্দুস্থানী যুবক কহিল,—"নিশ্চয়ই আমাদের সকলকে বন্য হস্তীর হাতে প্রাণ দিতে হইবে!"

সেই বলবান্ পুরুষ দুই জন, সেইরূপ উর্দ্ধশ্বাসে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া দৌড়িল। আমরা অনন্যগতি, নিরুপায়; কি করি, কোন্ দিকে যাই, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অগ্রসর হইলে বন্য হস্তী প্রাণে মারিবে। পশ্চাৎপদ হইয়াই বা যাই কোথায়? কারণ শাফাখানা আঠার ক্রোশ দূরে। হিন্দুস্থানী যুবক কহিল,—"এই খানেই থাকুন," আমার রাগ হইল, আমি কহিলাম,—"তুমি থাকিবে থাক, আমি অগ্রসর হইব। হাতী ক্ষেপিয়া তাড়া করিয়া যদি ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিত, তাহা হইলে এতক্ষণ হাতী অবশ্যই দেখিতাম। কোথায় বা হাতী, আর কোথায় বা কি! যদি হাতীই ক্ষেপিয়া থাকে, তবে সে এতক্ষণ জঙ্গলের কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গিয়া থাকিবে। এ বিপদের সময় বালকত্ব প্রকাশ করিও না; চল, এস আমার সঙ্গে।" যুবক দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি মনে মনে ইষ্টনাম জপিতে জপিতে হাতে পৈতা জড়াইয়া অগ্রসর হইলাম। এই সময় আমি মল্লবেশ ধারণ করিলাম। কষিয়া কাপড় পরিলাম, জানুদ্বয় আবরণ-শূন্য হইল। টাটুওয়ালা কহিল,—"বাবু সাহেব! আপ কী সুরৎ পহলওয়ান কীসী বান গয়ী।" আমি কহিলাম,—"হাতী আসিলে এখনি পহলওয়ান গিরি বাহির হইয়া যাইবে। তুমি যদি ভাল চাও, তবে রাম-নাম জপ কর।"

সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে হাতী দেখি নাই।

কোনরূপ বন্য জন্তু দেখি নাই। এমন কি শশক কি শৃগালটী পর্য্যন্তও দেখি নাই।

ক্রমশঃ মেঘবর্ণ পর্ব্বত-সমূহ স্পষ্ট ত নয়ন-গোচর হইল। টাটুওয়ালা কহিল,—"বাবু সাহেব! আর ভয় নাই;—ঐ দেখুন, কালাডুঙ্গি, ঐ দেখুন, নাইনিতাল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গতবারে যে মানচিত্র খানি প্রকাশ হইয়াছে, তাহা এইবার একবার স্মরণ করুন। স্মরণ না থাকে, জ্যৈষ্ঠের জন্মভূমি খুলিয়া দেখুন। দেখিবেন বেরিলী হইতে নাইনিতাল যাইবার দুইটী পথ আছে। একটী পথ বামে, একটী পথ ডাহিনে। বামের পথ দিয়া গমন করিলে রামপুর রাজ্য হইয়া, শাফাখানা হইয়া কালাডুঙ্গি পৌঁছিতে হয়। কালাডুঙ্গি, নাইনিতাল-পর্ব্বতের মূলদেশে অবস্থিত। কালাডুঙ্গি হইয়া নাইনিতাল-পর্ব্বতে উঠিতে হয়। বেরিলী হইতে ডাহিনের রাস্তা ধরিয়া নাইনিতালে যাইতে হইলে, বহেড়ী, চারপুর, হল্‌দুয়ানী প্রভৃতি গ্রাম নগর অতিক্রম করিয়া, নাইনিতাল যাইতে হয়। কিন্তু ডাহিনের এই পথ বিদ্রোহী সৈন্যের দ্বারা পরিপূর্ণ। খাঁ বাহাদুর খাঁ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়া রাখিবার জন্য দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছেন। হল্‌দুয়ানীতে নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রধান সেনা-নিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রায় অশ্বারোহী পদাতিকে ৪।৫ হাজার সৈন্য আছে। বিভীষণ-মূর্ত্তি উদ্ধত-স্বভাব মৌলবী-ফজলহক্ এই সমগ্র সেনার কমানডারইন চিফ্। তিনি নবাব কর্ত্তৃক নাইনিতাল আক্রমণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। নাইনিতালস্থ সমস্ত ইংরেজ-নর-নারীগণকে কাটিয়া কুচি কুচি করিবার জন্য তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৌলবী-ফজলহক্ প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য কেবল সুযোগ সুবিধা খুঁজিতে ছিলেন। ইংরেজগণকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার চেষ্টায় ছিলেন। নাইনিতাল অভিমুখে ইংরেজদিগের জন্য যে সকল আহারীয় সামগ্রী রওয়ানা হইত, সেই সকল লুঠপাট করাই হল্‌দুয়ানীস্থ সৈন্যদিগের তখন এক-প্রকার কাজ ছিল। এই সকল ধর-পাকড় কার্য্যে তাহারা বিশেষ বীরত্ব দেখাইত। হল্‌দুয়ানী হইতে কখন কখন শতাধিক অশ্বারোহী সৈন্য কালাডুঙ্গির দিকে ধাবিত হইত;—এবং কালাডুঙ্গিতে সম্মুখে যাহাকে পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত; এবং রসদাদি লুট করিয়া লইয়া যাইত।

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, তখন আমরা কালাডুঙ্গি পৌঁছিলাম। এখানে এখন কিছুই নাই, কেবল জঙ্গল। এখানে পৌঁছিয়া, পর্ব্বতীয় নির্ঝর হইতে আমরা নির্ম্মল জল পান করিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া, আবার যাত্রা করিলাম। ক্রমে পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দুইটী পথ দিয়া নাইনিতাল-পর্ব্বতীয় পথে উপস্থিত হইতে হয়। একটী পথ সোজা, একটী পথ বাঁকা। সোজা পথ দিয়া গেলে কিছু কষ্ট এবং বিপদও আছে। বাঁকা পথ দিয়া যাওয়া সহজ এবং সে রাস্তাটী ভাল। পাহাড়ের নিম্ন-তল দিয়া একটী ক্ষীণ-শরীরা খরস্রোতা নদী প্রবাহিতা। সে নদীতে জল অধিক নাই,—কোথাও এক কোমর, কোথাও এক বুক, কোথাও বা এক হাঁটু। কিন্তু স্রোত অত্যন্ত। সেই স্রোত-জলের ভিতর বড় বড় পাথর আছে। নদী পার হইবার সময়, পাথরে পা ঠেকিয়া পিছলিয়া একবার পড়িয়া গেলে আর রক্ষা নাই। স্রোতে অমনি গড়াইতে গড়াইতে নিম্নদিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু সে দেশীয় পাহাড়ী লোক অনায়াসে নদী পার হইয়া অপর পারে যায়। এইটী হইল সোজা পথ। হাঁটিয়া তড়ে নদী পার হইয়া গেলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নাইনিতাল পর্ব্বতীয় পথে উঠা যায়। দ্বিতীয় পথটী এক মাইলের অধিক ঘুরিয়া গিয়াছে। এই পথটী সৈন্যদিগের গমনাগমনের জন্য ইংরেজ-রাজ কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহা দিয়া গেলে নদী হাঁটিয়া তড়ে পার হইতে হয় না। নদীর উপর এক মজবুত সেতু বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া গোযান অশ্ব-শকট পর্য্যন্তও যাইতে পারে।

সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া টাটুওয়ালা কহিল, —"বাবু সাহেব! কোন্ পথে যাইবেন।"

টাটুওয়ালার নিকট উভয় পথের যথাযথ বিবরণ পূর্ব্বোক্ত-রূপ শ্রবণ করিয়া, আমি কহিলাম,—

"এক মাইল পথ ঘুরিয়া বাঁকা পথে সেতুর উপর দিয়া যাওয়াই ভাল। কেননা, সোজা পথ দিয়া যাইতে হইলে হাঁটিয়া নদী পার হইতে হইবে, নদীতে কত জল জানিনা; এবং ইতিপূর্ব্বে এরূপ নদী কখনও পার হই নাই; এবং কোন পথপ্রদর্শকও নাই।"

আমরা বাঁকা পথ ধরিয়া সেতুর উপর দিয়া চলিলাম। নদী পার হইয়া ক্রমশঃ নাইনিতালের পর্ব্বতীয়-পথ ধরিলাম। পর্ব্বতীয় পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ বড়ই প্রফুল্ল হইল। যাহার জন্য আজ কয়েক দিন কাল প্রাণ উৎসর্গ করিতেছিলাম, আজ তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা হইল। স্ফূর্ত্তির সহিত যথাসাধ্য বেগে পর্ব্বত-পথে উঠিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চতর ভূমিতে উঠা যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন না। আমার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, হাঁপাইতে লাগিলাম, কোমর কন্ কন্ করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী যুবক যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। মাছ অর্দ্ধমৃত হইয়া জলে যেমন ভাসে, যুবকটীর অবস্থা ঠিক সেইরূপ। বেগতিক বুঝিয়া আমি তখন তাহাকে টাটুর উপর চাপাইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি, ঝরণার জল খাই, আর পর্ব্বতে আরোহণ করি।

এইরূপে প্রায় এক ক্রোশের কিছু কম পথ অতিক্রম করিলাম। এমন সময় টাটুওয়ালা কহিল,—"বাবু সাহেব! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পাশ আনা হয় নাই। কালাডুঙ্গিতে ইংরেজের এক থানা-দার আছে। ঐ থানাদারের নিকট হইতে পাশ না পাইলে, পাহাড়ের উপর ইংরেজের যে প্রহরীগণ আছে, তাহারা কিছুতেই যাইতে দিবে না। আর একটা বাঁক ঘুরিলেই আপনি ইংরেজের ঘাটি দেখিতে পাইবেন। সেই ঘাটিতে প্রায় পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী গোরা আছে এবং তিনটী তোপ আছে।"

টাটুওয়ালার এই কথা শুনিয়া আমি বড়ই বিরক্ত হইলাম। মন বড়ই খারাপ হইল। এত কষ্ট করিয়া এতদূর আসিলাম, আবার নামিতে হইবে। অদৃষ্টে যে কতই যন্ত্রণা বিধাতা লিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তাহার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্যাতীত। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমাকে পুনরায় কালাডুঙ্গিতে প্রত্যাগত হইতে হইল। সূর্য্যাস্ত হইতে এখনও বুঝি অর্দ্ধঘণ্টার অধিক বিলম্ব আছে। আমরা পাশ লইবার জন্য থানাদারের ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তথায় জন-প্রাণী নাই, গৃহদ্বার রুদ্ধ। এদিক্-ওদিক্ চাহিতেছি,—এমন সময় অদূরে হলদুয়ানীর দিক হইতে বহুতর অশ্বের খুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে দেখিলাম,—প্রায় ৫০। ৬০ জন অশ্বারোহী-সৈন্য নিষ্কোষিত অসি-হস্তে আমাদের দিকে বিদ্যুৎ-বেগে প্রধাবিত হইয়া আসিতেছে। এই বিরাট-বিভীষণ ব্যাপার হঠাৎ দেখিয়া, আমাদের চক্ষুস্থির হইল। একি! একি! এ আবার কি!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি ভাবিতে লাগিলাম,—"সহসা সশস্ত্র সৈন্য-দল কোথা হইতে আসিল? আমি স্বপ্ন দেখিতেছি,—না, জাগরিত আছি? ইহারা কি পৃথিবী-ভেদ করিয়া উত্থিত হইল, না—বিমান-চ্যুত হইয়া ধরাধামে পতিত হইল!

আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব-ভাবের উদয় হইল,—"হে প্রভো! হে দয়াময়! বলিয়া দাও, আবার একি নূতন মায়াজাল পাতিলে! হে দানব-দলনি জননি! কোন দৈত্যদল-বিনাশার্থে এই সৈন্য-সমূহ সৃষ্টি করিলে? আমি পথশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ব্রাহ্মণ;—দারুণ দৈব-বিপাকে পড়িয়া একান্ত অবসন্ন হইয়াছি। বিধাতার বিধানে অস্ত্রহীনও হইয়াছি। তবে আমার জন্য এত আয়োজন কেন মা!"

সেই অপরাহ্নের অন্তিম-কালে নাইনিতাল-পর্ব্বতের তটদেশে দাঁড়াইয়া, শীতল সমীরণ দ্বারা সেবিত হইয়া, চারিদিকে গিরি অরণ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আমি আরও ভাবিতে লাগিলাম,—"এই অশ্বারোহী সৈন্যগণ বিদ্রোহি-দলভুক্ত না হইতে পারে। আমাদের রেজিমেণ্টের যে কয়জন অশ্বারোহী সৈন্য, বিদ্রোহের সময় বেরিলী হইতে ইংরেজদের সঙ্গে নাইনিতালে পলাইয়াছিল, হয়ত তাহারাই আসিতেছে;—আমায় এরূপ জন-শূন্য স্থানে একাকী দেখিয়া ইহারা আমার রক্ষার্থ আমার দিকে ধাবিত হইতেছে।"

আর অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, আর অধিক বিচার-বিতর্ক করিতে হইল না; ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অশ্বারোহিগণ আমার ঘাড়ে যেন লাফাইয়া পড়িল। একজন আমার বক্ষের দিকে বল্লম লক্ষ্য করিয়া, দৃঢ়-মুষ্টিতে দক্ষিণ-হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বজ্রনির্ঘোষে কহিল,—"তু কৌন্ হ্যায়, কাঁহাসে আতা হ্যায়, আওর কাঁহা জায়েগা?

বিষম বিপদ সম্মুখে দেখিয়া, আমি বিনীত-স্বরে কহিলাম,—"আমি একজন চাপরাশী, বেরিলীর কাছারিতে কর্ম্ম করিতাম; আমার ভ্রাতা নাইনিতালে চাকরী করেন, তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া আমার মাতা বড় কাতর হইয়াছেন, সেই জন্য ভ্রাতার সন্ধানে নাইনিতালে যাইতেছি।"

বিদ্রোহি-দল আমার এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া ভ্রূকুটী-ভঙ্গি করিয়া বলিল,—"সাচ হাল বতাও, নেহি তো অভি দোটুকরা কর্ ডালুঙ্গা। হামকো মালুম্ হোতা হ্যায় কি, তু "কাফিরোঁ" কো নবাব রামপুরকে তরফসে রসদ পৌঁছাতা হ্যায়।"

আমার পশ্চাতে হিন্দুস্থানী যুবকটী দাঁড়াইয়াছিল। একজন অশ্বারোহী, তাহাকে জিজ্ঞাসিল,—"তু কৌন্ হ্যায়?"

যুবক আমার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল,—"আমি ইঁহার চাকর।"

তাহার মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবা মাত্র অমনি অশ্বারোহি-দলমধ্যে একটা হাসির কোলাহল পড়িয়া গেল। ভাই, মজার কথা শুন! চপরাশীর আবার চাকর কি? নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি ইংরেজদিগকে রসদ যোগাইবার দলপতি। তখন শূন্যমার্গে তীক্ষ্ণধার তরবারি সমস্ত ঘুরিতে লাগিল। সেনাগণ এক হুহুঙ্কার রব করিয়া উঠিল। কেহ দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ পূর্ব্বক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল,—"এই পাপিষ্ঠ দলপতিকে এই তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেল।" কেহ কহিল,—"ইহাকে দগ্ধ করিয়া বিষম যন্ত্রণা দিয়া হত্যা কর।" কেহ কহিল,—"ইহার দক্ষিণ-হস্ত এবং দক্ষিণ-পদ কাটিয়া দাও।" তখন তথায় এক বিষম পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইতে লাগিল। অনেকে আমায় অশ্লীল অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। আমি নীরব নিস্পন্দ।

অশ্বারোহিগণ পরস্পর বিচার করিয়া স্থির করিল,—"ইহাকে এস্থানে প্রাণে মারা হইবে না, আমরা ইহাকে হলদুয়ানীতে ধরিয়া বাঁধিয়া সেনাপতি ফজল হকের নিকট লইয়া যাই চল। তিনি ইহাকে মারিতে হয়, মারুন,—রাখিতে হয়, রাখুন। অদ্য আমরা পুরস্কার নিশ্চয়ই পাইব।"

এইরূপ বলিয়া তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল-লোচন হইল।

ইতিমধ্যে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রায় ৪০।৫০টী টাটু, পৃষ্ঠে রসদ বোঝাই লইয়া ঠিক সেই সময় নাইনিতাল-অভিমুখে যাইতেছিল। টাটুওয়ালারা বিশেষ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল বলিয়া টাটুর পৃষ্ঠ হইতে রসদ নামাইয়া নদীকূলে রাখিয়া, তটিনী-তটবর্ত্তী ক্ষুদ্র-বনে লুক্কায়িত-ভাবে রন্ধন-আহারাদি কার্য্য সমাপন করিতেছিল। এ বিষয়ের আমি বিন্দু-বিসর্গও জানি না;—তাহারা কে কোথা হইতে আসিতেছে, কোথা যাইবে,—তাহার কিছুই অবগত ছিলাম না। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যগণ রসদপূর্ণ টাটু এবং আমাকে দেখিয়া স্থির নিশ্চয় করিল,—আমি দলপতি এবং টাটুওয়ালাগণ আমার অধীনস্থ। আমি এইরূপে সর্ব্বদা নাইনিতালে ইংরেজগণকে রসদ যোগাইয়া থাকি।

আটজন অশ্বারোহী, আমায় ঘেরিয়া রহিল; বাকি অশ্বারোহিগণ টাটুওয়ালাদের গ্রেপ্তার করিতে চলিল। প্রাণ-ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া কতকগুলা টাটুওয়ালা জঙ্গলের ভিতর পলাইয়া গেল। ৩০।৩২ জন টাটুওয়ালাকে অশ্বারোহিগণ ধরিল। ধরিবার সময় অস্ত্রাঘাতে ২ জন টাটুওয়ালা প্রাণত্যাগ করে, ৫ জন বিষম আঘাত প্রাপ্ত হয়। যে সকল রসদ মাটীতে নামান হইয়াছিল, টাটুওয়ালাদের দ্বারা তাহা আবার টাটু পৃষ্ঠে চাপান হইল।

যে আটজন অশ্বারোহী আমাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনকে আমি ধীরভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনারা কে, এবং আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন?" উত্তর এইভাবে পাইলাম,—"আমরা গয়েন্দার মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, রামপুরের নবাব এইরূপে নাইনিতালে রসদ পাঠাইয়া থাকে। এইকথা আমরা বহুবার শুনিয়াছি। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, চারিবার হলদুয়ানী হইতে কালাডুঙ্গি পর্য্যন্ত তাহাদের উদ্দেশ্যে 'ধাওয়া' করিয়া

য়াছি। কিন্তু কোথাও রসদ-ওয়ালা দেখিতে পাই নাই। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে, তোমাকে পাইয়াছি। দলশুদ্ধ তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলে অবশ্যই সেনাপতির কাছে পুরস্কার পাইব।"

আমার কাছে টাকা-কড়ি বা কোন জিনিস-পত্র আছে কিনা দেখিবার জন্য, আমার কাপড়-ঝাড়া লইল। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাপড় উঠাইয়া বিদ্রোহিগণ আমার দেহ অন্বেষণ করিল। আমার সঙ্গে পাথেয়-স্বরূপ পান্নাসুন্দরী-প্রদত্ত নয়টী মোহর ছিল। তাহা এক খণ্ড কাপড়ে বাঁধিয়া টেঁকে রাখিয়াছিলাম। আর আমার জামার পকেটে কয়েকটী টাকা ছিল। এই দারুণ দুঃসময়ে আমি ভয়ে অভিভূত হই নাই বা জ্ঞান-হারা হই নাই।

যখন আমাকে অশ্বারোহী জিজ্ঞাসিল,—"তেরে পাস্ ক্যা হ্যায়, সাচ সাচ বাৎলা।"

আমি কহিলাম,—"ম্যায় গরীব আদ্‌মি হুঁ, মেরে পাস ক্যা হ্যায়, সেরেফ দো-তিন রোপেয়া রাঃ খরচকা মেরে পাস মৌজুদ হ্যায়।"

এই কথা বলিতে না বলিতে অশ্বারোহী পকেটে হাত দিয়া টাকা কয়েকটী উঠাইয়া লইল।

আমি বালক কাল হইতে একটু-আধটু ভোজবাজি—ভেল্কী অভ্যাস করিয়াছিলাম। হাতের এ রকম কস্‌রত জন্মিয়াছিল যে, টাকা লইয়া গপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলিলাম,—হাত দেখুন, মুখ দেখুন, কাপড় ঝাড়া লউন,—টাকা কোথাও পাইবেন না। সেই ভোজ-বিদ্যার প্রস্তাবে, মোহর কয়টী সুকৌশলে এরূপ স্থানে লুকাইয়া রাখিলাম যে, বিদ্রোহিগণ কাপড়-ঝাড়া অঙ্গ-ঝাড়া লইয়াও মোহর কয়টী কোথায় স্থির করিতে পারিল না।

তাহার পর তাহারা বাগডোর দিয়া আমার দক্ষিণ-বাহু বিষম দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। একজন অশ্বারোহী সেই লম্বা দড়ীর অগ্রভাগ ধরিল। আমাকে কহিল,—"চল্, বদ্‌মাস্;—হামারে আগে আগে চল্।" আরও পাঁচ ছয় জন অশ্বারোহী আমাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অশ্বের উপর,—আমি পদব্রজে বন্ধন-দশায়। তাহারা দ্রুত যাইতেছে; আমাকে তাহাদের সঙ্গে দৌড়িতে হইতেছে। যখন আমি দৌড়িতে একটু অক্ষম হইতেছি,—অপেক্ষাকৃত একটু ধীরে ধীরে যাইতেছি,—অমনি একজন অশ্বারোহী পশ্চাৎ দিকে আসিয়া আমার পিঠে সপাসপ্ চাবুক্ কসিতেছে। ক্রমশ আমার পিঠ ফাটিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। ভাবিলাম,—"এইবার বুঝি প্রাণ যায়।" আমি যোড়হাতে বিদ্রোহিগণকে বলিলাম,—"হয় আমাকে, একেবারে মারিয়া ফেল,—না হয়, আমাকে তোমাদের সহিত আস্তে আস্তে যাইতে দাও। আমি দৌড়িতে আর পারিতেছি না। আমার মাথা ঘুরিতেছে। তোমাদের চাবুকের ভয়ে আর খানিক দৌড়িতে হইলে, বোধ হয়, আমি ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইব,—সম্ভবত প্রাণে মরিব।"

এ সময় আমার যে, কিরূপ যন্ত্রণা হইয়াছে,—তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত দিন আহার হয় নাই,—প্রায় ১৮ ক্রোশ জঙ্গল-পথ দৌড়িয়া অতিক্রম করিয়াছি,—আমার দেহ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে,—চোখে ভাল কিছু দেখিতে পাইতেছি না,—মাথাটা যেন খালি হইয়া ভোঁ ভোঁ করিতেছে।

সে সময় টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে,—আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। পথ পিচ্ছিল, উচু-নীচু এবং কঙ্করময়। আমি একবার হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় আমার হাঁটুর ছাল উঠিয়া গিয়াছিল। যে সময় আমি হোঁচট খাইয়া পড়ি, সে সময় প্রায় তিন চারি জন অশ্বারোহী একত্র হইয়া আমায় প্রহার আরম্ভ করে। কেননা তাহারা ভাবিয়াছিল,—আমি পলাইবার উপক্রম করিতেছি;—হোঁচট খাওয়া ভানমাত্র।

এই ত আমার অবস্থা! এ অবস্থা বর্ণনাতীত নয় কি?

যখন আমি অশ্বারোহিগণকে কাতরস্বরে বলিলাম,—আমি দৌড়িয়া যাইতে অক্ষম, তখন তাহারা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। কেহ কহিল,—"উহার মাথাটা এখনি কাটিয়া লওয়া হউক,—এই মাথা সেনাপতির নিকট ডালি দিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যাইবে।" কেহ কহিল,—তাহা উচিত নহে,—এ ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় মৌলুবীর নিকট লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এই গুপ্তচর দ্বারা ভবিষ্যতে ইংরেজদের গতিবিষয়ে অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।" কেহ আমাকে তামাসা করিয়া কহিল,—"এখনি তঞ্জাম ও ৮টা বেহারা আসিতেছে তুমি তাহাতে চড়িয়া হলহুয়ানি-সহর প্রবে

করিবে।" কোন অশ্বারোহী আমার কাণ মলিয়া দিয়া কহিল,—"তুমি বড় চালাক্ ;—তুমি ইংরেজের জন্য রসদ যোগাইতে পার,—আর একটু দ্রুতপদে চলিতে পার না—নয় ?"

আমি তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম,—"অদ্য আর নিস্তার নাই, মৃত্যু অতি সন্নিকট,—এই নর-ঘাতক বিদ্রোহী সিপাহীদের হস্তে নিশ্চয়ই এখনি জীবন সমর্পণ করিতে হইবে এ দুর্গম অরণ্যমধ্যে আমার এমন কেহই আত্মীয়-বন্ধু নাই, যিনি আজ আমাকে এই ঘোর সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারেন।" আমি তখন সেই অনন্তশক্তি, সর্ব্ব-সাক্ষী, দয়াময়, বিপদ-ভঞ্জন শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলাম। মনে মনে কহিলাম,—"হে দীনবন্ধু! হে জগৎপতি! রক্ষা কর, রক্ষা কর! প্রভু! কি দোষে, কোন্ অপরাধে—এই তুষানলের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটিতেছে ? একান্ত অনাথ বলিয়া, প্রভু! দয়া কর।"

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রায় তিন পোয়া পথ গিয়া অশ্বারোহিগণ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। আমিও দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইতে পাইয়া মনে মনে কহিলাম,—"আঃ—বাঁচিলাম।" তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে। যে অশ্বারোহী আমার বন্ধন-দড়ী ধরিয়া আছে, সাহসে ভর করিয়া, তাহাকে বলিলাম,—"তুমি যদি এ সময় আমাকে একটু জল দিয়া বাঁচাও, তাহা হইলে, ভগবান তোমার ভাল করিবেন।" তাহার কেমন হঠাৎ দয়া হইল। সে আমাকে জলপান করিতে অনুমতি দিয়া লম্বা বন্ধন-দড়ীটী কতক ছাড়িয়া দিল। জল নিকটেই ছিল। বর্ষাকাল। পথের প্রায় দুই ধারেই পর্ব্বতীয় ঝরণা আছে। আমি দড়ী আল্‌গা পাইয়া, ধীরে ধীরে প্রায় ষোল-পদ অতিক্রম করিয়া, এক ঝরণার নিকট বসিলাম। মুখ ধুইলাম, হাত পা ধুইলাম,—প্রাণভরিয়া জলপান করিলাম। খানিক জল লইয়া মাথায়ও দিলাম। শরীর যেন একটু সবল হইল, মনে স্ফূর্ত্তি হইল। নাড়ী একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছিল,—এখন 'ধাত' আসিল।

আমার তৃপ্তিপূর্ব্বক জলপান দেখিয়া, অশ্বারোহিগণও জল খাইতে আরম্ভ করিল। এই সুযোগে আমি বিশ্রাম করিয়া লইবার অবসর পাইলাম। এইরূপ জলপানে প্রায় পঁচিশ মিনিট অতিবাহিত হইল। তথায় অশ্বারোহিগণ সেস্থান হইতে নড়ে না। আমি আমার অশ্বারোহীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করিবার কারণ কি ?" সে কহিল,—"পশ্চাতে আমাদের প্রায় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহি আছে,—টাটুওয়ালাদিগকে তাহারা সঙ্গে করিয়া আনিতেছে। তাহাদের সহিত একত্র মিলিত হইয়া যাত্রা করিব। কারণ, সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে,—এখনও প্রায় তিন চারি ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। রাত্রিকালে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া যাওয়াই ভাল।"

দেখিতে দেখিতে টাটুওয়ালাগণ আপন আপন টাটুতে রসদ বোঝাই করিয়া, অশ্বারোহিদল কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া, আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। সেই মিশ্র বৈজনাথের লোক—সেই হিন্দুস্থানী যুবককে দেখিলাম,—সে কেবল কাঁদিতেছে ;—গণ্ডস্থল প্রবাহিত হইয়া অশ্রুজল পড়িতেছে। আর আমার সেই টাটুওয়ালাকে দেখিলাম,—সে ব্যক্তি বিষম প্রহারিত হইয়াছে। নাক মুখ, ঠোঁট দিয়া তাহার রক্ত পড়িতেছে। তাহাকে এরূপ ভাবে কেন মারিল, তাহার কারণ তখন কিছুই বুঝি নাই।

যখন উভয় দলে মিলিত হইল,—তখন অশ্বারোহিগণ মধ্যে এক আনন্দ-কোলাহল উপস্থিত হইল। প্রথমত,—নাইনিতালে সাহেবদের জন্য যে সকল রসদ যাইতেছিল, তাহা হস্তগত হইয়াছে ; দ্বিতীয়ত,—রসদ লইয়া যাইবার কর্ত্তাকেও তাহারা আজ ধৃত করিয়াছে,—সুতরাং অশ্বারোহীদের অন্তরে এবং বাহিরে আনন্দ-লক্ষণ দেখা না দিবে কেন ? তাহারা মনের উৎসাহে, গান গাহিতে গাহিতে, নাচিয়া-নাচিয়া, ঢলিয়া-ঢলিয়া চলিতে লাগিল। আর আমি ক্ষুৎপিপাসা-শ্রমাতুর—অবসন্ন-দেহ,—তাহাতে আবার জল্লাদের কুঠারে প্রাণ দিবার জন্য বন্দী হইয়া যাইতেছি। অহো! অতিবড় শত্রুরও যেন এরূপ অবস্থা কখন না ঘটে!

টাটুগুলির পৃষ্ঠদেশে নানারূপ আহারীয় সামগ্রী ছিল।—আটা, ডাল, ঘৃত, মুলা, আলু, ধোন্দল ইত্যাদি। কোন কোন অশ্বারোহী ডাল ঘৃত প্রভৃতি চুরি করিয়া নিজে রাখিতে লাগিল।

কেহ কেহ একটা বোতল বাহির করিয়া তাহাতেই খাঁনিক ঘি পুরিয়া লইল। কেহ কতকগুলা মূলা, বেগুন কাপড়ে বাঁধিয়া ঘোড়ার উপর রাখিল।

ক্রমশ আকাশ ঘোর তমোময় হইয়া উঠিল। ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ঘন ঘন মেঘ ডাকিতে লাগিল। এক পসলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গেল। আমরা সকলে ভিজিয়া ভিজিয়া যাইতে লাগিলাম। সঙ্গে একটীও আলোক নাই; কেবল বিদ্যুতালোকে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলাম।

কিন্তু ক্ষণ পরে আর কোথাও কিছুই নাই—মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, বজ্রাঘাত নাই—আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—ঈষৎ চাঁদের আলোকও দেখা দিল।

নিয়ম ছিল,—আমি সর্ব্বাগ্রে যাইব,—রক্ষক-স্বরূপ ছয় জন তুরুক-সওয়ার আমার আগে-পেছু থাকিবে। তৎপশ্চাতে টাটুওয়ালাগণ রসদ সহ টাটু লইয়া আসিবে,—তাহাদিগকে একরূপ ঘেরাও করিয়া অবশিষ্ট অশ্বারোহিদল চলিবে। নিয়ম এইরূপ ছিল বটে,—কিন্তু পথের সঙ্কীর্ণতা হেতু, অন্ধকার ও বৃষ্টি-নিবন্ধন —শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি দূর হইয়াছিল। কখন আমি আগে থাকি,—কখন পশ্চাতে যাই, কখন বা মধ্যস্থলে আসি। এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও অশ্বারোহিগণ তাহাতে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করে নাই।

আমার জঠরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—আর রক্ষা নাই। ক্ষুধাতেই বুঝি বা প্রাণ যায়। সম্মুখে দেখিলাম,—এক মোটা এবং লম্বা সপত্র কাঁচা-মূলা পথে পড়িয়া রহিয়াছে। টাটুর পৃষ্ঠে ঝুড়িতে অনেক মূলা বোঝাই ছিল,—সেই মূলাই পড়িয়া গিয়া থাকিবে। সেই মূলা দেখিয়া মন মজিল,—লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না;—আমি যাইতে যাইতে অতর্কিত ভাবে পায়ে করিয়া সেই মূলা তুলিয়া হাতে লইলাম। অন্ধের চক্ষুঃপ্রাপ্তির ন্যায়, বন্ধ্যার পুত্র-প্রাপ্তির ন্যায়, দরিদ্রের কহিনুর-প্রাপ্তির ন্যায় আমার এই মহামূলা-প্রাপ্তি ঘটিল। সাত রাজার ধন একটী মাণিক,—আর আমার এই মূলা! নগদ লক্ষকোটি রামচন্দ্রী মোহর সম্মুখে গণিয়া দিলেও, আমি এই মূলা এখন বিক্রয় করি কিনা সন্দেহ। হে মূলে! বিধাতা কি চাঁদ নিঙ্গড়িয়া রসে ফেলিয়া তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাই আজ তোমাকে এত অনির্ব্বচনীয় সুস্বাদু ও সুমিষ্ট বোধ হইতেছে।

মূলায় কামড় মারিয়া চিবাইয়া কতকাংশ গলাধঃকরণ করিলাম। আর, অমনি হাতের মূলা হাতে রহিল,—কেবল নয়ন-জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল।—বাপ! বাপ!—গেলাম! গেলাম!—শব্দ করিয়া উঠিলাম। সেই নিদারুণ ঝাল মূলা খাইয়া ঠোঁট জ্বলিল, মুখ জ্বলিল, বুক জ্বলিল, পেট পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। যন্ত্রণায় আমি ছটফট করিতে লাগিলাম। টান মারিয়া সুদূরে সেই মূলা নিক্ষেপ করিলাম। যে সকল অশ্বারোহী আমার এই মূলাভক্ষণ-ব্যাপার দেখিয়াছিল, তাহারা হো হো হাসিয়া উঠিল। এদিকে জ্বালায় আমার প্রাণ যায়-যায় হইল। আমার অশ্বারোহীকে বলিলাম,—"ভাই! পানি পিয়েঙ্গে।" সে অমনি হাসিয়া বাঁধন-দড়িটা লম্বা করিয়া দিল। আমি এক ঝরণার কাছে গিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিতে লাগিলাম।

জলপানে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল। ভাবিলাম,—এ বিষাক্ত মূলায় আজ বুঝি সত্য সত্যই আমার মহাপ্রাণ উড়িল।

পাহাড়ের নিম্নপ্রদেশে স্থানে স্থানে কলার বাগান আছে। অশ্বারোহিগণ পথের নিকটস্থিত একটী বাগান হইতে অনেকগুলি কলার কান্দি কাটিল। অনেকেই দুই এক কান্দি করিয়া কলা লইল। কেহ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে কলার কান্দি কৌশলে রাখিল; কেহ বা তাহা সহিসের কাঁধে দিল। একজন বিভীষণ-মূর্ত্তি মুসলমান অশ্বারোহী, এক বৃহৎ কাঁচা কলার কান্দি কাটিয়া আনিয়া, আমার কাঁধে দিয়া বলিল,—"চল্, শালা, চল্!" এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি, আমার গলায় এক ধাক্কা দিল। আমি ত অবাক্! আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কাঁধে কলা লইয়া যাইতে লাগিলাম। দুর্ব্বল-দেহে কলা কান্দির ভার পতিত হওয়ায় আর সেরূপ দ্রুতপদে যাইতে পারিলাম না। তদ্দৃষ্টে একজন নিষ্ঠুর অশ্বারোহী আবার আমাকে পশ্চাৎ হইতে প্রহার আরম্ভ করিল। আর সে, মধুর স্বরে খাঁটি-শ্লীল ভাষায় গালি দিতে লাগিল। আমার মন মোহিত হইল।

সর্ব্ব শরীর মূলা-আগুনে পুড়িতেছে,—তাহার উপর এই ব্যবস্থা। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—"হল্‌দোয়ানি আর কতদূর! পথে আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। সেখানে গিয়া ফাঁসি হউক, শূলি হউক,—তাহাতে রাজী আছি,—কিন্তু এ দারুণ-যন্ত্রণা সহিতে একান্ত অক্ষম।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি,—সম্মুখদিক হইতে হঠাৎ এক তোপধ্বনি হইল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকে গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইল। গুলির আঘাতে তিনজন টাটুওয়ালা ধরাশায়ী হইল; একটা অশ্ব, আরোহী সহ, ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। সকলে ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনেকে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম,—"এ আবার কি? ইংরেজ-সেনা আসিয়া ইহাদের গতি প্রতিরোধ করিতেছে নাকি?"

গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইবামাত্র, আমাদের অশ্বারোহি-দলের যিনি কর্ত্তা, তিনি এক বংশী-ধ্বনি করিলেন। শূন্যপথে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি এক নিশান উড়াইয়া দিলেন। অমনি গুলিবর্ষণ থামিল।

ব্যাপার কেহ বুঝিলেন কি? আমরা হল্‌-দোয়ানি-নগরপ্রান্তে পৌঁছিয়াছি। হল্‌দোয়ানি বিদ্রোহী-সেনার প্রধান আড্ডা। নবাব খাঁ-বাহাদুর খাঁ এই স্থানে নাইনিতাল আক্রমণার্থ তাহার প্রধান সেনাপতিকে পাঠাইয়াছেন। যদা এই স্থান হইতে ষাট জন অশ্বারোহী বহির্গত হইয়া, কালাডুঙ্গি গিয়া আমাদিগকে ধরিয়া আনিতেছে। এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। নগর-প্রান্তে রাত্রি নয়টার সময় পৌঁছিয়া, আমাদের অশ্বারোহিদল-কর্ত্তার উচিত ছিল, বাঁশী বাজাইয়া জানানো,—"অগো, আমরা আসি-য়াছি। আমরা শত্রু নহি,—মিত্র।" কিন্তু, সদল-সহ আমাকে গ্রেপ্তার করার আনন্দ-উল্লাসে তাহারা নগর-নিকটে পৌঁছিয়াও, বাঁশরী-সঙ্কেত দ্বারা মিত্রপক্ষের আগমন-বার্ত্তা বুঝাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। ও দিকে, অস্ত্রধারী অশ্বারোহী দেখিয়া, শত্রুপক্ষ ভাবিয়া, নগরের সৈন্যগণ গুলিবর্ষণ করে। এইরূপ উভয় পক্ষের ভ্রম হওয়ায় কয়েকজন হত এবং আহত হয়। গুলি-বর্ষণ থামিলেও, আমরা প্রায় এক দণ্ড কাল সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাদের দল হইতে কেবল দুই জন অশ্বারোহী নগরের দিকে ছুটিল। আমার কাঁধে যে, কলার কান্দি ছিল, তখন তাহা আমার কাঁধ হইতে লইয়া একজন সহিসের কাঁধে দিল।

পাঠক জানেন, আমার নিকট নয়টী মোহর আছে। নগর-প্রান্তে দাড়াইয়া মনে হইল,—"এই নয়টী মোহর লইয়া এখন কি করি? যদি এখান হইতে ইহার কিছু গতি না করি, তাহা হইলে হল্‌দোয়ানি পৌঁছিলে নিশ্চয়ই ইহা হস্তান্তর হইবে।" আমার এ কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত হাসিবেন। যে ব্যক্তির এখনি প্রাণদণ্ড হইবে,—তাহার আবার মোহরের জন্য এত মায়া কেন? কথা সত্য। কিন্তু অকারণ নয়টী মোহর, বিদ্রোহী মুসলমানদের হস্তে দিব কেন? বিশেষ, আমার হাতে যদি মোহর দেখিতে পায়, তাহা হইলে বিদ্রোহিগণ ভাবিবে,—"এ ব্যাটা মোহরের গাছ। ইহাকে নাড়া দিলেই তলায় মোহর পড়িবে। অতএব এ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ মোহর না দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাকে যন্ত্রণা দাও।" প্রাণদণ্ড—ফাঁসি, শূলি, এ সকল অনায়াসে সহ্য হয়; কিন্তু প্রত্যহ অষ্টপ্রহর যন্ত্রণাদান কিছুতেই সহ্য হইবার নহে। আরও এক কথা। আশা বড় মায়াবিনী! প্রাণ-দণ্ড নিশ্চয় জানিয়াও, তখন এক একবার আমার মনে হইতে লাগিল,—"যদি না আমি প্রাণে মরি,—যদি বাঁচিয়া থাকি,—শেষে যদি খালাস পাই, তাহা হইলে ঐ নয়টী মোহর পাথেয় স্বরূপ হইবে,—পথ-খরচ করিয়া বাটী যাইতে কষ্ট হইবে না।" মনে মনে এ চিন্তা করিয়াও, আমি কেমন লজ্জিত হইতে লাগিলাম। আমার এ কথা লোকে শুনিলে পাগল বলিবে যে! যথার্থ ক্ষুরধার অসি উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তথায় আমি প্রাণের আশা করিতেছি! ছি!!—কিন্তু আশা বড় কুহকিনী।

এই সকল কারণে, এই কয়েকটী মোহর যাহাতে শত্রুহস্তে না পড়ে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইল;—"নিকটস্থ গাছের তলায় মোহর পুঁতিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?" আমাদের পথের উভয় পার্শ্ব—অশ্বত্থ, বট, আম্র প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষে পরিশোভিত,—ঐ বৃক্ষাবলী

শাখা-প্রশাখা বিস্তার করত একদিন নিদাঘ-সন্তাপিত পরিশ্রান্ত পথিক-কুলের শ্রান্তি দূর করিত। কিন্তু এক্ষণে সে শাখা-প্রশাখা নাই;—বিদ্রোহী-সৈন্যদের হস্তীর আহারের জন্য তাহা কর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকাংশ বৃক্ষই এক্ষণে যেন বজ্রদগ্ধ হইয়া, ভ্রষ্টশ্রী হইয়া, দণ্ডায়মান আছে। আমি এইরূপ একটী বটবৃক্ষের তলদেশে যাইবার জন্য, অশ্বারোহীর নিকট প্রস্রাবের ভান করিলাম। অশ্বারোহী আমার বন্ধন-রজ্জু শিথিল করিয়া দিল। আমি তখন অনায়াসে একটী বটবৃক্ষের তলে গিয়া বসিলাম। দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ মাটী খনন করিয়া, তাহার ভিতর মোহর কয়টী ধীরে ধীরে রাখিয়া আবার মাটী চাপা দিলাম। আমার উক্ত কার্য্য অশ্বারোহী দেখিতে পাইল না, বা তাহার মনে কোন সন্দেহও হইল না। আমি পূর্ব্ববৎ তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম;—সে, দীর্ঘ রজ্জু গুটাইয়া লইল।

ইহার অল্পক্ষণ পরে, হল্‌দোয়ানি হইতে এককালে আটজন অশ্বারোহী আসিয়া, আমাদের পথপ্রদর্শক-স্বরূপ হইয়া, আমাদিগকে লইয়া চলিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে আমরা হল্‌দোয়ানি উপস্থিত হইলাম। আমাকে তাহাদের সর্দ্দারের নিকট উপস্থিত করিল। প্রথমে তাহারা আপনাদের অনেক বীরত্ব, অনেক বাহাদুরীর কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া শেষে আমার কথা উত্থাপিত করিল। সর্দ্দার তাহাদের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"আজ তোমরা বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছ; এক্ষণে চল আমরা এই সকল দ্রব্য-সম্ভার এবং এই লোকটীকে লইয়া মৌলবি ফজল-হকের সমীপে উপস্থিত হই। তিনি যেরূপ হুকুম দেন, তাহাই করা যাইবে।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা লুণ্ঠিত রসদ, অশ্ব, অশ্বারোহী এবং আমাকে লইয়া ফজল-হকের বাঙ্গালায় দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইল। অন্যান্য সিপাহীরা নীচে থাকিল। পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দারের আর দুইজন সওয়ার আমাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফজল-হকের সম্মুখে সমানীত করিয় সকল বৃত্তান্ত একে একে বিবৃত করিল। তিনি কোন কথার উত্তর করিলেন না। কেননা, তখন তিনি জানু পাতিয়া, মালা হস্তে "ওজিফা" পড়িতেছিলেন। তাহারা আমাকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৌলবি "ওজিফা" সমাপ্ত করত দুইটী হস্ত একবার আপনার মুখে দিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে আরক্ত লোচন, সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল। কিন্তু ব্যাকুলতা বা অধীরতা প্রকাশ করিলাম না। মৌলবি অতি পরুষ এবং জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"তু কৌন হায়"? আমি ইতিপূর্ব্বে বিদ্রোহী-সৈন্যদের নিকট যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, এখানেও তাহাই বলিলাম। কিন্তু তিনি তাহা বিশ্বাস করিয়া বলিল,—"তু আপনে তঁই চাপরাসী বনাতা হায়,—সব ঝুঁট বাত হায়, চাপরাসীকা গুপ্তগু এইসা সলিষ নেহি হোতী হায়। তু কাফেরোঁকো রসদ পৌঁছাতা হায়। লে, অব উসকা মজা চখ্।" এই কথা বলিয়া সর্দ্দারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল,—"ইসকো কল্ ফজর তোপমে উড়া দেও।" মিশ্র বৈজনাথের লোক, টাট্টুওয়ালা প্রভৃতি সকলেই নীচে ছিল,—আমি কেবল একা উপরে গিয়াছিলাম। কেবল আমার প্রতিই তোপে উড়াইবার হুকুম হইল; অন্যের প্রতি নহে। আমাকে কল্য তোপে উড়ান হইবে, এই হুকুম শুনিবামাত্র সেই যম-কিঙ্করেরা আমাকে নীচে লইয়া গেল। বাঙ্গালা-গৃহের দ্বারের সম্মুখে দুইটী বৃক্ষ; তাহার মূলে দুইখানি তক্তাপোষ পাশাপাশি পাতা তাহার উপর প্রহরীরা সসজ্জ হইয়া পাহারা দিতেছিল। তাহাদের নিকট আমাকে সমর্পণ করত তাহারা চলিয়া গেল। উক্ত প্রহরীরা আমার হস্ত-পদ শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন-পূর্ব্বক আমাকে, সেই দুই তক্তাপোষের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল, সেখানে শুইতে বলিল এবং ইহাও আদেশ করিল যে, "যখন তুমি পাশ ফিরিবে, তখন আমাদের অনুমতি লইয়া পাশ ফিরিবে। যদি বিনা অনুমতিতে পাশ ফের বা নড়-চড়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব।" আমার হাতে শিকল, পায়ে শিকল, কোমরে শিকল—আটেকাঠে বদ্ধ। সেই শিকলসমূহ তক্তাপোষের পায়ার সহিত সংলগ্ন। আমি ভূমিতলে ভিজা-মাটীতে চীৎপাত হইয়া শুইয়া রহিলাম। ঝাল-মুলার জ্বালা তখনও যায় নাই,—তৃষ্ণা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি এ অন্তিমে কেবল সেই বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে ভাবিতে লাগি-

লাম। জানিনা,—কেন,আমার চক্ষু-কোণে জল আসিল! জানি না,—কেন,—হঠাৎ গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল!

লজ্জাবতী।

(১)

এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
আসিতে আসিতে ঘরে, ফিরে কেন চলি গেলে,
আমি রহিয়াছি ব'লে ?—যাওয়া ত হবে না।
এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।

(২)

এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
যেওনা যেওনা চলি,' গেলেও দিবনা যেতে,
আঁচল ধরিব আমি তাড়া তাড়ি গিয়া।
তখন কি হবে প্রিয়ে! বলনা—বলনা।

(৩)

এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
তুমি দ্রুতপদে যাবে ?— পায়ের শবদ হবে,
তা তুমিত যেতে পারিবে না।
এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।

(৪)

এত লাজ সাজে কি এখনও প্রিয়তমে!
চোখো-চোখি করিবে না, কথা কওয়া দূরে থাক ;
ধিক্ ধিক্ এ পোড়া নয়নে!!
এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
তোমার আপন কাজ ফেলিয়ে যেওনা।

(৫)

এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
মোর পানে চেওনাক, আমিও চাব না ফিরে'।
ঘরে এস,—কি কাজ ;—কর না ?
নতুবা—আসিলে যাহার তরে তাহা ত হল না।
এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।

(৬)

এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
কখন্ পড়িবে কাজ, কখন্ আসিবে ঘরে!—
এই ভেবে বসে আছি চুপটি করিয়া।
আশায় নিরাশ করি চলিয়া যেওনা।
এস এস ঘরে এস ;—কি কাজ—কর না ?

(৭)

এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
ছোঁব না, ছোঁব না তোমা, চাব না তোমার পানে
শুধাব না—বলিব না একটী বচন।
তবু কেন চলি'যাও,—বলনা, বলনা!

(৮)

এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
শুধু আসিলেই ঘরে হৃদয় উঠিবে নাচি,
উছলিবে সুধা-প্রস্রবণ!
এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।

(৯)

এস এস প্রিয়তমে! যেওনা, যেওনা।
বারেক আসিলে ঘরে, মোর প্রাণ তৃপ্ত হবে
তোমার নিশ্বাস-গন্ধ বহিবে পবন—
মুহূর্ত্তে হইবে গৃহ নন্দন-কানন।

(১০)

এত লজ্জা, এত ভয় কেন প্রিয়তমে!
আমি কি তোমার পর ? কেন গো এমন কর ?
কি ফল আমারে বল পীড়িয়া মরমে ?
এত লজ্জা, এত ভয় কেন প্রিয়তমে!

(১১)

তবে কি বাস না ভাল মোরে প্রিয়তমে!
উদাস হৃদয়ে যুবা আকুল-পরাণে বলে,
"তবে কি বাস না ভাল মোরে প্রিয়তমে!"
বল বল প্রিয়তমে! পুড়িনু মরমে।

(১২)

যুবকের এত কথা কোথায় ডুবিল!
একটি তপত-শ্বাস, বালিকা-হৃদয় হ'তে,
উঠি সব উড়াইয়া দিল।
পূর্ব্বমত ধীর পদে, চলি'গেল লজ্জাবতী,
কিছু নাহি যুবক বুঝিল।
বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণ, অন্তরের বৃত্তিচয়,
একটী তপত-শ্বাসে বিভোর হইল।

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } শ্রাবণ। ১২৯৯। { ৮ম সংখ্যা।

যমুনা।

(১)

একটী বালক আর একটী বালিকা। দুয়ে বড় ভাব, বড় ভালবাসা। জীবনের সেই উষা-কাল হইতে, রবির প্রভাত-কিরণের সহিত, এই বালক-বালিকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ-কিরণ উদ্ভাসিত হইতেছিল। কেহ দেখিত না, কেহ জানিত না, দু'জনাই দু'জনার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতেছিল। মুহূর্ত্তের বিরহ কাহারও ভাল লাগিত না; কেহ কাহারও 'ছাড়াছাড়ি' হইয়া থাকিতে পারিত না।

গঙ্গার ধারে, ছোট 'খেলাঘর' বাঁধিয়া, দুটীতে ক্রীড়া করিত;—পুতুলের বিবাহ দিত, ফুল তুলিত, চাঁদ দেখিত, সন্ধ্যার জ্যোৎস্নালোকে গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট তরঙ্গগুলি উঠিত, তাহাই দেখিত। কত কথা, কত গল্প, কত হাসি! সেই গল্প ও হাসির মাঝে, কখন কখন নীরব হইয়া, দু'জনা দু'জনার মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিত। পরস্পর পরস্পরকে কত সুন্দর দেখিত! নির্ম্মল ভাবিত,—যমুনা কত সুন্দর! বুঝি, সেই চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল হাস্যময়ী প্রকৃতির শোভা, সে সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়! বুঝি, আপনার চিন্তা-শূন্য, সুখপূর্ণ, নির্ম্মল ও সুন্দর হৃদয়টুকু, যমুনার সৌন্দর্য্যে নিষ্প্রভ! যমুনাও ভাবিত,—নির্ম্মল কত সুন্দর! তেমন সুন্দর, সে বুঝি, পৃথিবীতে আর দেখে নাই। বালিকা আপনার রূপের রাশি দেখিতে পাইত না,—শ্যামবর্ণ নির্ম্মলের রূপ, তাহার কাছে জগতে অতুল! তাহারা কেহ কাহাকে এ কথা বুঝাইতে পারিত না; কিন্তু বাল্যকাল হইতে এইরূপ ভাবিত।

তখন কেহ বুঝিত না; কিন্তু এইরূপে দুইটী বালক-বালিকার বড় সুন্দর ভাব হইল। ক্ষুদ্র খেলাঘরের মাঝে বসিয়া, ক্ষুদ্র হৃদয় দুটীর এমনই মিলন হইল। পুতুলের বিবাহ দিতে দিতে আপনারাও দিনের মধ্যে দশবার করিয়া বিবাহিত হইত! কে দেখিত?—উপরে সুন্দর আকাশ, নিম্নে স্বচ্ছ-সলিলা গঙ্গা, গঙ্গাতীরে দু'একটী বৃক্ষ-বল্লরী, তাহারাই দেখিত। বর, আপনিই পুরোহিত হইত, আপনিই সম্প্র-দান করিত; ক'নে চক্ষু বুজিয়া, ঘোমটা দিয়া, আপনিই ক'নে সাজিত, আবার ক'নের মা হইয়া বরকে বরণ করিত! সংসারের সুখ-দুঃখ সেখানে ছিল না। শুধু কথা, শুধু হাসি, শুধু গান! নানা দুঃখে কাতর-প্রাণ হইয়া, কত-বার তোমায়-আমায় শৈশবের সেই খেলাঘর পানে নিরীক্ষণ করি! হায়, এ জীবনে তাহা আর মিলিবে কি?

বালক-বালিকার উষাকাল খুব পরিষ্কার! আকাশ নির্ম্মল, হৃদয় প্রফুল্ল! জীবন-মধ্যাহ্নে, কে জানে, কি নিহিত আছে!

(২)

মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাট। ঘাটের অনতিদূরে একটী দ্বিতল বাটীতে যমুনার পিতা বাস

করিতেন। তাঁহার আয় অতি সামান্য ছিল; খরচও অল্প ছিল। পরিবারের মধ্যে যমুনা ও তাহার পিতা-মাতা, আর একটী পরিচারিকা ছিল। অন্য পুত্র-সন্তান না হওয়ায়, যমুনা তাহার পিতা-মাতার বড় স্নেহ ও আদরের ধন ছিল। যমুনার অতুল রূপরাশি ও সরল হাসিটুকু, তাঁহাদের বড় আনন্দের ছিল। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, ঈষদ্বক্র, অলকাগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে, চঞ্চল হরিণ-শিশুর ন্যায়, যমুনা যখন তাহার পিতার কাছে ছুটিয়া আসিত, তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। যত্ন করিয়া তিনি কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইতেন; কন্যাও রীতিমত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

নির্ম্মল বড় গরীবের ঘরের ছেলে। যমুনার বাটীর পার্শ্বে তাহাদের একটী কুটীর ছিল। সেই কুটীর ও অট্টালিকার মাঝে, খুব উচ্চ এক প্রাচীর ছিল। বালক-বালিকার হৃদয়ের মাঝে কিন্তু কোন ব্যবধান ছিল না। নির্ম্মল শৈশবে পিতৃহীন; এক বিধবা মাতা ভিন্ন, সংসারে আপনার জন আর কেহ ছিল না। পিতৃসঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, তাহাতেই মোটা ভাত-কাপড় এক রকম চলিয়া যাইত। মায়ের যত্নে, নির্ম্মল দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত লেখা-পড়া শিখিতে লাগিল।

নির্ম্মলের তত রূপ ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের গুণে তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইত। সকলেই তাহার প্রশংসা করিত; শুনিয়া দুঃখিনী মায়ের চক্ষে জল আসিত। আর সে ক্ষুদ্র বালিকার? নির্ম্মলের প্রশংসা তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলের প্রতি যমুনার, যমুনার প্রতি নির্ম্মলের ভালবাসা খুব বাড়িতে লাগিল। প্রণয় বলিতে হয়, বল; এখন দুই জনে অবশ্য তাহা বুঝিত। যমুনার বয়স দ্বাদশ বর্ষ, নির্ম্মলের ষোড়শ।

প্রায়ই সন্ধ্যাকালে, মুঙ্গেরের গঙ্গাতীরে নির্ম্মল ও যমুনা বেড়াইত। অধিক লোক-সমাগম হইলে, বালক-বালিকা নিভৃতে যাইত, কত গল্প করিত। কথা কি ফুরাইত? কোন গল্প কি পুরাতন হইত? বক্তা ও শ্রোতা, পরস্পর মুখের প্রতি চাহিলে, আর গল্প হইত না—দু'জনেই হাসিয়া ফেলিত। সেই জন্য একজন গল্প বলিত—মুখখানি ভূমিপানে নত করিয়া; আর একজন সতৃষ্ণ-নয়নে অপরের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিত। সমস্ত আন্তরিক বৃত্তি, দর্শনেন্দ্রিয়ে পর্য্যবসিত হইত; সুতরাং গল্পের দিকে মন থাকা অসম্ভব হইত।

কষ্টহারিণীর সোপানোপরি নির্ম্মলের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, সন্ধ্যাকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া মধুর কবিতাগুলি, যখন তদধিক মধুর-কণ্ঠে যমুনা বলিতে থাকিত; তখন সন্ধ্যা-সমীরণ-চঞ্চল লহরীর মধুর-শব্দের সহিত সেই মধুর-কণ্ঠ মিশিয়া নির্ম্মলের হৃদয়ে সুখের প্রবাহ ঢালিয়া দিত।

"এত বড় আইবুড় মেয়ের, এমন করিয়া একটা যুবকের সহিত বেড়ান কি ভাল দেখায়? উপন্যাসে পড়ি বটে, এমন ঘটনা কিছু নূতন বা আশ্চর্য্যের নহে; কিন্তু তোমার-আমার ঘরের মেয়ের কি এ সব ভাল দেখায়? ভালবাসা আছে,—থাকুক; কিন্তু তাই বলিয়া আর অতটা হওয়া উচিত নহে,—সে বয়স গিয়াছে।"

একদিন কে, যমুনার পিতাকে এই কথা বলিল। তদবধি যমুনা আর বাটীর বাহির হইতে পারিত না। এই সময় হইতে দুই জনের দেখা-সাক্ষাৎ বড় কম ঘটিত। নির্ম্মল, পাঠে নিযুক্ত থাকিত; যমুনাও সংসারের দু'একখানা ছোট ছোট কাজে ব্যস্ত থাকিত। কেহ কাহাকে ভুলিয়াছিল কি? তাহা কি সম্ভব? যমুনা ভাবিত,—নির্ম্মল তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব। নির্ম্মল ভাবিত,—জগৎ বিস্মৃত হওয়া যায়, কিন্তু শৈশব-সঙ্গিনী, হৃদয়ের অমূল্য নিধি যমুনা ভুলিবার নহে! হৃদয়-মন্দিরে যে দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে, সমস্ত জগতের জন্যও তাহা বিস্মৃতি-গর্ভে বিসর্জ্জিতা হইতে পারে না। এই ভাবে কিছুদিন গেল।

(৩)

যমুনা বয়ঃস্থা হইয়াছে, অনূঢ়া রাখা আর ভাল দেখায় না। সম্বন্ধ হইতে লাগিল। যমুনা, পিতা-মাতার বড় আদরের ধন, খুব সৎপাত্রেরই চেষ্টা হইতে লাগিল। পিশাচের দেশ হইয়াছে, দয়া-ধর্ম্ম সব যাইতে বসিয়াছে;—সৎপাত্র মিলিল বটে, কিন্তু অর্থ কোথায়? যমুনার পিতা অর্থ-প্রদানে অসমর্থ হইলেন, সুতরাং পাত্রও

মিলিল না। টাকা নাই বলিয়া, লক্ষ্মীছাড়া পাত্রের হস্তে, কন্যাকে সমর্পণ করিতে, কোন্ পিতা পারত-পক্ষে স্বীকৃত হন?

সকলে জানিত এবং বুঝিলও যে, যমুনা ও নির্ম্মল, পরস্পরকে বড় ভাল বাসে; দু'জনের বিবাহ হইলে, দু'জনেই সুখী হইবে; কিন্তু যমুনার পিতা বা মাতা, কাহারও সে ইচ্ছা ছিল না। নির্ম্মল,—সচ্চরিত্র, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্; কিন্তু নিঃস্ব। সহায় নাই, সম্পদ্ নাই, কি দেখিয়া কন্যা দান করা যায়? কাজেই তাহা হইল না। যমুনা, সে কথাও শুনিল।

নির্ম্মলও তাহা শুনিল। কথাটা নূতন কি? তা' নহে,—নির্ম্মলও তাহা ভাবিত। তাহার মাতার বড় সাধ ছিল, যমুনাকে বধূ করেন। কিন্তু অবস্থার হীনতায় সে আশা পূর্ণ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব, তাহাও জানিতেন। নির্ম্মলও সে সব বুঝিত। কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া, কে, কবে, ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিতে পারিয়াছে?

যাহা হইবার, তাহাই হইল। যমুনার বড়ই ভাবান্তর ঘটিল। নির্ম্মলের ম্লান মুখখানি, তাহার হৃদয়ের সকল অবস্থাই ব্যক্ত করিল। বালিকার বুকে সে আঘাত লাগিল।

মায়ের প্রাণে লাগিল। কিন্তু পিতা বলিলেন, "বালক-বালিকার এ প্রকার ভাব, বয়সের একটা পিপাসা মাত্র। পরস্পরকে যদি পৃথক্ রাখা যায় ও দেখা সাক্ষাতের সুবিধা না দেওয়া হয়, তবে এক দিন, দুই জনেরই হৃদয় হইতে এ ভাব অপসৃত হইতে পারিবে।" এই ভাবিয়া তিনি নির্ম্মলকে আর বাটীতে আসিতে দিতেন না, কিংবা কন্যার সহিত দেখা করিতেও দিতেন না। কিন্তু তাহাতে হইল কি? বাধা পাইয়া যেমন নদী-স্রোত দ্বিগুণবেগে বাধা অতিক্রম করে, ইহাও সেইরূপ হইল। বস্তুতঃ আকর্ষণটা যেন দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠিল। জীবনের এত খানি এমনি ভাবে আসিয়া, কে কাহাকে ভুলিতে পারিয়াছে? দেখা করিতে দাও বা না দাও, হৃদয় হইতে এ স্মৃতি মুছিবার নহে। কালে সবই যায় সত্য; কিন্তু ইহার উপর কালের আধিপত্য কতটুকু?

দেখা হইত না বটে, কিন্তু কোন মুহূর্ত্তে কেহ কাহারও চিন্তার শূন্য থাকিত না। তাহাদের কি গভীর ভাবনা, তাহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু এখন হইতে, দু'জনেই দু'জনের আশা ছাড়িল।

(৪)

বর মিলিল। সুবোধচন্দ্র নামে বিংশতি-বর্ষীয় এক যুবা, যমুনার রূপে মোহিত হইয়া, বিনা পয়সায়,—এমন কি, ঘর হইতে সকল খরচ-পত্র করিয়া, অধিকন্তু যমুনার পিতাকে কিছু টাকা দিয়া, বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল। সুবোধ,—ধনীর সন্তান; লেখা-পড়ায় যদিও তত অনুরাগ নাই, তবে বুদ্ধিহীন নহে। পাত্রের রূপ আছে, ধন আছে, একটা 'ঘরানা-ঘরের' ছেলেও বটে,—পিতা-মাতার বড়ই আনন্দ হইল এবং যমুনার বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

ক'নে দেখা হইল। যমুনার রূপের রাশি সুবোধ দেখিল,—জগতে অতুল। সুবোধ, তাহাদেরই প্রতিবাসী; অনেকবার সুবোধ,—যমুনা ও নির্ম্মলকে দেখিয়াছে, তাহারাও সুবোধকে দেখিয়াছে। এক দিন—তখন যমুনার বয়স দশ বৎসর মাত্র,—সাঁতার দিতে দিতে, যমুনা, গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছিল; ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গার মাঝামাঝি একটা নিমজ্জিত পাহাড়ের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল; নির্ম্মল আপনার পৃষ্ঠের উপর যমুনাকে লইয়া আসিতে আসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সুবোধ সে দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের দু'জনকেই তুলিয়া আনিল। বালিকা ধীরে ধীরে তীরে উঠিয়া মনে মনে সুবোধকে ধন্যবাদ দিয়াছিল। কি করুণ-নয়নে সে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল! সুবোধ সেদিন যমুনাকে কত সুন্দর দেখিয়াছিল। সুবোধের তখন বিবাহের কথা হইতেছিল। কিন্তু সেই গঙ্গাস্রোতে ভাসমানা ও পরে গঙ্গাতটে আনীতা দশম-বর্ষীয়া বালিকা যমুনার স্বর্গীয় রূপরাশি তাহার মনে জাগিতেছিল। অন্যত্র বিবাহ করিতে সুবোধের ইচ্ছা হইল না। কিন্তু সকলে এইরূপ বুঝিত যে, নির্ম্মল ও যমুনার বড় ভাব, বড় ভালবাসা,—তাহাদেরই বিবাহ হইবে। সুবোধ এক প্রকার নিরাশ হইয়াছিল। আজ আবার প্রায় তিন বৎসর পরে, সেই যমুনার সহিত তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া, সুবোধ আনন্দে অধীর হইল।

ক'নে দেখার দিনে, সুবোধের সেই কথা

মনে পাড়ল। তাহার পর তিন বৎসর গিয়াছে, এই তিন বৎসরে যমুনার রূপ আরও কত বাড়িয়াছে। মুখখানি মলিন, প্রশান্ত চক্ষু দুটী অপ্রফুল্ল,—সুবোধ কিন্তু তাহা আরও সুন্দর দেখিল। বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল।

সুবোধ কি জানিত না, যমুনা নির্ম্মলকে কত ভালবাসে? জানিত বৈ কি,—সকলেই জানিত। কিন্তু যমুনার পিতা-মাতার মত সুবোধও ভাবিল যে, তাহার সহিত বিবাহ হইয়া গেলে, যমুনা নির্ম্মলকে অবশ্যই ভুলিবে।

(৫)

একজন কেবল ভুলিল না। যমুনাদের যে পরিচারিকা ছিল, সেই কেবল বুঝিল, অন্যরূপ। পরিচারিকার নাম ছিল—লক্ষ্মী; বয়স ২৪।২৫ বৎসর, শ্যামাঙ্গী। লক্ষ্মী ভদ্রঘরের মেয়ে, শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীনা হইয়া, দূর-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের নিকট থাকিত। তাহারা বিবাহ দেয়। বিবাহের কিছুদিন পরেই বিধবা হইয়া, দারিদ্র্যের কণ্টকাকীর্ণ মুকুট মাথায় পরিয়া, লক্ষ্মী এই গৃহের পরিচারিকা হইল। সমস্ত দিন কাজ-কর্ম্ম করিত; আহারান্তে, রাত্রে শয্যায় শুইয়া, প্রতিরাত্রেই সে, কে জানে কেন কাঁদিত। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিত, মাথার বালিস জলে ভিজিয়া যাইত। তাহার দুঃখ সেই বুঝিত; আর বুঝিত,—তাহার হৃদয়ের দেবতা।

লক্ষ্মীর সুখ-দুঃখের ভাগী ছিল—যমুনা। যমুনাকে সে, আপনার ভগিনীর মত ভালবাসিত; দুয়ে খুব প্রীতি ছিল। লক্ষ্মীর প্রকৃত পরিচয় কেবল যমুনাই জানিত; লক্ষ্মী সে কথা আর কাহাকেও বলে নাই—যমুনাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছিল। দু'জনেই দু'জনের ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী। কেহ কাহারও কাছে কোন কথা লুকাইত না। তাই লক্ষ্মী বুঝিয়াছিল,—যমুনা নির্ম্মলকে ভুলিতে পারিবে না। ইহাদের ভালবাসায় রূপের তৃষ্ণা নাই যে, একদিন সে ভাব তিরোহিত হইতে পারে। যদি সুবোধের সহিত যমুনার বিবাহ হয়, তবে যমুনা সুখী হইতে পারিবে না।

লক্ষ্মী, যমুনাকে সান্ত্বনা করিত,—আশাও দিত। সে, এ সব কোথা হইতে বুঝিয়াছিল, কে তাহাকে ভালবাসার কথা শিখাইয়াছিল, আমরা জানি না। যেমন ঘটিয়াছিল, আমরা তেমনি বলিতেছি।

যখন সুবোধ ও যমুনার বিবাহ ঠিক হইয়া গেল, তখন সকল আশাই নির্ম্মূল হইল। যমুনা কাঁদিল, লক্ষ্মীও কাঁদিল। লক্ষ্মী কি ভাবিল; বলিল, "তুমি নিশ্চিন্ত হও, এ বিবাহ কখনই হইবে না।"

যমুনা, এ কথা, এ সময় বিশ্বাস করিতে পারিল না,—মন প্রবোধ মানিল না; লক্ষ্মীর ক্রোড়ে মুখ রাখিয়া, আরও কাঁদিতে লাগিল। আমরা বালক-বালিকার জীবনের উষাকাল খুব পরিষ্কার দেখিয়াছিলাম। জীবন-মধ্যাহ্নে তাহাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল! এ মেঘ কি কখন অপসৃত হইবে?

---

(৬)

নির্ম্মলের বড় ভাবনা হইল। আর কি কোন আশা নাই! কাজ-কর্ম্ম ভাল লাগে না, পড়ায় মন নাই, কোন কিছুতেই স্পৃহাও নাই। পুত্রের এ অবস্থা দেখিয়া, মাতা চিন্তিতা হইলেন; কিন্তু তিনি আর করিবেন কি?

অতীতের কত কথা মনে পড়িল। সেই শৈশব কাল, সেই গঙ্গাতটে খেলাঘর, সেই ক্রীড়া, সেই গল্প, সেই পুতুলের বিয়ে, তার পর আপনাদিগের বিবাহ,—সে কতদিনের কত কথা নির্ম্মলের স্মৃতিমাঝে জাগিয়া উঠিল। দুইজনের বিবাহ হইলে কোথায় বাড়ী করিবে, কেমন থাকিবে, কত ভালবাসিবে,—একে একে তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। আরও কত কথা, তাহা আর কি বলিব! ভাবিতে ভাবিতে, নির্ম্মল সুখশান্তি-হারা হইল।

সন্তানের দুঃখে মায়ের প্রাণ কাঁদিল। মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া, নির্ম্মল আরও দুঃখিত হইল। কিন্তু এবার ভাবিল,—"আর এমন করিব না,—যমুনাকে ভুলিব।"

কিন্তু চেষ্টা করিয়া কে কাহাকে ভুলিতে পারে? ভুলিবার চেষ্টাই ভুলিবার প্রধান অন্তরায়। নির্ম্মলের মাতা নির্ম্মলকে কিছুদিন মাতুলালয়ে যাইতে বলিলেন। নির্ম্মলও স্বীকৃত হইল; কিন্তু

যাইবার আগে যমুনার সাহত একবার দেখা হয় না!

দেখা হইল, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য। যমুনা কাঁদিল না, কিন্তু কাঁদিলে বুঝি ভাল হইত।

কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে মর্ম্মভেদী কাতর-দৃষ্টি, সে কথাহীন ব্যথা, সে নিরাশার দীর্ঘশ্বাস বুঝিবার,—বুঝাইবার নহে।

দেখিতে দেখিতে উভয়ের চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। নির্ম্মল রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"যমুনা! ইহকালে আমরা সুখী হইলাম না, পরকালে আমাদের সুখ আছে। জীবন অনন্ত, কালও অনন্ত। কোন জীবনে, কোন কালে কি তোমাকে পাইব না? সেই আশায় বাঁচিয়া রহিলাম।"

যমুনা কোন উত্তর করিল না,—উত্তর করিতে পারিল না; মনে মনে কহিল,—"বুঝিয়াছি, আমার মৃত্যু সন্নিকট। নির্ম্মল! কেন তোমাকে এত ভাল বাসিয়াছিলাম?"

(৭)

যমুনার মাতা ক্রমে সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন,—কন্যার সুখ আর হইবে না। তখন স্বামী-স্ত্রীতে ভাবিলেন। কিন্তু অনেক বিলম্বে সে ভাবনা আসিয়াছিল। সুতরাং কোন ফল দর্শিল না। যমুনার পিতা বলিলেন,—"দূর হউক, ওকথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি'ত সৎপাত্র দেখিয়া কন্যাদান করি, তা'র পর মেয়ের অদৃষ্টে যা'থাকে।"

যমুনা আর কাঁদে না, বুক বাঁধিয়াছে। নীরবে, নিভৃতে কিন্তু এক একবার বুকটা হুহু করিয়া উঠিত। সে সময় বালিকা, কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত,—"হে দেব! আমায় বল দাও!"

আর নির্ম্মল?—হতভাগ্যের জীয়ন্তে সমাধি হইল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, অবিরাম সে একটা মহাশূন্য অনুভব করিতে লাগিল। যমুনা বিনা সে শূন্য স্থান কে পূরণ করিবে? নির্ম্মল এক্ষণে মাতুলালয়ে। মধুপুরের সুন্দর পাহাড়শ্রেণী তাহার কাতর প্রাণে কখন কখন কিছু শান্তি দিতে পারিত। নির্ম্মল দেখিত,—পাহাড়গুলির উপর স্থানে স্থানে শ্যামল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগাছ গুলি বড় সুন্দর। কৃষকদিগের দু'একখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, পাহাড়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া আছে। কোন কুটীরের চালাখানি ঢাকিয়া, মাধবী-বল্লরী গুলি বুকে বুকে জড়াইয়া, অনেক প্রাসাদ অপেক্ষা, সে কুটীরের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। চন্দ্রকিরণ পাহাড়ের উপর নিপতিত হওয়াতে বড় সুন্দর শোভা হইয়াছে।

নির্ম্মল পাহাড়ের উপর বসিয়া বসিয়া, এই সব দেখিতে দেখিতে, কিছু অন্যমনস্ক হইত। ভাবিত,—"আমি,ধনহীন বলিয়া, হৃদয়ের অমূল্য-রত্ন-লাভে বঞ্চিত হইলাম! কেন, কখন কি ধন উপার্জ্জন করিতে পারিব না? না পারি, এই যে সুন্দর স্থান, সুন্দর কুটীর, এমনি স্থানে, এমনি একটী কুটীর বাঁধিয়া, কি তাহাকে লইয়া থাকিতে পারিব না? উপরে ঐ নির্ম্মল আকাশ, এই নির্জ্জন স্থান, এমন পাহাড়শ্রেণী, এমন বৃক্ষরাজী, এই কুটীরগুলি,—কেন, ইহা অপেক্ষা কি অট্টালিকা সুন্দর? এই বিলাস-আড়ম্বরশূন্য, স্বার্থ-মলিনতা-হীন, সরল-হৃদয় দরিদ্র কৃষকগণের এ অবস্থা কি ঘৃণিত? যমুনাকে লইয়া এ পর্ণকুটীরে বাস করিলেও আমি স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতাম। হায়, কোন্ পাপে, কাহার অভিশাপে, আমি দেবী-প্রতিমায় বঞ্চিত হইলাম! দীননাথ! জন্ম-জন্মান্তরেও কি সে স্বর্গ-জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইব না?"

চক্ষে জল আসিল। নির্ম্মল এমনি করিয়া কতরাত্রি অতিবাহিত করিত। ভুলিতে কি পারিত? প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া একটী বাগানে ভ্রমণ করিত। দেখিত,—একটী কামিনী-বৃক্ষতলে বসিয়া, বালক-বালিকাগণ ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতেছে। সে দৃশ্য দর্শনে নির্ম্মলের চক্ষে জল আসিত।

---

(৮)

যেদিন যমুনা ও সুবোধের বিবাহ, সেদিনে কি বিঘ্ন বশত বিবাহ রহিত হইল। সে দিনের পর সাত দিন গিয়াছে।

আজ বিবাহ। সুবোধ, ধনীর সন্তান; খুব সমারোহ, খুব ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। ক'নের

বাড়ীতেও ধুম কম নহে। খরচটা ত যমুনার পিতার নহে,—বরেরই সব। এত সমারোহ হইলেও, যমুনার পিতা-মাতা কিন্তু বড় প্রফুল্ল নহেন। শ্রাবণের মেঘের মত কন্যার সে মলিন মুখখানি দেখিয়া, কাহারও তেমন আনন্দ নাই। তাঁহারা বুঝিলেন,—কাজটা ভাল হইল না। কিন্তু ভাবিবার আর সে সময় নাই,—বর আসিয়াছে।

যমুনা আগে বরং ভাবিত। বিবাহের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সে তত দৃঢ় হইল; কিন্তু ভুলিতে পারিল না। প্রফুল্ল থাকিতে চেষ্টা করিত,—পারিত না। বাটীর পার্শ্বে নির্ম্মলদের কুটীরখানি দেখিয়া, সে বড় বড় করুণ-আঁখি দুটী জলে ভরিয়া যাইত! নির্ম্মল কোথায় গিয়াছে, কেমন আছে;—লোকে বলিত, সে পাগল হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সেই সব যমুনা ভাবিত। তাহারই জন্য নির্ম্মল পাগল? তাহার মায়ের দশা কি হইবে? তিনি কি কিছু শুনিয়াছেন? মধুপুরে কি তবে নির্ম্মল নাই? জলে চক্ষু ভরিয়া ছিল, এখন জলে বুক ভাসিতে লাগিল। তখন সরলা বালিকা, যুক্তকরে—উর্দ্ধনেত্র হইয়া, সন্ধ্যাকাশ পানে চাহিয়া, কাহাকে কি জানাইল। দেবতাও কি বালিকার সে মর্ম্ম-কাতরতা শুনিলেন না?

যমুনা এইরূপ করিত। আর ব্যথার ব্যথী লক্ষ্মী?—সে দিনরাত কি ভাবিত, মাঝে মাঝে যমুনাকে সান্ত্বনা করিত। বিবাহের দিন প্রাতে লক্ষ্মী শুনিল,—নির্ম্মল তাহার বৃদ্ধ মাতামহীকে লইয়া মুঙ্গেরে আসিবে ও তথা হইতে মাতাকে লইয়া, সকলে কাশীযাত্রা করিবে। নির্ম্মল পাগল হইয়াছে—সকলে বলিত, কিন্তু তাহার মাতা কাহারও কথা বিশ্বাস করিতেন না। সেইদিন মধ্যাহ্নে নির্ম্মল আসিল। কি-জানি, লক্ষ্মী কেবলই সংবাদ লইতেছে,—নির্ম্মল আসিয়াছে কি না। যখন নির্ম্মলের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহার বড় আনন্দ হইল। লক্ষ্মীর ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল,—যমুনার সহিত নির্ম্মলেরই বিবাহ হইবে। পরদিন প্রাতে কাশীযাত্রা হইবে, সব ঠিক হইল। নির্ম্মল, তাহার মাতা, দিদী-মা ও এক গুরুপুত্র,—এই চারিজনে যাইবেন। নির্ম্মল ভাবিল,—মুঙ্গের হইতে তাহার দোকান-পাট জন্মের মত উঠিল। মাতা ভাবিলেন,—কাশীতে যাইয়া, ছেলের একটী বিবাহ দিব।"

(৯)

বিবাহ-সভায় বর আসিয়াছে। লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে আলো আর ফুল; গান আর বাজনা। বৈশাখ মাসের শুক্লাদশমী তিথি; জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক্ প্রফুল্ল। আনন্দ-কোলাহলে বিবাহ-বাড়ী পূর্ণ।

কন্যা-সম্প্রদান হইবে, যমুনাকে বিবাহ-স্থানে আনা হইল। অমনি চারিদিকে "বউ দেখি" "বউ দেখি" রব উঠিল। একজন যমুনার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিল। সকলে দেখিল,—সুন্দর রূপ, চাঁদপানা মুখ। কিন্তু কেহ দুঃখিত হইল, কেহ আশ্চর্য্য হইল,—যমুনার চক্ষে জল! এমন শুভ দিনে একি অমঙ্গল!

এই সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—উদ্‌ভ্রান্ত-বেশে নির্ম্মল সেই সভা-মাঝে উপস্থিত। মুখে কথা নাই, চক্ষের পলক নাই, কি এক গম্ভীর অথচ প্রশান্ত ভাব। সকলে পাগল বলিয়া জানিত; কেহ দুঃখ করিল, কেহ উপহাসও করিল। নির্ম্মল, চিত্রার্পিত স্থির-নেত্রে দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া সব দেখিল, শেষে কাঁদিয়া উঠিল। শৈশব-সঙ্গিনী, হৃদয়ের অমূল্য-নিধি আজ সে হারাইতে বসিয়াছে। এ হারানিধি কি সে আর পাইবে?

এইবার সকলে দুঃখ করিল, দু'একজন বন্ধুও কাঁদিল। নির্ম্মল উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে, বিকলকণ্ঠে কহিল, —"যমুনা! যমুনা! দেখ, এই আমার বিবাহ।"

দেখিতে না-দেখিতে, চক্ষের পলক ফেলিতে না-ফেলিতে, শাণিত ছুরিকা লইয়া নির্ম্মল আপন বক্ষে বসাইয়া দিল। বিবাহ-সভায় রক্ত-গঙ্গা বহিতে লাগিল।

"সর্ব্বনাশ" "সর্ব্বনাশ" চারিদিকে গোল পড়িল। যমুনার পিতা ধূল্যবলুণ্ঠিত নির্ম্মলের রক্তাক্ত দেহ আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

(১০)

কেহ বলিল, "ধন্য ভালবাসা!" কেহ বলিল, "পাগল হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, তাই এমন কাজ করিল।" নির্ম্মল চক্ষু মেলিল, ক্ষীণকণ্ঠে জল

প্রার্থনা করিল। জল দেওয়া হইল। নির্ম্মল অতি কষ্টে কহিল,—"আমি চলিলাম, হৃদয়ের অবলম্বন হারাইয়া কোন্ প্রাণে বাঁচিয়া থাকিব? যমুনা দেবী, আমি দেবী-হারা হইয়া থাকিতে পারিব না, তাই এমন কাজ করিলাম। কেহ আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না।"

যন্ত্রণা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কাতরকণ্ঠে আবার বলিল,—"জন্মের শোধ একবার তাহাকে দেখাও, একবার কাছে আসিতে দাও।"

পুরোহিত নিষেধ করিলেন; কিন্তু সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিল, মৃত্যু-কালে একবার দেখাইতে হানি নাই।

পিতার আজ্ঞাক্রমে যমুনা তথায় আনীতা হইল। অল্প অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া, নির্ম্মলকে তদবস্থায় দেখিল। চারিচক্ষের মিলন হইল। যমুনা কাঁদিতে লাগিল। মধুমতী নদীর ন্যায়, সে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নির্ম্মলের রক্তাক্ত-দেহোপরি সে অশ্রুরাশি যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল।

সকলেই যমুনার পিতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অতৃপ্ত-লোচনে নির্ম্মল, যমুনার অশ্রু-প্লাবিত মুখপানে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে বলিল,—"যমুনা! আমি ত চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি,—সুবোধকে বিবাহ করিয়া সুখী হও, আমাকে ভুলিয়া যাও।"

সেই নিষ্প্রভ চক্ষে আবার জলধারা বহিল। আবার অতি কষ্টে কহিল,—"যমুনা! আজ তের বৎসর ধরিয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছি; আপনার সহিত কত সংগ্রাম করিয়াছি; শেষে মরিয়া জুড়াইলাম! আমার অর্থ-হীনতায় আমাদের মিলন হইল না। উপরে দেবতা আছেন, তিনি জানেন,—'তুমি আমার, আমি তোমার।' কেহ আসিয়া তোমার-আমার সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

নির্ম্মল হস্ত প্রসারণ করিল, যমুনা সে উত্তপ্ত হস্তের উপর আপনার হস্ত দিল। নির্ম্মল সে হস্ত আপনার বুকের উপর রাখিয়া কাতরস্বরে কহিল,—"যমুনা! বাল্যকালের সে খেলা মনে পড়ে কি? সেই বিবাহ? আজও আমাদের বিবাহ!"

পুরোহিত বলিলেন,—"নির্ম্মল! তোমার মত হতভাগ্য আমি এ জীবনে দেখি নাই। আশীর্ব্বাদ করি, পরকালে সুখী হইও।"

তখনও নির্ম্মল ও যমুনা হাতে হাত দিয়া আছে। ক্রমশঃ নির্ম্মলের চক্ষু স্থির হইয়া আসিল; জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হইল।

যমুনা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মা! আমিই তোমার এ দশা করিলাম!"

পুরোহিত বলিলেন,—"আজ আর কন্যা সম্প্রদান হইবে না।"

পিতা কহিলেন,—"আর কন্যা-সম্প্রদানে কাজ নাই,—আজ হইতে আমার কন্যা বিধবা!"

সব ফুরাইল।

বিবাহের পূর্ব্বে "কোর্টশিপ্" করিয়া অনেক স্থলে বিবাহের পূর্ব্বেই এক প্রস্থ 'বিধবা' হইতে হয়।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত

বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ।

বাঙ্গালা ভাষার গড়ন কি প্রকার হওয়া চাই, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাই এখন কঠিন সমস্যা হইয়াছে। আমরা যে রকম ভাষায় কথা কই, লিখিতে বসিলে ঠিক সেই রকম সোজা সোজা চলিত কথা দিলে ভাষা শুনিতে ভাল হইবে, না—ছাঁকা সংস্কৃত শব্দ দেওয়া চাই?—লোকের এ গোল আজিও মিটিতেছে না।

কেন মিটিতেছে না? না মিটিবার কারণ ঠিক করা সহজ। গ্রাম্য-দোষ বলিয়া একটা নিন্দাবাদ আছে, লেখকদের তাহাই ভয়। আর এক ভয়,—লোকের রুচি। যাঁহারা কেবল সংস্কৃত-ব্যবসায়ী, লিখিত পুস্তকের ভিতরে সোজা সোজা চলিত বাঙ্গালা কথা দেখিলে তাঁহাদের মন রসে ভিজে না। "গাছের তলায়," "গাছের ছায়ায়"—পুস্তকের মধ্যে এমন সকল শব্দের প্রয়োগ দেখিলে তাঁহারা ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, লেখকদের তাহাই ভয়। লোকের রুচির পানে চাহিয়া অনেকে সোজা বাঙ্গালা শব্দ দিয়া পুস্তক লিখিতে ভয় করেন।

কিন্তু সে ভয় অমূলক। সকল কাজেই সোজা ও সরল ভাব ভাল। মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারাই, ভাষা-সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আমি প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম, ভাষা আমার মনের হাব-ভাবের চিত্র। আমার মনে যাহা হইতেছে, কথায় তাহাই ঠিক খুলিয়া বলিব,—লোকে যেন আমার মনের ভাব অবিকল বুঝিতে পারে। তাহা হইলেই ভাষার অঙ্গ-পুষ্টি ষোল-কলায় পূর্ণ হইল। আমরা জল-পূর্ণ-মেঘ-গম্ভীরনাদে ভাষাকে গর্জ্জন করাইতে চাই না। বড় বড় সন্ধি, বড় বড় সমাস, বড় বড় শব্দের ঘটা ভাবকে ঢাকিয়া রাখে। ভব-ভূতির গভীর ভাব, বাণভট্টের রসাল গল্প, শব্দাড়ম্বরের ভিতরে চাপা পড়িয়া আছে।

তাই বলিতেছি,—"সকল কাজেই সোজা ও সরল ভাব ভাল।" আরও এক কথা আছে,—কোন কোন বিষয় সহজ চলিত শব্দে যেমন স্পষ্ট খুলিয়া বলা যায়, অপ্রচলিত কঠিন শব্দে তেমন যায় না। দুই একটা উদাহরণ দেখাই। "চালাক," "জালিয়াত"—এই শব্দগুলি দ্বারা লোকে যেমন উহাদের মর্ম্মার্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে,—"চতুর," "কূট-লেখক" ইত্যাদি বিশুদ্ধ সংস্কৃত-শব্দ প্রয়োগ করিলে তেমন স্পষ্ট ভাব লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

যে ভাষা সকল দিকে ফিরাইতে পারা যাইবে, সকল দিকে ঘুরাইতে পারা যাইবে; যে ভাষায় গুরুতর জটিল বিষয়ও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যাইবে,—লোকের কাছে সেই ভাষারই আদর। সীতার বনবাসের ভাষা দিয়া যদ্যপি সংবাদপত্র লেখা হইত, তাহা হইলে অভিধান হাতে লইয়া ও গুণবান্ পণ্ডিত মহাশয়কে সম্মুখে রাখিয়া কয় জন লোকে খবরের কাগজ পড়িতে বসিত? পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি, ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি শাস্ত্র যদি তৃতীয়ভাগ চারুপাঠের ভাষায় লিখিত হইত; তবে বিদ্যালয়ের ছেলেরা পৌত্রের পিতামহ হইয়া উঠিলেও পড়ার এক পরিচ্ছেদ সাঙ্গ করিতে পারিত না।

বেশ, তাহা যেন হইল; কিন্তু রুচির কথা কি? সোজা চলিত ভাষায় পুস্তক লিখিলে সকল লোককে ভাল লাগিবে না, তবে পাঠকের রুচি জন্মাইয়া দিবে কে? কেহ কেহ ভাবিবেন,—এ সমস্যা বড়ই উৎকট। কিন্তু তাহা নয়। রুচি জন্মাইয়া দিবে,—সময় আর অভ্যাস। অভ্যাস না থাকায় তাহা মন্দ লাগে, অভ্যাস হইলে তাহাই আবার ভাল লাগে যাঁহারা পেঁয়াজ-রসুন খাইয়া থাকেন, পেঁয়াজ-রসুন দিয়া তর-কারি না রাঁধিলে তাঁহাদিগকে ব্যঞ্জন সুস্বাদু লাগে না। আমরা ব্রাহ্মণসন্তান; পেঁয়াজ-রসুন খাই না; রন্ধনের সময়ে কেহ পেঁয়াজ-রসুনের ফোড়ন দিলে তাহার দুর্গন্ধে নাড়ী পর্য্যন্ত উঠিতে আসে। কিন্তু মুখ সিঁট্‌কাইয়া দিন কতক যদি পেঁয়াজ-রসুন খাইতে অভ্যাস করা যায়, তখন তাহাদের সুরস-আস্বাদে মুখ দিয়া আবার লালা ঝরিতে থাকিবে। চীনদেশে মহিলা-গণের পা দুখানি ছোট ছোট হইবে, মিট্‌মিটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু হইবে,—তবেই রমণীকুলের সৌন্দর্য্য-গরিমা। সেখানে প্রসারিত মৃগ-নয়নের আদর নাই; তাই সে রুচি আমাদের সঙ্গে মিলে না। বেশ আকর্ণ-টানা, ভাসা-ভাসা, ঢল-ঢলে' চক্ষু হইবে,—আমরা তাহাই ভালবাসি। পূর্ব্বে বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা বাঁকমল পরিতেন; কপালে, নাকে, হাতে উল্কী পরিতেন; মাথায় মোমের পেটী পাড়িয়া সিঁদুর লেপিতেন,—আজও বাঙ্গালার অনেক স্থানে সেই সকল সৌন্দর্য্যভারে রমণী-অঙ্গের শোভা বাড়াইতেছে; কিন্তু আমাদের তাহা আর ভাল লাগে না,—রুচি ফিরিয়া গিয়াছে।

তবে রুচি কি?—অভ্যাস বৈ আর কিছুই নয়। পাঁচ জনে রকম রকম প্রণালীতে সরল ভাষায় পুস্তক লিখুন; তাহার মধ্যে যাহা ভাল হইবে, কালে তাহাতেই লোকের রুচি দাঁড়াইয়া যাইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া কি সংস্কৃত ভাষার অমর্য্যাদা করিতে বলিতেছি?—তাহা নয়। সংস্কৃত ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার জননী। বাঙ্গালার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত। যে গুলি ঠিক সংস্কৃত নয়, তাহাদেরও মধ্যে অনেক শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ইকার, ঈকার; উকার, ঊকার; ষত্ব, ণত্ব; সন্ধি-সমাস প্রভৃতির নিয়ম,—সংস্কৃত ব্যাকরণের মুখ চাহিয়া আমাদিগকে চিরকাল মানিয়া চলিতে হইবে। যদ্যপি ভাষা জটিল না হয়, তবে কোন স্থানে আমরা সংস্কৃত-রীতির অবমাননা করিব না।

বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দের চলন আছে, লেখকদের অনবধানতায় কোথাও তাহাদের ব্যাকরণ-গত দোষ ঘটে, কোথাও বা অর্থগত দোষ ঘটে। যেখানে বাঙ্গালা ভাষা চোরাবাঁকা, দুর্ব্বোধ ও কর্কশ না হইবে, তেমন স্থলে সে সকল দোষ ত্যাগ করা ভাল। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে কতকগুলি শব্দ তুলিয়া দেখাইতেছি।

(১) "আবশ্যক।" (অবশ্যং ভব্যং, অবশ্য + বুঞ্) ইহাতেই 'নিয়ত-করণীয়' এই অর্থ বুঝায়। কাজেই "আবশ্যকীয়" এপ্রকার রূপসিদ্ধি আর হইতে পারে না।

(২) "তাহাতে আমার আবশ্যক নাই?"—এ প্রকার প্রয়োগ হয় না। "তাহাতে আমার আবশ্যকতা নাই," কিংবা—"তাহা আবশ্যক নাই," এইরূপ বলা চলে।

(৩) "বাহ্যিক"। বহির্ভবং + বহিস্ + ষ্যঞ্ = বাহ্যম্। অতএব 'বাহ্য' এই শব্দেই বাহিরের এই অর্থ বুঝায়। 'বাহ্যিক'—এ প্রকার রূপ আর হইতে পারে না।

(৪) "তথাপিও," "অদ্যাপিও"। সংস্কৃত 'অপি' শব্দে বাঙ্গালার "ও" এই অর্থ বুঝায়। কাজেই 'তথাপিও' এ প্রকার লিখিলে বাঙ্গালায় 'তবুওও' এইরূপ দুইবার ওকারের প্রয়োগ হইয়া পড়ে। অতএব, "তথাপি," "অদ্যাপি"—এই প্রকার রূপ থাকিবে।

(৫) "সেখানে একটা হত্যা হইয়া গিয়াছে।" সংস্কৃত হত্যা শব্দ সাধিবার একটী বিশেষ নিয়ম আছে। (হনস্ত চ। পা ৩।১।১০৮। অনুপসর্গে সুপ্যুপপদে হন্তের্ভাবে ক্যপ্ স্যাৎ, তকারশ্চান্তাদেশঃ। স্ত্রীত্বং লোকাৎ)। যদ্যপি উপসর্গ না থাকে, তবে সুবন্ত উপপদের পর হন্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় হয়, অন্তে তকারের আদেশ হয় এবং লৌকিক ভাষায় তাহা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে।

অতএব, "ব্রহ্মহত্যা," "স্ত্রীহত্যা," "গোহত্যা," —এপ্রকার উপপদ ভিন্ন কেবল 'হত্যা' এমন রূপসিদ্ধি হইতে পারে না। কাজেই—'সেখানে একটা হত্যা হইয়া গিয়াছে'—এ রকম না লিখিয়া, "সেখানে একটা খুন হইয়া গিয়াছে,'—এমন কথা লিখিলে আর কোন দোষ হয় না।

(৬) "নীরোগী," "নির্দ্দোষী"—ইহাও ভুল। নির্নাস্তি রোগো যস্য নীরোগঃ। নির্নাস্তি দোষো যস্য নির্দ্দোষঃ। অতএব 'নীরোগ' বলিলেই 'যাহার রোগ নাই', এইরূপ অর্থ হয়। 'নীরোগী' এপ্রকার রূপসিদ্ধি আর হইতে পারে না। স্ত্রীলিঙ্গে "নীরোগা," "নির্দ্দোষা"—এইরূপ হইবে।

(৭) "রহস্য";—অনেকের বোধ আছে যে, এই শব্দের অর্থ—কৌতুক। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; "রহস্য" শব্দের অর্থ গোপনীয়। রহসি ভবং, রহস্ + যৎ।

(৮) "নিরাকরণ"। অনেকের বিশ্বাস যে, নিরাকরণ শব্দে স্থিরতাকে বুঝায়। তাই তাঁহারা বলেন,—"ইহার নিরাকরণ নাই," অর্থাৎ স্থিরতা নাই। নিরাকরণ শব্দের অর্থ দূরীকরণ। "এই সন্দেহ নিরাকরণ করিতে হইবে।"

এইরূপ অনেক শব্দ, বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে, তাহাতে ব্যাকরণ-গত ও অর্থগত বিস্তর দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যত্নপূর্ব্বক সেই সকল দোষের সংশোধন করিলে কোন ক্ষতি হয় না।

বাঙ্গালা ভাষায় "রামের রাজ্যাভিষেক" নামে একখানি পুস্তক আছে। পুস্তকখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য বাছিয়া পছন্দ করা হইয়াছে। ঐ পুস্তকখানি আমি কখন দেখি নাই। কিন্তু জনৈক সুযোগ্য ব্যক্তি উহার ব্যাখ্যা-পুস্তক ছাপাইয়াছেন, তাহাই আমি দেখিয়াছি। (৬৬ নং বীডনষ্ট্রীট,—স্কুলবুক্ প্রেসে মুদ্রিত, ১২৯৬ সাল)। ব্যাখ্যাকার, ব্যাখ্যার মধ্যে পদগুলি যত্নপূর্ব্বক সাধিয়াছেন এবং মূল গ্রন্থকার কোথায় কি দোষ করিয়াছেন, তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যাখ্যার স্থানে স্থানে লেখকের আক্ষেপোক্তিও আছে।

ব্যাখ্যাকর্ত্তা, ব্যাখ্যা-পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় "চক্ষুঃদ্বারা"—এই পদের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,—"এই অদ্ভুত পদ যে কোন্ ভাষা অনুসারে সিদ্ধ, তাহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি কেবল বঙ্গীয় রীতিই অবলম্বন করিতে হয়, তবে "চক্ষুদ্বারা" এবং সংস্কৃত-প্রণালী অবলম্বনীয় হইলে "চক্ষুর্দ্বারা" লেখা উচিত।"

পুনশ্চ, ৫৮ পৃষ্ঠায় "প্রজ্বলিত" শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,—"মূলগ্রন্থে 'প্রজ্জ্বলিত' আছে, অর্থাৎ জকারের দ্বিত্ব আছে। অনেক

বালক 'উজ্জ্বল' পদে দুইটী জকার দেখিয়া 'প্রজ্বলিত' পদেও দুইটী জকার লিখিয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থকারেরাও যে তাদৃশ সংস্কারাপন্ন, ইহা "অসঙ্গত; কেননা, ইহা বর্ত্তমান সভ্যতার বিরোধী। একারণ, বলা আবশ্যক যে, কম্পোজিটারদিগের ও প্রুফ-দর্শকের অমনোযোগিতাতেই এইরূপ হইয়াছে।"

আবার ১২৪ পৃষ্ঠায় "গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে" এই বাক্যের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,—"মূলগ্রন্থে "সত্ত্বে" আছে; বোধ করি, মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ এরূপ অশুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বক্তব্য এই যে, গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠাতেই যদি অশুদ্ধ রহিল, তবে তাহা ছাপাইবার বা কি প্রয়োজন ছিল এবং তাদৃশ অশুদ্ধরাশি-পরিপূর্ণ গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতেই বা কিজন্য নির্দ্ধারিত হইল!! ধন্য বাঙ্গালা দেশ! এখানে অচল চালাইবার যেমন সুযোগ, এরূপ আর কুত্রাপি দেখিতে পাই না।"

এই মিষ্ট ভর্ৎসনায় এখন হইতে সকল গ্রন্থকারই সতর্ক হইবেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই,—মানুষ খুব পণ্ডিত হইলেও কখন অভ্রান্ত হইতে পারে না,—মুনিদেরও মতিভ্রম হয়; তাই ব্যাখ্যাকর্ত্তা পরকে এত ভর্ৎসনা করিয়াও নিজে সাবধান হইতে পারেন নাই,—ব্যাখ্যার মধ্যে তাঁহারও পা টলিয়া গিয়াছে। এখানে কতকগুলি দোষ তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

১০ পৃষ্ঠায় "চক্ষুপ্রীতি"—এখানে "চক্ষুঃ" শব্দের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হইল কেন? যদি মূল পুস্তকে ঐরূপ ভুল থাকে, তবে ব্যাখ্যা-কর্ত্তা তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন?

১৪পৃ—"বিশ্বামিত্র"। ব্যাখ্যাকর্ত্তা লিখিয়া-ছেন,—"সমাসে পূর্ব্বপদের অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হইয়াছে।" বস্তুতঃ তাহা নহে।

মিত্রে চর্ষৌ। পা ৬। ৩ ১৩০। ঋষি বুঝাইলে, 'বিশ্ব' শব্দের উত্তর 'মিত্র' শব্দ থাকিলে পূর্ব্বপদ দীর্ঘ হয়।

অতএব, বিশ্বামিত্র নাম ঋষি। আবার ঋষি না বুঝাইলে "বিশ্বমিত্র" এই প্রকার রূপ হইবে।

২৩ পৃষ্ঠায় "একত্রিত"—এই পদের ব্যাখ্যা-স্থলে লিখিয়াছেন,—"কেহ কেহ বলেন যে, একত্র বলিলেই যখন হয়, তখন একত্রিত পদ নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত; কিন্তু আমরা এমত সমীচীন বোধ করি না। কারণ, একত্র আধিকর-ণিক অব্যয় এবং একত্রিত বিশেষণ পদ। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদ প্রস্তুত করিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় প্রয়োগ করা কোনও মতে অনুচিত নহে।"

এই বিচার সঙ্গত নয়। কোথায় 'ইতচ্' প্রত্যয়ের বিধান হইতে পারে, সেই সূত্রটী বেশ করিয়া বুঝিলে ভ্রম দূর হইবে।

"তদস্য সঞ্জাতং,—তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬। তদিতি প্রথমাসমর্থেভ্যস্তারকাদিভ্যঃ শব্দেভ্যোঽস্যেতি ষষ্ঠ্যর্থে ইতচ্ প্রত্যয়ো ভবতি। (কাশিকা)।" তাহা ইহার জন্মিয়াছে, এই অর্থে তারকাদি শব্দের উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়।

এখানে 'তাহা' এইটী প্রথমান্ত চাই (প্রথমা-সমর্থেভ্যঃ)। "একত্র" ইহা বুঝিতে গেলে সপ্তম্যন্ত পদ। মনে কর, উহার স্থানে যদি "এক সঙ্গে" এইরূপ পদ বসান যায়, তাহা হইলে উহার উত্তর কি ইতচ্ প্রত্যয় বিহিত হইতে পারে?—আর তাহার অর্থই বা কি হইবে?

২২ পৃষ্ঠায় "অপরাহ্ন," ২৮ পৃষ্ঠায় "মধ্যাহ্ন-কাল, ৮৯ পৃষ্ঠায় "পূর্ব্বাহ্নে," ১০৮ পৃষ্ঠায় "সায়াহ্ন"—এখানে সমস্ত পদ গুলিতেই 'দন্ত্য-নকার' করা হইয়াছে কেন? ব্যাখ্যাকর্ত্তা কি বাঙ্গালা ভাষা হইতে মূর্দ্ধন্য ণকারের চলন উঠাইয়া দিতে চাহেন? আর ঐ গুলি যদি ছাপাখানার ভুল হয়, তবে যে পুস্তকে এত ভুল রহিয়া গিয়াছে, তাহা ছেলেদের সম্মুখে বাহির করিয়া তাহাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা উচিত নহে।

অশুদ্ধ—অপরাহ্ন; শুদ্ধ—অপরাহ্ণ।
" পূর্ব্বাহ্নে; " পূর্ব্বাহ্ণে।

২৩ পৃষ্ঠায় "প্রিয়সহচরী", ৭৭ পৃ—"অনুচরবর্গ" ১০৯ পৃ—"তৎসহচর"—এই সকল স্থলে ব্যাখ্যা-কর্ত্তা, 'চর' ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয়ের বিধান করিয়া রূপসিদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভুল।

'চর' ধাতুর উত্তর 'ট' বা 'টক্' প্রত্যয় বিধা-নের স্থল এই,—

চরেষ্টঃ। পা ৩। ২। ১৬। চরের্ধাতেরধিকরণে সুবন্ত উপপদে টপ্রত্যয়ো ভবতি।

অধিকরণ উপপদের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়।

আর একটী—

ভিক্ষাসেনাদায়েষু চ। পা ৩।২।১৭।

ভিক্ষা, সেনা, আদায়, এই সকলের ও অধিকরণ-পদের পর চর ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়।

এখন দেখা যাইতেছে,—'সহচর', 'অনুচর'—এ সকল পদে চর ধাতুর পূর্ব্বে অধিকরণ-পদ নাই; কারণ, সহ, অনু এগুলি অব্যয়। তবে 'সহচর,' অনুচর,' এপ্রকার রূপসিদ্ধি কেমন করিয়া হইল? এখানে 'চর' ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া ঐ সকল রূপসিদ্ধি হইয়াছে এবং পচাদিগণে চরট্' এইরূপ টকার অনুবন্ধ থাকায় স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার বিধান করিতে কোন বাধা হইতেছে না। ভট্টোজিদীক্ষিতও পাণিনির ৩।২।১৭ সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে একটী উহ করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন;—"কথং প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীমিতি, পচাদিষু চরড়িতি পাঠাৎ।"

৩৮ পৃষ্ঠায় "গগনমার্গ—আকাশরূপ পথ। রূপক কর্ম্মধারয়"—এইরূপ লেখা হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। "গগনে মার্গঃ"—এই প্রকার সপ্তমী-তৎপুরুষ হইবে। তদনুসারে, "জলে মার্গঃ, জলে পন্থাঃ; স্থলে মার্গঃ, স্থলে পন্থাঃ—জলমার্গ, জলপথ: স্থলমার্গ, স্থলপথ"—এ সমস্তই সপ্তমী-তৎপুরুষ।

৪১ পৃষ্ঠায় "প্রভাব"। ব্যাখ্যাকর্ত্তা লিখিয়াছেন,—"প্র + ভূ ধাতু + ঘঞ্।" কিন্তু, "প্র এই উপসর্গের পর ভূ ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে"—এমন কথা বলিলে ভুল হয়। কেননা, পাণিনির সূত্র আছে,—

শ্রি-নী-ভুবোঽনুপসর্গে। ৩।৩।২৪।

পূর্ব্বে যদি উপসর্গ না থাকে, তবে শ্রি, নী এবং ভূ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ বিধান হয়। কাজেই পূর্ব্বে 'প্র' এই উপসর্গ থাকিলে, ভূ ধাতুর উত্তর আর ঘঞ্ বিধান হইতে পারে না।

তবে 'প্রভাব'—এই শব্দের রূপসিদ্ধি কি প্রকারে হইল? প্রথমে উক্ত সূত্রানুসারে ভূ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'ভাব' এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইল। তাহার পর, "প্র—প্রকৃষ্টো ভাব ইতি প্রাদি-সমাসঃ"—এইরূপ সমাস করিতে হইবে। ভট্টোজিদীক্ষিত উক্ত সূত্রে ইহার সমাধান করিয়াছেন, "কথং প্রভাবো রাজ্ঞ ইতি; প্রকৃষ্টো ভাব ইতি প্রাদি-সমাসঃ।"

৫৮ পৃষ্ঠায় "কিঙ্কর," ১৪৪ পৃষ্ঠায় "কিঙ্করী"—এখানে ব্যাখ্যাকর্ত্তা 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'ট' প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন। 'কিঙ্কর' শব্দের সোজাসুজি স্ত্রীলিঙ্গ করিলে 'কিঙ্করা' হয়; আর পুংযোগে স্ত্রীলিঙ্গ করিলে 'কিঙ্করী' হয়। কিন্তু ট বিধান করিলে 'কিঙ্করী' ভিন্ন অন্য প্রকার রূপ হইতে পারে না। তবে উপায়? উপায় এই—কিং + কৃ + অচ্, এইপ্রকার অচ্ বিধান দ্বারা রূপসিদ্ধি হইয়াছে। যথা, সিদ্ধান্তকৌমুদী ৩।২।২১ সূত্রে—"কিংযত্তদ্বহুষু কৃঞোঽজ্বিধানমিতি বার্ত্তিকম্। কিঙ্করা। যৎকরা। তৎকরা। হেত্বাদৌ টং বাধিত্বা পরত্বাদচ্। পুংযোগে ঙীপ্; কিঙ্করী।"

৯৯ পৃষ্ঠায় "পূজ্য"। এখানে 'পূজি' ধাতুর উত্তর 'য' বিধান করিয়া রূপসিদ্ধি করিয়াছেন, তাহাও ভুল হইয়াছে। কারণ—

ঋ-হলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪।

এই সূত্রানুসারে 'ণ্যৎ' (মুগ্ধবোধের ঘ্যণ্) হওয়া চাই। এখন এস্থলে সন্দেহ এই,—যদি 'ণ্যৎ' বিধান হইল, তবে 'পূগ্য' হইল না কেন? "ত্যজি-পূজ্যোশ্চ।" এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে কুত্ব হওয়া উচিত ছিল।

১০৫ পৃষ্ঠায় "রাজপথ"। এখানে ব্যাখ্যাকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, "পথের মধ্যে রাজা ৭মী তৎপুরুষ।" তাহাও সম্পূর্ণ ভুল। একপক্ষে, পথাং রাজা, এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ দিয়া বিগ্রহ করিতে হইবে। তাহার পর,—

রাজদন্তাদিষু পরম্। পা ২।২।৩১।

এই সূত্রানুসারে পরের পদ প্রথমে বসিবে। অন্য পক্ষে—রাজগমনযোগ্যঃ পন্থাঃ। উভয় পক্ষেই শেষে অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

রাজপথের লক্ষণ এই,—

"ধনূংষি দশ বিস্তারে শ্রীমান্ রাজপথঃ স্মৃতঃ।
নৃ-বাজি-রথ-নাগানামসম্বাধঃসুসঞ্চরঃ॥"

১৬৬ পৃষ্ঠায় "পরিচর্য্যা"। এখানে লেখক, "পরি + চর ধাতু + ক্যপ্"—এই প্রকারে রূপসিদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও পূর্ব্বাচার্য্যদের নিয়ম-বিরুদ্ধ।

পরিচর্য্যা-পরিসর্য্যা-মৃগয়াটাট্যানামুপসংখ্যানং শো যক্ চ নিপাত্যতে। (সিদ্ধান্তকৌমুদী ৩।৩।১০১ সূত্রে)

অতএব পরি + চর ইহার উত্তর শ প্রত্যয় হইয়াছে এবং নিপাতনে যকার হইয়াছে।

১৫১ পৃষ্ঠা—"ভার্য্যা—ভৃ ধাতু + ঘ্যণ"—এ

প্রকারে রূপাসাঙ্ক করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে দীর্ঘ ঋকারান্ত ভৃ ধাতু হইবে।

"অথ কথং ভার্য্যা বধূরিতি, ইহ হি সংজ্ঞায়াং সমজেতি ক্যপা ভাব্যম্, সংজ্ঞা-পর্য্যুদাসস্ত পুংসি চরিতার্থঃ? সত্যম্; বিভর্ত্তেঃ ভৃ ইতি দীর্ঘান্তাৎ ক্র্যাদের্ব্বা ণ্যৎ; ক্যপ্ তু ভরতেরেব তদনুবন্ধগ্রহণে ইতি পরিভাষয়া।" (সিং কৌ, ৩। ১। ১২ সূ)

১৫১ পৃষ্ঠায় "অসূর্য্যম্পশ্যরূপা"—এখানে ব্যাখ্যাকর্ত্তা এইরূপ সমাস করিয়াছেন,—"সূর্য্যকে দেখে যে ইতি সূর্য্যম্পশ্য; ন সূর্য্যম্পশ্য অসূর্য্যম্পশ্য।" কিন্তু এপ্রকার সমাস হইবে না। কারণ, 'নঞ্' এই উপপদের সঙ্গে 'দৃশ' ধাতুর সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে কারণ 'অসূর্য্য' এটী 'অসমর্থ' সমাস হইয়া পড়িতেছে। অতএব, সূর্য্যকে দেখে না, এইরূপ 'দৃশ' ধাতুর সঙ্গে এককালে 'নঞ্' দিয়া বাক্য করিতে হইবে। এখানে নঞ্ সঙ্গে দৃশ ধাতুর নিত্য সম্বন্ধ।

"অসূর্য্যমিত্যসমর্থসমাসঃ, দৃশিনা নঞঃ সম্বন্ধাৎ। সূর্য্যং ন পশ্যন্তীতি অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারাঃ। (সিং কৌং)

"অসূর্য্যম্পশ্য"—ইহার সঙ্গে 'রূপ' এই শব্দের সমাস করায় অর্থ বেশ সঙ্গত হয় নাই। সূর্য্যকে যে দেখিতে পায় না, অর্থাৎ লুকান,—যে কাহারও মুখ দেখে না। "অসূর্য্যম্পশ্যা রাজ-দারাঃ" অর্থাৎ যে রাজরাণীরা কেবল অন্তঃপুরেই থাকেন,—কখন কাহারও মুখ দেখেন না। এমন স্থলে, যে রূপ "সূর্য্যকে দেখে না"—এরূপ বলিলে কথার কি আর ভাব থাকিল? "যে রূপকে সূর্য্য দেখিতে পায় না"—যদি এপ্রকার বাক্য হইত, তাহা হইলে এই সমাসে কিছু ভাব থাকিত।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

কুকুরের ইতিহাস।

কুকুরের ন্যায় বিশ্বাসী প্রভুভক্ত জন্তু খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের গৃহস্থের বাটীতে দুইটী উপযুক্ত শিক্ষিত কুকুর থাকিলে দুইজন দ্বারবানের কাজ করে। কুকুর দুই প্রকার;—বন্য ও গৃহ-পালিত।

বন্য-কুকুর।

অনেক প্রাণিতত্ত্ববিৎ, বন্য-কুকুরকে নেকড়ে-বাঘের বংশজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বা শৃগালের সম্পর্কীয় বলিয়া থাকেন; কেহ বা বলেন যে, নানা জন্তুর সংসর্গে বন্য-কুকুর উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, নেকড়ে-বাঘ, শৃগাল এবং কুকুর যে, এক জাতীয় জন্তু, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেকেঞ্জী নদীর কুকুর

আমেরিকার "মেকেঞ্জী" নদীর ধারে এই কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বড় একটা ডাকে না। ইহাদের গায়ে খুব ঘন, বড় বড় লোম আছে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের লোম লাল বা ধূসর-বর্ণ হয়, কিন্তু শীতকালে সাদা হইয়া থাকে। ইহাদের লম্বা কান এবং মোটা মোটা পা। ইহারা বরফের

ডিঙ্গো কুকুর।

উপর দিয়া অনায়াসে গতায়াত করিতে পারে। ইহারা স্বদেশে সহজে পোষ মানে এবং তদ্দেশ-বাসীর শীকার-কার্য্যে অনেক সাহায্য করে। ইহা-দের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু প্রহার করিলে রাগ করে। এই সকল কুকুর যখন রাগিয়া উঠে, তখন নেকড়ে-বাঘের ন্যায় শব্দ করে। ডাক্তার রিচার্ডসন বলেন যে, তিনি একটী এই কুকুরের বাচ্ছা কিনিয়াছিলেন, সে যখন ৭ মাসের হইল, তখন স্বচ্ছন্দে তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বরফের উপর দিয়া যাইতে পারিত এবং তাঁহার গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অক্লেশে ৯০০ শত মাইল যাইত। একদিন তদ্দেশবাসীরা তাহাকে একাকী পাইয়া শৃগাল-ভ্রমে মারিয়া ফেলিয়া আহার করিয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে এক রকম কুকুর আছে, তাহাদিগকে "ডিঙ্গো" বলে। ইহারা দলে দলে অষ্ট্রেলিয়ার বনে বিচরণ করে এবং কেঙ্গেরু বা ছাগল প্রভৃতি দেখিতে পাইলে মারিয়া আহার করে। ইহারা অতিশয় বলিষ্ঠ ও দেখিতে বড়। ইহাদের মাথা বড় চওড়া; কান ছোট, কিন্তু সোজা; লেজ মাঝামাঝি; রং ঈষৎ লাল। ইহারা বড় চতুর ও বলবান্। সাধারণ কুকুরের ন্যায় ডাকে না, কিন্তু বাঘের ন্যায় গর্জ্জন করে। ইহার পাহাড়ের গুহায় বাস করে এবং শাবকদিগকে খুব সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করে। একজন সাহেব এই কুকুরের একটী শাবক গোপনে লইয়াছিলেন এবং একটু পরে আসিয়া দেখেন যে, অপর শাবকগুলি সেস্থানে আর নাই। ইহাদের সহগুণ আশ্চর্য্য রকম আছে। একটী ডিঙ্গোকে একদিন গুরুতর প্রহার করা হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দ ভাবিল,—তাহার হাড় চূর্ণ হইয়াছে এবং মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু দর্শকগণ যেমন একটু সরিয়া গেল, অমনি সেই কুকুর গা ঝাড়া দিয়া নিকটস্থ বনে পলায়ন করিল। ইহারা গৃহস্থের বাছুর, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি মারিয়া বহুতর ক্ষতি করে। ইহাদিগের নিপাত-সাধন করাও অতিশয় দুরূহ।

একটী দেড় মাসের ডিঙ্গো-শাবককে বিলাতের এক চিড়িয়াখানায় আনা হইয়াছিল। তাহাকে একটী ঘরের মধ্যে যেমন ছাড়িয়া দেওয়া হইল, অমনি সে এক কোণে যাইয়া লুকাইল। যখন সে একাকী থাকিত, তখন অর্ত্তনাদ করিত এবং মনুষ্য দেখিলেই চুপ করিয়া থাকিত। ক্রমে ক্রমে বেশ বলবান্ হইয়া উঠিল এবং যে ব্যক্তি আহার দিত, তাহাকে চিনিয়াছিল। অপর লোক দেখিলেই সে ভয়ে ঘরের মধ্যে যাইয়া লুকাইয়া থাকিত সাধারণ-কুকুরের ন্যায় ডাকিত না এবং অপরি-চিত লোক দেখিলেও শব্দ করিত না। প্রায় সমস্ত দিনই রোদন করিত এবং তাহার শব্দ অর্দ্ধমাইল দূর হইতে শুনা যাইত। রাত্রে যখন চন্দ্র-উদয় হইত, এই কুকুর তখন দুই চারি ঘণ্টা ধরিয়া রোদন করিত। এদিকে স্বজাতি-সুলভ চতুরতা ও বন্যভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই; সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে কিছু বলিত না, কিন্তু পিছন ফিরিলেই আঁচড়াইয়া দিয়া নিজের ঘরের ভেতর পলায়ন

করিত। একদিন হঠাৎ শিকল খুলিয়া, খুব উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং বহুকষ্টে পুনরায় ধরা পড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে "বুয়নশু" নামক এক প্রকার বন্য-কুকুর আছে। নেপালে ইহাদিগের জন্ম ; পশ্চিমে সিন্ধু নদ ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাহারা বিচরণ করে। বিন্ধ্যগিরি প্রভৃতি বড় বড় পাহাড়ের বনেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দলবদ্ধ না হইয়া বেড়ায় না এবং দিনেই কি, রাত্রেই কি, কেবল শীকার অনুসন্ধান করে। ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় খুব প্রখর। শীকারের গন্ধ পাইলেই তাহার অনুসন্ধানে বাহির হয় এবং বলপূর্ব্বক মারিয়া স্বস্থানে লইয়া যায়। শীকার করিবার সময় ইহারা "ডাল-কুকুরে"র ন্যায় শব্দ করে। এই জাতীয় ধাড়ী-কুকুরকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও পোষ মানে না। কিন্তু বাচ্ছা একটী আবদ্ধ করিয়া লালন-পালন করিলে অনেকটা পোষ মানে। মহাবালেশ্বর পাহাড়ে এই কুকুরকে লোকে বলে "ঢোল"।

মধ্য-প্রদেশ (দক্ষিণ) অঞ্চলে "কলশুন" নামক এক প্রকার বন্য-কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাথাটা লম্বা রকম এবং চক্ষুগুলা কেকান। ইহাদের আকৃতি অনেকটা পারস্য-দেশের "ডালকুকুরে"র ন্যায়। কান বড় বড়,—লম্বা লম্বা। পা অপেক্ষাকৃত বড়। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে কর্ণেল সাইকস্ সাহেব, এই জাতীয় কুকুরের সহিত "বুয়নশু" জাতীয় একটী কুকুরের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উভয়ে বেশী প্রভেদ নাই। উভয় জাতীয়ের মধ্যে এইটুকু প্রভেদ দেখা গিয়াছে যে, দক্ষিণ-দেশের কুকুর, নেপাল-দেশের কুকুরের মত অধিক লোমযুক্ত নহে। ইহাদিগের বর্ণ প্রায়ই ফেকাশে-লাল হইয়া থাকে। উক্ত কর্ণেল সাহেব এই জাতীয় কুকুরকে সচরাচর ত্রিশ চল্লিশটী একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন। প্রায় সকল রকম জন্তুই ইহাদিগকে ভয় করে। ইহারা বড় বড় বাঘ পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলে। ইহারা কিছুতেই পোষ মানে না এবং কেবল রাত্রে একবার অধিক পরিমাণে আহার করে।

জাভা দেশে এক রকম বন্য-কুকুর আছে এবং একটী সেই জাতীয় বড় কুকুর বিলাতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইহাদের আকৃতি সাধারণ নেকড়ে-বাঘের মত, কিন্তু কান অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহাদের বর্ণ পিঙ্গল।

বেলুচিস্থানে এবং পারস্যদেশে পার্ব্বতীয়-জঙ্গলে "বেলুক" নামক এক প্রকার বন্য-কুকুর আছে। ইহাদের বর্ণ সচরাচর লাল হয় এবং ইহাদের প্রকৃতি বড় ভয়ানক। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহারা বিশ ত্রিশটী একত্র দলবদ্ধ হইয়া শীকারে বাহির হয় এবং অনায়াসে মহিষ ও বৃষ মারিয়া ফেলে।

এসিয়া-মাইনরের "সীরিয়া" প্রদেশে একপ্রকার বন্য-কুকুর আছে, তাহাদের লোকে "সীর" বলিয়া থাকে। ঐ দেশের লোকে ইহাদিগকে নেকড়ে-বাঘের ন্যায় মনে করে। ইহাদের দাঁতে এত বিষ যে, একবার কামড়াইলেই সে ব্যক্তি অত্যন্ত পাগল হইয়া মরিয়া যায়। ইহারা দেখিতে প্রায় বাঘের ন্যায় এবং "লিওপার্ডের" ন্যায় লাফাইয়া পশুহত্যা করে।

মিশরদেশে এক প্রকার বন্য-কুকুর আছে, তাহাদিগকে মিশরবাসীরা "ডীব" বলিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের বোম্বাই অঞ্চলে আর এক রকম বন্য-কুকুর আছে, যাহাদের "জঙ্গল-কুত্তা" বলে। ইহাদের বর্ণ ঈষৎ ধূসর এবং শরীরের উপরে কাল কাল দাগ আছে। গলার নীচে-ভাগটা কতকটা সাদা সাদা এবং গায়ে বেশী লোম নাই। ইহাকে দেখিলে বাচ্ছা-বাঘ বলিয়া মনে হয়। ইহারা মরা-জন্তু খুঁজিয়া বেড়ায় এবং তাহা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

পৃথিবীর সকল স্থানের বন্য-কুকুরের নাম করিয়া প্রত্যেকের ইতিহাস লিখিতে গেলে একখানি বড় রকমের পুস্তক হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য, কতকটা আভাস দেওয়া। যদি কেবল আফ্রিকার "কঙ্গো," "গিনী" প্রভৃতি স্থানের এক এক প্রকার বুনো-কুকুর দেখা যায়, তাহা হইলেও নানা রকম বন্য-কুকুর দেখিতে পাইবেন। তাহারা গিরি-গুহায় কিংবা মাটীর ভিতরে বাস করে। আবার যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন তদ্দেশবাসীদেরও এক রকম অসাধারণ বলবান্, অর্দ্ধবন্য কুকুর ছিল। ইহারা মনুষ্যের সহিত শীকার করিতে যাইত। দক্ষিণ-

আমেরিকার "গায়েনা" প্রদেশে এক রকম শৃগালের ন্যায় বন্য-কুকুর আছে। উত্তর-আমেরিকার মেক্সিকোবাসীরা এক রকম বাঘের ন্যায় বুনো-কুকুরকে "কেগটী" বলিয়া থাকে। এই কুকুর স্বচ্ছন্দে বন্য নেকড়ে-বাঘিনীর সঙ্গে বিহার করে; কিন্তু বৎসরের এক সময়ে বাঘ ও বাঘিনী—উভয়েই এই কুকুর পাইলে মারিয়া ফেলিয়া আহার করে। প্রকৃতির মহিমা বুঝিয়া উঠা ভার !

পূর্ব্বকালের কুকুর।

মিশরবাসীরা, কুকুরকে নীল-নদের দেবতা মনে করিত এবং কুকুরের মস্তক ও মনুষ্যের দেহ দিয়া দেবতা অঙ্কিত করি । ঐ মূর্ত্তি মিশর-দেশের সকল দেবালয়ের সম্মুখে রাখা হইত। অবশেষে কুকুরের সম্মানার্থে সাইনোপলীস নামক একটী দেশ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা কুকুরের অনেক "মামী" পাওয়া গিয়াছে; ইহাতে এইটী বুঝা যায় যে, কুকুরকে তাহারা অতিশয় ভক্তি ও সম্মান করিত। কুকুরের নামে একটী নক্ষত্র অভিহিত হইয়াছিল এবং ঐ নক্ষত্রেরও পুজা হইত।

রোমবাসীরা দুইটী নক্ষত্র-দেবতার পূজার সময় কুকুর বলিদান দিত। গ্রীষ্মকালে "প্রোক্রয়ন" নামক একটী নক্ষত্র উদয় হইত এবং রোমবাসীরা তাহাকে ফল-শুষ্ক-কারক মনে করিয়া একটী লালরঙের কুকুর বলিদান করিত। তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, উক্ত বলিদানের দ্বারা নক্ষত্র সন্তুষ্ট হইয়া, ফল-মূল শুষ্ক না করিয়া বরং পাকাইয়া দিবেন। যখন গলদেশবাসীরা রাত্রে রোম-রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিল, তখন কুকুরগুলা নিদ্রা গিয়াছিল; কিন্তু রাজহংস জাগ্রত থাকায় শব্দ করিয়া প্রহরী জাগাইয়াছিল। তৎপরে রোমীয়েরা কুকুরগুলাকে টাঙ্গাইয়া শাস্তি দিয়াছিল। গ্রীস-দেশেও দেবতার তুষ্ট্যর্থে কুকুর বলিদান দেওয়া হইত। পারসীরা এখনও কুকুরগুলাকে আশঙ্কার সহিত দেখে।

পালেস্তাইনের শাস্ত্রকর্ত্তারা কুকুরকে অস্পৃশ্য-জন্তুর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। প্লিনী ও প্লুটার্কের মতে মিশরে কুকুর-জাতি শুধু পুজিত হইত,তাহা নহে; ইথিওপিয়ার একটী কুকুর রাজা ছিল। রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়া কুকুর সম্রাট্ সিংহাসনে উপবেশন করিলে, তাঁহার প্রজামণ্ডলী যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিত। তবে রাজকার্য্যের ভার দুইজন বিশ্বাসী মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত ছিল। কুকুর-রাজা লেজ নাড়িয়া সম্মতি প্রদান করিত এবং চীৎকার করিয়া অসম্মতি জানাইত। উক্ত রাজার গর্জ্জনে মনুষ্যের মুণ্ডপাত হইত এবং যদি তিনি কোন ব্যক্তির হস্ত চাটিতেন তাহা হইলে তাহার পদোন্নতি হইত। কুকুর-রাজার মনোভাব ব্যাখ্যা করিবার জন্য কতকগুলি পুরোহিত নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং বাস্তবিক সেই পুরোহিতের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত ছিল।

পূর্ব্বে কনষ্টাণ্টিনোপল্ নগরে একজন রাজ-কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন, তিনি কেবল সরকারী খরচায় কুকুরদের আহার যোগাইতেন। কুকুরদের আহার যোগাইবার জন্য অনেকে উইল করিয়া টাকা দিয়া যাইতেন।

অনেক দেশে কুকুরের মাংস আহার করা এখনও প্রচলিত আছে এবং পূর্ব্বকালেও ছিল। কাফ্রিরা এবং দক্ষিণ-দ্বীপের লোকেরা কুকুরের মাংস আহার করে। অনেক অসভ্যদের মধ্যে এই আহার প্রচলিত ছিল। এমন কি, চীনদেশবাসীরা কুকুর পুষিয়া বেশ মোটা-সোটা করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। আমাদের দেশে পাঁটা তেমন বিক্রয় হয়, সেইরূপ চীনদেশেও আহারের জন্য কুকুরের মাংস এবং কুকুর বিক্রয় করার প্রথা আছে। পূর্ব্বকালে গ্রীক এবং রোমীয়েরা কুকুর মারিয়া ভোজ দিত। প্লিনীর মতে কুকুরশাবক-সিদ্ধ, তাহাদের মুখে সুস্বাদু লাগিত। যেখানে খুব জাঁকাল-রকম ভোজ হইত, সেখানে গ্রীস ও রোমদেশ-বাসীরা কুকুরের মাংস একটী উপাদেয় আহারের মধ্যে গণ্য করিতেন।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কুকুর লইয়া লোকে নেকড়ে-বাঘ এবং বন্য-শূকর শীকার করিত। কেহ কেহ বা হরিণ শীকার করিত, কেহ বা কুকুরকে দিয়া প্রহরীর কার্য্য করাইত। সম্ভবত গ্রীসদেশে 'ডাল-কুকুর' ছিল এবং বাঘের ন্যায় সোজা-কান-যুক্ত কুকুরও ছিল। সেকলে কান ঝোলান কুকুর,—গ্রীস ও রোমে ছিল না।

প্রাচীন "মোলোসিয়া" দেশে এক রকম কুকুর জন্মিত, তৎসম্বন্ধে প্রবাদ এই রকম যে, "বিশ্বকর্ম্মা" তাহাদিগকে তামাতে গড়িয়াছিলেন" এবং

তিব্বত-জাতীয় কুকুর।
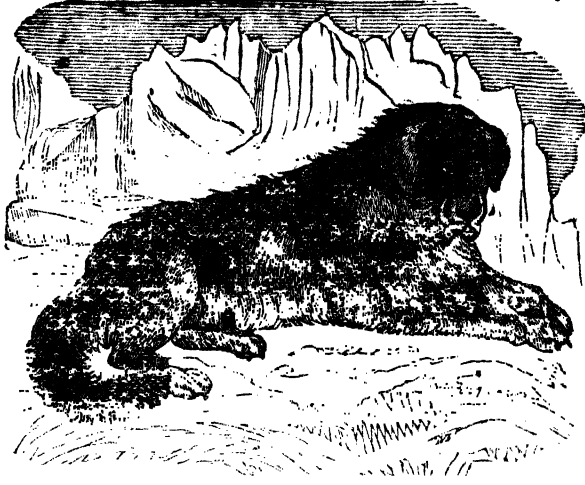
"জুপিটার" তাহাদের প্রাণদান দিতেন। ইহাদ্বারা এইটী বুঝা যায় যে, ঐ কুকুরগুলি লালবর্ণ এবং শীকারে ও প্রহরীর কার্য্যে খুব তৎপর ছিল। ইহাদের আকৃতি লম্বা-চওড়ায় একটী বড় বাছুরের মত;—দেখিলে, ভয় হইত। প্রাচীন আর্কেডিয়া দেশে আর এক রকম কুকুরের কথা উল্লেখ আছে। সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস যে, ইহারা সিংহ হইতে উৎপন্ন। তাহাদের শরীরে ভয়ানক বল এবং দেখিতেও সুশ্রী। প্রাচীন ইট্রারিয়া এবং আম্‌ব্রায়া প্রদেশে শীকারী কুকুর বহু সংখ্যক পাওয়া যাইত। তাহাদের আকৃতি দেখিতে অনেকটা নেকড়ে বাঘ এবং সাধারণ কুকুরের মাঝামাঝি। ইহাদের নাম 'লীসিয়া' ছিল এবং ইহারা পশ্বাদির রক্ষণে বড় তৎপর। পম্পীয়াই নগরে একটী প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিলে বোধ হয় যে, একটী রোম দেশের কুকুর যেন দরজার কাছে শিকলে বাঁধা রহিয়াছে; আর শিকল খুলিয়া পলাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিছু না করিতে পারিয়া রাগে চীৎকার করিতেছে। তাহার নিম্নে এই কথাগুলি লেখা আছে—"কুকুরকে সাবধান"। ইহার আকৃতি বন্য কুকুরের ন্যায়।

গ্রীসের সম্রাট্ আলেক্‌জাণ্ডার "মাষ্টিফ্"জাতীয় কুকুর প্রথমে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গ্রীসের লোক্ এই জাতীয় কুকুর দেখে নাই। আলেক্‌জাণ্ডার তিব্বত-জাতীয় মাষ্টীফ্, আফ্‌গানবাসীদের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন এবং তাহা স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

গৃহপালিত কুকুর।

(আধুনিক কুকুরের প্রকৃতি বা স্বভাব।)

কুকুরের সচরাচর আহার বেশী। অধিকাংশ কুকুরকে অধিক পরিমাণে উপবাস করিতে হয়, সেইজন্য তাহাদের ক্ষুধা খুব বেশী পরিমাণে হয় এবং যাহা খায়, সমস্তই জীর্ণ হইয়া থাকে; খুব বেশী আহার করিয়া কুকুর একটু বিশ্রাম করে এবং সেই সময় তাহাকে বেশী খাটান উচিত নয়।

কুকুর মনুষ্যের এত বশ্যতা স্বীকার করে যে, তাহার প্রভু যাহা বলে, সে তাহাই করে; এমন কি, অক্ষম কুকুরগুলাও প্রভুর আজ্ঞা পাইলে, প্রাণপণে অন্য কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকায় যে সমস্ত বড় বড় কুকুর, ভেড়া গরু প্রভৃতি জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহারা কেবল পশু-রক্ষার্থে নিজ নিজ বল-বিক্রম প্রদর্শন করে। ডারউইন্ সাহেবের পুস্তকে নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণিত আছে,—"মাঠে ভেড়ার দল চরিতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে না; দুইটী বা একটী কুকুর তাহাদের সঙ্গে থাকে, তাহারাই সমস্ত দিন সেই

পশুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে। এইরূপ ভিন্নজাতীয় পশুমধ্যে ঐ রকম বন্ধুত্ব থাকার একটী বিশেষ কারণ আছে। কুকুরের ছানা হইলে তাহাদিগকে কিছুদিন পরে মাতৃ-ছাড়া করিয়া ভেড়ার দলে রাখিয়া দেওয়া হয়। দিনের মধ্যে তিন চারি বার ভেড়ীদুগ্ধ তাহাদিগকে পান করান হয়। কোন সময়েই তাহাদিগকে অন্য কুকুরের সঙ্গে মিশিতে দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্থানে থাকে। এইরূপে যখন সেই শাবক বড় হয়, তখন অন্য কুকুরের প্রতি তাহার আর আসক্তি থাকে না। অন্য কুকুরে যেমন প্রভুকে বা মনুষ্যকে রক্ষা করে, সেইরূপ এই জাতীয় কুকুর ঐ ভেড়া-দলকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই কুকুরগুলি সন্ধ্যা হইলে আপন দলকে গৃহে লইয়া আইসে।"

যুদ্ধের সময় অনেক দেশে কুকুরের সাহায্য লওয়া হয়। ওলন্দাজেরা যখন আমেরিকাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তখন কতকগুলি বলবান্ কুকুর তাহাদের যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিল। ওলন্দাজ প্রভৃতি অনেক জাতি যুদ্ধ করিবার জন্য কুকুর পুষিত এবং তাহাদিকে মনুষ্য-আক্রমণ করিতে শিক্ষা দিত। কুকুর অনেক সময় নিজ প্রভুর জন্য ভিক্ষা করে এবং অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। রেজ সাহেব এই গল্পটী লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ইতালী-দেশে আমরা গাড়ী করিয়া বেড়াইতেছিলাম। একস্থানে আমাদের ঘোড়া বদলাইবার জন্য ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে হইল। ইতিমধ্যে দেখিলাম, —একটী কুকুর সাম্‌নের পা দুইটী তুলিয়া আমাদের গাড়ীর কাছে বসিয়া আছে। আমাদের কোচম্যান্ বলিল যে, একটী সু (পয়সা) দিন্, তাহা হইলে একটী মজা দেখিতে পাইবেন। আমি একটী পয়সা ফেলিয়া দিলাম। কুকুরটী তৎক্ষণাৎ তাহা মুখে করিয়া দৌড়িল এবং নিকটস্থ দোকান হইতে একখানি পাঁউরুটী লইয়া আসিয়া আমাদের সম্মুখে আহার করিল। সকলে বলিল যে, ঐ কুকুর একটী দরিদ্র অন্ধের পোষা কুকুর ছিল; কিন্তু অন্ধটী সম্প্রতি মরিয়া যাওয়ায় কুকুরটীও ঐরূপ ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।"

কুকুরের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ এবং বন্ধুর প্রতি আসক্তি খুব প্রগাঢ়। তিনটী কুকুর একস্থানে থাকিত। একদিন তাহারা (প্রভুর সঙ্গে নহে) শীকার করিতে যায়। অবশেষে একটী শশকের অনুধাবন করিয়া তাহারা এত উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল যে, শশক যখন একটী গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, একটী কুকুরও সবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু আর বাহিরে আসিতে পারিল না। তাহার অপর দুইটী বন্ধু এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নখের দ্বারা মাটী খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বাহির করিতে পারিল না। হতাশ হইয়া তাহারা সে দিবস গৃহে ফিরিয়া আসিল। পরদিন আবার তাহারা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সেই গর্তের কাছে যাইয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল এবং সে দিনও সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে। তাহারা আর আহার করিত না এবং তাহাদের গায়ে মাটী মাখা এবং পায়ে রক্তের দাগ দেখা গিয়াছিল। এইরূপ দুই তিন দিন আরও অতিবাহিত হইল। অবশেষে একদিন তাহারা সন্ধ্যা বেলা আপন স্থানে নীরবে বসিয়া আছে, এমন সময় কতকগুলি কুকুরের শব্দ শুনা গেল এবং তাহারা দরজা আঁচড়াইতে লাগিল। দরজা খুলিলে দেখিল যে, সেই হারান কুকুরটী ফিরিয়া আসিয়াছে এবং অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে তাহারা উল্লাসে চিৎকার করিতে লাগিল।

ফরাসী-সম্রাট্ প্রথম নেপোলীয়ন ইতালীর প্রধান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যখন সেই ভীষণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একটী কুকুরের অসাধারণ প্রভুভক্তির যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা একবার নেপোলিয়নের উক্তি হইতেই শ্রবণ করুন;— "গভীর রাত্রি, চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়াছে; আমরা মৃত-দেহ একে একে পার হইয়া যাইতেছি। এমন সময় একটী কুকুর মৃত-সৈন্যের কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে আমাদিগকে আক্রমণ করিল, আমরা লাঠী-প্রহার করিবার উদ্যোগ করিলাম। কুকুরটী তৎক্ষণাৎ মর্ম্মান্তিক চীৎকার করিয়া পুনরায় তাহার প্রভুর কাপড়ের ভিতর যাইয়া আশ্রয় লইল। কুকুরটী একবার সেই মৃত যোদ্ধার হস্ত চাটিতে লাগিল এবং একবার আমাদের দিকে ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িয়া আসিতে

স্পেনিয়াল জাতীয় কুকুর।

লাগল। এই ঘটনা দেখিয়া আমার মনে একটু বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি পৃথিবীর সমস্ত আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অনন্ত-শয্যায় শুইয়া আছে, তাহার ইহ-জগতে একটী কুকুর কেবল সঙ্গ ছাড়ে নাই, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়! আমি কত শত প্রাণি-বধ করিয়া স্বদেশবাসীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া এই যুদ্ধে জয় লাভ করিলাম, কিন্তু পূর্ব্বে একবারও আমার মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় নাই।"

আর একটী ঘটনা শ্রবণ করুন। যখন ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লব সবে আরম্ভ হইয়াছে, যখন রোবাস্পিয়ারের পতন হইবার কিছু বিলম্ব ছিল, তখন বিপ্লব-আইন অনুসারে একটী প্রবীণ মেজেষ্টারকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল। যখন অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিল, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী কুকুরও যাইতে লাগিল। অবশেষে কারাগারের ভিতরে আর সেই কুকুরকে যাইতে দেওয়া হইল না। কুকুরটী নিরুপায় হইয়া প্রভুর প্রতিবেশীর বাটীতে আশ্রয় লইল। কিন্তু প্রত্যহ এক একবার সেই কারাগারের দরজায় যাইয়া উপস্থিত হইত; ভিতরে প্রবেশ করিতে পাইত না। এইরূপ দ্বারবানের কাছে প্রত্যহ লেজ নাড়িয়া মিনতি করিয়া অবশেষে ভিতরে ঢুকিতে পাইয়াছিল। কুকুরটী ঢুকিয়াই আপন প্রভুকে পাইয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। "জেলার" সাহেব সভয়ে তাহাকে কারাগারের বাহিরে একদিন তাড়াইয়া দিল। প্রতিদিন এইরূপ কুকুর ও প্রভুতে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। যখন প্রাণদণ্ডের দিন উপস্থিত হইল, তখন সেই কুকুর রক্ষকমণ্ডলী ভেদ করিয়া একেবারে আপন প্রভুর পায়ের কাছে যাইয়া বসিল। যখন "গীলোটীন" অস্ত্রাঘাতে প্রভুর মুণ্ডপাত হইল, তখনও সেই কুকুর তাহার দেহ ছাড়ে নাই। অবশেষে সেই প্রভুভক্ত কুকুরটী বৃদ্ধের গোরের উপর যাইয়া শুইয়া থাকিত। ক্রমাগত তিনমাস কাল সেই কুকুর একবার একজনের বাটী যাইয়া আহার করিয়া আসিত, আর সেই রকম গোরের উপরে পড়িয়া থাকিত। অবশেষে আহার ত্যাগ করিল, দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং যদিন মরণকাল উপস্থিত হয় সেই শেষ দিবস ক্রমাগত প্রভুর কবরের মাটী খুঁড়িয়া কেবল রোদন করিয়াছিল।" ইহা গল্প নয়,—প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা।

কুকুরের সঙ্গে অপর জন্তুরও সদ্ভাব দেখা যায়। কুকুরে এবং ঘোড়ায় সদ্ভাব হইয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি,—একটী স্পেনিয়াল জাতীয় কুকুর ও সিংহে বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

কুকুর তিন বৎসরে প্রকৃত বলবান্ হয় এবং ১৫ বৎসরের অধিক প্রায় বাঁচে না। তবে ২০ বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

কুকুরের বুদ্ধি-সম্বন্ধে আমরা স্বচক্ষে একটী

আরবিয়ান জাতীয় কুকুর।

ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা এই স্থলে উল্লেখ করিলাম ;—খৃঃ ১৮৭৪ সালে রাজসাহী জেলার মধ্যে রামপুর-বোয়ালিয়া সহরে কোন গৃহস্থের বাটীতে রাত্রে চুরি হইয়াছিল। চোরগণ বাড়ীর পিছন দিকে সিঁদ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা টাকা ও গহনার বাক্স আত্মসাৎ করে। ঐ বাড়ীতে একটী দেশীয় কুকুর ছিল। চোর দেখিয়া সে প্রথমে চীৎকার করিয়াছিল, পরে গৃহস্থেরা কেহ না উঠায়, সে চুপ করিয়া রহিল। চোরেরা বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনা ও টাকা আপন আপন বাটীতে না লইয়া গিয়া সন্নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া রাখিয়া আইসে। কুকুরটী তাহাদের সমস্ত কার্য্য দেখিয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে গৃহস্থের চটক ভাঙ্গিল এবং যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া পুলিসে খবর দিল। পুলিস সমস্ত লোকের "এজেহার" নোট করিয়া লইয়া গেলেন। কুকুরটী রাত্রি-জাগরণ বশতঃ সকাল-বেলা বাহিরের ভস্মস্তূপের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রিত ছিল। বেলা প্রায় ১০টার সময় কুকুরটী চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং বাড়ীর কর্ত্তার কোঁচার খোঁট মুখেকরিয়া টানিতে লাগিল। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কুকুর ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া একবার সেই পুষ্করিণীর কাছে যায় আর একবার আসিয়া কর্ত্তার কোঁচা ধরিয়া টানে। যাহা হউক, সকলে যখন পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইল, তখন কুকুরটী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মধ্যস্থলে ডুবিয়া যাইতে লাগিল এবং পুনরায় উঠিয়া কর্ত্তার কোঁচা ধরিয়া টানিতে লাগিল। তখন সকলের মনে সন্দেহ হওয়ায় ডুবুরি ডাকাইয়া জলে নামান হইল এবং সমস্ত গহনা ও টাকা পাওয়া গেল। কর্ত্তাটী কুকুরের গলায় একটী রূপার বগলস্ গড়াইয়া দিলেন।

ডাল কুকুর।

দুই রকম আছে। ধূসরবর্ণ ডালকুত্তা (*greyhound*) এবং সাধারণ 'ডালকুকুর' (*hands*) ডালকুত্তা—*greyhound* জাতীয় কুকুর অনেক রকম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই চারিটীই প্রধান ;—(১) লোমযুক্ত ধূসরবর্ণ, (২) ছোট-লোমযুক্ত চক্‌চকে-বর্ণ, (৩) লোমশূন্য ধূসরবর্ণ, (৪) শুধু লেজে লোমযুক্ত।

প্রথম জাতীয় কুকুর,—তাতার এবং পূর্ব্বরুষ দেশে পাওয়া যায় ; দ্বিতীয় রকম ডালকুত্তা ;—পারস্য, মিশর এবং নেটোলিয়া দেশে থাকে ; তৃতীয় রকম এখন বিলাতেই বেশী, কিন্তু পূর্ব্বে ইউরোপের সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইত এবং

চতুর্থ জাতীয় আকাবা ও আরব্য দেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ-কাল-ভেদে আরও অনেক রকম ডাল কুকুর এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের দেন্‌মার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশে এক এক রকম ডালকুত্তা আছে। সেন্ডোমিঙ্গো ও হেইটী দ্বীপে এক প্রকার বড় বড় ধূসরবর্ণ ডালকুকুর বাস করে। তাহাদের দেখিলে বোধ হয় যে, ওলন্দাজেরা যখন ঐ সকল দ্বীপ জয় করিয়াছিল, তখন তাহাদের সঙ্গের কুকুরগুলি এই দেশে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত কুকুর, গৃহস্থের গরু, বাছুর, ভেড়া প্রভৃতির উপর বড়ই উৎপাত করে। পূর্ব্বকালে আলবেনিয়া-দেশে এক রকম ডাল-কুকুর ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, তাহারা সিংহ অপেক্ষা অধিক বলবান্ হইত। প্লিনী এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন যে, "গ্রীসের সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারকে আলবেনিয়ার রাজা এই জাতীয় কুকুর একটী উপহার দিয়াছিলেন। একদা এক রঙ্গক্ষেত্রে ঐ কুকুরটীকে আনাইয়া বন্য শূকর ও বন্য ভল্লুকের সহিত যুদ্ধ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। কুকুরটী যেন তাহাদের অবজ্ঞা করিয়া স্বচ্ছন্দ-মনে ঘুমাইতে লাগিল। আলেকজাণ্ডার এইরূপ দেখিয়া মনে করিলেন যে, কুকুর ভীত হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন। আলবেনিয়ার রাজা এই কথা শুনিয়া সম্রাট্‌কে আর একটী কুকুর উপহার পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, ইহাকে ভল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না দিয়া সিংহ এবং মত্তহস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দিবেন তাহা হইলে অনেকটা বলের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আলেকজাণ্ডার সেই কথা মত একটী সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে দিলেন; এবং অবশেষে সিংহই পরাস্ত হইয়া গেল।"

পারস্য-দেশের ডালকুকুর দেখিতে অতি সুন্দর। পারস্যবাসীরা ডালকুত্তা পুষিয়া তাহাকে শীকারীর সঙ্গে বনে বনে ফিরিতে অভ্যাস করায়। এই জাতীয় কুকুরের গায়ে, কানে এবং লেজে খুব বড় বড় লোম জন্মে, আর তাহারা বিলাতী ডালকুত্তা অপেক্ষা অধিক বলবান্। যদি দৈবাৎ ঘোড়া, শীকারীর হাত ছিনাইয়া পলায়, তাহা হইলে এই কুকুর অমনি তীরের ন্যায় দৌড়িয়া ঘোড়ার আগে যাইয়া, তাহার লাগাম ধরিয়া টানিতে থাকে, কিন্তু সহজে ঘোড়ার বেগ একেবারে থামাইতে পারে না। তখন একজন মনুষ্য যাইয়া ঘোড়া ধরিয়া ফেলে। এইরূপে ডালকুত্তা শীকারাদের বড় উপকার করে।

গ্রীসের দ্বীপ-সমূহে, ইটালীতে এবং দক্ষিণ-ভারতবর্ষে ডালকুত্তার গায়ে লোম হয় না। রুষ প্রভৃতি শীত প্রধান-দেশে লোমযুক্ত ডাল-কুত্তা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের গায়ের সব স্থানে সমান লোম জন্মে না। ইহারা খুব বড় বড় হয় এবং দেখিতে অতি ভয়ানক। আয়র্লণ্ডে যে নেকড়ে-বাঘের মত কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আদি-পুরুষ বোধ হয় এই রুষ-জাতীয় ডালকুত্তা।

ইংলণ্ডের ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, যখন স্যাক্সনজাতির আধিপত্য লোপ হইয়া, নর্ম্মেন জাতি এবং নর্ম্মেন-রাজা ইংলণ্ডের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়াছিলেন, তখন "বন্য আইন" এত কঠোর ছিল যে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। স্যাক্সন-দের কাছে যে সমস্ত কুকুর ছিল, এমন নির্দ্দয়রূপে তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত যে, তাহারা একেবারে শীকার-কার্য্যে অক্ষম হইয়া যাইত। কাহারও কাহারও বা সম্মুখের নখ সমস্ত কাটিয়া দেওয়া হইত। ডালকুত্তা গুলি কেবল জমীদার এবং রাজবংশীয়দের নিকটে থাকিতে পাইত।

ওয়েলস-দেশের বিখ্যাত যোদ্ধা এবং রাজা লীউলীনকে, ইংলণ্ডের রাজা 'জন' এই জাতীয় ডালকুত্তা উপহার দিয়াছিলেন। এবং নবম শতাব্দীর "ওয়েলস আইনে" ইহা স্পষ্ট লেখা ছিল যে, "যে ব্যক্তি কোন কুকুরকে খোঁড়া করিবে কিংবা কোন রকমে কুকুরের অপকার করিবে, তাহাকে রীতিমত কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। আর তাহাকে একটী ডালকুত্তার স্থানে দুইটী ডালকুত্তার দাম ধরিয়া দিতে হইবে।"

আয়র্লণ্ড-দেশস্থ টাইরোনের পার্ব্বতীয় অঞ্চলে অধিবাসীরা বাঘের উপদ্রবে বড়ই ব্যতি-ব্যস্ত হইয়াছিল। রাজা ঘোষণা করিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি একটী বাঘ মারিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। পুরস্কারের লোভে একজন ডানপিটে

সাধারণ ডালকুত্তা।

লোক একেলা বাঘ মারিতে সঙ্কল্প করিল। সে ব্যক্তি, রাত্রি দুই প্রহরের সময়—লোকজন সুষুপ্তি হইলে, যখন বাঘেরা আহার অনুসন্ধানে বাহির হইত, তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিত; সেই বাঘশীকারীর নাম—"রোরি কুরাগ"। তাহার সঙ্গে ডালকুত্তা দুই তিনটী থাকিত। সেই সকল ডালকুত্তা দেখিতে এক একটী বাঘের মৃত এবং ভয়ানক বলবান্। টাইরোন-দেশে একটী প্রাচীর বেষ্টিত জায়গায় লোকের ছাগাদি পশু রাখা হইত। কিন্তু সময়ে সময়ে তাহার মধ্যে দুইটী বাঘ প্রবেশ করিয়া অনেক ছাগাদি নষ্ট করিয়া যাইত। নিকটস্থ পশ্বধিকারীরা "রোরি কুরাগের" অসম সাহসের কথা শুনিয়া তাহাকে বিশেষ পুরস্কারের আশা দিয়া বাঘ দুইটী মারিয়া দিতে বলিল। কুরাগ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় দুইটী ডালকুকুর ও একটী ১২ বৎসরের বালক সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই খোঁয়াড়ের দুই দিকে দুইটী দরজা ছিল। কুরাগ একটী দরজায় বালকটীকে ও একটী ডালকুত্তাকে রাখিয়া, অপর দরজার কাছে আপনি চলিয়া গেল। বালকটী দরজা খুলিয়া ভিতরের দিকে বসিয়া রহিল এবং কুকুরটী তাহার কাছে রহিল। রাত্রি অন্ধকার—তিমিরাচ্ছন্ন; তাহাতে দারুণ শীতকাল। বালকটী শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া অর্দ্ধ নিদ্রিত হইয়া পড়িল; এমন সময় হঠাৎ একটী গর্জ্জনে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখে যে, কুকুরটী একলম্ফে একটী বাঘকে ধরিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছে। বালকটী সেই সময় কুরাগের গলার শব্দ শুনিয়া দ্বিগুণ সাহস পাইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই বাঘের গলদেশে বর্শা বিদ্ধ করিল। কুরাগও অপর বাঘের মস্তক হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। এই ঘটনা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল।

ধূসরবর্ণ ডালকুত্তা, হরিণ এবং খরগোষ শীকার করিতে বড় পটু। সার ওয়াল্টার স্কট্ প্রভৃতি বড় বড় গ্রন্থকর্ত্তা, ডালকুত্তার শীকারের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা যখন মৃগ কিংবা শশকের অনুধাবন করে, তখন পর্ব্বতের অত্যুচ্চ স্থানকেও তুচ্ছজ্ঞান করে। ইহাদের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং বড় পোষ মানে। ইহারা কেবল যুদ্ধ করিবার সময় ও শীকার করিবার সময় ভয়ানক রাগিয়া উঠে, কিন্তু অন্য সময় নিতান্ত 'ভালমানুষ'!

সাধারণ ডালকুত্তা অনেক রকম দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হরিণশীকারী ও শৃগাল-শীকারী—এই দুইটীই প্রধান। বিলাতেই এই জাতীয় ডালকুত্তা অধিক। ছোট জাতীয় ডাল-কুত্তাগুলি শশক-শীকারে খুব পটু। এই ছোট ডালকুত্তা ১০।১১ ইঞ্চি উচ্চ হয় এবং লম্বাতেও খুব বেশী বড় হয় না। শৃগাল-শীকারী ডালকুত্তা ২১।২২ ইঞ্চি উচ্চ হয় এবং সেই পরিমাণে লম্বা হয়। তাহাদের মাথাটী ছোট হয় এবং পশ্চাৎভাগ একটু চওড়া হইয়া থাকে। ইহাদের গতি অতিশয় দ্রুত; এমন কি ১০ মিনিটে তাহারা তিন চারি ক্রোশ দৌড়িয়া যাইতে পারে।

রক্তপিপাসু ডালকুত্তা পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক দেশে ডাকাইতদের পশ্চাৎ অনুধাবন

রক্তপিপাসু ডালকুত্তা।

করিত এবং দুষ্ট লোককে আক্রমণ করিত। ঐ সকল ডালকুত্তাকে যুদ্ধাবসানে পলাতকদের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে দেওয়া হইত। বিলাতের কয়েকটী বড় বড় যুদ্ধে এই জাতীয় কুকুরের ব্যবহারের কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। যখন ওয়ালেস ও ব্রুস, স্কট্‌লণ্ডের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যখন অষ্টম হেন্‌রী ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং যখন রাজ্ঞী এলিজাবেথ আয়র্লণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন; তখন এই জাতীয় কুকুরকে সৈন্য-সামন্তের মধ্যে গণ্য করা হইত। এলিজাবেথের সৈন্যাধ্যক্ষ আরল অফ্ এসেক্সের সৈন্যে এই জাতীয় কুকুর ৮০০ আটশত ছিল। পূর্ব্বকালে রাজা-রাজড়ারা এই জাতীয় কুকুরকে, প্রাসাদে এবং গড়ের ভিতর রাখিতেন। যদি তুমি এই কুকুরের হাত হইতে এড়াইতে চাও, তাহা হইলে তুমি যেখান দিয়া যাইবে, সেখানে রক্ত ছড়াইয়া যাও; তবে এই কুকুর তোমার পশ্চাৎ অনুধাবন করা ত্যাগ করিতে পারে। কারণ, রক্তের গন্ধে সে আর তোমার গন্ধ পাইবে না। শুধু আঘ্রাণ লইয়া শীকার অনুধাবন করাই ইহার স্বভাব। ইহাদের শীকার করার বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রেডলা সাহেব যেখানকার সভ্য ছিলেন, সেই 'নর্থামপ্টন' নগরে পূর্ব্বে একটী সভা করিয়া এই কুকুর পালন করা হইত। চোর ধরিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইত। একদিন পরীক্ষার্থ সমবেত জনগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে ১০টা বেলার সময় পলাইতে বলা হইল এবং এগারটার সময় ডালকুত্তাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দেড়ঘণ্টা পরে ডালকুত্তাটী খুঁজিয়া খুঁজিয়া, যে গাছে সেই ব্যক্তি লুকায়িত ছিল, সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল যে, ১৫ মাইল দূরে সেই গাছের চোরকে ডালকুত্তা কি করিয়া খুঁজিয়া আসিল।

বড় জাতীয় ডালকুত্তাকে "মাষ্টীফ," বল

কিউ বা দেশীয় রক্তপিপাসু কুকুর।
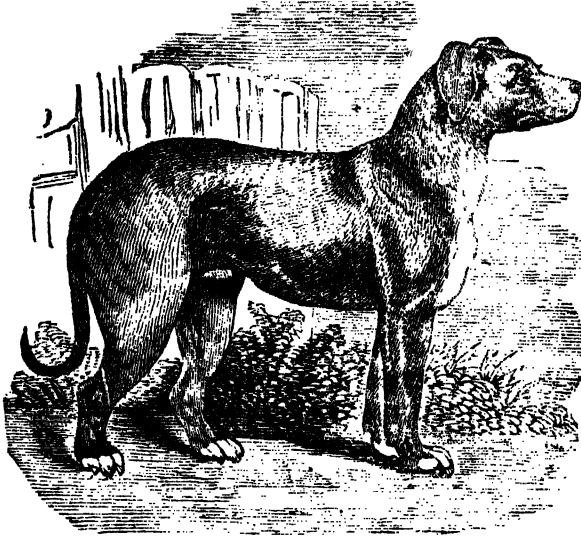
যায়। এই জাতীয় কুকুর লইয়া ওলন্দাজেরা মার্কীনবাসীদের উপর অত্যাচার করিত এবং অনেক দেশ জয় করিয়াছিল।

আফ্রিকা-দেশের ডালকুত্তা দেখিতে তত সুন্দর নয়, কিন্তু খুব বলবান্।

নিউফাউণ্ডলাণ্ড দেশের কুকুর।

এই জাতীয় কুকুর দেখিতে অতি সুন্দর এবং অবয়বও খুব লোমযুক্ত। উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে, অনেকে অনেক রকম কুকুর যুদ্ধ করিবার জন্য, শীকার করিবার জন্য, পশু মারিবার জন্য শিখাইয়া পালন করেন, কিন্তু এই নিউফাউণ্ডলাণ্ড-জাতীয় কুকুরকে সেণ্টবার্ণার্ড দেশের ধর্ম্মযাজকেরা (*Monks*) মনুষ্যের উপকারে আসিবার জন্য,—মনুষ্যকে বরফ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য—শিখাইয়া থাকেন। বড় বড় মাষ্টীফ্ যত উচ্চ হয়, এই জাতীয় কুকুর প্রায় তত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের কান লোটান, গায়ে বড়বড় লোম এবং ইহারা খুব বলবান্ বলিয়া বিখ্যাত। যখন শীতের দারুণ প্রভাবে চতুর্দ্দিকের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, যখন পরিশ্রান্তপথিক শীতে কাতর হইয়া অনেক সময় পাহাড়ের উপর বা গাছতলায় প্রাণ বিসর্জ্জন করে, যখন রাত্রিকালে শীত-বাত্যা প্রবাহিত হয় এবং চতুর্দ্দিকে লোকের সমাগম বন্ধ হইয়া থাকে, তখন এই সকল কুকুরের ডাক (শব্দ) পথিকের কানে যে কি মধুর লাগে, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বুঝিতে পারিবেন না। দারুণ শীতের রাত্রে এই কুকুরদিগকে যোড়া-যোড়ায় ছাড়িয়াদেওয়া হয়, কাহারও গলায় মদের বোতল ঝুলিতে থাকে, (কারণ, অধিক শীতে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়) কাহারও গলায় গরম কাপড়ের জামা বাঁধা থাকে। এইরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যখন কোন ভ্রমণকারী কোন বিপদে পতিত হইবেন, তখন কুকুরের কাছ হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য লইয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইতে পারিবেন। যদি পথিক চলিতে পারে, তাহা হইলে কুকুর তাহাকে পথ দেখাইয়া আশ্রমের দিকে লইয়া যায়; কিন্তু যদি সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কুকুর অমনি দৌড়িয়া যাইয়া ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হয়। এই কুকুরদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ যে, যদি কোন ব্যক্তি বরফের নীচে চাপা পড়িয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাকে বাহির করিয়া দেয়। এইরূপ মনুষ্যের উপকার করিতে গিয়া অনেক সময় এই জাতীয় কুকুরও প্রাণে মারা গিয়াছে।

প্রবাদ এইরূপ যে, একদিন একটী, নিউফাউণ্ড

আফরিকা দেশীয় হাউণ্ড।
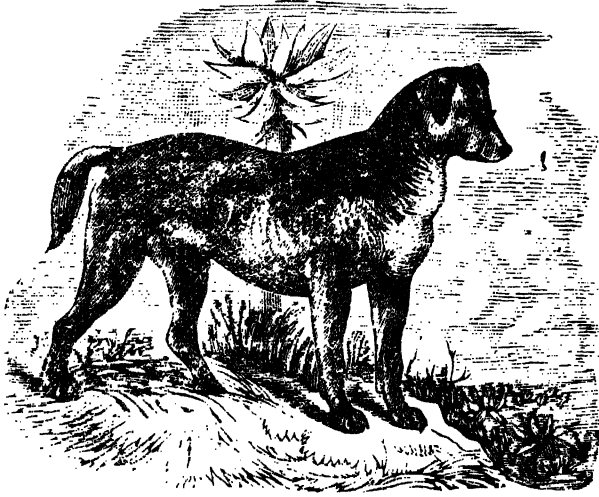
লাণ্ড কুকুর একটী বালককে বরফের মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিতে পায়, তাহার মাতা বরফ-চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছিল। কুকুরটী স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা কোন রকমে বালকটীকে পৃষ্ঠে চড়াইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছিল।

'লেব্রেডর' দেশে যে নিউফাউণ্ডলাণ্ড কুকুর পাওয়া যায়, তাহা খুব বড় এবং তাহারা বরফের উপরে গাড়ী টানিয়া থাকে। খাস নিউফাউণ্ড লাণ্ড-দেশে এই জাতীয় কুকুরকে কাঠের গাড়ী টানিতে দেওয়া হয়। যেমন আমাদের দেশে বলদে গাড়ী টানে, সেইরূপ সে দেশে কুকুরে গাড়ী টানিয়া থাকে। অনেক সময় এই জাতীয় কুকুর, মনুষ্যকে জল হইতে রক্ষা করিয়াছে, অনেকে এই কুকুরের সাহায্যে জীবন পাইয়াছেন।

এস্কুইমো কুকুর।

এই জাতীয় কুকুর উত্তরে শীতপ্রধান দেশে বাস করে। এসিয়ার সাইবিরিয়া, কামেস্কাট্কা এবং উত্তর ইউরোপ ও আমেরিকায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে দূর হইতে দেখিলে, উত্তর-আমেরিকার ধূসর-বর্ণ বাঘ বলিয়া ভ্রম হয়। শীতকালে বরফের উপর তাহারা চক্রহীন গাড়ী টানিয়া থাকে। আর গ্রীষ্মকালে তাহারা বোঝা বহন করে ,এবং তৎসঙ্গে শীকারেরও অনুসরণ করে।

"বেফীনসবে"র (*Baffin's bay*) চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকেরা, এস্কুইমো কুকুর না থাকিলে, জীবন ধারণ করিতে অক্ষমহয়। গ্রীষ্মকালে তদ্দেশবাসীরা কুকুরের সাহায্যে হরিণ শীকার করিয়া আহার করে এবং পরিধান করিবার জন্য চামড়া রাখিয়া দেয়। আর যখন শীতকালের নিদারুণ বাত্যা প্রবাহিত হয়, তখন এই জাতীয় কুকুরের সাহায্যে তাহারা আহার অনুসন্ধান করিতে পারে। এসকুইমো কুকুরের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এত প্রবল ও সূক্ষ্ম যে তাহারা গন্ধ দ্বারা দ্রুতগামী হরিণের অনুধাবন করে এবং শীল মৎস্য যদি বরফের নীচে লুক্কায়িত থাকেত, তাহাও তাহারা জানিতে পারে। তাহারা ভল্লুক শীকারে খুব তৎপর এবং ভল্লুক যদি বনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা তাহারা গন্ধ দ্বারা জানিতে পারে। দুই তিনটী কুকুর এক একটী শীকারীর সঙ্গে থাকে এবং তাহারা অনায়াসে বড় একটী ভল্লুক মারিয়া ফেলিতে পারে। তাহারা নেকড়ে বাঘ দেখিলে তত বিক্রম প্রকাশ করে না, স্বভাবত বাঘকে একটু ভয় করে এবং তাহাদের দেখিলে বিকট চীৎকার করিতে থাকে।

কুকুরের শকট চালাইবার সময় লোকে চাবুক ব্যবহার বড় করে না; গোটা কতক ইঙ্গিতের কথা আছে, তাহাতেই কুকুরকে ডাহিন বা বামে ফিরান যায়। যেখানে বরফের উপর শকটের দাগ থাকে, সেখানে শকট চালাইতে কিছুই

কষ্ট বোধ হয় না। উচু-নিচু স্থানে শকট চালাইতে গেলে চালককে অনেক সময় নামিয়া নামিয়া যাইতে হয়। আবার যখন শকট থামাইতে হয়, তখন চালক "উও, ওয়া" করিয়া শব্দ করে, তাহাতেই কুকুর থামিয়া যায়। যখন বাড়ী-মুখো ফিরিয়া আসে, তখন কুকুরগুলি খুব দৌড়িতে থাকে এবং পাছে শকট উল্টাইয়া যায়, সেইজন্য চালক পায়ের গোড়ালি বরফের উপর চাপিয়া থাকে। ভারী বোঝা লইয়া কুকুরগুলি অনায়াসে গাড়ি টানিতে থাকে। এক একটী গাড়িতে দুইটী তিনটী করিয়া কুকুর জুতিয়া দেওয়া হয়, কখন বা ৭।৮ টী কুকুর জুতিয়া গাড়ি চালান হয়। এই কুকুরদের স্বভাব একটু 'খেঁকি' রকমের এবং তাহারা বড় একগুঁয়ে।

স্পেনিয়াল কুকুর।

এই কুকুর দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার গায়ে বড় বড় ঘন লোম জন্মে। নানাদেশে নানা রকম স্পেনিয়াল কুকুর পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের জাতীয় স্বভাব এই যে, তাহারা খুব পোষ মানে এবং মনুষ্যকে খুব ভালবাসে। ইহাদের কান লোটান এবং বড় বড় হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও খুব তীক্ষ্ণ ও বলবান। শীকারের সময় এই জাতীয় কুকুর অপরিচিত লোকের সহিতও শীকার করিয়া থাকে। ইহাদের গাত্রের রঙ্গের কোন ঠিক নাই; কেহ কাল, কেহ সাদা, কেহ সাদা-কালমিশ্রিত রঙ্গের হইয়া থাকে।

একটী গল্প শুনুন;—বিলাতে কোন মহিলার একটী স্পেনিয়াল কুকুর ছিল। একদিন সকাল বেলা তিনি বুটজুতা পায়ে দিতে দিতে একটী ফিতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুকুরটী সেইখানে বসিয়াছিল। মেম সাহেব হাস্যচ্ছলে কুকুরকে কহিলেন,—"আর একটী জুতার ফিতা আনিতে পার ত ভাল হয়।" সেদিন আর কোন কথা হয় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন বুট পরিতে যান, কুকুরটী একগাছি ফিতা মুখে করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। সকলে একেবারে অবাক্! বোধ হয়, প্রভুভক্ত কুকুর কোন দোকান হইতে ফিতাগাছটী চুরি করিয়া আনিয়াছিল, নচেৎ সে এরূপ নূতন ফিতা কোথায় পাইলে?

জর্ম্মন দেশের গ্রন্থে আছে যে, এই জাতীয় কুকুর, মনুষ্যের কথা অনেকগুলি অস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে পারে। তত্রত্য কোন কোন কুকুর-পালক দু'টী হাত কুকুরের মুখে দিয়া তাহাকে ক্রমে মনুষ্যের ভাষা উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করায়। কিন্তু ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হয় এবং তাহাতে লোকেরও কোন উপকার হয় না।

"জলের স্পেনিয়াল" বলিয়া এক রকম কুকুর আছে। তাহারা জলে যাইতে খুব পটু। অন্য কুকুরদের অপেক্ষা ইহারা বেশী বুদ্ধিমান এবং দেখিতে বৃহৎ।

মাষ্টীফ্ ও টেরিয়া

মাষ্টীফ্ জাতীয় কুকুর খুব বলবান হইয়া থাকে। ইহাদের মাথা ছোট এবং চওড়া হয়। মুখ দেখিতে গোলাকার। তাহাদের ঠোঁটের মাংস ঝুলিয়া থাকে; চক্ষু একটু টেরা রকমের। সচরাচর ইহাদিগকে "বুলডগ" বলে। স্পেনিয়াল কুকুর অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধি কম, কিন্তু ইহাদের অতুল সাহস আছে। সম্মুখের দিকে ইহারা ৩০।৩৫ ইঞ্চি উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের গম্ভীর আকৃতি এবং কাণ লোটান হয়। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের সম্মুখে মাষ্টিফের বলের পরিচয় সম্বন্ধে একটী ঘটনা বর্ণিত আছে। একদা একটী সিংহের গর্ত্তে একটী মাষ্টীফ্‌কে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; সিংহ তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা কামড়াইয়া একেবারে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। আর একটী মাষ্টিফ্ যাইয়াও তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশেষে তৃতীয় কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, সে যাইয়া একেবারে সিংহের মুখ ও ঠোঁট কামড়াইয়া রহিল। অবশেষে সিংহ নখের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিলে মাষ্টীফ পশুরাজকে ছাড়িয়া দিল। সিংহও ভয়ে গর্ত্তের খুব ভিতরে যাইয়া লুকাইল। পূর্ব্ব-প্রেরিত দুইটী কুকুর পরে মরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তৃতীয়টী বাঁচিয়া থাকে। ইংলণ্ডেশ্বর নিজে তাহাকে সদা-সর্ব্বদা কাছে রাখিতেন ও অন্য কোন পশুর সহিত যুদ্ধ করিতে দিতেন না। ৭ম হেন্‌রী একটী মাষ্টীফকে

অষ্ট্রেলীয় দেশীয় কুকুর।
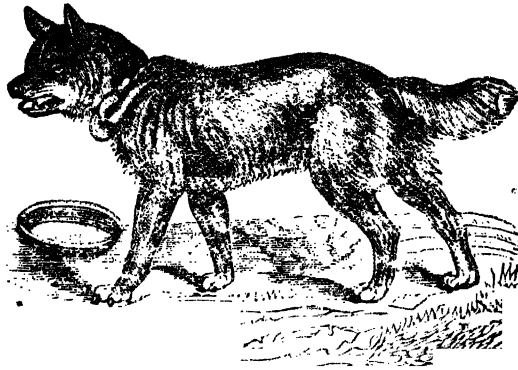
ফাঁসি দিবার হুকুম দিয়াছিলেন; কারণ, সে সিংহের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছিল।

টেরিয়া কুকুর নানা রকম হয় এবং নানাদেশে নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে এই কুকুর খুব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কাহারও গায়ে বড় বড় লোম জন্মে; কেহ বা ছোট ছোট লোমযুক্তও হইয়া থাকে। হেব্রিড্রিস অটার" পশু শীকার করিতে টেরিয়া কুকুর লইয়া যাওয়া হয়।

এই জাতীয় কুকুর নখ দ্বারা মাটী খুঁড়িতে ও মাটীর ভিতরে শীকার তাড়া করিতে খুব পটু। ভারতবর্ষে বন্য-পশু—শৃগাল, নেকড়ে বাঘ এবং হায়েনা শীকার করিতে গেলে, এই জাতীয় কুকুর সঙ্গে থাকে এবং যেখানে "বুল্‌ডগ" অগ্রসর হইতে ভয় পায়, সেখানেও টেরিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি জন্তু আক্রমণ করে। ইহারা অতিশয় প্রভুভক্ত এবং প্রভুর দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে খুব ভালবাসে।

শাস্ত্রেও হিন্দুর নিকট কুকুর যে ভাবে পরিচিত, তাহার আভাস কিঞ্চিৎ এই স্থানে দেওয়া গেল :—

"কুকুর কোন সঙ্কর জন্তু নহে। শৃগাল বা ব্যাঘ্র-বংশেও কুকুরের জন্ম নহে। অন্যান্য নানা জন্তুর উৎপত্তির ন্যায়, মহাযোগী মহর্ষি প্রজাপতি কশ্যপের বংশেই কুকুরের উৎপত্তি। ইহাদিগের আদি-মাতার নাম সরমা এইজন্য কুকুরের অন্যতম নাম—"সারমেয়"।

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ ষড়েতে বৈ শুনো গুণাঃ॥"

(১) কুকুর, বহুভোজী, অথচ (২) অল্প পাইলেও সন্তুষ্ট; (৩) কুকুরের নিদ্রা অতি সহজ—যথাতথায় পড়িয়া কুকুর সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, অথচ (৪) চেতনা খুব শীঘ্রই হয়, গাছের পাতা পড়িলে বা পিপীলিকা নড়িলেও বুঝি সে, নিদ্রা-নিমীলিত চক্ষু উন্মীলন করে—তাহার সংজ্ঞা হয়; (৫) কুকুর প্রভুভক্ত এবং (৬)—বীর, ইহাদিগের প্রভুভক্তি এবং বীরতার পরিচয় ইতিহাসে কত শত আছে;—কুকুর এই ষড়্‌গুণ-সম্পন্ন। কুকুর হইতে মনুষ্য এই ছয় গুণ শিক্ষা করিবে।

তাহা হইলেও কুকুর অতি নিকৃষ্ট জীব। কিরাত, চণ্ডাল প্রভৃতি অধম-জাতিরাই ইহাদিগের প্রতিপালকরূপে পরিচিত। দ্বিজাতিগণ বা উত্তম শূদ্র, কুকুরকে কদাচ স্পর্শ করিবে না। স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইতে হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত—সবস্ত্র অবগাহন-স্নান।

"শ্ব-কুক্কুট-বরাহাংশ্চ গ্রাম্যান্ সংস্পৃশ্য মানবঃ।
সচেলং সশিরঃ স্নাত্বা তদানীমেব শুধ্যতি॥"

কুকুরের উচ্ছিষ্ট-ভোজন জ্ঞানত বা অজ্ঞানত করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"বিড়াল কাকাদ্যুচ্ছিষ্টং জগ্ধা শ্ব-নকুলস্য চ।
————পিবেদ্‌ব্রহ্মসুবর্চ্চলাম্॥"

তাঞ্চ পীত্বা দিনমেকমতিবাহনীয়ম্ প্রমাদ-বিষয়মেতৎ। জ্ঞানে তু সম্বর্ত্তঃ,—

"শ্ব-কাক-গোভিরুচ্ছিষ্ট-ভক্ষণে তু দিনত্রয়ম্।"

তথা জ্ঞানাভ্যাসে বসিষ্ঠঃ,—

শ্ব-কাকাবলীঢ়-শূদ্রো-চ্ছেষণ-ভোজনেম্বতিকৃচ্ছ্রঃ অত্রৈব মধু-মাংস-বিপ্রকর্ষে।"

অত্যন্তাভ্যাসে শঙ্খঃ,—

"শুনস্তূচ্ছিষ্টকং ভুক্ত্বা মাসমেকং ব্রতীভবেৎ।"

প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

অজ্ঞানত একবার মাত্র কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে 'ব্রহ্মসুবর্চ্চলা' বৃক্ষের * ক্বাথ পান করিয়া একাহ উপবাস কর্ত্তব্য।

জ্ঞানত একবার ভোজন করিলে, তিন দিন উপবাস। জ্ঞানতঃ ছয় বার ভোজন করিলে 'অতিকৃচ্ছ্র' ব্রত। চতুর্ব্বিংশতি বার ভোজনে অতিকৃচ্ছ্রের চারিগুণ—একমাস গোমূত্রযাবক পান-প্রায়শ্চিত্ত। তবে কুকুরের উচ্ছিষ্ট অনিষিদ্ধ-মাংস এবং মধু, ভক্ষিত-স্থান পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করা যায়।

কুকুরের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজনেও পাপ হয়। অধিক বার ভোজন করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত বা প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হয়।

"লঘুবিষ্ণুঃ,—

"শূদ্রজুষ্টং শুনা বাপি সংস্পৃষ্টং প্রাশ্য ভোজনম্।
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যেৎ তু প্রাজাপত্যেন বা পুনঃ॥"

প্রায়চিত্তবিবেক।

কুকুরে দংশন করিলে ক্ষত অঙ্গের উচ্চ-নীচতা অনুসারে এবং দংশনের ন্যূনাধিক্য অনু-সারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের 'শ্বাদি-দংশন-প্রায়শ্চিত্ত' প্রকরণে এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

কুকুর দেখাইয়া বা কুকুর দ্বারা ক্রীড়া করাইয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাঁহাদিগের বাড়ীতে আহার করিতে নাই।

"শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ।" মনু—প্রায়শ্চিত্তবিবেক।
"চণ্ডালান্নং ভূমিপান্নমজজীবি-শ্বজীবিনাম্।
শৌণ্ডিকান্নং সূতিকান্নং ভুক্ত্বা মাসং ব্রতী ভবেৎ"
(শঙ্খ—প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।)

ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে, একমাস 'যাবক' পান করিতে হয়।

* হুড়হুড়িয়া বৃক্ষ।

বৃহৎ সংহিতায় কুকুর সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। রাজারাও মৃগয়াদির জন্য কুকুর পুষিতে পারেন, চাণক্য-নীতিতে তাহার লক্ষণাদি নানা প্রকার আছে।

পুরাণ ও কাব্যে কিরাত-শবরাদি বর্ণন প্রসঙ্গে কুকুর তৎসহচররূপে বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র এবং হিন্দুগণ এইরূপে কুকুরের দোষ ও গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে সংশূদ্র পর্য্যন্ত সকল গৃহস্থকেই প্রত্যহ কুকুরকে অন্ন দিবার জন্য উপদেশ শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে কুকুরের বিষ-চিকিৎসা আছে; কুকুর-বিষের নাম 'আলর্ক বিষ'।

অমরকোষে সাধারণ কুকুরের এই সব নাম আছে,—কৌলেয়ক, সারমেয়, মৃগদংশক, শুনক, ভষক, শ্বা।

মৃগয়াশাল কুকুরের নাম,—বিশ্বকদ্রু।

ক্ষিপ্ত কুকুরের নাম এই,—অলর্ক।

কুকুর সম্বন্ধে কত কথাই আছে, কত গল্পই আছে, তাহা একত্র করিয়া লিখিলে, একখানি মহাভারত অপেক্ষাও বিস্তৃত পুস্তক হইয়া পড়ে। সে কথা যাউক্, আজ এই টুকু দেখিয়াই পাঠকেরা বিরক্ত না হইলে বাঁচি।

কুকুরের পুচ্ছটী সহজত কুটিল, এইজন্য সংস্কৃত-সাহিত্যে দৃষ্টান্তে বা ব্যঙ্গস্থলে কুকুরের ল্যাজ লইয়া একটু নাড়াচাড়া আছে।

সাবান এবং বাতি।

১ম অংশ।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালা এবং ব্রহ্মদেশে প্রতিবৎসর অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের সাবান এবং বাতি ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হয়। এই সাবান এবং বাতি প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে চরবি, মোম, এবং নারিকল, রেড়ি, তিল, বাদাম, ইত্যাদির তৈল প্রভৃতি প্রধান, প্রধান উপকরণ গুলি আমাদিগের ভারত হইতে ভূরি ভূরি পরিমাণে ইউরোপে

প্রেরিত হয়। ফলতঃ সাবান এবং বাতি প্রস্তুত করিবার জন্য যে যে সকল উপাদানের আবশ্যক হয়, তাহা প্রায় সমস্তই আমাদিগের দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

সাবান এবং বাতি প্রস্তুত করিতে, যেটুকু বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহা অল্পায়াসেই অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তৈল এবং চরবির মধ্যে তরল পদার্থ ব্যতীত, আরও কয়েকটী নিরেট পদার্থ আছে। কয়েকটী সাধারণ রাসায়নিক সামগ্রী-যোগে তৈল কিংবা চরবির এই নিরেট অংশটুকু পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহাকে ছাঁচে ঢালিলেই সাবান এবং বাতি প্রস্তুত হইয়া যায়।

রাসায়নিক সামগ্রীর মধ্যে সাবান প্রস্তুত করিতে ক্ষার এবং বাতি প্রস্তুত করিতে তাহাতে অম্লের প্রয়োজন হয়। বাষ্প-যন্ত্রের শক্তি ছাঁচে প্রয়োগ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে সাবান এবং বাতি নির্ম্মাণ করা কেবল একটি কৌশল মাত্র।

সাবান এবং বাতি,—দুইটীই যমজ পদার্থের ন্যায়। ইহাদিগের একটী প্রস্তুত করিতে গেলে, অপরটী প্রায় স্বতঃই প্রস্তুত হইয়া উঠে। এজন্য সাবান এবং বাতি প্রস্তুতের কারখানা সচরাচর একত্র নির্ম্মাণ করা হয়। বস্তুতঃ তৈল কিংবা চরবিকে অগ্রে সাবানে পরিণত করিয়া, পরে তাহা হইতে বাতি-প্রস্তুত করণোপযোগী পদার্থ স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়।

এইজন্য অগ্রে সাবান-প্রস্তুত-প্রণালী লিখিত হইল। চরবি এবং যে যে তৈল সাবান এবং বাতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের উল্লেখ; কোথায় সেই সকল দ্রব্য পাওয়া যায়; ক্ষার এবং অম্ল কি প্রকারে সংগ্রহ এবং ব্যবহার করিতে হয় এবং কি প্রকার বাষ্প-যন্ত্রে প্রয়োগ করিয়া সহজে এবং সুলভে সাবান এবং বাতি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা অতি সরল ভাষায় লিখিত হইল। বোধসৌকর্য্যার্থে রাসায়নিক পরিভাষা যথা-সম্ভব পরিত্যক্ত হইল।

২য় অংশ।

সাবান।

সাবান একটী লবণতুল্য যৌগিক পদার্থ। লবণ মাত্রই যেমন ক্ষার এবং অম্ল দিয়া প্রস্তুত হয়, সাবানও ঠিক সেইরূপ ক্ষার এবং চরবি কিংবা তৈলের অভ্যন্তরস্থ অম্ল দিয়া প্রস্তুত হয়। ফিটকিরি (সল্‌ফেট্ অব্ এলাম্) এক প্রকার লবণ; এই লবণ গন্ধক-দ্রাবক অম্ল এবং এলুমিনা ক্ষারের সংযোগে উৎপন্ন। সোয়ারা (নাইট্রেট্ অব্ পটাশ্) একপ্রকার লবণ; ইহা যবক্ষার-দ্রাবক অম্ল এবং পটাশ্ নামক ক্ষারের সমষ্টি। আমরা যে লবণ প্রত্যহ খাই (ক্লোরাইড অব্ সোডিয়াম) তাহা ক্লোরিক নামক অম্ল এবং সোডা নামক ক্ষার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ লবণ পদার্থ মাত্রই একপ্রকার অম্ল এবং একপ্রকার ক্ষার দিয়া প্রস্তুত। লবণস্বরূপ সাবানও এই প্রকার তৈলের অভ্যন্তরস্থ অম্ল এবং পটাশ্ অথবা সোডা নামক ক্ষারের সমষ্টি।

চরবি কিংবা তৈলের অভ্যন্তরে যে যে অম্ল পদার্থ থাকে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ তৈলজ অম্ল (ফ্যাটি এসিড) কহা যায়। সচরাচর নিম্নলিখিত অম্ল কয়েকটী চরবি এবং তৈলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—

১। ষ্টিয়ারিক্ এসিড
২। মার্গরিক এসিড
৩। ওলিক এসিড

এতদ্ভিন্ন গ্লিসিরিন নামক উগ্র মিষ্টাস্বাদযুক্ত আর একটী পদার্থ থাকে।

তৈলে কিংবা চরবিতে ক্ষার-সংযোগ করিয়া তাহাতে যথেষ্ট অগ্নি-সন্তাপ প্রয়োগ করিলে এই তিনটী তৈলজ অম্ল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং ক্ষারের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাবান প্রস্তুত করে। দুধে অম্ল দিলে ছানা যেমন উপরে ভাসিয়া উঠে, সেই প্রকার তৈলে ক্ষার সংযোগ করিয়া অগ্নির উত্তাপ দিলে সাবান উপরে ভাসিয়া উঠে। গ্লিসিরিন নামক পদার্থটী পৃথক্ হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে।

সংক্ষেপেতঃ এরূপ বলিলেও হয় যে, উগ্র পটাশ্ কিংবা সোডা ক্ষারদ্রব-সহযোগে চরবি কিংবা তৈল হইতে গ্লিসিরিন পদার্থটী বহিষ্কৃত করিয়া দিলেই অবশিষ্ট সাবান রহিয়া যায়।

অর্থাৎ ক্ষার-দ্রব্যের জলের সহিত চরবি কিংবা তৈলের গ্লিসিরিন মিশিয়া গেলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সাবান।

পটাশ্ কিংবা সোডা ভিন্ন অন্য কোন ক্ষার দিয়া সাধারণ ব্যবহারোপযোগী সাবান প্রস্তুত হয় না। কারণ চুণ, ম্যাগ্‌নিসিয়া, ধাতুভস্ম ইত্যাদি অন্যান্য ক্ষার দিয়া সে সকল সাবান প্রস্তুত হইতে পারে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে জলে দ্রবণীয় হয় না। এরূপ সাবানের কোন কোনটী ঔষধ প্রস্তুতার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে লবণমাত্রেরই মূলে একপ্রকার ক্ষার এবং একপ্রকার অম্ল পদার্থ থাকে। এই ক্ষার এবং অম্লের যে যে পরিমাণ একত্র মিলিয়া লবণ প্রস্তুত করে, তাহাদের এক একটী স্বাভাবিক মাত্রা নির্দ্দিষ্ট থাকে। যেমন সল্‌ফেট্‌অব্ সোডা একপ্রকার লবণ; ইহা প্রস্তুত করিতে ৩১ ভাগ সোডা, ৪৯ ভাগ গন্ধক দ্রাবক এবং ৯ ভাগ জলের আবশ্যক। সেইরূপ সোডা বা পটাশ্ এবং তৈলজ অম্লের যে যে পরিমাণ পরস্পর মিলিত হইয়া সাবান উৎপন্ন হয়, তাহারও এক একটী স্বাভাবিক মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। কত পরিমাণ সোডা কিংবা পটাশ্, কত পরিমাণ তৈল কিংবা চরবিকে সাবানে পরিণত করিতে পারে, তাহা যথার্থরূপে নিরূপণ করিতে পারা অতি আবশ্যক। কারণ ইহারই উপর সাবানের ফলন এবং গুণের তারতম্য নির্ভর করে।

অন্যান্য অম্লাপেক্ষা তৈলজ অম্ল গ্রহণ করিতে ক্ষারের শক্তি অনেক বেশী। সল্‌ফেট্‌ অব্ সোডা প্রস্তুত করিতে, ৩১ ভাগ সোডা, ৪৯ ভাগের বেশী গন্ধক-দ্রাবক গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু সাবান প্রস্তুত স্থলে সেই ৩১ ভাগ সোডা ২৮৭ ভাগ ষ্টিয়ারিক এসিড অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। সোডার পরিবর্ত্তে পটাশ্ ক্ষার ব্যবহার করিলে ৩১ ভাগ সোডার স্থলে ৪৭ ভাগ পটাশ্ লইতে হয়।

ষ্টিয়ারিক এসিডের যেরূপ ক্ষার-শোষণশক্তির পরিমাণ উল্লিখিত হইল, তদনুসারে নিম্নলিখিত কয়েকটী তৈল এবং চর্ব্বির সহিত কত পরিমাণ সোডা কিংবা পটাশ্ মিশ্রিত হইতে পারে, তাহার তালিকা এ স্থলে দেওয়া গেল, পাঠকগণ, মনোযোগ করিয়া দেখুন,—

১০০ পাউণ্ড	বিশুদ্ধ সোডা	বিশুদ্ধপটাশ
নারিকেল তৈল	১২.৪৪ পাউণ্ড	১৮.৮৬পাউণ্ড
পাম্ তৈল	১১.০০ ,,	১৬.৬৮ ,,
চরবি	১০.৫০ ,,	১৫.৯২ ,,
(১) ওলিক এসিড	১০.৫২ ,,	১৫.৯৫ ,,

যে তৈলে যত অধিক ক্ষার শোষণ করে, তাহাতে তত অধিক পরিমাণে সাবান উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, সর্ব্বাপেক্ষা নারিকেল তৈলেই অধিক পরিমাণে সোডা কিংবা পটাশ গ্রহণ করিতে পারে; এইজন্য সাবান প্রস্তুতি জন্য এই তৈল অধিক ব্যবহৃত হয়। পরন্তু চরবিতে সাবানের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। তৈলজ অম্লের অভ্যন্তরস্থ কার্ব্বন এবং হাইড্রজনের অংশ বিভিন্ন হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন তৈলের ক্ষার-শোষণ শক্তির ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয়।

কয়েক শ্রেণীর সাবান প্রস্তুত করিতে অনেক পরিমাণে রজন অর্থাৎ ধুনা ব্যবহৃত হয়। তৈলের ন্যায় রজনেও কয়েকটী অম্ল পদার্থ আছে। এই অম্লের ৩০২ ভাগ, সোডার ৩১ ভাগকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারে। রজন অনায়াসে সোডা কিংবা পটাশ কার্ব্বনেটকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে এবং অতি সহজেই তাহার ক্ষারের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাবান উৎপন্ন করে। কিন্তু বিশুদ্ধ-রজন-নির্ম্মিত সাবান শক্ত জমাট বাঁধিতে পারে না এবং উহা বায়ুতে রাখিলে জলাকর্ষণ করিয়া গলিয়া যায়। এইজন্য অন্যান্য তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রজন দ্বারা উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দুধে অম্ল দিলে ছানা জমাট বাঁধিয়া যায়, কোন কোন অম্লে এই জমাট খুব শক্ত হয়, আর কোন কোন অম্লে উহা কিঞ্চিৎ নরম হইয়া যায়। সাবানও সেইরূপ কোন কোন ক্ষারে খুব শক্ত জমাট বাধে। পটাশ অপেক্ষা সোডার জমাট বাঁধিবার শক্তি অনেক বেশী। এইজন্য সোডা দ্বারা যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহাকে "কঠিন সাবান" বা "হার্ড সোপ্" বলে। আর পটাশ-সংযুক্ত সাবানকে "কোমল সাবান" অর্থাৎ "সফ্‌ট্

(১) বাতি প্রস্তুত করিতে অনেক ওলিক এসিড নির্গত হয়। ইহা একটী তৈলজ অম্ল। যথাস্থলে ইহার বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত হইবে।

সোপ্” কহে। সোডা, বায়ুতে রাখিলে শুকাইয়া যায়, কিন্তু পটাশ, বায়ুর জলাকর্ষণ করিয়া ভিজিয়া উঠে।

আমরা যে লবণ খাই, তাহা “কঠিন সাবান” প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যবহৃত হয়। ক্ষারদ্রব এবং তৈল, অগ্নি সন্তাপে কিছুকাল ফুটিলে তন্মধ্যে লবণ প্রয়োগ করিবার পর শীঘ্র সাবান জমাট বাঁধিয়া ভাসিয়া উঠে। নারিকেল তৈলের সাবানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লবণের প্রয়োজন।

পটাশ দিয়া সাবান প্রস্তুত করিতে লবণ ব্যবহার হয় না। কারণ, লবণের অভ্যন্তরস্থ সোডা, পটাশকে নষ্ট অর্থাৎ স্থানচ্যুত করিয়া সমস্ত ক্ষারকে সোডা-ক্ষারে পরিণত করিয়া ফেলে। এইজন্য পটাশ-মিশ্রিত সাবান-দ্রবে লবণ দিলে তাহাতে “কোমল সাবান” প্রস্তুত হয় না। সোডা দুর্ম্মূল্য কিংবা পটাশ সস্তা হইলে অনেকে লবণ সংযোগ করিয়া পটাশ দ্বারা “কঠিন সাবান” প্রস্তুত করিয়া থাকে।

তৈলের মধ্যে যে তৈল জমিয়া যায়, তাহা এবং চরবি দ্বারা সচরাচর “কঠিন সাবান” প্রস্তুত হয়। অন্যান্য তৈল দিয়াও সোডা সহযোগে “কঠিন সাবান” প্রস্তুত হয়। আবার, কেহ কেহ “কোমল সাবান” প্রস্তুত করিতে পটাশের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ সোডাও মিশ্রিত করিয়া লন। এরূপ করিতে হইলে, সোডার ভাগ পটাশের একচতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি ভাগের বেশী লওয়া উচিত নহে। এতদপেক্ষা বেশী সোডা মিশ্রিত করিলে, সাবানের কোমলত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

অনেক সময় দুই তিনটী তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সাবান প্রস্তুত করা হয়। কখন চরবি এবং তৈল অথবা তৎসঙ্গে রজন মিলাইয়া লওয়া হয়।

খনিজ তৈল অর্থাৎ কেরোসিন, মেটেতৈল ইত্যাদিতে সাবান প্রস্তুত হয় না। অতএব যে চরবি কিংবা তৈলে এই খনিজ তৈলের সংস্রব থাকে, তাহা সাবধানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তৃতীয় অংশ।

সাবান প্রস্তুত করিবার উপাদান।

যে সকল ঔদ্ভিজ্জ এবং জান্তব তৈল, সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা কোথায় পাওয়া যায়, কি প্রকারে তাহা সংগ্রহ করিতে হয় এবং কেমন করিয়া তাহাদিগকে পরিষ্কৃত করিয়া সাবান-প্রস্তুতকরণাপযোগী করিয়া লইতে হয়, তদ্বিষয় এই অংশে বিবৃত হইল।

ঔদ্ভিজ্জ তৈল।

১। নারিকেল তৈল। ভারতের ন্যায় নারিকেল-প্রদ দেশ পৃথিবীতে অতি বিরল। আমেরিকার এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী গ্রীষ্মপ্রধান স্থানসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে নারিকেল জন্মে বটে, কিন্তু তাহা দাক্ষিণাত্যের এক মলবর উপকূলের উৎপন্নের সহিত তুলনায় অতি সামান্য। সিংহল এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহে বিস্তর নারিকল জন্মে। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ সাবান এবং বাতি নির্ম্মাতা প্রাইস কোম্পানীর লঙ্কা-দ্বীপে নারিকেল তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য একটী বৃহৎ কুঠি আছে। এ ভিন্ন ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সকল স্থানেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়।

নারিকেল তৈলে অতি উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হয়। যত প্রকার উদ্ভিজ্জ এবং জান্তব তৈল দ্বারা সাবান প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে এই তৈলোৎপন্ন সাবান অতি পরিষ্কার এবং ফলনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। নারিকল তৈলে অধিক পরিমাণে ক্ষার শোষণ করে বলিয়া ইহার সাবান,—পরিমাণ এবং ওজনে বাড়িয়া যায়। ইউরোপে নারিকেল তৈল দুর্লভ হইলেও প্রতিবৎসর অন্যূন ৪ লক্ষ মন তৈলের আমদানি হয়।

এক শত ভাগ নারিকেলের মধ্যে ৩০ভাগ তৈল এবং ৪০ ভাগ জল থাকে। অবশিষ্ট ৩০ ভাগের মধ্যে চিনি, গঁদ, অণ্ডলাল এবং কিঞ্চিৎ খনিজ ও কাষ্ঠজাতীয় পদার্থ থাকে। শুষ্ক নারিকেলশস্য হইতে শতকরা ৫৪ অংশের অধিক তৈল নির্গত হয়। সচরাচর ৪০টা নারিকল হইতে ৫ সের তৈল পাওয়া যায়। লবণাক্ত স্থানের নারিকেল, কম তৈল প্রদান করে।

গাছ হইতে নারিকেল পাড়িয়া, তাহা সদ্য না ভাঙ্গিয়া, ঘরে রাখিয়া দিতে হয়। অতঃপর অন্ততঃ ৬।৭ সপ্তাহ অতীত হইলে, তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। এইরূপ বিলম্ব করিয়া ভাঙ্গিলে শাঁসগুলি শীঘ্র শুকাইয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে তৈল নির্গত হয়; সেই তৈল অনেক দিন রাখিয়া দিলেও ঘোলা হইয়া নষ্ট হয় না। নারিকেলগুলি অতি সুপক্ক অর্থাৎ খুব ঝুনা হওয়া চাই।

নারিকেল হইতে যে প্রকারে তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। 'কোরানো-নারিকেল চাপিয়া দুধ বাহির-করিয়া, তাহাকে জলযোগে অগ্নির উত্তাপ দিলে, তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। আর কলুর ঘানি-যন্ত্রে পেষণ দ্বারাও নারিকেলের শস্য হইতে তৈল বাহির করা হয়। প্রথমোক্ত প্রণালীতে তৈলের অনেক অপচয় হয়, কিন্তু তৈল অতিশয় নির্ম্মল, উজ্জ্বল এবং বর্ণহীন হয়। সুগন্ধযুক্ত তৈলাদি প্রস্তুত করণ জন্য এই উপায়োৎপন্ন তৈল ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত প্রণালী সাধারণ।

নারিকল তৈল শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত এবং শৈত্যে জমিয়া মাখমের ন্যায় হয়। ইহা সুরায় দ্রবণীয় এবং ক্ষারের সহিত সহজে মিশ্রিত হয়। ইহাতে কয়েকটী তৈলজ অম্ল এবং গ্লিসিরীন নামক একটী মধুবৎ পদার্থ আছে। ক্ষারের সহিত তৈল মিশ্রিত হইলেই, এই গ্লিসিরীনটী পৃথক্ হইয়া যায় এবং অম্ল কয়েকটী ক্ষারের সহিত মিলিত হইয়া সাবানে পরিণত হয়।

সাবান এবং বাতি প্রস্তুত জন্য নারিকেল তৈল একটী অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রধান উপাদান। ইহার সাবান অতিশয় শুভ্র, পরিষ্কৃত এবং জলে সহজে দ্রবণীয় হয়। নারিকেল তৈলের সাবানের আর এক বিশেষ গুণ এই যে, লবণাক্ত জলে অর্থাৎ সমুদ্রজলেও দ্রব হয়। ইহার বাতিও অতি উজ্জ্বল আলোক প্রদান করে এবং অন্যান্য বাতির ন্যায় ইহা হইতে কিছুমাত্র ধূমোদ্গম হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নারিকেল তৈল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্ষার শোষণ করে এবং এইজন্য অন্যান্য তৈল অপেক্ষা এই তৈলোৎপন্ন সাবানের ফলনও অধিক। ইহার সাবান ও তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জল শোষণ করে। এই অতিরিক্ত জল সাবান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। তজ্জন্য সাবান জমাট বাঁধিয়া ভাসিয়া উঠিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে লবণ (যে লবণ আমরা খাই) প্রয়োগ করিতে হয়। অনেক অসৎ লোক এই অতিরিক্ত জল সম্পূর্ণরূপ বহিষ্কৃত করিয়া ফেলে না, বরং উহা যত্নপূর্ব্বক সাবানে রক্ষা করিয়া উহার ওজন বৃদ্ধি করে।

তৈল পুরাতন কিংবা অপবিত্র, দুর্গন্ধযুক্ত অথবা ঘোলা হইয়া বিকৃত হইলে তাহা নিম্নলিখিত রূপে সংশোধন করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হয়।

বিকৃত তৈল কিঞ্চিৎ গরম করিয়া একটী বড় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত টবে ঢালিতে হয় এবং তাহাতে সম-পরিমাণ উষ্ণ জল মিলাইয়া কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা সজোরে আবর্ত্তন করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত তৈল ও জল সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া ক্ষীরের [illegible] সে পর্য্যন্ত ক্রমাগত সজোরে ঘুঁটিতে হইবে। অনন্তর আরও খানিক জল মিলাইয়া ২ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়। এই সময়ে জল হইতে তৈল পৃথক হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন সাবধানপূর্ব্বক নীচের জল ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় জল দিয়া পূর্ব্ববৎ আবর্ত্তন করিতে হয় এবং আবার কিছু কাল 'থিতাইয়া' পূর্ব্বের ন্যায় নীচের জল ফেলিয়া দিতে হয়। এইরূপ তিন কিংবা চারিবার ধৌত করিলে অতি দূষিত তৈলও সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়া যায়। তৈলে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে তাহাতে কয়লা-চূর্ণ দিয়া আবর্ত্তন করিলে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়।

বঙ্গদেশে বরিশাল, যশোহর ও ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশ স্থানসমূহে বিস্তর নারিকেল জন্মে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশের মলবর এবং করমণ্ডল উপকূলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নারিকেল জন্মে। এই দুই উপকূলস্থ লোকেরা নারিকেল তৈল রন্ধনে ব্যবহার করে। মলবর-উপকূলবাসীরা নারিকেলের দুধের সদ্য উৎপন্ন তৈল, মাখমের ন্যায় ভাতের সহিত খায়।

২। রেড়ীর তৈল—ইহার অন্যতর নাম—এরণ্ড তৈল। ইংরাজী নাম—ক্যাষ্টর অয়েল। ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ইহা বিস্তর জন্মে। মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে যেমন

প্রচুর নারিকেল জন্মে, বঙ্গদেশে তেমনি রেড়ীর প্রচুর আবাদ হয়। কলিকাতা সহরে রেড়ীর বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কারখানা আছে।

রেড়ীর বীজ রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিতে হয়। সেই চূর্ণ জল দিয়া অগ্নি-সন্তাপে কিছুকাল জ্বাল দিলে, জলের উপরে তৈল ভাসিয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন কলুর ঘানি দ্বারা শুষ্ক রেড়ী হইতে তৈল নিষ্পীড়িত করিয়া লওয়া হয়। অধুনা বিলাতি হাইড্রলিক প্রেস দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। হাইড্রলিক প্রেসে দিবার পূর্ব্বে বীজগুলি অগ্নি কিংবা রৌদ্র-তাপে তপ্ত করিয়া লইতে হয়। এরূপ করিলে বীজ হইতে সমস্ত তৈল চাপে সহজে নির্গত হয়। ঔষধার্থে শীতলাবস্থায়ই বীজ নিষ্পাড়ন করিয়া তৈল প্রস্তুত করা হয়। অনন্তর তৈল জলের সহিত ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়।

এরণ্ড তৈল কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ, বিশেষ দুর্গন্ধ-যুক্ত এবং আস্বাদহীন। ওজনে ভারি; সুরায় দ্রবণীয়।

এদেশে, কেবল ঔষধার্থে এবং আলোকের জন্য রেড়ীর তৈল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ মণ রেড়ীর তৈল,—সাবান প্রস্তুত এবং অন্যান্য ব্যবহার জন্য প্রতি বৎসর ভারত হইতে প্রেরিত হয়। আমেরিকায়ও প্রচুর এরণ্ড তৈল উৎপন্ন হয়

রেড়ীর তৈল অতি সহজে ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ক্ষার উহার তৈলজ অম্লের সহিত মিলিয়া উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করে। গ্লিসিরীণ পৃথক্ হইয়া পড়ে।

৩। তিল তৈল—ইহার ইংরেজী—নাম জিঞ্জিলী বা সিসেম তৈল। তিল সাধারণত দুই প্রকার ; শ্বেত এবং কৃষ্ণ। কৃষ্ণতিল অপেক্ষা শ্বেত-তিলে অধিক তৈল থাকে। ভারতবর্ষই তিলের আদি জন্মস্থান, কিন্তু অধুনা পৃথিবীর যাবতীয় উষ্ণ প্রধান স্থানসমূহে ইহার আবাদ হইতেছে।

ফ্রান্সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তিল তৈল প্রস্তুত হয়। প্রথমত শুষ্ক তিল নিষ্পীড়ন করিয়া একবার তৈল বাহির করা হয়। অনন্তর যে খইল অবশিষ্ট রহিয়া যায়, তাহা শীতল জলে আর্দ্র এবং নরম করিয়া দ্বিতীয় বার নিষ্পীড়ন করা হয়। সর্ব্বশেষে গরম-জলে কিঞ্চিৎ সিক্ত এবং তাহাতে কিছুকাল বাষ্প প্রয়োগ করিয়া, খইলগুলিকে তৃতীয়বার নিষ্পাড়ন করা হয়। এই প্রকারে ফ্রান্সে সচরাচর এক মণ তিল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মণ তৈল প্রস্তুত করা হয়। বলা বাহুল্য,—বাষ্প যন্ত্র দ্বারাই নিষ্পাড়ন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে চূর্ণ তিল জলে সিক্ত করিয়া তৈল পৃথক্ করিয়া লওয়া হয় এবং কলুর ঘানিযন্ত্রের সাহায্যে শুষ্ক তিল নিষ্পীড়ন দ্বারা তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক মণ এই প্রকারে ১৭। ১৮ সেরের অধিক তৈল প্রদান করে না।

তিল-তৈল অত্যন্ত লঘু, ঈষৎ পীতবর্ণ এবং বিশেষ গন্ধ-বিশিষ্ট। তিলের তৈল অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে ; নারিকল তৈলের ন্যায় শীঘ্র ঘোলা হইয়া খারাপ হয় না। তৈলজ অম্লের মধ্যে ওলিক এসিডই ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এক সের অকৃত্রিম তিল-তৈলে প্রায় তিন পোয়া ওলিক এসিড পাওয়া যায়। এই-জন্য সাবান প্রস্তুত জন্য ফ্রান্সে এই তৈলের বড়ই আদর।

সুলভ চিনে-বাদামের তৈল মিলাইয়া কোন কোন ব্যবসায়ী লোকেরা তিলের তৈল কৃত্রিম করিয়া বিক্রয় করে। এইরূপে তৈল কৃত্রিম করিলে নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

উগ্র নাইট্রিক-এসিড (যবক্ষার-দ্রাবক) এবং সল্‌ফিউরিক এসিড (গন্ধক-দ্রাবক) সম-পরিমাণে মিলাইয়া রাখিতে হয়। এই দুইটী দ্রাবক একত্র মিলাইলে মিশ্রটী খুব গরম হইয়া উঠে ; তখন শিশির মুখ কিছুকাল খুলিয়া রাখিয়া দিয়া ইহাকে শীতল করিয়া লইতে হয়। শীতল হইলে, এই মিশ্রের কিঞ্চিৎ লইয়া সম-পরিমাণ পরীক্ষণীয় তৈলের সহিত সজোরে ঝাঁকিয়া মিলাইতে হয়। তৈল যদি নির্ভেজাল তিলের তৈল হয়, তাহা হইলে এই নূতন মিশ্রটী উৎকৃষ্ট সবুজ-বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে। আর যদি অন্য কোন তৈল উহার সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে, ইহার বর্ণ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইবে না।

ইউরোপের সর্ব্বত্রই তিল তৈলের দ্বারা সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রামতিল নামক আর এক প্রকার তিল

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যখণ্ডে এবং আফ্রিকার অনেকাংশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই তিলের প্রতিমণে পঁচিশ সেরের অধিক তৈল উৎপন্ন হয় না। ষ্টিয়ারিক্‌ এসিড ইহাতে অতি অল্পমাত্রায় থাকে বলিয়া এই তৈলোৎপন্ন সাবান বড় নরম হয়। সচরাচর তিল-তৈলের সহিত মিলাইয়া এই তৈল সাবান-প্রস্তুতার্থে ব্যবহৃত হয়। সুলভ বলিয়া দাক্ষিণাত্যের গরিব লোকেরা গৃহস্থলীর সকল কার্য্যেই এই তৈল ব্যবহার করে।

৪। মসিনা বা তিসির তৈল।—ভারতবর্ষ এবং রুষিয়া—এই দুই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মসিনা জন্মে। রুষিয়ার মসিনা অপেক্ষা ভারতের মসিনায় কিঞ্চিৎ বেশী তৈল উৎপন্ন হয়।

রেড়ী এবং তিল হইতে যে প্রকারে তৈল নিষ্পীড়িত হয়, মসিনা হইতে ও সেই প্রকারে তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়। সদ্য মসিনার তেলের ফলন অতি কম হয়। সেইজন্য ক্ষেত্র হইতে মসিনা সংগ্রহ করিয়া, তাহা তিন চারি মাস গৃহজাত রাখিতে হয়। অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপ নিষ্পীড়ন দ্বারা তাহা হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। উৎকৃষ্ট মসিনায় শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত তৈল উৎপন্ন হয়। শ্বেত-মসিনায় অধিক তৈল উৎপাদন করে।

মসিনার তৈল ঘোর হরিদ্রাবর্ণ-বিশিষ্ট এবং বিশেষ দুর্গন্ধ-যুক্ত। ক্ষারের সহিত এই তৈল অতি সহজে মিশ্রিত হইয়া সাবান প্রস্তুত করে। তৈলজ অম্লের মধ্যে ওলিক এসিড ইহাতে অত্যন্ত বেশী এবং তজ্জন্য এই তৈলে শতকরা প্রায় ৯৫ অংশ সাবান প্রস্তুত হয়। পুরাতন তৈলাপেক্ষা সদ্যোজাত তৈল সাবান প্রস্তুতার্থে প্রশস্ত।

অন্যান্য তৈলাপেক্ষা মসিনার তৈল অতি সহজে শুকাইয়া যায়। শীতপ্রধান দেশোৎপন্ন মসিনার তৈলের এই শুষ্ককারিণী শক্তি কিঞ্চিৎ বেশী। ইহাকে মুদ্রাশঙ্খ নামক সীস লবণের সহিত অগ্নি-সন্তাপে মিলাইলে এই শুষ্ককারী ধর্ম্ম আরও বৃদ্ধি হয়। ইহার এই শুষ্ককারিণী শক্তির জন্য ছাপার কালী, রং, বার্ণিশ এবং কৃত্রিম রবর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে মসিনার তৈল বিস্তর ব্যবহৃত হয়।

৫। চিনে-বাদাম তৈল।—চিনে বাদাম ভারতবর্ষে প্রচুর জন্মে। মাদ্রাজ এবং পণ্ডীচারীতে ইহার বিস্তর আবাদ হয় এবং তথাকার নিম্ন-শ্রেণীস্থ লোকেরা মূল্য সুলভ বশত এই তৈল দ্বারা রন্ধন, আলোক দান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আমেরিকায় প্রতি বৎসর অন্যূন লক্ষমণ চিনে বাদাম উৎপন্ন হয়। জাবা দ্বীপেও ইহার খুব আবাদ হয়।

অন্যান্য শস্য হইতে যে প্রকারে তৈল নিষ্পীড়িত করিয়া লওয়া হয়, চিনে-বাদাম হইতে সেই প্রকারে তৈল প্রস্তুত হয়। ফ্রান্সে বিস্তর চিনে-বাদামের তৈল প্রস্তুত হয়। প্রথমত খোলা ফেলিয়া দিয়া শাঁস গুলি পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। অনন্তর ছোট ছোট থলিয়ায় পুরিয়া বাষ্পযন্ত্রের সাহায্যে তিলের ন্যায় ক্রমান্বয়ে তিনবার নিষ্পাড়ন করা হয়। এই প্রকারে শতকরা ৩০ ভাগ তৈল ইউরোপীয় বাষ্পযন্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়; কিন্তু ভারতে সামান্য ঘানি যন্ত্রেও এদতপেক্ষা বেশী তৈল পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা মাদ্রাজের চিনে-বাদামে বেশী তৈল উৎপন্ন হয়।

উৎকৃষ্ট চিনে-বাদামের তৈল প্রায় বর্ণহীন এবং কিঞ্চিৎ গন্ধযুক্ত। অনেক দিন বায়ুতে খোলা থাকিলে, ইহা ক্রমশ ঘনীভূত এবং ঘোলা হইয়া বিকৃত হয়।

সাবান প্রস্তুত জন্য প্রতি বৎসর মাদ্রাজ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চিনে-বাদাম ইউরোপে প্রেরিত হয়।

কায়স্থ।

মনুষ্য মরিয়া পশু-পক্ষী হইতেছে, পশু-পক্ষী মরিয়া মনুষ্য হইতেছে। নগরী অরণ্য হইতেছে, অরণ্য নগররূপে পরিণত হইতেছে। গ্রাম নদী-প্রবাহে আত্মবিসর্জ্জন দিতেছে, আবার নদী-গর্ভে দ্বীপাকারে কত গ্রামের উৎপত্তি হইতেছে। এইরূপ উৎপত্তি-ধ্বংস প্রতিনিয়তই হইতেছে, অথচ সমুদায় বিশ্ব-পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। কথাটা বিজ্ঞান-সম্মত না হউক, দার্শনিক তর্কসিদ্ধ না হউক, কবি একদিন অনায়াসে এরূপ ভাব

কল্পনা করিতে পারে। তাহাতে কিছুমাত্র বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, বিপত্তি নাই। বরং সপক্ষে দৃষ্টান্ত কত! ঐ দেখ,—ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতেছেন, প্রসিদ্ধ যুগী জাতি যোগী হইয়া ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র লইতেছে; দু'দশজন কায়স্থও উপনীত হইয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণের দল যতই যজ্ঞসূত্র ফেলিবেন, অপর জাতির মধ্যে যজ্ঞসূত্র লইবার ততই ধুম পড়িয়া যাইবে,—সুবর্ণবণিক্ কৈবর্ত্ত প্রভৃতির আয়োজন দেখিয়া ইহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। তাই বলি,—বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-পদার্থের সামুদায়িক হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। একদিকের হ্রাস, অপর দিকের বৃদ্ধি, ইহা নিশ্চিতই আছে। নির্ব্বিবাদ হইলে, এই কবি-কল্পনাও কালে দার্শনিক সিদ্ধান্তে পরিণত হইতে পারিত; পরন্তু এই যজ্ঞসূত্র ব্যাপারেই বেশ বিবাদ বিপ্রতিপত্তি বর্ত্তমান। এক প্রবল পক্ষ,—এই নবসূত্রধারী-দিগকে শাস্ত্র-ক্ষমতায় পর্য্যুদস্ত ও ইহাদিগের গলসূত্র ছিন্ন করিতে চাহেন; অপর পক্ষ,—সমর্থন করিতে অগ্রসর। সমর্থক পক্ষ, অন্য জাতির পক্ষে দুর্ব্বল; কায়স্থ জাতির পক্ষে অনেকটা প্রবল।

হাওড়া-আন্দুলের কায়স্থ রাজার উপবীত-গ্রহণ ব্যবস্থা হইতে এপর্য্যন্ত কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি ও উপনয়ন লইয়া সপক্ষে-বিপক্ষে পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ব্যবস্থা-অব্যবস্থা অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ নামক সুবৃহৎ অভিধানে, কায়স্থ শব্দের বিবরণীতে যে যুক্তিপূর্ণ বিচার লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের প্রীতি হইয়াছে;—কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে এরূপ বিচার ইতিপূর্ব্বে আর লিপিবদ্ধ হয় নাই একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি সঙ্কলনকর্ত্তা কল্যাণভাজন মান্ নগেন্দ্রনাথ বসু, এ বিচারে যথেষ্ট বিদ্যাবত্তা এবং ভূয়োদর্শনের পরিচয় দিয়াছেন; তথাপি, সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচনা হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় বিশ্বকোষের কায়স্থ-বিচারকে অবলম্বন করিয়াই দুই চারিটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

নগেন্দ্র বাবু,—(১) স্মৃতি, (২) পুরাণ, (৩) প্রাচীন কাব্য-নাটকাদি, (৪) সংস্কৃত ইতিহাস এবং (৫) দেশ-ব্যবহার,—এই পঞ্চবিধ উপায়ে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন। এক একটী করিয়া সংক্ষেপে 'ইহার পরিচয়' এবং আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

(১ম) স্মৃতির মত।

"সর্ব্ব প্রথমে বিষ্ণুসংহিতাতে 'কায়স্থ' শব্দের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং;—রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত-কায়স্থ-কৃতং তদধ্যক্ষ-কর-চিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।"

(বিষ্ণু ৭।২)

* * *

"অর্থাৎ রাজসভায় রাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং প্রাড়্বিবাকের কর-চিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত যে লেখ্য, তাহাই রাজসাক্ষিক।

"যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,—

"চাট-তস্কর-দুর্ব্বৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৩৩৫।

"কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।"

শূলপাণি-কৃত টীকা।

"কায়স্থ, রাজসম্বন্ধ প্রযুক্ত প্রভাবশালী।

"মিতাক্ষরায় কায়স্থের এইরূপ অর্থ আছে,—

"কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ। তৈঃ পীড্যমানা বিশেষতো রক্ষেৎ, তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ।"

"কায়স্থ অর্থাৎ গণক ও লেখক। তাহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত প্রজাদিগকে রাজা বিশেষতঃ রক্ষা করিবেন। কারণ, তাহারা (কায়স্থেরা) রাজার অতি প্রিয়পাত্র হওয়ায় অতি মায়াবী এবং দুর্দ্ধর্ষ। *

"বৃহৎপরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে,—

"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্ লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃৎ তু হিতৈষিণঃ॥"

বৃহৎপরাশর ১০। ১০।

* এ অনুবাদটী 'এইরূপ হইবে;—'কায়স্থেরা, রাজার অতি প্রিয়পাত্র এবং অতি মায়াবী, এইজন্য তাহারা দুর্নিবার।'

"শুচি, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরান্বিত ব্রাহ্মণকে এবং সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী লেখক কায়স্থকে (ইত্যাদি)।

"উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দু-রাজাদিগের সময়ে রাজকর্ম্মচারী রাজলেখকরূপে অভিহিত ছিলেন।

"ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা উল্লেখ না থাকিলেও তাহাদিগের আচার-ব্যবহার দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া দেখা উচিত যে, কায়স্থ-জাতি ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র কিনা?

"মনু প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই শূদ্র জাতির দ্বিজাতি-শুশ্রূষা ও শিল্প কার্য্যই একমাত্র (?) উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এমন কি, স্মৃতিশাস্ত্র-মতে শূদ্রকে স্পর্শ করাও দোষাবহ। যথা,—

"তস্মাৎ তানি ন শূদ্রায় স্পষ্টব্যানি যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বং তচ্ছূদ্র-সংস্পৃষ্টং ন পবিত্রং ন সংশয়ঃ।
লোকে ত্রীণ্যপবিত্রাণি পঞ্চামেধ্যানি ভারত।
শ্বা শূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব॥"
বৃদ্ধগৌতম ২১ অঃ, ১৯।২০।

"হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রগণকে স্পর্শ করা উচিত নহে। কারণ, এই সকল শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অপবিত্র হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে পাণ্ডব! কুকুর, শূদ্র ও শ্বপাক—এই তিন অপবিত্র। *

"রাজসভায় বসিয়া শূদ্রের লেখাপড়ার কথা কোন স্মৃতি বা পুরাণে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—কায়স্থেরা রাজসভায় বসিয়া লেখকের কার্য্য করিত; সুতরাং স্মৃতি মানিলে রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থগণ কোন ক্রমে শূদ্র হইতে পারেন না। বিশেষতঃ রাজ-সভায় নিযুক্ত লেখকগণ রাজার অষ্টাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যথা,—

"রাজা সংপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণক-লেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥"
নারদ সংহিতা ১।১৫।

"প্রাড়্‌বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, সুবর্ণ, অগ্নি ও জল—এই আটটী রাজার অঙ্গ। * * * কায়স্থকে যদি রাজসভাস্থ লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই জাতি যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

"মিতাক্ষরায় কায়স্থের অপর অর্থ, রাজার প্রিয়পাত্র গণক লিখিত হইয়াছে।

"ব্যাস, রাজ-সভাস্থ গণকের এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুট-প্রত্যয়-কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥"
বৈজয়ন্তী-ধৃত, ব্যাস বচন।

"রাজা,—ত্রিস্কন্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ স্ফুট-প্রত্যয়কারী এবং বেদবিদ্—এরূপ গণককে নিযুক্ত করিবেন।

"মহাভারতের সময়েও উক্ত গণক ও লেখকেরাই রাজার আয়-ব্যয় পরিদর্শন করিত। যথা,—

"কচ্চিচ্ছায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণক-লেখকৌ (?)
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্নে নিত্যমায়-ব্যয়ং তব॥"
সভাপর্ব্ব ৪র্থ (?)

"হে রাজন্! আয়-ব্যয় বিষয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক, পূর্ব্বাহ্নে আপনার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিয়া থাকে। (ত)?

"এক্ষণে যদি মিতাক্ষরার প্রমাণানুসারে কায়স্থকে গণক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কায়স্থকে শূদ্রজাতি বলা যাইতে পারে না; গণক বেদে অধিকারী, শূদ্রের কোন কালে বেদে অধিকার নাই।

"এক্ষণে স্থির হইল, কায়স্থ—শূদ্র নয়, কিন্তু দ্বিজাতির অন্তর্গত

---

* বৃদ্ধগৌতম-সংহিতার যে অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ; পূর্ব্ব শ্লোকটী দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। পূর্ব্ব শ্লোকটী এই,—

যান্যুক্তানি ময়া সম্যগ্ বিদ্যা-জন্মানি ভারত।
উৎপন্নানি পবিত্রানি পাবনার্থং তথৈব চ॥"

সুতরাং সমুদয়ের তাৎপর্য্য এইরূপ;—

যে চতুর্দ্দশ বিদ্যার কথা বলিলাম, তাহা পবিত্র এবং পবিত্র করিবার জন্য উৎপন্ন। অতএব তৎসমুদায় বিদ্যা শূদ্রকে দিবে না। কেননা, তৎসমস্ত শূদ্রাধিকৃত হইলে আর পবিত্র থাকে না। ইত্যাদি।

"বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন,—

লেখকঃ প্রাড়্‌বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানুপুর্ব্বশঃ।
নৃপেপশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতাঃ।"

"যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহার, ৬৭ শ্লোক। মিতাক্ষরা।

"রাজা তাহাদিগের কার্য্য দেখেন বলিয়া লেখক প্রাড়্‌বিবাক ও সভ্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।"

"উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাধিকরণে লেখকেরাও রাজসাক্ষী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

"যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত রাজসাক্ষীর এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ।
ত্র্যবরাঃসাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ।
যাজ্ঞবল্ক্য ২। ৬৮

"শূদ্রজাতি, ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত হইতে পারিত না। মহর্ষি কাত্যায়নের মতে—

"ব্রাহ্মণো যত্র নস্যাৎ তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।"

"মিতাক্ষরা, কেশব-বৈজয়ন্তী (১অঃ) ও কুল্লুক ধৃত কাত্যায়ন-বচন।

"যেখানে ব্রাহ্মণ নাই," অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন; শূদ্রকে কখন নিযুক্ত করিবেন না।

"উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারাও রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থ কখন শূদ্র হইতে পারে না। মনু-সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে ৩য় শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথিও কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"রাজাগ্রহার-শাসনাদ্যেক-কায়স্থ হস্তলিখিতা-ন্যেব প্রমাণীভবন্তি।"

"অর্থাৎ রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসন যাহা এক কায়স্থের হস্তলিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

"বাস্তবিক অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজাদিগের সময় মহাসান্ধি-বিগ্রহিকের কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বকালে রাজা শাসন দ্বারা যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন, সেই শাসনপত্রে মহাসান্ধি-বিগ্রহিকের নাম প্রকাশ থাকিত। এতৎসম্বন্ধে মিতাক্ষরায় এই বচনটী উদ্ধৃত দেখা যায়,—

"সন্ধি-বিগ্রহকারী তু ভবেদ্‌যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্‌।"
আচারাধ্যায় ৩১৯ শ্লোক।

"সন্ধি-বিগ্রহকারী লেখক নৃপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন। ইতিপূর্ব্বে মেধাতিথির উক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কায়স্থেরাই রাজশাসন লিখিত, এখন মিতাক্ষরা-ধৃত বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই লেখকই সন্ধি-বিগ্রহকারী বা সান্ধিবিগ্রহিক।

* * * *

"যতদূর দেখা হইয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে ক্ষত্রিয়েরই এই পদে অধিকার। মহর্ষি হারীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি—— ——
নীতিশাস্ত্রার্থ কুশলঃ সন্ধি-বিগ্রহ-তত্ত্ববিৎ।

* * * *

"তৈঃ সার্দ্ধংচিন্তয়েন্নিত্যংসামান্যং সন্ধি-বিগ্রহম্‌।
মনু ৭। ৫৬।

* * *

"রাজা সন্ধি-বিগ্রহাদি ঐ সকল বুদ্ধিমান্‌ সচিববর্গের সহিত সদ্‌যুক্তি ও সৎপরামর্শ (করিয়া?) করিবেন।

* * * *

"এবং মন্ত্রিনঃ পূর্ব্বং কৃত্বা তৈঃ সার্দ্ধং রাজ্যে সন্ধিবিগ্রহাদি লক্ষণং কার্য্যং চিন্তয়েৎ। সমস্তৈ-র্ব্যস্তৈশ্চ। অনন্তরং তেষামভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা সকল-শাস্ত্রার্থ-বিচারকুশলেন ব্রাহ্মণেন পুরো-হিতেন সহ কার্য্যং বিচিন্ত্য ততঃ স্বয়ং বুদ্ধ্যা কার্য্যং চিন্তয়েৎ।"

মিতাক্ষরা, আচারাধ্যায় ৩১১ শ্লোক।

"মিতাক্ষরার উক্ত বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা যে ৭। ৮ জন সচিবের সহিত সন্ধি-বিগ্রহাদি চিন্তা করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন; কারণ, ব্রাহ্মণের সহিত তৎপরে কি কি পরামর্শ করিবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (যাজ্ঞবল্ক্য ১অঃ। ৩১২ শ্লোক) ইতিপূর্ব্বে হারীতের

* অনুবাদ ঠিক হয় নাই।

বচন দ্বারা সন্ধি-বিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে !

"এক্ষণে সন্ধি বিগ্রহাদিকারী কায়স্থ স্মৃতির মতে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন্ বর্ণ হইতে পারেন ?

(বিশ্বকোষ, তৃতীয় ভাগ, ৫৬৫ হইতে ৫৬৮)

• উপরি উল্লিখিত বাক্যের সার তাৎপর্য্য এই যে, কায়স্থ—শূদ্র নহে। তাহার কারণ, (১) কায়স্থ রাজসভার লেখক। রাজসভায় বসিয়া লেখাপড়ার কার্য্য করা শূদ্রের পক্ষে অসম্ভব এবং নিষিদ্ধ। (২) লেখক—রাজসাক্ষী; রাজসাক্ষী ও রাজার অঙ্গ—শূদ্র হইতে পারে না। (৩) কায়স্থ,—লেখক এবং গণক। গণক বেদবিদ্ হইবেন। কায়স্থ, শূদ্র হইলে তাহার বেদাধিকার থাকিত না, কাজেই গণকপদ তাহার পক্ষে হইত না। (৪) লেখক এবং সান্ধি-বিগ্রহিক—একই ব্যক্তি। কায়স্থ যখন লেখক, তখন কায়স্থই সান্ধি-বিগ্রহিক। সান্ধি-বিগ্রহিকতা ক্ষত্রিয়েরই পদ ; কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হইলে এ পদে তাহার অধিকার থাকিত না। অতএব কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

কায়স্থ,—রাজসভার, ধর্ম্মাধিকরণের লেখক এবং লেখক-সহচর গণক এই টুকু মাত্র আমরা স্বীকার করি। উপরি বর্ণিত সাধ্য-সাধনাত্মক অপর সকল বিষয়েই আমাদের বিপ্রতিপত্তি আছে।

(১) রাজসভায় যে শূদ্রে বসিয়া লেখাপড়া করিতে পারিত না, এ কথা আমরা কোন মতে স্বীকার করি না। স্বীকার না করিবার কারণ,—ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়েই শূদ্রের অধিকার নাই, বিচার করিবার ক্ষমতাই শূদ্রের নাই, মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রে এই কথাই উক্ত হইয়াছে,—

"জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্‌ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন॥
যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥"

মনু, ৮অঃ, ২০।২১।

"উক্তং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ধর্ম্মনির্ণয়ং কুর্য্যাৎ ত্রিভিশ্চ মন্ত্রজ্ঞৈঃ। তত্র মন্ত্রিণাং জাতেরবিশেষিতত্বাৎ শূদ্রা অপি সভাং প্রবিষ্টা মন্ত্রিত্বাদনুজ্ঞাত-ব্যবহারনির্ণয়াস্তদ্দর্শনাৎ ধর্ম্মব্যবস্থাং কথঞ্চিৎ সংস্কৃতবুদ্ধয়ো ব্রূয়ুঃ।" ইত্যাদি।

মেধাতিথি-ভাষ্য।

অর্থাৎ বরং জাতিমাত্রোপজীবী কুৎসিত ব্রাহ্মণ, রাজসভায় ধর্ম্ম-নির্ণায়ক হইতে পারে, তথাপি, শূদ্র মন্ত্রী হইলেও কদাচ ধর্ম্ম নির্ণয় করিবে না। যে রাজার রাজ্যে শূদ্র, ধর্ম্ম-বিচারক, সে রাজার রাজ্য দেখিতে দেখিতে পঙ্ক-পতিত গাভীর ন্যায় অবসন্ন হয়। মনু-ভাষ্যকার মেধাতিথি, ঐ শ্লোকেরই ভাষ্যে অপরাংশে লিখিতেছেন,—

"নচ মন্ত্রিত্বে পুরোহিতবজ্জাতিনিয়মঃ। তথাহি তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েদিত্যুক্ত্বা ততো ব্রাহ্মণেন সহ চিন্তয়েদিতি, তেনায়মর্থঃ—যদ্যপি কথঞ্চিচ্ছূদ্রো ন্যায়লেশাংশমধিগচ্ছেৎ, তথাপি রাজাধিকরণে বিবদতো মন্ত্রী নিগ্রহাধিকৃতো বা ন কিঞ্চিৎ প্রব্রূয়াৎ॥"

অর্থাৎ পুরোহিতের যেমন জাতি-নিয়ম আছে, (ব্রাহ্মণ না হইলে পুরোহিত হইবে না) মন্ত্রিত্বে এমন কিছু জাতি-নিয়ম নাই (গুণ থাকিলে সকল জাতিই মন্ত্রী হইতে পারে)। ব্রাহ্মণ না হইলেও যে মন্ত্রী হইতে পারিবে—এই ভাব মনুসংহিতার মন্ত্রি-প্রকরণ হইতেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। মনু বলিয়াছেন,—'মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া পরে ব্রাহ্মণেয় সহিত মন্ত্রণা করিবেন।' অতএব, কারাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী যদি শূদ্র হয়, আর ঐ শূদ্র যদি ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত অভিযোক্তার অন্যতর পক্ষে যথাকথঞ্চিৎ কোন ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা বলিতেও সক্ষম হয়, তথাপি বলিবে না। ইহাই উপর্য্যুক্ত মনুশ্লোকের

এখন বিশ্বকোষের উল্লিখিত মিতাক্ষরা, কেশব বৈজয়ন্তী (৬ অঃ) ও কুল্লুকভট্ট-ধৃত ব্যাস-বচনটী দর্শন করুন,—

"ব্রাহ্মণো যত্র ন স্যাৎ তু*ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্যকে নিযুক্ত করিবার ও শূদ্রকে যত্নতঃ বর্জ্জন করিবার এই যে বিধি কাত্যায়ন করিয়াছেন, ইহাও ধর্ম্মনির্ণয়ের পক্ষে জানিবেন।

* কুল্লুকভট্ট-মতে প্রথম চরণের পাঠ,—
'যত্র বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ'
'অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের অভাবে।'

কুল্লুকভট্টও পূর্ব্বোক্ত "ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতেঃ" এই মনু-শ্লোক-টীকাতেই ধর্ম্মনির্ণয় ক্ষমতা যে তিন বর্ণের আছে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই "অতএব কাত্যায়নঃ" বলিয়া উক্ত বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শুক্রনীতিতে স্পষ্টই আছে,—

"যদা ন কুর্য্যান্ নৃপতিঃ স্বয়ং কার্য্যবিনির্ণয়ম্।
তদা তত্র নিযুঞ্জীত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
দান্তং কুলীনং মধ্যস্থমনুদ্বেগকরং স্থিরম্।
পরত্রভীরুং ধর্ম্মিষ্ঠমুদ্যুক্তং ক্রোধবর্জ্জিতম্।
যদা বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্রযোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

শুক্রনীতি ৪ অঃ। ৫ম প্রকরণ ১২—১৪।

রাজা স্বয়ং যদি ব্যবহার-কার্য্য নির্ণয় না করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই কার্য্য-নির্ণয় স্থলে একজন বেদপারগ, দমগুণসম্পন্ন, সদ্বংশোদ্ভব, পরলোক-ভীরু, উদ্যোগী, স্থিরমতি, অনুদ্বেগকর ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবেন। উক্তরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের অভাবে শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষত্রিয় বা শাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্যকে নিযুক্ত করিবেন; শূদ্রকে কদাচ নহে। কাত্যায়নের মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না; তাহা পাইলে, তাহাতেও এই ভাবই স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতাম। সুতরাং এ কথা কখনও বলা যায় না যে, শূদ্র রাজসভাতে বসিতে পাইত না বা লেখাপড়া করিত না। পারিত না কেবল বিচার করিতে, নতুবা উচ্চপদ মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত শূদ্র করিতে পাইত। প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর সূতজাতি সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্র-মন্ত্রিত্ব এবং সূত বলিয়া পরিচিত কর্ণের কুরু-রাজসভায় প্রভাব কাহারও অজ্ঞাত নহে। পুরাণে শূদ্র মন্ত্রীরও উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ—

"ব্যবহারবিদঃ প্রাজ্ঞা বৃত্ত-শীল গুণান্বিতাঃ।
রিপৌ মিত্রে সমা যে চ ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
নিরালস্যা জিতক্রোধ-কাম-লোভাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
রাজ্ঞা নিযোজিতব্যাস্তে সভ্যাঃ সর্ব্বাসু জাতিষু।"

শুক্রনীতি ৪ অঃ। ৫ম প্রঃ ১৬।১৭।

অর্থাৎ রাজা সকল জাতিকেই সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন, পরন্তু ব্যবহারবেত্তা, সচ্চরিত্র, সুশীল, গুণবান, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, নিরালস্য, কাম-ক্রোধ-লোভ-শূন্য, প্রিয়ংবদ এবং সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকেই সভ্য-নিয়োগ করিবেন।

সুতরাং শূদ্র যে রাজসভায় লেখকাদি-কার্য্য করিতে পারে না, ইহা ঠিক নহে। লেখক কোন্ জাতি হইবে, সে কথা কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নাই। সভ্যের কথা লইয়া বরং তর্ক-বিতর্ক চলিতে পারে।

(২) রাজসাক্ষী যে শূদ্র হইবে না, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। বরং সাক্ষীর মধ্যে শূদ্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

"গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রযোনয়ঃ।
অর্থ্যুক্তাঃ সাক্ষ্যমর্হন্তি ন যে-কেচিদনাপদি।"

মনু ৮ম অঃ। ৬২ শ্লোক।

গৃহস্থ, পুত্রবান্, তদ্দেশজাত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, অর্থীর নির্দ্দেশক্রমে সাক্ষী হইবে; ঋণ-গ্রহণাদি ব্যবহারে যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারিবে না। তবে বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য প্রভৃতি আপদে অপরেও সাক্ষী হইতে পারে।

"তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ।
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌত-স্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ২। ৬৮।

এই যাজ্ঞবল্ক্য-বচনেও উৎকৃষ্ট সাক্ষীর বিষয় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও শূদ্র যে সাক্ষী হইবে না, একথা নাই।

বিশ্বকোষ বলিতেছেন,—ইহা রাজসাক্ষীর লক্ষণ। আমরা তাহা বলিতে পারি না। হইলেও ক্ষতি নাই।

(৩) কেশববৈজয়ন্তী-ধৃত ব্যাস-বচনে—"শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নং গণকং" এই কথাটুকু দেখিয়াই কায়স্থকে বেদবিদ্ বলা যায় না। তাহার কারণ, মিতাক্ষরা-মতে গণক এবং লেখক—দুইই কায়স্থ, একথা স্বীকার করিলেও এই 'শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নে'র যে কি অর্থ, তাহা স্পষ্টতঃ অবগত হওয়া যায় না। 'শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্ন' শব্দে বেদ-পাঠীও হইতে পারে, সামান্যতঃ শাস্ত্রাধ্যায়ীও হইতে পারে। সামান্যতঃ শাস্ত্রাধ্যায়ী হইলে ত শূদ্রও পাওয়া যায়। শূদ্র, গুরুর নিকট শব্দাভিধান, কাব্য-নাটক, পুরাণ অধ্যয়ন করিতে পারে। এস্থলে গুরু-মুখ হইতে শ্রবণের নাম অধ্যয়ন। এতদ্ভিন্ন, গণকের আরও লক্ষণ আছে;—

"শব্দাভিধান-তত্ত্বজ্ঞৌ গণনাকুশলৌ শুচী।
নানালিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণক-লেখকৌ॥"
শুক্রনীতি ৪র্থ অঃ। ৪র্থ প্রকরণ ৪৩।

শব্দনাম-তত্ত্বজ্ঞ, গণনা-কুশল, নানা অক্ষরাভিজ্ঞ পবিত্র দুই ব্যক্তিকে রাজা,—গণক এবং লেখক করিবেন।

"গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায়্যঞ্চ লেখকঃ।"
শুক্র ৪র্থ অঃ। ৪র্থ প্রঃ। ৪২।

গণকের কার্য্য—অর্থ-গণনা; লেখকের কার্য্য—ন্যায্য-লেখন।

এই স্থলে 'শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্ন' এই বিশেষণটী নাই; "শব্দাভিধান-তত্ত্বজ্ঞ' এই কথাটী আছে। শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নেরও এই অর্থও হইতে পারে। হউক আর নাই হউক, মিতাক্ষরাকার যে কোন মতের গণক লিখিয়াছেন, তাহা জানা যাইবে কিরূপে? হইতে পারে, বেদবিদ্ গণক—উত্তম গণক; কিন্তু বেদজ্ঞ না হইলেও ত গণক হয়, এরূপ ভাবের কথা যখন শাস্ত্র হইতেই পাওয়া যাইতেছে; তখন মিতাক্ষরায় কায়স্থ-গণককে যে বেদবিদ্ না হইলে চলিবে না—ইহা স্বীকার করি কিরূপে? শূদ্র যে 'রাজার অঙ্গ' হইবে না এবিষয়েও কোন প্রমাণ নাই।

(৪) লেখক এবং সান্ধিবিগ্রহিক,—দুইটী বিভিন্ন পদ। যেখানেই সান্ধিবিগ্রহিকের নাম আছে সেখানেই দেখিবে,—লেখক—আর একজন। মৎস্য পুরাণ দেখ,—

"ষাড়্গুণ্য-বিধিতত্ত্বজ্ঞো দেশভাষা-বিশারদঃ।
সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যো রাজ্ঞা নয়-বিশারদঃ॥"
মৎস্যপুরাণ, ২১৫ অঃ, ১৬।

সন্ধিবিগ্রহাদি-ষড়্গুণ-বিধি-তত্ত্বাভিজ্ঞ, দেশভাষা-বিশারদ, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে রাজা 'সান্ধিবিগ্রহিক' করিবেন।

এতদ্ভিন্ন, রাজার ধর্ম্মাধিকরণাদিতে লেখক আবশ্যক। যথা,—

"লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ।"
মৎস্য, ২১৫ অঃ, ২৬।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া স্বতন্ত্র নাম নাই। মন্ত্রীই সান্ধিবিগ্রহিক। তবে কোন বচনে যে 'সন্ধিবিগ্রহ-কারী লেখক' বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য,—"সন্ধি-বিগ্রহপত্র-লেখক—লেখক।"

মিতাক্ষরায় এ বিষয়ে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে।

"রাজ্ঞা তু স্বয়মুদ্দিষ্টঃ সন্ধি-বিগ্রহকলেখকঃ।
তাম্রপত্রে পটে বাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহারাধ্যায়, বীর মিত্রোদয়-ধৃত ব্যাস-বচন।

স্বয়ং রাজার আদিষ্ট হইয়া সন্ধি-বিগ্রহ-লেখক, তাম্রপত্রে বা বস্ত্রে রাজার সনন্দ লিখিবেন।

ইত্যাদি অনেক বচন, পূর্ব্বোক্ত "সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্যস্তস্য লেখকঃ" ইত্যাদি বচনের সমানার্থক। বলা বাহুল্য,—'সান্ধিবিগ্রহিক' আর 'সন্ধিবিগ্রহ-পত্র-লেখক'—এক নহে; মন্ত্রী আর কেরাণী কি এক হইতে পারে? যে ব্যক্তি সন্ধিবিগ্রহ-পত্র লিখিয়া থাকে, সে উত্তম লেখক; রাজার তাম্র-শাসন তাহার লিখিত হইলে উত্তম এবং নির্দ্দোষ হয়, এইজন্যই উপরি-উক্ত ব্যবস্থা। নতুবা সান্ধিবিগ্রহিক বা মন্ত্রী, রাজার তাম্রশাসন লিখিবেন—এ বিধিটী কেমন অসঙ্গত বোধ হয়। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি,—লেখক এবং সান্ধিবিগ্রহিক, এক নহে। তবে সান্ধিবিগ্রহিক-পদ উপযুক্ত শূদ্রও পাইতে পারে। তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত মেধাতিথি প্রভৃতির উক্তি দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে। এইজন্য কোন স্থানে কায়স্থকে সান্ধিবিগ্রহিক দেখিলেই যে "কায়স্থ—ক্ষত্রিয়" এইরূপ স্থির করিতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। হারীত-বচনে "ক্ষত্রিয়, প্রজাপালন করিবেন, সন্ধি-বিগ্রহ-তত্ত্বজ্ঞ হইবেন," এই ভাবের কথা থাকিলেই যে 'সান্ধিবিগ্রহিক ক্ষত্রিয়ই হইবেন'—এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

নব্য স্মৃতি-সংগ্রহকারগণ কেহ এ-দিক্, কেহ ও-দিক্ হইয়াছেন। সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কায়স্থ,—দ্বিজাতি কি শূদ্র, কায়স্থ,—বর্ণসঙ্কর কি না"—এসব কথা স্মৃতিতে কিছুই মিলিল না। আছে কেবল কায়স্থের কার্য্য। কার্য্য দেখিয়া ও বচনাদির ভাবে এইমাত্র অনুমান হয়,—কায়স্থ, নীচজাতি নহে। ক্ষত্রিয়-রাজার বাড়ী চাকরি—কেরাণীগিরি, প্রভৃতি দ্বিজ-শুশ্রূষাও বলা যায়; আবার সম্মানের পদও বলা যায়;—এখন কি করিয়া স্মৃতির সাহায্যে কায়স্থের জাতি নির্ণয় করা যাইবে?

তবে স্মৃতির মধ্যে ব্যাস-সংহিতায় কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহা এই স্থানে প্রকটিত করিলাম,—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাত-কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ-চাণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥"
ব্যাসসং, ১ অঃ, ১০—১২।

ইহাতে কায়স্থ-জাতিকে অন্ত্যজ বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্যে আপাততঃ কায়স্থ-জাতিকে অন্ত্যজ বলিতে হয়। নগেন্দ্র বাবু এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"১৬৫৭ সংবতে লিখিত এবং ১৪০৯ শকে লিখিত দুইখানি ব্যাসংহিতায় প্রাচীন হস্তলিপিতে,—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাত-কায়স্থ মালাকার-কুটুম্বিনঃ॥"

এই শ্লোকটী এককালে নাই। ইহাতে অনুমিত হয়,—ঐ শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক সময়ে লিখিত।"

আমরাও বলি কায়স্থ, মালাকার, নাপিত, কুম্ভকার—এতগুলি প্রচলিত উচ্চজাতি যে শাস্ত্রমতে অন্ত্যজ, তাহা কখনই নহে। শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভব। না হয় অর্থান্তর আছে। এক আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে, শ্লোকের শেষাংশে যখন "যে চান্যে চ গবাশনাঃ" বলা হইয়াছে, তখন এ সব জাতিকেও 'গবাশন' বলা হইয়াছে; নতুবা 'অন্যে চ' অংশটী ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ সব জাতি কখনই গবাশন নহে। কায়স্থ, গোমাংসভোজী অন্ত্যজ জাতি হইলে, 'গণনা-কুশলো শুচী' ইত্যাদি নিয়মানুসারে পবিত্র লেখকপদে অধিষ্ঠিত হইতেন না। অনেক দেশে 'কায়স্থ' নামে পরিচিত অন্ত্যজ জাতি আছে, তাহার সহিত উত্তম কায়স্থের কোন প্রকার সংশ্রব নাই। ব্যাস-সংহিতোক্ত কায়স্থ, সেই জাতি হইতে পারে। নাপিত-কুম্ভকারাদি-নামকও এক একটা নিতান্ত অপকৃষ্ট জাতি থাকিবে। নচেৎ সঙ্গত হয় না। ফল;—যতই দেখা যায়, শ্লোকটীকে ততই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। এই অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় এবং কমলাকরভট্টের উল্লিখিত নিম্ন-লিখিত বচনটী যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে একরূপ মীমাংসা হয়,—কায়স্থ দ্বিবিধ; উত্তম পবিত্র রাজসভার লেখক এবং অন্ত্যজ। প্রথমোক্তের উৎপত্তি-কথা পরে বলা যাইবে। শেষোক্ত কায়স্থের উৎপত্তি-তত্ত্ব এই,—

"মাহিষ্য-বনিতাসূনুর্বৈদেহাদ্বঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তঃ॥"
কমলাকরভট্ট-কৃত শূদ্র-ধর্ম্মতত্ত্ব।

বৈদেহের ঔরসে, মাহিষ্য-পত্নীর গর্ভে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা-গর্ভে মাহিষ্য এবং বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর বৈদেহের জন্ম।

উত্তম কায়স্থের উৎপত্তির কথাও কমলাকরভট্ট লিখিয়াছেন, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃ প্রজায়তে।
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত নাপিতা বা ভবন্ত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে চৈব দীক্ষাকালেঽথ বাপনম্।
নাভেরূর্দ্ধ্বঞ্চ বপনং তস্মান্নাপিত উচ্যতে॥
কায়স্থ ইতি জীবেত্ত বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ॥"ইত্যাদি

বিশ্বকোষে শেষের অর্দ্ধশ্লোক এবং পরবর্ত্তী আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বের এই সার্দ্ধশ্লোক পড়িলে এইরূপ কতকটা বুঝাইতেও পারে যে, ব্রাহ্মণ গোপনে বৈশ্য-কন্যায় যে সব সন্তান উৎপাদন করেন, বৃত্তিভেদে, তাহারা তিন জাতি;—কুম্ভকার, নাপিত এবং কায়স্থ। তবে এই অর্থ যে নিশ্চিতই বুঝাইবে, এমন কিছু বলা যায় না, এইজন্যই "উক্ত শ্লোক দ্বারাও কায়স্থ জাতির বর্ণ-সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারা যায় না" এই বিশ্বকোষ-বাক্যের উপর আমরা ততটা দোষারোপ করি না। যদি উক্তরূপেও কায়স্থের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কায়স্থ ত্রিবিধ বলিতে হয়;—পূর্ব্বে একরূপ অন্ত্যজের পরিচয় দিয়াছি, আর এই এক প্রকার অনুলোম বর্ণসঙ্কর—মধ্যম প্রকারের কায়স্থ এবং অপর উত্তম কায়স্থ।

সম্ভবতঃ বোম্বাই প্রদেশের উপকায়স্থ বা প্রভাজাতি,—নামে 'কায়স্থ' হইলেও অন্ত্যজ লিম্নাব পরিগণিত। তাহারাই ব্যাস-সংহিতার বা কমলাকর ভট্টের উল্লিখিত নিকৃষ্ট কায়স্থ।

আর পশ্চিমের 'উনাই' নামক অর্দ্ধকায়স্থ,

এই ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের নাপিত-কুম্ভকার-সোদর কায়স্থ। নাপিতের নাম পশ্চিম-দেশে 'নাও'; আর ইহাদিগের 'উনাই' এই নাম-সাজাত্য দ্বারাও কতকটা আমাদের অনুমান সার্থক বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন ঐ-সকল প্রদেশে উৎকৃষ্ট কায়স্থ অনেক আছে। এইরূপে যখন ত্রিবিধ কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তখন এরূপ কল্পনা করিলে বিশেষ দোষ হইতেছে না। যাহা হউক, অনুলোম বর্ণসঙ্কর ' কায়স্থও কায়স্থ-সমাজে বর্ত্তমান; ইহাও পরে বলা যাইবে। ফলতঃ স্মৃতি হইতে কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে কোন কথার নির্ণয় হইতেছে না।

(২য়) পুরাণের মত।

"এক্ষণে দেখা যাউক, পুরাণে কায়স্থ-জাতি কিরূপ ভাবে অভিহিত হইয়াছে।

"পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখা যায়,—

"ততোহভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীর-সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥"
সৃষ্টিখণ্ড, ৩। ১৪৯ শ্লোঃ।

"অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যান আরম্ভ করিলে মানস প্রজাগণ উৎপন্ন হইল; পরে তাঁহার গাত্র হইতে শরীরোৎপন্ন কায়স্থ ও করণ-জাতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ উৎপন্ন হইলেন।

"অনেকের বিশ্বাস কায়স্থ ও করণ একজাতি। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহে কায়স্থ ও করণ এই উভয়জাতির উল্লেখ থাকিলেও কোন সংহিতায় কায়স্থ ও করণ এক জাতি বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। কায়স্থ ও করণ দুইটী স্বতন্ত্র জাতি।

* * * *

"কমলাকরভট্ট, শূদ্রধর্ম্ম-তত্ত্বে পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ড হইতে এই কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপং পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজ-সমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ-কর্ম্ম-লেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাহতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥"

"ক্ষণকাল ধ্যান-নিমগ্ন হইলে ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে এক সুন্দর পুরুষ বাহির হইলেন, তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত, প্রাণিগণের সদসংকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মরাজের নিকট নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা, দেবাগ্নি মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানী পুরুষকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা ভোজন-কালে ঐ পুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-কায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ জাতি নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার বংশ-সম্ভূত কায়স্থগণ নানাগোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন। *

"স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে † কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে,—

"এবং হত্বাহর্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান শরান্।
এক এব যযৌ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান নৃপান্॥
কেচিদ্গহনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশন্।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্ভ্যাশ্রমং যযৌ॥
ততো রামঃ সমায়াতো দাল্ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ॥
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ।
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বং মনোরথম্।
যাচয়ামাস রামাচ্চ কামং দাল্ভ্যো মহামুনিঃ।
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা॥
ভোজনানন্তরং দাল্ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি।
যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তৎ ত্বং শংসিতুমর্হসি॥
রাম উবাচ।
তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥
দাল্ভ্য উবাচ।
স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামোহব্রবীদ্দাল্ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥

* "নানাদেশীয় কোন প্রাচীন পদ্ম-পুরাণ পুস্তকেই এ অংশ নাই।" বিশ্বকোষ।

† "কমলাকর ভট্টও তাঁহার শূদ্রধর্ম্ম-তত্ত্বে এই উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন।" বিশ্বকোষ।

ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তং ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা।
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমম্ ॥
নির্জ্জগামাশ্রমাৎ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোহস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোহভবন্।
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরি-হরার্চ্চনে।
দেব-বিপ্র-পিতৃণাঞ্চ অথিতীনাঞ্চ পূজকাঃ॥"

"ভৃগুপুত্র এইরূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণকে নিধন করিতে নিশিত-শর-হস্তে একাকী গমন করিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ ভয়ে কেহ নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করিলেন। কেহ বা পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গর্ভবতী চন্দ্রসেনের ভার্য্যা, দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইলেন। অনন্তর পরশুরাম দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে গমন করিলে, মহর্ষি দাল্‌ভ্য পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং মধ্যাহ্নে সমাদরপূর্ব্বক ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিলেন। রাম ও দাল্‌ভ্য ঋষি পরস্পর পরস্পরের নিকটে যাচ্ঞা করিয়া উভয়ে ভোজন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি দাল্‌ভ্য ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে দেব! আপনার যাহা অভীপ্সিত তাহা নিবেদন করুন।' রাম কহিলেন, 'হে মহাভাগ! ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনের গর্ভবতী ভার্য্যা আপনার আশ্রমে আসিয়াছে, আপনি তাহাকে দান করুন আমি বিনাশ করিব; এই আমার অভিলাষ।' দাল্‌ভ্য কহিলেন, 'হে রাম! আপনার অভীষ্ট দান করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন; আমি সেই গর্ভস্থিত বালককে যাচ্ঞা করিতেছি।' রাম কহিলেন, 'হে মহর্ষে! আমি যাহার জন্য আপনার আশ্রমে আসিয়াছি, আপনি তাহাই প্রার্থনা করিলেন, আমি ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী। যাহা হউক, যেহেতু আপনি কায়-স্থিত গর্ভের প্রার্থনা করিয়াছেন, সেজন্য এই গর্ভস্থিত শিশু কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।' অনন্তর ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহাবাহু ভার্গব, গর্ভিণী চিত্রসেনের ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া দাল্‌ভ্যের আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই কায়স্থ, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে, রামের আজ্ঞায় সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত হইয়া চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। তদ্গোত্রজাত কায়স্থগণ দাল্‌ভ্যগোত্র নামে পরিচিত হইয়া দাল্‌ভ্যের উপদেশানুসারে ধর্ম্মিষ্ঠ; সত্যবাদী, সদাচারপর, হরি-হর অর্চ্চনায় রত, দেব, দ্বিজ, পিতৃ ও অতিথিদিগের পূজক হইল।*

"চিত্রগুপ্তের বৃত্তি কি? 'মানবের পাপপুণ্য-লেখনই তাঁহার বৃত্তি। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শিব-রাঘব সংবাদে ১০২ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

রাম উবাচ।

"চিত্রগুপ্তেন লিখিতা ললাটে যা লিপির্দৃঢ়া।
তয়া লিপ্যা তু নিয়তং নরকং কথমন্যথা॥"

"উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, চিত্রগুপ্তই মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফল লিখিয়া রাখেন।

"যাহা হউক, চিত্রগুপ্তের বৃত্তি বলিতে গেলে লেখক-বৃত্তি বুঝিতে হইবে। যদি উক্ত উপাখ্যান প্রকৃত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়-সন্তান যে কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়া লেখক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা বিশ্বাস করিতে হয়।

* * * *

"বিপ্রৈকলিপিকর্ত্তা চ ভক্ষ্যদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্‌ভবেৎ॥"
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৮৫। ১২৯।

"যে ব্রাহ্মণ লিপিবৃত্তি অবলম্বন করে এবং যে অন্নদাতার ধন হরণ করে, তাহাকে একশত-বর্ষ অন্ধকার-নরককুণ্ডে বাস করিযা স্বর্ণবণিক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, পৌরাণিক-সময়ে ব্রাহ্মণদিগের লেখক-বৃত্তি নিষেধ ছিল।

"মৎস্যপুরাণে লেখকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ।
শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণিগতান্ সমান্।
আন্তরান্ বৈ লিখেদ্‌যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ॥

* এ অনুবাদ সর্ব্বাংশে উত্তম নহে।

উপায়-বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম॥"
মাৎস্যে ১১৫। ২৫—২৮।

"সকল দেশের বর্ণমালায় অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, লেখকই রাজার ধর্ম্মাধিকরণের উপযুক্ত। যিনি সমান মাত্রায়, সমান ছত্রে, গোটা গোটা লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ-লেখক। হে নৃপোত্তম! যিনি উপায়-বাক্যকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যিনি অল্পকথায় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহাকেই লেখক বলা যায়।

"গরুড়পুরাণের মতে—
"মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥"
গারুড়ে ১১২। ৭।

"মেধাবী, বাক্যকুশল, বিদ্বান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশাস্ত্র যাঁহার দেখা আছে, সেই সাধুই লেখক।

"রেণুকামাহাত্ম্যে 'ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত' এইরূপ থাকায় কেহ কেহ কায়স্থকে ক্ষত্রধর্ম্মভ্রষ্ট, সুতরাং পতিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পতিতের সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মাধিকরণে অধিকার আছে, এরূপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব যদি রেণুকা-মাহাত্ম্যকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'ক্ষত্রধর্ম্মবহিষ্কৃত' অর্থাৎ 'যুদ্ধকার্য্যে বিরত' এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কারণ, স্বধর্ম্মত্যাগীর সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নাই, কিন্তু রাজসভাস্থ লেখক বা কায়স্থের সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে।

"গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—

"চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥"
উত্তরখণ্ড ১৯। ২।

"তথায় বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্ত-পুর; সেখানে কায়স্থগণ সকলের পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন।

"উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, কায়স্থগণ কেবল যে লেখক, তাহা নহে; ধর্ম্মাধিকরণে তাহাদের ভালমন্দ বিচার করিবারও ক্ষমতা ছিল। স্মৃতি ও পুরাণের সময় শূদ্রের লেখকবৃত্তি অথবা ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং পুরাণমতে কায়স্থেরা শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

"পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে এই বিবরণ পাওয়া যায়,—

"বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোঽপি বৈচিত্র্যং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতি-বিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়্বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ
তত্রস্থকায়বিজ্ঞানাং কায়স্থস্মিতিহেতয়োঃ॥
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্ তয়োশ্চিত্র-বিচত্রয়োঃ॥
একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্টঃ স্বাত্মবিচেষ্টিতম্॥
অস্মাকং কে চ সংস্কারাঃ কিংবর্ণজা বয়ং প্রভো।
তৎ সর্ব্বং কথয়স্বাবাং ভবৎ-সেবাপরায়ণৌ॥
ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যমনুমোদ্য পিতামহঃ।
উক্তঃ সোত্তরমুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্নিব॥
ব্রহ্মোবাচ।
অত্র বর্ণাগ্রে উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্যাবরজতাং যায়াৎ ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ॥
বিজ্ঞানজীবিতোপায়ী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণদ্বিতয়-সেবকঃ॥
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাদ্বর্ণত্রিতয়সেবকঃ।
অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সান্তু তত্র বৈ॥
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ॥
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্যবলোৎকর্ষাৎ সাধ্য-সাধনভাবিনৌ॥
এবমাখ্যায় ভগবান্ সর্ব্বামরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দ্দধে তয়োরন্তঃস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ॥
সূত উবাচ।
একবিংশতিসংখ্যাকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথগ্গতাঃ।
আদাবেব হি তদ্ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়ঃ॥
এতাবৎসু চ তাবৎসু কথ্যতে চ মহাধিপ।
মিথো ন ভক্তিসম্বন্ধসিদ্ধয়ে তু কলৌ যুগে।
ইমে স্বীয়া ইতি জ্ঞানমন্যথা নহি সিধ্যতি।
অতঃ পৃথক্‌কৃতয়া বর্গাঃ কৃতা একৈকবিংশতিঃ॥

সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতো কৃত্য গুণ-জাতিবিচক্ষণঃ।
প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থান-নামবান্॥
চিত্রদেবস্য সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত।
স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া॥
সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নং তস্য প্রবর্ত্ততে।
দেহে যস্মাৎ ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ উদারধীঃ॥
অহো তেজস্বিনং বেত্তি নাশ্রয়াৎ সঙ্কটস্থিনম্।
কুলেষ্টদৈবতং যেষাং শ্রীমানাদিত্য এবচ॥
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ভবৎসন্ততিসাত্ত্বিকঃ।
কুলেষ্টদৈবতাত্মানং ত্বামহং পরিপূজয়ে॥
এবং স্তুতিমতেরাসীৎ তস্য বিশ্বস্বরোদয়ঃ।
বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ॥
বরং বরয় ভদ্র ত্বং মত্তঃ সন্তোষবারিধেঃ।
কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্ব্বন্নিত্যাহ গগনস্থিতঃ॥
বিধেহি তারকমাং ত্বমেবৈকং সকলার্থদম্।
ত্বন্নাম বসতিস্থানং দেহি মে বিশ্বলোচন॥
এবমাভাষিত. সূর্য্যো বরমেব হি দিৎসতে।
এবমস্ত্বিতি সুব্যক্তং বভাষে ভগবানিদম্॥
সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃস্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাম্॥
সূর্য্যধ্বজাদ্ দ্বিজন্মানো দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্॥
আশ্রমং প্রথমং তে চ অনতিক্রম্য বৈদিকম্।
যুক্তিমাসাদ্য বিধিনা গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্।
তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া।
বানপ্রস্থা ভবেয়ুশ্চ ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ॥
চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু শাম্যমাদধুরুত্তমাঃ।
সর্ব্বত্র বিষয়াসক্তি-রহিতাঃ শিবহেতবে॥
সদা সদাচারপরাঃ পরপ্রাণিহিতেরতাঃ।
যজ্ঞীয়াং বৃত্তিমাসাদ্য গার্হপত্যাদিসেবকাঃ॥
দ্বিতীয়স্তু স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকো জ্ঞাতির্যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ॥
স একদা মুখ্যপুমান্ সধীনাং স্থিতিহেতবে।
সন্তুতৌ চ বিশুদ্ধায়ৈ বিত্তয়ে সমচিন্তয়ৎ॥
কুলেষ্টদেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধুমভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসিতুম্।
যযৌ সুমেরুশিখরং সুপর্ব্বশ্রেণিশোভিতম্॥
স্তুত্যানয়ৈবং সন্তুষ্টো রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মনাম্।
ওষধীনামধিপতির্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ॥
আবিরাসীৎ সমক্ষোঽসৌ চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ।
কৃপানিধিরুবাচেদং মধুরং পূর্ণবৎসলঃ॥

বরং বরয় ত ক্ষিপ্রং মত্তো মনসি নিশ্চতম্।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্বরম্॥
দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্ব তং।
মদীয়বংশবর্গ্যস্য বাসস্থানমনুত্তমম্॥
উপাসনায় ভো স্বামিন্ মর্ত্তে চ সততং স্থিতাঃ।
তস্মাদ্‌যাচে তু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ॥
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহর্ষ্য পুনরপ্যত।
মনঃসঙ্কল্পিতং সর্ব্বমেতাবৎ তে ভবিষ্যতি॥
ভবদ্ভক্তিবশাজ্জাতো হাসোঽয়ং তদ্ভবানপি।
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব্বকায়স্থমণ্ডলে॥
গণ্ডলেখঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবন্মুখশোভিতঃ।
মাহিষ্মতী-সমীপস্থ-চন্দ্রহাস-গিরীশ্বরঃ॥
অতুলস্থিতিমৎ সাক্ষাৎ পুরং নির্ম্মায় শোভনম্।
চন্দ্রহাসাভিধাং লেভে কায়স্থজাতিলক্ষণম্॥
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্তুষ্টগুণমূর্ত্তয়ঃ।
যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্॥
এষাং লেখনধর্ম্মোঽস্য ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিণাম্।
শ্রীমতাং মুখ্যপুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাম্॥
ভগবদ্-ভক্তিচিত্তানাং সর্ব্বজীবহিতাত্মনাম্।
ভরদ্বাজপ্রসাদেন সদাচার-স্বধর্ম্মিনাম্॥
বেদাভ্যাসনবৃত্তীনাং শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়িনাম্।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্ব্বব্যাপারবর্ত্তিনাম্॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাসস্তদাদেশং চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম্॥
তত্র স্থিতিমতস্তস্য বহুধা বংশতন্তুভিঃ।
পুত্র-পুত্রজ-পুত্রাদি-নপ্তৃ-নপ্তৃজ-নপ্তৃজৈঃ॥
চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ।
সুহৃৎসম্বন্ধিতদ্বর্গবিভবৈর্ব্যাপৃতা মহী॥
তৃতীয়ঃ সূরিচন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ।
পঞ্চমো রবিদাসোঽপি রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ॥
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপূজকঃ।
গম্ভীরো নবসংখ্যাকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ॥
একাদশো ময়াখ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ।
উদারহাসো বিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশসংখ্যকঃ॥
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয়া।
ভট্টঃ সুভট্টঃ সর্ব্বজ্ঞো ধীমান্ পঞ্চদশোঽপরঃ॥
শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো রাজধানা ততঃপরম্।
অষ্টাদশম আনন্দঃ সংভ্রমৈকোনবিংশতিঃ॥
বিশ্বাসঃ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ একবিংশতমঃ সুরঃ।
এতেষামনুগন্তারো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ॥”

এই জগতের আদি-কারণ ভগবান্ বিষ্ণু,—
যাঁহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি

করেন,—তিনি চিত্র ও বিচিত্র নামক দুই জনকে সৃষ্টি করিলেন।* তাঁহারা উভয়ে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী, অসৎদিগের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, শান্তিকর্ম্ম-স্থাপক এবং কায়স্থ নামে পরিচিত। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কায়স্থের আদি-পুরুষ এবং লেখনকার্য্যে নিপুণতা হেতু মুখ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের কায়বর্ত্তী ছয়প্রকার তত্ত্বে বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া তাঁহারা এই সংসারে কায়স্থ নামে পরিচিত এবং ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা একবিংশতি কায়স্থ-জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমরা কোনবর্ণ ও কি প্রকার সংস্কারসম্পন্ন হইব?—অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন; আমরা আপনার সেবক।' ব্রহ্মা কহিলেন,—'ব্রাহ্মণ—সকল বর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞান-বিশিষ্ট কর্ম্মোপজীবী ব্যবহারান্বিত ক্ষত্রিয়—দ্বিতীয়বর্ণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সেবক বৈশ্য—তৃতীয়বর্ণ। শূদ্র—চতুর্থবর্ণ। পৃথিবীতে ব্যবহারোপজীবী অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহাদের অন্তর্গত এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তোমরা ক্ষত্রিয়,—দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত; তোমাদের উপনয়ন হইবে, তোমাদের বেদে অধিকার আছে।' এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। সূত কহিলেন,—কায়স্থ জাতি একবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্ব্বকল্পে তাহাদের যে ধর্ম্ম, তাহাই স্বধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। হে মহাধিপ! কুলগত ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। 'এই আমার ধর্ম্ম' ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে কোন প্রকার সিদ্ধি হয় না। এই একবিংশতি শ্রেণীর ধর্ম্ম পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম সূর্য্যধ্বজ। চিত্রদেবের সঙ্কল্পানুসারে এক পুরুষ উৎপন্ন হন, তাঁহার শরীরে সূর্য্যধ্বজের চিহ্ন থাকায় তিনি সূর্য্যধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে গৃহাশ্রম না করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতেন। সূর্য্য তাঁহার কুলদেবতা। 'আপনার সন্ততি কায়স্থ, কুলদেবতাস্বরূপ আপনাকে পূজা করিতেছে' এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট সূর্য্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন,—'আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভীষ্টবর প্রার্থনা কর।' সূর্য্যধ্বজ কহিলেন,—'হে বিশ্বলোচন! আপনার নামে আমাকে একটী বসতি-স্থান প্রদান করুন।' 'তথাস্তু' বলিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যধ্বজের নিবাস জন্য ভূতলে সূর্য্য নামক একটী পুরী কল্পিত হইল। সূর্য্যধ্বজ হইতে ভারতে দ্বিতীয় দ্বিজ হইল, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা সদাচারসম্পন্ন, সর্ব্ব-প্রাণিহিতকারী এবং যজ্ঞীয়-বৃত্তি-অবলম্বী। দ্বিতীয় চন্দ্রহাস। যেমন সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি, তদ্রূপ চন্দ্রহাসও তাঁহার জ্ঞাতি। তাঁহার কুলদেবতা চন্দ্র। তিনি সুমেরুশিখরে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের স্তব করিলেন। চন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক অভিমত বর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন,—'আমার বংশীয়গণের বাসের জন্য একটী উত্তম স্থান দান করুন।' প্রীত হইয়া চন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তোমার বাক্যে আমি হাসিয়াছি, এজন্য তুমি 'চন্দ্রহাস' নামে কায়স্থমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইলে। মাহিষ্মতীর সমীপস্থ চন্দ্রহাস নামক গিরির অধীশ্বর হইবে। তোমার বংশধরগণ চন্দ্রহাস নামক পুরীতে বাস করিবে; তাহারা ভগবদ্‌ভক্ত, সর্ব্বজীব-হিতকারী, মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রসাদে সদাচার-সম্পন্ন, চিত্রগুপ্তের পুণ্যে শ্রৌত-স্মার্ত্তানুযায়ী সর্ব্বব্যাপারসম্পন্ন হইয়া আদিপুরুষস্বরূপ তোমাকে সম্মান করিবে।' এইরূপ বর দান করিয়া চন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। চন্দ্রহাস তাঁহার আদেশ বিধিপূর্ব্বক পালন করিলেন। ক্রমে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে তাঁহার বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার বংশধরগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তৃতীয় সূরিচন্দ্রার্দ্ধ। চতুর্থ চন্দ্রদেহ। পঞ্চম রবিদাস। ষষ্ঠ রবিরত্ন। সপ্তম রবিধীর। অষ্টম রবিপূজক। নবম গম্ভীর। দশম প্রভু। একাদশ বল্লভ। দ্বাদশ উদারহাস রবি। ত্রয়োদশ মধুমান। চতুর্দ্দশ ভট্ট। ষোড়শ শ্রীগৌর। সপ্তদশ রাজধানা। অষ্টাদশ আনন্দ। উনবিংশ সম্ভ্রম। বিংশ বিশ্বাস। একবিংশ

* 'সদাশ্রয়, জগৎকারণ, ভগবান্, স্বয়ং বিচিত্র। তাঁহা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাও জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিলেন। ভগবানের আদেশক্রমে ব্রহ্মা,—চিত্র ও বিচিত্র নামক দুই ব্যক্তির সৃষ্টি করিলেন।' এই প্রকার অনুবাদ এই অংশের হইবে।

পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ। এই একবিংশতি কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশতি বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।" * (বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ ৫৬৯)

মন্তব্য।

পদ্মপুরাণের ৩ স্থান হইতে কায়স্থের কথা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম,—সৃষ্টিখণ্ড হইতে এই বচনটী প্রদত্ত হইয়াছে,—

"ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।"

আমার বিবেচনায় এই কায়স্থ শব্দে মনু-কথিত (১২অঃ ১৩) জীব অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব অথবা প্রাণ; করণশব্দে ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ; ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে জীবাত্মা। এসম্বন্ধে শ্রুতিও আছে,—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।" ইত্যাদি।

নতুবা কায়স্থ-জাতির সহিত জীবাত্মার উৎপত্তি—এ প্রকার উক্তি সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয় না। বর্ণসঙ্কর করণজাতির উৎপত্তি যে ব্রহ্মদেহ হইতে নহে, ইহা ত সর্ব্বশাস্ত্রের অনুমোদিত। এইজন্য এ বচনের অস্মৎকৃত অর্থই গ্রাহ্য। দ্বিতীয়,—কমলাকর-ভট্ট-কৃত শূদ্র ধর্ম্মতত্ত্বে উদ্ধৃত সৃষ্টিখণ্ডীয় বচন মৌলিকত্ব-বিষয়ে সন্দিগ্ধ। তৃতীয় প্রমাণটীই প্রকৃত প্রমাণ বলিয়া গণ্য। কায়স্থ যে উত্তম ক্ষত্রিয় জাতি, তাহা এই তৃতীয় প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে। কমলাকর-ভট্ট-প্রদত্ত দ্বিতীয় প্রমাণটী সমূলক হইলেও বিরোধ নাই। (তৃতীয় প্রমাণের টীকার অনুবাদ দেখ)

তৃতীয় প্রমাণের চিত্রই কমলাকর-ভট্ট-ধৃত বচনের চিত্রগুপ্ত। চিত্র বা চিত্রগুপ্ত হইতে যে কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি তাহা উভয় প্রমাণেরই প্রতিপাদ্য। তবে, শেষ প্রমাণে—এই কায়স্থ কিরূপ জাতি, তাহারই বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

দাল্‌ভ্যগোত্রীয় কায়স্থগণ, ক্ষত্রিয়-সন্তান হইলেও চিরদিনই উপনয়ন-সংস্কার-শূন্য; এজন্য তাঁহারা সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত,—পতিত নহেন।

পুরাণে লেখককে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা লেখকের প্রাশস্ত্যার্থ। কেননা, শব্দাভিধান-তত্ত্বজ্ঞ, গণনাকুশল, বহু-অক্ষরজ্ঞ এবং পবিত্র হইলেই সামান্যতঃ লেখক বা গণক হওয়ার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। সুতরাং দাল্‌ভ্য-গোত্রীয় কায়স্থগণেরও লেখকতা করিবার অধিকার ছিল এবং সেই অধিকার ঋষি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। মূলের 'ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ' ইহার 'যুদ্ধবিরত' এরূপ অর্থ করা অযুক্ত; কেননা, যুদ্ধবিরত হইলেও পরশুরামের পরশুধারার নিকট কোন ক্ষত্রিয়ই অব্যাহতি প্রাপ্ত হন নাই। এখানে চন্দ্রসেন-পুত্রকে যুদ্ধবিরত করিয়াই তিনি তাহার বিনাশ-সঙ্কল্প-ত্যাগ করিলেন—ইহা ভাল সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ যদি কেবল তাঁহারা যুদ্ধবিরত ক্ষত্রিয়ই হইলেন, অথচ ক্ষত্রিয়ের অপরাপর ধর্ম্ম সমুদয় অক্ষুণ্ণ থাকিল; তবে—

"দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ।
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরি-হরার্চ্চনে।
দেব-বিপ্র-পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥"

এ অংশটুকু কেন?

ধর্ম্মিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা, সদাচার, হরি-হর-পূজা, অতিথি-সৎকার এবং দেব-পিতৃ-বিপ্র-পূজাও ত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অন্তর্গত। যুদ্ধ ভিন্ন যদি ক্ষত্রিয়ের সকল ধর্ম্মই কায়স্থের থাকিত, তবে এ গুলির পুনর্ব্বিধান হইত না। আর বিশ্বকোষে রেণুকা-মাহাত্ম্যকে যে অপ্রমাণ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা ভাল নহে। এরূপ করিলে "কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল" করা যায়। ফল,—পূর্ব্বকালে দাল্‌ভ্যগোত্রীয় কায়স্থগণ নিরুপবীত এবং চিত্র-বিচিত্র-সন্তান কায়স্থগণ দ্বিজাতি-ক্ষত্রিয়ান্তর্গত ছিলেন। কিন্তু যৎকালে রাজর্ষি চন্দ্রসেনের বংশধরগণ কায়স্থ হন, তখন বৃষলত্ব-প্রাপ্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়-সন্তানও অনেক ছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। বিশ্বকোষ, রাজা আদিশূরকে কায়স্থ এবং কাম্বোজ বা দরদদেশীয় ক্ষত্রিয়-বংশ-প্রসূত বলিয়াছেন, তাহা হইলে ত আমাদের এ অনুমান বিশেষ সঙ্গত হয়।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র-দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।
মনু, ১০অঃ, ৪৩। ৪৪।

* অনুবাদ স্থূলতঃ।

পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, দরদ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ, উপনয়নাদি দ্বিজোচিত ক্রিয়া-লোপ এবং যাজনাধ্যাপনাদির জন্য ব্রাহ্মণ-সকাশে না যাওয়া বশতঃ ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ-রাজ আদিশূরের পূর্ব্ব-পুরুষগণ, ক্ষত্রিয়-সন্তান হইলেও মনুর পূর্ব্ব হইতে শূদ্রভাবাপন্ন।' সুতরাং চন্দ্রসেন-বংশ দাল্ভ্যগোত্রীয় কায়স্থগণের সময়েও ইহাঁদিগকে এই শূদ্রভাবাপন্ন কায়স্থ অনায়াসে মনে করা যাইতে পারে।

(৩য়) প্রাচীন কাব্য-নাটকাদি।

মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস এবং নৈষধচরিতে কায়স্থের কথা আছে, কায়স্থ,—রাজসভা বা ধর্ম্মাধিকরণের লেখক—এ কথাও আছে। বিশ্ব-কোষে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রয়োজন-বোধে একটু উদ্ধৃত করিলাম,—

"শকটদাস কায়স্থ, রাক্ষসের পার্শ্বে, আসনে বসিয়া বরাবর সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিয়াছেন। রাক্ষস—বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, পুরুষানুক্রমে নন্দবংশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসের কথায় ও শকটদাসের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তৎকালেও কায়স্থেরা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত না। যদি শকটদাস শূদ্র হইত, তাহা হইলে বিশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রাজ্ঞ রাক্ষস কখনই শকটদাসের পার্শ্বে বসিয়া বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন না এবং শকটদাস নীচ-জাতি হইলে, কখনই রাক্ষসের পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রা যাইতে সাহসী হইত না। ইত্যাদি •

"এক্ষণে উপরোক্ত নাটক ও কাব্যাদির প্রমাণ যদি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কায়স্থেরা যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির। রাজ-সংসারে রাজার সহিত বিশেষ সংশ্রব থাকায় এবং রাজার সেক্রেটরী প্রভৃতি উচ্চপদ ভোগ করায়, উক্ত কায়স্থকে কি ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া অনুমিত হয় না ?"

(বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ ৫৮০)

মন্তব্য।

পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শূদ্রও সভা-সদ্, মন্ত্রী এবং কারাধ্যক্ষাদি উচ্চ পদস্থ হইতে পারে। যাহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর একত্র পরামর্শ করা কিছু অসম্ভব নহে। কায়স্থ শকটদাস লেখক থাকিলেও নিজগুণে রাক্ষসের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ও উভয়-পরামর্শী হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার কিছু আশ্চর্য্য নহে। অধিক কি, স্মৃতি-স্থিত বাৎস্যায়ন মুনি-বিশেষ চাণক্যও স্নেহ এবং কার্য্যানুরোধ বশতঃ সর্ব্ব-বাদি-সম্মত শূদ্র চন্দ্রগুপ্তের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব করিয়াছেন। রাজমন্ত্রী ম্লেচ্ছরাজ-মিলিত রাক্ষস, শকটদাসের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া যে শকটদাস শূদ্র হইতে পারে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। সংস্কৃত-বাক্য কথন, মাত্র পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শূদ্র রাজা চন্দ্রগুপ্তও সংস্কৃতে কথা কহিয়াছেন। শকটদাস সংস্কৃতে কথা কহিয়াছে বলিয়াই যে, সে শূদ্রত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে, এরূপ স্থির করা যায় না। আর রাক্ষসের পার্শ্বে নিদ্রা যাওয়া, তাহা প্রগাঢ় বন্ধুত্বেরই পরিচায়ক; নতুবা শকটদাস ক্ষত্রিয় হইলেও, সম্মানিত ব্রাহ্মণ রাক্ষসের পার্শ্বে নিদ্রা যাওয়াকে তাহার পক্ষে দূষণীয়ই বলা যাইত। বন্ধু—শূদ্রই হউক, কায়স্থই হউক, আর ক্ষত্রিয়ই হউক, বন্ধুর নিকট তাহার নিদ্রা দূষণীয় হইতে পারে না। শকটদাস যে নীচ-জাতি নহে, তাহা স্থির; তবে শূদ্রভাবাপন্ন কায়স্থ কি ক্ষত্রিয়-কায়স্থ, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। পুরো-হিত প্রাড়্বিবাক প্রভৃতি কতিপয় পদ ভিন্ন মন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত যখন শূদ্রে করিতে পারে, তখন রাজার বাড়ী বড় পদ দেখিয়া কায়স্থের জাতি স্থির করা যায় না; তবে কায়স্থ যে চিরকাল গুণ-বান্—ইহা স্থির করা যায়।

(৪র্থ) সংস্কৃত ইতিহাস।

প্রামাণিক সংস্কৃত ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী হইতে বিশ্বকোষে কায়স্থের অনেক উচ্চপদের কথা সংগৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রিতুল্য পদ কায়স্থের ছিল—ইহা দেখান হইয়াছে। কাশ্মীরের ষোল জন রাজা কায়স্থ-বংশীয় ছিলেন—ইহাও প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই কায়স্থ-বংশীয় প্রথম রাজার নাম—দুর্লভবর্দ্ধন। দুর্লভবর্দ্ধন, গোনন্দ-বংশীয় শেষ রাজা বালাদিত্যের জামাতা। বালাদিত্য কেবল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই দুর্লভবর্দ্ধনের সহিত একমাত্র দুহিতা অনঙ্গলেখার বিবাহ দেন এবং জামাতার নাম রাখেন প্রজ্ঞাদিত্য।

কহ্লণ-রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে,—
"হেতুংসুরূপতামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অথাশ্বঘামকায়স্থং চক্রে দুর্লভবর্দ্ধনম্॥
মাতুঃ কর্কোটনাগেন সুস্নাতায়াঃসমীয়ুষা।
রাজ্যায়ৈব হি সঞ্জাতা রাজ্ঞা নাজ্ঞায়ি তেন সা॥
অভূৎ সর্ব্বস্য চক্ষুষ্যঃ স তু দুর্লভবর্দ্ধনঃ।
প্রজ্ঞয়াদ্যোতমানংতং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম্॥"
৩। ৪৮৮—৪৯০।

(বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে, রাজতরঙ্গিণীর প্রাচীন হস্তলিপিতে 'অথাশ্বঘোষকায়স্থং' এই পাঠ আছে।)

রাজা, অশ্বঘাম-বংশীয় কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকে কেবল পরম রূপবান্ বলিয়া জামাতা করিলেন। রাজ্ঞী চতুর্থদিবসে সুস্নাতা হইলে কর্কোট-নাগ তাঁহার সহিত সঙ্গত হন, তাহাতেই সেই রাজ-কন্যার জন্ম হয়। রাজকন্যার জন্ম—রাজাভোগের জন্য; সেই অদৃষ্ট বশতই রাজা, রাজ্ঞীর এ বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। (জানিলে, রাজকন্যা ও রাজ্ঞী—উভয়েই নিহতা বা নির্ব্বাসিতা হই-তেন।)*। দুর্লভবর্দ্ধন সকলের নয়নানন্দবর্দ্ধন হইলেন; সেই প্রজ্ঞা-দীপ্ত রাজ-জামাতার দ্বিতীয় নাম হইল,—প্রজ্ঞাদিত্য।

এই কায়স্থ-রাজবংশে দুইজন পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, একজনের নাম—ললিতাদিত্য; অন্যের নাম—জয়াদিত্য। কাশিকা-বৃত্তি-প্রণেতা-বামন, দামোদর, ক্ষীর-স্বামী, উভটভট্ট প্রভৃতি, জয়াদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কাশিকা-বৃত্তির অনল্প অংশ ইহারই (জয়াদিত্যের) রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিদ্যোৎ-সাহিত্ব এবং পরাক্রম প্রভৃতি সদ্‌গুণে ইহার তুল্য রাজা কাশ্মীরে বিরল। ইনি গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁরই সাহায্যে শ্বশুর, গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান অধিপতি হন। বিশ্বকোষকার ইহাঁকেই আদিশূর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। শিলালিপি তাম্রশাসনাদি দ্বারাও কায়স্থ-জাতির প্রধান মন্ত্রিপদ, সান্ধি-বিগ্রহিক-পদ ও রাজপদ প্রভৃতির উল্লেখ এবং সম্মানসূচক সম্বোধনের উল্লেখ আছে। এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে এবং সুপদ্ধতি-ক্রমে প্রদর্শনের পর বিশ্বকোষের এক স্থানে কথিত হইতেছে,—

"উপরোক্ত রাজতরঙ্গিণী, শিলালিপি ও তাম্র-শাসন দ্বারা কায়স্থ-জাতিকে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।" ইত্যাদি।

মন্তব্য।

রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণে কায়স্থ-জাতি, ক্ষত্রিয়-জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা হয় না। রাজত্ব বা পদমর্য্যাদা, ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক নহে। অনেক শূদ্র রাজার পরিচয় পুরাণে পাওয়া যায়। উচ্চ-পদের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে এই গোনন্দ-বংশ এবং—দুর্লভবর্দ্ধন, যে কায়স্থ-বংশে জন্মিয়াছিলেন,—তাঁহারা তৎকালেও উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন ছিলেন কিনা বলা যায় না। শূদ্র-ভাবাপন্ন দরদ-দেশীয় ক্ষত্রিয়-সন্তান কায়স্থ-রাজ গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যাকে, দুর্লভবর্দ্ধন-বংশীয় জয়াদিত্য বিবাহ করেন জানিয়া, কাশ্মী-রের কায়স্থ-রাজাদিগকেও উপনয়ন-সংস্কার-শূন্য বলিয়া বোধ হয়। অখিল-ক্ষত্র-সংহারক মহা-পদ্মনন্দ দ্বারাই গোনন্দ-বংশও বোধ করি সংস্কার শূন্য হইয়াছিল। ফলে, স্পষ্ট কিছু বুঝা গেল না,—ইহাঁদিগের উপনয়ন-সংস্কার ছিল কিনা?

(৫ম) বর্ত্তমান কায়স্থ-জাতির অবস্থা

অর্থাৎ কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে ইদানীন্তন দৈশিক ব্যবহার।

প্রায় সকল দেশেই কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রায় সকল দেশেই কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত আছে। সকল দেশেই কায়স্থগণ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, গুজরাট, রাজপুতানা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা—সর্ব্বত্রই কায়স্থ জাতির বাস। বোম্বাই-প্রদেশে উত্তম-কায়স্থ-জাতির মধ্যে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়, প্রভু, পত্তনী-প্রভু ও বাল্মীক কায়স্থ—এই চারি প্রধান শ্রেণী আছে। বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে, "ইহারা

* বিশ্বকোষে টীকাকারে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরে লিখিত আছে, "কলহণ, কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকে কর্কোট-নাগের ঔরস-জাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন" ইত্যাদি। বস্তুগত্যা তাহা নহে। সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধ উপরে দেখুন।

(পুনার কায়স্থেরা) ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যজন, যাজন ও দানে অধিকারী এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদোক্ত হোমাদি-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।" * ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ ৫৮৮ হইতে)।

মন্তব্য।

কায়স্থ-জাতি যে ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত, তাহা অনেক দেশের ব্যবহারাদি দ্বারাও জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু কায়স্থের এই যজ্ঞসূত্র কিরূপ ভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা জানা উচিত। এ দেশে ও অন্য দেশে অনেক উপবীত-ধারী জাতি আছে, যাহাদের যজ্ঞসূত্র কেবল গলসূত্রে পর্য্যবসিত ;—উপনয়ন-সংস্কার নাই, কেবল আবশ্যক হইলে এক দিবসে গলায় পৈতা-সূতা দেওয়া হয়। কায়স্থের পৈতাও এরূপ কি না, তাহা জানা আবশ্যক। নাপিতের গলাতেও পশ্চিমে পৈতা আছে। পৈতা দেখিলেই উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজ মনে করা যায় না। আমার স্মরণ হইতেছে,—কোন কোন প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-রাজবংশেও এখন উপনয়ন-সংস্কার বিলুপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রসঙ্গত উপনয়ন-সংস্কার ব্যতীত গলায় সূতা মাত্র ধারণ করা অপেক্ষা আমাদের দেশীয় কায়স্থদিগের ন্যায় সূত্রহীন হইয়া থাকা ভাল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(৫)

তেজস্বী বিদ্যাসাগর, এক কথায় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল এবং স্কুল-ইনস্পেক্টরের পদ-পরিত্যাগ করিলেন। ৫০০ টাকা বেতনের মোহাবরণ, কার্য্য-বীরের সে অটুট দর্পের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণাঘাতে মুহূর্ত্তে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল।

শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সিবিলিয়ান ইয়ং সাহেবের ব্যবহার, ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে ভাবিয়াই, বিদ্যাসাগর দারুণ মনঃসংক্ষোভে মান্য ছোট লাট বাহাদুর হালিডে সাহেবকে পদ-পরিহারকল্পে পত্র লিখেন। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে তীব্র তেজস্বিতার জ্বলন্ত অগ্ন্যুচ্ছ্বাস। আত্ম-সম্ভ্রম-ত্রুটিতে শক্তিশালী কার্য্য-বীরের হৃদয়, কিরূপ অভিমানের মর্ম্মান্তিক বেদনায় আকুল হইয়া উঠে, সেই পত্রেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

পদ-পরিত্যাগের পত্র পাইয়া, বঙ্গেশ্বর বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যে সহসা ৫০০ টাকা বেতনের পদটা অম্লান-বদনে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, এটা অবশ্য তিনি ভাবেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার নিকট ইয়ং সাহেব সম্বন্ধে অনেকবারই অনুযোগ করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালে বিলাত হইতে প্রেরিত শিক্ষা-সম্বন্ধে "ডেসপ্যাচে"র মর্ম্মার্থ লইয়া যে, ইয়ং সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের কতকটা মনোবাদ চলিতেছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ; তবে সে মনোবাদ পরিণামে যে এত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে ; এবং তাহারই ফলে অবশেষে বিদ্যাসাগর যে পদ পরিত্যাগে সংকল্প করিবেন, তাহা তিনি মনে করেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোট লাটের নিকট অনুযোগ করিতেন ;—"শিক্ষা-সংপ্রসারণ সম্বন্ধে, বিলাত-প্রেরিত 'ডেস প্যাচে'র যে মর্ম্ম, আমি সেই মর্ম্মানুসারেই কার্য্য করি ; কিন্তু ইয়ং সাহেব, তাহার বিপরীত মর্ম্মগ্রহণ করিয়া, পদে পদে আমার কার্য্যের প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকেন ; এরূপ অবস্থায় আমার চাকুরী করা দায়।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুযোগ শুনিয়া, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে ইয়ং সাহেবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবারই পরামর্শ দিতেন ; এবং ইয়ং সাহেবকে এতৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিবেন বলিয়া, আশ্বাস প্রদান করিতেন। বিদ্যাসাগরও ছোট লাট বাহাদুরের আশ্বাস-বাক্যানুসারে মিলিয়া-মিশিয়া সদ্ভাবে সপ্রণয়ে কার্য্য-নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতেন ; কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, ছোট লাট বাহাদুরের নিকট পুনঃপুনঃ অনুযোগেরই প্রয়োজন হয় ;

* অপর স্থানে "তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরোহিত" ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরও যাজন বা পৌরোহিত্য শাস্ত্রবিহিত নহে। আর হোমাদিকর্ম শুধু ব্রাহ্মণ কেন ? সকল দ্বিজই করিতে পারেন।

অথচ অনুযোগ করা বৃথা। ছোট লাট বাহাদুরের আশ্বাসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও ইয়ং সাহেবের মতিগতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা অন্যরূপ হইল না। যে ইয়ং সাহেবকে তিনি হাতে করিয়া, শিক্ষা-বিভাগের সকল কাজ শিখাইয়াছেন, সেই ইয়ং সাহেবই তাঁহার সকল কার্য্যের বিরোধী এবং প্রতিবাদী; অথচ তৎ-প্রতীকারেরও আর পথ নাই; এইরূপ ভাবিয়াই তিনি ছোট লাট বাহাদুরকে পদ-পরিত্যাগের পত্র লিখিয়াছিলেন।

ছোট লাট বাহাদুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন নিশ্চিতই। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন; এবং পত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া লইবার জন্যও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইবেন এবং প্রশংসাপত্র পাইবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বাহাদুরের নিকট এ আশ্বাসও পাইয়াছিলেন।

সে আশ্বাস-বাণীতে কিন্তু বিদ্যাসাগর বিচলিত হইলেন না। তখনও তাঁহার হৃদয় দারুণ মর্ম্ম-বেদনার প্রচণ্ড উগ্রতাপে উচ্ছ্বসিত। তিনি পত্র-প্রত্যাখ্যানে বা পুনঃ পদগ্রহণে কিছুতেই আর সম্মত হইলেন না। তিনি হালিডে সাহেবকে স্পষ্টই বলিলেন,—"সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছি; আর ফিরিবার পথ দেখি না; ক্ষমা করুন, আমি আর চাকুরী করিব না; আমার আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই।" ছোট লাট বাহাদুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ তেজস্বিতা দেখিয়া, বাস্তবিকই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া, অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদ-পরিহার মঞ্জুর করিলেন।*

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়, তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কাওয়েল সাহেবকে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া, বিদায় লয়েন।

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাঁহার মাতা, পিতা, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব সকলেই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার কোন বন্ধু স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর বলিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগর! তুমি ভাল কাজ করিতেছ না। দেখ আজকালিকার বাজারে পাঁচশত টাকা বেতনের পদ দুর্লভ; বিশেষ তোমার মতন একজন বাঙ্গালা পণ্ডিতের পক্ষে। তুমি পদ পরিত্যাগ করিলে বটে; কিন্তু তোমার চলিবে কিসে?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি জানি মানুষের সম্ভ্রমই জগতে দুর্লভ; চলিবার কথা কি বলিতেছ? আমি যখন সংস্কৃতকলেজের সেক্রেটারী পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন আমার কি ছিল? এখন তবুও আমার প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকের কতক আয় আছে।"

সংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ বিদ্যাসাগরের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইল। পরবর্ত্তী জীবন-ঘটনাই তাহার প্রমাণ। পর-পদ-সেবায় মানব-জীবনের আত্মোৎকর্ষসাধন সহজ-সম্ভবপর নহে। রুদ্ধদ্বার পিঞ্জরে আবদ্ধ সুন্দর শুকের যে অবস্থা, পরপদ-সেবী মানুষের অবস্থা তদতিরিক্ত নহে ত? স্বাধীন-প্রাণে স্বাধীনভাবে কার্য্য-প্রসারণে কার্য্যবীরের যে সুবিধা, পরাধীন-প্রাণে তার তিলার্দ্ধও নহে ইহা ত নিশ্চিতই। স্বাধীন-প্রাণ মুক্তপথে মুক্তোচ্ছ্বাসে প্রধাবিত হয়। মানব-জীবনের উৎকর্ষ ও উন্নতি তাহাতেই; তা যিনি যে পথে যাউন না কেন? মানুষ আপন বুদ্ধিবশে, এক পথ দিয়া গিয়া স্বাধীন জীবনপ্রবাহে পার্থিব সুখের চরম সীমায় পৌঁছিতে পারে; আবার অন্য পথে গিয়া অপার্থিব সুখের অন্তিম পর্য্যন্ত পাইতে পারে। সংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করিবার পর হইতে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীন প্রাণে কার্য্য করিবার শত পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সে সকল পথই ঐহিক প্রীতি-প্রতিষ্ঠার সম্যক্ অভিমুখীন। স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় আধুনিক সভ্য জগতে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

* শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অনেকগুলি আহত সিপাহী সংস্কৃত কলেজে আশ্রয় লইয়াছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ডাইরেক্টরের অনুমতি না লইয়াও সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ইয়ং সাহেবের সহিত মনোবাদের ইহাও একটী কারণ।

যাবৎ এ জগৎ, তাবৎই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। সে প্রতিষ্ঠার একে একে পরিচয় লউন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় অনুজ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বপ্রকাশিত বিদ্যাসাগরের জীবন-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন ;—

"যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল পদ পরিত্যাগ করেন, সে সময় কলিকাতা সুপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচারক কলবিন সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উকীল হইবার জন্য পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পরামর্শানুসারে উকীল হওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যার সময়, তাৎকালিক প্রধান উকীল ৺ দ্বারকানাথ মিত্রের কার্য্যাবলী দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতেন। তিনি তথায় গিয়া দেখেন যে, টাকার জন্য হিন্দুস্থানী মোক্তারদের সহিত হুড়াহুড়ি করিতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া ওকালতী-কর্ম্মে, তাঁহার ঘৃণা জন্মে। পরে তিনি কলবিন সাহেবকে গিয়া আপনার অভিমত প্রকাশ করেন। কলবিন সাহেব বলেন, "তোমার মত পণ্ডিত লোককে টাকার জন্য মোক্তারদের সঙ্গে হুড়াহুড়ি করিতে হইবে না। তুমি ওকালতী কর ; তোমার খুব পসার হইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিছুতেই সে কার্য্যে প্রবৃত্তি হইল না।

বিদ্যারত্ন মহাশয় এতৎসম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন, আমরা সারাংশমাত্র প্রকাশ করিলাম। এ ঘটনার সত্যাসত্য তথ্য নির্ণয়ার্থ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম ; কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। যাঁহাদের নিকট সকল তথ্য অবগত হইব বলিয়া ধারণা ছিল, তাঁহারাও এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারেন নাই।

আধুনিক আদালতের অনেক উকীলকেই যে টাকার জন্য এরূপ হুড়াহুড়ি মারা-মারি করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন শান্তিপ্রিয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সেটাকে যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, তাহা বলা বাহুল্য ; সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না ; কিন্তু একটা বড় সন্দেহ, ৺ দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ উকীল কি টাকার জন্য মোক্তারদের সঙ্গে ঐরূপ হুড়াহুড়ি করিতেন; একথাটা বিশ্বাস করিতে যেন সহজে প্রবৃত্তি হয় না।

যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় অসীম-সাহসে সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুস্তকের কতকটা আয় ছিল বটে ; কিন্তু ঋণও অনেক ছিল। দানের ত ত্রুটি হয় নাই। ঋণেও বিদ্যাসাগরের অদ্ভুত তেজস্বিতার পরিচয়।

বিশ্বকোষ অভিধানে লিখিত আছে,—"সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা সময়, তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারি হালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ পরিচয় হয়। তিনি নানা বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া বিদ্যাসাগরকে লইয়া যাইতেন, অনেক সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারই যত্নে বিদ্যাসাগর 'স্কুল-ইনস্পেক্টর' হইয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালাবিভাগের চারিটী জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল। ঐ কুড়িটী বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ভার বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে যাইল। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ইনি স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিতেন। এই সময় ইনি হালিডে সাহেবের উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে প্রায় ৫০।৬০ টী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ কার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর ঐ সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচ পত্রাদির বিল করিয়া পাঠাইলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা দিতে সম্মত হইলেন না। যাঁহার উৎসাহে ঐ সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই হালিডে সাহেব তখন নিরুত্তর রহিলেন। তখন বিদ্যাসাগর নিজ হইতে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া বিদ্যালয়গুলি কিছু দিন চালাইয়াছিলেন।"

বিশ্বকোষ প্রকাশক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বমুখে এই কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, হালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে টাকা আদায় করিবার জন্য নালিষ করিতে বলিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর কি নালিষ করিবার মানুষ!

তিনি ৩৪ সহস্র টাকা ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধ করেন।

এ হেন অবস্থায়ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের দয়া ও দানের বিরাম ছিল না। আয়ে আঘাত পড়িল বলিয়া, দয়া ও দানের ত্রুটি তিলার্দ্ধও হয় নাই। তিনি সংসার-সংগ্রামে কঠোরতার শত পাষাণ-ভার অক্লেশে সহ্য করিতেন; কিন্তু নিরন্ন নিঃস্ব দুঃস্থ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেরই অশ্রুবিন্দু তাঁহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ-তীব্র বিষদিগ্ধ শক্তিশেল সম বিদ্ধ হইত। কাহারও চক্ষে এক বিন্দু বারি পতিত হইতে দেখিলে, শতধারে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইত।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল-পদ পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহীর ৺গঙ্গা লাভ হয়। পিতামহীকে পীড়িতাবস্থায় বীরসিংহ গ্রাম হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। এখানে ভাগীরথী তীরে সালিখা ঘাটে ২০ দিন, মাত্র গঙ্গাজল পান করিয়া তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত লেখক, বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদিগণ অনেকে শত্রুতা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধোপলক্ষে এ প্রদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল, অনেকে মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের পিতামহীর শ্রাদ্ধে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আসিবেন না; তাহা হইলেই পিতৃদেব মনোদুঃখে দেশত্যাগী হইবেন। যাঁহারা এরূপ মনে করিয়াছিল, তাহারা অতি নির্ব্বোধ, কারণ অগ্রজ মহাশয় দেশে অবৈতনিক ইংরেজি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রায় চারি পাঁচ শত বালককে বিনা বেতনে শিক্ষা ও সমস্ত বালককে পুস্তক কাগজ শ্লেট প্রভৃতি প্রদান করিতেন। ইহা ভিন্ন বাটীতে প্রত্যহ ৬০টী বিদেশস্থ সম্ভ্রান্ত ও অধ্যাপকদের বিদ্যার্থী সন্তানগণকে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে অনেক ভিন্ন গ্রামের ছাত্রগণের চাকরি করিয়া দিতেন। দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, ডাক্তার বিনা ভিজিটে গ্রামের ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের ভবনে চিকিৎসা করিতে যাইত, নাইট স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার বাসায় অন্নবস্ত্র পাইয়া মেডিকেল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চিকিৎসক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেকেই অর্থাৎ কি ধনশালী কি মধ্যবিত্ত কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোক বিপদাপন্ন হইয়া আশ্রয় লইলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইত। চাঁদা প্রদান করিয়া বিস্তর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। এবম্বিধ লোকের পিতামহীর শ্রাদ্ধে শত্রুপক্ষ কেমন করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে পারে।" শ্রাদ্ধে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা না হইয়াছিল যে এমন নহে; কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথাগুলি অত্যন্ত সন্দেহোদ্দীপক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কোন সূত্রে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাধ্য নহেন, এমন কোন প্রকৃত ধর্ম্মাচারী শাস্ত্রদর্শী খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন কি না,লোকে ইহাই জানিতে ইচ্ছুক হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয়, তৎপ্রমাণ প্রদানে কৃতকার্য্য হইলে লোকের মনে কোনরূপ সন্দেহ উত্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতামহীর সপিণ্ডকরণ উপলক্ষেও পিতাকে অনেক অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মীয় পরিবারের স্ব-বিশ্বাসানুচিত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোনরূপ ব্যাঘাত করিতেন না; বরং আবশ্যকমত অর্থ-সাহায্য করিতেন। এরূপ কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কেহই জানিতে পারিতেন না; কিন্তু কোনরূপ ব্যাঘাত দেওয়া যে অকর্ত্তব্য, তাহা তিনি অনেক সময়ই বলিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালপদপরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের সাধুপথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সংস্কৃত যন্ত্র ও সংস্কৃত ডিপজিটরী এখন প্রধান ভরসাস্থল। প্রেসে পুস্তক মুদ্রিত এবং ডিপজিটরীতে নিজের ও অপরের পুস্তক বিক্রীত হইত। বলা বাহুল্য, এই প্রেসে ও ডিপজিটরীতে অনেক লোকই প্রতিপালিত হইত; কিন্তু ক্রমে তিনি কোন কোন প্রতিপালিত কর্ম্মচারীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা বিলক্ষণ হইয়াছিল এবং হিসাব-

পত্রেও যথেষ্ট গোলযোগ ঘটিয়াছিল। এই সব দেখিয়া, তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে ডিপজিটরীর কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রাজকৃষ্ণ বাবু তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৮০ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে ছয় মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া, ডিপজিটরীর কার্য্য-তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। এই ছয় মাসের মধ্যে অসীম অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, তিনি ডিপজিটরীর সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তখন হিসাব-পত্রও এরূপ পরিষ্কার হইয়াছিল যে, আবশ্যকমতে সকল সময় আয়-ব্যয়ের অবস্থা জানিতে ক্ষণ-মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা, রাজকৃষ্ণ বাবুর কার্য্য-প্রণালী সন্দর্শনে এতাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে ফোর্টউইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ডিপজিটরীরই কার্য্যে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে সেই পরামর্শ দিলেন। অগত্যা রাজকৃষ্ণ বাবু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করিলেন। এ কার্য্যে তাঁহার বেতন হইল ১৫০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৌভাগ্যে, এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রগাঢ় যত্নে প্রেস ও ডিপজিটরীর কার্য্য সবিশেষ সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া, অনেকটা লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র পরোপকারার্থ তাঁহাকে পরে এ প্রেসও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। সে কথা যথাস্থানে বলিব। রাজকৃষ্ণ বাবু ক্রমাগত তিন বৎসর ডিপজিটরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই যত্নে ও চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত পাঠ্যের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া, ডিপজিটরীর কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বৎসর সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপালপদ পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসর তিনি হুগলী জেলার মধ্যে কতকগুলি গ্রামে নিজ ব্যয়ে ১৫টী বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। অনেক পুনর্ব্বিবাহিত বিধবাদের ভরণ এবং সংরক্ষণ জন্য, তাঁহাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ইহার জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ঋণ করিয়াও তিনি দীন হীন ঋণীর ঋণ পরিশোধ করিতেন। ঋণগ্রস্ত বটেন; কিন্তু দানে যে তিনি মুক্ত-হস্ত। দয়া বা দানে এতাদৃশ অসংযম বিজ্ঞ জনসম্মত নহে; অধিকন্তু সংসারীর সন্ত্রাসকারী। অসংযম কিছুতেই ভাল নহে। বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান যে তাহা বুঝিতেন না, তা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু তাঁহার দান ও দয়া এইরূপই ছিল। হয়ত তিনি কোন নৈসর্গিক শক্তিবলে বুঝিতেন; ঋণ যতই হউক, পরিশোধের পথ আবিষ্কার করিব; অথবা স্বভাব-দাতার পথ ভগবৎকৃপায় আপনি পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে; বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের দান ও দয়ার কথা ভাবিলে কি যেন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার মনে হয়।

কলেজের চাকুরী নাই, আয়েরও নূতন পথ উদ্ভাবিত হয় নাই; অথচ ঋণ অনেক; এমন অবস্থায় বৈঁচিনিবাসী গোকুলচাঁদ এবং গোবিন্দ-চাঁদ বসু নামক দুই ভাই আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন—"নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়* আমাদের বসতবাটী ক্রোক করিতে সংকল্প করিয়াছেন; আপনি রক্ষা করুন।" বিদ্যাসাগর শরণাগতের কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইলেন। তিনি তখনই নীলকমল বাবুকে একসহস্র টাকা দিয়া বসু পরিবারের বাস্তভিটার উদ্ধার করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট শুনিয়াছি, তিনি ডিপজিটরীর কার্য্য পরিত্যাগ করিলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় গোকুলচাঁদ বাবুকে ৫০ টাকা বেতনে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গোকুলচাঁদের মতন কত বিপন্ন ব্যক্তির দায়োদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার; কেন না তিনি ঢক্কা-শব্দে গগন মেদিনী কাঁপাইয়া, দান করিতেন না; অনেক সময়, তিনি অনেককেই এককালীন-দান করিতেন; কিন্তু সে সব প্রায়ই লিপিবদ্ধ করিতেন না। তবে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় বন্ধু এবং ভ্রাতৃবর্গ যে সব দানের কথা জানিতে পারিতেন, তাহা সময়ে সময়ে লোকপরম্পরায় প্রকাশিত হইয়া পড়িত। নির্দ্ধারিত সাময়িক দানের কথা অনেক

* নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুর ভ্রাতা।

লিপবদ্ধ থাকিত, স্থানান্তরে তাহার একটা তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবু নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, আমরা তাহা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে সকল এককালীন দানের কথা, তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ অবগত আছেন, তাহারই দুই একটী মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিয়া যাইব। তাহাতেও বিদ্যাসাগরের দয়া ও দানের পরিচয় কম হইবে না।

যে সময় গোকুলচাঁদের বাস্তুভিটার উদ্ধারসাধন হয়, সেই সময় শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির ৫০০ টাকার দেনার দায়ে বাটী নীলাম হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্যামাচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপস্থিত দায় জানাইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, তাহাকে ৫০০ টাকা দান করেন।

একটা মহত্তর দান ও দয়ার পরিচয় এইখানে দিই। রাজকৃষ্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও, তিনি ইহার মূলতত্ত্ব স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যারত্নলিখিত জীবনচরিতে বিবৃত আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহঘটিত তত্ত্ব এবং বহুবিধ দান বিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেকটা অভিজ্ঞ। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, সে সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয়লিখিত বিবরণ অবিশ্বাসযোগ্য নহে এবং আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে মহত্তর দানের কথা বলিতেছি, তাহাও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং সে দানবিবরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতে হইল ;—

"আমাদের বাটীর সন্নিহিত রাধানগরনিবাসী জমিদার ৺ বৈদ্যনাথ চৌধুরীর পৌত্র বাবু হরিনারায়ণ চৌধুরী এ প্রদেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য জমিদার ছিলেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের নিকট ইনি জমিদারী বন্ধক রাখিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইহাঁর পুত্রও ২৫ পঁচিশ হাজার টাকা লইয়াছিল। এই পঁচাত্তর হাজার টাকার কিস্তিবন্দী করিতে যাইয়া বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী কলিকাতাস্থ রায় মহাশয়ের দপ্তরখানায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। উহাঁর পুত্রদ্বয় রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট কাঁদিয়া পদানত হইলেও উক্ত রায় মহাশয়ের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল না। অনন্তর রাধানগর নিবাসী মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর পুত্রদ্বয় এবং মৃত সদানন্দ ও শিবনারায়ণ চৌধুরীর বিধবা পত্নী, ইহাঁরাও কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের রোদনে অগ্রজ মহাশয়েরও চক্ষে জল আসিল। ইহাঁরা রমাপ্রসাদ বাবুর ভয়ে তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া, খিদিরপুর পদ্মপুকুরের ধর্ম্মদাস কেরাণীর ভবনে গুপ্তভাবে প্রায় চারি মাসকাল অবস্থিতি করেন। অগ্রজ ইহাঁদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। যাঁহার নিকট টাকার স্থির করেন, রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহাদিগকে টাকা দিতে নিবারণ করিয়া দিতেন। তজ্জন্য কলিকাতার মধ্যে কোন মহাজন টাকা ধার দিতে অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের আত্মীয় বাবু কালিদাস ঘোষ মহাশয়ের নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অন্য এক ব্যক্তির নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া টাকা দিলেন ; কিন্তু মহাজন উক্ত রায় মহাশয়, টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কারণ তিনি তাঁহাদের জমিদারী লইবার দৃঢ়-সংকল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং অগ্রজ মহাশয় হুইনহো কোম্পানীর বাটীতে গতিবিধি করিয়া অবিলম্বে টাকা জমা দিয়া, উহাদিগকে রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট ঋণদায় হইতে অব্যাহতি করিয়া দেন। অগ্রজ মহাশয় রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের জমিদারী রক্ষার জন্য ক্রমিক ছয় মাস কাল নানা স্থানে নিজের প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনিও রমাপ্রসাদ বাবুর হস্ত হইতে উহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া দেশস্থ সাধারণের নিকট বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এই জন্য তদবধি বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজের মনান্তর হইয়াছিল"। অতঃপর কয়েক বৎসর চৌধুরী বাবু পরম সুখে কালাতিপাত করেন। দুঃখের বিষয়, এই ভ্রাতৃবিরোধ ও বন্দোবস্ত না হওয়াতে দুই এক মহাজন পরিবর্ত্তের পর ঐ সম্পত্তি ক্রোকে নীলামে বিক্রয় হয়। তন্নিবন্ধন উহাঁদের কষ্ট উপস্থিত হইল। মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর পত্নী ও সদানন্দ চৌধুরীর পত্নীকে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অগ্রজ মহাশয় প্রতি মাসে প্রত্যেককে সমানভাবে ৩০ টাকা মাসহারা প্রেরণ করিতেন। কিছুদিন পরে

মোনপুরের কাশীনাথ ঘোষ ৮০০ শত টাকার জন্য উক্ত চৌধুরীদের নামে অভিযোগ করিয়া নালিস করিলে আমি উক্ত মহাশয়দের অনুরোধে কাশীনাথ ঘোষের সহিত ১৫০ টাকায় রক্ষা করিয়া, দাদার নিকট ঐ টাকা লইয়া উক্ত বিষয় খোলসা করিয়া দিয়াছিলাম।”

এমন দয়া ও দানের কথায়, পুলকবিস্ময়ে কাহার না লোমোদ্গম হয়! কয়জন ঋণগ্রস্ত দাতার এরূপ দানে সাহস হয় বল দেখি? ধন্য বিদ্যাসাগর তোমার দয়া! ধন্য তোমার সাহস!

কলেজের চাকুরীকালে কর্ত্তব্য ভাবিয়া সাধারণ শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগর প্রাণপণ করিতেন, চাকুরি পরিত্যাগ করিয়াও তৎপক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই; বরং সে সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার প্রশস্ততর পথ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণতর উৎসাহ ও উদ্যমে আত্ম-উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার সুবিস্তর সংপ্রসারণে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয়, এটা অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুদৃঢ় ধারণা। সেইজন্য কি পরাধীন অবস্থা, কি স্বাধীন অবস্থা,—সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি ইংরেজি শিক্ষার সংপ্রসারণ সংকল্পে আত্ম-প্রাণ নিয়োজিত করিতেন। ইংরেজী আদর্শে গঠিত চরিত্রবান অনেকেই ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত কৃতকার্য্য কয় জন? চাকুরীকালে তিনি যেমন নানা স্থানে নানা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, চাকুরী যাইবার পরও তাঁহার যত্নে এবং অর্থব্যয়ে নানা স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপন আর্থিক উন্নতি সাধন অপেক্ষা এ কার্য্যকে তিনি জীবনের অধিকতর কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। তারও পরিচয় পদে পদে পাইবেন? চাকুরী পরিত্যাগ করিবার পর প্রথমতঃ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দীগ্রামে একটী ইংরাজী ও সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্দীগ্রাম পাইকপাড়া রাজবংশীয় ৺রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের জন্মস্থান। রাজা বাহাদুরেরাই অবশ্য আপন ব্যয়ে স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানায় স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই সময়েই ৺রাজা প্রতাপনারায়ণের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। সিংহ-রাজপরিবারও এক সময় বিদ্যাসাগরের নিকট যথেষ্ট উপকার ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের স্বভাবসিদ্ধ সরলতার এমনই মোহকরী আকর্ষণী শক্তি যে, একবার তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ-পরিচয় হইত, তিনি তাঁহার হৃদয়ে পাষাণাঙ্কিত হইয়া থাকিতেন।

এই সময়ে, এই কান্দীগ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্ব আশ্রয়দাতা ৺জগদ্দুর্লভ সিংহের কন্যা শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ক্ষেত্রমণি রাজ-পরিবারের ভাগিনেয় বধূ। ভাগিনেয় লালমোহন ঘোষ তাঁহার স্বামী। বিদ্যাসাগর বাটীতে গিয়াছেন শুনিয়া, শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানাকারণে ক্ষেত্রমণির অবস্থা বড়ই হীন হইয়াছিল। বহুদিনের পর সেই দীনহীনা ক্ষেত্রমণিকে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষেত্রমণির প্রার্থনায় মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দেন।

বিদ্যাসাগর গুণী ও গুণগ্রাহী। ইহসংসারে সকল গুণীরই গুণনির্ণয়ে শক্তি থাকে না। সে শক্তি যে অন্তর্ভেদিনী সূক্ষ্ম-দৃষ্টির অন্তর্ভূতা। বিদ্যাসাগরের সে শক্তি অতুলনীয়। চাকুরী কালে তাহার বহু পরিচয় পাইয়াছি। স্বাধীন অবস্থায় তিনি সে শক্তির প্রথম পরিচয় দিয়াছিলেন, ১৮৬১ সালে হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক-নিয়োগ-ব্যাপারে। হিন্দুপেট্রিয়টের স্বত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক সুলেখক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু পর ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫ সহস্র টাকা দিয়া হিন্দুপেট্রিয়টের স্বত্ত্ব ক্রয় করেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ৬ শত টাকা বেতন দিয়া একজন ইংরেজ সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া, হিন্দুপেট্রিয়ট পরিচালিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ অবস্থায় বেশী দিন রাখিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হিন্দুপেট্রিয়টের ভারার্পণ করেন। এই সময় ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়, “বৃটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনে”র কেরাণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণদাস পাল কেবল সম্পাদক নহেন, স্বত্ত্বাধিকারীও হইলেন। ইহার জন্য

তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় নাই। উদীয়মান লেখক কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের এরূপ অসম্ভব বিশ্বাস ও প্রীতি দেখিয়া, সেই সময় অনেকেই চমকিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘদর্শী বিদ্যাসাগরই বুঝিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস একজন শক্তিশালী প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। কৃষ্ণদাসের অশেষ শক্তিসম্পন্নতার অনুভবে যে বিদ্যাসাগর আপনারই সুতীক্ষ্ণ শক্তিসম্পন্নতারই পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরাও তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু পরে তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণদাসের অসীম শক্তিশীলতার সাজ্জাতিক ঘা সহিয়া যে, লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই।

প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করিবার বৎসর দুই পূর্ব্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল পরপোকারার্থ "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া সজল-নয়নে বলিলেন,—"মহাশয়! রক্ষা করুন! সংসার চলে না।"সারদাপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া, বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈব-বিড়ম্বনায় তাঁহার শ্রুতিশক্তি নষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দুঃখে বিগলিত হইয়া, তৎপরিবার প্রতিপালনের সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সারদাপ্রসাদেরই উপকারার্থ "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ করেন।

সারদাপ্রসাদ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে পরে বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে এবং লাইব্রেরিয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বর্দ্ধমানের মহারাজ ৺ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ঠ ভক্তি করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺রামগোপাল ঘোষ ও ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষালের সহিত বর্দ্ধমান দর্শনার্থ গমন করেন। তাঁহারা তিন জনেই এক বাসায় ছিলেন। রাজবাটী হইতে তাঁহাদের জন্য সিদা আসিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজবাটীর সিদায় উদর পূর্ণ করিতে অসম্মত হইয়া, অপর কোন বন্ধুর বাড়ীতে ভোজন ক্রিয়াসম্পন্ন করেন। মহারাজ এ সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহাকে বাড়ীতে আনাইবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম যাইতে সম্মত হন নাই; কিন্তু নানা সাধ্য-সাধনায় আর অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। মহারাজ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিদায় লইবার সময়, মহারাজ তাঁহাকে উপহার স্বরূপ পাঁচ শত টাকা ও একজোড়া শাল দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু ইহা প্রত্যাখ্যান করেন; বলেন যে, "আমি কাহারও দান লই না; কলেজের বেতনেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে; চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ এইরূপ বিদায় পাইলে অনেকটা উপকৃত হইতে পারেন।" রাজা বিস্মিত হইলেন। সেই সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তিনি ভক্তিমান। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখনই বর্দ্ধমান যাইতেন, তখনই মহারাজ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে আদর অভ্যর্থনা করিতেন। এরূপ অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধমাত্রেই যে সারদাপ্রসাদ বর্দ্ধমান রাজবাটীতে কর্ম্ম পাইবেন, তাহার বিচিত্র কি! সারদাপ্রসাদের সংসার-পরিচালন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ংই সোমপ্রকাশে লিখিতেন। ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দুই একটী প্রবন্ধও মধ্যে মধ্যে ইহাতে প্রকাশিত হইত। ক্রমে কিন্তু প্রতি সোমবারে নিয়মিত সোমপ্রকাশ বাহির করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে কিছু ভারস্বরূপ হইয়া পড়িল। সময়াভাব-প্রযুক্ত তিনি ইহাতে আর সম্যক্ মনোযোগী হইতে পারিতেন না। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্টই বলেন,—"একেত আমার সময় নাই; তাহার উপর যথানিয়মে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ বাস্তবিকই চাকুরী অপেক্ষাও কষ্টকর। তখন অগত্যা এক জন সুদক্ষ সম্পাদকের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। তিনি ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই হস্তে সোমপ্রকাশকে সমর্পণ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সোমপ্রকাশের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইলেন। নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার জীবন্ত নিদর্শন নহে কি?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদিত মহাভারতের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। অন্যান্য পুস্তকের মত এ পুস্তক তত লাভজনক হয় নাই।

মহাভারতের অনুবাদাংশ লাভজনক না হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রেল "সীতার বনবাস" প্রকাশ করেন "সীতার বনবাসের" প্রতিপত্তিপরিচয় আর দিতে হইবে না। ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত অবলম্বনে সীতার বনবাস লিখিত। অবশ্য উত্তরচরিতের সর্ব্বাংশেই সীতার বনবাসের সামঞ্জস্য নাই। বিয়োগান্ত নাটক সংস্কৃত অলঙ্কার-বিরুদ্ধ বলিয়া ভবভূতিকে উত্তরচরিতের উপসংহারে "রামসীতা" সম্মিলন সাধন করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, "বিয়োগান্তেই" সীতার বনবাসের উপসংহার করিয়াছেন। ভবভূতিলিখিত ছায়া-সীতার অপূর্ব্ব কল্পনা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসে অনুসৃত হয় নাই। নাই হউক, সীতার বনবাস বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন। ইহার তুলনা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় চারি দিনে "সীতার বনবাস" লিখিয়া সমাপ্ত করেন। দিবাভাগে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, লিখিবার অবসর পাইতেন না; রাত্রি ২॥০ টার সময় হইতে পরদিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত লিখিতেন। একবার লিখিয়া, পুনরালোচনারও তাঁহার সময় ছিল না।

চাকুরীর অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অবসর পাইলেই, বীরসিংহগ্রামে যাইতেন। স্বাধীন অবস্থায় অবশ্য যাইবার সময় ও সুবিধা অনেকটা হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় থাকিলেও, জন্মভূমি বীরসিংহ তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক থাকিত। বীরসিংহগ্রামে যাইলে, পূর্ব্ববৎ তিনি স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থাহীন ও অবস্থাপন্ন সকল অধিবাসীরই তত্ত্ব লইতেন; আবশ্যকমতে অবস্থাভেদে আকাঙ্ক্ষী মাত্রকেই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন; আগন্তুক অভ্যাগত জনকে সাদরসম্ভাষণে আদর অভ্যর্থনা করিতেন; এবং যে যাহাতে সন্তুষ্ট হইত, তিনি তাহাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট রাখিতেন। একবার তিনি বাড়ী যাইলে, পাতুলগ্রামনিবাসী রাঘব রায় নামক একজন ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং প্রণামান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিল,—"কিহে আমাকে চিনিতে পার; তোমায় আমায় এক পাঠশালায় লিখিতাম; গুরু মহাশয়ের হাতথেকে তোমায় কতবার বাঁচাইয়াছি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় পুরাতন সহপাঠী রাঘবকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন;—"তুমি ত রাঘব?" রাঘব একটু বিমর্ষ হইয়া কর্ণে হস্ত প্রদান করিল তখন একজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাণে কাণে বলিয়া দিল;—"উহাকে কৃষ্ণ রায় বলুন; রাঘব আপনাকে বগড়ির বিগ্রহ কৃষ্ণ রায় বলিয়া মনে করে; অনেকটা ছিট আছে; ও ব্রাহ্মণের চালে চলিয়া থাকে। বাগ্দীর অন্ন খায় না; এমন কি ক্ষুধায় মরিয়া যাইলেও বৈষ্ণব-জাতীয় পৈতাধারীদিগেরও অন্ন গ্রহণ করে না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল ব্যাপার বুঝিলেন। তিনি সহাস্য-বদনে আনন্দ গদ্গদ ভরে, রাঘবকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন—"তুমি কৃষ্ণ রায়"। রাঘবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যত দিন বাড়ীতে ছিলেন, ততদিনই রাঘবকে আপনার সম্মুখে সর্ব্বক্ষণই বসাইয়া রাখিতেন এবং তাহার সহিত তাহার তুষ্টিজনক কথাবার্ত্তা কহিতেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহগ্রামে আপন ঘরের "দাওয়ায়" বসিয়াছিলেন, এমন সময় মটুক ঘোষ নামক এক সদ্গোপ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া, উপরে উঠিয়া বসিতে বলিলেন। সে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই তাহাকে সেই 'দাওয়ার' উপর হইতে দুই হাত দিয়া বলপূর্ব্বক তুলিয়া, উপরে লইয়া বসাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাল্যাবস্থার ন্যায় যৌবনেও ভীমপরাক্রম ছিলেন। তিনি বাল্য কালে কপাটী খেলিতে খেলিতে অতি-বলবান যুবককেও ধরিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিতেন। একটা গল্প শুনা যায়, গদাধর পাল নামক এক অতি-অমানুষিক বল-বিক্রমশালী যুবক বীরসিংহ গ্রামে বাস করিত। একবার এই গদাধর গঙ্গাপার হইতে হইতে নৌকামজ্জনে জলমগ্ন হয়। গদাধর তখন দুইজন অপর লোককে বগলে পুরিয়া, সাঁতার দিতে দিতে

নিকটবর্ত্তী একখানি ষ্টীমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। ষ্টীমারের লোকেরা দড়ি ফেলিয়া, অপর দুইজন লোককে একেবারে তুলিয়া লয়; কিন্তু গদাধরকে তুলিতে দারুণ কষ্ট হইয়াছিল। এমন কি প্রথমবার ষ্টীমারের লোকেরা তাহাকে একবার খানিকটা তুলিয়াই ফেলিয়া দিয়াছিল। এ হেন গদাধর কপাটী খেলিতে খেলিতে বিদ্যাসাগরের নিকট জব্দ হইত। সেই বিদ্যাসাগরই যৌবনে পুষ্টদেহ মটুক ঘোষকে শূন্যে তুলিয়া দাওয়ায় বসাইয়াছিলেন। বাল্যের সহৃদয়তা ও বলবত্তা, বিদ্যাসাগরের যৌবনেও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বাল্যযৌবনে দেহ-মনের একাধারে এমন শক্তিসম্পন্নতার পূর্ণ বিকাশ অতি বিরল নহে কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাড়ী যাইতেন, তখনই প্রায় তাঁহার সঙ্গে ৫।৬ শত টাকা থাকিত। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রায় ৪।৫ শত টাকার বস্ত্র লইতেন। টাকা ও বস্ত্র দীনদুঃখাকে বিতরিত হইত। সর্ব্বদাই কলিকাতার বাটীতেও বিবিধপ্রকারের অনেক টাকার কাপড় মজুত থাকিত। তিনি যথাপাত্রে যথাযোগ্য কাপড় বিতরণ করিতেন।

১৮৬২ সালে তিনি একবার বীরসিংহ গ্রামে গিয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনকালে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটী বর্ষীয়সী রমণী ও একটী যুবতী দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন। তিনি অবগত হইলেন, যে বর্ষীয়সী তাঁহার গুরুমহাশয়ের স্ত্রী এবং যুবতী,—কন্যা। গুরুমহাশয়ের বহুবিবাহ। তিনি এক স্ত্রী এবং তদীয় কন্যার ভরণপোষণের ভার লয়েন নাই। তাঁহাদের দুইবেলা অন্ন জুটে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই গুরুমহাশয়কে ডাকাইয়া, স্ত্রী ও কন্যার ভার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। গুরুমহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় সম্মত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্ব্বে গুরুমহাশয়কে বীরসিংহ গ্রামের স্কুলে পণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার জন্য তাঁহাকে মাসে মাসে চারি টাকা দিতে স্বীকার করেন। কেবল স্বীকার নহে, তখনই তিন মাসের অগ্রিম দিলেন এবং তিন মাসের করিয়া, অগ্রিম দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। তাহাদের বস্ত্র সরবরাহের ভারও বিদ্যাসাগর মহাশয় লইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, গুরুমহাশয় স্ত্রী ও কন্যাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কথা শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই; গুরুমহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

এই সময় ছাপাখানা ও ডিপজিটরীতে লাভ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হইলে কি হয়; নানা কারণে ঋণও বাড়িয়াছিল। ঋণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ দয়া ও দান। বিপন্ন ও শরণাগত জন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে বিদ্যাসাগর স্থির থাকিতে পারিতেন না। হস্তে এক কপর্দ্দক নাই; কিন্তু দশ হাজার টাকা দিয়া, একজন বিপন্নকে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থ নাই; কিন্তু বিপন্নের জন্য প্রাণ ব্যাকুল; সে ব্যাকুলতা আমরা হৃদয়হীন কি বুঝিব বল? সে ব্যাকুলতার বেগরোধ বিদ্যাসাগরের অসাধ্য হইত। কাজেই ঋণভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ঋণ করিয়া দুঃখীর দুঃখ-মোচন করা, বিদ্যাসাগরের বাল্যাবস্থা হইতে অভ্যাস। যখন কলেজে পড়িতেন, তখন কাহারও বস্ত্রাভাব বা অন্নাভাবের কথা শুনিলে, তিনি দ্বারবানের নিকট টাকায় চারি পয়সা সুদ দিয়া, ধার লইতেন। চাকুরী করিয়া তিনি সেই ধার শুধিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—দ্বারবানেরা জানিত আমি কপর্দ্দকহীন; তবু যে তারা আমাকে কেন ধার দিত, বলিতে পারি না।"

এ জীবনে বিদ্যাসাগরের প্রায় অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকা ঋণ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে এক কপর্দ্দক ঋণ রাখিয়া যান নাই। বিপদ্‌গ্রস্ত ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তিনি ঋণ করিয়া হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

আমার জীবন-চরিত।

দশম পরিচ্ছেদ।

মরণ নিশ্চয়। প্রাণরক্ষার কোনও উপায় নাই। চারি দিক্ শূন্যাকার। মনে হইতে লাগিল, আমি মহাসাগরের অনন্ত সলিলে পড়িয়া, হাবুডুবু খাইতেছি,—ডুবিতেছি! কূল-

কিনারা নাই, তরী নাই;—নিকটে একগাছি তৃণও নাই যে, তাহা একবার ধরিবার আশা করি। ঘোর নিবিড় জলদজালে যেন বেষ্টিত হইলাম। চক্ষু, অন্ধ হইল। কর্ণ বধির হইল। দেহ শিথিল হইল। প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে কি এইরূপ ঘটনাই ঘটে?

মায়ের মুখ মনে পড়িল। জননীর সেই স্নেহমাখা সকরুণ বদন-মণ্ডল সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। মাকে বলিলাম, "মা! বিদায় দাও, —চলিলাম। বিপাকে বন্দী হইয়া তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অকালে নিহত হইতে চলিল।" এই কথা বলিতে বলিতে, আমি তখন স্পষ্টতই যেন দেখিতে পাইলাম,—মায়ের দুই চক্ষু দিয়া জল ধারা পড়িতেছে। আমি বলিলাম, "মা! দুঃখ করিও না,—তোমার মধ্যম পুত্র কালী-প্রসাদ রহিল, কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল রহিল,—ইহারা বড় হইয়া তোমার সেবা করিবে। আমার এইরূপ মৃত্যুই বিধি-লিপি ছিল,—সুতরাং শোক বৃথা।" মা তখন করুণ আর্ত্ত-নাদে, চোখের জলে সমস্ত অঙ্গ ভাসাইয়া দিলেন। মায়ের কান্না দেখিয়া আমারও নয়ন-দ্বয় হইতে অশ্রু-বিমোচন হইতে লাগিল।

যখন কাঁদিয়া উঠিলাম, তখন আমার জ্ঞান হইল,—মা'ত নিকটে নাই, তবে আমি কাঁদি কেন? প্রকৃতই সে রাত্রে এইরূপ নানারূপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। সে রাত্রি নিদ্রা হয় নাই,—মাঝে মাঝে যে তন্দ্রা হইয়াছিল,—সেই তন্দ্রায় কেবল অলীক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।

আজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে ছিলেন, সকলেই যেন একে একে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। সহধর্ম্মিণীকে যেন বিধবার ন্যায় বিকৃত-বেশা দেখিলাম,—আলু-থালু কেশ,—মলিন বসন পরিধান, রুক্ষ গাত্র, কম্বলাসনে উপবিষ্ট,—আর, নয়ন-জলে ভাসমান হইয়া মুখে কেবল হরি হরি ধ্বনি। আমি কহিলাম, "ক্রন্দন বৃথা। যাহা হইবার তাহাই হইবে,—কেহই আটক করিতে পারিবে না। তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হইয়াও, এই হত-ভাগ্যের হস্তে পড়িয়া, হতভাগিনী হইলে তোমার ভবিষ্যৎ ভরণ-পোষণের জন্য আমি এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। বিদ্রোহিগণ আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। তোমাকে আমার অন্তিমে এই উপদেশ,—তুমি হিন্দুর রমণী, তুমি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিও। আর, তোমার অন্নের চিন্তা কখনই হইবে না—ভাই কালীপ্রসাদ রহিল, সে তোমাকে প্রতিপালন করিবে।"

সহধর্ম্মিণী, ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। আমারও স্বপ্ন ভাঙ্গিল।

এইরূপে ভ্রাতা কালীপ্রসাদ, গোপাল, ঠাকুর দাদা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী; সকলকেই মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে হইল, সেই পান্নার মুখারবিন্দ। সেই পরোপকারিণী, আমার নিমিত্ত সর্ব্বস্বত্যাগিনী,—সেই অত্যন্ত অসময়ে রক্ষাকারিণী পান্নাকে যেন দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, "তুমি আমাকে নয়টী মোহর দিয়াছিলে। কিন্তু এখন আমিই বা কোথা, আর সেই মোহরই বা কোথা! তুমি একদিন আমাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিয়া বখ্‌তখাঁর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু আজ আমাকে মৌলভি ফজলহক্ তোপে উড়াইবার হুকুম দিয়াছে। রক্ষার আর কোনও উপায় নাই। আমি চলিলাম,—অনন্ত ধামে চলিলাম। মনে এক ক্ষোভ রহিল,—তোমার কোন উপ-কার করিয়া যাইতে পারিলাম না।"

কখন দেখিতে লাগিলাম,—এক ভীষণ তোপ আমার সম্মুখে দাগা হইতেছে। অদূরে বহু-সংখ্যক লোক দাঁড়াইয়া আমার এই প্রাণবধ কার্য্য অবলোকনার্থ অনিমিষ-লোচনে চাহিয়া আছে।

এক একবার মনে হইতে লাগিল, আমাকে যে তোপে উড়াইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যখন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরল সীবল্ড সাহেব প্রভৃতিকে গুলি করিয়া হত্যা করিল, এবং পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া লইয়া বেড়াইল,—তখন আমি ত কোন্ ছার? তোপে উড়ান এক প্রকার ভাল;—কেননা, দেহটাকে আর পথে পথে টানিয়া লইয়া বেড়া-ইতে পারিবে না।

সমস্ত রাত্রি এইরূপ আই-ঢাই, ছট্‌-ফট্‌, বিচার-বিতর্ক করিতে করিতে,—অর্দ্ধজাগ্রৎ-অবস্থায় নানারূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ প্রত্যূষ দেখা দিল। পূর্ব্ব দিক্ প্রসন্ন হইল।

আমি মৃত্যুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মৃত্যু নিকট জানিয়া ভগবানকে ডাকিলাম, "হে দীনবন্ধু! হে কৃপাসিন্ধু! হে দয়াময় প্রভু! জানি না, কোন্ পাপে বন্দী হইয়া, আমার মৃত্যু ঘটিতেছে! হে মধুসূদন! আমার রক্ষার কি কোন উপায় নাই?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইল। পক্ষিকুল কলকণ্ঠে গান ধরিল। তখনও আমাকে কেহ কোন কথা বলে না,—উঠিতে, বসিতে, বা বধ্য-ভূমিতে যাইতে কেহ বলে না। বুঝিলাম,—এখনও কাহারও ঘুম ভাঙ্গে নাই,—নবাবী-ধরণ, আমীরী-চাল-চলন, কাজেই বিশেষ বেলা ব্যতীত, নয়ন হইতে নিদ্রা দূর হইবার নহে।

বেলা যখন প্রায় সাড়ে সাতটা, তখন কয়েক জন মুসলমান সর্দ্দার, উত্তম বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থিত কয়েকখানি চৌকির উপর উপবেশন করিয়া, কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। উচ্চহাস্য, কৌতুক, গর্ব্বময় বীরত্ব-ব্যঞ্জক কথা,—এবং গল্প চলিতে লাগিল। সে কথার মর্ম্ম এইরূপ;—"এদেশে ইংরেজরাজ্য একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ ইংরেজ নিহত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি ইংরেজ প্রাণ-ভয়ে পলাইয়া নাইনি-তালে আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র নাইনিতাল আক্রমণ করিয়া এই কয়েক জন ইংরেজকে বধ করিতে পারিলেই আমরা নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারি।" একজন সর্দ্দার উত্তর করিল, "নাইনিতাল আক্রমণের আবশ্যকতা নাই। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, নাইনিতালে রসদ ফুরাইয়াছে। আমরা যদি একমাস কাল চুপ করিয়া এই খানে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে দেখিবে, নাইনিতালস্থ সমস্ত ইংরেজ অনাহারে মরিয়া আছে। আর, যাহাতে এ প্রদেশ হইতে কোনরূপে রসদ নাইনিতালে পৌঁছিতে না পারে, তাহার তদ্বির কর। আজ যেমন সমুদায় রসদ, সমস্ত টাটু ও তাহাদের দলপতি ধৃত হইয়াছে, এইরূপ প্রত্যহ এক একজন দলপতিকে ধরিয়া অনিবার চেষ্টা কর। এই যুক্তিই সার।"

সেই সর্দ্দার আরও কহিল,—"উপস্থিত দলপতিকে তোপে উড়ান উচিত নহে। তোপে উড়ান হইল ত, মানুষ ফুরাইল। ইহাকে জীবিত রাখিতে হইবে। ইহার নাক্ কাণ কাটিয়া, এবং ইহার ডান হস্ত ও ডান পা ভাঙ্গিয়া,—ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। যে প্রদেশ হইতে নাইনিতালে রসদ যায়, ইহাকে সেই প্রদেশে লইয়া যাওয়া হউক।" অন্য একজন সর্দ্দার উত্তর করিল,—"তাহা কখন হইতে পারে না। এ লোকটাকে কখন জীবিত রাখা উচিত নহে। বরং ইহার মৃত্যুর পর, ইহার মৃত্যু-বিকৃত মূর্ত্তি পটে চিত্রিত করিয়া, গাছে বা প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখা হউক;—এবং সেই পটের নিম্নে এই কথা লেখা হইবে যে, 'এই ব্যক্তি ইংরেজকে রসদ যোগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া, ইহার এই দশা হইয়াছে। যে কেহ এইরূপ কার্য্য করিবে, তাহার এইরূপ দণ্ড হইবে।'

সর্দ্দারগণ মধ্যে এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় মৌলভি ফজলহক্—প্রধান সেনা-পতি—আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সর্দ্দারগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। ফজলহক্ চৌকিতে উপবিষ্ট হইলে, তাহারা স্ব স্ব আসনে বসিল। আমার নাক-কাণ-কাটার পক্ষপাতী সর্দ্দার প্রথমেই এই ভাবে ফজলহক্‌কে কহিলেন,—"হুজুর! ইস্‌কো তোপ্‌মে না উড়াইয়ে, ইস্‌কা নাক আউর কাণ কাট দীজিয়ে। আউর রামপুরকে এলাকেমে ছোড়্ দীজিয়ে। যো কোই ইস্‌কা হাল্ দেখেগা, সো ডর্ যায়েগা। আউর কোই এইসা কাম নেহি করে গা। আউর কাফিরোঁকো রসদ নেহি পৌঁছায়েগা। হামলোগোঁনে কই দফা রসদ্ ভেজনে ওয়ালোঁকো মারডালা; লেকিন, লোগ্ ঝুট সমুঝ্‌তে হ্যায়।" এই কথা শুনিয়া মৌলভি গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না। তোপে উড়াইবার হুকুম যখন একবার হইয়াছে, তখন সে হুকুম রদ করা আমার সাধ্য নয়। তবে নবাব সাহেব আসুন, তিনি আসিলে, যাহা যুক্তি হয়, করা যাইবে। তিনিই এ দেশের কর্ত্তা,—আমি বিচারক, দণ্ডাজ্ঞা-দাতা মাত্র। বিশেষ তাঁহার

সমক্ষেই অপরাধীকে তোপে উড়াইতে হইবে; —ইহাই নিয়ম। তিনি এখনি আসিবেন।"

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন,—এ দেশটা এক্ষণে নবাব খাঁবাহাদুরের অধিকার-ভুক্ত; এখানকার সৈন্যাধ্যক্ষ মৌলভি ফজল্‌হক্‌;—এবং দেশ শাসনের জন্য এখানে একজন গবর্ণর আছেন। ফজল্‌হক্‌ বলিতেছেন, "সেই শাসনকর্ত্তা গবর্ণরের সম্মুখে আমাকে তোপে উড়ান হইবে।"

আমার প্রাণ ধুক্‌-ধুক্‌ করিতেছে;—কখন্‌ নবাব সাহেব আসেন,—কি কথা বলেন,—কখন্‌ আমাকে তোপে উড়াইয়া দিবেন,—এই চিন্তাই তখন মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল।

এমন সময় একজন অশ্বারোহী উপস্থিত হইয়া মৌলভি সাহেবের হস্তে একখানি পত্র দিল। মৌলভি সাহেব সর্দ্দারগণকে কহিলেন,—"অদ্য নবাব-সাহেব উপস্থিত হইতে পারিবেন না, কেননা, তাঁহার শরীর অসুখ। তিনি কল্য আসিবেন লিখিয়াছেন।" এই কথা শুনিবা মাত্র, ফজল্‌হকের আদেশক্রমে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি তদ্ভাবে বন্দী অবস্থায় পড়িয়াই রহিলাম।

আমার চিন্তা দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইল। এখনি তোপে উড়াইলে নিশ্চিন্ত হইতাম,—সকল জ্বালা দূর হইত। কিন্তু অদৃষ্টে সে শান্তি লেখা নাই,—এখনও কল্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত—এই চব্বিশ ঘণ্টা কাল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, অনাহারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা তুষানল ভাল ছিল। এ একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ মৃত্যু ঘোরতর যন্ত্রণাদায়ক।

আর যে ভাবিতে পারি না! ভাবিয়া ভাবিয়া দেহের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে! বুঝিবা এইরূপ অনাহারে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে ভাবিতেই মৃত্যু ঘটে!

দুর্ব্বৃত্ত সর্দ্দারগণ বলে কি?—আমার নাক কাণ কাটিয়া, আমাকে খোঁড়া করিয়া ছাড়িয়া দিবে!! তবে কি আমি নাক্‌-কাটা, কাণ-কাটা, খঞ্জ হইয়া বাঁচিয়া থাকিব? এরূপ জীবন ধারণে ফল কি? ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

বেলা যখন তৃতীয় প্রহর, তখন আমার জন্য ছোলা, ছাতু ও জল আসিল। দেখিলাম, একজন মুসলমান কর্ত্তৃক এই সকল আহারীয় সামগ্রী আনীত হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা তখন আমার আর নাই; তখন আমি সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। শরীর তখন কেমন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় আমি তখন কেবল পড়িয়া আছি।

মুসলমান-স্পৃষ্ট জল দেখিয়া আমি ধীরভাবে কাতরকণ্ঠে কহিলাম,—"ভাই! আমি ত মরিতে বসিয়াছি। এ সময়ে আমি স্বধর্ম্ম নষ্ট করিব না। কোন হিন্দু দ্বারা যদি জল ও আহারীয় সামগ্রী আনীত হয়, তাহা হইলে আমি খাইব, নচেৎ নহে।"

সেই মুসলমান আমাকে বিদ্রূপ করিয়া হাসিল। কি বিদ্রূপ করিয়াছিল, এখন ঠিক মনে নাই। বোধ হয় সে এই কথা বলিয়াছিল যে, "তুমি মরিতে যাইতেছ, তোমার আবার এখন ধর্ম্মের প্রতি এত মন কেন?"

সে যাহাই বলুক, অবশেষে মিষ্ট কথায় তাহাকে বশ করিলাম। সে ফিরিয়া গিয়া অর্দ্ধ-ঘণ্টা মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এবার দেখিলাম, দুই জন হিন্দু তাহার সঙ্গে আসিয়াছে। এক জনের হস্তে জল ও দুগ্ধ; অপরের হস্তে ছাতু, ছোলা, গুড়। দ্বিগুণ আয়োজন দেখিয়া বুঝিলাম, সত্যসত্যই মুসলমানের আমার উপর দয়া হইয়াছে।

প্রহরীগণ,—হাত, পা এবং কোমরের শিকল আল্গা করিয়া দিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। মুখ ধুইলাম। সংক্ষেপে সময়ানুরূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি সারিয়া আহারের যোগাড় করিলাম বটে,—কিন্তু দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া, কিছুই আহার করিতে পারিলাম না। অবসন্নতাহেতু আহারের সময় দেহ কেমন কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব না কি? মাথায় একটু জল দিয়া, মুখ হাত ধুইয়া শুইয়া পড়িলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রেও ঘুম ভাল হয় নাই, কেবল তন্দ্রা আর স্বপ্ন। আবার প্রভাত হইল, আবার পক্ষিকুল কলরব করিয়া উঠিল। আবার মৌলভি সাহেব এবং সর্দ্দারগণ যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। আবার সকলে নবাব-সাহেবের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

আমি এ অন্তিমে অন্তরে কেবল দুর্গানাম জপিতেছি।—দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! মা রক্ষা কর! রক্ষা কর! অবোধ সন্তানকে মা চরণে স্থান দাও। হে মহিষমর্দ্দিনি! রক্তবীজ-বিনাশিনি! দুষ্ট-দানব-দল-সংহারিণি! তোর্ ছেলেকে একবার কোলে কর্ মা!———"

ঠিক্ এইভাবে বিভোর হইয়া তখন আমি মা দুর্গাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে বেল এক প্রহর অতীত হইল, তথাপি নবাব-সাহেব আসিলেন না। বেলা দশটা হইল, ১১ট বাজিল,—তখনও নবাব সাহেবের দেখা নাই বেলা যখন প্রায় দুই প্রহর, তখন অদূরে অশ্বখুরধ্বনি শ্রুত হইল। আমি বুঝিলাম,—এইবার নবাব-সাহেব,—আমার যম আসিতেছেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব, অলৌকিক!! দেখিলাম,—প্রায় পাঁচিশ-ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য ধীরপদে অগ্রসর হইতেছে। সুসজ্জিত, বেগশালী, দৃঢ়কায়, আরব-দেশীয় অশ্বের উপর যোদ্ধগণ উপবিষ্ট। প্রত্যেক যোদ্ধার হস্তে এক একটী লম্বা বর্ষা। বর্ষার অগ্রভাগ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার লালধ্বজা উড়িতেছে। কটিতটে তরবারি দোদুল্যমান; উষ্ণীষ বহুমূল্য মুক্তাখচিত;—ঝালরের ন্যায় ঝল্ ঝল্ করিতেছে।

ইহাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত, একজন অপূর্ব্ব রূপবান্ পুরুষ,—যেন সাক্ষাৎকার্ত্তিকেয়। বয়ঃক্রম বাইস বৎসরের অধিক হইবে কি? কচি কচি ঈষৎ গোঁফ উঠিয়াছে,—মুখ-কমলে যেন ভ্রমর-পঙক্তির সমাবেশ! তিনিও একটী ভীমকায় অশ্বে আরোহণ করিয়া আছেন। যেমন তাঁহার মুখশ্রী,—অঙ্গে তাঁহার বসন-ভূষণও তদুপযুক্ত। লালরঙের রেশমী বস্ত্রের উপর সুবর্ণ, মুক্তা, হীরক খচিত! সূর্য্যের আভা পতিত হওয়ায়, তাহা ঝক্ ঝক্ করিতেছে! মনে হইতে লাগিল; স্বর্গ হইতে যেন স্বয়ং ইন্দ্র ভূতলে অবতরণ করিয়াছেন।

এই দলকে দেখিয়া, মৌলভি সাহেব প্রভৃতি সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া, সেই সুপুরুষকে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইলেন। এই সুপুরুষ আর কেহই নহেন,—ইনিই সেই শাসনকর্ত্তা গবর্ণর। ইনিই সেই নবাব সাহেব নামে কথিত,—এবং আমার পক্ষে দণ্ডধারী কালস্বরূপ স্বয়মাগত।

আমি যেস্থলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়াছিলাম, সেই স্থলে নবাব-সাহেব দুইজন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া আসিলেন। তিনি আমার আপাদ-মস্তক-নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে উত্তমরূপ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একজন প্রহরী আমার বন্ধন শিকল সমূহ শিথিল করিয়া দিয়া, ভীমরবে কহিল—"খাড়া হো যাও।" আমার ওষ্ঠাগতপ্রাণ,—উত্থানশক্তি একরকম রহিত। কিন্তু কি করি, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম, এইবার বুঝি তোপে উড়াইবার বা নাসাকর্ণচ্ছেদের হুকুম হইল!! দুর্গতিনাশিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর নাম কেবল মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সেই নবাব,—সেই গবর্ণর,—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আমাকে মধুর রবে তখন জিজ্ঞাসিলেন, "বাবু সাহেব! আপ্ হিঁয়া ক্যায়সে আয়ে?" মৃত্যুকালে পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় এই সম্ভ্রম-সূচক সম্বোধন শুনিয়া, প্রকৃতই আমার চক্ষু স্থির হইল। মাথা ঘুরিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া, ভূমিতে পড়িবার উপক্রম হইলাম। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলাম, 'ইনি কে? কণ্ঠের স্বর যেন চিনি-চিনি করিতেছি! হৃদয়ে আরও ভয়ের সঞ্চার হইল। সন্দিগ্ধচিত্তে আশঙ্কাই অগ্রগামী হইয়া থাকে। মনে হইল, এই নবাব-সাহেব যখন আমাকে "বাবু-সাহেব" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তখনত ইনি আমার সকল বিষয়ই অবগত আছেন। আমি যে বাঙ্গালী,—হিন্দুস্থানী নহি, ইহা আমার কথাবার্ত্তায় বা বেশভূষায় কেহ জানিতে সক্ষম হইবেন না;—পূর্ব্ব-পরিচয় ভিন্ন আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার কাহারও শক্তি নাই। তবে এই নবাব-সাহেব আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া কেমন করিয়া জানিলেন? ইহাঁর সহিত কোথা কোন্‌সূত্রে পরিচয়? সে যাহা হউক, আমি স্পষ্টত দেখিতেছি,—ইনি আমার সকল বিষয়ই অবগত আছেন। তবে ত নিশ্চয়ই আমি ইহাঁর নিকট ধরা পড়িয়াছি। নিতান্তই নিস্তার আর নাই।'

এখনও জ্ঞানহারা হই নাই,—বিপদে অধীর হওয়া মূঢ়ের কাজ, এখনও এ বোধটুকু আছে।

সাহসে ভর করিয়া নবাব-সাহেবকে কহিলাম,—"আপনি কৃপা করিয়া যদি আর একটু নিকটে আসেন, তাহা হইলে দুই একটী কথা আপনাকে বলি।" নবাব-সাহেব তৎক্ষণাৎ আমার নিকটে আসিলেন,—এবং অন্যান্য সহচর-বর্গকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেন। নবাব নিকটবর্ত্তী হইলে, আমি অনিমিষ-লোচনে তাঁহার মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলাম। তাঁহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, আমার চক্ষুকোণে জল আসিল। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। ক্রমশ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সৌম্যমূর্ত্তি নবাব-সাহেব ধীরে ধীরে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিলেন, "বাবু-সাহেব! কাঁদিবেন না; বড়ই সঙ্কটকাল। চোখের জল শীঘ্র মুছিয়া ফেলুন। কি হইয়াছে, কি ঘটিয়াছে, আমাকে সংক্ষেপে শীঘ্র বলুন।" আমি মৌলভি-ফজল্‌হকের নিকট "চাপরাসী" বলিয়া যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, সেই কথা বলিলাম এবং পথের অন্যান্য সকল সংবাদ তাঁহাকে কহিলাম। শেষে অতি বিনীতভাবে জানাইলাম,—আমাকে এ যাত্রা আপনি রক্ষা করুন।

নবাব-সাহেব আমাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "বাবু-সাহেব! পহিলে মেরা গরদান কোই কাটেগা, পিছে আপ্‌কা। আপ্ কুছ্ ফিকির (চিন্তা) না করিয়ে।" অন্য কেহ শুনিতে না পায়, এরূপ অনুচ্চ স্বরে তিনি আমাকে এই কথাগুলি বলিলেন।

পাঠক! এই নবাব সাহেব কে,?—তাহা চিনিতে পারিলেন কি? এই নবাব সাহেব আমার পূর্ব্বপরিচিত পরম বন্ধু। ইহাঁর নিবাস বেরিলী। ইনি নবাব-বংশীয়। বিদ্রোহের পূর্ব্বে যখন বেরিলীতে আমি অশ্বারোহী দলের "বড়বাবু" ছিলাম, তখন ইনি আমার বাসায় সর্ব্বদাই থাকিতেন। ইনি সেতার বাজাইতে সুনিপুণ ছিলেন—বড়ই হাত মিষ্ট ছিল। ইহাঁর নাম, চুন্নামিঞা। এতক্ষণে চুন্নামিঞার নাম কাহারও মনে পড়িল কি? সেই চুন্নামিঞা—যিনি গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সামান্য মাসহারা পাইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন,—যিনি আমাকে সেতারে পরিতুষ্ট করিয়া আমার নিকট হইতে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য পাইতেন,—মাসেমাসে যাহাকে আমি উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ প্রদান করিতাম,—যিনি নবাব খাঁবাহাদুর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—যিনি হাফিজ নিয়ামৎখাঁর পুত্র—সেই চুন্নামিঞা এক্ষণে এপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা,—এ প্রদেশের নবাব স্বরূপে অধিষ্ঠিত।

সেই চুন্নামিঞা আমার নিকট হইতে অতি দ্রুতপদে মৌলভি ফজলহকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ঐ বাদীকে চিনি; ঐ ব্যক্তি ভালমানুষ; বেরিলীতে চাপরাসীর কাজ করিত এবং সঙ্গতিপন্ন ছিল। উহার ভ্রাতা নাইনিতালে আছে ইহা আমি জানি। তাই ওব্যক্তি তাহাকে দেখিতে যাইতেছিল। রসদ পৌঁছিবার সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। এব্যক্তি বিশ্বাসী এবং মুসলমান রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।" এইরূপ নানা কথা চুন্নামিঞা, ফজল্‌হক্‌কে বুঝাইয়া বলিলে ফজল্‌হক্ কহিলেন, হুজুর! আপ মালিক্ হ্যাঁয়, যো আপজান্‌তেহেঁ তো ছোড়্‌দিজিয়ে।"

সৈন্যাধ্যক্ষ ফজলহক্ এই কথা বলিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সর্দারগণও প্রস্থান করিলেন। বোধ হয় ক্ষুব্ধমনে ঘরে পৌঁছিয়া ইহাঁরা ভাবিতে লাগিলেন, "কোথায় তোপে আমার ধ্বংস হইবে, না কোথায় আমি স্বচ্ছন্দে মুক্তিলাভ করিয়া বিজয় শব্দে নবাব সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলাম।" এদিকে চুন্নামিঞা স্বহস্তে আমার শিকল খুলিয়া, এক সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিতে বলিলেন। মুক্তিলাভের স্ফূর্ত্তিতে আমার দেহে যেন দ্বিগুণ বলসঞ্চয় হইল। আমি তখন লম্ফ দিয়া ঘোড়ার উপর উঠিলাম, উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে একঘণ্টা মধ্যে চুন্নামিঞার আলয়ে উপস্থিত হইলাম।

মহাবিদ্যা-সাধন।

সপ্তমী মহাবিদ্যা—ধূমাবতীর ধ্যান।

বিবর্ণা চঞ্চলা দুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তকুন্তলা রূক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
শূর্পহস্তাতিরূক্ষাক্ষা ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥

প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহাস্পদা।

ব্যাখ্যা।

প্রবীণা বিধবা নারী ধূমের বরণ।
কাকধ্বজরথারূঢ়া কুটিলনয়ন॥
ধূমেতে উৎপত্তি তাই নাম ধূমাবতী।
ধূমধামে কাঁপাতে পারেন বসুমতী॥
সুদীর্ঘ নাসিকা স্তন বাতাসেতে নড়ে।
আলুথালু কেশ রুক্ষ ভূমে এসে পড়ে॥
ক্ষুধায় আকুলা অতি ব্যাকুলা বিশেষ।
স্বভাব কুটিল তায় সুমলিন বেশ॥
দ্বিভুজা কলহপ্রিয়া মত্তা ঘোর দাপে।
এক হাতে শূর্পধরা আর হাত কাঁপে॥
মহাবিদ্যামধ্যে এই সপ্তম মূরতি।
নন্দীশ্বর-প্রিয়তমা বন্দি ধূমাবতী॥

ধূমাবতী-স্তোত্র।

ওমা ধূমাবতি, অগতির গতি,
চাহ মম প্রতি, করুণা-নেত্রে।
কেবা তব সম, পদে নম নম,
উর উর মম, মানসক্ষেত্রে॥
তোমারে হেরিয়া, তরাসে ডরিয়া,
মনে গুমরিয়া, নীরব ভব।
ধরি কৃত্তিবাস, করিলে গরাস,
শুনিতে তরাস, যে কার্য্য তব॥
তুমি ব্রহ্মাখ্যান, তুমি যোগধ্যান,
তুমি ব্রহ্মজ্ঞান, যন্ত্র-বাদিনী।
হইয়ে সধবা, সাজিলে বিধবা,
ইচ্ছাময়ী ভবা-নন্দা ভবানী॥
হইয়া ব্যাকুলা, করে ধর কুলা,
ভক্ত-অন্তর্ধূলা, উড়াতে বুঝি।
কেবুঝে এ খেলা, মুকতির মেলা,
তব যত্ন হেলা, কিছু না সুঝি॥
হস্ত কম্পমান্, এই অনুমান,
পাছে কৃপা দান, করিতে হয়।
তোমার এ ছল, ছল কি কুশল,
বুঝে কার বল, এ বিশ্বময়॥

আঁধার রজনী।

ধন্য তুই আঁধার রজনি!

আপন সুখের তরে, আপন যশের তরে,
সবাই সতত উনমত।
পরের সুখের লাগি, আপনি সে-সব-হারা,
কেবা আছে আর তোর মত!
দিবস জোছনা রাতি, বড়'র পিরীতি-আশে,
সদা থাকে রবি-শশী-পাশে।
ছোট ছোট তারাপানে, ফিরেত চাহেনা কভু,
তাড়াইয়া দেয় কোন্ দেশে।
আর, তুই আঁধার রজনী;——
দয়ার সাগর তুই, রবি শশী তেয়াগিয়ে,
কোলে নিস্ তা,সবে যতনে।
যত ছোট সব আসে, কোলে উঠে হেসে হেসে,
বলিহারি তোর আচরণে!
আলোক-উজ্জ্বল-ভূষা, সুনাম সুখের আশা,
একেবারে করিলি বর্জ্জন।
লইলি কলঙ্ক ডালি, সর্ব্বাঙ্গে মাখিলি কালি,
পর দুখ করিতে মোচন।
ধন্য ধন্য তুই ভবে, তোর মত কেবা হবে,
জয় জয় আঁধার রজনী।
অভিমানে মাতোয়ারা, বুঝেনা পরের পীড়া,
অবলার তুইরে স্বজনী।
অভাগী ভারত ভূমে, দেরে গাঢ় আলিঙ্গন,
ছাড়িবিনা ছাড়িবিনা, মুহূর্ত্তেরো তরে।
দিবস জোছনা রাতি এসনা এধারে।
সাধু সঙ্গে পুনরায়, পবিত্র জীবন পাবে,
স্বর্গাদপি গরীয়সী হইবে জননী।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } ভাদ্র। ১২৯৯। { ৯ম সংখ্যা।

কায়স্থ।

শেষ কথা।

"বঙ্গে কায়স্থ।—প্রাচীন ঘটক-কারিকার মতে, প্রথমে পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চদেশ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণের সহিত গৌড়রাজ আদিশূরের সভায় আগমন করেন।

* * * *

"আদিশূর, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক।* এই সময়ে দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ (৭৮০ খৃষ্টাব্দে) কনোজের সিংহাসনারোহণ করেন। এখন দেখা যাউক, ঐ সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে গৌড়দেশে কে কে রাজত্ব করিতেছিলেন?

"কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে,—
'মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়োদানামিবার্য্যমা।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ।
লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়-নিকেতনম্॥'
রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪১৫—৪১৭।

"(কাশ্মীররাজ জয়াপীড়, সৈন্যগণকে গঙ্গা-তীরে বিদায় করিয়া রাত্রিকালে একাকী) গৌড়-রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। জয়ন্ত নামক গৌড়-রাজের অধিকার-মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিবর্গের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। জয়াপীড় এখানে কার্ত্তিকেয়-দেবের মন্দিরে নৃত্য দর্শন-মানসে প্রবেশ করেন।

"ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরের প্রাচীন কায়স্থ-রাজবংশ-বর্ণনা-কালে লিখিত হইয়াছে যে, কায়স্থরাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শক (৭৪৫ খৃঃ অঃ) হইতে ৬৯৮ শক (৭৭৬ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে কোন সময়ে তিনি পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নগরে আসিয়াছিলেন। অতএব স্বীকার করা যাইতে পারে যে, গৌড়রাজ জয়ন্ত ৭৪৫ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন।

"রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে,—'জয়াপীড় কার্ত্তিকেয়-মন্দিরে কমলা নাম্নী দেবনর্ত্তকীর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। কমলা জয়াপীড়ের অসামান্য রূপ-মাধুরী দর্শনে তাঁহাকে কোন রাজবংশীয় ভাবিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহের উৎপাত হয়। জয়াপীড় স্বকীয় ভুজবল-প্রভাবে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে মারিতে গিয়া ঘটনাক্রমে তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া গৌড়রাজ জয়ন্তের নিকট উপস্থিত করে। তাহাতে সকলে জানিতে পারিল যে, কাশ্মীরপতি জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া-ছেন। সকলেই নাম শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়ন্ত কহিলেন,—'শুনিয়াছি কাশ্মীররাজ কল্লট নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।' তিনি চর

* এবিষয়ে অনেক বিচার বিশ্বকোষে আছে।

দ্বারা অবগত হইলেন যে, জয়াপীড় কমলার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর গৌড়রাজ,—অমাত্য ও রাজ-পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া জয়াপীড়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং বহু যত্নে তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এই সময় গৌড়দেশ কেবল জয়ন্তের অধিকারভুক্ত ছিল না। জয়াপীড় পাঁচজন গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে রাজচক্রবর্ত্তী করিলেন।' (রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ)

"রাজতরঙ্গিণীর উক্ত বিবরণপাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে জয়ন্ত একজন সামান্য রাজা ছিলেন, পরে জামাতার সাহায্যে সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইলেন।

"এদেশের প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের মতে, রাজা আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম রাজচক্রবর্ত্তী হন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ৬৬৭ শক হইতে ৬৯৮শক মধ্যে) ঐ সময়ে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি ব্রাহ্মণবংশাবলী ও রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আদিশূর ও জয়ন্তরাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, জয়ন্তরাজ সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইয়া 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন।

"আর এক কথা—যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়ন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শিলালিপি-পাঠে জানা যায়—সেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সেনরাজগণও রাজত্ব করিতেন। অতএব বোধ হইতেছে,—জয়ন্ত বা আদিশূরের সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ সর্ব্বপ্রথম এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ বল্লালসেনের সময়ে 'কুলীন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে যিনি যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তিনি, সেই স্থানের নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

* * * *

"রাজতরঙ্গিণীতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য শ্বশুরকে গৌড়দেশের অধীশ্বর করিয়া রাজ্ঞী কল্যাণদেবী ও কমলাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তিনি কান্যকুব্জ-রাজকে পরাস্ত করিয়া কনোজের রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন।

"নাসিক হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূটাধিপ গোবিন্দ-রাজ-প্রদত্ত ৭৩০ শকাব্দের তাম্রশাসন-পাঠে জানা যায়—যে তাঁহার পিতা পৌররাজ, বৎসরাজকে জয় করিয়াছিলেন, ঐ বৎসরাজ গৌড়রাজ্য জয় করিয়া ধনমদে মত্ত হইয়াছিলেন।

(*Journ, Roy, As, soc, Vol V, P, 350.*)

"উপরোক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে,—প্রথমে বৎসরাজ, গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। পরে সেই ধনমত্ত বৎসরাজও যে গৌড়-রাজ জয়ন্তের সম্মানরক্ষার্থ তাঁহার জামাতা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিয়া লইলে দোষের হয় না।

"ঘটক-কারিকাতেও লিখিত হইয়াছে" যে, গৌড়সেনাপতি প্রথমে কান্যকুব্জ-রাজের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, পরে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি গিয়া ছলে বলে একরূপ কনোজের অতুল প্রভাবকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই সময় হইতে বঙ্গদেশে গৌড় ও কনোজ-রাজের যুদ্ধের কথা পরম্পরায় প্রবাদরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তৎপরে আধুনিক কুলাচার্য্যগণ সেই প্রবাদ এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থের গৌড়ে আগমন উপলক্ষ্য করিয়া এক প্রকার নতন কথার অবতারণা করিলেন ; এক্ষণে তাহাই কারিকা-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

"কলহণ ১০৭০ শকে রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ যে অধিক প্রামাণিক, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য। অতএব এদেশের ব্রাহ্মণ-বংশাবলী যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে জয়ন্ত-রাজই (১) যে আদিশূর

(১) "আইন-ই-আকবরীতে, বঙ্গদেশের কায়স্থ-রাজবংশাবলী মধ্যে জয়ন্তের নাম পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ মতে জয়ন্ত-রাজ আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী। (*H. L. Jarrett's Ain I Akbari, Vol. II. p. 145* দেখ)

আইন অকবরীতে এক রাজার নাম দুই তিন বার স্বতন্ত্র উল্লেখও দেখা যায়। যেমন পালবংশীয় প্রথম-রাজা ভূপাল এবং চতুর্থ রাজা ভূপতিপাল—দুই জন ভিন্ন রাজা বলিয়া লিখিত হইলেও শিলালিপি অনুসারে একজন রাজা বলিয়াই বোধ হয় এবং ভূপাল বা ভূপতিপালের নামান্তর যেমন গোপাল ও লোক-পাল জানা গিয়াছে।

উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক সম্ভব। আবুলফজল, জয়ন্তকে কায়স্থরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার কন্যার সহিত কায়স্থরাজ জয়াপীড়ের বিবাহ হওয়ায় আইন অকবরীর কথাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।

"ঐ আদিশূরের সময়ে অর্থাৎ ৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়দেশে আগমন করেন। ঐ পঞ্চ

(*Indo Aryans, Vol. II. p. 262; Centenary Review of the As soc. Bengal, p. 206—9: Journ. As soc. Bengal, 1878. pt. I. p. 190.*) সেইরূপ আদিশূর, জয়ন্তের পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও একরাজা বলিয়া গ্রহণ করা অন্যায় হয় না। চন্দ্রদ্বীপের রাজপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠনামকঃ।
অভবৎ তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
অগমদ্ভারতং বর্ষং দরদাৎ স রবিপ্রভঃ। * * *
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বলাৎ।"

চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠনামা কায়স্থ জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশজাত মহারাজ আদিশূর দরদদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি—বৌদ্ধরাজগণ ও গৌড়াধিপ প্রভৃতিকে জয় করিয়াছিলেন।

উক্ত বচন অনুসারে আদিশূরের জন্মস্থান (কাশ্মীরের উত্তরস্থিত) দরদ-দেশ (বর্ত্তমান দার্দিস্তান)।

দিনাজপুরের একটী প্রাচীন শিবমন্দিরের স্তম্ভে কাম্বোজ-বংশজাত গৌড়পতির উল্লেখ আছে। যথা;—

"দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ।"

ঐ কাম্বোজ-বংশজাত গৌড়েশ্বরকে কেহ কেহ আদিশূর অথবা তাঁহার 'উত্তর-পুরুষ বলিয়া' অনুমান করিয়াছেন। (নব্যভারত ১২৯৬, ৪৬ পৃঃ)।

প্রাচীন কাম্বোজ-রাজ্য কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

দরদ ও কাম্বোজ উভয়েই পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ।

"কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরা অঙ্গলৌকিকাঃ।"
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১।৪৬।১১৮; মার্কণ্ডেয় ৫৬।৩৮।

কোন কোন আধুনিক ঘটক-কারিকায় আদিশূরকে বৈদ্যরাজ বলা হইয়াছে। বোধ হয়, আধুনিক কুলাচার্য্যগণ অম্বষ্ঠ নাম শুনিয়াই বৈদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।"

বিষ্ণুপুরাণে—অম্বষ্ঠ নামক একটী জনপদের উল্লেখ আছে—

"সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠা পারসীকাদয়স্তথা॥" বিষ্ণুপু২।৩।১৭

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, অম্বষ্ঠদেশ বর্ত্তমান পঞ্জাব ও পারস্যের মধ্যে ছিল। (ইহারই নিকট কাম্বোজ ও দরদরাজ্য ছিল।)

পাণিনি মতে—অম্বষ্ঠ শব্দ ক্ষত্রিয় ও জনপদবাচী (পা ৪।১।১৭১।) পশ্চিমের অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ অম্বষ্ঠদেশ হইতে আসিয়াছেন। ঐরূপ শ্রীবাস্তবেরা কাশ্মীরের শ্রীনগর হইতে আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকায় আদিশূর দরদদেশীয় অম্বষ্ঠ-কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দিনাজপুরের শিলালিপিতে কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; আবার কাম্বোজ, দরদ ও অম্বষ্ঠ পরস্পর নিকটবর্ত্তী দেশ হইতেছে। বিশেষতঃ অম্বষ্ঠ-কাম্বোজাদির নিকটবাসী কাশ্মীররাজ কায়স্থপ্রবর জয়াপীড় গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জয়ন্ত বা আদিশূরকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে, জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন শুনিয়া সকলেই শঙ্কিত হইয়াছিল, কেবল গৌড়রাজ জয়ন্ত জানিতেন যে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে 'কল্লট নামগ্রহণপূর্ব্বক দেশ ভ্রমণ করিতেন। কেহই জানিতে পারিল না, অথচ গৌড়রাজ জানিতে পারিলেন। ইহার কারণ কি? এতদ্দ্বারা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে কাশ্মীরের সহিত পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ সংস্রব অথবা (ধ্রুবানন্দের কথা যদি অল্পমাত্র সত্য হয় তাহা হইলে) তিনি কাশ্মীরের নিকট কোন স্থান হইতে আসিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রথম রাজা হন। এ সকলই অনুমান। বোধ হয়, কায়স্থ আদিশূর নিজে কায়স্থ বলিয়াই কনোজাগত কায়স্থকে বিশেষ সমাদর করেন এবং ব্রাহ্মণের পরই পদমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন।

কায়স্থের নাম সৌকালীন-গোত্রজ মকরন্দ ঘোষ, গৌতম-গোত্রজ দশরথ বসু, বিশ্বামিত্র-গোত্রজ কালিদাস মিত্র, কাশ্যপ-গোত্রজ বিরাট গুহ এবং মৌদ্গাল্য-গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত।

"বঙ্গীয় ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঘটক-কারিকার মতে ঐ পাঁচজন কায়স্থ শূদ্র। তাহারা পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত দাসরূপে গৌড়ে আগমন করে। আদিশূর প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া শেষে কায়স্থগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আপনাদিগের আগমনে আমার জন্ম সফল হইল, আমার ভবন পবিত্র হইল। হে শূদ্র-পুঙ্গবগণ! আপনারা ব্রাহ্মণদিগের সহিত কিজন্য আগমন করিয়াছেন?' ইত্যাদি স্তব-স্তুতি দ্বারা আদিশূর, কায়স্থগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রথম চারিজন আপনাদিগকে বিপ্র-দাস বলিয়া পরিচয় দিলেন। শেষে 'নিখিলশাস্ত্র-বিশারদ' পুরুষোত্তম দত্ত কহিলেন,—'সকলকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।'

"রাজা প্রথমে চারিজনকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দত্ত বিনয়হীন হওয়ায় তাঁহাকে নিষ্কুল করিলেন।'

"কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল, আবার সেই শূদ্রগণকে দেখিয়া আদিশূর কৃতার্থস্মন্য হইলেন, তাঁহাদের স্তব-স্তুতি করিলেন। একি চমৎকার! পূর্ব্বকালে যে শূদ্রজাতির রাজসভায় অধিকার ছিল না, পবিত্রচেতা আর্য্যগণ যে শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন, প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী যজ্ঞাভিলাষী আদিশূর সেই শূদ্রকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন! অতি অসম্ভব! ৪ জন কায়স্থ 'বিপ্রদাস' বলিয়া পরিচিয় দিয়াছিল বলিয়াই কি ঘটকেরা তাঁহাদিগকে শূদ্রমধ্যে গণ্য করিয়াছেন?

"ধ্রুবানন্দ মিশ্র ৫ জন কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন;—

১। '......এই প্রভাবসম্পন্ন মকরন্দ...... ইনি সৌকালীন-গোত্রসম্ভূত ও শৈব, ইহাঁর গোত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবপূজ্যা কালিকা। ইনি ভট্টনারায়ণের শিষ্য, মহাতান্ত্রিকদিগের অগ্রগণ্য, সূর্য্যধ্বজের বংশধর এবং বীরাগ্রগণ্য।

২। ......এই দশরথ......চন্দ্রের স্বরূপ চেদিরাজার বংশোদ্ভব, গৌতমগোত্রজ, দক্ষের শিষ্য, মহাত্মা, সুধীর, নির্ম্মল-চরিত্র, মতিমান্, মহাতান্ত্রিক এবং মহাবীরদিগেরও অগ্রগণ্য।'

৩। ......ইনি অগ্নিকুলোদ্ভব গুহের বংশধর, ইহাঁর নাম বিরাট্, ইনি সুতাপস, মহাবীর ও কাশ্যপগোত্রীয়, শ্রীহর্ষের শিষ্য, কালিকাভক্ত, ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য। ভট্ট যখন গুহ শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তখন ভূপতির সভ্যগণ হাস্য করিয়াছিলেন।

৪। ......এই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট কালিদাস...... মিত্রবংশে প্রকাশমান। ইনি চন্দ্রবংশোদ্ভব, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, রথিশ্রেষ্ঠ, ছান্দড়ের শিষ্য, বিশ্বামিত্র-গোত্রীয়, শাস্ত্রজ্ঞ, সুধী ও প্রাজ্ঞ। ইহাঁর কুলদেবী আদ্যা প্রকৃতি।

৫। ......এই পুরুষোত্তম......অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব......ইনি সৈকসেনার বংশধর, মহাশৈব, সমস্ত রথিগণের অধিপতি, মৌদ্গাল্যগোত্রীয়, শস্ত্রবিদ্ ও শাস্ত্রজ্ঞ, মহাবীর ও বলবান্। মহাদেব ইহাঁর কুলদেবতা।'

"ধ্রুবানন্দ কায়স্থদিগকে শূদ্রের পরিবর্ত্তে 'প্রধান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে প্রথম চারিজন, চারিজন-ব্রাহ্মণের শিষ্য।

"ধ্রুবানন্দ প্রায় দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঘটক-কারিকা সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে লিখিত। সুতরাং তিনখানি গ্রন্থই আধুনিক হইতেছে। যখন পরস্পর তিনখানি অনৈক্য, তখন কোনখানির উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না। তবে মূল কথা,—সেই পাঁচজন কায়স্থ যে পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্যধ্বজ, সকসেনা, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি কায়স্থ বিদ্যমান; এরূপ স্থলে, ধ্রুবানন্দ যে মকরন্দকে সূর্য্যধ্বজ, পুরুষোত্তমকে সৈকসেন-কায়স্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ সূর্য্যধ্বজ, সৈকসেন প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থগণ অদ্যাপি যজ্ঞসূত্র ও সংস্কার-সম্পন্ন হওয়ায় তাঁহারা যেমন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, ঐ পঞ্চকায়স্থ সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়াই মহারাজ আদিশূরের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; শূদ্র হইলে এমন আদৃত হইতেন না। যে কায়স্থ, যে ব্রাহ্মণের শিষ্য, তিনি তাঁহারই দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; এরূপ

স্থলে 'দাস' শব্দ শূদ্রবাচী নহে। কায়স্থ চিরকালই ব্রাহ্মণের ভক্ত। "দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্তশ্চ অতিথীনাঞ্চ সেবকঃ" ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব কায়স্থ ভক্তিভাবে 'ব্রাহ্মণদাস' বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহার উন্নত স্বভাব ব্যতীত নিকৃষ্টজাতিত্ব প্রকাশ পায় না।

"ধ্রুবানন্দমিশ্র লিখিয়াছেন,—

"গজাশ্ব-নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশ-সমন্বিতাঃ।
খড়্গচর্ম্মাদিভির্যুক্তাঃ পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥"

"প্রধানগণ (কায়স্থগণ) গজ, অশ্ব ও শিবিকায় এবং ব্রাহ্মণগণ, পুত্র-দারাদি সহ খড়্গ-চর্ম্মাদি-পরিবৃত হইয়া বীরবেশে আসিয়াছিলেন।

"অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—'কায়স্থেরা কিসের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন?' কোন কোন কারিকায় লিখিত আছে,—'কায়স্থগণ আদিশূরের যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিলেন।' মিশ্রকারিকার মতে, বীরসিংহ এই পাঁচজন প্রধানকে (কায়স্থকে) পাঠাইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন,—কায়স্থগণ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন; কারণ, শাস্ত্রেই আছে,—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥"

মনু ৯।৩২২।

"ব্রাহ্মণরহিত-ক্ষত্রিয়ো বৃদ্ধিং ন যাতি, শান্তিক পৌষ্টিক-ব্যবহারেক্ষণাদিধর্ম্মবিরহাৎ। এবং ক্ষত্রিয়রহিতোঽপি ব্রাহ্মণো ন বর্দ্ধতে, রক্ষাং বিনা যাগাদিকর্ম্মানিষ্পত্তেঃ।" কল্লুক।

"ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও কখন বৃদ্ধিলাভ করেন না। কারণ, ব্রাহ্মণ না থাকিলে শান্তিক, পৌষ্টিক ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব হয় এবং ক্ষত্রিয় না থাকিলে রক্ষা বিনা যাগ-যজ্ঞাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। তবে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব একত্র মিলিত হইলেই ইহ পর উভয় লোকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণের সহিত যে কায়স্থ আসিয়াছিল, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণোদিত।

"প্রাচীন ইতিহাস অথবা কারিকা অভাবে কেবল আধুনিক (দুই তিন শতবর্ষের) কুলাচার্য্য-গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যে কেবল যজ্ঞোদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। যদি যজ্ঞই করিতে আসিবেন, তবে পুত্র-দারাদি সঙ্গে আনিবার প্রয়োজন কি এবং বীরবেশে আসিবারই বা কারণ কি? বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের গৌড়াগমন সম্বন্ধে কোন রাজকীয় গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য কি?

'গুরুজন-কথাচরিত্র' ও প্রাচীন আসাম-বুরঞ্জীপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে (বর্ত্তমান কোচবিহারের অন্তর্গত) কামতাপুর নামক স্থানে দুর্লভনারায়ণ নামে একজন রাজা ছিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থকে কামরূপে পাঠাইয়া দেন। ঐ ৭ জন ব্রাহ্মণের নাম,—কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ান, ধর্ম্ম ও মথুর এবং ৭ জন কায়স্থের নাম,—হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। কামরূপ-রাজ তাঁহাদের 'বারভুঁয়া' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ চণ্ডীবর,—বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি "শিরোমণিভুঁয়া" উপাধিলাভ করেন। তিনি দেবীপূজক ছিলেন এবং "দেবীদাস" বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন।

"আসাম-বুরঞ্জী লেখকেরা অনুমান করেন যে, তাঁহারা গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন।

"দেবীপূজক চণ্ডীবরের বীরগাথা কামরূপের ঘরে ঘরে প্রসিদ্ধ। তিনি দুইবার ভোটন রাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজধর ১২৫০ শকে শিরোমণিভুঁয়া হন। বিখ্যাত শঙ্করদেব এই রাজধরের পৌত্র। বঙ্গে যেমন বৈষ্ণবেরা চৈতন্য-দেবের পূজা করেন কামরূপেও বৈষ্ণবগণ সেইরূপ শঙ্করদেবকে ততোধিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই শঙ্করদেবই প্রর্ব্বপ্রথম আসামী ভাষায় বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রচার করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গ-দেব, কামরূপে তেমনি শঙ্করদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

'কোচ-বিহারাধিপ নরনারায়ণের সভায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ অবস্থান করিতেন। অনেকেই তাঁহাকে ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বোধ হয়, রাজা দুর্লভনারায়ণের সময়ে যে ৭ জন

ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের কাহারও উত্তর-পুরুষ হইবেন।

"কামরূপে যে কারণে ব্রাহ্মণকায়স্থ গিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। আমাদের বোধ হয়, কামরূপের ন্যায় ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ গৌড়ের সুশৃঙ্খলা-স্থাপনের নিমিত্ত এবং রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য রাজনৈতিক কর্ম্মচারী (Political Officer)-রূপে কনোজ-রাজ অথবা জয়াপীড় কর্ত্তৃক গৌড়ের রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। গৌড়ে সমাগত আদি ব্রাহ্মণাদির উত্তর-পুরুষ ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ, মন্ত্রী পশুপতি, কায়স্থপ্রবর সান্ধি-বিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে, উত্থাপিত যুক্তি অনেকটা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

"ঘটক-কারিকামতে, পঞ্চ কায়স্থের আগমনের পর আদিশূরের সময়ে তাঁহাদের দার-পুত্রাদি এবং নাগ, নাথ ও দাস—এই তিন জন কায়স্থ (দারাদি সহ) আসিয়াছিলেন।

"সেনরাজগণ।—ইতিপূর্ব্বে আদিশূরের সময়-নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর প্রণয়ন করেন কিন্তু ডা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ সময়-প্রকাশের ভ্রমাত্মক পাঠের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে, "১০১৯ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয়" এবং তদনুসারে তাঁহারা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের অভিষেক-কাল অবধারণ করিয়াছেন।

দানসাগরে লিখিত আছে —

'অত্র সংবৎসরাদি-সময়-বিশেষ-পরিপাদনেন দানসাগরস্য নির্ম্মাণকালস্যৈব সংবৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখ্যতে।

নিখিলচক্রতিলকশ্রীমদ্‌বল্লালসেনেন পূর্ণে।
শশি-নব-দশ-মিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥
রবিভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্যান্তে।
ক্রমশোঽত্র সংপরীদানদাস্তা বৎসরাঃ পঞ্চ॥
তদেবমেকনবত্যধিকবর্ষসহস্রারেঽস্মিতে শাকে।
সংবৎসরাঃ পতন্তি বিশ্বপদারভ্য চ।
সংবৎসর-পরিবৎসর-ইদাবৎসর-অনুবৎসর-
উদ্বৎসরাঃ॥"

(দানসাগর, হস্তলিপি, ২২০ পত্র, ১ পৃঃ)

"চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্‌বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকবর্ষে দানসাগর রচিত হয়। রবিভগণকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই সংবৎসরাদি বর্ষ জ্ঞান হইবে; সুতরাং এই নিয়মানুসারে দানসাগরের রচনা-সময়ে 'সংবৎসর' নামক বর্ষ লাভ হইবে অর্থাৎ যে সময়ে দানসাগর রচিত হইয়াছিল, সেই বৎসর 'সংবৎসর' বর্ষ হইয়াছিল।

"পূর্ব্বোক্ত চূর্ণক দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা:—'অত্র সংবৎসরাদিসময়বিশেষ-পরিপাদনেন দানসাগরস্য নির্ম্মাণকালস্যৈব সংবৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখ্যতে'—

(তেন) রবিভগণাঃ—১০৯১ শকে

১৯৫৫৮৮১২৭০, ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট "০" শূন্য থাকে। ইহাতে সংবৎসর নামক বর্ষই হইবে; কারণ, অতীত বিষয়ই অবশিষ্ট থাকিবে।

"দানসাগরের উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ গ্রন্থ বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকে রচিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বল্লালসেনদেব নিজে যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই মুখ্য ও সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য এবং অপরাপর প্রমাণ কল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

"দেবীবর, বাচস্পতি, ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের মতে, বল্লালসেন অম্বষ্ঠকুল-জাত মিত্রসেনের পুত্র। আবার কেহ আদিশূরের পুত্র, কেহ বিশ্বক্‌সেনের পুত্র, কেহ শুকসেনের পুত্র, কেহ ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র, আবার কেহ তাঁহাকে জারজ বৈদ্যরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে যাহাই বলুন, এই আধুনিক কুলাচার্য্য-কারিকাসমূহ অথবা একদেশী অভিনব জনপ্রবাদ এককালে অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে সেনরাজগণের সাময়িক গ্রন্থ, শিলালিপি ও তাঁহাদের প্রদত্ত শাসনপত্রের উপরই একমাত্র বিশ্বাস করিতে হইবে।

"দানসাগরে বল্লাল,—বিজয়সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রায় শতাধিকবার "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্‌বল্লালসেনদেব" এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

"বল্লালের পিতা বিজয়সেনের শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তিনি দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেন-

বংশীয় সামন্তসেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেনের পুত্র; যশোদেবীর গর্ভজাত।

"অতএব যখন দেখা যাইতেছে,—শিলালিপি ও দানসাগরের পরস্পর ঐক্য হইতেছে, তখন অপরাপর আধুনিক প্রমাণ অপেক্ষা দানসাগরের বিবরণই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

"বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনদেব এবং তৎপুত্র কেশবসেনদেব স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'ওষধিনাথবংশ' ও 'সোমবংশ-প্রদীপ' এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

"কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সেনরাজগণ অম্বষ্ঠ-বৈদ্য আখ্যায় অভিহিত হন নাই। সুতরাং উক্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেবও যে চন্দ্রবংশোদ্ভব ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

দানসাগরের প্রারম্ভে বল্লালও ক্ষত্রিয়-চরিত্রের আভাস দিয়াছেন।

বিজয়সেন কর্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে ক্ষোদিত আছে,—বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেন,—ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। (১)

"ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের প্রধান কায়স্থগণ অদ্যাপি ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনকে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" বলা হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন, তাহা ঐ শিলালিপির বচন দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব তাঁহারাও দাক্ষিণাত্য-কায়স্থের ন্যায় যে আপনাদিগকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' আখ্যায় অভিহিত করিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ—সেনরাজদিগের রাজত্বকালে কতকগুলি গৌড় কায়স্থ গৌড়দেশ হইতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বেহার প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করেন; তাঁহারা বহুদিন হইল,—গৌড়দেশের সংস্রব ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর-পুরুষগণ অদ্যাপি সেনরাজগণকে "কায়স্থ" বলিয়া জানেন।

"বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা কায়স্থ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালে পুরুষোত্তমদত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত মহাসান্ধি-বিগ্রহিক পদে, দাসবংশীয় বটুদাস মহাসামন্ত-পদে এবং তৎকালীন বিখ্যাত কবি শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিক পদে নিযুক্ত ছিলেন; বোধ হয়, এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংগ্রহকার শূলপাণি, দীপকলিকা-নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় "কায়স্থৈঃ

(১) ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কেহ শ্রেষ্ঠ-ক্ষত্রিয় (*Noblest Kshetriya*) লিখিয়াছেন। (*Journ As., soc bengal, 1856, pt I. p. 144.*) শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় ব্রহ্ম-ক্ষত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং ক্ষত্রিয়ৈরেব কৈশ্চিৎ তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং লব্ধমিতি।" (বিষ্ণুপুঃ ৪।২১।৪টী)

স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে পরশুরামকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলা হইয়াছে। যথা—

"পরশুরাম উবাচ।

ভৃগুবংশসমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণং প্রভো।।
জমদগ্নিসুতং রামং রেণুকায়াঃ প্রিয়ঙ্করম্॥ ১৩॥
ব্রহ্মক্ষত্রং সদাজ্ঞেয়মিতি নিশ্চিত্য শঙ্কর।
আরাধিতোঽসি তপসা ধনুর্ব্বিদ্যার্থসিদ্ধয়ে॥" ১৪॥
রেণুকামাহাত্ম্য ১৫ অঃ।

পরশুরাম ব্রাহ্মণ, জমদগ্নির ঔরসে ক্ষত্রিয়রাজকন্যা রেণুকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণ হইলেও পুরাণকার তাঁহাকে "ব্রহ্মক্ষত্র" বলিয়াছেন।*

*এই টীকাংশে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়ের অর্থ একেবারেই বোধিত হয় নাই। শ্রীধরস্বামী 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রযোনি' এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন; তাহাতে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' শব্দের কোন বিশেষার্থবাচকতাই ব্যক্ত হয় নাই। সহ্যাদ্রিখণ্ডের প্রমাণেও পরশুরামকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলা হয় নাই। প্রমাণীভূত শেষ শ্লোকের অর্থ;—"হে শঙ্কর! বেদ এবং ধনুর্বিদ্যা বা ক্ষত্রধর্ম্ম, সর্ব্বদাই জানা উচিত, ইহা স্থির করিয়া ধনুর্বিদ্যা লাভের জন্য আমি আপনাকে তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়াছি।" শ্রী প, ত, ৬

রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ” অর্থাৎ কায়স্থ রাজ-সম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

* * * *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের উত্তর-পুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয় বটে, কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে সংস্কার-বর্জ্জিত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাঁহারা প্রথম সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ অবসন্ন হইলে মুসলমানদিগের আগমনে এবং মুসলমান নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে গিয়া সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছেন। মিশ্রকারিকার মতে, কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রীশূন্য হন। ক্রমে বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাঁহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ ও পবিত্রতা লাভ করিয়া বিপ্রভক্ত হইলেন। তাঁহারা তান্ত্রিক ও তন্ত্রদক্ষ। কিন্তু শ্রুতি-শাসনানুসারে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া খ্যাত।

“ধ্রুবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, শ্রুতির মতে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও অধ্যাত্মবিদের বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে যদি তাঁহাদের উত্তর-পুরুষগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তৎপরে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা অবশ্যই শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন শ্রুতিতেই তান্ত্রিককে শূদ্রধর্ম্মা বলা হয় নাই।”

মন্তব্য।

এই অংশে আদিশূর ও সেনরাজগণ যে কায়স্থ—এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ত্বের কথা ত সঙ্গে সঙ্গেই আছে। দুঃখের বিষয়,—আদিশূরপ্রভৃতি রাজগণকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহারা যে উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন অপ্রাপ্ত-শূদ্রভাব কায়স্থ ছিলেন, ইহা প্রমাণ হয় নাই। প্রত্যুত আদিশূর যদি দরদদেশীয় ক্ষত্রবংশ বা কাম্বোজ-বংশ হন, তাহা হইলে তাঁহার বহুশত পুরুষ পূর্ব্ব হইতে শূদ্রত্ব-প্রাপ্তির বিবরণ, মনু-সংহিতায় আছে। সুতরাং তাঁহার নিকটে সমাগত সজাতি-প্রবর পঞ্চ কায়স্থ, শূদ্রভাবাপন্ন হইলেও যে তাঁহাদিগের প্রতি আদিশূর বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিবেন, ইহা বিচিত্রও নহে, অসম্ভব ঘটনাও নহে। ইহা দ্বারা তৎকালেও কায়স্থদিগের অক্ষুণ্ণ-ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হয় নাই। ‘বল্লালসেন’ ‘ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামক’ কায়স্থ-শাখা-বংশ-সম্ভূত—একথা সত্য হইলেও তিনি যে উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন ছিলেন,—ইহা কিছুতেই স্থির করা যায় না।

“পঞ্চ ব্রাহ্মণ, আদিশূরের যজ্ঞ-সম্পাদনার্থ আসিয়াছিলেন” এ প্রবাদটী একেবারে উড়াইয়া দিবার প্রমাণ কিছুতেই নাই। বীরবেশে আসিবার কারণ—দস্যু-ভীতি হইতে পারে। বঙ্গদেশে আসিলে জাতিচ্যুতি ঘটিবে, নিজ সমাজে চলিতে পারা যাইবে না, বঙ্গদেশেই চিরদিনের জন্য থাকিতে হইবে,—এই মনে করিয়াই ব্রাহ্মণেরা সপরিবারে আসেন। গুরুকে জন্মের মত দেশত্যাগী হইতে দেখিলে, ভক্ত শিষ্যের প্রাণ সহজেই কাঁদিয়া উঠে; তাই তাঁহারাও গুরুর সঙ্গে দেশত্যাগ করিলেন। কাজেই তাঁহারাও সপরিবারে আসিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনাও কিছু অসম্ভব নহে।

আর একটী কথা;—কায়স্থদিগের উপনয়ন-সংস্কার-চ্যুতি সম্বন্ধে যে হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত বোধ হয় না,—মুসলমানদিগের আধিপত্য-কালে বাঙ্গালা-দেশের সকল কায়স্থেরাই যে ব্রাত্য হইলেন—এ অনুমানের পক্ষ সমর্থন করা যায় না। অনেক ব্রাহ্মণও নবাব-সরকারে কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা ত সকলেই প্রায় সংস্কার-সম্পন্ন ছিলেন; কায়স্থের পক্ষেই গোলযোগ ঘটিল কেন? এইজন্য আমরা বলি, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত হইলেও বহুকাল হইতে দ্বিজোচিত-সংস্কার-বর্জ্জিত; তবে পশ্চিমে কায়স্থেরা গলায় একটা সূতা দেয় বটে। বাঙ্গালার শাস্ত্রশ্রবণ-পরায়ণ ধার্ম্মিক কায়স্থগণ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় তাহাও ত্যাগ করিয়াছেন।

আমাদের স্থূল কথা এই যে, উত্তম কায়স্থগণ, ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত; কিন্তু বহুকাল ব্রাত্য। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ সত্ত্বেও অনেকে ব্রাত্য। দাল্‌ভ্য-গোত্রীয় কায়স্থগণ চিরকাল উপনয়ন-বর্জ্জিত। বাহাত্তুরে কায়স্থের অনেকেই ঔশনস-ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত নাপিত-সহোদর কায়স্থজাতি, বা অন্য-বিধ অনুলোম বর্ণসঙ্কর। কিন্তু কে যে কি,

তাহা স্থির করা নিতান্ত কঠিন। ক্ষত্রিয়-বংশীয় শূদ্রভাবাপন্ন কায়স্থদিগের সহিতও এই সঙ্কর কায়স্থজাতির সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে ক্ষত্রবংশীয় উত্তম কায়স্থদিগেরও উপনয়ন-সংস্কার হওয়া উচিত নহে। কায়স্থজাতি সম্বন্ধে আমাদিগের কথা শেষ হইল।

বহুদর্শী নগেন্দ্র বাবুকে আমরা আশীর্ব্বাদ করি, আমাদিগের সহিত অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার মতের মিল না হইলেও তিনি যে কায়স্থ শব্দের বিবরণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং অপক্ষপাতের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি। তিনি নিজে কায়স্থ হইয়াও কায়স্থের পক্ষসমর্থক অনেক বচন অমূলক বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এ সকল বচন যে অমূলক, তাহা অপরের পক্ষে নিঃসন্দেহে স্থির করা সাধ্যাতীত। উপসংহারে বক্তব্য এই,—নগেন্দ্র বাবু নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও অপর-কৃত সংস্কৃত-শ্লোকানুবাদগুলি যেন তিনি ভাল করিয়া দেখিয়া দেন।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ভাষা-রহস্য।

মনুষ্য-ভাষার সর্ব্ব-প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন রকম মত প্রচলিত আছে। ১ম—দৈব সৃষ্টি; ২য়—সম্মতি-সৃষ্টি; ৩য়—স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টি। ভাষার দৈব সৃষ্টি বা উৎপত্তি (*Devine origin*) সম্বন্ধীয় মত হিন্দু-শাস্ত্রের ও খৃষ্টীয় বাইবেলের। হিন্দু-শাস্ত্র ও খৃষ্টীয় বাইবেল—উভয়েই বলেন,—"মনুষ্য ভাষা—বিধির বিধান,—দেবতা-প্রদত্ত।" হিন্দু মতে,—সংস্কৃত—"দেব-ভাষা" ও পৃথিবীর আর সমস্ত ভাষা—"দেশভাষা"। কেহ কেহ বলেন, দেব-ভাষা সংস্কৃতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ পূজ্যপাদ পাণিনির মত এই যে, দেবাদিদেব মহাদেব সমগ্র দেবতা ও ঋষি-মণ্ডলীকে উক্ত ভাষা উপদেশ করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক বর্ণমালা হইতে ব্যাকরণের যাবতীয় তত্ত্ব,—"শিক্ষা", "ছন্দঃ শাস্ত্র", কাব্য ও অলঙ্কারাদি সৃষ্ট হইয়া, দেবতা ও ঋষিদিগের সাঙ্কেতিক বিনীত প্রার্থনায় তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। পরন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেলের মত এই যে, "জেভয়া" অর্থাৎ ভগবান্, সৃষ্টির সর্ব্বাদিম মানব ও মানবী আদাম ও ইভ্‌কে, সমগ্র মানবজাতির জন্য একটী ভাষা প্রদান করেন এবং সেই ভাষা আদাম ও ইভের বংশ পরম্পরায় অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মধ্যে ধারাবাহিক চলিয়া আসে। যখন আদাম ও ইভের অগণিত-সংখ্যক বংশধর ও বংশধরীরা সশরীরে স্বর্গে গমন জন্য বাইবেল-বিখ্যাত অত্যুচ্চ ব্যাবেল-মন্দির (*Tower of babel*) নির্ম্মাণ করিলেন ও সেই মন্দিরের চূড়া স্বর্গের প্রায় "কাছাকাছি" পৌছিল, তখন ভগবান্ তাহাদের মধ্যে ভাষা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া এক এক জনের এক এক ভাষা করিয়া দিলেন। আদাম ও ইভের আদি ভাষা ভাঙ্গিয়া শত শত রকমের ভাষা হইল। স্বর্গারোহণের যাত্রীরা তখন পরস্পরের মধ্যে কেহ আর কাহারও কথা বুঝিতে পারিল না; কলহ করিয়া পৃথিবীর অষ্ট দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাইবেলের মতে সেই সময় হইতেই জগৎ-সংসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রথম কল্পনা অর্থাৎ ধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখিত মত গেল এই। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় কল্পনার অর্থ এই যে, আদিম কালে বহুসংখ্যক মনুষ্য সমবেত হইয়া, পদার্থাদির সংজ্ঞা, দ্রব্যাদির নাম,—কোন্ শব্দ উচ্চারণ করিলে কি অর্থ বা কোন্ দ্রব্য বুঝাইবে, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনোপযোগী কথোপকথনের ভাষা সমবেত লোকদিগের সর্ব্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে আপনাদিগের মধ্যে নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই নির্দ্ধারিত ভাষা বা শব্দসমূহ, বাক্যালাপের ব্যবহার-স্রোতে বহু বিস্তার লাভ করিয়া জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। পরন্তু ভাষা-সৃষ্টি সম্বন্ধে তৃতীয় মত—স্বভাবানুকারিণী সংগঠন প্রণালী। এই মত—বৈজ্ঞানিক; অন্ততঃ ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত ও প্রমাণীকৃত অভিমত, ভাষার প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অদ্যাবধি সৃষ্ট বা কল্পিত হয় নাই। বলা বাহুল্য,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই মতেরই আলোচনা করা হইতেছে। যতদূর অবগত আছি, তাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতেও এমতের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় উক্তিতে এক মাত্র সংস্কৃতই "দেব-ভাষা" দেব-ভাষারই উৎপত্তি—দেবানুগ্রহে। নহিলে পৃথিবীর আর আর সমস্ত ভাষাই

"দেশভাষা।" "দেশ-ভাষা" শাস্ত্রানুসারে, দেব-কণ্ঠনিঃসৃত নহে। তাহাদের উৎপত্তি—অনুকরণ-মূলক। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির অনুকরণ, স্বভাব-সঞ্জাত শব্দাদির অনুকরণ,—পশুপক্ষী-উচ্চারিত ঝঙ্কারাদির অনুকরণ; পক্ষান্তরে দেবভাষারও অনুকরণ। হিন্দুমতে, আর্য্য ভিন্ন অন্যান্য জাতির শিক্ষায় পশু-পক্ষীদিগেরও শিক্ষকতা আছে। যাহা হউক ভাষা সৃষ্টি কল্পে স্বভাবানুকরণ কল্পনাই প্রবল এবং প্রমাণ। ভাষার দৈব-সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় মত সমালোচনাধীন হইতে পারে না,—তাহাতে সমালোচনা চলেই না। সর্ব্ববাদি-সম্মতি-মতে ভাষা-উৎপত্তির বিষয় যেরূপ কথিত আছে, তাহা আলোচনা করিলে অগত্যা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, সম্মতি-সৃষ্ট সেরূপ ভাষা-সৃষ্টির পূর্ব্বে, ভাষা-স্রষ্টাদিগের মধ্যে কোনও প্রকার ভাষা ছিল; নহিলে আর তাঁহারা সভা করিয়া শব্দার্থ সৃষ্টি, নিরূপণ বা স্থিরীকরণ করিয়াছিলেন কিরূপে? সুতরাং ভাষা-সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় কল্পনা, ভাষার প্রথম উৎপত্তির উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিদ্ আডাম স্মিথ তদীয় গ্রন্থে উপরোক্ত কল্পনার কতকটা অনুরূপ একটী দৃষ্টান্ত; ভাষা-সংগঠন সম্বন্ধে যাহা দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নয়; কিন্তু তাহা স্বভাবানুকারিতারই পরিপোষক। আডাম স্মিথের সে দৃষ্টান্তটী পদার্থাদির প্রাথমিক নাম-করণ সম্বন্ধে প্রদত্ত। মনে কর,—দুই জন লোক মনুষ্য-ভাষার কোনও কথা শিখিবার পূর্ব্বে,—তাহাদিগকে মনুষ্য সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া এতাদৃশ স্থানে প্রেরণ করা হইল, যেখানে মনুষ্য মাত্রের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার আদৌ কোন উপায় নাই। তাহারা মনুষ্য-বিহীন দেশে, মনুষ্য-সঙ্গ-মাত্র-বিরহিত; মনুষ্য-ভাষা,—কেন কোনভাষাই জানে না; অথচ তাহাদের মনুষ্যোচিত স্বাভাবিক অভাব সকল আছে। মনুষ্যোচিত মন ও বুদ্ধিও আছে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের অভাব ও মনোভাব পরস্পরে বলিবার ও বুঝিবার উপায় কি? উপায় সম্ভবত এই যে, তাহারা অহরহ যে সকল বস্তু দেখে ও যে সকল পদার্থ সর্ব্বদাই তাহাদের প্রয়োজন হয়,—তাহা ইঙ্গিতে ও হস্তাদি-সংস্পর্শে চিহ্নিত করিয়া কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ উচ্চারণ করত তাহাদের এক একটা নামকরণ করে। "নাম-করণ"টা কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ দ্বারা। যে বস্তুটার বা জন্তুটার নাম-করণ করা হয়, সেই বস্তুটা দেখিয়া বা সেই জন্তুটার রব শুনিয়া নামকরণ-কারীদিগের মনে—শঙ্কা বা সন্দেহ, হর্ষ বা বিষাদ, দয়া বা জিজ্ঞাসা—যেরূপ ভাবের উদয় বা তৎসাময়িক উত্তেজনা হয়,—কণ্ঠ হইতে সেইরূপ ভাব-ব্যঞ্জক একটা শব্দ বহির্গত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু একথা পরে বলিতেছি। এখন মনে কর, উপরি উক্ত ব্যক্তিদ্বয় পূর্ব্ব-কথিতরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা কতকগুলি পদার্থের নামকরণ করিল। যে শব্দটী দ্বারা যে দ্রব্যটী সূচিত হইল, সেই দ্রব্যটী দেখিলে সেই শব্দটী স্মরণ হয়, অথবা সেই শব্দটী দ্বারা সেই দ্রব্যটী বলিয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া হয়। একেবারেই কিছু তাহারা বহুসংখ্যক পদার্থের নামকরণ করে নাই; অনিবার্য্য প্রয়োজনানুসারে বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করত দুই চারিটী করিয়া পদার্থের নাম নির্দ্ধারণ করিয়াছে; অতএব তাহা স্মরণ রাখিতে, স্মৃতি-শক্তিরও যে বিশেষ কিছু শ্রম হইতেছে, তাহাও নহে। তথাচ, হয় ত পূর্ব্ব-উচ্চারিত দ্রব্য-বিশেষের নাম-সূচক শব্দটী, পরবর্ত্তী কালে বলিবার সময় ঠিক স্মরণ বা উচ্চারণ হইতেছে না,—অপভ্রংশ হইয়া উচ্চারিত হইতেছে। কোন একটা গাছকে, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট গহ্বরকে, ফলকে, মূলকে, নদীকে, তাহারা যথাক্রমে গাছ, গহ্বর, ফল, মূল, নদী, (অথবা অন্য কোন শব্দ) নাম দিল। তার পর যখন অন্যত্র ঐ সকল বা ঐ সকলের অনুরূপ পদার্থ দেখিতে লাগিল, তখনও ঐ নামে (গাছ, গহ্বর, নদী ইত্যাদি) তাহাদিগকে অভিহিত করিতে লাগিল। তাহারা গহ্বর-মধ্যে পলায়ন করে অথবা হিংস্র-জন্তুর ভয়ে লুক্কায়িত, হয়,—গাছের ছায়ায় বসিয়া রৌদ্র-ক্লিষ্ট দেহ শীতল করে,—ফল-মূল খাইয়া ক্ষুধা-নিবারণ ও প্রাণরক্ষণ করে,—নদীর জল পানে তৃষ্ণা নিবারণ করে; অতএব ঐ সকল দ্রব্য কোন ক্রমেই ভুলিবার নয়। তাহারা এখন গাছ দেখিলে "গাছ" ত বলেই; ছায়া দেখিলেও বলে গাছ। আহার্য্য দ্রব্য মাত্রই এখন তাহাদের নিকট ফল। গৃহ দেখিলেও বলে গহ্বর;—আদি "গহ্বর" শব্দ হইতে "গৃহ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, তাহা কে বলিবে? পরন্তু জলাশয় মাত্রই তাহাদের

নিকট "নদী;—জলকেও হয় ত বলে নদী। এইরূপে ভিন্ন দ্রব্যকে,—সাদৃশ্যের নৈকট্য ও দূরত্ব নির্ব্বিশেষে তাহারা একই নামে অভিহিত করিতে লাগিল। যখন ক্রমে ক্রমে এই প্রক্রিয়া-অনুসারে বহুসংখ্যক জাতিবাচক, গুণবাচক বা ক্রিয়াবাচক শব্দ এবং সংজ্ঞা, বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া সৃষ্ট বা সংগৃহীত হইল, তখন তাহাদের মধ্যে নির্ব্বাচন, মনোনয়ন ও "কাট-ছাট" আরম্ভ হইল। তখন তাহারা বুঝিতে লাগিল যে, বহুতর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সামান্য সাদৃশ্য-জনিত একই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে; অতএব পৃথক্ পৃথক্ নাম হওয়া উচিত ও আবশ্যক; নহিলে কার্য্যোপযোগী কথোপকথনের সুবিধা হয় না। একই শব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল; দ্রব্যের ও দ্রব্য-গুণের সাদৃশ্য ও পার্থক্য-ভেদে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম সমালোচনা এবং প্রথম-সৃষ্ট শব্দ-সমূহের স্ব স্ব শক্তি, মিষ্টত্ব ও উচ্চারণ-সৌকর্য্যানুসারে প্রাকৃতিক ও শৈল্পিক নির্ব্বাচন চলিতে লাগিল; তদ্দ্বারা নূতন শব্দের সংগঠন ও পুরাতনের রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া, ভাষা অল্পে অল্পে উন্নতির দিকে চলিল।

প্রথমতঃ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ নাম হইতে দ্রব্যের সাদৃশ্যানুসারে সাধারণ সংজ্ঞার সৃষ্টি, অর্থাৎ একই নাম সাধারণ ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্রব্যে দেওয়া হয়। সে কিরূপ,—ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তার পর, দ্রব্যের পার্থক্যানুভূতি জনিত, পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ-বাচক পৃথক্ পৃথক্ শব্দ-সৃষ্টি। যেমন মনে কর, প্রথমত হয় ত "নদী" বলিলে জল ও জলাশয় মাত্রই বুঝাইত, কিন্তু যখন সূক্ষ্ম-দর্শনে দেখা ও বুঝা গেল যে, জলাশয় মাত্রই নদী নহে, জলও নদী নহে; তখন, সমুদ্র, সরোবর, হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতির পৃথক পৃথক নাম হইল এবং জলেরও কোনও একটা জলবাচক নাম নির্দ্ধারিত হইল।

পুনশ্চ, স্বভাবানুকরণ দ্বারা, প্রথম কল্পে শব্দ সৃষ্টি কালে, পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপানুসারে একই পদার্থের হয় ত পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্ধারিত হইল;—হওয়াই সম্ভব,—হওয়ার প্রমাণ সকল ভাষাতেই আছে। একই পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ নামের মধ্যে যেটী বা যে গুলি, আত্ম-শক্তি-সমর্থনে শক্ত হইল, সেইটী বা সেইগুলি পরে রহিল,—অবশিষ্ট গুলির অস্তিত্ব লোপ হইল। হয় ত তাহাদের সব গুলিই থাকিয়া গেল। সকল ভাষাতেই একই পদার্থ-বাচক বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ বিদ্যমান আছে এবং বহুসংখ্যক শব্দের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাওয়ারও প্রমাণ আছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, বিশেষত ডারউইন-প্রবর্ত্তিত 'অভিব্যক্তিবাদ' অনুসারে মনুষ্যের মনুষ্য-রূপ ও মনুষ্যত্ব এক দিনের সৃষ্টি নহে; নিম্নতর জীব সৃষ্টি,—ক্রমোন্নতি ও উচ্চতর বিকাশ লাভ করিতে করিতে মনুষ্যে 'অভিব্যক্ত' হইয়াছে। এই অভিব্যক্তি-বাদের আভাস শাস্ত্রীয় গ্রন্থেও না আছে—এমন নয়। কিন্তু তা যাউক। মনুষ্যের ন্যায় মনুষ্যের ভাষাও এক দিনে জন্মে নাই। বহুকাল-ব্যাপী সংগঠন ও পরিবর্ত্তনে উহা বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং সে বিকাশে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টিক্রিয়াই ষোল আনা কার্য্য করিয়াছিল। এ কথা অবশ্য মনুষ্যের সর্ব্ব-প্রথম ও আদিম ভাষা সম্বন্ধে; তার পর ভাষা-বিশেষ হইতে কত কত ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে এবং ভাষা-বিশেষে কত কত স্বতন্ত্র ভাষার শব্দ ও শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু সে কথা এখানে হইতেছে না। এখানে হইতেছে, ভাষার সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে কথা। আদি মনুষ্য যখন বনমানুষ ও পশুর পরপুরুষ বা পরিণতি, তখন মনুষ্য-ভাষার আদি উৎপত্তি অনুসন্ধান কালে, পশু-ভাষাকে সে অনুসন্ধানের বহির্ভূত করা উচিত হয় না। ইদানী বানরের ভাষা লিপি-বদ্ধ করার চেষ্টা হইতেছে বটে এবং তাহার উন্নতি দ্বারা দূর ভবিষ্যতের উপকারেরও সম্ভাবনা। কিন্তু আপাতত তদ্দ্বারা পশুভাষা সম্বন্ধে আমাদের বিশিষ্ট কোনও জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নাই। মনুষ্য-ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধেই নানা কল্পনা,—পশু-ভাষা ত দূরের ও পরের কথা; কিন্তু তথাচ স্বভাবানুকরণ দ্বারা ভাষা-সৃষ্টি ও সংগঠন কালে মনুষ্য তাহার আদি-পুরুষ পশু-পক্ষীদিগের ভাষা উপেক্ষা করে না। উপেক্ষা যে করেনা, তাহা বাক্য-স্ফুটনোন্মুখ শিশুদিগের ভাষাতেই প্রকাশ। প্রথম বাক্যস্ফুরণ কালে শিশুগণ যেরূপ স্বভাব ও শব্দ অনুকরণ করে, মনুষ্য তাহার আদি-ভাষা-সৃষ্টি কালে সেইরূপ অনুকরণ

করে নাই,—কে বলিবে? বিড়াল "মেও মেও" শব্দ করে, বালক তাহার অনুকরণে "মেও মেও" করে। বালকের নিকট বিড়ালের প্রথম নাম "মেও মেও"। "মেও মেও" বলিলে বালক,—বিড়াল বুঝে। "কা-কা" কহিলে "কাক" বুঝে। ইংরেজি *Crow* বা "কা-কা" কাকের অপর নাম; ইংরেজীর আর একটা কথা *Crone* অর্থে বৃদ্ধা ও খেঁকী রকম স্ত্রী-লোক। বৃদ্ধা খেঁকীরা স্বভাবতই বাগ্-ভূলা ও "বদ্‌মেজাজ" সর্ব্বদাই "কাউ কাউ" করেন। কাক বা *crow* হইতে *crone* শব্দ তথা *croak* ও *croon* ও *cross* শব্দ *Peevish* প্রথম কল্পে উৎপন্ন হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? পুনশ্চ কাঙ্গালী, "কল্লর" কর্কশ, করাল প্রভৃতি শব্দ কাকের কা-কা হইতে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা, তাহাই বা কে বলিবে? "কুহু" শব্দ হইতে "কোকিল" ও ইংরেজি *cukoo* উৎপন্ন, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তার পর শৃগালের "ওয়া-হোয়া" রবের অনুকরণে "সার মেয়" এবং তাহার পর শৃগাল ও শেয়াল ও সংস্কৃত শৃগাল হইতে ইংরেজী *Jackal* ও *Ghagal* শব্দ উৎপন্ন, ইহাও ত নিতান্ত অস্পষ্ট নহে। বাতাসের "স্বন্ স্বন্" আওয়াজের অনুকরণে সমীরণ, বায়ু হইতে "হাওয়া" এবং বায়ু ও বাতাস হইতে ইংরেজী *breeze* উৎপন্ন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শত সহস্র শব্দে স্বভাবানুকারিতার ও পশু-শব্দ অনুকরণের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। একটু অনুধাবন ও অনুসন্ধান করিলে অসংখ্য অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। শব্দ-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দ-সাদৃশ্য দেখিয়াই এক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যে ইউরোপীয় ও আসিয়াটিক প্রায় সমস্ত জাতিই আদিম কালে একই জাতি ছিলেন এবং সে জাতির নাম আর্য্য জাতি। এই অভিনব আবিষ্ক্রিয়া আজ্ কাল প্রায় সর্ব্বত্রই সাদরে গৃহীত হইতেছে এবং প্রধানত এই ভিত্তিতেই ইউরোপীয়গণ আপনাদিগকে আর্য্য (*Aryan*) বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দুদিগের সহিত সুদূর জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করিতেছেন। শব্দ-সাদৃশ্যের হিসাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, লাটিন ও গ্রীক, কেলটিক ও টিউটোনিক, লেটিক ও শ্লেবোনিক, হিন্দু ও পারসাক প্রভৃতি জাতি এক মূলোৎপন্ন (আর্য্য) জাতির বংশধর এবং এক মৌলিক ভাষা হইতে এই সকল জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা উৎপন্ন। লাটিন, গ্রীক, কেলটিক প্রভৃতি উপরোক্ত জাতি-নিচয় হইতে আধুনিক ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ ও ইতালীয় প্রভৃতি জাতি উৎপন্ন; অতএব এ হিসাবে ইহাঁরাও আর্য্য-সন্তান। এই বিশাল বংশ-নির্ণয়-ব্যাপার একমাত্র শব্দ-সাদৃশ্য হইতে কল্পিত। মনুষ্যের ভাষা-সমূহ হইতে মনুষ্যের এক জাতিত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে, অথচ সেই সকল ভাষা পরস্পরে কতই বিভিন্ন, কতই বৈচিত্র্যময়। বহুশ বিভিন্নতার মধ্যে কথঞ্চিৎ একতা,—সহস্র স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে স্বল্পমাত্র সাদৃশ্য; তথাচ তদ্দ্বারা এতাদৃশ একটা বৃহৎ আবিষ্কার সম্পন্ন হইয়াছে, যাহাতে করিয়া মনুষ্য-জাতির পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা, লোকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আলোকে অধ্যয়ন করিতেছে। অতএব মনুষ্য-ভাষা, মনুষ্যের ভাগ্য-নির্ণয়কল্পে কিরূপ কার্য্য করে, ইহা বলাই বাহুল্য। মনুষ্য-জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষার শব্দ-সাদৃশ্য হইতে তাহাদের এক-জাতিত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্ত সত্য হউক, আর নাই হউক, ইহা সুনিশ্চিত যে, মনুষ্য-ভাষা মাত্রই স্বভাবানুকরণে সৃষ্ট। স্বভাবানুকরণ সব জাতিই একরূপ ভাবে করে না,—নৈসর্গিক ও পশ্বাদির শব্দও কিছু একই সুরে সকল কর্ণে প্রবেশ করে না; দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা ও অবস্থিতি অনুসারে মনুষ্য-স্বভাবের বিভিন্নতা বটে,—তাহার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াও বিভিন্ন হয়,—দেশ-কালানুসারে স্বয়ং নিসর্গ স্বতন্ত্র-মূর্ত্তি ধারণ করে; অতএব দর্শন ও শ্রবণ এবং দৃষ্ট ও শ্রুত দ্রব্যের পার্থক্য-জনিত অনুকরণের পার্থক্য ঘটে ও তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। তথাচ সেই সকল ভাষার বহু সংখ্যক শব্দের সাদৃশ্য মধ্যে মনুষ্য-স্বভাবের ও স্বভাবানুকারিতার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

মনুষ্য-ভাষার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ শব্দ—"মা" ও "বা"। এই দুইটী শব্দ অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক শব্দ, কোন ভাষাতেই আর একটীও নাই;—এরূপ সুমিষ্ট, সকরুণ, অত্যাবশ্যকীয় ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা-ব্যঞ্জক শব্দও আর তৃতীয়টী নাই। "বা" অথবা "পা" এবং "মা"—এই

শব্দ দ্বয়ের মধ্যে "মা" আবার অধিকতর আকর্ষণীয়। "মা"এর মত মিষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী শব্দ আর দ্বিতীয়টী নাই। এখন এই "মা" ও "পা" কিংবা "বা"—এই দুই শব্দ জগতের সকল ভাষাতেই অভিন্ন, সমান এবং একই রূপ। মনুষ্য হৃদয়ের ঐ স্বত উত্থিত ধ্বনি,—দেশ, কাল, পাত্র ভেদে' কোথাও পরিবর্ত্তিত হয় নাই;—সর্ব্বত্রই সমান ছিল, আছে এবং থাকিবে। বাক্য-স্ফূর্ত্তি' কালে বাঙ্গালী-শিশুর মুখেও "মা",—ইংরেজ-শিশুর মুখেও "মা",—জর্ম্মণের মুখেও "মা"; অসভ্য হটেণ্টট-বালকের মুখেও বোধ করি "মা" ভিন্ন আর কিছু হওয়া সম্ভবে না। ভাষা-মূলক আধুনিক জাতি-তত্ত্ব অনুসারে আসিয়াটিক ও ইউরোপীয়েরা একজাতি ছিলেন,—সে বহু-বহু শতাব্দ পূর্ব্বে, বহু সহস্রাব্দ পূর্ব্বে। হাজার হাজার বৎসর হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা পৃথক্ হইয়াছেন,—জাতি ও জ্ঞাতি সূত্রে বদ্ধ নহেন; অসীম মহা-সাগর তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান। পরন্তু অর্দ্ধ-স্ফুট-বাক্ অপোগণ্ড শিশুদিকেরও কিছু বহুকাল পূর্ব্বের জাতি-জ্ঞাতি-বোধ ও ভাষা-বোধ থাকে না,—তাহারা স্বাভাবিক শব্দ স্বতঃ উচ্চারণ করে। অতএব ভিন্ন ভাষার শব্দ-সাদৃশ্য,—ভিন্ন ভিন্ন জাতির এক জাতিত্বের, এক ভাষার ফল না বলিয়া তাহাদের কর্ত্তৃক স্বভাবানুকারিতার সৌসাদৃশ্যের ফল বলা কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নয়?

সে যাহা হউক, অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কতকগুলি শব্দ-সাদৃশ্য এস্থলে দেখান যাইতেছে;—

সংস্কৃত ...	আবস্তিক ...	পারসীক ...	গ্রীক ...	লাটিন ...	জর্ম্মণ ...	ইংরেজী ...	বাঙ্গালা
মাতৃ	...	মাদর	মাটর	মাটর	মুতের্	মদর,মামা	মা
পিতৃ	পৈতর	পদর	পাটর	পাটর	ফাতের	ফাদর,পাপা,	বাবা
ভ্রাতৃ	ব্রাতর	ব্রাদর	ফ্রাটিয়া	ফ্রাটর	ব্রদের	ব্রদর	ভাই
দুহিতৃ	দুঘ্ধর	দোখতর	থুগাটর	...	টখ্তের	ডটর	দুহিতা
অহম্	অজেম	...	...	...	...	আই	আমি
ত্বম্	তূম	তূ	সূ	টূ	...	দৌ,ইউ	তুমি,তুই;
দ্বি	দব্	দো	ডও	ডুও	...	টূ	দুই
ত্রি*	তিসরো	...	ট্রাইস	ট্রেস,	ত্রাই,	থ্রি	তিন
দদামি	দধামি	দেহম	ডিডোমি	ডো	...	গিভ্	দিই
নৌ,নাব	...	...	নৌস্	নাবিস্	নেকি	†	নৌকা
মাস্ (চন্দ্র)	...	মাহ	মীনী	...	...	মুন	চাঁদ
মাস	...	মাহ	মীন	মেনসিস্	...	মন্থ	মাস
গৌ	...	গাও	...	...	...	কৌ	গরু
উক্ষন্ (বৃষ)	...	গাও-আখ্তা	...	...	...	অক্স	ষণ্ড
অশ্ব	অশপ্	অস্প	...	...	...	হর্স	...
বরাহ	...	শূয়র	...	...	...	বোর্	শোর
ক্রমেল (উষ্ট্র)	...	...	...	কাম্লেস্	...	কেমেল	...
হংস	...	...	...	আন-সর	...	...	...
রাজা,রাজ্ঞী	...	...	...	রেগস,রেগীনা	...	কিং,কুইন্	...

ইত্যাদি

* নয় অবধি সংখ্যা-বাচক শব্দ সব কয়টীই এইরূপ সুসদৃশ।

† ইংরেজীতে রণ-তরী নিচয়ের বা বিভাগের নাম "নেবি"। নৌ বা নৌকা শব্দ স্পষ্টত নদ বা নদী শব্দ হইতে উৎপন্ন।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষায় এই প্রকার বিস্তর সুসদৃশ শব্দ আছে। সংস্কৃত—দ্বার, গ্রীক—থুরা, বাঙ্গালা—দুওর, ইংরেজী—ডোর। সংস্কৃত—বস্ত্র, আবস্তিক—বঁসত্র, লাটীন—বেঁসটিস, গ্রীক—এষ্টীস, গথিক, বঁসটি। সংস্কৃত—সীব (সেলাই), লাটিন—সুও, জর্ম্মন—সিউ, শ্লাভোনিক—সিভু, ইংরেজী—'সু', বাঙ্গালা—সেলাই। সংস্কৃত—মধু (মদ্য), গ্রীক—মেথ্। সংস্কৃত—শর্করা, লাটিন—সাক্কারক, পারসীক—শকর, ইংরেজী—সুগার।

বাঙ্গালা সংস্কৃত-মাতৃক ভাষা। ইংরেজী ভাষাও বহু ভাষা হইতে শব্দ-সম্পদ্ গ্রহণ করত গঠিত হইয়াছে। হইতে পারে, অন্যান্য ভাষাও পরস্পরে শব্দের আদান, প্রদান করিয়াছে;—সংস্কৃত হইতে পারসীক, পারসীক হইতে গ্রীক, গ্রীক হইতে লাটিন, ও লাটিন হইতে ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষা—শব্দ-গ্রহণ ও শব্দের অনুকরণ বা অপভ্রংশীকরণ করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া যে শব্দ-সাদৃশ্য সম্বন্ধে সকল স্থলেই এই কথা প্রযোজ্য ইহার প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন জাতির একজাতিত্বের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাহা নহে।

বলিয়াছি,—বাঙ্গালা-ভাষা সংস্কৃত-মাতৃক; কিন্তু তাহা পরম্পরা সম্বন্ধে। যেহেতু সংস্কৃত হইতে 'প্রাকৃত'; প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা। সংস্কৃত হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও বাঙ্গালা-ভাষার কতক কতক অবয়ব সংগৃহীত। সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন; আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্টু-গীজ প্রভৃতি যাবনিক ভাষার নিকটও বহুশত শব্দের জন্য বাঙ্গালা ঋণী। আজ কাল ইংরেজী হইতেও অজ্ঞাতে ও অল্পে অল্পে বাঙ্গালায় শব্দ গৃহীত হইতেছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বহুতর যাবনিক ভাষা হইতে উপকরণ উপার্জ্জন করিয়া বাঙ্গালা-ভাষা, তাহার বর্ত্তমান অবয়বে পরিণত হইয়াছে বটে; কিন্তু উহা সত্ত্বেও বাঙ্গালা-ভাষার নিজের নিজস্ব ও মূলে কিছু ছিল, এরূপ বিবেচনা করার কারণ আছে। সংস্কৃতাদির নিকট হইতে বাঙ্গালা যাহা পাই-য়াছে, তাহা তাহার স্বোপার্জ্জিত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা পরকীয় সামগ্রী হইতে "স্বোপার্জ্জিত"। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বভাব হইতে স্বোপার্জ্জিত সামগ্রী বাঙ্গালার এক কালেই ছিল না,—এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। বাঙ্গালা-ভাষার নিজের নিজস্ব দেশজ দ্রব্যজাত ছিল, অদ্যাপি তাহার কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। বাঙ্গালা-ভাষা যাহা অপরাপর ভাষারূপ পররাজ্য হইতে উপার্জ্জন বা "ইম্পোর্ট" করিয়াছে, তাহার তুলনায় তাহার নিজস্ব দেশীয় দ্রব্য খুব মলিন, ক্ষীণ বটে; কিন্তু পরকীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠত্বের পেষণে, চিক্কণতায় ও চমকে, তাহার নিজের ঘরের নিজস্ব "ক্ষুদ্র-কোণ" বিপর্য্যস্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাও মহা আক্ষেপের কারণ।

বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথাগুলির একটু বিস্তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সটান উৎপন্ন। সে উৎপত্তির কারণ—বিবিধ। তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এখানে নাই। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তের প্রবর্ত্তক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উক্ত উভয় ভাষা সর্ব্বাংশে অবিকল একরূপ। অর্থাৎ এই দুই ভাষায় কারক, বিভক্তি, ক্রিয়া, রচনা-প্রণালী প্রভৃতির কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; কেবল স্থানে স্থানে শব্দ-বিশেষের বর্ণগত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। যথা—প্রতিকূলঃ = পড়িউলঃ; রাজা = রাআ; ভবন্তি = হোন্তি ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত অনেক সহজ।" * * "সংস্কৃত যেরূপ অতি প্রাচীন বলিয়া প্রথিত, প্রাকৃত তাহা নহে। পাণিনীয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে প্রাকৃতের উল্লেখ মাত্রও নাই। ইহাতে বোধ হয়, তৎ-কালে উহার সৃষ্টি হয় নাই। পরে আধুনিক কালে উহার সৃষ্টি ও ক্রমশঃ প্রবলরূপে আরম্ভ হইলে উহার ব্যাকরণেরও সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। বররুচি, শাকল্য, ভরত, কোহল, বৎসরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি অনেকা-নেক মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাকৃত ব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে; কিন্তু তন্মধ্যে বররুচি-কৃত "প্রাকৃত-প্রকাশকেই" সর্ব্বপ্রথম প্রাকৃত ব্যাকরণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যেরূপ প্রসিদ্ধি, তাহাতে বররুচি* বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন।"

* এই বররুচি, সম্ভবতঃ পাণিনির মহাধ্যায়ী

এ হিসাবে "প্রাকৃতের বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক। সংস্কৃত অতি প্রাচীন। কিন্তু "প্রাকৃত"ও প্রাচীন বটে। খৃষ্টের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজাদিগের সময়ে দেশ মধ্যে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। উহা প্রদেশ-ভেদে মহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি ভাষায় পরিগণিত হইয়াছিল। পালীভাষাও প্রাকৃতের অনুরূপ। মৈথিলীভাষা মাগধীর অপভ্রংশ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রাকৃত ভাষা, (বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য আকারে) কখনও চলিত ছিল কিনা, বলা যায় না। পরন্তু পাণিনিতে প্রাকৃতের উল্লেখ না থাকিলেও প্রাকৃত যে পাণিনির সময়ে একেবারেই ছিল না, তাহা বলা যায় না। কারণ, যে ভাষাই হউক, লিখিবার ভাষা হইতে বলিবার ভাষা প্রায়ই পৃথক্ হইয়া থাকে। স্ত্রীগণের ও অশিক্ষিত সাধারণের ভাষা এবং কথোপকথনের ভাষারূপে প্রাকৃত চিরকালই সংস্কৃতের সাহচর্য্য করিয়াছে—এরূপ অনুমান করাও বোধ করি অযৌক্তিক নহে। কিন্তু ইহা যাউক। সংস্কৃত শব্দ হইতে প্রাকৃত শব্দ এবং তৎপরে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা শব্দ কি প্রণালীতে উদ্ভূত হয়?

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথা পুনর্ব্বার উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

"কঠিন ও দুঃশ্রব ভাষা, জন-সাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না, এইজন্য সেই ভাষাগত সংযুক্ত শব্দ সকলের শিথিলতা সম্পাদন করায় ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে। ঐ শিথিলতাকরণ দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়; এক প্রকার—সম্প্রসারণ, দ্বিতীয় প্রকার—বিপ্রকর্ষণ। 'নদ্যাদি' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ করিয়া 'নদী আদি' করাকে সম্প্রসারণ এবং ধর্ম্ম শব্দের সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া 'ধরম' করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে। এই সম্প্রসারণ-বিপ্রকর্ষণ প্রক্রিয়া দ্বারা দুরুচ্চার্য্য ভাষার সুখোচ্চার্য্যতা সম্পাদিত হয়; নিম্ন-লিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সময়ে অনেক স্থলেই যে, সেই ক্রিয়া বিলক্ষণরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হইবে।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ত্বম্	তুমম্	তুমি
লবণ	লোণ	নূণ
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
শ্মশান	মশাণ	মশান
গৃহ	ঘর	ঘর
স্তম্ভ	খম্ব	থাম্বা বা থাম
চক্র	চক্ক	চাক বা চাকা
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
অদ্য	অজ্জ	আজ
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা
বৎস	বচ্ছ	বাছা
কার্ষাপণ	কাহাবণ	কাহন
হস্ত	হত্থ	হাত
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজুলী
দংষ্ট্রা	দাঢ়া	দাড়া
বহিঃ	বাহির	বাহির
বধূ	বহু	বৌ
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
মধ্য	মজ্‌ঝ	মাঝ
বৃদ্ধ	বুড্‌ঢ	বুড়া
ভক্ত	ভত্ত	ভাৎ
স্নান	হ্নাণ	নাহা
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝা
উপাধ্যায়	উবজ্‌ঝাঅ	ওঝা
		ইত্যাদি।

এই তালিকায় ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা এবং তাহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক দেখা যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ রচনা লিখিবার ভাষায় এই তালিকা ভুক্ত আসল সংস্কৃত শব্দগুলিই বাঙ্গালা শব্দ হইয়া ব্যবহৃত হয় আর ঐ আসল সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত-উদ্ভূত বাঙ্গালা কথাগুলির অধিকাংশ পদ্যে ব্যবহৃত এবং অসাধু ও ইতর ভাষায় "বলা কহা"

নন্দরাজ মন্ত্রী। নতুবা, বিক্রমাদিত্যের বররুচি হইতে প্রাকৃত ভাষা বিশিষ্টরূপ প্রচলিত, তৎপূর্ব্বে অল্প প্রচার ছিল একথা স্বীকার করিলে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ শূদ্রক, 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণে কিরূপে প্রাকৃত-পাণ্ডিত্য দেখাইলেন? এই আপত্তি উঠিতে পারে। অনাবশ্যক বিধায় পাণিনিব্যাকরণে প্রাকৃত ভাষার নাম নাই। কিন্তু ইহারা উৎপত্তি আরও পূর্ব্বে।

জন্মভূমি-সম্পাদক।

হয়। লিখিবার ভাষায় প্রচলিত বাঙ্গালা কথা ছাড়িয়া তাহার স্থলে মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতেছি না; তবে সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, তাহাই কেবল বলিলাম। ফলত একদিকে প্রাকৃত হইতে "কথা-বার্ত্তার" শব্দ যেমন বাঙ্গালায় আসিয়াছে, অপরদিকে বাঙ্গালা লিখিবার জন্য বিবিধ শব্দ সংস্কৃত হইতে আসিতেছে। বাঙ্গালা শব্দ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত ও প্রাকৃত—উভয় হইতেই গৃহীত। অতএব কেবল মাত্র সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালার জন্ম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে নহে,—একথা বলা যায় না পুনশ্চ প্রাকৃতে "ষত্ব" "ণত্ব" বিধানের কিছু মাত্র বিভ্রাট নাই; সর্ব্বত্রই এক দন্ত্য 'স'কার, এক মূর্দ্ধন্য 'ণ'কার এবং এক বর্গীয় 'জ'কার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় "ষত্ব-ণত্বের" বিলক্ষণ "কায়দা কানুন" আছে; আর সে "কায়দা-কানুন" সংস্কৃত হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। তবে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইবার যেরূপ পদ্ধতি, প্রকরণ ও নিয়মাদি আছে, সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সেরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি নাই। কাজেই, কি প্রণালী ও পদ্ধতিক্রমে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ঠিক করা দুষ্কর। অতএব কেবল সংস্কৃত ও প্রাকৃতই যে প্রথম কল্পে বাঙ্গালা-ভাষার উপাদান হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় অনেকেই করেন না। প্রাকৃত, সংস্কৃত ও যাবনিক ভাষার শব্দ-নিচয় বাঙ্গালা-ভাষায় আসিয়া মিশিবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালা-ভাষা বলিয়া একটা স্বতন্ত্র দ্রব্যের কঙ্কাল ছিল,—সে কঙ্কাল কালক্রমে অন্যের রক্ত-মাংসে হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ প্রায় সমস্তই সংস্কৃত-ধাতু-মূলক; কিন্তু প্রাকৃতের অপভ্রংশ। বাঙ্গালা তাহার ক্রিয়াপদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছে। যথা—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ভবতি	হোই	হয়
করোতি	করই	করে
পততি	পড়ই	পড়ে
মৃদ্‌নাতি	মলদ্দি	মলে
	ফেলদ্দি	ফেলে
অস্তি	অত্থি	আছে
নৃত্যতি	নচ্চই	নাচে
কথয়তি	কহই	কহে

ইত্যাদি।

কিন্তু 'র' 'রা' 'এরা' 'কে' 'য়' 'তে' বাঙ্গালার বিভক্তির চিহ্নগুলি বাঙ্গালার নিজের। এ গুলি সংস্কৃতেরও নহে, প্রাকৃতেরও নহে; অন্য কোনও ভাষারও নহে। পরন্তু বাঙ্গালায় এমন কতকগুলি শব্দ প্রচলিত আছে, যাহা সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অন্য কোনও ভাষা হইতে সংগৃহীত নহে;—অন্ততঃ সেরূপ প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। সে শব্দগুলি খুব ইতর শব্দ হইলেও বাঙ্গালা-ভাষার নিজের। যেমন, ঢেঁকি, কুলা, চুচুনী, ধামা, খুঁচি, খোরোল, উনুন, আখা, সরা, আনাজ, কোঁস্তা, কাসুন্দি, জিউলী, জাবর, গোঁড়া, পাতি, ফ'ড়ে, খাতক, বেঙ্গা ("এ বেঙ্গা পিত্তল"—কবিকঙ্কণ) বোলেন, কলিকা, ঝাঁটা, লোসা, চট, বালিশ; ফুসফুসুনী, ফোঁসফোঁসানী, ফোসলান, ফসকান, ফিকির, প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার খাঁটী নিজস্ব দেশজ সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়; 'ফুসফুসুনী' 'ফোঁসফোঁসানী',—শব্দের স্বভাবানুকারিতার চিহ্ন এখনও উহাদের সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে।

বাঙ্গালা-ভাষায় যত কথা আছে, তাহার প্রায় পনর আনা রকম সংস্কৃত। কিন্তু কথা কহার ভাষায় ও প্রাত্যহিক কার্য্যোপলক্ষে আমরা যে তিন চারি শত কথা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার প্রায় অর্দ্ধেকই অপর-জাতীয় ও যাবনিক শব্দ। যেমন, চাকরাণী, দেয়াল, ঝরকা, চিক, রোয়াক, মনিব, দালান, কুলুপ, চাবী, তাগাদা, তহবিল, মাসকাবার, মোহরের, মোহর—এ সমস্তই যাবনিক কথা। জানালা, চাবি ও মাসকাবার—এ কয়টা কথা পোর্ত্তুগীজ; এবং গিরজা, কামরা, নিলাম, আলমারী, কেদেরা, পাদরী, এ কথা গুলাও পোর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। পুনশ্চ, সিন্দুক, লেপ, তাকিয়া, জামিন, তামিল, হুকুম, তাবিজ, মহল—এ সমস্তই আরবী কথা; কিন্তু এখন ইহারা পাকা বাঙ্গালা। তক্তপোষ, বালাপোষ, বালিশ, চাদর, র‍্যাজাই, খুন, খাঁকতি, বাজু, জখম, জামা, পোষাক, মোজা, খুসী, খোসামুদী, দস্তখত, দৌলত, পায়জামা, পায়েজোর, চুটকী প্রভৃতি বাঙ্গালায়

অষ্টপ্রহর ব্যবহার্য্য এই কথা গুলা সমস্তই পার্সী। কাগজ, কলম; জিনিস, জাহাজ—আরবী; কিন্তু মাস্তল—ইংরেজী। এইরূপে আমাদের কথা-বার্ত্তার ও বিষয়-কর্ম্মের ভাষাতে যাবনিক শব্দ অনেক। ফলত ভাষা-সংগঠন-কল্পে যে কত দিক্ দিয়া অনুকরণ চলে এবং কতদিক দিয়া শব্দ' সংগৃহীত হয়, তাহা সবিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করিলেই তবে অনুভূত হয়।

এখন মনুষ্যের সর্ব্বপ্রাথমিক ভাষা সংগঠন-প্রণালী-সম্বন্ধে মোটের উপর এই কয়টী কথা স্মরণীয় যে, (১) স্বভাবানুকরণে শব্দ গঠিত হয়; সকল ভাষাতেই স্বভাবানুকরণ দ্বারা সৃষ্ট বহু সংখ্যক শব্দ আছে। (২) ভাষা সৃষ্ট হওয়ার ও উন্নতি লাভ করার পরও উচ্চশ্রেণীর ভাষা, নূতন-শব্দ নির্ম্মাণকালে সম্পূর্ণরূপে স্বভাবেরই অনুকরণ করে; কারণ শব্দ, ভাবার্থের অনুরূপ হওয়া উচিত; নহিলে তাহার মূল্য অতীব অল্প হয়। ইংরেজীতে একটী বচনই আছে—*The sound must be an echo of the sense*, (৩) অনেক শব্দে স্বভাবানুকরণ চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহার কারণ শব্দাবয়বের ক্রমিক পরিবর্ত্তন বা অপভ্রংশ এবং অণুকরণ প্রণালীর দর্শনের বা শ্রবণের তারতম্য। যেমন আমরা আমাদের বাঙ্গালী-কর্ণে জল-স্রোতের শব্দ শুনি,—কলকল; কিন্তু ইংরেজের ইংরেজী কর্ণে সেই শব্দই শ্রুত হয়,—*Murmur*, এখন দেখ,—কলকলে ও 'মার মারে' কত তফাৎ। এ তফাৎ কর্ণ-ঘটিত। আমাদের কর্ণে যাহা 'স্বন্ স্বন্'; সাহেবদের কর্ণে তাহা *Hissing* আমাদের যাহা 'চুপ' ইংরেজের তাহা *Lush* ইত্যাদি। তারপর (৪) প্রথমে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ যে সকল নাম থাকে, তাহা পরবর্ত্তী সময়ে সাধারণত তত্তৎ দ্রব্যের ভাব বা অবয়বানুরূপ বিবিধ ও বহুসংখ্যক বস্তুতে প্রযুক্ত হইয়া, ক্রমে শব্দ হইতে 'ধাতুতে' পরিণত হয়। এইজন্যই, সকল ভাষাতেই এক একটী ধাতু হইতে বহু-বস্তু-জ্ঞাপক বহু শব্দের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়; প্রত্যেক পদার্থ-জ্ঞাপক স্বভাবানুকৃত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

পাথুরে কয়লা।

কোথা হইতে আসিল?

ভূমির নিম্নে এত কাঠ কোথা হইতে আসিল, যে, কালক্রমে তাহা হইতে অক্সিজেন প্রভৃতি অপরাপর পদার্থ বহির্গত হইয়া পাথুরে কয়লায় পরিণত হইল?—বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পৃথিবী এককালে কেবল বাষ্পময় ছিল। পৃথিবীতে তখন জল ছিল না, মৃত্তিকা ছিল না, কোনরূপ তরল বা কঠিন পদার্থ কিছুই ছিল না; অতি বিস্তৃত গোলাকার বাষ্পরাশি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া তখন কেবল ঘূর্ণিত হইতেছিল। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই বাষ্পরাশি ক্রমে শীতল হইতেছিল। শৈত্যের গুণ—ঘনীভূত-করণ; উষ্ণতার গুণ—প্রসারণ। শীতে নারিকেল-তৈল জমিয়া দৃঢ় হয়, জল জমিয়া বরফ হয়। উষ্ণতায় পুনরায় তাহা গলিয়া প্রসারিত হয়; উষ্ণতায় বরফ গলিয়া জল হয়, উষ্ণতায় জল আরও প্রসারিত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করে। তাই সেই বাষ্পময় পৃথিবী যতই শীতল হইতে লাগিল, ততই তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। নানারূপ মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি তরল ও কঠিন বস্তু-সমুদয় উৎপন্ন হইতে লাগিল। এককালে পৃথিবী কেবল জলেই আবৃত ছিল। তখন মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীব ভিন্ন পৃথিবীতে অপর কোন জীব ছিল না। পৃথিবী ক্রমে আরও ঘনীভূত হইয়া জল ও স্থলে পরিণত হইল। কিন্তু কোমলতা হেতু তখনও পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হয় নাই। এই সময়ে পৃথিবীর স্থল-ভাগ, নিবিড় উদ্ভিজ্জে আবৃত হইল। এই উদ্ভিজ্জ মাটী চাপা পড়িয়া কালক্রমে পাথুরে-কয়লা হইয়াছে।

কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে পাথুরে-কয়লার উৎপত্তি যে একেবারে বন্ধ হইয়াছে, তাহা নহে। কোটি কোটি বৎসর পরে যাহা পাথুরে-কয়লা হইবে, তাহার আয়োজন বোধ হয়, এখনও পৃথিবীতে চলিতেছে। আমাদের সুন্দরবনে পাথুরে-কয়লা উৎপত্তির উপকরণ সমুদয় বর্ত্তমান আছে।

নিবিড় বন আছে, প্রতি বৎসর এই বন, রাশি রাশি পচিতেছে। নদীর ধোয়াটে উদ্ভিজ্জ-শরীর মাটী-চাপা পড়িতেছে। কালক্রমে এই উদ্ভিজ্জ-শরীর হইতে অক্সিজেন বাহির হইয়া যাইবে, কালক্রমে ইহা প্রস্তরের আকার ধারণ করিবে ও তখন ইহা পাথুরে-কয়লা হইবে। এক্ষণে নদীর ধোয়াটে ইহার পর যে বালুকা ও কর্দ্দম পড়িতেছে, কালক্রমে তাহাও প্রস্তর হইয়া যাইবে। বালুকা হইতে যে প্রস্তর হয়, তাহাকে 'বালুকা-প্রস্তর' বলে। ইঁটের ন্যায় তদ্দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। কর্দ্দম হইতে শ্লেট-প্রস্তর উৎপন্ন হয়। সামুদ্রিক শম্বূকাদির খোলা ধ্বংস হইয়া যে প্রস্তর হয়, তাহাকে 'চূর্ণ প্রস্তর' বলে।

যেখানে পাথুরে-কয়লা আছে, সেই খানেই তাহার উপর 'বালুকা-চূর্ণ-শ্লেট' প্রভৃতি প্রস্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে এই বালুকা ও কর্দ্দম, নদীর ধোয়াটে আসিয়া বনকে চাপা দিয়াছিল। এক্ষণে যেখানে পাথুরে-কয়লা আছে, এক সময়ে সেস্থানে ঘন বনাবৃত সুন্দর-বনের ন্যায় নদীর মোহানা ছিল। নদী-মুখ-স্থিত উর্ব্বর কর্দ্দম—ভূমিতে এই বন বহুকাল পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভূমিকম্প দ্বারা হউক, অথবা অন্য কোনও কারণে হউক, বনাবৃত এই ভূমি বসিয়া যায়। তখন সেই ভূমি নিম্ন হইয়া জলমগ্ন হয়। বন মরিয়া যায়। নদী-স্রোতে বনের উপর বালুকা ও কর্দ্দম আসিয়া পড়ে। বালুকা-কর্দ্দম দ্বারা বন আবৃত হইয়া পড়ে। ধোয়াটে ধোয়াটে পুনরায় ভূমি উচ্চ হয়। তাহার উপর পুনরায় উদ্ভিজ্জ জন্মে, পুনরায় সেস্থান ঘোর নিবিড় বনে আবৃত হইয়া পড়ে। বহুকাল পরে পুনরায় সেস্থান বসিয়া যায়। আবার তাহা জলমগ্ন হয়, বন মরিয়া যায়, বালুকার ধোয়াটে আবৃত হয়। অনেক স্থানে কয়লার খনিতে এইরূপ স্তরে স্তরে পাথুরে-কয়লা ও স্তরে স্তরে প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় রকি মাউণ্টেন নামক একটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে; সেই পর্ব্বতস্থিত কয়লার খনিতে এইরূপ ত্রিশটী পাথুরে-কয়লার স্তর আছে। সুতরাং ইহাতে প্রতীয়-মান হইতেছে যে, যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে ত্রিশ বার এই ভূমি বসিয়া জলমগ্ন হইয়াছিল, ত্রিশবার ইহার উপর নিবিড় বন জন্মিয়াছিল, ত্রিশবার নদীর ধোয়াটে এই বন মাটী-চাপা পড়িয়াছিল। কলিকাতায় যখন শিয়ালদহ ষ্টেশন হয়, তখন মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে বন বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। বনের বৃক্ষাদি অবশ্য মরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মাটী-চাপা থাকিয়াও বৃক্ষগণ স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। কাল-ক্রমে এই বৃক্ষ-কাষ্ঠ পাথুরে-কয়লায় পরিণত হইত। অনেক পাথুরে কয়লার খনিতে কয়লা-রূপ প্রাপ্ত এইরূপ দণ্ডায়মান বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে আবার ফাঁপা বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বনে থাকিতে এইরূপ ফাঁপা বৃক্ষ গুলির ভিতরের কাঠ পচিয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল। বাহিরে কেবল কাঁচা ছাল ছিল, তাহাতেই বৃক্ষ জীবিত ছিল। এমন সময় ভূমি বসিয়া যাইল, বৃক্ষটী জলমগ্ন হইয়া মরিয়া গেল। সেস্থানে নদীর ধোয়াট আসিয়া পড়িতে লাগিল। নদীর বালি বৃক্ষ-কোটরে প্রবেশ করিল, বাহিরে ছালের দ্বারা আবৃত রহিল। কালক্রমে ছাল-ভাগটী পাথুরে-কয়লায় পরিণত হইল, অভ্যন্তরস্থ বালুকা প্রস্তর হইল কয়লার খনির ভিতর লোকে এই প্রস্তর-রূপ বৃক্ষকে থাম করিয়া রাখে। কখনও কখনও বাহিরের সামান্য কয়লার আবরণ, ভিতরের বালুকা-প্রস্তরের ভার সহ্য করিতে পারে না, থামটী ঝুপ করিয়া পড়িয়া যায়; তখন কাছে যাহারা থাকে, তাহারা আঘাতে হত বা আহত হয়। পূর্ব্বকালে যেরূপ ভূমি বসিয়া বন জলমগ্ন হইয়া ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রোথিত হইয়া পাথুরে-কয়লা হইয়াছিল, এক্ষণেও সেইরূপ মাঝে মাঝে নানা স্থানে ভূমি বসিয়া, যাওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু-নদের মুখে ভূমিকম্প হইয়া অনেক ভূমি এইরূপ বসিয়া গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূরে ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ, ৮ ক্রোশ প্রস্থ, সাত হাত উচ্চ হইয়া এক খণ্ড ভূমি উত্থিতও হইয়াছিল। এখানকার লোকে আজ পর্য্যন্ত এই উত্থিত ভূমিখণ্ডকে "আল্লা-বাঁন্ধ" বলে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় 'মিসিসিপি' নদীর মুখে নিবিড় বনাবৃত একটী প্রদেশ এইরূপে বসিয়া গিয়াছিল। পাঁচ বৎসর গত হইল, যবদ্বীপে ভূমিকম্প হইয়া অনেক ভূমি এইরূপে সমুদ্র-গর্ভ-নিহিত হইয়া গিয়াছিল।

আজ প্রায় একমাস হইল, ফিলিপাইন দ্বীপেও এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছে। এই সকল ভূমির উপর যে বন—বৃক্ষ আছে, ক্রমে তাহা মৃত্তিকা দ্বারা প্রোথিত হইয়া যাইবে। বনের কাষ্ঠ কালক্রমে প্রথমে লিগনাইট, পরে পাথুরে-কয়লা হইবে। পৃথিবীস্থ সমুদয় পাথুরে-কয়লা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে।

কয়লা কারে বলে।

অনেক স্থানে প্রোথিত উদ্ভিজ্জ-শরীর কয়লারূপ ধারণ করিয়াও এত অধিক মৃত্তিকা ও কর্দ্দমে মিশ্রিত হইয়া থাকে যে, তাহাকে প্রকৃত পাথুরে-কয়লা বলিতে পারা যায় না। উদ্ভিজ্জের ভাগ অধিক ও কর্দ্দমাদির ভাগ অল্প থাকিলে তাহাকে জ্বালাইতে পারা যায়, তাহাকে চুয়াইয়া মৃত্তিকা-তৈলও বাহির করিতে পারা যায়। এরূপ পদার্থকে বিটুমিনস শেল বলে। উৎকৃষ্ট বিটুমিনস শেল ও নিকৃষ্ট পাথুরে-কয়লায় বিভিন্নতা অতি সামান্য। এত সামান্য, যে, এরূপ পদার্থকে নিকৃষ্ট কয়লা বলা উচিত কি উৎকৃষ্ট শেল বলা উচিত, এই কথা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। "পাথুরে-কয়লা কারে বলে,বা 'শেল' কারে বলে? এই কথা লইয়া বিলাত ও ক্যানাডায় কয়েক বার ঘোরতর মোকদ্দমা হইয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্কটলাণ্ড-দেশীয় একজন জমিদার আপনার জমিদারীতে কয়লা তুলিবার নিমিত্ত এক জনকে ২৫ বৎসরের নিমিত্ত পাট্টা দিয়াছিলেন। পাট্টাদার সেই ভূমি হইতে এক প্রকার পদার্থ তুলিয়া গ্যাস-কয়লা বলিয়া বেচিতে লাগিলেন। জমিদার বলিলেন,—"আমি তোমাকে কেবল কয়লা তুলিবার নিমিত্ত পাট্টা দিয়াছি, অন্য পদার্থ তুমি তুলিতে পারিবে না। যে পদার্থ তুমি তুলিতেছ, তাহা কয়লা নহে; তাহা বিটুমিনস্ শেল।" পাট্টাদার বলিলেন যে, "সে পদার্থ বিটুমিনস্ শেল নহে, তাহা পাথুরে কয়লা।" জমিদার আদালতে নালিশ করিলেন ও এই বিবাদ-ভঞ্জনের নিমিত্ত উভয় পক্ষ সহস্র সহস্র টাকা মোকদ্দমায় ব্যয় করিতে লাগিলেন। ১৮৫৩ সালে এডিনবর্গ নগরে এই কথার আদালতে বিচার হয়। বিলাতের ছয় সাত জন মহা মহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। "নানা মুনির নানা মত।" সুতরাং পণ্ডিতেরা সেই পদার্থকে কেহ বলিলেন,—'শেল,' কেহ বলিলেন, 'কয়লা।' বিচারে জজ সাহেব পদার্থটীকে কয়লা বলিয়া পাট্টাদারকে ডিক্রী দিলেন। রায়ে তিনি এই কথা লিখিলেন,—"কারে কয়লা বলিতে পারা যায়, কারে শেল বলিতে পারা যায়, এ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। সে নিমিত্ত এ দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মত আমি জিজ্ঞাসা করি। পণ্ডিতগণ আমার আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। একমত হইয়া তাঁহারা এ কথার মীমাংসা করিতে পারিলেন না।" এডিনবর্গ নগরে আরও দুই একবার এই প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ক্যানাডা দেশেও একবার এইরূপ কথা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এক স্থানে অতি বিস্তৃত-ভাবে স্থিত দ্বাদশ হাত গভীর এক প্রকার খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। সে পদার্থটী কয়লা বলিয়া ভূস্বামী তাহার উপর আপনার অধিকার স্থাপনের বাঞ্ছা করেন। প্রজা বলেন যে, সে বস্তু কয়লা নহে, ভূস্বামীর তাহার উপর কোনও অধিকার নাই। অবশেষে এই কথা লইয়া আদালতে ঘোরতর মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মোকদ্দমায় উভয়ের প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়। প্রথম বারে জুরিগণ স্থির করেন যে, সে পদার্থ অ্যাস্ফাল্টম। মোকদ্দমা পুনর্বিচার হয়। সেবারকার জুরিগণ বলেন যে, "না, পদার্থটী কয়লা বটে।" যেমন এডিনবর্গের মোকদ্দমায় বিলাতের যাবতীয় ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিতে আসিয়াছিলেন, তেমনি ক্যানাডার মোকদ্দমাতেও দেশ-দেশান্তর হইতে রাসায়নিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিধান দিতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলেও সেই পুরাতন কথা ফলিল,—"নানা মুনির নানা মত!" পাঠকগণ! "পদার্থটী পাথুরে-কয়লা কি পাথুরে-কয়লা নয়।" এই সামান্য প্রত্যক্ষ বিষয় লইয়াও দেখুন,পণ্ডিতে পণ্ডিতে কত বিবাদ, কত তর্ক বিতর্ক। সকল কথা লইয়াই পৃথিবীর সকল স্থানেই জানিবেন—এই ভাব।
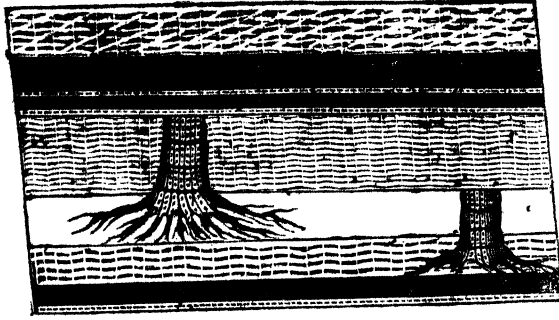
কি ভাবে থাকে।

পাথুরে কয়লা কি ভাবে মাটীর ভিতর থাকে, তাহা এই ছবি দুই খানি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ছবিতে যে কাল দাগগুলি রহিয়াছে তাহাই কয়লার স্তর। দ্বিতীয় ছবি খানিতে দুইটী বৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে, সে বৃক্ষ এক্ষণে পাথুরে কয়লা হইয়া গিয়াছে। কোনও স্থলে পাথুরে কয়লা পৃথিবীর উপরেই দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কোনও স্থানে ইহা পৃথিবীর এত গভীর দেশে অবস্থিতি করে যে, মনুষ্য সেখানে যাইতে পারে না। কালক্রমে এই ভূগর্ভ-নিহিত কয়লা আরও উপরে উঠিতে পারে। তখন মনুষ্য ইহা তুলিতে পারিবে। পৃথিবীর নীচে কয়লা স্তরে স্তরে থাকে। নিম্নে মৃত্তিকা, তাহার উপর এক স্তর কয়লা, তাহার উপর বালুকা-প্রস্তর চুর্ণ-প্রস্তর বা লৌহ-প্রস্তর, পুনরায় মৃত্তিকা, পুনরায় কয়লা, পুনরায় প্রস্তর ইত্যাদি। এক একটী কয়লার স্তর এক ইঞ্চি হইতে ২৫ হাত বা তাহারও পুরু হইতে পারে। সচরাচর কিন্তু এক একটী স্তর চারি পাঁচ হাতের অধিক স্থূল হয় না। একবারের বন পচিয়া এইরূপ স্থূল হইবারই সম্ভাবনা। যেখানে কুড়ি পঁচিশ হাত স্থূলতা দৃষ্ট হয়, সেখানে বোধ হয়, দুই তিনটী স্তর কোনও কারণে একীভূত হইয়া গিয়া থাকিবে। কয়লার স্তর এক হাতের অধিক পুরু না পাইলে তুলিয়া লাভ হয় না।
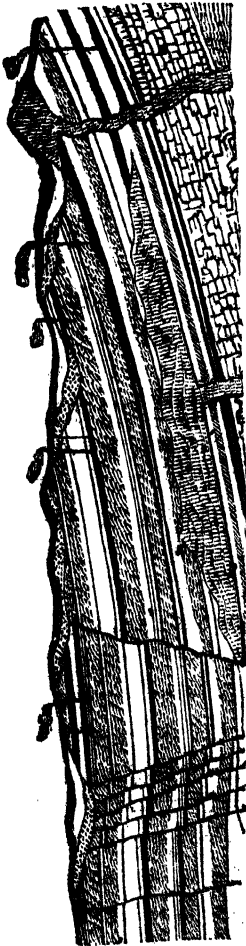
কয়লার জাতি।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পাথুরে কয়লা সচরাচর দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে, অ্যান্‌থ্রাসাইট ও বিটুমিনস্। ভাল মন্দ গুণে ইহাদিগের আবার নানা বিভেদ আছে। বিটুমিনস্ অপেক্ষা অ্যানথ্রাসাইট অধিক প্রস্তরবৎ অধিক ধাতুবৎ, অধিক ভারি। ইহা হাতে করিলে হাতে কালি লাগে না, দেখিতে ইহা উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণ। এ কয়লায় শীঘ্র অগ্নি ধরাইতে পারা যায় না, কিন্তু একবার ধরিয়া উঠিলে ইহা হইতে প্রখর উত্তাপ বাহির হইতে থাকে। অ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লা হইতে ধূম নির্গত হয় না, ধাতব প্রস্তর গলাইয়া লৌহ প্রভৃতি ধাতু বাহির করিতে ও বাষ্পীয় কল চালাইবার নিমিত্ত জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে সচরাচর ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কয়লায় ১০০ ভাগে ৮০ হইতে ৯৫ ভাগ কারবণ থাকে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই কয়লা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লা শিখা যুক্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয় না, তৈল, আলকাতরা প্রভৃতি পদার্থ ইহাতে একেবারেই থাকে না।

বিটুমিনস্ কয়লার নানা জাতি আছে। ইহার সহিত বিটুমেন, মৃত্তিকা তৈল, আলকাতরা প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহাকে বিটুমিনস কয়লা বলে। ইহার সহিত তৈল প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া এই কয়লা শিখাযুক্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়। ক্যানেল কোল বলিয়া এক প্রকার বিটুমিনস্ কয়লা আছে, পুড়িবার সময় তাহা হইতে চট্‌পট্ করিয়া শব্দ বাহির হয়। ক্যানেল কয়লায় বিটুমেন প্রভৃতি পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে। এ কয়লার আবার নানা জাতি আছে। এক প্রকার ক্যানেল কয়লা আছে, তাহা দেখিতে ঠিক কৃষ্ণবর্ণ মারবেল প্রস্তরের ন্যায়। ইহা কাটিয়া লোকে মালা, গহনা, বাক্স, দোয়াত প্রভৃতি বস্তু প্রস্তুত করে। মারবেল প্রস্তরের মেজের ন্যায় ইহা হইতে বড় বড় টেবেলও প্রস্তুত হইতে পারে। ক্যানেল কয়লার এ গুণ পূর্ব্বে লোকে জানিত না। এক বার বিলাতের এক জন বড় মানুষ ইহা হইতে থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি বাসন প্রস্তুত করিয়া বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এই বাসনে পান ভোজন করিলেন। আহারান্তে বড় মানুষ, সমুদয় বাসনগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। চট্‌পট্ শব্দ করিয়া বাসনগুলি পুড়িতে লাগিল। বন্ধুবর্গ তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। আলোকের নিমিত্ত ক্যানেল কয়লা হইতে উৎকৃষ্ট গ্যাস প্রস্তুত হয়। ইহাকে চুয়াইয়া লোকে মৃত্তিকা-তৈল ও (*Paraffin*) প্রস্তুত করে। স্কট্‌লাণ্ড, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ক্যানেল কয়লা প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হইয়া থাকে।

রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে যে কয়লা আনীত হয়, ইহাকে "সাধারণ কয়লা" বলে। ইহা দিয়া আমরা পাঁজা পোড়াই ও ইহা হইতে যে কোক্ কয়লা প্রস্তুত হয়, তাহা দিয়া আমরা রন্ধনাদি-কার্য্য নির্ব্বাহ করি। ইহা এক প্রকার বিটুমিনস্ কয়লা।

যে বৃক্ষ-কাষ্ঠ এখনও সম্পূর্ণভাবে কয়লা রূপে পরিণত হয় নাই, তাহাকে লিগনাইট বলে। জ্বালাইবার নিমিত্ত অনেক দেশে লিগনাইটও লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে কিন্তু কার্ব্বণের ভাগ অল্প; এক শত ভাগে ৫০ হইতে ৭০ ভাগ। অবশিষ্ট অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন। কারর্ব্বণের ভাগ ইহাতে অল্প বলিয়া, প্রকৃত কয়লার ন্যায় ইহা ততদূর কার্য্যোপযোগী নহে। কিন্তু যে দেশে ভাল কয়লা নাই, আর যেখানে কাঠের অভাব, সেখানে কাজেই লোককে লিগনাইটের আদর করিতে হয়। জর্ম্মাণী দেশে লোকে লিগনাইট হইতে মৃত্তিকা-তৈল, আলকাতরা প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

নানা দেশের কয়লা।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাথুরে কয়লা আছে। কিন্তু সকল স্থানের চেয়ে বিলাতে ও আমেরিকায় ইহা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা নহে। বিলাতের কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। এখানকার কয়লায় কারবণের ভাগ অধিক, ধাতু ও বাষ্পের ভাগ অল্প। সুতরাং ইহা হইতে ছাই অধিক বাহির হয় না। কার্ব্বণ

অধিক থাকা প্রযুক্ত এই কয়লা হইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপ বাহির হয়। সুতরাং বাষ্পীয় যন্ত্র চালাইবার নিমিত্ত ইহা বিশেষরূপে কার্য্যোপযোগী। আর লৌহকণা-মিশ্রিত প্রস্তর বা মৃত্তিকা গলাইয়া তাহা হইতে এই কয়লা দ্বারা লৌহ সুচারুরূপে বাহির করিতে পারা যায়। বিলাতবাসীদিগের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের দেশে, যেখানে পাথুরে কয়লা, সেই খানেই আবার প্রচুর পরিমাণে লৌহ-প্রস্তর আছে। এই দুই বস্তুর সহায়তায় এবং আপনা-দিগের বিক্রম ও বুদ্ধিবলে বিলাতবাসীরা এরূপ প্রতাপান্বিত হইয়াছেন। কালক্রমে এই দুই বস্তু, বিশেষতঃ পাথুরে কয়লা, পাছে সব খরচ হইয়া যায়, সে জন্য এখন হইতে বিলাতের লোকে চিন্তিত হইয়াছেন। পাথুরে কয়লা সব খরচ হইয়া যাইবার ভয় আপাততঃ কিন্তু কিছু নাই। তাঁহাদের দেশের মাটীর ভিতর এখনও যা পাথুরে কয়লা প্রোথিত আছে, তাহাতে অভাব পক্ষে তিন চারি শত বৎসর চলিতে পারিবে। কিন্তু তবুও এখন হইতে তাঁহাদের ভাবনা হইয়াছে যে, তিন চারি শত বৎসর পরে পাথুরে কয়লার অভাবে আমাদের দেশের হয় তো দুরবস্থা হইবে। সে নিমিত্ত কত লোকে কত চিন্তা করিতেছেন। অনেকে এখন হইতে কেরোসিন তেল জ্বালাইয়া কল চালাইবার পরামর্শ করিতেছেন। অনেকে এইরূপ কল প্রস্তুতও করিতেছেন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বিলাতে মাটির নীচে এখনও ৪,১০,১৩৭ কোটি মন কয়লা নিহিত আছে। পৃথিবীর উপর হইতে তিন সহস্র হাত নিম্ন পর্য্যন্ত যে কয়লা আছে, তাহারই হিসাব হইয়াছে। তাহার নীচে যে কয়লা আছে, তাহা আর তুলিতে পারা যায় না।

ফরাশি দেশে অধিক কয়লা নাই। চারি পাঁচ স্থানে কেবল কয়লার খনি আছে। তাহা হইতে এ দেশের লোক প্রতিবৎসর প্রায় পঞ্চাশ কোটি মন কয়লা তুলিয়া থাকে। ফরাশি দেশে প্রতি বৎসর যে কয়লা খরচ হয়, তাহা দেশীয় কয়লা হইতে চলে না। বেলজীয়ম, প্রুশীয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আরও কুড়ি কোটি মণ আমদানি করিতে হয়। বেলজীয়ম একটী অতি ক্ষুদ্র সামান্য দেশ। কিন্তু বেলজীয়ম দিয়া যাইবার সময় আমি অনেক কয়লার খনি দেখিয়াছিলাম। বেলজীয়মের যে প্রদেশে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা কিছু অধিক বড় নয়, ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ ২॥ ক্রোশ প্রস্থ ইহার অধিক হইবে না। কিন্তু এখানকার খনিতে কয়লার স্তর গুলি খুব স্থূল, সুতরাং তাহা হইতে অনেক কয়লা উঠিয়া থাকে। প্রতিবৎসর বেলজীয়ম দেশে প্রায় ৬০ কোটি মণ কয়লা উৎপন্ন হয়। জর্ম্মাণি দেশে নানা স্থানে কয়লা আছে। ওয়েষ্টফ্যালিয়া প্রদেশে কয়লা ভূমির পরিমাণ প্রায় পাঁচ শত ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রস্থ। জর্ম্মাণি দেশে প্রতিবৎসর প্রায় ১৩৫ কোটি মন কয়লা উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রীয়া দেশে অধিক কয়লা নাই। তবে এখানে এক্ষণে কাঠের বড় অপ্রতুল হইয়াছে। সে জন্য লোকে লিগনাইট, শেল ও নানারূপ নিকৃষ্ট কয়লা মাটীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া ব্যবহার করিতেছে। অষ্ট্রীয়া দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ২৪ কোটি মণ কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে। স্পেন দেশে অতি উৎকৃষ্ট কয়লা আছে। কিন্তু এ দেশে শাসন-প্রণালীর দোষে এখনও ইহা মনুষ্যের উপকারে আসে নাই। ইটালির কোনও কোনও স্থানে উত্তম অ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লা আছে। কিন্তু এখানকার লোকে এখনও ইহা ভালরূপে তুলিতে পারে নাই। ইটালি দেশে, ভূমধ্য সাগরের কূলবর্ত্তী স্থান সমূহে লিগনাইট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। নরওয়ে ও সুইডেন দেশে কয়লা-ভূমি আছে। কিন্তু এখনও এ দুই দেশে কাঠের অপ্রতুল হয় নাই। সুতরাং কয়লা তুলিতে লোকে বড় যত্ন করে না। রুষদেশে নানা স্থানে অতি বিস্তৃত কয়লা-ভূমি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু পোলাণ্ড হইতেই অধিক পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হয়। রুষদেশের অপরাপর অংশের কয়লা-ভূমি এখনও পতিত রহিয়াছে। যেরূপ বিলাতে, আমেরিকাতেও সেইরূপ অতি বিস্তৃত কয়লা-ভূমি আছে। এখানকার কয়লাও অতি উৎকৃষ্ট। এই কয়লার সহায়তায় আমেরিকার লোকেও প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ডাক্তার লিভিংষ্টন আফ্রিকার নানা স্থানে কয়লা দেখিয়াছিলেন। জ্যামবেজী নামক স্থানের কয়লা-ভূমি হইতে তিনি স্বর্ণরেণু আহরণ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া দেশে নানা স্থানে একণে

প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। কিন্তু স্বর্ণ আহরণ করিয়া এখানকার লোকে বিপুল ধনশালী হইয়াছেন; সুতরাং কয়লা তুলিতে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন নাই। কিন্তু যেখানে যতই কয়লা থাকুক না কেন, চীন দেশের কয়লা ভূমির বিস্তৃতি শুনিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। যে দুই এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত এখানকার কয়লা-ভূমি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ইহার পরিমাণ দুই লক্ষ বর্গক্রোশ। আর চীন দেশে মাটীর নীচে যে কয়লা আছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট কয়লা। কয়লার স্তর প্রায় ২০ হাত স্থূল। কিন্তু এরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট কয়লা থাকিলে কি হইবে? এখানকার মানুষেরা তাহা তুলিতে বা ব্যবহার করিতে জানে না। এই কয়লা-ভূমির উপর কাষ্ঠের ঘোরতর অপ্রতুল। গাছ কাটিয়া কাটিয়া গাছ নির্ম্মূল হইয়াছে। বৃক্ষাভাবে দেশ মরুভূমি-তুল্য হইয়াছে। রন্ধনাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকে অতি পরিশ্রমের সহিত ঘাসের গোড়া গুলি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া আহরণ করে। অথচ মাটীর নীচে এত কয়লা বৃথা পড়িয়া রহিয়াছে যে, সে কয়লা দ্বারা সমস্ত চীন দেশকে শত শত বৎসর পর্য্যন্ত রাবণের চিতার ন্যায় জ্বালাইতে পারা যায়। লক্ষ্মী সর্ব্বত্রই বিরাজমানা, তবে কেহ বা ভক্তিভাবে তাঁহাকে মস্তকে রাখে, আর কেহ বা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলে! চীনের তাই অবনতি, ভারতের তাই অবনতি, আর ইউরোপবাসীরাও আজ তাই লক্ষ্মীর বরপুত্র।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিম বাবুর সমুদ্র যাত্রা।

প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র বাহাদুর সমুদ্র-যাত্রার অনুকূলে মত দিয়াছেন এই লইয়া ইংরেজী-বাঙ্গালা সংবাদপত্র-মহলে বেশ আন্দোলন চলিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর এই প্রকার মত দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। বস্তুগত্যা কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি এবং তত্ত্ববিদ্ মাত্রেই জানেন,—সমুদ্র-যাত্রায় মত আর কাহারও না হউক, সুরেন্দ্র বাবু, ডব্লিউ, সি, বানার্জি, বঙ্কিম বাবু, রমেশ দত্ত প্রভৃতি কতিপয় বাবু-সাহেবের হইবে। সুতরাং যাঁহারা সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির সমুদ্র-যাত্রা পক্ষ-সমর্থনে বিস্মিত নহেন, বঙ্কিম বাবুর ঈদৃশ মত দেখিয়া তাঁহাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে।

কথাটার আন্দোলন হওয়ায় অনেক 'বিষয়ী' লোক, এ সম্বন্ধে আমাকে মৌখিক ও লিপি দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উত্তর না দিয়া বঙ্কিম বাবুর উক্তি-সম্বন্ধে আমার যাহা মত, তাহা এই স্থলেই প্রকাশ করিলাম।

বঙ্কিমবাবু, যে প্রধান ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্র-যাত্রার পক্ষ-সমর্থন করিয়াছেন, তাহা এই;—

"হিন্দুধর্ম্মের উপদেষ্টা ধর্ম্মশাস্ত্র নহে।"

এতৎসম্বন্ধে এক যুক্তি,—

"হিন্দুধর্ম্ম সনাতন, ধর্ম্মশাস্ত্রের স্র ঋষিগণ স্বষ্ট শাস্ত্র দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের অনুশাসন হইতে পারে না।"

অপর যুক্তি,—

"মহাভারত-কর্ত্তা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, তাহাও ধর্ম্মের অন্তর্গত না হইয়া অধর্ম্মের—অকার্য্যের, অন্তর্গত হইতেছে; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রকে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিলে, মহাভারত-কর্ত্তা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মিথ্যাবাদী বলিতে হয়, তাহা কোন্ হিন্দু স্বীকার করিবে? অতএব শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম; ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্ম-নির্দ্দেশক নহে।"

শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম;—

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৬৯ অঃ, ৫৯ শ্লোক।

অর্থাৎ "ধর্ম্মই লোক-ধারণ (লোকরক্ষা) করেন; ধারণ করেন বলিয়াই পণ্ডিতেরা তাঁহার ধর্ম্ম এই নাম দিয়াছেন, যাহাই লোকরক্ষা-কর, তাহাই ধর্ম্ম।"

"যাহা লোক হিতকর তাহাই ধর্ম্ম।"

এইরূপে বঙ্কিমবাবু শাস্ত্রবর্জ্জন এবং ধর্ম্মলক্ষণ করিয়া এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—"সমুদ্র-যাত্রা যখন লোক-হিতকর, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও

ধর্ম্মসঙ্গত। ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। সঙ্কীর্ণমত ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের অনুসরণ করাই উচিত। অতএব সমুদ্র-যাত্রা কর্ত্তব্য।"

বঙ্কিমবাবুর এই যুক্তিদ্বয়ে তাঁহার প্রতিভার কিছুমাত্র পরিচয় নাই। ক্রমে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে,—

১। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন বটে, তাই বলিয়া ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র যে তাহার জ্ঞাপক হইতে পারে না, এ কথা বলা যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও নিত্যের জ্ঞাপক অনিত্য—ইহা নূতন নহে। অনেক অনিত্য, নিত্যের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। যেমন ঈশ্বর নিত্য; কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি অনিত্য-কার্য্য, তাঁহার জ্ঞাপক;—পরমাণু নিত্য; স্থূল মৃৎপিণ্ড, জল, বায়ু, তেজঃ,—অনিত্য হইলেও সেই পরমাণুর স্বরূপ-জ্ঞাপক;—সেইরূপ, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্মের যাহা স্বরূপ, ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহারই প্রকাশ আছে মাত্র। নতুবা ধর্ম্মনির্ম্মাণ ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক হয় নাই। এইজন্যই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গ-মিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥"

১ম অধ্যায়।

পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যাকরণাদি সহিত চতুর্ব্বেদ, ধর্ম্মের আশ্রয়। অর্থাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ ইহাতেই বর্ণিত।

ধর্ম্মের লক্ষণ-কীর্ত্তন, ধর্ম্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশ করাতে যদি ধর্ম্মের সনাতনত্ব ব্যাহত হয়, তাহা হইলে, বঙ্কিম বাবুর উদ্ধৃত ঋষিপ্রণীত মহাভারতের শ্লোকেও ত ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ আছে, তবে ধর্ম্মের সনাতনত্ব থাকিল কিরূপে? অতএব "সনাতন ধর্ম্ম, ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদিষ্ট হইতে পারে না"—এপ্রকার যুক্তি নিতান্ত অসার।

বঙ্কিম বাবুর পক্ষ হইতে যে এক আপত্তি করা যায়;—

"ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ, কিরূপ ধর্ম্ম মানিতেন, তাঁহারা ত ধর্ম্মশাস্ত্র দর্শন করেন নাই। ধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয় তাঁহারা অবশ্যই অন্যরূপ করিতেন। সেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-বর্ণিত ধর্ম্ম যদি বিভিন্নই হইল, তবে ধর্ম্মের সনাতনত্ব রক্ষা হইল কৈ?"

তাহার উত্তর।

(১)

"বেদ নিত্য; বেদে ধর্ম্মের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদেরই গূঢ়-তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ, বেদানুসারে, বেদের নিগূঢ় মর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতেন। ক্রমে, এক একজন ঋষি, ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া সেই পূর্ব্বনির্ণীত ধর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাপর কালে ধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ধর্ম্ম, সনাতন বটেন।"

(২)

"যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম্ম"—এই উক্তি মহাভারতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে লোকে কোন্ ধর্ম্মপালন করিত। যদি অপর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, ধর্ম্ম সনাতন হইল কিরূপে? আর এই রূপ ধর্ম্মনির্ণয় পূর্ব্বাবধিই আছে, ইহা স্বীকার করিলে, ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ণীত ধর্ম্মও পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান—অনায়াসেই এ কথা স্বীকার করা যায়।"

(৩)

"মহাভারত-কার এবং ভগবান্ বিষ্ণু, প্রলয়,—কল্পান্ত স্বীকার করিয়াছেন; ধর্ম্ম যাহাই কেন হউক না, তাঁহাদের মতে এবং তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী জনগণের মতে, ধর্ম্ম সনাতন হয় কিরূপে? মনুষ্য নাই,—ধর্ম্ম থাকিবে কোথায়? যদি লোক-হিতকর কার্য্যই ধর্ম্ম হয় ত তখন লোক কোথায় যে, লোক-হিত হইবে? তবে ধর্ম্মকে সনাতন বলা যায় কিরূপে?—এই আপত্তি-পরিহারার্থ বলিতে হয়,—যাহা ধর্ম্ম, তাহা ঈশ্বরে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রচারক ঈশ্বর; এইজন্যই ধর্ম্মকে সনাতন বলা যায়। ঈশ্বর সনাতন, ধর্ম্মও সনাতন। এই সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ বা স্বরূপ-প্রকাশ, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রেই সর্ব্বপ্রথমেও হইয়া থাকে, যদি তৎপূর্ব্বকালে কোন মনুষ্যের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম-নির্ণয় নাও হইয়া থাকে, তাহাতেও ধর্ম্মের সনাতনত্ব ব্যাহত হয় না। ঈশ্বরে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত, প্রলয়ে-অবিনাশী ধর্ম্ম দুই দিন মনুষ্যের অননুষ্ঠানে অনিত্য হয় না,—তাহার সনাতনত্বে ব্যাঘাত পড়ে না। প্রলয় না মানিলেও, ক্রমোন্নতি-বাদ মানিলেও ধর্ম্মের সনাতনত্ব সিদ্ধি, ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠত্ব-ব্যতিরেকে কদাচ হইতে পারে না।"

অতএব আমরা বলিতে পারি না, বঙ্কিম বাবু কিরূপে প্রকাশ করিলেন,—"ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, সনাতন ধর্ম্মের উপদেশক হইতে পারে না।"

২। এক্ষণে দেখা যাউক, "যাহা লোক-হিতকর, তাহাই ধর্ম্ম" এই শ্রীকৃষ্ণোক্তির সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ আছে কি না ?

বিরোধ নাই। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ। ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ —এই মাত্র। ভগবান্ সংক্ষেপে বলিলেন,— "যাহা লোক-হিতকর, তাহাই ধর্ম্ম।" কিন্তু কি যে লোক-হিতকর কার্য্য, তাহা স্পষ্টতঃ এবং বিশেষ রূপে তিনি বলেন নাই। শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহারই বিবরণ শান্তিপর্ব্ব এবং অনুশাসন-পর্ব্বে অনেকটা পাওয়া যায়। এই-জন্যই,—এই শ্লোকে মহাভারতে ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইলেও অন্য স্থলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মতত্ত্ব-কীর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন বা বিরুদ্ধ হইল না।

"তবে যে ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সমুদ্র-যাত্রা পাপজনক হইল ! লোকহিত-কর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উক্ত্যনু-সারে ধর্ম্ম হইলেও সমুদ্র-যাত্রা যখন ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইতেছে, তখন আর কেমন করিয়া বলি, ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষরূপে প্রতিপাদিত ধর্ম্ম-তত্ত্বই সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে বিরোধ থাকিল।" এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি, সমুদ্র-যাত্রা শ্রীকৃষ্ণোক্ত লোক-হিতকর নহে, ধর্ম্ম-সঙ্গতও নহে এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ।

লোক-হিতকর শব্দের অর্থ প্রকাশ হইলেই আমার কথার মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইবে। তাই জিজ্ঞাসা করি,—

(ক) লোক-হিতকর শব্দের অর্থ কি সর্ব্ব-সাধারণের হিতকর ?—সর্ব্ব-সাধারণের হিত-কর, মনুষ্যের কোন কার্য্যই হইতে পারে না। সমুদয় পৃথিবীর মঙ্গল হয়—এমন কার্য্য করা কি কোন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ?

(খ) লোক-হিতকর শব্দে "অধিকাংশ লোকের হিতকর।" তাহাতেও পূর্ব্বদোষ বারণ হইল না। মনুষ্যের কোন্ কার্য্যটী জগতের অধিকাংশ লোকের হিতকর হইতে পারে ?

(গ) লোক-হিতকর শব্দে "অন্ততঃ একজনেরও হিতকর।" তাহা হইলে, সর্ব্ববাদি-সম্মত অনেক পাপ-কার্য্যও ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। নিরপ-রাধী ব্যক্তির প্রাণনাশ করিয়া তাহার ধন হরণে দস্যুদলের সাহায্য করিলে, দস্যুদলের ধনলাভ হইতে পারে—সংসার-নির্ব্বাহে উপকার হইতে পারে, অতএব একার্য্যও "অন্ততঃ একজনের" কেন, দস্যুদলের হিতকর ; তবে কি ইহা ধর্ম্ম-কার্য্য ?

(ঘ) "যাহাতে কাহারও অহিত হয় না, অথচ অন্ততঃ একজনেরও হিত হয়, তাহাই লোক-হিতকর।" না ;—ইহাও বলা যায় না। এরূপ কার্য্যই বা কয়টা আছে ? দস্যু-হস্তগত মনুষ্যের উদ্ধারসাধন করা, সর্ব্ববাদি-সম্মত ধর্ম্মকার্য্য ; তাহা-তেও ত কাহারও না কাহারও অহিত হইতেছে। ঐ যে দস্যুগণ নিরাশ হইয়া—ধনপ্রাপ্তি-আশায় বঞ্চিত হইয়া ম্লানমুখে গৃহে ফিরিয়া আসি তেছে, উহাদিগের কি অহিতসাধন হইল না ?

(ঙ) "অনাদি অতীত কাল হইতে অনন্ত ভবি-ষ্যৎকালের মধ্যে মনুষ্য-পরম্পরা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে কার্য্য,এই বৃহৎকালের অন্তর্গত অধিক সংখ্যক মনুষ্যের হিতজনক, তাহাই লোক-হিতকর" মিলের মতে লোকহিতকর শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোচ্চারিত সংস্কৃত শ্লোক হইতে এ অর্থ পাওয়া যায় না। "অধিক সংখ্যক লোকের হিতজনক" ইত্যাদি মর্ম্মের কোন কথাই শ্লোকে নাই।

মহাভারত-লেখক এবং শ্রীকৃষ্ণও জন্মান্তর মানেন ; সুতরাং আমাদের শ্রীকৃষ্ণোক্ত লোক-হিতকর শব্দের কষ্ট-কল্পিত অর্থ করিতে হইবে না। যাহা হইতে লোকের কেবল প্রকৃত হিত হয়, কাহারও অহিত হয় না ; তাহাই লোক-হিতকর। লোকের সংখ্যা-বিশেষের কোন প্রকার নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। হিত শব্দে ঐহিক পারত্রিক হিত। ঐহিক হিত অপেক্ষা পারত্রিক হিত শ্রেষ্ঠ। যে কার্য্যে ইহ-কালে কিঞ্চিৎ অহিত ও পরকালে হিত হয়, সে কার্য্য হিতকর-পদবাচ্য। যে কার্য্যে ঐহিক হিত ও পারত্রিক অহিত হয়, তাহা হিতকর কার্য্য নহে। দস্যুর নরহত্যায় সহায়তা করিয়া উপকার করিলে ঐহিক উপকার তাহার কিঞ্চিৎ হয় বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যের ফলে নরঘাতী দস্যু এবং তৎসাহায্য-কারীর ঘোরতর পারলৌকিক

অহিত হয়; দস্যুহস্তগত মনুষ্যের উদ্ধার করিলে দস্যুর, স্থলবিশেষে, কিঞ্চিৎ ঐহিক অপকার-সাধন কর হইলেও মনুষ্য-হত্যা-জনিত নরক হইতে তাহাকে রক্ষাকরা হইল। অতএব এই কার্য্যে সকলেরই হিত হইতেছে। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "পারত্রিক হিতকর কোন্ কার্য্য ?—এইরূপ হিতকর কার্য্যের বিবরণ ধর্ম্মশাস্ত্রে নিহিত। আমরা সামান্য জ্ঞানে লোক-হিতকর কার্য্য স্থির করিতে পারি না। পারি না বলিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় লই। ধর্ম্মশাস্ত্র যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমরা বুঝি, তাহাই লোক-হিতকর। সমুদ্র-যাত্রা স্থূল-দৃষ্টিতে ইহ-কালের কথঞ্চিৎ হিতজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হই-লেও, পরকালের অহিতজনক; অতএব—শ্রীকৃষ্ণ, লোকহিতকর বলিয়া যাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই-ধর্ম্মের অন্তর্গতও নহে; শাস্ত্র-সঙ্গতও নহে।

"যে কার্য্য হইতে ইহকালে কাহারও হিত হইয়াছে, তাহা কি কখন পরকালে অহিতকর হয় ?"—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা বলি,—"হয় বৈকি! দস্যুদলের নরহত্যা-সাহায্যকৃত উপকারের দৃষ্টান্তেই কেন বুঝিয়া লও না।"

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকরণে ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই প্রকরণ উল্লেখ করিয়া স্বয়ং তিনিই শাস্ত্রের উপর কিরূপ নির্ভর করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে ;—

"মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানত হইয়া শিবিরে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে অর্জ্জুন, সংশপ্তক-সংগ্রাম করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কুশলে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির, কর্ণবধ হইয়াছে—সম্ভাবনা করিয়া সাদরে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভাই! কিরূপে মহাবীর কর্ণকে বধ করিলে?' পরক্ষণেই কিন্তু অর্জ্জুনের উত্তরে তিনি যখন জানিলেন,—কর্ণবধ হয় নাই, তখন তাঁহার আর সহ্য হইল না। সেই অপমান-দুঃখ, ক্ষোভ এবং অভিমান একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত করিল। তিনি আজন্ম অভ্যস্ত ক্ষমাগুণের সীমা অতিক্রম করিয়া অর্জ্জুনকে, ভীরু, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী এবং শঠ প্রভৃতি নানাবিধ কর্কশ কথা বলিয়া তিরস্কার করিলেন। অবশেষে বলি-লেন, 'তুমি তোমার গাণ্ডীব অপর বীরকে প্রদান কর, সে অবিলম্বেই কর্ণবধ করিবে; কর্ণবধ করা তোমার কর্ম্ম নহে।' মহাবীর ধার্ম্মিক অর্জ্জুন, এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু অপরকে গাণ্ডীব দিবার কথা শুনিয়া তিনি অসি নিষ্কাশিত করিলেন; উদ্দেশ্য—রাজা যুধিষ্ঠি-রের শিরশ্ছেদ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এপর্য্যন্ত কোন কথাই বলেন নাই, এক্ষণে অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন,—'সখে! একি! অসময়ে অসি-নিষ্কাশন কেন?' অর্জ্জুন বলিলেন,—"আমার প্রতিজ্ঞা আছে,—যে ব্যক্তি, (অপরকে গাণ্ডীব দাও), এই মর্ম্মে আমাকে বলিবে আমি তাহার শিরশ্ছেদ করিব। রাজা সেই কথা বলিয়াছেন, আমি সত্য-রক্ষার্থ রাজার শিরশ্ছেদ করিব। তুমিই বা এ বিষয়ে কি বল?" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বারংবার 'ধিক্ ধিক্' বলিয়া দুই চারিটী কথা বলিবার পর কহিলেন,—

"নহি কার্য্যমকার্য্যং বা সুখং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।
শ্রুতেন জ্ঞায়তে সর্ব্বং তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে॥"

কর্ণপর্ব্ব, ৬৯ অঃ, ২২।

"কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা কোন প্রকারে অনায়াস-সাধ্য নহে। শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তৎ-সমুদয় জানা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তুমি শাস্ত্র জান না।"

ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ, যে শাস্ত্র হইতেই হয়, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্পষ্টই বলিতেছেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন,—"হে পার্থ! এরূপ প্রতিজ্ঞা করাও ধর্ম্মসঙ্গত নহে, এরূপ প্রতিজ্ঞা-পালনও ধর্ম্মানুমোদিত নহে। প্রতিজ্ঞা করিবার সময় বিবেচনা করিতে হয়।" এই বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য তিনি একটী পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"কৌশিকোঽপ্যভবদ্বিপ্রস্তপস্বী ন বহুশ্রুতঃ।"

৬৯অঃ। ৪৭

কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তিনি ভাল রকম শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না। 'আমি সর্ব্বদা সত্য কথা কহিব' 'ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। একদা কতিপয় ব্যক্তি, দস্যুগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া তাঁহার তপোবনে নিবিড় বন-মধ্যে লুকায়িত হয়। কেবল কৌশিক তাহা জানিয়াছিলেন। পরক্ষণেই দস্যুগণ সন্ধান

করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—"ভগবন্! এইদিকে কি কতিপয় ব্যক্তি আসিয়াছে? আপনি কি তাহাদিগের সন্ধান জানেন?" কৌশিক, প্রতিজ্ঞা পালন করত বলিলেন,—"হাঁ ঐ, বনমধ্যে লুকায়িত আছে।" দস্যুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া তথায় গিয়া সেই সকল ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিল। এই পাপে কৌশিকের নরক হইয়াছিল।"

"যথা চাশ্রুতো মূঢ়ো ধর্ম্মাণামবিভাগবিৎ।
বৃদ্ধানপৃষ্টা সন্দেহং মহচ্ছ্রমিতোঽর্হতি॥
৬৯অঃ। ৫৪।

"শাস্ত্র-জ্ঞান যাহার অল্প, সেই ধর্ম্মবিভাগানভিজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তি, বৃদ্ধদিগকে সন্দিগ্ধ স্থল জিজ্ঞাসা না করিয়া এই সংসার হইতে মহানরকে পতিত হয়।"

এইরূপে ভগবান্ শাস্ত্রকেই ধর্ম্মের একমাত্র স্বরূপ-নির্দ্দেশক বলিয়া এবং সেই শাস্ত্রজ্ঞানাভাবেই লোকে ধর্ম্মবিষয়ে বিমূঢ় হয়—ইহা প্রতিপাদন করিয়া শেষে স্বয়ং শাস্ত্রমর্ম্মানুগত ধর্ম্মস্বরূপ সংক্ষেপে বলিলেন,—

"যৎ স্যাদহিংসা-সংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

চরম তাৎপর্য্য;—

"এই প্রতিজ্ঞা-পালন ধর্ম্ম নহে; কেন না, ইহা হিংসাযুক্ত।"

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ-সংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥" ৫৯

চরম তাৎপর্য্য;—

"শাস্ত্রে যাহা কিছু ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই লোক হিতকর। তোমার এ প্রতিজ্ঞা কাহারও হিতকর নহে; সুতরাং এ প্রতিজ্ঞাও ধর্ম্ম নহে।

অতএব রাজাকে বধ করিলে কেবল পাপ হইবে,—ধর্ম্ম হইবে না।"

সুতরাং মহাভারত-লেখক যদি মিথ্যাবাদী না হন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি মিথ্যাবাদী না হন, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে,—শাস্ত্রই ধর্ম্মনির্দ্দেশক; শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। শাস্ত্রে নিন্দিত কার্য্যই অধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মস্বরূপ শাস্ত্রেরই অনুযায়ী। সমুদ্রযাত্রা-কারীর যখন পারলৌকিক অহিত হওয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত, তখন কেমন করিয়া বলি,—সমুদ্র-যাত্রা ধর্ম্মানুমোদিত!

আর যদি শাস্ত্র ছাড়িয়া মিলের মতানুসারে ইহলোকের হিতকর কার্য্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও ত সমুদ্র-যাত্রাকে ধর্ম্মানুমোদিত বলা যায় না। কেননা, সমুদ্রযাত্রা প্রকৃত পক্ষে বিশেষ লোকহিতকর কিনা, এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও সন্দেহ আছে। হিত সম্ভাবিত মাত্র; অহিত কিন্তু নির্দ্ধারিত। দুই একটী উচ্চ রাজপদ-প্রাপ্তি ও অসার সম্মান ভিন্ন বিলাত-গমনে অধিক ফল নাই। কিন্তু বিলাসিতার প্রসরবৃদ্ধি, জাতীয় অধঃপাত এই বিলাত-যাত্রায় অবশ্যম্ভাবী ফল। আজ বিলাতযাত্রা ছলে চলিল, কাল প্রকাশ্যে ও বলে চলিবে। তাহাতে উৎপথ-গামীদিগের যা হইবার তাই হইবে।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে অখাদ্য-ভোজন, অপেয়-পান সমাজে এইরূপে শনৈঃ শনৈঃ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিল। পিতা ধার্ম্মিক, পুত্র অখাদ্য ভোজন করিল; ইহাতে প্রথম প্রথম অনেক ধার্ম্মিক পিতাও বাৎসল্যাদি বশতঃ পুত্রত্যাগ না করার জন্য সমাজচ্যুত হইলেন। শেষে কেহ দয়ায়, কেহ পুত্রত্যাগ করার কথা প্রকাশ হওয়ায়, কেহ বা এইরূপ অন্য কারণে সমাজভুক্ত হইলেন। ক্রমে পিতৃদল অব্যাহতি পাইলেন। পরে অকার্য্যকারী পুত্রদিগের সময় উপস্থিত হইল। তখন, কেহ অকার্য্য করে নাই বলিয়া, কেহ পিতার সময় প্রচলিত ছিল—এই দৃষ্টান্তে, কেহ বা তদ্দৃষ্টান্তে সমাজভুক্ত হইল। ক্রমেই দৃষ্টান্ত বাড়িতে লাগিল। দল বাড়িল। দেখিয়া শুনিয়া সমাজের দৃঢ়সংস্কার শিথিল হইল। অকার্য্যে অপ্রকাশ দূর হইল। প্রকাশ্য অপেয়পানাদি শেষে চলিতে লাগিল। ঐহিক পারত্রিক অহিতকর অবিরত সুরাপান এবং এতদ্দেশবাসীর পক্ষে অবধারিত অহিতকর মাংসবিশেষ ভোজন, বেশ্যাগমন, নিজালয়ে বারাঙ্গনানয়ন এক উচ্চশ্রেণীর আচরণ রূপেও পরিণত হইল। কিন্তু মনে করিয়া দেখ,—ইহার মূল মাত্র যৎকিঞ্চিৎ সাহেব-সংস্রব; তখন সমাজ খানিকটা সাবধানতা এবং সাহস অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে এক্ষণে এত উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে চলিত না। এক্ষণকার বিলাত-ফেরত আর পূর্ব্বেকার কিঞ্চিৎ সাহেব-

সংসর্গী অনেক ইংরেজীশিক্ষিত প্রায় এক প্রকার জীব। সজাতীয় আচার-ব্যবহারে ঘৃণা, উদ্ধত-ভাব, অনীদৃশ ব্যক্তির প্রতি অনাদর এবং অসম্ভ্রম করা উভয়েরই প্রায় সমান অভ্যাস।

এখনকার বিলাত-ফেরত ব্যক্তিদিগের ন্যায় সমাজ, তখন ঐরূপ শিক্ষিত দুই চারি জনের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভাবে দণ্ডপ্রয়োগ করিলে, বা অবসরানুযায়ী সুনীতি প্রয়োগ করিতে পারিলে, এতাদৃশ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারিত হইত। বলা বাহুল্য, সমাজের তখন সেই সাবধানতা ও সাহসের পরিচয় দিবার শক্তি নানা কারণে হ্রস্ব হইয়াছিল। এবং বিলাত প্রত্যাগতদিগের ন্যায় সহসা তাহাদিগকে নিগৃহীত করিবার অপর অন্তরায়ও অনেক ছিল। পক্ষান্তরে এই এখনকার কতকগুলি ব্যক্তির এই 'হিন্দুমতে' বিলাত-যাত্রা প্রচলিত হইলে, সমাজের বিলাত-প্রত্যাগত-শাসনী শক্তি ক্রমে বিনষ্ট হইবে; যথেচ্ছ বিলাত গমন প্রচলিত হইবে। এই প্রকার বিলাত-যাত্রার ফলে অনেক ধনিসন্তান উৎসন্ন যাইবে। সেই বাহ্য-প্রলোভনময় চাকচিক্য-ময় বিলাতে বেড়াইতে গিয়া চিত্তসংযমে অপারগ হইয়া অনেক যুবক আত্মহারা হইবে এবং বিলাতের আচার-ব্যবহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অহরহ প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের ধর্ম্মরুচি-মার্জ্জিত আচার-ব্যবহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে। "বিলাত-প্রত্যাগতগণ প্রায়শই সজাতি-ব্যবহারে ঘৃণাযুক্ত এবং উদ্ধত হন,—অনেকটা এইজন্যই সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন না" এই ভাবের কথা বঙ্কিম বাবুই বলিতেছেন। বিলাতগমনে,—মনোমোহন বিলাতী চাল-চলন, বিলাতী রীতি-নীতি, জ্বলন্তভাবে হৃদয়ে প্রতিফলিত হওয়াতেই বিলাত-প্রত্যাগত, সমাজতত্ত্বে অনভিজ্ঞ যুবকবৃন্দ, জাতীয় রীতি-নীতির প্রতি, আচার-ব্যবহারের প্রতি ঘৃণাযুক্ত হয় এবং সজাতিদিগকে অসভ্য বলিয়া তাহার বিশ্বাস হয় ও এতন্নিবন্ধন ঔদ্ধত্য তাহাদিগকে অধিকতর কলুষিত করে। সুতরাং বিলাত-যাত্রা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিলাত-প্রত্যাগত-সুলভ সমাজের অহিতকর দোষরাশি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। বিলাসিতার প্রসার-বৃদ্ধি, আত্মার্থ ব্যয়বাহুল্য, বিশেষ প্রকারে হইবে এবং সর্ব্বদেশে যে কোন রূপে হউক, হিন্দুর যে একটী অক্ষুণ্ণ সম্মান আছে, বিলাত-যাত্রা প্রচলনের পর, তাহা তিরোহিত হইবে। প্রলোভনময় বিলাতে গুণপনা প্রচার অপেক্ষা ভবিষ্যতে অস্মদ্দেশীয়দিগের দোষ এবং অসারতা অধিক প্রচারিত হইবে। ইহার ফল—জাতীয় অধঃপতন। যেদিক্ দিয়াই দেখা যাক্, সমুদ্র যাত্রা অহিতকর। অতএব ধর্ম্মানুমোদিত নহে।

একটী বিষয়ে বড় কুতূহল হয়। বঙ্কিম বাবু, বিলাত-যাত্রার কথা না তুলিয়া কেবল যে সমুদ্র-যাত্রা লইয়াই গোল করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? 'সমুদ্র-যাত্রা ধর্ম্মানুমোদিত হইলেই বিলাত-যাত্রা অবাধে চলিতে পারে,'—এই বিশ্বাস তাঁহার আছে, না,—'বিলাত-যাত্রা ত ধর্ম্মসম্মত হয় না, তবে কেবল সমুদ্র-যাত্রার কথা তুলিয়াই আসল কথাটা চাপা দেওয়া যাক্'—এই অভিসন্ধি তাঁহার অন্তর্নিহিত? এই বিষয়টী জানিবার জন্য বাস্তবিকই কুতূহল হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভক্ত বিলাত-যাত্রিগণ, সমুদ্র-যাত্রা যে অশাস্ত্রীয়, বঙ্কিম-প্রমুখাৎ এভাবের আভাস অবগত হইয়া, আর 'সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্রীয়' এই বলিয়া চিৎকার করিতে পারিবেন না। এ কথাটীও এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য।

বঙ্কিম বাবু, রঘুনন্দনকে যে স্মৃতির সঙ্কীর্ণতর ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন,—ইহা নিতান্ত অলীক। ঋষিবচন ভিন্ন তিনি কোন সঙ্কীর্ণ-মতেরই অবতারণা স্বয়ং করেন নাই, রঘুনন্দ-নের গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা একথা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

বঙ্কিম বাবু প্রথম বি, এ, পাশ। তিনি উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং ইংরেজী সাহিত্য-গ্রন্থের অনুকরণে ও আংশিক অনুবাদে কয় খানি উপ-ন্যাস লিখিয়াছেন। এই ত্রিবিধ কারণে বঙ্কিমবাবু প্রসিদ্ধ। উপন্যাস দ্বারাই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই প্রৌঢ় বয়সে ইংরাজী ধর্ম্ম মত অবলম্বন করিয়া "কৃষ্ণ-চরিত্র" উপন্যাস লিখিয়া তিনি এক শ্রেণীর নিকটে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন। তা তিনি যাই হউন, ঋষিগণ অপেক্ষা আপনাকে উদার, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ইঙ্গিতে পরিচয় দেওয়া তাঁহার পক্ষে অন্ততঃ নীতিসঙ্গত কার্য্য হয় নাই।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

মোহমুদ্গর।

—০:০—

পরিব্রাজক পরমহংস ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের নাম ভারতে কাহারও নিকট অবিদিত নাই। যিনি সর্ব্ব সুখ-স্পৃহা তুচ্ছজ্ঞান করত শিবভাবে তন্ময় হইয়া সমস্ত জগৎ শিবময় দেখিয়াছিলেন; যিনি গগন-বিদারী 'শিবোহহং' শব্দে ব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত করিয়া, অনন্য-সাধারণ তেজস্বিতা ও যোগবলের অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছিলেন; যিনি অসাধারণ তর্কযুক্তি বলে অদ্বৈত-বাদের হুহুঙ্কারে প্রলয়-সংঘটনে তৎপর হইয়াছিলেন; যিনি যোগনিরত-চিত্তে স্বীয় অন্তরাত্মা মধ্যে পরমব্রহ্মের প্রভাবতী পূর্ণ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভগবৎ-প্রেমসুধা-পানে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া চিদানন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন,—সেই অসাধারণ তেজস্বী প্রবল-যোগবল-সম্পন্ন সাক্ষাৎ শঙ্কররূপী নিস্তার-গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই মোহমুদ্গর—ভারতের অমূল্য রত্ন। আইস ভাই! ভারতের পবিত্র স্বর্ণখনি-উৎখাত এই অমূল্য রত্ন-মালা গলদেশে ধারণ করিয়া জীবন সার্থক করি; আইস, সকলে মিলিয়া কোটি কোটি কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া সেই নির্ব্বাণ সঙ্গীত গান করি। জগৎ এই দিগন্ত-প্রসারি-ধ্বনিতে স্তম্ভিত হইয়া, বিস্ফারিত-নয়নে ভারতে বৈরাগ্যের ছায়া দেখিয়া ভাত হইবে। ধন্য ভগবান্ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য! ধন্য স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি, আর ধন্য আমরা ভারতবাসী!

(১)

মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥

মূঢ়! ধনলাভ-তৃষ্ণা কর পরিহার
অল্পমতি! কর মনে বৈরাগ্য সঞ্চার,
আপনার কর্ম্মফলে লভিবে যে ধন,
তাহাতেই কর নিজ চিত্ত-বিনোদন।

(২)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

কে বা তব কান্তা আর কে তব কুমার।
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার!
কোথা হ'তে আসিয়াছ,তুমি বা কাহার?
ভাবনা করহ ভাই! এই তত্ত্ব—সার।

(৩)

নলিনী-দল-গত-জলমতি-তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধি-ব্যাল-গ্রস্তং
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥

পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,
জীবন তেমন হয় অতীব চপল;
জানিও, করেছে গ্রাস ব্যাধি-বিষধর,
সমস্ত সংসার তাই শোকে জর জর।

(৪)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
কর-ধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-ভাণ্ডম্॥

ধবল-বরণ কেশ, শরীর গলিত,
বদন দশনহীন দেখিতে ঘৃণিত,
চলিয়া যাইতে যষ্টি কাঁপে সদা করে,
তবু আশাভাণ্ড নর নাহি ত্যাগ করে।

(৫)

দিন-যামিন্যৌ সায়ংপ্রাতঃ
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ॥

দিবস-যামিনী আর সায়াহ্ন-প্রভাত
শিশির-বসন্ত পুনঃ করে যাতায়াত;
এইরূপে খেলে কাল, ক্ষয় পায় আয়ু,
তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশাবায়ু।

(৬)

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

যাবৎ জনম হয় তাবৎ মরণ,
জননীর জঠরেতে আবার শয়ন;
এ সংসার এইরূপ দুঃখের আগার,
তবে কেন হে মানব! সন্তোষ তোমার।

জন্মভূমি।

(৭)

সুর-মন্দির-তরু-মূল-নিবাসঃ
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্ব-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥

দেবের মন্দিরে কিংবা তরুতলে বাস,
ভূতলে শয়ন আর মৃগচর্ম্ম বাস;
সমুদয় পরিজন-ভোগ-পরিহার
এহেন বিরাগে সুখ নাহি হয় কার?

(৮)

অষ্ট-কুলাচল-সপ্ত-সমুদ্রা
ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

অষ্ট কুলাচল আর সপ্ত রত্নাকর,
ব্রহ্মা পুরন্দর কিংবা রুদ্র দিনকর,
তুমি, আমি, এই বিশ্ব,— সকলি স্বপন;
তবে কেন শোকে তুমি হওহে মগন!

(৯)

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

খেলায় আসক্ত যত বালকের দল,
তরুণীতে অনুরক্ত তরুণ সকল,
সংসার-চিন্তায় মগ্ন বৃদ্ধ সমুদয়,
পরম ব্রহ্মেতে লগ্ন কেহই ত নয়!

(১০)

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জন-শক্তঃ
তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর-দেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

যতদিন করে নর ধন উপার্জ্জন,
ততদিন থাকে বশে নিজ পরিজন;
পরে যবে বৃদ্ধকালে জীর্ণ হয় দেহ,
ডেকেও জিজ্ঞাসা ঘরে নাহি করে কেহ।

(১১)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্
নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

'অর্থ অনর্থের মূল' ভাব সদা মনে;
যথার্থই লেশমাত্র সুখ নাই ধনে;
তনয় হ'তেও হয় ধনশালী ভীত,
সর্ব্বত্রেই এই নীতি আছয়ে কথিত।

(১২)

মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

ধন, জন, যৌবনের ত্যজ অহঙ্কার,
নিমেষে কৃতান্ত করে সকলি সংহার;
পরিহর এ সংসার ঘোর মায়াময়,
জানি' ব্রহ্মপদ শীঘ্র করহ আশ্রয়।

(১৩)

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ
মা কুরু যত্নং সমরে সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং
বাঞ্ছস্যচিরাদ্যদি বিষ্ণুত্বম্॥

শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু, সন্ধি কিংবা রণ,
এসব বিষয়ে নাহি করিও যতন;
সর্ব্বভূতে সমভাব ভাব নিরন্তর,
বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা যদি করহ সত্বর।

(১৪)

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥

তোমাতে আমাতে সর্ব্বজীবে এক হরি,
বৃথা কেন কর ক্রোধ, ধৈর্য্য পরিহরি'?
আপন আত্মায় হের আত্মা সবাকার,
সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান কর পরিহার।

(১৫)

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞান-বিহীনা মূঢ়াঃ
তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ করি' পরিহার
'কে আমি' তা' আপনারে দেখ একবার
আত্মজ্ঞান-পরিহীন যত মূঢ় জন,
দুস্তর নরকে ডুবি পচে অনুক্ষণ।

(১৬)

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
প রহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

পরমাত্ম-তত্ত্ব সদা করহ চিন্তন,
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বর্জ্জন ;
ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ কেবল সংসারে,
একমাত্র তরি ভবসিন্ধু তরিবারে।

(১৭)

ষোড়শ-পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ
শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥

পজ্ঝটিকা ছন্দে শ্লোক ষোড়শ রচিত,
শিষ্য-উপদেশ তরে হইল কথিত ;
ইহাতেও না হইবে বিবেক যাহার,
কে বা আর উপদেশে কি করিবে তা'র।

শ্রী————নবদ্বীপ।

ন্যায়দর্শন।

(৪)

তেজঃ।

তেজঃ, দ্রব্য-গণনায় তৃতীয়। তেজের লক্ষণ,—(১) উষ্ণ-স্পর্শবত্ত্ব, (২) ভাস্বর-শুক্লরূপবত্ত্ব এবং (৩) নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ত্ব।

যাহাতে উষ্ণস্পর্শ আছে, তাহাই তেজঃ; যাহাতে ভাস্বর শুক্লরূপ আছে, তাহাই তেজঃ, যাহাতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে, তাহাই তেজঃ।

(১) তেজে আর কোন স্পর্শ নাই, কেবল উষ্ণস্পর্শ; বহ্নি, সূর্য্য-কিরণ ইহার উদাহরণ। উষ্ণস্পর্শও আর কিছুতে নাই, কেবল তেজে আছে। তাই 'উষ্ণস্পর্শ বিশিষ্ট' বলিলে কেবল তেজই বুঝায়। এইজন্য "উষ্ণস্পর্শবত্ত্ব" তেজের একটী লক্ষণ।

(২) তেজে আর কোন রূপ নাই, কেবল ভাস্বর শুক্লরূপ আছে। হীরকাদি ইহার উদাহরণ। ভাস্বর শুক্লরূপও তেজ ভিন্ন আর কিছুতে নাই। সুতরাং 'ভাস্বর শুক্লরূপ-বিশিষ্ট' বলিলে তেজই বুঝায়। এইজন্য "ভাস্বর শুক্লরূপবত্ত্ব" তেজের লক্ষণ।

(৩) তেজে স্বাভাবিক দ্রবত্ব নাই, আছে কেবল নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। সুবর্ণাদি ইহার উদাহরণ। সুতরাং 'নৈমিত্তিক দ্রবত্ব-বিশিষ্ট' বলিলে তেজকে বুঝায়। 'নৈমিত্তিক দ্রবত্ব'-অর্থে বস্তন্তরের সাহায্য-সম্ভূত তরলতা। অগ্নির উত্তাপাধিক্যে সুবর্ণাদি তেজঃপদার্থ গলিয়া যায়; সুবর্ণাদি কিন্তু স্বাভাবিক তরল নহে। এইজন্য "নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ত্ব" তেজের লক্ষণ।

প্রথম লক্ষণের কথা।

"তেজের ত নানাবিধ স্পর্শ। বহ্নি, সূর্য্য-কিরণে যেমন উষ্ণস্পর্শ অনুভূত হয়, সেইরূপ সুধাকরের কর-রাশিতেও কি উষ্ণস্পর্শ অনুভূত হয়? কবির নিতান্ত প্রিয়তম বিরহি-বিরহিণী ভিন্ন এ কথা কে বলিবে? কৌমুদীর সেই নয়ন-মনঃ-প্রাণ-তৃপ্তিকর মধুর শীতল-স্পর্শ কে না অনুভব করিয়াছে? তবে কেমন করিয়া বলি,—'উষ্ণস্পর্শবত্ত্ব' তেজের লক্ষণ।" ইহার উত্তর এই,—

"তরণিকিরণযোগাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।"
ভাস্করাচার্য্য।

চন্দ্র, অমৃতাত্মক জলপিণ্ড মাত্র। সূর্য্যকিরণ ইহাতে প্রতিফলিত হওয়াতেই ইনি জ্যোৎস্না-কিরণ দ্বারা প্রকাশিত হন। চন্দ্রের মূর্ত্তি তেজোময় নহে,—জলময়; প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণই ইহাঁর জ্যোৎস্না। অতএব জলের সহিত গাঢ়-সংশ্রবে চন্দ্রকিরণ শীতবৎ প্রতীত হয়। জলের অর্থাৎ চন্দ্রবিম্বের স্বাভাবিক শীতলত্ব প্রযুক্তই চন্দ্রকিরণে শৈত্যোপলব্ধি হয়। নতুবা এই কিরণের স্পর্শ বা তেজের স্পর্শ শীতল নহে;—উষ্ণ। বহ্নি ও সূর্য্য—তেজোময়; এইজন্য তৎস্পর্শ উষ্ণ বলিয়াই প্রতীত হয়। শীতল-রূপে তাহার প্রত্যয় হয় না।

এই উত্তরের উপর আপত্তি।—"তেজের কেন কেবল শীতল-স্পর্শই স্বীকার করি না; সূর্য্য ও

অগ্নির স্পর্শ যে উষ্ণ হয়, তাহার কারণান্তর আছে; যেমন চন্দ্রকিরণের শীতস্পর্শে অপর কারণ তুমি কীর্ত্তন করিলে।”

উত্তর।—তেজঃ, শীতল-স্পর্শ হইলে, বহ্নি ও সূর্য্যাদি-কিরণ-স্পর্শ অবশ্যই শীতল হইত। কেননা, পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু—এই চারিটী দ্রব্যের মাত্র স্পর্শ হয়। তন্মধ্যে আবার পৃথিবী ও বায়ুতে অনুষ্ণ অশীত স্পর্শ; জলে শীত স্পর্শ। এক্ষণে তেজকে যদি উষ্ণ না বল, তাহা হইলে সূর্য্য ও অগ্নির মূর্ত্তিকে যে-দ্রব্যময়ই কেন বল না, তৎস্পর্শ উষ্ণ হয় কিরূপে? তেজ ভিন্ন আর যে তিন দ্রব্যের নাম করা গিয়াছে,—পৃথিবী, জল এবং বায়ু,—তাহার কাহারও স্পর্শ উষ্ণ নহে। আর বিচার ও বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করিলেও "সূর্য্য প্রভৃতি তেজোময় নহে,—কিন্তু জলাদিময়" এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না। এই সকল কারণে 'উষ্ণস্পার্শবত্ত্ব' তেজের নির্দ্দোষ লক্ষণ হইয়াছে।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই,—"সকল তেজে ত উষ্ণ স্পর্শ নাই; উৎপত্তিকালে দ্রব্যমাত্রেই যখন গুণ-কর্ম্ম নাই—এ কথা নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন, তখন উৎপত্তি-কালীন বহ্নি প্রভৃতিতেও ত উষ্ণস্পর্শ নাই বলিতে হয়; কেননা, স্পর্শও গুণের অন্তর্গত। 'উষ্ণস্পার্শবত্ত্ব' যদি তেজের লক্ষণ হইল, তবে এই উৎপত্তি-কালীন বহ্নিতে তাহা থাকিল কৈ? এইরূপ দোষই ত অব্যাপ্তিপদ-বাচ্য। যাহাতে তেজত্ব থাকিল, যাহা নির্ব্বিবাদে তেজঃ বলিয়া গণ্য, সেই উৎপত্তি-কালীন বহ্নি প্রভৃতি কিন্তু উষ্ণস্পর্শ-বিশিষ্ট হইল না। এইজন্যই ত বলিতেছি,—প্রথম লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল।"

উত্তর।—"উষ্ণস্পর্শবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"ই হইল,—প্রথম লক্ষণের চরম তাৎপর্য্য। এ লক্ষণে আর কোন দোষ নাই।

লক্ষণের অর্থ।—স্থূলতঃ, দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি হইল,—পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব প্রভৃতি। তন্মধ্যে কেবল তেজস্ত্ব জাতিই উষ্ণস্পর্শবদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ যে দ্রব্যে উষ্ণস্পর্শ, তাহাতে বর্ত্তমান। পৃথিবীত্ব জলত্বাদি জাতি 'উষ্ণস্পর্শবদ্‌বৃত্তি' নহে। কেননা, পৃথিবীত্ব থাকে পৃথিবীতে, পৃথিবীতে উষ্ণস্পর্শ নাই; জলত্ব থাকে জলে, জলে উষ্ণস্পর্শ নাই। অতএব পৃথিবী বা জল, উষ্ণস্পর্শবৎ নহে, অর্থাৎ তেজ ভিন্ন আর কেহই উষ্ণস্পর্শবৎ নহে। সুতরাং তেজস্ত্ব ভিন্ন অপর কোন জাতিই 'উষ্ণস্পর্শবদ্‌বৃত্তি' নহে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—উষ্ণস্পর্শবদ্‌বৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি হইল—তেজস্ত্ব; তেজস্ত্ব সকল তেজেই বর্ত্তমান। উৎপত্তিকালীন বহ্নিতে উষ্ণস্পর্শ না থাকিলেও 'উষ্ণস্পর্শবদ্‌বৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি' তথায় বর্ত্তমান। অতএব "উষ্ণস্পর্শবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"ই হইল—পরিষ্কৃত লক্ষণ; ইহাতে আর অব্যাপ্তি দোষ নাই।

আপত্তি।—উত্তপ্ত জলে, উত্তপ্ত মৃত্তিকায়, উষ্ণস্পর্শ অনুভূত হয়, সুতরাং জলত্ব ও পৃথিবীত্ব 'উষ্ণস্পর্শবদ্‌বৃত্তি' নহে কেন?

উত্তর।—জল ও মৃত্তিকায় যে উষ্ণস্পর্শ অনুভূত হয়, তাহা জল বা মৃত্তিকার নিজস্ব স্পর্শ নহে; কিন্তু তেজের সহিত প্রগাঢ় সম্বন্ধ বশতই, তাহার উষ্ণস্পর্শ প্রত্যয় হয়। জলের সহিত তেজঃ মিশ্রিত হয়। কিন্তু সে তেজে 'উদ্ভূত' রূপ নাই, ভর্জ্জন-কপালস্থ বহ্নির ন্যায় সেই তেজে বা সেই বহ্নিতে অনুদ্ভূত রূপ আছে, এইজন্য তাহার চাক্ষুষ হয় না। যাহাতে উদ্ভূত-রূপ নাই, তাহার চাক্ষুষ হইতে পারে না। তবে উদ্ভূতস্পর্শ আছে। এই অনুদ্ভূত রূপ-সম্পন্ন, অতএব চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের অগোচর তেজ,—জল বা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হওয়াতেই তাহাদের স্বাভাবিক স্পর্শ পরাজিত ও অনভিব্যক্ত থাকে,—তেজের, স্পর্শই প্রবল হয়; এইজন্য তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। নতুবা জলের বা পৃথিবীর স্পর্শ উষ্ণ নহে,—উষ্ণ হয়ও না।

দ্বিতীয় লক্ষণের কথা।

ভাস্বর, শুক্লরূপ অর্থাৎ মাত্র চক্‌-চকে সাদা রং কেবল তেজে আছে। মাত্র চক্‌চকে সাদা রং পৃথিবীতে নাই, চক্‌চকে সাদা রং জলে ত একেবারেই নাই। অতএব এই 'ভাস্বর-শুক্লরূপ-বত্ত্ব' তেজের লক্ষণ হইল।

আপত্তি।—অনেক প্রকার অগ্নির বর্ণ—আরক্ত; তেজঃপদার্থ বলিয়া স্বীকৃত মরকত-মণির বর্ণ—নীল; পদ্মরাগের বর্ণ—রক্ত;—ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এখন 'ভাস্বর-শুক্লরূপবত্ত্ব' বা 'ভাস্বর-শুক্লরূপমাত্রবত্ত্ব' তেজের লক্ষণ হইলে,

নানা প্রকার বহ্নি ও মরকত-পদ্মরাগ প্রভৃতি রত্ন, তেজঃ হইলেও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় নাই। সুতরাং এই লক্ষণ—অব্যাপ্তি-দোষাক্রান্ত হইল।

উত্তর।—অগ্নির আশ্রয় কাষ্ঠে, নানাপ্রকার পার্থিব পদার্থ বর্ত্তমান; দাহ-নির্গলিত সেই সকল পার্থিব পদার্থ, বহ্নির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বহ্নির রূপান্তর সম্পাদন করে। পার্থিব পদার্থে নানাবিধ রূপ; এই নানাবিধ রূপই বহ্নির নিজস্ব ভাস্বর রূপকে অভিভূত করিয়া মিশ্রিতভাবে লোক-লোচন-গোচর হইয়া থাকে। মরকত-পদ্মরাগ-রত্নের রূপ-পার্থক্য সম্বন্ধেও এই কথা। মরকত-রত্ন তৈজস-পদার্থ হইলেও, পদ্মরাগ-মণি তৈজস-পদার্থ হইলেও, তাহাতে পার্থিবাংশ অনেক; এইজন্যই উহাতে, গুরুত্ব আছে। তেজঃ—স্বভাবতঃ লঘু, গুরুত্বশূন্য, ভার-বিহীন। কিন্তু মরকত-পদ্মরাগ-সুবর্ণাদিতে ভার আছে। এই ভার বা গুরুত্বও পার্থিবাংশের ফল। গুরুত্বের পক্ষে যে কথা, রূপভেদের পক্ষেও সে-ই কথা। পার্থিবাংশ দ্বারা, পদ্মরাগাদিরও তৈজস-রূপ পরাজিত সুতরাং অনভিব্যক্ত এবং পার্থিব-রূপ অভিব্যক্ত হয়।

"উৎপত্তি-কালীন তেজে কোন গুণ নাই বলিয়া রূপও নাই, অতএব এই দ্বিতীয় লক্ষণ তাহাতে গেল না"—এ আপত্তির বারণ, প্রথম লক্ষণাদির ন্যায় করিতে হইবে, অর্থাৎ "ভাস্বর-শুক্লরূপবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"ই দ্বিতীয় লক্ষণের পরিষ্কার।

লক্ষণের অর্থ।—দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি, পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব ইত্যাদি। এতন্মধ্যে কেবল তেজস্ত্ব জাতিই ভাস্বর-শুক্লরূপবদ্‌বৃত্তি। ভাস্বর শুক্লরূপ ত কেবল তেজে আছে, 'ভাস্বর-শুক্ল-রূপবৎ' বলিতে তেজকেই পাই;—পৃথিবী বা জলকে পাই না। সুতরাং যাহা মাত্র পৃথিবীতে থাকে, সেই পৃথিবীত্ব ও যাহা মাত্র জলে থাকে সেই জলত্ব, 'ভাস্বর-শুক্লরূপবদ্‌বৃত্তি' হইল না। হইল কে?—তেজস্ত্ব। তেজস্ত্ব সকল তেজেই বর্ত্তমান, উৎপত্তি-কালীন বহ্নিতেও বর্ত্তমান। তবে দ্বিতীয় লক্ষণে আর দোষ কি?

আপত্তি।—কাচ—পার্থিব-পদার্থ, সাদা মার্ব্বেল-প্রস্তর—পার্থিব-পদার্থ; তাহাতে ত ভাস্বর-শুক্লরূপ আছে, অতএব পৃথিবীত্ব জাতিও ত ভাস্বর-শুক্লরূপবদ্‌বৃত্তি হইতে পারে; সুতরাং দ্বিতীয় লক্ষণ, পৃথিবীতে গেল। এই অতিব্যাপ্তি-দোষ এস্থলে বর্ত্তমান।

উত্তর।—উত্তম আপত্তি হইয়াছে। এই আপত্তি-বারণার্থ বলিব,—"ভাস্বর শুক্লরূপমাত্র-বদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব"—দ্বিতীয় লক্ষণের ইহাই চরম তাৎপর্য্য। ভাবটা এই,—চক্‌চকে সাদা রং পৃথিবীতেও থাকিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে কেবলই যে চক্‌চকে সাদা রং,—আর কোন রংই নাই, তাহা নহে। কাচ ও মার্ব্বেল-পাথরে চক্‌চকে সাদা রং, আবার তৈল-চিক্কণ কৃষ্ণ-প্রস্তরে গাঢ় কালিমা, অথচ উভয়ই পার্থিব; তাই বলি,—মাত্র চক্‌চকে সাদা রং পৃথিবীতে নাই, অতএব পৃথিবী 'ভাস্বর-শুক্লরূপ-মাত্রবৎ' নহে। কেবল তেজই 'ভাস্বর-শুক্লরূপমাত্রবৎ' তেজের নিজস্ব রং,—আর কিছুই নাই। 'ভাস্বর-শুক্লরূপমাত্রবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতি' এক মাত্র তেজস্ত্বকেই জানিবে। এখন ত আর কোন দোষ নাই।

তৃতীয় লক্ষণের কথা।

নৈমিত্তিক দ্রবত্ব তেজে আছে; জলে নাই বটে, কিন্তু পৃথিবীতে আছে। শুধু 'নৈমিত্তিক দ্রবত্ববত্ত্ব' তেজের লক্ষণ বলিলে, অতিব্যাপ্তি হয়;—সে লক্ষণের লক্ষ্য পৃথিবীও হইয়া পড়ে। এইজন্য "পৃথিব্যবৃত্তি-নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব" হইল—তৃতীয় লক্ষণের পরিষ্কার।

লক্ষণের অর্থ।—দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি,—পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব প্রভৃতি। 'নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববৎ' হইল—পৃথিবী এবং তেজঃ। নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি হইল, দুইটী;—পৃথিবীত্ব এবং তেজস্ত্ব। কিন্তু তন্মধ্যে পৃথিবীত্বটী পৃথিব্যবৃত্তি নহে,—পৃথিবী-বৃত্তি। পৃথিবীতে যাহা না থাকে, তাহার নাম পৃথিব্য-বৃত্তি। এক, তেজস্ত্ব জাতিই হইল,—পৃথিব্যবৃত্তি এবং নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববদ্‌বৃত্তি। সুতরাং তাদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত মাত্র সর্ব্ববিধ তেজ হইতে পারে; আর কেহ নহে।

এতদ্ভিন্ন "রূপবত্ত্বে সতি গুরুত্বাভাববত্ত্ব" "রূপ-বত্ত্বে সতি রসাভাববত্ত্ব" * এই প্রকার আরও

* যাহাতে রূপ আছে অথচ ভারী নহে, এমন বস্তুই তেজঃ। যাহাতে রূপ আছে অথচ রস নাই, তাহাই তেজঃ।

দুই চারিটী লক্ষণ তেজের হইতে পারে। তাহা প্রদর্শন করা অনাবশ্যক।

তেজে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী গুণ আছে, যথা;—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, রূপ, দ্রবত্ব এবং বেগাখ্য সংস্কার। এতন্মধ্যে স্পর্শ এবং রূপ—এই দুইটী মাত্র বিশেষ গুণ। বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই তেজঃ একটী 'ভূত'—পঞ্চভূতের অন্তর্গত।

পঞ্চবিধ কর্ম্মই তেজে আছে।

তেজঃ দ্বিবিধ;—নিত্য এবং অনিত্য। তৈজস পরমাণু, নিত্য তেজঃ; অপর সমুদয় তেজই অনিত্য। পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর সূর্য্য-মণ্ডল, শত শত নক্ষত্র-মণ্ডল এবং সুবর্ণ-হীরকাদি.—এই তৈজস-পরমাণু হইতেই উৎপন্ন। স্থূল-তেজের সমস্ত গুণই তৈজস-পরমাণুতে বর্ত্তমান। ক্রিয়াও পরমাণুতে আছে। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা কিছুতেই আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

অনিত্য পৃথিব্যাদির ন্যায় অনিত্য তেজও তিনরূপে বিভক্ত;—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। তৈজস-দেহ অযোনিজ; তৈজস দেহ স্বর্গবাসী-দিগের জানিবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ই তৈজস-ইন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় বা দর্শন-ইন্দ্রিয়। ইন্দীবর-দলের সহিত উপমিত, খঞ্জন-গঞ্জন বলিয়া প্রশংসিত দৃশ্যমান অবয়ব বিশেষ, চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে; চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের আশ্রয় এই মাত্র। বিষয়;—যাহা দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ তেজঃ, তাহাই বিষয়াত্মক তেজঃ। অগ্নি, সুবর্ণ, সূর্য্য,—এ সমস্তই বিষয়।

ক্রমশঃ।

অশোকা।

(১)

মাতালের সংসার। অতি কষ্টে দিন চলে। কোনদিন উপবাস, কোনদিন অর্দ্ধাশন। চারিটী অপোগণ্ড শিশু লইয়া, অভাগিনী অশোকা বড়ই বিপন্না। হতভাগ্য স্বামী দিনান্তেও তত্ত্ব লয় না। ভিক্ষান্নে আর কয়দিন চলে?—এক আধদিন নয়,—নিত্য। ভাবিয়া ভাবিয়া অশোকার সোণার বর্ণ কালি হইয়াছে। অভাগিনী, সোণার চাঁদ শিশুগুলির মুখপানে চায়, আর তাহাদের ক্ষুধাতুর কাতর-ভাব দেখিয়া শিরে করাঘাত করে। শতধারে অশোকার বুক ভাসিয়া যায়। হতভাগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে,—"নারায়ণ! দাসীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাও।"

(২)

অশোকার বড় ছেলেটীর বয়স দশ বৎসর। নাম—অনিল। অনিল এই বয়সেই মায়ের দুঃখ বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে যে, তাহাদের অকূল পাথার। ছোট ভাই বোন্ গুলি ক্ষুধায় কাঁদিলে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করে,—নিজে না খাইয়া সঞ্চিত খাদ্য হইতে তাহাদিগকে খাইতে দেয়। কখন বা কোলে-পিঠে করিয়া, এ-বাড়ী, ও-বাড়ী একটু খাবার মাগিয়া বেড়ায়। সে দৃশ্য দেখিয়া অশোকার চক্ষে জল পড়ে। মনে মনে আশী-র্ব্বাদ করেন,—"বাবা আমার! তোমা হ'তে যেন সুখী হই!"

(৩)

আজ বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, অশোকার কোলের মেয়েটী অবধি এক ঝিনুক দুধ পায় নাই। ক্ষুধায় সে, ধুকিয়া পড়িয়াছে। অনিলের-ছোট ভাই বোন্ দুটীও অনাহারে ছটফট করিতেছে। আজ অশোকা, একেবারে সম্পূর্ণরূপ নিরাশা হইয়াছেন। নিরাশা হইয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। পার্শ্বে অনিল উপবিষ্ট। অনিল, তাহার কোমল হাত খানি এক একবার মায়ের চক্ষে বুলাইতেছে ও অতি কষ্টে, রুদ্ধকণ্ঠে কহিতেছে,—"কাঁদ কেন মা!"

(৪)

এই সময়ে দ্বারদেশে আসিয়া এক ভিখারিণী ভিক্ষা মাগিল,—"মাগো! দুটী ভিক্ষা পাই!"

সে করুণস্বর, অশোকার কাণে বাজিল। শতগ্রন্থিময় ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া ভূমে শায়িতা ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু দুইটী পরিষ্কার করিয়া গদ্গদ-কণ্ঠে, তদধিক করুণস্বরে কহিলেন,—"মা! আজ এস,—চা'ল বাড়ন্ত।"

সবটা কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না

হইতে, টস্‌টস্‌ করিয়া দুই ফোঁটা চক্ষের জল পড়িল।

এ দৃশ্য দেখিয়া ভিখারিণীর হৃদয় দ্রব হইল। সে, আরও করুণস্বরে কহিল,—"কাঁদিতেছ কেন মা?"

অশোকা, কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন,—"না বাছা! ও কিছু নয়।"

ভিখারিণী কি ভাবিতেছিল; তাহার সংশয় বৃদ্ধি হইল। নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিল,—"না মা! আমাকে গোপন করিতেছ! আজ বুঝি কাহারও আহারাদি হয় নাই?"

অশোকা মুখখানি নত করিলেন। চক্ষু হইতে আবার দুই ফোঁটা জল পড়িল। ভিখারিণী, আপনা হইতে উত্তর পাইল। দুর্ভাগ্য-পরিবারের সকল দুঃখ বুঝিল। মনে মনে কহিল,—"ভগবান্! এতগুলি জীবের কপালে কি আজ অনাহার লিখিয়াছ?"

ভিখারিণী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে অশোকাকে কহিল,—"মা! যদি অপরাধ না লও, তবে এই চা'ল ক'টীতে ছেলেদের এক মুঠা ভাত রেঁধে দাও। আমি বৈষ্ণব,—কোন অজাত নই মা!"

ভিখারিণী ভিক্ষার চা'ল ক'টী ভূমে রাখিল। অশোকা নিষেধ করিলেন। কহিলেন,—"না মা! তোমার চা'ল তুমি নিয়ে যাও। আমাদের যা হয়"—

ভিখারিণী বাধা দিয়া কহিল,—"যা হয় কেন মা? নিত্য তোমাদের নিয়ে যাই, আর একমুঠা একদিন রেখে যেতে পারি না! না হয়, আর একদিন এসে চা'ল ক'টী ফিরে নিয়ে যাব।"

ভিখারিণী, ত্বরিত-পদে প্রস্থান করিল।

(৫)

অনিল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, আর স্থির থাকিতে পারিল না। ছল-ছল চক্ষে, কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিল,—"মা! ভিকিরী পাঁচ দোরে ভিক্ষে কোরে খায়; আজ সেই ভিকিরীর ভিক্ষের ভাত আমাদের খেতে হবে?"

বালক, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"যাই দেখি, বাবার কাছে;—তিনি কি বলেন!"

এবার অশোকাও কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের মুখ-চুম্বন করিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন,—"বাপ আমার! কোথায় যাবি তুই? তিনি কি আর তাঁয় আছেন? থাকলে কি আজ তোদের এই দশা?"

"তা হোক মা! একবার আমি যাই।"

"দুপুর গড়িয়ে গেছে। এখন অবধি, দুধের ছেলে তুই,—তোর পেটে এক ফোঁটা জল পড়েনি।—কেমন কো'রে অতটা পথ যাবি বাবা? বরং আমি রাঁধি,—দুটী খেয়ে যা।"

অশোকা, পুত্রের অঙ্গে পদ্মহস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনেক প্রবোধ দিলেন। অনিল, সে প্রবোধ মানিল না। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া সে, পিতার উদ্দেশে গমন করিল।

(৬)

অমরনাথ একজন ঘোর সুরাপায়ী। বাপের অনেক ধন-সম্পত্তি ছিল, একে একে সব খোয়াইয়াছে। শেষে পরিবারদিগকে পথে বসাইয়াছে। পাড়ার জমিদার-বাবুর বৈঠকখানায়, হতভাগ্য সুরাপানে মত্ত; এদিকে দুধের ছেলেগুলি অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। দিনান্তেও একবার তাহাদের খোঁজ লয় না। পতিব্রতা অশোকা, নিষ্ঠুর স্বামীর এ মর্ম্মান্তিক ব্যবহার অম্লান-বদনে সহ্য করেন, আর বিষাদে বিরলে ইষ্টদেবতার চরণে দিবানিশি কাঁদিতে থাকেন। তাহাতে মনের ভার অনেকটা লাঘব হয় বটে; কিন্তু অনাহার-ক্লিষ্ট শিশুগণের মলিন মুখ দেখিয়া, বুকটা এক একবার হু হু করিতে থাকে। তখন দেহ-ভার একান্ত দুর্ব্বিষহ হয়।

সুকুমার অনিল, ধুঁকিতে ধুঁকিতে, অতি কষ্টে পিতার সম্মুখীন হইল। হতভাগ্য পিতা তখন জমিদার-বাবুর সহিত "দুনিয়া ফাঁক" দেখিতেছিল। আরও দুই চারিজন পারিষদ চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া, বাবুর মজ্‌লিস সরগরম করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনারও ত্রুটী ছিল না। বিলাস-মণ্ডপে রসের স্রোত বহিতেছিল।

এমন সুখের সময়, এমন রঙ্গ-রসের 'গররা'র মুহূর্ত্তে, ম্লানমুখে অনিল সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, সভার শান্তিভঙ্গ করিল। পুত্রের এ বেয়াদবি, পিতার অসহ্য হইল। ক্রোধ-কষায়িত-নেত্রে, কর্কশ-কণ্ঠে কহিল,—"হতভাগা! এখানে এসেছিস কেন?"

নিষ্ঠুর পিতার কঠোর ভর্ৎসনা, ক্ষুধাতুর শিশুর বুকে বড়ই বাজিল। বালক একটী দীর্ঘনিশ্বাস

ত্যাগ করিয়া সভয়ে, সঙ্কুচিতভাবে কহিল,—"বাবা! এখনও অবধি আমরা কিছু খাই নাই। খুকিটী অবধি এক ঝিনুক"—

মুখের কথা মুখেই লীন হইল। পাপিষ্ঠ পিতা বাধা দিয়া আরও কর্কশ-কণ্ঠে কহিল,—"তা, এখানে মর্‌তে এসেছিস্ কেন? দূর হ।" অনিল অতি কষ্টে, মুখখানি কাঁদকাঁদ করিয়া আবার কহিল,—"বাবা! তবে কি আমরা না খেয়ে মর্‌বো?" পাপিষ্ঠের আর সহ্য হইল না। পাঁচ ইয়ারে মজ্‌লিসে বসিয়াছে,—তাহাদেরই সম্মুখে ঘরের কথা বাহির হইল! পাষণ্ড টলিতে টলিতে উঠিয়া, ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট, কচি-ছেলে-টীর বুকে মর্ম্মান্তিক পদাঘাত করিল।

"মাগো!" বলিয়া বালক ধরাশায়ী হইল। মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। অমনি সপ্রভু পারিষদবর্গ ত্রস্তভাবে "কি কর,—কি কর" বলিয়া মদ্যপায়ী উন্মত্ত পিশাচকে ধরিয়া ফেলিল। পিশাচ, আরক্ত-লোচনে, জড়িতস্বরে কহিল,—"দেখ দেখি বেটার আস্পর্দ্ধা! পুটে-খানেক ছেলে,—বাড়ী ব'য়ে, এখানে এসে, আমায় দীক্ ক'চ্ছে।"

অতঃপর পিশাচ, সরলা সহধর্ম্মিণীকে উদ্দেশ করিয়া, একটা অকথ্য কটু-বাক্য প্রয়োগ করিল। অমনি পিশাচ-মহলে, একটা "বাহবা" রব পড়িয়া গেল।

জমিদার-বাবু কি ভাবিয়া, কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া একটী টাকা আনাইলেন। পরে কহিলেন,—"একটা চাকর দিয়ে এই টাকাটা অমরের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

অতঃপর অনিলের প্রতি মুরুব্বিয়ানা চা'লে কহিলেন,—"যাও হে ছোক্‌রা!—বাড়ী যাও। ওঠ।"

অনিল তখনও ধরাশায়ী। উত্থানশক্তি-রহিত। অতি কষ্টে, "আঃ উঃ" করিতেছে। পিশাচ-পিতা আবার এক ধমক দিল। বালক, উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। আঘাতটা সাংঘাতিক হইয়াছে। অগত্যা, বালককে কোলে করিয়া বাটী রাখিয়া আসিতে, জমিদার-বাবু, সেই ভৃত্যকে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যও অতি সভয়ে, সন্তর্পণে, কোনও রকমে, সেই মুমূর্ষু বালককে, তাহার মায়ের নিকট গছাইয়া দিল। বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া অশোকা, প্রাণ-পুত্তলীকে কোলে লইয়া বসিলেন।

(৭)

হরি হরি!! মায়ের নিধি মায়ের কোলে শুইয়া, অতি কষ্টে, দুই চারিবার "মা" নাম ডাকিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষুও স্থির হইল। অশোকা বুঝিলেন,—পুত্রের অন্তিমকাল উপস্থিত। তিনি একদৃষ্টে, পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সে চক্ষের পলক আর পড়ে না। এইবার চিরদিনের মত মাতা-পুত্রের চারি চক্ষের মিলন হইল। যেমনি একজনের চক্ষু ফাটিয়া টস্‌টস্ করিয়া, দুই চারি ফোঁটা গরম রক্ত পড়িল,—হরি হরি হরি!!!—অমনি আর এক জনও অনন্তকালের জন্য দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল! ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও সে চক্ষু আর খুলিবে না!!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সম্বর হ্রদ।

রাজপুতানার অন্তর্গত সম্বর হ্রদের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। এই হ্রদ লবণের অক্ষয় ভাণ্ডার। কতকাল হইতে এখানে লবণ উৎপন্ন হইতেছে, কতকাল হইতে এই হ্রদের লবণ লোকে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তবু এখানকার লবণ ফুরাইতেছে না।

চলিত কথায় এখানকার লবণকে 'সামর লবণ' বলে। 'সম্বল লবণ'ও ইহার আর একটী নাম। ঔষধে যে সম্বর লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহা এই। বিলাতী লবণের আমদানী হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা অঞ্চলেও এই লবণ অনেক পাওয়া যাইত। এখনও বীরভূম, বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও রাজপুতানা প্রভৃতি অনেক স্থানে সামর লবণের চলন আছে। রাজপুতানায় ত এককালেই অন্য লবণের ব্যবহার নাই;—সেখানে কেবল সামর লবণ। লোকে সস্তাদরে ইহাই পায়, ইহাই খায়। সেখানে লিভারপুল সল্টের আমদানী নাই।

লিভারপুল সল্টের ন্যায় এ লবণ চূর্ণ করা নয়; করকচের মত অপরিষ্কারও নয়। শুভ্র

স্ফটিকের ন্যায় বেশ নির্ম্মল; ছোট, বড় নানা আকারের কোণ-বিশিষ্ট খণ্ড।

সম্বর হ্রদে মাটীর ভিতর হইতে আপনা আপনি জল চুয়াইয়া উঠে। কোন স্থানে এক হাত, কোন স্থানে দেড় হাত, আবার কোন স্থানে তিন চারি হাত গভীর। দুই তিন দিন পরে ঐ জল আপনিই জমিয়া যায়, জমিয়া গিয়া লবণ হয়। তাহার পর মজুরেরা কাটিয়া কাটিয়া লবণ তুলিয়া আনে। লবণ তোলা হইলে, দুই তিন দিন হ্রদের মধ্যে আর কিছুই জল থাকে না, তাহার পর পুনর্ব্বার জল চুয়াইয়া উঠে।

এ প্রকারে সম্বরের অক্ষয় ভাণ্ডারে কত যুগ-যুগান্তর হইতে জল উঠিতেছে, জল উঠিয়া শেষে জমিয়া লবণ হইয়া যাইতেছে; লোকে সেই লবণ তুলিতেছে আর খাইয়া আসিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে অবশ্য তাহার খাতা-পত্র নাই; খাতা-পত্র থাকিলেও আজি পর্য্যন্ত কত লবণ জন্মিল ও খরচ হইল, হয় ত তিনি তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না। এখনও কতকাল এই ভাণ্ডার হইতে লবণ উঠিতে থাকিবে, তাহারও স্থিরতা নাই।

সম্বরের কারিকরেরা বড় বড় লবণ-খণ্ড বিচিত্র আকারে ঘষিয়া নানা প্রকার অলঙ্কার ও স্ফটিকের ন্যায় চমৎকার মালা প্রস্তুত করে। আর এক কাজ হয়;——কারিকরেরা শর-কাটী দিয়া মনোহর অট্টালিকা প্রভৃতি বিবিধ গড়নের কাটামো নির্ম্মাণ করিয়া একরাত্রি সম্বর হ্রদের জলে ডুবাইয়া রাখে। অধিক নয়, এক রাত্রেই কাটীগুলির গায়ে লবণ জমিয়া আঁটিয়া ধরে। প্রাতঃকালে তুলিয়া আন,—দিব্য স্ফটিকময় হর্ম্ম্য; উজ্জ্বল স্ফটিকের স্তম্ভ, স্ফটিকের দেউল, স্ফটিকের ছাদ, সকলি বিশুদ্ধ স্ফটিকময়;— সূর্য্যকিরণে ঢল ঢল করিতে থাকে।

রাজপুতানার বায়ু সরস নয়। তাই সেখানে এই সকল সখের জিনিস শীঘ্র নষ্ট হয় না; শীতকাল হইতে সমস্ত গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত বেশ অক্ষুণ্ণ থাকে। বাঙ্গালার বায়ু অত্যন্ত সরস; এখানে ঐ সকল সখের জিনিস আনিলেই গলিয়া যায়। ঐ দ্রব্য গুলিকে স্থায়ী করিবার কোন কৌশল বাহির করিতে পারিলে, যে ঘরে লক্ষ্মী হাসিতেছেন, সেই সকল ঘরের হাসির শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য, অন্য অন্য সজ্জার সঙ্গে এ গুলিও গৃহ-সজ্জার একটা প্রধান উপকরণ হয়,— সামর লবণের আর একটা নূতন ব্যবসায় চলে। কিন্তু এই উৎকট ব্যাপারে রসায়ন-বিদ্যার হাত আছে কিনা, জানি না।

সম্বর হ্রদের ধারে সম্বর-নগর। ইহা জয়পুরের ও যোধপুরের মহারাজদিগের অধিকার-ভুক্ত। এখানে তাঁহাদের নাজিম ও বিচারালয় আছে। ইংরেজ-রাজ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট্, তখনকার মুসলমান-রাজ্যের নাজিম। এখনও স্বাধীন রাজাদের রাজ্যে পূর্ব্বাপর মুসলমান রীতি-নীতি চলিয়া আসিতেছে। সকল কাজ পার্শিতে চলে; বিচারাসনের স্থানেও আজিও চেয়ার-টেবল্ আসন পায় নাই,—হাকিমেরা উচ্চ গদির উপরে বড় বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসেন, আর পায়ের উপর পা রাখিয়া হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে মুদ্রিত চক্ষে আর্জ্জী শুনিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে সম্বর হ্রদও জয়পুরের এবং যোধপুরের রাজাদের অধিকারে ছিল। যে সময়ে লর্ড লিটন মাঞ্চেষ্টারের বাণিজ্যের উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তৎকালে তাঁহার মন্ত্রণা-কৌশলে সম্বর হ্রদও ক্রয় করা হয়। এখন সম্বর হ্রদ ইংরেজ-অধিকার-ভুক্ত। লবণের কার্য্যে ইংরেজ-কর্ম্মচারীই নিযুক্ত আছে। রাজপুতানার রেলওয়ের একটী শাখা সম্বর হ্রদের উপর পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তদ্দারা নানা স্থানে লবণের রপ্তানি হয়।

সম্বর-নগর নাকি পূর্ব্বকালের সম্বর-দৈত্যের রাজধানী। কিন্তু কেবল জনপ্রবাদ এ কথার প্রমাণ। কামদেব, সম্বর-দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। এখন তাহারই অস্থিমাংস হইতে নাকি লবণ জন্মিতেছে।

এখানে আর একটী পৌরাণিক ঘটনার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সে নিদর্শনটী "দেবযানীর কূপ"। সম্বরের লোকে ইহাকে "দেওদানী" কহে। নগরের প্রান্তে একটী পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীর ধারে গঙ্গাদেবীর মন্দির। লোকে বলে,—"ঐ পুষ্করিণীতে শর্ম্মিষ্ঠা, শুক্র-দুহিতা দেবযানীকে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং মহারাজ যযাতি ঐ কূপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন।" মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়,—"বৃষপর্ব্ব-

নগরের মধ্যে চৈত্ররথ বন। সেই বনে শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি দৈত্য-কন্যার সঙ্গে দেবযানী স্নান করিতে গিয়াছিলেন। পরে শর্ম্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর কলহ উপস্থিত হয়, তাই দৈত্য-কন্যা তাঁহাকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।" তবে এই স্থান কি পূর্ব্বকালের চৈত্ররথ বন? কিন্তু ঐতিহাসিক কিংবা ভৌগোলিক বিষয়ের অনুশীলন করা আজিকার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য—অন্য রকম। প্রায় আট বৎসর হইল,—আমি সম্বরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বেড়াইতে গিয়া সেখানে একটী আশ্চর্য্য নৈসর্গিক নিয়ম দেখিয়া আসিয়াছি। আজি এই প্রবন্ধে তাহাই লিখিয়া দিতেছি। যদ্যপি সাধারণের উপকার হয়, সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই জানেন, যে সকল লোক তামার কারখানায় কাজ করে, তাহাদের প্রায় বিসূচিকা * পীড়া হয় না। সে কারণ কেহ তাম্র-পাত্রে ভোজন করেন, কেহ কেহ ঘড়ীতে তাম্রের চেইন্ লাগাইয়া রাখেন; অনেকে আবার তাম্রের অঙ্গুরী পরেন। আমাদের দেশেও বহুকাল হইতে তাম্র চলিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা রেশমের সুতা দিয়া ছেলেদের কোমরে পুরাতন ত্রিশূলাঙ্কিত পয়সা পরাইয়া দেন। অনেকে তামার মাদুলীর ভিতরে নানা প্রকার ঔষধ পুরিয়া ধারণ করেন।

এই তাম্র ধাতুর সহিত সম্বরের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না।' কিন্তু সম্বরেরও আশ্চর্য্য ওলাউঠা নিবারণের শক্তি আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আশী বৎসরের বৃদ্ধ লোকেরাও সাম্বরে কখন বিসূচিকা হইতে দেখেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পিতামহের কাছেও কখন ওলাউঠার গল্প শুনেন নাই। বিসূচিকার পক্ষে সাম্বর ঋষ্যমূক হইয়া আছে।

সাম্বরের এরূপ বিসূচিকা নিবারণ করিবার শক্তি কিসে? তথাকার জলে, কিংবা বায়ুতে? সম্বর হ্রদের জল লবণাক্ত বটে, কিন্তু সেখানকার সকল কূপের জল লবণাক্ত নয়। দেবযানী কূপের জলও ভাল। আবার হ্রদের গর্ভের মধ্যেই জলের ধার হইতে দুই হাত দূরের মাটী খুঁড়িয়া জল বাহির কর, তাহাও লোণা নয়। এখানে বন-জঙ্গল নাই, বসুমতীর বুক কেবল বালুকারাশিতে ঢাকা পড়িয়া আছে। কিন্তু সেই বালির উপরে প্রচুর-পরিমাণে গম, যব প্রভৃতি শস্য জন্মে।

এখানকার বায়ু, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লবণ-কণায় পরিপূর্ণ। রেলওয়ে হইতে নামিয়া দুই চারি মিনিট অপেক্ষা কর, অমনি লবণে মুখ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। জিহ্বা দিয়া আপনার ঠোঁট চাটিয়া দেখ,—কেবলি লবণ। বহুকাল হইতে আমি লবণ খাই না, এককালে কোন প্রকার লবণ ব্যবহার করি না। লবণ ব্যবহার করা অভ্যাস নাই বলিয়া সম্বরে আমার কি প্রকার কষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। পুনঃপুন মুখ ধুইতাম, ভিজা গামছা দিয়া মুখ ও নাসিকা মুছিতাম, তবু স্বস্তিবোধ হইত না। লবণকণা বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র কেবল উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, নিশ্বাসের সঙ্গে লবণকণা নাসিকায়, ফুসফুসে ও মুখে প্রবেশ করিতেছে,

* *Dr. Burq, of Paris, who had been investiagting the therapeutic properties of metals variously applied, made the discovery in 1849 that workers in copper, foundrymen, machinists and others had experienced a wonderful exemption from* **cholera.** *In reporting his observations to the Academy, in Paris, he said, "The preventive effect was no doubt produced directly by contact, and in proportion to the amount of the protecting metal and indirectly by simple vicintly as in the case of those who are near a lightning rod: at least, it is by the latter mode only that we can account for marked preservation which was experienced by the neighbourhood of nearly all the copper foundries unless it may be attributed to the emanations form the metal, caused by its fusion, or, rather, by its manipulation in the workshop, either in the from of highly attenuated particles, or effluvia of a peculiar character.*

Arndt's System of Medicine.

তাহাতে মুখ ধুইলে কিংবা মুখ মুছিলে স্বস্তি হইবে।

সম্বরে ওলাউঠা হয় না, কোনও কালে ওলাউঠা হয় নাই ; বোধ করি, ঐ লবণকণাই বিসূচিকার বিষ নষ্ট করিয়া দেয়। এই লবণ বিসূচিকার নিবারক। যে যে কারণে বিসূচিকার দোষ উৎপন্ন হয়, সম্বরের মাটীতে, জলে কিংবা বায়ুতে সে সকল দোষ উৎপন্ন হইতে পারে না।

সামর লবণের এই প্রকার বিসূচিকা-নিবারণের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া গত পাঁচ বৎসর হইতে আমি উক্তরোগে সামর লবণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এখন এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে,—ঐ লবণে কেবল রোগ নিবারণ করে, এমত নহে, রোগসত্ত্বেও উহা সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। কোন বাটীতে অথবা কোন গ্রামে ওলাউঠা হইলে সেখানকার লোককে সামর লবণ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেই। যে প্রণালীতে সামর লবণ ব্যবহার করাইয়া উপকার হইতে দেখিয়াছি, এখানে তাহাও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। একটী পাত্রে নূতন অঙ্গারচূর্ণ এবং সামর লবণ গুলিয়া তাহাতে মোটা চাদর কিংবা পর্দা ভিজাইবে ; পরে সেই পর্দা ঘরের সমস্ত দ্বারে ও জানালায় ঝুলাইয়া দিবে। পর্দা শুকাইয়া যাইলে পুনর্ব্বার ঐ জলে ভিজাইয়া লইবে। তদ্ভিন্ন উক্ত লবণে পুঁটুলী বাঁধিয়া ঘরের ভিতরে আট দশ স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে ঐ সকল পুঁটুলীতে জলের ছিটা দিবে। জলের ছিটা দিলে লবণকণা সহজে বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। যাঁহাদের ঘরে টানা পাখা আছে, সে সকল লোকের আরও সুবিধা। পুঁটুলীগুলি টানাপাখায় ঝুলাইয়া দিলে, চাকরেরা যখন পা মেলিয়া মুদ্রিত-নয়নে ঢুলিতে ঢুলিতে পাখা টানিতে থাকে, সে সময়ে বায়ুর হিল্লোলে সমস্ত লবণকণা ঘরময় হইয়া পড়ে। ঐ লবণ, জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করাও আবশ্যক। আমি পাঠকবর্গকে এবং চিকিৎসক মহোদয়দিগকে বিশেষ অনুরোধ করি, তাঁহারা দেখিবেন,—বিসূচিকার মহামারী স্থানে যত্নপূর্ব্বক এই প্রক্রিয়া করিলে আর নূতন কাহারও পীড়া জন্মিবে না। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক,—আমি যে প্রণালীতে লবণ ব্যবহার করাইতেছি, যদি বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অন্য উপায় তাহার চেয়ে অধিক প্রশস্ত বিবেচনা করেন, তবে সে সকল উপায়ও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কাহারও ওলাউঠা হইলেও এই লবণ সেবনে বিলক্ষণ উপকার হইতে দেখিয়াছি।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

মুরশিদাবাদের নবাব।

সিরাজ উদ্দৌলা।

খুব শীঘ্রই সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত করিলাম। "সিরাজ উদ্দৌলা সম্বন্ধে দুইটী নূতন কথা শুনাইব" এই প্রতিজ্ঞা গত বৎসর ভাদ্রমাসে 'মুরশিদাবাদের নবাব' প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি ; এবৎসর ভাদ্রমাসে তন্মধ্যে প্রথম কথাটী সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য অদ্য এই লেখনী-ধারণ। এই সত্বরতার জন্য পাঠকগণ আমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃতানুসরণ করা যা'ক।

অতি সঙ্কট-সময়েই সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহার মাতামহ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দিকে যেমন মারহাট্টা, পিণ্ডারী এবং শিখদিগের অস্ত্রবলে মোগল-সাম্রাজ্য টলমল-প্রায়, তেমনি বঙ্গদেশে সমুদ্রের ও মেঘনা-নদীর উপকূলস্থ জনপদ সমস্ত পোর্টুগীজ এবং মঘ-দস্যুদিগের আক্রমণে অস্থির। পক্ষান্তরে আবার ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দিনেমারেরা বাণিজ্যের ভাণ করিয়া স্থানে স্থানে ভূমি অধিকার করিয়া, দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে বঙ্গদেশে রাজ্য রক্ষার জন্য এক জন অসাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন কাণ্ডারীর আবশ্যক ছিল ; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে হিতাহিত-জ্ঞানহীন এক যথেচ্ছাচারী যুবক,—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার রাজাসনে আসীন হইলেন!

আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহার অন্যান্য দৌহিত্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সিরাজ উদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আপনার পদে অধিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া স্থিরও করিয়াছিলেন। নবাব ও তাঁহার অধীনস্থ সকলেই

সিরাজ উদ্দৌলার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারও করিতেন, তথাপি আলীবর্দ্দীর শীঘ্র মৃত্যু হইতেছে না দেখিয়া সিরাজ উদ্দৌলার আর বিলম্ব সহ্য হইল না; তিনি তাঁহার এমন বৎসল মাতামহকে পদচ্যুত করিয়া শীঘ্র নবাব হইবার জন্য অস্ত্রধা ণ করিয়াছিলেন।

নবাবী-বুদ্ধিই সৃষ্টি-ছাড়া। সুবুদ্ধি লোকে সিরাজ উদ্দৌলার এমন গর্হিত কার্য্যের পর আর তাহার মুখ-দর্শন করিত না, কিন্তু আলীবর্দ্দী বুঝিলেন অন্যরূপ। িনি বলিলেন যে, "ইয়হ লেড়কা বড়া জবর্দস্ত আদমি হোগা" এবং বিবেচনা করিলেন যে, যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে রাজ্য-শাসনের জন্য সিরাজ উদ্দৌলাই উপযুক্ত ব্যক্তি হইবে। সেই বিশ্বাসে তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া নবাবী দিতে আদেশ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। এমন অব্যবস্থার কু-ফল অচিরাৎ ফলিল এবং বঙ্গদেশের শাসন-ভার দেখিতে দেখিতে অন্যের হস্তে চিরকালের জন্য ন্যস্ত হইল। সেই সকল কথা ইতিহাসেই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, আমার আর তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমি যে দুইটী কাহিনী বিবৃত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা করিতেই আমি এক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইল। নবাব-সরকারের চির-প্রচলিত প্রথানুসারে মুরশিদাবাদে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত গমী-পালন হইল অর্থাৎ নবাব-সরকারের অথবা নবাব-সরকারের অধীনস্থ কোনও আমীর ওমরার কিংবা রাজা-রাজড়ার নহবত বাজিল না, মুরশিদাবাদ-সহরে কাহারও বিবাহ-সাদী হইল না এবং কেহ কোনরূপ আনন্দ-উৎসবও করিতে পারিল না। নবাবী আমলে এইরূপে গমী অর্থাৎ শোকপ্রকাশ করা হইত।

এমন দীর্ঘ গমীর পরে নূতন-নবাব, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মসনদ্-আরোহণের জন্য একটী শুভদিন (?) শুভক্ষণ (?) নির্দ্দিষ্ট হইল। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরাও দিনক্ষণের হিতাহিত মানিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্য এবং উৎসব উপলক্ষে আম্‌দরবার হওয়ার রীতি আছে। সেআম্‌দরবার বড় সমারোহ ব্যাপার। তখনকার মুরশিদাবাদের নবাবের ক্ষমতাও যেমন; ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদও তদ্রূপ ছিল; বহুলোকের সমাগম হইবে বলিয়া এক বিস্তৃত স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তাহা নানা রঙ্গে রঞ্জিত কাশ্মীরি-শালের এক চন্দ্রাতপের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। এখন যেমন সভাগৃহ,—উদ্ভিজ্জ, লতা, পাতা এবং সামান্য পতাকা-রাজী দ্বারা সজ্জিত হইয়া থাকে, সিরাজ উদ্দৌলার সময় সে ব্যবহার ছিল না; ছিল,—স্বর্ণ রৌপ্য-দ্রব্য এবং পশ্মিনা ও রেশমী যবনিকা দ্বারা সুশোভন করার প্রথা। মণি-কাঞ্চনে মণ্ডিত আশাসোঁটা, আড়ানী, ছত্র, দণ্ড, চামর, পঞ্জা, মাহি, মোরাতব এবং আর কত যে বহুপ্রকার নবাবী সলতনতের চিহ্ন ছিল, তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারি না। এক একটা হস্তি-পৃষ্ঠের ঝুল কিংবা এক একটা অশ্বের জিন বর্ত্তমান কালের এক এক জন জমিদারের সম্পত্তি। এই সকল দ্রব্যই তখন ছিল,—নবাব সুবাদিগের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় এবং পদমর্য্যাদার আবশ্যকীয় চিহ্ন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বেতন-ভোগী শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলী খাঁ বাহাদুরের ফীলখানায় যত হস্তী, অশ্বশালায় যত ঘোটক ও জহরৎ-খানায় যে হীরা, মাণিক, মুক্তা ও শাল দোশালা দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া অক্ষুণ্ণ পুরা-নবাবী আমলের ঐশ্বর্য্যের হিসাব করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য। বোধ হয়, পাঠক স্বীয় স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। প্রকৃত যোদ্ধা পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজী সৈনিক পুরুষ যাহারা সেই দিবস মুরশিদাবাদে উপস্থিত ছিল, তাহারাও আসিয়া দরবারের চতুর্দ্দিকে সুন্দর বেশভূষা গ্রহণ-পূর্ব্বক সভার শোভা-বর্দ্ধন করিতেছিল। হস্তিপৃষ্ঠে রৌপ্য-ডঙ্কা, অশ্বপৃষ্ঠে নাগারা, নহবতে রৌষণ চৌকী, তুরী, ভেরী ও নানাবিধ চিত্তোৎসাহী রণবাদ্য, দর্শকবৃন্দের মন উল্লাসিত করিতেছিল এবং সভাস্থলে নবাবের 'আকোরবা'রা, অতি উচ্চ হইতে ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত পররাষ্ট্র সকলের দূত ও এল্‌চিগণ, নেজামতের অধীনস্থ জমিদার, কিংবা তাহাদের প্রতিনিধিগণ, নবাবের আগমন অপেক্ষায় স্ব স্ব স্থানে সমবেত ছিল। বাহিরে অগণ্য ফকীর-ফকরা, ভিক্ষুক এবং তামাসবীন্‌দর্শক দ্বারা এ কটী মনুষ্য-সমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। রাজ্যের নূতন শাসন-কর্ত্তা শাসন-ভার গ্রহণ করিবেন, সকলে

তাঁহাকে দেখিবে; তিনি কি বলেন, তাহা শুনিবে,—সকলের মনে উল্লাস, সকলের মনে উৎসাহ এবং সকলের মুখেই আনন্দের হাসি। পুরাতন কর্ম্মচারীরা ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহারা নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অধীনে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ছিলেন, অতএব সিরাজ উদ্দৌলাও তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা বিতরণ করিতে ত্রুটী করিবেন না। পক্ষান্তরে তাঁহার বাল্যবন্ধুরা, বিশেষত আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে যখন সিরাজ উদ্দৌলা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন যে সকল লোকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, বিদ্রোহিতায় তাঁহাকে সাহায্য ও তাঁহার পোষকতা করিয়াছিল, তাহাদের আশা-ভরসার ত সীমা পরিসীমা ছিল না। কেহ ভাবিতেছিলেন যে, আমি দেওয়ান হইব; কেহ সৈন্যাধ্যক্ষ, কেহ নাজীর, কেহ উজীর হইবার লুব্ধ আশ্বাসে আশাসিত হইয়া বসিয়া ছিলেন। বাহিরে ভিক্ষুকেরা ভাবিতেছিল যে, আজ নূতন নবাব কোন্ লক্ষ টাকা দরিদ্র দীনহীনদিগকে বিতরণ না করিবেন! এইরূপে সকলেই কোনও না কোনও লাভের প্রত্যাশায় পথের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। এমন সময় গুড়ুম গুড়ুম করিয়া তোপধ্বনি হইতে লাগিল, "জোনাবালী আসিতেছেন" বলিয়া শব্দের একটা রোল উঠিল। অমনি গভীর রবে ডঙ্কা সকল বাজিয়া উঠিল, নাগারা সকল গুড় গুড় করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিল, নহবতখানায় রৌষণ-চৌকী ও তুরী, ভেরী বাজিল। নবাবের চতুর্দ্দোলা দেখা মাত্রে বাহিরের সকল লোকে, "জয় নবাব-সাহেব কী জয়" "জয় সিরাজ উদ্দৌলা কী জয়" "জয় জোনাব আলী কী জয়" শব্দ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নবাবের যান আসিয়া দরবার-স্থানে উপস্থিত হইল। দরবারস্থিত সকল ব্যক্তি, সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সিরাজ উদ্দৌলা আসন গ্রহণ করিবামাত্রেই সকলে মস্তক নত করিয়া সেলামের উপর সেলাম, কুর্নিশের উপর কুর্নিশ করিয়া নবাবকে অভিবাদন করিলেন। তদনন্তর চারিজন নকীব সভাস্থলের চারি কোণে দাঁড়াইয়া সিরাজ উদ্দৌলার নাম ও তাঁহার নবাবী-উপাধি সকল উচ্চস্বরে ফুকারিয়া ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহার পরে প্রধান মোল্লা এক খানা কোরান হস্তে করিয়া তাহার একাংশ পাঠ করণান্তে সিরাজ উদ্দৌলাকে দোয়া অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ করিলেন। মোল্লা সাহেব প্রস্থান করিলে পর সকলে নজর প্রদানপূর্ব্বক নবাবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে নবাবের আকোরবা অর্থাৎ জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রভৃতি সম্পর্কীয় ব্যক্তি, তৎপর পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরা নজর দিলেন। ইহার পরেই যে সকল ব্যক্তিকে সম্মানিত করার আবশ্যক ছিল, তাহাদিগকে খেলাৎ দেওয়ার কথা; কিন্তু তাহা হওয়ার পূর্ব্বেই সিরাজ উদ্দৌলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এইক্ষণে আমি নবাব হইয়াছি কি না?"

অবশ্যই তখন যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা হিন্দি ভাষাতেই হইয়াছিল। কিন্তু আমার অনভিজ্ঞতা হেতু হিন্দিভাষা ব্যবহার করিতে গেলে তাহা বিকৃত হইবে; সুতরাং তাহার অর্থ আমি বাঙ্গালাতে প্রকাশ করিব।

নবাবের প্রশ্ন শুনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ উত্তর করিলেন যে, "অবশ্য হইয়াছেন এবং তাহা কেবল এখন নহে, আপনার মাতামহের জীবদ্দশাতেই আমরা সকলে আপনাকে নবাব বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছি।"

নবাব।—আচ্ছা, তবে আমি এখন হুকুম প্রচার করিতে পারি?

দেওয়ান।—তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আপনি যে ইচ্ছা হুকুম প্রচার করিতে পারেন।

নবাব।—তবে আমার সম্মুখে আমার আতালিক (শিক্ষক) কুলী খাঁকে হাজির কর।

ইহার পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলা যখন আলীবর্দ্দী খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অধিকাংশ লোকে বীতশ্রদ্ধ ছিল। অনেকের বিবেচনা—"এই পাষণ্ডের হস্তে শাসন-ভার ন্যস্ত হইলে বঙ্গের আর মঙ্গল হইবে না;"—তাই তাহারা সিরাজ উদ্দৌলা মসনদে আরোহণ করিয়া কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক ছিল। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিল যে, "তক্তে বসিবা মাত্র, সকল কার্য্যের পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলা তাহার বাল্যকালের শিক্ষককে স্মরণ করিয়াছে", তখন ইহাঁর প্রতি তাহাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত কুসংস্কারগুলি দ্রবীভূত হইয়া দ্বিগুণ ভাবে ভক্তির উদয় হইল। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানদিগের মধ্যেও গুরুভক্তি অতি প্রশংসনীয়;

অতএব দরবারের সকল লোকের বিবেচনায় সিরাজ উদ্দৌলা উত্তম ভক্ত এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সুস্থির হইল। নেজামতের পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মনেও সাহস হইল যে, এমন ধার্ম্মিক নবাবের হস্তে তাহাদের কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না। যখন কুলী খাঁ শুনিল যে, তাহার শাকরেদ তাহাকে ডাকিয়াছেন, তখন সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল। ভাবিল যে, এতদিনে তাহার দুঃখ দূর হইল। দরিদ্রের আশা সমুদ্র-স্বরূপ। প্রধান মন্ত্রীর কিংবা প্রধান কাজীর পদ না হইলেও সে তৎতুল্য উচ্চ একটা পদ পাইবে,—এইরূপ কুলী খাঁ আশালুব্ধ হইয়া হৃষ্টচিত্তে সিরাজ উদ্দৌলার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঞাজী কিংবা গুরু মহাশয়কে কে কবে খাতির করিয়া থাকে? কিন্তু অদ্য কুলী খাঁ, নবাবের নিকট চিহ্নিত হইয়াছে দেখিয়া, উভয়-পার্শ্বস্থ লোক সসম্ভ্রমে এবং আনন্দের সহিত তাহাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিল; ফকীরেরা তাহাকে দেখিয়া "ভালা হোয়" বলিয়া দোয়া করিতে লাগিল।

কুলী খাঁ আসিয়া তক্তের সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র সিরাজ উদ্দৌলা চক্ষু লাল করিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, "কেঁও হারামজাদা! তব্ তুঝে ইয়াদ্ নেহি থা, কি হাম এক রোজ ইয়ে তক্তপর বৈঠেঙ্গে!"

সকলে অবাক্ হইল। কেহ কিছুই বুঝিল না। কেবল কুলী খাঁ সব বুঝিলেন। তাঁহার আশা নির্ম্মূল হইল। অন্তর কাঁপিতে লাগিল। ফল কথা এই যে, আমাদের দেশের গুরুমহাশয়েরা বিশেষত মুসলমান মিঞাজীরা অত্যন্ত উগ্রস্বভাবের ব্যক্তি হইয়া থাকেন। ছাত্রদিগকে বেত্রাঘাত করিতে তাঁহারা প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন; পাত্রাপাত্রের ভেদাভেদ করেন না। কুলী খাঁ সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। সিরাজ উদ্দৌলাকে পড়াইবার সময় তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি ব্যাঘ্র-শাবক লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। যে বালক নবাবের দৌহিত্র এবং যাঁহার একদিন নবাব হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁহার প্রতিও তিনি অন্য বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং বেত্রাঘাত করিতেও ক্রটী করেন নাই। অন্য বালকে গুরুর বেত্রাঘাত শীঘ্র ভুলিয়া যায়, কিন্তু সিরাজ উদ্দৌলার চরিত্র ভিন্নরূপে গঠিত। বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক লাগিত। ক্ষমতা থাকিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ লইতে ক্রটী করিতেন না; কিন্তু সে ক্ষমতা তখন তাঁহার ছিল না, অতএব প্রত্যেক আঘাতের কথা তিনি যত্নে মনের মধ্যে শক্ত গ্রন্থি বন্ধন করিয়া রাখিয়া অবকাশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই অবকাশ এতদিনে উপস্থিত।

কুলী খাঁ এখনও স্বীয় বিপদ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে নাই, তথাপি নবাবের লক্ষণ যে ভাল নয়, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল অতএব নবাবের প্রশ্নে সে কোন উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল। নবাব পুনরায় বলিয়া উঠিলেন যে, "কেঁও জবাব নেহি দেতা. সুয়ার কা জনা? জল্লাদ! সামনে আও!"

জল্লাদকে ডাকাতে সকলে প্রমাদ গণিল। তথাপি নবাবের মনে যে কু-অভিপ্রায় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারে নাই। তাহারা অনুভব করিল যে, "কুলী খাঁ যেমন নবাবকে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধের জন্য নবাব জল্লাদকে দিয়া বুঝি কুলী খাঁকে বেত্রাঘাত করাইবেন অথবা অন্যরূপে অবমানিত করিবেন।"

এই সময় দরবার যেন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল। সমবেত চারি পাঁচ সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কাহারও মুখে কোন বাক্য, কিংবা শব্দ নাই,—সকলেই চুপ! কেবল তাহারা গলা বাড়াইয়া নবাব ও কুলী খাঁর দিকে স্থিরচিত্তে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। বাহিরের হাতী, ঘোড়া, উট, বলদ গুলাও যেন কোন বিপদাশঙ্কায় নীরবে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

জল্লাদ তক্তের সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি সিরাজ উদ্দৌলা উচ্চৈঃস্বরে হুকুম করিলেন যে, "ইস্ বজ্জাৎকো কতল করো।"

এই শব্দ যদিও মানব-কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল, তথাপি কুলী খাঁর কর্ণকুহরে তাহা যেন বজ্রাঘাতের ন্যায় প্রবেশ করিল। এতক্ষণ এই বৃদ্ধের শরীর দরদরিত ঘর্ম্মে সিক্ত-বিষিক্ত হইতেছিল, কিন্তু কতলের নাম শুনিবামাত্র সেই ঘর্ম্ম মুহূর্ত্ত মধ্যে এককালে শুকাইয়া গেল। তাহার রক্তের স্পন্দন ক্ষান্ত হইল, কণ্ঠের রস কোথা উড়িয়া গেল, মুখে ধূলা উড়িতে লাগিল,

বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা রহিত হইয়া গেল, চক্ষুর উপর যেন একটা পর্দা পড়িয়া সকলই অন্ধকারবৎ করিয়া দিল। বলশূন্য হওয়াতে শরীর থর্ থর কাঁপিতে আরম্ভ করিল এবং দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে অতি কঠিন হইয়া উঠিল; তথাপি সে বহুকষ্টে একবার আল্লার নাম উচ্চারণ করিল।

কুলী খাঁর মুখে আল্লার নাম শুনিয়া দুরাত্মা সিরাজ উদ্দৌলা "ইঁহা আল্লা তেরা ক্যা ফায়দা করেগা? ইঁহাকে আল্লা হাম" বলিয়া আপন বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

বেগতিক দেখিয়া মীর জাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তক্তের নিকট অগ্রসর হইলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া বিনীত-ভাবে নবাবকে বুঝাইতে লাগিলেন। যাহাতে তিনি কতলের হুকুম উঠাইয়া লয়েন, এ বিষয়ে তাঁহারা বিধিমত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সিরাজ, তাহা শুনিলেন না। তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরে নবাব যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে "তোমরা এখন কুলী খাঁর নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছ, কিন্তু এ যখন আমাকে বেত্রাঘাত করিত, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তখন ত আমাকে উহার বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিতে তোমরা আইস নাই! পৃথিবীর ধর্ম্মই এই যে, যাহার যখন যে এক্তিয়ার থাকে, তখন সে তাহা যথাশক্তি নির্দ্দয়ভাবে পরিচালন করে। কুলী খাঁ যখন আমাকে তাহার এক্তিয়ারে পাইয়াছিল, তখন সে আমাকে ছাড়ে নাই; এখন আমি তাহাকে আমার এক্তিয়ারে পাইয়াছি, আমি তাহাকে ছাড়িব কেন? কখনই ছাড়িব না।"

তথাপি তাহারা ক্ষান্ত হইতেছে না দেখিয়া সিরাজ উদ্দৌলা ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এখানে নবাব কে? আমি না তোমরা? যদি আমি হই, তাহা হইলে তোমরা চলিয়া যাও। নচেৎ তোমাদেরও মঙ্গল হইবে না।" কাজেই তাঁহারা অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া আসিলেন।

জল্লাদও এতক্ষণ ইতস্তত করিতেছিল। কারণ, জল্লাদ হইলে কি হয়, সেও ত মানুষ; তাহারও ত মায়া-দয়া আছে। কোনও কৌশলে কতলের হুকুমটা ফিরে কিনা, সে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সিরাজ উদ্দৌলা তাহা বুঝিতে পারিয়া জল্লাদকে আরক্ত-নয়নে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন যে, "আগর চে তুম হামারা হুকুম তামিল নেহি করেগা তো হাম অপনে হাতসে উস্কা আওর তেরা—দোনোকা সির দো টুকরা করেঙ্গে।"

জল্লাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া, কুলী খাঁর হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। অভিপ্রায় এই যে, দরবারের বাহিরে লইয়া গিয়া রীতিমত কতলের কার্য্য সমাধা করিবে, কিন্তু সিরাজ উদ্দৌলা তাহা তাহাকে করিতে দিলেন না। বলিলেন যে, "বাহর মৎ লে যাও। ইঁহা হামারে সামনে কতল করো।"

তাহাই হইল। কুলী খাঁর স্কন্ধে কোপ পড়িল,—সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, জোরে দীর্ঘনিশ্বাসও কেহ ফেলিতে পারিলেন না; পাছে নবাব তাহা শুনিয়া বিরক্ত হন। মস্তকের উপরে যেন দশ মন ভার আসিয়া উপস্থিত হইল,—এইরূপ সকলের বোধ হইতে লাগিল।

মুণ্ডটা মাটিতে কয়েক বার উলট-পালট খাইয়া, কি একটা দ্রব্যে আটকাইয়া ঊর্দ্ধমুখে দুই চক্ষু মেলিয়া স্থির হইয়া রহিল। কায়াটা কতকক্ষণ ছটফট করিয়া রক্ত উদ্গিরণ-পূর্ব্বক একপার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত, ভয়ে আকাট; কাহারও মুখে কোন বাক্য সরে না। মৃত্তিকা পানে সকলের দৃষ্টি, নবাবের দিকে তাকাইতে কাহারও সাহস হয় না। পাছে তাহারও প্রতিকূলে নবাব কোন শক্ত হুকুম প্রচার করেন। স্বীয় স্বীয় প্রাণ লইয়া কিসে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যস্ত হইলেন। দরবারে আসিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাইয়া, যেন কোন নৃশংস নরঘাতী পশুর পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ সকলের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কিসে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, তজ্জন্য সকলেই মনে মনে "ত্রাহি মাং মধুসূদন" বলিয়া জপ করিতে লাগিলেন। পরে যখন সিরাজ উদ্দৌলা "দরবার বরখাস্ত" বলিয়া উঠিয়া গেলেন, তখন যেন সকলের ধড়ে প্রাণ আসিল। যে যেমন করিয়া পারিলেন, প্রস্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িলেন এবং ম্লান-বদনে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন।

কুলী খাঁর শিরশ্ছেদ হওয়ার পরে তাঁহার দেহ এবং মুণ্ডটা একটা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া, মুখ বন্ধ করা হইল। পরে পূর্ব্ব-প্রথানুসারে এই থলিয়াটা একটা হস্তীর পৃষ্ঠে গোরস্থানে প্রেরিত হইল।

কথিত আছে যে, মুরশিদাবাদের চকের মধ্য দিয়া যখন হস্তীটা যাইতেছিল, তখন এক স্থানে সে হঠাৎ থামিয়া খাড়া হইল। মাহুত ইহার কারণ জানিবার জন্য মাটির দিকে তাকাইয়া দেখিল যে, থলিয়া হইতে কতক রক্ত হাতীর গা বহিয়া মৃত্তিকায় ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে এবং হস্তীটা শুণ্ডদ্বারা তাহার ঘ্রাণ লইতেছে। অনেক প্রহারের পর হস্তী পুনরায় যাইতে আরম্ভ করিল। ইহার পরে যখন সিরাজ উদ্দৌলার অদৃষ্টেও ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ মীর জাফরের পুত্র মীরণের হস্তে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল, তখনও সেই হস্তীটার পৃষ্ঠে তাঁহার মৃতদেহ গোর-স্থানে প্রেরিত হওয়ার সময় ঠিক এই স্থানে আসিয়া হস্তীটা থামিয়াছিল। মাহুত নাকি দেখিয়াছিল যে, হস্তী দাঁড়াইবা মাত্র সিরাজ উদ্দৌলার দেহ হইতে কয়েক ফোঁটা রক্ত কুলী খাঁর রক্তের স্থানের উপরে পড়িতে আরম্ভ করিল। লোকে বলে যে, কুলী খাঁর হত্যার এইরূপে প্রতিশোধ হইয়াছিল।

আমার প্রস্তাবিত সিরাজ উদ্দৌলার কাহিনীর ইহাই হইল,—প্রথম অঙ্ক।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু।

নবদ্বীপ-মহিমা।*

আটশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ, বঙ্গের রাজ-কুল-লক্ষ্মীর আবাস-ভূমি ছিল। লক্ষ্মী তদবধি অন্তর্হিতা হইয়াছেন—সেন-রাজবংশ আর নাই। বল্লালের সেই রাজ-প্রাসাদও আর নাই;—ভগ্নাবশেষও কালে কালে কাল-কবলিত-প্রায়। এখন কেবল "বল্লালঢিবি" র মৃত্তিকাস্তূপ, মহাকালের চর্ব্বিতাবশেষ স্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে। মহাকাল সমস্ত গ্রাস করিতে পারে না, এইটুকুই মহাকালের গুণ। লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার পদচিহ্ন রহিয়া যায়। গৌরব কখনই একেবারে লোপ পায় না,—কোঁথাও না কোথাও তাঁহার অবশিষ্ট কণা পড়িয়া থাকিবেই থাকিবে। দৃশ্য খুব ভীষণ বটে। তা অবশেষ-মাত্রই ভীষণ। প্রাণহীন দেহ, প্রাণিহীন গেহ, স্তূপাকৃতি রাজপুরী, জনশূন্য নগরী,—সবই কঙ্কাল, সবই ভীষণ। কিন্তু তবু ইহা ইতিহাস। কালের বক্ষে দাঁড়াইয়া ইহারা কালকে ভ্রুকুটি-ভঙ্গি করিতে থাকে। কি ভয়ঙ্কর!

নবদ্বীপও সেইরূপ এক মহা ভীষণ দৃশ্য! বল্লালের সে রাজ-প্রাসাদের স্থানে এখন পড়িয়া রহিয়াছে,—এক মৃত্তিকাস্তূপ—মূর্ত্তিমান্ "লুপ্ত গৌরব"—মূর্ত্তিমান্ ইতিহাস। কিন্তু হায়! কয়জনের মনে এই দৃশ্য, সেই গৌরবের রহস্য ভেদ করিবার প্রবৃত্তি উত্তেজনা করে? কঙ্কাল দেখিয়া প্রাণীর চিন্তা আমাদের মধ্যে কয়জনের মনে উদিত হয়? আমরা এমনই হৃদয়হীন, মনুষ্যত্ব-হীন, অধম হইয়া পড়িয়াছি। এমত অবস্থায় যে একজনও নবদ্বীপ-মহিমা-রহস্যের উদ্ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাই পরম সুখের বিষয় বলিতে হইবে। ইতিহাসাংশ খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ খুব প্রশংসনীয়।

এ ছাড়া নবদ্বীপ-মহিমার আর এক প্রকাণ্ড অংশ আছে; তাহা অধিকতর উজ্জ্বল ও মহান্। রাজলক্ষ্মীই নবদ্বীপে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সরস্বতী এতকাল সমান-সমুজ্জ্বল ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। বিশদ প্রভায় সমস্ত বঙ্গ কেন, জগৎ আলোকিত করিতেছিলেন।

"এক ন্যায়-দর্শনে বঙ্গদেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। এই নবদ্বীপই সেই ন্যায়দর্শনের জন্মভূমি। এই স্থানে ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ভারতের কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। এই স্থানে অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উৎপন্ন ও প্রাদুর্ভূত হইয়া, ন্যায়ের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক, গভীরভাব-পরিপূর্ণ গ্রন্থ-সমূহ

*নবদ্বীপ-মহিমা অর্থাৎ নবদ্বীপের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য বার আনা।

রচনা করিয়া, বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। এইখানে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব সার্ব্বভৌম জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, তৎকালে নিবদ্ধপ্রায় গৌতম-শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপ-ভূমিকে অলঙ্কৃত করেন। এইস্থানে কুশাগ্র-বুদ্ধি তার্কিক-চূড়ামণি রঘুনাথ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করত নবদ্বীপের প্রধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়তত্ত্বে কয়জন মনুষ্য পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এই স্থানেই মথুরানাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামভদ্র সার্ব্বভৌম; জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য এবং বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উৎপন্ন হইয়া ন্যায়ের বহুবিধ পুস্তকরত্নে নবদ্বীপ-ন্যায়ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং এই স্থানেই স্মার্ত্ত-চূড়ামণি রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক স্মৃতি-শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল ও এই নবদ্বীপ ভূমিকে সরস্বতীর "পীঠরূপে" পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন। এই স্থানেই সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শরীর পরিগ্রহ করিয়া পরমার্থ ধর্ম্মতত্ত্বের চরম উন্নতি ও বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং অসাধারণ চরিত্রের মনুষ্য, কয়জন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন? অতএব এই নবদ্বীপ হইতে আবার বাঙ্গালীর নাম সমুজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া বঙ্গভূমিকে জগদ্বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে, এই নিমিত্ত নবদ্বীপ ভূমি বাঙ্গালীমাত্রেরই তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই নবদ্বীপ "শ্রীধাম" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

* * *

"এই সময়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় সাদরে অমৃতময়ী কবিতা সকল রচনা করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দীপনার ফল স্বরূপ বঙ্গে রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন। চৈতন্যের সময় হইতে নবদ্বীপ প্রকৃত প্রাধান্য লাভ করিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চৈতন্য-চন্দ্রের উদয় হয়। এই সময় হইতেই বঙ্গভূমির প্রকৃত উন্নতি দেখা যায়;—বঙ্গভাষা সমধিক উন্নতি লাভ করে এবং এই নবদ্বীপ হইতে ন্যায়, স্মৃতি ও ধর্ম্ম—তিন বিষয়ের তিনটী অভিনব স্রোত ত্রিধারায় নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ভারত-ভূমি প্লাবিত করে। ক্রমান্বয়ে উক্ত তিন বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে।"

ইহার পর গ্রন্থকার,—নবদ্বীপের যে সকল মহাত্মা নবদ্বীপের গৌরব, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কীর্ত্তিকলাপ একে একে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। ঐ সকল জীবনীর মর্ম্মগ্রহণ ও রসাস্বাদন, হীন বাঙ্গালী-জাতি করিতে পারিবে কি না সন্দেহ; কিন্তু ও গুলি বাস্তবিকই অমূল্য। আমরা বাল্যাবধি মহৎ জীবনের আদর্শ খুঁজিবার জন্য—ফ্রান্সদেশের অন্তঃপাতী আর্টনী গ্রামে কাহার জন্ম হইয়াছিল,——কে কোথায় বিড়াল মারিয়া তাহার চর্ম্ম বিক্রয় করিয়া পুস্তক কিনিয়াছিল,—কে কবে পোড়া-রুটি খাইয়া অঙ্ক-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিত, এই সকল আদর্শের জন্য ইউরোপের গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই। আমরা বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, চৈতন্য প্রভৃতি অলোক-সামান্য মহানুভবদিগের জীবন-চরিত বুঝিব কি? এদেশেও যে চরিতের আবলী আছে, অন্ধকারে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এ জ্ঞান আমরা সাগরে ডুবাইয়াছি। পাঠকগণ! নিম্নোদ্ধৃত নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জীবনী পাঠ করুন;——

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাসুদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর গত হইল, ইঁহার শেষ বংশধর হরিনাথ ভট্টাচার্য্যের পরলোক হওয়ায় নবদ্বীপ হইতে তদ্বংশের বিলোপ হইয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত আড়বান্দী গ্রামের কেহ কেহ এই বাসুদেবের বংশ-সম্ভূত বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন।

বাসুদেবের পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচার্য্য। মহেশ্বর একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাসুদেবকে তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ সমাপনান্তে স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করান। বাসুদেব স্বীয় পরিশ্রম-গুণে অল্প দিনের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি ন্যায় শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন।

বাসুদেব যখন মিথিলা যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বয়স—আনুমানিক পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর। মিথিলায়

তৎকালে পক্ষধর মিশ্রই প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। বাসুদেব তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি নিত্য নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রকে—যে ন্যায়ের গ্রন্থাদি মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না; যে ন্যায়ের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসী বিদ্যার্থীদিগকে মিথিলার মুখাপেক্ষা করিতে হয়—সেই ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলা হইতে কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়া জন্মভূমি অলঙ্কৃত করিবেন। কিন্তু মৈথিলী আচার্য্যদিগের যত্ন-রক্ষিত ন্যায়শাস্ত্র আত্মসাৎ করা একবারেই দুঃসাধ্য বিবেচনা করিলেন। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তদনন্তর তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে ন্যায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং কয়েক বৎসর দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ন্যায়শাস্ত্র, বিশেষত গঙ্গেশো-পাধ্যায়-কৃত চারি খণ্ড চিন্তামণি-শাস্ত্র আদ্যোপান্ত একেবারে কণ্ঠস্থ করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, উক্ত শাস্ত্র সম্যক্ কণ্ঠস্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুসুমা-ঞ্জলি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ মনোযোগের সহিত কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিরে তাঁহার উদ্দেশ্য ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার হইয়া অবিলম্বে এ কথা পক্ষধরের কর্ণগোচর হইল; সুতরাং আর তাঁহার কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করা হইল না। তখন তিনি স্বদেশ-প্রত্যাগমনের বাসনা করিলেন। তদনন্তর তাঁহার আচার্য্য পক্ষধরমিশ্র কর্ত্তৃক তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হইল। তিনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার নাম শলাকা পরীক্ষা।

শলাকা পরীক্ষা এইরূপ;—একটী সূচ্যগ্র লৌহ-শলাকা পুঁথির পত্রের উপর নিক্ষেপ করিলে শেষে যে পত্রখানি বিদ্ধ হয়, সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয় এবং তাহার ব্যাখ্যা শেষ হইলে, পুনরায় উক্ত শলাকা কখন সহজে কখন বা সবলে পুনঃপুন নিক্ষিপ্ত হয় ও প্রত্যেক বারেই নূতন পত্র ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। বাসুদেবকে এইরূপে শতবারে শতখানি পত্রের ব্যাখ্যা করিতে হয়। তিনি তৎসমুদয় অতি সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" এই উপাধি প্রদান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব স্বদেশ-প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি পাছে, গ্রন্থ বা গ্রন্থের কোন অংশ, সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই আশঙ্কায় মৈথিলী অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অঙ্গবস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তখন বাসুদেব বলিয়াছিলেন যে, "আমার স্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার কোন গ্রন্থ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" তাঁহার এই কথায় মৈথিলী অধ্যাপকগণ বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। বাসুদেবও তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"যদি নবদ্বীপের পথে যাই, তাহা হইলে পথিমধ্যে তাঁহার জীবনের উপর কোন অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ভয়ে তিনি নবদ্বীপ যাত্রাচ্ছলে কাশীধাম যাত্রা করিলেন। কাশী যাইবার তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল। মিথিলায় তিনি কেবল ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্ত-শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞানলাভ করা অভিপ্রায় ছিল। তিনি কাশীধামে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন তথায় বেদান্তাধ্যয়ন করত ঐ শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া খৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হন।

তিনি নবদ্বীপ আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। কুসুমাঞ্জলির কেবল মাত্র শ্লোকাংশই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। সুতরাং নবদ্বীপে কেবল মাত্র কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ দেখা যায়।

তিনি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্ব প্রথম ন্যায়-শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন এবং উৎসাহ-সহকারে ন্যায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—'তাঁহার পিতা নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।' এক্ষণে সেই স্মার্ত্তপণ্ডিতের পুত্র মিথিলা হইতে বিপুল ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতেছেন,—এই নূতন সংবাদে চারি দিক্ হইতে তাঁহার টোলে ছাত্রগণ প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং দিন দিন তাঁহার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

বাসুদেব কেবল মাত্র গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন। এবং তাহারই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন দর্শন-শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ তৎকালে নবদ্বীপে অধীত হইত না। সুতরাং দূরদেশীয় ছাত্রগণ তখনও মিথিলায় গিয়া দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, মৈথিল-পণ্ডিত-গণ ব্যতীত উপাধি দিবার আর কাহারও অধিকার নাই। পরিশেষে বাসুদেবের জনৈক ছাত্রের বুদ্ধি-কৌশলে নবদ্বীপ-বিদ্যালয় উপাধিদানের ক্ষমতা

পাইয়া ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-রূপে পরিগণিত হইল। সেই অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির নাম রঘুনাথ-শিরোমণি।

বাসুদেব দীর্ঘজীবী ছিলেন। রঘুনাথ ও চৈতন্য তাঁহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। কথিত আছে,—রঘুনন্দন ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাসুদেব,—কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি বেদান্ত,—সকল বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি "সার্ব্বভৌমনিরুক্ত" নামে ন্যায়ের এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার আর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না।

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়,—বাসুদেব, জীবনের শেষ-দশায় শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন। কি কারণে শ্রীক্ষেত্রে বাস করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বোধ হয়, এক্ষণে যেমন অনেকে ৺কাশীধামে বা বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন, তৎকালে বৃন্দাবনধাম প্রকাশিত না থাকায় অনেকে বোধ হয় শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া শেষ-জীবন যাপন করিতেন। অথবা তৎকালে সমস্ত বঙ্গ-ভূমি মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল; পরন্তু উড়িষ্যা তৎকালে স্বাধীন ছিল। তথায় গঙ্গাবংশীয় প্রতাপ-রুদ্রদেব স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রতাপ-রুদ্র একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ও বিদ্যা বিষয়ে নিরতিশয় উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন। এই প্রতাপরুদ্র, বাসুদেবকে, যারপর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হয় ত তাঁহারই যত্নে ও আগ্রহে বাসুদেব তাঁহার সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া জীবনের শেষভাগ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত মহাত্মা চৈতন্যদেবের বিচার হয়। বিচারে পরাস্ত হইয়া বাসুদেব চৈতন্যের মতাবলম্বী হন।

"নবদ্বীপ-মহিমা" বুঝি সময় বুঝিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। জীবন থাকিতে কেহ জীবনী লেখে না,—মহিমা থাকিতে কেহ মহিমা প্রচার করে না। বোধ হয়, আবশ্যকই হয় না; হইলেও বোধ হয় আদর হয় না। মরণের পরেই জীবনীর আদর। দিন দিন যেরূপ ভাবগতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে মহিমার কাল অস্তগতপ্রায়,—এখন কালিমার কাল পড়িল। তাই বলিতেছি,—"নবদ্বীপ-মহিমা" প্রচার করিবার বুঝি বা এই উপযুক্ত সময়। এক সময়ে নবদ্বীপের "বুনো রামনাথ" সপরিবারে তেঁতুল-পাতা-সিদ্ধ খাইয়াও পরম উপাদেয় মনে করিতেন, তথাচ ব্রাহ্মণ-মহারাজ শিবচন্দ্রের স্বতঃপ্রস্তাবিত অর্থ-সাহায্য হাস্যের সহিত উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর এখন সেই নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিত নামধারী ব্রাহ্মণগণ অপধর্ম্মীগণের বেতনভোগী হইবার জন্য লালায়িত! সাধে কি বলিলাম যে, "নবদ্বীপের মহিমার কাল অস্তমিত প্রায়,—এখন কালিমার কালই পড়িল! এখনই "নবদ্বীপ-মহিমা" প্রচার করিবার উপযুক্ত সময়!" জীবন গিয়াছে, এখন জীবনী পাঠ করিয়া পাঠকগণ অশ্রু-বর্ষণ করুন।

ত্রিগুণ।

সত্ত্ব, রজ, তম, বা ত্রিগুণ, এই প্রসঙ্গের আলোচিতব্য বিষয়। সত্ত্বাদি কথাগুলির প্রকৃত অর্থ কি,—ঐ সকল কথা শুনিলে কিরূপ বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

সত্ত্ব, রজ, তম এবং ত্রিগুণ এই কটী কথা, এদেশে অতি সমধিক ব্যবহৃত হয়। কি শাস্ত্রে, কি দর্শন, কি কাব্য-ইতিহাস, কি বাঙ্গালা পুস্তক অথবা সাধারণের ব্যবহৃত বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি কথা, ইহার যেদিকে কর্ণপাত করিবে, সেইদিকেই কিছু কিছু অন্তরে সত্ত্ব, রজ, তম, অথবা ত্রিগুণ—ইহার কোন কথা শুনিতে পাইবে। বর্ণমালার বর্ণগুলি যেমন সমস্ত কথার এক একটী অঙ্গ, সত্ত্বাদি কথাগুলিও যেন সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ঐ সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা প্রায়-লোকেরই বিদিত নাই। সকলে সর্ব্বদা শুনে এবং সর্ব্বদা বলে, অথচ সেই কথার অর্থ বোধ নাই, ইহা অতীব বিড়ম্বনা ও হাস্যাস্পদ বিষয়। যাঁহারা ঐ কথাগুলির প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা অজ্ঞ-লোকের মুখে উহা শুনিলে, উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় মনে করিয়া অন্তঃস্মিত হন। অতএব সত্ত্বাদি কথা ক'টীর অর্থ, সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সত্ত্ব, রজ, তম,—এই কথা তিনটীর কোনরূপ প্রতিশব্দ নাই; সুতরাং এক কথায় ইহার অর্থ বুঝাইবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব অন্য উপায়ের আশ্রয় লইতে হইবে। যে কথার

কোন প্রতিশব্দ না থাকে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের ক্রিয়া এবং ভাবাদির দ্বারা তাহার অর্থ বুঝিতে হয়। সত্ত্বাদি তিনটী কথার অর্থও সেইরূপেই বুঝিতে হইবে। যে যে বস্তু মনে করিয়া শাস্ত্র বা কোন ব্যক্তি, সত্ত্ব, রজ, তম, এই সকল কথার উচ্চারণ করেন, তাহার ক্রিয়া কিরূপ, কিরূপই বা তাহার আকার-প্রকার-ভাবাদি, তাহাই ধরিয়া সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিনটী কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। অতএব আমরা সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া সাধারণকে ত্রিগুণ পদার্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত ত্রিলোকের যাবৎ পদার্থ, যদ্দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে,—যাহা এই ত্রিভুবনের মূল উপাদান কারণ, তাহাই সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটী নামে অভিহিত হয়। ইহার সাক্ষী—আমাদিগের শাস্ত্র; শাস্ত্রই বলিয়াছেন যে, "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ" এবং "সত্ত্বং রজস্তম ইতি বৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ" ইত্যাদি। এখন ভাবিয়া দেখ যে, যাহা এই যাবৎ জড়-পদার্থের মূল উপাদান-কারণ, তাহা এই জাগত-পদার্থ হইতে অন্য কিছু নহে; উপাদান-কারণ উপাদেয়-কার্য্য হইতে কদাপি ভিন্ন হইতে পারে না। যাহা উপাদান, তাহাই উপাদেয়; যাহা উপাদেয়, তাহাই উপাদান। মৃত্তিকার দ্বারা ঘটাদি পদার্থ নির্ম্মিত হয়; মৃত্তিকা, ঘটাদির উপাদান। ঘটাদি-পদার্থ মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন নহে, মৃত্তিকাও ঘটাদি হইতে বিভিন্ন নহে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যাবৎ পদার্থ এবং মৃত্তিকা উভয়ে একই বস্তু; ইহাতে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভুক্ত ও পীত বস্তুর দ্বারা যাবৎ প্রাণীর দেহ গঠিত হয়, ঐ সকল বস্তু, প্রাণি-দেহের উপাদান কারণ; দেহগুলি উহাদের উপাদেয়। এখানেও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই সকল দেহ, ভুক্ত ও পীত বস্তু হইতে বিভিন্ন জাতীয় কোন পদার্থ নহে। ঐ সকল দ্রব্যেরই আকার-প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহাকারে পরিণতি হইয়াছে। সেইরূপ, সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটী পদার্থ জগৎ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। জগৎও তাহা হইতে অন্য বস্তু সম্ভাব্য নহে।

যাহা জগৎ,—তাহাই সত্ত্ব, রজ, তম; যাহা সত্ত্ব, রজ, তম,—তাহাই জগৎ। সত্ত্ব, রজ, তমই নানা-আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিচিত্র জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে।

জগৎ বলিলে, কেবল পরিদৃশ্যমান জগতের স্থূলভাগ মাত্র বুঝিতে হইবে না; স্থূলতম, স্থূলতর, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম আর অন্তর-বাহিঃ-প্রভৃতি যাবৎ কল্পনার দ্বারা জগতের যতপ্রকার বিভাগ করা সম্ভব, তৎসমষ্টির নামই জগৎ। জগৎ বলিলে, অন্তর এবং বাহিরে সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলতম পর্য্যন্ত যাবৎ পদার্থ বুঝিতে হয়। উক্ত যাবৎ পদার্থই সত্ত্ব, রজ, তমোময় এবং সত্ত্ব, রজ, তমও এই যাবৎপদার্থময়। অতএব জগতের দ্বারা সত্ত্বাদির পরিচয় লইতে হইলে, জগতের স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎসঙ্গে-সঙ্গে মিলাইয়া সত্ত্বাদির স্বরূপ বুঝিতে হয়। নতুবা কেবল স্থূলতমাদি দুই একটী অবস্থা হইতে সত্ত্ব, রজ, তমের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া লওয়া যায় না।

জগৎ, প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত; অন্তর্জ্জগৎ এবং বহির্জ্জগৎ। আমাদের অধ্যাত্ম-রাজ্যের নাম অন্তর্জ্জগৎ এবং এই বহির্দৃশ্যমান রাজ্যই বাহির্জ্জগৎ। বাহ্য এবং অন্তর্জ্জগতের প্রত্যেকেই স্থূল-সূক্ষ্ম অবস্থা-ভেদে ষড়্‌বিধ। বাহ্য-রাজ্যে ছয়টী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়,—(১) কঠিনাবস্থা; (২) ঘনাবস্থা; (৩) তরলাবস্থা; (৪) বাষ্পাবস্থা; (৫) পরমাণু-অবস্থা; (৬) কেবল শক্তিমাত্র অবস্থা। ইহার মধ্যে শক্তিমাত্র অবস্থা সূক্ষ্মতম; পরমাণু অবস্থা সূক্ষ্মতর; বাষ্পাবস্থা সূক্ষ্ম; তরলাবস্থা স্থূল; ঘনাবস্থা স্থূলতর এবং কঠিনাবস্থা বাহ্য-জগতের স্থূলতম অবস্থা। উক্ত ষড়্‌বিধ অবস্থাই সত্ত্ব, রজ, তমোময়; সত্ত্ব, রজ, তমও এই ষড়্‌বিধ অবস্থাপন্ন পদার্থময়। অর্থাৎ এই বাহ্য-রাজ্যের সেই সূক্ষ্মতম শক্তিমাত্র-অবস্থাও সত্ত্ব, রজ, তমোময়; পরমাণু অবস্থাও সত্ত্ব, রজ, তমোময়; বাষ্পাবস্থাও সত্ত্ব, রজ, তমোময়; তরলাবস্থাও সত্ত্ব, রজ, তমোময়; ঘনাবস্থাও সত্ত্ব, রজ, তমোময় এবং কঠিনাবস্থাও সেই সত্ত্ব, রজ, তমোময়।

ইন্দ্রিয় এবং ভাল-মন্দ মানসিক বৃত্তি প্রভৃতিকে লইয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যেরও স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত ছয়টী অবস্থা আছে, কিন্তু তাহা

জগতের ন্যায় দুই এক কথায় বুঝাইবার উপায় নাই। সুতরাং সেই বিভাগ প্রদর্শিত হইল না। অধ্যাত্ম-রাজ্যেও সেই সমস্ত অবস্থাই সত্ত্ব, রজ, তমোময়; সত্ত্ব, রজ, তমও সেই ষড়্‌বিধ অবস্থা-ময়। এইরূপে জগতের দ্বাদশ প্রকার অবস্থার দ্বারা সত্ত্ব, রজ, তমের দ্বাদশ প্রকার প্রবিভাগ যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা এই হইল যে, সত্ত্ব, রজ, তম,—এই বাহ্য-রাজ্যের মধ্যে, শক্ত্য-বস্থায় বিরাজ করিতেছে, পরমাণু অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, বাষ্পাবস্থায় বিরাজ করিতেছে, তরলাবস্থায় বিরাজ করিতেছে, ঘনাবস্থায় বিরাজ করিতেছে এবং কঠিনাবস্থায় বিরাজ করিতেছে। অন্তর রাজ্যেও উক্ত ষড়্‌বিধ অবস্থায় সত্ত্ব, রজ, তম দ্যোতমান রহিয়াছে। অতএব যদি শক্তি-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কেহ সত্ত্বাদির চিন্তা করেন, তবে তাহাদিগকে শক্তি-পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। আবার সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মাদি স্তর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া যদি কেহ সত্ত্বাদির অণুপ্রবেশ দেখিতে পান, তবে তাঁহারা পরমাণ্বাদি-রূপেই সত্ত্বাদির বর্ণনা করেন। এইরূপে জগতের যতদূর পর্য্যন্ত যিনি চিন্তা করিতে পারেন, যতদূর যখন যাঁহার নয়নে উদ্ভাসিত হয়, তিনি সেই খানেই রাখিয়া সত্ত্বাদির বর্ণনা করেন। এইজন্য, উহারা কোন খানে গুণ-পদার্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও শক্তি-পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, আবার কখনও স্থূল জড় পদার্থ বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক জগতের বাহ্যাভ্যন্তরের শক্তিরূপ সূক্ষ্মতম স্তর হইতে কঠিনাদি সূক্ষ্মতম অবস্থা পর্য্যন্ত সমস্তই সত্ত্ব, রজ, তমের অবস্থা,—সমস্তই সত্ত্ব, রজ, আর তম। শক্তিও সত্ত্ব, রজ, তম; গুণও সত্ত্ব, রজ, তম; ধর্ম্মও সত্ত্ব, রজ, তম; সমস্তই সত্ত্ব, রজ, তম। এই নিমিত্ত আমরা উহাদিকে শক্তি, গুণ, ধর্ম্ম ইত্যাদি নানা কথাতেই ব্যবহার করিব।

এই ত হইল,—ত্রিগুণের আতিদেশিক বর্ণনা। কিন্তু ইহার দ্বারা সত্ত্বাদির বিশেষ কিছু ভাব বুঝিতে পারিলাম না। জগতের সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলতম অবস্থা পর্য্যন্ত সমস্তই সত্ত্ব, রজ, তমের পরিণাম অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-তমোময়,—তাহা বুঝিলাম। কিন্তু ইহাতে ত্রিগুণের বিকৃতি-অবস্থাই জানা গেল। জগতের যত প্রকার ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, সমস্তই ত্রিগুণের উপাদেয় বা বিকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরন্তু বিকৃতি-অবস্থা বাদে ত্রিগুণের স্বরূপ-গত মূল অবস্থা কিরূপ, যাহা হইতে স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা কিরূপ, তদ্বিষয় কিছুই জানা গেল না। এবং সত্ত্ব, রজ, তমের পরস্পরের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য কি, তাহাও অবগত হইল না। পরন্তু এতদুভয়ের মধ্যে প্রথম জিজ্ঞাস্য বিষয়টী নিতান্তই দুরূহ; অতি বিস্তৃত একটী প্রবন্ধের অবতারণা না করিলে তাহা কোন মতেই বুঝাইবার উপায় নাই। বাস্তবিক তাহা জানাও সাধারণের আবশ্যকের অতীত। কারণ, তাহা কাহার কোন ব্যবহারে আইসে না। যাহা ব্যবহার্য্য-রাজ্যের আয়ত্ত, যাহা কোন ব্যবহারে আনিতে পারা যায়, তাহাই অবগত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন; যাহা সমস্ত জগতের অতীত, অতীন্দ্রিয়, তাহা লইয়া কোন ব্যবহার চলে না। সুতরাং তাহা না জানিলেও কোন হানি নাই। এজন্য ত্রিগুণের মূল অবস্থার পর্য্যালোচনে নিবৃত্ত থাকিলাম।

শাস্ত্রাদিতে যে যে স্থানে ত্রিগুণ-বিষয় উল্লি-খিত আছে, তৎসমস্তই প্রায় উহাদের স্থূল বা বিকৃত অর্থাৎ ব্যবহার্য্য অবস্থা লক্ষ্য করিয়া। বাহ্য কি অন্তর্জগতে ত্রিগুণের যাহার যেরূপ সত্তা ও ক্রিয়াদি দেখা গিয়া থাকে, তাহা লইয়াই পুরাণাদি শাস্ত্রে সত্ত্ব, রজ, তম কথার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত লোক-ব্যবহারও ইহারই অনুবর্ত্তী। ত্রিগুণের মৌলিক অবস্থা কেবল কোন কোন দর্শন ও কোন কোন শ্রুতি-তেই বর্ণিত আছে। অতএব সত্ত্ব, রজ, তমের এই জগদন্তর্গত ব্যবহার্য্য অবস্থা লইয়াই আমরা পর্য্যালোচনা করিব। ঐ অবস্থাই সকলের জানার বিশেষ প্রয়োজন। তন্মধ্যে আবার বাহ্য-রাজ্য অপেক্ষা অন্তর-রাজ্যের সত্ত্ব, রজ, তমের মর্ম্ম বুঝা সাধারণের অধিকতর প্রয়োজনীয়। বাহ্য-রাজ্যের মধ্যে কোন্‌টী সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, কোন্‌টী রজোগুণের ক্রিয়া, কোন্‌টী তমোগুণের ক্রিয়া,—তাহাও জানিলে ভালই বটে; না জানিলে তত অনিষ্ট নাই। কিন্তু অন্তর-রাজ্যের সত্ত্ব, রজ, তমের পরিচয় লওয়া প্রত্যেকের সমভাবে প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে কাহারই উপাসনাদি কোন পন্থার অনুসরণের সম্ভাবনা নাই।

শাস্ত্রে ধর্ম্ম-সাধক যত প্রকার ক্রিয়ার বিভাগ আছে, তৎসমস্তই ত্রিবিধ। ত্রৈবিধ্যের কারণ,—সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণ। যাবৎ কার্য্যই সাত্ত্বিক, রাজস, তামস—এই তিন ভাগে বিভক্ত। উপাসনা, যজ্ঞ, ব্রত, শ্রাদ্ধ, দান, অতিথি-সৎকার, বিবাহাদি-সংস্কার, তীর্থদর্শন, পরোপকার, সদাচার, আহার, নিদ্রা, ব্যবায় প্রভৃতি যাবৎকর্ম্মই উক্তরূপে ত্রিবিধ। মানবের দেহ ত্রিবিধ; ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ; মন ত্রিবিধ; বুদ্ধি ত্রিবিধ; প্রকৃতি ত্রিবিধ; স্বভাব ত্রিবিধ; জ্ঞান ত্রিবিধ; ভক্তি ত্রিবিধ; শ্রদ্ধা ত্রিবিধ; আত্মা ত্রিবিধ;—দেহের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ত্রিবিধ। এই দেহাদি আত্মা পর্য্যন্তের সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও তামসিকতা—এই ত্রৈবিধ্য অনুসারে পূর্ব্ব-কথিত ত্রিবিধ উপাসনাদি যাবৎকর্ম্মের যোজনা করা শাস্ত্রের অভিমত। যাহাদের দেহাদি আত্মা পর্য্যন্ত সমস্তই সাত্ত্বিক, তাহারা সাত্ত্বিক উপাসনাদি করিবে; আর যাহাদের রাজস, তাহারা রাজস উপাসনাদি এবং যাহারা তামস-দেহাদি-সম্পন্ন, তাহারা তামস উপাসনাদি করিবে। তবেই দেখ,—অন্তর-রাজ্যের সত্ত্ব, রজ, তমের লক্ষণ না বুঝিতে পারিলে, কাহারই কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের ক্ষমতা নাই; করিলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। একাধিকারের লোক অপরাধিকার আয়ত্ত করার চেষ্টা করিলে, বিড়ম্বনামাত্র লাভ করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, অন্তর-রাজ্যস্থ ত্রিগুণ জ্ঞানের আরও ফল আছে। উহা বুঝিলে অনেকে বৃথাভিমানাদি পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে।

আন্তর গুণতত্ত্ব অবিদিত থাকিলে, ঘোর তমসাচ্ছন্ন মূঢ় ব্যক্তিও ভ্রান্ত হইয়া আপনাকে সত্ত্বসম্পন্ন মনে করিতে পারে। তদ্দ্বারা নিজের প্রকৃত উন্নতি-কার্য্যের শৈথিল্য এবং অন্যের প্রতি ঘৃণাদি দোষে অধঃপাত হয়। রজোভাবাপন্ন লোকেও ঐরূপ ভ্রান্তির ফল পাইতে পারেন। অতএব আন্তরিক ত্রিগুণের লক্ষণাদি বিশেষরূপে অবগত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয় বিষয়। এজন্য প্রথমে তদ্বিষয়েরই পর্য্যালোচনা করিব। ফলতঃ, বাহ্য-রাজ্যের ত্রিগুণের অবস্থাও ইহার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত হইয়া যাইবে। দেহস্থিত অধ্যাত্ম-রাজ্যে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের কাহার কিরূপ ক্রিয়া, কাহার কিরূপ লক্ষণ, কাহার কিরূপ স্বভাব এবং কিরূপে কাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সত্তা-অসত্তা ন্যূনাধিক্যাদি বুঝিতে পারা যায়, তৎ সমস্তের সমালোচনা করিব।

আন্তর-রাজ্যের সত্ত্বগুণের লক্ষণ।

সত্ত্বগুণ এক প্রকার অলৌকিক সুখস্বরূপ। ঐ গুণ যখন শরীরের মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন সর্ব্বশরীরের অভ্যন্তরে একরূপ অলৌকিক সুখময় ভাব অনুভূত হয়। কোমল করপল্লবের দ্বারা ধীরে ধীরে মৃদুভাবে গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিলে, দেহের বাহ্যস্তরে যেরূপ অনুভব হয়, সত্ত্বগুণের উদয় কালে শরীরের অভ্যন্তর-দেশে যেন সেইরূপ অনুভূতি হইতে-থাকে। ঐ সুখময় ভাবটী সর্ব্ব প্রকার আবিলতা-শূন্য, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুধাংশু-প্রভার-ন্যায় বিশদ, হৈমন্তিক জাহ্নবী-সলিলের ন্যায় সুপ্রসন্ন এবং তাপ, স্ফূর্ত্তি ও আন্ধ্য-মান্দ্য-জড়তাদি-দোষ-পরিশূন্য। বাহ্যেন্দ্রিয়-লব্ধ দর্শন, স্পর্শন এবং ব্যবায়াদি জনিত সুখের মধ্যে যেমন তাপের অনুপ্রবেশ থাকে, যেজন্য ঐ সকল সুখ অধিক কাল বহন করিলে শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠে, শেষে যন্ত্রণাময় অনুভূত হয়, উহা পরিত্যাগের প্রবৃত্তি হয়, কথিত সুখে তাহার লেশ মাত্র দেখিতে পাইবে না। উহা না-তপ্ত, না-শীতল, অথচ স্পৃহণীয়। উহা যত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যত অধিক সময় থাকিবে, ততই অধিকাধিক বাঞ্ছনীয় হইবে। ইন্দ্রিয়াহৃত সুখের মধ্যে যেমন স্ফূর্ত্তি বা চাঞ্চল্যের ভাব বিমিশ্রিত আছে, যাহার জন্য ধারাবাহী দর্শন, শ্রবণ ও ব্যবায়াদি কালে রুধির ও সমস্ত শারীর-যন্ত্রের দ্রুততরা গতি হইতে থাকে; সত্ত্বরূপ সুখে তাহার চিহ্নও পাইবে না। উহাতে স্ফূর্ত্তিও নাই কিংবা তদ্বিরুদ্ধ অবসাদও নাই, উহা তৃতীয় অবস্থাপন্ন সুখ। ইন্দ্রিয়-লব্ধ সুখের মধ্যে জড়তা-দোষ, আন্ধ্য-দোষ এবং মান্দ্যাদি দোষ আছে। কোন বস্তু অধিক কাল দেখিতে দেখিতে বা গানাদি শুনিতে শুনিতে বা ব্যবায়াদি কালে আত্মা জড়বৎ হইয়া পড়ে, অলস হইয়া পড়ে এবং অন্য-জ্ঞান পরিশূন্য হয়, ইহাই বিষয়-সুখের আন্ধ্য-মান্দ্যাদি-দোষের চিহ্ন। সত্ত্বরূপ সুখ তাহা নহে। উহা যত অধিক হয়, ততই জ্ঞানের বৃদ্ধি, আলস্যের ক্ষয় এবং আত্মপ্রসাদ

লাভ হইয়া থাকে। উহা অভ্যুদিত হইয়া আত্মাও দেহটাকে এক প্রকার অমুত্তোলনীয়, অতীন্দ্রিয়, অদৃষ্টাস্বাদ সুখময় করিয়া ফেলে।

সত্ত্বগুণ এক প্রকার মধুর স্বরূপ। উহার অভ্যুদয় কালে সর্ব্ব শরীরের মধ্যে যেন কি একরূপ মধুরতা অনুভূত হয়। যষ্টিমধু আস্বাদন কালে রসনার মধ্যে যেরূপ অনুভব হয়, সত্ত্বের অভ্যুদয় কালেও সর্ব্ব শরীরের মধ্যেই সেইরূপ উপলব্ধি হয়। রসনাটীও যেন ঠিক যষ্টিমধু ভক্ষণের পরকালীন অবস্থা গ্রহণ করে। ক্রিমির দোষ থাকিলেও কিন্তু কেবল রসনার অগ্রভাগে সময় সময় ঐরূপ অবস্থা হয়, তাহাকে সত্ত্বগুণের উত্তেজনা অবস্থা মনে করিও না। উহাতে দেহের মধ্যে সেইরূপ অনুভব হয় না।

সত্ত্বগুণ একরূপ সুগন্ধ স্বরূপ। উহার অভ্যুদয় কালে সর্ব্ব শরীরের মধ্যে যেন একরূপ অপূর্ব্ব গন্ধের উপলব্ধি হয়। গন্ধরাজ ও নাগকেশরাদি কুসুমের আঘ্রাণ কালে নাসিকার মধ্যে যেরূপ অনুভূতি হয়, সত্ত্বের উদয় কালেও সর্ব্ব দেহের মধ্যেই যেন সেই প্রকার একটা অনুভূতি হয়।

সত্ত্বগুণ এক প্রকার সুখস্পর্শ স্বরূপ। কোন রূপ স্পৃহণীয় সুখ-স্পর্শের অনুভব কালে ত্বক্-প্রান্তে যেরূপ অবস্থা হয়, সত্ত্বের প্রকাশ কালেও যেন সর্ব্ব দেহের মধ্যে সেইরূপ একটা অবস্থা হইয়া উঠে।

সত্ত্বগুণ, সুমধুর শব্দ এবং স্পৃহণীয় বর্ণের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য লাভ করে। কোকিলাদির সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ কালে অথবা নীলাকাশ, জলরাশি, কিংবা শস্যপূর্ণ মেদিনীমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দর্শন-স্থানে যেরূপ ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, সত্ত্বগুণের অভ্যুদয় কালে সর্ব্ব শরীরের মধ্যেই সেইরূপ একটা অনুভূতি হয়। এইরূপে বাহ্য-জগতের পাঁচপ্রকার বিষয়ানুভবের সঙ্গেই সত্ত্বানুভবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু, এই সকল বিষয়ানুভবের মধ্যে যে এক একটু তাপানুভূতির সংস্রব আছে, তাহা সত্ত্বানুভবের বিপরীত জানিবে। উল্লিখিত পঞ্চবিধ বিষয়ের তাপাংশটুকু বাদ দিলে যে কেবল শীতল, কোমল অথচ মধুর স্পৃহণীয় ভাবটী অবশিষ্ট থাকে, তাহার অনুভবই সত্ত্বানুভবের সাদৃশ্য স্থল।

উক্ত পঞ্চবিধ বিষয়, মূল সত্ত্বগুণ হইতে আত্মলাভ করে এবং আন্তরিক সত্ত্বের আবির্ভাবও সেই মূল সত্ত্বগুণ হইতে। তজ্জন্য এই সকল বাহ্য বিষয়ের সহিত আন্তরিক সত্ত্বের সাদৃশ্য-অনুভূতি পরিদৃষ্ট হয়। শাস্ত্রই ইহার অনুমোদন করিয়াছেন;—

"আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ॥"
(গীতা)

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং।" (শ্রুতি)
ইত্যাদি।

সত্ত্বগুণ আনন্দ স্বরূপ। উহার অভ্যুদয় কালে সর্ব্ব দেহ অতি অপূর্ব্ব একরূপ আনন্দময় হইয়া উঠে। কিন্তু বহির্বিষয় ভোগ-জনিত আনন্দের মধ্যে যেরূপ তাপ ও তীব্রতাদির সম্মীলন অনুভূত হয়, সত্ত্বরূপ আনন্দে তাহার লেশ মাত্র নাই। উহা অতি সুস্নিগ্ধ, সুশীতল এবং নিরঙ্কুশ ও নিরবকাশ আনন্দ।

সত্ত্বগুণ লঘু স্বরূপ। উহার অভ্যুদয় কালে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে একরূপ লঘুতার উপলব্ধি হয়। সর্ব্ব শরীরটা যেন হাল্কা হইয়া যায়।

সত্ত্বগুণ জড়তা-বিহীন বিবিক্ত স্বরূপ। উহার আবির্ভাব মাত্রে সর্ব্ব শরীরের জড়তা, তন্দ্রা, আলস্য, প্রমাদ ও চিত্ত বিকারাদি সমস্ত আবর্জ্জনা কাটিয়া যায়। তখন অন্তরাত্মা যেন দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়। অধিক সময় পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া থাকিলে, নিশ্বাস বন্ধ হব-হব সময়ে প্রত্যুদ্গত হইলে শরীরটার পক্ষে যেরূপ অনুভব হইয়া থাকে, সত্ত্বগুণের অভ্যুদয় কালে আত্মার পক্ষেও যেন ঠিক সেইরূপ ঘটনা অনুভূত হয়। তখন আত্মাটা যেন শরীরের আবর্জ্জনাদি সম্বন্ধ কাটাইয়া শরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত রূপে উদ্গত হইল বলিয়া অনুভূত হয়। বিকাশোন্মুখ কুসুম-দলাবলী যেমন পরস্পরে বিযুক্ত হয়, অথবা কুশগর্ভ যেমন আত্মলাভ করিলে সংশ্লিষ্ট কুশদল হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়, সত্ত্বের উদয়কালে যেন আত্মাও সেইরূপ এই দেহ হইতে একটু বিবিক্তভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন, নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাইতে যাইতে ঐ অরণ্যের শেষ হওয়ার উপক্রম হইলে, যখন

ঘন জঙ্গলরাশি বিরল হইয়া আইসে, তখন যেমন ফাক-ফাক আশ্বস্ত-আশ্বস্ত ও আরাম-আরাম ভাব অনুভূত হয়, সত্ত্বগুণের উদয় হইলেও শরীরের বহিঃস্তর হইতে অন্তঃস্তরের দিকে আত্মার প্রবেশ হইতে থাকে এবং সেই অন্তঃপ্রবেশকালে যেন সেইরূপ অনুভব হয়। অথবা এক পাত্র জল, নির্ব্বাপিতবৎ অগ্নির উপরে বসাইয়া রাখিলে যখন তাহার তলের জলটা ঈষৎ ঈষৎ উষ্ণ হয় আর উপরের জলটা পূর্ব্ববৎ সুশীতল থাকে, তখন তাহাতে শীতার্ত্ত হস্ত প্রবেশ করাইলে যেরূপ অনুভব হয়, সত্ত্বগুণের উদ্রেককালে শরীরাভ্যান্তরে প্রবেশ কালেও যেন সেইরূপ উপর-ঘন, মধ্য-তরল, উপর-যন্ত্রণা, মধ্য-সুখ একরূপ আরাম-আরাম ভাব অনুভূত হয়।

সত্ত্বগুণ স্পৃহনীয় স্বরূপ। উহা আবির্ভূত হইলে ক্রোধাদি বৃত্তির ন্যায় উহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। উহা যত উত্তেজিত হয়, ততই আরও অধিকাধিক বৃদ্ধির অভিলাষ জন্মে।

সত্ত্বগুণ প্রকাশ স্বরূপ। উহার আবির্ভাব হইলে শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তী সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া যায়। ভাদ্রমাসের ভাগীরথী-জলে নিমগ্ন হইয়া চক্ষু মেলিয়া দৃষ্টি করিলে যেমন দশদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে পাওয়া যায়, এই শরীর-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া মানস-চক্ষুর উন্মীলন করিলে আত্মাও সচরাচর সেইরূপ অন্ধকারময় অবলোকন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলে সেইরূপ অবস্থা থাকে না। তখন এই দেহটা কিরণযুক্ত নির্ম্মল জলের ন্যায় অবস্থা গ্রহণ করে। অতি সুপরিষ্কৃত অনাবিল বালুকাতল পুষ্করিণীতে সূর্য্য-কিরণ প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে নিমগ্ন হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলে যেমন অনতিস্ফুটরূপে নিজ দেহ, জল এবং মৎস্য-শৈবালাদি জলস্থ বস্তুগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, সত্ত্বগুণ-সমুদ্রেক কালেও তেমন অভ্যন্তরটা অনতিস্ফুট প্রকাশিত হয়। তখন আত্মা অন্তশ্চক্ষুর দ্বারা একটু লক্ষ্য করিলেই নিজের তাৎকালিক রূপ, দেহ এবং দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী যন্ত্র-সমষ্টি এবং তদীয় ক্রিয়া সমূহ অনতিস্ফুট রূপে মানস-প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বাহ্য-ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলিও তখন অতিপরিষ্কার-রূপে পরিদৃষ্ট হয়। সত্ত্বগুণের মাত্রানুসারে তাৎকালিক মানসিক বৃত্তিগুলিও অনুভূত হয়।

এইরূপ অবস্থা হইলে সেই সত্ত্বগুণই আবার বিবেক-বৈরাগ্যাদি আকার পরিগ্রহ করিয়া তদুচিত ক্রিয়া করিতে থাকে। অন্ধকার-কক্ষে প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়া যেমন কক্ষগর্ভের অন্ধকার বিদূরিত করে, আবার নয়নের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উদ্বোধন করে এবং তাহার তৈজসাংশের আপ্যায়ন করিয়া দর্শন কার্য্যের সহায়তা করে; দেহ এবং আত্মাতে সত্ত্বগুণ প্রজ্বলিত হইয়াও সেইরূপ ক্রিয়া করে। উহা অভ্যুদয়-মাত্রেই দেহ-কক্ষবর্ত্তী সমস্ত জড়তা-আবর্জ্জনাদি-রূপ অন্ধকার বিদূরিত করে, আবার মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার উদ্বোধন করে এবং তাহার স্বাভাবিক ক্ষীণ-সত্ত্বগুণের সমাপ্যায়ন করিয়া বিবেকাদিরূপে পরিণত হয় ও তদীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে। উহা বিবেকরূপে পরিণত হইয়া দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী নিখিল জড়পদার্থ এবং আত্মার পার্থক্য প্রকাশিত করিবে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ কোন এক উচ্চশ্রেণীর আত্মজ্ঞান বিকাশিত হইবে। এবং ঐ সত্ত্বগুণই বৈরাগ্য-রূপে পরিণত হইয়া দেহের সুখজনক বিষয়ের প্রতি বৈতৃষ্ণ্য করিবে। সত্ত্বগুণের নিজগত আনন্দ, বিষয়ানন্দ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক এবং নির্ম্মল ও ঘনীভূত। অতএব তাহা পাইলে ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দে তুচ্ছতা না হইয়াই পারে না। 'মোহনভোগ' ভোজন করিতে পাইলে যবাগূর প্রতি অনুরাগ থাকিতে পারে না। বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঔদাসীন্যও প্রকাশিত হয়। তখন তুচ্ছ ধনাদি জড়পদার্থের প্রতি আসক্তি বিশ্লথ হয়। দেহ-ধনাদির প্রতি আসক্তির হ্রাস হইলে তাহার ইষ্টানিষ্টে কোন-রূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি মনে হয় না, সুতরাং ক্ষমাগুণও তখনই বিকাশিত হয়। শান্তিও ক্ষমারই সহচারিণী। যেখানে ক্ষমা, সেইখানেই শান্তি; যেখানে শান্তি, সেখানেই ক্ষমা। জড়-বিষয়ের প্রতি আসক্তির হ্রাস হইলে যদৃচ্ছা-লব্ধ সুখ-ভোগে সন্তুষ্ট হইয়া অবিচলিত-ভাবে অবস্থিতির নামই শান্তি। এখন বলা বাহুল্য যে, অপূর্ব্ব সন্তোষগুণও শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই পরিদীপ্ত হয়। এজন্য শাস্ত্রই বলিয়াছেন যে, "সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টং * * *" (সাঙ্খ্যকারিকা), এবং "অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্। সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বি-

ষ্যত্মম্। (সাঙ্খ্যকারিকা) প্রীত্যপ্রীতি-বিষাদাদ্যৈ গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ। সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানাম্ (সাঙ্খ্য) ইত্যাদি। এই হইল সত্ত্বগুণের স্বরূপ। এখন ইহার বাহ্য লক্ষণ অবগত হও।

সত্ত্বগুণ বিকাশিত হইলে তাঁহার বদন-মণ্ডল হইতে অপূর্ব্ব সন্তোষ-প্রভা বিকীর্ণ হয়; নয়নদ্বয়, সমুজ্জ্বল, অক্ষীণ, সূক্ষ্ম ও সুশীতল কান্তি উদ্ভাসিত করে। ললাটফলক এবং চক্ষুর্দ্বয় অতি সুস্নিগ্ধ কমনীয় ভাব গ্রহণ করে। তাঁহার মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে ভয় ও সম্মানের সহিত ভালবাসার উদয় হইয়া থাকে। ঐ সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডলে দুঃখ বা ত্রাসের কালিমা পরিলক্ষিত হয়না। কর্কশতা ও তীক্ষ্ণতার লেশ মাত্র অনুভূত হয় না। সেই মুখ দেখিলে ঘোর কপটতাদি পাপাক্রান্ত হৃদয়ও যেন নির্ম্মল হইয়া উঠে। সত্ত্ববান্ ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয় সর্ব্বদা স্মিত-বিকসিত থাকে। নয়ন দুটী ব্যাঘ্রের ন্যায় ভৈরব ভাব প্রকাশ করে না; গোরুর ন্যায় নিস্পন্দ জড় ভাবও প্রকাশ করে না; বানরের ন্যায় চঞ্চল ভাবও নহে, শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত ভাবও নহে, কাকের ন্যায় রুক্ষ ভাবও নহে। কিন্তু কি একরূপ পরিপূর্ণ ভাব পরিদীপিত করে, তাহা অবলোকন কালে পূর্ণচন্দ্রের দর্শনের ন্যায় হৃদয় আপ্যায়িত হয়। সত্ত্ববান্ ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ হইতে অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার সুগন্ধ অনুভূত হয়। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বহির্গতি ক্ষীণপ্রভ হয় এবং অন্তর্গতি পরিপুষ্ট হয়। সত্ত্বগুণের অভ্যুদয় কালে তাঁহার হৃদয় বা দেহের মধ্যে কোনরূপ অবসাদ, মান্দ্য, আলস্য, প্রমাদ, তন্দ্রা, অজ্ঞান, গুরুত্ব, মোহ, তীক্ষ্ণতা, ধৃষ্টতা, ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরুষতা, নিষ্ঠুরতা, চঞ্চলতা, প্রবল ভোগ-তৃষ্ণা এবং শোক, তাপ, অভাবাদি কিছুই থাকে না। তখন তিনি একরূপ পরিপূর্ণ সদানন্দ ভাবে অবস্থিতি করেন।

এইরূপ আরও শত শত লক্ষণ দ্বারা সত্ত্বগুণের পরিচয় লইতে পারা যায়। এই সকল লক্ষণ যাঁহাতে দেখিতে পাইবে, তাঁহাকেই সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে। যাঁহাতে এই সকল লক্ষণ নাই, তিনি নিশ্চয় সত্ত্বগুণের কোনও সম্পর্ক রাখেন না। যে ব্যক্তি কৃপণ, দুর্ব্বল, জড়, অলস, নিদ্রা-তন্দ্রাদি-সমাসক্ত, ঘোর বিষয়াসক্ত, অতীব দেহাভিমানী ও ধনাভিমানী; আর যে ব্যক্তি নিষ্ঠুর, কর্কশ, চঞ্চল, ক্রোধন, দাম্ভিক, প্রভুত্ব-যশাদিপ্রিয়, মৎসরী, ঈর্ষী, অসন্তুষ্ট, অসূয়াবান্, দ্রোহকারী, পিশুন, ক্রূর, বঞ্চক ও অধর্ম্মাদি-সম্পন্ন,—নিশ্চয় জানিও তাহাতে কদাপি সত্ত্বগুণের আবির্ভাব নাই। মানব অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেই নিজের পরিচয় লইবে। পরীক্ষায় যখন দেখিবে যে, নিজের মধ্যে উল্লিখিত সত্ত্বগুণের বিরুদ্ধ কোনই লক্ষণ নাই,—অন্তরে যাহা কিছু আছে, সমস্তই সত্ত্বগুণের অনুরূপ, তখন আপনাকে সত্ত্বপ্রকৃতিক বলিয়া নিশ্চয় করিবে। তখন সাত্ত্বিকমতের উপাসনাদি ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিবে।

বাস্তবিক উক্তবিধ লক্ষণাপন্ন সাত্ত্বিক পুরুষ কেবল ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই দুই চারিটী দেখা গিয়াছে। কিন্তু কায়স্থের নিম্নবর্ত্তী জাতির মধ্যে ইহা গগনকুসুমের ন্যায় অসম্ভাব্য বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়। যাহাদের হৃদয়ে রজোগুণ পর্য্যন্ত স্থান পাইতে পারে না, সর্ব্বগুণোত্তম দৈবী প্রকৃতির ভূষণ, সে দেবারাধ্য সত্ত্বগুণ সেখানে কোথা হইতে আসিবে? তাহা কদাপি সম্ভাব্য নহে। ইহাই সত্ত্বগুণের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। অতঃপর রজোগুণের চিন্তা করা যাইতেছে।

আন্তর-রজোগুণের লক্ষণ

রজোগুণ একপ্রকার অলৌকিক দুঃখস্বরূপ; অন্তরে রজোগুণের সদ্ভাব হইলে, সর্ব্বশরীরের মধ্যে একপ্রকার তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ বা তীব্র-তীব্র ভাব অনুভূত হয়। মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত এক-প্রকার দাহপ্রদ অবস্থা প্রকাশিত হয় এবং এক-প্রকার উত্তেজনার ভাব,—যেন তাপময় ভাব অনুভূত হয়। বাহ্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া তখন শরীরের মধ্যে একটু লক্ষ্য করিতে পারিলে একরূপ যন্ত্রণার উপলব্ধি হয়। শরীরের অভ্যন্তরটা যেন নীরস ও রুক্ষতাময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ ও মস্তিষ্কাদি যন্ত্র সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। চক্ষুঃকর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয়-কেই কোন বিষয়ে বিশেষরূপে অভিনিবিষ্ট করা যায় না এবং চিত্তও কোনদিকে অভিনিবিষ্ট হয় না। যে বিষয়ে নিয়োগ করা যায়, তাহার কেবল

উপরউপর স্বরটা গ্রহণ করিয়াই ইন্দ্রিয়গণ প্রতিনিবৃত্ত হয়। মন কিংবা কোন ইন্দ্রিয়ই অধিককাল কোন বিষয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বদাই ইতস্তত বিচরণ করিতে থাকে। কিছুকাল কিছুকাল এক এক বিষয়ে থাকিয়াই অলক্ষিতরূপে অন্যত্র চলিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের বেগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও দুর্দ্দম হইয়া উঠে। প্রবলবাত্যা, নাবিকের সহস্র যত্নকে পদ-দলিত করিয়া, নদীগর্ভ-প্রবাহিনী তরণীকে আপন ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী করে, রজোগুণ আত্মলাভ করিতে পারিলেও জীবের ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে ঠিক সেইরূপ করিয়া ফেলে। জীব সহস্র যত্ন-চেষ্টা করিয়াও রজোগুণ-পরিচালিত ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছানুবর্ত্তী করিতে পারে না।

রজোগুণ একপ্রকার কটুরস স্বরূপ; উহার অভ্যুদয় কালে কটুরসাস্বাদের সদৃশ একপ্রকার ভাবের উপলব্ধি হয়। লঙ্কা-মরিচ প্রভৃতি ভক্ষণে রসনা-ভাগ ও সর্ব্বশরীরের মধ্যে যেরূপ জ্বালা ও তীক্ষ্ণতা-ভাব অনুভূত হয়, রজোগুণের উদয়কালেও সর্ব্বশরীরের মধ্যে ঠিক সেইরূপ ভাবেরই অনুভূতি হইয়া থাকে।

লবণ ও অম্লরসানুভূতির সঙ্গেও রজোগুণানুভবের সাদৃশ্য আছে। উহাদের আস্বাদ-কালে ও তৎপরে রসনাদি শরীরাবয়বে যাদৃশ তীব্রাদি ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়, শরীর বা আত্মাতে রজের প্রাদুর্ভাবেও দেহের মধ্যে তাদৃশ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, রসনাতে অনেক সময় ঠিক সেই রসেরই আবির্ভাব হয়। রসনাটী অম্ল-অম্ল, কখন বা লবণ-লবণ হইয়া উঠে।

রজোগুণ কোন সময় কষায়-রসেরও তুলনা ভাজন হয়। হরীতকী প্রভৃতি কষায়-বস্তুর স্বাদ গ্রহণে রসনা-শিরাসমূহ যেমন সঙ্কোচিত ও নীরস ভাব গ্রহণ করে, রজোগুণের অভ্যুদয়েও জিহ্বার মধ্যে তাদৃশ পরিণাম দেখা গিয়া থাকে।—শরীরের অন্যান্য অবয়বের মধ্যেও কষায়-রসাস্বাদের পরবর্ত্তী ঘটনার অনুরূপ ক্রিয়া অনুভূত হয়। অনেক সময় শরীরে রজোগুণের আবির্ভাবে সর্ব্বশরীর রুক্ষতাময় এবং সঙ্কোচিত-সঙ্কোচিত ভাবে পরিণত হয়।

রজোগুণ এক প্রকার তীব্র-গন্ধের সদৃশ পদার্থ; পলাণ্ডু, হিঙ ও আর্দ্রকাদির আঘ্রাণে নাসাভ্যন্তরে যাদৃশ ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, রজোগুণের আবির্ভাব সময়ে সর্ব্বশরীরে সেই জাতীয় একরূপ ক্রিয়ার অন্তঃপ্রত্যক্ষ হয়; এমন কি, তৎকালে তাহার নিশ্বাস এবং মুখবায়ুতে সত্য সত্য পলাণ্ডু-গন্ধের ন্যায় একরূপ গন্ধই অন্য লোকে অনুভব করিতে পায়।

মালতী যূথী, পাটলাদি পুষ্পের আঘ্রাণের সঙ্গেও রজোগুণের আংশিক সাদৃশ্য আছে। উহাদের আঘ্রাণের মধ্য হইতে শৈত্য অংশটুকু বাদ দিয়া যে একরূপ মাদক-মাদক ও ভোগাল-ভোগাল ভাব অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত রজোগুণের তুলনা হইতে পারে; রজোগুণের স্ফূর্ত্তি হওয়া কালে শরীরের মধ্যে তাদৃশ একরূপ মাদক-মাদক, ভোগাল-ভোগাল ভাব অনুভূত হয়।

রজোগুণ এক প্রকার তীক্ষ্ণস্পর্শ-সদৃশ পদার্থ; উত্তপ্ত বস্তু সংস্পর্শে অথবা মরীচ্যাদির আমর্ষণে ত্বক্‌প্রান্তে যেরূপ তীক্ষ্ণতার অনুভূতি হয়, রজোগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে যেন শরীরাভ্যন্তরে সেইরূপ এক প্রকার তীক্ষ্ণ স্পর্শের উপলব্ধি হয়। যেন এক প্রকার জ্বালা হইতে থাকে; তখন রক্তের গতি দ্রুততরা হয়; ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্রগুলিও ঘন ঘন ক্রিয়াশীল হয়।

রক্তাদি তীক্ষ্ণবর্ণের সঙ্গেও রজোগুণের সাদৃশ্য আছে; লোহিতাদি তীক্ষ্ণ বর্ণ দর্শনকালে চাক্ষুষ স্নায়ু-মধ্যে যেরূপ অসহনীয় ভাব অনুভূত হয়, রজোগুণের অভ্যুদয়ে সর্ব্ব শরীরের মধ্যেই সেইরূপ উত্তেজক, তীব্র, অসহনীয় ভাবের উপলব্ধি হইতে থাকে। তীব্র-ধ্বনির সঙ্গেও রজোগুণের তুলনা করিতে পার। উহার অভ্যুদয় কালে তীব্রধ্বনি-শ্রবণ-সদৃশ ঘটনা হইয়া থাকে; এইরূপে বহীরাজ্যের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—এই পাঁচটী দ্বারা আন্তরিক রজোগুণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবে। বাস্তবিক যে জাতীয় রূপ-রসাদির সহিত আন্তর রজোগুণের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল, উহারা সকলেই মূল রজোগুণের উপাদেয়। মূল রজোগুণ হইতে রক্তবর্ণাদি বিষয়গুলি আবির্ভূত হয়। আন্তর রজ ও সেই মূল রজোগুণের উপাদেয়; এ নিমিত্ত বাহ্য-রূপাদির সহিত আন্তর-রজের আভ্যন্তরিক সমতা দেখা গিয়া থাকে। শাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ আছে,—"কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-

রুক্ষ-বিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥" (গীতা) এবং "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্ ইত্যাদি।"

রজোগুণ একপ্রকার অসন্তোষ স্বরূপ; উহার অভ্যুদয় কালে কথঞ্চিৎ সন্তোষ হইলেও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট অসন্তোষ বা অতৃপ্তির ভাব অনুভূত হয় ও কষ্টদায়ক হয়। উহার স্বরূপ এত কষ্টময় যে, ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রাদুর্ভূত হইলে মৃত্যুঘটনাও উপনীত করে। কথাটা হয় ত অনেকে স্থান দিতে পারিবেন না, কিন্তু ইহা সত্য যে, একজন পথের ভিখারী দরিদ্রকে যদি হঠাৎ দশ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অর্থলাভ-জনিত সন্তোষ রজোগুণেরই পরিণাম; উহা একেবারে ষোল আনা উত্তেজিত হইলে সন্তোষত্ব পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুজনক অসহনীয় হয়। সুরা-অহিফেনাদি যেমন স্বল্প-মাত্রায় অভ্যাস করিলে সন্তোষ এবং কষ্ট উভয়ের অনুভূতি হয়, কিন্তু হঠাৎ অত্যধিক পরিমাণে উদরসাৎ করিলে উহা মৃত্যু-জনক হয়। তখন উহার সেই উপর-উপরের সন্তোষ জনক ভাবটুকু তিরোহিত হয়, এবং নিদারুণ বিষময় হইয়া প্রাণ সংহার করে। রজোগুণও এইরূপ ধীরে ধীরে এক একটু করিয়া অভ্যস্ত হইলে বিষের উপর-উপরে অত্যল্প এক একটু সন্তোষ, মাধুর্য্য উদ্ভাসিত করে। কিন্তু উহা একেবারে বেশী পরিমাণে আবির্ভূত হইলে আর প্রাণের আশা থাকে না। উহার দারুণ গরল-ক্রিয়া দ্বারা দেহের পঞ্চত্বলাভ হয়। উহার পূর্ণ আবির্ভাবে সর্ব্ব শরীর অগ্নিময় হইয়া উঠে। প্রাণ-নাশক-প্রদাহ উপস্থিত হয়, রুধির জল হইয়া ঘর্ম্মাদি-রূপে উড়িয়া যাইতে থাকে। তীব্রতর পরিচালনার দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ক বিপ্রকৃত হইয়া ক্রিয়া রহিত হয়, পরে পঞ্চপ্রাণ বাহির হইয়া যায়। অতএব রজোগুণ অতি নিদারুণ কষ্টময় বস্তু। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, "উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ" (সাংখ্যকারিকা) এবং প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ (সাংখ্য)।

এই রজোগুণ অনেকগুলি প্রবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। যথা;— দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মত্তত্তা, নিষ্ঠুরতা, যশস্কামনা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা বৈর-নির্যাতনেচ্ছা, নির্ব্বন্ধ (একগুঁয়ে ভাব), সম্মান-প্রিয়তা, শরণ্যতা (শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষার চেষ্টা), দানশীলতা, দয়া, সরলতা, উদারতা, বিষয়-ভোগেচ্ছা, পটুতা, সাহস, উগ্রতা, অভিমান ইত্যাদি। ইহারা সকলেই রজোগুণের রূপান্তর, সকলেই রজোগুণের লক্ষণযুক্ত। রজোগুণের দুঃখময়ত্বাদি যে যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকেরই তাহা আছে। সকলেই ইহারা দুঃখময়, তাপময়, স্ফূর্ত্তিময়, চঞ্চলতাযুক্ত, রুক্ষ ও কর্কশতাদি-দোষ-যুক্ত এবং পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইলে ইহারা সকলেই সেই প্রাণনাশক বিষময় হইয়া উঠে।

মনুষ্যের যাহার মধ্যে যে পরিমাণে এই সকল গুণের ক্রিয়া দেখিতে পাইবে, তাহাকে সেই পরিমাণে রাজস-প্রকৃতির লোক বলিয়া স্থির করিবে। যিনি পূর্ণমাত্রায় এই সকল গুণ-সম্পন্ন, তিনি পূর্ণ রাজস-প্রকৃতিক। যিনি মধ্যম-মাত্রায়, তিনি মধ্যম রাজস-প্রকৃতিক। আর যিনি স্বল্পমাত্রায়, তিনি স্বল্প রাজস-প্রকৃতিক মনুষ্য। ঐ সকল গুণ যাহাতে নাই, তিনি রাজস-প্রকৃতির লোক নহেন। কৃপণ, জড়, মূঢ়, দুর্মেধ প্রভৃতি মনুষ্যগণ রাজস-প্রকৃতির নহে; পূর্ব্ব-কথিত সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মহাত্মগণও রাজস প্রকৃতিক নহেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ হইতে কায়স্থ পর্য্যন্ত জাতির মধ্যে অনেকের রাজসিক প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। খাঁটি মুসলমানের মধ্যেও ইহার বড় অভাব নাই। কিন্তু হিন্দু-জাতির মধ্যে অতি জঘন্য, মহা কৃপণ-স্বভাব যে কয়েকটী জাতি আছে, নাম-উল্লেখ ব্যতীত একমাত্র 'মহা কৃপণ' বিশেষণেই যাহারা সাধারণের নিকট সুপরিচিত, তাহাদের মধ্যে রজোগুণ এত স্বল্প যে, তাহারা কোন মতেই 'রাজস-প্রকৃতিক' বিশেষণ পাইতে পারে না। এ বিষয় পরে বিস্তৃত হইবে।

সত্ত্বগুণের ন্যায় রজোগুণেরও কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ আছে; ললাট, চক্ষু, মুখ, নাসিকাদি অবয়বের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে উহা প্রকাশিত হয়। তদ্দ্বারা রাজস-প্রকৃতিক লোক জানা যাইতে পারে। যাহারা রাজস-প্রকৃতিক লোক, তাহাদের মুখ-মণ্ডল হইতে সর্ব্বদা এক রূপ অসন্তোষের প্রভা বিকীর্ণ হয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণতা ও কর্কশতার সংমিশ্রণ থাকে; নয়ন-

দ্বয় উৎফুল্ল হইলেও উদ্ধ-জ্যোতিঃ-প্রকাশক অথচ অন্তঃক্ষীণতা-ব্যঞ্জক। উহাতে অসরল ভাব প্রকাশিত হয়। নয়নের জ্যোতি, অগ্নির জ্যোতির ন্যায় স্থূল ও কণোজ্জ্বরূপে অনুভূত হয়। নয়নদ্বয় সহ ললাট-ফলক অধ্বয্যভাব গ্রহণ করে; মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটু ভয়-মাখা বিদ্বেষের ভাব প্রস্ফুটিত হয়; ওষ্ঠদ্বয় সংস্মিত হইলেও অন্তঃস্মিত-শূন্য; মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাজস ব্যক্তির শরীর হইতে এক প্রকার তীব্রগন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি বহিঃপ্রবণা, বহিঃস্থূলা, ও অন্তঃক্ষীণা বলিয়া অনুভূত হয় এবং দেহের মধ্যে কোনরূপ অবসাদ, মান্দ্য, আলস্য, প্রমাদ, তন্দ্রা, মোহ ও গুরুত্ব পরিদৃষ্ট হয় না। ইত্যাদি আরও শত শত লক্ষণের দ্বারা রজোগুণের আন্তরিক সত্তা বুঝা যাইতে পারে। ইহাই রজোগুণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। অতঃপর তমোগুণ চিন্তা করা যাইবে।

আমার জীবন-চরিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চুন্নামিঞার আবাস-ভবনে, দিব্য এক প্রকোষ্ঠে, স্প্রীঙের গদী-আঁটা একশোফায়, আমি উপবেশন করিলাম। একজন ভৃত্য আসিয়া এক বৃহৎ পাখা হস্তে লইয়া, আমাকে বাতাস করিতে লাগিল। মৃদু মন্দ বায়ু সেবনে আমার দেহ-প্রাণ শীতল হইল। আলস্য বোধ হওয়ায় শুইয়া পড়িলাম। গদী আমার দেহকে যেন গিলিয়া রহিল।

গৃহটী বেশ সুসজ্জিত। মেজের উপর সর্ব্ব নিম্নে কি পাড়া আছে জানি না, বোধ হয়, দর্ম্মার মত কোন দৃঢ় জিনিষ হইবে। তাহার উপর মাদুর পাতা। তদুপরি সতরঞ্চ। সর্ব্বশেষে লাল টকটকে বনাত বিছানো। অদূরে একটী টেবিল এবং তাহার চারি ধারে চারি খানি চৌকি।—দুই চারি খানি ছবিও টাঙান আছে। এইটী চুন্নামিঞার, অর্থাৎ গবর্ণর সাহেবের প্রাইভেট বৈঠক-গৃহ।

এই বৈঠকখানা কিসের বলিতে পারেন, ইটের, মাটীর না কাঠের? কিছুরই নয়; ইহা কাপড়ের তাঁবু।

হলদুয়ানী—পর্ব্বতময় জঙ্গলপূর্ণ দেশ। নাইনিতাল পাহাড়ের নিম্নতলে অবস্থিত। এখানে লোকের বসবাস নাই, থাকিবার মধ্যে আছে এক বাজার। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণ, নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় উপস্থিত হইয়া বেচা-কেনা করে। বাজারের নিকট এক ডাক-বাঙ্গালা পূর্ব্বে ইংরেজের অধিকৃত ছিল, এখন মুসলমানের হাতে আসিয়াছে। বাজারের সম্মুখে অদূরেই ইংরেজ-আমলের তহশীলদারের কার্য্য-গৃহ। এক্ষণে মৌলবী ফজলহক্ তথায় বাস করিতেছেন। বাজারের কতকগুলি খোলার ঘর, ডাক-বাঙ্গালা, তহশীল-গৃহ,—ইহা ছাড়া হলদুয়ানীতে আর বাসোপযোগী গৃহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে ঝোপে-ঝাপে এ দিক-ও-দিকে দুই এক জনের গৃহ দৃষ্ট হইত এইমাত্র। অধিকাংশ সৈন্যই তাঁবুর ভিতর বাস করিত; যাহাদের তাঁবু জোটে নাই, তাহারা বৃক্ষতলায় আশ্রয় লইয়াছিল। চুন্নামিঞা বাজারের কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে, পরিষ্কৃত উচ্চ ভূমি নির্ব্বাচিত করিয়া, তথায় তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার জন্য প্রায় ১৫। ১৬ টী ছোট বড় তাঁবু পড়িয়াছিল। একটী তাঁবুতে তাঁহার শয়নঘর, অপরটীতে রসুই-ঘর আর একটীতে স্নানাগার। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাঁবুটীতে দরবার হইত। যে তাঁবুটীতে আমি আছি,—ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং এটী তাঁহার খাস বৈঠকখানা। চুন্নামিঞার শরীর-রক্ষক সিপাহী-শান্ত্রী, এবং দাস-দাসী, প্রভৃতির সংখ্যা আজ কে গণনা করিবে? প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, চুন্নামিঞার চিত্ত-বিনোদনার্থ, এই বৈঠকখানায় সুন্দরী নর্ত্তকী-বৃন্দ নৃত্যও করিয়া থাকে।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, কালের কি বিচিত্র গতি! মরুভূমে হঠাৎ জলাশয় দেখা দিল! হঠাৎ তাহাতে আবার পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হইল! অমানিশা জ্যোৎস্নাময়ী হইল! যে চুন্নামিঞা ইতিপূর্ব্বে 'টো-টো' কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিল; দরিদ্রের পূর্ণ লক্ষণ যাহার মুখে অঙ্কিত হইয়াছিল, একটী টাকা পাইলে যে একটী মোহর বলিয়া বিবেচনা করিত;—সেই চুন্নামিঞা আজ

কেন হঠাৎ এরূপ ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইল? কেন এত অশ্ব-হস্তী জন-গণের এবং বিষম বিভবের অধিকারী হইল?' ভোগ-বিলাসিতা মূর্ত্তিমতী হইয়া, আজ কেন তাহার চরণ-যুগল, আজ্ঞাকারিণী ক্রীতদাসীর ন্যায়, সতত সেবা করিতে অনুরক্ত হইতেছে? কিসে কি হয়, তাহা বুঝি না,—কাহার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে, তাহাও জানি না! মহামায়ার এই অপরূপ মায়া-জাল ভেদ করিতে কে সমর্থ?

প্রকৃতই বিধাতার বিচিত্র বিধান বুঝা ভার! বন্দী হইয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া, আমি একটী বারও অন্তরের সহিত ভাবিতে সক্ষম হই নাই যে, আজ আমি রক্ষা পাইব। তোপের রক্তবর্ণ বৃহৎ গোলাকার গোলা আসিয়া আমার বক্ষ ভেদ করিয়া ফেলিবে, আমার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণিত হইবে, ইহাই আমার ধ্রুব-ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্র-বলে আমি রক্ষা পাইলাম। তাই বলিতে হয়, মহামায়ার মায়া-রহস্য বুঝি-বার শক্তি মানুষের নাই।

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় চুন্নামিঞা, সেই বৈঠক-গৃহে আসিয়া বলিলেন, "সমস্ত প্রস্তুত, আসুন! উপস্থিত একটু সরবৎ এবং ফলমূল মিষ্টান্ন খাইয়া জলযোগ করুন।" আমি ঈষৎ চকিত হইয়া বলিলাম—"জল-খাবার কে আনিল? কে তৈয়ারি করিল এবং কোথাই বা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল?" চুন্নামিঞা ঈষৎ হাঁসিয়া উত্তর দিলেন,—"সে সব কিছু ভয় নাই। আমার এই সৈন্যদল মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণও আছে। সেই ব্রাহ্মণ দ্বারাই, আপনার আহারীয় সামগ্রীর সংযোগ হইয়াছে। চলুন, ঐ নিকট-বর্ত্তী তাঁবুতে সমস্ত প্রস্তুত।"

আমি তথায় গিয়া, জলযোগ-কার্য্য সমাধা করিলাম। তৃষ্ণা দূর হইল। দেহে আরও একটু বল পাইলাম। মন তখন 'আরও কিছু খাই, আরও কিছু খাই,' করিতে লাগিল। চুন্না-মিঞা জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবু সাহেব! এইবার অন্ন পাক করিবেন কি?" আমি বলিলাম,—"হাঁ, দুই দিবস অতীত হইল, আমি অন্নাহার করি নাই। কিছু ঘৃত, চাল এবং ডাল পাইলে খিচুড়ী রন্ধন করি।" চুন্নামিঞা বলিলেন,—"তাহার আর ভাবনা কি? সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছি. এই তাঁবুর পার্শ্বে রন্ধন করুন।" আমি দেখিলাম, এখানে সকলই মুসলমানী ব্যাপার—মুরগী হাঁস চরিতেছে। প্রকাশ্যে কহিলাম,—"এখানে রসুই করিবার আমার সুবিধা হইবে না, অদূরে ঐ বৃক্ষতলে নিভৃত স্থানে আমি রন্ধন করিব।" চুন্নামিঞা কহিলেন,—"তবে তাহাই করুন।" যেখানে বিদ্রোহী সেনাগণ শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল, তাহার প্রান্তভাগে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তথায় আহারের আয়োজন করিতে বলিলাম। সেই স্থানের নিকট দিয়া পর্ব্বতীয় ঝরণা ঝর্ ঝর্ প্রবাহিত হইতেছিল। সেই ঝরণার নিম্নপ্রদেশ, ইংরেজ বলপূর্ব্বক প্রস্তর দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। বন্ধনের স্থান হইতে ঝরণাটী, ক্ষুদ্র নদীর ন্যায়, দুইটী মুখে দুই দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সেই নিভৃত মনো-রম স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ স্নান করি-লাম। আমার পরিচর্য্যা ও সেবার জন্য চুন্নামিঞা চারিজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা বাজার হইতে নব বস্ত্র আনিয়া দিল। আমি স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, চাল, ডাল, আলু, আটা ও অন্যান্য মসলা-সমূহ আনীত হইল। মাটীর উনান তৈয়ারি হইল।

বলা বাহুল্য, আমার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রার্থনানুসারে টাটুওয়ালা ও সেই নবীন হিন্দুস্থানী যুবকেরও মুক্তিলাভ হয়। তাহারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারাও সেই পর্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীতে স্নান করিয়া, সেই স্থানে রন্ধনের উদ্যোগ করিল। আমি টাটুওয়ালাকে কহিলাম,—"তোর আর স্বতন্ত্র রাঁধিবার আবশ্যক কি?—তুই আমার প্রসাদ পাইবি।" সে যোড়হাতে উত্তর দিল,—"যে আজ্ঞা হজুর।" আমি বিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ভুনী-খিচুড়ী রন্ধন করিলাম। নিজের রন্ধন-সামগ্রীর প্রশংসা করিতে নাই, তথাচ বলিয়া রাখি, খিচুড়ী অতি চমৎকার হইয়াছিল। তোফা সুগন্ধ-যুক্ত ঘৃত; মসুরির ডালগুলি বড়ই পরিষ্কার ও মনোহর; এবং স্বয়ং আমি পাচক। বুঝুন না কেন, ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল। এরূপ খিচুড়ীর কাছে পোলাও কোথা লাগে? ক্ষুধাও কিঞ্চিৎ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখ এই,—এরূপ উৎকৃষ্টতর রন্ধন হইলেও, খিচুড়ী অধিক খাইতে

পারিলাম না। দুই-চারি গ্রাস মুখে দিতেই মুখ কেমন মরিয়া আসিল। শেষে ব্রতস্বিনীর সুস্বাদু জল এক ঘটী খাইয়া ফেলিলাম পেট দমসম হইল। তার পর আরও দুই চারি গ্রাস খিচুড়ী খাইলাম, কিন্তু আর ভাল লাগিল না। তখন অতি কষ্টে আরও দুই এক গ্রাস খিচুড়ী উদরস্থ করিলাম। শেষে আসন হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া পান ও মসলা চিবাইতে লাগিলাম।

আমার পাতে প্রায় বার আনা খিচুড়ী মজুদ টাটুওয়ালার জন্য হাঁড়ীতেও যথেষ্ট খিচুড়ী ছিল হাড়ীর খিচুড়ীও, টাটুওয়ালা আমার পাতে ঢালিল। দ্বিগুণ খিচুড়ীতে পাত্র উথলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। টাটুওয়ালা, ইহজন্মে কস্মিনকালে এরূপ শিক্ষিত পাচক দ্বারা প্রস্তুত, এরূপ সদ্গন্ধ-যুক্ত-ঘৃত-সমন্বিত, ভূনী-খিচুড়ী ভক্ষণ করে নাই। প্রায় ২৮ ঘণ্টার পর ক্ষুধার্ত্ত টাটুওয়ালা এরূপ অপূর্ব্ব আহার পাইয়া শীঘ্রহস্তে শুভ কার্য্য সুসম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল। আমি অনিমিষ-লোচনে একাগ্রচিত্তে যেন চিত্রিত ছবির ন্যায় টাটুওয়ালার সেই বীর-আহার সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় আড়াই প্রহর। যে চারিজন ব্রাহ্মণ আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কহিলাম,—"তোমরা এখন স্বস্থানে যাও। রসুই করিয়া খাও। আমার আবশ্যক হইলে, তোমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইব।" পিতলের বাসন, ঘটী, বাটী, থাল,—সমস্তই তাহারা যোগাইয়াছিল। আমি কহিলাম, "ও-বেলা আসিয়া এ গুলি তোমরা লইয়া যাইও।" তাহারা "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আমি বসিয়া-বসিয়া এক দিকে টাটুওয়ালার আহার-কার্য্য সন্দর্শন করিতেছি, অন্য দিকে পর্ব্বতীয় ঝরণার শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি; এমন সময় একজন "পাহাড়ী" পর্ব্বতবাসী ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার দক্ষিণ পদে লোহার বেড়ী সংলগ্ন। বাম পদের বেড়ীটী তাহার দক্ষিণ হস্তে অবস্থিত। সে, নাইনিতাল পাহাড় হইতে এই মাত্র নামিয়া আসিয়াছে। আমি তাহার ভাবভঙ্গী-মূর্ত্তি দেখিয়া, প্রথমতঃ তাহার সহিত কোন কথা না কহিয়া, তৎপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সে ক্রমশঃ আরও আমার কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া ধীরস্বরে কহিল,—"আপকা নাম তো দুর্গাদাস বাবু! আপ্‌কা সব্ হাল নাইনিতালকা সাহেব-লোগো কোঁ মালুম হুয়া কি আপ পাকড়্‌গয়ে। লেকেন্ জল্‌দী কহিঁকো চলে যাইয়ে, কেঁও কি আজ কাল্‌মে সাহেবলোগ ধাওয়া করেঙ্গে।" এই কথা বলিতে বলিতে সে ব্যক্তি তীরের ন্যায় আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল এবং যেখানে বিদ্রোহী সৈন্যদল অবস্থিতি করিতেছিল, তদভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়াই, অনেক সৈন্য আগে ভাগে তাহার নিকট দৌড়িয়া আসিল। আহ্লাদে গদগদ হইয়া কেহ তাহাকে কোলে করিল, কেহ তাহাকে কাঁধে করিল, দুই বাহু দ্বারা কেহ তাহার অঙ্গ বেষ্টন করিয়া ধরিল। ফল কথা, সেই "পাহাড়ীর" আদর অভ্যর্থনার কোনরূপ ক্রটী রহিল না। আমি তো ব্যাপার দেখিয়াই অবাক্। এ ব্যক্তি কে? ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহা জানিবার জন্য তদভিমুখে এক-আধ পা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশেষে একজন বয়োবৃদ্ধ তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। বলিল,—"ভাই! তোমার হাতে পায়ে বেড়ী কেন? তোমার এরূপ দৈন্যদশা কেন এবং তুমি এত দিন এখানে আস নাই বা কেন?"

একটু পূর্ব্ব ইতিহাস বলিয়া রাখি। এই আগন্তুক পর্ব্বত-বাসী, বিদ্রোহী-সিপাহীদের গুপ্তচর ছিল। নাইনিতাল-পর্ব্বতস্থ ইংরেজ-গণের গতিবিধি বল-বিক্রম সমস্তই গুপ্তভাবে জানিয়া আসিয়া, বিদ্রোহীদিগকে বলিয়া দিত।

"পাহাড়ী," বয়োবৃদ্ধ সিপাহীর কথার এইরূপ উত্তর দান করিল,—"আমি তোমাদের যে গুপ্ত-চর এবং আমি তোমাদের সদাই যে সহায়তা করিয়া থাকি, হঠাৎ একদিন ইংরেজ এ বিষয় জানিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে বন্দী করিয়া ভীষণ কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু হলদুয়ানীতে নবাব-সাহেবের পাঁচ হাজার ফৌজ আসিয়াছে শুনিয়া, ইংরেজগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া নাইনিতাল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

গিয়াছে। সেই সুযোগে বন্দীরাও জেলখানা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বন্দীরা এখন স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছে। তোমরা এক্ষণে নিরাপদে নাইনিতালে যাও। সম্ভবতঃ সেখানে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া বিদ্রোহী সেনাগণ চতুর্গুণ আহ্লাদিত হইল। কোন্ দল নাইনিতাল অভিমুখে অগ্রসর হইবে, তাহারই পরামর্শ হইতে লাগিল। কিন্তু মজা এইটুকু, কোন দলই অগ্রগামী হইতে সাহস করিল না। অশ্বারোহী সৈন্যেরা, পদাতিক সৈন্য-দলকে এই ভাবে একবাক্যে কহিতে লাগিল,—"ভাই! তোমরা অগ্রবর্ত্তী হও।" পদাতিক সৈন্যেরা এ কথার এই উত্তর দিল,—"তোমরাই অগ্রবর্ত্তী হওনা কেন?" ফল কথা, এই বিষয় লইয়া উভয় দল মধ্যে বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল,—হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, চীৎকার, চপেটাঘাত পর্য্যন্ত আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, সে স্থানে উচ্চদরের কোন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন না।

আমার হৃদয়,—বিস্ময়, কৌতূহল ও ঔৎসুক্যে পূর্ণ হইল। এই লোকটা কে? আমার নাম জানিল কিরূপে? আমাকে চিনিলই বা কিরূপে? আমাকে আমার মনোমত মঙ্গলময় কথা বলিয়া আসিল; আবার বিদ্রোহীদের নিকট গিয়া উঁহাদের হৃদয়-রোচক সুখময় কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না এ সকল সত্য সত্যই সত্য ঘটনা?

দেখিতে দেখিতে সেই "পাহাড়ী", সেনাদল-মধ্যে মিশিয়া গেল। আমিও ভাবিতে ভাবিতে সেই নির্ঝরিণীতটে এক বৃহৎ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলাম। হৃদয় সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তখন রহস্য ভেদ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইলাম না।

পাঠকগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। এই ছদ্মবেশী;—বহুরূপীবৎ পর্ব্বতবাসী কে? পরে যাহা আমি জানিয়া ছিলাম, তাহা আপনারা এখনই সংক্ষেপে শুনুন;—প্রকৃতই "পাহাড়ী" ইতিপূর্ব্বে বিদ্রোহীদিগের গুপ্তচর ছিল; পাহাড়ে যাইবার রাস্তা-ঘাট এবং সেখানে কি হইতেছে, কি না-হইতেছে, ইংরেজেরা কিরূপ উদ্যোগ করিতেছে, কিরূপে রসদ সংগ্রহ করিতেছে,—এ ব্যক্তি সেসকল সংবাদ যথানিয়মে বিদ্রোহীগণকে আনিয়া দিত। এ কথা ক্রমশঃ নাইনিতালস্থ ইংরেজদের কর্ণগোচর হয়। ঐ পাহাড়ী-গুপ্তচরের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতিও পাহাড়েই থাকিত। একদিন সে পরিবার-বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, ইংরেজ-সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং সপরিবারে বন্দী হইয়া ইংরেজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। শেষে ইংরেজের সহিত ঐ পাহাড়ীর এই সর্ত্ত হইয়াছিল যে, যদি সে ব্যক্তি বিদ্রোহিদের কত সৈন্য, কত কামান, কত গোলা-গুলি, কত অস্ত্র আছে, তাহা জানিয়া আসিয়া বলে, এবং প্রবঞ্চনা—পূর্ব্বক বিদ্রোহিগণকে নাইনিতালের রাস্তায় আনিতে পারে, তাহা হইলে সে সপরিবারে মুক্তিলাভ করিবে,—নতুবা নহে। বিদ্রোহিগণকে ছলনা দ্বারা ভুলাইবার জন্য সে এক গাছি বেড়ী পায়ে দিয়া, এবং এক গাছি বেড়ী হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সে যেন বেড়ী ভাঙ্গিয়া কারাগার হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। আমি যে ইংরেজের লোক এবং বিদ্রোহীদের হাতে পড়িয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, তাহা সে পূর্ব্বেই জানিত; এবং ইংরেজের মুখে আমার আকার-প্রকার-মূর্ত্তির বিষয় সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। ঐ পাহাড়ী বড়ই ধূর্ত্ত এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া আমাকে চিনিয়া, পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আপনার নাম তো দুর্গাদাস বাবু!" এক্ষণে অদ্য সে ইংরেজের পক্ষ হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবেই বিদ্রোহী দিগকে ঠকাইতে আসিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সকলেরই আহার শেষ হইল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী যুবক, টাটুওয়ালা এবং আমি,—তিন জনেই খরবেগে চুন্নামিঞার বৈঠক অভিমুখে চলিলাম। টাটুওয়ালা আকণ্ঠ পূর্ণ আহার করিয়া চলিতে একান্তই অক্ষম। পেট যদি ফুটিজাতীয় হইত, তাহা হইলে টাটুওয়ালার পেট অদ্যই ফাটিয়া যাইত। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"পরের সামগ্রী বলিয়াই কি এত খাইতে হয়?"

তাঁবুর নিকটবর্ত্তী হইয়া ভৃত্য-দ্বারা আমার আগমন-বার্ত্তা চুন্নামিঞাকে জানাইলাম। আমি

ভিতরে গেলাম। হিন্দুস্থানী এবং টাট্টুওয়ালা তাঁবুর বাহিরে রহিল। প্রবেশমাত্র আমাকে চুন্নামিঞা বিশেষ অভ্যর্থনাপূর্ব্বক এক চৌকির উপর বসাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "পেট ভরিয়াছে ত? এ জঙ্গল-দেশ, এখানে খাবার জিনিস ভাল মিলে না" আমি আপ্যায়িত ভাবে বলিলাম "পেট খুব ভরিয়াছে, জিনিসের অভাব কি? ঘৃত অতি চমৎকার! এরূপ সুগন্ধময় ঘৃত বেরিলীতেও সহসা মিলে না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" চুন্নামিঞা কহিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কেবল অপনার সৌজন্য। সে যাহা হউক, আপনার জন্য অদ্য হৃষ্টপুষ্ট নবীন নধর দুইটী ছাগল যোগাড় করিয়াছি এবং আপনার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে দুইটী তাঁবুও ফেলাইয়াছি আর রন্ধনের জন্য একজন পাচক ব্রাহ্মণও নিযুক্ত করিয়াছি। আপনি পথে বহুকষ্ট পাইয়াছেন। পাঁচ সাত দিন এখানে থাকুন, বিশ্রাম করুন এবং সুস্থির হউন।" আমি বলিলাম, "এ সকলই আপনার অনুগ্রহ। আপনি অদ্য আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং আপনি আমার নিকট পরম পূজনীয় দেবতা স্বরূপ। আপনার আজ্ঞা সর্ব্বসময়েই শিরোধার্য্য। কিন্তু আমার বক্তব্য এই, অদ্যই আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাইব, তাই আপনার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি।"

চুন্নামিঞা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"তাওকি কখন হয়! এখনও আপনার পায়ের ব্যথা মরে নাই। পৃষ্ঠদেশের বেত্রাঘাত-ক্ষতও শুষ্ক হয় নাই। বিশেষ অদ্য আপনার জন্য আমি তয়ফা-নাচের বন্দোবস্ত করিয়াছি। এই পর্ব্বতীয় প্রদেশের রমণীগণ পরমা সুন্দরী। তাহাদের একবার হাবভাব-যুক্ত নর্ত্তন দেখিলে, তাহা আর ইহ জন্মে ভুলিতে পারিবেন না। নর্ত্তকীর নৃত্য ব্যতীত দিল্লী হইতে একজন সঙ্গীত-অভিজ্ঞ ওস্তাদ আসিয়াছেন। তিনি সেতারে সিদ্ধহস্ত। নাচ শেষ হইলে তাঁহার সেতার-বাজনা আরম্ভ হইবে। এরূপ নৃত্য গীত ছাড়িয়া, এরূপ ঐশ্বর্য্য-সমারোহ ছাড়িয়া আপনি একাকী পদব্রজে এই বর্ষাকালে বিপদ-সঙ্কুল দুর্গম পথ দিয়া কোথা যাইবেন বলুন দেখি? আর এদিকে সন্ধ্যা সমাগত হইবার অধিক দেরী নাই। আকাশে মেঘও রহিয়াছে। দিব্য স্বচ্ছন্দে কিছুদিন এখানে কালাতিপাত করুন,—কোথা যাইবেন?"

আমি দেখিলাম, ঘোর বিপদ। ওদিকে ইংরেজের গুপ্তচর পাহাড়ী আজ আমাদিগকে এস্থান ত্যাগ করিতে কহিয়াছে। এদিকে চুন্নামিঞা আমাকে এখানে থাকিবার বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। করি কি, কোন্ দিক্ রাখি? ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম, এখানে কিছুতেই থাকা হইবে না। বিশেষ কাতরতা দেখাইয়া চুন্নামিঞাকে কহিলাম, "আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাকে গমনের অনুমতি দিন। আমার মন চঞ্চল হইয়াছে। আমি কিছুতেই এ স্থানে তিষ্ঠিতে পারিব না। ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। আমি যোড়হাতে বলিতেছি, আপনি আমাদের অদ্যই বিদায় দিন।" চুন্নামিঞা কহিলেন, "বাবু সাহেব! আপনি এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? যদি এ স্থান ত্যাগ করাই আপনার একান্ত অভিমত হইয়া থাকে, তবে আজকার রাত্রিটী থাকিয়া কল্য প্রাতে যাইবেন।"

আমি। যদি শুভ অনুমতিই হইল, তবে আর এখানে কালবিলম্ব করিতে বলিবেন না।

চুন্নামিঞা। আপনি যাউন, তাহাতে কোন আপত্তি করি না, কিন্তু আশঙ্কা এই, পথে কোন বিপদ ঘটিতে পারে। নিয়তি আপনাকে টানিতেছে, নচেৎ আমার অনুরোধ আপনি উপেক্ষা করিবেন কেন? এই দুর্গম পথে বাঘ, ভালুক এবং বন্যহস্তীর ভয় তো আছেই, ইহা ব্যতীত, দুরন্ত দস্যুদল অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সদাই ঘুরিতেছে। বিশেষ এই বর্ষাকালে বন-জঙ্গলে পথ-ঘাট সমস্তই পূর্ণ হইয়াছে, তথাচ আপনি এই অবেলায় সন্ধ্যার প্রক্কালেই যাইতে উদ্যত হইয়াছেন! তাই বলি, নিতান্তই নিয়তি আপনাকে টানিতেছে।

আমি। (হাসিয়া) বিপদে আর বড় ভয় করি না। আজ যখন আমি তোপের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তখন আমি যে সহসা মরিব, এ বিশ্বাস আমার হয় না।

চুন্নামিঞা। আপনি এখন কোন্ দিকে যাইবার অভিলাষ করিয়াছেন? যে দিকেই যাউন, আমার নিকট হইতে "রাহাদারী-পরওয়ানা" লইয়া যাইবেন, নচেৎ আমাদের লোক দ্বারাই পথে পুনরায় উৎপীড়িত হইতে পারেন।

আমি। নাইনিতালের পথে যাইব।

চুন্নামিঞা। (সবিস্ময়ে) না! না! না! তাহা হইতে পারে না। নাইনিতাল-পথে যাইবার জন্য পাশ আমি কখন দিতে পারি না। অন্য অন্য সেনাপতিগণ ইহাতে সন্দেহ করিবেন। এক্ষণে হয়, এক্ষণে বেরিলী ফিরিয়া যাউন, অথবা কাশীতে,—যেখানে আপনার মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি আছেন,—সেখানে চলিয়া যাউন।

চুন্নামিঞা একজন মুন্সীকে ডাকাইলেন, তাহাকে রাহাদারী পরওয়ানা লিখিতে বলিলেন। শেষে সেই পরওয়ানায় স্বয়ং দস্তখত করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"আপনি বহেড়ী হইয়া পুনরায় বেরিলীতে গমন করুন, ইহাই আমার সৎপরামর্শ।"

আমি অগত্যা তাঁহার এই কথাই স্বীকার করিলাম।

গত পরশ্ব বন্দী হইয়া আসিবার সময় পথে যে নয়টী মোহর আমি বৃক্ষমূলের নিকট পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কথা স্মরণ হইল। বহেড়ীর রাস্তা দিয়া বেরিলী যাইতে হইলে আর আমাকে সেই পূর্ব্বপথে যাইতে হইবে না। সুতরাং মোহর কয়েকটী কেমন করিয়া সংগ্রহ করি, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। চুন্নামিঞার নিকট বহির্দেশে যাইবার ভাণ করত লোটা-হস্তে মোহরের অনুসন্ধানে গেলাম। কিন্তু পূর্ব্ব-পরিচিত বটবৃক্ষটী এক্ষণে চিনিয়া লওয়া আমার পক্ষে ভার হইল। সে দিন রাত্রে বন্দী হইয়া যাইবার সময় কেবল কয়েকটী মাত্র ডাল-পালা-বিহীন-বৃক্ষ দেখিয়া ছিলাম। এক্ষণে দেখি, প্রায় সকল গুলারই এক দশা,—শাখা পল্লব-বিহীন ভ্রষ্টশোভ হইয়া রহিয়াছে। আমি পূর্ব্ব বৃক্ষটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া গেলাম। তথাপি গাছটী চিনিতে পারিলাম না। কেমন আমার ভ্রম জন্মিল। শেষে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হঠাৎ সেই বৃক্ষটী চিনিতে পারিয়া,তাহার মূলদেশ খননান্তর কাপড়ে বাঁধা মোহর কয়টী সংগ্রহ করত পূর্ব্বের ন্যায় যষ্টির সহিত মুষ্টির মধ্যে রাখিলাম। পুনরায় চুন্নামিঞার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করত বহেড়ীর রাস্তায় চলিলাম।

আমরা অর্দ্ধ মাইল পথও অতিক্রম করি নাই, এমন সময় পশ্চিমে দেখিলাম, নবাবের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন মুসলমান সিপাহী আসিতেছে। আমাদের তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে একজন কড়াস্বরে বলিল,—"তোমরা কোথায় যাইতেছ?" আমি রাহাদারী পরওয়ানা দেখাইয়া বলিলাম,—"আমরা বেরিলী যাইতেছি,—নবাব সাহেবের ইহাই হুকুম।"

যে মুসলমান সিপাহীর হস্তে আমি পরওয়ানাটী দিলাম, সে লেখাপড়া জানে না। সে হাস্য করিয়া বলিল,—"ইহা জাল পরওয়ানা; তোমরা মিথ্যাবাদী এবং চোর। তোমরা এই টাটু চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছ।" আমি বলিলাম,—"এ টাটু আমি বেরিলী হইতে ভাড়া করিয়া আনিয়াছি।" টাটুওয়ালার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "ইহা এই ব্যক্তির টাটু।" মুসলমান সিপাহী বলিল,—"তুই বেটা চোর, বদমাইস, হলদুয়ানীতে লইয়া গিয়া তোকে তোপে উড়াইব, চল্, আমার সঙ্গে।"

তখন কয়েকজন সিপাহী আমায় পুনরায় বাঁধিল। উত্তম মধ্যম দুই চারি ঘা প্রহারও করিল। আমি নীরব। সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। টাটুওয়ালা এবং হিন্দুস্থানী যুবক আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তাহারা আমাকে লইয়া চুন্নামিঞার নিকট উপস্থিত হইল। আমাকে পুনরায় বন্ধন দশায় দেখিয়াই চুন্নামিঞার চক্ষু স্থির! ক্রোধভরে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিয়া, তিনি মুসলমান-সিপাহীগণকে বিস্তর গালি দিলেন। তাঁহার শরীর-রক্ষক সৈন্য আসিয়া আমার বন্ধন খুলিয়া দিল। তৎপরে [illegible]ঞা আমার নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত [illegible], আরও রুষ্ট হইলেন। তাঁহার স্বাক্ষরিত রাহাদারী পরওয়ানা অমান্য করার জন্য প্রত্যেক সিপাহীর প্রতি পঁচিশপঁচিশ বেতের হুকুম হইল। সিপাহীগণ, পলায়মান টাটুচোর ধরিয়া আনিয়াছে, নিশ্চয়ই নবাব-সাহেবের নিকট পুরস্কৃত হইবে, এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া, তাহারা প্রফুল্লমনে আমাকে চুন্নামিঞার নিকট হাজির করিয়াছিল। কিন্তু পুরস্কার তাহারা যাহা পাইল, তাহা অন্যরূপ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

নবাব সাহেবের নিকট আবার আমি বিদায় চাহিলাম। নবাব সাহেব ক্ষুণ্নমনে বিদায় দিয়া কহিলেন,—"খোদা আপনাকে রক্ষা করুন।" আমি ভাবিতে লাগিলাম, চুন্নামিঞার বোধ হয় কিছু রাগ হইয়া থাকিবে, নচেৎ এবার আমাকে এখানে থাকিতে বলিল না কেন? বলা বাহুল্য, থাকিতে বলিলেও কিছুতেই আমি থাকিতাম না। সেই পাহাড়ী গুপ্তচরের কথাই এক একবার মনে পড়ে, আর পলাইবার জন্য মন ব্যাকুল হয়।

দুর্গা দুর্গা স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। তখন দিবা অবসানপ্রায়। সূর্য্যদেব ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করত অস্তাচল-শিখরে বিলুপ্ত-প্রায় হইতে চলিলেন। সেই মহাবনের দীর্ঘ দীর্ঘ তরুশিরে অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের স্বর্ণ-প্রভা ছড়াইয়া পড়িয়া কতই রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে! হুহু শব্দে বায়ু চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অঙ্গের বসন অঙ্গে রাখা ভার হইয়াছে। আমি আঁটিয়া সাঁটিয়া মালকোঁচা মারিয়া, কাপড় পরিয়া, বীরবেশ ধারণ করিলাম। হলদুয়ানী হইতে বহেড়ী দিয়া বেরিলী যাইবার রাস্তা কাঁচা। এ পথ দিয়া সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করে না বলিয়া, পথটী এত ঘাস ও কণ্টকময়, এবং লতাগুল্মে এরূপ সমাচ্ছন্ন যে, রাস্তা চলা বড় কঠিন। তাহার উপর দুই পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। বৃক্ষ-শাখায় পথ এরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, রাত্রের কথা দূরে থাকুক, দিবা-ভাগেও রাস্তা ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ সূর্য্যের আলো ছিল, ততক্ষণ পথ চিনিয়া-চিনিয়া, এক প্রকার কষ্টে শ্রেষ্ঠে আমরা যাইতে-ছিলাম। কখনও কাঁটাবন ডিঙ্গাইয়া, কখনও ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া, কখনও বা হোঁচট খাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে ঘোর গভীর অন্ধকার আসিয়া দশদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।—এক্ষণে রাস্তা চলা প্রকৃতই কঠিন হইয়া উঠিল। পথ তো নয়ন-গোচর হইল না, কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আন্দাজি, অন্ধ ব্যক্তির ন্যায়, পথ চলিতে লাগিলাম। আকাশে চন্দ্র নাই, মেঘ-মালার উদয়ে, আকাশে তারকা-মালাও নাই। আর অবনীতে আমার নিকটও কোনরূপ আলোক নাই। ঘন-সন্নিবিষ্ট সূচীভেদ্য নীরন্ধ্র চাপ্-চাপ্ অন্ধকার, ভূতের ন্যায় বিভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে যেন গিলিতে আসিতে লাগিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি যে, হিন্দুস্থানী যুবকটী আর নাই। তার নাম ধরিয়া তখন কত ডাকিলাম, তথাচ কোন উত্তর পাইলাম না। বাঘে লইয়া গেল না কি? বাঘে লইলে শব্দ হইত, বাঘের গর্জ্জন এবং হিন্দুস্থানী যুবকের আর্ত্তনাদ—উভয়ে একত্রে মিশিত। অবশ্যই আমি জানিতে পারিতাম। আমাদের গতিক দেখিয়া, আরও ভাবি বিপদ আশঙ্কা করিয়া, হিন্দুস্থানী যুবক নিশ্চয়ই পলাইয়াছে;——ইহাই স্থির করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে আমি অগ্রগামী ছিলাম, আর টাটুওয়ালা টাটুর বল্গা ধরিয়া, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। পাছে টাটুওয়ালাও পলায়, এই ভয়ে টাটুওয়ালাকে অগ্রগামী করিয়া আমি পশ্চাদ্ভাগে আসিলাম। এইবার এক ঘোর বিপদে পতিত হইলাম। টাটুওয়ালার একরূপ চলচ্ছক্তি রহিত হইল। পাঠকগণ জানেন, অদ্য আমি যে খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা আমি অধিক আহার করিতে পারি নাই;—অধি-কাংশই সেই টাটুওয়ালার উদরস্থ হইয়াছিল। সে ইতরলোক; এ প্রকার মসলা-সংযুক্ত ঘৃত-পক্কের জিনিষ ইহজন্মে কখন খায় নাই। লোভ-সংবরণ করিতে না পারিয়া, সে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত খিচুড়ী খাইয়াছিল। সুতরাং পথে তাহার পেটের পীড়া উপস্থিত হইল। প্রায় প্রতি দশ মিনিট অন্তর তাহার দাস্ত হইতে আরম্ভ হইল। আমি প্রমাদ গণিলাম। আকাশপানে চাহিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলাম,—"প্রভু দয়াময়! বিপদের উপর আবার একি বিপদ ঘটাইয়া দিলে? এ পীড়িত টাটুওয়ালাকে লইয়া পথ চলিব কেমন করিয়া?" এইরূপে খানিক-খানিক যাই, আর টাটুওয়ালার জন্য খানিক খানিক দাঁড়াইয়া থাকি।

হলদুয়ানী হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পথ আমরা অতিক্রম করিয়াছি। রাত্রি বোধ হয়, আট ঘটিকা হইয়া থাকিবে। এমন সময় নিবিড় জঙ্গল মধ্যে শুষ্ক পত্রের খশ্ খশ্ শব্দ হইতে লাগিল। আমার বোধ হইল, বুঝি কোন বন্য জন্তু

আসিতেছে। বুঝি বাঘ বা ভালুক মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া আহারার্থ অগ্রসর হইতেছে। বড় বাঘ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব, ইহাই স্থির করিলাম;—কারণ আমার নিকট কোনরূপ আগ্নেয় অস্ত্র নাই। আমার নিকট যে, রিবলবারটী ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে। কেবল এক সরু লাঠি দ্বারা বাঘের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু বিনাযুদ্ধে কখনই প্রাণ দেওয়া হইবে না,—ইহা ভাবিয়া ব্যাঘ্রের আগমন প্রতীক্ষা পূর্ব্বক, প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।' অতি অল্পক্ষণ পরেই, আমার সেই ব্যাঘ্র-ভ্রম দূর হইল। সবিস্ময়ে সম্মুখে দেখিলাম,—কৌপীন-মাত্র-পরিহিত, অতি-ভীষণ আকার, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছয়জন দস্যু সুদীর্ঘ লাঠী হস্তে দণ্ডায়মান। তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসিল,—"তুম্‌লোগ কোন্ হো? কাঁহা যাতে হো?"

আমি। নবাব সাহেবের হুকুমে আমি বহেঁড়ী যাইতেছি।

দস্যু। "তেরে পাস্ কেয়া হ্যায়"

আমি। কিছুই নাই;—তবে ঐ টাটুর উপর আমার জিনিষ পত্র আছে,—কিন্তু টাটুটী আমার নহে।

এই বলিয়া আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, টাটুটী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু টাটুওয়ালা, কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, তাহার আর স্থিরতা নাই। আমি তাহার নাম ধরিয়া দুই চারিবার ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না।

মুহূর্ত্তমধ্যে ধুম্ করিয়া বজ্রোপম এক লাঠী আমার পিঠে পড়িল। দারুণ আঘাতে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি তখন কুস্তি করিতাম; দেহের বাঁধুনি খুব দৃঢ় ছিল; সেই জন্য তৎকালে সেই বিষম লাঠী খাইয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমি মধুররবে যোড়হাতে দস্যুগণকে কহিলাম, "ভাই! তোমরা আমাকে মার কেন? মারিয়া কোন লাভ আছে কি? যদি কোন পথিক, তাহার নিকট যাহা আছে, তৎসমস্তই দিতে চাহে, তবে তাহাকে মারিতে নাই; এরূপ ভাবে মারিলে, তোমাদের ধর্ম্মহানি হয়। আমার কাছে যাহা আছে, সর্ব্বস্বই তোমাদিগকে দিতেছি, গ্রহণ কর। কিন্তু কোন্ ধর্ম্মানুসারে আমাকে প্রহার করিতে চাও বল।"

এই সকল কথা বেশ সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিতে-বলিতে দস্যুদিগের মন যেন একটু নরম হইল। বিশেষ ধর্ম্মের কথায়, পাষাণও গলিয়া যায়। দস্যুগণ আর আমাকে প্রহার করিল না। তাহারা প্রথমে টাটুর পৃষ্ঠস্থিত জিনিষপত্র সমস্ত গ্রহণ করিল। চাদর, লোটা, কম্বল, কয়েক খানি কাপড়, হলদুয়ানী হইতে আনিত চুন্না-মিঞার প্রদত্ত ঐ সকল জিনিষ লইয়া তাহারা পরিতুষ্ট হইল না। তাহারা ভাবিল,—আমি যখন টাটু ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছি,—তখন আমি একজন অবশ্যই মহাজন বা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হইব। তাহারা "দেহ তল্লাসী" লইবার জন্য আমার নিকটবর্ত্তী হইল, বলিল—"তোমার নিকট যে টাকা-কড়ি আছে, দাও।" আমি বলিলাম,—"আমি সত্যই বলিতেছি, আমার নিকট কিছুই নাই।" তাহারা বলিল,—"তুমি কাপড় খুলিয়া দেখাও, অবশ্যই তোমার নিকট টাকা আছে।"

আমার গায়ে এক হিন্দুস্থানী আঙ্গরাখা ছিল, মাথায় হিন্দুস্থানী পাগড়ী, পরিধান হিন্দুস্থানী ধরণের কাপড়; তবে সে কাপড় আমি কুস্তগীর জোয়ানের ন্যায় আঁটিয়া পরিয়া ছিলাম। কোমরে থানের এক চাদর জড়ান ছিল। হলদুয়ানী হইতে যাত্রাকালে পান্না-প্রদত্ত নেকড়ায় বাঁধা, সেই নয়টী মোহর পকেটে রাখিয়াছিলাম। বনমধ্যে দস্যুদলকে দূর হইতে দেখিয়াই, আমি সেই মোহর কয়টী হাতে লইয়াছিলাম। একজন দস্যু আমার মাথার পাগড়ী উঠাইয়া লইল। একজন দস্যু আসিয়া আমার আঙ্গরাখা খুলিবার উপক্রম করিল। আমি দেখিলাম, এইবার বুঝি ধরা পড়িতে হয়। এইবার দক্ষিণ মোহর কয়টী মেঘ-মুক্ত মিহিরের ন্যায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমার অঙ্গ হইতে আঙ্গরাখা খুলিবার সময় একটু গোলযোগ হয়; এই সুবিধা বুঝিয়া, আমি কাপড়ে বাঁধা মোহর কয়টী, ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া, দক্ষিণ পদ দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিলাম। অন্ধকার ছিলবলিয়া দস্যুগণ তত লক্ষ্য করিতে পারিল না। আমি বলিলাম;—"ভাই! তোমরা আঙ্গরাখা লইয়া এত টানাটানি করিতেছ কেন? টানাটানিতে উহা ছিঁড়িয়া

যাইবে; সুতরাং তোমাদের কোন কাজে আসিবে না। ক্ষান্ত হও, আমি খুলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া আঙ্গরাখা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দস্যুর হস্তে অর্পণ করিলাম। একে একে অঙ্গের সমস্ত বসনই দূর হইল,—রহিল কেবল পরিধানের একমাত্র কাপড়। দস্যুগণের সন্দেহ-নিবৃত্তির জন্যবস্ত্রগুলি শিথিল করিয়া, কাপড়ঝাড়া দিয়া দেখাইয়া বলিলাম,—"দেখ ভাই! আমার কাছে, কিছুই নাই। আমি গরীব লোক, আমার কাছে থাকাও সম্ভব নহে।" আমি যেমন কাপড় পুনরায় পরিতে যাইব, অমনি হঠাৎ দুইজন দস্যু সে কাপড়খানি আমার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইল। আমি তখন দিগম্বর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, এ এক নূতন রকমের বিপদ। এরূপ পূর্ণ-উলঙ্গভাবে কেমন করিয়া আমি বহেড়াঁতে যাইব। আমি দস্যুগণকে বলিলাম,—"তোমাদেরও ত স্ত্রী, কন্যা, মাতা আছে। বল দেখি, আমি কেমন করিয়া এ অবস্থায় লোকসমাজে মুখ দেখাইব? উলঙ্গ করা দস্যুর রীতি নহে।" আমার এই কথা শুনিয়া অন্য দুইজন দস্যু আমার পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক কহিল,—"নঙ্গা মৎ করো, জানে দেও।" কাপড়খানি আমার গায়ে ফেলিয়া দিয়া, তাহারা দৌড়িয়া নিবিড় জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমি সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। দস্যুদলেরও প্রতি লক্ষ্য রাখিলাম। আমার বোধ হইল, তাহারা দূর জঙ্গলে যায় নাই; নিকটেই লুকাইয়া আছে। টাটুওয়ালা ফিরিয়া আসিবে মনে করিয়া, আমি সেখানে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিলাম। দস্যুগণ আমাকে অনেকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, পুনরায় বন হইতে বাহির হইয়া কহিল,—"তোম্ কেঁও খাড়া হ্যায়, চলা যাও।" আমি তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্য এই ভাবে বলিলাম,—"হলদুয়ানী হইতে ২৫ জন সওয়ার আমার পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া এবার তাহারা যেন উধাও হইয়া উড়িয়া গেল, আর দেখা দিল না।

টাটুওয়ালা আর ফিরিয়া আসিল না। তাহার সঙ্গে ইহ জীবনে এ পর্য্যন্ত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। এখন উপায় কি করি? মোহর কয়েকটী কুড়াইয়া আবার চলিতে লাগিলাম কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, তখন পদে পদে বিপদ ঘটিয়া থাকে। আমি পথ চিনিতে না পারিয়া মন-ভ্রমে সেই জঙ্গল-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর গিয়া শুষ্কপত্র মধ্যে পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল। মনে করিলাম, এখানকার পথই বুঝি এই রকম। ক্রমশ প্রতি পদবিক্ষেপেই কখনও বা বৃক্ষ দ্বারা, কখনও বা লতাগুল্ম দ্বারা আমার গতিরোধ হইতে লাগিল। তখনও মনে হইতে লাগিল, এখানকার পথই বুঝি এই রকম। অবশেষে এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িলাম যে তাহা আর অতিক্রম করিয়া যাইবার যো নাই। ভয়ানক ঘনসন্নিবিষ্ট কণ্টকময় বন, সম্মুখে প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান হইল। আর পথ নাই, যেমন একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি, গায়ে অমনি কাঁটা ফোটে। তখন আমার চমক ভাঙ্গিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, আমি জঙ্গলে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলাম, কেবল বড় বড় বৃক্ষ আকাশপথ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, আর তাহার নিম্ন প্রদেশ কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক বৃক্ষতলে গভীর অন্ধকার যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। এখন আমি যে দিকে যাই, সেই দিকেই কাঁটার বন আর জঙ্গল,—কোন দিকেই পথ পাই না। এক দিকে লক্ষ্য করিয়া, একটু অগ্রসর হই, আর দেখি, কণ্টক-বৃক্ষ দ্বারা আমার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আবার সে দিক্ ছাড়িয়া অন্য দিকে যাই, আবার সম্মুখে দেখি, সেইরূপ কাঁটাবন। আমি দিশাহারা হইলাম। পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ জ্ঞানশূন্য হইলাম। প্রকৃতই আমি অরণ্য মধ্যে হারাইয়া গেলাম। হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আতঙ্ক উপস্থিত হইল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। প্রতি শুষ্কপত্রের খড় খড় শব্দে হিংস্রক বন্যজন্তুর আগমন অনুভব করিতে লাগিলাম। অদ্য রাত্রে আমার প্রাণবায়ু নিশ্চয় বহির্গত হইবে, ইহা স্থির করিয়া, অন্তিমে, সেই অনন্ত অরণ্যে, হাতে পৈতা জড়াইয়া সেই পতিত-পাবনী, ত্রিলোক-তারিণী দয়াময়ী মাকে ডাকিতে লাগিলাম।

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } আশ্বিন। ১২৯৯। { ১০ম সংখ্যা।

কবিত্ব।

(১)

কবিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। স্বর্গের অপ্সরা, নন্দনের পারিজাত, পূর্ণিমার শশধর,—সুন্দর বটে, কিন্তু কবিত্বের নিকটে ইহাদিগের সৌন্দর্য্যও পরাজিত। বসন্তের মলয়ানিল, প্রভাতের দিঙ্মণ্ডল, সন্ধ্যার আকাশ,—সুন্দর বটে, কিন্তু কবিত্বের নিকটে এসব সৌন্দর্য্যও অকিঞ্চিৎকর।

কবিত্বকে সুন্দর বলিলে, কবিত্বের অবমাননা করা হয়। কবিত্বই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর। সুন্দরের সৌন্দর্য্য কবিত্বেরই প্রদত্ত। সৌন্দর্য্য-সংসারে কবিত্বই অদ্বিতীয় কর্ত্তা।

সকল সংসারেই কবিত্বের অসামান্য প্রভুত্ব। ভালকে মন্দ করিতে, মন্দকে অতি-মন্দ করিতে, অতি-মন্দকে অতি-ভাল করিতে,—ফিরাইয়া-ঘুরাইয়া যতই কেন বলা যাক না, এককে অপর করিতে ও ঠিককে ঠিক রাখিতে কবিত্বই একমাত্র সমর্থ।

কবিত্ব অন্ধকারে আলোক, দারিদ্র্যে ধন, উপবাসে অন্ন। কবিত্ব তৃষ্ণায় জল, বিষাদে সান্ত্বনা, বিরহে মিলন। কবিত্ব বসন্তে ফুল, শরতে জ্যোৎস্না, নিদাঘে সন্ধ্যা। আজ সেই কবিত্বের কথা লিখিতে বসিয়াছি, বাস্তবিকই মনে বড় আনন্দ হইতেছে।

কবিত্বের করুণায়, কবিত্বের প্রণয়ে সামান্য মানুষও অমর হয়। এহেন কবিত্বের উপাসনা করিতে কে অগ্রসর না হয়? এহেন কবিত্বকে 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া পূজা করিতে কাহার না প্রবৃত্তি হয়?

(২)

কবিত্ব এমন লোক, কিন্তু তাঁহার জীবন-চরিত নাই। জীবন-চরিত লিখিবার কোন উপকরণও নাই।

দর্শন বা বিজ্ঞান কবিত্বকে 'লোক' বলিতে আপত্তি করেন, করুন; আমি কিন্তু তাঁহাকে এক জন অসাধারণ লোক—একজন মহাপুরুষ বলিয়াই মনে করি। আমি যাহা মনে করি, পরিচয় তদনুসারেই দিব। বড় সাধেই অদ্য কবিত্বের একটু জীবনী লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। বহু অনুসন্ধানেও ইহাঁর জন্মসময় স্থির করিতে পারি নাই। তবে বহুকাল পূর্ব্বে—লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে ইহাঁর জন্ম হয়, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

কবিত্বের জন্মস্থান ভূতল কি দেবলোক, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। বলিবার কোন বিশেষ উপায়ও নাই।

কবিত্ব একজন প্রতিপত্তিশালী সর্ব্বজনপ্রিয় রাজচক্রবর্ত্তী। বাল্যকালে তাঁহাকে শত্রুর হস্তে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। অনেক সময়ে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ভাষার অভাবই তাঁহার প্রধান শত্রু। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে, এই ভাবের আভাস পাওয়া গিয়া থাকে। কবিত্ব তখন নিঃসহায়। শত্রু-দমনে তিনি তখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

তখন কে জানিত এই কবিত্বই কালে দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইবেন? কে মনে করিয়াছিল যে, এই কবিত্বই পরিণামে জগতের জীবন-স্বরূপ হইবেন? এই কবিত্বই যে জগতের শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়া দেব-মানব-হৃদয়ের পূজোপহার গ্রহণ করিবেন, এ কথা কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

নিঃসহায় হইলেও বীরশ্রেষ্ঠ কবিত্ব, আপনার প্রভাবে, সহায়-সম্পন্ন প্রবল-শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে এক অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্যবতী রমণী আবির্ভূতা হইয়া কবিত্বের দুর্দ্দান্ত শত্রু ভাষার-অভাবকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। এই রমণীর নাম 'ভাষা'।

বীরবর কবিত্ব এই সংবাদ পাইয়া, শত্রুদলনী বীরাঙ্গনা ভাষাকে বিবাহ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। ভাষাও কবিত্বের গুণ শ্রবণে, তাঁহার গলে বরমাল্য দিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। যেদিনকার যেটী, সেদিন ভিন্ন তাহা ঘটিবার যো নাই। কোন বাধা নাই, কাহারও আপত্তি নাই, তবু কত বৎসর অতীত হইল, ভাষা ও কবিত্বের আশা পূর্ণ হইল না। ভাষা ও কবিত্বের পরস্পর পরিণয় হইল না। কবিত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—ভাষাকে যদি না পাই তবে আর এ দেহ রাখিব না।

বিরহ বড় ভয়ানক ব্যাধি। যে বীর একাকী, দুর্দ্দান্ত শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আজ নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট। সে শত্রু নাই, তবু তিনি বাহির হইতে পারেন না। স্বীয়-কক্ষাভ্যন্তরে সজল-নলিনীদলে শয়ন করিয়াও অসহ্য তাপ অনুভব করিতেছেন। আত্মীয়-স্বজন, কবিত্বের অবস্থা দেখিয়া চিন্তায় নিপীড়িত। হায়, কবিত্ব বুঝি আর বাঁচে না! ভগবন্! জানিনা, তোমার মনে কি আছে?

---

(৩)

তমসাতীর। পুষ্পিত কানন। মৃদু মন্দ প্রভাত-বায়ু, ধীরে ধীরে কুসুম-স্তবক চুম্বন করিতেছে। লতা-কামিনীর কমনীয় কলেবর অমনি শিহরিয়া উঠিতেছে। পশুপক্ষি-কুল যুগলে-যুগলে ক্রীড়ায় আসক্ত।

বিরহীর পক্ষে এই প্রদেশ বড়ই নিদারুণ। দৈবক্রমে বিরহাতুর কবিত্ব আজ এই প্রদেশেই উপস্থিত। তাঁহার আজ আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি ক্রীড়াপরায়ণ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। সে দৃশ্য তাঁহার বিষময় বোধ হইতেছে, তবু তিনি সে দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। যেন কোন অন্তরের আকর্ষণ আছে। ক্রৌঞ্চযুবক আপনার চঞ্চুপুট দ্বারা ধীরে ধীরে ক্রৌঞ্চকামিনীর কোমল কলেবর কণ্ডুয়ন করিয়া দিতেছে, কখন উভয়েই উভয়েরদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে, কখন বা উভয়েই মিলিতাঙ্গ হইয়া নিমীলিত-নেত্রে পরম নির্ব্বৃতি অনুভব করিতেছে,—কবিত্বের দৃষ্টি সেইদিকে। কবিত্বের গাত্রদাহ হইতেছে। হৃদয়ের ভাষাময় অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে; তবু তিনি চক্ষুঃপ্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না।

হায়! সুখের লীলা সব ফুরাইল! অশ্রুপূর্ণ উত্তার-নয়নে প্রিয়ার প্রতি বারেক দৃষ্টিপাত করিয়া নিষাদ-শর-বিদ্ধ ক্রৌঞ্চ ভূতলশায়ী হইল! তখন লীলাময়ী ক্রৌঞ্চবধূর অবস্থা যে কি, একমাত্র কবিত্বই তাহা বুঝিতেছিলেন। আর কবিত্বের অবস্থা?—তাহা কেবল বুঝিয়াছিলেন,—পরম কারুণিক মহর্ষি বাল্মীকি। তিনি কবিত্বের অসীম-যন্ত্রণা বুঝিয়াছিলেন। প্রেম-পরিণতির শোকময়ী প্রতিমা দর্শনে, প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ কবিত্বের হৃদয়ে যে নৈরাশ্য-সন্ধুক্ষিত চিন্তার তুষানল জ্বলিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া ঋষিবর কাতর হইলেন। কবিত্বের সেই পুটপাকোপম নিদারুণ বিরহ-দুঃখ, মর্ম্মে মর্ম্মে অগ্নিকণাবর্ষী কারুণ্য-মিশ্রিত সেই অস্ফুট-যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, মহর্ষি বাল্মীকি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পর-দুঃখ দর্শনে সেই দয়াময়ের হৃদয় দ্রব হইল।

বাল্মীকি, ভাষা ও কবিত্বের বিবাহে অযাচিত ভাবে ঘটকতা গ্রহণ করিলেন; ঋষি, কবিত্ব-সমাগমের জন্য উৎসুক-চিত্তা কুমারী ভাষাকে আনিয়া, বিরহকাতর, মর্ম্মপীড়িত কবিত্বের হস্তে শুভক্ষণে সাদরে সমর্পণ করিলেন। ভাষা আনন্দে অধীরা হইলেন। কবিত্ব পুলকে পূর্ণ হইলেন।

তিনি সহসা নব-বলে বলীয়ান্ হইয়া, সহসা পূর্ব্বোত্তম এবং পূর্ব্বচেষ্টা প্রাপ্ত হইয়া, মধুর মোহনবেশে সর্ব্বসমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

দিগ্দিগন্তে আনন্দ-কোলাহল উঠিল। স্বয়ং ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া, এই কার্য্যের জন্য বাল্মীকিকে পুরস্কৃত করিলেন।

---

(৪)

সংসার বৈচিত্র্যময়। একদিকে আলোক, অপর দিকে অন্ধকার; একদিকে রৌদ্র, অপর দিকে মেঘ; একদিকে আনন্দ, অপর দিকে বিবাদ;—সংসারের গতিই এই। তাই সংসারে একদিকে সর্ব্বজন-পূজিত কবিত্ব, অপর দিকে সর্ব্বজন ঘৃণিত মিথ্যা।

কবিত্ব সুন্দর, মিথ্যা কুৎসিত। কবিত্বের প্রশংসা সর্ব্বত্র, মিথ্যার নিন্দা সর্ব্বত্র। কবিত্ব-উপাসক সম্মানিত, মিথ্যা-উপাসক অবজ্ঞাত। তাই বলিতেছি,—'সংসার বৈচিত্র্যময়।' কবিত্ব একদিন এই দীনা-হীনা মিথ্যাকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন। দীনার দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল।

মিথ্যা দৌড়িয়া বেড়াইতেছেন। কত লোক তাঁহার উপর ধূলি-কর্দ্দম নিক্ষেপ করিতেছে; কেহ কেহ অকথ্য ভাষায় গালি দিতেছে। অনেকে আবার তাঁহার জন্য উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করিতেছে। ভ্রমণ-পরায়ণা মিথ্যা কাহারও নিকটবর্ত্তী হইলে, সে অমনি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দশহাত সরিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্য গলায় বস্ত্র দিয়া অতি বিনয়ের সহিত, তাঁহাকে আবাহন করিয়া লইতেছে বটে, কিন্তু তাহারাও সুযোগ ক্রমে তাঁহার অবমাননা করিতেছে। শরণার্থিনী মিথ্যার প্রতি সদয় দৃষ্টি কাহারও নাই। যাহারা এই মিথ্যার অবমাননা না করে, জনসমাজে তাহারাও নিন্দিত। এই সব দেখিয়া কবিত্ব স্থির করিলেন,—"আহা! এই মিথ্যার ন্যায়, হতভাগিনী রমণী আর জগতে নাই। সকলের নিকট পদ-দলিত, উপকৃতের নিকট লাঞ্ছিত, এক মিথ্যা ভিন্ন আর কে আছে? এই রমণীর নিকট কাহারও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবারও যো নাই। হা ভগবন্! এই পতিতার কি কোন প্রকারে উদ্ধার নাই?"

অবশেষে কবিত্ব, বহু চিন্তার পর, এই মিথ্যাকে বিবাহ করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি বিবাহ করিলে ইহার দোষ সংশোধন অনেক পরিমাণে হইবে, এই বিশ্বাস-বশেই তিনি মিথ্যাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দীনা-হীনা মিথ্যাকে বিবাহ করিতে কবিত্বের কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে হইল না।

মিথ্যার সহিত কবিত্বের বিবাহ হইয়া গেল। এ বিবাহেও ঘটক সম্ভবতঃ ভগবান্ বাল্মীকি। বহু-বিবাহ সমাজে প্রচলিত। সুতরাং এ কার্য্যের জন্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের দোষ দেওয়া যায় না। কবিত্ব যথার্থই পতিতার উদ্ধার করিলেন। কবিত্ব-সহচারিণী মিথ্যা জনসমাজে বেশ সমাদৃত হইতে লাগিলেন। কুৎসিতা ঘৃণিতা মিথ্যা, কবিত্বের সহযোগে সুন্দর হইলেন, প্রীতিপ্রদ হইলেন। পতি কবিত্ব, সোহাগ করিয়া দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রাখিলেন কল্পনা। কল্পনা-ভাষা-সমন্বিত কবিত্বদেবের পূজা এখনও ঘরে ঘরে হইয়া থাকে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতদ্যুতিম্।"

কবিত্বের দুই পত্নীই কিঞ্চিৎ প্রগল্ভা। মিথ্যা ও ভাষা মাসে মাসে দুই জনেই স্বামিসঙ্গ ব্যতীতও বিভিন্নদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কখন বা দুই সপত্নী মিলিত হইয়া নানা স্থান দেখিয়া বেড়ান।

চন্দ্র ব্যতীত রজনীর শোভা হয় না। কবিত্ব ব্যতীত মিথ্যার সমাদর হইবে কেন? কাঞ্চন না থাকিলে, কাচের মরকত-প্রভা খুলিবে কেন? একাকিনী মিথ্যা, স্বামিসঙ্গহীনা মিথ্যা সেই পূর্ব্ববৎ ঘৃণিতা। সেই উজ্জ্বল-ভূষণা রাজমহিষী কল্পনা আর এই বিকৃতবেশা মিথ্যা যে একই ব্যক্তি, ইহা কেহ বুঝিতেও পারে না।

মিথ্যা যাবৎ মহাপুরুষের সন্নিধানে অবস্থান করেন, ততক্ষণ তাঁহার তেজ দেখে কে?—সম্মান দেখে কে? মিথ্যার তখন আর ক্রূর বুদ্ধি থাকে না। তখন ভাষার প্রতিও তাঁর যথেষ্ট ভালবাসা থাকে। তিনি ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্যও সচেষ্ট থাকেন।

স্বামিসঙ্গ না থাকিলেই ক্রূর-মতি মিথ্যা, সরল-হৃদয়া সপত্নী ভাষাকে অপদস্থ করিবার জন্যই তাঁহার সহিত মিলিত হন।

এইরূপ পদে পদে মিথ্যার দুঃস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

হে কবিত্ব! হে মহাপুরুষ! এই দুঃশীলা মিথ্যা তোমারই সংসর্গে রমণীরত্ন কল্পনা:— হে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেব! তোমাকে আমরা সবিস্ময়ে পুনঃপুন নমস্কার করিতেছি। হে দয়াময়! তুমি দীনে দয়া করিয়া তাহার দুঃখ মোচন করিয়াছ, জনসমাজে তাহার চির-প্রতিষ্ঠিত অসম্ভ্রমের পরিবর্ত্তে সম্ভ্রম স্থাপন করিয়াছ। তোমাকে শতসহস্র বার ধন্যবাদ দিতেছি।

হে মিথ্যে! তুমি স্বামিসঙ্গ ছাড়িও না। কে তোমার অপমান করিবে? কল্পনা নামে তুমি সকলের নিকট পূজা গ্রহণ কর। স্বামিসঙ্গ ছাড়িয়া, এ নাম ছাড়িয়া, অপমানিতা হওয়া কি তোমার সাধ?

---

(৫)

কবিত্বের আরও কতিপয় পত্নী আছেন, তাঁহাদের নাম চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি। কবিত্ব সকল পত্নীরই প্রিয়তম। কাব্য, আলেখ্য প্রভৃতি তাঁহার সন্তান। কবিত্বের অন্যতমা পত্নী কল্পনা, কোকিল-কামিনীবৎ সন্তান প্রতিপালনে অক্ষমা। এইজন্য তদীয় সন্তানগণ বিমাতার প্রতিপালিত।

কবিত্ব, কোন না কোন পত্নীকে সঙ্গে না লইয়া বহির্গত হন না। কিন্তু কেবল কল্পনাকে লইয়া বাহির হইতে তাঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই। তবে কল্পনা ও অপর কোন পত্নীর সহিত তিনি অনেক সময় উজ্জ্বলভাবে বিচরণ করেন।

কবিত্ব, পরমোপকারিণী ভাষা অপেক্ষা মিথ্যাকে অধিক ভালবাসেন এবং কবিত্ব স্ত্রৈণ;—কবিত্ব-চরিত্রের এইটুকুই দোষ। ইহাই হইল,—কবিত্বের আংশিক জীবনী।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(৬)

গতবার "হিন্দুপেটরিয়টের" সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-তারিখ সম্বন্ধে একটু ভ্রম হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই; হইয়াছিল ১৮৬১ সালের ১৪ই জুন শুক্রবার বেলা ৯টার সময়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই হিন্দুপেটরিয়ট কার্য্যালয় ভবানীপুর হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, কলিকাতা পাইকপাড়াস্থ রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ গুণগ্রাহী এবং কর্ম্মানুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেই রাজাবাহাদুরের সবিশেষ সহানুভূতি ছিল। রাজা বাহাদুরের বিয়োগে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বড়ই কাতর হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। রাজা বাহাদুরের মৃত্যু সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। পাইকপাড়া-রাজবংশও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নানা কারণে কৃতজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন দীন-দয়াল, তেমনই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গেরও সহায়-সুহৃদ্ ছিলেন। কাহারও নিকট তিনি একটী পয়সারও প্রত্যাশা করিতেন না; কিন্তু সকলেরই উপকারার্থ দেহ-প্রাণ উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; এমন কি, অনেক সময় বিপন্ন কুবেরকুলেরও বিপদুদ্ধারার্থ, অকাতরে নিজের অর্থব্যয় করিতেন; এবং অবিশ্রান্ত স্বেদ-ভারে কখন মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর হইতেন না। আবার কাহারও দ্বারা কোনরূপ কর্ত্তব্য-ত্রুটি দেখিলে, অথবা কাহারও দ্বারা কোনরূপে আত্মসম্ভ্রমের ত্রুটি দেখিলে, তিনি তদ্দণ্ডেই বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়ে কুবের-সম কোটিপতি সুহৃদেরও সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ-স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। ঘৃণায় আর তাঁহার পানে তিনি মুখ তুলিয়াও চাহিয়া দেখিতেন না। তখন

ব্রাজকুলেরও সেই সোধহর্ম্ম্যাবলী তাঁহার চক্ষে ভীষণ নরকাগাররূপে প্রতীয়মান হইত। যেমন বাহিরে, তেমনই ঘরে। স্বভাবস্নেহে আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ-সন্তানের প্রতি যেমন ক্ষীর-ধারের অনন্ত স্রোত ছুটিত; আবার কাহারও কর্ত্তব্য-ত্রুটি দেখিলে, তেমনই দারুণ মনঃক্ষোভে সহস্র সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ জ্বালাময় তীব্রতাপ ফুটিয়া উঠিত। প্রকৃতই বিদ্যাসাগরের হৃদয়,—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।" এ সবের পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন।

১৮৬২ সালে ৺রামমোহন রায়ের পুত্র, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হয়। রমাপ্রসাদ রায়, হাইকোর্টের বিচার-পতি-পদে অধিষ্ঠিত হইবার আজ্ঞাপত্র পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে হাইকোর্টের সে পবিত্র আসনোপবেশন-সুখ ভোগ করিতে হয় নাই। রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় সখ্য ছিল; কিন্তু বিধবা-বিবাহের আন্দোলন-কালে, একটা মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। শুনিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে প্রথমতঃ রমাপ্রসাদ রায়ের নিকট হইতে সবিশেষ সহানুভূতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যকালে সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক; তাঁহাকে দুই একটী মর্ম্মান্তিক কথা শুনিতে হইয়াছিল। যে কথায় বিদ্যাসাগরমহাশয় আপনাকে মর্ম্মাহত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এখানে তাহার উল্লেখ করা নানা কারণে অযৌক্তিক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ৺রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ী প্রায়ই যাইতেন; কিন্তু ইহার পর গতিবিধি একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু-সংবাদে কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই। শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, শক্তি-পূজকের চিরকালই পূজনীয়। বিদ্যাসাগর প্রকৃত শক্তি-সেবী; রমাপ্রসাদ রায়ও প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন।

এই খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সিমলা-অঞ্চলে একটী বিধবা-বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বর কন্যা উভয়ই ব্রাহ্মণ। ইহার পর অন্যান্য স্থানে আরও কতকগুলি বিধবা-বিবাহ হইয়াছিল। আমরা কতকগুলি বিবাহ-বিবরণ সংগ্রহও করিয়াছি; কিন্তু এস্থলে তৎপ্রকাশের প্রয়োজন নাই। সমুদায় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া স্থানান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে, চেষ্টায় এবং অর্থব্যয়ে যে সব বিধবা-বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই হিন্দুপেট্রিয়ট, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুস্তক-বিক্রয়ে ও ছাপাখানার কাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আয় অনেকটা বাড়িয়াছিল বটে; কিন্তু বিধবা-বিবাহের ব্যয়ে ও অন্যান্য বহুবিধ দান-ব্যাপারে তাঁহার ঋণও বিলক্ষণ হইয়াছিল। কখনও কেহ তাঁহার নিকট হাত পাতিয়াও বিমুখ হইত না। দশ হউক, আর দশ হাজারই হউক, প্রার্থনার প্রকৃত প্রয়োজন বুঝিলেই, যেখান হইতেই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। মাইকেল মধুসূদনকে তিনি দশ সহস্র মুদ্রা অকাতরে দিয়াছিলেন। এই দশ সহস্র টাকা, তাঁহাকে ঋণ করিতে হইয়াছিল। শুনিতে পাই, এই টাকা তিনি প্রথমতঃ হাইকোর্টের মৃত জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ঋণ করিয়াছিলেন; পরে পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া, তিনি অনুকূল বাবুর টাকা পরিশোধ করেন। এই টাকা আবার তাঁহাকে ছাপাখানার অংশ বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। সে বৃত্তান্ত পরে যথাস্থানে প্রকটিত হইবে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ উকীলের মোক্তার তাহার জমী-জমার পত্তনী লইয়াছিলেন। কোন কায়স্থ রাজা বাহাদুর, সেই পত্তনীদারের * নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া, মাইকেলকে বিলাতে পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। মাইকেল বার কতক টাকা পাইয়াছিলেন মাত্র; তার পর বারবার পত্র লিখিয়াও টাকা পাওয়া দূরের কথা, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পান নাই। অর্থাভাবে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না; এমন কি, কারাবাসের উপক্রম হইয়াছিল। তিনি তখন নিরুপায় হইয়া, সকরুণ বাক্-বিন্যাসে পত্র লিখিয়া, দয়াশীল

* পত্তনীদার ও ভারগ্রাহী রাজা বাহাদুরের নামোল্লেখ অধুনা নিঃপ্রয়োজন।

বিদ্যাসাগরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, সত্য সত্যই মাইকেলের সেই পত্র পাঠ করিতে করিতে রুদ্ধ-কণ্ঠে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না; কিন্তু ছয় সহস্র টাকা ঋণ করিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই মাইকেলকে পাঠাইয়া দেন। টাকার প্রয়োজন হইলে, তিনি প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে কোম্পানী কাগজ লইয়া, বন্ধক দিতেন; পরে সময় মত টাকা সংগ্রহ করিয়া, সুদে-আসলে সব পরিশোধ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে, মাইকেলকে নিশ্চিতই অনাহারে মরিতে হইত।

মৃতকল্প মাইকেল, অবশ্য আদৌ মনে করেন নাই যে, তিনি একেবারে এত সাহায্য পাইবেন। বলা বাহুল্য, এ সাহায্যে তাঁহার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি তখনই জীবনদাতা বিদ্যাসাগরকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, আনন্দ-বিগলিত-চিত্তে, অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। * কৃতজ্ঞতা কেবল পত্রে নহে; কবির অমর কাব্য "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে" জলন্ত দিব্যাক্ষরে এখনও জাজ্বল্যমান। বিদ্যাসাগরের দাতৃত্ব'ও মহত্ত্ব কবির মর্ম্মে মর্ম্মে উচ্ছ্বসিত। সে মর্ম্মোচ্ছ্বাস চৌদ্দ ছত্রের অক্ষরে অক্ষরে উৎসারিত। বিদ্যাসাগরের সহস্র গুণ সত্য; কিন্তু মাইকেল, দাতৃত্বেরই পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছিলেন, প্রথমেই বিদেশ বিলাতভূমে,—বড় বিপদে। তাই কৃতজ্ঞ কবি, সে "দাতৃত্বের" যেন একটা বিরাট সজীব মূর্ত্তি সম্মুখে গড়িয়া, তাতেই তন্ময় হইয়া, কাতর-কণ্ঠে সপ্তগ্রামে সুর চড়াইয়া, মুক্তপ্রাণে মুক্তোচ্ছ্বাসে গাহিয়াছিলেন,—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে;
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে! পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশির তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।"

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, ৮৬ পৃষ্ঠা।

১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাইকেল বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তখনও তিনি নিঃস্ব; এক রকম নিরন্ন বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। মাইকেল বিলাত হইতে আসিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জন্য একটা তেতলা বাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন। মাইকেল আসিয়া কিন্তু একটা হোটেলে থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সেই হোটেল হইতে তুলিয়া লইয়া আসেন। "বারিষ্টারী" কার্য্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে মাইকেলের একটা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে সে অন্তরায় দূরীকৃত হইতে পারে; মাইকেলের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমানে ছিলেন। মাইকেল বর্দ্ধমানে গিয়া কাতরকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার কথায় কলিকাতায় আসিয়া, নানা যোগাড়-পত্র করিয়া, মাইকেলকে বারিষ্টারী-কার্য্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। মাইকেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পিতার মতন ভক্তি করিতেন; বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে পুত্রবৎ ভাল বাসিতেন। বারিষ্টার হইলেও, মাইকেল পরিবার-পালনোপযোগী উপার্জ্জনে সক্ষম হন নাই; স্বপ্রকাশিত পুস্তকের কতকটা আয় থাকিলেও পানদোষে অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। একারণ তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে সাহায্য লইতে হইত। হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই, মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, থাকে থাকে

* পত্রখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ছিল। তিনি তাঁহার প্রিয়-দৌহিত্রবর্গকে এ পত্রের কথা প্রায়ই বলিতেন। এখন এ পত্র পাওয়া যাইতেছে না। পাইলেই প্রকাশ করিব।

টাকা সাজান; দু দশটা লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; "নিস্ নে, নিস্ নে" করিতে করিতে, মুঠো ভরিয়া তুলিয়া লইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার এরূপ কার্য্যেও বিরক্ত হইতেন না।

সহস্র স্বভাব দোষ সত্ত্বেও, মাইকেল বুদ্ধি-প্রতিভা-বলে, বিদ্যাসাগরের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মাইকেলের "প্রতিভা" জগতের পূজনীয়া; প্রতিভার পূর্ণাধার বিদ্যাসাগরের প্রেম-প্রীতি যে আকর্ষণ করিবে, তার আর বিচিত্র কি? প্রতিভার পূজা প্রতিভার কাছে; প্রতিভার রাজ্যে প্রেমের প্রস্রবণ ছুটে; প্রতিভা মানুষের দোষ ঢাকিয়া রাখে; প্রতিভা মানুষকে অন্ধ করে; জগতের ইতিহাসে,—প্রেমের সংসারে, এমন সহস্র দৃষ্টান্ত পাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মাইকেলের প্রতিভায় এতাদৃশ বিমোহিত ছিলেন যে, অনেক সময় মাইকেল কথার অবাধ্য হইলেও, তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না। জামাতৃ-পুত্রেরও অশিষ্টতা, অবাধ্যতা, কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা এবং দুষ্কৃতিপোষকতা যে বিদ্যাসাগরের অসহ্য হইত; এমন কি, তাহাদের মুখাবলোকনেও, যাঁহার প্রবৃত্তি হইত না; সেই বিদ্যাসাগর মাইকেলের শত অপরাধ বুক পাতিয়া লইতেন। প্রতিভা-পূজার প্রকৃত পরিচয়, ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? মাইকেলের সাহায্যার্থ, বিদ্যাসাগরকে আরও চারি সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। মাইকেল এক কপর্দ্দকও ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। কোনরূপ দুরভিসন্ধি-বশে মাইকেল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণ পরিশোধ করেন নাই, তাহা নহে; প্রকৃত পক্ষেই তিনি ঋণ পরিশোধে অপারগ ছিলেন। এই অপারগতার মূল কারণ অতীব অমিত-ব্যয়িতা। একে অমিতব্যয়ী, তাহার উপর উপার্জ্জনে তিনি সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিলেন। শুনিয়াছি, অনেক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে জোর-জবরদস্তী করিয়া আদালতে পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ না হইলে, তাঁহাকে অকালে আলিপুরের দাতব্য হাসপাতালে দীনহীন কাঙ্গালের মত, দারুণ মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে কেন? *

মাইকেল ঋণ পরিশোধে অপারগ ছিলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কিন্তু তাঁহার নিকট একটী দিনের জন্যও টাকার তাগাদা করেন নাই। তিনি হয় ত মনে করিতেন, যাঁহার জন্য মলিন মাতৃভাষার এতাদৃশ মুখ উজ্জ্বল, তাঁহার সাহায্যার্থ অর্থব্যয় করিয়া, সে অর্থের প্রতিশোধ প্রত্যাশা করা, মাতৃভূমির অকৃতজ্ঞ পুত্রের কার্য্য; মাইকেল কপর্দ্দকহীন হইলেও, কাব্যে তিনি যে মহা-কুবের; আর তাঁহার কাব্য যে সাহিত্য-সংসারে কোটি কোহিনূর স্বরূপ সতত সমুজ্জ্বল কিরণ-প্রভায় উদ্ভাসিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিদ্যাসাগরের ঋণ পরিশোধ না হউক, কাব্যে সাহিত্যসংসারে মাইকেল মাতৃভূমির বহু ঋণ পরিশোধ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাও নিশ্চিত।

প্রতিভাশালী পুত্রোপম মাইকেলের কথা ছাড়িয়া দাও। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঋণ করিয়া, যে সব ঋণগ্রস্ত অধমর্ণকে অধমর্ণ-দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও একটী দিনের জন্য তিনি টাকার তাগাদায় বিরক্ত করিতেন না। অনেক ঋণগ্রস্ত অধমর্ণ, তাঁহার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াও, ঋণ পরিশোধ করে নাই। কেহ কেহ ক্ষমতা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করেন নাই; কেহ কেহ বা সত্য সত্যই ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ছিলেন। এমন কত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, তাঁহার কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার নিরূপণ নাই। তদীয় ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয়, যে কয়টী উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গের পরিতৃপ্ত্যর্থ, তাহারই পুনরুল্লেখ এইখানে করিলাম;—

(১) রাধানগর-নিবাসী রামকমল মিশ্র এবং গঙ্গাদাসপুর-নিবাসী গোরাচাঁদ দত্ত, গঙ্গাদাসপুর-নিবাসী তারাচাঁদ সরকারের ৫০০ টাকা ধারিতেন। তারাচাঁদ উভয়েরই নামে নালিস করিয়া "ডিক্রী" পান। পরে ঐ দুই জন দেনাদার, ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

* ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন রবিবার বেলা ২ টার সময় মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই এক [illegible] পূর্ব্বে হইতে মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বক্ষঃস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নিজের স্বভাবের দোষাতিরেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিষ্ণুতার সীমা মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

ইঁহারা কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তখন ৺শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার নিকট তখন টাকা ছিল না। তিনি তথায় রাখাল মিত্র নামক এক ব্যক্তির নিকট খত লেখাইয়া এবং স্বয়ং সাক্ষী হইয়া ৫০০ টাকা তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু ইহার পর আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রাখাল বাবুর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার স্ত্রীকে সুদ-সহ টাকা দিয়া, খত খোলাসা করেন।

(২) একবার পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ৫০০ টাকার জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাঁদিয়া-কাটিয়া পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ৫০০ টাকা ধার করিয়া, তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ইহার পরে তর্কালঙ্কারের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

(৩) এক সময় জাহানাবাদের নিকট কোন গ্রামবাসী ভট্টাচার্য্য, দুই শত টাকা ঋণ করিয়া, পুত্র-পরিজন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। পাওনাদার মহাজন, তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয়া গলদশ্রু-লোচনে কাতর-কণ্ঠে আপনার দুঃখের কথা জানাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে দুই শত টাকাই দান করিয়াছিলেন।

পাঠক! একবার ভাব,—গৃহস্থ বিদ্যাসাগরের একি অপার করুণা এবং অশ্রুতপূর্ব্ব অসমসাহস! বিদ্যাসাগরের এ দাতৃত্ব-পরিচয়ে কত কোটিপতি ধনকুবেরকেও যে সবিস্ময়ে সহস্র বার মস্তক অবনত করিতে হয়, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পারসীক,—যে কেন হউক না, বিদ্যাসাগরের নিকট হাত পাতিয়া কখন কেহ বঞ্চিত হয় নাই।

ভাটপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চতুষ্পাঠীর সাহায্যার্থ প্রার্থনা করিয়া মাসিক ১০ দশ টাকা বৃত্তি চারি বৎসর কাল পাইয়াছিলেন। পরে তিনি উপায়ক্ষম হইয়া, বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। মাসিক-বৃত্তি ব্যতীত, ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও নানারূপে সাহায্য পাইতেন।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী বন্ধুর সহিত, কলিকাতায় সিমলা-হেদুয়ার নিকট, পাদ-চারণ করিতেছিলেন; এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া অতি বিষণ্ণ ভাবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের চক্ষে জল পড়িতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনি কাঁদিতেছেন কেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতা ও মোটা চাদর দেখিয়া, সামান্য লোক বোধে, ব্রাহ্মণের কোন কথাই বলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে তিনি বলেন,—"আমি এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম। ঋণদাতা আদালতে আমার নামে নালিস করিয়াছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন,—"মোকদ্দমা কবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'পরশ্ব।" ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়, মোকদ্দমার নম্বর, ব্রাহ্মণের নাম.ধাম প্রভৃতি একে একে সব জানিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে পর, তিনি সঙ্গী বন্ধুটীকে, মোকদ্দমার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে বলেন। তথ্যানুসন্ধানে ঠিক হয়, ব্রাহ্মণের কথা সত্য; দেনা তাঁর সুদে আসলে ২৪০০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ২৪০০ টাকাই আদালতে জমা দেন। তিনি আদালতের উকীল-আমলাকে বলিয়া রাখেন,—"আমার নাম যেন প্রকাশ না হয়; নাম প্রকাশের জন্য ব্রাহ্মণ যে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হইবে, আমি তাহা দিব।" ব্রাহ্মণ মোকদ্দমার দিন উপস্থিত হইয়া বুঝিলেন, কোন পুরুষোত্তম, তাঁহার দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। তিনি বহু চেষ্টায়ও উদ্ধার-কর্ত্তার নাম জানিতে না পারিয়া, বিষাদ-পুলকে বাড়ী ফিরিয়া যান। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুটীর সহিত ব্রাহ্মণের একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ হইয়াছে, বন্ধু ব্রাহ্মণের মুখে তা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, তাহার উদ্ধার-কর্ত্তা, তিনি তাহা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই। ব্রাহ্মণ সহরের অনেক ধনীর নিকট দুঃখের কথা জানাইয়াও যে, এক কপর্দ্দক কাহারও নিকট পান নাই, বিদ্যাসাগর

মহাশয়, ব্রাহ্মণের মুখে তাহা পূর্ব্ব-সাক্ষাতে শুনিয়াছিলেন।

এ দান-বিবরণটী আমরা ভট্টপল্লীর খ্যাতনামা পণ্ডিত-প্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কেবল সাহায্যপ্রার্থী-মাত্রেরই প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন এমন নহে; কোথায় কাঁহার কিরূপ কষ্ট, কে কোথায় অর্থাভাবে দারুণ দারিদ্র্য-সংগ্রামে বিপদাপন্ন অথবা অন্নাভাবে ভীষণ জঠরানলে অবসন্ন, তাহারও সন্ধান লইতেন; এবং স্বকীয় সাধ্যমত আর্ত্তত্রাণোপযোগী সাহায্য করিতেন। যখনই তিনি বাহির হইতেন, তখনই টাকা, আধুলী, দুয়ানী, পয়সা সঙ্গে করিয়া লইতেন। সেগুলি প্রায়ই ফিরিয়া আসিত না। শুনিয়াছি, অনেক সময়, রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিবার সময়, কোন অভাগিনী বেশ্যাকে, উপার্জ্জন-আশায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে, তিনি তাহাকে টাকা পয়সা দিয়া, সে রাত্রির জন্য তাহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিতেন। এক সময়ে, কলিকাতা সহরে এক অতি দরিদ্র দুঃস্থ মান্দ্রাজী, স্ত্রী ও বহু সন্তান-সন্ততি লইয়া, অতি নীচ জঘন্য সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতেছিল। তাহাদের দুঃখের পার ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাদের সে শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া, স্বয়ং তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। একটী মিথ্যা কহিয়া, ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানও করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার অসীম দাতৃত্বগুণে সে কর্ম্মফল খণ্ডিত হইবে না নিশ্চিতই; কিন্তু তিনি যে তাঁহার দাতৃত্ব-কার্য্যের অনুরূপে ও অনুপাতে, পরকালে সুখ-ফলভাগী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৮৬২ সালে ব্যাকরণ-কৌমুদীর চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা উপক্রমণিকার উচ্চতম স্তর।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "ট্রেণিং-স্কুলে"র চিতা-ভস্মের উপর, বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তিস্তম্ভ "মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন" প্রতিষ্ঠিত হয়। ৺ ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, ৺ যাদবচন্দ্র পালিত, শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ আঢ্য প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কর্ত্তৃক, ১৮৫৯ সালে কলিকাতা শঙ্কর ঘোষের লেনে "ট্রেণিং স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই স্কুলের সেক্রেটরী ছিলেন। বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার ভার অর্পিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের কোন সভ্যের চরিত্র-দোষ সন্দেহে, সভ্যগণের মধ্যে ঘোরতর মনো-মালিন্য উপস্থিত হয়। স্কুলগৃহে একদিন একটী মাকড়ী পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, এক জন সভ্য রাত্রিযোগে স্কুলগৃহে বেশ্যা আনিতেন, মাকড়ী সেই বেশ্যারই। মনান্তরের মূলোৎপত্তি এই খানেই। পরে যাঁহার উপর সন্দেহ হয়, তাহারই কোন প্রিয় পোষ্য শিক্ষকের পদচ্যুতি লইয়া, মনান্তর পাকাপাকি হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুলের সেক্রেটরী পদ পরিত্যাগ করেন। ৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ সভ্যগণ 'ট্রেণিং স্কুলের বেঞ্চি, চেয়ার প্রভৃতি সরঞ্জাম স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, "ট্রেণিংএকাডেমি" নামক একটী নূতন স্কুল স্থাপিত করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক ট্রেণিং স্কুলের বাটীতেই আর একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই "মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন।" প্রতিষ্ঠাতৃগণ স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন, "আর তাঁবেদারীতে কাজ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।" প্রতিষ্ঠাতৃগণ বলিলেন,—"তাঁবেদারী করিতে হইবে না; স্কুল আপনারই হইল; আমরা প্রতিষ্ঠা করিলাম মাত্র।" অনেক সাধ্য-সাধনায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, "মেট্রপলিটনে"র ভার-গ্রহণ করেন।

প্রথম প্রথম "মেট্রপলিটনের" জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, নিজের অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের বেতন, উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত ৩৲ টাকা ছিল বটে; কিন্তু অনেক ছাত্রকেই বিনা বেতনে পড়াইতে হইয়াছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত "ট্রেণিং একাডেমি" তখন "মেট্রপলিটনে"র ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল। যাহাই হউক, মেট্রপলিটনেরই পসার-

প্রতিপত্তি শীঘ্রই বাড়িয়া যায়। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে লাগিল; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অটুট যত্নে ও অধ্যবসায়ে এবং অনন্যপূর্ব্ব শিক্ষা-প্রণালীর গুণে, "মেট্রপলিটন" একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিগণিত হইল। ক্রমে স্কুলের আয়েই স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তাঁহাকে ইহার জন্য ঘরের পয়সা বাহির করিতে হইত; স্কুলের পয়সাও তিনি কিন্তু কখন ঘরে লইয়া যান নাই।

ইংরেজী শিক্ষায় হিন্দুসন্তানের নানা কারণে কু-প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, ইহাই দেশের দুর্ভাগ্য; কিন্তু ইংরেজী এখন হইয়াছে, অর্থকরী বিদ্যা। এই ইংরেজী-শিক্ষাপ্রসারণের কৃতিত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু কষ্টেই লাভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, "মেট্রপলিটনের" শিক্ষকতায় অনেক এদেশী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির অর্থার্জ্জনের উপায় সংস্থান হইয়াছে; এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকেরা ইংরেজী বিদ্যার্জ্জনের সুলভ পথ পাইয়াছে। ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন-প্রবর্দ্ধনে, প্রকারান্তরে হিন্দুসন্তানের ঘোরতর কু-প্রবৃত্তি-প্রণোদনে যে পোষকতা করা হয়, তাহা হিন্দু-মাত্রেই স্বীকার করিবেন; তবে যখন ইংরেজী-শিক্ষাভিন্ন উদরান্নের সংস্থান হওয়া আজ কাল দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইংরেজী বিদ্যাপ্রসারণের প্রশস্ততর পথ আবিষ্কার করিয়া যে, এ যুগে যশস্বী হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? তিনি যে আপন বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া, এ দেশীয় শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্বদেশিপোষকতাপ্রবৃত্তির পরিচয়। এদেশী শিক্ষক লইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিগ্বিজয়ী।

পাশ্চাত্য বিদ্যার উৎকর্ষসাধন পক্ষে যে প্রণালী ও পদ্ধতির প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সিদ্ধহস্ত। পরাধীন অবস্থাতেও সংস্কৃত কলেজেই তিনি তাহার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন স্বাধীন অবস্থায় নিজের বিদ্যালয়ে যে, তিনি সে সম্বন্ধে অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এখানে ত আর প্রভুদিগের রোষকষায়িত কটাক্ষ-বিক্ষেপের বা শাসনসূচক তর্জ্জনী-তাড়নার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। সত্য সত্যই তাঁহার কৃতিত্বের যশ এখন বিশ্বব্যাপী। অধুনা এদেশীয় অনেক ব্যক্তি ইংরেজী-বিদ্যা প্রচারার্থ, সেই প্রণালী-পদ্ধতিরই পথানুসারী। যখন তিনি যে কোন ইংরেজী-বিদ্যাবিশারদ এদেশী লোক পাইতেন, তখনই তাঁহাকে নিজের বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিতেন। বালকদিগের প্রতি কটু-ব্যবহার করিবার বা বেত্রাদি দণ্ড দিবার অধিকার কোন শিক্ষকেরই ছিল না; অথচ প্রায় কোন শিক্ষককেই ছাত্রদিগের দুরন্ত দুর্দ্দমনীয়তার জন্য অনুযোগ করিতে হইত না। যখন কোন ছাত্র দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত, তখন তাহাকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এমন কি, কখন কখনও অবিনয়ের অপরাধে কোন কোন শ্রেণীর সমুদায় ছাত্র বিতাড়িত হইত। তিনি ছাত্রদিগকে, শিক্ষকগণকে এবং ভৃত্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে সততই সস্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। স্বচক্ষে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা তাঁহার একটা স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। যখন পরিদর্শনে আসিতেন, তখন কাহাকেও 'পূর্ব্বাহ্নে' তাহা জানিতে দিতেন না। শিক্ষক অধ্যাপনায় গাঢ় মনোনিবিষ্ট হইয়া আছেন; এমন সময় হয় ত তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিতেন। কোনক্রমে শিক্ষক বা অধ্যাপক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি বলিতেন,—"তুমি পড়াইতে পড়াইতে উঠিও না; তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর; আমার খাতির করিতে গিয়া, তোমার যেন কর্ত্তব্য-ত্রুটি না হয়।" কখনও কোন ছাত্রকে নিদ্রিত দেখিলে, তিনি তাহাকে স্থানান্তরে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। স্কুল-পরিদর্শনে তাঁহার নিয়মিত কোন সময় ছিল না; কাজেই ছাত্র-অধ্যাপক, সকলকেই সতত সাবধানে থাকিতে হইত। সেইজন্য কোনক্রমে কোন সময়ে কাহারও কোন বিষয়ে অমনোযোগিতার সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষার চরমোৎকর্ষও সেই সঙ্গে হইয়াছিল। স্কুলের শিক্ষক বা অধ্যাপক কোন কার্য্যসূত্রে স্কুলের কার্য্যান্তে বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে জলযোগ করাইতেন। এমন শুনিয়াছি যে, তিনি স্বহস্তে আম কাটিয়াও খাওয়াইয়াছেন। স্কুলের কোন ভৃত্যের কোনরূপ অসুখ হইলে,

সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তিনি তাহার চিকিৎসা করাইতেন। বিদ্যালয়ের পুরাতন কাশী দ্বারবানের একটা বিষম ফোটকে মৃত্যু হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, কাশী তাহার ব্যারামের কথা আদৌ জানায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহার মৃত্যুর পর, তাহার ব্যারামের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি স্কুলের কর্ম্মচারিবর্গের চিকিৎসার্থ একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তায় এবং শিক্ষা-প্রণালীর সুশৃঙ্খলায়, তাঁহার বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিল। এ প্রতিপত্তিরও মূলাধার, বিদ্যাসাগরের সাহস, উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা।

১৮৬৪ সালে আখ্যানমঞ্জরীর প্রথম ভাগ প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। চরিতাবলী, জীবনচরিত সম্বন্ধে যে মত, আখ্যানমঞ্জরী সম্বন্ধেও সেই মত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া দিবার পর, ক্বচিৎ কোন পুঁথির প্রয়োজন হইলে, কলেজে যাইতেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গ তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকেরা সময়ে সময়ে, নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট পরামর্শও লইতেন। ১৮৬৪ সালেই সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক অলঙ্কার-অধ্যাপক পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ পেন্‌সন লইয়া বিদায় লয়েন। পেন্‌সন লইবার পূর্ব্বে, তাৎকালিক অধ্যক্ষ কাওয়েল সাহেবের সহিত তাঁহার এই পরামর্শ ও প্রস্তাব হইয়াছিল যে, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার পদে, তদীয় সহোদর রামময় চট্টোপাধ্যায়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদে এবং পুত্র রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন ৫০ টাকায় সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যাপক এবং রামময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের পেন্‌সন প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আপত্তি তুলেন। তিনি বলেন,—"আমি রামময় চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক; অতএব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদ আমি পাইব।" বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আপত্তি শুনিয়া কাওয়েল সাহেব কতকটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি তখন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত চাহিয়া পাঠান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নই মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পদ পাইবার যোগ্য। আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ন্যায়; আর যাহা হইবে, তাহা অন্যায়।" তর্কবাগীশ মহাশয়, পেন্‌সন লইয়া পদত্যাগ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াসী হইলে, কাওয়েল সাহেব, তাঁহাকে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আপত্তি শুনাইয়া দেন। তর্কবাগীশ মহাশয় বড়ই দুঃখিত হইলেন। কাওয়েল সাহেব, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মধ্যস্থ মানিবার প্রস্তাব করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ভাবিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁহার পরম ভক্ত শিষ্য, তিনি নিশ্চিতই, তাঁহার সহোদরেরই পোষকতা করিবেন। এই ভাবিয়া, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, মধ্যস্থ মানিতে সম্মত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও তাহাই বলিলেন। তর্কবাগীশ অবাক্ হইলেন; কিন্তু তিনি জানিতেন, বিদ্যাসাগর অন্যায় বলিবার লোক নহেন; তাই আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, পেন্‌সন লইলেন। কলেজ হইতে বিদায় লইয়া, তিনি কাশীবাসী হইয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার ১৮৬৭ সালে ২৫শে মার্চ্চ ৬১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ইহাঁর অন্যতম ভ্রাতা রামময় চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ডেপুটী মাজিষ্টর হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের গুরু বলিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয় সততই গৌরব করিতেন। হিন্দুপেট্রিয়ট এই কথারই উল্লেখ করিয়া, তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুকবি পণ্ডিত এখন বিরল। বিদ্যাসাগর এহেন গুরুর জন্যও, আপন মত পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী চিরকালই ছিলেন। বেথুন স্কুলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১৮৬৫ সালে ১৩ মার্চ্চ বেথুন-বিদ্যালয়ের পারিতোষিকের সময় তিনি একছড়া সোনার চিক উপহার দিয়াছিলেন।

এই পারিতোষিক-সভায় বড়লাট লরেন্স ও তাঁহার পত্নী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এইরূপ মধ্যে মধ্যেই পারিতোষিক দিতেন। বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিপক্ষে প্রাণান্ত পণ করিয়াছিলেন। বেথুন স্কুলের কোন বিভ্রাট উপস্থিত হইলে, তন্মীমাংসার ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইত। ১৮৬৭ সালে বেথুন স্কুলকে নর্ম্যাল স্কুলে পরিণত করিবার কথা প্রস্তাবিত হয়; অর্থাৎ এইখানে হিন্দু-স্ত্রীলোককে এমনই করিয়া শিখান হইবে যে, তাঁহারা পরে শিক্ষয়িত্রী-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইবেন; বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তৎকালে ৺ কেশবচন্দ্র সেন, বাবু এম, এম্ ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা উচিত কি না, তন্নির্দ্ধারণার্থ একটী "কমিটি" হইয়াছিল। সে কমিটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন। কিন্তু ৺ কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্ম সমাজে একটী সভা করিয়া নির্দ্ধারিত করেন যে, নর্ম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা জন্য, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে আবেদন করিতে হইবে। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিরক্ত হইয়া এক পত্র লিখিয়া, কমিটি হইতে নাম উঠাইয়া লয়েন। সেই পত্রখানি এই;—

Baboos Keshub chundra Sen, Mano Mohan Ghose and Dijendro Nath Tagore. Gentlemen,—With reference to the proceedings of the meeting held at the Brahmo Samaj in the evening of last Saturday, resulting in the election of ourselves to form a committee for the purpose of memorialising Government on the subject of the establishment of a Normal School for the training of Female Teachers, I have to observe that a question of such vital importance deserves a more serious consideration than was given to it on that occasion. Before any action was taken, it was, in my opinion, necessary to ascertain the views of such of the leading members of our community as are known to take an interest in the cause of female education. But as they were neither invited to the meeting, nor was their cooperation sought, I do not think it advisible for me to join in the proposed representation to government. In fact when I was asked to attend, I was given to understand that a private conference with Miss Carpenter was intended. I had not the remotest idea that the meeting would be formal or that a question of such grave import would be decided so summarily. As I was thus taken by surprise, I did not feel myself in a position to take part in the discussion or to expr[illegible] my [illegible] on the subject. I [illegible] hardly add [illegible]at un[illegible]er the circum[illegible]tances set f[illegible]h above I am under painful [illegible] of withdraw[illegible] myself from [illegible] Committee. 3rd De[illegible]ber 1866.

I have &c.

Issur Chundra Surma.

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺ কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির মত ছিল যে, সৎকুলজাত ভদ্র-মহিলারা মেয়ে পড়াইবার জন্য শিক্ষালাভ করিতে সম্মত হইবেন না। এইজন্য তাঁহাদের আপত্তি ছিল। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার জন্য একটী "কমিটিও" সংগঠিত হইয়াছিল,—তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য ছিলেন;—"অনারেবল ডবলিউ, এস, সিটনকর,—সভাপতি; অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত; ডবলিউ, এস্, আটকিনসন; রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর; হরচন্দ্র ঘোষ; কালী প্রসাদ ঘোষ; রাজেন্দ্রনাথ দত্ত; নরসিংহ দত্ত; হরনাথ রায়; কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রস্তাব অবশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই বটে; কিন্তু ক্রমে বেথুন স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী, তাঁহার অননুমোদিত হইয়া উঠে; সেইজন্য ১৮৬৯ সালে তিনি বেথুন স্কুলের সেক্রেটরী পদ

পরিত্যাগ করেন। ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহাকে বেথুন স্কুলের আরও একটী গুরুতর কার্য্যের মীমাংসা করিতে হয়। স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা মিস্ পিগটের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয় যে, তাঁহার অমনোযোগিতা হেতু বিদ্যালয়ের অবনতি হইতেছে। তদ্ব্যতীত স্কুলে খৃষ্টানী গান গীত হইত, এইরূপও একটা অতি ভয়ঙ্কর অভিযোগ হয়; অধিকন্তু স্কুলের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। এই জন্য অনেকেই স্কুলে আর মেয়ে পাঠাইত না। এই অভিযোগের অনুসন্ধানার্থ, এক কমিটি হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এই কমিটির সবকমিটিতে সভ্য ছিলেন। অনুসন্ধানে নির্দ্ধারিত হয়, মিস পিগট্ বাস্তবিক অপরাধিনী।* তিনি পদচ্যুত হন।

১৮৬৫ সালের শেষ ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা কাশীবাসী হন। পিতৃভক্ত পুত্র পিতাকে প্রথমতঃ কাশী পাঠাইতে সম্মত হন নাই; পিতার সনির্ব্বন্ধ ব্যগ্রতা দেখিয়া, তিনি অবশেষে তাঁহাকে কাশী পাঠাইতে বাধ্য হন। পিতাকে কাশী পাঠাইবার পূর্ব্বে, তিনি ৩ শত টাকা ব্যয় করিয়া, পিতার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া লয়েন। এ প্রতিকৃতি এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে বিরাজমান। অতঃপর তিনি জননীরও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছেন। জননীর প্রতিকৃতি, পিতার প্রতিকৃতির সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতামাতার মৃত্যুর পর, তিনি সময় সময় তাঁহাদের প্রতিকৃতি দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। প্রত্যহ তিনি দুইবার করিয়া তাঁহাদের প্রতিকৃতি দেখিতেন।†

১৮৬৫ সালে ২৭ শে এপ্রেল, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল সাটক্লিফ সাহেবের সহিত তাঁহার মনান্তর হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের দ্বিতলের একটী গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরি ছিল। সেই ঘরে লাইব্রেরির স্থান সঙ্কুলান হইত না। যে ঘরে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি ছিল, সাটক্লিফ সাহেব, প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরির জন্য সেই ঘরটী চাহেন, এবং সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিটীকে নিম্নতলে লইয়া যাইতে বলেন। প্রসন্ন বাবু তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাতেই সাটক্লিফ সাহেব প্রসন্ন বাবুর উপর বিরক্ত হন। পরে প্রসন্ন বাবু তাৎকালিক ডাইরেক্টার আটকিন্সন সাহেবের নিকট হইতে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করিবার জন্য আদেশ-পত্র প্রাপ্ত হন। প্রসন্ন বাবু পত্রখানি বড় অপমানজনক মনে করিয়া, তদ্দণ্ডেই একখানি অভিমানসূচক পত্র লিখিয়া, পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পদত্যাগের পর, সণ্ডর্স সাহেব ছয় মাস কাল সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট বাহাদুর বিডন সাহেবের নিকট গিয়া, প্রসন্ন বাবুর পদত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,-"আপনার রাজত্বে একি অন্যায়!" বিডন সাহেব বলেন,—"আমি প্রসন্নকে পুনরায় প্রিন্সিপালের পদগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিব।" ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"তিনি যেরূপ স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী, তাহাতে আমার মনে হয় না যে, তিনি আবার

---

* মিস্ পিগট আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ একটী সুবিস্তর মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তৎপ্রকাশের স্থান এখানে হইল না।

† পিতা ঠাকুরদাসের কাশীবাস সম্বন্ধে, পুত্র নারায়ণ বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়াছি,—"পিতার কাশীবাস করিবার প্রস্তাব শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ী যান। তথায় নির্জ্জনে তিনি পিতাকে বলেন,—'আপনি কাশীবাসী হইবেন কেন? যদি পুণ্যার্থে যান, তবে কথা নাই; যদি সংসার-বৈরাগ্যে যান, তাতেও কথা নাই; কিন্তু সুখস্বচ্ছন্দে সংসার চালাইবার উপযুক্ত টাকা পান না বলিয়া যদি যান, তাহা হইলে, আমি টাকার বন্দোবস্ত করিতে পারি।' পিতা বলিলেন,—'পুণ্যার্থেই যাইব।' বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিরুক্তি করেন নাই। পিতা যখন কাশী যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়া, কলিকাতায় আসেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্র নারায়ণকে বলিলেন,—'দেখ, তোর ঠাকুরদাদার যাহাতে কাশী না যাওয়া হয়, তাহার চেষ্টা কর্ দেখি।' অতঃপর নারায়ণ ঠাকুরদাদার সঙ্গ ছাড়িল না। ঠাকুরদাদা নাতির মায়ায় জড়াইয়া পড়িলেন; ক্রমে কাশী যাওয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র আসিয়া, উত্তেজনা বাক্যে পিতার মত পরিবর্ত্তন করেন।"

পদ গ্রহণ করিবেন।" তদুত্তরে বিডন সাহেব বলেন,—"প্রসন্ন আমার ছাত্র, আমার অনুরোধ সে ঠেলিবে না।" ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন। পরে ১৮৬৫ সালের ৩১ আগষ্ট বিডন সাহেবের অনুরোধে প্রসন্ন বাবু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপলের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।* সরকারী কর্ম্মে বিদ্যাসাগরের আর কোন সম্পর্ক ছিল না; তবুও রাজপুরুষগণ তাঁহার কত সম্মান রক্ষা করিতেন, তাহা এইখানেই বুঝা যায়। তেজস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বঙ্গেশ্বরকে স্পষ্টাক্ষরে কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিতেন, বিডন সাহেব তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন; নহিলে তিনি কি অমন করিয়া বলিতে পারেন,—"আপনার রাজত্বে একি অন্যায়!" কোথায় সম্ভ্রম ত্রুটির সম্ভাবনা, আর কোথায় নহে; তাহার বিচার করিয়া, তিনি ভাল মন্দ কথা কহিতেন; এবং কহিতে জানিতেন।

১৮৬৬ সালে মে, জুন ও জুলাই মাসে দেশ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিল। সে দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে এবং মস্তক ঘুরিয়া পড়ে। কত লোককে শাক, কচু সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইয়াছে; কত লোক অনাহারে মরিয়াছে; কত পিতামাতা পুত্র-কন্যাকে ফেলিয়া, কত স্বামী, স্ত্রীর মুখ না চাহিয়া, কত স্ত্রী, স্বামীর অপেক্ষা না করিয়া, দগ্ধ জঠর-জ্বালায় অস্থির হইয়া, এক মুষ্টি অন্নের জন্য সহরে দলে দলে ছুটিয়াছিল; তাহার সবিস্তার বিবৃতির স্থান ত হইবে না; তবে এ দুর্ভিক্ষ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যতটুকু সম্পর্ক, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হইবে মাত্র। জাহানাবাদ জেলা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-বার্ত্তা প্রথম হিন্দু-পেটরিয়টে এক জন লিখিয়া পাঠান। দুর্ভিক্ষ-সঞ্চারে তত্রত্য জমীদারমণ্ডলী প্রথম উদাসীন ছিলেন। তাৎকালিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রথম প্রথম এ বিষয়ে তত মনোযোগী হন নাই। হিন্দু-পেটরিয়টে লিখিত হয়, গড়বেতার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কর মহাশয়, বহুশ্রম স্বীকার করিয়া, দেশের অবস্থা পরিদর্শন করেন; এবং দেশের লোককে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। জাড়ার জমীদার শিবনারায়ণ রায় মহাশয় অনেককে অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ দারুণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ পান নাই। হিন্দু-পেটরিয়টের এক জন সংবাদ-দাতা কাতরকণ্ঠে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আবেদন করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও গ্রাম হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হন। স্বভাব-দাতা বিদ্যাসাগর কি আর স্থির থাকিতে পারেন। তিনি তখনই গ্রামে অন্নসত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, অনেককেই অন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দয়াময়ের দয়াময়ী জননী, অকাতরে অকুণ্ঠিত চিত্তে, বহু লোককে অন্নদান করিতেছিলেন। হিন্দুপেটরিয়টের সংবাদ-দাতা লিখিয়াছিলেন,—

"Pundit Issur Chander Vidyasaghur's mothar has been feeding 400 to 500 persons in Beersinggram"

Hindu patriot 30 July, 1866.

ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহ গ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামের নিরন্ন লোকদিগের জন্য অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম বীরসিংহের অন্নসত্রে এক শত করিয়া লোক অন্ন পাইয়াছিল। সংবাদ-দাতাই লিখিয়াছিলেন,—*"Babu Shibnarayan Ray feeds about hundred persons daily and the ilusttrious Vidyasaghur feeds almost an equal number at Beersinggram.*

ক্রমে অন্নার্থী, দলে দলে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদনুপাতে সাহায্য-

* ১৮৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর প্রসন্ন বাবুকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সপাল-পদ পরিত্যাগ করিয়া, বহরমপুর কলেজে যাইতে হইয়াছিল। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তৎপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহার বেতন এখন সহস্র টাকা। এই বেতনের উল্লেখ করিয়া, ৺ শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের স্ত্রী, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"এত দিন তোমার হাজার টাকা মাহিনা হইত।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা বলেন, "তাহা হইলে স্কুল, বাড়ী, এ সব হইত কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"হইত বৈকি?" আমরাও বলি, হইত বৈ কি, যদি ইয়ং সাহেবের সহিত মনান্তর না হইত।

পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। তিনি স্বয়ং অন্নসত্রের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না; যাহাতে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তৎপক্ষে সর্ব্বাগ্রেই যত্নশীল হইয়াছিলেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রথমতঃ উদাসীন ছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে তিনি দুর্ভিক্ষের দারুণতা অনুভব করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লইয়া, খাঁটাল, ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া অন্নসত্র স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এই কয় মাস বহুসংখ্যক লোক, সরকারী অন্নসত্রে অন্ন পাইয়াছিল।

যে কয় মাস দুর্ভিক্ষ প্রবল ছিল, এবং যে কয় মাস অন্নসত্রের কাজ চলিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই কয় মাস প্রতি মাসে একবার করিয়া বাড়ী যাইতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে, তাঁহার ভ্রাতাপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের উপর, অন্নসত্র-পরিদর্শনের ভার ছিল। তাঁহারা কোন রূপই ত্রুটি করিতেন না। যাহারা অন্নসত্রে আহার না করিত, তাহারা প্রত্যহ সিধা পাইত। কেহ পুত্রকন্যা ফেলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, তাহার পুত্রকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় লইতেন। গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসব করিলে, তাহার নবজাত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

যখন কাঙ্গালীরা খাইতে বসিত, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়জয়কার ধ্বনিতে গগন-মেদিনী পূর্ণ হইয়া যাইত। সেই সময় মনে হইত, অনন্ত মরুভূমে যেন শতধারে মন্দাকিনীর স্রোত ছুটিতেছে; এবং সকলের বিষাদক্লিষ্ট মুখ-মণ্ডলে, যেন প্রীতি-প্রফুল্লতার এক পবিত্র জ্যোতি নিঃসারিত হইতেছে।

সকলে প্রত্যহ খেচরান্ন পাইত। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া ভাত, মৎস্যের ঝোল ও দধির ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং, অনেক রুক্ষকেশ দীনহীন মলিন স্ত্রীলোককে তৈল মাখাইয়া দিতেন। যে সব ভদ্রলোক সিধা লইতে কুণ্ঠিত হইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, গোপনে তাহাদিগকে টাকা দিতেন। অনেক ভদ্র মহিলাদিগকে তিনি গোপনে গোপনে কাপড় বিতরণ করিয়া আসিতেন। অন্নসত্রে রোগীর চিকিৎসা চলিত; মৃতের সৎকার হইত।

ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত অন্নসত্রের কাজ চলিয়াছিল। অন্নসত্রের আবশ্যকতা তিরোহিত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় পাচক, পরিচারক প্রভৃতি কর্ম্মচারিবর্গকে, যথারীতি বেতনাদি দিয়া বিদায় দেন। অন্নকষ্টের অবসানের পরও, গ্রামের যে সব লোকের কষ্ট ছিল, তাহাদিগকে মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিবার ভার জননীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। যেমন পুত্র; তেমনই মাতা! গৃহস্থ বিদ্যাসাগরের এই অসীম করুণার কার্য্য দেখিয়া, অনেক কোটিপতিরও মস্তক হেঁট হইয়াছিল। দীন-হীন কাঙ্গালীরা, তাঁহাকে দয়ার সাগর বলিয়া ডাকিত।

বিদ্যাসাগর "দয়ার সাগর" হইলেন।

দয়ার কথা তাঁর আর কত বলিব? বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"ইতিমধ্যে গড়বেতার অন্নসত্রের কর্ম্মাধ্যক্ষ বাবু হেমচন্দ্র কর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সাহায্য প্রার্থনায় অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লিখিলেন, তাহাতে অগ্রজ মহাশয় আমার দ্বারা দরিদ্র-ভোজনের জন্য ৫০৲ আর উহাদের বস্ত্রের জন্য ৫০৲ একুনে ১০০৲ টাকা প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত ঐ সময় কোন কোন ভদ্রলোক পিতৃহীন অবস্থায় যাচ্ঞা করিতে আইসেন, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ৫০৲ টাকা, কাহাকেও ১০০৲ টাকা, কাহাকেও ২০০৲ টাকা দান করেন। ২৮শে শ্রাবণ পৃথক্ বাটীতে অন্নসত্র স্থাপিত হয়, ১লা পৌষে ভোজনের পর অন্নসত্র বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীয় নিরুপায়গণ ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত অন্নসত্রগৃহে উপস্থিত ছিল; একারণ দুর্ব্বল নিরুপায় প্রায় ৬০ জনকে কয়েক দিন ভোজন করাইতে হইয়াছিল।"

এইবার দারুণ দৈব-দুর্ভোগ! ১৮৬৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার বিদ্যাসাগর মহাশয়, মিস্ কারপেণ্টারকে* লইয়া, উত্তরপাড়ায় শ্রীযুক্ত বিজয়-

* ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া-শিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় ইনি ভারতে আসিয়াছিলেন। বৃষ্টলে ইহাঁরই পিতা পাদরী কারপেণ্টার সাহেবের

কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ গমন করেন। তাৎকালিক শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর আট্‌কিন্‌সন্‌ সাহেব এবং স্কুল-ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব, তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে সকলেই গাড়ী করিয়া, ফিরিয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী ভদ্রলোকের সহিত, একখানি বগী করিয়া আসিতেছিলেন। গাড়ী চড়িবার সময়, তিনি সঙ্গী ভদ্র লোকটীকে বলেন,—"বাপু! আমি কখন বগী চড়ি নাই; হাঁকাইও নাই; দেখ, সাবধানে হাঁকাইও।" ভদ্রলোকটী অবশ্য তাঁহাকে খুবই আশা-ভরসা দিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গাড়াখানি কিছু দূর আসিয়া মোড় ফিরিবার সময়, একেবারে উল্টাইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তখনই পড়িয়া, অজ্ঞান হইয়াছিলেন। যকৃতে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মিস্‌ কারপেণ্টার, তাঁহাকে বুকে তুলিয়া, আপন রুমাল ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার ও উড্রো সাহেবের শুশ্রূষায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় চৈতন্য লাভ করেন। পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া, অনেক কষ্টে কলিকাতায় কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীটস্থ বাসায় ফিরিয়া আসেন। এই দৈবদুর্ঘটনার কথা শুনিয়া, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে দেখিতে আসেন। পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবু, তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া, সুকিয়াষ্ট্রীটে নিজের বাটীতে লইয়া যান। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তখন ভয়ানক আঘাতে উরুদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। এক মাসের সুচিকিৎসায় তিনি এক রকম সারিয়া উঠিলেন; কিন্তু যে কাল-রোগে তাঁহার জীবনীলার অবসান হয়, তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি এই খানে। চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁহার যকৃৎ উল্টাইয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। ইহার পর তাঁহাকে প্রায়ই শিরঃপীড়া ও উদরাময় ভোগ করিতে হইত। পরিপাকশক্তি হ্রাস হইয়া যাইল; সুতরাং আহারও লঘু হইল। দুগ্ধ সহ হইত না। প্রাতে মাছের ঝোল ভাত এবং রাত্রিকালে বারলিরুটি, কখন কখন গরম লুচিমাত্র আহার ছিল। পরে তাহাও অসহ্য হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি রাত্রিকালে দুই এক গাল মুড়ি খাইয়া থাকিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"বাল্যে পয়সার অভাবে দুগ্ধ খাই নাই; বয়সেও রোগের জ্বালায় তাহা হয় নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বমুখে শুনিয়াছি, উত্তরপাড়ায় পতনের পর হইতে তাঁহার সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায়, চেষ্টা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি, যা কিছু সকলেরই হ্রাস হইয়াছিল। সেই সিংহবীর্য্যশালী মহাতেজস্বী কার্য্যবীরের পতন এইখানেই। আর তিনি শোধরাইতে পারিলেন না। স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ প্রায়ই তাঁহাকে ফরাসডাঙ্গা বর্দ্ধমান, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইত। তবুও কিন্তু কার্য্যবীরের কার্য্যবিরাম ছিল না।

পতনাঘাত হইতে কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১৮৬৭ সালের প্রারম্ভে বীরসিংহ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় এক অবীরা বিধবার আত্মীয়েরা, তাঁহার জমী আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই বিধবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাঁদিয়া-কাটিয়া আপন দুঃখ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিধবার আত্মীয়দিগকে ডাকাইয়া আনিয়া, বিধবার জমী আত্মসাৎ করিতে নিষেধ করেন। তাঁহারা তাঁহার কথা শুনেন নাই; বরং তাঁহারা বিধবার নামে আদালতে নালিষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ বিধবার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন শুনিয়া, তাঁহারা আর আদালতে উপস্থিত হন নাই।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহের বাটীর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করেন;—

"মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের ও স্বীয় পুত্রের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সকলেরই মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহার যেরূপ টাকার আবশ্যক, সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। এইরূপ করিবার কারণ এই,—একত্র অনেক পরিবার থাকিলে কলহ হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ বহুপরিবার একত্র অবস্থিতি করিলে সকলেরই সকল বিষয়ে কষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে ভগিনীদ্বয়ের পৃথক্‌ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তখন মিস্‌ কারপেণ্টার বালিকা।

বিদেশীয় যে সকল বালকগণ বাটীতে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে তাঁহাদের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সমস্ত টাকা দিয়া পাচক ও চাকর দ্বারা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার পুত্র নারায়ণের পৃথক্ বাটী প্রস্তুত হয়। এবং নিজের নিকট জননীদেবীর অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা হইল।"*

নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, ভ্রাতারা মধ্যে মধ্যে জ্যেষ্ঠের উপর অভিমান করিয়া, মাসহারা লইতেন না। এ জন্য সময় সময় তাঁহাদের কষ্ট হইত, সে কষ্টের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি বাটী যাইয়া, গোপনে গোপনে ভ্রাতৃবধূদের অঞ্চলে টাকা বাঁধিয়া দিয়া আসিতেন।

একটা বিষয় বলা হয় নাই। ১৮৬৬ সালের ১৯শে জুলাই রাত্রি ৩ টার সময় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু হয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যে রাজাবাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহায় ও পোষক ছিলেন।† মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, মুরশিদাবাদে গিয়া রাজাবাহাদুরের যথেষ্ট চিকিৎসা-শুশ্রূষাদি করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজাবাহাদুরের চিকিৎসা করিতেন। এতদর্থ তিনি মাসে সহস্র টাকা পাইতেন। কাশীপুরে গঙ্গাতীরে রাজার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিষয়ের ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাইকপাড়া রাজ-পরিবারের অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পিতামহী রাণী কাত্যায়নীর অনুরোধে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর বীডন সাহেবকে অনুরোধ করিয়া, পাইকপাড়া ষ্টেট, কোর্ট অব ওয়ার্ডের অন্তর্ভূত করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাৎকালিক পাইকপাড়ার নাবালক রাজপুত্র-দিগকে সঙ্গে করিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের অন্তর্ভূত হইবার সম্বন্ধে, অনেকটা গোলযোগ হইয়াছিল; বাহুল্যভয়ে তদুল্লেখে নিরস্ত হইলাম। তবে একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। কলেক্টরী খাজনার দায়ে পাইকপাড়া রাজবংশের বিষয় বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে, বঙ্গেশ্বর সে যাত্রা বিক্রয়দায় হইতে উদ্ধার করেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডে বিষয় গিয়াছিল বটে; কিন্তু নাবালক রাজপুত্রদিগকে, ওয়ার্ডের অধীনস্থ বিদ্যালয়ে থাকিতে হয় নাই। যাহাতে রাজকুমারদিগকে ওয়ার্ডের বিদ্যালয়ে যাইতে না হয়, তাহার জন্য রাণী কাত্যায়নী, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাষ্পাকুলিত-লোচনে অনুরোধ করেন। এতদর্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গেশ্বরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায়ই পাইকপাড়ার রাজবাটীতে যাইতেন। এক দিন পথিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত রামধন নামে এক মুদি তাঁহাকে ডাকিয়া, আপনার দোকানে লইয়া যায়। রামধন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে খুড়া খুড়া বলিয়া ডাকিত। রামধনের সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় অম্লান বদনে, তাহার দোকানের সম্মুখে, ঘাসের উপর বসিয়া থেলো হুকায় তামাক খাইতেছিলেন; এমন সময় রাজবাটীর কয়েকজন তাঁহাকে দেখিতে পান। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজবাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে, কেহ কেহ এ কথার উল্লেখ করেন। এটা "ভবাদৃশ জনোচিত নহে" বলিয়া, একটা মৃদুতীক্ষ্ণ মন্তব্যও প্রকটিত যে না হইয়াছিল, এমন নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কিন্তু ধীর-গম্ভীর বাক্যে, অথচ একটু মৃদুহাস্যে বলিয়াছিলেন, 'গরিব বড় মানুষ আমার সবই সমান।'

---

* বিদ্যারত্ন মহাশয়, এই কথা, লিখিয়াছেন। নারায়ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সবই সত্য; তবে কলহের সম্ভাবনা নহে, সত্যসত্যই কলহ ঘটিয়াছিল।

† *He was one of the principal supporters of the female schools established and managed by Pandit Issurchandra Vidyasaghar. Hindu Patriot. 1866, 23, July.*

এক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাটীতে বসিয়াছিলেন; এমন সময় দ্বারদেশে এক জন ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহে। দ্বারবানেরা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে বড় সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার পর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজবাড়ী যাওয়া বন্ধ করেন; কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইহার জন্য রাজবাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করেন নাই। কোন কোন রাজকুমারের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাছে তার পূর্ব্ব-সম্মান না থাকে, এই ভাবিয়া, তিনি রাজবাটী যাওয়া বন্ধ করেন। রাজকুমারেরা কিন্তু একটী দিনের জন্যও তাঁহার প্রতি ভক্তিশূন্য হন নাই। কুমার ইন্দ্রচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। কেহ তাঁহাকে বাড়ীতে দ্বারবান রাখিবার পরামর্শ দিলে, তিনি রাজবাড়ীর দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেন; এমন কি প্রায়ই বলিতেন,—"দ্বারবান রাখিলেই ত, আমার বাড়ীতে ভিখারী এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইবে না; অধিকন্তু প্রায় অনেক সাক্ষাৎ-প্রার্থী ভদ্র লোকেরও সাক্ষাৎ-লাভে বঞ্চিত হইব; তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে দ্বারবান ছিল না। কখনও কখনও তিনি আপনার দৌহিত্রবর্গকে বলিতেন, "যদি শুনিতে পাই, বাড়ীর কাহারও দ্বারা আমার বাড়ীতে কোন ভদ্রলোকের আসিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব।" দ্বারবান্ রাখিবার কথা হইলেই তিনি বলিতেন, আমি "অন্যের বাড়ীতে যে অসুবিধা দেখিয়া আসিয়াছি; সে অসুবিধা আমার বাড়ীতে যাহাতে না থাকে, তাহারই জন্য প্রাণান্ত পণ করি।"

বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুনিলেন, তাঁহার অনেক দেনা বলিয়া, হিন্দু-পেটরিয়ট, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। কথাটা শুনিবামাত্র রোষক্ষোভে, যেন চিকুর চমকাইয়া উঠিল;—যেন সেই প্রশান্ত বারিধিবৎ হৃদয়ে, মুহূর্ত্তে বিষম বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হইল! তিনি তখনই তার একটা প্রতিবাদ করিয়া, ১৮৬৭ সালের ১লা জুলাই মাসে হিন্দু-পিটরিয়টে এক পত্র লেখেন। সে পত্র প্রকাশের স্থানাভাব; মর্ম্ম তার এই:—

"বিধবা বিবাহ উপলক্ষে আমার ৪৮ হাজার টাকা দেনা হইয়াছে; এ কথা সত্য নহে; ইহার অর্দ্ধেক কি না সন্দেহ। দেনা যাহাই হউক, আমি কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি না। আমার দেনা আমিই পরিশোধ করিব।"

১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বহুবিবাহ রহিত করণসম্বন্ধে আইনের প্রত্যাশায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন হইয়াছিল। ফল হয় নাই।

১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতাদেবীর সহিত নদীয়া জেলার আইসমালী গ্রামবাসী গোপালচন্দ্র সমাজপতির বিবাহ হয়। কন্যা হেমলতা অতি বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মিষ্ঠা। জামাতা সমাজপতি মহাশয়ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোমত হইয়াছিলেন।

১৮৬৭ সালে ৬ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হয়। বেথুন স্কুলের সম্পর্কে ইহাঁর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেবার বেথুন স্কুলে চিক পুরস্কার দেন, সেইবারই ইনি সোণার বালা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

১৮৬৭ সালের ১৩ই এপ্রেল স্যর রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হয়। ইনি বিধবাবিবাহের বিপক্ষবাদী ছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

১৮৬৮ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক গুলি বন্ধুবিয়োগ ঘটিয়াছিল। ১৮৬৮ সালের ২১শে জানুয়ারি বেলা ১১॥ টার সময় রামগোপাল ঘোষের মৃত্যু হয়। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুহৃদ ও সহায় ছিলেন।* বিধবা বিবাহ ব্যাপারে ইহাঁর বেশ সহানুভূতি ছিল।

* *He was a warm advocate of widow-marraige and assisted the noble cause with money as well as personal labor.*

Hindu Patriot. 27 th. January, 1888.

নিমতলায় কলে শব দাহ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তেজনায় রামগোপাল বাবু, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ সালের ১৮ই মার্চ্চ বুধবার বর্দ্ধমান চকদিঘীর জমীদার সারদা প্রসাদ রায়ের মৃত্যু হয়। সারদা বাবুর সহিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সারদা বাবু কোন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত না লইয়া চলিতেন না। সারদা বাবু নিঃসন্তান ছিলেন। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা উচিত কি না, একবার এবিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লইতে নিষেধ করিয়া, স্কুল স্থাপন ডিস্পেনসারি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে সারদা বাবু ১৮৫৩ সালে চকদিঘীতে একটা ডাক্তারখানা এবং ১৮৬১ সালের ১লা আগষ্ট একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই চকদিঘীতে এক দরিদ্র পরিবারকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৫ টাকা করিয়া মাসহারা দিতেন।

১৮৬৮ সালের ১৭ই আগষ্ট পাইকপাড়া বৃদ্ধ রাণী কাত্যায়নী দেহ ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা ইনি কিরূপ উপকার পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৬৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, কলিকাতার ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়। ইনিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৬৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী, ৺ হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু জন্য শোক-চিহ্ন প্রকাশার্থে এক সভা হইয়াছিল। তাঁহার স্মরণচিহ্ন নির্দ্ধারণার্থ এই সভাতেই যে "কমিটি" হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই কমিটিতে ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রায় আর কোন কমিটিতে দেখা যায় নাই।

১৮৬৮ সালে শীতকালে ইন্‌কমট্যাক্সের অসহ্য কর নির্দ্ধারণে প্রপীড়িত হইয়া, অনেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাগত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কথা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে বিদিত করেন। তাঁহার অনুরোধে, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বর্দ্ধমানের তদানীন্তন কমিশনর হ্যারিসন সাহেবকে, ইনকম্‌ ট্যাক্সের তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত করেন। তথ্যানুসন্ধানে নির্ণীত হয় যে, প্রকৃত-পক্ষে অন্যায়রূপে কর-নির্দ্ধারিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দুই মাস কাল অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, এ তদন্ত ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় তিন সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই তদন্তকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘাটাল-স্কুলের বাটী নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে ৫ শত টাকা দান করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারের পর এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেন,—"বাবা! মেজখুড়ো ছাপাখানার বখরা চাহিতেছেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিয়া অবাক হইলেন, পরে তিনি মধ্যম ভ্রাতাকে ডাকাইয়া বলিলেন;—"ভাই! শুনিয়াছি তুমি ছাপাখানার ভাগ চাহিতেছ। ভাল; তবে তাহাই হইবে। দেনা পাওনা দেখ; মধ্যস্থ মান।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ৺ দ্বারকানাথ মিত্রকে এবং তদীয় মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বাবু দুর্গামোহন দাসকে মধ্যস্থ মানিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু ও অন্যান্য অনেকে সালিসিতে সাক্ষী ছিলেন। ছাপাখানা যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাহাতে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার কোন অংশ নাই, সালিসিতে তাহারই প্রমাণ হইল; অধিকন্তু দেনা অনেক দাঁড়াইল; কাজেই মধ্যম ভ্রাতাকে ছাপাখানার দাবী ছাড়িয়া দিতে হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রাতৃবর্গের সততই শুভ-কামনা করিতেন। তাঁহাদের মঙ্গল চেষ্টায় তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হইত। কেবল ভ্রাতৃবর্গ কেন; আত্মীয়স্বজন-মাত্রেরই উন্নতি কামনায় অর্থব্যয়ে কখন তিনি কোনরূপে কুণ্ঠিত হইতেন না। সকলকেই তিনি সাধ্যানুসারে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই দীর্ঘশ্বাসে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতেন,—"সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পারিলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।"

এই সময়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ইনি এই চিকিৎসার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ১৮৬৬ সালে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্‌ বেরিনী সাহেব কলিকাতায় আসিয়া, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন।

কলিকাতা বহুবাজার-বাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বেরিনী সাহেবের বেশ সংপ্রীতি হইয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে হোমিও-প্যাথিক শিক্ষানুশীলনে কতকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন; বেরিনী সাহেবের সহায়তায় তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মতে রাজেন্দ্র বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিরঃপীড়া আরাম করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-সেবনে রাজকৃষ্ণ বাবু, নিদারুণ মলকৃচ্ছ্রতা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুকে মলত্যাগ করিবার সময় ফিচকারী ব্যবহার করিতে হইত। ফিচকারী ব্যবহারে কঠোর মল অতি কষ্টে নির্গত হইত; এবং তাঁহার দুই জানুদ্বয় রক্তস্রাবে ভাসিয়া যাইত। এ হেন রোগ কেবল হোমিওপ্যাথিকের বিন্দুপানে আরাম হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতঃপর হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে ইনি সবিশেষ মনঃসংযোগ করেন। ইহাতে কতকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, তিনি অনেকের এ চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার পরামর্শে মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন হোমিপ্যাথিক সুচিকিৎসক হইয়াছিলেন। আধুনিক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তখন এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপর তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। তিনি প্রায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নিন্দা করিতেন। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মহেন্দ্র বাবু, হাইকোর্টের জজ পীড়িত অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় গাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবুর ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছিল। শেষে মহেন্দ্র বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শিরোধার্য্য করিয়া বলেন, "আমি এক্ষণে আর হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিব না; তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ইহার কি গুণ।" পরীক্ষায় তিনি হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ক্রমে অল্প দিনের মধ্যে ঐ চিকিৎসায় তিনি, যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহার যশঃ-প্রভায়, বেরিনীর প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছিল। এদেশের লোক, প্রায় বেরিনাকে না ডাকিয়া, মহেন্দ্র বাবুকেই ডাকিতেন। মহেন্দ্র বাবুরই উপর সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ১৮৬৯ সালে বেরিনী সাহেবকে শূন্য পকেটে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, —"কত সাহেব এদেশে আসিয়া ফিরিয়া যাইবার সময়, পকেট ভরিয়া টাকা লইয়া যান; আপনি কিন্তু রিক্ত পকেটে ফিরিতেছেন?" এতদুত্তরে বেরিনী সাহেব বলিয়াছিলেন;—

"*Rajendra I carry five thousand Rupees in my pocket.*"

অর্থাৎ আমি ৫ হাজার টাকা পকেটে পূরিয়া লইয়া যাইতেছি। রাজেন্দ্র বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে কিরূপ"। উত্তর হইল,—

"*Mohendro's conversion is worth five thousand to me*"

মহেন্দ্র যে হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী হইয়াছেন, ইহারই মূল্য পাঁচ সহস্র টাকা। এই সময়, গোবরডাঙ্গার জমীদার ৺ সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমীদার ৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং কলিকাতার ঝামাপুকুর-নিবাসী রাজা দিগম্বর মিত্র, হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইহার ৬।৭ বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার, অতি উৎকট পীড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরাম হইয়াছিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা, হার মানিয়াছিল। ইহাতে হোমিওপ্যাথিকের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধিকতর ভক্তি হইয়াছিল। তিনি এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। শববিচ্ছেদ শিক্ষা ভিন্ন চিকিৎসা বিদ্যা ব্যর্থ হয় বলিয়া, তিনি কতকগুলি নরকঙ্কাল ক্রয় করিয়াছিলেন। সুকিয়াষ্ট্রীটনিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ, তাঁহাকে এতদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরে এই সব নরকঙ্কাল, রাজকৃষ্ণ বাবুর পুত্রকে দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বহু সংখ্যক হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন। এ সব পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। এই লাইব্রেরীতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ব্যতীত প্রায় লক্ষাধিক টাকার অন্য পুস্তক

আছে। তেমন সুন্দর বিলাতী বাঁধান পুস্তক আর কোন পুস্তকালয়ে আছে কিনা সন্দেহ। পুস্তকালয়ই তাঁহার জীবনাবলম্বন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অধ্যয়ন তাঁহার জীবনের ব্রতই ছিল। এক মুহূর্ত্ত তিনি পুস্তক ব্যতীত থাকিতেন না। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া, তিনি বহু মূল্যের অতি সুদুর্ল্লভ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। স্বাস্থ্যভঙ্গই তাহার কারণ। শুনিতে পাই, যখনই তিনি লাইব্রেরির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া, ইতিহাসগুলির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, তখনই দরবিগলিত অশ্রুধারে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইত। জীবনের একটা পবিত্র কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না, সেই সুদারুণ স্মৃতিতে তাঁহার ভয়ঙ্কর মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইত।

উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর, স্বাস্থ্যলাভার্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ফরাসডাঙ্গায় যাত্রা করেন। সেখানে কিন্তু সুবিধা না হওয়ায়, তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইতে হয়। বর্দ্ধমান তখন সুন্দর স্বাস্থ্য-প্রদ স্থান ছিল। বর্দ্ধমানে যাইয়া, পরম মিত্র প্যারিচাঁদ মিত্রের বাড়ীতে থাকিতেন। প্যারিচাঁদ মিত্র* জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। প্রণয়-সদ্ভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারিচাঁদ বাবু হরি-হর আত্মা। উভয়েই যেন এক পরিবারভুক্ত। বর্দ্ধমানেও তাঁহার দান ও দয়ার কার্য্য অবিশ্রান্তভাবে চলিত। তাঁহার নাম শুনিলে, অনেক দীন-দরিদ্র তাঁহার নিকট আগমন করিত। তিনি যাহার যেরূপ অভাব বুঝিতেন, তাহাকে সেইরূপ দান করিতেন। দানে তাঁর জাতিবিচার ছিল না। অনেক দরিদ্র মুসলমানে, তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়া, গুরুতর দায় হইতে মুক্ত হইত। বর্দ্ধমান হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায় বীরসিংহ গ্রামে যাতায়াত করিতেন। সেই সময় যত দীন-দরিদ্র বালক, তাঁহার পাল্কী ধরিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। তিনিও কাহাকেও মিঠাই, কাহাকেও পয়সা, আর কাহাকেও বস্ত্র দান করিতেন। দয়ালু বিদ্যাসাগর যাইতেছেন শুনিলে, সাহায্য কামনা না থাকিলেও, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য শত শত লোক উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত।

* প্যারিচাঁদ বাবু পটলডাঙ্গার ৺শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের ভগিনীপতি ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর ভগিনী অকালেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্যারি বাবুকে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহণ করিতে হয়। প্রথম পত্নী গত হইলেও, প্যারি বাবু শ্যামাচরণ বাবুর সহিত পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন। প্যারি বাবুর দ্বিতীয় পত্নীও শ্যামাচরণ বাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত মনে করিতেন। শ্যামাচরণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়বন্ধু। এই সূত্রে প্যারি বাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়।

সব মাটী

"বাবা! বাবা! বিজয় সব মাটী ক'রেচে! তুমি ঘূর্ণী থেকে সেই যে সেই নতুন ভাল পুতুলটী এনেছিলে, বিজয় তা খান্ খান্ ক'রে ভেঙ্গেচে!" মধ্যম পুত্রটী আসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠের নামে এই অভিযোগ করিলেন। জিনিসটী ভাঙ্গিয়াছে, এই সহজ কথায় মধ্যম-শ্রীমান্‌কে "সব মাটী করিয়াছে" ইত্যাদি ভূমিকা করিতে দেখিয়া আমার বড় হাসি পাইল। হাসিয়া একটী কথা বলিতেও ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সেরূপ করিলে ছেলেদের অপচয়-পরায়ণতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাহা অন্যায়-বোধে হাসি ও সে কথা—দুইই সংবরণ করিয়া কহিলাম,—"বিজয় বড় দুষ্ট হইয়াছে, তাহাকে এখন হইতে আর কিছুই কিনিয়া দেওয়া হইবে না।" মধ্যম মহাশয় এই মনোগত উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে কনিষ্ঠকে ঐ সংবাদ দিতে ধাবিত হইলেন।

আমার গৃহটী নিস্তব্ধ হইল, কিন্তু অন্তঃকরণ নিস্তব্ধ হইল না। "সব মাটী করিয়াছে" ঐ কথাই অন্তঃকরণে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ভাল কথা, আমি মধ্যমের ঐ কথায় হাসিয়া যে কি বলিতে যাইতেছিলাম, সে কথাটী বলিয়া রাখি। বলিতেছিলাম যে, "মাটীর জিনিস আবার মাটী করিল কি রকম?" যাহা হউক, সে কথা ত চুকিয়া গিয়াছে। এখন মনে করিতেছিলাম যে, যাহা নষ্ট হয়, তাহারই নাম মাটী হওয়া? কি আশ্চর্য্য, মাটীর ঘরখানি

কেহ মাটী বলিবে না, কিন্তু ঘরখানি ভাঙ্গিয়া বা পড়িয়া গেলেই লোকে বলিবে,—"ঘরখানি মাটী হইয়াছে।" আমার এই অট্টালিকা, ইহা ভাঙ্গিলেও লোকে বলিবে, "দালানটী মাটী হইয়াছে।" তাহা না হয় বলিল; কেননা, মাটীর ভিত্তি ত মাটীই বটে, আর ইষ্টকও পোড়া-মাটী মাত্র। কিন্তু কাহারও প্রাণপণ পরিশ্রম বিফল হইলে বলিবে,—"সব মাটী হইয়াছে"; কাহারও ধন, যশ ইত্যাদির অপচয় হইলে বলিবে,—"সব মাটী হইয়াছে।" তাহা হইলেই বুঝা গেল,—নষ্ট হওয়াই মাটী হওয়া। কিন্তু মাটীর এ অখ্যাতি কেন? জিনিস নষ্ট হইলেত কেবল মাটী হয় না। মাটী হয়, জল হয়, বাতাস হয়, আকাশ হয়,—কত কি হয়। তবে কেবল মাটীরই একলা এ অখ্যাতি বহন করা কেন? জিনিস গৌরবে বিক্রীত হইতেছে না, বলিবে,—"মাটীর দরে জিনিস ছাড়িয়া দিতেছি।" সে মাল ছাই-ভস্মই হউক, আর যাহাই হউক, অগৌরব স্থলেই মাটীর সঙ্গে তুলনা! কেন, মাটী কি এতই অপদার্থ? আর কেবল মাটীই কি অপদার্থ, আর তোমরা কিছুই অপদার্থ নহ? মা বসুমতি! তোমার সর্ব্বংসহা নাম যথার্থ বটে!

ভাল কথা, "বসুমতী" তোমায় এ নাম কে দিল মা? এ যে সে-কালের নাম মা! বুঝি ব্যাস-বাল্মীকি, পাণিনি-কাত্যায়ন, অমর-জৈনেন্দ্র প্রভৃতির প্রদত্ত এই নাম? সুধু কি এই এক প্রকারের একটী নাম! বসুন্ধরা, বসুমতী, বসুধা, কত প্রকারে আদর করিয়া, শ্লাঘা করিয়া তাঁহারা তোমায় ঐ সকল নাম প্রদান করিয়াছেন! কেন মা! কি এমন ধন-রত্ন ধরিয়াছিস্ যে, তুই বসুন্ধরা বসুধা বলিয়া বিখ্যাত? কি এমন সর্ব্বোত্তম রত্ন আছে মা! যে তুই বসুমতী বলিয়া খ্যাতিমতী? আছে বৈ কি! সে সকল রত্নের অম্লান, অক্ষয় কিরণচ্ছটায় এ দুর্দ্দিনের অন্ধকারেও তোমার মুখখানি যে উদ্ভাসিত দেখিতে পাই মা! যে সকল সুসন্তানেরা তোমায় ঐ সকল নাম দিয়াছেন, তাঁহারাই যে শ্রেষ্ঠরত্ন! আমরাই যে ভুলিয়াছি মা! ব্যাস-বাল্মীকি, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, কপিল-কণাদ, জৈমিনি-গৌতম, —ইহাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরত্ন আর কোন্ রত্ন মা? ভীষ্ম-দ্রোণ, বলি-দধীচি, শিবি-হরিশ্চন্দ্র—ইহাঁদের সদৃশ রত্ন কোথা আছে মা? অনসূয়া-অরুন্ধতী, সীতা-সাবিত্রী, সতী-দময়ন্তী—ইহাঁদের তুল্য রত্ন আর কোথা মিলে মা? অকৃতজ্ঞ আমরা ভুলিয়া আছি, আর তাঁহাদের মনে পড়ে না! তাঁহারা যেন একেবারে লীন হইয়া গিয়াছেন! যদি লীন হইয়াই গিয়া থাকেন, তাঁহারা ত তোরই অঙ্গে লীন হইয়াছেন মা! দেখি দেখি, কোন্ অঙ্গে লীন হইয়াছেন মা! সে তেজ, সে প্রতিভা, কেমনে মিলাইয়া যায় মা! আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য কেমনে মাটীতে শয়ন করে মা! দেখি দেখি, একবার দেখা দেখি আমায়! দেখি মা! সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কত কঠোর মৃত্তিকা হইয়াছে! ভীষ্মদেবের পতন-ক্ষেত্র কি পাষাণে পরিণত হইয়াছে! কপিল গৌতমের শেষ-শয্যা কি তুঙ্গ-শৃঙ্গ-আকার ধরিয়াছে! উজ্জয়িনীর বিজয়িনী ভূমিতে কি মধুময়ী ধারা রহিয়াছে! আহা আহা, তোমার অঙ্গে কেমনে পদ স্পর্শ করিব মা! তোর প্রত্যেক পরমাণু যে রত্নকণা! সে রত্নের যে কিছুই ক্ষয় নাই! সীতার পদস্পর্শে যে মৃত্তিকা পবিত্র হইয়াছিল, পতিনিন্দাশ্রবণে যথায় সতীর অঙ্গ অবশ হইয়া ধরা-শয্যায় মিশাইয়াছিল, সে সকলই যে বর্ত্তমান মা! আমি কোথায় পদক্ষেপ করিব? বৃন্দাবন-বিপিনে এখনও ত বাঁশী বাজে মা! কোন্ সহৃদয়ের, সচেতনের কানে সে বাঁশী না বাজে? এখনও যে কালো যমুনা দেখা যায় মা! দলে দলে বিলাপিনী ব্রজবালার কজ্জলাক্ত অশ্রুধারাতেই ত উহা কালো হইয়াছে! গৃহত্যাগিনী প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার অনন্ত প্রেমধারাই যে যমুনার ঐ ধারাকে সজীব রাখিয়াছে! অভাগিনী জনক-তনয়ার দণ্ডকারণ্য-বিদারী হাহাকার-ধ্বনি, ঐ দেখ, ভবভূতির ভবন-পার্শ্ব-বাহিনী গোদাবরীর গদ্‌গদ্‌নাদে পরিস্ফুট রহিয়াছে! আর সেই যে অভাগিনী তাপস-কন্যা শকুন্তলা কয়েক দিনের জন্য রাজরাণী হইয়াছিল, আর শেষে সেই রাজা পতি কর্ত্তৃক অপমানিত ও উপহসিত হইয়া পরিত্যক্ত, পালক-পিতার শিষ্য কর্ত্তৃকও রোষ-পরুষাক্ষরে নির্ভর্ৎসিত হইয়া পরিত্যক্ত ও বিসর্জ্জিত হইয়া, কোথাও আশ্রয় না দেখিয়া, বিকল-কুররী-কণ্ঠে কাঁদিয়া তোমায় বলিয়াছিল,—"ভগবতি বসুন্ধরে! দেহি

মে অন্তরম্" তাহা আজিও কাণে বাজে মা! তাহা আজিও যে প্রাণে বাজে মা! কোথায় তোর রত্ন নাই, কোন্ রেণুতে তোর রত্ন নাই? তোর প্রত্যেক রেণুতে জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা-জ্যোতিঃ, কান্তি-শক্তি, স্নেহ-ভক্তি, প্রেম-প্রীতি বিরাজ করিতেছে! তোর প্রত্যেক রেণুতে ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য, মহত্ত্ব-ঔদার্য্য, তিতিক্ষা-শৌর্য্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে! তোর প্রত্যেক রেণুতে শান্তি-বৈরাগ্য, বিবেক-ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা-তীর্থ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে! অন্ধ আমি এসকল দেখিয়াও দেখি না; গুরুদেব শুনাইয়াছেন, শুনিয়াও শুনি না। নিত্যকৃত্য প্রাতঃকৃত্য স্মরণ করিয়াও স্মরণ করি না। প্রভাতে কি বলিয়া তোমায় বন্দনা করি? শয্যা ত্যাগ করিয়া নিম্নে পদক্ষেপ করিতে না করিতে বন্দনা করি,—

"সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"

দেবি! এখনি আমি পদ দ্বারা তোমার অঙ্গ-স্পর্শ করিব। তোমায় স্পর্শ না করিয়া উপায় কি? সমুদ্রান্ত অতি বিপুল যাবতীয় স্থান তোমার অবয়ব। এস্থান ত্যজিয়া আমি কোথায় যাইব? এ সমুদ্রান্তা ভূমিতে যত যত প্রাণী অধিষ্ঠান করে, সকলকেই তোমার গাত্রে এখনি পদক্ষেপ করিতে হইবে। তা মা, তুমি এ অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি জননী, তুমি ক্ষমা না করিলে কে করিবে? এই বিশাল পর্ব্বত তোমার স্তনমণ্ডল। এই পর্ব্বত হইতে যে সকল স্রোতস্বতী নির্গত হইতেছে, তাহা তোমারই ঐ স্তনের দুগ্ধধারা। তদ্দ্বারাই সমস্ত প্রাণী প্রাণবান্। তা জননি! বিষ্ণুপত্নি! সন্তানের এ অপরাধ ক্ষমা কর। আমরা ভক্তিপ্রবণ-চিত্তে তোমায় নমস্কার করি।

হায়! আজ মা আর সে সব রত্ন জীবিত নাই, তাই বুঝি তোমার এ অখ্যাতি। আজ তোমার সন্তানেরা মাটী, তাই তোমারও সে বসুধা বসুন্ধরা নাম বিলুপ্ত প্রায়। মা এখন তোমার মাটী আখ্যাই প্রচলিত।

এই সময় আমার সেই দুষ্ট ছেলেটী—মধ্যমটী ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবা, তুমি খুব মুক করিয়াছ, আর তাহাকে কিছু দিবে না শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।" আমি কহিলাম,—"দেখ সুধাংশু! আমিও কাঁদিয়া ফেলিয়াছি।" বস্তুতও ভাবের আবেগে আমার চক্ষে অশ্রু-বিন্দুর উদয় হইয়াছিল। দেখিয়া বালক কহিল, —"তাই ত! তুমি কাঁদ কেন বাবা! পুঁতুল ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া? পুঁতুল ত আবার কিনিলেই মিলিবে।" আমি বলিলাম,—"হাঁ, পুঁতুল কিনিলেই আবার মিলিবে। সেজন্য কাঁদি নাই। যাহা কিনিলে আর মিলিবে না, তাহার জন্যই কাঁদিয়াছি।

অভিমানী কনিষ্ঠ পুত্রটীর সান্ত্বনার নিমিত্ত আমাকে উঠিতে হইল। আমি বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইলাম। এইরূপে আমার চিন্তাস্রোত অৰ্দ্ধপথে আসিয়াই রুদ্ধ হইয়া গেল। রুদ্ধ হউক, ইহা হইতেই পাঠকবর্গ একরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্কলন করিয়া লইতে পারিবেন। অর্থাৎ "সব মাটী হয়" একথা লোকে যেরূপ বলিয়া থাকে, "মাটী হইতে সব হয়" একথাও সেরূপে বলা যাইতে পারে। কেন পারে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

পাথুরে কয়লা

ভারতে কয়লা।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাথুরে কয়লা আছে। সে কয়লা কিন্তু বিলাতের মত তত দূর উৎকৃষ্ট নয়। আমাদের দেশে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা একেবারে নাই বলিলেও হয়। ভারতবর্ষের কয়লা,—সমুদয় বিটুমিনস্ কয়লা। ইহাতে কার্ব্বনের ভাগ অল্প, বাজে পদার্থের ভাগ অধিক। রাণীগঞ্জের কয়লা-ভূমিতে যে প্রতি বৎসর রাশি রাশি কয়লা উত্তোলিত হয়, তাহাতে শতকরা গড়ে ৫৫ ভাগের অধিক কারবণ থাকে না। রাণীগঞ্জের নিকট করহর-বাড়ীর কয়লা, ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট। ইহাতে শতকরা ৬৫ ভাগ কারবণ আছে। রাণীগঞ্জের কয়লার ১০০ ভাগে, ১০ হইতে ১৫ ভাগ বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ। কয়লা বা কাঠ পোড়াইলে যে টুকু ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে,

* এই প্রবন্ধের অনেক স্থল আমাদের সম্মত নহে। ভ, স,

সেই টুকু জানিবে যে ধাতব পদার্থ, অর্থাৎ মৃত্তিকা, বালুকা ইত্যাদি। মৃত্তিকা, বালুকা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ পুড়িয়া উত্তাপ বাহির হয় না, মিছা-মিছি কেবল ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। তাই, কয়লায় যত এরূপ পদার্থ অল্প থাকে, ততই ভাল। আবার, ধাতব পদার্থ না থাকিয়া কয়লায় যতই কারবণের ভাগ অধিক থাকে, ততই ভাল। বিলাতের কয়লায় কারবণ অধিক, ছাই কম। তাই, যে কল চালাইতে অধিক উত্তাপের আবশ্যক, অধিক বলের প্রয়োজন, এদেশে সে কল চালাইতে বিলাতী কয়লা ব্যবহার হইয়া থাকে। সেজন্য প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে দেড় কোটি টাকার বিলাতী কয়লা আমদানি হয়।

আমাদের দেশে ভাল কয়লা নাই, তাই ভাল কাজের নিমিত্ত বিলাত হইতে কয়লা আমদানি হয়। যেমন তেমন কাজ এ দেশের কয়লাতেই চলে। চাউল, গম প্রভৃতি কৃষিজ-বস্তু সমূহের বিনিময়ে আমরা এই বিলাতী কয়লা ক্রয় করি। আমাদের দেশে যদি ভাল কয়লা থাকিত, তাহা হইলে এই চাউল গম আর বিদেশে যাইত না। দেশের লোক, অন্নের জন্য 'হা হা' করিতেছে, তাহারা খাইয়া বাঁচিত। আমি আমদানি-রপ্তানির বিরোধী নই। কারণ, আমদানি-রপ্তানি "বিনিময়" বৈ আর কিছুই নয়। আমাদের যাহা আবশ্যক, সেই দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আনয়ন করার নামই আমদানি। কিন্তু সে দ্রব্য অন্য দেশের লোক বিনা মূল্যে আমাদিগকে দিবে কেন? তাই, বিদেশের লোকের যাহা আবশ্যক, তাহা দিয়া আমরা তাহাদিগের দ্রব্য ক্রয় করি। বিদেশের লোকের প্রয়োজন,—চাউল, গম প্রভৃতি কৃষিজ-সামগ্রী। সেজন্য, এ দেশের লোক অন্নের জন্য লালায়িত হইলেও, চাউল গম দিয়া, কাপড়, লৌহ প্রভৃতি দ্রব্যাদি ক্রয় করে। কৃষক, আপনার কৃষি-জাত দ্রব্য—যেখানে অধিক মূল্য পাইবে,—সেইখানেই বেচিবে। পৃথিবীর নিয়ম এই। তাহার পর, তাহার কাপড়েরপ্রয়োজন। যেখানে অল্প মূল্যে সে কাপড় পাইবে, সেই স্থান হইতেই সে কিনিবে। এও পৃথিবীর নিয়ম। আমি যদি কৃষককে বলি যে,—"দেখ আমি তোমার স্বদেশী। বিদেশীয়দিগকে তুমি চারি টাকা মণ হিসাবে চাউল বেচিতেছ, তুমি আমাকে এক টাকা দরে বিক্রয় কর। আর আমি এই কাপড় খানি বুনিয়াছি। ঠিক এইরূপ কাপড় বিদেশীয়েরা চারি আনা গজ হিসাবে বিক্রয় করে সত্য, কিন্তু আমি এক টাকা গজের কম বিক্রয় করিতে পারি না। আমি তোমার দেশের লোক, সেই জন্য তুমি আমাকে এক টাকা মণ হিসাবে চাউল বিক্রয় কর, আর আমার নিকট এক টাকা গজ হিসাবে কাপড় ক্রয় কর।" ইহার উত্তরে কৃষক আমাকে বলিবে—"তোমার মত তো আর আমি পাগল হই নাই!"

সুতরাং আমরা এক্ষণে বিদেশ হইতে যে সমুদয় দ্রব্য আনয়ন করি, সেই দ্রব্য এদেশে অল্প মূল্যে হইতে পারে কি না, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। বিদেশীয় কাপড় যদি চারি আনা গজ হিসাবে বিক্রয় হয়, আমাদিগকেও অন্যূন সেই দামে বিক্রয় করিতে হইবে। তবেই দেশের লোকে লইবে। গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া প্রতিদিন কেহ স্বদেশ-অনুরাগ দেখাইবে না। "হিন্দু সাবান", "আর্য্য বিস্কুট", "সনাতন-পেড়ে সাড়ি", "মহাদেব চূর্ণ" এ সব জুয়াচুরি কেবল দুই দিন চলিয়া থাকে, অধিক দিন চলে না।

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আজকাল অনেকের মনে "চিন্তার" উদয় হইয়াছে। কত কাল আমরা চিন্তাশূন্য জড়-পদার্থের মত ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পুরাতন পুস্তক পাঠে, ভারতের প্রাচীন গভীর চিন্তাশীলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যখন প্রাচীন পুস্তকাদি পাঠ করি, তখন সত্য সত্যই মনে হয়, আমরা কি সেই সাগরসম গভীর-চিন্তাশীল ঋষিবংশ জাত? মনে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তখনি আবার ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সজ্জাতিদিগের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হয়। আমি পৃথিবীর নানা দেশের লোক দেখিয়াছি, পৃথিবীর নানা দেশের লোক আমার অধীনে কাজ-কর্ম্ম করিয়াছে। আমি বার বার বলিয়াছি, আর বার বার একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, বাঙ্গালী, কাশ্মীরী ও মারহাট্টা ব্রাহ্মণদিগের মত বুদ্ধিশালী মনুষ্য এ পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। কায়স্থ, বণিক্ ও প্রভু প্রভৃতি জাতির বুদ্ধি-প্রখরতাও সামান্য নহে। এদেশে এরূপ প্রগাঢ় তেজঃশালী বুদ্ধিবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিতেও আমাদের

এ গতি কেন? ভাবিয়া কিছু ঠিক পাই না। আমাদের ভাল ইতিহাস নাই। তবে মুসলমানপুরাবৃত্ত-পণ্ডিতগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে শোকে দুঃখে কাতর হইয়া, পড়িতে হয়। কি করিয়া মুসলমান বীরগণ হিন্দুদিগকে পরাভব করেন, তৎকালের হিন্দুগণ কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় বিষয় পাঠ করিতে করিতে চক্ষুতে জল আসে। দুঃখে কাতর হইয়া, পাঠে অক্ষম হইয়া, কতবার পুস্তক ফেলিয়া দিয়াছি। মনে হয়, সেই যে দ্বাপরের শেষে দানবগণ আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশ-সম্ভূত মনুষ্যরূপী জীবগণ ভারতবাসীদিগকে সতত কুপথগামী করিতেছে, ভারতের চক্ষে তাহারাই আবরণ দিয়া রাখিয়াছে। মহাভারতের যুদ্ধে ভারতে দানব-কুলের বীজ মরে নাই। তাই শত শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারত তিমিরাবৃত থাকিয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহা না হইলে এই সুবর্ণভূমি এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে কেন?

যাহা হউক, এক্ষণে সকলে বুঝিতেছেন যে, নব আবিষ্কৃত নানারূপ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। মুদ্রাযন্ত্র ও বাষ্পীয় কলের সহায়তা ভিন্ন এই "জন্মভূমি" কিছুতেই এরূপ সুলভ হইত না। বাষ্পীয় কলের সহায়তা ভিন্ন সুলভ মূল্যে কাপড়, কাগজ প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিছুতেই হইতে পারে না। রাসায়নিক শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন সুলভ মূল্যে কাচ, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে না। তাই, এদেশের অনেকেই এক্ষণে নব-আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সহায়তায় নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কল্পনা করিতেছেন। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা কৃতকার্য্য হউন। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্ত এক্ষণে এদেশের লোক নানা স্থানে গমনাগমনও করিতেছেন। ফরাশি দেশে অবস্থান করিয়া, কাশিম সাহেব রেশমের বিষয় শিক্ষা করিয়া, এই কলিকাতা নগরে শত শত দরিদ্র লোকদিগকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ইতালি প্রভৃতি দেশে অবস্থান করিয়া রেশম-কীটের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া, এক্ষণে বঙ্গদেশোৎপন্ন রেশমের নিমিত্ত চীন ও জাপানের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; বোম্বাইবাসী হিন্দুগণ একদিকে জাঞ্জিবার ও মাডেগাস্কার, অপর দিকে ম্যালে, চীন, জেপান প্রভৃতি দেশে গিয়া মাঞ্চেষ্টারের প্রবল প্রতাপান্বিত বণিকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোম্বাই নগরের কাপড় যদি এই সকল দেশে বিক্রীত না হইত, তাহা হইলে সেস্থানে এতগুলি কাপড়ের কল কিছুতেই চলিত না। এই সকল কাপড়ের কলে সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার কতকগুলি চিকন-ব্যবসায়ীদিগকে আমি আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে তাহাদিগের কার্য্য অতি সুচারুরূপে চলিতেছে। কেহ পাঁচ হাজার, কেহ ছয় হাজার টাকা ঘরে প্রেরণ করিয়াছে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া অষ্ট্রেলিয়া দেশেও ভারতবাসিগণ গমনাগমন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি জনকত লোক সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। তাহারা অতি সামান্য লোক। কিন্তু সেখানে তাহাদিগের কার্য্য এরূপ ভালরূপে চলিয়াছিল, যে বন্ধু-বান্ধবদিগকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত, তাহারা সোণার ঘড়ি প্রভৃতি নানারূপ বহুমূল্য দ্রব্য আনিয়াছে। কালের স্রোতের এইরূপ গতি দেখিয়া ভরসা হয় যে, কমলা পুনরায় দীন-হীন ভারতবাসীদিগের মুখ পানে তুলিয়া চাহিবেন। পূর্ব্বে যেরূপ সাগর-মহাসাগরে, দেশ-বিদেশে ভারতের কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান ছিল, পুনরায় আমাদিগের সেই সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইবে।

আমাদের দেশে ভাল পাথুরে কয়লা নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সহায়তায় এই মন্দ কয়লাকেই ভাল করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানের সহায়তায় এই মন্দ কয়লা হইতে সারভাগ টুকু বাহির করিয়া "পেটেন্ট ফিউয়েল" নামক পদার্থে পরিণত করিতে পারা যায়। মন্দ কয়লা হইতে এইরূপ পদার্থ বিলাতে অনেকেই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এ পদার্থ এদেশেও আমদানি হয়। গত বৎসর এই পদার্থ দুই লক্ষ টাকার আমদানি হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ উদ্যম, এরূপ বুদ্ধি-কৌশল ভারতবাসীদিগের এখনও চিন্তা-পথে উদয় হয় নাই। তাহার অনেক বিলম্ব

আছে। তবে কথা এই,—কার্য্যোপযোগী সুলভ "পেটেণ্ট ফিউল" প্রস্তুত করিতে পারিলে, ভারত হইতে প্রতিবৎসর দেড় কোটি টাকার গম চাউল প্রভৃতি দ্রব্য আর বিদেশে প্রেরিত হয় না। সে গম চাউল এদেশে থাকিলে শত সহস্র দরিদ্র লোকেরা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায়। এদেশের ধনবান্ ব্যক্তিরা দরিদ্র ভোজন করাইবার নিমিত্ত অনেক অর্থ ব্যয় করেন। বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন মিষ্টান্ন না খাইয়া, যাহাতে তাহারা বারমাস উদর পূর্ণ করিয়া সামান্য মোটা ভাত খাইতে পায়, এরূপ উদ্দেশে যদি কেহ অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে সে অর্থব্যয় বোধ হয় অধিক সুফলপ্রদ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে পাথুরে কয়লা আছে। সকলে বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই কলিকাতা সহরের নিম্নভাগেও পাথুরে কয়লা আছে। ৫৫ বৎসর গত হইল, অর্থাৎ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, এক জন সাহেব কেল্লার নিম্ন-ভূমি "বোরিং" যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কলিকাতা-ভূমির ২৬০ হাত নিম্নে তিনি পাথুরে কয়লা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ কয়লা কিন্তু উৎকৃষ্ট নহে। প্রিন্সেপ সাহেব পরীক্ষা করিয়া ইহার একশত ভাগে কেবল ৩৫ ভাগ কারবন পাইয়াছিলেন। অবশিষ্ট ৬০ ভাগ বাষ্পীয় ও ৫ ভাগ ধাতব পদার্থ। এরূপ কয়লা তুলিয়া কোনও লাভ নাই। বিশেষতঃ এরূপ গভীর প্রদেশ হইতে কয়লা উত্তোলন করা অতি ব্যয়সাধ্য। আবার, কয়লার স্তর অধিক স্থূলও নয়।

আজ ২৩ বৎসরের কথা হইল, মেদিনীপুর জেলখানায় এক সাহেব-চোর এক অপূর্ব্ব রহস্যের সংঘটন করিয়াছিলেন। এই জেলখানায় একটী কূপ খনন করা হইতেছিল। এদেশে যেরূপ সচরাচর কূপ দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ কূপ নহে। ইহাকে "আরটেশিয়েন" কূপ বলে। পৃথিবীর অতি নিম্নদেশে যে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, সেই স্রোতকে বিদীর্ণ করিয়া জল উত্তোলন করাই এই কূপের উদ্দেশ্য। একবার এইরূপ একটী জলস্রোত বিদীর্ণ করিতে পারিলে, ফোয়ারার মত অতি প্রবলবেগে জল ভূমির উপর আপনা-আপনি উঠিতে থাকে, জল আর তুলিতে হয় না। সকল স্থানে কিন্তু এরূপ কূপ খনন করিতে পারা যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভূমির অবস্থা দেখিয়া বলিতে পারেন যে, এখানে "আরটেশিয়েন" কূপ হইবার সম্ভাবনা আছে,—এখানে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অনেক সময়ে আবার তাঁহাদিগের ভ্রমও হইতে পারে। এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া লক্ষ্ণৌনগরে সম্প্রতি অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিচেরি নগরে ফরাশিরাও "আরটেশিয়েন" কূপ খনন করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। কোয়েটা অঞ্চলেও ইংরেজেরা এইরূপ কূপ খনন করিতেছিলেন। বোধ হয়, দুই চারি স্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাহা হউক, মেদিনীপুর জেলখানায় এইরূপ একটী কূপ খননের চেষ্টা হইতেছিল। সেই সময় এক জন ইংরেজ-কয়েদী এই জেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। কিছুদিন পরে তাঁহার কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষেরা বেতন দিয়া সাহেবকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। সাহেব চতুর, মেয়াদ-খালাশী, সামান্য লোক নহেন। ভূমির ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেস্থলে "আরটেশিয়েন" কূপ হইতে পারে না। তাই তিনি অন্য প্রকারে অর্থ সংগ্রহের উপায় স্থির করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই কূপ হইতে জল বাহির না হউক, ৮০ হাত খনন করিলে, ইহার ভিতর হইতে অতি উৎকৃষ্ট পাথুরে কয়লা বাহির হইবে।" সত্য সত্যই তাহা হইল। ৮০ হাত নিম্নে যাইতে না যাইতে, কূপ হইতে অতি উত্তম কয়লা বাহির হইতে লাগিল। কূপটী যতই নিম্নে যাইতে লাগিল, ততই পাথুরে কয়লা বাহির হইতে লাগিল। অতি উত্তম কয়লা, অতি উৎকৃষ্ট কয়লা! চারিদিকে এই কয়লার নমুনা প্রেরিত হইল। কয়লার রূপ, কয়লার গুণ দেখিয়া চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, সকলেই সে কয়লার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই কয়লা তুলিবার নিমিত্ত অনেক টাকা খরচ করিয়া বিলাত হইতে ভাল ভাল কল আসিল। যে সাহেব-চোর এই কয়লার হুজুগ তুলিয়াছিলেন, অনেক টাকা

তাহার হস্তগত হইল। তাহার পর? তাহার পর সাহেবটী নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহার কোনও সন্ধান হইল না। তাঁহার ঘর হইতে অনেক কয়লা বহির হইল। এই কয়লা চুপি চুপি তিনি কূপের ভিতর রাখিয়া দিতেন। কূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহাই বাহির হইত। সম্প্রতি সোণার হুজুগেও এইরূপ কাণ্ড হইয়াছিল। ছোট-নাগপুর অঞ্চলে পাথর গুঁড়া করিয়া তাহা হইতে সোণা বাহির করা হইবে, সে নিমিত্ত দুই বৎসর পূর্ব্বে কত কোম্পানি খোলা হইয়াছিল, আর কত শত লোক সেই কোম্পানিতে টাকা দিয়া ফকির হইয়া গেল। কোম্পানির শেয়ার অধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে বলিয়া একজন সাহেব সুবর্ণের রেণু প্রস্তর-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতেন।"

বঙ্গদেশে রাণীগঞ্জের পাথুরে কয়লাই প্রসিদ্ধ। কলিকাতার উত্তর-পশ্চিম ৬০ ক্রোশ দূরে রাণীগঞ্জের কয়লা-ক্ষেত্র। এই কয়লা-ক্ষেত্র, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, প্রায় কুড়ি ক্রোশ দীর্ঘ, প্রস্থে অধিক নয়: কেবল নয় ক্রোশ। রাণীগঞ্জের চারিদিকে এই কয়লা-ক্ষেত্র অবস্থিত বলিয়া, ইহা "রাণীগঞ্জ-ক্ষেত্র" নামে পরিচিত। একদিকে দামোদর, অপর দিকে অজয়, এই দুই নদের মধ্যেই ইহার অধিকাংশ ভাগ অবস্থিত। ইহার ভিতর অনেক গুলি কয়লার খনি আছে, যথা;—এগেরা, হরিষপুর, বাবুসোল, নিমচা, পরিহজারি, শিয়ারসোল, তপসী, ধোসাল, চৌকিডাঙ্গা, জুজানকী, বনবাহাল, শিবপুর, বনালী, মঙ্গলপুর, বাঁশড়া, রঘুনাথ চক, জেড়া, নিজা, শঙ্করপুর ইত্যাদি। শিয়ারশোলের খনি ভিন্ন আর সকল বড় বড় খনি গুলিই সাহেবদের। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরও অনেকগুলি ছোট ছোট খনি আছে।

পূর্ব্বকালে এদেশের লোকে কয়লার ব্যবহার জানিতেন কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পাথুরে কয়লার ব্যবহার তখন আবশ্যক ছিল না। যে সকল স্থানে এখন জনাকীর্ণ গ্রাম ও নগর হইয়াছে, প্রাচীনকালে সে সকল স্থান নিবিড় বনে আবৃত ছিল। কানপুরের নিকট বিঠুরে, যেখানে নানা সাহেব বাস করিতেন, সেই খানে সীতার বনবাস হইয়াছিল। এই স্থানে লব-কুশের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের সময়, যে সমুদায় বড় বড় অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ প্রভৃতি নানা নামধারী বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফলা আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পাপ-চক্ষে আমি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তবে ইংরেজী পড়িয়া মনটী আমার কিছু সন্দিগ্ধ হইয়াছে; টপ করিয়া কোন কথা বিশ্বাস করি না। তাই আমি পুরোহিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"তোমরা এ সমুদয় বাণের ফলা কোথায় পাইলে?" তাহারা উত্তর করিল,—"গঙ্গার ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে।" তবে আমার বিশ্বাস হইল। এক্ষণে যেস্থানে হরডুয়ি জেলা, পূর্ব্বে সেই স্থানে নৈমিষারণ্য ছিল। এক্ষণে যেস্থানে দিল্লি, পূর্ব্বে সেস্থানেও বন ছিল। পঞ্চপাণ্ডব এই বন কাটিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের স্থাপনা করেন। এলাহাবাদও বনে আবৃত ছিল। ব্যাঘ্র ভল্লুক ব্যতীত এই বনে গন্ধর্ব্ব রাক্ষস প্রভৃতি অপরাপর নানা যোনি বাস করিত। এলাহাবাদের বেণীঘাটে অর্জ্জুনের সহিত সেই গন্ধর্ব্বের কত বিবাদ না হইয়াছিল! বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। কনোজ হইতে আসিয়া নানা স্থানে আমাদিগকে বন কাটিয়া তবে বসবাস করিতে হইয়াছে। যেস্থানে এত বন, সেস্থানে কাঠের অভাব কি? সুতরাং কয়লারও কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই জন্য বোধ হয় প্রাচীন ভারতবাসিগণ কয়লা তুলিতে কখন যত্ন করেন নাই।

বোধ হয়, ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পর কয়লার ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জে কয়লা উত্তোলিত হইত। সেই সময় হইতে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবসা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তখন রেল ছিল না; দামোদর দিয়া নৌকা করিয়া কলিকাতায় কয়লা আনীত হইত। এক তো দামোদরে বার মাস জল থাকে না, নৌকা চলে না, তাতে আবার আনিতে অনেক খরচ হইত। এখন যেরূপ আড়াই পয়সা তিন পয়সা মণ মাটির দরে কয়লা বিক্রয় হইতেছে তখন আর তাহা কি করিয়া হইবে কয়লা তখন মহার্ঘ্য ছিল। লোকে তখন সুন্দরী-কাঠ দিয়া ভাত রাঁধিত, আর আম ও বাবলা কাঠ দিয়া পাঁজা পোড়াইত। পাঁজাও তখন কম

হইত। খুব বড় মানুষ ছাড়া, অপর সকলের তখন মেটে বাড়ী ও খোড়ো ঘর ছিল। অল্প-স্বল্প ক্ষমতা হইলেও তখন কেহ কোঠা বাড়ী করিতে সাহস করিত না। কোঠা-বাড়ী করিলে ডাকাত আসিয়া গায়ে মশালের হুঁ্যাকা দিত, না হয়, তলোয়ারে কোপ মারিত। লোকের বাড়ী ডাকাত পড়িলে পাড়া-প্রতিবাসীরা আপনার আপনার ঘরে ডবল করিয়া হুড়কো ও খিল দিত। কেহ বাহির হইলে ডাকাতেরা তাহার সহিত আড়ি করিত, আর তার পরদিন আসিয়া তাহাকে কাটিয়া যাইত। রেল অভাবে সহর অঞ্চলে কয়লা আনিবার সুবিধা ছিল না; নৌকা করিয়া আনিতে অনেক খরচ পড়িত, সুতরাং কয়লার মূল্য অধিক ছিল। এই কারণে কয়লার-খরচও অল্প ছিল। আজকাল যত কয়লা একদিনে উত্তোলিত হয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তত কয়লা এক বৎসরেও উত্তোলিত হইত কি না, তাও সন্দেহ।

যেস্থানে পাথুরে কয়লা, ভূমির সামান্য নিম্নে অবস্থিতি করে, সেস্থানে পুষ্করিণীর মত গর্ত্ত খনন করিয়া কয়লা তুলিতে পারা যায়। এরূপ গর্ত্তকে "পুকুরে খাদ" বলে। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে সেকালে এরূপ অনেক পুকুরে খাদ ছিল। রাণীগঞ্জ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে "উকড়ো" বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। সেকালে এই গ্রামে আমি স্কুল-মাষ্টারী করিতাম। অবসর পাইলেই কয়লার খাদ দেখিতে যাইতাম। কালি-ঝুঁলি মাখিয়া যখন পুনরায় মাটির উপর উঠিতাম, তখন বাউরী-কন্যাদিগের নিকট হইতে কতই না টিট্‌কারী খাইতাম। এই সময় "পুকুরে খাদ" ও অন্যান্য নানারূপ খাদ দেখিয়াছিলাম। কয়লা-খনি হইতে উকড়োর একটী ভদ্রলোক এই সময় কেমন বিপুল ধন-লাভ করিয়াছিলেন! তিনি, একটী বিস্তৃত পতিত ভূমি, যাহাকে "ড্যাঙা" বলে, তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। এই পতিত ভূমি আবাদ করিবেন, এইরূপ তাঁহার মানস ছিল। প্রথম সেই ভূমির উপর এরণ্ডের বীজ ছড়াইয়া দিলেন। রেড়ীর গাছ বড় হইলে রেড়ী বেচিয়া অনেক টাকা পাইবেন, এইরূপ আশা করিলেন। কিন্তু সে কঙ্করময় ভূমিতে রেড়ীর গাছ ভাল হইল না, ফলও হইল না। তাহার পর তিনি আরও কত কি চাষ করিলেন। লাভ কিছুতেই হইল না, কেবল লোকসান হইতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া সে ভূমির উপর তিনি আর কিছু করিলেন না। ভূমি বৃথা পড়িয়া রহিল। এমন সময় সাহেবেরা "বোরিং" করিয়া, অর্থাৎ ভূমিতে ছিদ্র করিয়া দেখিলেন যে, সে ভূমির নীচে পাথুরে কয়লা আছে। আমার ঠিক মনে নাই, বোধ হয়, ৬০,০০০ টাকা সেলামী দিয়া সাহেবেরা সেই ভূমি তাঁহার নিকট হইতে পাট্টা করিয়া লইলেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণ।

(মৃত মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত "বীরাঙ্গনা" কাব্যের "লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখার" পত্রিকার উত্তর-স্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত হইল।)

জান তুমি, হে সুভগে! কিসের কারণে
ভ্রমি এ বিজন বনে, বিভূতি মাখিয়া
কলেবরে—জটাজূটে আবরিয়া শির—
সুবর্ণ অযোধ্যা-পুরী রাজ-ভোগ সহ
কেন বা ত্যজিয়া আমি পশেছি কাননে—
ধরিয়াছি কোন্ ব্রত;—জানিয়া শুনিয়া
বৃথা এ লেখন তুমি লিখিয়াছ মোরে।

রঘুবংশে জন্ম মম, ধর্ম্ম-প্রাণ সদা;—
ভব-সুখে নাহি রতি ধর্ম্ম তেয়াগিয়া
কোন কালে;—নহি ভীত শত্রু-পরাক্রমে;—
দিগ্বিজয়ী রঘুবংশে জনমে যে জন,
স্ববীর্য্য-রক্ষিত সেই ত্রিলোক মাঝারে।

অয়ি মুগ্ধে! কিবা অর্থ দিবে তুমি মোরে?
পিতা মম দশরথ—দেবগণ(ও) যাঁর
আজ্ঞাকারী ছিল সদা—যাঁহারে লইয়া
নিজ সিংহাসনে ইন্দ্র বসিতেন সুখে।
কুবেরের ধন যদি হয় প্রয়োজন,
না চাহিতে ধনেশ্বর দিবে তা আমারে।

শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণ।

রাজ-কুলবালা তুমি—উদাসীন আমি
ব্রহ্মচারী—তব যোগ্য নহি কোন মতে;—
মোর কাছে বৃথা তুমি এ প্রেম-কাহিনী
বর্ণিয়াছ—এ হৃদয়ে মাগিতেছ স্থান;—
উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি মাঝে
জল-কণা কোন্ কালে লভয়ে আশ্রয়?

"স্বর্গজয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র রাবণ,
ভ্রাতা তব;—বিশ্বশ্রবা মুনি-কুলোত্তম
জন্মদাতা;—মহাকুলে জনম তোমার;—
রক্ষঃকুল চিরদিন উজ্জ্বল হইবে
তব রূপ-গুণ-যশঃপ্রভায় ললনে—
সুকবি বিদুষী তুমি;—হিমাদ্রি হইতে
পবিত্র-সলিলা গঙ্গা লভিয়া জনম
সুবিমল পুণ্য-প্রভা প্রকাশেন যথা
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল উজ্জ্বল করিয়া;—
পূর্ণ-শশী দেহ হ'তে কৌমুদী যেমতি
জনমিয়া, স্নিগ্ধ শান্ত বিভায় কেমন
জগৎ উজ্জ্বল করি হাসে যেন সুখে।

কিন্তু বিপরীত ভাব দেখি কেন তব?
রমণী স্বাধীনা কভু নহে ত জীবনে,
ভুলিয়া এ কথা আজি—লাজ ভয় ত্যজি'
পর-পুরুষেরে তুমি কি বিচারি করি'
চাহিতেছ করিবারে আত্ম-সমর্পণ?
ব্রহ্মচারী আমি এবে বিধির বিধানে—
নারী-মুখ দেখি নাই দ্বাদশ বৎসর;
ব্রহ্মচর্য্য অবসানে ফিরি' অযোধ্যায়
দেখিব সে চন্দ্রাননে, যার স্মৃতি ধরি'
হৃদয়ে, যাতনা এত তুচ্ছ করি সদা।
জাননা কি হে কামিনি! প্রণয়ের তেজে
বিকশিত যদি হৃদি, পতিগত-প্রাণা
কামিনীরে কান্ত কভু পারে কি ত্যজিতে?
দিবাকর-কর যবে প্রকাশে আকাশে
বিটপী ছায়ারে কভু ত্যজিতে কি পারে?

চামুণ্ডা আপনি সতী কুল-দেবী তব—
এই শিক্ষা, রাজবালে! শিখেছ কি তুমি
তাঁর কাছে? শুনিয়াছি দেবগুরু না কি
তব ভ্রাতৃ-সভাতলে বসেন সতত।
এই জ্ঞান, হা কপাল! লভেছ কি তুমি
তাঁর সহ আলাপনে? রূপ গুণ কিছু
নাহি মম—তবু যদি মুগ্ধ তুমি, তাহা
দূর কর ত্বরা করি উপাড়ি' সবলে
মোহভাব—উপাড়য়ে কৃষক যেমতি
শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র হ'তে বন-গুল্ম যত।

রক্ষঃকুলে জন্ম তব—রঘুকুলে মম,—
ক্ষত্র আমি—কোন্ শাস্ত্র, কোন্ ধর্ম্ম-মতে
তব সহ, বল শুভে, উদ্বাহ-বন্ধনে
হইব মিলিত?—বশী রঘুবংশীয়েরা
পরস্ত্রী-বিমুখ-বৃত্তি জানিও সতত।

কিন্তু বৃথা এই কথা—সাগর-হৃদয়ে
ঊর্ম্মিমালা-লীলা যথা বিরাজে ললনে।
অবিরত—অবিরত এ মোর হৃদয়ে
ঊর্ম্মিলা-প্রণয়-স্মৃতি বিরাজিত সুখে।
স্বপনেও নাহি হেরি অন্য-নারী-মুখ
এ জীবনে কোন কালে;—বসুধা ব্যতীত
অনন্ত কাহারে বল ধরেন মস্তকে?
কৌমুদীর অনুদয়ে, হেন সাধ্য কার
কে বল আকাশে আর পারে হাসাইতে?

অনাহারে অনিদ্রায় স্ত্রী-মুখ না দেখি'
কঠোর এ ব্রত আমি পালিতেছি এবে
ধর্ম্ম হেতু—কত সুখে উছলিত হিয়া
কে জানিবে! কে বুঝিবে হৃদয়ের ভাব
লক্ষ্মণের?—অগ্রজের পদসেবা করি'
কি বিমল সুখ-সুধা লভি যে সতত
কি জানিবে? রাজ-ভোগে নাহি এত সুখ।
কি সুখ রমণী-প্রেমে? দেহ-সুখ সদা
তুচ্ছ করি' দূরে রাখি;—ধর্ম্ম-সুখ(ই) সুখ।

দেখ ভাবি, হে ভাবিনি! এত যে বর্ণনা
করিয়াছ—কত সুখ পার প্রদানিতে
লিখেছ আমারে তুমি—যৌবনের তব,
কুসুম দেহের কিবা, এতই বর্ণন—
সব বৃথা; অন্ধজন-সম্মুখে যেমতি
কুসুম-কানন শোভা;—প্রেম-কথা তরে
এ হৃদয়ে নাহি স্থান অন্য-নারী-মুখে।
কৌমুদী পরমসুখে সুপ্রবেশ লভে
কুমুদ-হৃদয়ে সদা—কিন্তু পঙ্কজেরে
ফুটাইতে নারে কভু;—রবিবিভা পুনঃ
মহাসুখে পড়ে গিয়া পদ্মের হৃদয়ে,
কুমুদ-হৃদয়ে কভু নাহি স্থান তাঁর।

বৃথা তুমি ভ্রম আর এ বিজন বনে
তেয়াগিয়া রাজ-সুখ!—স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী—
তব যোগ্য। যেই সুখ চাহ মোর কাছে,
কোন কালে পারিব না দিতে তা তোমারে।

বৃথা আশা তব আজি কর বিসর্জ্জন—
বিস্মৃতির সুগম্ভীর প্রশান্ত সলিলে।
কোন্ হেতু এ কাননে নিষ্ফল প্রবাস?
কেন নিজ অন্তরের বাড়াও যাতনা?
হৃদয়ের তৃষ্ণা কেন কর উত্তেজিত?
প্রাণের পিপাসা কেন না কর দমন?
যাও ফিরি—নিশাশেষে ভ্রমরীর মত
হিমসিক্ত নিমীলিত কুমুদ হইতে;
বৃথা আশা আজি তব সুধা লভিবারে।

কেমনে হে কুলবালে! কহ মোরে আজি
ন্যায়যুক্ত পন্থা তুমি করি' পরিহার
উচ্ছৃঙ্খলা নদী যথা বরিষার কালে
ভাঙ্গি' কূল—স্বচ্ছজল পঙ্কিল করিয়া—
উপাড়িয়া তারস্থিত মহীরুহ-রাজি,—
ধায় বেগে—কুলশীলে দিয়া জলাঞ্জলি,
পবিত্র হৃদয় তব করি' কলঙ্কিত,
গভীর পাপের এই তীব্র কামনায়,—
জটিল কূলের মান করি' উৎপাটিত,
ধাইতেছ মোর পানে?—চঞ্চলতা এবে
কর ত্যাগ—ধর্ম্ম পানে চাহি ভক্তি-ভাবে।
বেলা যথা সাগরের তরঙ্গের খেলা
দমে সদা, শান্তভাবে তুমিও তেমতি
অধীর চিত্তের বৃত্তি করহ দমন।

ধর্ম্মভাবে চিত্ত তব কর উচ্ছলিত;—
দূর কর যৌবনের চপলতা এবে
হৃদয়ের দৃঢ়তায়,—জন্মেছ যে কুলে,
কলঙ্কের কালি কেন ঢালিবে তাহাতে?—
সুপবিত্র সেই কুল,—হৃদয়ের বেগ
দম নিজ শান্তিগুণে, না হয়ে অধীর;—
মত্ত মাতঙ্গেরে যথা দময়ে কৌশলে
চালক,—নদীর বেগ রোধে লোক যথা
নির্ম্মাইয়া দৃঢ় রোধঃ—কি আর কহিব?

দেখেছ আমারে কভু হও বিস্মরণ—
যাও ফিরি' লঙ্কাধামে—ভুল এ কাহিনী।
কোমল হৃদয় তব—নবীন যৌবনে
দেখিয়াছ যে স্বপন ভুলিবে সত্বরে।
তরল হৃদয়ে তব যে মূর্ত্তি অঙ্কিত
হয়েছে পলকে এবে, পলকে মিলাবে;—
নিমেষে বুদ্বুদ যথা মিশে যায় জলে—
জলে লেখা অঙ্ক যথা মুহূর্ত্তে মিলায়—
তরণী-গমন-চিহ্ন নদী-বক্ষপরে;—
আকাশ নিমেষ মধ্যে ফেলে আবরিয়া—
বিহঙ্গম পক্ষক্ষুণ্ণ পথ-চিহ্ন যথা!
যাও ফিরি ভ্রাতৃগৃহে—স্বর্ণ-লঙ্কাধামে—
শান্তি সহ কর বাস চিরদিন তথা—
সুখে থাক—ধর্ম্মে থাক—আশীর্ব্বাদ করি।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

দুর্গোৎসব।

আশ্বিন মাস, বর্ষের প্রথম। বৎসর-পরিবর্ত্তনের প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রথম না হইলেও প্রাকৃতিক প্রথম।

বর্ষা বৎসরের বার্দ্ধক্য। স্ফূর্ত্তি নাই, উদ্যম নাই, 'তৎপরতা' নাই;—সদাই আলস্য, সদাই মেজমেজে-ভাব। এ জীবনে কেহই বার্দ্ধক্য-অতিক্রমে সমর্থ হয় নাই, বৎসরও হইলেন না; পুরাতন বৃদ্ধ-বৎসর বার্দ্ধক্যের চরমে উপনীত হইয়া কালক্রোড়ে শয়ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নূতন বৎসরের উৎপত্তি। শরৎ এই নূতন বৎসরের শৈশব। শৈশবের প্রফুল্ল কোমল-ভাব, চির-সদানন্দময় ভাব শরতে পরিস্ফুট। আশ্বিন মাস আবার এই শরৎ-শৈশবের নবীনাবস্থা। তাই বলি,—আশ্বিন মাস, বর্ষের প্রথম।

আশ্বিনের প্রথম শুক্লপক্ষই দেবীপক্ষ। এ সময়ে মহাশক্তির আরাধনা, দশভুজার উপাসনা বস্তুতই বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। এ সময়ে সদানন্দময়ীর উদ্দেশে আনন্দ-উৎসব, জননীর উদ্দেশে মহোৎসব আমাদের ত নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

এই বৎসরের-প্রথম আনন্দ-উৎসবে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে, উদ্যম-উৎসাহে হৃদয় মার্জ্জিত করা—মন প্রসন্ন করা সকলেরই বিশেষ বিধেয়।

সকালে মন খুঁত খুঁত করিলে, অজ্ঞাতভাবে মনের অপ্রসন্নতা উপস্থিত হইলে, লক্ষ্য করিয়া দেখিও, সে সমস্ত দিনটাই কেমন একরূপ কষ্টে কাটে। সকালে মন প্রফুল্ল থাকিলে, মন প্রসন্ন থাকিলে, দিনও ভাল যায়।

মনের এই প্রকার গতির সঙ্গে বাহ্যভাবের যে কি সম্বন্ধ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু ফলে এইরূপই দেখা যায়।

মা'র সতত চিন্তা,—সন্তানের মঙ্গল কিসে হয়, সন্তান কিসে কষ্ট না পায়। তাই বুঝি মা জগদম্বা সংবৎসরের প্রাতঃকাল আশ্বিন মাসে,—সন্তান-সন্ততির উৎসব-আনন্দ, উৎসাহ-উদ্যোগ, ধর্ম্ম-মঙ্গলের জন্য—এ ধরাধামে স্বীয় মহাশক্তি মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। তাই জগজ্জননী, এই বর্ষ-প্রভাত-মহোৎসবে, আপামর-সাধারণ সকলেরই অধিকার দিয়াছেন। চণ্ডাল-কিরাত-শবরাদি নীচতম জাতিও এ উৎসবাধিকারে বঞ্চিত হয় নাই। প্রবৃত্তিভেদে উৎসবের প্রকার-ভেদ আছে বটে, কিন্তু উৎসব সকলেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সংবৎসরের সুপ্রসন্ন প্রাতঃকাল, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, উৎসবে-আনন্দে কাটিলে, শক্তির উপাসনা করিলে, সংবৎসর ভাল যাইবে,—মায়ের মনে বুঝি এইভাব।

সেই প্রভাত-মহোৎসবের মঙ্গলময় বাসর সম্মুখে উপস্থিত। মহাশক্তি-আরাধনার সেই শুভমুহূর্ত্ত সমীপে সমাগত। এস, এস, হিন্দু-সন্তানগণ! এস, এস, মায়ের অনুপযুক্ত সন্তানগণ! কোটি কোটি কণ্ঠে জননীর পবিত্রনাম উচ্চারণ করিয়া, জননী-মহোৎসবের—বর্ষ-প্রভাত-মহোৎসবের—শ্রীশ্রী ৺দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করি। এস, এস, বঙ্গসন্তানগণ, চির-পরিচিত নির্জ্জীবতা ভুলিয়া এ সময় একবার মহাশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হই; এস, এস, ভ্রাতৃগণ! বন্ধুগণ! সকলে মিলিয়া চির-নিরানন্দের অধিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া সদানন্দময়ীর আনন্দ-উৎসবে মগ্ন হই।

এমন ভারতব্যাপক ধর্ম্মোৎসব আর দ্বিতীয় নাই। পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতানা, বঙ্গ, মহারাষ্ট্র সকল প্রদেশেই এ সময় মায়ের আরাধনা,—মহাশক্তির উপাসনা হইয়া থাকে; সকল দেশেই এই সময় বীরোৎসব—শক্তি-আরাধনার অনুরূপ উৎসব উজ্জ্বলভাবে প্রচলিত। পঞ্জাব উত্তর-পশ্চিমের বীরাভিনয়—রামলীলা, মহারাষ্ট্র রাজপুতানার বীরোৎসব—অস্ত্রপূজা এবং নানা দেশে নবরাত্রিব্রত * ভক্তিভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

* দেবীপক্ষের প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত নয় দিন প্রত্যহ উপবাস, বা ফল ভোজন করিয়া জগদম্বার উপাসনাই নবরাত্রি ব্রত।

আর আমরা নিজ্জীব বাঙ্গালী-জাতি—বীরত্ব-বর্জ্জিত বাঙ্গালী-জাতি, অস্ত্র-পূজায় অনধিকারী, রামলীলার বিরাট অভিনয়ে অনভ্যস্ত। আমাদের নিজের পরাক্রম নাই, বীর্য্য নাই, ঐশ্বর্য্য নাই,—আমাদের শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, গৌরব নাই,—তাই আমরা, মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া তাঁহার বীর্য্য-বিক্রম অনুধ্যান করিয়া, নিজের নির্জ্জীবতা দূর করিতে যত্নশীল হই। মায়ের অতুলনীয় শক্তি-সামর্থ্যের শক্তিশালী চিত্র প্রত্যক্ষে রাখিয়া আত্মজড়তা-অপসারণে অগ্রসর হই। মায়ের ঐশ্বর্য্য-গৌরবের গাঢ়-অঙ্কনে উৎসবে মত্ত হই। আমাদের নিজের কিছু নাই, তাই আমরা মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাকে আহ্বান করিয়া মায়ের শক্তি-সম্পদ্ প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই। "আমরা এই মায়ের সন্তান, তবে আমাদের নাই কি?" মনে করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হই। মা ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আমাদের গর্ব্ব করিবার জিনিস মা; আমাদের গৌরবের সামগ্রী মা; আমাদের উৎসবের মূল মা; আমাদের সজীবতার হেতু মা।

আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র নাই, বাহু বলহীন, হৃদয় সঙ্কীর্ণ, দৃষ্টি সঙ্কুচিত,—আমরা আদর্শহীন; আমরা 'দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী', প্রফুল্ল-প্রসন্ন-হৃদয়া, স্মেরমুখী, ত্রিনয়না, জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণে, জননীর প্রতিমা-অবলোকনে পরিতৃপ্ত হই। আদর্শ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, মায়ের গুণে উত্তরাধিকারী হইবার জন্য ক্ষণেকের তরেও অন্ততঃ আকাঙ্ক্ষা হয়। অথবা হইতে পারে।

আমাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, দ্রব্য-সামগ্রী নাই; আমরা 'হা অন্ন যো অন্ন' করিতেছি; আমরা দীনহীন, দরিদ্রাপেক্ষা দরিদ্রতম; কিন্তু মায়ের প্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মায়ের পার্শ্বে ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মীর সমাগম দেখিয়া আশ্বস্ত হই।

আমাদের বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, পরিণাম-দর্শিতা নাই; আমাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ঐকমত্য নাই; দুই চারিটা পুথির গৎ বা দুই দশটা ইংরেজি বোল মুখস্থ করিয়া বাহবা লইলেও আমরা মূর্খ; কিন্তু মায়ের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর সমাবেশ দেখিয়া পুলকিত হই।

আমাদের কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা নাই;—আমাদের সকল কার্য্যই অসিদ্ধ, সকল কামনাই অপূর্ণ,—আমাদের সর্ব্বত্রই বিঘ্ন; কিন্তু মায়ের সমীপে বিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা গণপতির অবস্থিতি বিলোকনে আশান্বিত হই।

আমরা শক্তিশূন্য অক্ষম—চিরদিনের অক্ষম বাঙ্গালী-জাতি; আমরা মায়ের নিকটে শক্তিধরের বীর্য্য-বৃংহিত মূর্ত্তি দেখিয়া গৌরবামোদে আমোদিত হই।

আমরা সিংহ-সন্ত্রাসিত, দৈত্য-নির্জ্জিত, দুর্ব্বলাদপি দুর্ব্বল নিকৃষ্ট মানব; আমরা কেশরি-উপাসিত, দৈত্যদলনকারী জননী-চরণ দর্শন করিয়া উৎসাহিত হই। মায়ের প্রতিমা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

সেই মাতৃ-অধিষ্ঠিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শনোৎসবের দিন সম্মুখে সমাগত। সেই আশা-আশ্বাস, আনন্দ-উৎসাহের দিন অদূরে অবস্থিত। সেই জননী-আরাধনার দিন অগ্রে বিরাজিত। সেই মহাশক্তি উৎসবের মঙ্গলময় মুহূর্ত্ত,—উজ্জ্বলতর মুহূর্ত্ত,—বাঙ্গালী-জীবনের আনন্দময় মুহূর্ত্ত, ঐ দেখা যাইতেছে!

এস, এস, ভাই। একবার জয়ধ্বনি করি; এস এস ভাই! একবার মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া আগমনী-সঙ্গীত গাই:

আয় মা আনন্দময়ী চির-নিরানন্দ ঘরে।
শ্মশান-বাসিনী তুই মা
তাইতে ডাকি সাহস ক'রে।
ভারত শ্মশান ভূমি পরিপূর্ণ অন্ধকারে।
আঁধার-প্রিয়ে, উজলরূপে
আয় জননি আলো ক'রে।
অক্ষম সন্তান মোরা মা বিনে আর জানিনে,
বছর পরে মায়ের আসা,
কত আশা মোদের মনে।
মা আমাদের এলেন ব'লে,
আর আমাদের ভাবনা কিরে।
"জয় জননি! জয় জননি!"
গাওরে আজি ঘরে ঘরে।

৺কাশীধাম।

এখন কাশী বলিলেই বর্ত্তমান বারাণসী বা বনারস নামক নগরকে বুঝায়, কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নগর বৃহদায়তন ছিল, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী অবধি এই কাশী একটী বিস্তীর্ণ জনপদ এবং বারাণসী ইহার প্রধান নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

বিষ্ণু প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণে বর্ত্তমান কাশী "কাশীপুরী" ও "বারাণসী" নামে অভিহিত হইয়াছে।

(বিষ্ণুপুঃ ৫। ৩৪। ২৬,৪১)।

পুরাণাদিতে কাশীপুরীর এইরূপ সীমা ও পরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

মৎস্যপুরাণে (১৮৩। ৬১—৬৮)—

"দ্বিযোজনন্তু তৎ ক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমতঃ স্মৃতম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং তৎ ক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরম্॥
বরণা হি নদী যাবদ্ যাবচ্ছুষ্কনদী তু বৈ।
ভীষ্মচণ্ডিকমারভ্য পর্ব্বতেশ্বরমন্তিকে॥"

সেই ক্ষেত্র পূর্ব্বপশ্চিমে দুইযোজন আয়ত এবং উত্তরদক্ষিণে অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত। ইহা বরণা নদী হইতে শুষ্ক নদী পর্য্যন্ত এবং ভীষ্ম চণ্ডিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত অবস্থিত।

আবার তৎপরে (১৮৪। ৩৯—৪০)—

"দ্বিযোজনমথোর্দ্ধঞ্চ তৎ ক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোত্তরতঃ স্মৃতম্।
বারাণসী নদী যাবদ্ যাবচ্ছুষ্কনদী তু বৈ॥"

শিবপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায় (৪৫। ১১১)—

"ক্ষেত্রাগতমলঙ্কৃত্য জাহ্নব্যা সহ সঙ্গতা।
বরণা নাম তত্রৈব গঙ্গাসিশ্চ সরিদ্বরা॥"

বরণা ও গঙ্গাসি (অসি) নামক নদীদ্বয় এই ক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়া জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

"ততশ্চ তেজসঃ সারং পঞ্চক্রোশাত্মকং শুভম্॥"
(শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯। ৮)

বামনপুরাণে (৩। ২৪—২৮)—

"যোঽসৌ ব্রহ্মাণ্ডকে পুণ্যে মদংশপ্রভবোঽব্যয়ঃ।
প্রয়াগে বসতে নিত্যং যোগশায়ীতি বিশ্রুতঃ॥
চরণাদ্দক্ষিণাৎ তস্য বিনির্গতা সরিদ্বরা।
বিশ্রুতা বরণেত্যেব সর্ব্বপাপহরা শুভা॥
সব্যাদন্যা দ্বিতীয়া চ অসিরিত্যেব বিশ্রুতা।
তে উভে তু সরিচ্ছ্রেষ্ঠে লোকপূজ্যে বভূবতুঃ॥
তয়োর্মধ্যে তু যো দেশস্তৎ ক্ষেত্রং যোগশায়িনঃ।
ত্রৈলোক্যপ্রবরং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্॥
ন তাদৃশং হি গগনে ন ভূম্যাং ন রসাতলে।
তত্রাস্তি নগরী পুণ্যা খ্যাতা বারাণসী শুভা॥"

এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রয়াগে আমার (বিষ্ণুর) অংশজাত যোগশায়ী নামে বিখ্যাত যে অব্যয় পুরুষ নিরন্তর বাস করেন, তাঁহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী শুভঙ্করী বরণা এবং বাম চরণ হইতে অসি নামে বিখ্যাত দ্বিতীয় নদী নিঃসৃত হইয়াছে। এই উভয় নদীই লোকমধ্যে পূজনীয়া। এই উভয়ের মধ্যস্থলে যোগশায়ী মহাদেবের সর্ব্বপাপনাশন ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ যে ক্ষেত্র আছে, সুবিখ্যাতা মোক্ষদায়িনী পুণ্যময়ী বারাণসী নগরী সেই স্থানেই বিরাজিত। এমন স্থান আকাশ, পাতাল বা ভূমণ্ডল মধ্যে আর কোথাও নাই।

কাশীখণ্ডে (৩০। ৬৯—৭০)—

"অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে॥
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা॥"

সত্যযুগে যখন এই কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য অসি ও বরণা নদী উৎপন্ন হইয়াছে, হে মুনে! সেই দিন হইতেই এই কাশিকা,—বরণা ও অসিনদীর সঙ্গম লাভ করিয়া 'বারাণসী' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিদের মতে "বরণা ও অসি মধ্যে থাকাতেই কাশীপুরী বারাণসী নামে প্রথিত হইয়াছে, এই মত নিতান্ত আধুনিক।" কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা নিতান্ত আধুনিক নহে। পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিয়া উপনিষদের কথা ধরিলেও উক্ত পৌরাণিক-মত সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যথা—

জাবালোপনিষদে (১—২)

"অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে, যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি; তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত; [illegible] ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য!......সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি"

এই স্থানে জন্তুগণের মরণকালে রুদ্র "তারক ব্রহ্ম" নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেহেতু তদ্দ্বারা জীবগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অতএব এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করা একান্তই কর্ত্তব্য। অবিমুক্ত কখন পরিত্যাগ করিবে না। হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমি যাহা বলিলাম, ইহা সত্য বলিয়া জানিও। সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত? বরণা ও নাশী এই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বরণা কাহাকে কহে, এবং নাশীই বা কাহাকে বলে? সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষরাশি নিবারণ করে বলিয়া ইহার নাম "বরণা" এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নাশ করে বলিয়া ইহার "নাশী" এই নাম হইয়াছে।

জাবালদীপিকায় নারায়ণ লিখিয়াছেন,—

"উত্তরং বরণায়াং নাশ্যাঞ্চেতি। যথা স্কান্দে—
'অসী-বরণয়োর্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরম্।
অমরা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ।'
বরণা-নাশীশব্দয়োঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তং পৃচ্ছতি।"

বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে শাক্যসিংহ এই বারাণসী-প্রদেশের অন্তর্গত ঋষিপত্তনে মৃগদাব নামক স্থানে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (ললিতবিস্তর ২৫ অঃ)। এমন কি, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন বারাণসীস্থ বৌদ্ধতীর্থদর্শনে আগমন করেন, তখন বারাণসী রাজ্য প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০ লি) এবং বারাণসী নগরী দেড় ক্রোশ (১৮।১৯ লি) দীর্ঘ ও প্রায় অর্দ্ধক্রোশ (৫।৬ লি) বিস্তৃত ছিল।

পুরাতত্ত্ব।—বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে আয়ুবংশীয় সুহোত্রপুত্র কাশ প্রথম রাজা, তৎপুত্র কাশিরাজ বা কাশ্য। সম্ভবতঃ এই কাশিরাজের নামানুসারে তদীয় রাজ্য 'কাশি' বা 'কাশী' নামে বিখ্যাত হয়। কাশিরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দীর্ঘতমা কাশীরাজ্য লাভ

করেন। দীর্ঘতমার ধন্ব নামে এক পুত্র জন্মে, তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়া ধন্বন্তরিকে পুত্র রূপ লাভ করেন। ক্ষত্রিয়রাজ ধন্বন্তরি, মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদকে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বৈদ্যনামে বিখ্যাত হন। কাশিরাজ ধন্বন্তরির ঔরসে কেতুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে রাজা কেতুমান্ হর্য্যশ্ব নামে অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ হর্য্যশ্বের রাজত্বকালে বারাণসী নগরী স্থাপিত হয়। এই সময়ে যদুবংশীয় হৈহয়-পুত্রগণের সহিত কাশিরাজের বিবাদের সূত্রপাত হয়। অবশেষে হৈহয়-পুত্রেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া হর্য্যশ্বের প্রাণ সংহার করেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে থাকেন। হৈহয়গণ তখনও ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা পুনরায় আসিয়া সুদেবকে সংহার করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুদেবের পুত্র মহাত্মা দিবোদাস পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় কাশীর রাজধানী বারাণসী, গঙ্গার উত্তর ও গোমতীর দক্ষিণকূলে সংস্থাপিত ছিল। দিবোদাস শত্রুভয়ে রাজধানী সুদৃঢ় করিলেন। (মহাভারত, অনুশাসন, ৩০ অঃ।)

হরিবংশ, পদ্ম, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—দিবোদাসের পুর্ব্বে হৈহয়বংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসী অধিকার করিয়াছিলেন; পরে দিবোদাস তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বহু কষ্টে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এই সময়ে নিকুম্ভের শাপে ও ক্ষেমক রাক্ষসের উৎপাতে মহাসমৃদ্ধিশালিনী বারাণসী হতশ্রী ও জনশূন্য হইলে দিবোদাস গোমতীতীরে এক নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। হৈহয়বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্যের দুর্দ্দম নামে এক পুত্র ছিল, রাজা দিবোদাস বালক ভাবিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে সেই বালক হৈহয়বংশের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, তিনি দিবোদাসকে পরাজয় করিয়া বারাণসী অধিকার করেন।

কাশীর পালবংশীয় রাজগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁদিগের মধ্যে গৌড়াধিপ মহীপালকেই কাশীর প্রথম পালবংশীয় রাজা বলিয়া অনুমান হয়, বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথে মহীপালরাজের ১০১৩ বিক্রম-সংবতে (১০২৬ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মহীপালের পর তৎপুত্র স্থিরপাল ও বসন্তপালের (১০৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজ্যকালেও কাশী বৌদ্ধ-পালদিগের অধিকারে ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ জয়চ্চন্দ্র পরাভূত হইলে শাহাবদ্দীন্ ঘোরি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন, তিনি প্রায় সহস্রাধিক হিন্দুমন্দির চূর্ণ করিয়াছিলেন।

অকবর বাদশাহের সময় মির্জা চীন কলিজ বারাণসীর ফৌজদার ছিলেন। এই সময় বারাণসী আলাহাবাদ সুবার অধীন ছিল। অরঙ্গজিব বারাণসী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার 'মুহম্মদাবাদ' নাম রাখেন, তৎপরবর্ত্তী মুসলমান-গ্রন্থে ও অযোধ্যার নবাবদিগের সনন্দে বারাণসী 'মুহম্মদাবাদ' নামেই চলিয়া আসিয়াছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী অযোধ্যা-সুবেদারীর অধীন হইলেও, একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া অভিহিত ছিল।

দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহ হিন্দুর পবিত্র স্থান বারাণসী হিন্দুরাজের অধীনে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাণসীর পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গঙ্গাপুর নামক গ্রামের জমীদার মনসারামকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। তৎপুত্র বলবন্তসিংহ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পুণ্যভূমি বারাণসীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আহ্মদশাহ সফদরজঙ্গকে উজীরপদ এবং অযোধ্যাপ্রদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে বারাণসী, অযোধ্যা-সুবার অন্তর্গত হয়। বলবন্তের উপর সফদরজঙ্গের চক্ষু পড়িল, তিনি বলবন্তকে অযোধ্যার অধীনে একজন সামান্য জমীদাররূপে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময় বলবন্তসিংহ আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সাহস ও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুজাউদ্দৌলা সুবেদার হইলেন। তিনিও পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া বলবন্তের পদমর্য্যাদা খর্ব্ব করিতে বিশেষ চেষ্টা পান। এই সময় বলবন্ত, অযোধ্যার নবাবের

করালকবল হইতে রাজ্য ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য রামনগরে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। ইনিই কাশীর প্রতাপশালী রাজা ; ইনিই স্বতেজে আপন স্বাধীনতা রক্ষা করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ২২ আগষ্ট বলবন্তসিংহের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার এক ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভজাত চেৎসিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর, অযোধ্যার নবাব চেৎসিংহকে এক সনন্দ প্রদান করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখ হইতে বারাণসী বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইল, তদনুসারে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল, চেৎসিংহ গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনরায় এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে ইউরোপে ফরাসীবিপ্লব ঘটে, সনন্দানুসারে যুদ্ধব্যয়-নির্ব্বাহার্থ গবর্ণরজেনরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস চেৎসিংহের নিকট তাঁহার দেয় বার্ষিক কর ব্যতীত ৫ লক্ষ টাকা অধিক চাহিয়া পাঠান। প্রথমে চেৎসিংহ ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বর্ষে ঐরূপ ৫ লক্ষ টাকা দিবার সময় হইলে চেৎসিংহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু সময় প্রার্থনা করেন, তাহাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। চেৎসিংহ নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ারে তাঁহার মৃত্যু হয়। চেৎসিংহ পলায়ন করিলে, বলবন্তসিংহের কন্যা হেষ্টিংস্‌কে জানাইয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বলবন্তসিংহের এক মাত্র কন্যা এবং তাঁহার পুত্র (বলবন্তের দৌহিত্র) মহীপনারায়ণই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। হেষ্টিংস্ মহীপনারায়ণকেই বারাণসীর প্রকৃত রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর মহীপনারায়ণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বারাণসীর জমিদারী-সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা মহীপনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজ উদিতনারায়ণ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উদিতনারায়ণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ রাজা হন। ইনি একজন কবি ও শিল্পী ছিলেন। ইহাঁর স্বহস্ত-নির্ম্মিত বিবিধ হস্তিদন্তের কারুকার্য্য রামনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে। গত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইনি পরলোক গমন করেন। এক্ষণে তৎপুত্র রাজা প্রভুনারায়ণ সিংহ বারাণসীর জমিদারী-স্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

তীর্থবিবরণ।—কাশী বা বারাণসী নগরী আমাদের পরম পবিত্র তীর্থ। মহাভারতে লিখিত আছে,—

"বারাণসীতে গিয়া বৃষভবাহন মহাদেবকে অর্চ্চনা ও কপিলাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তৎপরে অবিমুক্ত-তীর্থে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ দূর হয় এবং তথায় প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হয়।" (উদ্যোগ পর্ব্ব ৮৪ অঃ)

হরিবংশে মহাদেবের বারাণসীতে আগমনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"রাজর্ষি দিবোদাস মহাসমৃদ্ধিশালিনী বারাণসীনগরী পাইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবাদিদেব দারপরিগ্রহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন। মহাদেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার পারিষদগণ নানা উপায়ে ভগবতী পার্ব্বতীর প্রীতিসাধন করিতে লাগিল। দেবী পার্ব্বতী বড়ই সুখী হইলেন, কিন্তু তাঁহার জননী মেনকার তাহা ভাল লাগিল না ; তিনি অনেক সময়ে উভয়ের নিন্দা করিতেন, কহিতেন—'পার্ব্বতি! তোমার স্বামী পারিষদগণের সহিত বিচার-আচারভ্রষ্ট, দরিদ্র, তাঁহার শীলতা কিছুমাত্র নাই।' একদিন স্বামীর নিন্দাবাদ শুনিয়া দেবী পার্ব্বতী, স্ত্রীস্বভাব বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন মাতার নিকট মনের ভাব গোপন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে মহাদেবের নিকট আসিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন, 'দেব! আমি আর এখানে বাস করিব না। আমাকে নিজ ভবনে লইয়া চলুন।' তখন মহাদেব একবার সকল লোক নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে পৃথিবীতেই বাসস্থান নির্ণয় করিয়া সিদ্ধক্ষেত্র বারাণসী-নগরী মনোনীত করিলেন। কিন্তু ঐ নগরী দিবোদাসের অধিকৃত মনে করিয়া, স্বীয় পারিষদ নিকুম্ভকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি বারাণসী-পুরীতে গমন করিয়া কৌশলক্রমে উহা জনশূন্য কর, কিন্তু সাবধান, মহারাজ দিবোদাস অত্যন্ত পরাক্রান্ত।'

"নিকুম্ভ বারাণসী-নগরে গিয়া কণ্ডুক নামক একজন নাপিতকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন,

'দেখ! তুমি এই নগরীর প্রান্তভাগে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন কর, আমি তোমার ভাল করিব।' রাত্রিযোগে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া পরদিনই মহারাজ দিবোদাসকে জানাইয়া কণ্ডুক নগরদ্বারে নিকুম্ভের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিল এবং এই বিষয় নগরের চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিল। মহাসমারোহে গণপতি নিকুম্ভের পূজা হইতে লাগিল। গণেশ্বর,—পুত্রার্থীকে পুত্র, ধনার্থীকে ধন, আয়ুঃপ্রার্থীকে আয়ু,এমন কি, যে যাহা চাহিত,তাহাকে তাহাই বর দিতে লাগিলেন। এক সময়ে দিবোদাসের আদেশে মহিষী সুযশা বিবিধ উপচারে গণপতির পূজা করিলেন এবং পূজান্তে পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ আসিয়া যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুত্র কামনা করিলেও, নিকুম্ভ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বরপ্রদান করিলেন না। দীর্ঘকাল এইরূপে গত হইল। নিকুম্ভের আচরণে রাজা দিবোদাস ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি কহিতে লাগিলেন, 'এই ভূতটা আমারই নগরের সিংহদ্বারে অবস্থিতি করে, নাগরিকদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া শত শত বর দিতেছে, কিন্তু কিজন্য আমাকে বর প্রদান করিতেছে না? আমি ব্যগ্র হইয়া মহিষী দ্বারা পুত্র প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কৃতঘ্ন কিছুতেই আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিল না। অতএব ইহার আর পূজা বিধেয় নহে, বিশেষতঃ আমার অধিকারে আর কিছুতেই পূজা পাইবে না। আমি দুরাত্মাকে স্থানভ্রষ্ট করিব।' এইরূপ স্থির করিয়া রাজা দিবোদাস সেই গণপতির স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। নিকুম্ভ আয়তন ভগ্ন হইল দেখিয়া রাজাকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে, 'তুমি যখন নিরপরাধে আমার স্থান নষ্ট করিলে, তখন তোমার এই পুরী নিশ্চয় এখনি জনশূন্য হইবে। নিকুম্ভ এইরূপ অভিশাপ দিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এদিকে নিকুম্ভের অভিশাপে বারাণসী জনশূন্য হইল। দিবোদাস গোমতী-তীরে রাজধানী নির্ম্মাণ করাইলেন। তখন মহাদেব সেই শূন্য বারাণসী-নগরীতে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর সহিত পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই স্থান দেবীর প্রীতিকর হইল না। অবশেষে তিনি মহাদেবকে কহিলেন, 'এই (জনশূন্য) পুরীতে আমি বাস করিতে পারিতেছি না।' তখন মহেশ্বর কহিলেন, 'এ গৃহ আমি পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার অবিমুক্ত-গৃহ। আমি আর কোথাও যাইব না। তোমার ইচ্ছা থাকে, যাও।' ত্রিপুরান্তক মহাদেব স্বয়ং বারাণসীকে অবিমুক্ত বলিয়াছিলেন, সেই জন্য উহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বারাণসী এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অবিমুক্ত নামে কীর্ত্তিত হয়। এই স্থানে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত মহেশ্বর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনযুগে দেবীর সহিত পরমসুখে বাস করেন। কলিযুগ উপস্থিত হইলে ঐ পুরী অন্তর্হিত হইবে বটে, কিন্তু মহাদেব উহা পরিত্যাগ করিবেন না।"

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—"দেবদেব মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য প্রতিপালনের জন্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া মন্দরপর্ব্বতে আসিয়া বাস করেন। মহাদেব গমন করিলে সমস্ত দেবগণও মন্দরপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব এখানে আসিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে কাশী-বিরহ প্রবল হইল। এই সময় বারাণসী মহারাজ দিবোদাসের রাজধানী, তপস্যাবলে সেই রাজা সমস্ত দেবগণেরই রূপ-ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য দেবগণ তাঁহার স্তব ও ভজনা করিতেন। অসুরগণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করিত। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক নৃপতি সে সময়ে কেহ ছিলেন না। এই দিবোদাসের অপর নাম রিপুঞ্জয়।

মন্দরপর্ব্বতে মহাদেবের কাশী-বিরহ উপস্থিত হইলে, তিনি দেখিলেন, রাজা দিবোদাসকে কোন প্রকারে তাড়াইতে না পারিলে তাঁহার বারাণসীলাভ হইতেছে না। প্রথমে তিনি ৬৪ যোগিনীকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন, যোগিনীগণ কাশীতে আসিয়া পরমধার্ম্মিক দিবোদাসকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না। তাঁহারা মণিকর্ণিকাকে সম্মুখে রাখিয়া কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন অতীত হইল, মন্দরস্থ মহাদেব দেখিলেন, যোগিনীগণ ফিরিয়া আসিল না। তখন তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সূর্য্যকে পাঠাইলেন। সূর্য্য কাশীতে গিয়া ধার্ম্মিক দিবোদাসের কিছুমাত্র ছিদ্র বাহির

করিতে সমর্থ হইলেন না। এখানে তিনি কাশীর মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যোগিনীদিগের মত সূর্য্যও আর ফিরিলেন না, তখন মহাদেব তাঁহার গণধরদিগকে পূর্ব্বের মত উপদেশ দিয়া কাশীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও কাশীতে আসিয়া কাশীর বিমোহিনীশক্তিতে বিমুগ্ধ হইলেন, যোগিনীগণের ন্যায় তাঁহারাও দিবোদাসের অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মহাদেব তাঁহাদিগের কোন সংবাদ না পাইয়া, বিশেষতঃ কাশী-বিরহে অস্থির হইয়া গণেশকে পাঠাইলেন। গণপতি কাশীতে আসিয়া বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের বেশ ধরিয়া কাশীবাসীর ভাগ্যলিপি গণনা করিয়া সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে কাশীতে থাকিলে সকলেরই ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের কথায় কাশীবাসীর মনে ভয় হইল, অনেকেই কাশী পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ক্রমে বৃদ্ধদৈবজ্ঞের অদ্ভুত গণনার কথা দিবোদাসের অন্তঃপুরে পৌঁছিল। এইরূপে গণপতি রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়া রাজমহিলাদিগের ভাগ্যগণনা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঐরূপ দৈবজ্ঞ, রাজ্ঞীগণের মধ্যে মহাসম্মান লাভ করিলেন। রাজমহিলাগণ তাঁহার অসাক্ষাতে রাজার নিকট তাঁহার বহুবিধ গুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা মজিলেন। একদিন তিনি বৃদ্ধদৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞরূপী গণপতি নানাপ্রকারে রাজার মন মুগ্ধ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! উত্তরদেশ হইতে একজন ব্রাহ্মণ আপনার নিকট আগমন করিবেন, তিনি যাহা বলিবেন, আপনি তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিবেন, তাহা হইলে আপনার সকল বিষয় সিদ্ধ হইবে।'

"এদিকে মন্দরাসীন মহেশ্বর, গণনাথের বিলম্ব দেখিয়া বিষ্ণুর প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অনেক কথাই উপদেশ করিলেন এবং শেষে কহিলেন, 'হে বিষ্ণো! দেখিও অন্যান্য ব্যক্তি কাশীতে যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তুমি যেন সেরূপ করিও না।' বিষ্ণু যথোচিত উত্তর দিয়া হৃষ্টমনে কাশী যাত্রা করিলেন।

বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত কাশীতে আসিয়া কাশীবাসীকে মায়ায় বিমুগ্ধ করিলেন, অধিকাংশ লোকেই স্বধর্ম্মচ্যুত হইতে লাগিল। এদিকে দৈবজ্ঞের উপদেশে রিপুঞ্জয় দিবোদাসের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল তিনি সেই ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ দিবসে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশে দিবোদাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ রিপুঞ্জয় অভিপ্রেত ব্রাহ্মণদর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলেন; তিনি ব্রাহ্মণবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে দ্বিজোত্তম! বহুদিন রাজ্যভার বহনে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমার মনে সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে! আপনি অদ্য আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।' ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু রাজাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি যে বিশ্বনাথকে কাশী হইতে দূর করিয়াছ, ইহাই তোমার একটী মহাদোষ! যদি এই মহাপাপের শান্তি চাও, তবে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় সহস্র অপরাধ বিনষ্ট হয়।' মহারাজ দিবোদাস জ্যেষ্ঠপুত্র সমঞ্জয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসারসংস্রব ত্যাগ করিলেন। তিনি বিষ্ণুর আদেশানুসারে গঙ্গার পশ্চিমতটে একটী শিবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সপ্তম দিবসে শিবদূত-পরিবেষ্টিত জ্যোতির্ম্ময় রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ রিপুঞ্জয় তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এইরূপে মহাত্মা দিবোদাসের নির্ব্বাণ হইল। তৎপরে মহাদেব, দেবী পার্ব্বতীর সহিত পুনরায় তাঁহার প্রিয়ক্ষেত্র বারাণসীধামে আগমন করিলেন।"

বারাণসীতে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, অদ্যাপি তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী সারনাথ বৌদ্ধদিগের একটী পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফা-হি-য়ান এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে হিউএন্ সিয়াং এই সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও এই স্থানে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি ছিল, অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এখনও

কাশীপুরীতে বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ যৎসামান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন সময়ে কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন বারাণসীতে আসিয়াছিলেন, তখন কাশীতে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল। তিনি বারাণসীধামে শতাধিক দেবমন্দির ও প্রায় দশসহস্র দেবোপাসক দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীর মতে উৎকলরাজ যযাতিকেশরী ৩৯৬ শকে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর বারাণসীর অনুকরণে নির্ম্মিত হয়। সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বারাণসীর উল্লেখ আছে এবং তৎকালে শিবোপাসনাও প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজ অশোকের মৃত্যু হইবার পর এবং মহাভাষ্য রচিত হইবার সময়ে বারাণসীতে হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় প্রবল হইতে আরম্ভ হয়।

হিন্দুর নিকট কাশী অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ জগতে আর নাই। প্রাচীন মুনিঋষিগণ প্রাণ-ভরিয়া এই মুক্তিধাম কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন

মৎস্যপুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছে,—

"ইদং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং সদা বারাণসী মম।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং হেতুর্মোক্ষস্য সর্ব্বদা॥"
১৮০।৪৭।

আমার এই বারাণসী ক্ষেত্র সর্ব্বদাই গুহ্যতম, ইহা নিয়তই সমস্ত জীবগণের মোক্ষলাভের হেতু।

"বিষয়াসক্তচিত্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মরতির্নরঃ॥ ৭১
ইহক্ষেত্রে মৃতঃ সোঽপি সংসারং ন পুনর্বিশেৎ।"

ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে একান্ত আসক্তচিত্ত হইলেও, যদি তাহার এই বারাণসীক্ষেত্রে মরণ হয়, তবে সে ব্যক্তিকে আর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না, নিশ্চয়ই তাহার মুক্তি লাভ হয়।

"অবিমুক্তস্য কথিতং ময়া তে গুহ্যমুত্তমম্॥ ৭৫
অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিগুহ্যং মহেশ্বরি।"

হে দেবি! মহেশ্বরি! এই আমি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের অতিশয় গুহ্যবিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ফলতঃ ইহা অপেক্ষা সিদ্ধিবিষয়ে গোপনীয়তর বিষয় সংসারে আর নাই।

"অকামো বা সকামো বা হ্যপি তির্য্যগ্‌গতোঽপি বা।
অবিমুক্তে ত্যজন্ প্রাণান্ মম লোকে মহীয়তে॥" ১৮১।২২

অকাম বা সকামই হউক অথবা তির্য্যগ্-যোনিজাতই হউক, অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই আমার লোকে (শিবলোকে) পূজা প্রাপ্ত হয়।

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়—

"পঞ্চক্রোশ্যাঃ পরং নাস্ত্যৎক্ষেত্রঞ্চ ভুবনত্রয়ে।" ৪৯।৯৩

এই ত্রিভুবন মধ্যে পঞ্চক্রোশী (বারাণসী) অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোন ক্ষেত্র জগতে আর নাই।

"ধর্ম্মস্যোপনিষৎ সত্যং মোক্ষস্যোপনিষচ্ছমঃ।
ক্ষেত্রতীর্থোপনিষদমবিমুক্তং বিদুর্বুধাঃ॥" ৫০।৩১

সত্যই যেমন ধর্ম্মের উপনিষৎ অর্থাৎ উৎ-কৃষ্টতম রহস্য এবং শান্তিই যেমন মোক্ষের গুহ্যতম বিষয়, সেইরূপ অবিমুক্ত ক্ষেত্রকেই বুধগণ ক্ষেত্র ও তীর্থ মধ্যে উৎকৃষ্টতম রহস্য বিষয় বলিয়া অবগত আছেন।

লিঙ্গপুরাণে (৯২ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—

"হে পদ্মাক্ষি! নৈমিষক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার ও পুষ্কর এই সকল তীর্থে স্নান অথবা অবস্থানপূর্ব্বক সেবা করিলে তদ্দ্বারা জীবগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহা শ্রেষ্ঠতম, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার অধিষ্ঠানহেতু প্রয়াগে অথবা এই স্থানে মোক্ষলাভ হয়, তীর্থ-শ্রেষ্ঠ প্রয়াগ অপেক্ষাও এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর।"

কূর্ম্মপুরাণে (পূর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়ে)—

"যাহারা পরমানন্দ লাভের বাসনা করিয়া জ্ঞানে ও ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত, হে সুলোচনে! তাহাদের যে গতি হয়, অবিমুক্তে মৃত ব্যক্তি-গণেরও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ যে সকল কাম্য-বর্জ্জিত স্থানের কথা কহিয়া থাকেন, সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষা এই বারাণসী শ্রেষ্ঠতমা ও শুভদায়িনী। ইহাতে প্রাণপরি-ত্যাগ সময়ে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মহাদেব ভ্রূ, নাভি ও হৃদয়ে তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

কাশীখণ্ডে (২২ অধ্যায়ে)—

"যেখানে বিশ্বেশ্বর বাস করেন, সেই মহাক্ষেত্র অবিমুক্ত অপেক্ষা মনোরম ও মঙ্গলদায়ক বস্তু

এই ব্রহ্মাণ্ডগোলক-মধ্যে কোথাও নাই। এই স্থান পঞ্চক্রোশ পরিমিত। প্রলয়কালে একার্ণবের জল যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মহাদেব সেই পরিমাণে এই ক্ষেত্র উন্নমিত করিয়া উচ্চে তুলিয়া থাকেন। দ্বিজবর! এইক্ষেত্র শূলধারী মহাদেবের ত্রিশূলের অগ্রভাগে অবস্থিত। ইহা আকাশে ও ভূমিতে অবস্থিত নয়, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না।"

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং বারাণসীতে আসিয়া শত হস্ত উচ্চ তাম্রময় বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। এখন সেই শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় লিঙ্গ কোথায়? সাড়ে বার শত বর্ষ পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজক যে শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন, এখন তাহার নিদর্শন নাই অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখমাত্র নাই। বোধ হয়, শাহাবুদ্দীন্ ঘোরি যে সময়ে বারাণসী লুণ্ঠন করিতে আসেন, সেই সময় সেই পবিত্র তাম্রলিঙ্গ ম্লেচ্ছকর্তৃক বিচূর্ণিত বা বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে। বোধ হয়, তৎপরে হিন্দুরাজগণের সময়ে পুনরায় যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিতে পাই।

এখন যে বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণকলস ও স্বর্ণচূড়া-বিলম্বিত সুন্দর মন্দির নয়নগোচর হয়, তাহা শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন বিশ্বেশ্বরের অনতিদূরে যে অরঙ্গজিবের মস্জিদ্ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে সেইখানেই বিশ্বেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির ছিল। হিন্দু-বিদ্বেষী অরঙ্গজিব সেই মন্দির নষ্ট করিয়া মুসলমান-মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছে। অনেকে বলেন, সেই মন্দিরই এখন মস্জিদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে, মুসলমানেরা তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির সমচতুরস্র প্রাঙ্গণের উপর অবস্থিত। উহা চূড়াসমেত ৩৫ হাত উচ্চ। এই মন্দির কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না। মহারাজ রণজিৎসিংহ মন্দিরের খিলান, চূড়া ও সমুদায় কলস তামার উপর সোণা দিয়া মুড়িয়া দেন। সূর্য্যালোকে দূর হইতে দর্শন করিলে ইহার অপূর্ব্বশোভায় নয়ন ঝলসিয়া যায়। স্বর্ণোজ্জ্বল চূড়ার উপর ত্রিশূল ও তাহার পার্শ্বে পতাকা উড়িতেছে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের খিলানের নীচে ৯টী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘণ্টাটী নেপালরাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত। মন্দিরের উত্তরে বিশ্বেশ্বরের সভা, এখানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। এই পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিলে মনে অদ্ভুতরসের আবির্ভাব হয়; দেখিতে পাইবে, ভারতবর্ষের সকল স্থানের সর্ব্বজাতীয় হিন্দু ভক্তিভাবে বিশ্বেশ্বরের পবিত্র লিঙ্গ দর্শনে উপস্থিত! ভক্তগণের মুখ-নিঃসৃত "হর হর ব্যোম ব্যোম" রবে বিশ্বেশ্বর-মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কেহ যোড়হস্তে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছে, কেহ বা উদাত্তাদিস্বরে বেদপাঠ করিতেছে, কেহ বা সুমধুর স্বরে শিবস্তোত্র গান করিয়া ভক্তের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করিতেছে!

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে 'জ্ঞানবাপী' নামক পবিত্র কূপ। শিবপুরাণে এই কূপ "বাপীজল" নামে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবাদ এই-রূপ,—যখন কালাপাহাড় কাশীর দেবমন্দির সকল ধ্বংস করিতে যায়, তখন বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞানবাপীর মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। জ্ঞানবাপীর উপর একটী নাতি-উচ্চ ছাদ আছে, এই ছাদ আবার ৪০টী পাথরের থামের উপর। ইহার গঠন অতি সুন্দর। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ারাজ দৌলতরায় সিন্ধিয়ার বিধবা-পত্নী শ্রীমতী বৈজ বাই উহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। জ্ঞানবাপীর পূর্ব্বে নেপালরাজ-প্রদত্ত পাঁচহাত উচ্চ একটী বৃষভমূর্ত্তি এবং এখানে হায়দরা-বাদের রাণীর মন্দির আছে।

এখানে দাঁড়াইয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই ৪০ হাত উচ্চ 'আদিবিশ্বেশ্বর'-মন্দির নয়ন-গোচর হয়। তাহারই অদূরে 'কাশী-কর্ব্বট' নামক পবিত্র কূপ। অনেকের বিশ্বাস,— যে ডুব দিয়া এই কর্ব্বট উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে দুই একজন এই কূপে ঝাঁপ দিত, গবর্ণমেণ্ট এই জন্য কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া-ছিলেন, তৎপরে এখানকার পাণ্ডার বিস্তর আবেদনে, এখন প্রতি সোমবারে একবার করিয়া মুখ খুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

কাশীকর্ব্বটের নিকট অনেকগুলি সুন্দর দেবালয় আছে। সেই সকল দেবালয়-গাত্রে অতি চমৎকার কারুকর্ম্ম ও শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়

তৎপরে শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গের মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে—সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শনৈশ্চরেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে মানব দেহান্তে কাশালোকে, সুখভোগ করিতে পারেন। (৭ অঃ)। শনৈশ্চরলিঙ্গের শিরোভাগ রৌপ্যময়, নিম্নভাগ পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা আবৃত।

শনৈশ্চরেশ্বরের নিকটেই অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির। কাশীতে কেহ অনাহারে থাকে না, এই অন্নদায়িনী দেবী অন্ন দিয়া দীন-দরিদ্র সকলেরই দুঃখ দূর করেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইবার পথে অসংখ্য দীন-দরিদ্র ভিক্ষার্থ বসিয়া আছে, মন্দির হইতে ভিক্ষাস্বরূপ এক-হাতা কলাই দিবার প্রথা আছে; এখানে সকলেই ভিক্ষা পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ১৮০ বর্ষ পূর্ব্বে পুণার মহারাষ্ট্ররাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরস্থ নানারত্ন-বিভূষণা ত্রৈলোক্য-মোহিনী অন্নপূর্ণার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের মন প্রকৃতই বিমোহিত হয়। মন্দিরের একধারে সপ্তাশ্বযোজিত রথোপরি সূর্য্য দেবের মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

শনৈশ্চরেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, পুরাকালে ভৃগুনন্দন শুক্র এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে কালভৈরবের মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, "মহেশ্বর ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য নিজ কোপ হইতে এক ভৈরবপুরুষ সৃষ্টি করেন, সেই পুরুষই কালভৈরব। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চমুখ ছিল, কালভৈরব তাঁহার পঞ্চম মস্তক ছেদন করেন। কালভৈরব এই ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপ অপনয়নের জন্য কাপালিকব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার সেই কপালহস্তে ভিক্ষার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করেন। তিনি বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু সেই কপাল কোথাও বিমুক্ত হইল না। কি আশ্চর্য্য! কালভৈরব কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে সেই কপাল নিপতিত হইল, ব্রহ্মহত্যাও ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইল! (যে স্থানে সেই কপাল পতিত হইয়াছিল, তাহাই 'কপালমোচন' তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। কূর্ম্মপুঃ ৩৪।১৮) তৎপরে কালভৈরব কপালমোচন তীর্থকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তগণের পাপতাপ দূর করিবার জন্য সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া কালভৈরবের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে মহাপাপ দূর হয়।

(কাশীখণ্ড ৩১)।

কালভৈরব বা ভৈরবনাথের বর্ত্তমান-মূর্ত্তি প্রস্তরে গঠিত, কৃষ্ণাভ ও ঘোর নীলবর্ণ; তাঁহার দুই চক্ষু রৌপ্যময়, তাঁহার অধিষ্ঠান স্বর্ণময়। পার্শ্বে তাঁহার কুক্কুরের মূর্ত্তি। ভৈরবনাথের মন্দির দেখিবার যোগ্য, মন্দিরগাত্র বিবিধবর্ণে অলঙ্কৃত এবং দেবলীলা-চিত্রিত, বিশেষতঃ প্রবেশ-দ্বারের বামপার্শ্বে অতিসুন্দর দশাবতারের মূর্ত্তি আছে।

কালভৈরবের বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ৬৫ বর্ষ পূর্ব্বে পুণার বাজিরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের বহির্ভাগে ভৈরবনাথের পূর্ব্বতন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মন্দির মধ্যে মহাদেব, গণেশ ও সূর্য্য-নারায়ণ-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। কাশীতে ৫টী শীতলা-দেবীর মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভৈরবনাথের মন্দিরের নিকটে একটী; এই শীতলা-মন্দিরে সপ্তভগিনী-মূর্ত্তি আছে।

কালভৈরবের অনতিদূরে দণ্ডপাণির মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে—"হরিকেশ নামে এক যক্ষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়ে শিবভক্তি উদ্দীপিত হয়। তিনি শয়নে সর্ব্বদাই মহাদেবের বিভূতি দর্শন করিতেন। বালককালেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে আসিয়া মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল পরে, মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন, "হে যক্ষ! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই ক্ষেত্রের দণ্ডধর হও। আজ হইতে তুমি এই কাশীস্থ দুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক হইয়া অবস্থান কর। তুমি দণ্ডপাণি নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আমার সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামে গণদ্বয় সর্ব্বদা তোমার অনুগামী হইয়া চলিবে। কাশীবাসীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে তুমি তাহাদের গলে সুনীলরেখা, হস্তে সর্প-বলয়, ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গল-বর্ণ জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্রকলা ও বাহনার্থ বৃষ প্রদান করিবে। তুমিই কাশীবাসীর অন্নদাতা, প্রাণদাতা, জ্ঞানদাতা ও মোক্ষদাতা।" তদবধি দণ্ডপাণি, মহাদেবের আদেশে বারাণসী শাসন করিতেছেন। (কাশীখণ্ড ৩২ অঃ।)

দণ্ডপাণি ও ভৈরবনাথের মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহের মন্দির; এখানে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহ-মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

কালভৈরবের অনতিদূরে কালোদক বা কালকূপ। "এই তীর্থে স্নান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয়। (কাশীখণ্ড ৩১। ১৭) এই কূপটী এমনি ভাবে অবস্থিত যে, ঠিক মধ্যাহ্নের সময় সূর্য্যরশ্মি ইহার জলে পতিত হয়, সেই সময়ে অনেকে অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ এই কালকূপ দর্শনে আসিয়া থাকে। বিশ্বাস, মধ্যাহ্নালোকে যে ব্যক্তি ঐ কূপের জলে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে না পায়, ৬ মাস মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কালোদকের অনতিদূরে বৃদ্ধকালেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, "দক্ষিণদেশে নন্দিবর্দ্ধন নামক গ্রামে বৃদ্ধকাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সহধর্ম্মিণীর সহিত কাশীতে আগমন করিয়া একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই প্রাচীন শিবলিঙ্গ বৃদ্ধকালেশ্বর নামে খ্যাত। বৃদ্ধকালেশ্বর মহাদেবের সেবা করিলে দরিদ্রতা, উপসর্গ, রোগ, পাপ কিংবা পাপজনিত ফলভোগ নিবারিত হয়।" (কাশীখঃ ২৭ অঃ)। বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন; অনেকের মতে, কাশীতে যত শিবালয় আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির পুরাতন।

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির মধ্যে দক্ষেশ্বর নামে স্বতন্ত্র লিঙ্গ আছেন। এই মন্দির ছাড়াইয়া দক্ষিণভাগে 'অল্পমৃত্যেশ্বর' শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। ভক্তের বিশ্বাস, এই অল্পমৃত্যেশ্বরলিঙ্গ অল্পায়ু মানবের দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য বিস্তর তীর্থযাত্রী এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিতে আইসে।

এক সময়ে এই বৃদ্ধকালেশ্বরের দক্ষিণে পুরাণপ্রসিদ্ধ কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ছিল। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—

"মহাদেব গজাসুরকে নিহত করিলে, তাহার শরীর এই স্থানে শিবলিঙ্গরূপে পরিণত হয়। শিব, গজাসুরের কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম পরিধান করেন বলিয়া উক্ত লিঙ্গ কৃত্তিবাসেশ্বর নামে বিখ্যাত হন। এই লিঙ্গ কাশীস্থ সকল লিঙ্গ হইতে উত্তমরূপে সপ্তকোটি মহারুদ্রী জপ করিলে যে ফল হয়, কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করিলে সেই ফল হয়।"

(কাশীখঃ ৬৮ অঃ)।

একসময়ে কৃত্তিবাসেশ্বরের অতি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—

"এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ প্রাসাদ নয়নগোচর হইতেছে, মানব দূর হইতে সেই প্রাসাদ দেখিয়াই কৃত্তিবাসত্ব লাভ করিয়া থাকে।"

সেই কৃত্তিবাসেশ্বরের পবিত্র প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নাই, এখন তাহারই কিয়দংশ আলমগীরি মসজিদ্ নামে খ্যাত। হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিবের রাজত্বকালে মুসলমানেরা কৃত্তিবাসেশ্বর-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই মালমসলায় ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঐ মসজিদ্ নির্ম্মাণ করে।

উক্ত মসজিদের নিকটই রত্নেশ্বরের পবিত্র মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—"কালভৈরবের উত্তরভাগে গিরিরাজ হিমালয়, পার্ব্বতীর জন্য যে রত্ন সমুদয় আনয়ন করেন, সেই সকল পুণ্যোপার্জ্জিত রত্নরাশি এই স্থানে রাখিয়া তিনি নিজ গৃহে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কাশীতে যত লিঙ্গ আছে, সেই সকলের মধ্যে এই লিঙ্গ,—রত্নভূত, এইজন্য ইহার নাম রত্নেশ্বর।"

(কাশীখঃ ৬৮ অঃ)

প্রায় পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে এই মন্দিরের ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকা হইতে মণিরত্ন বাহির হইয়াছিল।

কাশীর মণিকর্ণিকা এক প্রধান তীর্থ। শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় লিখিত আছে,—

"ততশ্চ বিষ্ণুনা দৃষ্টা অহো কিমেতদদ্ভুতম্।
ইত্যাশ্চর্য্যং তদা দৃষ্টা শিরসঃ কম্পনং কৃতম্।
ততশ্চ পতিতস্তঃ কর্ণাম্মণিশ্চ পুরতঃ প্রভোঃ॥
যত্রাসৌ পতিতস্তৈবতত্রাসীম্মণিকর্ণিকা" ৪৯।১০-১৪

তদনন্তর বিষ্ণু, তাহা দেখিয়া মনে করিলেন, আহা ইহা অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার! এই আশ্চর্য্য দেখিয়া তিনি শিরঃকম্পন করিলেন, তাহাতে তাঁহার কর্ণ হইতে মণিভূষণ প্রভুর অগ্রে পতিত হইল। যেখানে ঐ মণি পতিত হইল, সেই স্থানই মণিকর্ণিকা।

সৌরপুরাণে (৪।৮)—

"নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্॥

কাশীখণ্ডে (৭। ৭৯—৮০)—

"সংসারিচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ
তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্।
শিবোহভিধত্তে সহসান্তকালে
তদ্গীয়তেহসৌ মণিকর্ণিকেতি॥
মুক্তিলক্ষ্মীমহাপীঠমণিস্তচ্চরণাব্জয়োঃ।
কর্ণিকেয়ং ততঃ প্রাহুর্যাং জনা মণিকর্ণিকাম্॥"

মণিকর্ণিকার ঠিক সম্মুখে তারকেশ্বরের মন্দির। সৌরপুরাণে লিখিত আছে,—"অন্তিমকালে এই তারকেশ্বরই কাশীবাসীকে তারকব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।" (৬। ৮)

গঙ্গার পশ্চিমতটে মীরঘাটের উপর দিবোদাসেশ্বরের মন্দির।

বারাণসীর উত্তর-পশ্চিম কোণে নাগকূপ নামক তীর্থ আছে, এই স্থান এখন 'নাগকূঁয় মহল্লা' নামে খ্যাত। এই অঞ্চল বারাণসীর প্রাচীন অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে একজন রাজা বিস্তর ব্যয়ে এই কূপের পুনঃসংস্কার করিয়া পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। কূপের ধাপে এক স্থানে তিনটী নাগমূর্ত্তি ও অপর স্থানে শিবলিঙ্গ আছে। এখানে নাগ ও নাগেশ্বর শিবের পূজা হয়।

নাগকূপের কিছুদূরে বাগীশ্বরী দেবীর মন্দির; ঐ দেবীমূর্ত্তি অষ্টধাতু-নির্ম্মিত, শিরে বৃহৎমুকুট শোভিত এবং সিংহোপরি অবস্থিত। মন্দিরটীও দেখিবার যোগ্য, ইহার বারান্দায় নানাবর্ণের দেব-দেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত। মন্দিরের এক কোণে আমেঠি-রাজ-প্রদত্ত একটী পাথরের সিংহমূর্ত্তি আছে। এ ছাড়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির এবং নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে।

বাগীশ্বরী-মন্দিরের নিকটেই জ্বরহরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। অনেকের বিশ্বাস, জ্বরহরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। এইরূপ সিদ্ধেশ্বর, মানবের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

বারাণসীর মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট একটী মহাতীর্থ, এখানে ৬৯২টী মন্দির আছে।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে (৫২। ৬৬—৬৯)—

"ব্রহ্মা, রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্যে কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যে স্থানে তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তদবধি সেই স্থান দশাশ্বমেধতীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাকালে এই তীর্থ 'রুদ্রসরোবর' নামে বিখ্যাত ছিল, ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি তাহার 'দশাশ্বমেধ' নাম হইয়াছে।"

এই স্থানে ব্রহ্মা দশাশ্বমেধেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মৎস্যপুরাণের মতে (১৮৩। ৭১)—

"তত্র স্নাত্বা মহাভাগে ভবন্তি নীরুজা নরাঃ।
দশাশ্বমেধানাং ফলং তত্র প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

সেই (দশাশ্বমেধ) তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ রোগশূন্য এবং দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—"এই দশাশ্বমেধ-তীর্থে তিনটী মাত্র আহুতি প্রদান করিলে অগ্নিহোত্র-যাগের ফল লাভ হয়।"

(কাশীখঃ ৩৩। ১৭৯)

দশাশ্বমেধেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই 'রুদ্রসর' নামক তীর্থ। কাশীখণ্ডমতে, এই তীর্থে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মদ্বয়কৃত পাপ বিনষ্ট হয়। দশাশ্বমেধঘাটে দশহরেশ্বর প্রভৃতি অনেক দেবমন্দির আছে, একত্র সারি সারি এত অধিক মন্দির কাশীর আর কোন স্থানে নাই। দশাশ্বমেধের উত্তরে মানমন্দির-ঘাটের নিকট দাল্‌ভ্যেশ্বর, সোমেশ্বর, বিষ্ণু, শীতলা, বারাহীদেবী প্রভৃতির মন্দির আছে।

বারাণসীর পশ্চিমে নগর-সীমার বাহিরে পিশাচমোচন তীর্থ। ইহা একটী প্রাচীন তীর্থ। কূর্ম্মপুরাণেও এই তীর্থের উল্লেখ আছে। (পূর্ব্বভাগে ৩২। ২)।

পিশাচমোচনের পূর্ব্বধারে দুইটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটী মীরাবাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিদিকে অনেক দেবমূর্ত্তি আছে। কোথাও শিব, কোথাও তাঁহারই পার্শ্বে পিশাচের ছিন্ন মুণ্ড, কোথাও বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সূর্য্য, গণেশ, হনূমান্ প্রভৃতির মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।

তৎপরে সূর্য্যকুণ্ড বা সাম্বাদিত্য। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে,—"বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব আদিত্যদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। এই দারুণ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের জন্য কাশীতে আসিয়া একটী কুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিয়া শাপমুক্ত হন। সাম্ব-প্রতিষ্ঠিত সাম্বাদিত্য নামক সূর্য্যবিগ্রহ, ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন।

সাম্বাদিত্যের সেবা করিলে স্ত্রীলোক কখনও বিধবা হয় না। মাঘমাসে শুক্ল সপ্তমীতে সাম্বকুণ্ডের বাৎসরিক যাত্রা হইয়া থাকে। সেই দিন সাম্বকুণ্ডে স্নান করিয়া সাম্বাদিত্যের পূজা করিলে উৎকটরোগও শান্তি হয়।”

কাশীখণ্ডোক্ত সাম্বকুণ্ডেরই বর্ত্তমান নাম ‘সূর্য্যকুণ্ড।’ সূর্য্যকুণ্ডের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র-মন্দিরে অষ্টাঙ্গভৈরবের ‘মূর্ত্তি,’ হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিব এই মূর্ত্তি অঙ্গহীন করিয়াছে। এই অঞ্চলে ধ্রুবেশ্বরের মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, ধ্রুব এই শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

বারাণসীর ঈশানগঞ্জ মহল্লায় বিখ্যাত ঘাগেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত আছে।

ঈশানগঞ্জ মহল্লার সন্নিহিত কাশীপুরা মহল্লায় কাশীদেবীর মন্দির আছে। ইনিই কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহারই অনতিদূরে ঘণ্টা-কর্ণতলাও। কাশীখণ্ডের মতে ইহার নাম ‘ঘণ্টা-কর্ণহ্রদ,’ এই হ্রদের নিকট চিত্রঘণ্টেশ্বরী বিরাজ করেন। হ্রদের তীরে ঘণ্টাকর্ণ নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে।

(কাশীখঃ ৫৩। ৩২—৩৪)।

ঘণ্টাকর্ণহ্রদের তীরে বেদব্যাসেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরে বেদব্যাসমূর্ত্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শ্রাবণ মাসে ঘণ্টাকর্ণহ্রদ ও তন্নিকটস্থ মন্দির দর্শনে বিস্তর তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে।

কাশীদেবীর মন্দির হইতে কিছু উত্তরে ভূতভৈরব বা বিষমভৈরবের মন্দির। ভূতভৈরবের মূর্ত্তিও অদ্ভুত। এখানে অপরাপর দেবমূর্ত্তিও আছে। তন্মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের গুঁড়ি হইতে উত্থিত বৃহৎ শিবলিঙ্গই প্রধান।

এই মহল্লায় বারগণেশ ও জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। এক স্থানে দুইজন সতীর প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে, উভয়ে পতির সহগমন করিয়াছিলেন। সধবা স্ত্রীলোকেরা আসিয়া এই দুই সতীমূর্ত্তির পূজা করে। এখানে আরও অনেক অঙ্গহীন পাষাণমূর্ত্তি আছে; কালবশে অথবা ম্লেচ্ছ-উৎপীড়নে সেই সকল দেবমূর্ত্তির এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

বারাণসীর মধ্যস্থলে ত্রিলোচনের প্রাচীন মন্দির। কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, “যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, বিষ্ণু প্রত্যহ সহস্র পুষ্প দিয়া শিবের পূজা করিতেন। একদিন বিষ্ণু শিব-পূজায় নিরত, এমন সময়ে শিব মায়াবলে তাঁহার একটী ফুল হরণ করেন। তৎপরে বিষ্ণু পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় একে একে ৯৯৯টী ফুল দেবোদ্দেশে অর্পণ করিলেন; শেষে দেখিলেন, একটী ফুল নাই। অবশেষে ভগবান্ আপনার একটি নেত্রকমল উৎসর্গ করিলেন। শিবের কপালদেশে সেই নেত্রটী পড়িবামাত্র তাঁহার তিন চক্ষু হইল এবং তিনি ত্রিলোচন নামে বিখ্যাত হইলেন।”

ত্রিলোচনের বর্ত্তমান মন্দির, পুণাবাসী নাথুবালা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটী নিতান্ত প্রাচীন না হইলেও এখানে যে সকল দেবমূর্ত্তি আছে, তাহাদের আকৃতি দর্শনে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কাশীখণ্ডের মতে, ‘ত্রিভুবন মধ্যে বারাণসীপুরীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই বারাণসী হইতে প্রণবেশ্বর লিঙ্গ এবং প্রণবেশ্বর হইতেও এই ত্রিলোচনলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। মহেশ্বর কলিকালে ত্রিলোচনের মহিমা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।” (কাশীখঃ ৬৭। ১৫৫, ১৬৮)

মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে বিবিধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি দর্শনে নয়ন ও মন আকৃষ্ট হয়। এখানে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে, সর্ব্বত্রই প্রায় ৫, ১০, বা ২০টীর অধিক শিব এবং নিকটেই নন্দিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভাগে দেবসভা, এখানে বিখ্যাত কোটি-লিঙ্গেশ্বরমূর্ত্তি আছে। এই লিঙ্গটী দুই হাত উচ্চ। লিঙ্গের অঙ্গ এরূপে গঠিত যে, দেখিলেই শত শত শিবলিঙ্গের একত্র অধিষ্ঠান বলিয়া বোধ হয়।

ত্রিলোচন-মন্দিরের মোহনের সম্মুখে যোড়া-মন্দির। এখানে মন্দিরের নিম্ন হইতে ভিতর পর্য্যন্ত অসংখ্য দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ত্রিলোচনমন্দিরের মোহন (বারান্দা) লাল-বর্ণ আটটী থামের উপর স্থাপিত। ইহার ছাদ বিবিধ চিত্রে চিত্রিত, মোহনে বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে। প্রবেশ-দ্বারের পার্শ্বদেশে একটী বৃহৎ শ্বেত-পাথরের বৃষভমূর্ত্তি। এখানে গণেশাদি দেবমূর্ত্তি ব্যতীত শিখগুরু নানক-সাহের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এখানকার নরক

ও মৃত্যুনদীর দৃশ্য অতি চমৎকার। পাপী মানবগণ কিরূপে দণ্ডিত হয়, কালনদীর পর-পারে যাইবার জন্য মানব কেমন ব্যাকুল, তাহার সুন্দর চিত্র এইখানে দেখিতে পাইবে।

ত্রিলোচনঘাটের প্রাচীন নাম 'পিলিপিলা' তীর্থ। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, "গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা নদী যেখানে হাস্য করিতেছেন, সেই পিলিপিলা তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে, তাহার আর গয়ায় যাইবার প্রয়োজন কি? পিলিপিলা তীর্থে স্নানান্তে পিণ্ড প্রদান করিয়া ত্রিপিষ্টপ-লিঙ্গ দর্শন করিলে কোটিতীর্থ-দর্শনের ফললাভ হয়। ত্রিপিষ্টপের দক্ষিণদিকে সরস্বতীশ্বর, পশ্চিমদিকে যমুনেশ্বর এবং পূর্ব্ব-দিকে সুখপ্রদ নর্ম্মদেশ্বর, এই তিন লিঙ্গ দর্শনেই মহাপুণ্য লাভ হয়।"

(কাশীখঃ ৫৭। ৫—১১)।

অদ্যাপি ত্রিলোচনের নিকট ও ত্রিলোচনঘাটে এই সকল মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

কাশীস্থ বাঙ্গালী-টোলায় প্রসিদ্ধ কেদারে-শ্বরের মন্দির। কাশীখণ্ডে কেদারেশ্বরের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, "উজ্জয়িনীতে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ-তনয় ছিলেন। তিনি হিমালয়স্থ কেদারেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া এই কাশীতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, 'যতকাল বাঁচিব, প্রতি চৈত্রমাসে কেদারেশ্বর-দর্শনে যাত্রা করিব।' এই-রূপে সেই ব্রাহ্মণ ৬১ বার কেদারেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্ব্ববৎ কেদারেশ্বর দর্শনার্থ সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে অতি বৃদ্ধ দেখিয়া যাইতে নিষেধ করিল। তথাপি বৃদ্ধের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তিনি স্থির করিলেন, যদি পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেও ভাল, তবু তিনি কেদারেশ্বরে গমন করিবেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে কেদারনাথ সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং কহিলেন, 'আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।' তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া হিমালয় হইতে আসিয়া এইখানে অবস্থান করুন।' ভগবান্ ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার কলামাত্র হিমশৈলে রাখিয়া এই স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণ-ভাবে হরপাপহ্রদে অবস্থান করিলেন। হিমালয়ে কেদারেশ্বর-দর্শনে যে ফল হয়, কাশীতে কেদারে-শ্বরকে দেখিলে তাহার সাতগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। হিমালয়ে যেমন গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ ও গঙ্গা আছেন, এই কাশীতেও সেই সমুদায় একভাবে আছেন। পুরাকালে গৌরী এই মহাহ্রদে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা "গৌরীকুণ্ড" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপর নাম মানসতীর্থ। এই কেদারকুণ্ডে যে স্নান করে, কেদারেশ্বর তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন।" (কাশীখঃ ৭৭ অঃ।)

কেদারেশ্বর-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে কিছু দূরে মানসিংহ-উৎখাত মান-সরোবরনামক গভীর জলাশয়, ইহার চারিদিকে প্রায় ৫০টী মঠ। এখানকার রাম-লক্ষ্মণের মন্দিরই প্রধান, এই মন্দির-সীমার মধ্যে একস্থানে দত্তাত্রেয়-মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন সেই স্থানে প্রায় সহস্রাধিক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অনতিদূরে মানসিংহ-প্রতিষ্ঠিত মানেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের মন্দিরও আছে।

মানেশ্বরের পশ্চিমে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির। তিলভাণ্ডেশ্বরের মূর্ত্তি উচ্চে তিন হাত, কিন্তু প্রস্থে ১০ হাত। সাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তি প্রত্যহ তিলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাই ইহার নাম তিলভাণ্ডেশ্বর।

কাশীতে যে কত শত দেবমূর্ত্তি আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। গঙ্গার ধারে প্রতি ঘাটেই দেবালয় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অগ্নীশ্বরের দক্ষিণে ও চক্রপুষ্করিণীর উত্তরে সঙ্কটাঘাট, যমেশ্বরঘাট ঘোষালাঘাট ও শ্রীমঠ উল্লেখ-যোগ্য।

গঙ্গার ধারে চৌকীঘাটের উপর রুক্মেশ্বরের মন্দির, ইহার নিকট বিস্তর নাগমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

কাশীর দুর্গাবাড়ী অতি প্রসিদ্ধ। এখানকার দুর্গামূর্ত্তি যে বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়। বর্ত্তমান দুর্গামন্দির রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের মোহন তৎকালের সুবেদার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

দুর্গাবাড়ীর জনতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, দেশ-বিদেশ হইতে কত যে তীর্থযাত্রী

আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যহই যেন দেবীর মন্দিরে মহোৎসব! প্রত্যহই দেবী পার্ব্বতীর প্রীতির নিমিত্ত বিস্তর ছাগ বলি হয়। প্রতি মঙ্গলবারে দেবীর উদ্দেশে মেলা হয়। প্রতিবর্ষে শ্রাবণে মঙ্গলবারে একটী মহামেলা হয়; সে সময়ে যে কত তীর্থযাত্রী আসে, তাহার সংখ্যা নাই।'

কাশীর অনন্ত কথা আমি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কত বর্ণনা করিব! যদি কেহ ইহা অপেক্ষা কাশীর বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি মৎসম্পাদিত মাসে মাসে প্রকাশিত বিশ্বকোষ নামক বৃহৎ অভিধান দেখিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

ঘোষজা মহাশয়ের দুর্গোৎসব।

প্রথম উল্লাস।

শরৎকাল আসিয়াছে। সুতরাং কবির কল্পনায় আর সে বর্ষাকালীন দিগন্তব্যাপী গভীর মেঘগর্জ্জন নাই,—সে মুহুর্মুহুঃ বৃষ্টিপাতও নাই। আকাশ এখন সুনির্ম্মল। এখন সেই সুনীল নভোমণ্ডলে কচিৎ শ্বেতাম্বুদকে বিবিধ মূর্ত্তি ধরিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এই সময়টী যেমন রমণীয়, তেমনি নয়নাভিরাম। বিশেষতঃ এই কালে জগৎ-প্রসবিনী, বিশ্ব-পালিনী, জগজ্জননী মহামায়া ধরাধামে আসিবেন বলিয়া, ধরিত্রী কি এক অপরূপ মোহন বেশে সাজিয়া বিশ্ব-সংসারকে আনন্দ-বারিতে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। এই শারদীয় উৎসব-সময়ে কত লোকের বহুদিনের পোষিত আশা-লতা ফলফুলে পরিশোভিত হয়, আবার কাহার বা তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সময়ে স্নেহময়ী জননী, সংবৎসরের পর প্রবাসস্থ প্রিয়পুত্র-মুখ দর্শিবেন বলিয়া ব্যগ্র হইয়া থাকেন। ওদিকে ভক্তিপরায়ণ পুত্র পিতৃ-মাতৃ-সন্দর্শনাভিলাষে নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হন। পতিবিরহ-বিধুরা কত সীমন্তিনী স্বামী-সন্দর্শন-লালসায় ব্যাকুল-হৃদয়ে পথ পানে চাহিয়া থাকে। স্বামীও, নয়নানন্দ-দায়িনী, জীবন-তোষিণী প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য দিন গণিতে থাকেন। সময়ের মাহাত্ম্য অনুসারে, কত নির্জ্জীব লোক সজীব হয়, আবার কেহ বা নিরাশার গভীর নিখাতে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতে থাকে।

শারদীয় উৎসব—বাঙ্গালির সার এবং শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাঙ্গালির গৃহে গৃহে মহা ধুম পড়িয়া যায়। কেহ পুত্র-কন্যাদের জন্য বিবিধ মনোরম সামগ্রী কিনিতেছেন। কেহ বা অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণীর সোহাগ বাড়াইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কাপড়-বিক্রেতার দোকানে, ঢাকাই-গুলবাহার, বোম্বাই, নীলাম্বরী, কল্কাপেড়ে, মিসিপেড়ে, বাবুধাক্কা, গলাধাক্কাপেড়ে সাড়ী কিনিতেছেন। কেহ বা চন্দ্রহার, গোট, বালা, অনন্ত, গোপহার, হেলেহার, চিক, কান, ঝাঁপটা এবং ফুল ইত্যাদির জন্য স্বর্ণকারকে রাত্রে ঘুমাইতে দিতেছেন না। কেহ বা বডি-সেমিজকামিজের জন্য কত কত নবীন প্রবীণ কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। গন্ধ-বিক্রেতার দোকানে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক,—কেহ অটোডিরোজ কেহবা হোইট, কেহ বা ডামাস্করোজ, কেহ বা গমৃনেলের সাবান ইত্যাদি বিবিধ মন-ভোলানে জিনিস কিনিয়া মনের উল্লাসে বাক্স-বন্দী করিতেছেন। আর যাহার পুত্র-কলত্র নাই, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রিয়-সমাগমের উপায় নাই, সুখের আশায় যেদিকে চাহিবে সেস্থান কিংবা তাহার নিদর্শন মাত্রও নাই; তাহার জীবন আজ ঘোরতর মরুময়, তাহার জীবন আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্মশানক্ষেত্রের সহিত তুলনীয়!

আজ ষষ্ঠী। কলিকাতা সহরে ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কাহার বাড়ীর দ্বারে মঙ্গলময় পল্লব, জলপূর্ণ ঘট। কাহার দ্বারে নব-বিকসিত পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে। কাহার বা তোরণ-দ্বারোপরি মৃদু মধুর নহবত বাজিতেছে। এইরূপ অনেক বাড়ীতে আনন্দের উচ্ছ্বাস যেন উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই সহরের আর একটী বাড়ীর ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাড়ীটী খুব বড়, তিন মহল; বাহিরে পূজার দালান এবং বৈঠকখানা। বাল্যাবস্থায় বাড়ীটী বড় আহ্লাদ করিয়া, সাদা ধপ্-ধপে দেখাইবে বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে চূণ মাখিয়াছিল; কিন্তু কালের এমনি উৎপাত যে, সে সাবের চূণ-কাম এখন সব খসিয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থানে লোণা ধরিয়াছে, কোথায় বা টালি খসিয়া পড়িয়াছে, ছাতের আলিসা ভাঙ্গিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, বাড়ীটী পুরাতন খোলস বদলাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছে। এহেন বাড়ীর পূজার দালানে দশ-ভুজার মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে মৃন্ময়-দীপাধারে একটী প্রদীপ মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। দালানের একধারে একটী ছেঁড়া শপে কয়েকজন বসিয়া আছেন। মান্ধাতার আমলের একখানি আসনে পুরোহিত-ঠাকুর উপবিষ্ট, আর বাড়ীর যিনি খোদ

কর্ত্তা তিনি নিরাসনেই বসিয়া আছেন। সকলেই এক মনে প্রতিমা চিত্রিত করা দেখিতেছেন। পটোর ও মালীর সঙ্গে কিরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা ত জানি না; তবে প্রতি বৎসরই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলের বাড়ীতে প্রতিমা চিত্রিত করিয়া এবং সাজাইয়া, যে রংটুকু বাঁচে, সেই রং এবং যে সাজ উদ্বৃত্ত হয়, তাহাই লইয়া কেবল বুদ্ধিবলে এ বাড়ীর প্রতিমার রং ফলায় এবং রাঙ্তা দিয়া সাজায়, এই সকল সরঞ্জাম লইয়া পটোকে এবং মালীকে আজ এ বাড়ীর কাজ সারিয়া যাইতেই হইবে, কেননা কাল সপ্তমী।

কু-লোকের কেমন কু-অভ্যাস, তাহাদের ত কোন কাজ কর্ম্ম নাই। কোন একটা অছিলা পেলেই তাহারা লোকের নামে নানা কলঙ্ক রটাইয়া থাকে। আমাদের এই বাড়ীর বাবুর নামে লোকে কত কি বলে, কত কথা কাণা-কাণি করে। তাহারা বলে, "এ বাবুর নাম করিলে সে দিন আর অন্ন জোটে না। এমন কি, বাবুর নামের এমনি মহাত্ম্য যে, তাঁহার নাম করিবামাত্র ভরা-ভাতের হাঁড়ি ফাসিয়া যায়, বাড়া ভাত কুকুর-স্পৃষ্ট হয়। ইহা যে কত দূর সত্য, তাহার সঠিক সংবাদ আমরা দিতে পারিলাম না, তবে এ বিষয়ের আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিতেছি। আমোদ-প্রিয় বাবুরা আমোদ করিয়া গ্রাবু খেলিতে বসিয়াছেন। খুব রোকের সঙ্গে তাস-খেলা চলিতেছে, এক পক্ষ ছক্কা ধরিয়াছে, আবার চারি খানা কাগজও হইয়াছে। তাহাদের পড়তাও বেশ পড়িয়াছে। প্রতিহাতে গোলাম, নহলা, টেক্কা, সাহেব আসিতেছে,—ব্যোম হয় আর কি!! এমন সময় প্রতিপক্ষেরা বলিয়া উঠিল,—"দেখ্‌চ কি? এক কথায় তোমাদের ছক্কা, পাঞ্জা, ব্যোম কোথায় উড়িয়া যাইবে। দেখবে তবে—এই দেখ।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাদের বাবুর নামটী একবার স্মরণ করিয়া কাগজ কয় খানিতে হাত বুলাইয়া দিল। বিধির বিচিত্র লীলা যেমন বুঝা ভার, তেমনি আমাদের বাবুর নামেরও অপার মহিমা সকলের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কেননা, উক্ত নামটী করিবামাত্র জিত-কাতের হাতে গোলাম, নহলা, টেক্কা আসা-সত্ত্বেও, সেই সব কয়খানি কাগজ একেবারে উঠিয়া গেল!! ইহা নামের মাহাত্ম্যে ঘটিল, কি আর কোন কারণ বশতঃ হইল, তা তোমাদের যাহা ইচ্ছা বলিতে হয়, বল; আমি কিন্তু যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, তাহাই বলিলাম।

এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ বাবুটী যে কে, তাঁহার পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার এখন নামটী পর্য্যন্তও করি নাই। কিন্তু নামটী করা ত বড় সহজ ব্যাপার নহে, সে নামটী মুখাগ্রে আনিলে, কি যে ঘোর বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা ত বলা যায় না। আবার নামটা না করিলে গল্পও হয় না; কেননা, নায়ক-নায়িকা-বিহীন গল্প ত ভাল দেখায় না। কাজেই নামটী না করিলে আর চলিতেছে না। কি করি, এ বিপদের ঝটিকা না হয় লেখকের মাথার উপর দিয়া যা'ক, লেখক না হয় একদিন উপবাস করিবে। তবে পাঠকদের পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া রাখি, তাঁহারা যেন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যাহা জুটিবে, তাহা আকণ্ঠ পর্য্যন্ত আহার করিয়া আমার এই গল্প শুনিতে বসেন। ইহার পর যদি কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে লেখক নাচার এবং সে জন্য কেহ লেখককে দোষ দিতে পারিবেন না। তবে এক্ষণে সকলের অনুমতি লইয়া নামটা করি—কিন্তু দেখবেন, খুব সাবধান—তবে বলি—বাবুটীর নাম—"তারিণী ঘোষ।" তাঁহার নামটা ত কেহ কখন মুখে আনে না, ঠারে-ঠোরেই বলিয়া থাকে। কেহ বলে—"অমুক ঘোষ" কেহ বলে "কল্পনা ঘোষ" কেহ বলে "বড় কর্ত্তা।"—এই রূপেই আমাদের ঘোষজ মহাশয় জনসমাজে অভিহিত এবং পরিচিত হইয়া থাকেন। পুরা নামটা কেহ কখন করেও না, আমরাও তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিব না।

ঘোষজ মহাশয়ের পিতার নাম রামতনু ঘোষ। তিনি বহু কষ্টে অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দান-ধ্যান, লোকলৌকিকতা এবং নানাবিধ সদ্ব্যয় ছিল। তাঁহার সময়ে বারমাসে তের পর্ব্বাহ হইত। দুর্গোৎসবের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পাড়ার লোকদের কাহারও ঘরে হাঁড়ি চড়িত না; সকলেই রামতনু বাবুর বাড়ীতে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিত। লোকে আজও গল্প করে যে, পূজার কয়েক দিন তাঁহার বাড়ীতে দইয়ের কাদা হইত, ক্ষীরের সাগরে লোকজন সাঁতার দিত; আর সন্দেশ মেঠাই লইয়া ছেলেগুলো ভাঁটা খেলিত। কালক্রমে রামতনু বাবুর মৃত্যু হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের সুপরিচিত শ্রীমান্——ঘোষ তাঁহার অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী হইলেন। পিতা যে কত টাকা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাহা কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারে না। তবে লোকে কাণাকাণি করিত, মৃত রামতনু বাবুর একটী গুপ্ত ঘর ছিল, সেই ঘরে ঘড়া ঘড়া মোহর এবং টাকা

পোতা আছে। তখন সময়ে সময়ে হাত পড়িত ; কিন্তু এখন হইতে তাহাতে ছাতা পড়িতে সুরু হইয়াছে। পূর্ব্বের স্থায় যদি এখন দোল দুর্গোৎসব সকলই বজায় আছে বটে, তবে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বে রসনা-তৃপ্তিকর-সুরসাল ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী বাড়ীতে ছড়াছড়ি যাইত, এখন যেন তাহা কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছে। আর তাহার পরিবর্ত্তে লোকদের নিরম্বু উপবাসটা যেন একচেটে হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় উল্লাস

দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘোষজ মহাশয়ের পূজার দালানে পূর্ব্বকথিত কয়েকজন বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী লোক অতি ধীর পদবিক্ষেপে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটীর চেহারা অতি মলিন, কণ্ঠার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নয়নদ্বয় কোটর-প্রবিষ্ট, তাহা আবার জবাফুলের স্থায় রক্তবর্ণ; কেশ অতি রুক্ষ। পরিধান অতি মলিন কাপড় এবং স্কন্ধে আধ-ময়লা একখানি চাদর। গলার আওয়াজটা বড় খাদ। লোকটী পূজার দালানস্থ সিঁড়ির নিকটে আসিল এবং অতি সন্তর্পণের সহিত চাদরখানি গলায় দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত বলিতে লাগিল,—

"আস্তিকস্ত মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুর্ম্মুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমোস্তুতে।
আস্তিক আস্তিক গরুড় গরুড় ॥"

শেষ কয়েকটী কথা কিছু উচ্চস্বরে বলিল। তাহার এই অসময়ে এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক মন্ত্র শুনিয়া দালানস্থ সকলে "হাঁ হাঁ কল্লি কি, কল্লি কি।" বলিয়া একেবারে মহাহুলস্থূল বাধাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন রাগ আর সামালাইতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'তবে রে পেঁচো বেল্লীক, গেঁজেল গাঁজা খেয়ে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে দেখছি, তোর আক্কেলটা কি বল দেখি? তুই এই দুর্গা পূজার দালানে কি বলে মনসার প্রণামটা কল্লি?"

২য় ব্যক্তি। যে চব্বিশ ঘণ্টা গাঁজা খায়, তার যদি আক্কেল থাকবে, তবে সে এ কথা বলবেই বা কেন?

সদ্গোপবংশ-অবতংস পঞ্চানন ওরফে পাঁচু বা পেঁচো বাল্যকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ হয়, তাহার পরও কিছু দিন লেখা পড়া করিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গ-দোষে সে এখন একেবারে বিগড়িয়া গিয়াছে, এখন তাহার গাঁজাই ধ্যান, গাঁজাই জ্ঞান, গাঁজাই তাহার এ ভবনদী পার হইবার এক মাত্র ভেলা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া কি তাহার কোন গুণ ছিল না, এমন বলিতেছি না; তাহার একটী বিশিষ্ট গুণ ছিল যে, তাহাকে কোন পুরা মজলিসে ছাড়িয়া দেও, সে তাহার উদ্ভাবনী-শক্তি-প্রভাবে নূতন নূতন রঙ্গপূর্ণ কথায় তাহা মাৎ করিয়া তুলিবে। সে যাহা হউক, আজ পাঁচু, সপ্তরথীপরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের বাক্যবাণে একেবারে জর জর হইয়া উঠিল। উক্ত পূজার দালানস্থ একে একে সকলেই তাহাকে তিরস্কার এবং ভর্ৎসনা করিয়া মনের সাধ মিটাইয়া লইলেন। তাঁহাদের পালা শেষ হইলে, পাঁচু গলায় বস্ত্র দিয়া যোড়হাতে বলিল,—"মহাশয়গণ গো! রাগ করিবেন না, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু তা বলে যে আমি একেবারে নিতান্তই গেঁজেল, এ কথাটা মনে করিবেন না?"

৩য় ব্যক্তি। তুমি যদি গেঁজেল নও, তবে তুমি কি বাপু! আর গেঁজেল না হলে কি কেহ কখন দুর্গোৎসবের সময় দুর্গাপূজার দালানে আসিয়া মনসার প্রণাম করে?

পাঁচু। শুধু রাগ কল্লে হয় না, আর আমাকে গেঁজেল বলে উড়িয়ে দিলেও চলবে না, ভিতরের খবরটা রাখেন কি?

১ম ব্যক্তি। ভিতরের খবর আবার কি?

২য় ব্যক্তি। আজ বুঝি আড্ডা হতে কোন নূতন গাঁজাখুরী গল্প শুনে এসেছে?

পাঁচু। আজ্ঞা এবড় গাঁজাখুরী গল্প নয়, আর কোন আড্ডার কথাও নয়।

৩য় ব্যক্তি। তবে কি বাপু, তুমি না হয় তাহা প্রকাশ করেই বল না, অত বাক্যব্যয় করচ কেন?

পাঁচু। আজ্ঞে, কিন্তু আমার একটী কথা আছে, আমি গল্প বলতে আরম্ভ করলে, মধ্যস্থলে কেহ আমাকে বাধা দিয়া থামাইতে পারিবেন না। গল্প ভাল না লাগিলেও কেহ বিরক্ত হইতে পারিবেন না। গল্প দীর্ঘ হইলেও, গল্প বলিতে অধিক সময় লাগিলেও, কেহ উঠিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন না। ইহা আমার প্রতিজ্ঞা। আপনারাও যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তাহা হইলে কেন যে আজ দুর্গোৎসবের দালানে মা মনসাদেবীর প্রণাম-মন্ত্র পাঠ করিলাম, সে বিষয় খুলিয়া বলি। নহিলে পাঁচু এখনি বলিয়া যায়।

সভাস্থ প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, হাঁ, তাই হবে, তুই বেটা শীঘ্র গল্প আরম্ভ কর্।”

পাঁচু। তবে আমার দায় দোষ নাই;—আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আমি বলিতেছি,—আজ ষষ্ঠীর দিন, মহামায়া আসিবেন বলে মনটা কিছু প্রফুল্ল ছিল। তাই আজ কয়েক ছিলেম বেশী মাত্রায় টানা হয়। নেসায় মোহাৎ বুঁদ হয়ে ঘোষেদের আটচালায় বসে আছি, জানিনা, কেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। চক্ষু মেলিয়া দেখি, কোন এক অজানিত স্থানে এসে পড়েছি। চারিদিকে পাহাড় আর গাছ। কোথাও মন্দার, পারিজাত, সরল, শাল, তাল, তমাল, অর্জ্জুন। কোন স্থান বা আম্র,কদম্ব, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক বকুল, মল্লিকা মাধবী ইত্যাদি কুসুমিত শ্যামল শোভাময় নানা জাতীয় বৃক্ষ এবং লতা দ্বারা পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। সেথানে মধুরকণ্ঠ বিহগকুল প্রুতস্বরে গান করিতেছে। বন মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শরভ, মত্তমাতঙ্গ, মৃগ, শাখামৃগ ইত্যাদি নানাবিধ বন্য জন্তু বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। আমি তথা হইতে কিছু দূরে গিয়া দেখি, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তরের অট্টালিকা। তাহার সুনির্ম্মল শ্বেত আভা যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই মহাভবনে বিবিধ কারুকার্য্যের যে কি বিচিত্র ঘটা তাহা বর্ণনা করা মৎসদৃশ ক্ষীণকায় ব্যক্তির ক্ষমতার অতীত। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, দেউড়ীতে বিকটমূর্ত্তি দুইটী লোক দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে এক জন সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, আর অন্যে। একজন গাঁজা টিপিতেছিল।

আর থাকিতে না পারিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, “পেঁচো, তুই সাপের মন্ত্র আওড়াতে বসলি কেন?—যা তোর বলবার আছে, বলে ফেল্ না!!”

পাঁ। (যোড় হাতে) আজ্ঞে, আমাকে মধ্য পথে বাধা দিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পুন্নাম নরকে বাস হয়। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ভীষ্মপ্রতিজ্ঞ হউন।

সকলকে নীরব করিয়া পাঁচু বলিতে আরম্ভ করিল;—“আরও কিছু নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র চিনিলাম, তাহারা আমার চিরপরিচিত নন্দী এবং ভৃঙ্গী। তখন আমার দিব্য চক্ষু ফুটিল এবং বুঝিলাম যে, আজ গাঁজার প্রসাদে একেবারে সশরীরে কৈলাসপুরে আসিয়াছি। তখন মনে হইল, আজ আমার বড় জোর কপাল বলিতে হইবে। মুনি ঋষিরা যুগ-যুগান্তর তপস্যা করিয়া যাহা সহজে লাভ করিতে পারেন না, আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়া শুদ্ধ কয়েক ছিলেম গুণময়ী গাঁজার জোরে সেই মহামোক্ষ ফল হস্তগত করিয়াছি। তখন আর আমার আহ্লাদ ধরে না। আমি একেবারেই নন্দী-ভৃঙ্গীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার মনে মনে একটা বড় ভয় ছিল, পাছে তাহারা আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়া দেয়। কিন্তু রতনে রতন চেনে, আমাকে দেখিবামাত্র, তাহারা আমাকে চিনিয়া ফেলিল, অনেক খাতির-যত্ন করিয়া নিকটে বসিতে বলিল এবং দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, ‘দেশের দশা আর কি বলিব,—একে জলকষ্ট, তাহার উপর দুর্ভিক্ষ, তাহাতে আজ কাল আবার রুষাতঙ্ক হইয়াছে। এ ত্র্যহস্পর্শে লোক আর বাঁচে কেমন ক'রে বল! যিনি গৃহিণী, তিনি আমার জননীকে করিতে চাহেন দাসী,—আর এই দাসীপুত্র আমাকে করিতে চাহেন,—ক্ষেতে-খাটা কৃষাণ। গৃহিণী উঠেন বেলা এক প্রহরে, ঢাকাই শাড়ী তাঁহার আটপহরে, ওস্তাদ বিলক্ষণ আহারে, আর আছেন সদাই খোস-বাহারে। গৃহিণী বলেন,—

“পড়বো বই, উঠবো গাছে চড়বো মই,
মারবো পাড়ী ভাঙ্গবো ছই, ধরবো তান,—
‘কদম্বের মূলে দাঁড়িয়ে কালা কৈ?’

‘আমি একা কত কথা বলবো,—তবে মা ত স্বয়ংই যাচ্ছেন, তিনি স্বচক্ষে দেশের সম্পত্তি দেখবেন।’ এই সকল কথাবার্ত্তার পর ভৃঙ্গী আমাকে সঙ্গে করিয়া কৈলাসপুরীর মধ্যে লইয়া গেল।

তৃতীয় উল্লাস।

পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার জ্ঞান রহিত হইয়া গেল। ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল, আর দু-পা অগ্রসর হইতে যেন সাহস হইল না। যা হোক, ভাগ্যে সঙ্গে ভৃঙ্গী ছিল, বলিয়াই রক্ষা, নতুবা ভয়ে মুখ-থুবড়ে পড়িয়া যাইতেছিলাম। বাড়ীর প্রথম মহলের শোভা দেখে, আমার তো একেবারে চক্ষু স্থির!! যখন বিশ্বকর্ম্মা, স্বয়ং স্বহস্তে যেখানে যাহা শোভা পায়, সেখানে সেই সেই জিনিস দিয়া সাজাইয়াছেন, তখন সে সৌন্দর্য্যের আর কি কোন খুঁত আছে? প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে দেখিলাম,—জাতী, যূথী, মল্লিকা, মালতী, গোলাপ, গন্ধরাজ ইত্যাদি নানাবিধ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দালানের ধারে ধারে উজ্জ্বল রঙের মাটীর টবে

ভায়লেট, ভার্ব্বিণা, জিরেনিয়ম, চন্দ্রমল্লিকা এবং আরও কত শত গাছ সারি সারি সাজান রহিয়াছে। তাহার পর "ড্রয়িংরুমের" দিকে গেলাম। সে ঘরটী মস্ত বড়। চারি আঙ্গুল পুরু বিচিত্র-বর্ণের এক খানি সুকোমল গালিচা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর শ্বেত পাথরের এবং মেহগ্‌নি কাঠের বড় বড় টেবেল, চেয়ার, ইজি-চেয়ার, সোফা, কাউচ, ইত্যাদি বসিবার নানাপ্রকার আসন সাজান রহিয়াছে। উপরে নীল, পীত, লোহিত, বহুবর্ণের ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, বিশ্বকর্ম্মা, হ্যামিণ্টন এবং অসলারের দোকান একেবারে খালি করিয়া আনিয়াছেন। এই ঘরের এক ধারে একখানা প্রকাণ্ড ইজি-চেয়ারে ভবানীপতি ভূতনাথ, গাঁজায় দম মেরে বেদম হয়ে আলুথালুবেশে আধ-শোওয়া গোছ হয়ে আছেন। আলবোলার নলটা এখন পর্য্যন্ত হাতে আছে বটে, কিন্তু হস্তভ্রষ্ট হয়ে পড়-পড় হইয়া রহিয়াছে। একেত গাঁজার নেশায় তিনি নিজ্‌ঝুম নীরব, তাহাতে আবার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী শক্তিরূপিণী ভগবতী তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইবেন, তাঁহার দারুণ বিরহ-ব্যথা সহ্য করিতে হইবে বলিয়া নয়নত্রয়-বিভূষিত চারুমুখ বড়ই পরিম্লান হইয়াছে। পিনাক-পাণির অপূর্ব্ব-বিন্যাস-বিশিষ্ট জটাভার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিরোভূষণ শশিকলা এখন হীন-প্রভা হইয়াছে। বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত কপালে চিন্তারেখা প্রকটিত হইয়াছে। ধূর্জ্জটি ত এই ভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার বামদিকে একটী বড় টেবিল। তাহার সম্মুখে স্প্রিংয়ের গদি আঁটা চেয়ারে বহুরত্ন মণ্ডিতা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী জগন্মাতা স্বয়ং দশভুজা বসিয়া আছেন। পরিধানে রত্নখচিত মহামূল্য একখানি বারাণসী শাটী। গায়ে মহাপ্রভাযুক্ত মণি-মাণিক্যশোভিত বিচিত্রবর্ণের ওড়না; মণিমুক্তার আভায় তাহা ঝক্‌-মক্‌ করিতেছে। দক্ষিণে, ধন-ধান্যাদি-সম্পদ্‌-দাত্রী, অশেষ সৌভাগ্য-বিধায়িনী লক্ষ্মী; বামে, শ্বেতাম্বর বীণাপাণি বাগ্‌দেবী সরস্বতী। এক পার্শ্বে মণিমণ্ডিত-কাঞ্চনকণ্ঠ, সিদ্ধ্যবরদাতা, বিঘ্নবিনাশন শশি-সূর্য্য-সমপ্রভাযুক্ত গণনায়ক; অপর পার্শ্বে অমিত-বলবীর্য্য-শালী কুমার কার্ত্তিকেয়। আজ সকলেই মহা ব্যস্ত; বিশেষত গিরিরাজপুত্রী জগজ্জননী পার্ব্বতী। তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাশি রাশি টেলিগ্রাম্ নিমন্ত্রণ-পত্র রহিয়াছে। তিনি দশ হাতে তাহা খুলিতেছেন, এবং পড়িয়া যথাস্থানে রাখিতেছেন। এমন সময়ে নন্দী আসিয়া তাঁহার হাতে এক খানি পত্র দিয়া বলিল,—"মা! ডাকে এই চিঠি খানি আসিয়াছে, কিন্তু পত্রখানি বিয়ারিং, আমি বাজার খরচের পয়সা হইতে চারিটী পয়সা দিয়া ডাক-হরকরাকে বিদায় করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া অদ্রিসুতা কিছু বিরক্তভাব প্রকাশ করত বলিলেন,—"আমাকে আবার বেয়ারিং পত্র কে লিখিল?"

নন্দী। তা তো মা, জানি না, ঐ পত্র পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

নগরাজবালা পত্রখানি খুলিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পাছে "কালীর আঁচড়" দিলে ধার কর্জ্জ হয়, এই ভয়ে পত্র-লেখক যেন বিশেষ ভীত, তাই তিনি পত্রে কালীর সঙ্গে ততটা সংস্রব রাখেন নাই। যেনতেন-প্রকারেণ আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। যাহা হউক, মাতা জগত্তারিণী পত্রখানি লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি অতি কষ্টেও পত্রার্থ অবগত হইতে না পারিয়া, লক্ষ্মীর হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলেন,—"দেখ ত মা লক্ষ্মী! এ পত্রখানি কে লিখেছে?" লক্ষ্মী পত্রখানি লইয়া বিশেষ যত্ন-সহকারে পড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে "কালীর আঁচড়" আদৌ নাই, পড়বেন কেমন করে বল? শেষে হতাশ হইয়া বলিলেন,—"আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ যেরূপ লেখা, তাহা সহজে বোধগম্য হওয়া ভার।" লক্ষ্মী বিফল-প্রযত্না হইলে একে একে গণেশ কার্ত্তিককে পত্রখানি দেখান হইল, কিন্তু কেহই দন্তস্ফুট করিতে পারিলেন না। শেষে সরস্বতীর হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলেন,—"দেখ দেখি সরস্বতী! তুমি ভিন্ন দেখ্‌ছি আর কেহ এ পত্র পড়িতে পারিবে না; তুমিই পড়।" সরস্বতী পত্রখানি হাতে লইয়া, অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন,—"এতদিনের পর দেখছি আমাকেও হার মানিতে হইল, এ পত্র আমিও পড়িতে পারিলাম না, ইহা আমার বুদ্ধি-বিদ্যার অগোচর।" ভগবতী এবার সত্য সত্যই কিছু বিষণ্ণ হইলেন। অবশেষে অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ওহো, এতক্ষণের পর বুঝেছি, এ দেখছি সেই তারিণী ঘোষ পত্র লিখেছে।"

এই কথা বলিবামাত্র উদ্ধত যুবা কার্ত্তিক বলিয়া উঠিলেন, "মা! এমন কাজ করিতে হয়? আমরা সবে মাত্র এক এক পেয়ালা চা খেয়েছি, আর এখনও কিছুই খাই নাই, এমন সময় কি না আপনি সেই

অনামুখোর নাম করলেন। আজ দেখছি আমাদের আর যাওয়া হইবে না।"

কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া শৈলসুতার তাম্বূল-রাগ-রক্ত ফুল্লাধরে হাসির রেখা ঈষৎ অঙ্কিত হইল এবং বলিলেন,—"তোমাদের সে ভাবনা করিতে হইবে না, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।"

অনেক কষ্টের পর পত্রপ্রেরকের নামটা ত ঠিক হইল বটে, কিন্তু এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে এখন যায় কে? এই লইয়া পার্ব্বতীর মহা ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন,—ঘোষের বাড়ীর পূজায় কেহই যে সহজে যাইবে এমন বোধ হয় না। কিন্তু সেখানে না যাওয়াটা ত বড় ভাল দেখায় না; সে যেরূপ প্রকৃতির লোক হউক না কেন, সেও ত তাঁহার একজন ভক্ত।

চতুর্থ উল্লাস

জগদম্বা, অনেক চিন্তা করিলেন, মনে মনে নানা-প্রকার তর্ক-বিতর্ক করিলেন, ঘোষজার বাড়ীতে কাহারও না যাওয়াটা যে একেবারেই ভাল দেখায় না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। তখন ভবানী লক্ষ্মীকে বলিলেন,—"দেখ মা লক্ষ্মী! এবার তোমাকেই সেই ঘোষের বাড়ী যেতে হবে।"

লক্ষ্মী। না মা! আমি ও-বাড়ীতে কখনই যাইতে পারিব না। আমি বর্দ্ধমানের মহারাজের বাড়ী যাইব। সেই আমার হলো প্রকৃত স্থান, সেই স্থানে আমার অটল, অচল হয়ে থাকবার কথা। আমি সে বাড়ী পরিত্যাগ করে আর কোথায়ও যাইতে পারিব না। আপনি আর কাহাকেও পাঠাইয়া দিন।

ভগবতী। তবে মা সরস্বতি! তুমিই যাও।

সরস্বতী। আমি চিরদিন নদিয়ার নবদ্বীপে গিয়া থাকি, সেই আমার পীঠ-স্থান। সেই স্থানে আমার যত মান-সম্ভ্রম, আদর-অভ্যর্থনা, এমন আর কোন স্থানে নাই; এখন শ্মশান হইলেও আমি নবদ্বীপটী ত্যাগ করে আর কোথায়ও যাইতে পারিব না।

ভগবতী। আচ্ছা, তবে গণেশ! তুমিই না হয় যাও?

গণেশ। "মা! আমি তারক পরামাণিকের বাড়ী যাই। সেখানে সিদ্ধিদাতা হইয়া বসি। সেই মঙ্গলময় স্থান পরিত্যাগ করে, অন্য কোন স্থানে যাওয়া আমার কখনই সম্ভবে না।

ভগবতী। তবে বাপু কার্ত্তিক! তুমিই যাও?

কার্ত্তিক। আপনি বলেন কি মা! আপনি কিনা সেই অনামুখোর বাড়ীতে আমাকে যেতে বলেন? আমি শ্যামনটবরের বাড়ী যাব, সেখানে কত রঙ্গ বিরঙের "পাগড়ী" পরিব, আমোদ আহ্লাদ করে চারিদিক্ ঘুরে ফিরে বেড়াব, থিয়েটার দেখব, সেই অপ্সরা-বিনিন্দিত রমণীর কণ্ঠনিঃসৃত স্বর্গীয় গীত শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত করিব। আমি এমন প্রেমপূর্ণ জায়গা ত্যাগ করে কি অন্য কোন স্থানে যাইতে পারি? আপনি আর কাহাকেও পাঠাইয়া দিন।

ভগবতী। সিংহ! তবে তোমাকেই যেতে হচ্চে দেখ্‌চি, একজন না গেলে ত ভাল দেখায় না।

সিংহ এতক্ষণ টেবিলের নীচে শুইয়া ছিল, সে এই কথা শুনিয়া কেশর ফুলাইয়া হেলিতে দুলিতে এবং লেজ নাড়িতে নাড়িতে মা ভগবতীর সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"মা! আপনি ত বেশ জানেন, আমি আজন্ম কালটা শোভাময় বাজারের বাহাদুরদের বাটীতে গিয়া থাকি। সেখানে চিরদিনই বৃটিশ-সিংহের পদার্পণ হয়ে থাকে। যেমন যজ্ঞেশ্বর বিনা যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, সেইরূপ তথায় বৃটিশ-সিংহের পদ-ধূলি ভিন্ন কোন কাজই সিদ্ধ হয় না এবং পূজাও হীনাঙ্গ হয়। সে যা হোক, এমন স্থলে না গেলে ত আমার কাজ চলে না। আমি সেখানে যাব, বৃটিশ-কেশরীর সঙ্গে একাসনে বসে, সেক্ হ্যাণ্ড করে পা শুঁকাশুঁকি করিব। এক টেবিলে বসে আহারাদি করিব। তাহার পর নাচ তামাসা দেখে চক্ষু সার্থক করিব। এমন আনন্দপূর্ণ স্থান ছেড়ে কি আমি সেই হতভাগার বাড়ী যেতে পারি? মা আমাকে ক্ষমা করুন, আর যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই পাঠাইয়া দিন।"

তখন মা জগদম্বা মহিষাসুরের মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন,—"বাপু অসুর! তোমাকেই দেখ্‌ছি সেখানে যেতে হচ্চে, তুমি ভিন্ন আর কে যাবে বল?"

মহিষাসুর যোড় হাতে বলিল,—"জগদীশ্বরি! আমাকে ও-আজ্ঞাটী করিবেন না। আপনি ত সকলই জানেন, আমি চিরকালটা কে, ডি বসুর বাগান-বাড়ীতে যাই, সেখানে পিপে পিপে মধু পাচার করি, নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচি, গাই, চলিতে থাকি, মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিই, কাদা মাখি। এই তিন দিন আমাদের তাণ্ডবের চোটে ধরা থানা টলটলায়মান হয়। এমন মজার স্থান ছেড়ে কি আমি আর কোন স্থানে যাইতে পারি? আপনি সেই অনামুখোর

বাড়ীতে আর কাহাকেও পাঠাইয়া দিন, আমি সেখানে কোন ক্রমেই যাইতে পারিব না; বিশেষতঃ নিরম্বু উপবাস করাটা কস্মিন্‌কালেও আমার অভ্যাস নাই।"

জগদম্বা দেখিলেন,—তাঁহার ভক্ত ঘোষের বাড়ী কেহই যেতে চায় না। অবশেষে চালচিত্রদের একে একে তথায় যাইতে বলিলেন। তাহারা বলিল,—"না মা! আমরা আটস্কুলের প্রণয়ে চিরবদ্ধ। সে স্থান পরিত্যাগ করা আমাদের সাধ্যাতীত! মা ক্ষমা করুন। অন্য স্থানে যাইতে আমাদিগকে অনুমতি করিবেন না।

এবার সেই ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারিণী গিরিরাজ-তনয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি একে একে সকলকেই উক্ত ঘোষের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই যাইতে সম্মত হইল না। শেষে অনেক চিন্তার পর সর্পকে বলিলেন,—"দেখ বাপু সর্প! কেহই ত সে ঘোষের বাড়ী যেতে চায় না; এখন যে কি উপায় করিব তাহা ত ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না, একজন এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না গেলে আমার ভক্ত-মনোবাঞ্ছা-পূর্ণকারিণী নামে অপযশ ঘোষিবে। তাই বলি সর্প তুমিই যাও।"

এই কথা শুনিবামাত্র সর্পটী তড়াক্ করে এক লাফে গললগ্ন-কৃতবাসে, জোড় হাতে মহামায়ার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"মা, এতক্ষণের পর আপনি ঠিক আজ্ঞা করেছেন। আপনার ভক্ত ঘোষের বাড়ী, আমি ভিন্ন আর কাহারও যাওয়া শোভা পায় না; আমি মা! বায়ু-ভুক্; বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, ও গিরি-কন্দরে কত যুগ-যুগান্তর শুধু বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করিতে পারি তা মা! সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমী এই তিনটী দিন কি আর আমি অনাহারে থাকতে পারব না? তা আমি বেশ থাকতে পারব, আপনার আর কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে পিত্রালয়ে যান। আমি এই তিন দিন আপনার সেই ভক্ত ঘোষের পূজার দালানে গিয়ে ফণাটী তুলে ফাঁকা বায়ু ভক্ষণ করিব, আর দুলিতে থাকিব।"

ভগবতী। তা বেশ বাপু! তুমিই যাও, নহিলে আমাকে বড়ই অপ্রতিভ হইতে হইবে। কি জান বাপু! সকল ব্যক্তি সমান হয় না, তা যাই হোক, আমার কাছে কিন্তু সকল ভক্তই সমান। এক্ষণে তুমি খাবার উদ্যোগ কর।

সর্প। আজ্ঞা হাঁ মা! আমি এখনই যাচ্ছি। তবে এই কয়েকদিনের মত পেট-পূরে আহার করে নিই, তাহার পর যাত্রা করিব। আপনি সেজন্য কিছুই ভাবিত হইবেন না

এই বলিয়া সর্প উদর-পূর্ণ আহার করে, শ্রীমান ———ঘোষের বাড়ী যাত্রা করিল।"

পাঁচু এইরূপে আপনার উপাখ্যান শেষ করিয়া দালানস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বলি মহাশয়গণ! শুন্‌লেন ত; পাঁচু গাঁজা খায় বটে, তা বলে সে এত বেতালা নয় যে, দুর্গাপূজার দালানে এসে মনসার প্রণাম-মন্ত্র আওড়ায়। আমি এখনই কৈলাসপুরী হইতে সঠিক পাকা খবরটী জেনে এল্যাম যে, এবার আর এখানে মা আসিতেছেন না, তিনি তাঁহার পার্শ্বচর সর্পটীকে এ যাত্রা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কি জানেন মহাশয়গণ! পূজার কদিন এ বাড়ীতে যাওয়া আসা করিতে হয়, সাপটীকে মা দুর্গাই পাঠান, আর সে কৈলাস পুরী হইতেই আসুক, সাপের জাত ত বটে তাকে আর বিশ্বাস কি বলুন, কি জানি যদি পেটের জ্বালায় একটা ছোবল মারে; তাই আগে হতে মনসার প্রণামটা পড়ে "আরমার" করে রাখ্‌লাম! এখন বোধ হয়, আপনারা সব বুঝিতে পেরেছেন!! এখন বোধ হয়, আর আমাকে গেঁজেল বলে উপহাস করিবেন না।"

এই কথাগুলি বলার পর পাঁচুর কালিমাময় একটুকু হাসির রেখা দেখা দিল।

ঘোষজা মহাশয় ঘাড় হেঁট করে রহিলেন, মুখে একটী কথাও সরিল না। কথা কানে হাটে, অল্পক্ষণ মধ্যে পাঁচুর গল্পটা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল আমাদেরও গল্প ফুরাইল

গল্প ফুরাইল বটে, কিন্তু আজও ঘোষজা মহাশয়কে দেখিলেই পাড়ার বালকবৃন্দ বলিয়া উঠে,—

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু-মুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥

শ্রীসঃ—

ভেক-ভুজঙ্গ।

(প্রথম প্রস্তাব)

ভেক, সর্পজাতির আহার। সাপে বেঙ ধরিয়া খায়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সাপে বেঙ ধরিলে বেঙটা মৃত্যু-মুখে পড়িয়া ভয়ে ও

বিষের জ্বালায় ক্যাঁ-কোঁ করিয়া ডাকে, তাহাও সকলে দেখিয়াছেন। কিন্তু বড় বড় সোণা বেঙ গোখুরা সাপকে ধরিয়া খায়, বোধ করি তাহা সকলে দেখেন নাই। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার যেখানে সেখানে প্রতিদিন ঘটে না বলিয়া সকলে তাহা দেখিতে পান না। তাই এই অদ্ভুত ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আজি সর্প-বিষ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাইতেছি।

গোখুরা সাপ অনেক রকম। বাঙ্গালার স্থান বিশেষে ইহাকেই 'খরাঁশ' বলে। ইহার বিষ অত্যন্ত তীব্র, অতিশয় মারাত্মক। মানুষের রক্তের সঙ্গে অল্পমাত্র মিশিলে এক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে। দুই মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হইতে ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। মানুষ, গোরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যে সকল জন্তুর শরীরের রক্ত উষ্ণ, সাপের বিষে তাহাদের শীঘ্র মৃত্যু হয়। বেঙ, মাছ, টিকটিকী প্রভৃতি যে সকল জন্তুর শোণিত শীতল, সাপের বিষে তাহাদের শীঘ্র মৃত্যু হয় না। আবার যাহাদের রক্ত গরম, তাহাদেরও মধ্যে যে সকল জন্তু খুব বড়, তাহারা বিলম্বে মরে; যে সকল জন্তু ছোট, তাহাদের শীঘ্র মৃত্যু হয়। হাতীকে সাপে কামড়াইলে, শীঘ্র তাহার মৃত্যু হইবে না। আবার মানুষের শরীরে যতটুকু বিষ প্রবেশ করিলে, মানুষ হলাহলের জ্বালায় জর জর হইয়া প্রাণত্যাগ করে, ততটুকু বিষে হাতীর কিছুই হয় না। ফলকথা, বিষে শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত করে, তাহার পর মৃত্যু ঘটে। হাতী বড় জন্তু, তাহার সমস্ত শরীরে শোণিত-রাশি অনেক। তাই বিষের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী না হইলে হাতীর মৃত্যু হয় না।

আমাদের দেশের বড় তেঁতুলিয়া বিছার বিষে ছাগলের মৃত্যু হইতে দেখিয়াছি। বেহারে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে বিচ্ছু নামে এক প্রকার কীট আছে। তাহার গড়ন আমাদের দেশের কাঁকড়া বিছার মত। কিন্তু খুব বড়, খুব মোটা। কোন মানুষকে বিচ্ছুতে কামড়াইলে তাহাকে জগৎ অন্ধকার দেখিতে হয়, ব্রহ্মাণ্ড যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া পড়ে,—এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা! বিচ্ছুর বিষে মানুষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুর মৃত্যু হয়। একবার সন্ধ্যাকালে একটা ষাঁড়কে বিচ্ছুতে কামড়াইয়াছিল। ষাঁড়টা সমস্ত রাত্রি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ভোরের সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। ছোট বিচ্ছুতে কিংবা ছোট সাপে বড় বড় জন্তুকে কামড়াইলে বিষের জ্বালায় খুব কষ্ট হয় বটে, কিন্তু মৃত্যু না হইতে পারে।

একটা বড় গোখুরা সাপ অন্য একটা বড় গোখুরা সাপকে কামড়াইলে বিষে তাহার কোন অনিষ্ট হয় না। 'একটা' বাচ্ছা গোখুরা সাপ একটা বড় গোখুরা সাপকে কামড়াইলে বিষে তাহার কোনও ক্লেশ নাই। কিন্তু একটা বড় গোখুরা সাপ, একটা বাচ্ছা গোখুরা সাপকে কামড়াইলে, বাচ্ছাটা বিষের তেজ সহিতে পারে না। প্রথমে লেজ নাড়ে, মাথা কাঁপাইতে থাকে, তাহার পর ঢুলিয়া পড়ে। কিন্তু মৃত্যু হয় না।

বড় বড় কেউটিয়া সাপ, বড় বড় গোখুরা সাপের বিষ সহ্য করিতে পারে। বড় বড় গোখুরা সাপও বড় বড় কেউটিয়া সাপের বিষ সহ্য করিতে পারে। কিন্তু বড় কালাজ সাপকে দিয়া বড় গোখুরা সাপকে দংশন করাইয়াছিলাম, এবং বড় গোখুরা সাপকে দিয়া বড় কালাজ সাপকে দংশন করাইয়াছিলাম। এবার কালাজের বিষে গোখুরা জর জর, গোখুরার বিষে কালাজ জর জর। দুইটী সাপেই প্রাণত্যাগ করিল। তিন ঘণ্টা বাইশ মিনিট পরে কালাজটা মরিল; ছয় ঘণ্টা পরে গোখুরাটার মৃত্যু হইল। অতএব বোধ হয়, কালাজের চেয়ে গোখুরার বিষ অধিক তীব্র।

কেউটিয়া ভিন্ন গোখুরা সাপের বিষ অন্য কোন সাপে সহ্য করিতে পারে না। কেউটিয়া এবং গোখুরা সাপের বিষ,—ঢ়াঁড়া, হেলে, ঢোঁড়া, চিতি, বোড়া প্রভৃতি সাপের রক্তের সঙ্গে মিশিলে তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধভাবে ঝিমাইয়া থাকে; পরে মৃত্যু হয়। একটা বড় গোখুরা সাপ, আহারের জন্য একটা ঢোঁড়া সাপকে ধরিয়াছিল। তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি; কিন্তু শ্রাবণ মাস—বর্ষাকাল, পাতলা পাতলা মেঘে চাঁদকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তবু সে স্নিগ্ধ রজত-প্রতিমার সুধা-মাখা অঙ্গের ছটা মেঘ ফুটিয়া একটু একটু বাহির হইয়া আসিতেছে। বেশ স্পষ্ট করিয়া না হউক, সে আলোকে পথ দেখা যাইতেছে;

কিন্তু পথের কোথায় কি আছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। আমরা ঘরের ভিতরে বসিয়া ছিলাম, বাহিরে পথের উপরে কি শব্দ হইতে লাগিল; যেন কোন জীয়ন্ত প্রাণী নড়িতেছে, যেন ধীরে ধীরে কে কাহারে চাবুক মারিতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কি একটা বড় সাপ আস্ফালন করিতেছে, মাথা ঝাড়িতেছে,—কিন্তু কি সাপ; আর মাথা ঝাড়িয়া যে, সে কি করিতেছে, ভাল করিয়া তাহা দেখা গেল না,—মেঘের কোলে চন্দ্রবিম্ব লুকাইয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে লাণ্ঠন আনিলাম—বৃহৎ গোখ্‌রা সাপ একটা ঢোঁড়া সাপকে ধরিয়াছে। আলোক দেখিয়া ঢোঁড়া সাপটাকে ছাড়িয়া সে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পলাইবে কোথায়? জনৈক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ লাঠীর প্রহারে তাহাকে মারিয়া ফেলিল। ঢোঁড়া সাপটা পলাইতে পারিল না, সেই খানেই অল্প অল্প নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। পর দিন বেলা এগারটার সময়ে তাহার মৃত্যু হয়।

শকুনী, গৃধিনী, ময়ূর, হাড়গিলে প্রভৃতি পাখী সাপ ধরিয়া খায়। তাহারা ছোট বড় সকল প্রকার সাপ খায়; বিষাক্ত সাপকেও মারিয়া গিলিয়া ফেলে। বড় বড় সাপেও ছোট ছোট সাপকে ধরিয়া খায়। আবার আশ্চর্য্যের কথা কি বলিব?—বড় বড় ভেকও সাপকে না মারিয়া গিলিয়া খায়!

শকুনী ও গৃধিনী মরা সাপ খায়; ইহাদিগকে কখন জীবন্ত সাপ ধরিতে দেখি নাই। ইহারা যেমন অন্য অন্য মৃত দেহ খায়, সেইরূপ মৃত সাপও খায়,—কিন্তু সাপের মাথাটা খায় না। সমস্ত শরীরের মাংস হাড় হইতে খুলিয়া খাইয়া ফেলিয়া রাখে। মাথাতেই বিষ, বোধ করি এ জ্ঞান তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ।

হাড়গিলেরা জীবিত সাপকে মারিয়া খায়। ইহারা কাঁটা, পোঁটা, মাথা কিছুই বাছে না, এককালে সমস্ত সাপটাকেই গিলিয়া ফেলে। সাপ কিংবা অন্য অন্য দ্রব্য গিলিলে ইহাদের গলার থলী ঝুলিয়া পড়ে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইয়া যায়।

না কি সাপ মারিয়া তাহাকে লেজের দিক্ হইতে গিলিয়া আসে। ক্রমে সমস্ত শরীর উদরস্থ হইলে, ঠোঁট দিয়া সাপের মাথা চাপিয়া ধরে। ইহারাও না কি শকুনি-গৃধিনীর মত সাপের মাথা খায় না। সাপকে উদরস্থ করিয়া কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া এক পায়ে দাঁড়াইয়া ঘুমায়, তাহা হইলে সাপের সমস্ত মাংস জীর্ণ হইয়া যায়, কেবল অস্থিপঞ্জর অবশিষ্ট থাকে, তাহা উগারিয়া ফেলে। কিন্তু বনবাসী সাঁওতালেরা সে কথা বলে না। তাহারা বলে, হাড়গিলের মত ময়ূরেরা বড় বড় সাপকে তাড়া করিয়া ধরে না। বড় বড় গোখ্‌রা সাপকে তাহারা ধরিয়া খায় কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। আগ্রা জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তর ময়ূর। আমাদের দেশে যেমন সালিক, ছাতারে প্রভৃতি পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে চরিয়া বেড়ায়, ঐ সকল দেশে সেইরূপ ময়ূর অনেক। প্রখর রৌদ্রের সময়ে কোন উদ্যানের ভিতরে যাও, দেখিবে কোথাও বড় বড় গাছের শাখায় বসিয়া ময়ূরেরা গম্ভীর ষড়্‌জস্বরে কেকারব করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে; কোথাও নিবিড় পাতার ছায়ায় মাটীর উপরে চিকণ-চাঁদ-সাজানো পুচ্ছগুচ্ছ সোজা করিয়া মেলিয়া দিয়া পালে পালে ময়ূর চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে। ঐ সকল দেশে ময়ূর অনেক, সাপও অনেক। কিন্তু কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেহই ময়ূরকে সাপ ধরিয়া খাইতে দেখে নাই। তবে পূর্ব্বাপর যে সকল গল্প চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সকলে জানে। আমার নিজের দুইটা পোষা ময়ূর ছিল। তাহাদের কাছে বেত-আঁছড়া হেলে প্রভৃতি সাপ ফেলিয়া দিতাম; ময়ূরগুলা সে দিক্ পানে ফিরিয়াও চাহিত না। কিন্তু পোষা জন্তুর কাছে সকল বিষয়ের ঠিক পরীক্ষা হয় না।

ঢোঁড়া সাপ ও বোড়া সাপ, কেউটিয়া ও গোখ্‌রা সাপের বিষে মরিয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, ঐ সকল সাপ পরস্পর সঙ্গত হইয়া থাকে, তখন পরস্পর দংশনও করে, তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, না রাগিলে সাপেরা বিষদাঁত দিয়া দংশন করে না।

ডাঁড়া সাপে অন্য অন্য ছোট সাপকে ধরিয়া খায়। ছোট ছোট গোখুরার বাচ্ছাকেও ধরিয়া খায়। একবার একটা ডাঁড়াসাপে ছোট একটী গোখ্‌রা সাপের বাচ্ছাকে ধরিয়া তাহার লেজের দিক্ হইতে গিলিয়া আসিতেছে,—আমরা

বেড়াইতে যাইতেছিলাম, সম্মুখে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইলাম। গোখুরা সাপটা ফণা মেলিয়া ঊর্দ্ধমুখে এ-দিক্ ও-দিক্ দুলিতেছে, কিন্তু ঢাঁড়া সাপটাকে দংশন করিতেছে না। ক্রমে ক্রমে সমস্ত সাপটা উদরস্থ হইল, কিন্তু গোখুরার বাচ্ছাটা একবারও ডাঁড়াসাপকে দংশন করিল না।

বেজীরা দাঁতে করিয়া সাপকে কাটিয়া ফেলে। তাই অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, নেউলে বেশ সাপের ঔষধ জানে। সাপে কামড়াইলে তাহারা বনের ভিতরে গিয়া ঔষধ তুলিয়া খায়, সে কারণে সর্পাঘাতে নেউলের মৃত্যু হয় না। এ বিশ্বাস একেবারে অমূলক। নেউলে সহসা সাপকে কাটিতে পারে না ; সাপ ফণা তুলিয়া থাকিলে তাহার কাছেও অগ্রসর হইতে পারে না। বেজীটা তখন দূরে থাকিয়া সাপকে বেড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক ক্ষণ পরে সাপটা ক্লান্ত হইয়া ফণা নামাইলে, বেজীটা হঠাৎ তাহার উপরে পড়িয়া কাটিয়া ফেলে কিন্তু সেই অবসরে সাপটাও যদি সুবিধা পাইয়া একবার দংশন করিতে পারে, তাহা হইলে বেজীরও নিস্তার নাই।

একটা বড় আশ্চর্য্য কাজ অনেক বার দেখিয়াছি। কুকুর, বিড়াল, নেউল, বানর, ইঁদুর, ছুঁচে, প্রভৃতি জন্তু সর্পাঘাতে মরিয়া যায়, কিন্তু সকল সময়ে তাহাদের মৃত্যু হয় না। ইহার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন, সর্পাঘাত হইলে শীঘ্র শীঘ্র বিষ চাটিয়া ফেলিলে আর কোন অনিষ্ট হয় না। সাপে কামড়াইবামাত্র ক্ষতস্থান খুব জোরে চুষিতে পারিলে অনেকটা উপকার হয় বটে, কিন্তু চাটিলে কতদূর ফল দর্শে বলিতে পারি না। বিড়াল আপনার মাথা আপনি চাটিতে পারে না। গত বৎসর আষাঢ় মাসে একটা গোখুরাসাপ কোন গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। একটা বিড়াল আসিয়া তাহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। শেষে দুই জনে বিরোধ। সাপটার জেদ, যে কোন প্রকারে হউক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে, বিড়াল কিছুতে পথ ছাড়িয়া দিবে না। সাপটা যে দিকে যায়, বিড়াল সেই দিকে গিয়া তাহার মাথায় থাবা মারে। সাপটা ফণা তুলিয়া দংশন করিতে আসে, বিড়াল অমনি সরিয়া দাঁড়ায়। সারা রাত্রি দুই জনে এইরূপ যুদ্ধ হইল, সারা রাত্রি লোকে কাতার দিয়া দেখিতে লাগিল। শেষে বিড়ালটা আর পথ আগুলিয়া থাকিতে পারিল না ; সাপটা তাহার মাথায় কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই, তিন চারি দিন বিড়ালটা বিষে জরিয়া পড়িয়া থাকিল, একবারও উঠিল না, কিছুই খাইল না। তিন চারি দিন পরে পূর্ব্বের মত সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল।

তাহার পর ভেক-ভুজঙ্গের খাদ্যখাদক-সম্বন্ধের কথা। সাপে বেঙ ধরিয়া খায়, বালককাল হইতে ইহাই দেখিয়া আসিতেছি, তাই বেঙকেই সাপের খাদ্য বলিয়া জানিতাম। কিন্তু ইহার ভিতরে যে বিধাতার কার্য্যকৌশল অন্য রকমও আছে, তাহা কখন দেখি নাই। দেখি নাই বলিয়া মনেও কখন ভাবি নাই। বেঙ সাপের খাদ্য ; সাপ বেঙের খাদক। আবার সাপও বেঙের খাদ্য, বেঙ সাপের খাদক।

১২৯৭ সালের শ্রাবণ মাসে বেলা দুই প্রহরের সময়ে আমি একটা কালাজ ও একটা গোখুরা সাপ লইয়া তাহাদের বিষের নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছিলাম ; ইত্যবসরে জনৈক প্রতিবাসী দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া সংবাদ দিল,—"মহাশয়, শীঘ্র আসুন ; একটা বড় ঝাইড়ু বেঙে একটা খরীশ সাপকে ধরিয়াছে।" এই অদ্ভুত সংবাদ শুনিয়া আমি ঊর্দ্ধমুখে ছুটিলাম,—পড়ি তো উঠি না। প্রতিবাসীর বাটীতে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। উঠানে শাক-সব্‌জির পাতলা পাতলা বন আছে, তাহার মধ্যে একটা বড় সোণা বেঙ একটা গোখুরা সাপকে ধরিয়া লেজের দিক্ হইতে গিলিয়া আসিতেছে। প্রায় ছয় অঙ্গুলি লাঙ্গুল গিলিয়া ফেলিয়াছে, মস্তকের দিক্ বাহিরে আছে। সাপটা ফণা মেলিয়া ঊর্দ্ধমুখে এদিক্ ওদিক্ দুলিয়া বেড়াইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত কি হয়, সাপটা বেঙকে কামড়াইয়াছিল কি না, এই সকল দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি, ইত্যবসরে জনৈক ইতর লোক হঠাৎ গিয়া লাঠীর প্রহারে সাপ ও বেঙ উভয়কেই মারিয়া ফেলিল। সাপটাকে মাপিয়া দেখা গেল এক হাত দুই অঙ্গুলি লম্বা। সাধারণ লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে, যে, সকল বেঙে পাখী কিংবা সাপ ধরিয়া খায়

তাহাদের মাথায় মাণিক থাকে। মাণিক পাওয়া যাইবে বলিয়া অষ্টাহ কাল বেঙটাকে গোবর চাপা দিয়া রাখা হইল, খুব দুর্গন্ধ ছুটিল, কিন্তু মাণিক মিলিল না। আমার কাছে এই গল্পটী শুনিয়া কেহ কেহ বলিলেন যে, "সর্পবিষে সোণা বেঙের মৃত্যু হয় না। কারণ সোণা বেঙের মস্তিষ্কে মতির বীজরস আছে। মতির বীজরস অত্যন্ত বিষনাশক। কাহাকে সাপে কামড়াইলে ক্ষত স্থানে ঐ বীজরস মাখাইয়া দিলে তাহার মৃত্যু হয় না।" পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ঐ সমস্ত কথা নিতান্ত অলীক। সাপের বিষে সোণা বেঙের মৃত্যু হয় এবং সোণা বেঙের মজ্জায় সর্পাঘাতের রোগীর কিছুই উপকার হয় না।

হুঁকার কাইট এবং খুব কটু হুঁকার জল খাওয়াইয়া দিলে সকল প্রকার সাপ ৩।৪ মিনিটের মধ্যে মরিয়া যায়। কার্ব্বলিক এসিডের উগ্র গন্ধ লাগিলে সর্পজাতির কিছু বিলম্বে মৃত্যু হয়। বিল্বপত্রের ও বরাহক্রান্তের রসের গন্ধ পাইলে সে দিকে সাপেরা সহসা যাইতে চাহে না।

একটা প্রবাদ আছে, সাপে কামড়াইলে আফিমখোরের কিছুই অনিষ্ট হয় না। এ প্রবাদ সম্পূর্ণরূপে সত্য না হউক, কিন্তু একেবারে নিতান্ত অমূলকও নয়। আমাদের জনৈক কুটুম্ব অত্যন্ত আফিমখোর ও গুলিখোর ছিলেন। বালককাল হইতেই এই দুইটা নেসায় তাঁহার প্রগাঢ় অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছিল। রাত্রি নাই, দিন নাই,—প্রায় সর্ব্বদাই 'নলে আর মুখে হইয়া' থাকিতেন;—তোড় জোড় যেরূপ তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার উপরে আফিম,—সকালে কুলের মত এক গুলি, সন্ধ্যাতে কুলের মত এক গুলি। যে সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন বয়ঃক্রম প্রায় আটান্ন বৎসর। শরীর মলিন; কোথাও মাংস নাই,—কেবল অস্থিচর্ম্ম সার। নেসায় নেসায় দেহদণ্ডখানি পাকিয়া খাঁটি ইস্পাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কলিকাতার দক্ষিণে কোন গ্রামে তিনি ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলেন। প্রজারা জাতিতে সদ্‌গোপ। ঠাকুর মহাশয় বাটীতে আসিয়াছেন, গৃহস্থেরা পরম আহ্লাদে তাঁহার খাদ্য-সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিল। ঠাকুর মহাশয় সন্ধ্যাকালে যথাবিধি মৌতাতের পর ভোজনাদি সারিয়া শয়ন করিলেন। আফিমখোরের প্রথম রাত্রিতে নিদ্রা আসে না, প্রায় তামাকু খাইয়া নিশিভোর করিতে হয়। কাজেই ঠাকুর মহাশয় শেষ রাত্রি হইতে ঘুমাইয়া বেলা দেড় প্রহরের সময়ে শয্যা হইতে উঠিলেন। দুই চক্ষু লাল জবাফুল। তিনি বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছেন, বৃদ্ধ গৃহস্বামী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তাহার পর আপনার সন্তানদিগকে বলিলেন,—তোমরা শীঘ্র ঠাকুর মহাশয়ের ভোজনের আয়োজন করিয়া দাও। ঠাকুর মহাশয় রাগে অগ্নিকুণ্ড। তিনি গৃহস্বামীকে বলিলেন,—"তোমরা ব্রহ্মহত্যা করিতে পার। তোমাদের আর আদরে কাজ নাই। কল্য রাত্রিতে ভোজনের পরে শুইলাম; বিছানায় একটা সাপ ধরিয়া রাখিয়াছিলে। আমার বিষয় ফাঁকি দিয়া লইবে, তাহাই তোমাদের ইচ্ছা। এই দেখ সাপটা হাতে কামড়াইয়াছে। সারারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি। বড় আলস্য হইল, তাই তোমাদিগকে আর ডাকিতে পারিলাম না। আমি এখন আমার বাটীতে চলিয়া যাই।

এই বলিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন।

ব্রাহ্মণের শয়ন-গৃহের এক কোণে অনেক গুলি সপ জড় করা ছিল। সকলে অনুসন্ধান করিয়া দেখে, তাহার মধ্যে একটা বড় গোখুরা সাপ মরিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সকলের হৃৎকম্প হইল। ব্রাহ্মণকে কেহ বাটীতে ফিরিয়া আসিতে দিল না, সেই খানেই চিকিৎসা হইতে লাগিল। বেলা প্রায় চারিটার সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সর্পবিষে আফিমখোরদের অনেক বিলম্বে মৃত্যু হয়, কিন্তু মৃত্যুমুখ হইতে এককালে অব্যাহতি পায় না। আর এক কথা আছে। অনেকে বলেন, আফিমখোরকে সাপে দংশন করিলে আফিমের বিষে সাপের মৃত্যু হয়, আফিমখোরের মৃত্যু হয় না। এখানে সাপটা মরিয়াছিল, তাহাতে ঐ সংস্কার অনেকের মনে বদ্ধমূল হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ জনপ্রবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা, আফিমখোরকে সাপে কামড়াইলে সাপের মৃত্যু হয় না। এক্ষেত্রে সাপটা মরিয়া

গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার মৃত্যুর অন্য কোন কারণ ছিল, সন্দেহ নাই।

দীর্ঘকাল শেঁকো বিষ খাইলে সর্পবিষে শীঘ্র অনিষ্ট করিতে পারে না। লাহোরে একবার অনেক সন্ন্যাসী একটা সাপ লইয়া লোককে নানা প্রকার কৌতুক দেখাইতেছিলেন। সাপটা সন্ন্যাসীকে পুনঃপুনঃ দংশন করিতেছিল, কিন্তু ফলে তাঁহার কিছুই অনিষ্ট হয় নাই। ডাক্তার হনিগ্‌বর্জার সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য কাজ দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, ইহার ভিতরে কোন চাতুরী আছে তাহাতে ভুল নাই। বোধ করি, সাপটার বিষ-দাঁত ভাঙ্গা, কিংবা বিষের থলী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই পুনঃপুনঃ দংশনে সন্ন্যাসীটির মৃত্যু হইতেছে না। যাহা হউক, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এইরূপ মনের মধ্যে ভাবিয়া তিনি সাপ ও সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া আপনার কুঠীতে গেলেন। পর দিন পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সাপটার বিষদাঁত আছে, বিষের থলীও আছে। এই সকল দেখিয়া হনিগ্‌বর্জার বড়ই চমৎকৃত হইলেন, তিনি সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দিলেন না।

তিন চারি দিন গত হইয়া গেল। হনিগ্‌বর্জার প্রত্যহ এক এক বার সাপটাকে দেখেন আর সন্ন্যাসীকে দেখেন; আর এই অদ্ভুত ব্যাপারের ভিতরে কি কৌশল আছে তাহাই ভাবিতে থাকেন। অনেক দেখিলেন, অনেক ভাবিলেন, কিছুই ঠিক হইল না। পরিশেষে মহারাজ রণজিৎ সিংহের কাছে তিনি এই গল্প করিলেন। মহারাজ কৌতুক দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তৎক্ষণাৎ লোক গিয়া সাপটাকে ও সন্ন্যাসীকে আনিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিল। রণজিৎ সিংহ, সন্ন্যাসীর ক্ষমতা দেখিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসী সাপটাকে রাগাইয়া দিলেন, সাপটাও রাগিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দংশন করিল। কিন্তু আজি আর সে ক্ষমতা নাই, সন্ন্যাসী বিষের তেজে ঢুলিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত ডাক্তার সাহেবকে বিস্তর কষ্ট ও যত্ন পাইতে হইয়াছিল। জ্ঞান হইলে ডাক্তার হনিগ্‌বর্জার সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেদিন সাপটা তোমাকে এত দংশন করিয়াছিল, তাহাতে তোমার কিছুই অনিষ্ট হয় নাই, আজি তুমি ঢুলিয়া পড়িলে কেন?" সন্ন্যাসী কহিলেন,—"মহাশয়, চারি দিন হইল আপনি আমাকে কুঠীতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি নিত্য শেঁকো খাই, আজি চারি দিন তাহা পাই নাই। তাই ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম, আমার শেঁকো খাওয়া অভ্যাস আছে, তাই আপনি আমাকে বাঁচাইতে পারিলেন, অন্য লোক হইলে আপনার চিকিৎসায় কোন ফল হইত না। আজি যদি পুনর্ব্বার শেঁকো খাই, কল্য ঐ সর্পবিষে আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।"

সন্ন্যাসী, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে, তাঁহার কুঠীতে গিয়া সেদিন তিনি চারি বার শেঁকো খাইলেন। পরদিন রাজসভায় সাপটাকে আনিলেন। সাপটা পুনঃপুনঃ দংশন করিল, সেদিন সন্ন্যাসী আর ঢুলিয়া পড়িলেন না। শেঁকোর এইরূপ গুণ দেখিয়া শার্প প্রভৃতি ডাক্তারেরা সর্পাঘাতে শেঁকো প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

প্রথম প্রস্তাব সমাপ্ত।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

আমার জীবনচরিত

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আমি পথভ্রান্ত পথিক। বিপদে পড়িয়া, আমি হারাইয়া গিয়াছি। হারাইয়া গেলে, চিত্ত যে কিরূপ চঞ্চল হয়, প্রাণ যে কিরূপ হাঁকুপাঁকু করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে সক্ষম নয়। যে দিকে যাই, সেই দিকেই দেখি কাঁটার বন। দেখিয়া আমার কেমন দম্ আট্‌কাইবার উপক্রম হইল। যেন মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। বোধ হইল,—মরণ ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল ছিল। আজ দিবসে, তোপে উড়াইলে, এ নিদারুণ মর্ম্ম-যাতনা সহ্য করিতে হইত না। এই দগ্ধ অদৃষ্টকে কতই ধিক্কার দিলাম। আমার কান্না আসিতে লাগিল। চক্ষু ফাটিয়া ক্রমশ অশ্রু প্রবাহিত হইতে

লাগিল।—"হে জগজ্জননি মহামায়ে! এই অবোধ সন্তানের জন্য এত মায়াজাল কেন পাতিলে মা? যদি তোমার এইরূপই অভিলাষ ছিল, তবে আজ তোপের মুখ হইতে কেন অব্যাহতি দিলে মা? এই অনন্ত অরণ্যে, এই অনন্ত দুর্বিপাকে পড়িয়া, প্রাণ যে বাহির হয় মা!"

বিজন বনমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। ক্রমশ চক্ষের জল আপনা-আপনি নিবৃত্ত হইল। ভাবিলাম,—"কাঁদিয়া কি হইবে? রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলাম,—মেঘ তখনও সম্পূর্ণরূপ কাটে নাই। সেদিন কি তিথি, তাহা স্মরণ ছিল না। তবে মনে মনে এই আশা হইতেছিল, চন্দ্রদেব হয় ত এখনই উদিত হইবেন; জ্যোৎস্না-আলোকে তখন হয় ত পথ দেখিতে পাইব। এখন অন্ধকারে ঘুরিয়া কোন লাভ নাই। নিশা-নাথের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম; কিন্তু দুরদৃষ্ট এমনই, গগন-গর্ভে চাঁদের দেখা পাইলাম না। মেঘ দূর হইল, আকাশ তারার মালা পরিলেন, কিন্তু বোধ হয়, আমার জন্যই সেদিন কেবল চাঁদকে বক্ষে ধারণ করিলেন না।

এই মহা অরণ্যে পার্ব্বতীয় ভূমির উপর আমি অবস্থিত। জমী সমতল নহে। জমী কোথাও বা উচ্চভাবে খানিক উঠিয়াছে, কোথাও বা নিম্নে নামিয়াছে;—ঠিক যেন সাগরের ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে চলিয়াছে।

এই পর্ব্বতময় প্রদেশ পাথর এবং মৃত্তিকা, মিশ্রিত। কে যেন মাটী দিয়া পাথর গাঁথিয়া দিয়াছে। এই পর্ব্বতারণ্যে ক্ষুদ্র প্রস্রবণ আছে, ঝরণা আছে এবং গিরি-নদীও আছে।

বর্ষা কাল। অদ্য সম্ভবত এস্থলে বহুবার বৃষ্টি হইয়া থাকিবে। অরণ্য-প্রদেশ কর্দ্দমময়। কয়েক বার পা পিছলিয়া টক্কর খাওয়াতে দক্ষিণ পদের পাদুকা ছিন্নপ্রায় হইয়াছে; তবে নিতান্ত অচল হয় নাই। আমি একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের গুঁড়ীতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। জুতার ভিতর শুষ্ক পত্রখণ্ড, জল ও অল্প কাদা ঢুকিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। জুতা খুলিয়া, নিম্নে এক শিলাখণ্ড ছিল, তাহার উপর বসিলাম।

ভাবিতে লাগিলাম,—"এখন কি করি? কোন্ উপায়ে এরাত্রে রক্ষা পাই? এখানে বসিয়া থাকিলে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু, অথবা বিষাক্ত পার্ব্বতীয় সর্প দ্বারা নষ্ট-প্রাণ হইতে পারি।" গাছে উঠিয়া রাত্রিবাস করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। কিন্তু বৃক্ষশাখায় অবস্থিতি করিলেও নিতান্ত যে বিপদ-শূন্য হইব, তাহাও নহে। ভল্লুক, বৃক্ষারোহণে বিলক্ষণ সমর্থ। শুনিয়াছি,—কোন একজাতীয় বাঘও গাছে উঠিতে পারে। সুতরাং আরণ্য-বৃক্ষে আরোহণ করিলেই বা সুস্থির হইতে পারি কৈ? আরও বিশেষ কথা এই,—আমি গাছে উঠিতে মোটে জানি না। সে অভ্যাস বাল্যকাল হইতে আদৌ ছিল না। কস্মিন্ কালে আমি কোনও গাছে উঠিয়াছিলাম কি না, আমার স্মরণ নাই। সেই লম্বা-লম্বা গাছ যেন তাল-নারিকেল-আদি বৃক্ষের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই, আকাশ-পথে উঠিয়াছে। সে গাছে আমি কেমন করিয়া উঠিব? এই সকল পার্ব্বতীয় বৃক্ষ, অশ্বত্থ বা বটের ন্যায়, বৃহৎ বৃহৎ শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট নহে। গুঁড়ীর দশ বার হাত লম্বা। তাহার পর ছোট ছোট ডাল আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত গাছই, কেমন এক রকম জলে ভিজিয়া পিছল হইয়া আছে। বলুন! আমি কেমন করিয়া গাছে উঠি?

আরও এক কথা এই,—গাছে উঠিলে পড়িয়া যাইতে পারি। কোন্ ডাল শক্ত, কোন ডাল্ পল্কা, তাহার বিচারই বা কেমন করিয়া করিব? বিশেষ যদি আমার নিদ্রাকর্ষণ হয়, তাহা হইলে তো একবারেই গিয়াছি। নিদ্রাকর্ষণ না হইলেও গাছের উপর বসিয়া-বসিয়া মন-ভ্রমেও তো পড়িয়া যাওয়া সম্ভব। তবে করি কি? যুক্তি কি?

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যে দিকে কাঁটার বন কম দেখিলাম, সেদিকপানেই অগ্রসর হইলাম। মনে মনে আশা,—"যদি সুপথ পাই।" কিন্তু কোথায় বা পথ, আর কোথায় বা নিরাপদ স্থান! কাঁটার বন কিঞ্চিৎ কমিল বটে; কিন্তু বনবৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ ক্রমশই বৃদ্ধি হইল। এখানকার গাছগুলি অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী এবং বৃহৎ শাখা প্রশাখা-বিশিষ্ট। বৃক্ষগণ যেন দশবাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। সেই ঘোর অন্ধকারে, উঁচু নীচু পিছল পথ দিয়া,

যাইতে যাইতে হঠাৎ এক ডালে মাথা ঠুকিয়া আমি পড়িয়া গেলাম। আঘাত অধিক লাগে নাই; কিন্তু দেহ কাদামাখা হইল। আমি মনে মনে কহিলাম,—'আর সুপথ অন্বেষণ করিবার আবশ্যকতা নাই। আর অগ্রসর হইব না। অদৃষ্টে যা থাকে, এই খানেই রাত্রি যাপন করিব। বিশেষত এস্থানের বৃক্ষসমূহ আরোহণ এবং অবস্থিতির পক্ষে কিঞ্চিৎ অধিক উপযোগী।

এইরূপ কল্পনা করিতেছি, এমন সময় অদূরে ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের ন্যায় বিকট শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আমি ভাবিলাম,—"এইবার কৃতান্ত আসিতেছে।" যে দিকে শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই দিকে কান পাতিয়া রহিলাম। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহ কম্পিত হইয়া উঠিল। এই বৃক্ষ-সমুদ্রের কম্পন-ঢেউ আমার গায়ে লাগে নাই বটে; কিন্তু আমার সম্মুখবর্ত্তী দশহাত দূরস্থিত বৃক্ষসমূহ কাঁপিয়া উঠিল বলিয়া বোধ হইল। আমার দৃঢ় ধারণা হইল,—নিশ্চয়ই এদিকে বাঘ আসিতেছে। আমি এক বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—'এ স্থলের বৃক্ষসমূহ বহুতর ডাল-পালা বিশিষ্ট এবং গুঁড়ীর নিকটেই ডাল ছিল। গাছে উঠিয়া বাঘের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম বটে; কিন্তু বাঘ আসিল না। তখন আমি স্থির করিলাম, কোন এক বৃহৎ ব্যাঘ্র, কোন এক জন্তুকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া থাকিবে; তাই গাছ সকল নড়িয়া উঠিয়াছিল।

অতিকষ্টে সেই বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলাম। এই খানেই নিশা যাপন করিতে হইবে, মনে করিয়া, একটী কঠিন অথচ মোটা ডালে পা-ঝুলাইয়া বসিলাম। পশ্চাতে ঠেশ দিবার জন্য একটী ডাল ছিল। পাছে নিদ্রা আসিলে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে, পরিধানের সেই একমাত্র বসন লইয়া, সেই ঠেশদিবার ডালটীর সঙ্গে আপনাকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিলাম।

রজনী ঘোর তমময়ী। নীল আকাশে অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হইয়া প্রাণ-পণে এই ঘোর কাল নিশার তিমির বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা! অগণন দাস-দাসী দ্বারা সেবিতা হইলেও, স্বামী বিহনে যেমন রমণীর হৃদয়-আকাশের অন্ধকার দূর হয় না; সেইরূপ কোটি কোটি পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ তারার ফুল ফুটিয়া উঠিলেও, এক চন্দ্র ব্যতীত, আকাশ বা পৃথিবীর অন্ধকার দূর করিতে কেহই সক্ষম নহে। কথিত আছে,—"রামচন্দ্রের সমুদ্র-বন্ধন কালে, ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-বিড়ালকুল সেতু-নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিল।" বোধ হয়, সেই ক্ষুদ্র জীবের অনুকরণ করিয়া, ক্ষুদ্রাদপি খদ্যোতকুলও সেই ঘোর অন্ধকার বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ একত্র মিলিত হইয়া, এক একটী বনস্পতিকে, ফিরিয়া-ফিরিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া আছে। যেন তাহারা আপনা-আপনি হীরকের হাররূপে গ্রথিত হইয়া, বনস্পতির গলদেশে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ফুৎকারে যেরূপ হিমগিরি উড্ডীন হয় না, সেইরূপ জোনাকীর শত চেষ্টাতেও অন্ধকার দূর হয় না।

রজনী যতই গভীর হইতে লাগিল, ততই বন্যজন্তুদের ভীষণ গর্জ্জন শুনিতে লাগিলাম। তাহারা অন্ধকারে আপনাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লুক্কায়িত করত, আহার-অন্বেষণের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। সেই নিদাঘ-নিশীথে, পর্ব্বত-নিঃসৃত অসংখ্য নির্ঝরিণীর কল কল শব্দে চারি দিক্ নিনাদিত হইয়া উঠিল। ঝিল্লীকুল উভরায়ে চীৎকার করিয়া কাণ ঝালা-পালা করিয়া তুলিল। মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া বোঁ-বোঁ শব্দে বায়ু বহিতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে আমিও বৃক্ষের সহিত দুলিতে লাগিলাম। তখন মনে হইতে লাগিল,—বুঝি এইবার ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এবং আমিও ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চত্ব পাইব।

কিন্তু নিদ্রা দুরতিক্রম্য। মহীরুহের শীর্ষদেশে অবস্থিতি করিয়াও, মাঝে মাঝে বায়ুবেগে দোদুল্যমান হইয়াও, মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশঙ্কা অহরহ হৃদয়ে জাগরূক থাকিলেও,—নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে, অতর্কিতভাবে আসিয়া, ক্ষণে ক্ষণে আমার চেতনা অপহরণ করিতে লাগিলেন। ইহা প্রকৃত নিদ্রা না হউক, ইহাকে গভীর তন্দ্রা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাত্রি যত শেষ হইতে লাগিল, ততই আমি ঢুলিয়া ঢুলিয়া চম্‌কাইয়া উঠিতে লাগিলাম। জাগিয়া উঠিয়া মনে করি,—আর ঘুমাইব না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিব না, আর বৃক্ষ-শাখায় ঠেশ দিব না,—এই ঠায় ঠিক সোজা স্ফীতবক্ষে

বসিয়া রহিলাম। দেখি, কেমন করিয়া নিদ্রা আইসে। কিন্তু নিদ্রা—অনন্ত অসীম শক্তি-শালিনী। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই মহাশক্তির নিকট পরাভূত। আমি কোন্ ছার, কোন কীটানুকীট! অচিরেই আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। অচিরেই আমি নিদ্রা-বিষে অভিভূত হইলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। এবার একটু গতিক খারাপ দেখিলাম। আমি দক্ষিণ পার্শ্বে ঢুলিতে ঢুলিতে এরূপ হেলিয়া পড়িয়া-ছিলাম যে, আর একটু হেলিলেই ভূতলে পড়িয়া যাইতাম। দৈবানুগ্রহেই কেবল বাঁচিয়াছি বলিয়া মনে হইল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম,—বৃক্ষের শীর্ষদেশে আর এরূপ ভাবে থাকা উচিত নয়। নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়া থাকি, অথবা একটু বেড়াই; তাহা হইলে আর ঘুম আসিবে না। এরূপ অন্ধকার রাত্রিতে হঠাৎ নিম্নে অবতরণ করা উচিত কি না, তাহাও ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রি আর কত আছে? অনেকক্ষণ হইতেই ত মনে করিতেছি, শেষ-রাত্রি হইয়াছে। অথচ এখনও প্রভাত হইল না। আমার হিসাব ধরিলে এতক্ষণ বেলা ৯টা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এ কাল-রাত্রি পোহায় কৈ? বিপদের রাত্রি বড়ই দীর্ঘ হইয়া থাকে।

নিদ্রার বেগ হ্রাস করিবার নিমিত্ত আমি সেই বৃক্ষের শীর্ষদেশ হইতে মধ্যদেশে, বহুকষ্টে বাঁধন খুলিয়া অবতরণ করিলাম। ভাবিলাম এরূপ গমন, নড়ন-চড়ন এবং উদ্যমে নিদ্রা দূর হইবে। মধ্য-দেশে আসিয়া, আবার সেইরূপ একটী ডাল বাছিয়া লইয়া, আপনাকে ডালের সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিলাম। উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে কেবল প্রভাত কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঐ অরুণ উদয় হইল, ঐ ঊষাদেবী উঁকি মারিল, ঐ বুঝি পাখী-কুল কলরব করিয়া উঠিল,—কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল। কখন মনে হয়,—এই যে, বেশ ফর্‌সা হইয়া আসিতেছে, সত্য সত্যই এইবার তারাদল স্বগৃহে গমন করিবে। আবার এ-দিক্ ও-দিক চাহিয়া মনে হয়,—কৈ ফর্‌সা ত হইল না, বরং অন্ধকারের অধিক মাত্রা চড়িয়া উঠিল দেখিতেছি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুম আসিল, আবার ঢুলিতে লাগিলাম, আবার পড়ি-পড়ি হইলাম। অবশেষে সে স্থান হইতে উঠিয়া সর্ব্ব-নিম্নের ডালে আসিলাম। মনে হইল, এ স্থান হইতে পড়িলে নিশ্চয়ই প্রাণ-বিয়োগ হইবে না। এখানে কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দচিত্তে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—"আমার কষ্টের এইখানেই কি শেষ, না ইহাই আরম্ভ? যদি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। আচ্ছা, আমি কেন এত কষ্ট পাইতেছি? আমি দাস-দাসী পরিবৃত হইয়া দিব্য সুখ-স্বচ্ছন্দে ছিলাম, ধন এবং অন্নের অভাব ছিল না; আমার গাড়ী ছিল, ঘোড়া ছিল, নরযান ছিল; সহস্রাধিক অশ্বারোহী আমাকে দেবতার ন্যায় মান্য করিত, ভক্তি করিত; ওস্তাদ-গায়ক বাদকবৃন্দ এবং সুন্দরী-নর্ত্তকীকুল আমার পরি-তোষের নিমিত্ত সদাই প্রাণপণে যত্ন করিত; অধিক কি, নবাবপুত্র পর্য্যন্ত আমার সেবায় নিযুক্ত ছিল; বেরিলী নগরে আমি দ্বিতীয় রাজা ছিলাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু জানিনা, কেন সেই-আমি আজ এরূপ বিপন্ন হইলাম? জানিনা, কোন্ পাপে, কার অভিশাপে আজ আমি ভিখারীর অধম হইলাম? আমার সঙ্গী সহচর কেহই আর নাই; আমার পরিধানে একখানি মাত্র বসন,—তাহাও দুই খণ্ডে বিভক্ত। ক্ষুধায় আহার নাই; তৃষ্ণায় জল নাই; নিদ্রায় শয্যা নাই। অহো! শয্যা চাই না, নিদ্রায় শুইবারও যে, যো নাই; এই বৃক্ষশাখায় বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইতেছে।"

ইহার উপর আরও কতরূপ দুর্ভাবনা মনো-মধ্যে উদিত হইতেছে। শুনিয়াছি, নাইনি-তালের এই মহারণ্য প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ বিস্তৃত। আমি এখন দিক্-বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য। কোন মুখে গমন করিলে, এ অরণ্য পার হইব, তাহা জানিনা। ঘুরিতে ঘুরিতে যে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিব না, তাহাই বা কে বলিল? কতদিন অথবা কতকাল এই অরণ্যে বাস করিতে হইবে, তাহা ত বুঝিতেছি না। কি খাইয়াই বা প্রাণ ধারণ করিব? অথবা হঠাৎ একদিন বাঘ-ভল্লুক বা হস্তীর সম্মুখে পড়িলে, নিশ্চয়ই প্রাণ-বিয়োগ হইতে পারে।—প্রাণ-বিয়োগ হউক ক্ষতি নাই; কিন্তু চিরদিনই যে, এই অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইব, আর মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইব না, আমি ইহজন্মের মত অরণ্যের মধ্যে হারাইয়া রহিলাম,—এই ভাব হৃদয়ের মধ্যে

উদিত হইলে, প্রাণ আর দেহে থাকে না। বুক যেন ফাটিয়া উঠে! শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করে!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রাণ আঁই-ঢাই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। হাঁপানি-কাস-যুক্ত রোগী যেমন হাঁপায়, তেমনি হাঁপাইতে লাগিলাম। যেন মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল,—মরিবার পূর্ব্বে কি এইরূপই যাতনা হয়? আমি অধীর হইলাম, নিকটবর্ত্তী আর একটী ডাল, বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাহাতে বক্ষ রাখিলাম। আমার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। আমি ক্ষণেক যেন চেতনাশূন্য হইয়া রহিলাম।

আমার এ বর্ণনাকে কেহ যেন অতি-রঞ্জিত মনে না করেন। মহারণ্য-মাঝে আমি হারাইয়া গিয়াছি,—এ সময় মনের ভাব যে কি হয়, তাহা বর্ণনাতীত। আমি শতাংশের একাংশও বর্ণন করিতে সক্ষম হইয়াছি কিনা সন্দেহ। ঠিক ঐ অবস্থায় পতিত ব্যক্তি ভিন্ন, অন্য কোন ব্যক্তিই যে, এ রহস্য বুঝিতে পারিবেন না,—ইহা স্থির নিশ্চয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া। দুঃখের পর সুখ। অমানিশার পর পূর্ণিমা। নৈরাশ্যের পর আশা।

আমার আশা হইতে লাগিল,—রাত্রি প্রভাত হইলে, অবশ্যই পথ দেখিতে পাইব। এখন অন্ধকারে অমাবস্যায় দিশাহারা। তখন দিবসে সূর্য্যালোকে দিক্-নির্ণয় ক্ষমতা অবশ্যই জন্মিবে। শুনিয়াছি,—কাঠুরিয়াগণ মাঝে মাঝে এই নিবিড় অরণ্যে কাঠ কাটিতে আইসে, তাহাদের সঙ্গেও ত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

ভয় কি? আমি বড় জোর জঙ্গলে জঙ্গলে দুই ক্রোশ পথ আসিয়াছি। সমস্ত দিন-মধ্যে,—বার ঘণ্টার মধ্যে, আমি কি এই দুই ক্রোশ পথ ফুড়িয়া বাহির হইতে পারিব না? চিহ্ন, লক্ষণ, পক্ষিগণের গমনাগমন, সূর্য্যের অবস্থান, বায়ুর গতি,—এ সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া-বুঝিয়া অবশ্যই পথের কিনারা করিয়া লইব। কোন ভয় নাই।

এ দিকে আশার আলোক অন্তরে যতই উদিত হইতে লাগিল, ওদিকে অন্তরীক্ষে আকাশ-মণ্ডলে ততই সূর্য্যদেবের লাল আলোক প্রতি-ফলিত হইতে আরম্ভ হইল। যেদিক্ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সেই দিক্ পূর্ব্বদিক্, ঠিক্ করিলাম। অন্তরে আর আনন্দ ধরে না। দেহ-মন পুলকে পূর্ণ হইল। শরীর প্রকৃতই কণ্টকিত হইল। হৃদয়-পদ্ম বিকসিত হইল। আমি সূর্য্যদেবের উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিলাম। মনে মনে কহিলাম,—'হে দেব। আলোক-দানে তুমি ত্রিভুবন রক্ষা করিতেছ, অদ্য পথ দেখাইয়া দিয়া, আমায় রক্ষা কর।" আমি আহ্লাদে উল্লাসিত হইয়া, তখন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলাম। বৃক্ষমূলেই ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। কেননা, তখনও ঘোর-ঘোর কাটে নাই। এমন সময় দুই একটী পাখী ডাকিতে লাগিল। আমার আহ্লাদ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। সেই পাখীর রব কর্ণে যেন মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। কেননা, ইহার ধ্বনি, সূর্য্যদেবের শীঘ্র-উদয়, সূচনা করিতেছে। প্রথম দুই একটী, তার পর দুই চারিটী, তার পর দশ বিশটী পক্ষীর মনোহর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। লোকে আহ্লাদে আটখানা হয়, আমি আহ্লাদে আট-আষ্টে চৌষট্টি-খানা হইবার উপক্রম হইলাম। তখন পূর্ব্বাকাশের লাল-লাল ভাব, কতক কাটিয়া সাদা-সাদা ভাব হইয়া আসিতেছে। আর রক্ষা রহিল না। চারিদিক হইতে কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল এককালে ডাকিয়া উঠিল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ পক্ষী সমস্বরে উৎফুল্ল-চিত্তে যেন গান আরম্ভ করিয়া দিল। পাখিগণ প্রভাত-কালে যেন ঈশ্বরের স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। এই স্তব-গীতিতে সত্য সত্যই যেন ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমান্। নানা জাতীয় পক্ষীর রব নানা প্রকার হইলেও, আমার কর্ণ-পটহে তাহা যেন এক অনির্ব্বচনীয় একই সুর হইয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভব-রঙ্গভূমিতে যেন ঐকতান কনসর্ট বাজনা বাজিতে লাগিল। পাখীর মধুর রবে আমার মন মোহিত হইল।

কোথা হইতে এত পাখী আসিল? লক্ষ বলিলেও হয়, কোটী বলিলেও হয়, লক্ষকোটী বা কোটী কোটী বলিলেও হয়। মানুষের পক্ষে

কালকাতা যেমন মহানগর, পক্ষীর পক্ষে এই মহারণ্য তেমনি মহানগর। নানা জাতীয় পক্ষীর রব নানা প্রকার। কেহ কিচ্‌মিচ্ করিতেছে, কেহ কচ্‌মচ্ করিতেছে। কেহ কু দিতেছে, কেহ কু কু করিতেছে। কেহ ঘু ঘু করিতেছে, কাহারও ডাক,—ট্যাঁ ট্যা। কেহ মধুর রবে কী কী করিতেছে। কেহ শিস দিতেছে, কেহ গান গাহিতেছে, কেহ বা নাচিতেছে। অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের বর্ণন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কখন দেখি,—এক দিক দিয়া অসংখ্য বন্য টীয়া আকাশ-পথ আচ্ছন্ন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আকাশের নক্ষত্র বরঞ্চ বরং গণনা করিতে পারি; কিন্তু সেই বনের বুলবুলির সংখ্যা গণনা করিতে কিছুতেই সক্ষম নহি। ছাতারে পাখী ও ঘুঘুর পালও বিস্তর। ইহা ব্যতীত আর যে সকল বিচিত্র রঙ্গের মধুর-স্বর-বিশিষ্ট পক্ষী দেখিলাম, তাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে কখনও নয়ন-গোচর করি নাই। সুতরাং তাহাদের নামও জ্ঞাত নহি। এই অজ্ঞাত-কুলশীল, এই অজ্ঞাত-নামা, পক্ষিকুল দেখিতে বড়ই সুন্দর। কেহ লাল, কেহ নীল, কেহ শ্বেত, কেহ পীত; কেহ বা এই রঙ্গ চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে চিত্রিত। কেহ ধূসরবর্ণ, কেহ তাম্রবর্ণ, কেহ রজতবর্ণ, কেহ বা নবদূর্ব্বাদল-শ্যামবর্ণ,—আবার সেই বর্ণের উপর কত বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন পক্ষীর পৃষ্ঠদেশে এবং লেজে ভগবান্ যেন তাজমহলের অনুকরণে কারুকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই মহাবনে বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি দেখিয়া, আমি ক্ষণকালের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। শেষে ভাবিতে লাগিলাম,—একি এ! আমি কোথায় আসিয়াছি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? অথবা এ সমস্ত সত্য সত্যই বাস্তব ঘটনা!

সেই মহাদেবী মহা মহামায়ার অনন্ত লীলার অনন্ত রহস্য ভেদ করিতে কে সমর্থ?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত কাল। শীত বিলক্ষণ অনুভব করিতে হইল। এক বস্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; একখানি পরিধান করিয়া আছি; শীত-নিবারণার্থ অন্য খানি গায়ে দিলাম। কিন্তু তাহাতে শীত কমিল না। পার্ব্বতীয় কন্‌কনে শীত কখন কি সূতার কাপড়ে দূর হয়?

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পূর্ণাঙ্গে আকাশ-পটে সমুদিত হইলেন। নভোমণ্ডল হাসিল, ধরাধাম হাসিল, অরণ্য-প্রদেশও হাসিয়া উঠিল। আমি তখন সেই বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিয়া, পথান্বেষণে যাইবার সূচনা করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে, সূচের ন্যায় অগ্রভাগ-বিশিষ্ট ধারাল এক পাথর-কুঁচি লইয়া, সেই বৃক্ষগাত্রে আপন নাম ও তারিখ লিখিলাম। লেখা স্পষ্ট হইয়া ফুটিল না। তখন চিহ্ন স্বরূপ কতকগুলি পাথর জড় করিয়া বৃক্ষমূলে রাখিয়া দিলাম, এবং লাঠী করিবার নিমিত্ত গাছের সরল ডাল একটী ভাঙ্গিয়া লইলাম। গাত্রবস্ত্র খুলিয়া কোমরে দৃঢ়রূপে বাঁধিলাম। জুতা-জোড়াটী সেই বৃক্ষের নিকট পরিত্যাগ করিলাম। এইরূপ সাজে সুসজ্জিত বা অসজ্জিত হইয়া, শ্রীদুর্গার নাম স্মরণ করিয়া, যাত্রা করিলাম। যেদিকে গমন করিলে লোকালয় পাইব, এই অরণ্য পার হইতে পারিব, এইরূপ মনে ধারণা হইল, সেই দিকেরই পথ অনুসরণ করিলাম। এইরূপে প্রায় এক ক্রোশ পার্ব্বতীয় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া কেমন যেন মনে হইল, না,—এ দিকে ত কৈ পথ দেখিতেছি না। এদিকে যে জঙ্গলের ঘন-সন্নিবেশ ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। আবার সেদিক্ ছাড়িয়া অন্য একদিকে চলিলাম। এবার বৃক্ষের আর সেরূপ ঘন-সন্নিবেশ দেখিলাম না। ক্রমশই ফাঁক ফাঁক বোধ হইতে লাগিল। কোন স্থানে বৃক্ষাদি আদৌ নাই, প্রায় দুই তিন বিঘা জমি মরুভূমির ন্যায় পতিত হইয়া আছে। আমি হৃষ্টচিত্তে ধাবিত হইলাম। ভাবিলাম,—এইবার নিশ্চয় জঙ্গল পার হইব। প্রায় এক ঘণ্টাকাল দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া দেখি,—আমার পথিমধ্যে একটী বেগবতী পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। নদী এরূপ খরস্রোতা যে, কুটা পড়িলে দুখানা হইয়া যায়। সম্মুখে নদী দেখিয়াই চক্ষুস্থির। ইহা কি মায়ানদী? মহামায়া কি আমার জন্য আবার এখানেও মায়াজাল পাতিলেন? আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নদীর

ওপারে দেখিলাম, উঁচু উঁচু পাহাড় এবং ঘন জঙ্গল।

ভাবিয়া ভাবিয়া এক সূক্ষ্ম বিচার করিলাম। এ নদী অবশ্যই লোকালয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে; আমি এই নদীর তীর ধরিয়া যেদিকে নদীর জল প্রবাহিত হইতেছে, তদভিমুখে গমন করিলে, অবশ্যই লোকালয় পাইব। এইরূপ ভাবিয়া, তাহাই করিলাম,—নদীর ধারে ধারে যাইতে লাগিলাম।

বাল্যকাল হইতেই জুতা পায়ে দেওয়া অভ্যাস। শূন্যপদে পর্ব্বতময় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পদদ্বয়ে বিষম ব্যথা জন্মিল। বিশেষ পাথরের কুঁচি লাগিয়া, দক্ষিণ পদের মধ্যস্থলটী ক্ষত হইয়া, রক্ত পড়িতে লাগিল। নদী-জলে পা ধুইয়া একটু বসিলাম। রক্ত বন্ধ হইল, আবার চলিতে লাগিলাম। এইরূপ নদী-তীরে যাইতে যাইতে, বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইল। সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িল। নদীর গতি দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম,—এ নদী ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে;—বিষম বাঁকা, আমি নদীর সহিত কত ঘুরিব? সোজা পথে গেলে যাহা একদিন লাগে, নদীর সহিত যাইলে, তাহা সাত দিন লাগিতে পারে। বিশেষ পায়ে যেরূপ ব্যথা জন্মিয়াছে, তাহাতে ত চলৎশক্তি ক্রমে ক্রমে রহিত হইয়া উঠিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি, তাহার পর সম্মুখে দেখিলাম,—বিষম কাঁটার বন এবং উঁচু উচু পাহাড়। এতক্ষণ নদীর ওপারে জঙ্গল এবং পাহাড় ছিল; এইবার সেইরূপ জঙ্গল এবং পাহাড়, নদীর উভয় পারেই দেখা দিল। আমার গতিরোধ হইল। ভাবিলাম,—এ এক রকম ভালই হইয়াছে। পাগলের ন্যায় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ কোথায় যাইতেছিলাম! যেখানে জঙ্গলের আরম্ভ, সেই স্থানে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম লইলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকা উচিত নয় বলিয়া,—প্রয়ে পনর মিনিট পরেই সেস্থান হইতে উঠিলাম। যেদিকে গেলে পথ পাইব বলিয়া অনুমান হইল, আবার সেই দিকেই চলিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম,—এক প্রকাণ্ড প্রান্তর। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ তাহার পরিধি হইবে। সে স্থানে জঙ্গল নাই,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লহ-লহ নবীন-নবীন ঘাস গজাইয়াছে। এই প্রান্তরের মাঝে মাঝে কেবল দুই চারিটী বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উত্থিত হইয়া, শাখা-পল্লব দ্বারা প্রান্তরকে ছায়াদানে সুস্নিগ্ধ রাখিয়াছে। এই প্রান্তরটী দেখিয়া, আমার কেমন মনে হইল, এইখানে মনুষ্যের বাস আছে। বোধ হয়, কোন পার্ব্বতীয় বন্য-জাতিরা এই স্থলে নিরাপদে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছে। অথবা এখানে কোন ঋষি-তপস্বীর তপোবন থাকা সম্ভব। এমন ভুবন-মোহন শ্যামলক্ষেত্র আমি ত কখনও দেখি নাই! সেই প্রান্তরের দিকে আমি বেগে ধাবিত হইলাম। কিছু দূর গিয়া দেখি,—দলে দলে হরিণ-সমূহ সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে বিচরণ করিতেছে নির্ভয়-হৃদয়ে আমি তাহাদের ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমাকে দেখিয়া, হরিণ দল ভ্রূক্ষেপও করিল না। আপন মনে পূর্ব্ববৎ চরিতেই লাগিল। কোন হরিণ আমার পানে একবার চায়, আর নিতান্ত অগ্রাহ্যতার সহিত উপেক্ষা করিয়া আপন কার্য্যে মন দেয়। বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট হরিণ দেখিলাম; ছোট ছোট হরিণশাবক জননীর স্তন্যপান করিতেছে দেখিলাম; যুবক-হরিণকে যুবতী-হরিণের সহিত প্রেমালাপ করিতে দেখিলাম; কোন হরিণ-শিশু লাফাইয়া লাফাইয়া একবার ওদিকে যাইতেছে, একবার এদিকে আসিতেছে; কেহ বা কুন্দন করিয়া নিকটবর্ত্তী ঝরনার নিকট যাইতেছে, আর অল্প জলপান করিয়া তীরের ন্যায় গতিতে আপন দলে ফিরিয়া আসিতেছে। আমি অনিমিষ-লোচনে নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়া, সেই হরিণ-দলের ভব-রঙ্গলীলা অবলোকন করিতে লাগিলাম। মনকে বলিলাম,—"এইবার দেখিয়া লও; কাব্যে যাহা পড়িয়াছ,—এইবার সেই হরিণ-চক্ষু প্রত্যক্ষ নয়ন-গোচর কর। সেই নীলপদ্মাভ, সেই আকর্ণ-বিস্তৃত, সেই ভাবযুক্ত চল-ঢল নয়ন,—সেই উৎকণ্ঠা-পূর্ণ, সেই মধুর-উজ্জ্বল-চঞ্চল নয়ন,—সেই সুখ-শান্তিদায়ক, সেই কবিকুলের অবলম্বনীয় হরিণ-নয়ন দেখিয়া, একবার তোমার নয়ন সার্থক কর।"

এইরূপ প্রায় বিশ মিনিট কাল দাঁড়াইয়া হরিণ-নয়ন এবং হরিণ-কুলের বিচরণ দেখিতে লাগিলাম। আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিব? কেননা, দিবাভাগের মধ্যে আজ আমাকে পথ খুঁজিয়া লইতেই হইবে। পথ না পাইলে, আজ

অন্ততঃ উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলতায় প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা।

মানবজাতির বসবাসের চিহ্ন এখানে ত কিছুই দেখিতেছি না। মনুষ্য থাকিলে এস্থলে অবশ্যই চাষ আবাদ করিত। পদচিহ্নও দৃষ্ট হইত। এখানে মনুষ্য নাই,—একথা ভাবিতে ভাবিতে আমার বুক কেমন দমিয়া গেল।

কি করি? কোন্ দিকে যাই? কোন্ পথ ধরি? মাঠের অপর পারে ঝুপি ঝুপি বন দেখিতেছি। সম্ভবতঃ ঐস্থলে মনুষ্যের বাস আছে। থাকুক আর না থাকুক, ওখানে একবার গিয়া, কি আছে কি না-আছে, দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ওখানে যাইতে হইলে, হরিণদলকে অতিক্রম করিয়া, হরিণদলের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু যেরূপ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট হরিণ দেখিতেছি, তাহাতে উহারা যদি একবার আমাকে তাড়া করে, একবার যদি উহাদের শৃঙ্গ আমার দেহের সহিত সংলগ্ন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে এককালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।

আমি চিরদিনই একটু গোঁয়ার। স্থির করিলাম,—"হরিণ-দলের মধ্য দিয়াই যাইব; মরি, মরিব।" তখন কেবল এই বিচার বিতর্ক করিতে লাগিলাম,—ধীরপদে নীরবে উহাদিগকে অতিক্রম করিব, না ভীষণ চীৎকারপূর্ব্বক, লাঠী ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাদের দিকে ধাবিত হইব? ভয়ে যদি ইহারা পলায়, তাহা হইলে আমি ত নিশ্চিন্তে এবং নির্ভয়ে চলিয়া যাইব। আর যদিও ইহারা না পলায়, তাহা হইলে আমার বিষম বিক্রম দেখিয়া, ইহারা আমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। সম্ভবতঃ এই স্থানের হরিণদল কখনও মনুষ্য দেখে নাই। ব্যাধ অবশ্যই এখানে কখনও আসে নাই। কোন শীকার-প্রিয় ইংরেজ বা ক্ষত্রিয় এ মহারণ্যে, কখনও পদার্পণ করেন নাই। বোধ হয় এখানকার হরিণদল মানুষকে চেনে না। অথবা এমনও হইতে পারে, এখানে কেবল তপস্বীরই বাস। তাঁহারা হরিণের প্রতি কখনও হিংসা করেন না। কাজেই এদেশীয় হরিণগণ মানুষ দেখিলে পলায় না, ভয় খায় না। তাই উহারা মানুষের অত গা-ঘেঁষা। সে যাহা হউক, এখন যুক্তি কি? হো হো মার মার শব্দে গমন করিব, না নীরবে ধীরপদে প্রচ্ছন্নভাবে যাইব?

কোন্ যুক্তি অনুসারে জানি না; আমি কিন্তু সেই লাঠী লইয়া হো হো মার মার রবে এক বিকট চীৎকার করিয়া হরিণ-দলের প্রতি ধাবিত হইলাম। দৌড়িবার সময় বাঘের অনুকরণে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিণ-দল, একবার সচকিত-নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া, উৰ্দ্ধশ্বাসে দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফ দিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। সে দৌড়ের বাহার দেখে কে! শিশু-সন্তানটীর পর্য্যন্ত লম্ফের মাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইয়া আকাশ পানে চাহিয়া বিশ্বকর্ত্তাকে বলিলাম,—"তুমিই ধন্য।" হরিণের এক একটী লাফ, আট হাত বা দশ হাতের কম নয়। নিমেষ মধ্যে তাহারা যে কোথায় উধাও হইয়া উড়িয়া গেল, তাহা আর ঠিক করিতে পারিলাম না। যেন যাদুমন্ত্রে সকলে অন্তর্হিত হইল।

আমি যেখানে ঋষি-তপস্বীর আশ্রম আছে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, ক্রমে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু কোথায় বা ঋষি-তপস্বী, আর কোথায় বা তাহাদের আশ্রম! কিছুই নাই; কেবল সব শূন্যাকার। সেই পূর্ব্ববৎ ফাঁক ফাঁক জঙ্গল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। যেন মরমে মরিয়া গেলাম। অদূরে এক গিরীনদী প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া, তাহার তীরে গিয়া বসিলাম। তখন ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছে। পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছে। পথ-শ্রান্তিতে দেহ অবসন্ন হইয়াছে। সূর্য্যদেব মাথার উপর উঠিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে।

এই মহারণ্য মাঝে কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করি? এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলাম,—কোন বৃক্ষে কোন রূপ ফল আছে কি না। নদীর ধারে এক রকম লতাবন রহিয়াছে। যখন টাটুওয়ালার সঙ্গে সাফাখানা পার হইয়া জঙ্গল-পথ দিয়া নাইনিতাল অভিমুখে গমন করি, তখন সেই টাটুওয়ালা এইরূপ লতাবন দেখাইয়া বলে, এই লতা গাছের গোড়া খুঁড়িলে, শাঁক আলু বা মুলার মত একরূপ আহারীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। ইহা খাইলে পেট ভরে এবং তৃষ্ণা দূর হয়। তখন তাহার সে কথার কোন আস্থা প্রদান করি নাই।

এখন বিপাকে পড়িয়া, সেই লতাগাছ উপড়াইয়া দেখি,—টাটুওয়ালার কথাই সত্য। আমি চারি পাঁচটী লতার মূল উপড়াইয়া জড় করিলাম। ইহাতেই তখন আনন্দ কত হইল, তাহা বলিতে পারি না। অতঃপর নদীজলে স্নান করিলাম। স্নান করিতে করিতেই কয়েক অঞ্জলি জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ পিপাসা দূর করিলাম। তীরে উঠিয়া সিক্ত বস্ত্রখানি শিলাখণ্ডের উপর শুকাইতে দিয়া অপরখানি পরিধান করিলাম। তারপর পরম তৃপ্তি সহকারে সেই লতামূল ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহা শাঁক আলু অপেক্ষা অধিক সরস ও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তিনটীর অধিক আর খাইতে পারিলাম না, তিনটীতেই উদর পূর্ণ হইল। নদীতে গিয়া আবার জল পান করিয়া আসিলাম।

একটী বৃক্ষের নিম্নে দেখিলাম,—এক খানি মসৃণ প্রস্তর পড়িয়া আছে। দীর্ঘে তাহা চারি পাঁচ হাত হইবে, প্রস্থে তিন হাতের কম নহে। রং ঠিক্ আবলুস কাঠের মতন। সেই শিলার উপর বৃক্ষের ছায়া পতিত হইয়াছে। তথায় আমি উপবেশন করিলাম। সেই শিলা মার্ব্বেল পাথরের ন্যায় আমাকে নরম ঠেকিল। আমি বিশ্রাম-মানসে তাহার উপর চীৎপাত হইয়া শুইলাম। যাই শয়ন, অমনি নিদ্রার আকর্ষণ। গত কল্য সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর কতই যে পরিশ্রম, তাহার ত ইয়ত্তা নাই। সুতরাং নিদ্রাদেবী ভীমবেগে আমার প্রতি আক্রমণ করিলেন। আমি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। সম্পূর্ণরূপে বাহ্য চৈতন্য লুপ্ত হইল। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল; তখন দেখি সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত। আকাশে দুই চারিটী তারকা উদিত হইয়াছে।

আমি ত অবাক্! আবার একি হইল! আবার যে রাত্রি আসিল! সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, তথাচ পথ পাইলাম না। হা দুরদৃষ্ট! আমি তখন কেবল হায় হায় করিতে লাগিলাম। জগদম্বারি নামে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া, বৃক্ষে উঠিয়া রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত আবার এক শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট বৃহৎ মহীরুহ খুঁজিতে লাগিলাম।

মহাবিদ্যা-সাধন

অষ্টমী মহাবিদ্যা—বগলামুখী-ধ্যান।

মধ্যে সুরাব্ধিমণিমণ্ডলরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণ-মাল্যবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং নমামি ধৃতমুদ্গারবৈরিজিহ্বাম্॥

ব্যাখ্যা।

নমামি বগলা দেবী মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
রত্নপীঠস্থিতা রত্নসিংহাসনোপর॥
রত্ন-আভরণমাল্যে কত শোভা পায়;
পীতবর্ণ পরিধান পীতবস্ত্র তায়॥
শশিখণ্ড ললাট-ফলকে চক্ চক্।
ত্রিনয়নে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্॥
এক দৈত্যজিহ্বা বাম-করেতে ধারণ।
দক্ষিণ-করেতে করি মুদ্গার ঘাতন॥
দ্বিভুজা বগলামুখী হরমনোহরে।
প্রণমামি পদযুগ-সরোরুহবরে॥

বগলা-স্তোত্র।

মা বগলামুখি, ভক্তভাবে সুখী,
অসুর-নাশিনী সদ্য।
পীত বর্ণ ধর, পীত বস্ত্র পর
পদ্মোপরে পাদপদ্ম॥
বিবিধ ভূষণে, সাজিয়া যতনে,
রত্নাসনে বিরাজিতা।
সৃষ্টিসংহারিণী, মুদ্গার-ধারিণী,
অশেষ-গুণ-মণ্ডিতা॥
করিয়া প্রণাম, দুর্গা দুর্গা নাম,
প্রভাতে যে জন স্মরে।
সুখে যায় দিন, শমন-অধীন
সে নহে, জনম তরে॥
ঐ পুণ্য হেতু, ব্যাধ কালকেতু,
পাইল দর্শন তব।
নামে মৃত্যুঞ্জয়, করে মৃত্যু জয়,
মাহাত্ম্য কতই কব॥
কালী কালী বলি, গাঁথি নামাবলী,
শ্রীমন্ত বিপদে তরে।
এই নাম সার, ভরসা আমার
যা জান তা কর পরে॥

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } কার্ত্তিক। ১২৯৯। { ১১শ সংখ্যা।

দক্ষিণাপথে অবরোধ-প্রথা।

জয় দক্ষিণাপথ মাতা।

নর্ম্মদা-কাবেরী-কৃষ্ণা-গোদাবরী-নিরমল-সলিলে পূতা।
সহ্য মলয়াচল বিন্ধ্য মহেন্দ্রে অঙ্কিত তব যশোগাথা।
সাধ্বী অনসূয়া অত্রি অগস্ত্যে যাঁরে যথাবিধি পূজে,
বিল্ব নক্তমাল তিন্দুক তমাল পূগ তাম্বূল সাজে,
এলা-ব্রততী-ধৃত-চন্দন-সুরভিত প্রবাহিত দক্ষিণবাতা।
চোল পাণ্ড্য কেরল বলভী সুরাষ্ট্রী শোভন বিক্রম গীতা।
শিবজী বাজীরাও ত্র্যম্বক সদাশিব মরাঠী পুঙ্গব ধাত্রী,
ভবভূতি বিহ্লণ শঙ্কর সায়ন রামানুজ জনয়িত্রী,
সে সব উজ্জ্বল আলোক নির্ব্বাণ ঘোরআঁধার যাতা।
ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা গুণে অদ্বিতীয়া দক্ষিণাপথ মাতা।

বিশাল হিন্দুসমাজ, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকার করিয়া অবস্থিত। তবু এখন ভারতবর্ষের আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন অঙ্গ কাম্বোজ-বাহ্লিক এখন বিচ্ছিন্ন, গান্ধার, কেকয়, বিগলিত, চীন মহাচীন বিশ্লিষ্ট। এই সুবিস্তৃত ভূমণ্ডলের নানাস্থান নানাজনপদ অলঙ্কৃত করিয়া ধর্ম্মোন্নত বিদ্যাগৌরববিজৃম্ভিত, বিশাল হিন্দুসমাজ অবস্থিত ছিল। কর্ত্তিত—বিচ্ছিন্ন—বিগলিত হইলেও হিন্দুসমাজের অধিকৃত ভূমি এখনও নিতান্ত অল্প নহে। এখনও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সিন্ধু হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমণ্ডলে হিন্দুসমাজের অধিকার। অথচ প্রায় একই সূত্রে প্রায় একই নিয়মে এই বিশাল সাগরোপম সমাজ সংযত। সেই 'শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ' সেই 'বেদো ধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে' সর্ব্বত্রই সম্মানিত। সেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, বশিষ্ঠ, সেই ব্যাস, পরাশর, দক্ষ, বৃহস্পতি, সকল স্থানেই উপজীব্য। সেই অত্রি, অঙ্গিরা, বিষ্ণু, কাত্যায়ন, সেই যম, উশনা, সম্বর্ত্ত, আপস্তম্ব, সর্ব্বদেশেই সমান মান্য। সেই শঙ্খ, লিখিত, নারদ, বৌধায়ন, সেই হারীত, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাতাতপ সকল দেশেরই আরাধ্য। সেই গোভিল, পারস্কর, আশ্বলায়ন প্রভৃতি গৃহ্যকর্ত্তা মহর্ষিগণের মতেই সমুদয় সমাজের জাতকর্ম্মাদি শ্মশানান্ত যাবৎ ক্রিয়া-কর্ম্ম প্রতিপালিত হয়। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নাই ; এই সুবিশাল সমাজ, নিয়মের কঠোরতা, সংযমের দৃঢ়বন্ধন প্রায় এক ভাবে অঙ্গীকার করিয়া আছে। এরূপ উদাহরণ আর কৈ ?

কিন্তু দৃষ্টান্ত না থাকিলেও ইহা বিচিত্র নহে। ঋষিদিগের অবিমিশ্র পবিত্র শুক্র-শোণিত-সম্ভূত ধর্ম্মবিশ্বাসী মহাসমাজের পক্ষে ইহা বিস্ময়াবহ ঘটনা নহে। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন লোকহিতকারী নিঃস্বার্থ ঋষিকুলের উপদেশ-পরম্পরাকে উপেক্ষা করা সাধুহৃদয়ের, আত্ম-হিতাভিলাষীর উপযুক্ত নহে। এই জন্যই বলিতেছি, 'ইহা বিস্ময়াবহ ঘটনা নহে।'

বরং যে জন্য প্রায় শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, 'প্রায় একই সূত্রে প্রায় একই নিয়মে' এই প্রকার বলিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহাই বিস্ময়ের কারণ। দুই একটী আচার, দেশভেদে সম্পূর্ণ

বিভিন্ন দেখা যায়। এই কারণেই 'প্রায়' পদ ব্যবহার করিয়াছি।

শাস্ত্রেই দেখা যায়, দক্ষিণাপথে, পিস্তুত-ভগিনী মামাতভগিনী বিবাহ প্রচলিত, উত্তরাখণ্ডে উর্ণাবিক্রয়, এবং শীধুপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ, অবরোধ-প্রথা আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি জনপদে সম্পূর্ণ প্রচলিত, আবার দক্ষিণাপথে অবরোধের নামগন্ধও নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ এই অবরোধ-প্রথার আলোচনা উদ্দেশেই প্রবর্ত্তিত, এক্ষণে তাহারই অনুসরণ করা যা'ক, অন্যান্য বিরুদ্ধ আচারের বিষয় অবসর মতে মীমাংসা করা যাইবে।

আমাদের দেশে অতি সামান্য দরিদ্র রমণীও শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমাঙ্গ আবরণ না করিয়া পুরুষ-সমক্ষে বাহির হইতে পারে না। দক্ষিণাপথে, সম্পত্তি-শালী গৃহস্থের কুলবধূরাও অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়াও অবগুণ্ঠনও দিবে না; গৃহমধ্যে লুক্কায়িতও হইবে না। আবশ্যক হইলে, তাহার সহিত কথা কহিতেও তাহাদের কোন বাধা হয় না। এ সকল দেশের অধিবাসীর পক্ষে এ দৃশ্য বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। 'অসূর্য্যম্পশ্যরূপা' 'অবরোধ' প্রভৃতি কথা দক্ষিণাপথবাসীদিগের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার নহে।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের দাক্ষিণাংশই দক্ষিণাপথ নামে অভিহিত। বর্ত্তমান বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ এই দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। দক্ষিণাপথের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বজনসমক্ষে অনাবৃত মস্তকে ভ্রমণ করিলেও কেহ কোন দোষ ধরে না। পুরুষের সঙ্গে কথা কহিলেও তাহা কোন দোষের অন্তর্গত হয় না। ভদ্রঘরের স্ত্রালোকেরা আপণ বিপণীতেও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে। এদেশের কবি গাহিয়াছেন 'সঞ্চারো রতি মন্দিরাবধি সখী কর্ণাবধি ব্যাহৃতম্' কুলকামিনীগণের গমন সীমা শয়নাগার, কথা এতই মৃদু, এতই অল্প যে, সখীর কর্ণ ভিন্ন তাহার মর্ম্মগ্রহ আর কেহ করিতে পারে না। এ দেশের কুলকামিনীরা গৃহাভ্যন্তরে নিলীন হইয়াই কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা বাহির হইতে জানে না। অন্য পুরুষের নিকট লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়, ব্যতিব্যস্ত হয়, কোথায় লুক্কায়িত হইবে, এই ভয়ে ভাবনায় অস্থির থাকে।

দুই দেশের এই ঘোর বিসদৃশভাব বিরুদ্ধ-ভাব কোথা হইতে আসিল? ইহার অনুসন্ধান করিতে বড়ই কুতূহল হয়।

কেহ কেহ বলেন, "অবগুণ্ঠন অবরোধ প্রভৃতি প্রথা আমাদের নহে; মুসলমানগণের নিকট আমরা শিক্ষা করিয়াছি। আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত-বাসিগণ বহুদিন মুসলমান সংশ্রবে থাকিয়া তাহাদের আচারেরই অনুকরণ করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে মুসলমানের প্রভুত্ব অল্পদিন স্থায়ী এবং সামান্য ভাবে পরিচালিত, এই জন্য মুসলমানের আচার দক্ষিণাপথ সমাজে প্রবিষ্ট হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্ত সমাজে অনেক মুসলমানী আচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে, দক্ষিণাপথে করে নাই, এ প্রকার দৃষ্টান্ত অনেক আছে।"

কেহ কেহ বলেন, "জবন প্রভুগণ, সুন্দরী রমণী দেখিলেই অধীর হইতেন, যেন তেন প্রকারেন তাহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন, প্রভাবশালীর কুৎসিতেচ্ছাবশে অনেককে মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছে, তাই দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ প্রতিবেশী জবন প্রভু হইতে আত্মকুল আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এই অবরোধ প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে জবন-দৌরাত্ম্য অল্প ছিল, প্রবল-পরাক্রান্ত জবন-রাজ বা শক্তিসম্পন্ন জবন-প্রভু দক্ষিণাপথবাসীর প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং নিষ্প্রয়োজনতা-বশতঃ তাঁহারা অবরোধপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই।"

এই মতদ্বয়ই আপাততঃ সম্পূর্ণ মুখরোচক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রকার কথা একেবারেই সত্য নহে।

উক্ত মতদ্বয়েরই স্থূল মর্ম্ম এই যে, যত দিন এ দেশে জবনাধিকার হইয়াছে, স্ত্রীলোকের অবরোধ অবগুণ্ঠনাদিও ততদিন মাত্র। তৎপূর্ব্বে এ দেশেও স্ত্রীলোকের অবরোধ অবগুণ্ঠনাদি ছিল না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

সপ্তশত বৎসর ভারতে জবনাধিকার। সপ্তশত বৎসরের পূর্ব্বে কি তবে এ দেশের স্ত্রীলোক অবরোধে অবস্থান করিত না? করিত বৈ কি। রামায়ণ, মনু, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং প্রাচীন নাটকাদিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে, ভারতে অবরোধ প্রথা বহুকাল প্রচলিত।

১ বাল্মীকি রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড

ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রিয়াঃ॥
১১৬ সর্গ ২৮।

রাবণ বধ হইয়া গিয়াছে। লঙ্কা শ্রীরামের বশীভূত। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে বিভীষণ শিবিকারূঢ়া সীতাকে শিবিরের অনতিদূরে আনিয়াছেন। সীতা আসিয়াছেন এ সংবাদ বিভীষণ শ্রীরামকে দিলেন। রাম বলিলেন, সীতাকে এই শিবিরে শীঘ্র লইয়া আইস। শিবির ঋক্ষ-রাক্ষস-বানর-সৈন্যে পরিপূর্ণ। অসূর্য্য-ম্পশ্যা সীতাকে সে স্থানে কি করিয়া লইয়া আসিবেন বিভীষণ এই চিন্তা করিয়া শিবিরের সমুদয় সৈন্যগণকে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশে বৈত্র-পাণি কঞ্চুকিবৃন্দ চতুর্দ্দিকে সৈন্যোৎসারণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে প্রক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায়, সেই বিশাল-বাহিনী হইতে তুমুল কোলাহলধ্বনি উঠিল। দয়াময় রামচন্দ্রের হৃদয়ে তাহা সহ্য হইল না। আজ কতদিন পরে, কত ক্লেশের পরে, কত পরিশ্রমের পরে, আশ্রিত সৈন্যগণ, বিশ্রাম করিতে পাইয়াছে। পরস্পর সুখ-সম্ভাষণের সময় পাইয়াছে। সেই সুখে ব্যাঘাত—আত্ম-মনোরথ সম্পাদনার্থ, তাহাদিগের সেই সুখে ব্যাঘাত,—শ্রীরামের হৃদয়ে অসহ্য বোধ হইল। সমর-প্রহার-বেদনা সৈন্যগণের এখনও প্রবল। আজ বিশ্রাম করিয়া বেদনা লাঘবের চেষ্টায় আছে, এ সময় তাহাদিগের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন, উৎসারণ অপসারণ, যা কিছু হইবে, তাহাই অত্যাচার, করুণাময় রঘুনাথ ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। যেন অসন্তুষ্ট হইয়া বিভীষণকে বলিলেন,—

কিমর্থং মামনাদৃত্য ক্লিশ্যতেঽয়ং ত্বয়া জনঃ।
নিবর্ত্তয়ৈনমুদ্বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম॥
রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১১৬ সর্গ।

মিত্র! আমার মত না লইয়া এই সৈন্যগণকে কেন ক্লেশ দিতেছ! ইহাদিগকে উৎসারণ করিতে হইবে না, ইহারা আমার নিতান্তই স্বজন। বিশেষতঃ—

"ব্যসনেষু নকৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ংবরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতেস্ত্রিয়াঃ।"
লঙ্কাকাণ্ড ১১৬ সর্গ।

বিপদ্, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ এবং বিবাহ এই সকল সময় স্ত্রীলোক কাহারও দৃষ্টিগোচর হইলে দোষ নাই।

সৈষা বিপদ্গতা চৈব কৃচ্ছ্রে মহতি চ স্থিতা।
দর্শনে নাস্তি দোষোঽস্যা মৎসমীপে বিশেষতঃ॥
লঙ্কাকাণ্ড ১১৬ সর্গ।

এই জনকনন্দিনী, বিপন্না এবং নিতান্ত ; এসময়ে জনসমাজে বহির্গত হইলেও দোষ নাই, বিশেষতঃ আমার সমীপে।

মনু বলিয়াছেন,—

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যা পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
————————পত্যাচ বিরহোঽটনম্।
————————নারীণাং দূষণানিষট্।
৯ম অঃ।

আত্মীয় স্বজনেরা স্ত্রীলোককে সর্ব্বদাই অধীনে রাখিবেন। পতি-বিরহ, ইতস্ততো ভ্রমণ প্রভৃতি ছয়টী কার্য্য হইতে রমণীগণের দোষ সঞ্চয় হয়।

গার্গ্য * বলিয়াছেন,—

শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাচ্ছিরঃ প্রচ্ছাদন ক্রিয়া।
পুত্রৈর্দর্ভেণ সা কার্য্যা মাতুরভ্যুদয়ার্থিভিঃ॥

পিতার সপিণ্ডকরণ † পিতামহাদি পুরুষত্রয়ের সহিত করিতে হয়। কিন্তু বিধবা মাতার সপিণ্ডীকরণ কেবল পিতার সহিত হইবে।

শ্বশুরের নিকট স্নুষা, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকে, এইজন্য মৃত-মাতার পারলৌকিক শুভাভি-লাষী পুত্রেরা কুশদ্বারা সেই অবগুণ্ঠন কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ... দ্বারদেশগবাক্ষকেষনবস্থানম্।
২৫ অঃ।

'দ্বারদেশ বা গবাক্ষে স্ত্রীলোকের দাঁড়াইয়া থাকিতে নাই।'

* গার্গ্য ঋষিও একজন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক, পরাশর-সংহিতায় ব্যাসপ্রশ্নস্থলে লিখিত আছে,—

'শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমশ্চৈব————পরাশর—১অঃ।১৩

আমি, মনূক্ত, বশিষ্ঠোক্ত, কশ্যপোক্ত, গার্গ্যোক্ত এবং গৌতমোক্ত ধর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ করিয়াছি।

† সপিণ্ডীকরণের সরল অর্থ, পিণ্ডমিশ্রণ। পিতার সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণের অর্থ, পিতার পিণ্ডের সহিত মাতৃ-পিণ্ড মিশ্রণ।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পথে বাহির হওয়া সাধারণ স্থানে ভ্রমণ করা ত দূরের কথা, স্বীয় গৃহেও যে স্থানে থাকিলে অপরে দেখিতে পায় সেস্থলে স্ত্রীলোক দাঁড়াইবে না। ইহাই জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণুর উপদেশ।

কবিবর শূদ্রক, মৃচ্ছকটিক নাটকে * লিখিয়াছেন।

সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তামেষ শিরসা বন্দ্যতাং জনঃ।
যত্র তে দুর্লভং প্রাপ্তং বধূশব্দাবগুণ্ঠনম্।
চতুর্থ অঙ্ক।

'যাঁহার সাহায্যে তুমি (ক্রীত দাসী হইয়াও) বধূশব্দ এবং অবগুণ্ঠন প্রাপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি শুভাবলোকন কর এবং তাঁহাকে নমস্কার কর।' মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়িকা বসন্ত সেনা, আপনার ক্রীতদাসীকে এক অনুরক্ত ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেন। তাহাতেই পরিণেতা ব্রাহ্মণ, পত্নীকে এই কথা বলিয়াছেন।

পুনশ্চ

"আর্য্যে! বসন্তসেনে! পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূশব্দেনানুগৃহ্লাতি। ... বসন্তসেনামবগুণ্ঠ্য"
দশম অঙ্ক।

বসন্তসেনাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! বসন্তসেনে! রাজা তুষ্ট হইয়া আপনাকে 'আর্য্য চারুদত্তের বধূ' বলিয়া অনুগ্রহ করিলেন। ... বসন্তসেনার মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া———

বসন্তসেনা বেশ্যাকন্যা; আর্য্যচারুদত্তের প্রতি সবিশেষ অনুরক্তা। রাজা তাঁহাকে চারুদত্তের পত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন। তদনুসারে তাঁহার চির অনাবৃত মস্তক চির অনাবৃত বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত হইল।

কবিবর শূদ্রকের লিপিক্রমে তদীয় অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, স্ত্রীলোক 'বধূ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেই অবগুণ্ঠিতা হইবে। কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলে লিখিয়াছেন,—

'কেয়মবগুণ্ঠনবতী' ৫ম অঙ্ক।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ঋষিদ্বয় সমভিব্যাহারে দর্শন করিয়া বিতর্ক করিতেছেন 'এই অবগুণ্ঠনবতী রমণীটী কে?'

আমরা আদি কবি বাল্মীকির সময় হইতে মহাকবি কালিদাস পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি, হিন্দুসংসারে অবরোধ প্রথা প্রচলিত। সগর-তাড়িত ক্ষত্রিয়গণ, যখন জবনদেশে বাস করিয়া ক্রমেই অধম হইতেছে, বর্ব্বর কিরাতগণের সঙ্গে সমান আসন পাইবার উপযুক্ত হইতেছে, আর্য্যাবর্ত্ত যখন ব্রহ্মক্ষত্রতেজে সমুজ্জ্বল, হিন্দু-উন্নতি-সুশোভিত; সে সময়েও আমরা রমণীর অবরোধ প্রথা দেখিতে পাইতেছি। শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত শক, জবন, কাম্বোজ জাতির উন্নতি-উন্মেষের বহুপূর্ব্ব হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে দেখিতেছি, অবরোধ প্রথা ভারতে প্রচলিত। শক জবনাদি জাতি মুসলমান হইয়াছে ত সে দিন, মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের উৎপত্তিও ত সে দিন হইয়াছে। মুসলমানের ভারতাক্রমণও আবার তাহারও বহুপরে। আর হিন্দুদিগের অবরোধ প্রথার কথা পাইতেছি, কতকাল হইতে। আমরা বলি লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে; ইংরেজ বলে, অন্ততঃ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে। সে যাহা হউক, ভারতে মুসলমান অধিকারের—জগতে মুসলমান জন্মের—বহুপূর্ব্ব হইতেই যে এ দেশে অবগুণ্ঠন প্রথা আছে, তাহা সকলেরই মানিতে হইবে।

ভারতে মুসলমান-অধিকারের পর, মুসলমানের দেখা-দেখি বা মুসলমানের অত্যাচার-ভয়ে যে আর্য্যাবর্ত্তে অবরোধপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, একথা কি আর বলা যায়?

তাই বলিতেছিলাম, দক্ষিণাপথ এবং আর্য্যাবর্ত্তের অবরোধপ্রথা-ঘটিত বৈষম্য বড়ই কতুহলোদ্দীপক।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, "অতি পূর্ব্বকালে, স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠনাদি আবরণ ছিল না। দক্ষিণাপথে সেই পূর্ব্ব নিয়মের অতিক্রম হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তে হইয়াছে। উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু আর্য্যাবর্ত্তবাসী ঋষি, তাঁহার মর্য্যাদা আর্য্যাবর্ত্তেই সীমাবদ্ধ আছে। স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা প্রভৃতি, শ্বেতকেতুকৃত নিয়মেরই উত্তম সংস্করণ। স্ত্রীলোকের আবরণ পদ্ধতি, শ্বেতকেতু যে, কেন প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার বিবরণ মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

কিন্তু ঐ মতও সমীচীন নহে। কেন যে নহে ইহা বলিবার পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যের উৎপত্তি

* সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রমতে মৃচ্ছকটিক, নাটক-পদ-বাচ্য না হইলেও বাঙ্গালাভাষাতে ইহার নাটক "নাটক" ব্যবহৃত।

সম্বন্ধে ইতিহাস প্রকটিত করিতে হইল। পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্য অরণ্য ছিল না, সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তখন তাহার নামও দণ্ডকারণ্য ছিল না। ইক্ষ্বাকুপুত্র দণ্ডক, দক্ষিণাপথে দণ্ডকারণ্য প্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্যের এক দুহিতার প্রতি বলপূর্ব্বক অত্যাচার করাতে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। শুক্রের অভিশাপে, সপরিবার দণ্ডক, এবং সমুদয় দণ্ডকরাজ্য উৎসন্ন হয়। সেই ব্রহ্মশাপহত দণ্ডকরাজ্যই জনমানব শূন্য হইয়া ক্রমে নিবিড়ারণ্যে পরিণত হয়। পরিশেষে ব্যাঘ্রভল্লুকাদিহিংস্রজন্তুগণনিষেবিত এই মহারণ্য যজ্ঞবিঘ্নকারী ঋষি-ঘাতী রাক্ষস-কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। রাক্ষসদিগের দৌরাত্ম্য নিতান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, অগস্ত্য প্রভৃতি তপঃপ্রভাবসম্পন্ন কতিপয় ঋষি দণ্ডকারণ্যে গিয়া আশ্রম স্থাপন করেন। তৎপরে রাক্ষসকুল-ধূমকেতু, দশবদন-বদন-বন-দাবানল দাশরথির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এই দণ্ডকারণ্য নিরুপদ্রব হয়। অনন্তর দণ্ডকারণ্য প্রদেশে পুনরায় লোকালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। এইরূপে দণ্ডকারণ্য আবার জনপদ হইয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকি, শ্রীরামের সমকালিক। তাঁহার কীর্ত্তিকেতন রামায়ণ, রঘুনাথের লীলা-সময়েই প্রকটিত। এই রামায়ণে যখন আমরা অবরোধ পদ্ধতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি, দণ্ডকারণ্য লোকালয়ে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের তথায় গিয়া উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যখন দেখিতেছি আর্য্যাবর্ত্তে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত, তখন কি করিয়া বলা যাইবে সেই অতি প্রাচীন রীতি—স্ত্রীলোকের অনাবরণ—দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি দক্ষিণাপথ প্রদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, অবরোধ-প্রথা-নিয়ম-তন্ত্র আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণই দক্ষিণাপথ আশ্রয় করিয়াছেন, অতি পূর্ব্বকাল হইতে সে সব দেশে একটা নূতন প্রকার সমাজ স্থাপিত হইয়া আসে নাই।

দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণাপথে অবরোধ-প্রথাই নাই, তাই বলিয়া যে শ্বেতকেতুকৃত রমণীমর্য্যাদা তথায় আদৃত নহে এ কথাও বলা যায় না। সতীত্বের আদর, সতীত্বের গৌরব দক্ষিণাপথেও আর্য্যাবর্ত্তের তুল্য। সেখানেও এক নারীতে বহু পুরুষ উপগত হয় না। উত্তর কুরুতে শ্বেতকেতুর মর্য্যাদা প্রচলিত হয় নাই। ভারতের সমুদয় দেশেই প্রচলিত হইয়াছিল। 'এই জন্যই মহাভারতে স্ত্রীলোকের অনাবরণের বিষয় উত্তর কুরুতেই দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

তাই বলিতেছি,—দক্ষিণাপথে অবরোধ-প্রথা না থাকিবার কারণ কি? বুঝিয়া উঠা ভার।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা এ স্থলে বিবৃত করা যাইতেছে;—

দক্ষিণাপথে অবরোধ-প্রথা না থাকিবার দুইটী কারণ অনুমিত হয়।

১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অগস্ত্য প্রভৃতি কতিপয় মহর্ষি * প্রথমতঃ দক্ষিণাপথে আশ্রম স্থাপন করেন, তৎপরে, শ্রীরাম দক্ষিণাপথ রাক্ষসভীতিহীন করিলে, ক্রমে ক্রমে তথায় চতুর্ব্বর্ণের বসবাস হইতে আরম্ভ হয়। এই অল্পসংখ্যক চতুর্ব্বর্ণের প্রতিবেশী হইল, শবর কিরাতাদি অরণ্যচর ম্লেচ্ছ বর্ব্বরজাতি। এ প্রদেশে চতুর্ব্বর্ণের সকলদিকে সুবিধা,—নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি প্রসন্ন পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনীর নির্ম্মল জল, মনঃপ্রাণতৃপ্তিপ্রদ দক্ষিণানিল, নাতিশীতোষ্ণ অত্যুর্ব্বর ভূভাগ, নবাগত আর্য্যাবর্ত্তবাসী চতুর্ব্বর্ণের বড়ই মনোহর এবং প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। কাজেই তদ্দেশাধিষ্ঠিত ম্লেচ্ছ বর্ব্বরগণের দৌরাত্ম্য ভিন্ন আর কিছুমাত্র তাঁহাদের অসুবিধা ছিল না। এ দেশ, উপনিবেশী চতুর্ব্বর্ণের বিশেষ প্রকারে অপরিত্যাজ্য হইল। অল্পসংখ্যকতা এবং দস্যুভীতি, দক্ষিণাপথোপনিবেশী আর্য্যাবর্ত্তাগত চতুর্ব্বর্ণের সংসারে অবরোধ প্রথার অস্তিত্ব লোপ করিল। পরস্পরের অধিক আত্মীয়তা ব্যতীত এই নবাবলম্বিত মনোরম প্রদেশে অবস্থিতি করাই অসম্ভব। আবার যে স্থলে অত্যন্ত আত্মীয়তা, সেস্থলে যে অবরোধ-শৈথিল্য হয়, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। বাল্মীকি রামায়ণেও তাহার আভাস পাওয়া যায়,—

'নিবর্ত্তয়ৈনমুদ্বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম।'

* অগস্ত্য, অত্রি, অগস্ত্যভ্রাতা ইধ্মবাহ, সুতীক্ষ্ণ, গৌতমবংশীয় শরভঙ্গ, নমুচি, প্রমুচি, সুমুখ, বিমুখ এবং অত্র্যাশ্রম প্রভৃতি।

'এই সমস্ত সৈন্যদিগকে উৎসারিত করিতে হইবে না। (সীতা ইহাদের সমক্ষে আসিলেও দোষ নাই কেননা) ইহারা আমার স্বজন (ভ্রাত্রাদিস্থানীয়)।

দাক্ষিণাত্যে অবরোধ প্রথা না থাকিবার এই এক কারণ। সজাতির অল্পতা প্রযুক্তই পিতৃ-পক্ষের সপ্তমী বর্জ্জিত মাতৃপক্ষের পঞ্চমী বর্জ্জিত কন্যার অপ্রতুলতা ঘটিতে লাগিল। ক্রমে আর চলে না, তখন কাজেই মামাত পিস্তুত ভাই ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত হইল।

এই অল্পতা নিবন্ধন আমাদের বাঙ্গালা দেশে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বৈদিক এই তিন শ্রেণীর মধ্যেই ন্যূনাধিকভাবে, মাতামহ সগোত্রা, মাতামহ-সপিণ্ডা * বিবাহ চলিয়াছে। এ প্রকার কন্যা-বিবাহও শাস্ত্রে ঘোরতর নিষিদ্ধ। প্রায় মামাত পিস্তুত ভগিনী বিবাহের ন্যায়ই নিষিদ্ধ। তথাপি অগত্যা প্রচলিত হইয়াছে। অগত্যা প্রচলনের অভিপ্রায় অবশ্য শাস্ত্রের আভাসে পাওয়া যায়। দক্ষিণা পথেও বোধ করি এই প্রকার বিপৎপাত বশতঃই উক্ত বিবাহ ব্যাপার চলিয়াছে।

২। রাক্ষস ভীতি সত্ত্বেই ব্রাহ্মণেরা অনেকে তথায় উপনিবেশী হ'ন এ কথায় কোন বিবাদ নাই। আমার বোধ হয়, এই রাক্ষস ভয়েই ব্রাহ্মণেরা, শাস্ত্রালোচনা করিবার সময়, কোন সভায় যাইবার সময় বা অন্য কোন স্থানে যাইবার সময়, স্ত্রীকে বা পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। অনেক দিন এই নিয়ম থাকায়, শ্রীরাম, দক্ষিণাপথকে রাক্ষসভীতি-শূন্য করিলেও স্ত্রীপুরুষ কেহই পূর্ব্ব অভ্যাস ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। স্বভাবভীরু অঙ্গনাগণ, স্বামি-সঙ্গে বা অন্য কোন আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে স্থানান্তরে যাইতেন তবু একাকিনী গৃহে থাকিতে পারিতেন না। অল্পে অল্পে সমাগত অপরাপর বর্ণ মধ্যেও এই 'শ্রেষ্ঠের' আচার অনুকৃত হইল।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।

রাক্ষসোপদ্রব-নিপীড়িত ব্রাহ্মণের আচার হইতেই অবরোধ প্রথা দক্ষিণা পথে গিয়াছে।

ক্রমে চতুবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, পূর্ব্বমত বর্ণমণ্ডলীর সন্তান সন্ততি দ্বারা এবং অপর চতুর্ব্বর্ণের উপনিবেশ দ্বারা দক্ষিণা পথে চতুর্ব্বর্ণ-জনপদ হইল। তথাপি সেই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আচার অন্যথা হয় নাই।

পূর্ব্বাচার অন্যথা করিলে পূর্ব্বপুরুষের অবমাননা করা হয়, এই ভয়েই পূর্ব্বাচার পরিত্যাগ করার প্রথা হিন্দুজাতির মধ্যে নাই। তদনুসারে, দক্ষিণাপথের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত আচার—অবরোধ প্রথার নাস্তিত্ব—পরেও—বহুজনপদ গ্রাম নগর প্রভৃতির পরেও—অক্ষুন্ন রহিল। দক্ষিণাপথে অবরোধপ্রথা না থাকার ইহাই দ্বিতীয় কারণ। এই আচার-সম্পন্নদণ্ডকারণ্যপ্রবাসী চতুর্ব্বর্ণের বংশপরম্পরা দ্বারাই দক্ষিণাপথ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

শ্যামাপূজা-কালনির্ণয়।*

দীপান্বিতা অমাবস্যানিমিত্তক যে শ্যামাপূজা প্রচলিত আছে, মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য তদীয় স্মৃতিতত্ত্বে উক্ত পূজার কালনির্ণয় করিয়া যান নাই। অথচ তন্ত্রশাস্ত্রের নানাস্থানে উক্ত পূজার কালসম্বন্ধে যেরূপ নানা বচন দেখিতে পাওয়া যায়, পরস্পর বিরোধ-ভঞ্জন পূর্ব্বক ঐ সকল বচনের মীমাংসা না করিলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। অনেকের তন্ত্রশাস্ত্রে সম্যক্ দৃষ্টি না থাকায় সাধারণের প্রকৃত সিদ্ধান্ত-লাভে সবিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। গত-বর্ষে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষেও সেইরূপ ঘটনা হইয়াছে। এন্নিমিত্ত মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত পূজাকাল-নির্ণয় সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় শ্যামাসন্তোষ নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণের পরম উপকার লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ বিষয়ী ব্যক্তিবর্গের উহাতে অসুবিধা দূর না হওয়ায় আমি ন্যায়

* মাতামহ হইতে সপ্তম পুরুষের অন্তর্গত।

* এসম্বন্ধে আমাদের [illegible] প্রবন্ধ শেষ হইলে প্রকাশ করা যাইবে। জঃ সঃ।

বাঙ্গালা ভাষায় ঐ পুস্তকের মর্ম্মসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

না জানি, জগজ্জননী মানবের কত পুণ্যফলে আদ্যামূর্ত্তি প্রথম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন! তখন বুঝি স্থল-জল অনিল-অনল আদি কোন পদার্থ পৃথক্‌রূপে পরিব্যক্ত হয় নাই। সকলই সেই মহাপ্রকৃতির অনন্ত উদরে লীন ছিল। মহাপ্রকৃতিই সেই মহাপ্রলয় কালে প্রথম মূর্তিমতী হইলেন। তাই প্রলয় চিহ্ন শবমাত্র তাঁহার আসন হইল। শব্দব্রহ্মের প্রপঞ্চস্বরূপা পঞ্চাশৎ বর্ণমাতৃকা মুণ্ডমালারূপে তাঁহার কণ্ঠদেশে বিলম্বিত হইল। কৃপাময়ী ভাবী, ভক্ত, সিদ্ধ, সাধকাদির আশ্বাস-উদ্দেশে করযুগলে বরাভয় মুদ্রা ধারণ করিলেন। করুণাবশে জগৎসৃষ্টি-অভিলাষে মহাকালসহ সম্মিলিত হইলেন। তখন চন্দ্র-তারকাদির অভিব্যক্তি হয় নাই। কাল তখন ঘোরতিমির অমাবাস্যাময়, অথবা তিনিই ঘোরতিমিরময়ী অমাবাস্যাস্বরূপা। স্থান তখন সর্ব্বশূন্য মহাশ্মশান। সেই শ্মশানবাসিনী তখনও প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে বর্ত্তমানা। তখনও ঘোরদংষ্ট্রাময় করালবদনা। তখনও অপর করদ্বয়ে দৈত্যদর্পদলনচিহ্ন খড়্গ ও মুণ্ড; তখনও সৃক্কদ্বয়ে রুধিরধারা। কিন্তু তখনও করুণনয়না ও প্রসন্নবদনা! জগন্মাতার কি কখনও পরমার্থকোপ সম্ভবে? সদানন্দময়ীর কি নিরানন্দময় ভাব কখনও সম্ভবপর? কখনই নহে। আহা, তাঁহার স্মরণেই যে আমি আনন্দে বিহ্বল হইতেছি! কি লিখিতে কি লিখিতেছি! জয় জগদম্বে, তোমারই অচিন্ত্য মহিমার জয়! করুণাময়ি, তোমারই অনন্ত করুণার জয়! তোমার স্বরূপনিরূপণে আমার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা করিতে বসিয়াছি, তাহাই করি।

কালীপূজাসম্বন্ধে দেব্যাগমে লিখিত হইয়াছে,—

কার্ত্তিকস্যাপ্যমাবাস্যা তস্যাং কালীপ্রপূজনম্।
কুলঋক্ষেতু যঃ কুর্য্যাৎ স গচ্ছেচ্ছিবমন্দিরম্॥

কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যাতিথিতে কুল নক্ষত্রে যে কালীপূজা করে, সে ব্যক্তি শিবনিকেতনে গমন করে।

যুগ্মনক্ষত্র-হেতু ও যোগ্যতাবশতঃ কুলনক্ষত্র বলিতে এখানে চিত্রা বা বিশাখা।

তন্ত্রান্তরে—

তুলারাশিং গতে ভানৌ দীপযাত্রাদিনেষু চ।
পূজয়েৎ কালিকাং দেবীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

ভাস্কর তুলারাশিগত হইলে দীপান্বিতা অমাবস্যায় ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কালিকার অর্চ্চনা করিবে।

পূর্ব্ববচনে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যাতিথিনিমিত্তক পূজার বিধান হইল বলিয়া ইহাকে তিথিকৃত্য বলিতে হইবে। সুতরাং ঐ বচনে যে কার্ত্তিক মাসের উল্লেখ আছে, তাহা গৌণচান্দ্র কার্ত্তিক। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তিথিকৃত্য সমস্ত গৌণচান্দ্র মাসেই অনুষ্ঠান করিবে। এবং বিদ্যোৎপত্তিতন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, কার্ত্তিকের অমাবাস্যানিমিত্তক পূজা গৌণচান্দ্র মাসেই আচরণ করিতে হয়।

"তুলারাশিং গতে ভানৌ" এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকায় যদি তুলার্কঘটিত বিধি বলা যায়, তাহা হইলে যে বার তুলায় ক্ষয়বশতঃ সৌরকার্ত্তিকের মধ্যে অমাবাস্যার অপ্রাপ্তি হয়, সেবার দীপান্বিতা-অমাবস্যানিমিত্তক কৃত্যের লোপপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। যদি বলেন, সৌর কার্ত্তিকের অমাবাস্যায়ই যখন পূজার বিধান বচনে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে, তখন উক্তরূপ সৌর কার্ত্তিকে অমাবাস্যার অলাভস্থলে অগত্যা উক্ত পূজার লোপ হইবে, তাহাতে ক্ষতি কি?

তাহাতে ক্ষতি আছে। "প্রতিসংবৎসরং কুর্য্যাৎ কালিকায়া মহোৎসবম্ "এই দেব্যাগমবচন দ্বারা কালীপূজার প্রতিবর্ষকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রতিসংবৎসর তাহার অকরণে তন্ত্রান্তরে বিশেষ হানিরও উল্লেখ আছে।

যথা—

ন করোতি নরো যস্তু বার্ষিকং কালিকার্চ্চনম্।
ধনপুত্রবিয়োগী স্যাৎস্বল্পায়ুঃ স্যান্নসংশয়ঃ॥

যদি এরূপ হইল, তবে তুলারাশিতে ক্ষয়স্থলে দীপান্বিতা অমাবাস্যানিমিত্তক কৃত্যের লোপ করিলে প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্যতা-প্রতিপাদক ঐ ঐ বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব "ভাস্কর তুলরাশি গত হইলে" ইত্যাদি বচন ফলের প্রশস্ততা প্রতিপাদক মাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মাসগণনা নানারূপে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সৌর ও চান্দ্রমাসের নিরূপণ এই স্থলে করা আবশ্যক। সূর্য্য মেষাদি এক একটী রাশিতে

যতদিন ক্রিয়া থাকেন, ঐদিন সমূহ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি এক একটী সৌর মাস হইয়া থাকে। চন্দ্রভোগ্য প্রতিপদাদি ত্রিংশৎ তিথিকে বৈশাখাদি চান্দ্রমাস বলে। মুখ্য ও গৌণভেদে ঐ চান্দ্রমাস দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শুক্ল প্রতিপৎ অবধি অমাবাস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথি মুখ্যচান্দ্র ও কৃষ্ণপ্রতিপৎ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিশতিথি গৌণচান্দ্র হইয়া থাকে। এই গৌণচান্দ্র বৈশাখাদি মাস তিথিকৃত্যে অর্থাৎ প্রতিপৎ দ্বিতীয়াদি তিথিবিশেষ বিহিত কৃত্যে আদরণীয়।

যেমন শুক্ল প্রতিপদাদি অমাবাস্যান্ত মুখ্যচান্দ্র বৈশাখাদি মাসমধ্যে রবিসংক্রান্তি না হইলে তাহাকে মলমাস বলা যায়, তেমনি মুখ্যচান্দ্র কার্ত্তিকাদি মাসমধ্যে একমাসে সংক্রান্তিদ্বয় হইলে ক্ষয়মাস বলিয়া থাকে। যদি এরূপ স্থির হইল, তবে যে স্থলে শুক্ল-প্রতিপদে তুলাসংক্রান্তি ও তদুত্তর কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে বৃশ্চিক সংক্রান্তি হয়, সে স্থলে সৌর কার্ত্তিকে ক্ষয়মাস হয় ও ঐ সৌর কার্ত্তিকে অমাবাস্যা স্পর্শ হয় না, সুতরাং পূজা লোপের প্রসক্তি হয়, অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

পূর্ব্বোক্তবচনে যদিও কার্ত্তিকের অমাবাস্যাই শ্যামাপূজার প্রতি নিমিত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি ঐ অমাবাস্যাকে রাত্রিপ্রাপ্ত বলিয়া বিশেষ করিতে হইবে। কেননা, নানা তন্ত্রবচনে রাত্রিপ্রাপ্ত কার্ত্তিকামাবাস্যায় উক্ত পূজার বিধান উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

যেয়ং দীপান্বিতা দেবি খ্যাতা পঞ্চদশী ভুবি।
তদ্রাত্রৌ কালিকাপূজা সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥

অর্থ,—হে দেবি, ভূতলে যাহা দীপান্বিতা অমাবাস্যা বলিয়া খ্যাত আছে, তাহার রাত্রিতে সর্ব্ববিঘ্নোপশমের নিমিত্ত কালিকাপূজা কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

কার্ত্তিকামাবাস্যার রাত্রিকালে কালীপূজার কারণও উক্ত হইয়াছে। যথা,—

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে।

রাত্রৌ নিশীথ ব্যাপ্তয়ামামাবাস্যা স্ত্রিহৈবতু।
পৃথ্বীতলং সমায়াতা কালী দিগ্বসনান্বিতা॥
অতস্তামত্র ভক্ত্যা বৈ দেবদেবীং দ্বিজাতয়ঃ।
পূজয়েদাত্মনো ভক্ত্যা পশুপুষ্পার্ঘ্যসম্পদা॥

অর্থ—নিশীথব্যাপ্ত অমাবস্যার রাত্রিতে দিগম্বরী কালী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব হে দ্বিজগণ! দেবদেব-গেহিনীকে তাদৃশ কালেই পশুপুষ্পাদি উপচার দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে।

বিশ্বসারতন্ত্রে—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষেতু পঞ্চদশ্যাং মহানিশি।
আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনীকোটিভিঃ সহ।
অতোহত্র পূজনীয়া সা তস্মিন্নহনি মানবৈঃ।
ইত্যাদি।

অর্থ,—কার্ত্তিকের অমাবাস্যায় মহানিশাকালে মহাকালী কোটি-কোটি যোগিনী সহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব তাদৃশ কালেই তাঁহার পূজা করা মানবগণের কর্ত্তব্য।

এই বচনদ্বয়ের প্রথমটীতে যে অর্দ্ধরাত্র পর্য্যায়ক নিশীথপদ আছে, তাহা রাত্রির মধ্যদণ্ড-দ্বয়াত্মক কালে রূঢ়। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যও কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি ও সংক্রান্তিপ্রকরণে উক্ত রাত্রি মধ্যদণ্ড দ্বয়াত্মক কালকেই নিশাথ ও অর্দ্ধরাত্র পদবাচ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব দ্বিতীয় বচনটীতে যে মহানিশাপদের উল্লেখ আছে, তাহারও ঐরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। অতএব, "মহানিশাতু বিজ্ঞেয়া মধ্যং মধ্যমযাময়োঃ" "মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রের্মধ্যমযাময়োঃ" এই বৌধায়ন ও দেবল বচনে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রহরের মধ্যদণ্ড দ্বয়ের যে মহানিশা পরিভাষা করিয়াছেন, এই পরিভাষাই এস্থলে গ্রাহ্য। যোগিনীতন্ত্রের পূর্ব্ব-খণ্ডের দ্বিতীয় পটলে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—

শ্লিষ্টে দ্বে ঘটিকে যেতু রাত্রের্মধ্যমযাময়োঃ।
সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তৎকৃতত্ত্বক্ষয়ং ফলম্॥

রাত্রির মধ্যম প্রহরদ্বয়ের যে দুই ঘটিকা পরস্পর সংযুক্ত তাহাকে মহারাত্রি অর্থাৎ মহানিশা কহে। ঐ সময়ে পূজাদি করিলে তজ্জনিত ফল অক্ষয় হয়। এখানে ঘটিকা অর্থ দণ্ড। বিশেষ প্রমাণব্যতিরেকে ঘটিকা পদের মুহূর্ত্ত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে অর্দ্ধরাত্রপদ ও মহানিশাপদ একার্থক হইল।

যদি বলেন, "মহানিশাতু বিজ্ঞেয়া মধ্যমং প্রহরদ্বয়ম্" এই গৃহস্থরত্নাকরধৃত দেবলের আর একটী বচনে রাত্রির মধ্যম দুই প্রহর কালকে যে মহানিশা বলিয়াছেন এবং "মধ্যমুহূর্ত্তে ব্যতীতেতু রাত্রাবেব মহানিশা" এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-

পুরাণে সার্দ্ধ প্রহরের অনন্তর কালের যে মহানিশা পরিভাষা করা হইয়াছে, এই দুই পরিভাষাই গ্রহণ করা যাউক না কেন? তাহা করা যায় না। যে হেতু একব্যক্তির মহানিশা-কালে ও নিশীথকালে, এইরূপ বিভিন্নকালে প্রথমাবির্ভাব রূপ জন্ম হওয়া সম্ভবপর নহে।

অপিচ, যেমন কোন্ কোন্ বচনে কার্ত্তিকা-মাবাস্যায় আবির্ভাব শ্রুত হইলেও মহানিশা-বোধক বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া ঐ অমাবাস্যাকে মহানিশাকালীন অমাবাস্যা বলিতে হইবে, তেমনি মহানিশাপদে মধ্যম প্রহরদ্বয় বা সার্দ্ধপ্রহর নিশার অনন্তরকাল, এই উভয় পরিভাষার যে কোন পরিভাষা গ্রহণ করুন না কেন, "রাত্রৌ নিশীথব্যাপ্তায়াং" এই নিশীথবোধক বচনের সহিত একবাক্যতাবলে মহানিশাপদে সঙ্কোচ করিয়া তদন্তর্গত মধ্য-দণ্ডদ্বয়াত্মক কালরূপ অর্থই অঙ্গীকার করিতে হইবে। না করিলে ভিন্ন ভিন্ন কালে উৎপত্তি হইয়া পড়ে। যদি তাহা হইল, তবে "প্রক্ষাল-নাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্" অর্থাৎ পঙ্কে লিপ্ত হইয়া পশ্চাৎ তাহা প্রক্ষালন করা অপেক্ষা দূর হইতে যাহাতে তাহার স্পর্শ না হয় এই-রূপ করাই ভাল, এই ন্যায়ানুসারে মহানিশা-পদে উক্ত উভয় পরিভাষার আদর করিয়া বচনান্তরের সহিত একবাক্যতার অনুরোধে সেই পরিভাষিত অর্থের সঙ্কোচ করা অপেক্ষা, "শ্লিষ্টে দ্বে ঘটিকে যেতু রাত্রের্মধ্যমযাময়োঃ" এই যোগিনীতন্ত্রোক্ত রাত্রিমধ্যদণ্ডদ্বয়াত্মক কালরূপ পরিভাষার গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তন্ত্র প্রযুক্ত পদে অন্তরঙ্গতা প্রযুক্ত তান্ত্রিক পরিভাষাই আদরণীয় হওয়া উচিত এবং তাহা হইলেই সর্ব্বসামঞ্জস্য হয়। এই নিমিত্ত, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যও শিবরাত্র্যাদি প্রকরণে মহানিশা ও অর্দ্ধরাত্র পদের সমানার্থতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্যামাপূজায় রাত্রিপ্রাপ্ত অমাবাস্যা সামান্য-কাল হইলেও যেমন জন্মাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম শ্রবণহেতু শ্রীকৃষ্ণপূজায় অর্দ্ধরাত্রের প্রাশস্ত্য নির্ণীত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও অর্দ্ধরাত্রে আবির্ভাব শ্রবণ আছে বলিয়া অর্দ্ধ-রাত্রের প্রশস্ততা বুঝিতে হইবে। এই নিমিত্ত যামল, কালীকল্প, বৃহন্মুণ্ডমালা, জ্ঞানার্ণব, নন্দি-কেশ্বর, উত্তর কামাখ্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, ব্যোম-কেশ সংহিতা, কালীকুল সর্ব্বস্ব প্রভৃতি নানা তন্ত্রীয় শ্যামাপূজাবিধায়ক নানাবচনে মহানিশা, অর্দ্ধরাত্র, নিশীথ, মধ্যরাত্র, নিশার্দ্ধ প্রভৃতি সমানার্থক পদসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রস্তাব-বাহুল্যভয়ে বচনগুলি উদ্ধৃত হইল না।

যদি বলেন, অর্দ্ধরাত্র মহানিশাদি পদের প্রশস্ততা অভিপ্রায়ে মীমাংসা করিলে "কার্ত্তিকা-মাবাস্যার রাত্রিকালে কালীপূজা করিবে" এবং "অর্দ্ধরাত্রে ঐ পূজন প্রশস্ত" এইরূপ বাক্যভেদ হইয়া পড়ে, অতএব অর্দ্ধরাত্রাদি পদ বিধিসম-ভিব্যাহৃত থাকায় "কার্ত্তিকামাবাস্যার অর্দ্ধরাত্রে কালীপূজা করিবে" এইরূপ বিশিষ্টবিধি কল্পনা করাই উচিত, তবে তাহার উত্তর এই;—দেখুন, অর্দ্ধরাত্রঘটিত বিধিকল্পনা করিলে উভয় দিনে অর্দ্ধরাত্রির অপ্রাপ্তিস্থলে কৃত্যলোপের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। যদি তাহাতে ইষ্টাপত্তি বলেন, তাহা হইলে শ্যামাপূজার প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য-তাবোধক বিধির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব "তুলাসংস্থে রবৌ রাত্রাবুপচারৈর্মহা-নিশি। তিথৌ দর্শে মহাকালীং পূজয়েদ্ যোঽতি-যত্নতঃ।" অর্থাৎ রবি তুলারাশিস্থিত হইলে রাত্রিতে মহানিশাকালে অমাবাস্যাযোগে যে যত্নপূর্ব্বক মহাকালীর অর্চ্চনা করে, এই বচনে রাত্রির সামান্যকালত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত "রাত্রৌ" এইপদ ও অর্দ্ধরাত্রের প্রাশস্ত্য বুঝাইবার নিমিত্ত "মহানিশি" এইপদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহা না হইলে "মহানিশি" এইমাত্র বলিলেই যখন ইষ্টসিদ্ধি হয়, তখন আবার "রাত্রৌ" এই-রূপ বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব "তস্মাৎ পূর্ব্বাহ্ণ এবেহ কার্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ" অর্থাৎ সেই মাঘশুক্ল পঞ্চমীর পূর্ব্বাহ্ণে সরস্বতীর উৎসব করিবে এবং "সপিণ্ডীকরণং কার্য্যমপরাহ্ণেতু পূর্ব্ববৎ" অপরাহ্ণে পূর্ব্ববৎ সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য, ইত্যাদিস্থলে পূর্ব্বাহ্ণাদিপদের বিধিবাক্যে উল্লেখ থাকিলেও প্রাশস্ত্যপরতা যেমন অঙ্গীকৃত হই-য়াছে, তদ্বৎ এখানেও অর্দ্ধরাত্রাদিপদ বিধিবাক্য-প্রবিষ্ট হইলেও তাহারও প্রাশস্ত্য অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হইবে।

এরূপে যদি অর্দ্ধরাত্র কালটাই প্রশস্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তবে উভয়দিনে কার্ত্তিকা-মাবাস্যার রাত্রিপ্রাপ্তি ও একদিন মাত্র অর্দ্ধরাত্র প্রাপ্তি হইলে প্রশস্তকালব্যাপ্তির অনুরোধে অর্দ্ধ-

রাত্র প্রাপ্ত খণ্ডেই সর্ব্বভাবীর পূজা করা শাস্ত্রসিদ্ধ হইল। বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য তাহাই বলিয়াছেন,—

কর্ম্মণো যস্য যঃ কালস্তৎকালব্যাপিনী তিথিঃ।
তয়া কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত হ্রাসবৃদ্ধী ন কারণম্॥

অর্থাৎ যে কর্ম্মের যে কাল প্রশস্ত, যদি তিথি সেই প্রশস্তকালব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে তাদৃশ তিথিবিশিষ্ট হইয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তিথির অল্পকাল-বহুকাল-সম্বন্ধ কর্ম্মনিয়ামক হইবে না। এবং বিদ্যোৎপত্তিতন্ত্রে ইহাই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে,—

কার্ত্তিকস্যাপ্যমাবাস্যা গৌণচান্দ্রপ্রমাণতঃ।
নিশীথব্যাপিনী যাতু তস্যাং পূজাং সমাচরেৎ।

অর্থাৎ কার্ত্তিকের অমাবাস্যা গৌণচান্দ্রপ্রমাণে গ্রাহ্য। ঐ অমাবাস্যা যেদিন নিশীথব্যাপিনী হইবে, তাহাতেই পূজা করিবে।

যেস্থলে উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্র লাভ হয়, সে স্থলেও ভাব ভেদের আদর না করিয়া পূর্ব্বদিনেই পূজা কর্ত্তব্য। যেহেতু বচনে ভাব বিশেষের উল্লেখ নাই। যথা কালীকল্পলতায়,—

তুলার্কে বহুলে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং মহেশ্বরীম্।
যথোপচারৈঃ সংপূজ্য মহানিশিনৃপো ভবেৎ।
শনিভৌম দিনে চেৎস্যাত্তত‌ঃ শতগুণং ফলম্।
তত্রোভয়দিনে ভূত যুক্ত কুহ্বাং মহানিশি।
ইমাং যাত্রাং কারয়িত্বা চক্রবর্ত্তী নৃপোভবেৎ।

অর্থ,—ভাস্কর তুলারাশিগত হইলে অমাবাস্যার মহানিশাকালে যথোপচারে কলিকাপূজা করিলে মানব নৃপত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ কালে শনি বা মঙ্গলবার যোগ হইলে শতগুণ অধিক ফল হয়। উভয় দিনে মহানিশা লাভ হইলে চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবাস্যায় উক্ত পূজারূপ উৎসব করিতে হইবে। তাহাতে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ হয়।

যদি বলেন; উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্রলাভ স্থলে পরদিন কুজবারাদিলাভ হইলে পরদিনেই পূজা কর্ত্তব্য। কেননা পূর্ব্বোক্ত কালীকল্পলতাবচনে ইহা উক্ত হইয়াছে, "শনিভৌমদিনে চেৎস্যাত্তত‌ঃ শতগুণং ফলম্" অর্থাৎ শনি-মঙ্গলবার যোগ হইলে শতগুণ অধিক ফল হয়। এবং তন্ত্রান্তরেও উল্লিখিত হইয়াছে, "অঙ্গারকদিনে রাত্রৌ দর্শযোগো যদা ভবেৎ। অর্দ্ধরাত্রে মহাপূজা কর্ত্তব্যাতু তদা বুধৈঃ।" অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত্রিতে যদি অমাবাস্যাযোগ হয়, তবে ঐ অর্দ্ধরাত্রেই মহাপূজা কর্ত্তব্য।'

একথা বলিতে পারেন না। যে হেতু গুণ মাত্রই প্রধানের অনুযায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং প্রধানীভূত অমাবাস্যা যে দিনে বিহিত; তদ্দিনেই গুণীভূত কুজবারাদি ফল বিশেষের প্রয়োজক হয়। গুণফলের অনুরোধে তিথির খণ্ডবিশেষ নিয়ম হইতে পারে না। ব্যোমকেশ তন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—কুজবারে লক্ষগুণং পূর্ব্ববিদ্ধা ততোধিকা। অর্থাৎ অমাবস্যায় কুজবারযোগে লক্ষগুণ ফল হয়, কিন্তু পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা হইলে ততোধিক ফল হয়। এই বচনে কুজবারপদে শনিবারের উপলক্ষণ।

কেহ কেহ বলেন, যদি উভয় দিনেই অর্দ্ধরাত্রের অপ্রাপ্তি হয়, সেস্থলেও সকলেরই পূর্ব্ব দিনে পূজা হইবে। "তত্রোভয়দিনে ভূতযুক্ত কুহ্বাং মহানিশি" এই কালীকল্পলতাধৃত পূর্ব্বোক্ত বচনই তাহার সাধক বলিয়া উপন্যাস করেন। যেহেতু উভয়দিনে প্রশস্তকাল লাভালাভস্থলেই সংশয়নিরাসক বচনের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

এসিদ্ধান্তও যুক্তিসঙ্গত নহে। "তত্রোভয় দিনে ভূতযুক্ত কুহ্বাং মহানিশি" এই বচনে মহানিশি এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় উভয়দিনে মহানিশা প্রাপ্তিস্থলেই এই বচনের আদর হইবে, অপ্রাপ্তিস্থলে এবচনের বিষয় হইবে কেন? যে বচনে প্রশস্তকাল প্রাপ্তির উল্লেখ না করিয়া কেবল উভয়দিনে তিথিলাভে পূর্ব্বদিনে বা পরদিনে কর্ত্তব্যতার উপদেশ আছে, ঐ বচনগুলির উভয় দিনে প্রশস্তকাল লাভ বা অলাভ উভয়থাই বিষয় হইতে পারে। বস্তুতঃ তাদৃশ স্থলেই ভাবভেদে পূর্ব্বাপর খণ্ডের আদর করা শাস্ত্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে দিব্যভাব ও বীরভাবাপন্নের পূর্ব্বদিনে পূজা হইবে। কেন না তদ্দিনে অর্দ্ধরাত্রের উত্তর দণ্ডচতুষ্টয় লাভ হইয়াছে। ইহার প্রমাণ যথা—

অর্দ্ধরাত্রাৎপরংযচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেবচ।
সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তদত্তমক্ষয়ং ভবেৎ।
তন্ত্রসারধৃত বচন।

অর্থ, অর্দ্ধরাত্রের পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তদ্বয় মহারাত্রি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৎকালে দত্ত পূজাদ্রব্যাদি অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবি কুলপূজা প্রকীর্ত্তিতা।

গুপ্তসাধনতন্ত্র।

অর্থ,—হে দেবি! অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে কুলপূজা কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

নিশার্দ্ধে সা তিথির্নাস্তিতদূর্দ্ধে ভূতসংযুতা।
তত্রাপি পূজয়েদ্দেবীং ভূতযুক্তাং নলঙ্ঘয়েৎ॥

কালীকুলসর্ব্বস্ব।

অর্থ,—যদি অর্দ্ধরাত্রে অমাবাস্যা লাভ না হয়। অর্দ্ধের পরে অমাবাস্যা প্রবৃত্তি হয় সে স্থলেও কুলাচারীরা তদ্দিনে পূজা করিবেন, চতুর্দ্দশীযুক্ত তিথি পরিত্যাগ করিবেন না।

উল্লিখিত স্থলে পরদিনে পঞ্চম মুহূর্ত্তাদি কাল লাভ হেতু পশুভাবীর পরদিনে পূজা কর্ত্তব্য। প্রমাণ, যথা—

দশদণ্ডেতু যা পূজা তৎসর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।
ষষ্ঠক্রোশে মহেশানি তৎসর্ব্বমমৃতোপমম্।
সপ্তমক্রোশকে দেবিসর্ব্বং ক্ষীরোপমংভবেৎ।
অষ্টমক্রোশকে দেবি দ্রব্যতুল্যং ন সংশয়ঃ।
অতঃপরং মহেশানি বিষতুল্যং ন সংশয়ঃ।
এতৎসর্ব্বং মহেশানি পশুভাবে ময়োদিতং।
অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবি কুলপূজা প্রকীর্ত্তিতা।
তত্ত্বত্তন্ত্রানুসারেণ সর্ব্বপূজাদিকঞ্চরেৎ॥

গুপ্তসাধনতন্ত্র।

অর্থ,—দশদণ্ড রাত্রিতে কৃতপূজা অক্ষয় হয়। ষষ্ঠ মুহূর্ত্তে ঐ পূজাদি উপচার দ্রব্যগুলি অমৃত তুল্য, সপ্তমমুহূর্ত্তে ক্ষীরোপম, অষ্টমমুহূর্ত্তে দ্রব্যতুল্য হয় ও তৎপরে বিষতুল্য হয়, তাহাতে সংশয় নাই। পশুভাবীর পক্ষে এই সমস্ত ব্যবস্থা কথিত হইল। অর্দ্ধরাত্র গত হইলে কুলপূজা কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত আছে। তত্তৎ শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বপূজাদিতে এইরূপ আচরণ করিবে।

এই গুপ্তসাধনতন্ত্র বচনে অষ্টমমুহূর্ত্ত অর্থাৎ মধ্যদণ্ডদ্বয়াত্মক অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত কাল বিধান করিয়া তৎপরবর্ত্তী কালকে বিষতুল্য বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে এবং ঐ তন্ত্রেই আরও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, "অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং দেবি পশুভাবো ন পূজয়েৎ" অর্থাৎ পশুভাবী ব্যক্তি অর্দ্ধরাত্রের পরে পূজা করিবে না। কৌলাবলী গ্রন্থে যে একটী বচন আছে, যথা,—

উভয়স্মিন্ দিনে দেবি বহ্নিভাদিপুরংঙ্করঃ।
কুলীনৈরাদৃতাপূর্ব্বা পরাভক্তৈন চাদৃতা॥

অর্থাৎ উভয় দিনে অমাবস্যা হইলে পূর্ব্বখণ্ড কুলাচারীর ও পরখণ্ড পশ্বাচারীর আদরণীয়। এই বচনও উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্রের অলাভস্থলে বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, "দশদণ্ডেতু যা পূজা" ইত্যাদি গুপ্তসাধন তন্ত্রের বচন নিত্য পূজা-বিষয়ক। ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ গুপ্ত-সাধনে ঐ প্রস্তাবের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে "এতৎ সর্ব্বং মহেশানি পশুভাবে ময়োদিতং" পশুভাবীর পক্ষে এই সমস্ত ব্যবস্থা কথিত হইল। সুতরাং ঐ বচনকে পশুভাববিষয়ক বলিতেই হইবে। পশুভাবীদিগের রাত্রিকালে নিত্যপূজা করণের নিষেধ আছে। যথা নিরুত্তরতন্ত্রে—

ন দিবা পূজয়েদ্বীরঃ পশুরাত্রৌন পূজয়েৎ।
বিপরীতং মহেশানি অভিচারায় কল্পতে॥

অর্থ—বীরাচারী দিবাভাগে পূজা করিবে না, পশ্বাচারীও রাত্রিতে পূজা করিবে না। ইহার বিপরীত হইলে তাহা অভিচাররূপে পরিণত হয়।

এই বচনে পশ্বাচারীর রাত্রিপূজন নিষেধ নিত্য পূজা বিষয়েই বলিতে হইবে। কেননা রাত্রি নিমিত্তক পূজার রাত্রিনিষেধ কখনও সম্ভবপর নহে। কুলার্ণবের পশ্বাচার প্রকরণীয় বচন, যাহা তন্ত্রদীপিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আরও স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে, যথা—

নিত্যার্চ্চনং দিবা কুর্য্যাদ্রাত্রৌ নৈমিত্তিকার্চ্চনম্।

অর্থাৎ পশ্বাচারী দিবায় নিত্যপূজা ও রাত্রিতে নৈমিত্তিক পূজা করিবে।

এই নিমিত্ত প্রাণতোষণী-কারও এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যদি পূর্ব্বোক্ত গুপ্তসাধন তন্ত্রের বচনানুসারে ষোড়শ দণ্ড রাত্রিমধ্যে পশ্বাচারীর পূজাবিধান হইল, তবে "রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবীং" "পশূ-রাত্রৌ ন পূজয়েৎ" ইত্যাদি বচনদ্বারা রাত্রি-কালে পশ্বাচারি কর্ত্তৃক পূজার নিষেধ কিরূপে সঙ্গত হইল? ইহার উত্তর এই যে, গুপ্তসাধন-তন্ত্রোক্ত বচন দীপান্বিতা, অমাবস্যাদি-নিমিত্তক শ্যামাদি পূজাবিষয়ক, এবং নিরুত্তর তন্ত্রোক্ত বচন নিত্য পূজাবিষয়ক; তাহা হইলে আর কোন অসমাঞ্জস্য রহিল না।

গুপ্তসাধন তন্ত্রোক্ত বচন দীপান্বিতামাবাস্যা নিমিত্তক, এইকথা জানিয়া কাহারও যেন এমন

ভ্রম না হয় যে, দীপান্বিতায় ঐ বচনানুসারেই ব্যবস্থা হইবে। উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্রের অলাভ স্থলেই, গুপ্তসাধনের ঐ বচনানুসারে ব্যবস্থা হইবে, ইহাই প্রাণতোষণী-কারের অভিপ্রায়। ঐ বচন যে নিত্যপূজাপর কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং দীপান্বিতা পূজা যে অর্দ্ধরাত্রে কর্ত্তব্য, তাহাও তিনি নানা বচন দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

দ্রৌপদীর প্রতি অর্জ্জুন।

কাদম্বিনী দরশনে নিদাঘের শেষে
শিখীর মানসে মরি যে সুখ সঞ্চারে,—
অথবা সাগর-বক্ষ হয় উছলিত
মেঘান্তর অপগমে শশিবিভা হেরি
যেই ভাবে ;—ভানুকরে তাপিত মানব,
নন্দনের সুধা পেলে যে আনন্দ লভে,—
সেই সুখ প্রাণেশ্বরি! পত্রিকা তোমার
দিতেছে অন্তরে মোর ;—শুন সুলোচনে!
কত বার ধরি বুকে করেছি চুম্বন
রেখেছি হৃদয়ে পুনঃ, কব তা কেমনে?
তব লিপি শশিমুখি কে বুঝিবে কত
আদরের ধন মম!—তৃপ্তি নাহি পাঠে।
যতবার পড়ি আহা নব সুখে যেন
পুলকিত হয় মন—এ দীর্ঘ বিচ্ছেদে
ভুলিয়া, তোমার সনে প্রেম আলাপন
করি যেন—খুলি যেন মনের কপাট ;—
বিরহের দুঃখ ক্ষণে হই বিস্মরণ।
একি কথা প্রিয়তমে! লিখিয়াছ মোরে?—
সংসারের কথা আর কেন বা পড়িবে
মোর মনে? কি অভাব স্বর্গপুরে মম?
শুন তবে বিনোদিনি! অর্জ্জুনের কাছে
সংসার চক্রের কেন্দ্র তুমিই কেবল।
অর্জ্জুনের সুখ তুমি—তোমার বিরহে
স্বরগেও নিরানন্দ—কি আছে জগতে
তোমার বিরহ যাহে করি বিস্মরণ?
কি অভাব স্বর্গে মোর শুনিবে সুন্দরি?
কি অভাব চকোরের গাঢ় মেঘে যবে
আবরি আকাশে ঢাকে পূর্ণ শশধরে?
কি অভাব শিখী ভুঞ্জে বল প্রাণেশ্বরি!
প্রখর রবির করে দহে তারে যবে
দূর করি কাদম্বিনী—শিখিমনোলোভা?
তোমারি অভাব হেথা ;—যে চারুবর্ণনা
স্বরগের করিয়াছ, সুন্দর এ পুরী
তা হতেও ;—কিন্তু এবে তোমার বিরহে
আঁধার সকলি হায় আমার নয়নে।
সুরপুরে কোন সুখে সুখী নহে মন।
রজনীর মধুরিমা প্রকাশে জগতে
কৌমুদী আকাশে যবে হাসে লো সুন্দরি!
স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণ নাচে গায় সুখে
পিতৃনাট্যশালে নিত্য, সত্য সুলোচনে!—
কিন্তু নয়নের কোণে কারো প্রতি কভু
নাহি চাহি—সুরপুরে যতেক ললনা
সকলের সুরূপের মাধুরী লইয়া
সৃজিলা তোমারে বিধি ;—আমার নয়নে
জগত-ললাম-ভূতা তুমি সুহাসিনী।
না জানিয়া না বুঝিয়া মনোগত ভাব
ফাল্গুনীর,—হায় লজ্জা! আদি-বংশ-মাতা
উর্ব্বশী—চির যৌবনা—লাজভয় ত্যজি
এসেছিলা কামভাবে আমার সকাশে,
মাতৃসম্বোধনে আমি বিদায়িনু তাঁরে।
শতেক যুবতী হেথা বিরাজে সতত—
কিন্তু বল প্রাণেশ্বরি! অযুত কুসুম
ফুটে যদি মধুমাসে, ভ্রমর কি কভু
লোভে তাহা, সহকার মুকুলেরে ছাড়ি?
অনন্ত তারকা যদি শোভে লো অম্বরে,
আকাশ কৌমুদী বিনা হাসে কি কখন?
দিবানিশি তব প্রেম জাগিছে অন্তরে
প্রিয়তমে— তব স্মৃতি ধরিয়া হৃদয়ে,
স্মরিয়া তোমার মুখ, ধরিতেছি প্রাণ।
কাঞ্চনের শৃঙ্গ যথা সুমেরুর বুকে
হাসে সদা—স্বর্ণপুরী লঙ্কা যথা সতি!
ভারত সাগর বুকে—শুন প্রেমময়ি!
তব প্রেম এ হৃদয়ে নিয়ত সেরূপে
ভাতিছে ;—ভুলিব তোমা কিসের কারণে?
প্রকৃত প্রণয়ে প্রিয়ে! বিরহ কখন
নাশিবিতে নাহি পারে ;—স্বাভাবিক ভাব,
প্রকৃতির আলো যথা আকাশের ভালে,
জ্বলে নিত্য একভাবে ;—স্বর্গ নাট্যশালে
গতনিশি জ্বলেছিল যেই দীপরাজি
আজি তা নির্ব্বাণ এবে—কিন্তু প্রিয়তমে!

অই নীলাম্বর মাঝে যেই তারাদলে
দেখিতেছ, সহস্রেক বৎসরের পরে
জ্যোতির্ম্ময়, সমুজ্জ্বল, এমনি রহিবে।
বেলা যথা বেরিয়াছে অনন্ত সাগরে—
জলনিধি-বক্ষে যথা তরঙ্গের মালা
অনুক্ষণ বিরাজিত—শূন্যকোলে যথা
কাদম্বিনী চিরবদ্ধ আলিঙ্গন পাশে,—
তব ভালবাসা সতি! তেমতি আমার
হৃদয়ে বেরিয়া আছে চির বিরাজিত ;
বদ্ধ সদা প্রেমময়ি, প্রেমপ্রতিদানে।
চরণে রাখিতে তোমা লিখেছ সুন্দরি ;—
হৃদয়ের ধনতুমি রহিবে হৃদয়ে
চিরদিন—শুন কৃষ্ণে, সাগরের বুকে
কৌমুদী মনের সুখে খেলা করে সদা—
সরোবর বুকে সদা নলিনী সুন্দরী
মানস-রঞ্জন করি রহে বিরাজিত।
আমার কল্যাণ প্রিয়ে করিতেছ তুমি
নিশিদিন—অবশ্যই তোমার কল্যাণে
কল্যাণী আমার তুমি—সঙ্কল্প মনের
হবে সিদ্ধ—শীঘ্র পুনঃ মিলিব দুজনে।
এ দুঃখবিরহ মাঝে মিলনের সুখ
দেখাইছে আশা মোরে—আঁধার নিশিতে
পথিক সম্মুখে যথা বিজলীর ভাতি।
কতদিন পরে আর ও স্বর্ণ প্রতিমা
ধরিব হৃদয়ে মোর—কতদিনে পুনঃ
হৃদয় আকাশে উদি হাসিবে আমার
হৃদয়ের পূর্ণশশী—নিদাঘ তাপিত
ধরাবক্ষে কতদিনে পড়িবে আবার
বরষার জলধারা—বিধিই তা জানে।
নিয়তই তব চিন্তা উদিত অন্তরে।
কিরণ-অঙ্গুলি দিয়া অপসৃত করি
অন্ধকার কেশপাশ, হে সুকেশি, সুখে
নিমীলিত পদ্মনেত্র নিশিমুখ যবে
চুম্বেন আদরে শশী, শুন শশিমুখি,
তখন স্মরিয়া তব কমল বদন
কত কাঁদি, কে জানিবে? কে বুঝিবে বল?
স্বর্গ বিদ্যাধরীগণ মন-সুখে যবে
কল্পতরুবর-মূলে—নন্দন কাননে
নাচে গাহে হাসে সুখে বিদ্যাধর সহ
প্রফুল্ল—আমোদ স্রোত ভাসে চতুর্দ্দিকে—
তখন এ পোড়া প্রাণে গুমরিয়া মরি,
কেমনে যে কেঁদে উঠে কব তা কেমনে?

যে হাসি উজ্জ্বল ধরে তাদের সঙ্গীত,
নৃত্য, প্রফুল্লতা আর, হায় রে বিধাতঃ!
হাসির সে প্রাণভূতা প্রতিমা আমার
কবে বিরাজিবে পুনঃ হৃদয়ে আসিয়া
উজলিয়া হৃদয়ের আঁধারের পুরী।
জানি আমি প্রাণ তব আমাতেই রত
চিরদিন—ভালবাসা অনন্ত তোমার
মোর প্রতি ;—দুঃখ নাহি কর বিরহিণি,—
যে আকাশ হ'তে পড়ে বরষার কালে
ভীম বজ্র, শরতের মধুর চাঁদিনী
সেই সে আকাশ ভালে শোভে লো সুন্দরি।
শুন প্রিয়ে, অস্ত্রশিক্ষা প্রায় শেষ মম ;
ত্বরায় ফিরিয়া পুনঃ হেরিব হরষে
সেই ধ্রুবতারা মম যার পানে চাহি
সংসার সাগর মাঝে চলিয়াছি সদা।
জান তুমি, নিতম্বিনি, কি ভাব অন্তরে
উদিলে, তোমারে ছাড়ি, এ বিরহ সহি
আসিয়াছি সুরপুরে অস্ত্রশিক্ষা হেতু।
তোমারি কারণে প্রাণ! সহিতেছি আমি
তোমার বিরহ-জ্বালা—সতী-অপমান
করিয়াছে দুর্য্যোধন প্রতিফল তার
দিব যেই দিন প্রিয়ে, সেই দিন মম
এ শ্রম সফল হবে ;—ক্লেশশেষে যদি
সফলতা, সব দুঃখ হয় বিদূরিত।
মনশ্চক্ষে তব মূর্ত্তি হেরিতেছি আমি,
দুঃখময়ী—অশ্রুসিক্ত বদন কমল,
চিন্তাপূর্ণ—অভাগার চিন্তায় কেবল ;—
কত আশা করেছিলে শৈশব সময়ে
কত সুখ ভুঞ্জিবারে যৌবনের কালে—
পার্থপত্নী হবে তুমি—রাজরাজেশ্বরী
রূপে বিরাজিবে সদা লক্ষ্মী ; দাস, দাসী
সেবিবে তোমারে নিত্য ; কাঁপিবে সভয়ে
কতজন, হাস্যমুখ না দেখিলে তব ;—
কোন্ সাধ হৃদয়েতে উদিবে তোমার
পূরণ না হবে যাহা, অর্জ্জুনের তুমি
অঙ্কলক্ষ্মী?—কোন্ সুখ রহিবে জগতে
তুমি না পাইবে যাহা লো চারুহাসিনি?
মণি মুক্তা হীরকাদি অলঙ্কার যত—
অগুরু চন্দন চুয়া গন্ধদ্রব্য আর—
রথ গজ হয় আদি যতেক বাহন—
বিচিত্র বসন ভূষা—কি হেন স্বরগে,
মরতে, পাতালে কিবা রহিবেক, যাহা
ধনঞ্জয়-জায়া চাহি না পাবে তখনি।

সুরেশ্বর পিতা মম—নারায়ণ সখা—
যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, হেন শুভযোগ
কার ঘটে ?—কত আশা করেছিলে তুমি
কত সুখ লভিবারে, কিন্তু হা কপাল,
অভাগার ভাগ্যদোষে, একদিন তরে
পুরিল না আশা তব ;—রে দারুণ বিধি !
কেমনে লিখিলি তুই, কোন্ প্রাণে মরি,
এই দুঃখ কৃষ্ণসখা দ্রোপদীর ভালে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জিতোরে নির্দ্দয় হৃদয়
সদা তুই—তা না হ'লে অনন্ত শয়নে
কেশবে রাখিবি কেন সাগরের জলে ?
দেবদেব মহাদেব কপালে কেন বা
বাঘছাল পরিধান, বিভূতি লেপন,
লিখিব ? হৃদয়ে তোর নাহি দয়ালেশ।
ত্রিদিবের বার্ত্তা সখি কি লিখিব বল ?
ত্রিদিব আমার চক্ষে অন্ধকার পুরী
তোমার বিহনে সদা—আলোক বিহনে
নিশি যথা—গন্ধ বিনা কুসুম যেমন।
একাকী বেড়াই আমি মন্দাকিনী তীরে
অবসর কালে সদা,—শুন সুবদনি,
কত প্রেম আলিঙ্গন পাঠাই আদরে
মনে মনে তব কাছে কব তা কেমনে—
দেবনদী সম্বোধিয়া কত কথা বলি,—
"বিরহের জ্বালা তুমি জান ভালমতে
জাহ্নবি, সদাই তেঁই আকুল পরাণে
না চাহিয়া কোন দিকে, না মানিয়া কভু
কোন বাধা, ধাও তুমি সাগর সঙ্গমে ;—
আমিও তাপিত আজি সে মহাজ্বলনে।
অযুত তরঙ্গ কর রঙ্গে পশারিয়া
লো গঙ্গে, আলিঙ্গি তোমা লন জলনিধি—
প্রতি বাহু পশারণে পড় তাঁর বুকে—
কিন্তু দেখ মোর দশা সুরতরঙ্গিণি,
নিদ্রাঘোরে কতদিন দেখিয়া স্বপন
পশারিয়া বাহুদ্বয় চেয়েছি ধরিতে,
পাই নাই—নিদ্রাভঙ্গে সহেছি আবার
বিরহের ঘোর জ্বালা রাবণের চিতা।"
পারিজাত তরুমূলে কখন বা গিয়া
বলেছি সম্বোধি তারে—"দেববৃক্ষ তুমি,—
কিন্নরীরা তব ফুলে অলঙ্কার গড়ি
পরে সদা—বিদ্যাধরী সকলে আসিয়া
পারিজাত লয়ে কত খেলে মন সুখে—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা আদি করি যত
অপ্সরীরে—কিন্নরীরে, বিদ্যাধরীদলে—
পারিজাত বিভূষিতা দেখেছ সদাই—
কিন্তু দেব ! কি বলিব, দ্রোপদীরে আনি
তব ফুলে সাজাইয়া পারিতাম যদি
ধরিতে সম্মুখে তব, দেখিতে তা হলে,—
দেখিতে স্বর্গের ফুলে শোভিত হইয়া
মরতের লতা দেব, কত শোভা ধরে,—
স্বরগের রবিকরে মণ্ডিত হইলে
মর্ত্ত্য পর্ব্বতের চূড়া কত শোভাময়ী,—
নীলপঙ্কজিনী, দেব, মরতবাসিনী,
দিবাকর করে আহা কি শোভায় সাজে ;—
মরতের মধুরিমা স্বরগের শোভা
হারাইত—কিন্তু হায় কোথা সে এখন।"
কল্পতরুমূলে গিয়া কখন বা কহি
ডাকি তরুবরে উচ্চে—"সিদ্ধিদাতা সদা
দেবনর রক্ষযক্ষ কিন্নরের তুমি—
সবারি মনের আশা সিদ্ধ কর দেব,
তোষ তুমি জগতেরে—কেন তবে প্রভু
না হও সদয় মোরে ?— হৃদয়ে আমার
দেখ চাহি কোন্ চিন্তা জাগিছে সতত ?
কোন্ বাঞ্ছা হৃদে মোর জাগরূক চির ?
কোন্ সাধ পুরাইতে লালায়িত সদা ?
দেখ দেব—সর্ব্ববিদ্ চিরদিন তুমি—
পুরাও মনের বাঞ্ছা বাঞ্ছা-কল্পতরু—
যেই বিভা অনুদয়ে অন্তর আকাশ
হয়েছে আঁধারময়, কর কৃপা আজি,
সে আলোকে এ অন্তরে করহ উদয়—
তৃষিত হৃদয় আজি যাহার অভাবে
সেই সে শীতলবারি কর বরিষণ—
কামদ সদাই তুমি ;—কিন্তু হা কপাল,
বায়সের রবে কভু বর্ষে জলধারা
আকাশ ? মরুতে হায় ফোটে কি কখন
কমলিনী ? অভাগার অদৃষ্টের দোষে
স্বর্গের কামদ তরু বাম মম প্রতি।
স্বরগ হইতে প্রিয়ে তব উপযোগী
যতেক সামগ্রী আছে যাইব লইয়া
পারিজাত আদি করি তোমার কারণে ;—
ইন্দ্র-পুত্রবধূ তুমি—ইন্দ্রপুরে যাহা,
সকলি তোমার ভোগ্য শুন ভাগ্যবতি !
দেখিতেছি মূর্ত্তি তব শশাঙ্কলোচনে—
রবিকরহতশোভা শশাঙ্কের লেখা,
মলিনা বিষণ্ণা যদি আকাশের ভালে

যেমতি দিবসে দেখি—বিরহের তাপে
দেহের মাধুর্য্য যেন গিয়াছে শুকায়ে—
পারি না ভাবিতে আর—নয়নের জলে
ভাসে বক্ষঃস্থল মম—কোন্ হিয়া বল
নাহি ফাটে দেখি আহা ও স্বর্ণ প্রতিমা
নিমজ্জিত বিরহের অনন্ত সাগরে ;—
কিন্তু নিদাঘের শেষে—রবি-পীতজলা
তরঙ্গিণী সহ যথা দেন মিলাইয়া
প্রবাহে—দিবেন বিধি শুন বিধুমুখি,
তব সহ অভাগায় মিলাইয়া পুনঃ।

সাবান এবং বাতি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

৬। পাম্‌তৈল।—আফ্রিকার পাম্ নামক বৃক্ষের ফলের অভ্যন্তরস্থ এক প্রকার কোমল শ্বেত পদার্থ হইতে এই পাম্‌তৈল নিষ্পীড়িত হয়। লিচু ফলের যেমন উপরে খোসা, নীচে বীজ এবং মধ্যস্থলে একটি শ্বেত পরদা বা আবরণ (যে টুকু আমরা খাই) বীজ পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, পাম্ ফলেরও ঠিক সেইরূপ, উপরের একটি দৃঢ় খোসা এবং নীচের বীজ বা আঁঠির মধ্যস্থলে শ্বেত আবরণের ন্যায় এক প্রকার কোমল পদার্থ আছে। এই শ্বেতাবরণ স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া নিষ্পীড়ন করিলে পাম্ তৈল নির্গত হয়।

ফলগুলি বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া বাহিরে কোন একস্থানে স্তুপাকারে রাখিতে হয়। ৮।১০ দিন পরে রৌদ্র, হিম এবং বায়ুর প্রভাবে যখন উপরের খোসা নরম হইয়া উঠে, তখন ফলগুলি আস্তে আস্তে পিটাইলে খোসা সহজেই খুলিয়া গিয়া অভ্যন্তরস্থ শ্বেতাবরণের সহিত বীজ বা আঁঠিগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে।

অতঃপর এই শ্বেতাবরণ যুক্ত আঁঠিগুলি কিছু দিন মাটির গর্ত্তে পুতিয়া রাখিয়া পচাইতে হয়। কারণ এরূপ করিলে শ্বেতাবরণ অংশটি সহজেই বীজ হইতে ছাড়িয়া যায়। গর্ত্তটি সাধারণতঃ ৪ ফুট গভীর করিয়া কাটিতে হয় এবং উহার নীচে এবং চারি পার্শ্বে কলাপাতা পাতিয়া বীজ ঢালিয়া দিতে হয় এবং উপরি ভাগ কলাপাতা দিয়া ঢাকিয়া তদুপরি মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। যে পর্য্যন্ত শ্বেতাবরণ পদার্থ কিঞ্চিৎ পচিয়া সিদ্ধ হওয়ার ন্যায় নরম না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা গর্ত্তে নিহিত থাকে। সচরাচর ৩ সপ্তাহ হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া থাকে।

এই প্রক্রিয়ার পর বীজগুলি গর্ত্ত হইতে সাবধান পূর্ব্বক তুলিয়া আর একটী গর্ত্তে ঢালিতে হয়। এ গর্ত্তটিও পূর্ব্বোল্লিখিত গর্ত্তের ন্যায় ৪ ফুট গভীর হওয়া চাই, কিন্তু উহার নিম্ন এবং পার্শ্বদেশ প্রস্তর নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। গর্ত্তে ঢালিয়া দিয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত বড় বড় মুদ্গার দ্বারা বীজগুলি কুটিতে হয়। চারি পাঁচজন লোক গর্ত্তের ধারে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কুটিতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত শ্বেতাবরণ পদার্থগুলি আঁঠি হইতে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক্ হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত কুটিতে হইবে। যেমন ঢেঁকিতে ধান ভানিতে ভানিতে চাল্ হইতে তুষ পৃথক হইয়া যায়, এই বীজগুলিও ঠিক সেইরূপ গর্ত্তের মধ্যে মুদ্গার দ্বারা কুটিতে কুটিতে আঁঠি হইতে শ্বেতাবরণগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে। তখন আঁঠিগুলি বাছিয়া পৃথক্ করিতে হয় এবং শ্বেতাবরণ শাঁস সমস্ত একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগে অগ্নি-সন্তাপে জ্বাল দিতে হয়। যখন ফুটিতে থাকে, তখন ঘন ঘন আবর্ত্তন করিতে হয়। এইরূপ কিছুকাল সিদ্ধ এবং আবর্ত্তণ করিলে শাঁস হইতে তৈল দ্রব হইয়া নির্গত হইতে থাকে; তখন উহা জালের ন্যায় সচ্ছিদ্র স্থূল কাপড়ে ঢালিয়া তৈল নিষ্পীড়িত করিয়া লইতে হয়। কাপড়ের দুই প্রান্তে কাঠি বান্ধিয়া লইলে গরম অবস্থায় নিষ্পীড়ন করিতে কষ্ট হয় না।

খুব বেশী দিন, ফল মাটিতে পুতিয়া রাখিলে, তাহা হইতে যে তৈল নিষ্পীড়িত হয়, তাহা অত্যন্ত ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত এবং খারাপ হয়। যত অল্প সময় নিহিত করিয়া অর্থাৎ পচাইয়া নিষ্পাড়িত হইবে, তৈল ততই উৎকৃষ্ট হইবে।

উপরে যে প্রকার পামফল হইতে তৈল নিষ্পাড়িত করিয়া লইবার প্রণালী বিবৃত হইল, তাহা আফ্রিকা দেশবাসী লোকদিগের নিয়ম। তাহারা উপরোক্ত নিয়মে প্রচুর পরিমাণে পাম্‌তৈল সংগ্রহ করে এবং সুযোগমতে বিলাত

চালান দেয়। কিন্তু এই সমস্ত তৈল কিছুতেই নির্ম্মল বা বিশুদ্ধ হয় না। অজ্ঞলোকদিগের অতর্কিতভাবে কার্য্য করিবার দোষে তৈলের অভ্যন্তরে ফলের আঁশ, খোসা, মাটি ইত্যাদি ময়লা থাকিয়া যায়; এ জন্য এই তৈল অধিক দিন ভাল থাকে না। কিছু দিন পরেই বিকৃত হইয়া উঠে। অনেক স্থলে উহার মধ্যে ন্যূনাধিক জল থাকিয়া যায়। আবার, কখন কখন চালান দিবার জন্য জাহাজ পাইতে বিলম্ব হইলে, তৈল গৃহে ফিরিয়া লইয়া যায় না। সমুদ্রতীরেই গর্ত্ত করিয়া বালির নীচে পুতিয়া রাখে। ইহাতেও তৈল খুব ময়লা মিশ্রিত হইয়া যায়। এতদবস্থায়, ইহা পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। পরিষ্কৃত করিবার জন্য নারিকেল তৈলে যেরূপ ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, তাহাই (জন্মভূমি, শ্রাবণ, ২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা ৪৮৭ পৃষ্ঠা দেখ,) অবলম্বনীয়।

পাম্‌তৈল দেখিতে মাখমের ন্যায় ঘন, পীতবর্ণবিশিষ্টএবং অনুগ্র সদ্‌গন্ধযুক্ত। ইহা সহজেই বিকৃত হইয়া উঠে। রৌদ্রোত্তাপে স্বাভাবিক বর্ণ কাটিয়া শুভ্র হইয়া যায়। পাম্‌তৈল ক্ষারের সহিত অতি সহজেই মিলিত হয় এবং তাহা হইতে উত্তম সাবান প্রস্তুত হয়। ইহার বাতি অতি উত্তম হয় এবং তজ্জন্য বিস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইথর এবং বিশুদ্ধ সুরায় পাম্‌তৈল সম্পূর্ণরূপে দ্রব হইয়া যায়। সুলভ নিবন্ধন অনেকে পাম্‌বীজের তৈল মিলাইয়া পামতৈল বিক্রয় করে। পাম্‌বীজতৈল, ফলের আঁঠির অভ্যন্তরস্থ শাঁস নিষ্পীড়িত করিয়া সংগৃহীত হয়।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পাম্‌বৃক্ষের এত আবাদ হয় যে, বৃক্ষ হইতে সমস্ত ফল সংগৃহীত করিতে না পারায়, উহারা তলায় পড়িয়া থাকে, এবং কিছুকাল পরে পচিয়া গিয়া নীচের মাটি তৈল দ্বারা সিক্ত করিয়া ফেলে। এদিকে বিলাতে পাম্‌তৈল রপ্তানি করিবার জন্য উপকূল সমূহে প্রায় বার.মাসই জাহাজ অবস্থিতি করিতেছে। অধুনা, চরবির মূল্য সস্তা হওয়ায়, পাম্‌তৈলের আদর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাতি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার উপযোগিতা অদ্যাপিও খুব প্রবল রহিয়াছে। কোন কোন শ্রেণীর সাবানও পাম্‌তৈল ভিন্ন অন্য কোন তৈল দ্বারা যথাবৎ প্রস্তুত হয় না। প্রতিবৎসর অন্যূন ৮ লক্ষ মণ পাম্‌তৈল আফ্রিকা হইতে বিলাতে প্রেরিত হয়। ভারতে এই তৈলের আমদানী করা অতি সহজ ব্যাপার।

৭। পাম্‌বীজ তৈল।— উপরোক্ত পাম্‌তৈল প্রস্তুত করিবার সময় ফলের অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লীবৎ শ্বেতাবরণ অংশ টুকু গ্রহণ করিয়া যে বীজ অর্থাৎ আঁঠি গুলি পরিত্যক্ত হয়, সেই আঁঠির শাস হইতে এই তৈল নিষ্পাড়ন করিয়া লওয়া হয়। গাছের তলায় ফল পড়িয়া পচিয়া গেলে যে আঁঠি গুলি পড়িয়া থাকে, তাহা হইতেও এই তৈল সংগৃহীত হইয়া থাকে।

অতি পূর্ব্বে বীজ খোলায় ভাজিয়া লওয়া হইত; কিন্তু তাহাতে তৈলের বর্ণ কাল হইয়া যাইত বলিয়া অধুনা সে নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ, বীজ গুলি উত্তম রূপে রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। অনন্তর সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া ভিতরের শাস গুলি সংগ্রহ করিতে হয়। যদি শাস গুলি সম্পূর্ণরূপ শুকাইয়া না থাকে তাহা হইলে বীজগুলিকে আরো কিছু কাল রৌদ্রে দিয়া উত্তমরূপ শুকাইয়া লইতে হইবে। অতঃপর উহাদিগকে ঢেকিতে কিম্বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত বৃহৎ খলে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। এই চূর্ণ গুলি সর্ব্বশেষে প্রস্তর নির্ম্মিত জাতা দিয়া অতি সূক্ষ্মরূপে পেষণ করিতে হয়। এই সময় সমস্ত চূর্ণ, তন্মধ্যস্থ তৈল যোগে খইলের ন্যায় জমাট বান্ধিয়া যায়। তখন উহা শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত দ্বারা আবর্ত্তন করিতে হয়। অনন্তর কিছু ক্ষণ পরে জলের উপরিভাগে মাখমের ন্যায় তৈল ভাসিয়া উঠে। এই ভাসমান তৈল সংগ্রহ করিয়া জ্বাল দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। এই সময়ে তৈলের বর্ণ ঈষৎ পীতবর্ণ থাকে, কিন্তু কিছু কাল বাহিরে রৌদ্র এবং শিশিরে রাখিয়া দিলে উহা সম্পূর্ণরূপে শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

পাম্ বীজের তৈল স্বভাবতঃ ঈষৎ পীতবর্ণ বিশিষ্ট এবং নারিকেল তৈলের ন্যায় উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট। রাসায়নিক এবং বাহ্য প্রকৃতিতে নারিকেল তৈলের সহিত এই তৈলের অনেক সাদৃশ্য আছে। বস্তুতঃ এই সাদৃশ্য হেতু সুলভ সাবান প্রস্তুত করিতে এখন আর নারিকেল

তৈল ব্যবহৃত হয় না। তত্তৎস্থলে পাম্-বীজ-তৈলই অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে। নারিকেল তৈলের ন্যায় পাম্-বীজ-তৈল জমিয়া যায়; কিন্তু তদ্রূপ সহজে বিকৃত হয় না।

৮। জলপাইয়ের তৈল।—ইহাকে ইংরাজীতে অলিভ্ অয়েল কহে। জলপাই-চূর্ণ থলিয়ায় পূরিয়া, তৈল নিষ্পাড়ন করিয়া লওয়া হয়। খইলটাকে পরিষ্কৃত জলে কিঞ্চিৎ আর্দ্র করিয়া পুনরায় নিষ্পীড়ন করিলে আরও তৈল নির্গত হয়। কোন কোন স্থলে তৃতীয় বার নিষ্পীড়ন করা হয়। শেষোক্ত নিষ্পীড়নের তৈল নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট জলপাইয়ের তৈল লঘু এবং কিঞ্চিৎ সবুজ আভাযুক্ত পীতবর্ণ বিশিষ্ট হয়। ঈষৎ সুগন্ধযুক্ত। বেশি উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তৈল হইতে ষ্টিয়ারিন্ দানার আকারে বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল আহার এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। এবং সাধারণতঃ স্যালাড্ অথবা সুইট অয়েল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাবান প্রস্তুত জন্য অপকৃষ্ট তৈলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনে বাদামের এবং কার্পাস বীজের তৈল মিশ্রিত করিয়া, সচরাচর জলপাইয়ের তৈল বাজারে বিক্রীত হয়।

এসিয়ার নাতি শীতোষ্ণ প্রদেশেই জলপাইয়ের প্রচুর আবাদ হয়। প্রস্তরচূর্ণ, বালি ও কঙ্কর বিশিষ্ট জমিতেই জলপাই বৃক্ষের আবাদ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। প্রতিবৎসর অন্যূন ৪ লক্ষ মণ তৈল এসিয়া হইতে বিলাতে প্রেরিত হইতেছে।

৯। কার্পাস-বীজ-তৈল।—তূলা বাছিয়া লইলে যে বীজগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা প্রায়ই লোকে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকায় তৈলের নিমিত্ত ইহার এত আদর যে তূলা হইতে বীজ স্বতন্ত্র করিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে; এবং এই বীজ হইতে তৈল সংগ্রহ করিবার জন্য একটি নূতন বৃহৎ কার্য্য-ক্ষেত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমেরিকার এক ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ প্রদেশেই অন্যূন ৫০টি তৈলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কল হইতে প্রতিবৎসর ন্যূন-কল্পে বিংশতি সহস্র মণ কার্পাস-বীজ-তৈল প্রস্তুত হয়।

তূলা স্বতন্ত্র করিয়া লইলেও বীজের গায়ে কিঞ্চিৎ তূলা থাকিয়া যায়। এই তূলা সম্পূর্ণরূপে ফেলিয়া না দিলে, বীজ সকল পরস্পর জড়িত হইয়া ঢেলা বান্ধিয়া যায়; এবং পরবর্ত্তী কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। বীজগুলি বালিমিশ্রিত করিয়া, চালুনিতে নিক্ষিপ্ত এবং বাষ্পযন্ত্রযোগে সজোরে সঞ্চালিত হয়। এইরূপে যখন বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়া যায়, তখন তাহাতে আর তূলার কণামাত্র থাকে না। তখন উাহারা কলের সেপারেটর নামক যন্ত্রাংশে নীত হয়। সেপারেটর যন্ত্রে কতগুলি ছুরির ন্যায় ধারাল স্ক্রূপ থাকে; এই যন্ত্রের ক্রিয়ায় বীজগুলি খোসা-মুক্ত হইয়া যায়। এখন শাঁসগুলি রোলার অর্থাৎ বৃহৎ লৌহ দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে চাপিয়া খইলের ন্যায় জমাট বান্ধিতে হয় এবং বৃহৎ লৌহ-কটাহে চাপাইয়া প্রচুর বাষ্পোত্তাপে সিদ্ধ করিতে হয়। বাষ্পযন্ত্র হইতে একটি নল, কটাহের তলদেশে সংযুক্ত করিয়া দিলেই, তদ্দ্বারা বাষ্প নীত হইয়া, কটাহে প্রবিষ্ট হয়; এবং তন্মধ্যস্থ পদার্থ সিদ্ধ করিয়া আর্দ্র করিয়া ফেলে। এইরূপ সিদ্ধ হইবার সময় খইলগুলি পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। অতঃপর ইহা থলিয়া পূরিয়া হাইড্রলিক প্রেসে নিষ্পাড়িত করিলেই সমস্ত তৈল নির্গত হয়। এক মণ তূলার বীচিতে প্রায় পাঁচসের তৈল, পনর সের খইল এবং আধ মণ তুষ পাওয়া যায়। খইল গরুর উপাদেয় খাদ্য এবং জমির উৎকৃষ্ট সার।

আমাদিগের দেশীয় কলুর ঘানি-যন্ত্রেও তূলার বীজ হইতে উত্তম তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এতদর্থে এদেশে ইহার ব্যবহার অতি কম। অধুনা ভারত হইতে কার্পাস-বীজ ইউরোপে চালান যাইতে সুরু হইয়াছে।

নূতন বীজ হইতে সদ্য নিষ্পীড়িত তৈল দেখিতে নির্ম্মল এবং লাল বর্ণযুক্ত। পুরাতন বীজের তৈল অপেক্ষাকৃত গাঢ় এবং ঘোলা হয়। শোধিত করিলে কার্পাস-বীজ-তৈল দেখিতে পীত জলপাইয়ের তৈলের ন্যায় হয়। এই সাদৃশ্য হেতু বিশুদ্ধ কার্পাস-বীজ-তৈল অথবা ইহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে জলপাইয়ের

তৈল মিশ্রিত হইয়া, বিশুদ্ধ জলপাইয়ের তৈল বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ কার্পাস-বীজের তৈল সুগন্ধ এবং সুস্বাদবিশিষ্ট।

অন্যান্য ব্যবহার ব্যতীত, সাবান প্রস্তুত করিবার বারজন্য চর্ব্বি এবং অন্যান্য তৈলের সহিত কার্পাস-বীজ-তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১০। ডিকা-তৈল।—আফ্রিকার পশ্চিমোপকূল হইতে ডিকা নামক একপ্রকার তৈল বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে, উহা মাখম বা শীতকালের নারিকেল তৈলের ন্যায় সংহত এবং ফারণহিটের ৮৬ হইতে ৯১॥ ডিগ্রীর নিম্নতাপাংশে দ্রব হয় না। সাবান প্রস্তুতোপযোগী কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপাদান ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে; এবং তজ্জন্য এই তৈল-নির্ম্মিত সাবান অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান মধ্যে পরিগণিত। বিলাতে প্রতিবৎসর যে ডিকা-তৈল প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা মম অপেক্ষাও শক্ত এবং ময়লামিশ্রিত থাকায়, ঈষৎ লাল বর্ণবিশিষ্ট।

আফ্রিকার ডিকা নামক বৃক্ষের বীজ হইতে এই তৈল প্রস্তুত হয় বলিয়া, তদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে ডিকার তৈল কহে। বিলাতেও ঐ ডিকা নাম রক্ষিত হইয়াছে। তৈল নিরেট বলিয়া ইহাকে ডিকার চর্ব্বিও বলা হইয়া থাকে। এক মণ বীজ হইতে ২৪ সের নীরেট তৈল পাওয়া যায়।

১১। সিয়াতৈল।—ডিকাতৈলের ন্যায় "সিয়া" তৈলও আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলে প্রস্তুত হয়। নাইগার নদীর তীরস্থ "লুলু" নামক বৃক্ষের ফলের বীজ হইতে সিয়াতৈল প্রস্তুত করা হয়। দেখিতে মাখমের ন্যায় বলিয়া, ইহাকে সিয়া অর্থাৎ মাখম বলা হয়। নদীর ধার দিয়া বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া সিয়া বৃক্ষের জঙ্গল পড়িয়া রহিয়াছে। বীজ দেখিতে পায়রার ডিম্বের ন্যায়।

বৃক্ষ হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া, রৌদ্রে উত্তমরূপ শুকাইতে হয়। অনন্তর গম-পেষণের ন্যায় উদূখলে পিশিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিতে হয়। এই চূর্ণ কোন পাত্রে রাখিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ গরম জল দিয়া ময়দা মাখার ন্যায় সজোরে হস্ত দ্বারা পেষণ করিতে হয়। কিছুকাল পেষণ করিলেই সিয়া চূর্ণ হইতে বিযুক্ত হইয়া চূর্ণ পিণ্ডের গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের ন্যায় তৈল বহির্গত হয়। তখন উহা যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত মিলাইলে, তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। পুনঃপুনঃ এই প্রণালী দ্বারা সিয়াচূর্ণ হইতে সমস্ত তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়, এবং উগ্র অগ্নিসন্তাপে তাহা ফুটিত করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। দেশীয় লোকেরা এই তৈল সিয়াপাতায় জড়াইয়া বাতি বান্ধিয়া রাখিয়া দেয়। এই বাতি দুই বৎসরের মধ্যে নষ্ট হয় না। এক মণ সিয়াবীজ হইতে ১২ হইতে ১৬ সের পর্য্যন্ত তৈল নির্গত হয়।

সিয়াতৈল মাখমের ন্যায় সংহত। ঈষৎ ধূসরবর্ণ, কখন বা কিঞ্চিৎ লালাভাযুক্ত। পুনঃপুনঃ গরম জল দ্বারা ধৌত করিলে, সিয়াতৈল সম্পূর্ণ বর্ণহীন হইয়া যায় এবং দেখিতে ঠিক চর্ব্বির ন্যায় হয়। কিন্তু এই তৈল এত আঠাযুক্ত যে, আঙ্গুলে লাগিলে উহা সহজে ছাড়িয়া যায় না। গন্ধ উগ্র নহে এবং মধুর ন্যায় ঈষৎ মিষ্টাস্বাদবিশিষ্ট। তৈলজ অম্লের মধ্যে ষ্টিয়ারিক এসিড একটু বেশী পরিমাণে আছে। সেই জন্য এই তৈল দ্বারা অনেক সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য তৈল কিংবা চর্ব্বির সহিত মিলাইয়াও ইহা সাবান প্রস্তুতার্থে ব্যবহৃত হয়। সিয়াতৈল তারপিন্ তৈলে দ্রব হইয়া যায়, কিন্তু ইথর কিংবা এল্‌কহলে সম্পূর্ণরূপে দ্রব হয় না। কিন্তু ষ্টিয়ারিক্ এসিড্ বেশী থাকিলেও বাতি প্রস্তুতার্থে সিয়াতৈল ততোধিক উপযোগী নহে; কারণ বাতিগুলি অপেক্ষাকৃত নরম থাকিয়া যায় এবং জ্বালিলে শিখা হইতে ধূমোদ্গম হয়। তথাপিও ইউরোপের কোন কোন কারখানায় সিয়াতৈল দ্বারা বিস্তর বাতি প্রস্তুত হইতেছে। আফ্রিকার সিয়ালিওন উপকূল হইতে বৎসর বৎসর ১৪।১৫ হাজার মণ সিয়াতৈল বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

অন্যথা তৈলজ পদার্থ ভিন্ন "গাটাসিয়া" নামক আর একটি উপাদান, সিয়াতৈলে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে গাটার্পাচার ন্যায়। বিশুদ্ধ সুরা-মিশ্রিত ইথার সংযোগ করিলে সিয়াতৈল হইতে গাটাসিয়া বিশ্লিষ্ট হয়।

১২। ঔদ্ভিজ্য চর্ব্বি।—ইহা কতিপয় গ্রীষ্ম প্রধান দেশীয় বৃক্ষ বিশেষের ফলোৎপন্ন তৈল। চর্ব্বির ন্যায় শ্বেত এবং শক্ত বলিয়া

ইহা ঔদ্ভিজ্য চর্ব্বি নামে অভিহিত হইয়াছে। পাম্-ফলের অভ্যন্তরস্থ বীজপরিবেষ্টিত শ্বেতাবরণ শাঁস হইতে যেমন পাম্ তৈল প্রস্তুত হয়, এই ঔদ্ভিজ্য চর্ব্বিও সেইরূপ কোন কোন বৃক্ষ-বিশেষের ফলাভ্যন্তরস্থ শাঁস হইতে প্রস্তুত হয়। স্থানভেদে এই চর্ব্বির গুণের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। চীন, মলয় এবং আফ্রিকা—এই তিন স্থানেই এই বৃক্ষের বিস্তর আবাদ এবং উহার ফল হইতে প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(ক) চীন।—চীন দেশীয় লোকেরা এই বৃক্ষকে "টিলিঞ্জিয়া" অর্থাৎ চর্ব্বি বৃক্ষ কহে। চীনের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে এই বৃক্ষের আদি স্থান। তথা হইতে চেকিয়াং এবং তন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জে, কিয়াংসি এবং হুপী প্রভৃতি স্থানে ইহা নীত এবং বিস্তর আবাদ হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান স্থানসমূহে এবং ভারতের কোন কোন স্থানে ইহার আবাদ হইতেছে। পঞ্জাবে গারোয়াল প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ডনি নামক স্থানে, কামায়নের অন্তর্গত আয়ারতালি এবং হাওলবাগ এবং কাঙ্গারা পাহাড়ের উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে অধুনা এই বৃক্ষের আবাদ হইয়াছে। নিম্ন, জলাজমী, স্রোতস্বতীর উপকূল, বালুকাময় চর, পার্ব্বতীয় উপত্যকা ইত্যাদি স্থানে এই বৃক্ষের আবাদ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

ফলগুলি প্রায় অর্দ্ধ-ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট। উহার ভিতরে তিনটি বীজ পরস্পর সংযত হইয়া থাকে। এই বীজত্রয় বেষ্টন করিয়া একটি তেলপ্রদ স্থূল শ্বেতাবরণ থাকে। এই শ্বেতাবরণ হইতে বাষ্প এবং উষ্ণজলের সাহায্যে তৈল অর্থাৎ উপরোক্ত উদ্ভিজ্য চর্ব্বি সংগৃহীত হয়। অনন্তর অগ্নিসন্তাপে দ্রব করিয়া এবং তদবস্থায় কিছু কাল 'থিতাইয়া' তৈল পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। শীতল হইলে কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ টবে ঢালিয়া এক এক মণ ওজনের এক এক বড় ঢেলা বান্ধিয়া রাখা হয়। এই ঢেলা কিছু কাল পরে এত শক্ত হইয়া উঠে যে অঙ্গুলের চাপে শুষ্ক মাটির ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায়।

এই ঔদ্ভিজ্য চর্ব্বি গন্ধাস্বাদহীন এবং নির্ম্মল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ইহার প্রায় সর্ব্বাংশই ষ্টিয়ারিণ এবং ১১১ ডিগ্রীর নিম্ন তাপাংশে দ্রব হয় না। চীনেরা ইহা দ্বারা কেবল একমাত্র বাতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহার বাতি অতি পরিষ্কার আলোক প্রদান করে; এবং কিছুমাত্র ধূমোত্থিত হন না। একমণ বীজে আধমণ বা ৩০সের তৈল প্রদান করে; বীজের অভ্যন্তরস্থ শাঁস হইতেও এক প্রকার তৈল নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা অতি নিকৃষ্ট।

(খ) মলয়।—বর্ণিও, জাবা এবং সুমাত্রা দ্বীপে কোনও এক বৃক্ষের ফল নিষ্পীড়ন করিয়া, এক প্রকার তৈল সংগৃহীত হইয়া থাকে; তাহা তত্তৎদেশীয় লোকেরা ঔদ্ভিজ্য চর্ব্বি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। সরবক্ নদীর তীরেও এই বৃক্ষ বিস্তর জন্মে; এবং তথাকার লোকেরা ইহার ফল হইতে "স্পারম অয়েল" অর্থাৎ তিমি মৎস্যের তৈলের ন্যায় এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকে; ইহাকেও ঔদ্ভিজ্য চর্ব্বি কহে। ম্যানিলায় ইহা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিলাতে এই মলয় দেশীয় ঔদ্ভিজ্য চর্ব্বি প্রচুর আমদানি হয়। উভয় চীন ও মলয় দেশীয় ঔদ্ভিজ্য চরবিতে সাবান প্রস্তুতোপযোগী উপাদান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ওলিক এসিড অতি অল্প পরিমাণে থাকে।

(গ) আফ্রিকা।—এখানে যে ঔদ্ভিজ্য চর্ব্বি পাওয়া যায়, তাহা সিয়ালেওনা নামক স্থানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হইতেও উক্ত চর্ব্বি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলগুলি দ্বিখণ্ড করিলেই, এক প্রকার পীতবর্ণ বিশিষ্ট নির্যাস নির্গত হয়, তাহাই সংগ্রহ করিয়া রক্ষিত হয়। ইহা মিষ্টাস্বাদ যুক্ত এবং জঙ্গিমঙ্গের নিকটস্থ লোকেরা রন্ধন কার্য্যেই ব্যবহার করিয়া থাকে।

সরকার।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(৭)

১৮৬৮খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ আখ্যানমঞ্জরী প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতেও বৈদেশিক চরিত্রের সমাবেশ।

হরকালী চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় রন্ধন করিত। বর্দ্ধমানেও তাহার উপর রন্ধন করিবার ভার ছিল। একবার বর্দ্ধমানের বাসা হইতে কোন একটী স্ত্রীলোক, অনেকবার টাকা ও কাপড় লইয়া গিয়াছিল। হরকালী তাহাকে বলে,—"মাগী, তোরা কি বিদ্যাসাগরকে লেদা আম পাইয়াছিস্।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, একথা শুনিয়া, হরকালীর উপর বড়ই বিরক্ত হন। হরকালী ক্ষমা প্রার্থনা করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, দুই টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, তাহাকে বিদায় দেন।

এ অতীব অবিশ্বাস্য বিবরণ, আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা। তিনি নিশ্চিতই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তবে একবার একটা দোষ করিয়া, দীন-হীন অনুগত ভৃত্য, কাতরকণ্ঠে ক্ষমা চাহিলেও, বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে সহজে কাহার প্রবৃত্তি হইবে বল? তবে ঘটনা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে, বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর ভাঙ্গিয়াছে; রোগে দেহ-যষ্টি ক্ষীণ-বল হইয়াছে; তবুও কিন্তু কার্য্যের বিরাম নাই। বর্দ্ধমানে আবার কঠোর কার্য্যকারিতার প্রয়োজন হইল। ১৮৬৯ সালে বর্দ্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের সংহার-মূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ-দৃশ্যে যাহার করুণ-বুক ফাটিয়া, অবিশ্রান্ত শোণিত-স্রোত ছুটিয়াছিল, আজ বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়ায় কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? সংবাদপত্রে কোটি কণ্ঠের কাতর-ক্রন্দন উত্থিত হইল। রোগে ত্রাহি ত্রাহি; কিন্তু চিকিৎসা করিবার লোক নাই। দারুণ দুন্দুভিনাদে সংবাদপত্র-সমূহে এ সাংঘাতিক সংবাদ বিঘোষিত হইতে লাগিল। সে সময় কি যে মর্ম্মান্তিক হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাৎকালিক সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই তাহা বলিতে পারেন। সে মহামারী ব্যাপার বর্ণনাতীত! হিন্দুপেট্রিয়ট-সম্পাদক, সে লোকক্ষয়কর কাণ্ডের প্রতীকার-প্রত্যাশায়, মুহুর্ম্মুহু চীৎকার করিয়া, গবর্ণমেণ্টের কর্ণাকর্ষণ করিতে, তিলমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, রোগীদিগের চিকিৎসার্থে "ডিস্পেন্সারি" স্থাপন করিয়াছিলেন। ঔষধ-পথ্যের যথারীতি ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া, ম্যালেরিয়ার সেই ভীষণ সর্ব্বনাশকারিতার সংবাদ, তাৎকালিক ছোটলাট গ্রে সাহেবের কর্ণগোচর করেন। গ্রে সাহেব বাহাদুরও সবিশেষ তথ্য নির্দ্ধারণার্থ প্রবৃত্ত হয়েন। তথ্য-নির্ণয়ে অবশ্য কালবিলম্ব হইল না। সাহায্যের আবশ্যকতা-বিবেচনায়, স্থানে স্থানে "ডিস্পেন্সারি" খোলা হইল; এবং ঔষধ ও পথ্য দিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে পীড়িত ব্যক্তিগণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ডিস্পেন্সারি" হইতে ঔষধ, পথ্য ও পয়সা পাইত। তিনি প্রায় দুই সহস্র টাকার বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিশ্চিতই নামের প্রত্যাশায় এ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই; কিন্তু তৎকালে হিন্দুপেটরিয়ট-প্রমুখ সংবাদপত্রে তাঁহার নামে একটা আকাশভেদী জয় জয়কার-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।*

এই সময় প্যারিচাঁদ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক সাহায্য করিতেন। তাঁহার উপর "ডিস্পেন্সারি"র সম্পূর্ণ ভার ছিল। কুইনাইন বড় মূল্যবান, অথচ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল; এই জন্য গঙ্গানারায়ণ বাবু, পরামর্শ দেন যে, কুইনাইনের পরিবর্ত্তে "সিঙ্কোনা" ব্যবহার করা হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"গরীবের রোগ বলিয়া, প্রকৃত ঔষধ ব্যবহার করিবেনা; এও কি কখন হয়? দুঃখী-ধনী সবারই প্রাণ ত একই; পরন্তু রোগও এক।" গঙ্গানারায়ণ বাবু, বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বে ডুবিয়া গেলেন। যে সব রোগী ঔষধ লইবার জন্য "ডিস্পেন্সারি"তে আসিতে পারিত না, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাদের বাড়ীতে গিয়া, স্বয়ং ঔষধ-পথ্য দিয়া আসিতেন।

প্যারিচরণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণের প্রিয়তম সুহৃদ্। মৃত্যুর পর, তাঁহার পরিবারবর্গ বিদ্যাসাগরের সেই সাদর স্নেহে বঞ্চিত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তাঁহারা চির-কৃতজ্ঞ। প্যারি বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র এখন মুনসেফ; এবং কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত

* *Vide Hindu Patriot* 1869.

অবিনাশচন্দ্র মিত্র জজ আদালতের সেরেস্তাদার। বঙ্গবাসী কলেজের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু তাঁহার জামাতা। গিরিশ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। এখনও উভয় সংসারে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব বিদ্যমান আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়; প্রায়ই গিরিশ বাবুর নিকট আপন জীবনের গল্প করিতেন।

বিদ্যাসাগর কি! এ রোগ-কোলাহল-সঙ্কুল কার্য্যময় বর্দ্ধমানে বসিয়াও, তিনি সেক্সপিয়রের "কমিডি অব এরারস্" অবলম্বন করিয়া, ভ্রান্তিবিলাস নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ভ্রান্তি-বিলাসের ভাষা লালিত্যময়ী ও রহস্যোদ্দীপিকা। ভাষান্তর-রচিত ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদিত পুরাতন পুস্তকের ছায়াবলম্বন করিয়া, সেক্সপিয়র, "কমিডি অব এরারস" রচনা করেন।* বলা বাহুল্য এ রচনায় ইংরেজি ভাষার বলপুষ্টি হইয়াছে। "কমিডি অব এরারস্" উৎকৃষ্ট নাটকমধ্যে পরিগণিত না হইলেও, সুন্দর রহস্যোদ্দীপক প্রহসন-প্রকারে পরিগণিত হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রান্তিবিলাসে সে রসমাধুর্য্য সংরক্ষিত হইয়া যে, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন-পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর! তুমি যে কেন বলিয়াছিলে, উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর হইতেই, তোমার সকল শক্তির হ্রাস হইয়াছিল, তাহা আমরা আজিও বুঝিতে পারি নাই। তোমার কার্য্যকরিতার অপার মহিমা!

১৮৬৯ সালের মার্চ্চ মাসে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাস-বাটীতে আগুণ লাগিয়াছিল। বাড়ী পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ও জননী নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহারা সকলেই রক্ষা পান। বাড়ীর বিগ্রহটী পর্য্যন্ত দগ্ধ-বিদীর্ণ হইয়াছিল।† জিনিস-পত্র কিছু রক্ষা পায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই সংবাদ পাইয়া বাড়ীতে গিয়াছিলেন।

১৮৬৯ সালের ৯ই অগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুকে, সংস্কৃত প্রেসের এক তৃতীয়াংশ চারি সহস্র টাকায়, এবং শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষকে এক তৃতীয়াংশ চারি সহস্র টাকায় বিক্রয় করেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখেই শুনিয়াছি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাওনা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছাপাখানার অংশ বিক্রয় করিয়া, তাঁহার দেনা পরিশোধ করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মল্লিনাথের টীকা সহ, মেঘদূত মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

এইবার বড় হৃদয়বিদারক কথা! এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, জন্মের মতন, বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটী, তাঁহার দেশ-পরিত্যাগের অন্যতম কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগত প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহের পুত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে ঘটনাটী আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি;—

ক্ষীরপাইনিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কেঁচকাপুর-স্কুলের হেডপণ্ডিত, কাশীগঞ্জবাসিনী মনোমোহিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগ করেন। পাত্র-পাত্রী উভয়কেই বীরসিংহ গ্রামে আনয়ন করা হইয়াছিল। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার-পরিবারের ভিক্ষা-পুত্র। হালদার বাবুরা আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন,—"মহাশয় যাহাতে এ বিবাহ না হয়, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাদের কাতরতা দেখিয়া, তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন এবং বলিলেন,—"এ বিবাহ হইবে না, আপনারা উহাদিগকে লইয়া যাউন।" তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গ্রামের অন্যান্য কয়েকজন, রজনীযোগে তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া, বাড়ীর

* *Comedy of Errors (Comedy) The Menaechmi and Amphitruo of Plautus; (?) An old play the Historie of Error, 1576-77.* Shaw's 'Student's English Literature'. P. 150.

† কাহারও কাহারও মুখে শুনি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা সর্ব্বাগ্রে বিগ্রহটী মস্তকে লইয়া, বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়েন। বিগ্রহ অক্ষত দেহে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

বারান্দায় বসিয়া, তামাক খাইতে খাইতে, অকস্মাৎ শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইলেন; কিন্তু ইহার কিছু ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সেই সময় গোপীমোহন সিংহ, তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শাঁক বাজিতেছে কেন?" সিংহ মহাশয় বলিলেন,—"আপনি জানেন না? মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়া গেল।" শুনিয়া ক্রোধে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বদনমণ্ডল রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, কেবল তামাক টানিয়া, মুহুর্মুহু ধূম ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাগ হইলে, তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন। রাগ হইলে, তিনি অনেক সময়, চুপ করিয়া থাকিতেন; বড় একটা কথা-বার্ত্তা কহিতেন না। যদি কোন স্নেহাস্পদ বয়ঃকনিষ্ঠকে "ইনি" "উনি" "বাবু" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইত, তাঁহার অন্তরে দাবানল প্রধূমিত। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়, সিংহ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই ইহার কিছুই জানিস না?" সিংহ মহাশয় উত্তর দিলেন,—"আপনার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানিনা।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আমি ভদ্রলোকদিগকে কথা দিয়া, সত্য রক্ষা করিতে পারিলাম না; অতএব বীরসিংহ পরিত্যাগ করিলাম; আর আসিব না।" বিধবা-বিবাহের সৃষ্টিকর্ত্তা সত্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর, সত্য-ভঙ্গ হইল বলিয়া, জন্মের মত প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। আর তিনি বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন নাই; কিন্তু যাহার যেরূপ বৃত্তি বা মাসহারার বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বন্ধ হয় নাই।

বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত কোন অতি-অন্তরঙ্গ আত্মীয়, এক স্থানে দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"জানেন, এখনই তার ধোপা নাপিত বন্দ করে দিতে পারি; তাকে এখানে চেনে কে?" এ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই।

১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগরের ৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে "ডিপজিটরী" প্রদান করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, ডিপজিটরীর কর্ম্মচারীদের ব্যবহারে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক দিন তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া, বিরক্ত ভাবে বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি ডিপজিটরী লয়, তাহা হইলে আমি বাঁচি। সেই সময় ব্রজ বাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,—"আপনি রাগ করিয়া বলিতেছেন; না—সত্য সত্য আপনার মনের কথাই ইহা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"সত্যই আমারি মনের কথা।" ব্রজ বাবু বলিলেন,—"তবে আমায় দেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"লও।"

আমরা এই কথা রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—"আপনি এক্ষণে ডিপজিটরীর কার্য্য রীতিমত চালাইয়া, ইহার উপস্বত্ব ভোগ করুন, পরে যেরূপ হয় করা যাইবে।" রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, ইহার পর দুই এক জন লোক ৫।৬ হাজার টাকা দিয়া, ডিপজিটরীর সত্ত্ব ক্রয় করিতে চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন,—"যাহা এক জনকে এক বার দিয়াছি, কোটি মুদ্রা পাইলেও, তাহা ফিরাইয়া লইব না।"

১৮৭০ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম সুহৃদ্ ও সহায়, বৰ্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

১৮৭০ খৃঃ অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলা ৩টার সময়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবলীলা সম্বরণ করেন। যে অকৃত্রিম প্রিয় বন্ধুর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; এবং যাঁহার অলৌকিক উদারতাগুণে এবং অসামান্য চিকিৎসাসাহায্যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, শত শত আর্ত্তপীড়িতের প্রাণ-দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর বিয়োগে তিনি যে মর্ম্মান্তিক শোক পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে দুর্গাচরণ বাবু প্রাণ উৎসর্গ করিতেন; আবার দুর্গাচরণ বাবুর কার্য্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন। ১৮৬৯ সালে দুর্গাচরণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে সিবিলিয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু তাঁহার বয়স লইয়া গোল

হইয়াছিল। দুর্গাচরণ বাবু সে সংবাদ পাইয়া, এদায়ে উদ্ধার পাইবার জন্য, আকুল-প্রাণে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরম বন্ধু ৺ দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত নানা পরামর্শ করিয়া, দুর্গাচরণ বাবুর দায় উদ্ধারার্থ বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, সুরেন্দ্র বাবুর কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার সিবিলসার্ব্বিস' পরীক্ষোপযোগী বয়স নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, নানা তর্কযুক্তি সহকারে বিলাতে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। ইহাতেই বয়স বিভ্রাট মিটিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হন। দুর্গাচরণ বাবুর মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পরে, সে সংবাদ কলিকাতায় আসিয়াছিল। লোকান্তরিত বন্ধু দুর্গাচরণের স্মৃতিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়, চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। যখন সুরেন্দ্রনাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে "সিবিল সার্ব্বিস" হইতে পদচ্যুত হন, তখন তিনি অনন্যোপায়ে, বাক্-বজ্র-সাহায্যে দেশহিতৈষী হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার অন্ন-সংস্থানে সে বাকপটুতার সাহায্য বড় অল্পই হইয়াছিল। একমুষ্টি উদরান্নের জন্য তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে নিজের কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিয়া, মৃত বন্ধুর প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিনটী চিকিৎসক-বন্ধু, সর্ব্বকার্য্যে সহায় ছিলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব মুখোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রলাল সরকার। নীলমাধব, দুর্গাচরণের কিছুকাল পূর্ব্বে লোকান্তরিত হন। মহেন্দ্রলাল আজ চিকিৎসা-রাজ্যের উচ্চ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এই মহেন্দ্রলালের সঙ্গে কিন্তু বৎসর কতক পরে দারুণ মনান্তর সংঘটিত হয়। শুনিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার সঙ্কটাপন্ন পীড়াসূত্রে এই মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। মহেন্দ্র বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রেরিত আহ্বান-পত্র না পড়িয়া,রাখিয়া দিয়াছিলেন; পরে সেই পত্র পড়িয়া, চিকিৎসার্থ আগমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার বিলম্বে আগমনের হেতু অবগত হইয়া, ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হন। ইহাতেই মনান্তরের সূত্রপাত। ক্রমে মনান্তর এতদূর ঘনীভূত হইয়াছিল যে, কোন স্থানে দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে, চারি চক্ষু একত্র হইত না। সেই চারিটী বিশাল চক্ষের পুনঃ সম্মিলন হইয়াছিলমাত্র, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পূর্ব্বে,—রুগ্নশয্যায়! মহেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। মৃত্যু-শয্যায় মনের মালিন্য ভেদ ও মিত্র-মিলন, মহা-নাটকেরই বিষয়ীভূত!!*

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১৮৭০ সালে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সভায় সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। দীন-দরিদ্রে দান; যাচিতে-অযাচিতে দান; সভা-সমিতিতে দান; আত্ম-পরে দান; বিদ্যাচর্চ্চায় দান; বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় দান;—দানময় জীবনের অবারিত দান! বলিবার যে আর স্থান হয়না। বিদ্যোৎসাহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচুর দানের কথা তুলিয়া, তাৎকালিক দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের স্কুল-ইন্স্পেক্টর মার্টিন সাহেব, বিস্ময়-বিমোহনে শত-মুখে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১১ই আগষ্ট পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহ করেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভবসুন্দরী খানাকুল কৃষ্ণনগরবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। নারায়ণচন্দ্র বিবাহ করিবার পূর্ব্বে পিতাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন,—"আমার এমন গুণ নাই যে, আপনার মুখোজ্জ্বল করি; তবে আপনার জীবনের মহৎ ব্রত,—বাল-বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিয়া, বালবিধবার ভীষণ বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর করা। এ অধম সন্তানের তাহা অবশ্য সাধ্যায়ত্ত। আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাতে আপনাকে কতকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই, আমার জীবন ধন্য হইবে; আর তাহা হইলে বোধ হয়, আপনার সদভিপ্রায়ের বিপক্ষবাদীরাও সন্দিহান হইতে পারিবে না।"

নারায়ণচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয়ানুজ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ই প্রধান উদ্যোগী।

---

* মৈত্রী-বিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বিগত মৈত্রীর পুনরুদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেন না। মৈত্রী-উদ্ধারের এরূপ অনাকাঙ্ক্ষা, মনুষ্য-চরিত্রের মহত্ত্ব-পরিচায়ক নহে নিশ্চিতই; কিন্তু আত্ম-নির্ভর ও তেজস্বী পুরুষে প্রায়ই এইরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কন্যার মাতা, বিধবা কন্যাটীকে লইয়া প্রথম বীরসিংহগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় তিনি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কন্যার পুন-র্ব্বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী পাত্র ঠিক করিয়া, কন্যাকে কলিকাতা আনিবার জন্য, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পত্র লিখিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে কিন্তু নারায়ণচন্দ্র কন্যাটীর বিবাহার্থী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সংবাদ পাইলেন। তাঁহার পত্নী ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের অমত ছিল; তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ অভি-মতি প্রকাশ করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে পাত্র ও পাত্রী কলিকাতায় আনীত হয়। কলিকাতায় উভয়ের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিবাহান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভ্রাতাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন;—

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভব-সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সম্বাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে, আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন; অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া, কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হই-তাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরা-ঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা, কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে, আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করায় আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বত-ন্ত্রেচ্ছ, অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে।" ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

নারায়ণচন্দ্রের বিধবা-বিবাহে তদীয় মাতার সম্পূর্ণ অমত ছিল। এই জন্য পাছে বধূ ও বনিতার অসদ্ভাব হয়, এই ভাবিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, নারায়ণচন্দ্রকে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দেন।* বিদ্যাসাগর মহাশয়, তথায় প্রায়ই যাই-তেন এবং আহারাদি করিতেন।

* কিয়দ্দিন পরে কাহারও আর কোন সঙ্কোচ ছিল না। শ্বশ্রূ, পুত্র ও বধূ, সকলেই বহুদিন একত্র কালযাপন করিয়াছিলেন। নিরক্ষরা বিদ্যাসাগর-পত্নী, স্বধর্ম্মে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমতী হইয়াও, পতি-পুত্রের স্নেহ-নিবন্ধন শেষে বিধবা-পত্নীক পুত্রের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা, মেয়েদের লেখাপড়া

বিদ্যাসাগর ভণ্ড নহেন। যে অসাধু কার্য্য, সাধু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তৎসাধনার্থ তিনি সমগ্র সমাজের চক্ষের উপর অটল বীরত্বেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সাহসিক বীর, এজন্যও আমাদের প্রশংসার পাত্র। অধুনাতন যে সব কুলাঙ্গার, সম্পূর্ণ অনাচারী এবং ধর্ম্মবিরোধী হইয়াও,বাহিরে হিন্দুনামে পরিচয় দেয়; এবং হিন্দুর সংসারে, স্বচ্ছন্দ-বিহারে প্রয়াস পায়, তাহাদের নরকেও স্থান নাই। এইসব ভণ্ড-পাষণ্ডের দল-পুষ্টিতে আজ সমগ্র সমাজ সন্ত্রাসিত। ভয় তাহাদিগেরই জন্য। বিদ্যাসাগর বা রামমোহন, এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-গোপনে প্রয়াস পাইতেন না; বরং তাঁহাদের আত্মপরিচয়ে বীরত্বেরই বিকাশ। লোকে তাঁহাদিগকে চিনিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের দোষ-গুণের বিচারে সহজে বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ব্যক্ত শত্রু অপেক্ষা গুপ্ত শত্রুই ভয়ঙ্কর।

১৮৭০ সালে আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, ৺বারাণসী ধামে, পতি-সকাশে গমন করেন। তিনি তথায় কিয়দ্দিন থাকিয়া, বহু তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হন। তীর্থ পর্য্যটনান্তে তিনি পুনরায় কাশীধামে ফিরিয়া আসেন। নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি স্বামী ঠাকুরদাসকে বলেন,—"আমি বাড়ী ফিরিয়া যাই; মরিবার এখনও বহু বিলম্ব আছে; এখন দেশে যাইলে, দেশের অনেক গরিবদুঃখী খাইতে পাইবে; ঠিক মরিবার পূর্ব্বে এই খানে আসিব।" এই কথা বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী দেশে ফিরিয়া আসেন। এখানে তিনি দরিদ্র-দুঃখ হরণ-রূপ মহাব্রতেই নিযুক্ত হন। এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন কিন্তু এইবার এইখানেই হইল। পর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে, ৺বারাণসী ধামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার সাংঘাতিক পীড়া হয়। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা, তৃতীয় ভ্রাতা এবং জননী, কাশীধামে গিয়াছিলেন। পিতা আরোগ্য লাভ করেন; বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ফিরিয়া আসেন; দুই মাস কাশী-বাস করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কিন্তু চৈত্র-সংক্রান্তিতে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সতীবাক্যের প্রত্যক্ষ মহিমা!

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, অসুস্থতা-নিবন্ধন কলিকাতা-কাশীপুরের গঙ্গাতীরে দেড় শত টাকায় একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া, বাস করিতেছিলেন। এই খানে তিনি জননীর মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন। মাতৃভক্ত পুরুষ, মাতৃ-হারা হইলেন! যে মাতৃ-আজ্ঞার পত্র পাইয়া, মাতৃ-চরণ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিদ্যাসাগর প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন করিয়া, দুস্তর দামোদরের খর-স্রোতে সাঁতার দিয়াছিলেন, সে মা আজ নাই! মাতৃ-ভক্তের সে মর্ম্মান্তিক বেদনা কি বর্ণনীয়! তিনি কয়েক মাস বিষয়-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, নিভৃত নিলয়ে কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। মাতার মৃত্যুর পর, তিনি এক বৎসর হবিষ্যান্নাহারী হইয়াছিলেন। এই এক বৎসর কাল তিনি ছাতা, শয্যাসন প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই কাশী যাইতেন; মাতার মৃত্যুর পর দুই বৎসর যান নাই। মাতৃশোকে জর্জ্জরিত হইয়াও কিন্তু তিনি পিতৃ-পাদপদ্ম বিস্মৃত হন নাই। পিতার সেবার্থ, ভ্রাতা ও অন্য কোন আত্মীয়কে নিযুক্ত করিয়া, পিতৃ-প্রিয় দ্রব্যাদি এখান হইতে পাঠাইয়া দিতেন। কাশীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আসিলে, প্রায়ই বিমুখ হইতেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগকেই ভোজন করাইতেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং তাঁহাদের পাদ-প্রক্ষালনাদি করিয়া দিতেন; কোন প্রকার ক্ষত-পুঁজ দেখিয়াও, ঘৃণা বোধ করিতেন না। কাশীতে যাইলে, পিতার অন্নব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দেওয়া এবং পিতার ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করা, তাঁহার নিত্যক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত হইত। স্বয়ং তিনি বাজার করিয়া আনিতেন। মাতৃ-বিয়োগের পর ১৮৭৩ সালে নবেম্বর মাসে, পিতার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে শুনিয়া, তিনি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কাশী গিয়াছিলেন। তথায় এক পক্ষের মধ্যে পিতা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। পবিত্র কাশীধামে গিয়া, তিনি প্রত্যহ প্রাতঃ-

---

শিখাইতে বড়ই নারাজ ছিলেন। এইজন্য তাঁহার সকল পুত্রবধূরই লেখাপড়া শিখিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ঘটিয়াছিল।

কালে টাকা, আধুলী, সিকি লইয়া পদাচারে বাহির হইতেন; এবং দীন-হীন দরিদ্র ব্যক্তিকে যথাসাধ্য বিতরণ করিতেন।

এই সময়ে এক দিন এক ব্যক্তি, তাঁহাদের বাসায় আগমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মনে করেন, তিনি তাঁহার পিতার পরিচিত; পিতা মনে করেন, পুত্রের পরিচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সেই সময় কি একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে যান; পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, লোকটী নাই। তখন তিনি পিতাকে লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন,—"সে কি, আমি জানি, উনি তোমারই পরিচিত; মনে করিলাম, তুমি আসিয়া উঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে; সুতরাং আমি একটা বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাপার বুঝিয়া, বড় দুঃখিত হইলেন। তখনই তিনি চাদর লইয়া, বাঙ্গালীটোলায় তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হন। অনেক অনুসন্ধানের পর, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে আপনাদের ক্রটী স্বীকার করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লোকটীও যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাদের বাসায় গিয়াছিলেন কেন?" ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"শুনিলাম, আপনি আসিয়াছেন, তাই দেখিতে গিয়াছিলাম; আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"কি জিজ্ঞাসা করিবেন?" ভদ্রলোকটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মমত কি, জানিতে চাহিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই; বলিবও না; তবে এই কথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন; শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন; তাহা হইলে, তাহাই আপনার ধর্ম্ম।" এই বলিয়াই তিনি ফিরিয়া আসেন। এই কথাটী আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতার মুখে শুনিয়াছি।

বিদ্যারত্ন মহাশয়, একস্থানে লিখিয়াছেন,—"কাশীর ব্রাহ্মণেরা বলেন,—আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না। ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন, আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না। ইহা শুনিয়া, ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, তবে আপনি, কি মানেন? তাহাতে অগ্রজ উত্তর করেন, আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।"

১৮৭০ সালে ১লা সেপ্টেম্বর, "হিন্দু উইলস্ আক্ট" পাস হয়। ১৮৬৯ সালে ইহার পাণ্ডুলিপি "পেশ" হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান সাক্‌সেন্" নামক আইনে কার্য্য চলিত; সে আইন কেবল সাহেবদের জন্য। তাহারই কতকগুলি ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া, হিন্দু, বৌদ্ধ, ও জৈনদের জন্য "হিন্দু উইলস্ আক্ট" হয়। পূর্ব্বে সুপ্রিম কোর্ট হওয়ার পর, কলিকাতায় ধনাঢ্য-মণ্ডলী, আপনাদের স্বেচ্ছামতে উইল করিয়া যাইতেন। ক্রমে বিচারে প্রকাশ পায়, এইরূপ উইলে নানা রূপ অসুবিধা ও জুয়াচুরি ঘটে। এতন্নিবারণ উদ্দেশ্যে, এই বিলের সৃষ্টি। এই বিল লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট হইতে এবিষয়ে যাবতীয় গণ্যমান্য ও হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উক্ত আইন সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রদান করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আইনের মর্ম্ম বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া, দুইটী বিষয় সমর্থন করেন নাই। প্রথমতঃ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অজাত কোন ব্যক্তিকে দান করিলে, তাহা বৈধ হয় না। গ্রহীতার ও দাতার জীবদ্দশায় বর্ত্তমান থাকা ও বোধবিশিষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু উক্ত আইনে এ প্রকার দান কোন কোন স্থলে বৈধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনে, যাহাকে *Rule against perpetuity* অর্থাৎ "আবহমানকাল স্বত্বাধিকার বিরুদ্ধ বিধি" বলে, তাহাও হিন্দু আইন-সম্মত নহে বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, মত প্রকাশ করেন। যেরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে, বিদেশীয় শাসনকর্ত্তারা উক্ত আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১৮৭০ খৃঃ অব্দের ২৫শে অক্টোবর নবদ্বীপের মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যু হয়। নবদ্বীপ রাজ-বংশের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। সতীশচন্দ্রের পিতা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে, ভারতচন্দ্র-

প্রণীত গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং কৃষ্ণনগর-স্কুলের পরিদর্শন সূত্রে এই সংস্রবের সূত্রপাত হয়। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সুদৃঢ় সখ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোথায় সেই বাঙ্গালার সর্বজন-পূজ্য ও সর্ব্ব-সাধারণ-মান্য ব্রাহ্মণ-কুলপ্রদীপ, রাজ্যেশ্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশতিলক মহারাজ শ্রীশচন্দ্র! আর কোথায় পরসেবী দীন-হীন ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের বংশধর গৃহস্থ বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্রই, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রত্ন-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, পুলক-প্রীতিভরে সেই বেশ-ভূষা-হীন দরিদ্র-বেশধারী ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন দিতে কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। এত অনুরাগ কিসের? এমন কি, শুনিয়াছি, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মবিগর্হিত বিধবা-বিবাহকাণ্ডেও সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। * শুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহের আইন সম্বন্ধে আবেদনপত্রে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু জানি, প্রথম বিধবা-বিবাহ কালে তিনি উপস্থিত ছিলেন না; এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোন কার্য্য-কারিতার পরিচয়ও দেন নাই। যাহা হউক, শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্রও পিতার মতন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। পিতার মৃত্যুর পরও মহারাজ সতীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পূর্ব্ববৎ ঘনিষ্ঠ সংস্রব সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দারুণ শোক-শেল বিদ্ধ হইয়াছিল।

সতীশ চন্দ্রের মৃত্যুর পরও, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কৃষ্ণনগর রাজ্যের সুশৃঙ্খলা-স্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া, অনেক সময় ক্ষতি ও অর্থহানি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উপকারী বন্ধুর উপকার সাধনার্থ এরূপ ক্ষতি-স্বীকার কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগরের স্বভাবসিদ্ধ। *

* কেহ কেহ বলেন, পরাশরের যে বচন অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উত্থাপিত করেন, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, তাঁহার বহুপূর্ব্বে সেই বচন-সহায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতেন। কৃষ্ণনগর-রাজধানীর দেওয়ান বাহাদুর ৺কার্ত্তিক চন্দ্র রায় কর্তৃক সঙ্কলিত, ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে এইরূপ লিখিত আছে;—"পরাশরোক্ত যে বচন মূল করিয়া, মহামতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা-বিবাহের অখণ্ড ব্যবস্থা দেন, রাজা (শ্রীশচন্দ্র) অনেক দিন পূর্ব্বে সেই বচন সহায়ে, বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং যখন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে ঐ বচনের উল্লেখ করেন।"

এই ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে যে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাতে, বুঝিতে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। তৎকালে বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণ বয়স্কা কন্যার বৈধব্য-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, বিধবা-বিবাহ চালাইবার উদ্যোগ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে সে চেষ্টা বিফলীকৃত হয়। সে বৃত্তান্ত বর্ণনের স্থান হইবে না। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে, ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতের ১৫৪—১৫৭ পৃষ্ঠা অবলোকন করিতে পারেন।

* এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটু কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, একমাত্র ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। সে কলঙ্ক-প্রক্ষালনার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বয়ং "নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারও প্রতিবাদ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, তৎপ্রতিবাদার্থ প্রয়াসী হইয়া, আপন মত সমর্থনার্থ, আর একখানি পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্থূল কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা আত্মসাৎ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা, আত্মসাৎ নহে; ছাপাখানা-সংক্রান্ত বিবাদ-মীমাংসায়, তাহা তাঁহারই বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বাদ-প্রতিবাদ সংগ্রহ করিয়া, একটা মীমাংসা-স্থলে উপস্থিত হইতে হইলে, একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিবার প্রয়োজন হয়। জন্মভূমির প্রবন্ধে তাহার স্থান অসম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র-সমালোচনায়, এ কলঙ্ক তাঁহাতে যে অসম্ভব, এ ধারণা অবশ্য সর্ব্বসাধারণেরই হইবে। আমাদেরও ধারণা তাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে আদ্যন্ত বিবরণ শুনিয়া, আমাদের ঐ ধারণা দৃঢ়তর হইয়াছে। অন্যরূপ যদি কাহারও হয়, আমরা তাঁহাকে বাদ-প্রতিবাদের পুস্তক মনোভিনিবেশ সহকারে পড়িতে এবং তাহার পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি।

মহারাজ সতীশচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন। মহারাজ উইল করিয়াছিলেন,—"রাজ্ঞীরা যদি পুত্রবতী না হন, তাহা হইলে আমার অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠা রাণী দত্তক গ্রহণ করিবেন। যদি তিনি দত্তক না লন, তবে জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী লইবেন।" মহারাজার জীবিতাবস্থায় জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়। মহারাজ সতীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে পর, কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরী, স্বয়ং বিষয়-কার্য্য চালাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাৎকালিক দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকচন্দ্র রায় দেখিলেন, বিষয়ের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে স্বয়ং মহারাণী বিষয়-ভার গ্রহণ করিলে, নানা কারণে বিষয়ের আরও শোচনীয়তর অবস্থা সংঘটিত হইবে। এতৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সকল অবস্থা পর্য্যালোচন করিয়া, কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে বিষয় থাকা ভাল বলিয়া, মত প্রদান করিলেন।* তখন রায় মহাশয়,বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরীকে বুঝাইয়া, বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করিতে পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণনগরে যাইয়া, রাণীকে বিধিমতে পরামর্শ দেন। রাণী তাঁহার পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ ভাবিয়া, বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ৫ই জানুয়ারি, বিষয়-সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডে অর্পিত হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত উত্তর-চরিত ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক প্রকাশ করেন। তিনি দুইখানি পুস্তকেরই টীকা করিয়াছিলেন। দুইখানি পুস্তকের বঙ্গভাষায় লিখিত উপক্রমণিকা-টুকু উপাদেয় পাঠ্য প্রবন্ধ। সেই মৃদঙ্গ-নিনাদ-নিন্দিত গুরুগম্ভীর ভাষা-ধ্বনি! সেই মধুর-কোমল-কান্ত বাক্য-বিন্যাস! স্বল্পায়তনে ভবভূতি ও কালিদাসের গুণগরিমা ও প্রতিভা-প্রতিষ্ঠার এমন প্রস্ফুট পরিচয়, আর কুত্রাপিও পাইবেনা।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে, "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না" বিচারের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়, "বহু-বিবাহ" শাস্ত্রসম্মত কি না। কয়েকটী কারণে হিন্দুর একাধিক বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত, বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ পুস্তকের প্রারম্ভে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দশরথ বহু-বিবাহ করিয়াছিলেন। পুত্রাভাব-নিবন্ধন দশরথের বহু-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাও বলিয়াছেন। যে কয়টী কারণে একাধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকৃত, তাহা এই,—

(১) যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চির-রোগিনী, অতি ক্রূর-স্বভাবা ও অর্থ-নাশিনী হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ বিধেয়।

(২) স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশমবর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশবর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে।

এতৎকারণ ব্যতীত একাধিক দারগ্রহণ অশাস্ত্রীয় এবং নিষিদ্ধ, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কলিযুগে অসবর্ণা বিবাহ রহিত হইয়াছে, সুতরাং যদৃচ্ছা

* নাবালকী জমিদারী রক্ষা করণোদ্দেশে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের সৃষ্টি। মালগুজরিতে ব্যাঘাত ভাবিয়াই যে, গবর্নমেণ্ট এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, আইন-কারেরা তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। স্বার্থ-রক্ষার জন্য গবর্নমেণ্টের এই পরার্থ-পরতার প্রণোদন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে বিষয় না দিলে যে, রক্ষা হয় না, এমন নহে। পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী ও বহরমপুরের মহারাণী স্বর্ণময়ী, ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। ওয়ার্ডে বিষয় দিয়া, অনেককেই যে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহারও বহু প্রমাণ আছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, তাহা বুঝিতেন না, এমন [illegible] তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপ রাজ্যের বিষয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে না দিলে, বিষয় রক্ষা করা দুষ্কর; তাই তাঁহাকে ওয়ার্ডের মূলনীতি উপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। বাস্তবিকই ওয়ার্ডে গিয়া, বিষয় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বেকার সব ঋণ পরিশোধিত হয়। এখন বিষয়ের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। বর্ত্তমান মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র বাহাদুর রাণী ভুবনেশ্বরীর পোষ্যপুত্র। ইনি সাবালক হইয়া, দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা পাইয়াছেন। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ওয়ার্ডের স্কুলে ছিলেন।

প্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা। এ কথার শাস্ত্রীয়তা বা অশাস্ত্রীয়তা লইয়া কোন বিচারও উত্থাপিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কৌলীন্য-সম্ভূত বহুবিবাহ পাপাবহ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এতৎ-প্রমাণার্থ তিনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছেন।

কোন আত্মীয় কন্যার কষ্টানুভবে তিনি বহু-বিবাহ রহিত করণে উদ্যোগী হন। আত্মীয় কুলীন কন্যার পতি, বহু-বিবাহ করিয়াছিলেন। পতিসাক্ষাৎ-লাভ, তাঁর প্রায়ই ঘটিত না। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের অদৃষ্টে যা ছিল, তা হইয়াছে; আমাদের কন্যারা যাহাতে আর কষ্ট না পান, তাহার একটা উপায় করিতে পারেন?" ইহারই পর হইতে, তিনি বহু-বিবাহ রহিত করণের জন্য প্রাণপণে উদ্যোগী হন। বাঙ্গালার কোন্ জেলায় কোন্ কুলীনের একাধিক বিবাহ হয়, তাহারও তিনি তালিকা সংগ্রহ করেন। এই তালিকা "বহু-বিবাহ" বিষয়ক প্রথম পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। ১৮৫৬ সালের এই উদ্যোগের সূত্রপাত। এই সময় বহু-বিবাহ রোধ সম্বন্ধে যাহাতে একটা আইন হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে সিপাহী-বিদ্রোহনিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, এবিষয়ে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর নিশ্চিন্ত হইবার পাত্র নহেন। ১৮৬২ সালে যখন কাশীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, সেই সময় এসম্বন্ধে আইন হইবার উদ্যোগ হয়; কিন্তু কিয়দ্দিন পরে রাজাবাহাদুরকে ব্যবস্থা সমাজ হইতে যথানিয়মানুসারে বিদায় লইতে হইয়াছিল; সুতরাং উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হইল না। ১৮৬৫ সালে তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর স্যর সিসিল বিডন সাহেবের নিকট বহুজন-স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে যে কোন ফলোদয় হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যান। শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন, তিনি এতৎ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিতে পারেন নাই। ১৮৭০ সালে তাৎকালিক সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায় এতৎসম্বন্ধে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। সভায় বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। এই অবসরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুনরায় এতদালোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেই আলোচনার ফল, এই প্রথম পুস্তক।

প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, ৺ তারানাথ বাচস্পতি, ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ স্মৃতিরত্ন, মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা কবিরাজ ৺গঙ্গাধর কবিরত্নপ্রমুখ অনেকেই ইহার প্রতিবাদ করেন। সেই সময় ইহা লইয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ বিলোড়িত হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; অন্যান্য পুস্তক বাঙ্গালায়। এই সব প্রতিবাদীর মত খণ্ডনার্থ, ১৮৭২ সালের মার্চ্চ মাসে, "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না?" বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়।

সে সময়ে এ বিষয়ে বহু বাদানুবাদ হইয়াছিল, সুতরাং বাদানুবাদের আলোচনায় প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। বাচস্পতি মহাশয় যেরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাচস্পতি মহাশয়কে যেভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা বিজ্ঞোচিত হয় নাই। এই সূত্রে উভয়ের যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল, তাহা আর ইহ-জীবনে দূরীকৃত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিচারে ভাষাভিজ্ঞতা, তর্কনিপুণতা, মীমাংসা-পটুতা, অনুসন্ধিৎসুতা এবং বিদ্যাবুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বাচস্পতি মহাশয়কে আক্রমণ করিতে গিয়া একান্ত ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, বিদ্যাসাগর মহাশয়, এসম্বন্ধে যে তর্কপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত তেমন অল্প লোকেই পারিয়াছেন। কোন কোন আত্মস্পর্দ্ধী দাম্ভিক লেখক, তাঁহাকে সময়ে সময়ে, "নিজস্ব"হীন বলিয়া, তাঁহার গৌরব-হানির চেষ্টা করিয়া থাকেন; এবং সময়ে সময়ে তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থনিচয়, সেই সব দাম্ভিক পুরুষদের রহস্য-বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা" বিষয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, যাঁহাদের এরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা কৃপার পাত্র মনে করিয়া রাখিয়াছি। কেননা, সেরূপ স্পর্দ্ধা ব্যাধি-বিশেষ।

যাহা হউক, "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা" বিষয়ক পুস্তক লইয়া, অদ্য বাদানুবাদ করিতে চাহি না; সে স্থানও নাই। এ সম্বন্ধে আইন যে হয় নাই, ইহা দেশের মঙ্গলের বিষয়। আইনে বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা। বৈদেশিক বিচারকেরা ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, বহু অনর্থ ঘটাইতে পারিতেন। শাস্ত্র-সম্মত একাধিক বিবাহেও বহু ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। স্ত্রী-পুরুষের সন্তানোৎপত্তির শক্তি বিচারে যে নানা কুৎসিত কাণ্ডের অভিনয় হইত না, তাহাইবা কে বলিতে পারে? এরূপ বিষয়ে রাজদ্বারে আইন-প্রার্থনা, যুক্তিসঙ্গত কোন মতেই নহে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত চব্বিশ পরগণা রুদ্রপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

এই সময় পুত্র নারায়ণচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়, নানা কারণে বিরক্ত হন। ক্রমে বিরক্তি এতদূর উৎকট হইয়া উঠিল যে, প্রিয়তম পুত্রকেও হৃদয়ের শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিতে হইল। মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান পড়িয়া গেল। পিতার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামী বলিতে পারেন; কিন্তু পুত্রের কর্ত্তব্যত্রুটী সংশোধিত হইল না বলিয়া, পুত্রকে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার বাহ্য ভাবে মনে হইত, তহাতেই তিনি যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কর্ত্তব্যতানুরোধে পিতার প্রাণ কঠোর হইতে পারে; মাতৃপ্রাণে তা হওয়া দুষ্কর। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিসর্জ্জনে, মাতা দারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। সে কুসুমাদপি কোমল-প্রাণ দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়াছিল। মাতার যে সুখ-স্বচ্ছন্দতা ছিল না; সম্ভবও নহে। ইহার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বনিতার প্রসন্নতা-ফলভোগে যে কতক বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

১৮৭২ খৃঃ অব্দের জুনমাসে "হিন্দু ফ্যামিলি আনুইটি ফণ্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইহার ট্রষ্টী হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালের প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর মহাশয়, "হিন্দু ফেমিলি আনুইটি ফণ্ডে"র ট্রষ্টী-পদ পরিত্যাগ করেন। সভ্যদিগের সহিত মনান্তরই এই পদত্যাগের কারণ। তিনি যে পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৭৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ⁄ কারাণসী ধামে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি, ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত কাশী গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। জামাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া, বিদ্যাসাগর শোক-সন্তাপে অধীর হইয়া পড়েন; কিন্তু শোককাতরা কন্যাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, তিনি পাষাণ-চাপে দারুণ শোকানল চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। বিধবা কন্যার মুখপানে তাকাইলে, তাঁর বুক ফাটিয়া যাইত! কন্যা একাদশী করিতেন; তিনিও একাদশীর দিন অন্ন-জল গ্রহণ করিতেন না; দুইবেলা আহারও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কন্যার অনুরোধে কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহাকে এ কঠোরতা পরিত্যাগ করিতে হয়।

কন্যাকে তিনি গৃহের সর্ব্বময়ী করিয়াছিলেন; কন্যাও কায়মনোবাক্যে পিতৃ-সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মপটুতায় এবং স্নেহসুজনতায় পরিবারবর্গের সকলেই সন্তোষ লাভ করিত। বিধবা কন্যা, বিদ্যাসাগরের গৃহে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা। তাঁর পুত্র দুইটী, বিদ্যাসাগরের স্নেহবাৎসল্যে এবং করুণাশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পিতার আদর-যত্নে এবং পিতৃসংসারের কার্য্যানবচ্ছেদে তিনি স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিসংযোগে একটীবারও অশ্রুপাতের অবসর পাইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, দৌহিত্রদ্বয়ের বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে কোন ত্রুটি রাখেন নাই। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং দ্বিতীয় দৌহিত্র শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি, উভয়েই বাড়ীতে সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা করিতেন। স্কুলে দেওয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে সংস্কৃত শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিলনা। তাঁহাদিগের পায়ে কাঁটা ফুটিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বুকে বাজ বাজিত। তাঁদের

মুখে পিতৃবিয়োগের স্মৃতিজনিত কোন আক্ষেপোক্তি শুনিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেন। একবার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র, বিলাত যাইবার উদ্যোগী হন। মাতামহ ও মাতা, উভয়েই নিষেধ করেন। সুরেশচন্দ্র এক দিন আহার করিতে করিতে, মাকে বলিয়াছিলেন—"আমার বাপ থাকিলে কি, তোমার বাপকে বলিতে যাইতাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, অন্তরাল হইতে এই কথা শুনিয়া, চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। দৌহিত্রদের আহারের সময়, তিনি প্রত্যহ নিকটে বসিয়া থাকিতেন। কাহারও কোন সদনুষ্ঠান দেখিলে, তাঁর আনন্দের সীমা থাকিত না। একবার কনিষ্ঠ দৌহিত্র, পথ-পতিত একটি আমাশয় রোগাক্রান্ত রোগীকে তুলিয়া লইয়া, বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। দৌহিত্রের করুণায়, তাঁহার করুণাস্রোত মিশিয়া, গঙ্গা-যমুনার স্রোত বহিয়াছিল। তিনি স্বয়ং রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু চেষ্টায় কিন্তু রোগী জীবন লাভ করিতে পারে নাই। জ্যেষ্ঠ সুরেশচন্দ্রের রচনাশক্তি, তাঁহার বড় প্রীতিদায়িনী হইয়াছিল। ইনি এখন সাহিত্যের সম্পাদক। তাঁহারা পুত্রবৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহের ভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে মাতামহের রহস্য-ভাসেও বঞ্চিত হইতেন না। বিদ্যাসাগরই যে ষড়রসের পূর্ণাধার। তিনি আপন দুইটী দৌহিত্রের ভার ত লইয়াছিলেনই; অধিকন্তু জামাতার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী, তাঁহার প্রতিপাল্য হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দিয়াছিলেন; এবং সমগ্র ভরণপোষণেরও ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দারুণ শোক-তাপেও বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুল-কলেজের শুভানুধ্যানে এক মুহূর্ত্তও বিরত হইতেন না। স্কুল-কলেজের কথা মনে হইলে, তিনি শোকতাপের সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেন। শোকতাপে অভিভূত হইয়াও, তিনি ১৮৭৭ সালে কালিকাতা-শ্যামপুকুরে মেট্রপলিটানের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। মূল বিদ্যালয়ের ন্যায়, অল্প দিনে ইঁহারও শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

১৮৭৪ খৃঃ এপ্রেল মাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাশীর মৃত কবি হরিশ্চন্দ্রকে কলিকাতার "মিউজিয়ম" (যাদুঘর) দেখাইতে লইয়া যান। সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তখন পার্কষ্ট্রীটে যাদুঘর ও এসিয়াটিক সোসাইটী এক বাড়ীতেই ছিল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশ, সেই থান ধুতি, থান চাদর ও চটি জুতা। কবি হরিশ্চন্দ্রের* পোষাক-পরিচ্ছদ আধুনিক সভ্য-জনোচিত,—পায়ে ইংরেজি জুতা, গায়ে চাপকান-চোগা এবং মস্তকে পাগড়ী। গাড়ী হইতে নামিয়া, তিন জনেই যাদুঘরে প্রবেশোন্মুখ হইলেন। দ্বারবান বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাইতে নিষেধ করিল। হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে নিষেধ রহিল না; সুরেন্দ্র বাবুও নিশ্চিতই সুসজ্জিত ছিলেন; কেননা তিনিও অবাধে প্রবেশাধিকার পাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্য বুঝান হইল, তাঁহার মতন একজন উড়িয়ার প্রবেশাধিকার নাই। †

বিদ্যাসাগর মহাশয়, আর দ্বিরুক্তি না করিয়াই গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। সংবাদ তাৎকালিক "এসিয়াটিক সোসাইটী"র আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী ও কলিকাতার আধুনিক রেজিষ্টার

* হরিশ্চন্দ্র একজন প্রতিভাশালী হিন্দী কবি। হিন্দী কবিকুলে বর্ত্তমানকালে তিনি অতুলনীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। গুণগ্রাহিতার গুণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের প্রগাঢ় সখ্যস্থাপন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে আপনার সকল পুস্তকের অনুবাদাধিকার দিয়া রাখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, কবি হরিশ্চন্দ্র অকালে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, জানুয়ারি মাসে, ৩৪ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

† বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনেক সময় অপরিচিত জনের নিকট সত্য সত্যই এক জন সভ্যভব্য উড়িয়ারই সম্মান লাভ করিতেন। তিনি এক দিন স্বয়ং হাসিতে হাসিতে এই গল্পটী করিয়াছিলেন,—"আমি পটলডাঙ্গার পথ দিয়া যাইতেছিলাম; সেই সময় তাগা-হাতে, দানা-গলায়, ভমর-পরা, বোধ হয়, কোন বড় মানুষের ঝি যাইতেছিল। আমার চটি জুতার ধূলা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। মাগী বলিল,—'আ মর। উড়ের তেজ দেখ।' কাম্বেল সাহেব সত্য সত্যই আমাকে উড়ে করেছে।" কাম্বেল সাহেবের সময় বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভিতরে লইয়া, যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আমি আর যাইতেছি না; অগ্রে কর্ত্তাদিগকে পত্র লিখিয়া জানিব, এরূপ কোন নিয়ম আছে কিনা; আর যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিব; এবং প্রতীকার করিতে পারি ত আসিব।" এই বলিয়া তিনি সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া, ফিরিয়া আসেন। সুরেন্দ্র বাবুর মুখেই এইরূপই শুনিয়াছি। কিন্তু প্রতাপ বাবু বলিয়াছেন,—"আমি অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া, তাঁহাকে সোসাইটীর লাইব্রেরীতে লইয়া যাই।" যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়, "মিউজিয়ম" ও "এসিয়াটিক সোসাইটী," উভয়েরই কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিয়াছিলেন। উভয় কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর দিয়াছিলেন। পত্র-প্রকাশের স্থানাভাব; তৎকালে হিন্দুপেটরিয়টে কি লিখিত হইয়াছিল, তাহারই আভাস লউন;—

* * * বিদ্যাসাগর মহাশয়, গৃহে আসিয়া মিউজিয়ম তত্ত্বাবধায়কদিগকে নরম ভাবে একখানি পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলেন, মিউজিয়মের অধ্যক্ষগণ দেশী জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ-সূচক কোন আদেশ দিয়াছেন কি না; আর বুঝাইয়া বলা হইল যে, এরূপ নিষেধ থাকিলে মান্য গণ্য দেশীয় ভদ্র লোক অথবা যে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেশী চটি জুতা পায়ে দেন, তাঁহারা আর সোসাইটীতে যাইতে চাহিবেন না। সোসাইটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাকে এই মর্ম্মে স্বতন্ত্র পত্র লেখা হয়। মিউজিয়মের অধ্যক্ষ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, এরূপ হুকুম দেওয়া হয় নাই; বিদ্যাসাগর মহাশয় ফিরিয়া গিয়াছেন বলিয়া কিন্তু তাহার জন্য একটু দুঃখপ্রকাশও করা হইল না; দ্বারবানকে দোষী করাও হইল না; আর ভবিষ্যতে তাহাকে এরূপ করিতে বারণ করা হইবে, তাহাও বলা হইল না। সোসাইটীর অধ্যক্ষ-সভা, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটু টীটকারী দিয়া বলেন যে, দেশীয় লোকে দেশীয় আচার ব্যবহার ভাল জানেন। পাঠক অবশ্য বুঝিবেন যে, মিউজিয়মের অধ্যক্ষ, আর সোসাইটীর অধ্যক্ষ সভা স্বতন্ত্র জিনিস। দুই পক্ষের পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। সোসাইটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাকে বুঝাইয়া বলা হয়,—"দেশীয় আচার জুতা খোলা বটে, কিন্তু সে কোথায়? যেখানে চেয়ারে বসিবার ব্যবস্থা সেখানে জুতা খুলিতে হয় না; যখন ফরাস বিছনায় বসিতে হয়, তখনই জুতা খুলিতে হয়। সম্মান দেখাইবার জন্য জুতা খোলা ভারতবাসীর নিয়ম নহে।"

এই সম্বন্ধে ইংলিসম্যান এই ভাবে বলিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগরের মতন একজন পণ্ডিতের প্রতি যখন এইরূপ ব্যবহার, তখন এসিয়াটিক সোসাইটীতে আর কোন পণ্ডিত যাইতে চাহিবেন না।*

* চটি জুতার বড় লাঞ্ছনা। পূর্ব্বে বহু-বিবাহের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে যাইতে হইয়াছিল। রাজ-দরবারের দ্বাররক্ষক, তাঁহাকে চটি জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে বলে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, জুতা খুলিয়াই, দরবারে প্রবেশ করেন। বলা বাহুল্য, মহারাজ, তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। রাজার নিকট বিদ্যাসাগরের এত সাদর-সম্মান দেখিয়া, দ্বার-রক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সে অন্যান্য কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে, যাঁহার এত সম্মান, তিনি স্বয়ং বিদ্যাসাগর। কার্য্যান্তে বর্দ্ধমানরাজ, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদায় দিবার জন্য দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। রাজা-বাহাদুর, বিদায় দিয়া যেমন ফিরিলেন, অমনই দ্বার-রক্ষক করযোড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিল, "আমি চিনিতে পারি নাই, ক্ষমা করুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"তোমার দোষ কি? তোমার মনিবের যেমন হুকুম, তেমনই করিয়াছ।" রাজা একথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া আসিলে পর, তিনি দ্বার-রক্ষককে ভর্ৎসনা করিয়া, তাড়াইয়া দেন। দ্বার-রক্ষক অন্যান্য কর্ম্মচারীর পরামর্শমতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তখনই দ্বাররক্ষককে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, রাজা-বাহাদুরকে একখানি নরম-গরম পত্র লিখেন। রাজা-বাহাদুর পত্র পাইয়া, দ্বার-রক্ষককে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতিপ্রিয়-পাত্র সদাশয় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের মুখে এই গল্পটী শুনিয়াছি।

১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিজ বিদ্যালয়ে "ফাষ্ট আর্ট ক্লাস" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ক্লাস খুলিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের সঙ্গে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বহু বাদ-বিসম্বাদ করিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিনা বেতনে পড়াইবার জন্য এল, এ, ক্লাস খুলিয়াছিলেন; অনেক ছাত্র নামও লেখাইয়াছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষ, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বহু বাদানুবাদের পর ১৮৭২ সালে তাঁহাদিগকে সম্মতি দান করিতে হয়। কলিকাতার সুকিয়াষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন রায়ের বাড়ীর নিকট প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে শঙ্কর ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে, সুকিয়াষ্ট্রীটের এক স্বতন্ত্র বাড়ীতে স্কুল উঠিয়া আসিয়াছিল।

কলেজের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক অর্থ-ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের বেতন তিন টাকার উর্দ্ধ হইল না; অথচ অধিক বেতনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইল; সুতরাং ঘরের অর্থব্যয় ভিন্ন আর উপায় কি? যেরূপেই হউক, কলেজের শিক্ষা সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। এ দেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই অধ্যাপনার ভার লইয়াছিলেন। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন এবং স্পষ্টতঃ বলিয়াছিলেন, দেশীয় শিক্ষক দ্বারা কলেজের শিক্ষাসাধন অসম্ভব, লজ্জায় তাঁহাদের মস্তক অবনত হইল।

এই সময় সংস্কৃতকলেজের "স্মৃতি-বিভাগ" লইয়া, তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুরের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মসীযুদ্ধ চলিয়াছিল। ছোটলাট বাহাদুর, ব্যয়সংক্ষেপ-সঙ্কল্পে স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা করেন। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের দুইটী ইংরেজী অধ্যাপক পদ উঠাইয়া এবং অন্যান্য দুই একটী কার্য্য তুলিয়া দিয়া, মাসিক প্রায় ৬৫০ টাকার ব্যয়সংক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প হয়। চারিদিকে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধিল। তুমুল-আন্দোলন উঠিল। যাহাই হউক, পরে ধার্য্য হয়, স্মৃতির অধ্যাপনা, অলঙ্কারের অধ্যাপক দ্বারা সম্পাদিত হইবে। সাধারণ্যে রব উঠিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই, এই স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়াছে; বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু তাহা স্বীকার করেন নাই। এই সূত্রেই মসী-যুদ্ধ। এতৎসম্বন্ধে যে পত্র লেখা-লেখি হইয়াছিল, তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোট লাটের প্রাইবেট সেক্রেটরি লটসন জনসন সাহেবকে প্রতিবাদ করিয়া যে পত্র লেখেন, তাঁহার মর্ম্ম এই;—

স্মৃতি-শাস্ত্র এত প্রকাণ্ড যে, এক জন মনুষ্য সমস্ত জীবনে তাহা পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, অথচ স্মৃতি ভাল জানেন, এমত লোক থাকা কিছু অসম্ভব নহে; কিন্তু নিতান্ত বিরল। প্রেসিডেন্সি কালেজের এক জন সাহিত্য অথবা গণিতের অধ্যাপককে নিজের কাজ করিয়া আইনের অধ্যাপকতা করিতে বলিলে যেরূপ ফল হয়, ইহাতেও সেইরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে; তবে এক জনের উপর এত অধিক ভার দিলে আইন-শিক্ষাও ভাল হইবে না; অন্যান্য শিক্ষাও ভাল হইবে না। হিন্দু সমাজের ইচ্ছা, স্মৃতির এক জন স্বতন্ত্র অধ্যাপক থাকেন। ছোট লাট যে, মতামত জানিয়া কার্য্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ, সন্দেহ নাই। লোকের ইচ্ছা যেরূপ, তাহা আমি জানি; তথাপি গেজেটে যখন আমার মত লওয়া হইয়াছে বলিয়া লেখা হইয়াছে, তখন দেশের লোকে মনে করিবে, আমার বুঝি ঐরূপ অভিপ্রায়; কিন্তু আমার মত ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী; ইহা প্রকাশ থাকা আবশ্যক।

২৫শে মে তারিখে জনসন সাহেব, এই পত্রের যে উত্তর দেন, তাহার মর্ম্ম এই,—

"আপনার নিজের মত ঐরূপ নহে, তাহা ঠিক কথা। তবে অধ্যাপনা সম্বন্ধে ছোট লাটের মত যে, অধ্যাপকের স্মৃতি-অধ্যাপনাই প্রধান কার্য্য হইবে; অন্যান্য অধ্যাপনা নিম্নস্থান অধিকার করিবে। পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এই কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতেছেন। উপস্থিত বন্দোবস্ত আপাততঃ চলিতেছে; পরে যদি ভাল না চলে, তবে নূতন বন্দোবস্ত করা যাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১০ই জুনের হিন্দু-পেটরিয়টে এই সকল কথা প্রকাশ করিয়া, আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ তেজস্বিতা

কথা স্মরণ করিয়াই, বোধ হয়, দৈনিকসম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

"যে সকল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের কাছে অন্যে মাথা হেঁট করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদিগকে আপনার সমান বলিয়া, মনে করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের সহিত বন্ধুত্ব-সুলভ সদ্ভাবসম্বন্ধ ছিল; তিনি কোন কালেই কাহারও তোষামোদ করেন নাই। গবর্ণর ও কাউন্সিলের সভ্যদিগকে বিদ্যাসাগর নিজের বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন; বড় আদালতের জজদিগকেও সেই ভাবে দেখিতেন। উচ্চপদে এমন ইংরেজ ছিলেন না, যাঁহার কাছে বিদ্যাসাগরকে ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া কথা কহিতে হইত।"

ইহার পর শিক্ষা বিভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় আয়ের হ্রাস হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান ছোটলাট কাম্বেল সাহেবের সহিত আমার মনান্তরের কারণ এই যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ পাইবার সময় আমার সহ পরামর্শ করিয়া, আমার উপদেশের বিরুদ্ধে ঐ পদ পাইবার আজ্ঞা দেন এবং প্রকাশ করেন যে, এবিষয় তিনি আমাদের সহ পরামর্শ করিয়া, কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু আমি ইহাদ্বারা সাধারণের ক্ষতি ও নিজের অপবাদ দেখিয়া, ঐ বিষয় প্রকাশ করায়, তাঁহার সহ মনান্তর হয়। এই কারণে শিক্ষা বিভাগে আমার পুস্তকের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় আয়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে।"

এই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কাহারও কাহারও মাসিক বন্দোবস্ত কমাইতে হয়। পরে আয় বৃদ্ধি হইলে, সকলেরই বন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল।

কলেজ-প্রতিষ্ঠার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কালেজের জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইত। ইহাতে তাঁহার ভগ্নশরীর, আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল; সুতরাং ক্রমেই তাঁহার অতি স্বাস্থ্যপ্রদ নিভৃত স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন হইল। এই সময় দিওঘরে একটী সরকারী বাঙ্গালা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রথমত তাহা ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মূল্য অত্যধিক বিবেচনা করিয়া, তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হন। পরে তিনি অতি সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ বনজঙ্গলে পরিবৃত করমটাঁর এক অতি নিভৃত স্থানে একটী বাঙ্গালা প্রস্তুত করেন। করমটাঁ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত। সাঁওতালগণই তাঁহার প্রতিবেশী হইল। অসভ্য সাঁওতালগণ ক্রমে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগরের করুণা-মর্ম্ম তাহারা বুঝিয়া লইল। কেহ দাদা, কেহ বাবা, কেহ জেঠা, ইত্যাদিরূপে সম্পর্ক পাতাইল। জীর্ণ পর্ণ-কুটীর-ময় মলিন সাঁওতাল-মণ্ডপ, বিদ্যাসাগরের করুণস্রোতে প্লাবিত হইল। বিদ্যাসাগর শীতের সময় চাদর ও কম্বল বিতরণ করিতেন। যে সময়ের যে ফল, সর্ব্ব-সুরস-বঞ্চিত দরিদ্র সাঁওতাল, বিদ্যাসাগরের প্রসাদে তাহার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইত। বস্ত্র নাই, বিদ্যাসাগর বস্ত্র দিতেন; অন্ন নাই, অন্ন দিতেন; যা নাই, তাই দিতেন। সাঁওতাল প্রবল পীড়ায় শয্যাগত; বিদ্যাসাগর তাহার শিয়রে বসিয়া মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতেন; হাঁ করাইয়া পথ্য দিতেন; উঠাইয়া বসাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইতেন; সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন। বিদ্যাসাগর যেখানে, সেই খানেই প্রেম ও করুণা। তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন; প্রত্যেক সাঁওতাল-বন্ধুর গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কাহারও নিকট কুমড়া, কাহারও নিকট বেগুন, কাহারও নিকট শশা ইত্যাদি উপহার লইয়া, প্রফুল্লবদনে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতেন। বাঙ্গালার প্রাঙ্গণভূমি পরিচ্ছন্ন-পরিষ্কৃত এবং স্বহস্ত-রোপিত নানা ফল-ফুলের বৃক্ষে পরিশোভিত; যেন একখানি ক্ষুদ্র নন্দন-কানন। যখনই তিনি করমটাঁয় যাইতেন, তখনই হয় কন্যা, না হয় দৌহিত্র, না হয় অন্য কোন আত্মীয় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসাগর, সাঁওতালদিগকে নাচাইতেন। সরল-হৃদয় সাঁওতালদের সেই বর্ব্বর-নর্ত্তনে সারল্যের অনুপম মাধুর্য্য অনুভব করিয়া, বিদ্যাসাগরের করুণ-হৃদয়খানি বিপুল পুলকে প্লাবিত হইয়া যাইত। সত্য সত্যই করমটাঁয় যাইয়া, তিনি স্বর্গীয় শান্তি উপভোগ করিতেন। সাঁতালদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭৪ খৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি, হাইকোর্টের অন্যতম জজ দ্বারকানাথ মিত্র, ইহলোক পরিত্যাগ

করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর বহু কার্য্যেই দ্বারকানাথের পরামর্শ লইতেন; দ্বারকানাথও বিদ্যাসাগরের মত না লইয়া, কোন কঠিন্ বিষয়ের সহসা মীমাংসা করিতেন না। উভয়েই উভয়েরই, সহায় ও পৃষ্ঠপোষক। পতিতা রমণীর বিষয়াধিকারের মোকদ্দমা সম্বন্ধে উভয়ের মতভেদমাত্র লক্ষিত হইয়াছিল; নতুবা অন্য কোন বিষয়ে কখন কোন মতভেদ দেখা যায় নাই। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে হাইকোর্টে উক্ত মোকদ্দমা পক্ষিত মোকদ্দমার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের মত গৃহীত হয়। বিচার্য্য এই,—হিন্দু-রমণী স্বামি-বিয়োগান্তে, স্বামি-পরিত্যক্ত বিষয়ের একবার উত্তরাধিকারিণী হইলে পর, যদ্যপি তাহার চরিত্র কলঙ্কিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রমতে পুনরায় সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না? বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত, অপর দুই জন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া বলেন, হিন্দুশাস্ত্রমতে কলঙ্কিত বিধবা, বিষয়চ্যুত হইতে পারে। দ্বারকানাথের এই মত ছিল; কিন্তু তাঁহার এই মত টিকে নাই। দশ জন বিচারক, এই মোকদ্দমার বিচারভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই জন ব্যতীত কেহই, দ্বারকানাথের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন,—"আমি অন্যায় কিরূপে বলিব? অন্যায়ই বা শুনিবে কে? আমি অবশ্য ভ্রষ্টাচারের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু এক জন বিষয়ের অধিকারিণী হইলে, কেমন করিয়া বলিব, আবার সে বিষয়চ্যুত হইবে; তাহা হইলেত,নানা কারণেপদে পদে বিষয়চ্যুতির মোকদ্দমা সংঘটিত হইবে।" এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দূরদর্শিতার পরিচয় নাই সত্য; সমগ্র হিন্দুসমাজ ইহাতে সংক্ষোভিত; কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃঢ় ধারণা ও প্রতীতি ছিল যে, এরূপ অবস্থায় কেহ বিষয়চ্যুত হইতে পারে না। অনেকে বলেন, পতিতা-রমণীর বিষয়চ্যুতি আইনসিদ্ধ হইলে, বিদ্যাসাগরের প্রিয় বিধবাবিবাহ-ব্রতে কতকটা ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা; দূরদর্শী বিদ্যাসাগর ইহা বুঝিয়াই দ্বারকানাথের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করিতে সহজে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা প্রতিনিয়তই দেখিয়া আসিতেছি, শত্রুর ভ্রূকুটীভঙ্গে, মিত্রের সস্নেহ সম্ভাষণে বা আপনার স্বার্থসাধন উদ্দেশে, বিদ্যাসাগরের কখন কোনরূপ পদস্খলন হয় নাই।

যাহাই হউক, দ্বারকানাথ প্রায়ই বলিতেন,—"বিদ্যাসাগরই আমার উন্নতির মূল। বিদ্যাসাগরের পরামর্শে আমি ওকালতী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই। তিনি সে পরামর্শ না দিলে, হয়ত আমার সে প্রবৃত্তি আদৌ হইত না।"

১৮৭৫ সালে এক উইল হয়। এই উইলে নারায়ণচন্দ্র বিষয়-বর্জ্জিত হন।* শাস্ত্রানুসারে অন্য কোন উত্তরাধিকারী বিষয় পাইবেন বলিয়া, স্থির হইল। তমুলকের উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহ এবং ডেপুটী কলেকটার শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ একজিকিউটার হইয়াছিলেন। কালী বাবু পরে একজিকিউটারী ত্যাগ করেন।

এই বৎসর ১৩ইজুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় কন্যার বিবাহ হয়। পাত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী। ইনি বি, এ, উপাধিধারী। পুত্রবর্জ্জনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, জামাতা সূর্য্যকুমারে পুত্রপ্রেম ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে জামাতা সূর্য্যবাবু, মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসনের সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ১১ই এপ্রেল,পিতা ঠাকুরদাস কাশী প্রাপ্ত হন। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতৃ-বিয়োগে, পঞ্চম বৎসরের শিশুর মত উচ্চৈঃস্বরে না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন নাই। মা গেলেন,—পিতা গেলেন;—ইহ-সংসারে বিদ্যাসাগরের সকল সুখ অপহৃত হইল! ১২ই এপ্রেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভেদ-বমি হইয়াছিল। তাঁহাকে তদবস্থায় কলিকাতায় আনা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুস্থ হইয়া, বারান্তরে কাশী গিয়াছিলেন। তথায় তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি করেন; ইহাই তাঁহার পিতার আদেশ ছিল।

---

* এই উইল অনুসারে নারায়ণ বাবু, প্রকৃতপক্ষে বিষয়-বর্জ্জিত হইতে পারেন কিনা, তন্মীমাংসার্থ বর্ত্তমান বর্ষে হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। বিচারে সিদ্ধান্ত হয়, নারায়ণ বাবু বিষয়বঞ্চিত হইতে পারেন না। তিনি এখন বিষয়াধিকারী।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারীর বিবাহ হয়। কন্যা ও জামাতা বাড়ীতেই থাকিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাতা, কন্যা এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকেও বড় ভাল বাসিতেন।

১৮৭৭ সালে কলিকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ী সম্পূর্ণ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুব্যয়ে এই বাড়ী প্রস্তুত করান। শীতকালে তিনি এই বাটীতে প্রবেশ করেন। প্রথম তিনি স্বয়ং লাইব্রেরী লইয়া, এই বাড়ীতে একাকী থাকিবারই সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্য বাড়ী প্রাপ্ত হইবার সুবিধা না হওয়ায়, সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হইলেন।

আর দেহ বহে না! রোগে শরীর জীর্ণ! ইহার উপর মাতৃশোক ও পিতৃশোক! আর কত সহে! তেজস্বী পুরুষ, তাই এত দিন দেহ বহিয়াছিল। আর কত দিন! প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে দেবতা হারে; মানুষ কোন ছার! দুর্জ্জয় বীর বিদ্যাসাগর ক্রমেই শোণিতশূন্য ও শক্তিহীন হইয়া আসিতে লাগিলেন। তিনি সংসারের সকল কঠোর কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় আর তিনি বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে সংসার-কোলাহল, ভয়ঙ্কর কষ্টকর হইতে লাগিল। তাই তিনি কখন বা করমটায়,—কখন বা ফরসডাঙ্গায় থাকিতেন। সুযোগ্য কৃতবিদ্য জামাতাকে স্কুলের ভার দিয়া, তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্কুলের ভাবনা সদাই মস্তিষ্কে ঘুরিয়া বেড়াইত।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে কলেজে বি,এ ক্লাস খোলা হয়। ইহারও চরমোন্নতি হইল।

১৮৮০ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়, গবর্ণমেণ্টের নিকট C. *I.* *E.* উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমতঃ উপাধি গ্রহণে অসম্মত হন; পরে উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া উপাধি গ্রহণ করেন; সনন্দ লইতে কিন্তু দরবারে যান নাই।

ইহার পর তিনি কলেজের বাড়ী নির্ম্মাণের ভাবনায় বিব্রত হইয়াছিলেন। তিন বৎসর প্রায় আর কোন কার্য্য করেন নাই। ১৮৮৩ সালে আইন ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ সালে বি, এ পরীক্ষায় মেট্রপলিটন সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৫ সালে বড় বাজারের শাখা ও ১৮৮৭ সালে বহু বাজারের শাখা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৪ সালের নবেম্বর মাসে, বিদ্যাসাগর অসুস্থ হন। সেই সময় তিনি কানপুরে বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুকে, তাঁহার সংস্কৃত প্রেসের অবশিষ্ট অংশ ৫ সহস্র টাকায় বিক্রয় করেন। প্রেসের কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি-হীনতা, এ বিক্রয়ের কারণ; অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার অনেক টাকার ঋণ শোধ হইয়াছিল। পুস্তকের আয় মাসিক প্রায় ৩৪ সহস্র টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এ আয় এখনও বিদ্যমান। মৃত্যুর পূর্ব্বে দেনা তিনি এক পয়সাও রাখিয়া যান নাই। বিদ্যাসাগর দেনা করিয়াছিলেন অনেকেরই; দেনা রাখেন নাই কাহারও। পাওনাদার পাওনার কথা ভুলিতেন, বিদ্যাসাগর দেনার কথা ভুলিতেন না। যাচিয়া ঋণ পরিশোধের শত-পরিচয় বিদ্যাসাগরের জীবনে পাইবে। একবার গবর্ণমেণ্টের নিকট, তিনি কতক টাকার দেনদার ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট এ দেনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; হিসাব-নিকাশেও ইহার উল্লেখ ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং পত্র লিখিয়া, এই দেনার কথা তুলিয়া, দেনা পরিশোধ করেন।

১২৮৩ সালে ১লা ডিসেম্বর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, মনান্তরবশতঃ সংস্কৃত ডিপজিটরি হইতে আপনার সমুদায় পুস্তক তুলিয়া লইয়া আনিয়া, স্বপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা লাইব্রেরীতে রাখিয়া দেন। কলিকাতা লাইব্রেরী, এখন কলিকাতা সুকিস-ষ্ট্রীটে অবস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাবতীয় পুস্তক, এইখান হইতে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে ব্রজবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে সংস্কৃতডিপজিটরীর ভার পাইয়াছিলেন। ব্রজবাবু সম্প্রতি লোকান্তরগত হইয়াছেন; সুতরাং মনান্তরের কারণাদি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ আপাততঃ যুক্তিযুক্ত নহে।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে শঙ্করঘোষের লেনে, নূতন বাড়ীতে কলেজ ও স্কুল প্রবেশ করে। জমী ক্রয় করিতে ও বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রায় লক্ষ টাকা ধার হইয়াছিল।

১৮৮৮ সালে ১৩ই আগষ্ট, বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের পত্নী রক্তামাশয় পীড়ায় লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর কিয়ংকাল পূর্ব্বে, ইনি কপালে করাঘাত করিতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতাকে ডাকিয়া বলেন,—"বাবা মা কি বলিতেছেন, শুনুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, তাই হইবে; তার জন্য আর ভাবিতে হইবে না।" কপালে করাঘাত,—পুত্রের জন্য করুণা-ভিক্ষা। আশ্বাস পাইয়া সতী সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

এত আধি-ব্যাধির জ্বালাময়ী যন্ত্রণায়ও বিদ্যাসাগর এক মুহূর্ত্তের জন্য আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। স্কুল কলেজ সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। জামাতা সূর্য্য বাবুর উপর ভার দিয়া, তিনি গুরু কার্য্যভার হইতে অবসর লইয়াছিলেন বটে; কিন্তু ভাবনা প্রাণের ভিতর অবিরামই। বিধাতা বিমুখ! পত্নী-বিয়োগের দিন কতক পরেই, বিদ্যাসাগর মহাশয়, জামাতা সূর্য্য বাবুর কোন কার্য্যের কর্ত্তব্যক্রটি বিবেচনায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। পুত্রবর্জ্জনান্তে যাঁহাকে পুত্ররূপে কোল দিয়াছিলেন, যাঁহার কার্য্য-পটুতায় স্কুল-কলেজের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হইয়াছিল,এবং যাঁহার উপর স্কুলের ভার দিয়া, গুরুতর কার্য্যভার হইতে অবকাশ পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পদচ্যুত করিলেন। নিশ্চিতই সে কর্ত্তব্য-ক্রটীকে তিনি ক্ষমাতীত মনে করিয়াছিলেন।

জামাতার পদচ্যুতির পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রায়ই স্কুল-কলেজের পরিদর্শন করিতে হইত। তিনি পাল্কী করিয়া যাইতেন এবং পাল্কী করিয়া আসিতেন। উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর, তিনি প্রায় গাড়ী চড়িতেন না। নিজের গাড়ী-ঘোড়া রাখিবার অর্থ-সামর্থ্য ছিল; কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। বহু পূর্ব্বে তিনি গাড়ী-ঘোড়া রাখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু নানা কারণে তাহা তুলিয়া দেন।

এরূপ অবস্থায়ও তিনি একদিনের তরে জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম বিস্মৃত হন নাই। ১৮।১৯ বৎসর বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন নাই বটে; কিন্তু বীরসিংহের মায়া পরিত্যাগ করেন নাই। এক দিন তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, উপরে উঠিতেছিলেন, সেই সময় বীরসিংহ গ্রাম হইতে প্রেরিত একখানি মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তক, তাঁহার হস্তগত হয়। স্বয়ং বীরসিংহ-জননী যেন কাতর-কণ্ঠে বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করিয়া, সেই পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে, বিদ্যাসাগর অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার তাড়নায় বীরসিংহ গ্রামের স্কুলটী উঠিয়া গিয়াছিল। ১৮৯০ সালে ১৪ই এপ্রিলে, তিনি এই বিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় জননীর নামে এই বিদ্যালয়ের নাম হইল, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়। এখনও এই স্কুল চলিতেছে।

কিন্তু আর কত সয়! শোকতাপপরীত, ব্যাধিজর্জ্জরিত ও সুদারুণ শ্রমভারাক্রান্ত জীর্ণ দেহে আর কত সয়! এ কঙ্করিত সংসার-ক্ষেত্রে, বিদ্যাসাগর বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কঠোরতার দুর্ব্বার সংগ্রামে আজন্ম জয়ী; কিন্তু এ জগতে কে কবে কালজয়ী! ইতিপূর্ব্বে প্রাণপ্রতিম বন্ধু প্যারিচরণ সরকার ও শ্যামাচরণ বিশ্বাস, মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ও প্রিয় ভক্ত কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্যাসাগরকে শোকের অনন্ত শর-শয্যায় শয়ন করাইয়া, একে একে ইহ-সংসার হইতে বিদায় লইয়াছিলেন; সুতরাং আর কত সয়!

গত পূর্ব্ব বৎসর পৌষ মাসে, পীড়া প্রবল হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে, তিনি ফরাসডাঙ্গায় গমন করেন। সেইখানে এক মাস কাল সুস্থ ছিলেন। সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট "সহবাস-সম্মতি আইন" সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন। তিনি দিন পাঁচ ছয়ের জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং বহু পরিশ্রমে নানা শাস্ত্রালোচনা করিয়া, আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন,—"আইনে হিন্দুর ধর্ম্মে আঘাত করিবে।" প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগও ছিল।* বিদ্যাসাগর মহাশয়, মুমূর্ষু

* বিধবা-বিবাহ বিচারে যে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মতি আইনের বিচারে সে ভ্রম ঘটে নাই দেখিয়া, সমগ্র হিন্দু-সমাজ সুখী হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা-বিবাহের কার্য্যকারিতায়ও অনেকটা নির্লিপ্ত ছিলেন ভাবিয়া; এক্ষণে তাঁহাকে আবার সহবাস সম্মতি-আইনের বিপক্ষে মত দিতে দেখিয়া, অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসাগর

পৌত্রীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, সেই প্রতিজ্ঞা যে রক্ষা হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ পরিচয় ফরসডাঙ্গায় পাইয়াছিলাম।

আবার পীড়া প্রবল হইল। তাঁহার বিশ্বাস না থাকিলেও, কলিকাতার বাড়ীতে, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় জনের অনুরোধে, পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান হইয়াছিল; কিন্তু রোগের আর উপশম হইল না। পুনরায় তিনি কলিকাতায় আসিলেন। এখানেও রোগের উপশম হইল না। ক্রমে রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। আষাঢ় মাস হইতে ব্যাধি, সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিল। সকলেই তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে আতঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। কোন দিন জ্বর, কোন দিন হিক্কা, কোন দিন পেটের পীড়া, কোন দিন বেদনা,—এইরূপে পীড়ার কোন উপশম না হইয়া, বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই সব দৈনন্দিন বিবরণ এখনও পাঠকের স্মরণাতীত হয় নাই; সুতরাং এ প্রবন্ধে তদ্‌বিবৃতি অধুনা নিষ্প্রয়োজন। রোগ বাড়িতে লাগিল।

রোগের সঙ্গে সঙ্গে যাতনা বাড়িল। যাতনা বাড়িল; কিন্তু সাগরের স্থৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। অন্তরের যাতনানুভূতি তিনি বাহিরের লোককে আকারে বুঝিতে দিতেন না। যতক্ষণ উঠিয়া বসিতে পারিতেন; যতক্ষণ না চৈতন্য-লোপ হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি কাহাকেও সহজে মল মূত্র বা বমনাদি পরিষ্কার করিতে দিতেন না; সে পক্ষে কেহ উদ্যোগী হইলে; বরং বিরক্ত হইতেন। কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। কিন্তু নিজের অসহ্য কষ্টতাপেও তিনি কখনও কাতর হইতেন না; নিরঙ্কুশ ভীম হিমগিরিবৎ অচল ও অটল থাকিতেন। একবার তিনি আপনার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কোন পুস্তকালয়ে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার পায়ের উপর একটা ভয়ানক ভারা লৌহ-চাপ পড়িয়া যায়। অপর কেহ হইলে, হয়ত উঠিতে পারিতনা; তিনি কিন্তু অম্লান বদনে উঠিয়া, পাল্কী চাপিয়া বাড়ী আসেন। যাতনা মর্ম্মরোনাস্তি হইয়াছিল; কিন্তু সে যাতনায় বাহ্যবয়বে বিকৃতির লেশমাত্র হয় নাই। দৌহিত্র যতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাতনা হইতেছে কি?" তিনি ঈষদ্ হাসিয়া বলিলেন,—"যাতনা যা হইতেছে, তোদের হইলে, ডাক্তারের ডাক বসাইতে হইত; আমাকেও পাগল করিতিস।" আর একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পায়ে "কারবঙ্কল" হইয়াছিল। তিনি সদানন্দ-হাস্য-বদনে বসিয়া, ৺প্যারিচরণ সরকারের সহিত কথা কহিতেছিলেন; সেই সময় ডাক্তার আসিয়া, তাঁহার "কারবঙ্কল" কাটিয়া দেন। "কারবঙ্কল" কাটিবার সময়, তাঁহার একটুমাত্রও মুখ-বিকৃতি দেখা যায় নাই। প্যারি বাবু অবাক হইয়াছিলেন। এমন সহিষ্ণুতার পরিচয় সহস্র প্রকারে পাইবে। বার্দ্ধক্যেও কণ্টকময় অন্তিম-শয্যায় সে সহিষ্ণুতার সর্ব্বোচ্চ পরিচয়। যাতনার অগ্নিকুণ্ড হইতেও যথাপাত্রে যথাযোগ্য রসহাস্যের সুধা-ধারা বর্ষিত হইত।

২৯শে আষাঢ় প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার সলজর বলেন,—পাকস্থলীতে "অলসর" হইয়াছে; ঐ দিন অপরাহ্নে ডাক্তার বার্চ্চ ও ডাক্তার ম্যাকোনেল বলেন, "ক্যানসার; অলসর নহে।" জ্বর কমিবার সম্ভাবনা; কিন্তু না কমিলে ৩ দিনের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা; কমিলেও এক মাসের অধিক বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু হায়! এক পক্ষেরও ভর সহিল না! করুণাময়ের সে করুণ-কান্তির নিভন্ত জ্যোতি কালের করাল-শ্বাসে নির্ব্বাপিত হইল।

১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটে, বঙ্গের বিদ্যাসাগর ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বহু উপকরণ সত্ত্বেও নানাকারণে বিদ্যাসাগরের জীবনী সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল; এবং অনেক কথা বলি-বলি করিয়াও, বলা হয় নাই। বৎসরান্তে পূর্ণ জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

মহাশয়, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম অনুভব করিতে পারিয়াছেন। বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীরা বলেন, শরীর অসুস্থতা ও স্বদেশবাসীর দুর্ব্ব্যবহারই এই নির্লিপ্ততার কারণ। আমাদের ধারণা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে ভ্রমানুভব হয় নাই; হইলে তিনি এমন কপটাচারী নহেন যে, তাহা সাধারণ্যে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। অধিকন্তু আমরা জানি, জীবনের শেষাবস্থাতেও তিনি নিজ দৌহিত্রের বিধবা-বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

ভীষ্মচরিত ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বাঙ্গালা ভাষায় ভীষ্মচরিত নামে একখানি পুস্তক আছে। মহাভারতের ভীষ্মকে লইয়াই এই ভীষ্মচরিত। এখানি বাঙ্গালা-ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বালকদের পরীক্ষার পুস্তক হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা-পুস্তকও চাই। ব্যাখ্যা পুস্তকের কাট্‌তি অনেক, কাজে কাজেই লাভও অনেক। সকল ব্যবসার চেয়ে এ ব্যবসাটা চলে ভাল। তাই ভীষ্মচরিতের ব্যাখ্যা-পুস্তক বাহির হইয়াছে।

গত শ্রাবণ মাসে রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাখ্যা-পুস্তকের কথা লিখিয়াছি, তাহার প্রণেতার যে নাম, ভীষ্মচরিত-ব্যাখ্যা-পুস্তকের (১) প্রণেতারও সেই নাম। বোধ হইতেছে, ইহাঁরা দুইজনেই এক ব্যক্তি। কেননা; ইহাঁদের দুই জনেরই ভুল করিবার পদ্ধতিটা এক রকম; ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রগাঢ় অনভিজ্ঞতাও এক রকম; আবার যাহার উপর আর কথা নাই,—পরের ছিদ্রান্বেষণ করা প্রবৃত্তিটা দুই জনেরই ঠিক এক রকম। তাই স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ইহাঁরা দুই জনেই এক ব্যক্তি,—তিনিই ইনি, ইনিই তিনি।

পুস্তকের ব্যাখ্যা লিখিবার অছিলায় ব্যাখ্যাকর্ত্তা, ভীষ্মচরিতের লেখককে বেশ দশকথা শুনাইয়া দিয়াছেন। প্রকাশিত পুস্তকে, কাগজে কালিতে লেখাপড়ার মধ্যে যতদূর কড়া কড়া কথার ভাঁজ দিয়া ঠাট্টা করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছে; কিছুর ত্রুটি হয় নাই; ভুলিয়া কোন কথা ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই কি কি বলিয়া ঠাট্টা করা হইয়াছে, পাঠকেরা হয় তো তাহা জানিবার জন্য আমার কাছে ভারী আব্দার লইবেন। বেশ তবে বলি, শুনুন।

ব্যাখ্যা-পুস্তকের ১৭পৃষ্ঠায় আছে—

"অতঃপর আর ব্যাখ্যা লিখিয়া এই পুস্তকের অবয়ব অনর্থক বর্দ্ধিত করা হইবে না। কেননা ——বাবুর ভীষ্মচরিতের কোনও পরিচ্ছেদেই কোনও কঠিন ভাব বা অলঙ্কারাদি নাই; কেবল কথার শ্রাদ্ধ আছে; একই ভাব পুনঃপুনঃ নানা কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ভীষ্মের যে সমস্ত গুণের কথা লেখা হইল, সেই সমস্ত গুণ প্রায় প্রত্যেক অনুচ্ছেদেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া লেখা হইয়াছে; পুস্তক খানি একবার পড়িয়া দ্বিতীয়বার পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না; প্রত্যুত বড়ই বিরক্তি বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস শতবার পড়িলেও বিরক্তি বোধ হয় না। যাহা হউক, সীতার বনবাস যে চিরকালই ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য থাকিবে, ইহা অভিলষিত নহে। চিরকাল মিষ্ট দ্রব্যও ভাল লাগে না। কটুকষায় প্রভৃতিও সময়ে সময়ে রুচিকর হইয়া থাকে। ভীষ্মচরিতও তদ্রূপ-রস-বিশিষ্ট; সুতরাং এ সময়ে এখানি ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য হওয়াতে ভালই হইয়াছে।"

২৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—

"আপনার অবর্ত্তমানে" ইহা সামান্য লোকের মুখে সচরাচর শুনা যায় বটে; কিন্তু পণ্ডিত লোকে এরূপ প্রয়োগ করেন না; ইহা ব্যাকরণ-বোধশূন্য মূর্খেরা লিখিতে পারে; কিন্তু পণ্ডিতাখ্যাধারী——বাবুর লেখা উচিত হয় নাই।

৭৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—

"ভ্রাতষ্পুত্রদিগকে—[ব্যাকরণ অনুসারে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া ভ্রাতৃপুত্র পদ হয়; অথবা অলুক্ তৎপুরুষে ভ্রাতুষ্পুত্র পদও হইতে পারে; কিন্তু ভ্রাতষ্পুত্র পদ কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে হইবে, তাহা—— ভিন্ন আমাদের জানা সম্ভাবিত নহে। প্রচলিত কথায় সাধারণ লোকে ভ্রাতষ্পুত্র ও ভাদ্রবধূ কথা ব্যবহার করে; ——মহাশয়ের জ্ঞানও যদি তদ্রূপ হয়, সেই জন্য ইহাকে মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়া গণ্য করা গেল না।]"

১০০ পৃষ্ঠায় আছে—

"মহামতি বিদুর ইত্যাদি বারণ করিয়া দিলেন পর্য্যন্ত—এই বাক্যটী——বাবু নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় লিখিয়াছেন। * * * বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরাও এইরূপ ভুল লেখে না; সুতরাং ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থীর পাঠ্য-লেখকের এইরূপ ভুল কখনই মার্জ্জনীয় নহে। পুনঃ——বাবু উক্ত যৌগিক বাক্যটীতে সাতটী (,) কমাচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন;——মহাশয়

(১) ৬৬ নং বীডন্ ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে মুদ্রিত। ১২৯২। পুস্তক খানির নাম—"ভীষ্মচরিতের সুচারু ব্যাখ্যা।"

বিদ্যাসাগরের পুস্তকের অনুকরণ করিতে গিয়াই এইরূপ কমার ছড়াছড়ি করিয়াছেন। আরও কয়েকটী বিষয়ে ——মহাশয় বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের অনুকরণ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু গুণের অনুকরণ করা সহজ নহে, দোষের অনুকরণ করা অতীব সহজ;——মহাশয়ও সহজ-সাধ্য অনুকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষাবস্থায় যখন বহুকালব্যাপী পীড়ায় কাতর ছিলেন, তখন তাঁহার পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্য সাধারণ দিগ্‌গজগণের হস্তেই ন্যস্ত হওয়াতে তাঁহারা কমার ছড়াছড়ি ও অন্যান্য দোষের সমাবেশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুরাতন সংস্করণে এ সকল দোষ ছিল না। যাহা হউক, ব্যাখ্যা-পুস্তক লিখিতে ব্রতী হইয়া আমাকে অনেক গ্রন্থকারের বিরাগ-ভাজন হইতে হইয়াছে এবং হইবে; ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টের কথা হইলেও সাধারণ শিক্ষার্থি-বালকবৃন্দের উপকারার্থ অগত্যা আমাকে সেই বিরাগ সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু ভাষা-সম্বন্ধীয় সমস্ত দোষের উল্লেখ করিতে গেলে, বিশেষতঃ কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক শব্দবিন্যাস ও বাক্যবিন্যাস প্রভৃতির দোষ দেখাইতে গেলে ব্যাখ্যা-পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে; সেজন্য দুই একটী গুরুতর দোষের স্থল প্রদর্শিত হইবে। মৎপ্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানি যেন ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থিগণ নিত্য-সহচর করেন; তাহা হইলে তাঁহারা অনেক দিগ্‌গজ লেখক-ব্যাঘ্রের গুণাগুণ জানিতে পারিবেন।"

১০৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—

"অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম। অগ্নি—হু ধাতু × ত্র, অধিকরণ বাচ্যে; করণ বাচ্যে ত্র করিলে ঘৃত বুঝায়। কিন্তু উক্ত প্রচলিত কোন অর্থই এখানে তাদৃশ সঙ্গত নহে,——বাবুর অভিপ্রেত অর্থ——হোত্রীয় অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নি; সাগ্নিকগণ প্রত্যহ প্রাহ্নে ও সায়াহ্নে হোম করিয়া থাকেন; সেই হোমাগ্নি কখনও নির্ব্বাণ করেন না; সেই অগ্নিতেই তাঁহাদের জাতকর্ম্ম ও অন্তিম-কার্য্যাদি হইয়া থাকে। যাহা হউক——বাবুর অনুরোধে আমরা অভিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া শব্দের অর্থ করিতে ইচ্ছা করি না; এবং——বাবুর ইহা "আর্যপ্রয়োগ" বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না। পাঠকগণ——মহাশয়ের নিকট এজন্য কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারেন।"

১২০ পৃষ্ঠায় আছে—

——'বাবু ভীষ্মচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, পুস্তক খানি কিছুতেই ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থিগণের উপযোগী বৃহদায়তন হইবে না; ইংলিশ টাইপে অর্থাৎ বড় বড় অক্ষরে বিরলরূপে পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস করিয়া অর্থাৎ ২২টী করিয়া পঙ্‌ক্তি প্রতি পৃষ্ঠায় সাজাইয়াও বৃহদায়তন হইবে না; কিন্তু মোটা-সোটা না হইলেও টেক্‌ষ্টবুক্ কমিটীর মেম্বরেরা কখনও ছাত্রবৃত্তির কোর্স করিবেন না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা অনেক "শিবের গীত" গাহিয়াছেন। ভীষ্মচরিতের সঙ্গে যে বিষয়ের কোনও সংস্রবই নাই, তেমন বিষয়ও চিবাইয়া চিবাইয়া গদাইলস্করী ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।"

ব্যাখ্যাকর্ত্তা, ভীষ্মচরিতের লেখকের সঙ্গে এই প্রকারে সদালাপ করিয়াছেন। একদিন কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভীষ্মচরিতের ব্যাখ্যাকর্ত্তার নামোল্লেখ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"লোকটার লেখা বড়ই রূঢ়। পড়িলে সকলের মনেই বিদ্বেষ জন্মে।" আমি এই কথা বলি, যিনি বালকদের পাঠ্য পুস্তক লিখিতেছেন, তাঁহার লেখার মধ্যে সৌজন্য এবং শিষ্টাচারিতাই থাকা উচিত। প্রথম হইতে যাহাদিগকে বিনয় ও নম্রতা এবং লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার শিখাইতে হইবে, তাহাদের পাঠ্য পুস্তকে রূঢ়তা থাকা ভাল নয়। আমরা মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেছি, ইহাতে হাস্য-পরিহাস থাকিলে নিন্দা নাই। মাসিক পত্রিকায় রং থাকিবে, সং থাকিবে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ থাকিবে; হাসি থাকিবে, কান্না থাকিবে, আবার গভীর চিন্তায় ডুবিয়া ভাবিবার বিষয়ও থাকিবে। এত রকম কাণ্ড না থাকিলে মাসিক পত্রিকার অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু বালকের পাঠ্য পুস্তকে সে সকল থাকা চাই না। কাহারও ভুল দেখিলে ভদ্রভাবে তাহার সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত। সকলেরই ভুল হয়; বৃহস্পতিও কলম ধরিলে অনবধানতা প্রযুক্ত ভুল করিয়া ফেলেন। তাই কোন গ্রন্থকারের ভুল ধরিয়া লোকের কাছে তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিলে মনঃপীড়া জন্মে। এ কথা সত্য কি মিথ্যা অনুমানের চেয়ে লেখক বরং তাহার প্রত্যক্ষ পরখ দেখুন।

রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাখ্যা-পুস্তক যে ধরণে লেখা হইয়াছে, ভীষ্মচরিতের ব্যাখ্যা-পুস্তকের ধারা-ধরণও অনেকটা সেই প্রকার।

"অনেকটা" বলিলাম,—এ কথার তাৎপর্য্য আছে। পাঁজির প্রারম্ভে ও শেষে এবং মলাটে বিজ্ঞাপন দেখা যায়। অনেক পুস্তকের প্রারম্ভে কিংবা শেষে স্বতন্ত্র কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে। কোন কোন পুস্তকের কেবল মলাটেই বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। কিন্তু ভীষ্মচরিতের ব্যাখ্যা-পুস্তকে তাহা নয়। পুস্তকের প্রারম্ভে কিংবা শেষে বিজ্ঞাপন দিলে হয় তো কেহ পড়েন, নয় তো কেহ পড়েন না। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে দৃষ্টি পড়িবে বলিয়া এ পুস্তক খানির পাঠ্য বিষয়ের ভিতরে ভিতরেই বিজ্ঞাপন গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে—বিজ্ঞো ভবতি ক্রমশো জনঃ।

শুনিতে পাই, বিলাতে নাকি পথিকের পিঠে বিজ্ঞাপন ঝুলিতে থাকে। গাড়ীর ভিতরে বাহিরে বিজ্ঞাপন; রাস্তার থামে, দেউলে;—যেখানে দশজন লোক গিয়া দাঁড়ায়; যেখানে দশজন লোক আসে যায়, সেই খানেই বিজ্ঞাপন। আমাদের দেশেও রেল-ওয়ে ষ্টেশনে আর স্থান নাই। বিচিত্র বিজ্ঞাপন-সজ্জায় দেউলের গা ঢাকিয়া গিয়াছে। আবার বিজ্ঞাপন সাজাইবার ভাষার ধাঁজাই বা কি? পড়িলে প্রাণ-পুতলী নাচিয়া উঠে।

কিন্তু ভীষ্মচরিতের ব্যাখ্যা-পুস্তকে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভাষার ধাঁজা নাই, কেবলি খুব অনুরোধ, হাতে ধরিয়া অনুরোধ,—"আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেখ।" পাতায় পাতায় কেবলি—"আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেখ।"

অর্থাৎ জগতে আর অন্য ব্যাকরণ নাই। থাকিলেও অন্য ব্যাকরণে বুদ্ধি খুলিবে না, জ্ঞান জন্মিবে না, ব্যুৎপত্তিও হইবে না, তাই হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছেন,—"আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেখ।"

বেশ, তবে ভীষ্মচরিতের ব্যাখ্যা-পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানাও দেখা যাউক।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ১১ পৃষ্ঠায় সূত্র করা হইয়াছে—

"এক শব্দ পরে থাকিলে বার ও অর্দ্ধ শব্দের অকারের লোপ হয়। যথা,—বার + এক = বারেক, অর্দ্ধ + এক = অর্দ্ধেক।"

এই সূত্রটী কি কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে? কিংবা ইহা নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণের নূতন ব্যবস্থা? যদি কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে এই সূত্র গৃহীত হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যাকরণখানার নাম লিখিয়া দিলে ভাল হইত। কারণ এ প্রকার সূত্র যে সে সংস্কৃত ব্যাকরণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর ইহা যদি নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণের নূতন ব্যবস্থা হয়, তবে প্রশংসার কথা। কালক্রমে মানুষের আচার ব্যবহার, ঘর দ্বার, পরিচ্ছদ ভাষা সকলি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ভাষা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যাকরণেরও পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে সূত্রটী এইরূপ হওয়া উচিত ছিল—

চলিত বাঙ্গালা ভাষায়, বিশেষতঃ পদ্যে, এক শব্দ পরে থাকিলে বার, অর্দ্ধ, জন, ক্ষণ, দিন, তিল, যত, কত, এত, শত, সহস্র প্রভৃতি শব্দের অকারের লোপ হয়।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ১০৫পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

"দ্বন্দ্বসমাসে নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—রাত্রি ও দিবা = রাত্রিন্দিব; কুশ ও লব = কুশীলব; অগ্নি ও বরুণ = অগ্নী-বরুণ; অগ্নি ও সোম = অগ্নীসোম; মিত্র ও বরুণ = মিত্রাবরুণ; ইন্দ্র ও সোম = ইন্দ্রাসোম; স্ত্রী ও পুমান্ = স্ত্রীপুংস; বাক্ ও মনঃ = বাঙ্মনস; দিব ও ভূমি = দ্যাবাভূমি; দিব্ ও পৃথিবী = দিবস্পৃথিবী ও দ্যাবাপৃথিবী।"

"কুশ ও লব = কুশীলব।" এস্থলে বলা উচিত ছিল, কুশ ও লব এই দুই পদের দ্বন্দ্ব-সমাসে কুশীলব ও কুশলব এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধি হয়। এরূপ না বলিলে, বালকেরা বুঝিবে যে, কুশ ও লব এই দুই পদের দ্বন্দ্বসমাসে কেবল কুশীলব এই প্রকার রূপ হইয়া থাকে, অন্য কোন প্রকার রূপ হয় না।

কিন্তু এ দোষ সম্পূর্ণরূপে আমাদের ব্যাকরণ-লেখকের নয়। কতকটা দোষ মুগ্ধবোধের টীকাকার রামতর্কবাগীশের আছে। তিনি লিখিয়াছেন——"লবে কুশস্য। আদরার্থোঽয়ং আরম্ভঃ কুশস্য ঈ স্যাৎ লবশব্দে পরে। কুশী-লবাবিতি বাল্মীকিপ্রয়োগঃ।" কিন্তু বাল্মীকি-প্রয়োগঃ—এই কথা বলায় তাঁহার সকল দোষের পরিহার হইয়াছে।

সুপদ্ম ব্যাকরণের অলুক্, সমাস প্রকরণে এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে,—

"মাতরপিতরৌ কুশীলবৌ চ দ্বৌ নিপাত্যেতে চকারাৎ মাতাপিতরৌ কুশলবৌ চ।"

অর্থাৎ, মাতরপিতর এবং কুশীলব এই দুইটী পদ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। সূত্রে যে চকার আছে, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, মাতাপিতা এবং কুশলব এ প্রকার রূপসিদ্ধিও হয়।

রামায়ণ এবং পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে "কুশীলব" এই প্রকার রূপ গৃহীত হইয়াছে।

অগৃহ্নীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেশৌ কুশীলবৌ।

রামায়ণ, বাঃ কাঃ ৩। ৪।

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ রাজেন্দ্র রামপুত্রৌ কুশীলবৌ।

পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, রামায়ণপান। কিন্তু রঘুবংশ, উত্তরচরিত প্রভৃতি পুস্তকে কুশলব এই প্রকার রূপ গৃহীত হইয়াছে।

কবিঃ কুশলবাবেব চকার কিল নামতঃ।

রঘুবংশ ১৫। ৩২।

মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুর্গুরুচোদিতৌ

রঘুবংশ, ১৫ ৬৩।

তয়ৈব কিল দেবতয়া তয়োঃ কুশলবাবিতি নামনী প্রভাবশ্চাখ্যাতঃ।

উত্তরচরিত।

অতএব কুশীলব এই প্রকার রূপকে আর্ষপ্রয়োগ বলিলেও বলা যায়। কুশলব এই রূপ সংস্কৃত।

অগ্নীবরুণ, অগ্নীসোম, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাসোম দ্যাবাভূমি, দিবস্পৃথিবী, দ্যাবাপৃথিবী এই পদগুলি পাকনে সিদ্ধ হয় নাই। পদগুলি সাধিবার জন্য বিশেষ সূত্র আছে।

দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা ৬। ৩। ২৬। দেবতাবাচী যে দ্বন্দ্ব সমাস তাহার পূর্ব্বপদে আনঙ আদেশ হয়। মিত্রাবরুণৌ, ইন্দ্রাবরুণৌ ইন্দ্রাসোমৌ, ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইত্যাদি।

ঈদগ্নেঃ সোমবরুণয়োঃ। ৬। ৩। ২৭

দেবতাবাচী যে দ্বন্দ্ব সমাস তাহাতে সোম এবং বরুণ শব্দ পরে থাকিলে অগ্নি শব্দের ইকার দীর্ঘ হয়। অগ্নীসোমৌ, অগ্নীবরুণৌ।

দিবো দ্যাবা। পা ৬। ৩। ২৯।

উত্তর পদে দেবতা-দ্বন্দ্বে দিব্ এই শব্দ স্থানে দ্যাবা আদেশ হয়। দ্যাবাভূমি, দ্যাবাক্ষমে।

দিবসশ্চ পৃথিব্যাম্। পা ৬। ৩। ৩০।

পৃথিবী শব্দ উত্তর পদে থাকিলে দিব্ শব্দ স্থানে দিবস্ এবং দ্যাবা আদেশ হয়। দিবস্পৃথিব্যৌ, দ্যাবাপৃথিব্যৌ।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে এই শব্দগুলি না লিখিলেই ভাল হইত।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"সংজ্ঞার্থে কালী, দেবী ও ষষ্ঠী শব্দের পর দাস শব্দ; এবং রেবতী ও রোহিণী শব্দের পর পুত্র শব্দ থাকিলে উহাদের ঈকার হ্রস্ব হয়।"

এই সূত্রটীতে সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে। এখানে কালী শব্দের সঙ্গে দাস শব্দের কোন সম্পর্ক নাই; এবং রেবতী ও রোহিণী শব্দের সঙ্গেও পুত্র শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে হ্রস্ব হইবার অন্য কারণ আছে।

ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্ব্বহুলম্।

পা ৬। ৩। ৬৩।

সংজ্ঞা এবং বেদবিষয়ে ঙী প্রত্যয়ান্ত এবং আপ্ প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সমাসে অনেক স্থলে হ্রস্ব হয়। (কিন্তু সংজ্ঞা না হইলেও কোন কোন স্থলে হ্রস্ব হইয়া থাকে)।

সুপদ্ম ব্যাকরণেও সূত্র করা হইয়াছে—

"ঙ্যাপোর্নাম্নি বহুলম্।"

অর্থাৎ সংজ্ঞা বিষয়ে ঙী প্রত্যয়ান্ত এবং আপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসে অনেক স্থলে হ্রস্ব হয়।

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণেও ঠিক ঐ মর্ম্মে সূত্র করা হইয়াছে,—

"তদ্ধিতেৎস্ত্র্যাতঃ সংজ্ঞায়াং বহুলম্।"

তদ্ধিতের ঈকারান্ত এবং স্ত্রী প্রত্যয়ের আকারান্ত শব্দ সমাসে সংজ্ঞাবিষয়ে অনেক স্থলে হ্রস্ব হয়।

ঙী-প্রত্যয়ান্ত যথা,—বৈদেহিবন্ধু, বৈদেহিপুত্র, রেবতিমিত্র, রেবতিপুত্র, রোহিণিপুত্র, ভরণিপুত্র, কুমারিদারা, প্রদর্বিদা।

আপ্ প্রত্যয়ান্ত যথা,—কান্তকুব্জ, শিলবহ, শিলপ্রস্থ, অজক্ষীর, উর্ণনাভ, উর্ণম্রদা, প্রমদবন, শিংশপস্থল, মন্দুরজ।

ঐ সকল পদের মধ্যে—রেবতীপুত্র, অজাক্ষীর, প্রমদাবন, শিংশপাস্থল ইত্যাদি বিকল্পরূপও হয়। কালিদাস শব্দও উপরের লিখিত সূত্রানুসারে হ্রস্ব হইয়াছে।

পাঠক দেখিলেন, কালী, দেবী এবং ষষ্ঠী শব্দের পরে দাস শব্দ না থাকিলেও এবং রেবতী ও রোহিণী শব্দের পরে পুত্র শব্দ না থাকিলেও সমাসে হ্রস্ব হইয়াছে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ১১০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

"মিত্র শব্দ পরে থাকিলে বিশ্বশব্দের আকার দীর্ঘ হয়।

এ সূত্রটীতেও সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে।

মিত্রে চর্ষৌ। পা। ৬। ৩। ১৩০।

ঋষি বুঝাইলে বিশ্ব শব্দের পরে মিত্রশব্দ থাকিলে, বিশ্ব শব্দের অকার দীর্ঘ হয়। কিন্তু ঋষি না বুঝাইলে দীর্ঘ হইবে না। যথা,—বিশ্বামিত্র ঋষি। বিশ্বমিত্র মাণবক।

সুপদ্ম ব্যাকরণেও ঠিক এইরূপ সূত্র করা হইয়াছে।

"নরে চ নাম্নি। মিত্রে চ ঋষৌ।"

অর্থাৎ সংজ্ঞা বুঝাইলে বিশ্ব শব্দের পর নর শব্দ থাকিলে এবং ঋষি বুঝাইলে বিশ্ব শব্দের পর মিত্র শব্দ থাকিলে বিশ্ব শব্দের অকার দীর্ঘ হয়।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ১১০ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে,—

"অণ্ড, দুগ্ধ প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে কুক্কুটী প্রভৃতি শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—কুক্কুটীর অণ্ড ইতি কুক্কুটাণ্ড, হংসীর অণ্ড ইতি হংসাণ্ড; এইরূপ ছাগদুগ্ধ, মৃগদুগ্ধ ইত্যাদি।"

এখানে আমি কোন ভুল ধরিতেছি না, কিন্তু আর কতকগুলি উদাহরণ দিলে বালকদের উপকার হইত।

এস্থলে কাত্যায়নের একটী বার্ত্তিক আছে,—

কুক্কুট্যাদীনামণ্ডাদিষু পুংবদ্বচনম্। যথা,—কুক্কুট্যা অণ্ডং, কুক্কুটাণ্ডং, মৃগ্যাঃ পদং, মৃগপদম্। মৃগ্যাঃ ক্ষীরং, মৃগক্ষীরম্। কাক্যাঃ শাবঃ, কাকশাবঃ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার কৌমুদী ব্যাকরণে এইরূপ একটী সূত্র সঙ্কলন করিয়া কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছেন। যথা,—পুংবৎ কুক্কুটীপ্রভৃতীনামণ্ডাদৌ। * * * কুক্কুট্যা অণ্ডং কুক্কুটাণ্ডম্। হংস্যা অণ্ডং হংসাণ্ডম্। কুক্কুট্যাঃ শাবঃ কুক্কুটশাবঃ। হংস্যাঃ শাবঃ হংসশাবঃ। কুক্কুট্যাঃ ক্ষীরং কুক্কুটক্ষীরম্। হংস্যাঃ-ক্ষীরম্। হংসক্ষীরম্।

এখানে ক্ষীর শব্দের অর্থ কি?

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"নির্দ্ধারে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হইলেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না। যথা,—মনুষ্যের মধ্যে বীর ইত্যাদি।"

তাহার পর ১১৩ পৃষ্ঠায় আবার লেখা হইয়াছে,—

নির্দ্ধারে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হইলেও সপ্তমীতৎপুরুষ সমাসই হইবে; কদাচ ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হইবে না। অতএব—পুরুষের মধ্যে উত্তম ইতি পুরুষোত্তম, পথের মধ্যে রাজা ইতি রাজপথ, দন্তসমূহের মধ্যে রাজা ইতি রাজদন্ত, নরের মধ্যে অধম ইতি নরাধম, ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ নহে।

আ মরে যাই! আমাদের শ্রীমান পর-ছিদ্রান্বেষি-বিপুল-বিশাল-বিষম-বৈয়াকরণ-বিকট-ব্যাঘ্র-বাবু-বাহাদুর বাছার পেটে পেটে এতটা বিদ্যা না থাকিলে লোকে তাঁহাকে গুণনিধি বলিয়া ডাকিবে কেন? পাখীরা দাঁড়ে বসিয়া দুধছোলা খায় আর এক এক বার "রাধাকৃষ্ণ," "রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া ডাকে; কিন্তু রাধাকৃষ্ণ কি?—বনের কোন প্রকার সুমিষ্ট পাকা ফল, কিংবা বালিকারা তাহা চুলের বিনানীর সঙ্গে জড়াইয়া মাথায় পরে, অথবা তাহা মেলেরিয়া জ্বরের কোন রকম একটা পেটেন্ট ঔষধ,—পাখীরা তাহার কিছুই জানে না। লোকে রাধাকৃষ্ণ পড়ায়, পাখীরা রাধাকৃষ্ণ পড়ে। আমাদের বৈয়াকরণ মহাশয়েরও সেই দশা। তিনি ব্যাকরণের এক একটা সূত্র কাহার নিকটে পড়িয়াছিলেন, এক এক বার কেবল তাহাই কপ্‌চাইতেছেন। কিন্তু সেই সকল সূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝেন নাই, ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টিও নাই। শাস্ত্রের সকল দিকে দৃষ্টি না থাকিলে বিচার ঐকদেশিক হইয়া পড়ে। কোন বিষয়ের কেবল একদেশ দেখিয়া বিচার করিলে কিছুই মীমাংসা হয় না। যদ্যপি কেবল কাণ দেখিয়া হাতী জন্তুটা কি রকম তাহার বিচার করা যায়, তাহা হইলে, হাতী গ্রীষ্মকালে বাতাস খাইবার দুইখানা পাখা কিংবা চাউল ঝাড়িবার দুইখানা কুলা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যদ্যপি কেবল দাঁত দেখিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে হাতী, মহিষের খড়ী-মাথানো দুইটা শিং। যদ্যপি কেবল শুঁড় দেখিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে হাতী দমকলের মোটা একটা নল। যদ্যপি কেবল পা দেখিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে হাতী চারিটা থাম। আর যদ্যপি কেবল পেট দেখিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে হাতী, ষ্টিম্-এঞ্জিনের বড় একটা বইলার। কিন্তু সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়া বিচার করিলে, হাতীজন্তু কি, তাহার মীমাংসা হয়।

নির্দ্ধারণ বিভক্তি কি রকম, পুরুষোত্তম প্রভৃতি শব্দ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে হয় কি না, এ সকল বিষয় জানিতে হইলে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অনেকটা গাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণেও এ বিষয়ে অনেকটা গোল রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ মুগ্ধবোধের টীকাকারেরা এবিষয়ে অনেকটা গোল বাধাইয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রণীত উপক্রমণিকা ব্যাকরণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"অনেক স্থল এরূপে লিখিত হইয়াছে যে, সহজে তাৎপর্য্য-গ্রহ হওয়া দুর্ঘট। সেই সেই স্থলে টীকাকারদিগের সাহায্য আবশ্যক; কিন্তু যে সকল মহাশয়েরা মুগ্ধবোধের টীকা লিখিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। সুতরাং ব্যাকরণের যথার্থ মত-গ্রহ-বিরহে অনেক স্থলেই স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা অসম্বদ্ধ অপ্রামাণিক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।" বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে কিছুই ভুল নাই। মুগ্ধবোধে একটী সূত্র আছে,—

মুখ্যার্থোরসঃ।

মুখ্য অর্থাৎ প্রধান অর্থ বুঝাইলে উরস্ শব্দের উত্তর সমাসে অ প্রত্যয় হয়। (অগ্র্যাখ্যায়ামুরসঃ। পা ৫।৪।৯৩। টাচ্ স্যাৎ)

মুগ্ধবোধের উক্ত সূত্রের পর এইরূপ বৃত্তি ও উদাহরণ আছে,—মুখ্যার্থাদুরঃশব্দাদঃ স্যাদ্-ষাদৌ। অশ্বোরসং মুখ্যোঽশ্ব ইত্যর্থঃ।

বেশ, বৃত্তি করা হইল, উদাহরণ দেওয়া হইল, লেটা চুকাইল। কিন্তু তাহার পর কোন প্রসঙ্গ নাই, অথচ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,—"পুরুষেষু উত্তমঃ পুরুষোত্তমঃ।" সূত্রে কোন কথা নাই, অথচ উদাহরণ দেওয়া হইল,—"পুরুষোত্তমঃ"। বোধ হইতেছে,—এই উদাহরণ প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত হইলেও টীকাকারদের পূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এ স্থলে টীকায় লিখিত হইয়াছে,—"সপ্তমীমাহ পুরুষেষ্বিতি। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠ্যাস্তু সমাস-নিষেধাৎ পুরুষেষু উত্তমঃ পুরুষোত্তম ইতি সপ্তমী-তৎপুরুষঃ।" পুনর্ব্বার ঐ টীকায় লেখা হইয়াছে,—"নির্দ্ধারণে ষষ্ঠ্যা সমাসো ন স্যাৎ পুরুষাণাং শূরঃ।"

অতএব নির্দ্ধারণ বিভক্তি লইয়া আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে গোল চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা দেশে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া এবং বিক্রমপুর না থাকিলে এতদিন আমরা সংস্কৃতের নাম ভুলিয়া যাইতাম। বহুকাল হইতে এই তিন স্থান দ্বিতীয় অবন্তীনগর হইয়া আছে। মহা-মহা আচার্য্যেরা এই সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সে সকল মহোদয়গণও দূরতর স্থান হইতে আসিয়া ঐ তিন বিদ্যাপুরীতে বিদ্যাভ্যাস করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই,—বাঙ্গালা দেশে চিরকালই বেদের ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের ভালরূপ আলোচনা নাই। সে কারণ মুগ্ধবোধের টীকার স্থানে স্থানে ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ সকল পুস্তকেই বিস্তর ভুল হইয়াছে।

পুরুষোত্তম প্রভৃতি পদে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে। কি কারণে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইবে এবং নির্দ্ধারণ বিভক্তি কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছি, পড়িলে আমাদের বৈয়াকরণ মহাশয়ের আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

যতশ্চ নির্দ্ধারণম্। পা ২।৩।৪১। যাহা হইতে নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহাতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি বিহিত হয়। যথা,—মনুষ্যাণাং ক্ষত্রিয়ঃ শূরতমঃ। জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সংজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা সমুদায় হইতে একদেশকে পৃথক্করণের নাম নির্দ্ধারণ।

তাহার পর—

ন নির্দ্ধারণে। পা ২।২।১০।

নির্দ্ধারণে যে ষষ্ঠী, তাহার সমাস হয় না।

যথা,—মনুষ্যাণাং ক্ষত্রিয়ঃ শূরতমঃ। এখানে মনুষ্যক্ষত্রিয়শূর, এ প্রকার সমস্ত পদ হইবে না।

তাহার পর, দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। ৫। ৩। ৫৭। পাণিনির এই সূত্রের ব্যাখ্যা স্থলে কৈয়ট লিখিয়াছেন যে, নির্দ্ধারণ আশ্রয়ে ষষ্ঠী এবং সপ্তমী হয়। যাহা হইতে নির্দ্ধারণ করা যায়, যে একদেশকে নির্দ্ধারণ করা যায়, এবং নির্দ্ধারণের যাহা কারণ, এই তিনটীকে নির্দ্ধারণ বিভক্তি কহে। এই তিনটী এক স্থানে সন্নিহিত থাকিলে সেস্থলে ষষ্ঠীসমাস হইবে না। কিন্তু যেখানে এই তিনটী নির্দ্ধারণ বিভক্তি এক স্থলে বিদ্যমান না থাকিবে সেখানে সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠীসমাস হইবে। যেমন, নাগানামুত্তমঃ, নাগোত্তমঃ। (নির্দ্ধারণাশ্রয়ে ষষ্ঠীসপ্তম্যৌ ভবতো যস্মান্নির্দ্ধার্য্যতে, যশ্চৈকদেশো নির্দ্ধার্য্যতে, যশ্চ নির্দ্ধারণহেতুরেতত্ত্রয়সন্নিধানে নির্দ্ধারণং ভবতীতি, তত্রৈব ষষ্ঠীসমাসনিষেধো ভবতি। ইহ তু নাগানামুত্তমো নাগোত্তম ইতিত্রয়সন্নিধানাভাবাৎ সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠীতি সমাসো ভবত্যেব)। মনুষ্যাণাং ক্ষত্রিয়ঃ শূরতমঃ। এখানে মানুষ হইতে পৃথক্ করা হইতেছে (যস্মান্নির্দ্ধার্য্যতে), ক্ষত্রিয় এই একদেশকে পৃথক্ করা হইতেছে (যশ্চৈকদেশো নির্দ্ধার্য্যতে), শূরতম ইহাই নির্দ্ধারণের হেতু (যশ্চ নির্দ্ধারণহেতুঃ)। এখানে তিনটীই নির্দ্ধারণ বিভক্তি সন্নিহিত আছে, তাই ষষ্ঠীসমাস হইল না। কিন্তু যদ্যপি বলা যায়,—মনুষ্যাণাং শূরঃ। তাহা হইলে, মনুষ্যশূরঃ, এই প্রকার ষষ্ঠীসমাস হইবে। কারণ এখানে তিনটী নির্দ্ধারণ বিভক্তি বিদ্যমান নাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভুল সকলেরই হয়। বৃহস্পতিও কলম ধরিলে অনবধানতা প্রযুক্ত ভুল করিয়া ফেলেন। মুগ্ধবোধের টীকাকারও তাই অনবধানতা প্রযুক্ত এ স্থলে ভুল করিয়াছেন। দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ লিখিয়াছেন,—"নির্দ্ধারণে ষষ্ঠ্যা সমাসো ন স্যাৎ। পুরুষাণাং শূরঃ।" এখানে নির্দ্ধারণ বিভক্তি বিদ্যমান নাই, সে কারণ পুরুষাণাং শূরঃ পুরুষশূরঃ, সম্বন্ধসামান্যে এই প্রকার ষষ্ঠীসমাস হইবে। আমাদের নবীন বৈয়াকরণ মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—মনুষ্যের মধ্যে বীর। এখানেও নির্দ্ধারণ বিভক্তি নাই, তজ্জন্য সম্বন্ধ-সামান্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে।

এখন পাণিনির একটী সূত্র হইতেই উদাহরণ দিতেছি। সূত্রে নির্দ্ধারণ অর্থ বুঝাইতেছে, কিন্তু নির্দ্ধারণ বিভক্তি নাই বলিয়া ষষ্ঠীসমাস হইয়াছে।

হলাদিঃ শেষঃ। পা ৭। ৪। ৬০।

হল্‌দিগের মধ্যে যে আদি হল্। এখানে নির্দ্ধারণ অর্থ আছে, কিন্তু নির্দ্ধারণ বিভক্তি নাই বলিয়া ভগবান্ পতঞ্জলি ষষ্ঠীতৎপুরুষ ও কর্ম্মধারয় সমাস করিয়াছেন। (হলাদিঃ শেষঃ। কিময়ং ষষ্ঠীসমাসঃ হ লামাদির্হলাদিঃ) হলাদিঃ শিষ্যত ইতি। আহোস্বিৎ কর্ম্মধারয়ঃ? হল্ আদির্হলাদিঃ)। এখানে নির্দ্ধারণ অর্থ থাকিলেও নির্দ্ধারণ বিভক্তি নাই বলিয়া পতঞ্জলি ষষ্ঠীসমাস ও কর্ম্মধারয় সমাস করিলেন।

পণ্ডিতবর স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়,—"ন নির্দ্ধারণে"—পাণিনির এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে সরলায় লিখিয়াছেন,—সেইরূপ পুরুষোত্তম ইত্যাদি পদে ত্রিতয় সন্নিহিত না থাকায় নির্দ্ধারণ বিভক্তি নাই, সে কারণ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে। (ততশ্চ পুরুষোত্তম ইত্যাদৌ ত্রিতয়সন্নিধানাভাবাৎ ন নির্দ্ধারণবিভক্তিঃ, কিন্তু সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠীতি সমাসঃ)। অতএব বাচস্পতি মহাশয়ও বলিলেন যে, পুরুষোত্তম ইত্যাদি শব্দে ষষ্ঠীসমাস হইবে। কিন্তু ইত্যাদি বলিয়াছেন কেন? ইত্যাদি বলিবার কারণ এই—নরোত্তম, নরাধম এই প্রকার যত পদ আছে, সে সমস্ত পদেই সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে।

পুরুষোত্তম ইত্যাদি পদে, অতিশয় উক্ত হইলেও নির্দ্ধারণীয় গুণবচনের সঙ্গে নির্দ্ধারণবিহিত ষষ্ঠীসমাস হয়। যথা,—পুরুষাণামতিশয়েন উত্তমঃ পুরুষোত্তমঃ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী যে সটীক সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার টীকায় লেখা আছে,—"তথা নির্দ্ধার্য্যেণ গুণিনাতিশয়ে। অস্যার্থঃ, অতিশয়ে বিবক্ষিতে নির্দ্ধারণীয়েন গুণবচনেন সহ নির্দ্ধারণ-বিহিতা ষষ্ঠী সমস্যতে। সর্ব্বেষামতিশয়েন শুক্লং সর্ব্বশুক্লং; গবামতিশয়েন কৃষ্ণা গোকৃষ্ণা; পুরুষাণামতিশয়েন উত্তমঃ পুরুষোত্তমঃ।"

রাজপথ,—এই পদেও ষষ্ঠীসমাস হইবে। আবার ষষ্ঠী ভিন্ন মধ্যপদলোপীও হইবে। রাজগমনোপযোগী পন্থাঃ রাজপথঃ। পথাং রাজা রাজপথঃ, এই প্রকার পরনিপাত করিয়া ষষ্ঠীসমাস হয়। হঠযোগপ্রদীপিকার টীকায় ব্রহ্মানন্দ, রাজ্ঞাং পন্থাঃ রাজপথঃ, এই প্রকার ষষ্ঠীসমাস করিয়াছেন। যথা,—

প্রাণস্য শূন্যপদবী তথা রাজপথায়তে।

হঠযোগ ৩।৩

তথা শূন্যপদবী সুষুম্না প্রাণস্য বায়োঃ রাজ্ঞাং পন্থাঃ রাজপথঃ রাজপথমিবাচরতি রাজপথায়তে রাজমার্গায়তে। সুখেন গমনসম্ভবাৎ। ইতি ব্রহ্মানন্দ।

রাজদন্ত,—পাণিনির একটী সূত্র আছে,—রাজদন্তাদিষু পরম্। ২।২।৩১। এই সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে কাশিকায়, সিদ্ধান্তকৌমুদীতে, লঘুকৌমুদীতে, মধ্যকৌমুদীতে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে, সুপদ্ম ব্যাকরণে, মুগ্ধবোধের টীকায় সর্ব্বত্রই দন্তানাং রাজা রাজদন্তঃ, এই প্রকার বাক্য করা হইয়াছে। কেবল আমাদের নবীন বৈয়াকরণ বাবুর সে মত নয়।

নরাধম পদ, পুরুষোত্তম পদের ন্যায় সম্বন্ধ-সামান্যে ষষ্ঠীসমাস হইবে।

অতএব আমাদের নবীন বৈয়াকরণ বাবু যে লিখিয়াছেন,—"পুরুষের মধ্যে উত্তম ইতি পুরুষোত্তম, পথের মধ্যে রাজা ইতি রাজপথ দন্তসমূহের মধ্যে রাজা ইতি রাজদন্ত, নরের মধ্যে অধম ইতি নরাধম, ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ নহে।" লেখকের এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও উপহাসের যোগ্য। আমি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বলি, যতদিন না আমাদের নবীন বৈয়াকরণ-শার্দ্দূল উপরের লিখিত ব্যাকরণ গুলির মত খণ্ডন করিবেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা বলিবে যে,—পুরুষোত্তম প্রভৃতি পদে ষষ্ঠীসমাস হইতে পারিবেই পারিবে।

বালক-কালে ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে পড়িয়াছি, বেদব্যাস নাকি শিবের উপরে জেদ করিয়া নূতন একটা কাশী নির্ম্মাণ করিতে গিয়াছিলেন। শেষে ক্ষমতায় কুলাইল না, কেবল দুর্গতি ভোগ সার হইল। তাই অন্নপূর্ণা ব্যাসকে ভর্ৎসনা করিয়া দৈববাণী-যোগে বলিয়াছিলেন,—

অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দাও তসরেতে হাত॥

দেখিতেছি আমাদের নবীন বৈয়াকরণ-কেশরী মহাশয়ের ভাগ্যেও ঠিক সেই প্রকার বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। তিনি ব্যাকরণ না জানিয়া, ব্যাকরণ না বুঝিয়া, কেবল টাকার লোভে ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া খুঁয়ে তাঁতির কাজ করিয়াছেন। তাঁহার যদি ব্যাকরণ লিখিতে এতই সখ জন্মিয়াছিল, তাহা হইলে প্রথমে নিজে ব্যাকরণ শিখিতে হইত, নিজে ব্যাকরণ শিখিয়া তাহার পর ব্যাকরণ লিখিলে লোকের কাছে এত গঞ্জনা খাইতে হইত না।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ১১১ ও ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"পটের শুক্ল, জলের শীত, আম্রের মধুর ইত্যাদি বাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না। কিন্তু পটের শুক্লতা জলের শৈত্য এবং আম্রের মাধুর্য্য ইত্যাদি বাক্যে পটশুক্লতা, জলশৈত্য, ও আম্র মাধুর্য্য প্রভৃতি পদ হয়।

"কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণ-লেখক এবিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়া লিখিয়াছেন যে,—পটের শুক্লতা, গতির মৃদুতা, জলের মাধুর্য্য ...... ইত্যাদি অনেক স্থলে তৎপুরুষ সমাস হয় না।" আবার ইহার অনুকরণে অন্য একজন লিখিয়াছেন যে, "পটের শুক্লতা, জলের মাধুর্য্য, ইত্যাদি স্থলে সমাসের প্রায় ব্যবহার নাই।" এই দুই জনের মধ্যে একজন সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে পাঠ অপাঠবৎ হইয়া গিয়াছে। অপর ব্যক্তি অনুকরণ-কারক।"

আমাদের নবীন বৈয়াকরণ-সিংহ এই প্রকারে দুই জন বাঙ্গালাব্যাকরণ-লেখকের নিন্দা করিয়া মুগ্ধবোধের টীকা হইতে একটু স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

"উপরি ভাগে যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহার প্রমাণ এই—

"শুক্লাদীনাং শীতাদীনাং মধুরাদীনাঞ্চ গুণমাত্রবাচিত্বে ষষ্ঠীসমাসো ন স্যাৎ। যথা,—পটস্য শুক্লঃ, জলস্য শীতং, আম্রস্য মধুরঃ। এষাং গুণবাচিত্বে তু দ্রব্যস্য বিশেষণত্বাৎ পূর্ব্বস্থায়িনাং বহুব্রীহিঃ কর্ম্মধারয়শ্চ স্যাৎ। যথা,—শুক্লপটো বিপ্রঃ, শুক্লপটোঽয়ং, শীতলজলা নদী, শীতলজলমিদং, মধুরাম্রো দেশঃ, মধুরাম্রমিদং ইত্যাদি। এষাং ভাবপ্রত্যয়েষু ষষ্ঠীসমাসঃ

স্যাদেব। যথা পটস্য শৌক্ল্যং পটশৌক্ল্যং এবং জলশৈত্যং, আম্রমাধুর্য্যং.

"নির্ব্বোধের প্রমাদের ভয় নাই। পাঠক মনে করিবেন না যে, আমাদের নবীন বাঙ্গালাব্যাকরণ-লেখককে নির্ব্বোধ বলিতেছি, কিন্তু কথাগুলা ও কাজগুলা অনেকটা সেই রকমের। [illegible]র শুক্লতা, আম্রের মাধুর্য্য ইত্যাদি স্থলে সমাস হইবে কিনা, সে বিষয়ে যে, কত গোল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যগণ এ বিষয়ে যে কত বিচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া যাইতে পারেন নাই, আমাদের লেখক মহাশয় সে সকল কথা জ্ঞাত থাকিলে অনর্থক দুই জন বাঙ্গালাব্যাকরণ-লেখকের নিন্দা করিতেন না। পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের সমস্ত বিচার এখানে বাঙ্গালায় লিখিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিতে বড়ই দুরূহ হইবে। সে কারণ পাণিনির সূত্র, কাত্যায়নের বার্ত্তিক এবং পতঞ্জলি ও কৈয়টের মত সংক্ষেপে বাঙ্গালায় লিখিয়া দিতেছি। নিম্নে টীকায় তাঁহাদের বিচার যথাবৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ দেখিবেন।

পূরণগুণসুহিতার্থসদব্যয়তব্যসমানাধিকরণেন। পা ২। ২। ১১।

পূরণ, গুণ, সুহিতার্থ অর্থাৎ তৃপ্ত্যর্থ, সৎ, অব্যয়, তব্য এবং সমানাধিকরণের সঙ্গে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস হয় না।

উপরে পটস্য শুক্লঃ, ইত্যাদি লইয়া যে প্রশ্ন উঠিয়াছে এই সূত্রে তাহা "গুণ"। অর্থাৎ গুণের সঙ্গে ষষ্ঠীসমাস হয় না। বামন জয়াদিত্য ইহার উদাহরণ দিয়াছেন,—যথা, বলাকায়াঃ শৌক্ল্যম্, কাকস্য কার্ষ্ণ্যম্। এখানে বলাকাশৌক্ল্যম্, কাককার্ষ্ণ্যম্ এ প্রকার ষষ্ঠীসমাস হইবে না।

সূত্রে বলা হইয়াছে যে, গুণের সঙ্গে ষষ্ঠী-সমাস হইবে না। কিন্তু কি (১) প্রকার গুণের সঙ্গে ষষ্ঠীসমাস হইবে না? কাত্যায়ন বলেন, যে গুণ কোন বস্তুতে আছে এবং যাহা অন্য গুণের বিশেষণ নয়, তাহার সঙ্গে ষষ্ঠীসমাস হইবে। যেমন, চন্দনের গন্ধ, চন্দনগন্ধ এই প্রকার সমাস হইবে। কিন্তু যদ্যপি বলা যায়, চন্দনের মৃদু, তাহা হইলে চন্দনমৃদু এ প্রকার ষষ্ঠীসমাস হইবে না [illegible]হইবে না? পতঞ্জলি বলেন,—যে স্থলে অন্য [illegible]দের অপেক্ষা থাকিবে, সে স্থলে সমাস হইবে না। চন্দনের মৃদু, এমন কথা বলিলে চন্দনের গন্ধ মৃদু এইরূপ গন্ধ শব্দের অপেক্ষা থাকিতেছে। ব্রাহ্মণের শুক্ল, শূদ্রের কৃষ্ণ এ প্রকার বলিলে দন্ত শব্দের অপেক্ষা থাকিতেছে। যেখানে কোন গুণবাচী শব্দে অন্য শব্দের অপেক্ষা থাকিবে, সেখানে সমাস হইবে না। কোন কোন আচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—যাহা কোন বস্তুর সারভূত গুণ, তাহার সঙ্গেই সমাস হইবে, অন্যত্র হইবে না।

(১) তৎস্থৈশ্চ গুণৈঃ। তৎস্থৈশ্চ গুণৈঃ ষষ্ঠী সমস্যত ইতি বক্তব্যম্। ব্রাহ্মণবর্ণঃ, চন্দনগন্ধঃ, পটহশব্দঃ, নদীঘোষঃ। নতু তদ্বিশেষণৈঃ। তদ্বিশেষণৈরিতি বক্তব্যম্। ইহ মাভূৎ,—ঘৃতস্য তীব্রো গন্ধঃ। চন্দনস্য মৃদুরিতি কিমর্থমিদমুচ্যতে গুণেন নেতি প্রতিষেধং বক্ষ্যতি, তস্যায়ং পুরস্তাদপকর্ষঃ। কিমর্থং পুনর্গুণেন নেত্যুচ্যতে ন পুনর্গুণবচনেন নেত্যুচ্যেত। নৈবং শক্যমিহ হি ন স্যাৎ। কাকস্য কার্ষ্ণ্যং, বলাকায়াঃ শৌক্ল্যমিতি। এতদেব তর্হ্যপি তস্মিন্ যোগে উদাহরণম্। যত্তেদং ব্রাহ্মণস্য শুক্লাঃ, বৃষলস্য কৃষ্ণা ইতি। অসামর্থ্যাদত্র ন ভবিষ্যতি। কথমসামর্থ্যম্? সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীতি। দ্রব্যমত্রাপেক্ষ্যতে দন্তাঃ। তস্মাদ্‌গুণেন নেতি বক্তব্যম্। গুণেন নেত্যুচ্যমানে তৎস্থৈশ্চ গুণৈরিতি বক্তব্যম্। তৎস্থৈশ্চ গুণৈরিতি উচ্যমানে নতু তদ্বিশেষণৈরিতি বক্তব্যম্।

গুণে কিমুদাহরণম্? ব্রাহ্মণস্য শুক্লাঃ, বৃষলস্য কৃষ্ণা ইতি। নৈতদস্তি প্রয়োজনম্। অসামর্থ্যাদত্র ন ভবিষ্যতি। কথমসামর্থ্যম্? সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীতি। দ্রব্যমত্রাপেক্ষ্যতে দন্তাঃ। ইদং তর্হি, কাকস্য কার্ষ্ণ্যং, কণ্টকস্য তৈক্ষ্ণ্যং, বলাকায়াঃ শৌক্ল্যমিতি। ইদং চাপ্যুদাহরণং, ব্রাহ্মণস্য শুক্লাঃ, বৃষলস্য কৃষ্ণা ইতি। ননু চোক্তমসামর্থ্যাদত্র ন ভবিষ্যতি। কথমসামর্থ্যম্? সাপেক্ষমসমর্থং ভবতীতি; দ্রব্যমত্রাপেক্ষ্যতে দন্তা ইতি। নৈষ দোষঃ। ভবতি বৈ কস্যচিদর্থাৎ প্রকরণাদ্বাহপেক্ষ্যং নির্জ্ঞাতং তদা বৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। (পতঞ্জলি।

তাহার পর কৈয়ট লিখিতেছেন,—

তৎস্থৈরিতি। যচ্ছব্দেন সন্নিধানাদ্ গুণএব পরামৃশ্যতে। তেনায়মর্থঃ। স্বাত্মনি যে গুণাঃ অবস্থিতাস্তৈঃ

কিন্তু এ কথাতেও গোল থাকিতেছে। কেননা, দুগ্ধের শৌক্ল্য দুগ্ধে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, অথচ দুগ্ধশৌক্ল্য এ প্রকার সমাস-বিধান নিষিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন,—বৈয়ধিকরণিক গুণের সঙ্গে সমাস হইবে, কিন্তু সামানাধিকরণিক গুণের সঙ্গে সমাস হইবে না। গন্ধ চন্দনের বৈয়ধিকরণিক গুণ, সে কারণ চন্দনের সঙ্গে গন্ধ শব্দের সমাস হইবে। কিন্তু মৃদু সামানাধিকারণিক গুণ, তজ্জন্য মৃদু শব্দের সঙ্গে সমাস হইবে না। মৃদু চন্দন এ প্রকার বলা যায়। অন্য অন্য আচার্য্যের মত এই,—ভাব-প্রত্যয়ের সঙ্গে সমাস হইতে পারে, এবং পাণিনির সূত্রে যে গুণ শব্দ লিখিত হইয়াছে, তাহা বিশেষণাদি গুণ। কিন্তু এরূপ মীমাংসাতেও গোল মিটিতেছে না। তাই ভট্টোজি দীক্ষিত লিখিয়াছেন,—তদশিষ্য, সংজ্ঞাপ্রমাণত্ব, অর্থগৌরব, বুদ্ধিমান্দ্য ইত্যাদি প্রয়োগ রহিয়াছে; অতএব গুণের সঙ্গে ষষ্ঠীসমাস হইবে না, এ নিষেধ-বাক্য অনিত্য। (অনিত্যোঽয়ং গুণেন নিষেধঃ তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাদিতি নির্দ্দেশাৎ। তেনার্থগৌরবং বুদ্ধিমান্দ্যমিত্যাদি সিদ্ধম্)। পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী যে সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও টীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—গুণের সঙ্গে কোথায় সমাস হইবে এবং কোথায় সমাস হইবে না, তাহা শিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়া

সহ সমাসে, ন চ স্বাশ্রয়বহানং গুণানাং সম্ভবতি; ভেদনিবন্ধনত্বাদাধ্যাধারাধেয়ভাবস্য। সর্ব্বস্য চ গুণস্য দ্রব্যাশ্রয়ত্বাৎ। তস্মাদভিধানব্যাপারাপেক্ষয়া তৎস্থত্বমুচ্যতে। ইহ কেচিদ্ গুণাঃ শব্দেন দ্রব্যান্নিষ্কৃষ্টা এব প্রত্যায্যন্তে, নতু দ্রব্যস্যোপরঞ্জকত্বেন। যথা চন্দনস্য গন্ধ ইতি। সর্ব্বদা বৈয়ধিকরণ্যমেব গুণগুণিনোঃ, ন কদাচিচ্চন্দনগন্ধ ইতি সামানাধিকরণ্যং ভবতি। শুক্লাদয়স্তু গুণাঃ কদাচিন্নিষ্কৃষ্টরূপাঃ শব্দৈরুচ্যন্তে, পটস্য শুক্ল ইতি; কদাচিদ্ দ্রব্যেণৈকত্বমাপন্নাঃ, শুক্লপট ইতি। তস্মাদ্ দ্বিবিধগুণসম্ভাবাৎ তৎস্থৈরিতি বিশেষণং, রূপাদিগুণপরিগ্রহার্থমুপাত্তমিতি ব্রাহ্মণবর্ণাদয় উদাহরণম্।

অথ বলাকায়াঃ শৌক্ল্যমিতি সমাসঃ কস্মান্ন ভবতি? তৎস্থং হি শৌক্ল্যম্? সর্ব্বদা বৈয়ধিকরণ্যেন সম্বন্ধাৎ। নৈষ দোষঃ। শৌক্ল্যশব্দেন শুক্লগুণোঽভিধীয়তে, শুক্লশব্দস্য দ্রব্যে বর্ত্তমানস্য তস্মিন্নেব প্রবৃত্তিনিমিত্তে ভাবপ্রত্যয়বিধানাৎ। ন চাসৌ তৎস্থঃ। অভেদাধ্যবসায়েন দ্রব্যং প্রত্যুপরঞ্জকত্বদর্শনাচ্ছুক্লঃ পট ইতি। অর্থস্য চ তৎস্থত্বমাশ্রীয়ত ইতি শব্দভেদেঽপ্যর্থস্যাভেদান্নাস্তি শুক্লস্য গুণস্য তৎস্থত্বম্। রূপবান্ পট ইত্যাদৌ তু নাস্তি গুণগুণিনোরভেদাধ্যবসায়ঃ। ভেদাশ্রয়েণৈব মত্বর্থীয়প্রয়োগাদিতি রূপস্য তৎস্থত্বমব্যাবৃত্তমিতি পটরূপমিতি সমাসো ভবত্যেব।

নতু তদ্বিশেষণৈরিতি। তচ্ছব্দেন গুণাঃ পরামৃশ্যন্তে। তেষাং গুণানাং যানি বিশেষণানি তদ্বচনৈঃ সহ সমাসো ন ভবতীত্যর্থঃ। ঘৃতস্য তীব্র ইতি। তীব্রো গন্ধস্য বিশেষণম্। চন্দনস্য মৃদুরিতি, স্পর্শস্য মৃদুত্বং বিশেষণম্। নমু ঘৃতস্য গন্ধেন সম্বন্ধো নতু তদ্গতেন তীব্রেণ বিশেষণেনেতি সামর্থ্যাভাবাৎ সমাসস্য প্রাপ্তিরেব নাস্তি। তৎ কিং প্রতিষেধেন? এবং তর্হি যদা প্রকরণাদিবশাৎ তীব্রশব্দ এব বিশিষ্টগন্ধবৃত্তিস্তদা তদর্থোপজনিত এব ব্যতিরেকো ঘৃতস্যেতি ষষ্ঠীতি সমাসপ্রসঙ্গঃ। যশ্চ গন্ধবিশেষবচনস্তীব্রশব্দস্তস্য দ্রব্যবাচিনা সামানাধিকরণ্যাভাবাদ্গন্ধশব্দস্যেব তৎস্থগুণাভিধায়িত্বাৎ সমাসপ্রসঙ্গে প্রতিষেধ উচ্যতে। নমু চ তীব্রং ঘৃতং মৃদু চন্দনমিতি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ তৎস্থত্বাভাবাৎ সমাসপ্রসঙ্গাৎ তৎপ্রতিষেধোঽনর্থকঃ। এবং তর্হি সৌত্রস্য প্রতিষেধস্য বিষয়কথনমিদং, নতু তদ্বিশেষণৈরিতি। তৎস্থত্বাভাবাৎ তৈঃ সমাসঃ প্রতিষিধ্যত এবেত্যর্থঃ। ন পুনরিতি। তত্র গুণোপসর্জ্জনদ্রব্যবাচিনা সমাসো নিষিধ্যতে। কেবলগুণবাচিনা রূপাদিশব্দেন সমাসো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। এতদেবেতি। কেবল-গুণবাচ্যেবেত্যর্থঃ। দ্রব্যমত্রেতি। ততশ্চ দণ্ডাপেক্ষয়া ব্রাহ্মণস্যেতি ষষ্ঠীতি শুক্লার্থেন সম্বন্ধাভাবাৎ সমাসস্য প্রসঙ্গাভাবাদনার্থঃ প্রতিষেধেন।

.... মুনিত্রয়বচনাজ্জ্ঞাপকাদুত্তরপদার্থপ্রাধান্যমিত্যাদেশ্চ মুনিপ্রয়োগাদস্য প্রতিষেধস্যানিত্যত্বাদ্ ঘতুগৌরবাদিশব্দসিদ্ধিঃ। গুণে কিমিতি? বক্ষ্যমাণোঽভিপ্রায়ঃ। ভবতীতি। যদা প্রকরণাদিবশাদ্ দণ্ডাদ্যর্থ এবাবসিতবৃত্তিঃ শুক্লাদিশব্দস্তদা তদর্থোপজনিত এব ব্রাহ্মণাদৌ ব্যতিরেক ইতি সামর্থ্যসম্ভাবাৎ সমাসপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। নমু গুণস্য গুণাপেক্ষত্বাদ্ গুণিন এব সমাসনিষেধেন ভাব্যং, নচ ব্রাহ্মণঃ শুক্লগুণাধারঃ। নৈষ দোষঃ। গুণশব্দেন কেবলগুণবাচিনো গুণোপসর্জ্জনদ্রব্যবাচিনশ্চ ব্যাপ্তিন্যায়াশ্রয়েন গৃহ্যন্ত ইতি গুণিনো গুণাধারসম্বন্ধিনশ্চোপপন্নঃ সমাসপ্রতিষেধঃ।

অনুসরণ করিতে হইবে। (বাহুল্যাং বুদ্ধিনৈপুণ্যং, বুদ্ধিবৈশদ্যং পুরুষধামাস্তং, অঙ্গমার্দ্দবং, শব্দলাঘবং, করণপাটবম্, অর্থগৌরবং, উদাহরণভূয়স্ত্বং, গগনমলিনিমা, শঙ্খপাণ্ডুতা, বদনসৌরভং, শিলাশ্যামলতা, দন্তচ্ছদাহরুণিমা, অন্যদপি.শিষ্টব্যবহারতোঽনুসরণীয়ম্)। কৈয়ট লিখিয়াছেন,—গুণের সঙ্গে সমাস হয় না, এই নিষেধ-বাক্য অনিত্য। (মুনিত্রয় ইত্যাদি)।

অতএব পাঠক দেখুন, এস্থলে কত গোল। আমাদের বাঙ্গালাব্যাকরণ-লেখক মুগ্ধবোধের টীকা দেখিয়া অনায়াসে লিখিয়া দিয়াছেন যে, পটুশৌক্ল্য, জলশৈত্য, আম্রমাধুর্য্য ইত্যাদি সমাস হয়। কিন্তু যে সকল আপত্তি লিখিয়া দিলাম, তদ্দ্বারা বরং প্রমাণ করা যাইবে যে, ঐরূপ সমাস হয় না।

এখন বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে এই কথা বলি, যাহা সুশ্রাব্য হইবে, সেইরূপ পদ প্রয়োগ করিবে। যেখানে শুনিতে ভাল লাগিবে, সে স্থলে সমাস করিবে; যেখানে ভাল লাগিবে না, শ্রুতিকটু হইবে, তেমন স্থলে সমাস করিবে না।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ১২২পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—

"পূরণবাচক, জাতিবাচক, অঙ্গবাচক, সংজ্ঞাবাচক এবং অকভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গশব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। যথা,—দ্বিতীয়াভার্য্য, ব্রাহ্মণীভার্য্য, সুকেশাভার্য্য, কমলিনীভার্য্য, রসিকাভার্য্য, পাচিকাভার্য্য, বামোরুভার্য্য ইত্যাদি।"

এই সূত্রেও অনেক ভুল রহিয়াছে "অঙ্গবাচক"—অর্থাৎ অঙ্গবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,—"সুকেশাভার্য্য।"

এখানে এই প্রকার লক্ষণ করিতে হইবে,—স্বাঙ্গবাচক ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গশব্দ এবং তাহার পর যদি মানিন্ শব্দ না থাকে।

(স্বাঙ্গাচ্চেতোঽমানিনি। পা ৬।৩।৪০।)

এ প্রকার না লিখিলে লক্ষণ অসম্পূর্ণ ও ভ্রমযুক্ত হয়। কারণ, ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেরই পুংবদ্ভাব হইবে না, কিন্তু আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হইবে। যথা,—সুকেশা ভার্য্যাস্য সুকেশভার্য্যঃ; অকেশা ভার্য্যাস্য অকেশভার্য্যঃ। এখানে সুকেশা, অকেশা এগুলি স্বাঙ্গবাচক আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, ইহাদের পুংবদ্ভাব হইয়াছে।

আবার,—পরে যদি মানিন্ শব্দ না থাকে,—একথাও বলা চাই। কারণ স্বাঙ্গবাচক ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গশব্দ হইলেও তাহার পর যদি মানিন্ শব্দ থাকে, তবে পুংবদ্ভাব হইবে। যথা,—সুকেশমানিনী। দীর্ঘমুখমানিনী।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার কৌমুদী ব্যাকরণে এস্থলে অসম্পূর্ণ সূত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা,—

ন জাতিস্বাঙ্গয়োঃ।

জাতিবাচক ও স্বাঙ্গবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না।

বোধ করি, আমাদের নবীন বৈয়াকরণ-ব্যাঘ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সূত্র দেখিয়া নিজেও ভুল করিয়া বসিয়াছেন।

"অকভাগান্ত"—অর্থাৎ অকভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,—"রসিকাভার্য্য," "পাচিকাভার্য্য"।

পাচিকা শব্দ পাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব এখানে অকভাগান্ত বলিলে লক্ষণের সঙ্গে ঠিক খাটিতেছে; কিন্তু রসিকা শব্দ রসিক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, রসক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নহে। তবে এখানে অকভাগান্ত বলিলে চলে কৈ? রসিক শব্দ ইকভাগান্ত হইতেছে। অতএব এখানে এইরূপ সূত্র করা চাই,—

যে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উপধাতে তদ্ধিতের অথবা অক-প্রত্যয়ের ককার থাকে, তাহার পুংবদ্ভাব হয় না।

(ন কোপধায়াঃ। পা ৬।৩।৩৭।

কোপধপ্রতিষেধে তদ্ধিতবুগ্রহণম্। ইতি কাত্যায়ন-বার্ত্তিক।

কোপধপ্রতিষেধে তদ্ধিতস্য যঃ ককারো বোশ্চ যঃ, তস্য গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ইতি মহাভাষ্য।)

লেখক, উদাহরণের শেষে লিখিয়াছেন,—"বামোরুভার্য্য।" এখানে এই উদাহরণটী দেওয়া হইয়াছে কেন? লেখক যদি সীতান্বেষণের মত কিছুকাল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তথাপি "বামোরুভার্য্য"—এই উদাহরণের কারণ, তাঁহার সঙ্কলিত সূত্রের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিবেন না। সূত্রে লেখা উচিত ছিল,—'উকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।' অর্থাৎ উকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। যথা,—বামোরুভার্য্য।

(স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিতপুংস্কাদনূঙ্ সমানাধিকরণে স্ত্রিয়ামপুরণীপ্রিয়াদিষু। পা ৬।৩।৩৪। অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকিলে ভাষিত-পুংস্ক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। কিন্তু উত্তর-পদে (দীর্ঘ) উকারান্ত ভাষিত-পুংস্ক শব্দ, সমানাধিকরণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ও পরে পুরণবাচক ও প্রিয়াদিগণ-প্রভৃত শব্দ থাকিলে হয় না)।

আর এক কথা আছে,—লেখক, "বামোরু-ভার্য্যে"—এখানে (হ্রস্ব) উকার করিয়াছেন কেন? সমাসে ত (হ্রস্ব) উকার হইবেই না, আবার স্ত্রীপ্রত্যয় বিধান করিলেও (হ্রস্ব) উকার হয় না। ব্যাকরণে ব্যবস্থা আছে,—

সংহিত-শফ-লক্ষণ-বামাদেশ্চ। পা ৪।১।৭০।

সংহিত, শফ, লক্ষণ, বাম প্রভৃতি শব্দের পরে উরু শব্দ থাকিলে উপমা না বুঝাইলেও স্ত্রীলিঙ্গে উকার হইবে। যথা,—বামোরূ।

যাহা হউক, বেশ যোগ্য ব্যক্তিটী কিন্তু ছেলেদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যা-বৃহস্পতিরা আর দুই এক খানা পুস্তক লিখিলে বিদ্যালয়ের বালকেরা কলম ফেলিয়া পাঁচন ধরিবে, আর মাঠে মাঠে ঠায় ঠায় করিয়া বেড়াইবে।

লোক-হিতৈষী লেখক মহাশয় জন-সাধারণের উপকারার্থ ব্যাকরণের প্রারম্ভেই সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,—"এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে। ইহার কোন অংশ মাত্রও কেহ পুস্তকান্তরে উদ্ধৃত করিলে আমি উল্লিখিত আইন অনুসারে তাহার নামে অভি-যোগ উপস্থিত করিব।"

পোড়া কপাল আর কি! যে ব্যাকরণের পাতায় পাতায় কেবলি ভুলের ছড়াছড়ি, কোন্ গ্রন্থকারের অদৃষ্টে এমন আগুন লাগিয়াছে যে, তিনি নিজের পুস্তকে ঐ সকল ভুল-রাশি তুলি-বেন আর সাধে সাধে সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্কের কালি মাখিবেন!

আজ এই পর্য্যন্ত থাক। বারান্তরে বাঙ্গালা ব্যাকরণের গোটাকতক পদ এবং ভীষ্মচরিতের ব্যাখ্যা-পুস্তক খানা পড়িয়া দেখিতে হইবে।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

পুনশ্চ।—অনেক কথা লেখা হইয়াছে, অনেক কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই পুনশ্চ বলিয়া আবার নূতন পাঠ ধরিতে হইল। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের পণ্ডিত মশাইয়ের নিজের ছেলেপিলে আছে তো? যদি থাকে তাহাদিগকে এই ব্যাকরণ খানা পড়িতে দেন কি না? এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ আছে। অনেক চিকিৎসক পরের ছেলের চিকিৎসা করেন, কিন্তু নিজের ছেলেদের নাড়ী ধরেন না; বলেন, মন ঠিক থাকে না। নিশ্চিত বোধ হইতেছে, ব্যাকরণ খানাও ঠিক থাকিবে না এই আশঙ্কায় পণ্ডিত মশাই উহা নিজের ছেলেদিগকে পড়িতে দেন না।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

ন্যায়-দর্শন।

(৫)

বায়ু।

দ্রব্য-গণনায় চতুর্থ। বায়ুর লক্ষণ একটী বা দুইটী মুক্তাবলীকারের অভিপ্রেত।

বায়ুর এক লক্ষণ,—অপাকজানুষ্ণাশীতস্পর্শ-বত্ত্ব, অপর লক্ষণ,—তির্য্যগ্ গমনবত্ত্ব।

১। বায়ুতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই। বায়ুতে স্পর্শ আছে। স্পর্শও ত এক প্রকার নহে,—বহু প্রকার। কঠিন-স্পর্শ, কোমল-স্পর্শ, বাষ্প-স্পর্শ, উষ্ণ-স্পর্শ, শীত-স্পর্শ,—স্থূলতঃ স্পর্শের এই পঞ্চবিধ ভেদ করা যাইতে পারে। কঠিন, কোমল এবং বাষ্প-স্পর্শ পরস্পর-বিরুদ্ধ; উষ্ণ-স্পর্শ এবং শীত-স্পর্শও পরস্পর-বিরুদ্ধ। তন্মধ্যে বায়ুতে কোন্ স্পর্শ বর্ত্তমান?—অপাকজ-অনুষ্ণ-অশীতস্পর্শ বায়ুতে আছে। এই বায়ব-স্পর্শেরই স্থূল সংজ্ঞা দিয়াছি,—বাষ্পস্পর্শ।

বিখ্যাত গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—

"স্পর্শঃ—

অনুষ্ণাশীতশীতোষ্ণ-ভেদাৎ স ত্রিবিধো মতঃ।

কাঠিন্যাদিঃ ক্ষিতাবের————————।"

স্পর্শ ত্রিবিধ;—(১) অনুষ্ণাশীত (২) শীতল এবং (৩) উষ্ণ। কঠিন কোমল স্পর্শ পৃথিবীতেই বর্ত্তমান। এ কারিকার ভাব এই যে, "কঠিন

কোমল স্পর্শও অনুষ্ণাশীত-স্পর্শের অন্তর্গত। পৃথিবীতে যে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ আছে, তাহারই নামান্তর কঠিন-স্পর্শ বা কোমল-স্পর্শ। আর অপর প্রকার অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ বায়ুতে আছে।" আমরা এই অনুষ্ণাশীত-স্পর্শের স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ না করিয়া, তৎস্থলে, কঠিন-স্পর্শ, কোমল-স্পর্শ এবং বাষ্প-স্পর্শ—এই তিন প্রকার স্পর্শের উল্লেখ করিয়াছি। বায়ুর অনুষ্ণাশীত-স্পর্শই আমাদের কথিত 'বাষ্প-স্পর্শ।'

এই বাষ্প-স্পর্শ বা অপাকজ-অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ, বায়ুতে আছে। 'অপাকজানুষ্ণাশীতস্পর্শবান্' বলিলে বায়ুকেই বুঝা যায়। অতএব 'অপাকজানুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ত্ব' বায়ুর লক্ষণ।

২। তির্য্যগ্‌গমন, বায়ুতে আছে। তির্য্যগ্‌-গমন-অর্থে বক্রগতি। বায়ুতে সরল গতি নাই,—ঊর্দ্ধগতি নাই,—অধোগতি নাই; বায়ুর বক্রগতি। তাই 'তির্য্যগ্‌গমনবান্' বলিলে বায়ুকে বুঝা যায়। বায়ুর লক্ষণ হইল,—'তির্য্যগ্‌গমনবত্ত্ব'। প্রাচীন মতানুসারে কোন কোন পণ্ডিত বলেন,—বায়ুর অপর লক্ষণ—'স্পর্শাদ্যনুমেয়ত্ব'। স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা যাহার অনুমান করা যায়, তাহাই স্পর্শাদ্যনুমেয়; স্পর্শাদ্যনুমেয় বলিলে বায়ুকে বুঝায়। অতএব 'স্পর্শাদ্যনুমেয়ত্ব' বায়ুর লক্ষণ।

১ম লক্ষণের কথা।

"অপাকজ-অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবত্ত্ব" এই লক্ষণে, অপাকজ-অনুষ্ণাশীত পদ অতিব্যাপ্তি-বারণার্থ। অর্থাৎ বায়ুর লক্ষণ যদি কেবল 'স্পর্শবত্ত্ব' হইত, তাহা হইলে পৃথিবী, জল এবং তেজেও সে লক্ষণ যাইত। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু—এই চারি দ্রব্যেরই স্পর্শ আছে। ইহারা সকলেই স্পর্শবান্। 'স্পর্শবত্ত্ব' শুধু বায়ুর লক্ষণ হইতে পারে না। যাহা স্পর্শবান্, তাহাই বায়ু;—একথা বলিলে মহাভুল হয়। সেই ভুলটুকুরই নাম,—অতিব্যাপ্তি। 'অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবত্ত্ব' বায়ুর লক্ষণ হইলে, দোষ কি? দোষ,—অতিব্যাপ্তি। জলে এবং তেজে অতিব্যাপ্তি নাই বটে, পৃথিবীতে অতিব্যাপ্তি। জলে শীতল-স্পর্শ, তেজে উষ্ণ-স্পর্শ; সুতরাং অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবান্ বলিলে, জলকে বা তেজকে বুঝায় না বটে, কিন্তু পৃথিবীকে বুঝাইতে পারে। পৃথিবীতেও ত অনুষ্ণাশীত স্পর্শ আছে। যাহা অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবান্, তাহাই বায়ু;—একথা বলিলে বিশেষ ভুল হয়। পৃথিবীও তাহা হইলে বায়ু-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল 'অপাকজ-স্পর্শবত্ত্ব' বায়ুর লক্ষণ,—একথা বলিলে, জলে এবং তেজে অতিব্যাপ্তি। পাকজ-স্পর্শ কেবল পৃথিবীতে আছে। জলে ও তেজে যে স্পর্শ আছে, তাহাও অপাকজ। সুতরাং যাহা অপাকজ-স্পর্শবান্, তাহাই বায়ু;—একথা বলিলেও খুব ভুল হয়। এই সকল কারণে 'অপাকজানুষ্ণাশীত-স্পর্শবত্ত্ব'ই বায়ুর লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

আপত্তি। স্রোতস্বতীর তরঙ্গালিঙ্গিত সমীরণের শীত-স্পর্শ অনেকেই অনুভব করিয়াছে। বর্ষায় জলদ-তলসঞ্চারী পবনের শীতলতা সকলেই উপভোগ করিয়াছে। শীতের উত্তর-দিক্‌-প্রবাহিত প্রভঞ্জনের তুষার-স্পর্শে গাত্র কণ্টকিত, শরীর সঙ্কুচিত সকলেরই হয়। তবু বলিবে,—প্রত্যক্ষ অপহ্নব করিয়াও বলিবে,—বায়ুতে শীত-স্পর্শ নাই? নিদাঘ-মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বিশুষ্ক বায়ুর কথা কি ভুলিয়া যাইব? মরুভূমির অনল-কণাবর্ষী পান্থদাহনদক্ষ প্রভঞ্জনের ভীম বিক্রম কি গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিব? নতুবা কেমন করিয়া মানি, বায়ুতে উষ্ণ-স্পর্শ নাই? কেমন করিয়া স্বীকার করি, বায়ুর শীত-স্পর্শ নাই, উষ্ণ-স্পর্শ নাই; বায়ু অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শবান্?

উত্তর। বায়ুতে যে শীতোষ্ণস্পর্শ অনুভূত হয়, তাহা বায়ুর স্পর্শ নহে; পবনাহৃত, পবনবেগে ভ্রমণশীল পদার্থান্তরের স্পর্শ। শীতল জল-বিন্দু, সুশীতল হিম-বিন্দু, সমীরণ সঙ্গে মিলিত হইয়া সমীরণের শৈত্য সম্পাদন করে। আবার তেজোমিশ্রিত উত্তপ্ত সিকতা-কণা, বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া উষ্ণতা অনুভব করায়।

আপত্তি। উৎপত্তি-কালে দ্রব্যে গুণ ক্রিয়া থাকে না, ইহা নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত; উৎপত্তি-কালীন বায়ুতে সুতরাং স্পর্শও থাকে না। অতএব "অপাকজ-অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ত্ব" বায়ুর বলিলে, সে লক্ষণ, উৎপত্তি-কালীন বায়ুতে খাটে না। অতএব উৎপত্তি-কালীন বায়ুতে অব্যাপ্তি। উক্ত-লক্ষণাক্রান্ত বস্তুর মধ্যে আমরা উৎপত্তি-কালীন বায়ুকে দেখিতে পাই না।

উত্তর। "অপাকজ-অনুষ্ণাশীতস্পর্শবদ্‌বৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্বই হইল,—প্রথম লক্ষণের নিষ্কর্ষ।

লক্ষণের অর্থ ;—দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি শব্দে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব, বায়ুত্ব প্রভৃতি। তন্মধ্যে কেবল বায়ুত্বই অপাকজ-অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ-বদ্‌বৃত্তি। অপাকজ-অনুষ্ণাশীত স্পর্শ, বায়ু ভিন্ন আর কিছুতেই থাকে না, সুতরাং এক বায়ুই "অপাকজ-অনুষ্ণাশীত স্পর্শবান্ ; তাহাতে বর্ত্তমান দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য জাতি কে ? পৃথিবীত্ব নহে, জলত্ব নহে, তেজস্ত্ব নহে ;—তবে কে ?—বায়ুত্ব। বায়ুত্ব সকল বায়ুতেই আছে, উৎপত্তি-কালীন বায়ুতেও আছে। এ লক্ষণে আর অব্যাপ্তি নাই। আবার বলি,—অপাকজ-অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবদ্ (বায়ু) বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতি (বায়ুত্ব) মত্ত্ব সকল বায়ুতেই আছে।

ইহার উপর আপত্তি ;—এই লক্ষণ পৃথিবীতেও খাটিল ; পৃথিবীও বায়ু-লক্ষণাক্রান্ত হউক। সমুদয় পার্থিব পদার্থে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ আছে, তাহা ত তুমি স্বীকারই কর। আবার বস্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি পার্থিব-পদার্থে পাকজ-স্পর্শ নাই, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তবেই হইল,—অপাকজ-অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বস্ত্রাদিতে বর্ত্তমান, অপাকজ-অনুষ্ণাশীতস্পর্শবৎ হইল,—বস্ত্রাদি ; তাহাতে বর্ত্তমান দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি হইল,—পৃথিবীত্ব ; পৃথিবীত্ব সকল পৃথিবীতেই আছে। এইরূপে পৃথিবীতে বায়ু-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল।

উত্তর। ভাল আপত্তি করিয়াছ। এইরূপে এ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় বটে ; সেই জন্ম আর একটী বিশেষণ-বৃদ্ধির প্রয়োজন। দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতিটী কিরূপ হইবে ? না,—'পাকজ-স্পর্শবদবৃত্তি' যে দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি, পাকজ-স্পর্শ-বিশিষ্ট দ্রব্যে না থাকে, তাহাকেই বায়ু-লক্ষণে প্রবিষ্ট করিব। সমুদায় লক্ষণ করিব এই,—"পাকজ-স্পর্শবদ-বৃত্তি-অপাকজানুষ্ণাশীতস্পর্শবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব।"পৃথিবীত্ব জাতি,—পাকজ-স্পর্শ-বিশিষ্ট দ্রব্যে অবৃত্তি নহে,—বৃত্তি। দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতির মধ্যে এক বায়ুত্বই পাকজ-স্পর্শবদবৃত্তি এবং অপাকজ-অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবদ্‌বৃত্তি। তাহা বায়ু ভিন্ন আর কিছুতে নাই, অথচ সকল বায়ুতে আছে। এ লক্ষণে আর অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। এক্ষণে একটা কথা বলা আবশ্যক,—বায়ু-লক্ষণের মধ্যে 'অপাকজ' পদটী আর দিতে হইবে না। "পাকজস্পর্শবদবৃত্তি-অনুষ্ণাশীতস্পর্শবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্ব ব্যাপ্য-জাতিমত্ত্বই" বায়ুর নির্দ্দোষ লক্ষণ। 'অপাকজ' পদ না থাকিলে, মাত্র পৃথিবীতে অতিব্যাপ্তি হয়—ইহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে ; কিন্তু তখন 'পাকজস্পর্শবদবৃত্তি' এ বিশেষণটী ছিল না। এ বিশেষণ থাকিলে আর দোষ নাই। পৃথিবীত্ব, অনুষ্ণাশীতস্পর্শবদ্‌বৃত্তি হইলেও পাকজ-স্পর্শ-বিশিষ্টে অবৃত্তি নহে। পাকজস্পর্শ-বিশিষ্ট হইল,—ঘটাদি ; পৃথিবীত্ব ত তাহাতে বর্ত্তমান।

এই সকল কথা একটু নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে, দর্শন-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিশেষে সূক্ষ্মদৃষ্টি নিপতিত হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণের কথা।

আপত্তি। তির্য্যগ্‌গমনবত্ত্ব বায়ুর লক্ষণ হইল কিরূপে ? পক্ষী, সর্প—প্রভৃতিরও তির্য্যগ্‌গতি,—মানুষেরও তির্য্যগ্‌গতি আছে। পৃথিবী-জলাদির তির্য্যগ্‌গতি থাকিতে পারে। যাহা তির্য্যগ্‌গমনবান্, তাহাই বায়ু ;—এরূপ লক্ষণ করিলে অর্থাৎ তির্য্যগ্‌গমনবত্ত্ব বায়ুর লক্ষণ করিলে, পৃথিবী-প্রভৃতিও বায়ু-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে, সুতরাং এরূপ লক্ষণ যে বিলক্ষণ বায়ুর লক্ষণ তাহা বেশ বুঝা যায়।

উত্তর। "তির্য্যগ্‌গমনেতরগমনাভাববত্ত্বই হইল ;—বায়ু-লক্ষণ। পৃথিব্যাদিতে তির্য্যগ্‌গমন থাকিলেও তির্য্যগ্‌গমন ভিন্ন অপর প্রকার গমনও ত আছে। সুতরাং তির্য্যগ্‌গমনেতর-গমনের অভাব থাকিতে, পৃথিব্যাদিতে নাই,—বায়ুতে আছে। এ লক্ষণে আর পূর্ব্বদোষ নাই।

উত্তরে আপত্তি। পূর্ব্বদোষ না থাকিলেও এ লক্ষণে অন্য দোষ হইল। আত্মা, আকাশ প্রভৃতি বিভু (ব্যাপক) পদার্থে ক্রিয়া নাই, সুতরাং কোন প্রকার গমনই নাই। তির্য্যগ্‌গমনও নাই, তির্য্যগ্‌গমন ভিন্ন অপর প্রকার গমনও নাই। অতএব তির্য্যগ্‌গমনেতরগমনাভাববত্ত্ব, আত্মা আকাশাদিতে থাকিল। বায়ুর লক্ষণ, অপর পদার্থে সমন্বিত হওয়াতে, উক্ত বায়ু-লক্ষণে পুনরায় অতিব্যাপ্তি হইল।

প্রত্যুত্তর। 'তির্য্যগ্‌গমনেতর গমনাভাববত্ত্বে সতি গমনবত্ত্ব'ই হইল,—বায়ুর লক্ষণ। সমুদায় লক্ষণের বিশেষণাংশ, আত্মা আকাশাদিতে সমন্বিত হইলেও, বিশেষ্যাংশের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। ক্রিয়ারহিত বিভু-পদার্থে গমনবত্ত্ব

থাকিতে পারে না। পৃথিব্যাদিতে বিশেষ্যাংশ থাকিলেও বিশেষণাংশ নাই,—গমনবত্ত্ব থাকিলেও "তির্য্যগ্‌গমনেতর-গমনাভাববত্ত্ব" নাই। অতএব এ লক্ষণটী ত নির্দ্দোষ হইতে পারে।

প্রত্যুত্তরে আপত্তি। এমন কোন একটী পার্থিব-পদার্থ থাকিতে পারে বা করা যাইতে পারে, যাহাতে কেবল তির্য্যগ্‌গমনই আছে,—অন্য গমন হয় নাই; হইবার পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছে। তাদৃশ পার্থিবাদি-পদার্থে বায়ু-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল। এবং উৎপত্তি-কালীন বায়ুতে গুণ নাই, ক্রিয়া নাই; অতএব উৎপত্তি-কালীন বায়ুতে কথিত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল,—উক্ত লক্ষণ দ্বারা ত উৎপত্তি-কালীন বায়ু বোধগম্য হয় না।

চরম উত্তর। বায়ুর নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ হইল,—তির্য্যগ্‌গমনেতরগমনবদ্‌বৃত্তি-ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি দ্রব্য-বিভাজক-জাতিমত্ত্ব।"

লক্ষণের অর্থ;—দ্রব্য-বিভাজক ধর্ম্ম পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব, আত্মত্ব প্রভৃতি। কিন্তু ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি দ্রব্যবিভাজক ধর্ম্ম আত্মত্ব নহে; পৃথিবীত্ব, জলত্ব, বায়ুত্বাদি। কিন্তু তির্য্যগ্‌গমনেতর-গমনবদ্‌বৃত্তি অথচ ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি দ্রব্য-বিভাজক জাতি, বায়ুত্ব ভিন্ন আর কেহই নহে। পৃথিবীত্ব জলত্বাদিও নহে। পৃথিবীত্ব, সকল পৃথিবীতেই বর্ত্তমান, জলত্ব সকল জলেই বর্ত্তমান; তির্য্যগ্‌-গমনেতর-গমন কোন না কোন পৃথিবীতে, কোন না কোন জলাদিতে আছেই। অতএব 'তির্য্যগ্‌-গমনেতরগমনবৎ' হইতে, পৃথিবীও হইল, জলও হইল। তাহাতে অবৃত্তি জাতি,—পৃথিবীত্ব, জলত্ব নহে। তেজস্ত্ব প্রভৃতিও কেহ নহে। কোন বায়ুতেই তির্য্যগ্‌গমনেতর-গমন নাই। অতএব 'তির্য্যগ্‌গমনেতরগমনবদ্‌বৃত্তি' দ্রব্য-বিভাজক ধর্ম্ম হইল,—কেবল বায়ুত্ব। বায়ুতে যে ক্রিয়া আছে, বায়ু যে ক্রিয়াবান্‌, বায়ুত্ব যে তাহাতে বৃত্তি—এ সব কথা বলাই বাহুল্য। উক্ত দ্রব্য-বিভাজক-ধর্ম্মবত্ত্ব সকল বায়ুতেই রহিল,-উৎপত্তিকালীন বায়ুতেও রহিল; বায়ুত্ব কোন বায়ুতে না থাকিবে? এদিকে বায়ুত্ব কোন পার্থিবাদি পদার্থে ত থাকিবেই না। এই লক্ষণ হইল,—চরম; ইহাতে আর দোষ নাই।

'দ্রব্য-বিভাজক ধর্ম্ম' অর্থে যে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দ্রব্য বিভাগ করা হইয়াছে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ইত্যাদি নাম করিয়া পৃথিবীত্বাদি ধর্ম্মপুরস্কারে দ্রব্যের নবধা বিভাগ হইয়াছে; দ্রব্যবিভাজক ধর্ম্ম হইল,—পৃথিবীত্ব, জলত্ব, বায়ুত্বাদি। তত্তৎপৃথিবীত্ব, তদ্বায়ুত্ব, তদ্ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম, দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য বটে; কিন্তু দ্রব্য-বিভাজক নহে। বায়ু-লক্ষণে যদি 'দ্রব্য-বিভাজক ধর্ম্ম' প্রবেশ না করিয়া দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্য ধর্ম্ম প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে, সেই পার্থিব-পদার্থে—যাহাতে তির্য্যগ্‌গমন ভিন্ন আর কোন গমন হয় নাই, তাহাতে—অতিব্যাপ্তি থাকিয়া যায় তির্য্যগ্‌গমনেতর-গমনবদ্‌বৃত্তি-ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য-ধর্ম্মবত্ত্ব অর্থাৎ তদ্ব্যক্তিত্ববত্ত্ব সেই পার্থিব-পদার্থেও থাকে।

অথবা দ্রব্য-বিভাজক-ধর্ম্মবত্ত্ব না বলিয়া দ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব বলিলেও হয়; তদ্ব্যক্তিত্ব, তৎপৃথিবীত্ব, জাতি নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

বায়ুতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯টী গুণ আছে। যথা;—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগ বা বেগাখ্য সংস্কার। এতন্মধ্যে স্পর্শই কেবল বিশেষগুণ। বিশেষগুণ আছে বলিয়াই বায়ু একটী 'ভূত' পঞ্চভূতের অন্তর্গত।

পঞ্চবিধ কর্ম্মই বায়ুতে আছে।

বায়ু দ্বিবিধ;—নিত্য এবং অনিত্য। বায়বীয় পরমাণু নিত্য বায়ু; অপর সমুদয় বায়ুই অনিত্য। দ্যাবাপৃথিবী-পরিব্যাপক বায়ু, এই বায়বীয় পরমাণু হইতেই উৎপন্ন। স্থূল বায়ুর সমস্ত গুণই বায়বীয় পরমাণুতে বর্ত্তমান। ক্রিয়াও পরমাণুতে আছে। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা কিছুতেই আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

অনিত্য পৃথিব্যাদির ন্যায় অনিত্য বায়ুও তিন প্রকারে বিভক্ত;—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। বায়বীয় দেহ অযোনিজ; প্রেত-পিশাচাদির বায়বীয় দেহ। ত্বগিন্দ্রিয়ই বায়বীয় ইন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করা যায়, তাহাই ত্বগিন্দ্রিয় বা স্পর্শনেন্দ্রিয়। ত্বক্‌ সর্ব্বশরীর-ব্যাপী। ত্বক এবং চর্ম্ম দুইটী বিভিন্ন বস্তু। চর্ম্ম দেখা যায়, ত্বক্‌ অতীন্দ্রিয়। বিষয়,—যাহা দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ বায়ু, তাহাই বিষয়াত্মক বায়ু। উনপঞ্চাশৎ প্রকার বায়ু শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

প্রাণ অপান প্রভৃতি শরীরস্থ বায়ুও বিষয়াত্মক বায়ুর অন্তর্গত।

ন্যায়দর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যে অনিত্য বায়ুকে চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে ;— দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং প্রাণাদি শরীরস্থ বায়ু। নব্য-মতে ত্রিবিধ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

আমার জীবন-চরিত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ মনোমত বৃক্ষ সহজে খুঁজিয়া পাইলাম না। যে বৃক্ষটীর নিকটে যাই, সেইটীই ছোট বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল। আমার প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গাছে উঠিয়া রাত্রি কাটাইব, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশত উপযুক্ত গাছও মিলিতেছে না। এক্ষণে যে যে গাছ নির্ব্বাচন করিতেছি, তাহা পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত বৃক্ষ অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম,—"কাজ ভাল হয় নাই,—প্রথম নির্ব্বাচিত বৃক্ষটীতে উঠিলে ভাল হইত।" কিন্তু এখন আর চিন্তার সময় নাই, যুক্তিরও সময় নাই। কেননা, বেগবতী নদীর ন্যায় আঁধার-তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া মহারণ্যকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। এদিকে আমি পথভ্রান্ত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম,—এ সকল কিছুই জ্ঞান নাই। কেমন করিয়া আমি এক্ষণে সেই পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত বৃহৎ বৃক্ষটীর নিকট যাইব? কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইতেছি, কোথায় যাইব,—এ সকলেরও কিছুই ঠিক নাই। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখিলাম,— তাহাতেই উঠিলাম। বৃক্ষটী দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও, ডালপালা-বিশিষ্ট। ডাল খুব শক্ত,— পুরাতন বৃক্ষ বলিয়া বোধ হইল। সেই গাছের মধ্যভাগে উঠিবামাত্র একটী বৃহদাকার সর্প সন্‌সন্‌ শব্দে দ্রুতবেগে গাছ হইতে ডাল বাহিয়া, গুঁড়ি বহিয়া, নীচে নামিয়া গেল। দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির। ভাবিলাম,— "এ আবার কি? নূতন বিভীষিকা দেখিতেছি! বুঝি মহামায়ার এই এক নূতন লীলা!" অন্ধকারে বোধ হইল, সাপের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নাতি-স্থূল, নাতিক্ষীণ। তেজস্বী। এ সাপ বিষাক্ত কিনা, তাহা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু তৎকালে আমার "বিষাক্ত" বলিয়াই কতকটা ধারণা জন্মিল।

সাপ দেখিয়াই হৃদয়ে কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সাপ পলাইলেও সে আতঙ্ক দূর হইল না। বুক তবু ধুক্‌ধুক্‌ করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল,—"গাছে বুঝি আরও সাপ আছে। আমি নীরব হইয়া বসিলে, অথবা তন্দ্রাভাব আসিলে, সাপ আসিয়া যদি দংশন করে, অথবা জড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে ত গিয়াছি!" একবার মনে করিলাম,— "অদূরবর্ত্তী ঐ বৃক্ষটীতে যাই।" আবার ভাবিলাম,—"উহাতেও যদি সাপ থাকে,—তখন উপায়?" এখন ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ভয় দূর হইয়া আমার সর্পভয় উপস্থিত হইল। গাছের পাতা নড়ে, আর আমার মনে হয়,—ঐ সাপ আসিতেছে। বায়ুভরে গাছ একটু দোলে, মনে হয়,—ঐ সাপ। আমি চারিদিকেই যেন সাপ দেখিতে লাগিলাম। একপ্রকার অনাহারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হৃদয়ের বলও কেমন কম হইয়া আসিয়াছিল। গাছে আরও সাপ আছে কিনা জানিবার জন্য আমি দাঁড়াইয়া একটী বড় ডাল ধরিয়া গাছ-নাড়া দিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে যে একগাছি লাঠী ছিল, কখন বা তাহা লইয়া গাছ ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিলাম। আবার মনে হইল,—"এইরূপ গাছ-নাড়ানাড়িতে সাপ আমার গায়ে আসিয়া পড়িতে পারে।" তৎক্ষণাৎ অমনি গাছ-নাড়া বা গাছ ঠেঙ্গান বন্ধ করিলাম। আমার কেমন মতিভ্রম জন্মিয়াছিল। কি করিব, কি উপায় অবলম্বন করিলে রক্ষা পাইব, ইহার কিছুই স্থির ছিল না। মন কেমন হুহু করিতেছিল। দেহ অবসন্ন। সেদিনকার কথা আজও মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়।

কি করি! নীরবে গাছেই বসিলাম। মনকে বুঝাইলাম,—"এ বিপদে এত ব্যাকুল হইলে চলিবে না। ধৈর্য্য ধর। উপায় ত কিছুই নাই,— এই স্থানেই রাত কাটাইতে হইবে। সর্পেই

দংশন করুক, বা ব্যাঘ্রেই ভক্ষণ করুক, এই বৃক্ষে বসিয়াই নিশা যাপন করিতে হইবে,—কেননা, আমি আজ নিরুপায়।

"অথবা ভয় কি? ভগবান্ রক্ষা করিলে মারে কে? লোহার বাসর-ঘরে থাকিয়াও নখিন্দর রক্ষা পায় নাই। জতুগৃহে বাস করিয়াও পঞ্চ-পাণ্ডব রক্ষা পাইয়াছিল। আদ্যাশক্তি মহামায়া ভগবতী যাঁহার জননী, দেবাদিদেব মহাযোগেশ্বর মহাদেব যাঁহার জনক,—সেই স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণপতির গজমুণ্ড কেন হইল? কপালং কপালং কপালং মূলম্। দৈব দুরতিক্রম্য। তা; আমি কোন্ ছার?—আমি কোন্ কীটাধম?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে কেমন বল-সঞ্চয় হইল! কেমন অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল! আমার ললাট-লিপিতে জীবিত থাকা যদি লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ সংসারে এমন কে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আছে যে, আমাকে হনন করিতে সমর্থ? অদ্য যদি মরণই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলেই বা রক্ষা করিবে কে? জীবন-মৃত্যু বিষয়ে ভাবনা ভাল নয়,—উচিতও নয়; যাহা এই আছে, এই নাই,—যাহা জল-বুদ্বুদের সঙ্গে তুলনীয়,—যাহা পদ্মপত্রে শিশিরের সঙ্গে তুলনীয়,—যাহা বালুকাভূমিতে পদ-চিহ্নের সহিত তুলনীয়,—অবোধ ব্যক্তিই তাহার জন্য ভাবনা করিয়া থাকে। মৃত্যুতে কিছুই আশ্চর্য্য-ভাব নাই,—বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্য্য। আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় বৃক্ষ-শাখায় আপনাকে বন্ধন করিয়া বসিলাম। নিদ্রা আসিল না। আকাশ পানে চাহিয়া সুর-সংযোগে সেই ত্রিলোকতারিণী, পতিতপাবনী মায়ের নাম করিতে লাগিলাম। মায়ের মধুর নামের গুণে, শোক-তাপ-ভয়-ক্লেশ সমস্তই যেন বিদূরিত হইল। শুধু তাহাই নহে, হৃদয়ে কেমন আহ্লাদ এবং উল্লাসভাবের উদয় হইল। রাত্রি এক প্রহরের অধিককাল পর্য্যন্ত এইরূপে কাল অতিবাহিত করিলাম। ক্রমে শীতানুভব হইতে লাগিল। এই জঙ্গল, নাইনিতালের উপত্যকা-প্রদেশে অবস্থিত। কাজেই শীতে ক্রমশ জড়সড় হইয়া উঠিলাম। অঙ্গে বস্ত্র নাই। একমাত্র বস্ত্রকে দ্বিখণ্ড করিয়া, তাহারই অর্দ্ধখণ্ড পরিয়া আছি;—বাকি অর্দ্ধখণ্ডে আপনাকে গাছের সহিত দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছি। কোমর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেহটা একেবারে উলঙ্গ। আমি তখন অনন্যোপায় হইয়া, উলঙ্গ হইলাম;—পরিধানের বস্ত্রটুকু লইয়া গায়ে দিলাম। কিন্তু শীত তাহাতে বিশেষ কিছুই নিবারণ হইল না;—কেবল উলঙ্গ হওয়াই সার হইল।

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল। অদ্য নিদ্রা বা তন্দ্রা নাই। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল দিবসে নিদ্রা গিয়াছিলাম,—বোধ হয়, সেইজন্যই রাত্রে নিদ্রায় অভিভূত করিয়া তুলিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে মহারণ্যের কেহ শব্দ শুনিয়াছেন কি? এ শব্দ বড়ই মধুর, মনোহর, মনোমোহকর। কাণ পাতিয়া শুনিলে, ঠিক মনে হয় যেন দূরে ঘুঙ্গুর পায়ে দিয়া সুর-সুন্দরীরা নৃত্য করিতেছে,—আর সেই সঙ্গে তালে তালে স্বর্গবাদ্য বাজিতেছে। ঝম্ ঝম্ ঝিম্—দুম্-দুম্-দ-দ-দুম্—ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুম্—ধিন-ধিন্-তা-তা-ধিন্! কিবা গভীর শ্রুতিসুখ-কর ধ্বনি! অবর্ণনীয়, অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি! কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিলাম;—ইহাতে পাঠকগণ যাহা হয় বুঝিবেন।

শেষরাত্রে চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। এক একবার ঢলিয়া পড়ি, আর চমকিয়া উঠি। ছোট গাছ; পড়িয়া ভূতলশায়ী হইলেও মরিবার আশঙ্কা ত ছিল না। অথচ সাহস করিয়া ঘুমাইতেও সক্ষম হইলাম না। ঘুমাইবার স্থানটী বেশ!! গাছের ডালে বসিয়া ঘুম! অতি চমৎকার বন্দোবস্ত!

অদ্য ব্যাঘ্র-ভল্লুকের গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাই নাই। কোন হিংস্র জন্তুকে অন্যের প্রতি ধাবিত হইতেও দেখি নাই। এ স্থান ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হীন বলিয়া হরিণদল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে।

রাত্রি যত শেষ হইতে লাগিল, শীতে ততই থর-থর কাঁপিতে লাগিলাম। নিদ্রা-তন্দ্রা দূরে পলাইল। শীতের তাড়নায় বৃক্ষ হইতে নামিয়া, সেই দুই খণ্ড বস্ত্রই গায়ে দিয়া বৃক্ষ-তলদেশে এদিক-ওদিক দ্রুতপদে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তাহাতে শীত যেন কিছু কমিল বলিয়া বোধ হইল। তখন কখন্ প্রভাত হয়,—ইহাই আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছি, এক এক মুহূর্ত্ত এক এক প্রহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে আকাশ রাঙ্গা রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। আমি শীত ভুলিয়া গেলাম। ক্ষুধার্ত্ত-ব্যক্তি, সম্মুখে অন্ন পাইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, আমি সেইরূপ আহ্লাদিত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। বনের অন্ধকার দূর হইল। আমি তখন কাপড় পরিলাম; দ্বিতীয় খণ্ড কাপড় গায়ে দিলাম। অরণ্যে দিগম্বর হইয়া চলিলেও কোন ক্ষতি ছিল না;—কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। শীত সত্বেও আমি গাত্র হইতে একখণ্ড কাপড় খুলিয়া লজ্জা নিবারণ করিলাম। কিন্তু লজ্জা কাহাকে?

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এ বৃক্ষটীতেও স্বনাম অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু লেখা ভাল ফুটিল না। অন্য বৃক্ষের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া চিহ্নের স্বরূপ সেই বৃক্ষের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিলাম। সেই আশ্রয়দাতা বৃক্ষকে প্রকৃতই প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলাম।

কিন্তু কোন্ দিকে যাই, কোথা যাই, কোথা গেলে পথ পাই,—এই চিন্তাই অহরহ মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। সূর্য্যদেবকে দেখিয়া যাত্রার পূর্ব্বে মনে আনন্দ জন্মিয়াছিল; কিন্তু যাত্রার পর সে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ক্রমশ বিদূরিত হইল। ভাবনা হইল,—"আজও যদি পথ না পাই, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? আমাকে কি অনন্ত কাল গাছের উপর বসিয়া রাত্রি কাটাইতে হইবে? আমাকে কি অনন্ত কাল অনাহারে এইরূপ প্রত্যহ দিবাভাগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে?" মনে কেমন ধিক্কার জন্মিল।

আবার হৃদয় বিচলিত হইল। আবার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। মনে মনে স্থির করিলাম,—"আর দুই একদিন দেখিব,—যদি পথ একান্তই না পাই, যদি লোকালয়ে পৌঁছিতে না পারি,—তাহা হইলে আত্মহত্যা করিয়া এ কষ্টময় জীবনের অবসান করিব।" এক একবার মনে হইতে লাগিল,—"দুই একদিন অপেক্ষা করিবারই বা আবশ্যকতা কি আছে? অদ্য বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে যদি লোকালয়ে যাইতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে, এ জীবন আর রাখিব না। এই উত্তরীয় খণ্ড বৃক্ষডালে বাঁধিয়া, গলায় ফাঁসি দিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিব।"

দুষ্ট সরস্বতী আমার ঘাড়ে চাপিয়াছিল,—তাই তখন এই মহাপাপ-কার্য্যের দিকে আমার মন প্রবণ হইয়াছিল।

আমি হাল্ ছাড়িয়া দিলাম। যেদিকে দু'চোখ যায়, সেই দিকেই যাইতে লাগিলাম। কখন উচ্চে পাহাড়ের উপর উঠিতেছি, কখন বা তাহা হইতে নামিতেছি; আবার উচ্চে উঠিতেছি, আবার নামিতেছি। সে স্থানের ভূমি ঠিক যেন ঢেউ খেলাইয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় একপ্রহর হইল। সুবিধার মধ্যে এই হইল যে, শীত কমিল। সূর্য্যদেবের উত্তাপ এবং আমার ভ্রমণ-জনিত পরিশ্রম,—এ উভয়ে একত্র হইয়া, ক্রমশ শীতকে বিদূরিত করত, আমার মুখমণ্ডলে বিন্দুবিন্দু ঘর্ম্ম, মুক্তাফলের ন্যায় অঙ্কিত করিয়া দিল।

ক্লান্তি বোধ হইল। জঠরানলও জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পিপাসাও পাইয়াছে। কিন্তু অদ্য সেই সুমিষ্ট লতামূলও নাই, পর্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীও নাই, শয়নার্থ সেই কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ প্রস্তরখণ্ডও নাই।

জলের ভাবনা ছিল না। কারণ, এ পর্ব্বতীয় জঙ্গলে ঝরণা অসংখ্য। একটু অন্বেষণ করিলেই ঝরণা পাওয়া যাইবে। কিন্তু ক্ষুধা-নিবৃত্তির উপায় কি? বৃক্ষপানে চাহিয়া দেখিলাম, কোন রকম ফল আছে কি না? কোন কোন গাছ ফলে বিভূষিত দেখিলাম; কিন্তু তাহা খাদ্য, কি অখাদ্য, সুস্বাদু কি কটুকষায়, বিষাক্ত কি মধুময়,—তাহা কেমন করিয়া ঠিক করিব? কোন কোন ফল আম্রফলের ন্যায়,—পাকিয়া লাল হইয়া রহিয়াছে। দেখিলেই, খাইবার জন্য লোভ জন্মে। কিন্তু কোন পক্ষীতেই সে ফল খাইতেছে না দেখিয়া, আমার মনে সন্দেহ জন্মিল,—বুঝি উহা বিষফল। কোনও বৃক্ষে গোছা-গোছা সুপারির ন্যায় ফল ধরিয়া আছে,—কিন্তু তাহা সবুজবর্ণ,—কাঁচা বলিয়া বোধ হইল। কোন ফলের আকৃতি খর্জ্জুরের ন্যায়। কোন ফল আমড়ার মত। কোন ফল চালুদার সহিত তুলনীয়। ফলও অনেক, ফুলও অনেক। কিন্তু একটী ফলও ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। যখন বিদ্রোহী অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক বন্দী

হইয়া হলদোয়ানি যাই,—মধ্যপথে প্রাপ্ত সেদিনকার সেই ঝাল মূলার কথা আমার এখনও মনে আছে। তাই ভাবিলাম,—এ ফল খাইয়া প্রাণে যদিও একান্তই না মরি;—যদি সেই ঝাল মূলার দশা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে মরণের অধিক হইবে। অতএব কিছুতেই এ ফল খাওয়া হইবে না।

আর বিলম্ব না করিয়া তথা হইতে উঠিলাম। জল এবং আহারীয় সামগ্রী অন্বেষণে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর গিয়াই ঝরণা মিলিল। শূন্য উদরে প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বাগ্রে জলপান করিলাম। তার পর, চাহিয়া দেখি, ঝরণার পাশে কুলগাছের বন। পাকা পাকা, বড় বড়, গোল গোল কুল, বৃক্ষসমূহকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। বন্য পক্ষিকুলও সেই কুল ঠুক্‌রাইয়া ঠুক্‌রাইয়া খাইতেছে। তলায়ও অনেক কুল পড়িয়া আছে। হৃদয়ে বড়ই আনন্দ জন্মিল। ঝরণার জলে স্নান করিলাম। কুলতলায় গেলাম। তলার কুল কুড়াইলাম না। অগ্রে বৃক্ষ হইতে একটী কুল পাড়িলাম। কুল হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ আরণ্য-কুল যদি তিক্ত হয়, তখন উপায়? পক্ষিগণের নিকট তিক্ত ফলও সুস্বাদু হইয়া থাকে। যাহা হউক, অগ্রে কুলের আঘ্রাণ লইলাম। আঘ্রাণে কুল সুমিষ্ট হইবে বলিয়াই বোধ হইল। তখন "জয় দুর্গা" বলিয়া কুল মুখে দিলাম। বলিব কি,—সে কুল তখন অমৃত অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বোধ হইল। ঈষৎ অম্ল-রসও আছে, অথচ ঘোর মিষ্ট। দুইটী, চারিটী, দশটী, ক্রমশ বিংশতিটী কুল উদরস্থ হইল। দেহ যুড়াইল। ঝরণায় গিয়া জলপান করিয়া আসিলাম। পথের সম্বল স্বরূপ কতকগুলি অর্দ্ধ-পক্ব ও কতকগুলি সুপক্ব কুল কাপড়ে বাঁধিয়া লইলাম।

কুল খাইয়া কুলতলায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় খানিক বিশ্রাম লইলাম। কিন্তু পাছে ঘোরঘুমে অভিভূত হই, এই ভয়ে অদ্য আর পূর্ণমাত্রায় শয়ন করিলাম না। বেলা যখন প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তখন উঠিয়া, যেদিকে দু-চোখ যায়, আবার সেই দিকে যাত্রা করিলাম।

কিছুদূর গিয়া, সমতল ভূমিতে পড়িলাম। ভূমি কিন্তু প্রস্তরময়। দেখিলাম, বড় বড় নীল গাভী বিচরণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহ; স্বচ্ছন্দ-হৃদয়ে প্রচুর তৃণশষ্প খাইয়া গাভীগণ ঐরাবত-জাতীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া বেগে এক দিকে দৌড়িয়া পলাইল।

আর এক স্থানে দেখিলাম, ময়ূরের পাল। পাঁচশত ময়ূরের কম হইবে না। এক একটী বৃক্ষে দশ পনরটী ময়ূর বসিয়া আছে। ভূমিতলেও বহু ময়ূর ভ্রমণ করিতেছে। এরূপ বৃহদাকার ময়ূর আমি আর কখনও দেখি নাই। কোন ময়ূর পুচ্ছ বিস্তৃত করিয়া আছে। মনে হইতে লাগিল যেন, শারদীয় প্রতিমার মেড়্। কোন কোন ময়ূরের দেহে এতই বল, মনে হইল যে, ঠোঁটে করিয়া সে অনায়াসে মানুষ উড়াইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম। এই ময়ূরগণ যদি আমাকে ঠুক্‌রাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে এই খানেই প্রাণে মরিব। মনে করিলাম, 'আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না,—ময়ূরেই মারিয়া ফেলুক্।' কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত নিমেষমধ্যে ময়ূর-দল আমাকে দেখিয়া একদিকে চলিয়া গেল। বোধ হয়, মানুষ তাহারা এই প্রথম দেখিল।

আমি এক মনে চলিয়াছি,—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ আর এখানে নাই; বৃক্ষাবলী দূরে দূরে অবস্থিত। আমার মনে আশার সঞ্চার হইল, এইবার বুঝি জঙ্গল ছাড়াইলাম। ক্রমে আরও ফাঁক্ ফাঁক্ ঠেকিতে লাগিল। পঁচিশ ত্রিশ হাত অন্তর এক একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ। আমি এই স্থানটী দ্রুতপদে, এক রকম দৌড়িয়াই, অতিক্রম করিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ বেগে গমন করিয়া দেখি, সম্মুখে আর রাস্তা নাই। সেই মহারণ্য মধ্যে এক বহুবিস্তৃত বিপরীত গর্ত্ত। সেই গর্ত্ত দ্বারা সেই অরণ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেইগর্ত্ত প্রস্থে অর্দ্ধ মাইলেরও কম হইবে; কিন্তু লম্বা যে কত, তাহা কেমন করিয়া বলিব। এ-ধার ও-ধার নজর হয় না। ইহাকে পর্ব্বতীয় 'খাত' বলে। এই গর্ত্ত এত গভীর যে, নীচে নজর হয় না। পাঁচ সাত হাজার ফীট গম্ভীর হইতে পারে। সেই খাতের ধারে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন টানিয়া লইয়া নীচে ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। সেই অতলস্পর্শ খাতে একবার পড়িলে আর 'মা' বলিতে হয় না।

খাত দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির! আমি

যেন স্পন্দহীন জড়-পদার্থের ন্যায় হইলাম। মুখে আর কথা নাই, কেবল নয়নজলে বুক ভাসিতে লাগিল। হে মহামায়ে! ইহা কি সত্য সত্যই পার্ব্বতীয় খাত, না, তোমার মায়া? মা! আর বেলা নাই, শীঘ্রই সন্ধ্যাদেবী সমাগতা হইবেন, আমাকে পথ দেখাইয়া দিয়া রক্ষা কর মা!

এই স্থানে বসিয়া আমি বালকের ন্যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শেষে কেমন ক্ষিপ্তবৎ হইলাম। চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কখন বা এক বৃহৎ বৃক্ষকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকেই জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—"হে বৃক্ষ! তুমি অতি প্রাচীন এবং বিজ্ঞ, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে লোকালয় পৌঁছিবার পথ দেখাইয়া দাও।" কখন বা এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম,—"তুমি অজর অমর,—তুমি সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এইখানেই বাস করিতেছ; তুমি সর্ব্বজ্ঞ; কিছুই তোমার অগোচর নাই; এই আশ্রয়হীন, অনাথ, অধমের প্রতি দয়া করিয়া মনুষ্য-সমাজে গমন করিবার পথ বলিয়া দাও।" ক্রমে সন্ধ্যা হইবার যতই সময় হইতে লাগিল, আমার প্রাণ ততই আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাণটা তখন যে, কিরূপ আইঢাই ছটফট্ করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার যো নাই। "হে বনদেবতে! হে বনদেবতে! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর"—বলিয়া কতবার যে তখন ডাকিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিলেন না, কেহই উত্তর দিলেন না।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার প্রাক্কাল উপস্থিত হইল। আমি নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"হে আকাশ! আর একটু অপেক্ষা কর;—আঁধার-সাগরে এ অরণ্য এত শীঘ্র ডুবাইও না। হে করুণাময় আকাশ! কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর, আমি আর একবার পথ খুঁজিয়া লই। যদি পথ না পাই, তবে লম্ফ দিয়া এই খাতে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

আকাশ আমার কথা শুনিল না। রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া, অরণ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। আমি খাতের অদূরে বসিয়া পড়িলাম; পথান্বেষণের আর কোন চেষ্টা বা উদ্যম করিলাম না।

আর না,—আর সহ্য হয় না,—এই সন্ধ্যা-কালে, মায়ের নাম করিয়া, খাতে পড়িয়াই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। বৃক্ষে বসিয়া, শীতে কাতর হইয়া, অনিদ্রিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতে আর সক্ষম নহি। আর পারি না,—দেহ আর বয় না,—মনও আর সরে না। এ সময় মৃত্যুই মঙ্গলজনক। সর্ব্ব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করিবার মৃত্যুই এখন একমাত্র উপায়। মৃত্যুই এখন সুহৃদ; মৃত্যুই এখন মা-বাপ; মৃত্যুই এখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু। তবে মরি।

উঠিলাম। খাতের ধারে গেলাম। সেই গভীর গর্ত্তের দিকে নয়ন নিবিষ্ট করিলাম। তবে পড়ি! শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব কি? এই পড়িলাম।

এই মুহূর্ত্তে কে যেন আমাকে কাণে কাণে বলিয়া দিল,—"আজ থাক্,—আরও দুই এক দিন অপেক্ষা কর। শুধু শুধু এ তরুণ বয়সে জননী-সহধর্ম্মিণী-ভ্রাতা থাকিতে তুমি হঠাৎ মরিতে যাইবে কেন? ভাবনা কি? ভয় কি? পথ অবশ্যই পাইবে। বিশেষত আত্মহত্যা মহাপাপ।"

আমার চমক্ ভাঙ্গিল। এইবার আমার ক্ষিপ্তভাব দূর হইল। আমি খাতের ধার হইতে দৌড়িয়া আসিলাম। ভাবিলাম,—"ছি! ছি! করিতেছিলাম কি? আমার বাহ্যজ্ঞান কি একেবারেই লোপ পাইয়াছিল? কাপুরুষেই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। আজ পথ নাই বা পাইলাম; কাল বিশেষ স্থির-বুদ্ধিতে তন্ন তন্ন করিয়া পথ অন্বেষণ করিলে, অবশ্যই সুপথ পাইব। ভয় কি?"

মনকে দৃঢ় করিলাম। রাত্রি-যাপনের জন্য একটী বৃক্ষ খুঁজিয়া লইলাম। সর্পভীতি দূর করিবার জন্য গাছের ডাল ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিলাম। শেষে লাঠির দ্বারা গাছ ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অদ্য আর সাপ বাহির হইল না। আমি গাছে উঠিয়া স্বচ্ছন্দ মনে বসিলাম। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আমার দেহকে শাখার সহিত বাঁধিলাম। শেষে গান আরম্ভ করিলাম। কাপড়ে কুল বাঁধা ছিল; ক্ষুধা বোধ হওয়ায়, সেই ডাসা কুলগুলি আগে খাইতে

লাগিলাম। সুপক্ব কুল অপেক্ষা এই অর্দ্ধ পক্ব কুল আরও সুমধুর বোধ হইতে লাগিল। গান গাই, আর কুল খাই; আর মাঝে মাঝে গাছের ডাল চাপড়াইয়া তাল রাখি। বড়ই আনন্দ উৎসবে নিশা অতিবাহিত হইতে লাগিল।

তিন দিন কাল গাছে ঘুমাইতেছি। ক্রমে একটু অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শেষ রাত্রে গাছের ডালে বসিয়াই বেশ এক ঘুম হইয়া গেল। পাখীর কলরবে ও শীতের আবেগে ঘুম ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি,—প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যদেব ঈষৎ উদিত হইয়া পৃথিবীকে হাস্যময় করিয়াছেন। আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া পথান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অরণ্যে অদ্য আমার চতুর্থ দিন। অদ্য কেমন একটু উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে,—সাহসও অধিক হইয়াছে। সূর্য্যের উদয় দেখিয়া, আমি মনে মনে এক রকম দিক নির্ণয় করিয়া লইলাম। খাতের ধার ছাড়িয়া আপন নির্ণীত-দিকে চলিতে লাগিলাম। এক ঘণ্টা কাল এইরূপে গমন করিয়া দূরে এক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত দেখিলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিয়া মনে হইল,—মাথায় কাপড়ের পাগড়ী বাঁধা কয়েকজন মানুষ নদীর ধারে বসিয়া আছে। মানুষ দেখিয়া আহ্লাদে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল,—"ইহারা যদি ডাকাত হয়, তবে ত আমার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। ডাকাইত অথবা আর যে-ই হউক, ইহারা মানুষ ত বটে। আজ মানুষের মুখ দেখিলেই আমার স্বর্গ। দস্যু হইলেই বা হঠাৎ আমাকে প্রাণে মারিবে কেন? আমার কাছে আছে কি যে, ইহারা লইবে।"

আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই, মহোল্লাসে মানুষের দিকে দৌড়িলাম। কিন্তু কাছে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর বলিবার নহে। আট দশটা বড় বড় শকুনি কেবল নদীর ধারে বসিয়া আছে। দেখিয়াই ত আমি গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। হরি! হরি! একি? শেষে শকুনি হইল!! একটা জানোয়ার মরিয়া পচিয়া আছে; শকুনিগুলা তাহার মাংস খাইতেছে, আর মনের সুখে পা-পা বেড়াইতেছে। আমি আর কথাটী না কহিয়া তথা হইতে উঠিলাম। কিন্তু মানুষের পরিবর্ত্তে শকুনি দেখিয়া এবার মন তত দমিল না। বরং হাসি আসিল। ক্রমশ মন কেমন কঠিন হইয়া আসিয়াছিল।

বেলা এখনও এক প্রহর হয় নাই। শীত-শীত ভাব এখনও অল্প আছে। তথাচ নদীতে অবগাহন করিতে ইচ্ছা হইল। নদীতে নামিলাম। কিন্তু নদীর জল বড় ঠাণ্ডা বলিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, নদী হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

আবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে একটী অতি বিস্তৃত প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। প্রান্তরের এ-ধার ও-ধার নজর হয় না। এ মাঠে গাছ আছে বটে, কিন্তু খুব কম। ভূমি প্রস্তরময় নহে। বেশ চাষ-বাস হইবার উপযুক্ত। মাঠ দেখিয়া মনে কিছু আশার উদয় হইল। স্থির করিলাম, আশা আর করিব না; যতবার আশা করিয়াছি, ততবারই ঠকিয়াছি, এই প্রান্তর দিয়া যাই,—দেখি, পরিণাম-ফল কি হয়! যাইতে যাইতে আভাসে বোধ হইল, দূরে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা। নানারূপ শস্যে প্রান্তর পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। আশা দ্বিগুণ বাড়িল। এক একবার মনে হইতে লাগিল, এ কি মায়া-মরীচিকা? আমার চোখের দোষ জন্মিয়া থাকিবে। যাহা হউক, দ্রুতপদে সেই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের দিকে গমন করিতে লাগিলাম। খানিক দূর গিয়া মনে হইল, এক বৃদ্ধা একস্থানে দাঁড়াইয়া, কুলার দ্বারা, শস্যের জঞ্জাল উড়াইয়া, শস্য পৃথক্ করিতেছে। মানুষ দেখিয়াও, মানুষ বলিয়া বিশ্বাস হইল না। ভাবিলাম, বৃদ্ধা যে শকুনি হইবে না, তাহা কে বলিল? শকুনি না হউক, শৃগালও ত হইতে পারে।

যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই বৃদ্ধাকে মানুষ বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। কিন্তু মন কেমন কু, তখনও এক একবার বৃদ্ধাকে 'মানুষ নয়' বলিয়া সন্দেহ হইতে লাগিল।

যখন পাঁচ সাত রশী পথ ব্যবধান আছে, তখন বৃদ্ধার দিকে প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। দৌড়িয়া গিয়া, উন্মত্তের ন্যায় 'মা

আমাকে বাঁচাও' বলিয়া একেবারে বৃদ্ধার পদপ্রান্তে পতিত হইলাম। আমি যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া রহিলাম। বৃদ্ধা চমকিত হইয়া আমার গায়ে হাত দিয়া উঠাইল। সত্য সত্যই এ কি মানুষের হাত আমার অঙ্গে ঠেকিল! আমি উঠিয়া বসিয়া যোড়হাতে বৃদ্ধাকে বলিলাম, "মায়ি! হম্ ব্রাহ্মণ হ্যায়। চার্ রোজসে রাস্তা ভুলে হুয়ে। আজ তোমকো দেখা, নহিত কই আদ্‌মি নজর নেহি পড়া " আমি ব্রাহ্মণ শুনিয়া বৃদ্ধা আমাকে প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় দিল। বৃদ্ধা কহিল "বেটা থোড়া বৈঠো, হম্ থোড়া আনাজ আউর উড়ালে তো তুম্‌কো ঘর লে চলে।" বৃদ্ধা শীঘ্র হস্তে খোষা-ভুষি উড়াইতে লাগিল। আমি তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধার বয়স ৭৫ বৎসরেরও অধিক হইবে; অথচ তাহার দেহ দৃঢ় আছে; পরিশ্রম করিতে বেশ পটু।

আমি সেখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে পর, সেই বর্ষীয়সী আমাকে সঙ্গে করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেল। মাঠ হইতে তাহার ঘর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরের কম নহে। বৃদ্ধা পাহাড়ী, রাজপুতবংশীয়া। ইহারা পাহাড়েই থাকে। কেহ কেহ আবার কৃষিকার্য্যের জন্ম জঙ্গলের খুব নিকটে বাস করে।

বৃদ্ধার গৃহে গিয়া দেখিলাম, চারিখানি ছোট ছোট খড়ের ঘর রহিয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিতেছে। সিন্দূর পড়িলেও স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লওয়া যায়। আর একটী দীর্ঘ গোহাল ঘর। তাহাতে সাত আটটী দুগ্ধবতী গাভী থাকে; এবং চাষের জন্ম দুইটী বলদও থাকে। বাটীতে একজন অশীতিবর্ষবয়স্ক বুড়া থুড়-থুড়ে লোক। সে ব্যক্তি ঐ প্রাচীনার দেবর। আর একটী যুবতী স্ত্রী দেখিলাম। ঐ যুবতী, বৃদ্ধার পুত্রবধূ।

বৃদ্ধার বাটীর নিকটে একটী ক্ষুদ্র বাগান ছিল। তাহা পর্ব্বতীয় কদলীবৃক্ষে পূর্ণ। এক আধটী তেঁতুল গাছও আছে। সেই বাগানে একটী কুঁড়ে ঘরে বৃদ্ধা আমাকে যত্নপূর্ব্বক বসিতে বলিল। বসিবার জন্ম কম্বল বিছাইয়া দিল। তৎপরে বৃদ্ধা ও তাহার দেবর আমার নিকট হইতে আমার কাহিনী শুনিতে আসিল। আমার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে একমনে শ্রবণ করিয়া, বৃদ্ধা অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধা অধিকক্ষণ আর তথায় বসিল না। উঠিয়া গিয়া, গোহাল হইতে একটী গোরু খুলিয়া আনিয়া, স্বয়ং গোদোহন করিতে আরম্ভ করিল। একটানে, পাঁচসের আন্দাজ দুগ্ধ দোহন করিল। তৎপরে বৃদ্ধা আমাকে স্নানার্থ তৈল আনিয়া দিল। আমি তৈল মাখিয়া নিকটবর্ত্তী ঝরণায় গিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। স্নান করিয়া আসিবা মাত্র বৃদ্ধা একখানি নববস্ত্র আমাকে পরিধানার্থ দিল। দেশী কাপড়, মোটা, কিন্তু খস্‌খসে নহে। আমি তাহা সানন্দে পরিলাম। বৃদ্ধা একটী পাথর বাটীতে প্রায় অর্দ্ধসের ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ আমাকে খাইতে দিয়া বলিল, "বেটা, এখন এই অল্প দুগ্ধই পান কর; তোমার উদরে এককালে বেশী দুগ্ধ সহ্য হইবে না; আর একটু পরে অধিক আহার করিও।" আমি সেই দুগ্ধ পান করার পর, বৃদ্ধা আমাকে এক রকম সাদা গুড় খাইতে দিল। গুড় খাইয়া আমি এক ঘটী জল পান করিলাম।

বেলা প্রায় ১১টা অতীত হইয়াছে। প্রায় দুই দণ্ড পরে বৃদ্ধা আমার জন্ম একতাল গরম গরম ক্ষীর লইয়া আসিল। আমি সেই ক্ষীর খাইয়া আবার জল পান করিলাম। দুরন্ত ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে।

ক্ষীর ভক্ষণ শেষ হইলে, বৃদ্ধা কিছু কম এক সের আটা, প্রায় এক পোয়া ঘৃত, উপযুক্ত পরিমাণে ডাল, লবণ—আমার জন্ম লইয়া আসিল। স্বয়ং উনান ধরাইয়া দিল। আমি বড় বড় মোটা মোটা আট খানি রুটী তৈয়ারি করিলাম। সে রুটী কিন্তু মাখমের ন্যায় নরম। বাহাত্তর ঘণ্টার পর আহার,—পাঁচ খানি রুটী খাইতে না-খাইতে পেট দম্‌সম্ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা সস্নেহে কহিল,—"বেটা! তুমি আরও খাও; এস্থানে অসুখ নাই; খুব পেট ভরিয়া খাইলেও কোন কষ্ট হইবে না।" বৃদ্ধার অনুরোধে আমি আরও দুই খানি রুটী খাইলাম।

বৃদ্ধার যত্ন ও স্নেহ দেখিয়া আমি গলিয়া গেলাম। সেই পরিবারস্থ সকলেরই প্রকৃতি অতি সরল। বৃদ্ধার ভালবাসা দেখিয়া প্রকৃতই আমি মোহিত হইলাম। বৃদ্ধা আমাকে দিবা-

নিদ্রা যাইতে নিষেধ করিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল।

আমার স্বভাব চঞ্চল। আমি আহারাদির পর বাগানের এদিক-ওদিক ঘুরিতে লাগিলাম। ইচ্ছা হইল,—বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া অন্য স্থানে গিয়া একটু পা-চালি করি। কিন্তু ভয় হইল,—পাছে আবার হারাইয়া যাই।

সন্ধ্যার পরে আবার বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসিল—"বেটা, তু কেয়া খায়গা?" আমি বলিলাম,—"তুমি যাহা দয়া করিয়া দিবে, তাহাই খাইব। এবেলা যদি কিছু চাউল দাও, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। আমার অন্ন খাইবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। চা'ল আছে ত?"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল,—"চাল আছে বৈ কি?"

অর্দ্ধ দণ্ড মধ্যে বৃদ্ধা আমার আহারের জন্য চাল, ডাল, তরকারি, তৈল, লবণ, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, গুড়-সন্দেস, ক্ষীর,—একে একে সমস্ত আনিয়া হাজির করিল। আমি অতি পরিতোষের সহিত কয়েক দিনের পর অন্নাহার করিলাম। আমার গাত্রবস্ত্র ছিল না বলিয়া বৃদ্ধা একখানি "দোহর" মোটা চাদর আনিয়া দিল। রাত্রে শয়নের জন্য একখানি খাটিয়া ও আর একখানি কম্বল পাইলাম।

সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া এই কয়েক দিনের পর আবেগশূন্য—দুশ্চিন্তাশূন্য হৃদয়ে সুখে নিদ্রা গেলাম।

রজনী কিরূপে যে অবসান হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। আনন্দের রজনী সুনিদ্রায় সুপ্রভাত হইল। পাখীদের সুমধুর স্বর তমসাচ্ছন্ন জগতের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিল, নিদ্রিত বিষাদ-মণ্ডিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আবার হাসাইয়া তুলিল। তরুণ-অরুণের নবীন আলোক পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া অবনীমণ্ডলকে হর্ষোৎফুল্ল করিল। আমিও ইষ্ট-দেবতার নাম করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করত বৃদ্ধার নিকট বিদায় চাহিলাম, কিন্তু সে আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল,—"দো চার রোজ হিঁয়া রহো, যব্ মেরা বেটা আ যায়, তো তুমকো রাস্তা বাতায়গা, তো যানা।" আমার আর যাওয়া হইল না। আমি সেই পর্ব্বতবাসী-দের অসামান্য আতিথেয়তায় পরম সুখে ৫ দিন কাটাইলাম। বর্ষীয়সীর পুত্র আসিল, সেও যেন আমার কত দিনের পূর্ব্ব-পরিচিত। আমাকে সুখে রাখিবার জন্য তাহারও বিশেষ যত্ন। সে আমাকে বলিল,—"যব্ তক্ বলওয়া (বিদ্রোহ) হায়, হাম্ আপকো যানে নেহি দেঙ্গে, ইয়ে ঘর আপ্‌কা হায়, কুছ ফিকির (চিন্তা) না করিয়ে।" আমি সেখানে আর অধিক দিন থাকিতে কোন মতে স্বীকৃত হইলাম না। আমি পুনরায় সকৃতজ্ঞ চিত্তে মুগ্ধান্তঃকরণে আমার সেই আশ্রয়-দাত্রী সরল প্রতিমা প্রাচীনার নিকট বিদায় চাহিলাম। বৃদ্ধা আমাকে বিদায় দিবার সময় কতই কাঁদিতে লাগিল। এত বিপদেও আমি পান্না-প্রদত্ত সেই মোহর কয়টী ছাড়ি নাই। যাইবার সময় বৃদ্ধার হাতে একটী মোহর দিলাম, কিন্তু বৃদ্ধা তাহা কোন মতেই লইতে চাহিল না। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"যখন আমি তোমাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছি, তখন পুত্রের প্রদত্ত বলিয়া তাহা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।" এইরূপ অনেক কথা বলার পর সে মোহরটী লইল। কিন্তু আমাকে যে কাপড়, চাদর এবং কম্বল দিয়াছিল, তাহা আর লইল না এবং বলিল,—"ইহা লইয়া না গেলে পথে তোমার কষ্ট হইবে।" কিন্তু কম্বল ভারী বলিয়া তাহা লইলাম না, কেবল কাপড় ও চাদর খানি লইলাম। বৃদ্ধার স্নেহমাখা মুখ মনে করিয়া যাত্রা করিলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকালে বেরিলীর রাস্তা দেখাইবার জন্য প্রাচীনার পুত্র আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রায় ৫ ক্রোশ আসিল এবং বহেড়ির রাস্তা দেখাইয়া সে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। আমি সেই প্রদর্শিত পথে বহেড়ি অভিমুখে চলিতে লাগি-লাম। প্রায় সতের মাইল রাস্তা হাঁটিয়া উক্ত স্থানে পঁহুছিলাম। তখন সন্ধ্যা উপস্থিত হই-য়াছে। কিন্তু কোথায় থাকিব, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সহরের ভিতর যাইতে সাহস হইল না; কারণ, সেখানকার সকলেই বিদ্রোহী। আবার তাহাদের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইব মনে করিয়া, রাস্তার ধারে একটী বড়গাছের তলায় গেলাম, সেখানে তিন খানি অতি সামান্য দোকান রহিয়াছে। তথায়

যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত দিন অনাহারী, ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, কিন্তু দ্রব্য-সামগ্রী কিনিবার ত পয়সা নাই। সঙ্গে আটটী মোহর আছে বটে, কিন্তু তাহাও বাহির করিবার যো নাই। দোকানীরা জানিতে পারিলে, তাহার লোভে আমাকে তৎক্ষণাৎ খুন করিয়া ফেলিবে। আমি ভিক্ষাবৃত্তিরূপ অতি সহজ উপায় অবলম্বনে তিনখানি দোকান হইতে তিন মুষ্টি আটা (ময়দা) সংগ্রহ করত কাপড়ে রাখিয়া তাহাতে জল দিলাম। শেষে তাহার নেচি পাকাইয়া ঘুটের আগুনে পোড়াইয়া দগ্ধোদরের কথঞ্চিৎ জ্বালা নিবারণ করিলাম। শেষে বৃক্ষ-মূলে শয়ন করত পথশ্রম-জনিত কষ্টে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। সেখান হইতে বেরিলী প্রায় তেইশ মাইল। আমি পথিমধ্যে শ্রান্তি দূর করত অতি কষ্টে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঠিক সন্ধ্যার সময় বেরিলী উপনীত হইলাম। সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি হঠাৎ, একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার বস্ত্র ধরিয়া কহিল,—“বাবুজী! কাঁহা যাতে হো? মারে যাওগে? আও, হামরা পিছে পিছে চলে আও।” ইহা শুনিবামাত্র আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল; বড়ই ভীত হইলাম। মনে হইল,—“আবার আমার জন্য কি বিপদ ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে নিহিত রহিয়াছে, তাহা ত জানি না।” আমি দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া সেই লোকটীর পশ্চাদনুসরণ করিলাম। কিছু-দূর গিয়া সে আপনার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, আমিও গেলাম। সে, গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া কহিল,—“আপনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, আবার এখানে কেন আসিলেন? আপনার ভ্রাতা বাবু কালীপ্রসাদ এবং এই সহরস্থ আরও ছয়জন বাঙ্গালীকে খাঁ বাহাদুর খাঁ কয়েদ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পায়ে বেড়ী দিয়া কোতওয়ালীতে রাখিয়াছেন। জনরব এই যে, বাঙ্গালীরা ইংরেজদের সকল সংবাদ দিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবে। আপনি এখানকার একজন বিশেষ পরিচিত লোক। আপনাকে দেখিবামাত্রই খাঁ বাহাদুর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আপনাকে যে আমার বাড়ীতে রাখিব সে উপায়ও নাই; কারণ, চারিদিকে গুপ্ত-চর ফিরিতেছে, তাহারা সন্ধান জানিতে পারিলে আপনার যে গতি, আমারও সেই গতি হইবে। এক্ষণে যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় এমন উপায় চিন্তা করুন।” আমি এই আসন্ন বিপদের কথা শুনিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম, বিশেষত মধ্যম সহোদর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে রহিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া বক্ষঃস্থল যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বোক্ত লোকটী আমাকে আপনার গৃহে রাখিয়া চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে সে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। কিন্তু আমার তাহা স্পর্শ করিবারও প্রবৃত্তি ছিল না, তবে লোকটীর অনেক অনুরোধে কিছু আহার করিলাম। যাহা হউক, এ লোকটী কে, তাহা জানিবার জন্য কিছু উৎসুক হইলাম। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, “আমাদের রেজিমেণ্টে এক জন বাজারের “চৌধুরী” ছিল, আমি তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা।” আমি তাহার সদ্ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়া বলিলাম,—“যদ্যপি তুমি কোন প্রকারে হাফিজ নিয়ামত খাঁর বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হই।” সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমাকে উক্ত হাফিজ নিয়ামত খার বাড়ীতে লইয়া গেল। যে সময়ে আমি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, সে সময়ে তিনি একাকী বৈঠক-খানায় বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করত আমার অভ্যর্থনা করিলেন এবং অতি সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কহো ভাই! কাঁহাসে আয়ে, আর আপ্‌কা ইয়ে ক্যায় হালে হুয়া হায়?” আমি আমার সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত আমূল বৃত্তান্ত একে একে সকলই জ্ঞাপন করিলাম এবং শেষে অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে বলিলাম,—“এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি এই শরণাপন্নকে রাখিতে হয় রাখুন, মারিতে হয় মারুন।” আমি তাঁহাকে ইহাও বলিলাম যে, খাঁ বাহাদুর খাঁ সকল বাঙ্গালীর উপর খড়্গাহস্ত হইয়াছেন, আমি এখানে আছি জানিতে পারিলে হয় ত আমাকে এখান হইতে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন।” আমার এই কথা শুনিয়া হাফিজ

নিয়ামত খাঁ সরোষে কহিলেন,—"ক্যা, হামারে মোকান সে আপকো লে যায়গা ? এইসা কেস্‌কা মক্‌দুর হায় ? আপ বে-খট্‌কে (নির্ভাবনায়) রহিয়ে।" আমি তাঁহার নিকট হইতে অভয় পাইয়া কিছু আশ্বস্ত হইলাম বটে, কিন্তু মধ্যম ভ্রাতার জন্য বড়ই কাতর হইয়া রহিলাম। কি উপায়ে তাহাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব, অনুক্ষণ সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

যে হাফেজ নিয়ামত খাঁর গৃহে আমি অতি যত্নে, অতি সমাদরে এই কয়েক দিন কাটাইলাম, তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত। হাফেজ নিয়ামত খাঁ,—খাঁ বাহাদুর খাঁর জ্যাটতুতোভাই এবং বয়ঃকনিষ্ঠ। যখন খাঁ বাহাদুর খাঁ বেরিলীর শাসনকর্ত্তা হইয়া মসনদে বসেন, তখন তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি নিয়ামত খাঁকে উজীর বা দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু নিয়ামৎ খাঁ তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন। হাফেজজী বড় চতুর এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় অভিপ্রায় এইরূপে ব্যক্ত করেন যে, সত্যবটে ইংরেজরাজ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের হস্ত হইতে রাজ্যভার কাড়িয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়মিত মাসহারা পাইয়া থাকেন এবং ইংরেজরাজ ভাল ভাল উচ্চপদ দিয়া তাঁহাদের প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এমন লোকের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করা কখন উচিত নহে। বরং যাহাতে ইংরেজেরা বিদ্রোহীদের দমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন, ইহাই তাঁহার কামনা ছিল। ইনি ইংরেজদের বিশেষ অনুগত ছিলেন বলিয়া খাঁ বাহাদুর খাঁ ইহাঁকে ভয় করিতেন এবং ইহাঁর আশ্রিত ব্যক্তির উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইতেন না। যে দুশ্চিন্তা আমার এখন চিরসহচর, এমন নিরাপদ স্থানে আসিয়াও আমি সে চিন্তা হইতে কোন ক্রমে অব্যাহতি পাই নাই। আমি সর্ব্বদাই ভ্রাতা কালীপ্রসাদের কথা ভাবিতাম। একদিন হাফেজ জীকে কহিলাম,—"আমি নাইনিতালে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, এখানে আর অধিক দিন থাকিতে অভিলাষ নাই। আপনি যদি এ সময়ে আমার একটী উপকার করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হই।" তিনি বলিলেন,—"আমার যতদূর সাধ্য, আপনার উপকার করিতে কখন বিমুখ হইব না।" হাফেজ জীকে আমি বিশেষ জানিতাম। তাঁহার সহিত আমার ইতিপূর্ব্বে বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তিনি তখন আমাকে অতিশয় খাতির করিতেন। এখন বিপন্ন বলিয়া তাঁহার সদাশয়তা এবং সখ্যভাব আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহা হউক, আমার প্রতি তাঁহার সদয়-ভাব দেখিয়া বলিলাম,—"আমার সহোদর কালীপ্রসাদ ও আর ছয়জন আমাদের স্বদেশবাসীকে খাঁ বাহাদুর খাঁ বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, আপনি যদি দয়া করিয়া কোন প্রকারে কারামুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আজীবন অতি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই কথা স্মরণ করিব।" ইহা শুনিয়া হাফেজ জী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, "আমার ক্ষমতায় যতদূর হইতে পারে, তাহা আমি অতি অবশ্য করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন।

মহাবিদ্যা-সাধন।

নবমী মহাবিদ্যা—মাতঙ্গীধ্যান।

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং
রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্॥

ব্যাখ্যা

বিরাজিতা দিব্য রত্ন সিংহাসনোপর।
শ্যামলবরণা ভালে অর্দ্ধ শশধর॥
তরুণ-অরুণবর্ণ বস্ত্রে সুশোভিত।
ত্রিনয়ন নীলপদ্মতুল্য বিকসিত॥
অসি চর্ম্ম পাশাঙ্কুশে শোভে চারি কর।
রতন-ভূষণ অঙ্গে সুন্দর সুন্দর॥
সিদ্ধ বিদ্যা মাতঙ্গী দেবীর এই ধ্যান।
নমামি মাতঙ্গি মাতঃ জগৎকল্যাণ॥

মানসপূজা।

কোথা গো মাতঙ্গি মাতঃ ভুবনকারণ।
মানস করেছি আমি পূজিব চরণ॥

দীনদয়াময়ি দীনে তারিতে সঙ্কটে।
অধিষ্ঠাত্রী হও মম ভাগ্যরূপ ঘটে॥
জলবিন্দু নাই ঘটে বড়ই সঙ্কট।
দয়াসিন্ধু-সলিলে সম্পূর্ণ কর ঘট॥
কি দিয়া পূজিয়া করি মা তোমায় বশ
ভক্তিরস পাদ্য দিনু খাদ্য ষড়রস॥
যদি কিছু করে থাকি ধরম-সঞ্চার।
যজ্ঞেশ্বরি অর্ঘ্য দিনু চরণে তোমার॥
চিন্তা দিনু দক্ষিণান্ত দাক্ষিণ্য-দায়িনি।
অন্তে যেন দেখা দিও শিবসীমন্তিনি॥

মাতঙ্গীস্তোত্র।

তার গো মাতঙ্গি মাতঃ, আমি ভ্রান্ত জ্ঞান তাত,
তব তত্ত্ব না জানি কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া আমারে দীন, ভজন পূজন হীন,
করুণায় না কর বঞ্চিত॥
জগৎকুশলহেতু, মা তুমি কুশল সেতু,
স্বতন্ত্র তন্ত্রেতে আছে লেখা।
পূর্ব্বকালে অপরূপ, ধরিয়া মাতঙ্গীরূপ,
মতঙ্গ মুনিরে দিলে দেখা॥
ভক্তের মঙ্গল কাজে, কদম্ব-কানন মাঝে,
এই মূর্ত্তি প্রকাশিলে ভবে।
এত অনুগ্রহ জীবে, তাই বলি ওমা শিবে,
নাশিবে দুর্গতি মম কবে॥
তোমার করুণাসিন্ধু, যদি মা চলকে বিন্দু,
বিপদ-সাগরে পাই ত্রাণ।
দয়াসিন্ধু বলি তাই, বিন্দু দিতে ক্ষতি নাই,
হেলায় করিতে পার দান॥
আমি ঋণী তব পুত্র, মা বিনা জানাই কুত্র,
মাকে জ্ঞাত করা চাই আগে।
পুত্র দুঃখ পেলে পর, কি জানিবে অন্য পর,
মা'র বাছা মা'র গায়ে লাগে॥
অন্যে পারে এড়াইতে, মা কি পারে তাড়াইতে,
জুড়াইতে স্থান মা'রকোল।
তাই হই কৃতাঞ্জলি, মা ভৈরবী মা ভৈরবা বলি,
দীনে দেহি করুণা-হিল্লোল॥
মা'র বাছা মা'র হই, মায়ের নিকটে রই,
মা ছাড়া না হই যেন আর।
হাজার দুঃখেতে থাকি, মা বলিয়া যদি ডাকি,
উথলে সুখের পারাবার॥
শৈশবে রচনা শিখি, দুর্গানাম কত লিখি
মত্ত মা মাতঙ্গি তব বোলে।
এই কি নামের ফল, শেষে যাই রসাতল
সন্তান বলিয়া লও কোলে॥

স্তোত্র।

বিশ্বপতি ক্ষুদ্রমতি ত্বদীয় চরণে।
ভক্তিভরে নতশিরে বিনয় বন্দনে॥
নিরাকার নির্ব্বিকার সাকার বিকার।
নির্ব্বিকল্প সবিকল্প কে বুঝে প্রকার॥
তুমি শেষ পরমেশ আদি মধ্য আর।
তুমি সত্য তুমি নিত্য তোমা বুঝা ভার॥
তুমি ভাব কি অভাব ভাবা নাহি যায়।
ভাবাভাব যত ভাব সব শোভা পায়॥
বিশ্বপাতা ভয়ত্রাতা পাপ-বিনাশন।
পুণ্যময় পাপময় কে জানে কেমন॥
জগজ্জ্যোতিঃ তব জ্যোতিঃ প্রতিবিম্ব পাই।
এ মার্ত্তণ্ড কি প্রচণ্ড জ্যোতিঃ ধরে তাই॥
নিরাময় কি আময় কি বলি কিরূপ।
বিশ্বরূপ তব রূপ কে জানে স্বরূপ॥
অনুমেয় কি অমেয় মীমাংসার স্থলে।
ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম যেবা যাহা বলে॥
কি মিহির কি তিমির সম তোমা সব।
পাপ পুণ্য পূর্ণ শূন্য জীবিত কি শব॥
তুমি ক্ষান্তি তুমি দান্তি তুমি শান্তি হও।
তুমি সাধ্য হে সুসাধ্য সাধ্যমধ্যে নও॥
ভেদাভেদ হে অভেদ কে জানে তোমার।
কত ভাবে জীব ভাবে মহিমা অপার॥
শিবময় গুণময় অশিব নির্গুণ।
শিবাশিব কি কহিব কিবা আছে গুণ।
হে চিন্ময় দয়াময় অধম নন্দনে।
প্রাণ-অন্তে পদপ্রান্তে স্থান দিও দীনে॥

জন্মভূমি।

২য় ভাগ। } অগ্রহায়ণ। ১২৯৯। { ১২শ সংখ্যা।

ভেক-ভুজঙ্গ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ভেক-ভুজঙ্গ প্রস্তাবে ভেকের কথা আমার ফুরাইয়াছে। ভেকের বিষয়ে যাহা বলিবার ছিল, বলিয়াছি; আর কিছুই বলিবার নাই, লিখিবার নাই। এখন বাকি ভুজঙ্গ। নানা জাতীয় সর্প ও সর্প-বিষের কিছু কিছু বিবরণ লিখিব; তাহা হইলেই আমার কথাটী ফুরায়।

আমাদের ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেই সাপের প্রাদুর্ভাব অধিক। সাপেরা হিমের প্রভাব সহিতে পারে না। তাই শীতপ্রধান দেশে বড় একটা সাপ নাই। যাহা আছে, তাহাও বিশেষ মারাত্মক নহে।

শরৎকাল আসে; কাশ-কুসুমের চামর ফুটিয়া দুলিতে থাকে; আকাশের কোলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা লঘু-মেঘগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলিয়া বেড়ায়; দিবসে রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপ বাড়ে; রাত্রিতে চাঁদ উঠিলে জগতে যেন জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতে থাকে; সূক্ষ্মকণায় বিন্দু বিন্দু শিশির পড়ে; এ দেশের বিষাক্ত সাপ আর বাহিরে থাকিতে পারে না; গর্ত্তের ভিতরে গিয়া শরীর লুকায়। সাপের শরীরে শীত সহ্য হয় না। কার্ত্তিক যায়, অগ্রহায়ণ যায়; পৌষ যায়, মাঘ যায়; সমস্ত ফাল্গুন মাসও গত হয়,—তখন ভুজঙ্গের শীত-নিদ্রা ভাঙ্গে। একটা জন-প্রবাদ আছে, অনন্ত-চতুর্দ্দশীর দিন অনন্তব্রতের ডোর ধরিয়া শীত নামে। সমস্ত বিষাক্ত সাপেরা সেই দিন মুদ লইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, শারদীয় বিজয়া-দশমীর দিন সাপেরা মুদ লয়, এবং জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরার দিন তাহাদের মুদ ভাঙ্গে। এ প্রবাদ অমূলক অনন্তব্রতের কিংবা বিজয়া দশমীর পরেও বাহিরে গোখরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

হিমের তেজ কমিয়া যায়; রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠে; তখন সাপেরা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসে। কিন্তু শীতকালেও কোন কোন দিন তাহারা গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া রৌদ্র পোহায়। দারুণ গ্রীষ্মের রাত্রিতে, যখন ঝুর্ ঝুর্ করিয়া মৃদু-মন্দ বাতাস বহিতে থাকে, সেই সময়ে সাপেরা পথের উপরে এবং ভূমির আইলে শুইয়া বায়ু সেবন করে। আবার গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া গেলে, সে সময়ে সাপেদের আরও আনন্দ। তাহারা ভেক প্রভৃতি ধরিয়া খাইবার নিমিত্ত চারিদিকে চরিয়া বেড়ায়। তখন রাত্রিকালে ঘরের বাহির হওয়া বড় বিপদের কথা। কোথাও যাইতে হইলে আলোক ভিন্ন কদাচ যাইবে না। খুব খট্ খট্ শব্দ করে এ প্রকার জুতা কিংবা খড়ম পায়ে দিবে এবং ঝন্ ঝন্ শব্দ হয় এ প্রকার লাঠী লইবে, তবে পথ হাঁটিবে। বর্ষাকালে অনেক পল্লীগ্রামে জুতা চলে না; খড়ম পায়ে দেওয়া যায় না। জুতা, জলে কাদায় ভিজিয়া যায়; খড়ম কাদায় বসিয়া যায়। তেমন স্থলে আলোক ও লাঠী লইয়া পথ চলিবে।

রাত্রিকালে পথ হাঁটিবার সময়ে জানে...

হাততালি দেন। হাততালি শুনিলে সাপ পলাইয়া যায়। কিন্তু কেউটিয়া ও রাজ সাপ পূর্ব্ব হইতে রাগিয়া থাকিলে হাততালি শুনিয়া তাড়া করিতে পারে।

একটা আস্তসার মন্ত্র আছে,—

চলে যেতে ঘুঙ্গুর বাজে, নূপুর বাজে পায়।
পথ ছেড়েদে বাসুকীমা,
তোর গরুড় গোঁসাই যায়॥

শুনিতে পাই বহুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার ও বিহারের লোকে রাত্রিকালে কোথাও যাইতে হইলে, উক্ত মন্ত্র পড়িয়া পায়ে নূপুর ও ঘুঙ্গুর পরিতেন তাহার পর ঘরের বাহির হইতেন। বিষের চিকিৎসা প্রকরণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিব।

আলোক দেখিলে সাপে ভয় পায়; (১) কিন্তু সকল সময়ে তাহাদের ভয় হয় না। চারি বৎসর হইল, সন্ধ্যার পরে কোন দরিদ্রলোকের পৃষ্ঠব্রণ অস্ত্র করিবার উদ্যোগ করা হইতেছিল। গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যা হইয়াছে। রোগী তাহার দাওয়াতে বসিয়া ছিল। নিবিড় মেঘ করিল; ঝড় উঠিল; খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। পৃথিবী শীতল। রোগীর কাছে দুইটা প্রদীপ দপ্ দপ্ করিয়া জলিতেছে; মাটীতে তিল পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। একটী প্রদীপ রোগীর কন্যার হাতে। ইত্যবসরে উঠানে কি নড়িয়া উঠিল। সকলে বলিল,—"ও ইঁদুর।" পুনর্ব্বার নড়িল, পুনর্ব্বার সকলে বলিল,—"ও ইঁদুর; প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নড়ে।" অস্ত্র করিবার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে; ছুরী বসাইলেই হয়, এমন সময়ে রোগীর কন্যার যে হাতে প্রদীপ জলিতেছিল, একটা বড় গোখ্‌রা সাপ সেই হাতের উপরে আসিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত লোক ভয়ে আড়ষ্ট। কেহ কেহ ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আমি বালিকাটীকে ও রোগীকে বলিলাম, তোমরা নড়িবে চড়িবে না; ঠিক কাঠের পুতুলের মত নিস্তব্ধ থাক। কোনও ভয় নাই। কাছে শিশির ভিতরে কার্ব্বলিক এসিড্ ছিল, তাহাই মাটীতে ঢালিয়া দিলাম।' সাপটা কার্ব্বলিক এসিডের গন্ধ পাইয়া পলাইয়া গেল; কিন্তু কোথায় পলাইল, আর খুজিয়া পাওয়া গেল না।

বীরভূমে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সাপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। রাত্রিতে লোকের ঘরে দ্বারে সাপ উঠে। সে কারণ সন্ধ্যা হইলেই মোটা কাপড়ের মশাল কার্ব্বলিক এসিডে ভিজাইয়া আমার বাসার দ্বারে দ্বারে রাখিয়া দিতাম এবং সমস্ত রাত্রি ঘরের প্রত্যেক দ্বারে লাণ্ঠন জালিয়া রাখিতাম। সাপ আসিতে পারিবে না, মনে এই সাহস ছিল। কিন্তু, যতো রক্ষা ততো ভয়ঃ। আলো দেখিয়া ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ লাণ্ঠনের কাছে উড়িয়া পড়িতে লাগিল। কীট-পতঙ্গ ধরিয়া খাইবার জন্যে ছোট ছোট ভেক আসিয়া দেখা দিল। শেষে এক রাত্রিতে দেখি, বেঙ খাইবার আশায় একটা বড় সাপ আসিয়া সেইখানে শুইয়া আছে। কি সাপ ঠিক হইল না; মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়া কোথায় পলাইয়া গেল। অতএব আলো দেখিলে সাপেরা যে, নিশ্চিত ভয় পাইবে, এমন কিছু কথা নয়।

ঠিক সম্মুখে সাপে ফণা ধরিয়া দাঁড়াইলেও যদি কাঠের পুতুলের মত নিস্তব্ধ ভাবে থাকা যায়, তাহা হইলে প্রায় দংশন করে না, এ উপদেশ একটী বানরের কাছে পাইয়াছি। অনেক দিন হইল, চন্দননগরের বড়হাটায় একটা হাঁড়ীর ভিতরে গোখ্‌রা সাপ ধরা ছিল। হাঁড়ীর উপরে সরা, সরার উপরে ইট চাপানো ছিল। ছাদের আলিসায় একটা বানর বসিয়া বসিয়া সরা ঢাকা হাঁড়ী দেখিতে পাইল। মনে ভাবিল, ভিতরে কোন খাদ্য-সামগ্রী আছে। ঝুপ করিয়া পড়িয়া ঢাকা খুলিয়া ফেলিল। আর কোথা যাও! নূতন ধরা সাপ,—তেজে ও রাগে গর্ গর্ করিতেছে; একেবারে ফণা ধরিয়া উচ হইয়া উঠিল। কিন্তু বিধাতা যেন কানে কানে মন্ত্র পড়িয়া দিলেন; নিমেষ না পালটিতে বানরটা কাঠের পুতুলের মত স্থিরভাবে থাকিল; আর নড়া চড়া নাই, চক্ষুতে পলক নাই। সাপেরা অধিকক্ষণ ফণা তুলিয়া থাকিতে পারে না, শীঘ্র

(১) আমাদের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এইরূপ উপদেশ আছে যে, রাত্রিকালে ও দিবসে ছত্র ও জর্জ্জর শব্দ করে এমন যষ্টি লইয়া চলিবে, তাহা হইলে ছায়া ও শব্দে ভয় পাইয়া সাপেরা শীঘ্র পলাইবে।

ছত্রী জর্জ্জরপাণিশ্চ চরেৎ রাত্রৌ তথা দিবা।
তচ্ছায়াশব্দবিত্রস্তাঃ প্রণশ্যন্ত্যাশু পন্নগাঃ॥

চরক।

ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাই কিছুক্ষণ ফণা তুলিয়া থাকিয়া সাপটা মুখ নামাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। বানর তখন অবসর বুঝিয়া একলাফে দশ হাত দূরে গিয়া পড়িল। সাপের কাছে নিস্তব্ধভাবে থাকিলে প্রায় বিপদ্ ঘটে না। কিন্তু তাহারা রাগিলে মাটীতে, কাঠে, গাছে, সর্ব্বত্রই দংশন করে; যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাতেই দংশন করে; তখন এ ভুজঙ্গ কি আর খাটে না।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে গোখুরা, কেউটিয়া, কালাজ এবং কেরেতা সাপই অধিক বিষাক্ত। এই সকল সাপের দংশনেই মানুষের মৃত্যু হয়। অন্য কোন সাপের দংশনে এদেশে কাহারও মৃত্যু হইতে শুনা যায় না। বাঙ্গালার স্থান-বিশেষে গোখুরা সাপকে খরিষ কহে, এবং কোন কোন স্থানে কেউটিয়ার নাম আলান। বড় বড় পাহাড়ী বোড়া, বাঙ্গালা দেশে নাই। কিন্তু বর্ষাকালে বন্যার জলের সঙ্গে পাহাড় হইতে ভাসিয়া দুই একটা এদেশে আসে এবং গৃহস্থের ছাগল, ভেড়া, গোরু, বাছুর প্রভৃতি খাইয়া অনেক অত্যাচার করে। তাই এবার গোখুরা, কেউটিয়া এবং পাহাড়ী-বোড়া সাপের বিবরণ লিখিব।

সচরাচর চারি প্রকার গোখুরা সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। কেউটিয়া সাপ তিন প্রকার। খইয়ে-গোখুরা, সুন্দরবনের হরিদ্রাবর্ণ শাঁখামুটী-গোখুরা, কালী-গোখুরা এবং পদ্ম-গোখুরা।

আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই গোখুরা সাপ আছে। গোখুরা সাপ সকলেই দেখিয়াছেন। ইহার আকৃতি কিরূপ, বর্ণ কেমন, কিপ্রকার ফণা করে, তাহা জানিতে কাহার বাকি নাই। পর-পৃষ্ঠায় গোখুরা সাপের একটী চিত্র দেওয়া হইল।

খইয়ে-গোখুরার গায়ে খইয়ের মত শাদা শাদা দাগ আছে, তাই লোকে ইহাকে খইয়ে-গোখুরা বলে। ইহার চর্ম্মও অনেকটা পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ চর্ম্ম, তাহার উপরে কাল কাল টোপ তাই এই সাপকে এত পরিষ্কার দেখায়। গোখুরা সাপ সচরাচর আড়াই হাত লম্বা হয়; কিন্তু চারি হাত লম্বাও দেখা গিয়াছে।

সুন্দরবনের হরিদ্রাবর্ণ শাঁখামুটী-গোখুরার বর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ঢোঁড়া-সাপের মত। ইহারা তিন রকম। তাহার মধ্যে একপ্রকার গোখুরা খুব বড় ও অত্যন্ত রাগী। ১৮৭৬ সালে দুই জন ইতরলোক বাদাবন হইতে এই জাতীয় একটা গোখুরা সাপ আনিয়া কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে নামাইয়া রাখিয়াছিল। লোকে ঠাই ভরিয়া গিয়াছে। যে প্রকার বাঁশের ওড়াতে করিয়া মাচ আসে, সেই প্রকার ওড়ার ভিতরে সাপটা রাখা ছিল। চারিদিকে দড়ী জড়ানো, উপরে লম্বা বাঁশ। দুইজনে সেই বাঁশে কাঁধ দিয়া তাহাকে বহিয়া আনিয়াছে। সাপটাকে বাহির করিবার জন্য সকলে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু তাহারা সে কথা শুনিতেছে না। শেষে আমি দুই টাকা দিলাম। সাপুড়িয়ারা মাথায় কাপড়ের বড় পাগড়া বাঁধিয়া সাপটাকে বাহির করিল। বিষদাঁত ভাঙ্গা, তবু তাহার কাছে যায় কে! লাঙ্গূলের উপরে ভর দিয়া একেবারে উচ হইয়া উঠিল; যেন কুলার মত ফণা। ইহারা রাগিয়া মানুষের মস্তকেই দংশন করে। সাপুড়িয়ারা বলিল, সুন্দরবনের যেখানে এই প্রকার সাপ থাকে, সেস্থলে যাওয়া বড় বিপদের কথা।

কালী-গোখুরার বর্ণ, কাল ঢোঁড়া-সাপের মত ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল ও রাগী। লোকে বলে, ঢোঁড়া-সাপের ঔরসে এই জাতীয় গোখুরা সাপের জন্ম।

পদ্ম-গোখুরা দেখিতে অতি সুশ্রী গায়ের চর্ম্ম রক্তপদ্মের ন্যায় নির্ম্মল লোহিত আভাযুক্ত; তাহার উপরে ঈষৎ কাল কাল ছোট ছোট টোপ সাজানো। বিস্তারিত ফণা দেখিতে ঠিক যেন একটা প্রস্ফুটিত পদ্মদল; তাহার উপরে নূপুরের ন্যায় বাঁকা রেখা আঁকা। ইহাই লোক-প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন। কৃষ্ণ, কালীয়দমন করিতে কাল-সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, সেই অবধি নাকি তাঁহার চরণরাজীবের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ রেখা সাপের মাথায় চির-অঙ্কিত হইয়া আছে।

খইয়ে-গোখুরা এবং পদ্ম-গোখুরা অপেক্ষাকৃত অনেকটা ধীর ও শান্ত। ইহারা সহসা রাগে না, সহসা মানুষকে দংশন করে না। লোক বসিয়া থাকিলে কোলের উপর দিয়া ধীরে ধীরে সুড়্ সুড়্ করিয়া চলিয়া যায়, তথাপি দংশন করে না।

সে-কেলে লোকের কাছে বাস্তু-সাপ বড় ভক্তির জিনিস। বাস্তু-সাপ, গৃহস্থের গৃহের লক্ষ্মী। যে বাটীতে বাস্তু-সাপ বাস করে, সেখানে

ভারতীয় বৃহৎ গোখুরা।
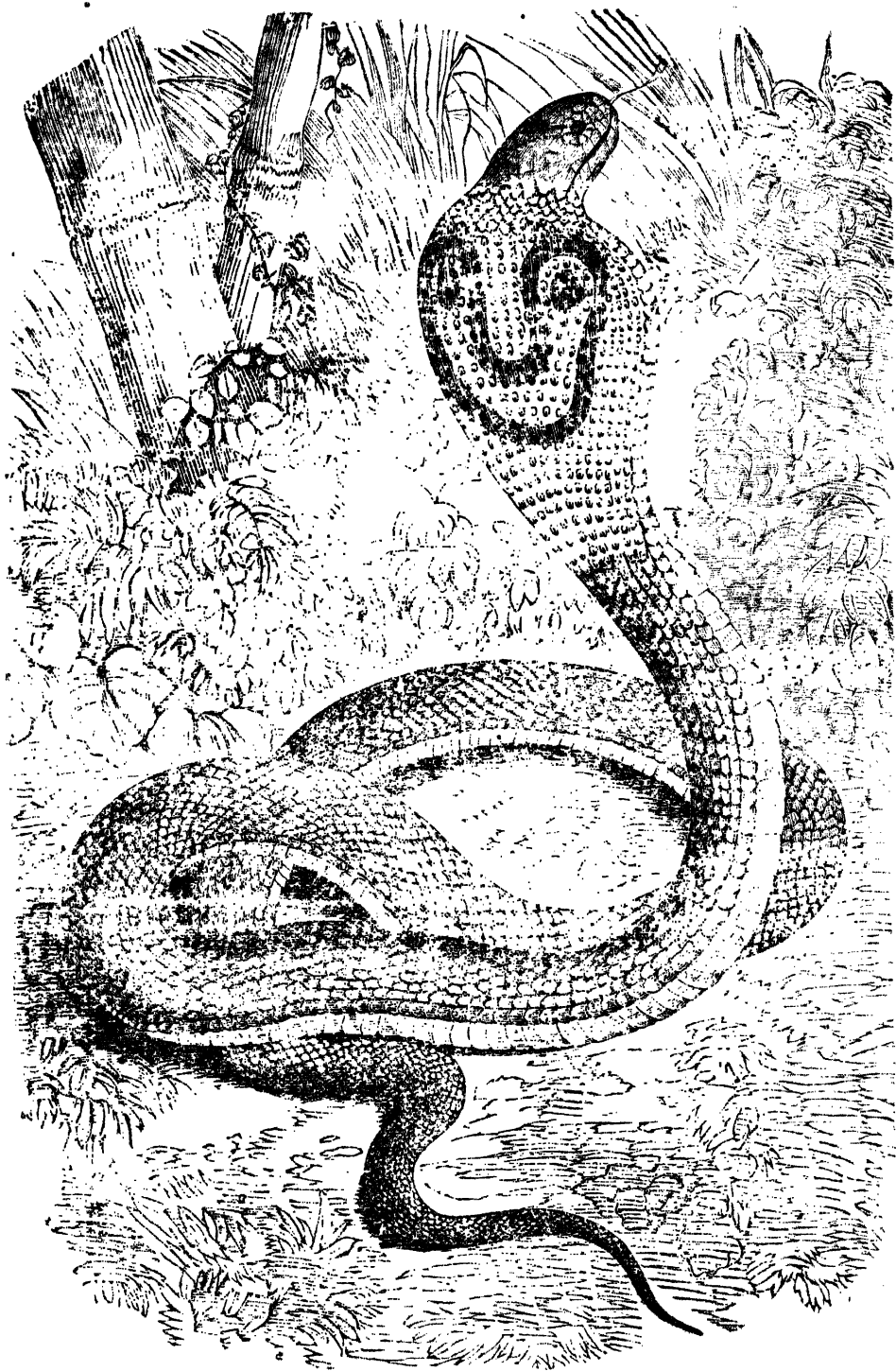
আপদ্-বালাই থাকে না, লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদাই সে বাটীতে বসিয়া হাসি হাসি মুখে বিরাজ করিতে থাকেন। অপরাধ না হইলে বাস্তু-সাপ কখন কাহাকেও দংশন করে না। বাস্তু-সাপ, কোন গৃহস্থের বাটী হইতে চলিয়া গেলে কিংবা মরিয়া গেলে, সে গৃহস্থের নাকি লক্ষ্মী ছাড়িয়া যান্।

সাপের মাথায় মাণিক থাকে, এ প্রবাদ কি? আবার শুনিতে পাওয়া যায়, প্রায় সকল বাস্তু-সাপেরই মস্তকে মাণিক আছে। রাত্রিকালে চরিবার সময়ে সাপেরা মাণিক উলাইয়া এক স্থানে রাখিয়া দেয়। মাণিকের ছটা দেখিয়া সেই-খানে কীট-পতঙ্গ আসে। কীট-পতঙ্গকে ধরিয়া খাইবার জন্য ভেক আসে। তখন সাপেরা সেই ভেকগুলিকে ধরিয়া আহার করে। মাণিকের উপরে গোবর ঢাকা দিলে, সাপেরা সে মাণিক আর মুখের ভিতরে পূরিতে পারে না; মাণিকের শোকেই হউক আর যে জন্যই হউক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। লোকের বিশ্বাস এই, যে সালিক পাখীতে এক লক্ষ কেঁচো খায়, সেই সালিক পাখীকে যে ভেকে ধরিয়া খায়, সেই বেঙকে যে সাপ আহার করে, তাহার মাথায় মাণিক হয়। মাণিক না থাকিলে সে বাস্তু-সাপ সুলক্ষণাক্রান্ত নহে।

সাপের মাণিক কি রকম? যখন সাপের মাণিকের গল্প আছে, তখন মাণিক কি রকম, তাহারও গল্প আছে। না থাকিলে এতবড় প্রবাদটা অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। এক গৃহস্থের বাড়ীতে বাস্তু-সাপ ছিল। বাস্তু-সাপের মাথায় মাণিক ছিল। গৃহস্থের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কত দিন পরে বউটী ঘরকন্না করিতে আসিলেন। রাত্রিতে উঠেন, বাহিরে আসেন। দ্বার খুলিলেই উঠানে কি একটা আলো দেখিতে পান্; ঠিক যেন শেষরাত্রির শুকতারা, দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলে; কিন্তু নিমেষ মধ্যেই আবার নিবিয়া যায়। এক রাত্রি দেখিলেন, দুই রাত্রি দেখিলেন; উপরি উপরি তিন চারি রাত্রি দেখিলেন। আলোটা কি, কোথা হইতে আসে, আবার কি প্রকারে নিবিয়া যায়, বউটী মনে মনে এ সকল ভাবেন; কাহাকে কিছু বলেন না। এক রাত্রিতে, বড় গ্রীষ্ম লাগিয়াছে, স্বামীর কাছে এই ছল করিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া বসিয়া থাকিলেন। গভীর নিশীথ সময়; চারিদিক্ চম্ চম্ করিতেছে। জগৎ নীরব। কেবল গাছের উপরে কখন কখন এক একটা কালপেঁচা কু কু করিতেছে; ঘরের চালে লক্ষ্মীপেঁচা এক একবার চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া উঠিতেছে; কখন কখন হুলো বিড়ালটা গাঁও গাঁও করিতেছে; বনের ভিতরে এক একবার শৃগাল-গুলা হুয়া হুয়া ক্যা হুয়া করিয়া ডাকিতেছে,—আর সব নিস্তব্ধ; মানুষের সাড়া-শব্দ নাই চৌকীদার বিশ্রামশয্যায় ঘুমাইয়া আছে। জাগিয়া থাকিবার মধ্যে কেবল আমাদের এই কুলবধূ। রাত্রি দু'প্রহর; কি সন্ সন্ শব্দ হইল; তাহার পরেই উঠান আলো হইয়া উঠিল। বউটী দেখিলেন, একটা সাপ সেই আলো রাখিয়া এদিক্ ওদিক্ চরিয়া বেড়াইতেছে। সাপের মাথায় মাণিক থাকে সকলেই জানেন, বউটীও তাহা জানিতেন। তৎক্ষণাৎ একতাল গোবর ছুড়িয়া সেই আলোকের উপরে ফেলিয়া দিলেন, মাণিক ঢাকা পড়িয়া গেল। মাণিক হারাইলে সাপ আর বাঁচে না, গৃহস্থের ভাগ্যদোষে বাস্তু-সাপটী তৎক্ষণাৎ মাথা আছড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিল সাপ মরিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া বউ, মাণিকটী তুলিয়া আনিয়া, সমস্ত গোবর ধুইয়া ঘরের ভিতরে ধামা ঢাকা দিয়া রাখিলেন।

রজনী প্রভাত। তখনও বউয়ের নিদ্রা ভাঙ্গে নাই; সারারাত্রি জাগিয়া তিনি অকাতরে ঘুমাইয়া আছেন। উঠানে বাস্তু-সাপ মরিয়া রহিয়াছে; সেজন্য বাটীর সকলেই শোকাকুল; সকলেই দুঃখ করিতেছেন; তবু বউয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিল না। অনেক বেলা হইল, শাশুড়ী ঠাকুরাণী বৌকে জাগাইতে আসিলেন,—ঘর আলোকাকীর্ণ। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখেন, ধামার ছোট ছোট ছিদ্র দিয়া প্রদীপ্ত আলোকের ছটা বাহির হইয়া আসিতেছে। ধামা তুলিয়া দেখেন, ভিতরে শুকতারার মত একটা গোল বড় মাণিক, জ্বলন্ত আগুনের মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্রবধূই যত প্রমাদের মূল। কিন্তু তখন আর দুঃখ করিয়া কি করিবেন? সেই দিন হইতে নাকি গৃহস্থের লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে, গোখুরা সাপের মাথার এটুলী লইয়া কোথাও যাত্রা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। সে কারণ, অজ্ঞ-লোককে ভুলাইয়া টাকা লইবার জন্য সাপুড়িয়ারা গোক্ষুর ও কুকুরের

গায়ের এট্‌লী, সাপের মাথায় লাগাইয়া রাখে। সাপ খেলাইতে গেলে যদি কোন লোক এট্‌লী চায়, তাহাকে সেই এট্‌লী তুলিয়া দিয়া টাকা কাপড় গ্রহণ করে। লোকটী এট্‌লী পাইয়া কৃতার্থ হয়।

গোখুরা সাপ হইতে অজ্ঞ-লোকের আরও একটা উপকার আছে। যে সময়ে দুইটা গোখুরা সাপ সঙ্গত হয়, তখন সেখানে ধৌত-চাদর পাতিয়া দিলে, সাপ দুইটা যদি সেই চাদরের উপরে আসিয়া খেলা করে, তাহা হইলে সেই চাদর লইয়া রাজসভা, দেবসভা, গন্ধর্ব্বসভা, যেখানে যাইবে, সেই খানেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রবাদ আছে, মহারাজ মানসিংহের কাছে নাকি সাপের এট্‌লি ও এইরূপ কাপড়ের পাগড়ী ছিল, তাই তিনি অকবর বাদসাহকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন।

গোখুরা সাপ লোকালয়ে অধিক থাকে। ইঁদুর খাইবার জন্য তাহারা মানুষের বাটীতে আসে, পরিশেষে খাদ্যের সুবিধা হয় বলিয়া সেইখানেই বাস করে। অনেকের বিশ্বাস আছে, সাপে নিজে গর্ত্ত কাটিতে পারে না, ইঁদুরের গর্ত্তেই ইহারা বাস করিয়া থাকে। এটী লোকের ভুল। শূকরে যেমন কসের দুই পাশের বড় দাঁত দিয়া ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করিয়া মাটী খুঁড়িয়া যায়; সাপেরাও ঠিক তদ্রূপ মুখের দুই পাশের বড় দাঁত দিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে গর্ত্ত কাটে। ইহার পরীক্ষা দেখা দুর্ঘট নয়। একটা নতন-ধরা সাপের লেজ ধরিয়া তাহার মাজার উপরে অল্প জোরে একটা লাঠী চাপিয়া রাখিলে সে কিছুক্ষণ ফণা তুলিয়া থাকিবে; পরে মাথা নামাইয়া এদিক্ ওদিক্ পলাইবার চেষ্টা করিবে, শেষে গর্ত্ত কাটিতে থাকিবে। আর এক পরীক্ষা আছে। যে গর্ত্তে সাপ থাকে, দিবসে তাহার ভিতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত মাটী দিয়া বুজাইয়া দিলে, রাত্রির মধ্যে সাপটা মাটী কাটিয়া বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু গোবর দিয়া গর্ত্ত বুজাইলে সাপেরা সেদিকে যায় না। সাপের নাকে গোবরের গন্ধ সহ্য হয় না।

গোখুরা সাপ দুর্গন্ধি দ্রব্য ভাল বাসে না; দুর্গন্ধি স্থানে বাস করিতে চায় না। প্রবাদ আছে, সাপেরা পাকা কাঁটালের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। এ কথাও মিথ্যা নয়। পাকা কাঁটালের উগ্রগন্ধ ইংরাজেরা সহ্য করিতে পারে না; দেখিয়াছি, সাপেরও ঠিক সেই রকম প্রকৃতি। কাঁটালের গন্ধ ইহাদেরও বড়ই অসহ্য।

গোখুরা সাপ সঙ্গীত-প্রিয়। রাত্রিকালে বেহালা, সেতারা, পি-এনো, বাঁশি প্রভৃতির মধুর সুর শুনিলে সেখানে সাপ আসে। সিস্ শুনিলেও সাপ আসে, তাই রাত্রিকালে সিস্ দিতে নাই।

কেয়া প্রভৃতি ফুলের গন্ধ পাইলে সেখানেও সাপ আসে। সাপেরা পাকা পটল, পাকা আতা, আম প্রভৃতি মিষ্ট ও সুরস দ্রব্য খায়; কেবল যে, ভেক ইঁদুর প্রভৃতি জীবজন্তু খায় এমত নহে। ক্ষেত্রে পটল পাকিয়া থাকিলে তাহা আহার করা বিঘ্নশূন্য নহে।

সাপের মল মূত্র একপথ দিয়া নির্গত হয়। সাপের বিষ্ঠায় বিস্তর কৃমি থাকে। বিষ্ঠা দেখিতে চূণের মত। লোকের বিশ্বাস যে, কাহারও হাতে সাপে মলত্যাগ করিলে, তাহার জল অশুদ্ধ।

সাপেরা গর্ত্তের ভিতরে বড় হাঁড়ী করে। সেই হাঁড়ীর ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া থাকে। হাঁড়ী হইতে বাহির হইবার জন্যে দুই তিনটী পথ করিয়া রাখে। কোন কোন স্থলে দেখিয়াছি এক একটী পথের মুখ দুই তিন শত হাত দূরে। কেহ হাঁড়ী খুঁড়িতে গেলে সেই পথ দিয়া তাহারা পলাইয়া যায়। একটা সঙ্কেত দেখিয়াছি, সঙ্কেতটা প্রায় ব্যর্থ হয় না। কোথাও যদি গর্ত্ত হইতে সাপ মুখ বাহির করিয়া রাখে, এবং মানুষ দেখিলেই মুখ গুটাইয়া ভিতরে লুকায়,—এইরূপ দুই তিন দিন দেখিতে পাইলে, নিশ্চিত জানিবে,—সে সাপটা কেউটিয়া কিংবা গোখুরা।

সাপেরা কদাচ আপনার বাসস্থান ত্যাগ করে না। কোন বাটীতে সাপ ধরিয়া দুই ক্রোশ পথ দূরে ফেলিয়া দিয়া আইস, রাত্রির মধ্যে আবার সে নিজের গর্ত্তে ফিরিয়া আসিবে। অনেকে সাপকে হিংসা করে না। সাপ, ব্রাহ্মণ; হিংসা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। এই বিশ্বাসে বাটীতে সাপ ধরা পড়িলে তাহাকে মাঠে কিংবা অন্যত্র ছাড়িয়া দিয়া আসে। কিন্তু সাপকে ছাড়িয়া দিলে সে আপনার বাসস্থান ভুলে না।

একদিনে না হউক, দুই তিন দিনের মধ্যে সে পুনর্ব্বার আপনার গর্ত্তে আসিয়া আশ্রয় লয়। অতএব সাপকে ছাড়িয়া দিলে কোন ফল নাই। এত বড় কাল শত্রুকে দেখিলেই বিনষ্ট করিবে।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, মাছের মাদ্দা নাই, এবং সাপের সাপা নাই। অর্থাৎ ইহাদের পুরুষ-জাতি নাই, সমস্তই স্ত্রী। এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। সাপের মধ্যেও পুরুষ, স্ত্রী এবং ক্লীব আছে। মাছের মধ্যেও পুরুষ, স্ত্রী এবং ক্লীব আছে। তবে কথা এই, মাছের এবং সাপের স্ত্রীজাতিই অধিক। কেন অধিক, সে কথার ঠিক উত্তর দিতে পারি না। বর্ষাকালে মাছ ধরিলে তাহাদের অধিকাংশেরই পেটে ডিম থাকে, খুব অল্প মাছ ষাঁড়া,—অর্থাৎ তাহারা পুরুষ কিংবা ক্লীব। সাপেরও ঠিক সেইরূপ দেখা যায়। ইহার কারণ কি? বানরীর বাচ্ছা হইলে বানরটা অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়,—কি সন্তান হইয়াছে,—পুরুষ না স্ত্রী? মর্দ্দা বাচ্ছা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নষ্ট করে; মেদী বাচ্ছাকে রাখিয়া দেয়। বিড়ালদেরও স্বভাব ঠিক সেই রকম। কিন্তু সর্পজাতি ও মৎস্যজাতি কি তাহাই করে? জানি না; কিন্তু সেরূপ সন্দেহও হইতে পারে। সাপেরা আপনার সলুই আপনি খাইয়া ফেলে, এ চির-প্রথিত প্রবাদ। শুধু প্রবাদ নহে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে কথা এই, তাহারা কি বাছিয়া গুছিয়া খায়?—কেবল পুরুষগুলিকে খায়, আর মেদী বাচ্ছাকে ছাড়িয়া দেয়? এ সমস্যা বড় কঠিন। কিন্তু পুরুষের সংখ্যা কম এবং মেদীর সংখ্যা বেশী দেখিয়া বিশ্বাস তাহাই হয়। বোধ করি, মৎস্যেরাও সেইরূপ আপনাদের মর্দ্দা পোনা খাইয়া ফেলে। যাহারা পলাইতে পারে, তাহারাই বাঁচিয়া যায়। সৃষ্টিকর্ত্তার এমনও নিয়ম থাকিতে পারে যে, উহাদের ডিমে স্ত্রীর ভাগ অধিক এবং পুরুষের ভাগ কম। কিন্তু এ প্রকার অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত কিনা, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

কেউটিয়া সাপ দেখিতে প্রায় গোখুরার মত; দুইয়ে প্রভেদ অতি সামান্য। কেউটিয়া সাপ, গোখুরার চেয়ে অধিক মলিন; ইহার গলার কাঁটী কাল; মাথার পদ্ম ভাল পরিষ্কার নহে। গোখুরার বিষ অত্যন্ত তীব্র, অত্যন্ত মারাত্মক। কেউটিয়া সাপের বিষ তত তীব্র ও তত মারাত্মক নহে। কালী-কেউটিয়া অত্যন্ত কাল। ইহাকেই কৃষ্ণসর্প কহে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদের মতে এই সাপের বিষেই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং পেটের দিকও অপেক্ষাকৃত কিছু কাল। কথিত আছে, বহুকাল হইতে যাহাদের কান দিয়া পূজ পড়ে, কালসর্পের লেজে তৈল ও সিন্দূর মাখাইয়া সেই লেজ কানের ভিতরে বুলাইলে, পূজ পড়া ভাল হয়। শাঁখা-মুটী কেউটিয়ার গায়ে সাদা ও কাল সাদা দাগ আছে। গৌড়ী-ভাঙ্গা কেউটিয়া, কালী-কেউটিয়ার চেয়ে অনেক ফর্সা, ইহাদের চক্ষুও রক্তবর্ণ নহে।

কেউটিয়া সাপ প্রায় লোকালয়ে বাস করে না। তাহারা মাঠে ও বিলে অধিক থাকে। তবে গ্রামের মধ্যে ইটের পাঁজা ও পুরাতন ভগ্ন ইষ্টকালয় পাইলে সেখানেও বাস করে। যে সকল সাপ ঝিল, বিল, ও খালের ধারে ও মাঠে বাস করে, তাহারাও রাত্রিতে নিকটবর্ত্তী গ্রামে আসিয়া মুর্গী, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী নষ্ট করে।

গোখুরা এবং কেউটিয়া সাপেরই স্ত্রী-পুরুষ চিনিতে পারা যায়। ক্লীব সাপ আছে, কিন্তু কখন দেখি নাই। যে সকল সাপের ফণা নাই, তাহাদের স্ত্রী-পুরুষ চিনিয়া দেওয়া অনেকটা কঠিন। পুরুষ-জাতি গোখুরা ও কেউটিয়া সাপের শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক গোল ও দীর্ঘ; ফণা বড় ও গোল এবং চক্ষু কিছু উপর দিকে উঠানো। স্ত্রী-জাতীয় সাপ, অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট এবং তাহাদের শরীর সরু ও চেপ্টা; ফণা লম্বা, সরু ও ছোট।

গোখুরা এবং কেউটিয়া সাপ স্বজাতির সঙ্গেই মিলিত হয়। স্বজাতি না পাইলে, ডাঁড়া এবং ঢোঁড়া সাপের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া থাকে।

গোখুরা এবং কেউটিয়া সাপ এককালে যোলটা হইতে পঞ্চাশ-ষাটটা ডিম পাড়ে। যত-দিন না ডিম ফুটে, সে পর্য্যন্ত মেদী সাপটা গর্ত্তের ভিতরে ডিম কোলে করিয়া বসিয়া থাকে। রাত্রিকালে কেবল এক একবার বাহিরে গিয়া চরিয়া আসে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাচ্ছা হইলে মেদীটা বাচ্ছাকে লুকাইয়া রাখে। কিন্তু সাপেরা ডিম পাড়িলে সেখানে স্ত্রী-পুরুষ একত্র বাস করিতে দেখা

গিয়াছে। স্ত্রী-সাপেও নাকি আপনার বাচ্ছা খাইয়া ফেলে। সাপের বাচ্ছাকে স্থান-বিশেষে সন্নই এবং স্থান-বিশেষে ডেকা কহে।

ইনি এবং চিতি জাতীয় কোন কোন সাপের ডিম হয় না। তাহাদের জরায়ু-মধ্যেই বাচ্ছা জন্মে। গর্ভবতী ইনি এবং যে সকল চিতির গর্ভে বাচ্ছা জন্মে, তাহাদের মুখের উপরে গোবর চাকা দিলেই বাচ্ছা বাহির হইয়া আসে এবং চারিদিকে ছুটিয়া পলায়। কিন্তু পূর্ণ-গর্ভাবস্থা চাই; পূর্ণ-গর্ভাবস্থা না হইলে, বাচ্ছারা পলাইতে পারে না।

কোন্ সাপের বিষ আছে, আর কোন্ সাপের বিষ নাই, দাঁত দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে সকল সাপের বিষ নাই, তাহাদের মুখের উপর-পাটীতে দুই সারি দাঁত আছে। এক সারি তালুর দিকে এবং আর এক সারি তাহার সম্মুখ দিকে। ইহাদের নিম্ন-পাটীতে দুই সারি দাঁত। বিষাক্ত সাপের সে প্রকার নয়,—তাহাদের কেবল উপর-পাটীতেই দাঁত আছে। নির্ব্বিষ সাপের মত ইহাদের উপর-পাটীতে দুই সারি দাঁত। তাহার মধ্যে তালুর দিকের দন্তপাঁতি কিছু উচ, সম্মুখ পাঁতির দাঁত কিছু বসা। তদ্ভিন্ন উপর কসের দুই পাশে দুইটী করিয়া চারিটী বিষদাঁত আছে। তাহার মধ্যে বড় বিষদাঁত একটি সম্মুখে, ছোট বিষদাঁত কসের দিকে। বড় বিষদাঁত বিড়ালের নখের মত বক্র। বিষদাঁতের গোড়া হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পেয়াজের কোয়ার মত দুইটী কোষ আছে। তাহাই বিষের আধার। ঐ কোষ হইতে বিষদাঁত পর্য্যন্ত সূত্রের মত খুব সরু ছিদ্র আছে। বিষদাঁতেরও অগ্রভাগ হইতে কিঞ্চিৎ উপরে সরু ছিদ্র আছে। সাপে দংশন করিয়া বিষ ঢালিয়া দিলে, বিষকোষ হইতে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পথ দিয়া বিষ আসে; তাহার পর দাঁতের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সাপুড়িয়ারা বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেয় এবং বিষকোষ তুলিয়া ফেলে, তাই খেলাইবার সময়ে তাহাদিগকে দংশন করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেও শীঘ্র শীঘ্র আবার তাহা গজাইয়া উঠে ও বিষের কোষে বিষ জন্মে। সে কারণ সাত দিন অন্তর বিষদাঁত ভাঙ্গিতে হয়। সাপুড়িয়াদের মুখে শুনিয়াছি যে, পনর দিন অন্তর বিষদাঁত ভাঙ্গিলে কোন ক্ষতি হয় না।

একজাতীয় বেদিয়া আছে তাহারা প্রতারক। লোককে ফাকি দিয়া টাকা লইবার জন্য নানা-প্রকার কৌশল করে। তাহারা বিষদাঁত ভাঙ্গে না, কেবল বিষকোষ তুলিয়া ফেলে এবং দাঁতে বিষ আসিবার যে সূত্রবৎ পথ আছে, তাহাও কাটিয়া দেয়। এই জাতি মালেদের কোমরে ছোট ছোট অনেক মাদুলী থাকে; তাহারা ঝুলীর ভিতরে অনেক প্রকার ঔষধ ও পাথর রাখে। গ্রামের পাশে মাঠের মধ্যে যেখানে অনেক লোক দেখে, সেইখানে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাই খনন করিতে বসে। খনন করিতে করিতে সুযোগমত নিজের পোষা সাপ বাহির করিয়া তদ্দ্বারা আপনার শরীর দংশন করায়। দর্ দর্ করিয়া শোণিতধারা বহিতে থাকে। তখন সাপুড়িয়াটা চীৎকার করিয়া ঢুলিয়া পড়ে; চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। সাপুড়িয়া, তাহাদিগকে বলে,—"আমার কোমর হইতে শীঘ্র একটা মাদুলী ছিঁড়িয়া আমার মুখে দাও; আমাকে সাপে কামড়াইয়াছে, আর বাঁচি না।"

লোকে ত্রস্ত হইয়া তাহাই করে। প্রতারক বেদিয়া তখন উঠিয়া বসে, নিজের ঝুলি হইতে নানাপ্রকার শিকড় বাহির করিয়া চিবাইতে থাকে এবং ক্ষতস্থানে বিষপাথর লাগাইয়া দেয়। অজ্ঞ-লোকেরা এই সকল চাতুরীতে ভুলিয়া যায়; তাহার পর টাকা কাপড় প্রভৃতি নানা দ্রব্য দিয়া মাদুলা, শিকড় এবং পাথর ক্রয় করে।

গৃহস্থের বাটীতে সাপ প্রবেশ করিলে, গৃহস্থেরা সাপুড়িয়াকে ডাকিয়া আনে। সাপুড়িয়ারা প্রথমে ঘরের প্রকৃত সাপ বাহির করিবার জন্য অনেক যত্ন করে। প্রকৃত সাপ না পাইলে, শেষে নিজের পোষা সাপ বাহির করিয়া দেয়। গৃহস্থেরা, সাপুড়িয়াকে টাকা কাপড় প্রভৃতি দিয়া সন্তুষ্ট করে।

সাপটা যথার্থই নূতন-ধরা হইয়াছে কি না এবং তাহার বিষ আছে কি না, তাহা নিশ্চিত করা কঠিন নহে। নূতন-ধরা সাপের খুব তেজ; হড়ুপীতে ফুঁ দিয়া তাহাকে রাগাইতে হয় না। হড়ুপীতে হাত দিয়া ঘাঁটিয়া তাহাকে তুলিতে হয় না। হড়ুপীর ঢাকা খুলিলেই সে ফণা ধরিয়া উঠে এবং বারংবার ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে দংশন

করিতে যায়। সাপেরা প্রতিবৎসর একবার করিয়া খোলস ছাড়ে। নূতন খোলস ছাড়িলে, তিন চারি দিন সাপের তেজ থাকে না। অতএব যেখানে সহজে সন্দেহ ভঞ্জন না হইবে, তেমন স্থানে একটা হাঁস কিংবা মুর্গীকে দংশন করাইতে হয়, তাহা হইলেও মুখে বিষ আছে কিনা বুঝিতে পারা যায়। সাপটার মুখের ভিতরে লাঠী পুরিয়া দিলেও, বিষ আছে কিনা, তাহার পরীক্ষা হইতে পারে। বিষ থাকিলে, লাঠীতে দংশন করিলে দর্ দর্ করিয়া তাহা বাহির হইয়া থাকে।

সাপের বিষ, কি রকম, বিষের ক্রিয়া কি প্রকার, কোনও দ্রব্যে বিষের তেজ নষ্ট হয় কি না, সর্পাঘাতের চিকিৎসা প্রভৃতির বিবরণ বারান্তরে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। এখন পাহাড়ী বড় বোড়া সাপের বৃত্তান্ত লিখি। ক্রমে অন্য অন্য সাপের বিবরণ লিখিব।

বৃহৎ পাহাড়ী বোড়া।
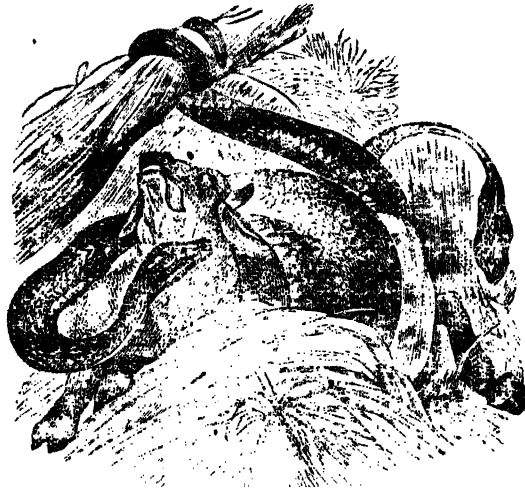
সকল সাপের চেয়ে পাহাড়ী বোড়া সাপ অত্যন্ত বড়। বোধ করি, ইহার মত বৃহদাকার সর্প পৃথিবীতে আর নাই। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকেই অজগর কহে। অজ শব্দে ছাগলকে বুঝায় এবং গর শব্দের অর্থ ভোজন। যে সাপ, ছাগল ধরিয়া খায়, তাহাই অজগর।

আসিয়ায়, আফ্রিকায় এবং আমেরিকায় বড় বড় পাহাড়ী বোড়া সাপ আছে। আসিয়ায় ও আফ্রিকায় যে সকল বোড়া সাপ আছে, তাহাদের নাম পাইথন্। আমাদের ভারতবর্ষে পাইথন্ রেটিকিউলস (*Python reticulatus*) জাতীয় বোড়া সাপ, সকলের চেয়ে অধিক বড়। আমেরিকার পাহাড়ী বড় বোড়ার নাম বোয়া কন্সট্রিক্টর (*Boa constrictor*)।

খুব বড় বড় পাহাড়ী বোড়া সাপেরা, অনায়াসে ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, সিংহ এবং বড় বড় হাতীকেও ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। এখানে বড় পাহাড়ী বোড়া সাপের একটা চিত্র দেওয়া হইল। সাপটা, একটা গোরুকে শিকার করিয়াছে। গোরুটার গলায় কামড়াইয়া আছে; পেটে আপনার সকল শরীর জড়াইয়া বেড় দিয়াছে; তবু পাছে পলাইয়া যায়, সে কারণ গাছেও নিজের লেজ জড়াইয়া রাখিয়াছে।

সচরাচর পাহাড়ী বোড়া সাপ দশ-পনর হাত দীর্ঘ এবং বাঁশের মত মোটা। কিন্তু ষাট, সত্তর এবং আশি হাত দীর্ঘ বোড়া সাপও অনেকে দেখিয়াছেন। ইহাদের চক্ষু ক্ষুদ্র; সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ ও হরিদ্রাবর্ণে চিত্রিত। আমাদের দেশে হিমালয় পর্ব্বতে এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এই জাতীয় সর্প অনেক আছে। আসামের জঙ্গলে মধ্যে মধ্যে অনেক পাহাড়ী বোড়া দেখিতে পাওয়া

যায়। বাঙ্গালা দেশে এ সাপ নাই। কিন্তু বর্ষাকালে বন্যার জলে দুই একটা ভাসিয়া আসে; তাহাদিগকেই আমরা এদেশে দেখিতে পাই।

১২৭৩ সালের শ্রাবণ মাসে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত গণুটীর রেশমের কুঠীর সম্মুখে একটা বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়, ময়ূরাক্ষী নদীর জলে ভাসিয়া আসিয়াছিল। কখন আসিয়াছিল, কেহ দেখে নাই। নদীর ধারে নিবিড় কেশে ও শরবণ; সাপটা তাহার ভিতরে লুকাইয়া ছিল। প্রায় এক প্রহর বেলা হইলে রাখালেরা, গোরু বাছুর ও ছাগল ভেড়া আনিয়া সেইখানে ছাড়িয়া দিল; তাহারা এদিক্ ওদিক্ চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাচ্চা ছাগল তখনি মাতৃস্তন টানিতেছে; তখনি তুড়ুক্ তুড়ুক করিয়া লাফাইতেছে; তখনি আবার দুইটা বাচ্চায় ঢু-মারামারি করিতেছে। ভেড়াগুলা শরবণের পাশে চরিতেছে; বড় বড় গাভিগুলা বনের ভিতরে ঢুকিয়াছে; বাছুরেরা গাছের ছায়ায় শুইয়া আছে। রাখালেরা কেহ ধূলা জড় করিতেছে; কেহ ধূলা ছড়াইতেছে; কেহ কেশের টুপি করিয়া মাথায় পরিতেছে। সকলেই অন্যমনস্ক,—আপন-আপন কাজে সকলেই অন্যমনস্ক। ইত্যবসরে বন হইতে বৃহদাকার কি জন্তু মুখ বাড়াইয়া একটা ভেড়া ধরিল; ধরিয়াই তৎক্ষণাৎ গিলিয়া ফেলিল। রাখালদের কেহ দেখিতে পাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পথ দিয়া লোক যাইতেছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেশ স্পষ্ট দেখিল; কেহ একটুকু একটুকু দেখিল; কেহ কিছুই দেখিতে পাইল না। কিন্তু সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল; কবির টাঁকিসুরে খুব চিতানে,—"বাঘ", "বাঘ",—করিয়া সকলেই চীৎকার করিল। যাহারা দেখিয়াছিল তাহারাও চীৎকার করিল; যাহারা কিছুই দেখে নাই, তাহারাও "বাঘ বাঘ" শব্দ করিয়া কুঠীর ভিতরে ছুটিয়া পড়িল।

কুঠীর বানকে প্রায় পাঁচ সাত শত কাটানী, পাকদার, সর্দার, দফাদার। স্ত্রী পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা,—সকল রকমের মানুষ। বাঘের কথা শুনিয়া সকলেই লাঠী সোঁটা লইয়া ছুটিল। সম্মুখে যে যাহা পাইল তাহাই লইয়া ছুটিল। কত লোক আস্ফালন করিয়া আসিল, আসিয়া খুব দূর হইতে ভুজবীর্য্যের স্পর্দ্ধা দেখাইতে লাগিল। কত লোক গাছের উপরে উঠিয়া অসামান্য বিক্রম প্রকাশ করিল। কুঠীর অধ্যক্ষ স্বয়ং হেন্‌রি রেট্ সাহেবও প্রথমে নিজ খাস কামরার ভিতরে চেয়ারে হেলান দিয়া অনেক অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাম-হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ কামড়াইতে কামড়াইতে তিনি পুনঃপুনঃ আমদাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন,—"টবে সেইটী হয় নিশ্চিট্ট রয়েল টাইগার।" তিনি এই কথা কতবার যে, বুঝাইয়া দিলেন তাহা কে গণিয়া ফুরাইতে পারে। তাহার পর যখন ঠিক হইল, জানয়ারটা বাঘ নয়,—সাপ; মহাবীর রেট সাহেব, অমনি বন্দুকে গুলি ভরিয়া ছুটিলেন। এক গুলিতেই সাপটা কাতর হইয়া পড়িল; শেষে অন্য অন্য লোকে লাঠীর প্রহারে তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিল। বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া; তের-হাত লম্বা, বাঁশের মত মোটা মৃত্যুকালে ভেড়াটা উগারিয়া ফেলিয়াছিল; তখন ওজনে বত্রিশ সের হইল।

মানভূম জেলার পর্ব্বতেও বড় বড় বোড়া আছে। ১২৬৫ সালে দুইজন কুর্ম্মী, দল্‌মার পাহাড় হইতে একটা বড় বোড়া সাপ পুরুলিয়াতে আনিয়া তাৎকালীন ডেপুটি কমিশ্যনর্ ওকস এবং ডাক্তার ইলিস্ সাহেবকে নানা প্রকার বুজরুকি দেখাইয়াছিল। সাপটা প্রায় আট হাত দীর্ঘ।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, রোমকেরা সসৈন্যে আফ্রিকায় আসিলে একটা বৃহদাকার বোড়া, তাঁহাদের অনেক সৈন্য গিলিয়া ফেলিয়াছিল। রোমকেরা সেই সাপকে মারিয়া তাহার চর্ম্ম রোমনগরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। মাম্মুদের সমসাময়িক লোক, আবুল ফজল বৈহকী তৎপ্রণীত তারিখ-ই-নারিসী নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,—গজনীর সুলতান মাম্মুদ, সোমনাথ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে বৃহদাকার একটা পাহাড়ী বোড়া সাপ মারিয়াছিলেন। তাহার চর্ম্ম গজনীনগরের সিংহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। চর্ম্ম খানা ষাট হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত প্রশস্ত।

পাহাড়ী বোড়া আশ্চর্য্য কৌশলে শিকার

করে। ক্ষুধার্ত্ত হইলে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকারী জন্তুরা, হ্রদ, নদ ও নির্ঝরের ধারে ঝোঁপের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। কোন জন্তু জল খাইতে আসিলে তাহার উপরে লাফ দিয়া পড়ে। পাহাড়ী বোড়া সাপও ঠিক সেইরূপ করে। ক্ষুধা পাইলে ইহারা হ্রদ, নদ ও নির্ঝরের ধারে গিয়া বড় গাছের ডালে লেজ লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাদের মলদ্বারের কাছে বড়শীর মত বক্র হাড় আছে। ডালে লেজের অগ্রভাগ জড়াইয়া সেই বক্র হাড় লাগাইয়া দেয়, তাহাতে অনায়াসে ঝুলিতে পারে। দুর্দ্দান্ত বন্যহস্তীও খুব জোরে টানিলে ছাড়িয়া আসে না।

ডালে লেজ লাগাইয়া ইহারা নিস্তব্ধ ভাবে প্রতীক্ষা করে; নড়ে চড়ে না; যেন গাছেরই একটা শুষ্কডাল ঝুলিয়া রহিয়াছে; এইরূপ অবস্থায় চুপ করিয়া থাকে। কোন জন্তু জল খাইতে আসিলে অমনি একটু দুলিয়া তাহার উপরে গিয়া পড়ে। শিকারকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পেটে বেড় দিয়া গাছে লেজ লাগাইয়া দেয়। শিকারটা তখন টানাটানি করিয়াও আর শত্রুর মুখ ছাড়াইতে পারে না। একবার ধরিতে পারিলে দুর্জ্জয় বন্যহস্তীও পাহাড়ী বোড়ার কাছে পরাস্ত হয়। সাপটা শিকারের পেটে জড়াইয়া গাঁইট কসার মত জোরে কসিতে থাকে, তাহাতে বড় বড় পশুরও পঞ্জিপঞ্জর মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। এই কারণে গোরু, মহিষ, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি বড় বড় বন্য পশুকে একবার ধরিতে পারিলে তাহারা পাহাড়ী বোড়ার মুখ ছাড়াইয়া পলাইতে পারে না। আবার সাপটা নিজে ইচ্ছা করিলেও যে, সহজে শিকারকে ছাড়িয়া দিবে তাহারও যো নাই। ইহাদের নিম্ন-পাটিতে একসারি দাঁত এবং উপর-পাটিতে দুই সারি দাঁত। সেই দুই পাটি দাঁত মুখের ভিতর দিকে বাঁকানো। কাজেই শিকার গিলিতে যে প্রকার সুবিধা হয়, ছাড়িয়া দিতে সে প্রকার সুবিধা হয় না। ছাড়িতে গেলে দাঁতে আটকিয়া যায়।

ইহারা কোন জন্তুকে ধরিয়া মুখের লালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দেয়। বিধাতা ইহাদের মুখে ফেনের মত প্রচুর লালা করিয়া দিয়াছেন। সেই ফেনের মত লালায় জন্তুটার সকল শরীর হড়হড়ে পিছল হইয়া পড়ে; তখন মুখ মেলিয়া ক্রমে ক্রমে শিকারের দিকে সরিয়া সরিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটা উদরস্থ হয়। শিকার গিলিয়া আপনার শরীর বড় মোটা গাছে বেড় দিয়া মোচড় দিতে থাকে, তাহাতে মহিষাদি বৃহৎ জন্তুর হাড়ও মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়।

পাহাড়ী বোড়া সাপের মাড়ীর গড়ন অতি আশ্চর্য্য। অন্য অন্য জন্তুর মাড়ীর হাড় জোড়া; মনে করিলে কেবল দুই কস মেলিয়া মুখ বিস্তীর্ণ করিতে পারে। কিন্তু পাহাড়ী বোড়ার চোয়ালের হাড় সে প্রকার জোড়া নয়; এক এক খানি হাড় পৃথক্ করিয়া সাজানো; তাই সকল দিকেই চোয়াল খেলিয়া বেড়ায়। এক দিকের কস না নাড়িয়া ইহারা অন্য দিকের কস নাড়িতে পারে। আবার মনে করিলে পাশের দিকেও হাঁ বড় করিতে পারে, উপর দিকেও হাঁ বড় করিতে পারে।

বড় বড় জন্তু গিলিবার সময়ে পাছে বুকে চাপ লাগিলে শ্বাস রোধ হয়, সে কারণ ইহাদের ফুস্ফুসে দুইটী কোষ আছে। তাহার মধ্যে একটী কোষ ছোট, আর একটী কোষ বড়। বড় কোষের প্রান্তভাগে বায়ু থাকিবার জন্য একটী আধার আছে। বড় বড় জন্তু গিলিবার সময়ে যখন বুকে চাপ লাগে, কাজেই নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার কিছু ব্যাঘাত ঘটে, তৎকালে সেই আধার-স্থিত বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কৃত হয়।

পাহাড়ী বোড়া সাপের পেটে অত্যন্ত কৃমি জন্মে। এই রোগে বিস্তর সাপের মৃত্যু হয়। এই সাপকে শিকার করা বড় দুষ্কর। কেবল একটী সুবিধা আছে। পশ্বাদিকে খাইয়া ইহারা অনেক দিন এক স্থানে চুপ করিয়া ঘুমায়; নড়িতে চড়িতে পারে না। সেই সময়ে অনায়াসে ইহাদিগকে বিনষ্ট করা যায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব সমাপ্ত।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত।

বন-নিবাসিনী তুমি তাপসকুমারী
রমণি, তবুও যদি কলুষ-চিন্তায়
কলঙ্কিত করিয়াছ আপন অন্তরে,
পারে কি করিতে তাহা চন্দ্রবংশপতি?
আশা-মদে মত্ত তুমি, লিখিয়াছ মোরে—
আশা-মদে মত্ত হন—দুরাশার ছলে
ছলিত—কেমনে কহ কি ভাবিয়া মনে
লিখেছ এ লিপি মোরে? নয়নে কখন
দেখি নাই মূর্ত্তি তব—কখন শ্রবণে
শুনি নাই কেবা তুমি;—এ লেখন তবে
আপনা ভুলিয়া তুমি লিখিলে কেমনে?
পাগলিনী সত্য তুমি—মত্ততায় মনে
আপনারে ভাব নিত্য রাজার মহিষী—
এ মহৎ মনোরথ উঠিল যে কেন
সামান্য হৃদয়ে তব বলিব কেমনে?
কিন্তু উন্মাদের মনে সকলি সম্ভবে—
জ্ঞানহীন—জ্ঞানহীন বালিকার মত
আকাশের গায়ে দেখি বাসবের ধনু
ধরিবারে চাহ তাহা—শুধু বিড়ম্বনা!
মহামুনি কণ্বঋষি—মুনিকুলোত্তম—
পিতা তব লিখিয়াছ—শুনি নাই কভু
হেন কথা—হে বিধাতঃ, 'পূর্ণশশী হ'তে
জনমিবে কোন্ পাপে আঁধারের রাশি?,
সুপবিত্র হিমালয় পর্ব্বত হইতে
কোন্ পাপে কর্ম্মনাশা লভিবে জনম?
একি কথা শুনি পুনঃ—লিখিয়াছ তুমি,
জনক জননী তব ত্যজিয়াছে তোমা
শৈশবে—তাপসশ্রেষ্ঠ কণ্ব মহামতি
নহে জন্মদাতা তব;—কার কন্যা তুমি?
জনক-জননী তব ত্যজিলা কি হেতু
তনয়ারে কহ?—এবে বুঝিলাম মনে
জারজ সন্তান তুমি—মুনির পালিতা।
এত স্পর্দ্ধা, এত আশা, হৃদয়ে তোমার—
আমার মহিষী হবে স্বৈরিণী-দুহিতা?
পয়োনালা পড়ে কভু সাগর-সঙ্গমে?
কাচখণ্ড শোভে কিগো রাজার মুকুটে?
স্বর্ণশৃঙ্গ রাজে সদা হিমাদ্রির শিরে,
কাদম্বিনী পশিতে কি পারে লো সেখানে?
কিঙ্করী করিতে তোমা লিখিয়াছ মোরে—
বলিহারি ধূর্ত্ততায়—মম অন্তঃপুরে,
দ্বিচারিণী-নন্দিনীর নাহি স্থান কভু।
প্রবঞ্চনা-পরিপূর্ণ রমণী-হৃদয়
জানি চিরদিন—কিন্তু জাননা কামিনি,
ন্যায়ভাবে, ধর্ম্মভাবে সদা উছলিত
হৃদয় আমার নিত্য—বিচলিত কভু,
নহি আমি মধুমাখা অসত্যবচনে;—
জলনিধি উছলিত কলানিধি হেরে
নিয়তই—শত শত তারকার হাসি
বিচলিতে নারে তাহে, দেখ ভাবি মনে।
এ জীবনে অধর্ম্ম না করি আমি কভু
জ্ঞানমতে—রাজভোগ, রাজসিংহাসন,
ছত্র, দণ্ড, সুখ, যশঃ, যত কিছু বল,
ধর্ম্মের অধীন সব—পৌরব কখন
ধর্ম্মে তেয়াগিতে নারে;—যত কর্ম্ম মম
সূর্য্যের আলোক-সম প্রকাশিত লোকে।
কেন কহ ধর্ম্ম তব করিয়া হরণ
মন সহ, তেয়াগিব কোন্ অপরাধে?
রমণীর মন লয়ে এ খেলা খেলিব
ভারতের পতি হয়ে কিসের কারণে?
অবলার সুখ আমি হরিব কি হেতু?
ধর্ম্মপত্নী যদি আমি করিয়াছি তোমা—
হৃদয় তোমারে যদি করিয়াছি দান—
সেবিয়াছ তুমি যদি পতিভাবে মোরে—
ত্যজিয়া তোমারে তবে রহিয়াছি কেন?
কেন না লইয়া বল আইনু তখনি
মোর সাথে, সিংহাসনে বসাইতে তোমা?
পত্নীরে ত্যজিয়া আমি রহিব কি হেতু?
কি অভাব আছে মম এ ভব সংসারে?
সত্য যদি প্রেমভাবে হৃদয় তোমার
উছলিত মম প্রতি—কেন এ ছলনা?
মিথ্যা প্রবঞ্চনা কভু নারে মজাইতে
এ মোর অন্তরে, সত্য কহিনু তোমারে।
সরলতা মাখাইয়া ধরমের সহ
কেন নাহি জানাইলে হৃদয়ের ভাব?
লতামণ্ডপের তব কেন এ বর্ণনা?
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কথা তরুবর মূলে,
কুঞ্জবনে ফুলশয্যা কানন-বাসরে,
প্রেমের গীতিকা লেখা, কেন এ কল্পনা?
হাসি আসে পড়িতে এ লিপিখানি তব!
কেন কাম, শর তব—কুসুম-রচিত—
এত তীক্ষ্ণ?—ভস্মশেষ হর-কোপানলে

হয়েছিলে তুমি জানি—কেমনে বল না
নর-নারী-হৃদে তবে জলন্ত অনল
কর উদ্দীপিত তেজে; পোড়াইয়া যত
ধর্ম্মভাব—বিবেকেরে ভস্মরাশি করি'—
মহাদেব-নেত্র-জন্মা অনলের কণা
পরশনে, ফুলশরে অগ্নিময় শিখা
জ্বলিতেছে দিবানিশি—তা, না হলে কভু
বাড়ব অনল সম জ্বলে অহরহ
নরহৃদে কাম, তব ফুল-শরাঘাত?
শতেক কল্পনা-জাত কু-চিন্তায় আরো
দ্বিগুণিত তেজে জ্বলে জ্বালাময়ী শিখা।

ঋষির পালিতা তুমি, শান্ত তপোবনে,
শকুন্তলে—নিয়তই পবিত্রতা ছবি
দেখিতেছ চারিদিকে—বনস্থলী তথা
শান্তিদেবী সহ সুখে বিরাজেন সদা।
কতবার দেখিয়াছি মুনির আশ্রম
মিথ্যা-প্রতারণা-শূন্য, কিবা পুণ্যময়—
হিংস্র জন্তু যত নিজ স্বভাব ভুলিয়া
মৃগশিশু সনে সদা করে বিচরণ।
এই নিশানাথে আমি দেখিয়াছি তথা
উজ্জ্বলিত শতগুণ নির্ম্মল কিরণে—
পবিত্র তটিনী যেন আশ্রম-চরণ
ধৌত করি প্রবাহিত—মুনি-তপোবনে
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কিছু নাহি তথা।
লতা, তরু, গুল্ম সদা কুসুম-শোভিত—
কুসুম পূরিত সদা মধুর সৌরভে—
শত অলি সে সৌরভে নিয়ত আকুল—
সুধাকণ্ঠী বিহঙ্গম মধুর সঙ্গীতে
শান্তি পবিত্রতা স্রোতঃ উথলয়ে হৃদে।
পুলক-পূরিত চিত্তে মুনির কুটীরে
শিষ্যবৃন্দ মহানন্দে বিভুগুণ গায়—
রত তত্ত্বজ্ঞান লাভে;—থাকি' সে আশ্রমে,
হা ধিক্ রমণী জাতি,—পুণ্যপথ ত্যজি,'
কামের ছলনে ভুলি,' দীপ-শিখাগামী
পতঙ্গের মত, আজি পশিয়াছ কেন
গভীর পাপের তীব্র জ্বলন্ত অনলে?
নারীর হৃদয়ে কভু নাহি থাকে বোধ
ধর্ম্মাধর্ম্ম কালাকাল মদন তাড়নে,
জানিলাম ধ্রুব আজি;—হায় রে বিধাতঃ,
কোন্ পাপে কল্পদ্রুম নিজভাব ত্যজি'
অসিপত্র-বৃক্ষ-ভাব করয়ে ধারণ?
কোন্ পাপে সঞ্জীবনী লতিকারে মরি
বিষবল্লী-পরিবৃতা করিস্ বিধাতা?

ভাবিয়াছ মনে মনে, প্রেমলিপি তব
গলাইবে চিত্তে মোর—নিদাঘ-তাপিতা
ভুজঙ্গীর মত তুমি যাচিতেছ যেন
মলয়দ্রুমের ছায়া—বৃথা সে বাসনা।
সদাচার-শুচি সদা নিরমল কুল
চন্দ্রবংশ—শত শত রাজেন্দ্র যে কুলে
জনমিয়া করিয়াছে উজ্জ্বল তাহারে;—
উষ্ণবায়ু পরশনে দরপণে যথা
কলঙ্কের ছায়া পড়ে, স্বচ্ছ সেই কুলে
এ পাপের পরশনে চন্দ্রবংশপতি
কেমনে করিবে বল কলঙ্কিত আজি?
অযুত তরঙ্গ-কর বিস্তারি' সঘনে
যমুনা ডাকিয়া উচ্চে কহিছে আমারে—
'রাখ চন্দ্রবংশমান চন্দ্রবংশপতি'।
ন্যায়পন্থা ধর্ম্মপন্থা তেয়াগিয়া পাছে
অধর্ম্মের করে করি আত্মসমর্পণ
ভুলিয়া কামের ছলে, এই ভয়ে যেন
আকাশ ডাকিয়া মোরে কহিছে গম্ভীরে
বজ্রনাদ স্বরে অই সু-উচ্চে নিনাদি
'রাখ চন্দ্রবংশমান চন্দ্রবংশপতি'।
দীর্ঘ তরু-বাহুদলে দোলাইয়া যেন
কহিছেন হিমাচল ডাকিয়া আমারে
পবন-স্বনন নাদে সুদূর হইতে
'রাখ চন্দ্রবংশমান চন্দ্রবংশপতি'।
আদি-পিতা চন্দ্রদেব অম্বর হইতে
অগণন কররাশি প্রসারিয়া যেন
কহিছেন শুনিতেছি, অভ্রান্ত ভাষায়
'ভুলিও না হে নন্দন, কুহকীর ছলে—
চিরদিন চন্দ্রবংশ উজ্জ্বল জগতে
তব পিতৃপুরুষের সুকৃতি-প্রভায়,
কুহকিনী কামিনীর ছলনায় ভুলি'
কলঙ্কের কালি যেন দিও না সে কুলে।'
আশীর্ব্বাদরূপে যেন কৌমুদীর রাশি
ঢালিছেন শিরে মোর;—আমা হ'তে কভু
হে কামিনি, এ অকার্য্য সম্ভবে কি আজি?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে কেমনে ঢালিব
কূপোদক।—বিষবৃক্ষ রোপিব কেমনে
নন্দনকাননে কহ?—পাতকের ছায়া
পড়িবে কেমনে গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে—
নিত্য মোক্ষফলপ্রদ—কহ লো প্রমদে?

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

রমণী-রেজিমেণ্ট।

নাম শুনিয়াই শিহরিবেন না, নাক শিকায় তুলিয়া ব্যঙ্গ করিবেন না; বিদ্রূপের হাসি হাসিবার সবিশেষ কিছুই ইহাতে নাই। হাস্য, পরিহাস বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় ইহা নয়। প্রকৃত ঘটনা; সত্য বিবরণ। বহুকালের কথা নয়। প্রাচীন ইতিহাসের কুয়াসাময় কুক্ষি হইতে "তত্ত্ব বাহির" করিয়া এ প্রবন্ধ লেখা হইতেছে না। রমণী-রেজিমেণ্ট একালের,—অদ্যকার,—এই মুহূর্ত্তের, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

রমণী-রেজিমেণ্ট 'অসি ধরে', 'রণ করে', রাজা ও রাজ্য [illegible] করে;—তুমি বলিবে,—'তোমার [illegible] সিকতাও উৎপাদন করে!' তাহাতে [illegible] আমি 'নাচার' রমণীর কথা পড়িলেই,— [illegible] এমনি রসিক পুরুষ যে, রসের উৎস [illegible]নাইতে' পার না। পার না, তাহা আমি জানি; জানি বলিয়াই পূর্ব্বাহ্নে বলিলাম। কিন্তু বৎস! [illegible]ণ-রঙ্গিণীর উন্মুক্ত তরবারি [illegible] রুদ-পূর্ণ [illegible] ইডার-বন্দুকের সম্মুখে তোমার [illegible] সিকতা [illegible] তুমি কি পরিমাণে সজীব থাক,—আদৌ জীবিত থাক কি না, সে বিষয়ে সকলেরই গভীর সন্দেহ আছে। কারণ, সুবে বাঙ্গালার সুরসিক পুরুষ-সিংহ শয্যা-সঙ্গিনীর সামরিক শতমুখীর অগ্রভাগ মাত্র দেখিয়াই যখন আঁতকাইয়া উঠেন, তখন তাঁহার রস-ভাণ্ডে [illegible] তহবিলে বড় বেশী কিছু মজুদ থাকে, এমন কেহই অনুমান করেন না। বিলাসিনীর সেই বিলাস-বিক্রমময় ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে বাবু-বার-[illegible] হ "শেষের সে দিন" স্মরণ করিয়া, ভবানীর [illegible] বা পৃথিবীর,—কোন্ করাল-বদনার নাম জপ [illegible]রেন, অভিধানে ঠিক লিখে না; তবে তৎকালে যে তিনি যূপ-কাষ্ঠ-সংলগ্ন মহিষ-পূজার ছাগলের ন্যায় সজল নয়নে কিঞ্চিৎ সন্ধ্যাহ্নিক-পরায়ণ হন, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। বধূ-ঠাকুরাণীর একটা কাঁকা ফুৎকারে, হায়! বাবু-সাহেবের বহুশ্রম-অর্জ্জিত রসিকতার কলসটী শুষ্ক, শূন্য, সটান পরব্রহ্মে লীন,—যেন ইনি আর সে তিনি নন। একটু ভরসা পাইলেই হয়;—সহরে বা সীমান্তে ভলেণ্টিয়ারগিরির সাধ অঙ্কলক্ষ্মীর অঞ্জনের এবং অলক্তকের আড়ালে আমরণ কালের তরে প্রোথিত করিয়া, ভাল করিয়া একটা "চৌতিশা" রচেন অথবা আরও কিঞ্চিৎ নূতন গহনার জন্য সেকরা-বাড়ী প্রয়াণ করেন;—এখন পরমার্থ ভাবের উদয় কি না!—সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থই এই পরমার্থের অন্তর্গত। অতএব মহাশয়েরা বুঝিবেন,—বাঙ্গালীর বীরত্ব-গৌরবের ও রসিকতা-সৌরভের এক বিন্দুও এদিক-ওদিক করা আমার অভিলাষ নহে।

স্বয়ং পরমেশ্বরী রণরঙ্গিণী,—সম্মুখ-সমর-পরায়ণা;—রণক্ষেত্রে অসিহস্তা, বর্ম্মধারিণী,—শত্রু-শোণিতে সমুদ্র বহাইয়া সুরলোকের রক্ষাকর্ত্রী; শক্তি-সংগ্রামে সুরগণ নিরস্ত্র, নিশ্চেষ্ট, অসুর-ভয়ে শঙ্কাতুর,—রক্ষার্থে রমণীর শরণাপন্ন; রণ-বিশারদা রমণী একাকিনীই সব,—সৈন্য এবং সেনাপতি, রথী এবং পদাতি;—একেশ্বরী অসংখ্য অসুরের সহিত লড়িতেছেন,—দুর্দ্দান্ত দানবদিগকে সসৈন্য শাফ্ করিয়া দিতেছেন; দেবগণ কিন্তু দূরে দাঁড়াইয়া;—দূরে দাঁড়াইয়া অবশ্য দুর্গানাম-জপ-পরায়ণ; অসুরদিগের পতনের পরেও, রণ-প্রাঙ্গণের দিকে ঘেঁসিতেছেন না,—প্রাণরক্ষার প্রতিদান স্বরূপ রণক্লান্তা রক্ষয়িত্রীর মস্তকে, বিমানে বসিয়া, পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। এখন শুনিতে পাই যে, যেদেশে রণ আছে, সেদেশে, রণ-বিজয়ী বীর পুরুষদিগের মস্তকে রমণীরাই পুষ্পবৃষ্টি করেন; কিন্তু তখন ব্যাপারটা যেন ঠিক ইহার বিপরীত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। পুরাণেতিহাসে, প্রকৃতি কর্ত্তৃক পুরুষ রক্ষিত;—পুরুষের পুরুষার্থ পুষ্পবৃষ্টিতে প্রস্ফুট। কিন্তু তাহা দেবলীলা; দেবলীলার নিগূঢ় রহস্য প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য নহে। সুরদিগের কার্য্যে সমালোচনা চলে না। সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা;—অবশ্যই একটা উপপাতক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, রমণীদিগের সংগ্রাম-সমর্থতার পূর্ণ দৃষ্টান্ত ও মৌলিক আদর্শ আদ্যাশক্তি নিজে, ইহা স্পষ্টই কি প্রতীত হইতেছে না?

রন্ধন-নৈপুণ্যের ন্যায়, রমণীদিগের রণ-নিপুণতা বিলক্ষণ সম্ভবে, সম্ভাবিত ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল, হইয়াছে, হইতেছে এবং পশ্চাৎ বোধ করি আরও অধিক হইবে। রন্ধনের ন্যায়

রণও রমণীদিগের অতি সহজ-সাধ্য ও স্বভাব-সিদ্ধ স্বরূপ বলিয়া আমার বিবেচনা হয় আর আমি বোধ করি, এ সুবিবেচিত সিদ্ধান্তে সকলেই, ন্যায়ানুসারে, উপনীত হইতে বাধ্য। কিন্তু রন্ধনের সহিত রণের কি কোনও সবিশেষ মুখ্য বা গৌণ সম্বন্ধ আছে? অরিএন্টাল কংগ্রেসের পূজনীয় পণ্ডিতগণ, তাঁহাদের আগামী অধিবেশনে, প্রশ্নটা বিবেচনাধীনে গ্রহণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

বাবুদের মত——বাবুদের মত কেন! বাবুদের অপেক্ষা অষ্টাশীতিগুণ অধিক পারদর্শিতার সহিত বাবু-বাহিনীরা, বলেণ্টিয়ারি করিতে পারেন, তাহাতে ত সংশয়ই নাই। তাঁহারা রন্ধনশালায় (ভোজনে নহে, রন্ধনে) শিথিলহস্তা হইলেও, শিক্ষা-শালায় এবং রাজপথে তাঁহাদের সামরিক শক্তির ও সাহসের সমূহ বিকাশ-প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব এঁদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। কিন্তু তোমার গৃহ-কোণের ঐ অবগুণ্ঠন-আবৃতাটী,—যিনি চতুর্দ্দালের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধই রাখেন না, ৺গঙ্গাস্নান উপলক্ষে রেলগাড়ীতে উঠিবার সময়, অনেক ধরাধরিতেই, যাঁহার পঞ্চাশ বার পদস্খলন হয়, আর রেলগাড়ীতে উঠিয়া, প্রায় মুহুর্মুহু মূর্চ্ছার মত হয়,—তাঁহার—ঐ অবগুণ্ঠন-আবৃতাটীর অভ্যন্তরেও সাংগ্রামিক স্বরূপ অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে। বিদ্যমান আছে; কেবল বিকাশাভাব। বাঙ্গালীর মেয়ে হইলেই বহিয়া যায় না; তাঁদের কুসুম-কোমল আবরণের অন্তরালে (বিশেষতঃ কণ্ঠে এবং কণ্ঠতালুতে,—দন্তে ও দন্তোষ্ঠেও বটে) রণ-নৈপুণ্য,—তাহার সামর্থ্য ও সাহস, নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই বিরাজমান; কেবলর্ণবিশিষ্ট বিকাশাভাব। তবে একেবারেই যে তাহা অপ্রাপ্ত-বিকাশ, এমন নহে। এমন যে নহে, ইহা কি আপনারা আর জানেন না? আর আমিও কি উপরে বলি নাই? কামিনীর কণ্ঠ-ওষ্ঠ-তালু-আদি অংশের সামরিক স্বরূপ যখন প্রস্ফুট হইয়া, তদীয় কর-কমলের 'কোঁস্তা'কে প্রায় কৃপাণের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হয়, তখন, প্রিয়-পাঠক! আপনি একবারও কি অন্ততঃ হরি-লুটও মানেন না? পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কালের রমণী-রণ-তত্ত্ব পুনরুক্ত করা উদ্দেশ্য নহে। পৌরাণিক রণদেবী শাক্ত-বঙ্গে গৃহে গৃহে পূজিতা। পরন্তু রাজস্থানের ঐতিহাসিক বীর-বালা ও বীর-বধূদিগের বীরত্ব-গৌরবের গীতি কেই বা না শুনিয়াছেন! রাজপুত-অঙ্গনা, মারহাট্টা ও মারয়ারী রমণী শৌর্য্যে আজও সিংহিনী,—অশ্বারোহণনিপুণা; তরবারি-চালন-কুশলাও কেহ কেহ আছেন। মস্তৌষধের তাতার তাতারাঙ্গনাদিগের সহিত তুলিত হইলেও শক্তি ও সাহসে তাহারা হীনা হন না। তবে তাতারিণীরা অতি তীব্রা,—তীব্রতরা অপেক্ষাও তীব্রা—তীব্রতমা ভারতীয় রণললনাদিগের অভ্যন্তরে রমণী-জন-সুলভ লালিত্য ও কোমলতা আছে। কিন্তু তথাচ রসিকচাঁদ বাঙ্গালী যাঁহাদিগকে "মেছো মেয়ে" না বলিলে বাঁচি!

ইতিহাসের ন্যায় কাব্য-কবিতাতেও রমণীর রণ-নৈপুণ্য বর্ণ ও শোণিতাক্ষরে অঙ্কিত আছে। কিন্তু ইতিহাস, আখ্যান বা উপন্যাস উপস্থিত প্রস্তাবে আমাদের আলোচ্য নহে। বহুদেশে বহুতর রণজয়ী সৈনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন; কিন্তু কোথাও কখনও শুদ্ধ রমণী-সেনার রীতিমত বাহিনী বা রেজিমেণ্ট সংগঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বিবৃতি নাই; কোন আখ্যায়িকাতেও তাদৃশ ঘটনা কল্পনা ও বর্ণনা আছে বলিয়া জানিনা। কেবল বিগত ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান সমর কালে, কতকগুলি ফরাসিনী [illegible] প্যারিস-নগর রক্ষার্থে স্ব স্ব বাসনা [illegible] নী হইয়া, একটী বলেণ্টিয়ার নারী-প্রহরী-সম্প্রদায় সংগঠন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা অনেকের নিকটে সেদিনকার কথা হইলেও, বহু বৎসরের ঘটনা; বিশেষত ইহাকে রীতিমত রেজিমেণ্টও বলা যাইতে পারে না। আর, এই স্বদেশ-প্রেমিকা শৌর্য্য-সম্পন্না রমণী-প্রহরী-সম্প্রদায়ের সবিশেষ কোন বিবরণও ফরাসী-ইতিহাসে লিখিত নাই। নাই বটে, কিন্তু অনেকেরই স্বচক্ষে দেখা যে, এই রণ-রঙ্গিণী কামিনীরা, সেই ঘোর বিভ্রাট কালে, সমূহ শক্তি, অবিচলিত অধ্যবসায়, অতিমাত্র সহিষ্ণুতা ও অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহারা বড় বড় বন্দুক ঘাড়ে করিয়া সজ্জিত-সৈনিক-বেশে সমগ্র রজনী নগরে ও নগরের প্রান্তরে প্রহরা দিতেন;—দুর্গ-রক্ষার্থে আততায়ী পুরুষ-সৈনিক-

দিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতেন;—হুঙ্কারে গোলাবৃষ্টি করিয়া শত্রুসৈন্য হত ও ভূপাতিত করিতেন। সৈনিক-পুরুষোচিত সিংহনাদে আকাশ কাঁপাইয়া গোলা বর্ষণ ও ভক্ষণ করিতে করিতে মারিতেন ও মরিতেন। মরিবার সময় তাঁহাদের গীত প্রজাতান্ত্রিক *Marseillaise* গীতে নভঃস্থল পূর্ণ হইত। সে এক অতি অভিনব, হৃদয়-মন-উত্তেজক বীরত্বের করুণ কবিতাময় দৃশ্য! নারীদিগের ন্যায় পুরুষদিগের মধ্যেও অবশ্য প্রহরী-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু পুরুষ-প্রহরীদল অপেক্ষা রমণী-প্রহরাই অধিকতর আত্মত্যাগ-অধ্যবসায়, সমরক্লেশ-সহিষ্ণুতা, বীরত্ব ও রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহারা ইঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতনের দিকে দৃক্‌পাত করিতেন না। অনাহারের ও প্রহারের অতি কঠোর ক্লেশ হাস্যবদনে অগ্রাহ্য করিতেন। অতি যাতনার সময় ইঁহারা বিবেচনা করিতেন ও বলিতেন যে, "আমরা স্ত্রীলোক, কেবল পুষ্পশয্যায় শায়িত থাকিবার জন্য সৃষ্টি নাই; প্রসববেদনার তীক্ষ্ণাদপি তীক্ষ্ণ যাতনা আমরা সহ্য করিতে সক্ষম,—আমরা নিঃশব্দে তাহা সহিয়া থাকি,—সমর ক্ষেত্রের প্রহার ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার ক্লেশ আমরা অম্লান-বদনে কেন সহিব না? প্রসব-যাতনার তুলনায় এ সব ত তুচ্ছ,—অতি তুচ্ছ।

এই বীর-হৃদয়া স্বদেশ-হিতৈষিণী রমণীদিগের অনেকেই রণপ্রাঙ্গণে পুরুষ-যোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; বিধির বিড়ম্বনায় অনেককে গোলায় উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; কেহ কেহ ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন। ইঁহাদের জনৈক অগ্রণী লুসি মাইকেল অদ্যাপি জীবিতা আছেন। ইনি এখন লণ্ডনে নির্ব্বাসিতা। ইঁহার অদ্ভুত জীবনবৃত্ত কল্পিত উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতূহলপ্রদ। লুসি মাইকেল মধুর কোমলতা ও চরম কাঠিন্যের অদ্ভুতপূর্ব্ব সংমিশ্রণ-রূপিণী। দেবী ও দানবী—ইনি দুইই। এই কামিনী—প্রবলা প্রতিশোধ-স্পৃহার, বিষাক্ত বিদ্রোহের ও অপরিসীম অরাজকত্বের একটী মূর্ত্তিমতী জীবন্ত প্রতিমা। ইনি এক সময়ে ভূতপূর্ব্ব গতাসু ফরাসী সম্রাট্ লুইস নেপোলিয়নকে অকুণ্ঠিতচিত্তে হত্যা করিতে তৎপরা হইয়াছিলেন। এই ভয়ঙ্করী রমণী অমানুষিক অতি-স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্না বলিয়াও প্রসিদ্ধা। ইনি রমণী-প্রহরাদলের অগ্রণী ছিলেন; কিন্তু পুরুষ-প্রহরীদিগের সহিতও কার্য্য করিতেন। রমণীদিগের প্রহরা সম্বন্ধে ইনি এই মর্ম্মে আত্ম-জীবনীতে পুনঃপুনঃ লিখিয়াছেন;—

"Women showed more determination than men and from first to last the fighting women seem to have fought more desperately and to have flinched at nothing. They reconciled themselves much more speedily to the inevitable. When they saw it was necessary, they submitted to any sacrifice with the same patient, uncomplained spirit that they face the suffering of child—bearing—a service entailing much more positive pain and entailing much greater risk of life than the off chance—of having to bear arms entails upon the other sex."

এই অসি-বর্ম্মধারিণী কামিনীদিগের অস্তিত্ব অতি অল্পকাল মাত্র ছিল। ইঁহারা বিধির বিপাকে উত্থিতা হইয়াই, বিধির বিপাকেই পতিতা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ইঁহারা স্বয়মিচ্ছু সৈনিক। কোনও রাজ্যের বা রাজার নিয়োজিত রীতিমত রমণী-রেজিমেণ্ট নহেন।

কিন্তু তবে, রমণী-রেজিমেণ্ট কোথায়? এসিয়াখণ্ডের ত কথাই নাই। এসিয়া এখন আর সুসভ্য নহে, সমরক্ষমও নহে। বিশেষত এসিয়া-রমণী "পিঞ্জরের বিহঙ্গী" বলিয়া উক্ত। তবে, বিহঙ্গীকুলের মধ্যে, বাজ-বউরী থাকিতে পারে। এসিয়ার বিহঙ্গ-সমাজে বাজ-বউরী অবশ্যই আছেন। কিন্তু বাজবধূ পিঞ্জরাবদ্ধা,—কুরুক্ষেত্রে যান কি করিয়া, আর লইয়াই বা যায় কেও কাজেই, তাঁহার রণক্ষেত্র রন্ধনশালার অঙ্গন আর পিঞ্জরের বাতায়ন। এসিয়ায় চীন ও পারস্যের রাজ্যগৌরব আছে; যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য প্রস্তুতও থাকিতে হয়। কিন্তু চীন-অঙ্গনা বিকল-চরণা,—চলিতে ফিরিতেই প্রাণ চক্ষুপুট-গত,—আভ্যন্তরিক রণশক্তির বাহ্য-বিকাশ দেখাইতে কাজেই অসমর্থা। পক্ষান্তরে পারস্য-রমণীরা পরী-তুল্যা; তাঁহারা পুষ্প-শর ব্যতীত অন্য শর ব্যবহার করেন না। কাবুলিনীরা

নারী-সেনা।

কৃপাণ-ধারণে সক্ষমা হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা মুসলমানী ;—আমার আবদার রহমনের এই আশঙ্কা কালে, এমন কি, রুষ-ফিরিঙ্গী-লঙ্কাকাণ্ড ব্যাপারেও তাঁহারা জেনানার বাহির হইবেন না। এসিয়াখণ্ডের ত কথাই নাই ;—সুসভ্য, স্বাধীন ও সমর-মাতোয়ারা ইউরোপ ও মার্কিনের কোনও রাজার ও রাজ্যের রমণী-সৈনিকের রেজিমেণ্ট নাই ; রমণী সৈনিকও নাই। আমেরিকান ও ইউরোপীয় রমণীগণ লেখনী ও ল্যানসেট লইয়া যুদ্ধ করেন। রণ-নিপুণা রসনার বাগ্‌যুদ্ধেও তাঁহারা দিগ্‌বিদিক জয় করেন। কিন্তু [illegible] "প্যাসন"-পরায়ণা প্রচণ্ডা পুরোহিত-ঠাকুরাণীরাও অদ্যাপি কামান-বন্দুকে স্বকুলের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। সম্মুখ-সমর-ক্ষমা রমণী-সৈনিক-বাহিনী পৃথিবীর আর কোথাও নাই ;—আছে কেবল আফ্রিকায়।

আফ্রিকার অসভ্য অংশের উপর ইউরোপের সভ্য শক্তি নিচয়ের সকরুণ দৃষ্টি পড়িয়া সভ্য ইয়ুরোপ অসভ্য আফ্রিকাকে উদরস্থ করিয়া উদ্ধার করিতে চাহেন ;—উদ্ধার করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কারণ, তাহাতে প্রভু যাশুখৃষ্টের প্রীতি জন্মিবে। রাজতন্ত্র বৃটন ও প্রজাতন্ত্র ফরাসী—উভয়ই স্বস্ত্যয়ন ও সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই উদ্ধার-কার্য্যে অতিরিক্ত মাত্রায় [illegible] হইয়াছেন। ইংরাজ উদ্ধারের জন্য যেরূপ [illegible] নির্ম্মিত হইয়াছিল [illegible] জন্যও সেইরূপ হইয়াছে; কতিপয় বৎসর হইতে কোম্পানী বাহাদুরেরা তথায় উদ্ধারের

কার্য্য খুব কষিয়া করিতেছেন ;—কোন বিষয়েরই ক্রুটী হইতেছে না। বাইবেল লইয়া পাদরী গিয়াছেন ; বন্দুক লইয়া "রুল ব্রিটেনিয়া" ও "ভেভা রেসপাবলিকা ফ্রান্কা" গিয়াছেন ; ব্রাণ্ডির বোতল ও বিস্কুটের বাক্স লইয়া মহাজন বণিক গিয়াছেন স্পেলিংবুক লইয়া মাষ্টার মহাশয় গিয়াছেন ; আর বাকি কি? আফ্রিকার অধিকাংশ উদ্ধার হইয়াছে ; আরও অধিকাংশ উদ্ধার হইবে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় বৃটিশ-সিংহ ব্রতী হইয়াছেন আর পশ্চিম আফ্রিকায় ব্রতী হইয়াছেন,—ফরাসী "রিপাবলিক"

পশ্চিম আফ্রিকায় 'ডাহোমি' রাজ্য। ডাহোমি সুবৃহৎ ও স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীনতা মন্ত্রে মর্ম্মান্তিক দীক্ষিত প্রজাতন্ত্র ফ্রান্স, ডাহোমি-ভূমি গ্রাস করিয়া রাজার ও প্রজার সনাতন স্বাধীনতা সমূলে ধ্বংস করত স্বকীয় স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় দিতে নিরতিশয় প্রস্তুত হইয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর হইতে ডাহোমি-রাজের সহিত ফরাসী-ফৌজের সাময়িক সংগ্রাম চলিয়াছে। সভ্য ফরাসী, সংহার ও সমর-বিজ্ঞানের বিবিধ আধুনিক আয়োজনে অভিযান সাজাইয়া ডাহোমি-সেনার সহিত লড়িতেছে, কিন্তু ডাহোমি দমিতেছে না,—ফরাসীর সহিত সমানে যুঝিতেছে কত কত বার পাল্টা আক্রমণ করিয়া ফরাসী-ফৌজের পঙ্গপালদিগকে "কোণ-ঠাসা" করিতেছে। আজ কয়েক সপ্তাহ মাত্র হইল,—উভয় পক্ষে আবার তুমুল "সম্মুখ-সংগ্রাম" বাধিয়াছে যুদ্ধ খুব তেজে চলিয়াছে।

ডাহোমি-রাজ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিজে যুদ্ধ করেন। রাজভ্রাতা, যুবরাজ ও কুমারগণ সৈনিক ও সেনাপতিত্ব-কার্য্য করেন। ডাহোমি-রাজের রাজ্যের আয়তনানুরূপ প্রচুর সৈন্য-সামন্ত আছে। পুরুষ-সৈনিকে সংগঠিত রেজিমেণ্ট সচরাচর সকল দেশে রাজাদিগের যেরূপ থাকিয়া থাকে, সেরূপ সৈন্য-রেজিমেণ্ট ডাহোমি-রাজের ত আছেই। কিন্তু তাহা ব্যতীত কেবল মাত্র রমণী-সৈনিকে সংগঠিত দুইটী সুবৃহতী বাহিনী আছে। রমণী-গঠিত এ দুই রেজিমেণ্টে সৈন্য-সংখ্যা,—প্রত্যেকটীতে সার্দ্ধ সপ্ত সহস্র করিয়া ; সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ সহস্র!! বিশ্ব-সংসারে রমণী-সৈনিকের [illegible] বৃহতী বাহিনী কখনও কাহারও ছিল বলিয়া জানি না। এই বিচিত্র বাহিনীর সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে কাহার না কৌতূহল জন্মে! কিন্তু ইহার খুব লম্বা বিবরণ আপাতত আমাদের হাতে নাই। যাহা আছে, নির্ব্বন্ধ সহকারে পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছি ;—গদি ও গের্দার আজন্ম-কালের মালিক বঙ্গীয় বাবু, আড়াই-মাইল-ব্যাপী আলবোলার নল ওষ্ঠে আঁটিয়া 'আড় নয়নে' অবলোকন করুন।

ডাহোমি-রাজের পঞ্চদশ সহস্র রমণী-সৈন্য,—স্বরাজ্যের সর্দ্দারদিগের দুহিতা ও রাজমহিষী-দিগের পরিচারিকা-মণ্ডলীর কন্যাগণের মধ্য হইতে সংগৃহীত। ইহাঁদের সমষ্টিগত সাধারণ নাম "মাইনস" অর্থাৎ -না রাজব *Wives of the king* কিন্তু এনাম নিরর্থক। কারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাঁরা রাজবধূ অর্থাৎ রাজার 'ওয়াইফ্' নহেন ইহাঁরা কাহারই 'ওয়াইফ্' নহেন ; উপ-ওয়াইফও নহেন। ইহাঁরা জন্ম হইতে আমরণ-কাল অবিবাহিতা ;—চিরজীবন কুমারী। কৌমার্য্য ব্রত ইহাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। পুরুষের সহিত ইহাঁদের যাহা কিছু সাক্ষাৎ, তাহা কেবল অসি-বর্ম্মের সংঘর্ষণেরই জন্য। অসি-বর্ম্মের সহিত অসি-বর্ম্মের অতি উত্তম প্রণয় সাক্ষাৎ বটে! এই বীর-হৃদয়া বামা-দিগের সমগ্র জীবনের এক মাত্র প্রিয়-ক্রীড়া—কেবল সংগ্রাম-ক্ষেত্র ও পরাক্রমের করাল ক্রিয়া। ইহাঁদের সাহস সত্য সত্যই অসীম। ডাহোমি-রাজের পুরুষ-যোদ্ধগণ শৌর্য্য ও সাহসে ইহাঁ-দিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। পুরুষ-দিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়াও ইহাঁরা সন্তুষ্ট নহেন। বীরত্ব-বলে পুরুষদিগকে নিয়ত বিজিত রাখিবার জন্য এই রমণীগণ একান্ত ঈর্ষান্বিতা। ডাহোমির সৈনিক-পুরুষেরা ইহাঁদিগের দুর্জ্জয় পরাক্রমে পরাভূত ত বটেই ;—পুরুষ-জাতির কোনও পুরুষে এতাদৃশ পরাক্রম কখনও ছিল কিনা সন্দেহ-স্থল। ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা অভিমন্যু আদি কুরুক্ষেত্রের মহারথা ও অতিরথীদিগের অমানুষিক বল-বিক্রম কলির কোনও লোক ত আর সচক্ষে দেখে নাই,—পুঁথিতেই কেবল পড়িয়াছে ; কিন্তু ডাহোমি-রাজ্যের রমণী-বীর-দিগের অলৌকিক রণ-রঙ্গ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-ঘটনা।

শান্তি-সময়ে ডাহোমি-রাজের বামা-বাহিনী বিবিধ রাজ-প্রাসাদের রক্ষয়িত্রী। যুদ্ধকালে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা রাজার শরীর-রক্ষিকা খাস "বডিগার্ড" সৈনিক কটক। রাজার সবিশেষ আদেশেই সাধারণত এই রমণীগণ রণ করেন। বিশেষ বিশেষ স্থলে অবশ্য অন্যরূপ ব্যবস্থা।

এই রমণী-সেনাবর্গের সাধারণ ও সৈনিক সাজ অতীব সরল;—গায়ে আস্তেন বিহীন অঙ্গ-রাখা, পরিধানে ছোট ছোট "টাইট" প্যায়ে-জামা;—পায়েজামা—ইজের ও আলখেল্লায় আবৃত। এই আবরণ-বসন, শান্তিকালে ঢিলে ঝুল-ঝুলে থাকে; যুদ্ধের সময়ে "আঁটোসাঁটো" করিয়া দেওয়া হয়। তরবারী, বৃহৎ ছুরী ও বন্দুক—ত্রিবিধ অস্ত্রে ইঁহারা যুদ্ধ করেন। তবে তরবারী ও ছুরী—ডাহোমি-নারী পুরুষদিগের প্রধান অস্ত্র। পঞ্চদশ সহস্র রমণী-সৈন্য দুই বাহিনীতে বিভক্ত ইহা ইত্যগ্রে বলিয়াছি। কিন্তু দুইটী বাহিনী একই সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনস্থ। বলা বাহুল্য, এই রমণী-সেনার সৈন্যাধ্যক্ষও রমণী। শক্তি-সামর্থ্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া সৈন্যদিগের মধ্য হইতেই সৈন্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার বডিগার্ড থাকিয়া, রাজার খাস আদেশে রমণী-বীরেরা শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে রাজ-সৈন্যের পুরুষ-যোদ্ধারা যদি কখনও ভীত ও বিশৃঙ্খলিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন-পর হয়, রাজ-আদেশে রমণী-সৈন্য বিদ্যুদ্বৎ যাইয়া তাহাদিগকে অষ্ট-দিকে বেরিয়া ফেলে; শাণিত খড়্গে শাসন ও দমন করিয়া পলায়নপর পুরুষ-বীরদিগকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করে।

১৮৯০ অব্দের মার্চ্চ মাসে ডাহোমি-রাজ বেড়-জিন সসৈন্যে কোটো নামক ফরাসী-শিবির আক্রমণ করেন। ফরাসীদিগের ক্ষিপ্রবেগ ... কের গোলা বৃষ্টিতে কাতর হইয়া ডাহোমি-সেনা হাটিয়া যায়। ডাহোমীশ্বর অগত্যা সৈন্যদিগের গমনপথের আড্ডায় আড্ডায়, নিজের বডিগার্ডস্থ রমণীদিগকে প্রহরী স্বরূপ স্থাপন করেন। রমণী-গণ ব্যাঘ্রী-বিক্রমে পুরুষদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে বাঁধা দেয়,—শাসিত ও স্বকার্য্যে নিরত করে। তবেই দেখ, রমণী-বাহিনী, সমষ্টিভাবে, ডাহোমির পুরুষ-রেজিমেণ্টের সেনাপতি।

নান্সিকা নাম্নী একটী উগ্রচণ্ডা বীর-রমণী কোটো ক্ষেত্রে হত হন। এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতেও শুনিলাম, সেদিন কয়েকটী রমণী-বীর নিহত হইয়াছেন। জীবনকে ইঁহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন; স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে সমর-প্রাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করা যার পর নাই সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বুঝিয়া থাকেন।

ডাহোমির নারী বীরদিগকে নারী বলিয়াই আমরা 'বাহবা' দিই না; তাঁহারা বস্তুতই বীর-ধর্ম্মাক্রান্তা বলিয়াই প্রশংসার পাত্রী। নহিলে, যে সকল রমণী কেবল মা ... সাজিয়া, রমণীত্বের দোহাই দ্বারা বীরত্বের বাহবা পাইতে চাহেন অথবা যে কামিনীরা কেবল পুস্তকে ও প্রবন্ধে স্বনাম ছাপাইবার বা ... করিবার জন্য সাহিত্যের আসরে না ... ও নারীত্বের "পাস" দেখাইয়া অমর হইতে আবদার করেন, তাঁহারা কৃপারই পাত্রী,—প্রশংসার নহেন। রণ-প্রাঙ্গণের রুদ্র বক্ষেই হউক আর সাহিত্য-ক্ষেত্রের শীতল ছায়াতেই হউক, রমণী ঘোমটা খুলিয়া তথায় দাঁড়াইলেই পুরুষোচিত সমালোচনার অধীনা হইয়া পুরুষোচিত পরীক্ষা দিতে বাধ্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এক হিসাবে কতক ভাল, নহিলে কেবল ঘোমটা খোলাই সার।

কিন্তু ইউরোপীয়েরা নারী জাতির অত্যন্ত উপাসক বলিয়া, অতিরিক্ত মাত্রায় অহঙ্কার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ফরাসী-জাতি রমণীদিগের নিরতিশয় 'গ্যাল্যাণ্ট"—তাঁহারা সুন্দর "সেভ্যের" (*Chevalier*) "শেভালিয়া,"—সুন্দরী-সমাজের শ্রীচরণের স্লিপার,—কমলিনী-কুলের কর-কমলের "কিড গ্লাভ"। অতএব আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, ফরাসীরা কি করিয়া রমণীদিগের উপর আগ্নেয় গোলা বর্ষণ করেন। এ কাজটা পুরুষজাতির কোনও পুরুষেই ত পুরুষার্থ নহে। তবে ইউরোপীয়েরা অতিরিক্ত রকম নারী-উপাসক বলিয়াই যদি সেটা পরম পুরুষার্থ হয়, বলিতে পারি না। আমাদের হিন্দু বুদ্ধিতে অবলা সবলা হইলেও অবলা। স্বদেশীয় হউক, বিদেশীয় হউক, নারীর সহিত পুরুষ,—পুরুষ হইয়া,—শস্ত্র-সংগ্রাম করিতে পারেন না। অঙ্গ কঠিন হউক আর কোমল

হউক, কামিনীর অঙ্গে অসি-চালনা কোনক্রমেই চলে না।

ফরাসীদিগের যদি কিছু মাত্র পুরুষার্থ থাকে, তাঁহাদিগের উচিত,—ডাহোমি-রাজের রমণী-বাহিনীর সহিত রমণী সেনার দ্বারা যুদ্ধ করান। কোন্ লজ্জায় তাঁহারা নিজে রমণীর সহিত রণ করিতেছেন, রমণীর গায়ে গোলা গুলি মারিতেছেন! [illegible] সাম্রাজ্য কি রমণীশূন্য হইয়াছে যে, পুরু[illegible] সাজিয়া [illegible]রিয়া, 'হাড়িয়াল-বন্দ' হইয়া র[illegible] [illegible]দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যায়! যে দেশে এরূপ [illegible] দেশের পুরুষেরাই রমণী। নচেৎ ফরাসী[illegible] [illegible]ক এক্টুকুও বুঝিতেন যে, স্ত্রীলোকের স[illegible] [illegible]দ্ধ জিনিলে পুরুষের সম্ভ্রম নাই, হারিলে [illegible] বে-ইজ্জত। তা ফরাসীরা যাহাই বলুন, [illegible] আমরা যাহাই বলি, ডাহোমিনার নিকট [illegible] পুরুষার্থ হাসির কথা; তাঁহারা যে পদার্থটি [illegible] গভীর পঙ্কে ডুবাইয়া দিয়াছেন। অখ্যাতি বা সুখ্যাতি, কুনাম বা সুনাম—যাহাই হউক না, তাঁহারা আজীবন অসি-হস্তে স্বদেশের স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন এবং স্বজাতীয় ভাষায় চিরকাল যেরূপ গাইয়া আসিতেছেন, সেইরূপ গাইবেন,—

ডাহোমি! দেবতা তুমি পৃথ্বী-অধিপতি,
দুহিতা আমরা তব বল-বীর্য্যবতী;
পুরুষের চেয়ে ধরি সাহস অন্তরে,
রক্ষি রাজা, রাজ্যপাট, যুঝিয়া সমরে।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় অভাব।

এই প্রস্তাবে, অভাব অর্থে অপূর্ণতা; যে পদার্থের অসত্তায় যাহার পূর্ণতার হানি হয়, তাহাই তাহার অভাব। সুতরাং সকলের অভাব সমান নহে, যেহেতু সকলের পূর্ণতার [illegible] তাহাতে [illegible] পূর্ণতা নহে; যাহাতে [illegible] পূর্ণতা, তাহাতে পক্ষীর পূর্ণতা নহে; যাহাতে পক্ষীর পূর্ণতা, তাহাতে পশুর পূর্ণতা নহে এবং যাহাতে পশুর পূর্ণতা, তাহাতে মনুষ্যের পূর্ণতা নহে। অতএব কীট, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য—সকলেরই অভাব বিভিন্ন। এইরূপ আবার সকল মনুষ্যের অভাব সমান নহে, যেহেতু সকলের পূর্ণতার আদর্শ এক নহে। যে বীর; সর্ব্বাভিভাবিনী শক্তি, সর্ব্বাতিরিক্ত রণকৌশল, সর্ব্বতোমুখ শৌর্য্য ভিন্ন তাহার পূর্ণতা নাই। যে ধর্ম্মপ্রাণ ও লোকহিত, চিত্তশুদ্ধি, ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভিন্ন তাহার পূর্ণতা নাই। যে বিলাসী; কামিনী, কাঞ্চন, কৌতুক ভিন্ন তাহার পূর্ণতা নাই; সুতরাং সকলের অভাব ভিন্ন প্রকৃতির।

যেরূপ ব্যক্তিগত অভাব, সেইরূপ জাতিগত অভাব; কারণ জাতি, ব্যক্তির সমষ্টি বই আর কিছুই নহে। জাতীয় পূর্ণতার আদর্শের ভিন্নতায় জাতীয় অভাবের ভিন্নতা হয়। যাহা খৃষ্টান জাতির অভাব, তাহা মুসলমান জাতির অভাব নহে; যাহা মুসলমান জাতির অভাব, তাহা হিন্দুজাতির অভাব নহে; কারণ সকলের জাতীয় পূর্ণতার আদর্শ সমান নহে। এইরূপে ফরাসী, রুষ, ইংরাজ, বাঙ্গালা—সকলেরই অভাব ভিন্ন প্রকৃতির।

আর একটা কথা বলিয়া রাখি। যে জীব যত উন্নত, তাহার অভাবের পরিমাণও তত অধিক। তরু-লতা শত-মুখে রস শোষণ করিয়া, ফল পুষ্প প্রসব করিয়া চরিতার্থ হয়। পশু পক্ষী দেহের স্ফূর্ত্তি, উদরের পূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাকে যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু মানুষের অভাবের পক্ষে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। শরীর, মন, আত্মা, ইহাদের পূর্ণ পরিণতি ভিন্ন তাহার অভাব পূরণ হইবার নহে। সবল দেহ, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সরস-হৃদয়, উন্নত নীতি, উদার অধ্যাত্মতা, এ সকলই মানুষের পূর্ণতার উপাদান; সুতরাং ইহারা সকলই মানুষের অত্যাবশ্যক। এইরূপ মানুষের সভ্যতার পরিমাণের সহিত অভাবের পরিমাণও বৃদ্ধি হয়; অসভ্যের অপেক্ষা অর্দ্ধ-সভ্যের এবং অর্দ্ধ-সভ্যের অপেক্ষা সুসভ্যের অভাব অধিক। 'এসকিমো' প্রভৃতি অসভ্যজাতির অভাব বন-মানুষের অপেক্ষা বড় বেশী নয়; সাঁওতাল প্রভৃতি অর্দ্ধসভ্যের অভাব 'এসকিমো'র অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। কিন্তু সভ্যজাতির অভাবের সীমা বা ইয়ত্তা নাই

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি; যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বন, জলের সমষ্টি জলাশয়। বৃক্ষ বা জলের যে স্বরূপ, বন বা জলাশয়ের অনেকাংশে তাহাই; এইরূপ মানুষের যাহা স্বরূপ; মনুষ্যসমষ্টি—জাতিরও অনেকাংশে তাহাই।—মানুষের স্বরূপ কি?

মানুষ—দেহ সম্বন্ধে দ্বিভক্ত শরীর ও আত্মা এই উভয়ের সংযোগে মানুষ। আত্মা—মন, বুদ্ধি, বিবেক, অধ্যাত্ম্য প্রভৃতি কতকগুলি শক্তি সম্পন্ন। সুতরাং মানবপ্রকৃতির পূর্ণতা বলিলে, দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণ বিকাশ বুঝায়। এই সকল প্রকৃতির কোন একের বিকাশ অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হয় না, সুতরাং ঐ অবিকাশই, তাহার অভাব। অতএব মানুষের অভাব ব্যক্তিবিশেষে দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক অভাব হইতে পারে। জাতি যখন ব্যক্তির সমষ্টি, তখন ব্যক্তির যাহা অভাব, জাতিরও অনেকাংশে তাহাই লক্ষিত হয়। সুতরাং জাতিরও অভাব দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভাবের এক দুই বা ততোধিক প্রকারের হইতে পারে। জলাশয়ের যদি জলকণা উত্তপ্ত হয়, তবে জলাশয়ে শৈত্যাভাব অনুভূত হয়; বনের যদি তরুলতা আতপ শুষ্ক হয়, তবে বনে সরসতার অভাব লক্ষিত হয়। মনুষ্য জাতিরও ঐরূপ।

সুসভ্য মানুষ সমাজবদ্ধ হইলে, সমাজের সহিত তাহার আর কতকগুলি নূতন অভাবের উৎপত্তি হয়—সমাজ বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, যাহাদের অস্তিত্ব ছিল না। সিংহ ব্যাঘ্রের মত, মানুষ কখন সহচর বিহীন একচর ছিল কিনা, সে কথা এস্থলে বিচার্য্য নহে; বোধ হয় কখন ছিল না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, এখন যে অভাবের উল্লেখ করিতেছি, তাহা সমাজ-জন্য; সমাজ বন্ধনের ফল। সমাজও যতদিন, এ সকল অভাব ও ততদিন; সমাজের ধ্বংসে এ সকল অভাব পূরণের আর প্রয়োজন থাকিবে না। আর সমাজ যত উন্নত হইবে, এই সকল অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ তত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এই সকল অভাব কি?

সমাজ জন্য অভাব প্রধানতঃ তিনভাগে বিভাজ্য—আর্থনীতিক বা বাণিজিক, সামাজিক ও রাজনীতিক। মানুষের দেহের পুষ্টির জন্য খাদ্য সামগ্রীর প্রয়োজন; অসভ্য অবস্থায় এই প্রয়োজন সহজেই বনফল বা বন্য পশু পক্ষী দ্বারা সিদ্ধ হয়। ক্রমে সভ্য অবস্থায় বুদ্ধির কর্ম্মকৌশলের সহিত নানা প্রকারের আবিষ্কার হয়; তখন মানুষ শুধু প্রকৃতির বা স্বভাবের আনীত শস্য ও পশুপক্ষীর উপর নির্ভর না করিয়া আপনার সুকৌশল আয়াসের ফল ভোগ করে। ক্রমশঃ সভ্যতার সহিত অভাবের সংখ্যা অধিক হইতে থাকে; মানুষ আপনার স্বদেহশক্তি কৌশল ও পরিশ্রমে সকল অভাবের পূরণ করিয়া উঠিতে পারে না। তখন বিনিময়ের প্রথা প্রবর্তিত হয়; আপনার শক্তি, কৌশল, পরিশ্রমের বিনিময় দিয়া একে, অন্যের শক্তি, কৌশল ও পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। ইহাই বাণিজ্য। বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনায় বা প্রচারে যে সকল অভাব পূরণ হয়, তাহাকেই সামাজিক অভাব বলিয়াছি।

বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তি-মনুষ্যের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সমষ্টি মনুষ্য বা জাতি ও সমাজের বিষয়েও সেই সকল কথা খাটে। সমাজের ও দৈহিক পোষণে জন্য আহার সংগ্রহ আবশ্যক। সমাজেরও আদিম অবস্থায় বনফল বা পশু পক্ষীতে ঐ আহার ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, পরে ক্রমশ জীব বৃদ্ধি ও সভ্যতার দায়ে প্রথমে কৃষি, তাহার পর বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যের ফল অর্থ সংগ্রহ, যাহাতে সমাজের যাবতীয় দৈহিক অভাব মোচন হয়। অতএব সমাজেরও বাণিজিক বা আর্থনীতিক অভাব প্রতিপন্ন হয়। এবং যেহেতু কি অসভ্য কি সুসভ্য মনুষ্য, কেহই কখন সহচর ভিন্ন একচর ছিল না, অতএব এই বাণিজিক অভাব কেবলই সমাজজন্য।

দুর্ব্বলের উপর প্রবল চিরদিন প্রভুত্ব করে, বিশেষত অসভ্য অবস্থায়। সিংহ পশুরাজ, কেননা সিংহ সকল পশুর অপেক্ষা বলবান্। গরুড় পক্ষিরাজ, কেননা গরুড় সকল পক্ষীর উপর প্রবল। মানুষেরও এইরূপ। তবে প্রভেদ এই মাত্র যে, মানুষের পক্ষে বুদ্ধি ও বলের অংশ অসভ্য অবস্থায় সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও বুদ্ধিমান, সেই প্রভু বা রাজা হয়। প্রথমে এই প্রভুত্ব বা রাজপদ,

বংশগত না হইয়া ব্যক্তিগত থাকে, অর্থাৎ যখন যে সকলের উপর প্রবল হয়, তখন সেই প্রভু বা রাজা। আমরা দেখিতে পাই প্রত্যেক বানরের দলে একজন 'বীর' বানর থাকে; সে দলের সেই প্রভু। সময়ে সময়ে অন্য দলের 'বীর' আসিয়া তাহাকে সংগ্রামে আহ্বান করে; পরাজিত হইলে সে নিহত বা বিতাড়িত হয়, নূতন বীর তাহার স্থান অধিকার করিয়া প্রভু বা রাজা হয়। সমাজের প্রথম অবস্থায় মানুষ-বীরেরাও ঐরূপ করে। জরা, বার্দ্ধক্য বা রোগে, রাজা হীনবল হইলে, নবাগত প্রবল ব্যক্তি তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয় এইরূপ কিছুদিন চলে। ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত রাজা আপনার আত্মীয় স্বজনকে —ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, মিত্র প্রভৃতিকে প্রভুত্বের ভাগে অংশী করিয়া, আপনার দলে সংগ্রহ করিয়া বল সঞ্চয় করে। তখন কেহ তাহাকে আক্রমণ করিলে ইহারা তাহার সহায় হইয়া নবাগতের বিরোধী হয়। সুতরাং জয়লাভ করিতে হইলে তাহাকেও স্বদলবল লইয়া আসিতে হয় এবং জয়ী হইলে ঐ সকল সহায়কারীদিগকে লাভের অংশ দিতে হয়। ইহা হইতে ক্রমশঃ রাজতন্ত্রের পরিবর্তে রাজন্যতন্ত্রের (*Oligarchy*) উৎপত্তি হয়। তখন রাজা একক প্রভু না হইয়া রাজন্য-বর্গকে প্রভুত্বের ভাগী করেন। প্রজা এক প্রভুর স্থানে শত প্রভুর অত্যাচার সহ্য করে; তবে রাজায় রাজায়, রাজায় রাজন্যে ও রাজন্যে রাজন্যে সংঘর্ষের ফলে অত্যাচারের পরিমাণ কতক উপশমিত হয়। তখন প্রতি সমাজ, পীড়ক ও পীড়িত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ক্রমশঃ পীড়িতেরা বল সঞ্চয় করিয়া পীড়কদের বল হ্রাস করে; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এরূপ হইলে ক্রমে ক্রমে প্রজাতন্ত্রের বিকাশ হয়; প্রজাতন্ত্রে প্রজাই রাজা,—অন্য রাজা বা রাজন্য নাই। যতদিন সকলের সকল কার্য্যে সম্পূর্ণ প্রভুতা না হয়, ততদিন সমাজের রাজনীতিক অভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। রাজতন্ত্র রাজন্যতন্ত্র অধিক কি প্রজাতন্ত্রেও এ অভাব সম্পূর্ণ পূরণ হয় না; এ অভাবের পূরক অতন্ত্র বা তন্ত্রাভাব (*Anarchism*) এই অভাবকে রাজনৈতিক অভাব বলিয়াছি।

এইবার সামাজিক অভাবের কথা বলি। মানুষের আত্মা, কতকগুলি বিরোধী শক্তির আশ্রয়স্থল,—যাহাদের বশে সে পর্য্যায়ক্রমে পুণ্য ও পাপ পথে প্রবর্ত্তিত হয়। মানুষ—কখন কাম ক্রোধ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, কখন ভক্তি প্রীতি দয়ার আবেগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অসভ্য মানুষের হৃদয়ে পাপ প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য অধিক। তা ছাড়া, চিত্তবৃত্তি সংযমে অপারগ বলিয়া সে, পাপ কার্য্যেই অধিক সময়ে অগ্রসর হয়। ঐ পাপবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়া, তাহার পুণ্য-বৃত্তির প্রবৃত্তির উদ্দেশে অনেক নিয়মের নিগড় সৃষ্ট হয়,—যথা দণ্ডবিধি, দায়বিধি, বিবাহ-বিধি, জাতি বিধি প্রভৃতি। দুর্ব্বল দেখিলে প্রবল তাহার নিপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দণ্ড-বিধান আবশ্যক; ধনী দেখিলে নির্ধন তাহার ধনাপহরণ করে, অতএব দায়বিধি আবশ্যক; কামুক কামের বশে স্ত্রী সঙ্গত হয়, তাহাতে সন্তান লালনের ব্যতিক্রম ঘটে, অতএব বিবাহ প্রচার প্রবর্ত্তনা আবশ্যক; বংশ পরম্পরাক্রমে কোন ক্রিয়া-শক্তির অনুশীলন হইলে, ঐ শক্তির সম্যক বিকাশ হইবার সম্ভাবনা,—অতএব জাতিভেদ আবশ্যক; ইত্যাদি। এইরূপে সামাজিক প্রথার সৃষ্টি হয়; ঐ সকল প্রথার একই উদ্দেশ্য—সামাজিক অভ্যুদয়। যতদিন না এই অভ্যুদয় পূর্ণমাত্রায় সাধিত হয়, যতদিন না মানুষের সমাজ, পশুভাব বিসর্জ্জন দিয়া দেবভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ততদিন সামাজিক অভাব দূর হয় না।

অতএব জাতি বা সমাজের এই কয়টি অভাব —দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক মনুষ্য যতদিন না সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে, ততদিন এই সকল অভাবের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভাবিত হইবে না। তবে যে সমাজ যত উন্নত, তাহার অভাব সেই পরিমাণে মিটিতেছে।

এই সকল অভাবের স্বরূপ আলোচনা করিলে আর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সে সিদ্ধান্ত এই যে, আধ্যাত্মিক জীবন যেমন মানব আত্মার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা, তেমনি মানবসমাজের আধ্যাত্মিক অভাবের পূরণ হইলে, সকল অভাব নিঃশেষ হয়—কোন অভাবের পূরণ অবশিষ্ট থাকে না। উপনিষদে বলে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল বিষয় সুজ্ঞাত হয়, কারণ কোন বিষয় ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে, সকলই ব্রহ্মময়। আধ্যা-

ত্মিক অভাব সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। যে কোন অভাবের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি আধ্যাত্মিকতা-সাপেক্ষ; অর্থাৎ জীবের পূর্ণবিকাশ অর্থে সকল অভাবের অত্যন্ত পূরণ।

যে অভাব পূরণের মূলে আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তাহার একান্ত পূরণ কখনই সিদ্ধ হয় না। সমাজ যখন দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অভাবের অতীত হয়, তখনই তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করে। 'সবল দেহ, সরস মন, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উন্নত নীতি, উৎকৃষ্ট সমাজ, অতুল বিভব, অতন্ত্র জীবন, অনুপম অধ্যাত্মতা,—কবে জাতীয় অভাব দূর হইয়া মানবের এই অবস্থা হইবে?*

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রকৃতির হাসি।

হাসে চাঁদ গগনের কোলে,
সে হাসি-ছটার রাশ তটিনী-তরঙ্গে মিশি'
ফুটায় ফটিক্ ফুল নিরমল জলে॥

চিকণ চাঁদের পাশে কি চারু তারকা হাসে!
কোটি কোহিনুর যেন নীল আস্তরণে!!
জানেনা যাতনা-জ্বালা, শুধুই হাসির মেলা,
বিষাদের ছায়ারেখা নাহি কোন খানে।

হাসি' হাসি' তরঙ্গিণী পতি-প্রেমে পাগলিনী
চাঁদ-মুখ বুকে ক'রে সিন্ধুপানে ছোটে;
প্রণয়-সুখের ভাষা কহিবে প্রাণেশে,—আশা,
মৃদু কলস্বরে তার হাসিরব ফোটে।

মৃদুল মলয় বায় হাসিয়ে বহিয়ে যায়,
চুমি' ফুলকুল ল'য়ে সুরভির ভার;
দ্বারে দ্বারে যোগাইয়ে তপ্ত প্রাণ জুড়াইয়ে
বহে বায়ু কোন ব্যথা নাহি প্রাণে তা'র।

কাননে কুসুমগুলি সুধীরে ঘোমটা খুলি'
হাসিয়ে সমীর সনে সুখ-কথা কয়;
বিন্দু পরিমল আশে হেসে হেসে পাশে পাশে
কত অলি গায় গান! কত সুধা বয়!!

নিকুঞ্জে তমাল-ডালে কিশলয়-অন্তরালে
পঞ্চমে ঝঙ্কার করে পাপিয়া কোকিল।
সে ঝঙ্কারে—সে কূজনে হাসি ঝরে একতানে
জেগে উঠে ঘুম-ঘোর জগৎ নিখিল।

সমীরে দোলা'য়ে মাথা শন্ স্বরে কহি' কথা
হাসি' তরু গায় গান কা'র মহিমার!
সে হাসি আকাশে ছোটে, সে গান পবনে লোটে,
ব্যোমে ভূমে মাখামাখি সে সঙ্গীত-ধার।

শ্যামল লতিকাগুলি ক্ষুদ্র হৃদি-দ্বার খুলি'
হাসিছে জড়া'য়ে তরু-প্রাণেশের বুক,
অঞ্চল ঈষৎ দোলে, ফুটন্ত কুসুম কোলে,
লাবণ্যের চারু ছবি হাসি-ভরা মুখ।

উন্নত শিরস্ তুলি' হাসিছে শেখরগুলি,
এ হাসি গাম্ভীর্য্যভরা ভীতি-ভাবময়!
নীচে—দূর শালবনে মৃগেন্দ্র, মহিষী সনে
আনন্দে বিহরে তায় হাসি-স্রোত বয়!!

সুনীল সাগর-গায় হাসি' ফেন ভাসি' যায়,
আনন্দের সে কল্লোল ছোটে চারিধার।
প্রদোষ, প্রভাত বেলা রাঙ্গা রবি করে খেলা,
উজলি সাগর-বুক দিয়ে রাঙ্গা কর।

যেদিকে ফিরাই আঁখি, সবাই হাসিছে দেখি,
প্রকৃতির মুখে যেন সদা হাসি-ভার।
আমি শুধু দিশে-হারা নিতান্ত পাগল-পারা
কাঁদিতে দুখের জন্ম লভেছি এবার!!

যারে চে'য়ে এতকাল সয়েছিনু এ জঞ্জাল,
সংসারের এত ঝড় সয়েছিনু বুকে;
সে-ও মোরে অবশেষে ফেলি' এ জ্বালার দেশে,
জানিনাক চ'লে গেছে কোন্ দেশে সুখে!!

হইয়ে সে-লক্ষ্যহারা হারা'য়ে সে ধ্রুবতারা
বেড়াই একাকী আমি ভাঙ্গা বুক নিয়ে;
দীর্ঘশ্বাস সে আমায় দিয়ে গেছে জ্বালাময়,
নিয়ে গেছে হাসি মোর অশ্রুরাশি দিয়ে!!

---

* এই প্রবন্ধের সহিত সর্ব্বাংশে আমরা একমত হইতে পারি না। জং সং।

মদালসা-পরিণয়। *

(১)

পূর্ব্বকালে, শত্রুজিৎ নামে এক যথার্থনামা রাজা ছিলেন। দেবরাজ পুরন্দর, তাঁহার যজ্ঞে অজস্র সোমরস পান করিয়া পরিতুষ্ট হন।

একদা ঋষিশ্রেষ্ঠ গালব, একটী উৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া সেই রাজার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সম্ভ্রম ও ব্যগ্রতা প্রযুক্ত অন্য কোন কথা না বলিয়া এবং রাজাকে কোন কথা বলিতে অবকাশ না দিয়া ঋষি বলিলেন ;—"রাজন্! কোন দৈত্য, বারংবার পশু পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া আমার আশ্রমে প্রবিষ্ট হয় এবং নানাপ্রকার বিঘ্ন সম্পাদন করে। আমার সমাধি, আমার মৌনব্রত—তাহার দৌরাত্ম্যে আর সুসিদ্ধ হয় না। আমি কোপানলে তাহাকে ভস্মসাৎ করিলে, আমার বহুদুঃখ-সঞ্চিত তপস্যার ক্ষয় হয়, অতএব সে কার্য্য করিতে আমি ইচ্ছা করি না। আপনি রাজা, ষষ্ঠাংশভাগী ; প্রজাপালন,—শিষ্টরক্ষণ, দুষ্টদমন,—আপনার ধর্ম্ম ; আপনি ইহার প্রতিকার করুন। এই দুষ্ট-দানব-নিবারণ আপনারই আয়ত্ত।

"মহারাজ! দুরাত্মা দৈত্য, এক দিবস আমাকে বড়ই ক্লেশ দিয়াছিল, আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম ;—তৎক্ষণাৎ গগনমণ্ডল হইতে এই অশ্বটী নিপতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণীও শুনিতে পাইলাম ;—'এই অশ্ব, অনায়াসে সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে পারে। আকাশ পাতাল, জল, পর্ব্বত—কিছুতেই এই তুরঙ্গ-পুঙ্গবের গমন-ব্যাঘাত হয় না। মহর্ষে! ভগবান্ আদিত্য তোমাকে এই অশ্বরত্ন প্রদান করিয়াছেন। কু-বলয় শব্দে ভূমণ্ডল, এই অশ্বশ্রেষ্ঠ অনায়াসে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ বলিয়া ইহারও নাম হইবে 'কুবলয়'। দ্বিজবর! মহারাজ শত্রুজিতের পুত্র কুমার ঋতধ্বজ, এই অশ্বে আরোহণ করিয়া তোমার ক্লেশদায়ী দুষ্ট দানবকে নিহত করিবেন। এই অশ্বরত্ন প্রাপ্ত হইয়া কুমার ঋতধ্বজও 'কুবলয়াশ্ব' নামে বিখ্যাত হইবেন।'

"মহারাজ! এই দৈববাণী শুনিয়া,আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ; তপোবিঘ্নকারী দুষ্ট দানব, যাহাতে নিবারিত হয়, তাহা করুন। আমি এই অশ্বরত্ন আপনার নিকট অর্পণ করিলাম, আপনি নিজ পুত্রকে আমার ইষ্ট-সম্পাদনে আজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করুন।"

আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ রাজা, ঋষি-বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্র ঋতধ্বজকে সেই তুরঙ্গ-পুঙ্গবে আরোহণ করাইয়া নীরাজনাদি মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠান-পুরঃসর আশ্রম-রক্ষার্থ এবং কথিত দানব বিনাশার্থ মহর্ষি গালবের সহিত প্রেরণ করিলেন।

(২)

বীরবর ঋতধ্বজ, এখন কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। কুবলয়াশ্ব, আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনে নিশিত শরনিকর যোজনা করিয়া মণ্ডলাকারে সেই আশ্রম-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন ; কতশত আশ্রম-বিঘ্ন, তিনি নিবারণ করিলেন। ঋষিগণ, নিত্য নিত্য তাঁহার প্রতি অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার বীরতা, তাঁহার প্রশান্তভাব, তাঁহার মধুরতা, সকলেরই মন হরণ করিয়াছিল। কুবলয়াশ্ব, ঋষিপত্নীগণের প্রতি মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিতেন, ঋষিকুমারীদিগকে ভগিনী জ্ঞান করিতেন। আশ্রম-মৃগ-পক্ষি-পাদপগণের প্রতি বন্ধুস্নেহ প্রদর্শন করিতেন। কুশ-কাশ-সমিদাহরণ-পরায়ণ ঋষিগণের পোষিত মৃগগণ, সেই শরাসনধারী কবচাবৃত-কলেবর বীরবরেরও করতল লেহন করিত। তখনও সেই প্রধান দানবের দেখা নাই। কুবলয়াশ্বের প্রধান চিন্তা,—'কবে সেই দুর্দ্দান্ত দানবকে বিনষ্ট করিয়া ঋষিগণকে নিরুপদ্রব করিব।'

আজ কুবলয়াশ্বের আকাঙ্ক্ষিত শুভ অবসর উপস্থিত। দুর্দ্দান্ত দানব, শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ধ্যোপাসন-তৎপর মহর্ষি গালবকে আক্রমণ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। মুনি-শিষ্যদিগের 'অব্রহ্মণ্য' নির্ঘোষে সমুদয় আশ্রম-কানন বিকম্পিত হইল। ঋষিপত্নীগণের আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। বীরবর কুবলয়াশ্ব, নিমেষমধ্যে সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া সেই

* মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত উপাখ্যান অবলম্বনে এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

ায়া-বরাহের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ারাচ-প্রহরণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ানবের বলবীর্য্য সকলই অন্তর্হিত হইল। ুরাত্মা, গাঢ়ব্যথায় অস্থির হইয়া, পর্ব্বত-পাদপ-সঙ্কুল অরণ্যানীর মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবিষ্ট হইল। পিতৃনির্দেশবর্ত্তী কুবলয়াশ্ব সেই মনোযায়ী তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া বরাহরূপী দানবের অনুসরণ করিলেন। বরাহ, দিগ্‌পথ অতিক্রম করিয়া বিবৃত ভূ-গর্ত্তে নিপতিত হইল। অশ্বারূঢ় রোষোন্মত্ত রাজপুত্রও অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিতে অবসর না পাইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই অন্ধতমসাবৃত মহাগর্ত্তে নিপতিত হইলেন। কিন্তু কোথায় সে মায়াবী দানব?

(৩)

পাতাল নগর। সূর্য্যরশ্মি নাই। চন্দ্রালোক নাই। নক্ষত্র নাই। অথচ অন্ধকার নাই। কৃষ্ণপক্ষ নাই। বিভাবরী নাই। মেঘাবরণ নাই। সর্ব্বত্র মণি-মাণিক্যের আলোকরশ্মি হীরক-রত্নের জ্যোতিঃপ্রভা। শত সহস্র সুবর্ণময় প্রাসাদ, রত্নময় অট্টালিকা; দেখিতে নয়ন ঝলসিয়া যায়। সেই স্নিগ্ধালোকনিমগ্ন মহারাজ্যে—সেই নিরুপপ্লব তেজোময় পাতাল নগরে, এক হিরণ্ময় হর্ম্ম্যোপরি দুইটী রমণী—অনুপম-লাবণ্যময়ী দুখানি বিষাদ-প্রতিমা, নীরবে নিষণ্ণ। বিষাদ-কালিমাঙ্কিত বদন-যুগল শীতসঙ্কুচিত ছিন্নমূল কমলবৎ অধিকতর পরিম্লান; স্তিমিত নিষ্প্রভ নয়নের অস্ফুট জ্যোতি ঔদাস্যের ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। বিধবা এবং কুমারী—দুই জনেই চিত্র-পুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ। প্রকোষ্ঠে আর কেহ নাই; প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার বিশাল রাজত্ব। অনেক ক্ষণের পর, কুমারী নিস্তব্ধতা দূর করিয়া বলিলেন,—"সখি! আমার জন্য তুমি অকারণ নিদারুণ কষ্ট পাইলে; আমার জন্য তোমার অভিলষিত ধর্ম্মকার্য্য এতদিন অনুষ্ঠিত হয় নাই। আমার জন্য তুমি বৈধব্য-দগ্ধ শরীর আরও দগ্ধ করিয়াছ। কিন্তু আর না; আমার আর আশা ভরসা নাই; এখনই দুষ্ট-দানব আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে; আজ শেষ-দিন। নির্দ্দিষ্ট সময় অদ্য ফুরাইল।

"সখি! তুমি আমার কেবল সখী নহ। তুমি আমার গুরু, আমার ধাত্রী, আমার পরিচারিকা, আমার মন্ত্রী। তোমার নিকট আজ আমি জন্মের মত বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; এই সুসমিদ্ধ হুতাশনে দেহ আহুতি দিয়া সকল যন্ত্রণা এবং পাতক-শঙ্কা হইতে বিমুক্ত হই।"

প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বে এক শামময় বৃহৎ কুণ্ডে প্রদীপ্ত অগ্নি, সুরক্ষিত ছিলেন।

বিধবা কি বলিবেন, অলীক সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া প্রবোধ প্রদানে আর প্রবৃত্তি নাই। তিনি নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

কুমারী বলিলেন,—"পতিদেবতে! চরণ-ধূলি প্রদান কর। আশীর্ব্বাদ কর, পরজন্মে যেন আর এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে না হয়।" কুমারী, সখীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

বিধবা আর থাকিতে পারিলেন না; মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"সখি! অগ্রে আমি দেহত্যাগ করি, পশ্চাৎ তুমি যাহা হয় করিও। আমার সাক্ষাতে এ প্রকার কার্য্য করা কি তোমার উচিত?"

কুমারী, ভাবিতেছিলেন, সখী সহজে কখনই বিদায় দিবেন না, অথচ বিলম্বে আমার ধর্ম্মনাশ হইতে পারে। এ সময় আর বাগ্‌বিতণ্ডা করা উচিত নহে। এখনই অনলে পতিত হই। মনে মনে কুলদেবতার স্মরণ করিলেন মনে মনে অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। আর সখীকে একবার দেখিলেন,—সখী, অদূরে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। কুমারী 'অয়মেবাবসরঃ' বুঝিয়া অনলোদ্দেশে লম্ফপ্রদান করিলেন। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইল না, পশ্চাৎ হইতে একজন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পতন-রোধ করিল।

কুমারী সভয়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, এক অসামান্যা রূপবতী রমণী তাঁহাকে অগ্নি-প্রবেশ হইতে বিরত করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, ইহাও বুঝি আসুরী মায়া। কুমারীর ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ পাংশুবর্ণ হইল।

আগন্তুক রমণী মিষ্টস্বরে বলিলেন, "মদালসে! ভয় নাই, আমি দেবমাতা সুরভি। তুমি কি নিমিত্ত এই মহাসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে? বৎসে! এমন উদ্যম আর করিও না। এই দানবাধম, তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। এক রাজ-

পুত্র এই দানবকে শরবিদ্ধ করিবেন; তিনিই মর্ত্তলোক হইতে এই পুরীতে আসিয়া তোমায় বিবাহ করিবেন। তুমি আশ্বস্তা হও। অন্য দানব আসিলে, তাহাকে মিষ্ট কথায় এবং আশা দিয়া তুষ্ট করিও।" অনন্তর কুমারীর প্রার্থনামতে সুরভি, আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন।

কুমারী এবং বিধবা উভয়ই অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে দেবমাতাকে প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

(৪)

কুবলয়াশ্ব, শরবিদ্ধ মায়া-বরাহের অনুসরণ করিতে করিতে অদ্য পাতাল-নগরে রমণীদ্বয়ের অধিষ্ঠিত হর্ম্যদ্বারে উপস্থিত। কুমারী, বাতায়ন পথে তাঁহার পীনোন্নত বক্ষস্থল, শালপ্রাংশু দেহ, প্রশস্ত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নযুগল এবং ধীর-গতি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কুমারীর সংযম শিক্ষা বিফল হইয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞান পরাজিত হইয়াছে। তিনি অতৃপ্ত-নয়নে সেই বীরদেহের রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছেন। সহসা দেবমাতার বাক্য তাঁহার মনে পড়িল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। হৃদয়ের তুমুল ঝঞ্ঝাবাতে ক্ষণকালের জন্য জ্ঞানদীপ নির্ব্বাণ হইল। বিহ্বল হইয়া অধিষ্ঠিত আসনেই পতিত হইলেন। নিকটে সখী নাই, সখী পূজার্থ পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতি-দেবী বাতায়নগত দক্ষিণানিলে কুমারীর সুকুমার দেহ ব্যজন করিতে লাগিলেন; ললাট-বিগলিত স্বেদজলে, কুমারীর বদন-লোচন অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

আনন্দ-সমাচার প্রদান করিবার জন্য কুমারী-সখী দ্রুতপদে গৃহপ্রবেশ করিয়াই এই বিষম ব্যাপার অবলোকন করিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহার দারুণচিন্তা ভোগ করিতে হইল না; প্রকৃতির সাহায্যে, কুমারী তখনই চৈতন্য লাভ করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সখী, কুমারীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুমারী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার ধর্ম্ম রক্ষিত হইল না; দেবমাতা সুরভি বলিয়া গিয়াছেন, দানব-ঘাতক রাজপুত্র আমার স্বামী হইবেন, কিন্তু আমার চিত্ত—ঐ দেখ,—বাতায়ন পথে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, ঐ মোহন মূর্ত্তিতে নিবিষ্ট হইয়াছে। ভবিতব্য অন্যথা হইবে না; স্বামী তিনিই হইবেন, কিন্তু মন এই পুরুষে অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং আমার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা হইল কৈ? আমি ব্যভিচারিণী হইতে বসিয়াছি। এই দারুণ চিন্তা আবির্ভূত হইয়াই আমাকে একেবারেই জ্ঞান-শূন্য করিয়াছিল।" এখনও আমার প্রকৃত জ্ঞান নাই। আমি কিসে এই পাতক হইতে উদ্ধার পাইব, এখনও তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। অগ্নিদেবই আমার একমাত্র শরণ। এই পাপপঙ্কিল জীবন ধারণ করিয়া অনন্তকাল যন্ত্রণাভোগ করা অপেক্ষা, অচিরেই ইহার শেষ করা উচিত।"

সখী। "স্থির হও; আমি তত্ত্ব করিয়া জানিয়া আসিলাম, এই দুষ্ট দানব, বরাহদেহ ধারণ পূর্ব্বক আশ্রম-বিঘ্ন-সম্পাদন করিতে গিয়াছিল, কোন মুনি-ত্রাণকারী মহাপুরুষ, শরাঘাতে ইহার প্রাণসংশয় করিয়াছেন। দুরাত্মা মৃতপ্রায় হইয়া আপনার গুপ্ত-গৃহে পতিত আছে। আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে, ইনিই সেই মুনি-ত্রাণকারী মহাপুরুষ। নতুবা সামান্য মনুষ্য, এস্থানে আসিতে কখনই সমর্থ হয় না। আর ইনি যে মনুষ্য, আকৃতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। অতএব শান্ত হও; ইহাঁর নিকট সকল কথা জানিয়া লইতেছি।"

ব্রহ্মচারিণী বিধবা, কুবলয়াশ্বের নিকট গমন করিলেন।

কুবলয়াশ্ব, রমণীকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। এতক্ষণ জনমানব দর্শন করেন নাই, কাহাকেও কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই; বরাহের অনুসন্ধানও করিতে পারেন নাই; ক্ষুধা তৃষ্ণাও প্রবল হইয়াছে।

রমণী সমীপবর্ত্তিনী হইবামাত্র, কুবলয়াশ্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুভগে! আপনি কি বলিতে পারেন, একটা বরাহ এই দিক্ দিয়া পলায়ন করিয়াছে কি না?"

রমণী মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া কুবালয়াশ্বের সকল বৃত্তান্তই অবগত হইলেন। এবং বুঝিলেন, সখীর অদৃষ্ট এতদিনে সুপ্রসন্ন হইয়াছে। সুরভি, যাঁহার সহিত সখীর বিবাহের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তিনিই এই।

রমণী বলিলেন, "রাজকুমার! সেই বরাহ-রূপী দানব, আপনার শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া স্বীয় গুপ্তগৃহ আশ্রয় করিয়াছে;—এক্ষণে তাহার আর সন্ধান পাইবেন না। সে যাহাহউক, আপনি অরণ্য ভূগর্ভ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, অদ্য আমার নিকট আপনার আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিতে হইবে।

কুবলয়াশ্ব বলিলেন, আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, আপনার স্বভাব এবং বাক্যাদি দ্বারা বোধ হইতেছে, আপনি কোন দেবাঙ্গনা; কিন্তু এই দৈত্য-প্রদেশে আপনি কেন বাস করিতেছেন? জানিতে আমার বড়ই কুতূহল হইতেছে। যদি প্রকাশ করা অনুচিত না হয়, ত বলিয়া চরিতার্থ করুন।

রমণী বলিলেন, গৃহে আসুন, শ্রমাপনোদন করুন, সকল কথা জানিতে পারিবেন। রমণী, কুবলয়াশ্বকে সমভিব্যাহারে লইয়া একেবারে মদালসার প্রাকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন।

মদালসা, কুবলয়াশ্বকে দেখিয়া লজ্জা, আনন্দ, মনোবিকার এবং চিন্তার বশবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সখীর সঙ্কেত মত অভ্যুত্থান দ্বারা অতিথির সম্মাননা করিলেন।

জিতেন্দ্রিয় রাজপুত্রও ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। সেই রূপ-মাধুরী, সেই লজ্জারক্ত-গণ্ডস্থল, স্বেদজল-লাঞ্ছিত-ক্ষুদ্র-ললাট, সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ-তরঙ্গিত-কেশ-কলাপ, সেই ভূমিতল-সংলগ্ন-দৃষ্টি, সুবিশাল পক্ষ্মল নয়ন-যুগল দেখিয়া কুবলয়াশ্ব ক্ষণকালের জন্য রোমাঞ্চিত হইলেন। পরক্ষণেই রাজকুমার প্রকৃতিস্থ হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে সুখাসীন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বলিলেন;—সুভগে! আমার কুতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; আপনি কে? ইনি কে? এখানেই বা আপনারা কিজন্য?—জানিতে বড়ই কুতূহলী হইয়াছি।"

রমণী বলিলেন, "তবে বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই কুমারী, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা,—নাম মদালসা। যাহাকে আপনি বাণ-বিদ্ধ করিয়াছেন, সেই দুরাত্মা দানব পাতালকেতু গন্ধর্ব্বরাজের উদ্যান হইতে মায়া-প্রভাবে ইঁহাকে হরণ করিয়াছে। আমি মদালসার সখী,—আমার নাম কুণ্ডলা; গন্ধর্ব্বপ্রবর বিন্ধ্যবান আমার পিতা। আমি বিধবা। শুম্ভাসুরের সহিত সংগ্রামে আমার স্বামী বীরবর পুষ্করমালী বিনষ্ট হইয়াছেন। আমি দিব্য-গমন-প্রভাবে তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া কালাতিপাত করি। এক্ষণে সখীর সহিত আমিও বদ্ধ হইয়া আছি। সখীকে পরিত্যাগ না করিলে, আমারও উদ্ধারের আশা নাই। আমাদের উদ্ধারার্থ আসিলে কেহই আমাদিগকে দেখিতে পায় না। আমরাও কাহাকেও দেখিতে পাই না। আমার সখী মদালসাকে বিবাহ করাই দানবের অভি-প্রায়। কিন্তু বেদশ্রবণে শূদ্র যেমন অনধিকারী, যজ্ঞীয় হবিগ্রহণে কুক্কুর যেমন সর্ব্বথা অনুপযুক্ত, তদ্রূপ অধম দানব আমার সখীকে বিবাহ করি-বারও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হরণ করিয়া আনিয়াই দুষ্ট পাতালকেতু বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, তারপর, 'বৎসর-সাধ্য অগ্নিব্রত আছে—ব্রত সমাপনান্তে শুভদিনে বিবাহ হইবে,' এইরূপ বলিয়া সখী দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ব্রত-ব্যপদেশেই এই প্রকোষ্ঠে প্রজ্বলিত অনল স্থাপন। যদি কোন ক্রমেই উদ্ধার না হয়, তাহা হইলে, এই অনলেই দেহ সমর্পণ করিব—ইহাই আমাদিগের হৃদয়ের গূঢ় অভিসন্ধি। তাই এখনও কৌশলে অগ্নি রাখিয়াছি। বৎ-সরের শেষ দিন, সখী নিরাশ হইয়া ধর্ম্মনাশ-ভয়ে এই অনলে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যতা হন, তখন দেবমাতা সুরভি রমণীরূপে আবির্ভূত হইয়া এই সঙ্কল্প হইতে ইঁহাকে বিরত করেন, এবং বলেন,—'এই দুরাত্মা দানব, তোমার স্বামী হইবে না, এক রাজপুত্র এই দানবকে শরবিদ্ধ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইবেন, তিনিই তোমাকে বিবাহ করিবেন।' সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া সখী জীবন ধারণ করিয়া আছেন।

"সেদিন, পাতালকেতুও উপস্থিত হইয়াছিল, ব্রত সমাপন হইয়াছে জানিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিল। কথা হইয়াছে,—আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে সখীকে সে বিবাহ করিবে। দেব-মাতা সুরভির বাক্য অন্যথা হইবার নহে; তাই আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।"

অনন্তর মদালসাকে বলিলেন,—"সখি! ইনিই সেই রাজপুত্র; ইনিই দানব পাতাল-কেতুকে শরবিদ্ধ করিয়াছেন।"

মদালসা, অধিকতর লজ্জায় অধোবদন হইলেন, তাঁহার স্বেদাঙ্কিত ললাট-গণ্ড অধিকতর স্বেদসিক্ত হইল। তাহার আরক্ত কপোলপালী অধিকতর রক্তিম-রাগে রঞ্জিত হইল। প্রমাণাধিক শ্বাসে তাহার বস্ত্রাবৃত স্তনমণ্ডল বিকম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত-স্রোত ছুটিতে লাগিল। আর কুবলয়াশ্ব?—কুবলয়াশ্ব একবারমাত্র এই অনবদ্যাঙ্গীকে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবাবেশে নিস্পন্দ হইলেন।

কুণ্ডলা বলিলেন,—বিধাতার নির্ব্বন্ধ;—আপনার সহিত সখার পরিণয়। আপনি সখীকে গ্রহণ করিয়া আমাকে সংসার-পাশ হইতে বিমুক্ত করুন। আপনি ইহাঁকে গ্রহণ করিলে আমি আমার ধর্ম্মচর্য্যা যথানিয়মে প্রতিপালন করি।"

কুবলয়াশ্ব বলিলেন, "এই সম্বন্ধ কাহার বাঞ্ছনীয় নহে? গন্ধর্ব্বরাজ-দুহিতার সহিত বিবাহ-প্রসঙ্গে কে সুভগম্মন্য না হয়? দিব্যাঙ্গনা-পরিণয় কাহার প্রার্থনায় নহে। এই শিরীষ-সুকুমার কলেবর, এই অনিন্দনীয় সুষমা কাহার না মনোহরণ করে? পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যবলেই আমার এই স্ত্রীরত্ন লাভের সময় উপস্থিত কিন্তু ভগবতি! কুণ্ডলে! আজ আমার হৃদয়ের সহিত মহা সংগ্রাম উপস্থিত। হৃদয়ের নিতান্ত অভিলাষ এই মুহূর্ত্তেই গন্ধর্ব্বরাজ-দুহিতার সহিত আমার বিবাহ হয়। কিন্তু জ্ঞান আসিয়া তাহাতে বাধা দিতেছে

"আমি অধীন, পিতা বর্ত্তমান; আমি পিতার আজ্ঞাবহ; তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি এ বিবাহ করিতে পারি না। ভগবতি! আমি প্রতিজ্ঞা করিতে পারি, যদি মদালসার সহিত আমার বিবাহ না হয়, তাহা হইলে আমি আর বিবাহ করিব না। পিতা যাহাতে বিবাহ করিতে আদেশ না করেন, তাহা করিব। কিন্তু তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি বিবাহ করিতে পারি না। দেবি! আপনিই বলুন, কি করিয়া আমি পিতাকে না বলিয়া এ বিবাহ করিতে পারি।"

মদালসার হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ যুগপৎ অনুভূত হইতে লাগিল।

কুণ্ডলা বলিলেন,—"দিব্যবিবাহে অনুমতির অপেক্ষা নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে এ বিবাহ করিতে পারেন।"

কুবলয়াশ্ব নীরবে রহিলেন। কুণ্ডলা আবার বলিতে লাগিলেন,—"অথবা আপনার পিতার অনুমতি গ্রহণ করাও বিচিত্র নহে। আমাদের কুলগুরু গন্ধর্ব্বমুনি তুম্বুরু সকল কার্য্য সমাহিত করিবেন। আমরা বিবাহাদি কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি উপস্থিত হইবেন;—এই বর কুলগুরু আমাদিগকে দিয়াছেন।" মদালসার বিষাদ-দুঃখ অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

কুণ্ডলা, কুলগুরুর স্মরণ করিলেন। স্মৃতিমাত্রে অনুদ্ধতাকৃতি, প্রশান্তচেতা, তেজঃপুঞ্জময়, পরমভাগবত ভগবান তুম্বুরু তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। তুম্বুরুকে দেখিবামাত্র সকলেই আসনত্যাগ করিয়া উঠিলেন, সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দিব্যদর্শী তুম্বুরু, সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন ও স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট আসনে আসীন হইলেন। কুণ্ডলা বলিলেন,—"গুরো! স্মৃতিমাত্রে যে অদ্য আপনি উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। ভগবন্! এই রাজকুমারের সহিত গন্ধর্ব্বরাজ-দুহিতা মদালসার বিবাহ হইবে। এই রাজপুত্রই আমাদের এখন উদ্ধারকর্ত্তা। সখা মদালসা, ইহাঁর প্রতি সবিশেষ অনুরক্তা সখার প্রতিও ইহাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ হইয়াছে। কিন্তু রাজকুমার পিতার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিবেন না। আমরা ঘোরতর বিপন্ন; আপনি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া উপায় বিধান করুন।"

তুম্বুরু হাস্য করিয়া বলিলেন, "কুণ্ডলে! আমি সমস্তই বিদিত আছি; আমিই রাজকুমারের পিতা মহারাজ শত্রুজিতের অনুমতি লইয়া আসিয়া এই বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।"

কুবলয়াশ্ব ও মদালসা আনন্দ ও উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে লাগিলেন। মনোযায়ী মুনিপ্রবর তুম্বুরু, মহারাজ শত্রুজিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় পুত্রের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া—মদালসার সহিত রাজপুত্রের বিবাহে অনুমতি গ্রহণ করিলেন। মহারাজ পুত্র-কার্য্য শ্রবণে ও তুম্বুর-সমাগমে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তুম্বুরু, রাজার নিকট যথাযোগ্য পূজা-সৎকার প্রাপ্ত হইয়া পাতাল-পুরীতে প্রত্যাগত হইলেন। তুম্বুরু-মুখে, কুবলয়াশ্ব, পিতার অনুমতি-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। মদালসার সেই যত্নরক্ষিত প্রাণত্যাগের অনল,

সেই মিথ্যাব্রতের কল্পিত অনল, আজ বৈবাহিকাগ্নিতে পরিণত হইলেন। নরঘাতী রত্নাকর আজ ঋষিপুঙ্গব হইলেন। ভীষণ হলাহল বুঝি আজ পীযূষধারা হইল।

তুম্বুরু যথাবিধি মদালসা ও কুবলয়াশ্বের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তে স্বস্থানে প্রতি গমন করিলেন। কুণ্ডলার আনন্দের সীমা রহিল না। কুণ্ডলা, মদালসাকে কত নারীকর্ত্তব্য শিখাইলেন, কুবলয়াশ্বের হাতে হাতে আপনার প্রিয় সখীকে সমর্পণ করিলেন তবু যেন প্রত্যয় হয় না; সবিনয়ে কুবলয়াশ্বকে কত কথা বলিলেন, হিতোপদেশ দিলেন, কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরিশেষে সখীকে বিদায়-আলিঙ্গন দিয়া এবং রাজপুত্রকে নমস্কার করিয়া দিব্যগমনে তীর্থপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সংসার বিরক্তা বিধবা কুণ্ডলা মায়াপাশ বিমুক্ত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। মদালসা, দানবের ক্রীড়া সামগ্রী বিলাসোপকরণ না হইয়া বীরাগ্রগণ্য ধার্ম্মিক-প্রবর পরমসুন্দর রাজপুত্রের সহধর্ম্মিণী হইলেন, তাঁহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। কুবলয়াশ্ব মনুষ্যদুর্লভ দিব্যাঙ্গনা মদালসাকে পাইলেন বটে; কিন্তু সেই শরবিদ্ধ বরাহরূপী দানবের সন্ধান পাইলেন না; তাঁহার বাসনা এখনও পূর্ণ হয় নাই। যাহাহউক, তিনি নাতিহৃষ্টমনে মদালসাকে লইয়া তুরঙ্গারোহণে মর্ত্তভূমে যাত্রা করিলেন।

তখন দানবগণ, জানিতে পারিয়া বিষম চীৎকার করিতে লাগিল,—'পাতালকেতু স্বর্গ হইতে যে রমণী রত্ন আহরণ করিয়াছেন, এই তাহা অপহৃত হইতেছে, অপহৃত হইতেছে।'

সেই চীৎকার শব্দে পাতালকেতু-সমভিব্যাহারী দানবদল অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাজনন্দনের সম্মুখীন হইল।

সেই দুর্দ্ধর্ষ-দানব-বৃন্দ,—'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া রাজনন্দনের প্রতি, শূলশেল, মুষলমুদ্গার, শরশক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। রাজপুত্র কুবলয়াশ্বও একাকী লঘুহস্তে শত সহস্র দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি দানব নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র স্বীয় অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা অনায়াসেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন। অনন্তর, রাজপুত্র, ত্বাষ্ট্রঅস্ত্র দ্বারা সমুদয় বৈরীদিগকে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিলেন।

কুবলয়াশ্বের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। সেই গালবাশ্রমপীড়াপ্রদ—দুষ্ট দানব পাতালকেতুর বিনাশে, রাজপুত্রের বিশেষ আনন্দ হইল। তিনি সমুদয় বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তুষারমুক্ত হিমকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র, মদালসা সমভিব্যাহারে তুরঙ্গারূঢ় হইয়া পিতৃভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

(৫)

শত্রুজিৎ-নগরে আজ মহামহোৎসব। নগর আজ সুসজ্জিত। রাজভবনে দীনদুঃখীকে আশাতিরিক্ত দান করা হইতেছে। বন্দীর মুক্তি, ঋণীর ঋণমোচন, ভোজনার্থীকে অন্ন দান প্রতিনিয়তই হইতেছে। প্রতিগৃহে মঙ্গল-বাদ্য বাজিতেছে। কুবলয়াশ্ব, আশ্রম রক্ষা, দৈত্য বধ ও গন্ধর্ব্ব কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। অদ্য রাজনন্দনের বীরত্বগাথা ঘরে ঘরে গীত হইতেছে; আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। মহারাজ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। অদ্য রাজকুমার কুবলয়াশ্বও অধিকতর আনন্দিত, কেননা, পিতা তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতি সম্পন্ন হইয়াছেন; পিতা বলিয়াছেন, 'তোমার পিতা হইয়া আমি শ্লাঘ্য হইয়াছি; তুমি আমার কীর্ত্তিবর্দ্ধনপুত্র।' তাই রাজপুত্রের আজ অসীম আনন্দ এরূপ আনন্দ, কুবলয়াশ্বের ইহজীবনে আর ঘটে নাই।

পিতার পরম প্রীতিসম্পাদনই সৎপুত্রের কার্য্য। তাহাতেই সৎপুত্রের আনন্দ। এইরূপ পিতৃ-প্রীতি সম্পাদন কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? ধন্য কুবলয়াশ্ব! তুমি নিজগুণে পিতার অসীম প্রীতি সম্পাদন করিয়াছ।

পুত্রের বীরত্বকীর্ত্তি, স্নুষার অতুলনীয় রূপরাশি, অনুপমেয় গুণরাশি, বীরজননী বীরাঙ্গনা শত্রুজিন্মহিষীকে স্বর্গসুখ প্রদান করিয়াছে। সুখের স্রোত প্রবাহিত; আনন্দের তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছুটিয়াছে। পাতাল-প্রত্যাগত বিজয়ী বীর কুবলয়াশ্বকে দেখিতে প্রজাপুঞ্জ দলে দলে আসিতেছে। সকলেই মহারাজের ও রাজনন্দনের জয়ধ্বনি করিতেছে। সে সুখের দিন স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়। সেই রাজদ্বারের গগনভেদী জয় জয় ধ্বনি, প্রজাপুঞ্জের পূর্ণ

তৃপ্তিময় চিত্ত এখনকার আমাদের অভিনিবেশ সহকারে চিন্তনীয়। চিন্তা করিলেও প্রাণ সুখময় হইয়া উঠে।

অদ্য হইতে কুবলয়াশ্ব, পিতার আদেশে, আনন্দময় নগরে, আনন্দ-ভবনে আনন্দ-উদ্যানে সহধর্ম্মিণী সহ আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

(৬)

আনন্দের দিন শীঘ্রই অতিবাহিত হয়। দেখিতে দেখিতে বৎসর অতীত হইল। মদালসা প্রত্যহ প্রভাতে শ্বশ্রূ শ্বশুরের পাদবন্দন, গুরুজনের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করেন। বয়স্যা, সখী, চেটী—প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করেন। আর কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করেন। স্বামী কুবলয়াশ্ব, অতৃপ্তহৃদয়ে তাঁহার রূপমাধুরী পান করেন, গুণগ্রাম পর্য্যালোচনা করেন। তিনি সকল কার্য্যেই মদালসার ছায়া দেখিতে পান। তাঁর জীবন মদালসাময় হইয়া উঠিয়াছে। মদালসা, ক্ষণেকের জন্ম মান করিলেও তাঁর অসহ্য হয়। আহা মদালসা যে তাঁর জীবনগ্রন্থি!

একদা এক তেজঃপ্রভাময় ঋষিকুমার আসিয়া মহারাজ শত্রুজিৎকে বলিলেন, "মহারাজ! দৈত্য দৌরাত্ম্যে আমরা নিতান্ত প্রপীড়িত। আমাদের কুলপতি যজ্ঞ করিবেন, কিন্তু দানববিঘ্ন ভয়ে তাঁহার মনোরথ, কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। আপনি রাজা, আপনি তপঃষষ্ঠাংশ ভাগী; আপনি আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আপনার ঘোরতর অধর্ম্ম। দানবগর্ব্বখর্ব্বকারী আপনার বীরপুত্র কুবলয়াশ্বকে আমার সহিত প্রেরণ করুন। ঋষিপীড়া-দমনে, মহারাজ, সময়াতিপাত করিবেন না।"

রাজা, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া ঋষিকুমারকে বলিলেন, "আমি এখনই আপনার সহিত আমার পুত্রকে প্রেরণ করিতেছি।" রাজার আদেশে কুবলয়াশ্ব-ভবনে তৎক্ষণাৎ প্রতিহারী ধাবিত হইল।

এদিকে কুবলয়াশ্ব তখন প্রেয়সীর প্রসাধনে নিযুক্ত; আজ মদালসার অভিলাষ হইয়াছে, স্বামী তাঁহার প্রসাধন সম্পাদন করিবেন। ছলে কৌশলে গন্ধর্ব্বনন্দিনী স্বামীকে আপনার মনোরথ জ্ঞাপন করিয়াছেন, কলাকুশল কুবলয়াশ্ব, হৃষ্ট মনে সেই কার্য্য করিতেছেন। তখনও প্রসাধন সমাপ্ত হয় নাই; সমাপ্ত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, পুষ্পমাল্য গ্রথিত হইয়াছে, কিন্তু তখনও তাহা মদালসার কোমল কণ্ঠে স্থান পায় নাই। কুসুম-কর্পূর-চন্দন-গন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও স্তনমণ্ডলে পত্রাবলীর সমাবেশ হয় নাই। এমন সময় প্রতীহারী গিয়া অবরোধ পরিচারিকা মুখে রাজাদেশ—রাজসকাশে অবিলম্বে গমন—নিবেদন করিল।

পিতৃভক্ত কুবলয়াশ্ব এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী মদালসা আর কি কলা-কৌশলে কালাতিপাত করিতে পারেন। মদালসা তখনই বলিলেন, স্বামিন্! এ সব কার্য্য এখন থাক, আপনি অবিলম্বে রাজসকাশে গমন করুন। কুবলয়াশ্ব, হৃদয়ানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন, মদালসার দিকে একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। কিন্তু আজ কুবলয়াশ্বের বীরহৃদয় এত ব্যাকুল হইল কেন? পিতৃনিদেশ পালন-পরায়ণ সুপুত্রের আজ পিতৃসন্নিধান-গমনে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল কেন? জানি না বিধাতার মনে কি আছে?

(৭)

যমুনাতীর। তপোবন।

"নীবারাঃ শুককোটরার্ভকমুখ-
ভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ
সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।"

আবার—

"কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা
ভিন্নো রাগঃ কিশলয়রুচামাজ্যধূমোদ্গমেন
এতেচার্ব্বাগুপবনভুবি ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াং
নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরন্তি॥"

ইতস্ততঃ ঋষিকুমারদিগের বেদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। পশ্চাৎবর্ত্তী একখানি পর্ণকুটীরে কুলপতি বৃদ্ধ মহর্ষি প্রগাঢ় সমাধিমগ্ন।

এই কুলপতি আর কেহ নহে, সেই দৈত্য পাতালকেতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুরাত্মা তালকেতু। তাহার সমাধি প্রতিহিংসা। মায়াবলে উত্তম তপোবন নির্ম্মাণে তাহার মনে মনে আনন্দ হইয়াছে। তখন তালকেতু ভাবিতেছিল, "এ কৌশলে আমি কৃতকার্য্য হইবই; আমার জ্যেষ্ঠহন্তা কুলবৈরী

কুবলয়াশ্বের সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম হইবই। আমি আমার ভাগিনেয় নিকুম্ভকে ঋষিকুমাররূপে রাজসদনে প্রেরণ করিয়াছি, ঋষিত্রাণের কথা শুনিয়া, আর্ত্ত-পরিত্রাণের কথা শুনিয়া রাজা শত্রুজিৎ কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। পুত্রকে তৎস্থলে নিশ্চয়ই প্রেরণ করিবে। অরেরে! মানবাধম কুবলয়াশ্ব! তুই, শারীরিক বীর্য্য পাইয়া বড়ই গর্ব্বিত হইয়াছিস্, কিন্তু দেখিব, আজ তোর হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারি কিনা?"

একজন অনুচর আসিয়া তালকেতুকে সংবাদ দিল, "কুবলয়াশ্ব আসিয়াছেন"। তালকেতু আনন্দে উৎফুল্ল হইল। মনে করিল, "আঃ! আজ কি সুখের দিন! জ্যেষ্ঠভ্রাতার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আজ আমি পরলোকগত জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে সুযোগ পাইলাম।"

ঋষিকুমাররূপী নিকুম্ভের প্রদর্শিত মার্গা-বলম্বনে, কুবলয়াশ্ব সেই বৃদ্ধ ঋষির সমীপে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণের পর তাঁহার কপট সমাধি ভঙ্গ হইলে, রাজনন্দন ঋষিকে অভিবাদন করিলেন, ঋষি আশীর্ব্বাদ এবং স্বাগতপ্রশ্নাদি করিয়া আশ্রমে দৈত্য-দৌরাত্ম্যের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন, "রাজনন্দন! আমি, যোগানুষ্ঠান পুরঃসর একটী যজ্ঞ করিব, কিন্তু আমার অর্থ নাই; আপনি আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে এবং আশ্রম রক্ষায় নিযুক্ত হইলে, আমি নিশ্চিন্তমনে ও নির্ব্বিঘ্নে এই যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইতে পারি। অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে আমার যজ্ঞাদি কার্য্য সমাপ্ত হইবে। রাজনন্দন! আপনার বীরত্ব অসীম, আপনার কীর্ত্তি অতুলনীয়। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনার বীরত্ব কীর্ত্তি আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।"

রাজনন্দন বলিলেন, "আমার নিকটে ত অন্য ধন নাই, এই কণ্ঠভূষণ উজ্জ্বলরত্ন আছে, ইহাতে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয় ত বলুন, এখনই দিতেছি। নতুবা যত অর্থের প্রয়োজন, পিতাকে জানাইয়া, রাজকোষ হইতে আনাইয়া দিতেছি। আর আশ্রম রক্ষা, ইহা ত আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। মহর্ষে! আপনার যতদিন ইচ্ছা যজ্ঞ করুন, আমি আশ্রম রক্ষা করিব। আপনার আশ্রমকে আমি নিরুপদ্রব করিয়া তবে রাজধানীতে প্রতিগমন করিব।"

ঋষি বলিলেন, "রাজনন্দন! বংশের অনুরূপ কথাই বলিয়াছ; তোমার ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তোমার পিতা ধন্যতর হইয়াছেন। আমি পরম প্রীত হইলাম। তোমার কণ্ঠরত্নই আমার যজ্ঞে পর্য্যাপ্ত। অন্য ধনে প্রয়োজন নাই।"

কুবলয়াশ্ব, হৃষ্টচিত্তে কণ্ঠরত্ন উত্তোলন করিয়া ঋষিকে প্রদান করিলেন।

ঋষিপ্রবর, অন্তরের সহিত আনন্দিত হইয়া রাজনন্দনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে তিনি রাজনন্দনের আতিথ্য ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "আমি প্রথমতঃ পঞ্চদশ দিন এই কুটীর মধ্যে সমাধিস্থ থাকিব, তৎপরে যজ্ঞারম্ভ হইবে। রাজ-নন্দন! এই পঞ্চদশ দিন রজনীযোগে, আপনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিবেন। এবং যাহাতে আমার সমাধি ভঙ্গ না হয়, তাহা করিবেন।"

ঋষিকুমারকে বলিলেন,—"হারীত! তুমি অবিলম্বে সকল আশ্রমবাসীকে বিদিত কর যে, আমি পঞ্চদশ দিন এই কুটীরে সমাধিস্থ থাকিব। কেহ যেন কোন প্রকারে সমাধির ব্যাঘাত না করে।"

সকল দিকে সুব্যবস্থা হইল। পরদিন প্রভাতে ঋষিবর কুটীরদ্বার রোধ করিয়া সমা-ধিস্থ হইলেন। রাজনন্দন কুবলয়াশ্ব ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত আশ্রম রক্ষা করিতে লাগিলেন।

(৮)

কুটীরের দ্বার রুদ্ধ। রাজনন্দন জানিয়া রাখিয়াছেন;—মহর্ষি, কুটীরাভ্যন্তরে মহাযোগে নিরত। রাজনন্দন জিতনিদ্র হইয়া রজনীযোগে আশ্রম পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু কোন বিঘ্ন-কারী দৈত্য-দানবের দর্শন ঘটে না। তিনি বিবেচনা করিলেন, ভীরু কাপুরুষ দানবগণ, রক্ষকহীন শমপরায়ণ ব্রাহ্মণেরই হিংসা করে। আয়ুধের নাম শ্রবণেই বোধ হয়, তাহারা পলায়ন করিয়াছে।

ফল কথা, ঋষিপুঙ্গব কুটীরে নাই; তিনি রাজকুমারের সেই কণ্ঠরত্ন গ্রহণ করিয়া গোপনে শত্রুজিৎ-নগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন।

সায়ংকাল অতীত হইয়াছে; রাজা শত্রুজিৎ অন্তঃপুরে অবস্থিত। এমন সময় সেই কপট ঋষি, রাজসাক্ষাৎকার-লাভার্থ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঋষিদিগের অবারিত দ্বার। রাজা, ঋষিপুঙ্গবের যথাবিধি সৎকার সমাদর

করিয়া, তাঁহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিন্তু ঋষি ক্ষণকাল নীরব। তাঁহার বিশুষ্ক-বদন, অশ্রুপ্লাবিত লোচন এবং ব্যাকুলতা দেখিয়া, রা রাজপত্নী, রাজ-বধূ মদালসা সকলেই নি ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর ঋষি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, " াজ! আমি যে জন্মান্তরে কত পাপই করি তাহার ইয়ত্তা নাই; নতুবা এমন অশনি দৃশ দারুণ সমাচার আমাকে প্রদান করি হইবে কেন? মহারাজ! আমা-দিগেরই াণের জন্য,—দৈত্য-সংগ্রামে কু লয়াশ্ব বীর-জনোচিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তপ ার অন্তে নির্গমন করিয়াছেন: তিনি পশ্চিমসময়ে ই অঙ্গুরী আমার হস্তে দিয়া, শেষ সমাচার পিতামাতাদের কট দিবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। সে সময় অগত্যা আমাকে তাহা স্বীকার করিতে হয়। তাই মহারাজ! এই দারুণ সমাচার লইয়া আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। রাজকুমার কুবলয়াশ্ব! তথায় নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলে

একটা ক্ষুদ্র শোকান্ধকার রাজপুরীকে পরিব্যাপ্ত করিল। বিষাদ-রাক্ষসের করালভৈরব ছায়া রাজভবনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজা রাজপত্নী প্রভৃতি সকলেই শোকাবেগে বিমুগ্ধ হইলেন। আর গন্ধর্ব্বরাজদুহিতা মদালসা?—তিনি স্বামীর কণ্ঠভূষণ লইয়া স্বীয় শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু নাই, বদনে 'হা হতাস্মি' নাই তিনি গম্ভীরভাবে এটী ওটী দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রসাধন কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই—স্বামী ঋষি-পরিত্রাণের জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেই প্রসাধন সামগ্রী সেই স্থানেই ছিল আর কেহ তাহাতে হস্তার্পণ করে নাই। মদালসার বড় সাধ হইয়াছিল, স্বামী আসিলে, এই বিশুষ্ক পরিম্লান প্রসাধনোপকরণেই তাঁহার হস্তে আবার প্রসাধিত হইব।

মদালসা, সেই প্রসাধন-সামগ্রীগুলি একে একে লইলেন। বিশুষ্ক মাল্য, বিশুষ্ক অনুলেপন, আঞ্জন, অলক্তক, সিন্দূর, বস্ত্র, অলঙ্কার—যাহা ছিল, সমস্তই লইলেন, স্বামীর পাদুকা লইলেন, স্বামীর পরিধেয় বস্ত্র লইলেন,—আর কি করিলেন?—তাঁহার প্রিয় শুক-সারিকাকে পিঞ্জরমুক্ত করিলেন, দাসদাসীকে আপনার ধনরত্ন সমস্ত প্রদান করিলেন। তার পর, স্বামীর বৈশ্বানরবহ্নিতে কলেবর আহুতি দিয়া অন্তরের দারুণ দাবানল নির্ব্বাণ করিলেন।

রাজা রাণী সকল কথাই শুনিলেন। তাঁহাদের শোকাবেগ দ্বিগুণ হইল। পুত্রের শৌর্য্য-বীর্য্য,—পুত্রবধূর রূপ গুণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে শেলবিদ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহাদেরও মনে হইল, আর কেন, এ পাপ-তাপময় সংসারে আর কেন! ক্রমে জ্ঞান শক্তির নিকট সর্ব্ববিজয়িনী শোকশক্তি পরাজিত হইল। ধর্ম্মপ্রমোদসলিলে বিষাদের কলঙ্ককালিমা বিধৌত হইল। রাজা বলিলেন, হে শোকাচ্ছন্ন স্বজনগণ!—আমি এতক্ষণ বিষম মায়ামোহে অভিভূত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি সুস্থ হইয়াছি। আমার মোহ অপগত হইয়াছে, তোমাদিগেরও মোহ অপগত হউক, আর পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য শোক করিও না। আমিও রিতেছি না;—

"কিং নু শোচামি তনয়ং কিং নু শোচ্যমাহং স্নুষাম্।
বিমৃষ্য কৃতকৃত্যত্বাদ্মন্যেঽশোচ্যাবুভাবপি ॥
মচ্ছুশ্রূষুর্মদ্বচনাদ্দ্বিজরক্ষণতৎপরঃ
প্রাপ্তো মেষ-সুতোমৃত্যুং কথং শোচ্যঃস ধীমতাম্ ॥
অবশ্যং যাতি যদ্দেহং তদ্দ্বিজানাং কৃতে যদি।
মমপুত্রেণ সন্ত্যক্তং নন্বভ্যুদয়কারি তৎ ॥"

আমার পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়েই কৃতার্থ হইয়াছেন, অতএব, আমি তাঁহাদের জন্য শোক করিব কেন?

মন্নিদেশবর্ত্তী মৎসেবা-পরায়ণ আমার পুত্র, ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার জন্য কি বুদ্ধিমানে শোক করে? দেহ একদিন না একদিন বিনষ্ট হইবেই, সেই দেহ আমার পুত্র, ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা ত অত্যন্ত আনন্দের কথা।

"ইয়ঞ্চ সৎকুলোৎপন্না ভর্ত্তর্য্যেবমনুব্রতা।
কথং নু শোচ্যা নারীণাং ভর্ত্তুরন্যন্ন দৈবতম্ ॥"

আর আমার পুত্রবধূ যাহা উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। এই সদ্বংশসম্ভূতা সাধ্বী স্বামীর প্রতি উপযুক্ত অনুরাগই প্রদর্শন করিয়াছেন; পতি ভিন্ন দেবতা স্ত্রীজাতির নাই।

ইনি পতির অনুমৃতা হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

রাজার বাক্যে সকলেই ক্রমে ক্রমে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

(১)

রাজকুমার আশ্রম রক্ষায় ব্যাপৃত। ব্রাহ্মণ-রক্ষায় নিযুক্ত আছেন, মনে মনে বড়ই আনন্দ; কিন্তু তিনি জানেন না যে, চন্দনভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও জানেন না যে, তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী মদালসারত্নকে বিনষ্ট করিবার জন্যই মায়াবীর এই মায়া। তিনি স্বর্গভ্রমে যে নরকের অধস্তলে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারেন নাই। রাজোচিত আহার নাই, নিদ্রা নাই, বেশ বিন্যাস নাই, কিছুই নাই, কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার অসীম আনন্দ। সপ্তাহ অতীত হইয়াছে।

আজ কেন হঠাৎ এমন হইল? অকস্মাৎ কেন তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে, তুষানল জ্বলিয়া উঠিল? কেন আজ বীরবাহু অবসন্ন হইল? কেন আজ মর্ম্মান্তিক ব্যাকুলতা—জীবনের ক্রন্দন, অন্তরে অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল? তাঁহার আনন্দ, উদ্যম, উৎসাহ যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে; বিষাদ, অবসাদ, উৎকণ্ঠা আসিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে।

রাজনন্দন আজ এই আত্মশক্তি-বিপর্য্যয়ে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এ বিস্ময় তাঁহার অধিমক্ষণ অনুভব করিতে হয় নাই। দৈবযোগে ক্ষণবিলম্বেই যমুনাতীরে, পূর্ব্ব-পরিচিত মহর্ষি গালবের সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ হইল। রাজনন্দন তাঁহার প্রমুখাৎ এই আশ্রমের গূঢ়বৃত্তান্ত সকল জানিতে পারিলেন। মহর্ষি, মদালসার অমঙ্গল সম্ভাবনা এবং দুরাত্মা তালকেতুর সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইবে, এই দুই কথা বলিয়া দিয়া যথাগত প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু রাজপুত্রের তখনও সংশয় দূর হইল না; তাঁহার মনে হইল, ইহাই যদি দৈত্যমায়া হয়, আমাকে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত করিবার জন্য কোন দৈত্যই যদি মায়াবলে গালবরূপে আসিয়া থাকে; আমি ক্রোধবশে আশ্রমধ্বংসে প্রবৃত্ত হইব, আর ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হইব, এই অভিসন্ধিতে, কোন দানবেও ত আমার বুদ্ধি পরিবর্ত্তন করিতে পারে। তবে এই আশ্রমই মায়াময়,—না এই গালবই মায়াময়?

কুবলয়াশ্ব সংশয়াপন্ন হইয়া, সেই সমাধি-কুটীরের নিকট গিয়া, তাহার অভ্যন্তর উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তথায় মহর্ষি নাই। দুই চারি দণ্ড অপেক্ষা করিয়া আবার দেখিলেন, যোগী তথায় নাই। এইরূপ বার বার দেখিয়া স্থির করিলেন, সত্য সত্যই আমি প্রতারিত হইয়াছি। সত্য সত্যই তালকেতু আমার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য, এই কৌশল করিয়াছে। কুবলয়াশ্ব, অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। উৎকণ্ঠার সহিত ক্রোধ এবং ঘৃণা মিশ্রিত হইল। কুবলয়াশ্ব রোষোদ্দীপ্ত হইয়া, সেই আশ্রম-ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষুদ্র দানবগণ, ঋষিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিল। কেহ কেহ বা যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহার শরনিকরে জর্জ্জরিত হইয়া, শমনসদনে গমন করিল। রাজনন্দন, এইরূপে সেই মায়াশ্রম বিনষ্ট করিয়া, তালকেতুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। রাজনন্দন, গালব-কথিত স্থানে ঋষি-বেশধারী তালকেতুর সাক্ষাৎ পাইয়া, সমরে তাহার প্রাণসংহার করিলেন। মদালসা যে তাঁর ইহলোকে নাই, সে সমাচার, মহর্ষি গালব, তাঁহাকে দেন নাই। কিন্তু তালকেতু সে সমাচার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু শত্রুর কথায় তিনি বিশ্বাস করেন নাই। এ প্রকার সংবাদ হইলে মিত্রের কথাতেও সহসা বিশ্বাস করা যায় না, স্বচক্ষে দর্শন করিলেও যেন অবিশ্বাস হয়, সে সংবাদ প্রতিহিংসা-পরায়ণ শত্রুর মুখে শুনিয়া রাজনন্দন কেন বিশ্বাস করিবেন? তিনি বিশ্বাস করিলেন না বটে; কিন্তু তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে লাগিল। তিনি বিঘূর্ণিত মস্তকে রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজা, রাণী,—মৃত-পুত্রের পুনর্জ্জীবনে যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ লাভ করিলেন। বন্ধু স্বজন আত্মীয়বর্গ, সকলেই পরম আনন্দ লাভ করিলেন। সকলেই আসিয়া রাজনন্দনকে আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৈ সেই পতিপ্রাণা মদালসা, কৈ? তিনি কি তবে ইহসংসারে নাই? শত্রু তালকেতু তবে কি সত্য কথাই বলিয়াছে? রাজনন্দন, জনক-জননী-সমক্ষে হৃদয়ের এই প্রশ্ন গোপন

করিলেন। সুষা-গুণ-বিমুগ্ধা রাজমহিষী কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। তিনি, এই আনন্দময় দিনেও—এই মৃত পুত্রের পুনঃপ্রাপ্তি সময়েও শোকবিহ্বলা হইলেন। তাঁহার ক্ষণিক আনন্দাশ্রু—শোকাশ্রুর সহিত সম্মিলিত হইল। তিনি গুণবতী পুত্রবধূর কথা স্মরণ করিয়া—বিলাপ করিতে লাগিলেন। কেবল মহিষী নয়, সকলেই তখন হাহাকার করিতে লাগিল। রাজনন্দনের হৃদয় শোকে অবসন্ন হইবে, এ ভাবনাও তখন কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইল না। একমাত্র মহারাজ, হৃদয়ের অনল হৃদয়ে চাপিয়া রাজপুত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পিতৃভক্ত রাজপুত্র আজ কিন্তু পিতার কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না। তিনি রোদন করিলেন না, মূর্চ্ছিত হইলেন না। তিনি স্বয়ং কি করিতেছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমে, রাজনন্দন, সকল কথা বুঝিতে ও ভাবিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয়, অসীম শোকে অভিভূত হইল। কত অতীত ঘটনা, তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল। স্মরণের শত শত শক্তিশেল তাঁহার হৃদয়ে নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমে মদালসে! পিতার আদেশ,—সম্মুখে আবার সেই ঋষিকুমার—তৃণচ্ছন্ন কূপোপম ঋষিকুমার-বেশী দানবানুচর, কাতরতা প্রদর্শন করিতেছিল, প্রিয়তমে! তাই তোমার নিকট আর বিদায় লইতে পারি নাই, তৎক্ষণাৎ ঋষি-বিঘ্ন নিবারণের জন্য যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; তাই কি অভিমান করিয়া—আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া, মানবতি! আমায় পরিত্যাগ করিলে? প্রিয়তমে! তুমি ত আমার পিতার আদেশে কখন অভিমান কর নাই। তাঁহার আদেশ,—উচিত হউক, অনুচিত হউক,—তোমার সুখকর হউক, দুঃখকর হউক, তাহাতে ত তুমি কখন দৃক্‌পাত কর নাই,—আমি সে আদেশ পালন করিলে তুমি বরং সন্তুষ্ট হইয়াছ; তবে কেন,—কোন্ অপরাধে এই অভাগাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া চিরদিনের জন্য পলায়ন করিলে?

"অহো! আমি কি নিষ্ঠুর! যে সাধ্বী, আমার প্রাণবিনাশ-সমাচার পাইয়া অবিলম্বে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছেন, আমি, তাঁহার—আমারই জন্য প্রাণত্যাগের কথা শুনিয়াও এখনও জীবন ধারণ করিতেছি! ধিক্ আমাকে! ধিক্ আমার কঠিন জীবনকে!! শত ধিক্ আমার হৃদয়কে!!!

"প্রিয়তমে! তোমার অভিলষিত প্রসাধন আমি সমাপ্ত করিতে পারি নাই,—অলক্তক-রাগে এখনও তোমার পদতল রঞ্জিত করিতে পারি নাই, কমনীয় কম্বুকণ্ঠে মালতীমাল্য এখনও পরাইতে পারি নাই, পৃষ্ঠবিলম্বিত বেণী লইয়া এখনও কবরীবন্ধন করিয়া দিতে পারি নাই, এখনও স্তনমণ্ডলে পত্রাবলী রচনা করিতে পারি নাই,—এস, এস, প্রিয়তমে! একবার এস; সেই অর্দ্ধমণ্ডিত লজ্জাবগুণ্ঠিত শিরীষ-সুকুমার কলেবর একবার প্রদর্শন কর; প্রিয়ে! আমি প্রসাধন-কার্য্য সমাপ্ত করি। আমি তোমায় ধরিয়া রাখিব না, তোমার প্রিয়-পরলোকে যাইতে আমি বাধা দিব না; কেবল একবারখানি এস; আমার বড় সাধের—তোমার আদেশানুযায়ী প্রসাধন—সেদিন শেষ করিতে পারি নাই, আজ শেষ করিব।

"হে প্রভো বৈশ্বানর! আমরা উভয়ে তোমার কত পরিচর্য্যা করিয়াছি, কত সেবা করিয়াছি; আমাকে কি তাহারই প্রতিফল প্রদান করিলে? হে দেব! দেব-শরীরে কি দয়া নাই? নতুবা সেই কমল-কোমল কলেবর কি করিয়া আপনার করাল জ্বালাকলাপে বিশীর্ণ করিয়া একেবারেই বিনষ্ট করিলে!

"প্রিয়তমে! আমি পরলোকে একাকী থাকিয়া কষ্ট পাইব, এই আশঙ্কা করিয়া তুমি জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছ; কিন্তু দেখ, আমি পরলোকে নাই,—ইহলোকে তোমারই জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতেছি। এখন একবার এস, একবার দর্শন দিয়া আমার তপ্ত প্রাণ শীতল কর।

"প্রিয়তমে! তুমি আমারই জন্য পরলোকে গমন করিয়াছ, কিন্তু যখন দেখিলে, আমি তথায় নাই, তখন ইহলোকে আমারই ন্যায়, পরলোকে তুমিও কি এইরূপ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছ? প্রিয়ে! ইচ্ছা করিলেও কি সেখান হইতে এখানে আসিবার যো নাই। তবে দাঁড়াও দাঁড়াও প্রিয়ে! আর কষ্ট পাইতে হইবে না, এই আমি যাইতেছি।"

শোকোন্মত্ত রাজতনয়, শেষের কথাগুলি আবেগপূর্ণ হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন।

বলিয়াই তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন,—পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই শশব্যস্তে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেছেন। তাঁহার হৃদয়, লজ্জা ও শোকের রঙ্গভূমি হইল। তিনি অবনত-বদনে, রুদ্ধশ্বাসে আপনার চিত্তবিকার সহ্য করিতে লাগিলেন। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই অনেক প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তিনি তখন ধীর-স্থির ভাবে হৃদয়ের তুষানল হৃদয়ে রাখিয়া, নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমার অপরাধ কি? যে বিরহ-শঙ্কায় প্রিয়া আমার, অনায়াসে অনলে আত্ম-সমর্পণ করিলেন, সেই বিরহে—সেই অসহ্য বিরহে কাতর হইয়া আমি যে উন্মত্তের ন্যায়, গুরুজন সমক্ষে মনের আগন্তুক অসদ্ভাব ব্যক্ত করিয়াছি, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

"অথবা, আমার আর কর্ত্তব্যই কি আছে? এই নিদারুণ যন্ত্রণা লইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা প্রাণত্যাগই শ্রেয়ঃ।

"না—না, প্রাণত্যাগ করিব না। মরিলে ত এ যন্ত্রণা ফুরাইয়া গেল। যিনি আমার জন্য অনলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, আমি মরিলে, তাঁহার কি উপকার হইবে? তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন,—আমার সহিত পরলোকে মিলিত হইবেন বলিয়া। আমি মরিলে ত পরলোকে তাঁহাকে পাইব না। তবে আমি মরিব কি সুখের জন্য?—দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না, এইজন্য মরিব। না,—তা মরিব না; আমার প্রিয়ার বিষাদ-প্রোজ্জ্বল পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া আমরণ এই দারুণ দাবানল আলিঙ্গন করিয়া থাকিব। মন যাক্, বুদ্ধি যাক্, ইন্দ্রিয় যাক্,—সব দগ্ধ হউক,—সেই অনলে সমুদয় ভস্মরাশি হউক, তবু ছাড়িব না।

"আমি আর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিব না। কেবল ধর্ম্ম উপার্জ্জনই আমার একমাত্র লক্ষ্য হইল। কোন প্রকার পাপ যাহাতে আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে আমি প্রাণপণে যত্ন করিব। পূর্ব্বজন্মের মহাপাপেই আমি মদালসা-রত্নে বঞ্চিত হইয়াছি।

"আমি অদ্য হইতে মান, অভিমান, দম্ভ, অহঙ্কার—সমুদয় পরিত্যাগ করিলাম; আর সহিষ্ণুতা আমার হৃদয়ের সহচর হইল। মাতা-পিতৃ-শুশ্রূষা, গুরুজন-সেবা পরোপকার এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্র আমার সাংসারিক কর্ত্তব্য হইল। হে মধুসূদন! হৃদয়ে আমার শক্তি প্রদান করুন,—আমি আপনার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া যেন জীবন যাপন করিতে পারি।

"ঠাকুর! আমি, স্বর্গ চাহি না, ব্রহ্মলোক চাহি না, মুক্তি চাহি না;—পরকালে আমি যেন মদালসার সহিত সম্মিলিত হইতে পারি।

"ভগবন্! আপনি অন্তর্যামী। দেখুন, কুবলয়াশ্বের সেই আনন্দময় হৃদয়, কি হইয়াছে! দয়াময়! এই দগ্ধ-হৃদয়ে যেন আপনার করুণা-বারি নিপতিত হয়।"

রাজপুত্রের অশ্রু-প্লাবিত নয়ন-যুগল, অধিকতর অশ্রুপূর্ণ হইল।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। রাজনন্দন, যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায়, পিতার আদেশ মত রাত্রিকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

(১০)

রাজকুমার, অসীম ধৈর্য্যগুণে হৃদয় স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি এখন, মাতা-পিতৃ-গুরুজন-সেবা, শাস্ত্রচর্চ্চা, হরিনাম-সঙ্গীতামোদ, পরোপকার এবং ধর্ম্মজনক ক্রীড়া-কৌতুকে সময়াতিপাত করেন। রাজা জানিয়াছেন, পুত্রের এক পত্নীক ব্রত। মনস্বী রাজা, পুত্রের এই দৃঢ়ব্রত ভঙ্গ করিতে প্রয়াসী নহেন। পুত্রের মনঃপীড়া প্রদান করা রাজার অভিপ্রেত নহে। রাজনন্দন, সকলের সহিত সমভাবে সদ্ব্যবহার করেন। তাঁহার সুশীলতা, সদ্ব্যবহার, সৎপ্রবৃত্তির কথা দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইল। অনেক ব্রাহ্মণ-কুমার, রাজপুত্র, বৈশ্যপুত্র, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। অনেকেই তাঁহার সহবাসে থাকিয়া অসীম আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি তাঁহার সমভাবে অতীত হইত। তাঁহার এই যৌবন-ব্রহ্মচর্য্য সকলেরই বিস্ময়াবহ হইল।

শুদ্ধ পৃথিবীতে নহে, রাজনন্দনের সর্ব্বজন-প্রিয়তা এবং উদারতার কথা ত্রিভুবনে প্রথি হইয়

একদা নাগরাজ অশ্বতরের দুই পুত্র আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুক করিবার জন্য ব্রাহ্মণকুমার রূপে রাজনন্দন কুবলয়াশ্বের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজনন্দনের শিষ্টাচার, সদ্ব্যবহার এবং ক্রিয়াকলাপে, নাগরাজ-কুমার-যুগল, এক-দিনেই নিতান্ত বাধ্য হইয়া পড়িলেন।

প্রণয় অপূর্ব্ব পদার্থ। প্রণয়ের মূলে কি এক অলৌকিক উপকরণ নিহিত আছে। প্রণয়, শতবর্ষের পরিচয়েও পদার্পণ করেন না; আবার, মুহূর্ত্তের চাক্ষুষেই তাঁহার স্বর্গীয় প্রতিমার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়। কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"————ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতু-
র্ন খলুবহিরুপাধীন্প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ॥"

একদিনেই রাজনন্দনের সহিত তাঁহাদের প্রণয় হইল। অনন্তর নাগপুত্রদ্বয় অতৃপ্ত-হৃদয়ে রাজতনয়ের সুখ-সমাগম-লালসায় প্রত্যহই গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কোন দিন আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে, রাজপুত্রও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেন। এইরূপ পরস্পরের প্রণয়-পারিজাত পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আমোদ রাশি বিতরণ করিতে লাগিল।

ক্রমে রাজপুত্রের ইচ্ছানুসারে, নাগকুমারদ্বয়, সময়ে সময়ে একক্রমে অনেক দিন রাজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ সমাচার রাজার কর্ণগোচর হইল। যেরূপে হউক, পুত্রের হৃদয়ে আনন্দ-সঞ্চার হইতেছে জানিয়া রাজা বড়ই আনন্দিত হইলেন। পুত্রের প্রণয়ী বলিয়া নাগরাজ-পুত্রদ্বয়কে, রাজাও পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন।

ছয় মাস অতীত হইল। রাজনন্দনের হৃদয়ের কোন কথাই নাগরাজ-কুমারদ্বয়ের অবিদিত নাই। রাজনন্দন তাঁহাদিগকে কোন কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু নাগকুমারদ্বয়, সুশর্ম্মা এবং দেবশর্ম্মা নামে পরিচিত হইয়াছেন; এখনও তাঁহারা স্বস্ব প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন নাই। কেন, তাহা বলিতে পারি না।

(১১)

শরৎ কাল। পূর্ণিমা। দিবা অবসান। সূর্য্যকিরণ পীতবর্ণ হইয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল এখনও দেখা যায় নাই।

রাজনন্দন বলিলেন,—"ভাই! চল। তোমরা দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, চল। কিন্তু—"

মস্তক ঘূর্ণিত হইল, কণ্ঠরোধ হইল; নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল; আর বলিতে পারিলেন না।

সুশর্ম্মা। "সখে! আশ্বস্ত হও।"

দেবশর্ম্মা। "সখে! তবে কাজ নাই। এত ক্লেশ হইবে জানিলে, আজ আর এ কথার উত্থাপন করিতাম না।"

রাজনন্দন। "ক্লেশ?—বন্ধু! ক্লেশের জন্য জীবন। তার জন্য আমি ভাবি না; তবে মানবের হৃদয় দুর্ব্বল,—সকল সময়ে স্থির থাকে না। দুঃখভোগই আমার প্রতিজ্ঞাত; তবে আমি দুঃখের জন্য কাতর হই কেন? চল সখে! তোমাদের অভিলাষ আজ পূর্ণ করিব।"

সখিদ্বয়, স্বীকার করিলেন না।

রাজনন্দন বলিলেন,—"শুধু তোমাদের অভিলাষ নয়; আমারও ইচ্ছা হইতেছে,—আজ একবার হৃদয়েশ্বরীর প্রিয় নিকেতন দেখিয়া আসি। এক বৎসর হইল, সেই আনন্দধাম আমার চির-বিষাদ-ভূমি হইয়াছে। সেই দেবালয় আমার নরক-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। বন্ধু! চল, একবার দেখিয়া আসি।"

নাগরাজ-পুত্রদ্বয় অদ্য রাজনন্দনের আনন্দ-ভবন, প্রমোদোদ্যান প্রভৃতি দেখিতে চাহিয়াছেন। সেই উপলক্ষেই তাঁহাদের এই কথোপকথন।

সুশর্ম্মা এবং দেবশর্ম্মা, যেন অগত্যা বন্ধুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ক্রমে তিন জনেই আনন্দ ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(১২)

রাজভবনের দক্ষিণে রাজনন্দনের আনন্দ-নিকেতন অবস্থিত। আনন্দনিকেতনের পূর্ব্বাংশে ও দক্ষিণাংশে প্রমোদোদ্যান। প্রমোদোদ্যানের পূর্ব্বতলবাহিনী দক্ষিণস্রোতা কলকলনাদিনী পবিত্রসলিলা গোমতী।

আজ বৎসরান্তে রাজনন্দন এই ভবনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। দৌবারিক, কুঞ্চিকা লইয়া রাজনন্দনের অনুসরণ করিতেছে। সেই নাগরাজ-কুমারদ্বয়, বিস্ময়-প্রীতি-বিস্ফারিত-নয়নে ভবনের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। রাজনন্দন, সেই তাঁহার আনন্দভবনে প্রবিষ্ট হইয়া অস্থির-হৃদয়ে এদিক্-ওদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর হৃদয়ের বিষাদময় আবর্ত্তনে আকুলপ্রাণে বন্ধুদ্বয়কে সেই সব দেখাইতেছেন।

তিনি ভবন-প্রবিষ্ট হইলে শুক-সারিকা

তাঁহার হস্তে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহাদের সে লাবণ্য নাই, কান্তি নাই, চপলতা নাই। সারিকা সেই মদালসার শিক্ষিত সম্বোধনে, অতি মৃদুস্বরে, রাজনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আর্য্যপুত্র! কেমন আছ? এতক্ষণে কি অধীনাকে মনে পড়িল?"

মদালসা, প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে শুক-সারিকাকে পিঞ্জর-মুক্ত করিলেও তাহারা চলিয়া যায় নাই।

রাজকুমারকে নীরব দেখিয়া সারিকা আবার বলিল,—"আর্য্যপুত্র! কেমন আছ?—"

রাজনন্দন, আর থাকিতে পারিলেন না। নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইল। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন।

তখন সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

অনন্তর রাজপুত্র গদ্গদ-স্বরে দৌবারিককে বলিলেন,—"দৌবারিক! তুমি শুক-সারিকাকে পান-ভোজন করাও না?"

দৌবারিক বলিল, "কুমার! আমরা অনেক যত্ন করিলেও ইহারা অতি সামান্যমাত্র আহার করে। উপযুক্ত আহার আর করে না।"

দৌবারিক চক্ষু মুছিল। রাজনন্দন বলিলেন,—"আজ কিছু আহার করাও দেখি।"

দৌবারিক যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পক্ষি-খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইল।

রাজনন্দন তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন; শুক যৎকিঞ্চিৎ আহার করিল এবং চঞ্চুপুটে খাদ্য লইয়া সারিকাকে খাওয়াইল। রাজনন্দন, কত আদর করিলেন, কত গাত্র-মার্জ্জনা করিলেন, তবু আর আহার করিল না।

রাজনন্দন বলিতে লাগিলেন,—"বুঝেছি,—সেই অমৃতময়ীর অমৃত-কর যে একবার স্পর্শ করিয়াছে, সেই মজিয়াছে;—এই অবোধ তির্য্যক্-জাতিও তাঁহার করস্পর্শ না পাইয়া এক-প্রকার অন্ন-জল পরিত্যাগ করিয়াছে। হায় অমৃতময়ি!—"

সুশর্ম্মা। "সখে! এইজন্য কি তোমাকে এই স্থানে লইয়া আসিলাম?"

দেবশর্ম্মা। "সখে! আমাদিগের আর প্রাণে ব্যথা দিও না। তোমার আনন্দ-ধামের করুণ-ছবিই আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে; সখে! স্বীয় অসীম ধৈর্য্যগুণে হৃদয় স্থির কর।"

রাজনন্দন। "সখে! আমি হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়াছি। আবার স্থির করিব কি!"

শুক-সারিকাকে লইয়াই রাজনন্দন অগ্রসর হইলেন; একটী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বন্ধু-যুগলকে বলিলেন,—"এই গৃহ আমার প্রিয়তমার প্রসাধন-নিকেতন। ঐ দেখ, অলক্তক-রাশি,—ঐ দর্পণ,—ঐ সিন্দূর,—ঐ অনুলেপন-পাত্র,—ঐ সুগন্ধি-জল-পূর্ণ ভৃঙ্গার। যেমনটী তেমনই আছে। আমার আদেশে ভৃত্যগণ সব সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সখে! এই গৃহেই প্রিয়তমার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই গৃহেই আমার সুখের পূর্ণ-বিকাশ,—এই গৃহেই আমার সুখের পূর্ণ অধঃ-পতন। সখে! এখনও আমি সেই অর্দ্ধ-বিভূষিতা প্রিয়তমার লজ্জানম্র দৃষ্টি, স্মেরানন দেখিতে পাইতেছি,—এখনও আমি তাঁহার কোমল কলেবরের স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু সখে! সেই সুখ-স্পর্শ আজ আমার অশনি অপেক্ষাও কঠোর, ক্রকচ অপেক্ষাও অরুন্তুদ!

"সখে! কি করিয়া হৃদয় স্থির হয় বল দেখি! আমি চতুর্দ্দিকেই আমার সেই মদালসা-মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, প্রিয়তমার সেই কমনীয় কান্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি,—কেমন করিয়া হৃদয় স্থির করি? ঐ দেখ, প্রিয়ার আমার, অলক্তক-লাঞ্ছিত চরণকমলের ধূলি-মলিন অস্ফুট চিহ্ন।

পদচিহ্ন! আমি মস্তকে রাখিবার জন্য প্রিয়তমার কত অনুনয় করিয়াছি; কিন্তু প্রিয়া আমার সে কথাটী রক্ষা করেন নাই। সকল কথা শুনিতেন, সে কথায় কিন্তু কর্ণপাত করেন নাই সেই তুমি মলিন বেশে ভূতলে নিপতিত! এস, এস, অলক্তক লঞ্ছিত পদচিহ্ন! এখনও বলি আমায় মাথায় এস। আসিবে না; স্বামিনীর অনুমতি ব্যতীত কিছু করিবে না। ভাল, বলিয়া দাও, তোমার স্বামিনী কোথায়, তোমার সেই অতুলনীয়া অধিকারিণী কোথায়; আজ আমি যেমন করিয়া হউক, অনুমতি লইব।

রাজপুত্রের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

দেবশর্ম্মা। সখে! এই গৃহ দর্শন করিলাম, চল অন্যত্র গমন করি। রাজনন্দন, রত্ন কিরণ-সমুজ্জ্বল শয়ন-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

"সখে! এই আমার শয়ন গৃহ, এই আমার প্রিয়তমার নিত্য লীলাভূমি মহাক্ষেত্র। এই

পর্য্যঙ্কে আমরা শয়ন করিয়া কত ভাবহীন, ভাষাহীন, রসহীন গল্প করিয়া, ভাবে বিভোর হইয়া, বিনিদ্র নয়নে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছি। সখে! ঐ দেখ, শয্যার উত্তরচ্ছদে প্রিয়তমার বসন-বিচ্যুত হিরণ্যচূর্ণ এখনও পতিত হইয়া রহিয়াছে।

রাজনন্দন উদ্‌ভ্রান্ত-নয়নে দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—

"এই দেখ, সখে! প্রিয়ার আমার, প্রিয়তম প্রতিমূর্ত্তি।"

"সখি মদালসে! এই আমি কতদিনের পর তোমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম, সখি! একবারও অভ্যর্থনা করিলে না! যাহাকে ক্ষণকাল না দেখিলে অস্থির হইতে,—যাহার অদর্শনে দিনকে যুগজ্ঞান করিতে,—সেই আমি তোমার গৃহে বৎসরান্তে আসিয়া উপস্থিত; একবার কথা কহিলে না!—মানময়ি! অভিমান করিয়াছ; তোমার অবনত-দৃষ্টি এখনও দূর হইল না!

"সুতনু জহিহি কোপং পশ্য পাদানতং মাং
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবম্বিধোঽভূৎ।"

"আমি তোমার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া আছি, সুতনু! মান পরিহার কর; এমন মান ত তুমি কখনও কর নাই।

"প্রিয়ে! বহুদিনের পর, তোমার কমনীয় কলালাপ শ্রবণ করিব বলিয়া, তোমার কোমল কলেবর স্পর্শ করিব বলিয়া, উৎকণ্ঠিত আছি;—প্রিয়তমে! কৈ, একটীও কথা বলিলে না, একবারও আলিঙ্গন করিলে না।"

সুশর্ম্মা। ভাই দেবশর্ম্মা! এ করুণ-চিত্র আর দেখিতে পারি না।

রাজনন্দনের প্রতি বলিলেন, সখে! চল, অন্যত্র গমন করি।

রাজনন্দন, ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন,—"সখে! তোমার সময় অসময় জ্ঞান নাই। প্রিয়ার এই দুর্জ্জয় মান,—ইহা দূর না করিয়া কিরূপে আমি স্থানান্তরে গমন করি?—প্রিয়তমে! তোমার ক্ষাম কণ্ঠ আলুলায়িত কুন্তল, আমি আর দেখিতে পারিতেছি না।"

সুশর্ম্মা, দেবশর্ম্মাকে মৃদুস্বরে বলিলেন,—ভাই! রাজনন্দন চিত্র দর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন, আহা! রাজনন্দনের যন্ত্রণা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হয়।

দেবশর্ম্মা বলিলেন,—"সখে! শান্ত হও। তোমার লোকাতীত ধৈর্য্য, লোকাতীত জ্ঞান, লোকাতীত কার্য্য;—চিত্র দেখিয়া এমন উন্মত্ত হইলে চলিবে কেন? সখে! এই মূর্ত্তি—চিত্র।

রাজনন্দন আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ভূমিতলে উপবেশন করিয়া মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত করিলেন।

তৎপরে ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"চল সখে! প্রমোদ-উদ্যানে চল।"

সুশর্ম্মা বলিলেন,—"আর কাজ নাই, প্রতিক্ষণে তোমার এই দারুণ-যন্ত্রণা আমরা আর দেখিতে পারি না।"

রাজনন্দন সে কথা শুনিলেন না। তাঁহাদের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"চল আমার প্রার্থনা রক্ষা কর।"

সকলেই উদ্যানাভিমুখে চলিলেন।

চন্দ্র উদিত হইয়াছেন, পৃথিবী হাস্যময়ী। তুষারের অপরিস্ফুট ক্ষীণশুভ্র আবরণ দিঙ্মণ্ডলে বিরাজিত।

সকলেই প্রমোদ-উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। ফুল্ল ফুলরাজি-শোভিত তরু-লতা, কৌমুদীস্নাত মর্ম্মর-শিলাতল, সুস্নিগ্ধ সুগন্ধি নিকুঞ্জ—একে একে রাজনন্দন সমস্তই দেখাইতে লাগিলেন। রাজনন্দনের হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হইতেছিল। তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি, অতীত ঘটনা এই সব নিদর্শনে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি আজ স্বভাব-সুলভ ধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া, মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখি মদালসে!"—"প্রিয়তমে মদালসে!"—সুশর্ম্মা, সময় বুঝিয়া গোমতীতীরাভিমুখ প্রাচীর সংলগ্ন বাতায়নের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। অনাবৃত নদীবক্ষে প্রতিধ্বনি হইল,—'সে-এ-এ-এ'—

রাজনন্দন, ক্ষিপ্তভাবে যেন প্রিয়তমার প্রদত্ত উত্তর পাইয়া ব্যগ্রভাবে বাতায়ন পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। দেখিলেন,—গোমতী সলিলোপরি অর্দ্ধোমগ্ন—মদালসা।

রাজনন্দন, উন্মত্ত হইয়া পদাঘাতে বাতায়ন ভগ্ন করিয়া চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। সুশর্ম্মা, দেবশর্ম্মা ও দৌবারিক, রাজনন্দনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

রাজনন্দন বলিলেন,—"প্রিয়তমে! মদালসে! দাঁড়াও দাঁড়াও।" কিন্তু মদালসা তাহা শুনিলেন না; গোমতীর অন্তঃ সলিলে নিমগ্ন হইলেন!

রাজনন্দন বলিলেন,—"সখি! অকরুণে! আমি এই তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম।"

রাজনন্দন,—বন্ধুদ্বয় এবং দৌবারিক আসিবার পূর্ব্বেই 'মদালসে!—"বলিয়া নদীস্রোতে নিপতিত হইলেন। দৌবারিক ও সুশর্ম্মা রাজনন্দনের অনুসরণ করিলেন। অবশেষে রাজনন্দন এবং সুশর্ম্মা সলিল মধ্যে নিমগ্ন হইলেন! আর তাঁহাদিগকে দেখা গেল না!!

দৌবারিক স্রোতে সন্তরণ দিতে লাগিল এবং বিফল অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

দেবশর্ম্মা, উচ্চস্বরে দৌবারিককে বলিলেন,—"প্রাণত্যাগ করিও না,—এস, রাজসকাশে গমন করি। রাজনন্দনের অনুসন্ধানে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে।"

ভগ্ন-হৃদয় দৌবারিক, কিছুক্ষণের পর নদী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে, দেবশর্ম্মার সহিত রাজপুরাভিমুখে গমন করিল।

পূর্ব্বভাগ সমাপ্ত।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সমালোচনা।

(পুরাতন ও নূতন প্রণালী।)

সাহিত্য-সমালোচনার, যেরূপ ভাব ও অবয়ব এখন দাঁড়াইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ সাহিত্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। সেই ভাব ও অবয়বের ক্রম-বিকাশ ও বর্ত্তমান পরিণতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে করা যাইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত আমাদের এই প্রবন্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যেরই জন্য। অতএব বাঙ্গালা ভাষা-প্রসূত সমালোচনী-সাহিত্যের আলোচনা করাই আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ আধুনিক সমালোচনা সম্বন্ধে ইংরেজী সাহিত্যেরই অনুকারী। বাঙ্গালা ভাষায় সমালোচনী-সাহিত্য অতি অল্পই অদ্যাবধি উৎপাদিত হইয়াছে; যতটুকু হইয়াছে, তাহা প্রাগুক্ত ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণেই সংগঠিত। অতএব, বাঙ্গালা ভাষার সমালোচনী-সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে উক্তবিধ ইংরেজী সাহিত্যেরই মূল তত্ত্ব অনুসন্ধান ও উদ্ঘাটন করিতে হয়। ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনা স্তরে স্তরে পরিবর্ত্তিত আকারে ক্রমে যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা যে ঠিক সেইরূপে সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহা নয়। বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের সমালোচকগণ, ইংরেজী সমালোচনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর মধ্যে যিনি যে প্রণালীতে নিজের সুবিধা ও শক্তি অনুভব করিতেছেন, তিনি সেই প্রণালীর অন্নাধিক অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই প্রবৃত্তি ইষ্ট কি অনিষ্ট জনক এবং উ ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যে কি ফল উৎপাদন করিবে, তাহার অনুসন্ধান করা আপাতত আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে এবং সে অনুসন্ধান কিয়ৎকাল পরে করিলেও চলিতে পারিবে। তবে বলিতেছি কেবল এই যে, ইংরেজী সমালোচনী-সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির যুগপৎ অনুকরণ যে বাঙ্গালায় করা হইতেছে, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষার সমালোচনী-সাহিত্য, তদীয় আদর্শের ন্যায় স্তরে স্তরে বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া, আদর্শের অগ্র-পশ্চাৎ—উভয় দিকেরই এককালে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার পরিণাম ফল যাহাই হউক, এই চেষ্টায় যতই অপারিণামদর্শিতা থাকুক, চেষ্টাটা কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক। আদর্শের অনুসরণ করিয়া সদর্শানুরূপ হইবার চেষ্টা করাই প্রাজ্ঞোচিত। কিন্তু আদর্শকে আদর্শে পরিণত হইতে যত প্রকারের পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, সে সমস্তের জন্য আদর্শানুকারীকে অপেক্ষা করিতে হয় না;—তাহা করা স্বাভাবিকও নয়, সম্ভবও নয়। যে সকল কারণে ও উপাদানে আদর্শের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, আদর্শানুকারীর পক্ষেও তাহাই অবিকল ঘটিবে বা ঘটিতে হইবে; ইহারও কিছু অর্থ নাই। আদর্শানুকারী আদর্শের প্রদর্শিত ও প্রস্তুতীকৃত পথে দ্রুতগতি গমন করে; পথ প্রস্তুতের জন্য আদর্শকে যতটা কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল, আদর্শানুকারী তাহা করে না। যদি তাহাই করিবে, তবে আদর্শই বা কেন আর আদর্শের অনুকরণই বা কেন? আদর্শ ও অনুকরণ—উভয়ই ত তাহা হইলে নিষ্প্রয়োজন হয়। ইংরেজী সাহিত্যের যে যে এবং যত যত অনুকরণ আমরা করিয়াছি এবং করিতেছি, তাহা প্রায় সমস্তই অত্যন্ত দুর্ব্বল;—ইংরেজী সমালোচনী-সাহিত্যে আমাদিগের অনুকরণ অধিকতর দুর্ব্বল। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনা অধিকাংশই কৃশ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা।

কথায় কথায় আমরা প্রস্তাবিত কথার সূত্র ছাড়িয়া কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন সেই পরিত্যক্ত সূত্র পুনর্গ্রহণ করিয়া, ইংরেজী ভাষার সমালোচনী-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরেজীভাষায় সমালোচনী-সাহিত্যের আবির্ভাব এবং বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই উহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। ইংরেজী সাহিত্যেতিহাসে দেখা যায় যে, ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যে সময়-স্রোত প্রবাহিত, ইহার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ইংরেজী সাহিত্যের

সমালোচনা-প্রণালী পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সর ফিলিপ সিডনী (১৫৫৪—৮৬) ইংরেজী সাহিত্যের আদি-সমালোচক বলিয়া পরিচিত তাঁহার Defence of Poesy (কাব্য-শাস্ত্র-সমর্থন) অভিধেয় সমালোচনা গ্রন্থ ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে জনৈক স্বতন্ত্র লেখক-কৃত "*Art of English Poesy*" (ইংরেজী কবিতা প্রকরণ) নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময়কেই ইংরেজী সমালোচনী-সাহিত্যের 'সুপ্রভাত' বলা যাইতে পারে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই প্রকৃতির সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইহার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইতে থাকে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে *Edinburgh Reviw* (এডিনবরা রিবিউ) নামক সুপ্রসিদ্ধ সমালোচনী-পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ইহার পরে উপর্য্যুপরি আরও কয়েক খানি প্রথম শ্রেণীর সমালোচনী-পত্র দেখা দেয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কোয়ারটালি রিবিউ *Quartly* Reviw ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার রিবিউ (*West-minister Reviw* এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ব্ল্যাকউডস্ মেগাজিন (*Black woods*) প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে বিস্তর উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্র প্রচারিত হইয়া সমালোচনী-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও বৃহৎ আয়তন করিতেছে। ফলত এডিনবরা রিবিউর সময় হইতে ইংরেজী সমালোচনা-শাস্ত্র সহস্র শাখা বিস্তার করিয়াছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকা ফ্রান্সিস্ জেফ্রে কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। জেফরে একজন বিশিষ্ট ও সমর্থ সমালোচক এবং তাঁহার সম-সাময়িক ইংরেজী সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর সহযোগী লেখকদিগের প্রায় সকলেই এডিনবরা রিবিউতে প্রবন্ধ লিখিতেন। অতএব বলা বাহুল্য যে, অনতিবিলম্বেই উক্ত পত্রের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং উক্ত পত্র সমালোচনী-সাহিত্যের আদর্শপত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঐ পত্রেরই দৃষ্টান্তে ও আদর্শে ইংরেজী অন্যান্য সমালোচনীসাময়িক-পত্রের সৃষ্টি এবং স্থিতি। কাব্য ও সাহিত্য-সমালোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্প-সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় বিদ্যা, সকল প্রকার সূক্ষ্মশিল্প ও শাস্ত্রের সমালোচনা উক্ত পত্রে প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। এডিনবরা রিবিউতে প্রথম প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধাবলী বহুদিন হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া চিরস্থায়ী হইয়াছে এবং অত্যন্ত সঞ্জীবভাবে ইংরেজী সমালোচনী-সাহিত্যের শীর্ষস্থানে আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে।

সে কালের সরফিলিপ সিডনী হইতে আরম্ভ করিয়া কালের সুইনবরণ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিতে ইংরেজী সাহিত্যেতিহাসে বিস্তর প্রতিভাশালী সমালোচকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের সমালোচনার বিশেষ বিশেষ গতি-প্রকৃতির উল্লেখ করা দূরের কথা, তাঁহাদের নামগুলির একটা তালিকা দেওয়াও এস্থলে অসম্ভব। লর্ড মেকলে ইংরেজী সাহিত্যের একজন অত্যন্ত বিখ্যাত সমালোচক; জনমরলে সে ক্ষেত্রে অবিখ্যাত নহেন। এখন মেকলে ও মরলের সমালোচনা তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব অনুভব হইবে। মেকলে কবি ও কাব্যের ইঙ্গিতমাত্র গ্রহণ করিয়া সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন। মরলেও তাই করেন, কিন্তু মেকলের ন্যায় সমালোচ্য কবিরা বা কাব্যকে বিস্মৃত হন না; বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই সকল কথার অবতারণা করেন। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর সমালোচক (ইহাঁরা এক অভিনব শ্রেণী) কবি কাব্যের সমালোচনায় স্বতন্ত্র কবিতা প্রণয়ন করেন। ইহাঁরা সমালোচ্য কবি বা কাব্যের ভাবরাশির মধ্যে ডুবিয়া হৃদয় এতদূর উচ্ছ্বসিত এবং কল্পনা এতদূর উত্তেজিত করেন যে, ইহাঁদের সমালোচনা স্বতন্ত্র আর একটী কাব্যেরই আকার ধারণ করে। গেটের উইলিলম মিষ্টার (*Willielm Meister*) নামক কাব্যগ্রন্থে সেক্সপিয়রের হ্যামলেট-সমালোচনাকে এই শ্রেণীর সমালোচনা বলা যাইতে পারে। উইলসন্, সুইনবারণ প্রভৃতি অল্লাধিক পরিমাণে এই অভিনব-শ্রেণীর সমালোচক। ফ্রান্সিস জ্যাফরে একদিকে যেমন কবি-কল্পনায় মোহিত ও কাব্য-রসে উচ্ছ্বসিত হইতেন, অপর দিকে তেমনি কাব্য-শাস্ত্রের কঠোর বিচারক ছিলেন। কিন্তু ম্যাথিউ আরনল্ড

সমালোচনার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক অধিকারের আবিষ্কর্ত্তা। *A disinterested endeavouer to learn and propagate the best that is known and thought in the world.* সৌন্দর্য্যের স্বার্থশূন্য সন্ধানই সমালোচনা। সংসারের সরস ও সুন্দর চিন্তার শিক্ষা ও সুপ্রচারের নিঃস্বার্থ চেষ্টাই সাহিত্য-সমালোচনা। আরনল্ডের পূর্ব্বে ইউরোপে অপর কেহ সমালোচনার এরূপ লক্ষণ অনুভব ও এরূপ উদার ব্যাখ্যা করেন নাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আরনল্ডের *Essays in criticism* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে সমালোচনায় কর্ত্তৃত্বের কঠোরতার পরিবর্ত্তে কবিত্বের কোমলতা ও অনুভূতির আন্তরিকতা আবির্ভূত হইয়াছে। সমালোচকের কার্য্য এবং কর্ত্তব্য এই সময় হইতে এক সুন্দর নূতন পথে নির্দ্ধারিত হয়। আরনল্ড, গ্রন্থ অপেক্ষা গ্রন্থকারের,—জড় অপেক্ষা জীবনের উচ্চ সমালোচক। আরনল্ড উচ্চশ্রেণীর কবি এবং সমালোচক—উভয়ই; তাঁহার মতে কবি আর কেহই নহেন, *Critic of life* জীবন-সমালোচক। এখন ইংরেজী সমালোচনা (যাহার আদর্শে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা গঠিত হইতে দেখা যায়) মোটের উপর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম, পুরাতন প্রণালীর সমালোচনা; দ্বিতীয় নূতন প্রণালীর সমালোচনা। উভয় প্রণালীরই কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

পুরাতন প্রণালীর সমালোচনা।

এই প্রণালীর প্রধান পরিচালক,—সেমুয়েল জনসন, লর্ড মেকলে প্রভৃতি অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এ প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য,—বিচার-বিবেচনা দ্বারা গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া সাহিত্যের সাহিত্যত্ব রক্ষা করা, সাহিত্যের স্বত্বাধিকার অগ্রসর করা এবং অক্ষুণ্ণ রাখা। এই শ্রেণীর সমালোচকগণ সাহিত্য-সংসারে একদিকে প্রহরী অপর দিকে পুরোহিত স্বরূপ। অশুদ্ধ, মলিন ও অপবিত্র পদার্থ পতিত হইয়া সাহিত্যের নির্ম্মল ক্ষেত্র যাহাতে কলুষিত ও অশুচি করিতে না পারে, অনুপযুক্ত অনাবশ্যকীয় দ্রব্যে সাহিত্যের সুন্দর শরীর যাহাতে ভারাক্রান্ত না হয়, ইহাঁরা সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া তাহার প্রহরা দেন। পক্ষান্তরে উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তি, মূল্যবান্ দ্রব্যজাত লইয়া সে ক্ষেত্রে সহজে যাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করেন; উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাদরে আহ্বান ও সম্মান করিয়া উপযুক্ত আসন দেন এবং তাঁহার আনীত দ্রব্য তাহার উচ্চ বা নিম্ন মূল্য অনুসারে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া উৎসর্গ করত সাহিত্যের একাঙ্গীভূত করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত নূতন আলোকে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেরও গুণাগুণ ইহাঁরা বিচার-বিবেচনা করেন। গ্রন্থের ভাষা-ভাব, রুচি-রস, ছন্দ-অর্থ-অলঙ্কার, মৌলিকতা-সহৃদয়তা, কল্পনা, আলোচনা, অভাব, উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের উপকারিতা এবং সফলতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়েরই বিচার-বিবেচনা সংক্ষেপে করিবার চেষ্টা করেন; পরন্তু গ্রন্থকারের শক্তি, সামর্থ্য নিপুণতাও প্রতিভার পরিমাণও করেন। কিন্তু এই বিচার-বিবেচনা, পরখ-পরীক্ষা ইহাঁরা কিরূপে করেন? তাহা করিবার কি কি উপায় ও অবলম্বন? যুক্তি-তর্ক, সাহিত্যের নির্দ্ধারিত নিয়ম, পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলীর বিধি এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত ও চির-প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি বিবিধ উপায় প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা ও বিচার-বিবেচনা করিয়া সমালোচ্যগ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে ইহাঁরা সিদ্ধান্ত করেন। সকল স্থলেই যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় বা করা হইয়া থাকে তাহা নয়। পরীক্ষা-উপযোগী উপায়-নিচয়ের যখন যেটী বা যেগুলি প্রযোজ্য, প্রয়োজন অনুসারে সেইটী বা সেই গুলি ব্যবহৃত হয়। বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণও বটে এ প্রণালীর সমালোচনায়—সকল প্রণালীর সমালোচনাতেই অস্ত্র বা যন্ত্র স্বরূপ ইহা বলা অতিরিক্ত মাত্র। পরন্তু এই সমালোচকদিগের বিচার বিষয়ক বক্তব্য কথা প্রবন্ধ-আকারে প্রকটিত হয়; সেই প্রবন্ধ যাহাতে সমালোচ্য গ্রন্থের সহিত একত্রে এবং পৃথক্ ভাবে সাধারণের পাঠোপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হয়, তজ্জন্য সমালোচক বিলক্ষণ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন। ইদানীন্তন সমালোচনী পত্রিকানিচয়ের প্রসাদাৎ সমালোচ্য গ্রন্থ পাঠ করার পূর্ব্বেই লোকে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকে। অনেক লোক মূলগ্রন্থ পাঠও করেন না; তৎসম্বন্ধে সমালোচন প্রবন্ধ পাঠ করি-

যাই সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব সমালোচকদিগের প্রবন্ধ বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। পরন্তু আর একদিক দিয়া দেখ,—এই সমালোচকবর্গ কতক পরিমাণে সাহিত্যের সংবাদদাতাও বটেন। পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না এবং সাধারণ শিক্ষার এতটা বিস্তারও ছিল না, সুতরাং গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল এবং সেই অল্প সংখ্যক গ্রন্থ পণ্ডিত-বর্গেই পাঠ করিতেন ও তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীর পাঠোপযোগী করিয়াই প্রণীত হইত। পণ্ডিতের জন্য পণ্ডিত-কৃত গ্রন্থ (বিশেষত সেই সকল গ্রন্থ যখন সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ও পণ্ডিতি ভাষায় লিখিত হইত) স্বভাবত কিছু কঠিন এবং অত্যন্ত গভীর-ভাব-সম্পন্ন হইত। কাজেই তখনকার সমালোচক দেখা দিয়া-ছিলেন,—টীকাকার-রূপে। তখনকার টীকাকার এবং এখনকার সমালোচকের মধ্যে পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে, তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হয় না। টীকাকার প্রত্যেক শ্লোকের দুরূহ পদ মাত্রের টীকা বা ব্যাখ্যা করেন; সমালোচক গ্রন্থটী মোটের উপর লইয়া বা তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল লইয়া তাহার "সমালোচনা" করেন। "সমালোচনা" শব্দ বিস্তৃতার্থ-বোধক। অতএব "ব্যাখ্যাও" উহার অন্যতম অংশ। তবে টীকা-কারের ব্যাখ্যার ন্যায় সে ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ নহে। পুঙ্খানুপুঙ্খ হইবার প্রয়োজনও হয় না। কারণ, এখন টীকাকার এবং সমালোচক এক ব্যক্তি নহেন; ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। একালে মুদ্রাযন্ত্র ও সাধারণ শিক্ষার প্রভাবে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংখ্যা প্রায় অসংখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গ্রন্থনিচয়ে অধিকাংশ আবার খুব 'হালকা' পাতলা হইতেছে। সকলে চলিত সাহিত্যের সকল পুস্তক পড়িয়া উঠিতে পারেন না, কাজেই সমা-লোচকদিগকে সে সকলের একটা সংবাদ একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণজন-সাধারণকে জ্ঞাত করিতে হয় এবং সাহিত্যের ভবিষ্য ইতিহাস লেখকের ব্যবহারের জন্যও লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে হয়।

এখন এই একটা কথা হইতে পারে যে, প্রাগুক্ত প্রণালীর সমালোচনা যখন পুরাতন রীতি-পদ্ধতির বিধি-নিয়ম, আইন-কানুনের অনুসরণ করিয়া সেই সমস্তের অনুমোদিত বিধান অনুসারে গ্রন্থের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করে, তখন মৌলিকতার আদর কদাচিৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে গ্রন্থকার পূর্ব্ব-বর্ত্তীদিগের পুরাতন প্রণালী অনুসরণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে বা অধিকাংশ বিষয়ে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ না করেন,—স্বপ্রথিত নূতন পথে গমন করেন বা পুরাতন পথ নূতন উপাদানে সংস্কার করিয়া তাহার মূর্ত্তি অল্লাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত বা স্বতন্ত্রীকৃত করেন, এই সমালোচকদিগের হস্তে তাঁহার নিষ্কৃতি কোথায়? এই সমালোচকদিগের মধ্যে যাঁহারা লঘুচেতা, অত্যন্ত রক্ষণশীল, অভিনব মাত্রেই যাঁহাদের ঘৃণা অপরিসীম, যাঁহাদের রসানুভবশক্তি নেহাত সঙ্কীর্ণ, (এরূপ লোক সমালোচক-দলের মধ্যে বিরলও নহে) তাঁহাদের হস্তে অবশ্য মৌলিকতা মারা পড়ে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবে পূর্ব্ব-পদ্ধতি অনুযায়ী নয়, তাহাকে চণ্ডালের দ্বারা পোড়াইয়া কর্ম্মনাশা জলে নিক্ষেপ করিতে প্রায়ই ইহাঁরা কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ইহাঁদিগকে লইয়াই সমালোচক-সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই। সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক সূক্ষ্মদর্শী সুনিপুণ শিল্পী থাকেন,—এমন উদার, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি থাকেন,—যাঁহারা মৌলিকতার অত্যন্ত পক্ষপাতী;—প্রকৃত মৌলিকতা যদ্দ্বারা মুখ্য ও মাননীয় আসন প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, তাঁহারা তাহারই বিহিত করেন। অতএব উপরি-উক্ত সমালোচনা-প্রণালীর মূল অভি-প্রায়—মৌলিকতার গতি-শক্তি রোধ করা নহে। মৌলিকতার গতিশক্তি সুশৃঙ্খল, সুনিয়মিত ও সংরক্ষণ করাই উহার অভিপ্রায়। রক্ষণশীলতা, উন্নতিশীলতার বিরোধী নহে;—উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী। উচ্ছৃঙ্খলতা উন্নতি নয়। রক্ষণশীলতা শৃঙ্খলা রক্ষা করে। শৃঙ্খলা উন্নতির উত্তেজক। অভিনব হইলেই মৌলিক হয় না, উচ্ছৃঙ্খলতায়ও অভিনবত্ব থাকে। উচ্ছৃঙ্খলতা মৌলিকতা নয়। যাহা শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সংরক্ষণ করিয়া, নিজের অভিনবত্ব দেখায়, দেখাইতে সক্ষম হয়, তাহাই মৌলিক *Original* এ প্রকৃতির মৌলিকতা রক্ষণশীল সমালোচনা প্রণালী দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না। প্রত্যুত তাহার পক্ষ সর্ব্বদা উহা দ্বারা সমর্থিত হয়।

অভিনবে আসক্তি স্বভাবতই লোকের আছে। তথাচ যাহা অভিনব, অত্যধিক পরিমাণে যাহা প্রচলিতের বিপরীত, সাধারণ রুচির সহিত তাহা সহজে খাটে না; কেননা, তাহাতে লোক অনভ্যস্ত। অভিনব অভিনব হইলেও অনভ্যস্ত। অভিনবে লোকের আসক্তি থাকিলেও, অনভ্যস্ত; তাহারা সহজে অভ্যাস করিতে চাহে না। তাই এই সমালোচকদিগকে সময়বিশেষে কিছু কিছু ওকালতীও করিতে হয়। ওকালতী,—অনভ্যস্তকে লোকের অভ্যস্ত করিবার জন্য। আদালত মাত্রেই সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যা—উভয় পক্ষেরই ওকালতী চলে। সাহিত্যের আদালতে সেরূপ চলে না, চলিতে দেওয়া হয় না, ইহা কেমনে বলিতে পারি? সমালোচক, সাধারণের রুচির পরিচালক। সুরুচি কুরুচি—উভয়দিকেই সাধারণ লোককে তিনি পরিচালনা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার কার্য্যবিশেষ দায়িত্ব-সঙ্কুল। কার্য্যের গুরুত্ব, দায়িত্ব সংসারে অনেকেই বুঝে না,—আমাদের এখনকার সমালোচক মহাশয়দিগেরও অনেকে বুঝেন না। যিনি সংসারের সকল কার্য্যে অক্ষম, তিনিই এখন এ দেশে অনেক স্থলে সম্পাদকের কার্য্যে ব্রতী। অতএব "বুকসমঝো"র কথাটা এ ক্ষেত্রে না পাড়াই ভাল।

নূতনপ্রণালীর সমালোচনার আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

সিপাহী-বিদ্রোহে ভুক্তভোগী।

মিরাট।

সেরিস্তাদার মহম্মদ মহিজুদ্দিন বিদ্রোহের সময় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা। তাঁহার স্বকৃত বর্ণনাই আমাদের অবলম্বন। "তৃতীয় সংখ্যক লাইট অশ্বারোহী সৈন্যেরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করার জন্য অভিযুক্ত হইল। কিন্তু সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই অফিস অঞ্চলে এই জনরব উঠিল যে, সেশন আদালতের হেডক্লার্ক তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন।—তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, সিপাহীরা, অচিরে, বিদ্রোহী হইবে। প্রথমতঃ এ কথা তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল; কিন্তু যখন দেখিলেন, কোথাও কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল না, তখন তাঁহার সে ধারণা ক্রমশঃ অপনীত হইল। তাহার পর সামরিক বিচারালয়ে ৮৫ জন সওয়ারের দোষ সপ্রমাণিত হইলে তাহারা কারারুদ্ধ হইল। তখন তাঁহার মনে এই বিশ্বাস হইল, যখন দুষ্ট লোকেরা দণ্ড পাইয়াছে, তখন আর কেহ বিদ্রোহী হইবে না। ১০ই মে রবিবার অপরাহ্ন চারিটার সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আফিসের নায়েব-নাজির আমেদবক্সের সঙ্গে মহিজুদ্দিনের সাক্ষাৎ হয়। আমেদবক্স বলেন, "যে সকল সওয়ার বন্দী হইয়া জেলে গিয়াছে, তাহাদিগকে অন্য কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া আনিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে তথায় পাঠাইয়া দেন। আমি তথায় গিয়া দেখি যে, সেখানে কোন গোলযোগ নাই, এবং বিদ্রোহের কোনরূপ পূর্ব্ব-সূচনাই দেখিতে পাই নাই।" এ সংবাদ পাইয়া মহম্মদ মহিজুদ্দিনের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি যে ইতিপূর্ব্বে বিদ্রোহের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার তখন সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

উক্ত দিবস বেলা ছয়টার সময় সহরময় এই লইয়া হুলস্থূল বাধিয়া গেল যে, রাইফলধারী সৈন্যেরা ২০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সৈন্যদের অস্ত্রাধ্যক্ষতা হইতে বঞ্চিত করিলে, তাহারা নিশ্চয়ই বাধা দিবে। কেননা, ২০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিরা মনে ভাবিয়াছিল, হয়ত তাঁহারাও সওয়ারদের ন্যায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। এই অমূলক আশঙ্কায় উক্ত দেশীয় পদাতিক সৈন্যগণ, বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজদের হত্যা করিতে লাগিল, সাহেবদের বাঙ্গলায় আগুন লাগাইয়া দিল এবং তাহাদের সম্পত্তি সকল নষ্ট করিতে লাগিল। অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১১ সংখ্যক রেজিমেণ্টও তাহাদের ন্যায় বিদ্রোহী হইয়া ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল; সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রহরীরাও যোগ দিল। সূর্য্য

অস্তমিত হইলে তৃতীয় সংখ্যক লাইট অশ্বারোহী-সৈন্যেরা জেল আক্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সওয়ার নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে, কাম্বা ফটক দ্বারা সহরে প্রবেশ করত জেলখানার দিকে চলিয়া গেল। তাহাদের করাল মূর্ত্তি দেখিয়া সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকেরা জীবন, অর্থ এবং সম্ভ্রম হানির ভয়ে আপন আপন গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। সন্ধ্যা মসীবর্ণ আবরণে পৃথিবী আবৃত করিলে চারিদিকেই গৃহদাহের অগ্নি-শিখা দেখা যাইতে লাগিল। বিদ্রোহীদের গগণস্পর্শী বিকট চীৎকার-ধ্বনিতে সহর বিকম্পিত হইয়া উঠিল। সহর এবং ক্যান্টন্‌মেন্টের বদমায়েসেরা, নিকটস্থ পল্লীগ্রামবাসী এবং ১৫০০ কারামুক্ত কয়েদীরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। সেরিস্তাদার মহাশয় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আপনার গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি ছাদে গিয়া দেখিলেন, কতকগুলি বৃষ এদিক-ওদিক বিচরণ করিতেছে। অনুসন্ধানে তাহা গবর্ণমেণ্টের বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আবার শুনিলেন, বিদ্রোহীরা ইঞ্জিনিয়ার আফিশের উট এবং হাতী-শালা সব লুট-পাট করিয়াছে। নায়েব-নাজির আমেদ বক্স, তাঁহার বাড়ীর নিকটে বাস করিতেন। এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া, তিনি আমেদ বক্সকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই সকল গরু গবর্ণমেণ্টের; তিনি যদি চাপরাসিদের সাহায্যে এই গরুগুলি একস্থানে ধরিয়া রাখেন, তাহাহইলে ভাল হয়। কিন্তু তিনি ইহাতে কোন প্রকার উৎসাহ দেখাইলেন না বলিয়া তাঁহাকে সাহস দিয়া বলা হইল যে, "আপনার কোন ভয় নাই, সহরে অনেক ইংরাজ-সৈন্য আছে, তাহারা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই বিদ্রোহীদের আক্রমণ করত—অচিরে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে, অচিরে বিদ্রোহীদের নাম পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এখন যদ্যপি আপনি গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগ এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন, তাহাহইলে নিশ্চয়ই আপনি সুনাম কিনিবেন।" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকট এখন একজনও চাপরাসি নাই, এবং এ বিষয়ে তিনি কোন সাহায্যও করিতে পারিবেন না।

যখন তাঁহারা এই সকল কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, তখন প্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েকজন লোক তথায় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই একজন বদমায়েস অতি উৎকৃষ্ট দুইটী ঘোড়া তথায় আনিয়া উপস্থিত করিল; কিন্তু নিঃসন্দেহ চোরাই-মাল বিবেচনা করিয়া পাড়ার কেহই তাহাকে সে ঘোড়া বাঁধিতে দিল না। ঘোড়া দুইটী ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই একজন লোক এই সংবাদ আনিল যে, "সহরে যত বদমায়েস আছে, তাহারা আজ অবাধে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিবে, তাহাদের যত শত্রু আছে; আজ তাহাদের সমুচিত শাস্তি দিবে, এবং যত ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের আজ যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিবে। মেজর উইলিয়ম্‌স যে সকল তজমাবাজীদের (জুয়ারী) দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহারা ডাকাইতী-বিভাগের সেরিস্তাদার তফজ্জুল হোসেনকে অনুসন্ধান করিতেছিল, তাঁহাকে পাইলে যে কি দুর্দ্দশা করিত তাহা বলা যায় না। ইহার অনতিবিলম্বে আমেদ বক্সের নিকট একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে এই সংবাদ দিল যে, তহসিলদারের আদেশ-অনুসারে বিদ্রোহীরা যে সরকারী খাজনা-খানা লুঠ করিয়াছে, এই কথা ডেপুটী কলেক্টরকে জানাইতে যায়। তথায় গিয়া দেখে যে, তাঁহার বাড়ী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আর একজন সিপাহি তথায় দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করাতে সিপাহী বলিল, তিনি এখানে নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সে আরও বলিল যে, এক দল সৈন্য দুইটী কামান লইয়া সরকারী খাজানা-খানা রক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে।" এই লোকটী এই কয়েকটী সংবাদ আনিয়া দিল; তাহার পর আবার কয়েকজন লোক আসিয়া এই সংবাদ দিল যে, "বেগমের পুলের নিকট কয়েকটী কামান রাখা হইয়াছে। বদমায়েসেরা লুণ্ঠিত-দ্রব্য-সমগ্রী লইয়া পলাইয়া যাইতেছে, এবং কয়েদীরা এদেশীয় কর্ম্মচারীদের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। আবার ওদিকে বিদ্রোহী-সিপাহীরা রেষানী গ্রামের নিকট যে খাল আছে, তাহার ধারে কি গুপ্ত পরামর্শ করি-

তেছে, কিন্তু তাহাদের দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।" যে সকল লোক সেই সময়ে সেরিস্তাদার মহিজুদ্দিনের বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আমেদ বক্সকে বলিতে লাগিল যে, "সহরের দুর্নিবার বিপ্লবকারীদের দমন করিবার কোন উপায়ই নাই। কারণ স্বয়ং কোতওয়ালই যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্ধান নাই, তিনি থাকিলেও বা কোন প্রকার উপায় হইত। সে যাহা হউক, ইংরেজেরা যে শীঘ্রই এই বদমায়েসদের প্রতিফল দিবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই; এবং তাহাদিগকে ধৃত করত অপহৃত দ্রব্য সামগ্রী যে, তাহাদের নিকট হইতে লইবেন, তাহাও সুনিশ্চিত।" এই সকল নানা প্রকার সংবাদাদি দিয়া তাহারা সেরিস্তাদার মহাশয়কে অতিসাবধানে বাড়ীতে চৌকি দিতে বলিয়া চলিয়া গেল। তিনিও রাত্রি ১১টার সময় বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমস্ত রাত্রি সত্রাসে বাড়ী চৌকি দেওয়াইয়া ছিলেন।

তিনি পরদিন শুনিলেন, জেলখানার প্রহরীরা দেওয়ানী আদালতের খাজাঞ্চী বাহাদুর সিংহের বাড়ী আক্রমণ করে। বাহাদুর সিং তাহাদের ২৫৲ টাকা দিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পান। তথা হইতে তাহারা কালেক্টরী খাজাঞ্চীর বাড়ীতে গিয়া সেইরূপ উৎপাত করে, তিনিও কিছু দিয়া সেই সকল দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে নিস্তার পান। এই সকল সংবাদ শেষে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছিলেন। সেরিস্তাদার মহিজুদ্দিন বলেন যে, "তাঁহার সামান্য ক্ষমতায় যতদূর হইয়াছিল, তদনুসারে তিনি গবর্ণমেণ্টের হিতসাধনে কিছুমাত্র ক্রুটি করেন নাই। সহরের লোকেরা বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল কিনা, এবং মান্য-গণ্য লোকেরা এই বিদ্রোহের বিষয় পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, সওয়ার এবং সিপাহীরা আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া এই সকল বিভ্রাট বাধাইয়াছে। যদি ভদ্র লোকেরা এবিষয় পূর্ব্ব হইতে কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিদ্রোহের পূর্ব্বেই এ সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িত। সহরের এবং ক্যাণ্টনমেণ্টের সকল বদমায়েসেরা লুটপাট এবং হত্যাকাণ্ডে যে, বিশিষ্টরূপে লিপ্ত ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানা গিয়াছে। শেষে তাহারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রস্থান করে, আর যাহারা ছিল, তাহারা যথোপযুক্ত দণ্ড পায়।"

মিরাটের তহসিলদার বাবু গঙ্গাপ্রসাদের কথা অনুসারে লিখিত হইতেছে—"১৮৫৬ সালের শেষে কি ১৮৫৭সালের প্রারম্ভে মিরাট অঞ্চলে "চাপাটী" আসিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহা সমস্ত দেশময় বিতরণ হইতে লাগিল। উক্ত "চাপাটী" প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে আইসে। গ্রাম্য চৌকিদারেরা তাহা বিতরণ করিত এবং তাহারা আবার নিকটস্থ গ্রামের চৌকিদারদিগকে বলিয়া দিত, তাহারা যেন উক্ত চাপাটী এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পাঠাইয়া দেয়। এইরূপে চাপাটী বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইল। তদনন্তর সহর এবং সদরের লোকেরা বন্দা-টোটার কথা লইয়া ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস যে, এই টোটা গরু এবং শূকরের চর্ব্বিতে প্রস্তুত হইয়াছে, আর তাহাই এ দেশীয় সৈন্যদের ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে সংবাদ আসিল যে, বারাকপুরের সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল এবং তাহারা মনে মনে ভাবিল, অবশ্যই এই টোটা লইয়াই বারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। আবার গুজব উঠিল, অস্থি-মিশ্রিত আটা কাণপুরে আসিয়াছে এবং তাহা শীঘ্রই মিরাটে পাঠান হইবে। এই সংবাদ পাইয়া সিপাহীরা আটা খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ভাত খাইতে লাগিল। এপ্রেল মাসের শেষে একজন ফকির মিরাটের সূর্য্যকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়। সিপাহিদের সঙ্গে তাহার বড়ই সদ্ভাব হইল, তাহারা তাহাকে আপনাদের লাইনে লইয়া গিয়া আহারাদি করাইত। এই কথা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট জনষ্টন সাহেব সেই ফকিরকে সে স্থান পরিত্যাগ করিবার আদেশ দেন। এপ্রেলের শেষে তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহী সেনার ব্যারাকের কতক অংশ আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। ৯ই মে যখন তৃতীয় সংখ্যক অশ্বা-

রোহী সেনাদের মধ্যে কতকগুলি সওয়ারদের কারারুদ্ধ করা হয়, তখন সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইবে। ১০ই মে শনিবার অপরাহ্ন ৫ টার সময় যখন তিনি তসিলীতে ছিলেন, তখন তাঁহার প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, সদরের বেণেরা অতি দ্রুতপদে আসিতেছে, এবং তাহারা সকলেই বলিতেছে, সিপাহীরা শীঘ্রই বিদ্রোহী হইবে। তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, শত শত লোক সভয়ে সদর হইতে সহরে যাইতেছে, আর বন্দুকেরও আওয়াজ হইতেছে। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আর ঘরের ভিতরে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আফিসের দরজা বন্ধ করত বন্দুক তরবারি এবং কয়েকজন চাপরাসি লইয়া ফটকের ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তৃতীয় সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের একজন সওয়ার তরবারি হস্তে এই কথা বলিতে বলিতে জেলাভিমুখে ধাবিত হইল,—"হিন্দু এবং মুসলমান ভ্রাতারা শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দেও, আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা নিশ্চয় জানিও, আমাদের সঙ্গে যাহারা যোগ দিবে, তাহাদের কোনপ্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, আমরা কেবল গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" সে চলিয়া গেল, তাহার পরক্ষণেই প্রায় ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং আর কতকগুলি পদাতিক সৈন্য জেলখানার দিকে যাইতে লাগিল। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন অগ্নিকণা বর্ষণ করত হীনকান্তি হইয়া অস্তাচলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন শুনা গেল, বিদ্রোহীরা জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের ছাড়িয়া দিয়াছে। কিয়ৎকাল পরেই বাবু গঙ্গাপ্রসাদ দেখিলেন, শত শত উন্মত্ত বিপ্লবকারী "আলি-আলি" শব্দে সদর হইতে আসিতেছে। তাহারা দেওয়ানী আদালতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। মেজর উইলিয়মস্ যে বাঙ্গালায় ছিলেন, তাহা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে, জিনিষপত্র যাহা ছিল, তাহা সকলই লুটিয়া লইয়াছে। সরকারী যে সকল নথি-পত্র দলিল দস্তাবেজ ছিল, তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছে। যাহ হউক, এই সকল বিদ্রোহী সিপাহী, কয়েদী, জেলখানার নজির (প্রহরী) এবং আরও বহুসংখ্যক লোক হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ করিতে করিতে এবং বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে তসিলির দিকে "ধাওয়া" করিল। তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া বাবু গঙ্গাপ্রসাদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তাঁহার হাতে বন্দুক ছিল, তিনি তৃতীয় অশ্বারোহী সৈন্যের একজন সওয়ারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন,—সে অমনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। পুনরায় আর একজনের উপর গুলি চালাইলেন,—সেও আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মাটিতে পড়িল। তিনি অন্তরাল হইতে গুলি চালাইতেছিলেন বলিয়া, প্রথমে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু দ্বিতীয়বারে তিনি ধরা পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কয়েকজন সিপাহী অসি-হস্তে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। একটু হইলেই সেখানে তাঁহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইত, কিন্তু তিনি সাহসে নির্ভর করত এক লাফে একজনের বাড়ীর প্রাচীর টপ্‌কাইয়া ভিতরে পড়িলেন, সেখান হইতে আর একজনের বাড়ীর ছাতের উপর উঠিয়া তৃতীয় ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহীরা, তখন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। তাহার পর তিনি পেঁশকারের বাড়ীর ভিতর দিয়া আর এক জনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আর তাঁহার সন্ধান না পাইয়া বিদ্রোহীরা চলিয়া গেল। এইস্থানে তিনি আপনার পরিবারবর্গকে আনিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সমস্ত রাত্রি কেবল বিদ্রোহীসেনার "আলি আলি" শব্দে মিরাট ভূমি বিকম্পিত ও আকাশ অনুনাদিত হইয়াছিল। তৎপরে যখন তিনি শুনিলেন, বিদ্রোহীরা মিরাট ত্যাগ করত দিল্লী চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি আপনার গুপ্তস্থান পরিত্যাগ করিয়া তহসিলের অবস্থা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন। সেখানকার সে দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে যুগপৎ বিস্ময় এবং দুঃখ উপস্থিত হইল। সেখানে সে সুন্দর ঘর-দরজা, বাগান-বাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই, তাহার পরিবর্ত্তে কেবল ভস্মের স্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি শুনিলেন, কসাই মুটে, খটিক (একপ্রকার জাতি), তাঁতী, সতরঞ্চ-বিক্রেতা, খানসামা, খিস্‌মদগার, সইস, ঘেসেড়া, প্রভৃতি অনেকেই লুণ্ঠনকার্য্যে বড়ই ব্যাপৃত

ছিল। তাহারা আবার নিকটস্থ গ্রামবাসীদের সাহায্য পাইয়া অনেক সাহেব এবং মেমকে হত্যা করে; কিন্তু তাহাদের কাহারও নাম জানিতে পারা যায় নাই। বিদ্রোহের প্রারম্ভে তিনি কেবল কয়েকজন সতরঞ্চ-বিক্রেতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দুই জনের ফাঁসি হইয়াছে, আর সকলেই দিল্লী প্রস্থান করিয়াছে। ইহারা সকলেই মুসলমান। বিদ্রোহের রাত্রে এইরূপ রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগারের গুলি বারুদ এবং বন্দুক লইয়া দিল্লী যাত্রা করিয়াছে এবং বৃটিশ শাসনেরও একেবারে পর্য্যবসান হইয়া গিয়াছে।

১১ই মে হইতে সহর এবং সদরে যদিও তাদৃশ কোনরূপ গোলমাল ছিল না বটে, তথাপি চারি পাঁচ রাত্রি বদমায়েসেরা লুণ্ঠনাভিপ্রায়ে সহর বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। বিদ্রোহের রাত্রে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, বাবু গঙ্গাপ্রসাদ তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য কাহারও গৃহে আছে কিনা, তাহারও তল্লাসী লইতে আরম্ভ করেন। প্রতি রাত্রেই দেখিতেন, পাড়ার স্থানে স্থানে এবং সিবিল-লাইনস্থ শূন্য-গৃহের হাতায় সাহেবদের অপহৃত দ্রব্য-সামগ্রী পড়িয়া রহিয়াছে। এই দ্রব্য ফেলিয়া দিবার সময় কেহ কেহ ধরাও পড়ে এবং তাহাদিগকে কর্তৃপক্ষদের নিকট চালান দেওয়া হয়; তাহারা তথায় সমুচিত শাস্তি পায়। যখন রাত্রে তিনি পরিভ্রমণের জন্য বাহির হইতেন, তখন তিনি প্রায়ই দেখিতেন, নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী এবং পশম-বস্ত্রাদি স্থানে স্থানে গর্ত্ত-মধ্যে দগ্ধ হইতেছে। বিদ্রোহের পর তিনি এবং মঙ্গলসেন শূন্য-গৃহে টিকিট মারিতে যান। তখন দেখেন, অধিকাংশ মুসলমানদের গৃহ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তথায় তাঁতী এবং সতরঞ্চ-বিক্রেতারা বাস করিত। তিনি এ কথাও শুনিয়াছিলেন যে, ১১ই মে হাফিজ রহিম মৌলুবী কতকগুলি জিহাদের (ধর্ম্ম-যোদ্ধা) লইয়া দিল্লীযাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীসর্ব্বেশ্বর মিত্র।

দুই ভাই।

(১)

সবিতা ও সুপ্রভাত দুই ভাই। দুই ভাইয়ে বড় ভাব, বড় প্রণয়। কেহ কাহারও চক্ষের অন্তরাল হয় না; নিমেষের বিচ্ছেদ উভয়কেই ব্যথিত করে। কৈশোরের সেই খেলা-ধূলা হইতে আরম্ভ করিয়া, এখন পঠদ্দশা অবধি, উভয়ের প্রণয়-স্রোত সমান টানে বহিতেছে। হিংসা, দ্বেষ বা কপটতা বিন্দুমাত্রও নাই;—উভয়েই সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি।

সবিতা জ্যেষ্ঠ, সুপ্রভাত কনিষ্ঠ। সবিতার বয়স একাদশ, সুপ্রভাতের দশ। দুটী 'পিটোপিটি' ভাই,—বাপ-মায়ের বড় আদরের। সাত নয়, পাঁচ নয়,—এই দুটী মাত্র ছেলে; ছেলে দুটী আবার অধিক বয়সের; সুতরাং বাপ-মায়ের আর আনন্দের অবধি নাই। দুটীতে দেখিতেও বেশ শ্রীমান্, গৌরকান্তি, চাঁদপানা মুখ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল চক্ষু; তদুপরি সুকুঞ্চিত কেশরাশিতে বালক দুটীকে বস্তুতই লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে। জনক-জননী সুকুমার শিশুদ্বয়ের অতুল রূপরাশি দেখিয়া, সংসার ভুলিয়া যাইতেন।

ইহা ত গেল বাহ্য-সৌন্দর্য্যের কথা; বালকদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য আরও মনোহর, আরও প্রীতিপ্রদ। ধর্ম্মে বিশ্বাস, গুরুজনে ভক্তি, বালক-বালিকায় স্নেহ, দীন-আতুরে দয়া; ব্যথিতে সহানুভূতি বালকদ্বয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে নিহিত। পরের মর্ম্ম-কথা বুঝিতে, পরের মর্ম্মব্যথা বুঝাইতে দুটী ভাইয়ে বিশেষ অভ্যস্থ। রূপে-গুণে সবিতা ও সুপ্রভাত সকলেরই স্নেহের পাত্র। প্রতিবাসী আত্মীয়-কুটুম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, পথের পথিক অবধি, ছেলে দুটীকে ভালবাসে। ভিখারী ভিক্ষা করিতে আসিয়া, ছেলে দুটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়। এ দৃশ্য দেখিয়া, জনক-জননীর চক্ষে, অজ্ঞাতে, দুই এক বিন্দু জল পড়ে।

(২)

সর্ব্বেশ্বর বসু একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি ছিল; তাহারই উপস্বত্ব হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন।

তাহা ব্যতীত পূর্ব্বতন চাকরীর আয়ও কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে। তাঁহার পত্নী সত্যবতী বড় সুগৃহিণী; তাই আয় অল্প হইলেও, সাংসারিক ব্যয় বেশ সুশৃঙ্খলে সমাধা হইত। বিশেষ, বসুজ-মহাশয়ের পরিবারও কম। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ, আর ঐ ছেলে দুটী। সত্যবতী সুমাতা; তাই, অতিরিক্ত স্নেহ করেন বলিয়া, প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। এই শৈশবেই পুত্রদ্বয়ের লেখা-পড়ার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। সবিতা ও সুপ্রভাত স্থানীয় রামনগর বিদ্যালয়ে পাঠ করিত। সোণার চাঁদ বালক দুটী, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণেরও বিশেষ প্রেয়পাত্র হইয়া উঠিল।

দুটী ভাইয়ে এক শ্রেণীতেই পড়িত। তাহাদের দুজনকে দেখিলে 'যমজ' বলিয়া বোধ হয়। দুটীতে একত্র বসিত, এক সঙ্গে বেড়াইত দুজনের বেশ-ভূষাও একরূপ। দুই ভাইয়ের প্রকৃতি বুঝিয়া এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির আধিক্য দেখিয়া, বসুজ-মহাশয় ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে ঠিক একরূপ পরিচ্ছদ করিয়া দিতেন। সবিতা ও সুপ্রভাত, দু অঙ্গে সেই এক রকমের কাপড় চাদর, জামা জু-পরিধান করিয়া প্রীত-মনে বেড়াইত; সেই একরূপ বেশে পরস্পর পরস্পরকে বড়ই সুন্দর দেখিত।

সবিতা দেখিত,—সুপ্রভাত,—তাহার প্রাণের ভাই সুপ্রভাতই বটে। প্রাতঃকালের ন্যায় নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, প্রশান্ত, শান্তিপূর্ণ তাহার মুখখানি। সে অনির্ব্বচনীয়, সরল মুখারবিন্দে, সুপ্রভাতের সমগ্র প্রকৃতিখানি খুলিয়া রাখিয়াছে। সবি-ভাবিত,—"এমন প্রেমময়মুখ বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। সুপ্রভাতের জন্য কি না করা যায়?" আর সুপ্রভাত দেখিত,—সবিতা,—তাহার জ্যেষ্ঠ তাহার জীবন সর্ব্বস্ব সহোদর জগতে অতুলনীয়। বুঝি, সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ে, সে, সবিতাকে ছাড়িতে পারে না। সবিতার সে উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, প্রতিভার সে মোহন মূর্ত্তি,—তাহার সে অকৃত্রিম ভালবাসা, সে প্রগাঢ় প্রেম, সে মধুর মিলন, সে প্রাণে-প্রাণে বন্ধন, বালক সুপ্রভাত মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিত না; জ্যেষ্ঠের রূপ-গুণ অহর্নিশ তাহার অন্তরে জাগরূক থাকিত।

'অনেকের অনেক ভাই দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ভাই—দুটীতে এক, কোথাও দেখি নাই!" এ কথা, যে-সে, যখন-তখন বলিত। কথা, পিতা-মাতার কাণে উ... ; তাহাতে তাঁহাদের কি সুখ, কেবল তাঁহারাই বুঝিতেন।

আর সেই বালকদ্বয়?—তাহার এ কথা শুনিয়া, অবাক্ হইয়া মনে মনে হাসিত; পরস্পর পরস্পরের প্রতি আ... চাহিয়া থাকিত। বুঝি মনে মনে ... "ভাইকে ভাই ভালবাসে, স্নেহ করে, এ আর ... বেশী কথা কি? যাহার প্রাণ-বিনিময়ে ... বলি দেওয়া যায়; যাহাদের দুই প্রাণ ... অভে-দাত্মা; তাহাদের এ সামান্য একটু ভালবাসা দেখিয়া, লোকে এত ভাল বলে কে ... ছাড়া ভাইকে অন্যরূপে দেখা যায় না।

দুটী ভাইয়েরই মনোভাব এইরূপ। প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের এ মধুর-মিলন দেখিয়া ...নক-জননী পরমানন্দ ভোগ করিতেন ... র ভাব-তেন,—"স্বর্গ আর কোথায় ... সুপ্রভাতকে লইয়া সংসার করিতেছি, এই ... মার স্বর্গ। এইভাবে চিরদিন যাক, আমি ... অন্য স্বর্গ চাহি না।"

সত্যবতী ভাবিতেন,—"আমার সোণার সবিতা-সুপ্রভাত বাঁচিয়া থাকু, দুটী চাঁদপা... ঘরে আনি; আমার স্বর্গবাস এইখানে হবে নারায়ণ কি আমার এ সা... ইবেন না?'

(

সর্ব্বেশ্বর বসুর বাটীর সম্মুখে ... প্রকা... দীর্ঘিকা ছিল। লোকে তাহাকে "বোসেদের গঙ্গা" বলিত। সবিতা ও সুপ্রভা... এক একদিন সেই গঙ্গার তীরে বসিয়া সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিত, এবং মধ্যে মধ্যে আপনাদের মনের কথা, মন-খুলিয়া কহিত। পাড়ার অন্য বালক-দলে, তাহারা বড় একটা মিশিত না,—মিশিবার আবশ্যকও হইত না। দুজনে মিলিয়া খেলা করিত, আমোদ করিত, গল্প করিত। এইরূপ সখ্য-ভাবে, সদানন্দ-চিত্তে, বালক দুইটীর প্রণয়-স্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিছুদিন, এইরূপে গেল; বালকদ্বয় বয়ঃ-প্রাপ্ত হইল। এখন উভয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রস্তুত হইতে লাগিল। যথাসময়ে প্রশংসার সহিত উভয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। বয়োবৃদ্ধির

সহিত ক্রমেই উভয়ের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল; সংসার কি, সংসারের সুখ-দুঃখ কি, ক্রমেই উভয়ে একটু একটু বুঝিতে পারিল।

একদিন পরম্পরায় সবিতা শুনিল,—"পাড়ার অমুক ব্যক্তি সহোদরের সহিত পৃথক্ হইয়াছে। পৃথক্ হইয়াই পরস্পরের এতদূর মনোমালিন্য ঘটিয়াছে যে, মুখদর্শন অবধি নাই। ইহা ব্যতীত পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়িত ও প্রবঞ্চিত করিতেও চেষ্টা পাইতেছে—ইত্যাদি।"

কথাটা শুনিয়া, সবিতার বুকে বড় আঘাত লাগিল। মনে মনে ভাবিল,—"মার-পেটের ভাই হইয়া, একজন আরজনকে এতদূর নির্যাতন করিতেছে? মানুষ কি স্বার্থের মোহে এতদূর অন্ধ হয়? অন্য কেহ নয়—সহোদর; এক মায়ের পেটে জন্মিয়া, এক মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া, শেষে এ দৈত্য-নীতি কোথা হইতে শিক্ষা করে?"

সবিতা যথাসময়ে, প্রাণাধিক সুপ্রভাতকে এ কথা জ্ঞাত করিয়া কহিল,—"ভাই! ভাই-ভাইয়ে এতদূর মনোমালিন্য ঘটিতে পারে, আমি বিশ্বাস করিতাম না। প্রাণে প্রাণে, রক্তে মাংসে যাহার সহিত সম্বন্ধ; একের বিচ্ছেদে, অন্যের জীবন ধারণ করা যাহার পক্ষে কঠিন; সে, কেমন করিয়া, কোন্ প্রাণে, তাহাকে 'পর' করে? স্নেহ-প্রেম করা দূরের কথা,—হৃদয় হইতে তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত, কেমন করিয়া অপসারিত করিয়া দেয়? ভাই! ইহারই নাম কি সংসার? তবে মানুষে ও পশুতে প্রভেদ কি? সুপ্রভাত, ভাই আমার!——"

সবিতা আর কথা কহিতে পারিল না,—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সেই রুদ্ধ-কণ্ঠে, ভগ্নস্বরে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আবার কহিল,—"সুপ্রভাত, ভাই আমার! তুমি, আমিও ত ভাই; তুমি আমিও ত এক মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া মানুষ হইয়াছি; বল দেখি, কোন দিন, ক্ষণ-মুহূর্ত্তের জন্যও, এরূপ পাপ-চিন্তা আমাদের মনে——"

বলিতে বলিতে সবিতা, কনিষ্ঠের হাত ধরিল। অমনি, কোথা হইতে দুই বিন্দু মন্দাকিনীধারা, তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া সুপ্রভাতের হাতে পড়িল। সে উত্তপ্ত অশ্রুস্পর্শে, সুপ্রভাতের হৃদয়ও দ্রব হইল। সুপ্রভাতও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"দাদা! ইহারই নাম সংসার! ঈশ্বরের নিকট——"

সবিতা বাধা দিয়া কহিল,—"ইহারই নাম সংসার কেন ভাই? সংসারে কি তবে দেবতা নাই? মানুষ কি এতই নিকৃষ্ট জীব? স্নেহ-ধর্ম্ম কি তাহার হৃদয় হইতে এককালে লোপ পাইয়াছে?"

সুধীর সুপ্রভাত আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"দাদা! তোমার মন নাকি নিতান্ত কোমল, তাই এমন কথা বলিতেছ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমার প্রতি তোমার এই রকম ভালবাসা যেন চিরদিন সমভাবে থাকে। আর আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমিও তোমার পদানুসরণ করিতে সক্ষম হই। ভগবান্ কি আমাদের এ সাধ পূর্ণ করিবেন না?"

সুপ্রভাতও নীরবে এক বিন্দু চক্ষের জল মুছিল।

(৪)

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবিতা ও সুপ্রভাত কলিকাতায় কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতে আসিল। যথাসময়ে কলেজে নিযুক্ত হইয়া, উভয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল।

একদিন সুপ্রভাতের একটু জ্বর হইয়াছিল। সবিতা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, অহর্নিশ রোগীর শিয়রে উপস্থিত রহিল। সুপ্রভাতের প্রতি নিশ্বাসে, যাতনাজড়িত, প্রতি কথাহীন-ব্যথায়, সবিতা দারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে কহিল,—"কেন আমি পীড়িত হইলাম না? তাহা হইলে সুপ্রভাতের ত কোন কষ্ট হইত না। ভাই আমার ত সুখে থাকিত। ভগবান্! সুপ্রভাতকে ভাল করিয়া দাও; বরং আমি পীড়িত হই।"

আর একদিন কলেজ হইতে বাসায় আসিবার পথে, সবিতা ট্রামগাড়ী হইতে নামিবার সময় পড়িয়া যায়। তাহাতে গায়ে একটু বেদনা হইয়াছিল। কনিষ্ঠ সুপ্রভাতও সে সময় প্রাণান্তপণে অগ্রজের সেবা করিয়াছিল। মনে মনে কহিয়াছিল,—"আহা! আমি কেন সেখানে বুক পাতিয়া দিই নাই? তাহা হইলে ত পড়িয়া গিয়া,

দাদার শরীরে এত বেদনা হইত না! জগদীশ্বর! দাদাকে-আমার শীঘ্র আরোগ্য করিয়া দাও।"

দুই ভায়ের মনোভাব এইরূপ। দুটীতে যেন একাত্মা—এক প্রাণ।

(৫)

কিছুদিন গেল। এল, এ পরীক্ষায়ও সবিতা-সুপ্রভাত প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। যথা-সময়ে উভয়ে বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিল।

পিতামাতার আর আনন্দের সীমা নাই। পুত্রদ্বয় উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছে দেখিয়া, কোন পিতামাতা না আনন্দিত হন? চারিদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। অনেকেই বসুজ-মহাশয়ের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন সত্যবতী কহিলেন,—"সবিতা-সুপ্রভাত আমার বড় হইয়াছে; মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায়, বাছা-দুটী আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে; বিবাহ দিতে হানি কি? আহা! চাঁদপানা বউ-দুটী ঘরে আনি, আমার ঘর আরও আলো হোক।"

সর্ব্বেশ্বর কহিলেন,—"তা' তোমার যদি সাধ হয়, ত হোক। শুভকর্ম্মে আমারও আপত্তি নাই।"

তাহাই স্থির হইল। নানাস্থানে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। বসুজ-মহাশয় নিজের পছন্দ-মত কন্যা দেখিতে লাগিলেন। কুলে-শীলে, ধনে-মানে, রূপে-গুণে—সর্ব্বাংশেই করণীয়, অবশ্য এমন স্থলেই সম্বন্ধ হইতে লাগিল। শেষে দুইটী কন্যা-রত্ন মনোনীতও হইল। সকল কথা স্থির হইয়া গেল।

এদিকে, সবিতা ও সুপ্রভাত, বি, এ, পরীক্ষায়ও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। সবিতার বয়স এক্ষণে উনিশ, সুপ্রভাতের আঠার। যৌবনের এই প্রারম্ভে, উভয়ের সে স্বাভাবিক রূপরাশি, আরও সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিল।

(৬)

উভয় পক্ষের পাকা দেখা-শুনা হইয়া গেল; লগ্ন-পত্রও স্থির হইল। পর-পর দুই দিন, দুই তারিখে, দুই ভাইয়ের বিবাহ।

পুত্রদ্বয়ের বিবাহে মায়ের আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। সত্যবতী আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

বিবাহের আর এক সপ্তাহ কাল আছে। ফাল্গুন মাস; মধুময় বসন্তকাল সমুপস্থিত। প্রকৃতি-দেবী নব-সাজে সজ্জিতা হইয়া জীব-জগৎকে অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উপহার দিতেছেন। মলয়-মারুত মৃদুমন্দ হিল্লোলে সকলকেই উৎফুল্ল করিতেছে। নব-মঞ্জরিত ফলে-ফুলে তৃণে-পত্রে চারিদিক্ সুশোভিত।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, সবিতা ও সুপ্রভাত, আপনাদের বাটীর সম্মুখে, সেই 'বোসের গড়ার' তীরে বেড়াইতে লাগিল। দু'জনের মনই খুব প্রফুল্ল। একে মাধুর্য্যময় বসন্তের সমাগম; তাহার উপর সম্মুখ শুভ-বিবাহের সুমধুর কল্পনা;—অভিন্ন-হৃদয়, সুখে-দুঃখে সমভাগী একাত্মা, দুই ভায়ের—সবিতা-সুপ্রভাতের মত দুই ভায়ের শুভ-বিবাহের সুমধুর-কল্পনা,—মণি-কাঞ্চন-যোগ হইল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। জ্যোৎস্না রাত্রি; চাঁদ উঠিল। চকোর-চকোরী চাঁদের সুধা পান করিতে লাগিল। চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে দিক্ আলোকিত হইল। মৃদু-মন্দ মলয়-হিল্লোল সঞ্চালিত হইতে লাগিল। অদূর-প্রস্ফুটিত কুসুম-সৌরভে দিক্ আমোদিত হইল। সম্মুখে দীর্ঘিকা, সময় সন্ধ্যা, উপরে চাঁদ, চারিদিকে জ্যোৎস্নালোক, তাহার উপর মধুময় বসন্ত-সমাগম। এই মনোরম কবিতা-রাজ্যে, পরম প্রীতিপ্রদ সময়ে, তদধিক প্রীতিপ্রদ বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে উভয়ে দীর্ঘিকার পার্শ্বে উপবেশন করিল। আজ আর কাহারও মুখে বড়-একটা অধিক কথা নাই। প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হইয়া, ভাবী সুখের কল্পনায় মত্ত থাকিয়া, উভয়েই স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সবিতা আকাশপানে চাহিয়া কহিল,—"ভাই! প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব শোভা! আজ যেন আমার প্রাণে শান্তির প্রস্রবণ বহিতেছে। সুপ্রভাত! তোমার মনও কিরূপ হইতেছে, বল দেখি।"

বলিয়া, সবিতা প্রীতিভরে কনিষ্ঠের গায়ে হাত বুলাইল। সুপ্রভাতও প্রফুল্লচিত্তে কহিল,—"দাদা! আমারও বোধ হইতেছে, যেন কোন অভিনব-রাজ্যে আসিয়াছি। আহা! মন-প্রাণ স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কে বলে, সংসার দুঃখময়? মানাইয়া চলিতে পারিলে, এমন সুখের স্থান কি আর আছে?"

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইল। মলয়-সমীরণ সমভাবে বহিতে লাগিল।

সবিতা কহিল,—"ভাই সুপ্রভাত! আর সপ্তাহ পরে তোমার ও আমার বিবাহ হইবে। বিধাতা আমাদের প্রতি নূতন দায়িত্ব-ভার দিতেছেন। এখন হইতে প্রতিপদে, আমাদের সাবধান হইয়া চলা উচিত। বিবাহ বড় পবিত্র বন্ধন; যাহাতে সেই বন্ধন ধর্ম্মভাবে বদ্ধমূল হয়, আমাদের তাহাও করিতে হইবে। ভাই! তুমি কি বল?"

সুপ্রভাত কহিল,—"দাদা! ও সকল শাস্ত্রের কথা আমি কিছু বুঝি না। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা কর, যেন আমাদের মতি-গতি চিরদিন এই ভাবে থাকে। আর আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর, যেদিন তোমার সহিত মনান্তর ঘটিবে, সেই দিন যেন আমার আয়ুঃশেষ হয়।"

সবিতা একটু আবেগভরে কহিল,—"ভাই! ওরূপ অমঙ্গল কথা মুখে আনিও না। তোমায় আমায় মনান্তর ঘটিবে! ইহা কি সম্ভব? স্বভাবেরও গতিরোধ হইতে পারে, তথাপি তোমার আমার মনান্তর ঘটিবে, না। এ কথা, তুমি প্রস্তরে, লৌহ-ফলকে লিখিয়া রাখ।"

"কিন্তু দাদা, কাল বড় কুটিল। মানুষের পদস্খলন পদে পদে। তাই ভয় পাছে হয়, ভবিষ্যতে,কোন্ দিন, তোমার আমার এ পবিত্র বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। বিবাহ পবিত্র বন্ধন বটে; কিন্তু এ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, মানুষ আত্মহারা হয়; অনেক সময় মনুষ্যত্বও নষ্ট করে। সংসারে এ দৃশ্য বিরল নহে।"

"সংসারে বিরল না হইতে পারে; কিন্তু তোমার আমার সে ভয় নাই।"

তার পর, একটু ক্ষুণ্ণভাবে সবিতা কহিল,—"সুপ্রভাত! আজ তুমি এমন সন্দেহজনক কথা কহিতেছ কেন?"

বস্তুতঃ, সবিতার কথায়, সুপ্রভাত কিছু অপ্রতিভ হইল। মনে মনে কহিল,—"আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি। এরূপ কথায়, দাদার মনে কষ্ট দিয়াছি। আহা, দাদা আমার সরলতার প্রতিমূর্ত্তি!"

প্রকাশ্যে কহিল,—"না দাদা! তুমি কিছু মনে করিও না. মনের আবেগে আমি অমন কথা বলিলাম।"

সবিতাও উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিল,—"উপরে দেবতা আছেন; অন্তর্যামী তিনি,—আমার অন্তর দেখিতেছেন;—সুপ্রভাত! তোমায় সত্য বলিতেছি, সমস্ত পৃথিবী একদিকে হইলেও, তোমার আমার এ ভ্রাতৃপ্রেমে কেহ বাদ সাধিতে পারিবে না!"

সুপ্রভাতও পুলকিত-হৃদয়ে কহিল,—"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক!—দাদা! তোমারই কথাই যেন সার্থক হয়।"

রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া, উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া, গৃহে গেল।

(৭)

শুভদিনে, শুভক্ষণে, উভয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল।

সত্যবতী প্রীতি-প্রসন্ন-মনে, হাসি-মুখে, পুত্রবধূদ্বয়কে গৃহে তুলিলেন। বধূদ্বয়ের চাঁদ-পানা মুখ, প্রেমভরা হাসি দেখিয়া, ইহসংসার ভুলিয়া গেলেন।

কিছুদিন খুব সুখ-শান্তিতে কাটিয়া গেল। বউ-দুটীও মানুষ হইয়া উঠিল। সবিতা ও সুপ্রভাত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধি লাভ করিল। এইবার তাহারা কার্য্যক্ষম হইল। দুই ভায়ে বিস্তর অর্থও উপার্জ্জন করিল। সর্ব্বেশ্বরের অবস্থা ফিরিয়া গেল। তিনি এক্ষণে একজন ধনী-ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হইলেন।

আরও চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। সবিতা ও সুপ্রভাত যথাক্রমে উনত্রিংশ ও অষ্টাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সময়ে বৃদ্ধ জনক জননীও একে একে ইহলোক হইতে অনন্ত কালের জন্য অন্তর্হিত হইলেন। এইবার "কালের স্ব-ধর্ম্ম" ফলিতে চলিল।

* * * * * *

(৮)

ভক্ত-কবি তুলসীদাস সত্যই কহিয়াছেন,—

"দিন কা মোহিনী, রাত কা বাঘিনী,
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া লোক সব বাউরা হোকে,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

হে মোহিনি, হে বাঘিনি, হে বঙ্গ-গৃহ-ধ্বংসকারিণি, অশান্তিময়ি, অলক্ষ্মি! তোমাকে নমস্কার! তুমি কত সোণার-সংসার ছারখার করিতেছ; কত রেষারিষী-দ্বেষাদ্বেষী, কলহ-

কুবাক্যে বিষ-বহ্নি উদ্গিরণ করিতেছ; কত পিতা-মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজনের বুকে ছুরি মারিতেছ; কত লোককে ক্রমে ক্রমে চক্ষুশূন্য করিয়া নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছ; কত শান্তিময় সমাজকে শ্মশানে পরিণত করিতেছ তাহার ইয়ত্তা নাই। ধন্য তোমার প্রভাব, ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি! তোমার প্রভাবে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠকে, পুত্র পিতাকে, বংশধর জ্ঞাতিবন্ধুকে পায়ে ঠেলিতেছে!—প্রবলে! আবার কতদিনে তুমি এ বঙ্গভূমে দেবীমূর্ত্তিতে দেখা দিবে?

এই যে দেব-চরিত্র সবিতা-সুপ্রভাত সহোদর দুটী,—আহা, 'ভাই' বলিতে যাহারা অজ্ঞান; এতদিন—জীবনের এতখানি পথ অগ্রসর হইয়াও যাহারা পরস্পরকে অভিন্ন-হৃদয় বলিয়া জানিত; মুহূর্ত্তের বিরহ যাহাদের অসহ্য বোধ হইত; পরস্পর পরস্পরকে প্রাণান্তপণে ভাল বাসিয়া, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব দিয়াও যাহারা তৃপ্ত হয় নাই,—আজ বল দেখি, কাহার মায়ায়, কাহার উত্তেজনায়, কাহার যাদুকরী মন্ত্রে, তাহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য হইল? মায়াবিনি, অন্তর্দ্ধান হও! তোমার অন্তর্দ্ধানে, ত্রিভুবন শান্ত হউক; নরকের আগুন নিবিয়া যাক্। দেবীর আগমনে, হিন্দুর সংসার, আবার দেবতার সংসার হউক!

বৃদ্ধ জনক-জননীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, সবিতা ও সুপ্রভাতের সুখ-রবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম কেহ বুঝিতে পারে নাই,—কোথা হইতে,বিষ কিরূপে একটু একটু ধরিতেছে। ধিকি ধিকি বিষও ধরিতে লাগিল, আবার তাহার উপর, অল্পে অল্পে, ইন্ধনও পড়িতে লাগিল। কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,—কালমাহাত্ম্যে অনেকেরই এইরূপ হয়,—সবিতা-সুপ্রভাতের ভাগ্যেও তাহাই হইল।

বড়-বউ ঠাকুরুণটী এই অনর্থের মূল। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, দুই 'জায়ে' মিলে-মিশে সংসার করেন। "কেন, রামেরা দু'ভাই পৃথক্ হ'য়েছে; শম্ভু যদুও আলাহিদা হাঁড়ী কেড়েছে; আর তোমার বেলায় 'মহাভারত অশুদ্ধ'! বিষয় আশয়, বাড়ী ঘর-দ্বার সব ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নাও; নিজের 'এক্তার' মত পায়ের উপর পা দিয়ে ব'স; দশের এক-জন হও; তবে ত সকলে মানিবে গণিবে! তা নয় কি,—এক ভাই, ভাই, ভাই! অমন গুণের-ভাই হয় অনেকে! কেন, রামের লক্ষ্মণ নাকি?"

এইরূপ দিন-রাত ফোঁস ফোঁস শব্দ, হাঁড়ী-মত মুখখানা, আর এটা সেটা 'অছিলা' ধরিয়া কান-ভাঙ্গানি! সে কুঞ্চিত নাসিকা, বক্র দৃষ্টি, আর হাত-মুখ-নাড়ার ভঙ্গী একরূপ অদ্ভুত! স্ত্রী-রত্নের প্রতিনিশ্বাসে বিষ-অগ্নি-উদ্গিরণ হইতেছে; সে রত্নমণি "পলক পলক" রুধির-লোলুপা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ইতস্তত ধাবিতা হইতেছেন। সবিতা বেচারী আর কতক্ষণ ঠিক থাকিতে পারে? প্রথমে একটু কম মশামিশী, একটু কম-কথাবার্ত্তা, একটু উপেক্ষাভাব প্রদর্শন, একটু বিরক্তি-প্রকাশ, একটু খিটখিটে-মেজাজী—এইরূপ একটুর পর একটু করিয়া সবিতা, সুপ্রভাতকে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুন্দরী ঠাকুরুণ (সবিতার সহধর্ম্মিণী) ছোট বধূকে বিধিমতে বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন। সুরবালা (সুপ্রভাতের সহধর্ম্মিণী) অমানুষী সহিষ্ণুতা-গুণে পিশাচী জায়ের সে অত্যাচার সকল অম্লান বদনে সহ্য করিতে লাগিলেন। মুখের কথাটী বাহির না করিয়াও, চোরটীর মত, খলের ষড়যন্ত্র সকল দেখিতে লাগিলেন।

সুপ্রভাত কিন্তু এসব কিছু দেখিয়াও দেখেন না; কিছু শুনিয়াও শুনেন না। তাঁহার মনে হয়,—"ইহাও কি হইতে পারে, দাদা আমাকে পায়ে ঠেলিবেন? আমি কি চিরদিনের মত তাঁর স্নেহে বঞ্চিত হইব? না—না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এ অলীক-চিন্তা মনে স্থান দেওয়াও পাপ!"

(৯)

কিন্তু "কালের স্বধর্ম্ম" কোথায় যাইবে? পতিপ্রাণা সুন্দরী ঠাকুরুণ, পতির কর্ণকুহরে অবিশ্রান্ত ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিতে করিতে সবিতার চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ইষ্ট-দেবতা যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য। "দুই ভাইয়ে এক অন্নে থাকাটা কিছু নয়। ইহা, একালের সভ্যতা-বিরুদ্ধ। বিশেষ, সুপ্রভাতের অনেক গুলি ছেলে-মেয়ে হইতে চলিল; পরিবার তাহারই অধিক; খরচও অধিক। মিথ্যা

নয়,—কেন আমি 'পর'কে জড়াইতে গিয়া নিজে মারা পড়ি? সুন্দরীর কথাই সত্য,—কলিতে আবার ভাই ভাই এক থাকে কোথায়? বিশেষ, ভাই ত আর রামের অনুজ লক্ষ্মণ নয়!"

আগুনে বিজলী খেলিল। সবিতা এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট আছেন, এমন সময় ছেলেদের খাবার-দুধ লইয়া, সুরবালার পরিচারিকার সহিত সুন্দরী ঠাক্রুণের কি-একটু বচসা হইল। এইবার তিনি মতলব হাসিল করিবার সম্পূর্ণ অবসর বুঝিলেন। স্বামি-সোহাগিনী তখনি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া কান্নার সুরে অভিমানভরে কহিলেন,—"তুমি আজই এর একটা বিহিত কর। দাসী-বাঁদীতেও আমায় দশকথা শুনাইবে?—কেন?"

কান্নার বেগ বাড়িল। ঠাক্রুণ কহিলেন,—"কেন, দুধ ত সরকারী,—এর আবার খোকা-খুকীর কি? নিজে খেলে আশ মিটেনা, আবার দাসীকে দিয়ে অপমান!"

সবিতা মনে মনে কি বুঝিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"কি হ'য়েছে?"

"হ'বে আর কি? তোমার গুণের ভাই আর বউ-মার জ্বালায় আমায় আত্মঘাতিনী হ'তে হ'বে দেখছি।"

কান্নার বেগ আবার বৃদ্ধি হইল। স্বামি-সোহাগিনী ঝাঁক-মুখ নাড়িয়া, হেলিয়া দুলিয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া, আবদারভরে কহিলেন,—"কি, ওরকম ক'রে ব'সে ভাবছ কি? আজই যা হয় একটা শেষ কর। নিজে না মুখ-ফুটে বল্তে পার, বল, আমি আছি।"

সবিতা একটু ঢোক গিলিয়া, আমৃতা আমৃতা করিয়া কহিল,—"হঁা, আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। সুপ্রভাতকে আমি নিজে একথা বলিতে পারিব না। তুমি, ছোট বউ-মাকে গিয়া, সব কথা খুলিয়া বল। কেমন?"

"আচ্ছা, তাই।"

স্বামি-সোহাগিনী সুন্দরী, আহ্লাদে ডগমগ হইয়া, আবেগভরে কহিল, "তবে আজ হইতে? কেমন, কি বল?"

সবিতা আর একবার ঢোক গিলিল। কি ভাবিল। শেষে বলিল,—"তাই।"

সতী-প্রতিমা সুরবালা এসময়ে প্রাঙ্গণ হইতে গৃহে উঠিতেছিলেন। কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল। হঠাৎ একখানি সুদৃঢ় কাষ্ঠফলক ঠিক্রিয়া সজোরে তাঁহার কপালে আঘাত করিল। সে আঘাতে একটু রক্তপাতও হইল।

(১০)

ভ্রাতৃবৎসল সুপ্রভাত অতি উদার-প্রকৃতি। মুহূর্ত্তের জন্যও জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস হয় নাই। তিনি স্ব-উপার্জ্জিত সমস্ত ধন-সম্পত্তি অগ্রজের হস্তে দিতেন। কি হইতেছে, বা কি হইল, একদিনের জন্যও এ প্রশ্ন করেন নাই। 'দাদা' বলিতে তিনি অজ্ঞান হইতেন।

এদিকে যথাসময়ে, সয়তানী সুন্দরী, সয়তান-ধর্ম্ম পালন করিল। সরলা সুরবালাকে নিকটে ডাকিয়া কহিল,—"আজ হইতে আমরা পৃথক্ হইলাম। তোমার স্বামীকে কহিও, তাঁর দাদার আদেশ যে, পৈতৃক যা' কিছু আছে, সমস্ত ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া নিন। বিলম্বে তাঁহারই ক্ষতি। তাঁহার দাদা ভালমানুষ,—চক্ষু-লজ্জাটা তাঁর নাকি বড় বেশী,—তাই তিনি নিজে এ কথা বলিতে না পারিয়া, আমা দ্বারা বলাইলেন। তা' বোন, কিছু মনে করো না। পৃথক্ হলেম ব'লে যে, তোমাদের উপর আমাদের দয়া-মায়া থাকিবে না, এমন মনে ক'রো না। আর, আম-রাই কি তোমাদের 'পর' হবো? এ কোন্ দেশী কথা!"

কথা শুনিয়া, সুশীলা সুরবালা কোন উত্তর করিল না; মুখখানি নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

সুন্দরী আবার কহিল,—"তবে ব'লো, বোন। তাঁকে ডাকিয়ে এনে না হয়, এখনি বল।"

এই কথা বলিয়া, পাপিষ্ঠা তথা হইতে চলিয়া গেল এবং কোন একটা কৌশলে, সুপ্রভাতকে তখনই বাটীর ভিতর আনাইল। বিলম্বে পাছে, মতলব-সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়!

(১১)

সুশীল সুপ্রভাত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, সরলা সুরবালা বিষণ্ণমুখে, সকল কথা কহিল। শুনিয়া, সুপ্রভাত সর্পদষ্ট পথিকের ন্যায় চমকিত ভাবে কহিয়া উঠিলেন,—"না—না, ইহা কি সম্ভব? দাদা আমাকে পৃথক্ করিয়া দিলেন!!"

সরলা সহধর্ম্মিণী মুখখানি নত করিয়া, মৃদু-স্বরে বিনীতভাবে কহিলেন,—"স্বামিন্, সম্ভব

অসম্ভব আমি জানি না; যেমন শুনিলাম, বলিতেছি।"

সুপ্রভাত গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিক্ষণে তাঁহার মুখে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অতীতের অনেক দিনের অনেক কথা, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া স্মৃতিপথে উদিত হইল। অমনি শত-বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায়, উদ্ভ্রান্ত ভাবে, বিকলকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"না—না, ইহা কি সম্ভব? দাদা আমাকে পৃথক্ করিয়া দিলেন'? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? দাদা, দাদা—"বলিয়া সুপ্রভাত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেন। আবেগভরে আবার কহিলেন,—"না—না, ইহা কি সম্ভব? আমাকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়াও যাঁর আশ মিটিত না; যিনি আমাকে প্রাণাধিক প্রিয়তম ভাবিতেন; আমার জন্য যিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না,—সেই দাদা, আমার মার-পেটের ভাই, আমার হৃদয়ের দেবতা, বিনাদোষে আমাকে পায়ে ঠেলিবেন? না—না, ইহা কি সম্ভব?"

সুপ্রভাতের মুখ হইতে কথাগুলি অতি উচ্চৈঃস্বরে বাহির হইতে ছিল। সবিতা সহজেই তাহা শুনিতে পাইলেন। পাপিষ্ঠা পত্নীর উত্তেজনায় ও তাহার শিক্ষামত, তিনি সুপ্রভাতের গৃহের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুপ্রভাত অস্থির-চিত্তে কি ভাবিতে ছিলেন; এই সময়ে, আবার যাতনা-জড়িত বিকল কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"না—না, ইহা কি সম্ভব?"

সবিতাও অমনি প্রত্যুত্তরের অবসর বুঝিলেন। কিন্তু সে প্রত্যুত্তর তাঁহার নিজের ইচ্ছায় নয়, পাপিষ্ঠা পত্নীর উত্তেজনায়। কম্পিত-কণ্ঠে সবিতা কহিলেন,—"কি সম্ভব, সুপ্রভাত?"

অগ্রজের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুপ্রভাত দ্রুতপদে সেই খানে উপস্থিত হইলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে, বুক চাপিয়া ধরিয়া, কহিলেন,—"দাদা, দাদা, তুমি নাকি আজ হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছ?"

সবিতা অধোবদনে নীরব রহিলেন। মুখে একটী মাত্রও কথা বাহির হইল না। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

এই সময়ে পাপিষ্ঠা সুন্দরী, পার্শ্বের ঘর হইতে, বিরক্তভাবে সুপ্রভাতকে শুনাইয়া কহিল,—"তা কি, তুই বল্ না,—বাবু চক্ষু-লজ্জায় কিছু বল্‌তে পাচ্ছেন 'না' ব'লে, এত পীড়াপীড়ি করা কেন? ওর হ'য়ে আমিই বল্‌চি,—হাঁ, আজ হইতে উনি তোমাদিগকে পৃথক্ ক'রে দিলেন!"

কথাগুলা বিষাক্ত শরের ন্যায় সুপ্রভাতের বুকে বিঁধিল। সবিতা তখনও নিরুত্তর। সেই নিরুত্তর অবস্থায়, সুযোগ বুঝিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরম ভ্রাতৃ-বৎসল, কোমল-হৃদয়, সুপ্রভাতের সে নির্ম্মম-দৃশ্য আর সহ্য হইল না,—তিনি ছিন্ন কদলী-বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(১২)

'অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইলাম' ভাবিয়া, সহৃদয় সুপ্রভাত হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। অতীতের অনেক দিনের অনেক কথা, একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। সেই শৈশব কাল, শৈশবকালের সেই ধুলা-খেলা, সেই বিদ্যালয়ে একত্র পাঠাভ্যাস, একত্র শয়ন ভোজন ও বিহার —একে একে সকল কথা মনে উঠিতে লাগিল। সেই পীড়াকালীন সবিতার কাতরভাব, সেই স্বার্থ-মলিনতা-শূন্য স্বাভাবিক ভালবাসা, সেই অকৃত্রিম স্নেহ—এক এক করিয়া সকল চিন্তা, সুপ্রভাতকে বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় অধীর করিয়া তুলিল। তারপর,—সেই দীর্ঘিকার তীরে উভয়ের কথোপকথন, সবিতার সত্যনিষ্ঠা, স্থির-প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক বাক্য, ভ্রাতৃ-প্রেমের উদ্দামভাব-পূর্ণ সরল উপদেশ, উভয়ের বিবাহ—ভাবিতে ভাবিতে সুপ্রভাতের হৃদয়ে তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে, মর্ম্মান্তিক যাতনায় তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এইক্ষণ হইতে তাঁহার মূর্চ্ছা রোগ দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বরও আসিল। দেখিতে দেখিতে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন; রোগ সাংঘাতিক হইল।

ডাক্তার আসিল। রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগের কোনরূপ উপ-

শম হইল না। রোগীর অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, সুপ্রভাত এ যাত্রা সকলকে ফাঁকি দিয়া যাইবে।

সুবর্ণ-দীপ হাসিয়া উঠিল। আজ যে দীপ নির্ব্বাণ হইবে,—হায়, তাই এ হাসি!

সবিতার চৈতন্য হইয়াছিল,—কিন্তু অনেক বিলম্বে। ফলে কিছুই হইল না। বুঝিলেন, তিনিই সুপ্রভাতের এই অকাল-মৃত্যুর কারণ। ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। তাই আজ অতি কষ্টে, হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিয়া, তিনি অনুজের সেই অন্তিম-শয্যার শিয়রে আসিয়া বসিলেন; অতি কষ্টে কণ্ঠরোধও করিলেন। কিন্তু চক্ষু ফাটিয়া, টস্ টস্ করিয়া, কয় ফোঁটা গরম রক্ত অনুজের সেই পাংশুময় মুখের উপর পড়িল!

প্রভাতী-চাঁদের মত সুপ্রভাত একটু ম্লান হাসি হাসিল। অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে কহিল,—"দাদা, কাঁদ কেন? তোমার দোষ নাই,—দোষ আমার অদৃষ্টের;—দেশ এই কলি-যুগের!"

সবিতা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন

সুবর্ণ-দীপ আর একবার হাসিয়া উঠিল। যেন ছিন্ন মেঘের কোলে ক্ষীণা সৌদামিনীর বিকাশ! তাহা আভাহীন, প্রভাহীন, শোভাহীন, প্রাণহীন। কিন্তু সে হাসি,—পরম ভ্রাতৃবৎসল, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, দেব-চরিত্র, সুপ্রভাতের সেই ম্লানহাসি, আজ সবিতার বক্ষে, বিষাক্ত শল্যের ন্যায় বিষম বাজিল!

সুপ্রভাত অতি কষ্টে, অন্তিম নিশ্বাস টানিতে টানিতে কহিলেন,—"দাদা, মনে হয় কি,—আমাদের বিবাহের সাতদিন আগে দীঘীর পাড়ের সেই কথা? আমি ব'লেছিলাম না,—'দাদা, আশীর্ব্বাদ কর, যে দিন তোমার সহিত মনান্তর ঘটিবে, সেইদিন যেন আমার আয়ুঃ শেষ হয়!' আ! আজ আমার সেই কথা সার্থক হইল। এখন আমি সুখে মরিতে পারিব। দাদা, আমি চলিলাম! আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম তোমাকেই ভাই পাই!!"

সুপ্রভাতের চক্ষে জলধারা দেখা দিল; কিন্তু তাহা গণ্ডস্থলেই রহিল আর বহিতে পারিল না,—যেখানকার বস্তু, সেই খানেই মিশিয়া রহিল।

কথা শুনিয়া সবিতার প্রাণ ফাটিয়া গেল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটী কথাও কহিতে পারিলেন না। সহসা, বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অমনি, এককালে শত-সহস্র বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায়, মর্ম্মান্তিক যাতনায়, বিকল কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"সুপ্রভাত, ভাই আমার,—আমিই তোমার জীবনহন্তা। বুঝিলাম, নরকেও এ ভ্রাতৃঘাতীর স্থান নাই!!"

সবিতা কাঁদিয়া উঠিলেন। সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

পতিপ্রাণা সুরবালা এই সময়ে সোণারচাঁদ শিশু তিনটীকে সঙ্গে লইয়া, স্বামীকে শেষ দেখা দেখিলেন। সাধ্বী সতী পতির পায়ে মাথা লুটাইতে লুটাইতে কাঁদিতে লাগিলেন। অবোধ শিশু তিনটীও কাঁদিয়া উঠিল। হরি হায় হরি!!—এদিকেও অমনি, নিঃশব্দে, নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি সুপ্রভাত অনন্তধামে চলিয়া গেলেন!

দীপ নির্ব্বাণ হইল!!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

আমার জীবন-চরিত

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমার বেরিলীত্যাগের পর-দিনই, ভ্রাতা-কালীপ্রসাদ এবং বেরিলীর আর ছয় জন বাঙ্গালী, নবাব খাঁ বাহাদুরের আজ্ঞায়, কারারুদ্ধ হন। ইঁহারা যে, কোন বিশেষ বা সামান্যও অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অপরাধের মধ্যে, ইঁহারা বাঙ্গালী। উত্তর-পশ্চিম-দেশ-বাসিগণের তখন সাধারণত ধারণা ছিল,—ইংরেজ ও বাঙ্গালী এক-দেহ, এক-প্রাণ। বাঙ্গালী, ইংরেজের গুপ্তচর, গুপ্তমন্ত্রী। বাঙ্গালী, ইংরেজের দাক্ষণ-হস্ত,—সিন্দুকের চাবি, অঙ্গুরীর হীরা, ব্যঞ্জনের লবণ। স্বভাবতই বাঙ্গালী ইংরেজের পক্ষ। অতএব মার, ধর, বাঁধ বাঙ্গালীকে। এইরূপ বিশ্বাস-বশেই বেরিলীর বাঙ্গালী কয়জন ধৃত হইয়া, যমালয়-সদৃশ ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁহাদের নামে অভিযোগ উঠিল যে, ইঁহারা মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতেছেন, ইংরেজের সহিত

গোপনে চিঠিপত্র লেখা-লিখি করিতেছেন, এবং সংগোপনে ক্ষুধার্ত্ত ইংরেজকে রসদ যোগাইবার চেষ্টায় আছেন।" বলা বাহুল্য, এ অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহার মূল নাই, অঙ্কুর নাই, ফুল-ফল-পত্র কিছুই নাই। অথচ কেবল সন্দেহ করিয়া ধারণা-বশে ইঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করা হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, শেষে প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্য্যন্ত আসিল।

বর্ষাকাল। বেরিলীর কারাগার তখন কর্দ্দমময়। ছাদ ফাটা। বর্ষা-জল নল দিয়া বাহিরে পড়ে না,—প্রায় সবটুকু গৃহাভ্যন্তরে পতিত হয়। কারাগৃহ অধম গোশালা অপেক্ষাও অধম। তাহার উপর ছত্রিশ জাতিকে এক সঙ্গে একত্রে বাস করিতে হয়। তাহার উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন-প্রহার বিলক্ষণ আছে। শয়ন, উপবেশন জন্য প্রত্যেক কয়েদী এক এক খানি পুরাতন, দুর্গন্ধময় ছেঁড়া-চট পাইয়াছেন। তাহাকেই কাদায় বিছাইয়া বসিতে হয়, শুইতে হয়। পায়ে বিষম বেড়ী। অভ্যাস নাই, কোমল শরীর;— চতুর্থ দিনে বেড়ী-ভারে কালীপ্রসাদের পায়ে ঘা হইয়া উঠিল। আহারের ব্যাপার আরও বিভীষিকাময়। ঘোড়ায় যে দানা খায়, সেই-রূপ দানা অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে প্রত্যেক কয়েদীর প্রতি বরাদ্দ ছিল। আর, ইহার উপর ছাতু, জল, আর লঙ্কা। বাঙ্গালী কয় জনের কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে।

ভ্রাতা কালীপ্রসাদ এবং অন্য ছয় জন বাঙ্গালী দুই দিন কাল অনাহারে ছিলেন। তৃতীয় দিনে একজন ব্যতীত আর আর সকল বাঙ্গালীই সেই সুখাদ্য খাইতে আরম্ভ করি-লেন। চতুর্থ দিনে আদৌ কারাগারে আহার আসিল না। কারাকক্ষে হাহারব পড়িয়া গেল।

যিনি প্রথম দিন হইতে অনাহারে ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ,—উচ্চ বংশজাত,—পণ্ডিত,—এবং নিষ্ঠাবান্। কারাগারে তিনি কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না; আপন মনে নীরবে বসিয়া, হাতে পৈতা লইয়া, অন্তরে কেবল দুর্গা-দুর্গা নাম জপ করিতেন। চতুর্থ দিনে অপরাহ্নে তিনি আর সোজা হইয়া বসিতে পারিলেন না। সেই চটের উপর শুইয়া পড়ি-লেন। জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা কহিবার তাদৃশ শক্তি নাই। চারি দিন অনাহারে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে, গা ঝিমু ঝিমু করিতেছে।

কারা-ভবনের সকল গৃহগুলিই যে এরূপ ভগ্ন, তাহা নহে। হঠাৎ একজন কারা-প্রহরী আসিয়া, কয়জন বাঙ্গালীকে একটু সম্মান দেখাইয়া ধীরভাবে কহিল,—"আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।"

বাঙ্গালী সাতজন প্রহরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সেই নিষ্ঠাবান হিন্দুকে ভ্রাতা কালী-প্রসাদ ও আর একজন বাঙ্গালী,—এ উভয়ে ধরিয়া লইয়া যান। কারণ, তখন তাঁহার চলৎ-শক্তি একরূপ রহিত হইয়াছিল।

সেই কারা-ভবনের ভিতর যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘর, সেই ঘরে সাত জন বাঙ্গালী প্রবেশ করি-লেন। এ ঘরটী বৃহৎ; ভগ্ন নহে। দিব্য চুণ-কাম করা। পরিষ্কার,—খট্‌খটে। চারি দিকে চারিটী জানেলা এবং দুইটী দ্বার। 'সাত খানি 'খাটিয়া' পাতা। বারেন্দায় সাত জনের বসিবার উপযুক্ত একখানি শতরঞ্চ বিছানো।

হঠাৎ এরূপ সমাদর দেখিয়া সাত জনেই হতবুদ্ধি। হঠাৎ কেন এমন হইল? এই নরকে পচিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহারা স্বর্গে আসি-লেন কেন?

হঠাৎ একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ লুচি, সন্দেস, দধি, ক্ষীর আনিয়া উপস্থিত করিল। আর একজন ব্রাহ্মণ পবিত্র পানীয় জল আনিল। সেই জল-বাহক ব্রাহ্মণ সাত জনের সাতটী "পাত" করিয়া দিল। লুচি সন্দেস পরিবেশনের পর সে কহিল, "বাবু সাহেব! খাইতে বসুন।"

বাঙ্গালী সাত জন অবাক্, মুগ্ধ। এ কি এ? কালীপ্রসাদ ভাবিয়াছিলেন,—বোধ হয়, অদ্য সন্ধ্যার পর আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে, তাই শেষ-ভক্ষণ এত সমারোহে হইতেছে। কালী-প্রসাদ বলেন,—"আর একটু হইলেই আমি কাঁদিয়া ফেলিতাম।"

এমন সময় একখানি পাল্কী কারাভবনে প্রবেশ করিল। বাহকগণ পাল্কী লইয়া ধীর-পদে সেই সাত জন বাঙ্গালীর সম্মুখপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। পাল্কী হইতে এক অসামান্য

রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী-রমণী বাহির হইলেন। ইনি গন্ধর্ব্বকন্যা, নাগকন্যা, না—যক্ষকন্যা? এই বিদ্যাধরীকে দেখিয়া কাশীপ্রসাদ ভাবিয়াছিলেন,—"আমরা বুঝি মর্ত্ত্যরাজ্যে আসিয়াছি, অথবা স্বপ্ন দেখিতেছি।"

কিছুক্ষণ পরে, কাশীপ্রসাদ বুঝিলেন,—ইনি আর কেহই নহেন,—সেই পরোপকারিণী পান্না। কাশীকে দেখিয়া পান্নার চোখে জল টস্ টস্ পড়িতে লাগিল। কাশীও কাঁদিতে লাগিল।

পান্না কারাগারে আসিল কিরূপে? সাত জন বাঙ্গালীর কষ্ট দূর হইল কিরূপে?—হঠাৎ এরূপ লুচি সন্দেসই বা আসিল কিরূপে? সমস্তই পান্নার কীর্ত্তি। অর্থে জগৎ বশ। , কারাপ্রহরীগণ কোন্ ছার? পান্না বিশেষ তদ্বির করিয়া, কারাধ্যক্ষকে বশ করিয়া, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, এই অঘটন ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ একবার করিয়া ঐ সাত জনের জন্য লুচি সন্দেস প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী বাহির হইতে আসিত।

সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, কারাকক্ষে লুচি সন্দেস ভক্ষণ করেন নাই। ব্রাহ্মণ দ্বারা আনীত ছোলা ভিজাইয়া খাইতেন এবং কমণ্ডলু সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জলপান করিতেন।

এই একমাস কাল আহারাদি যোগাইবার জন্য এবং প্রথম তদ্বিরের জন্য পান্নার প্রায় এক সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

কারাবাসের বিংশতি দিনে সাত জন বাঙ্গালীর প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। কিন্তু কবে যে, প্রাণদণ্ড হইবে, তাহার কিছুই ঠিক হইল না। তখন চারিদিকে কেবল আমার অন্বেষণ হইতে লাগিল। নবাব খাঁ বাহাদুর বলিয়াছিলেন,—"দুর্গাদাস বড়ই বদমায়েস,—তাহাকে একান্তই গ্রেফতার করিতে হইবে। সে ধৃত হইলে, একত্র একদিনে আটজন বাঙ্গালীর প্রাণবধ করা হইবে।"

কারাবাসের দ্বাবিংশতি দিনে প্রকাশ পাইল, —পান্না, সাত জন বাঙ্গালীকে কারাগৃহে গোপনে আহার যোগাইয়া থাকে। নবাব খাঁ বাহাদুর, পান্নাকে ধরিবার জন্য বার জন সিপাহী যাইতে আজ্ঞা দিলেন। গুপ্তচর-মুখে পান্না এ সংবাদ পাইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রচ্ছন্নবেশে বেরিলী ছাড়িয়া পলাইলেন। পান্না ধরা পড়িলেন না,—কিন্তু কারাধ্যক্ষ কর্ম্মচ্যুত হইল। আর প্রত্যেক বাঙ্গালীর দশ দশ বেতের হুকুম হইল। মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। আমাকে ধৃত করিবার জন্য নানা দিকে গুপ্তচর ফিরিতে লাগিল।

আমি এখন হাফিজ নিয়ামৎ খাঁর ঘরে বসবাস করিতেছি। কিন্তু বড়ই সভয়ে। কখন ধরে,—কেবল এই সন্দেহই মনোমধ্যে উদিত হইত। কিন্তু হাফিজ নিয়ামৎ বলিতেন,—"বাবুজি! ভয় কি?—আপনি আমার লোক লইয়া স্বচ্ছন্দে বেরিলী সহরে ভ্রমণ করুন,—খাঁ বাহাদুরের সাধ্য কি যে, আপনাকে গ্রেফতার করে?" হাফিজ দারুণ গোঁয়ার ব্যক্তি;— তাহার ক[illegible] [illegible] অবশ্যই [illegible] [illegible]র হইতাম।

[illegible] অচিরে প্রাণদণ্ড হইবে,— ইহাতে মন যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহা লিখিয়া কত জানাইব? ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে আমারও প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী; কারণ, আমি ত ভ্রাত[illegible] প্রাণদণ্ড কালে আর লুক্কায়িত থাকিতে পারি[illegible] না,—অবশ্যই বাহির হইয়া পড়িব। তখন নবাবের প্রহরীগণ আমাকে [illegible] সকলের সহিত একই স্থানে নিশ্চয় [illegible] করিবে। কি [illegible]?—উপায় কি? উদ্ধারের বিষয় হাফিজ সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিব কি?—কিন্তু তিনি যেরূপ উদ্ধত-স্বভাব এবং নবাবের প্রতি খড়্গহস্ত, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

হাফিজ নিয়ামতের বাটীর সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র বাগান ছিল,—সেই বাগানেই আমি থাকিতাম এবং স্বয়ং কূপ হইতে জল তুলিয়া আহারাদি করিতাম। কেবল হাফিজ সাহেব যখন, তাঁহার বৈঠকখানায় বসিতেন,—তখনই আমি তাঁহার নিকট যাইতাম।

আমি একদিন নির্জ্জনে পাইয়া হাফিজ সাহেবকে ধরিয়া বসিলাম,—"সাত জন বাঙ্গালীকে উদ্ধার আপনাকেই করিতে হইবে,—আপনি ভিন্নগতি নাই।"

এ কথা শুনিয়া হাফিজ সাহেব যে উত্তর দেন, তাহা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।
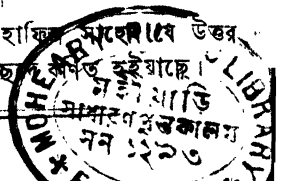
জন্মভূমি।

(বিশেষ-দ্রষ্টব্য

জন্মভূমির দুই বৎসর শেষ হইল। পৌষে জন্মভূমি তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিবে।

এরূপ সুলভ মূল্যের অথচ এরূপ বৃহৎ সারগর্ভ মাসিক পত্র এ দেশে আর নাই। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে তৃতীয় বৎসরের জন্মভূমি কাহারও নিকট প্রেরিত হইবে না। এই সস্তার সামগ্রী ধারে দিতে একান্তই অক্ষম।

অনেকেই অগ্রিম মূল্য পাঠান বটে, কিন্তু কাহারও কাহারও আলস্য হয় কাহারও ভুল হয়, কেহবা বিস্মরণ হন। সেই জন্য এবার হইতে এক প্রশস্ত নিয়ম উদ্ভাবন করিলাম। ইহাতে আমাদের কার্য্যের বিশেষ ঝঞ্চাট বটে, কিন্তু গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়াই এ নিয়ম অবলম্বন করিলাম।

পৌষ মাসের জন্মভূমি গ্রাহকগণের নিকট ভ্যালুপেবলে প্রেরিত হইবে ;— গ্রাহকগণ জন্মভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও ডাকমাশুল ছয় আনা এবং ভিঃ পিঃ খরচ ৵০ দুই আনা,—পোষ্ট-পিয়নের হাতে দিয়া পৌষের জন্মভূমি খানি লইবেন। ইহাতে গ্রাহকগণের কত সুবিধা ভাবিয়া দেখুন।

ভিঃ পিঃ পোষ্টে জন্মভূমি পাঠাইবার কি গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত দুই আনা দিতে হইল বটে, কিন্তু মণিঅর্ডার করিয়া টাকা গ্রাহকগণকে পাঠাইতে হইলেও ত সেই দুই আনাই কমিশন দিতে হইত! সুতরাং গ্রাহকগণের পক্ষে কোন দিকেই লোকসান নাই।

যদি কোন মফস্বলের গ্রাহক লোক দ্বারা জন্মভূমির বার্ষিক মূল্যাদি পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি যেন সত্বর পাঠান। কারণ, অগ্রহায়ণ মাসে সে মূল্য না পাঠাইলে, পৌষমাসে ভ্যালুপেবলে জন্মভূমি যাইবে।

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, ৩৪।১ কলুটোলা, কলিকাতা।